চৈতন্য-পরিকর

চৈতন্য-পরিকর

(ষোড়শ শতক)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি.ফিল.-ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত থিসিস-এর
সাধারণ-পাঠকোপযোগী ঈষৎ-পরিবর্ধিত সংস্করণ]

শ্রীরবীন্দ্রনাথ মাইতি, সাহিত্যভারতী, এম. এ.

॥ বুকল্যাণ্ড, প্রাইভেট, লিমিটেড্ ।
১ শঙ্কর ঘোষ লেন,
কলিকাতা-ছয়

বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিঃ
১, শংকর ঘোষ লেন, কলিকাতা - ৬
বিক্রয় কেন্দ্র :
২১১/১, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

শাখা :
৪৪, জনস্টনগঞ্জ
এলাহাবাদ-৩

অশোক রাজপথ
পাটনা-৪

মূল্য ১৬.

STATE CENTRAL LIBRARY

জানকীনাথ বসু কর্তৃক বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ১ শংকর ঘোষ লেন কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত ও প্রভাতচন্দ্র চৌধুরী কর্তৃক লোকসেবক প্রেস ৮৬-এ, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলিকাতা-১৪ হইতে মুদ্রিত।

যাঁহার প্রত্যয়সিদ্ধ কল্যাণকামনা জীবনের মর্মমূলে বসিয়া তাহাকে চিরকাল উদ্দীপিত করিতেছে, সেই স্বর্গত পিতৃদেব, এবং যাঁহাকে দেখিয়াছি বলিয়া জানি না, অথচ যাঁহাকে আজীবন অনুসন্ধান করিয়া চলিতেছি, সেই মাতৃদেবী—এই উভয়ের স্মৃতি উদ্দেশে এই গ্রন্থ নিবেদিত হইল।

মুখবন্ধ

D. O. No.
Seal
University of Calcutta
Advancement of Learning

University College of Arts & Commerce
Asutosh Building
Calcutta

ঢের শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ মাইতির 'চৈতন্য-পরিকর' বহু যত্ন ও চিন্তনের শ্রমজাত রচনা। শতাব্দীর বৈষ্ণবমহাজনের সংখ্যা কম নয় এবং তাঁহাদের জীবনকাহিনীও অবিচিত্র গুরুত্বহীন নয়। সত্য বটে পুরানো বৈষ্ণব সাহিত্যে জীবনীগ্রন্থের অপ্রতুলতা নাই; কিন্তু জীবনীগ্রন্থগুলিতে যে সব কথা আছে তাহা সর্বাংশে বিশ্বাসবহ নয়। তদ্‌ব্যতিরেকে বহু পরস্পরবিরোধী উক্তিও প্রচুর আছে। রবীন্দ্রবাবু সে সব খুঁটিয়া আলোচনা করিয়া সত্যাসত্য নির্ণয় করিয়াছেন বলিব না, নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাহাই প্রকৃত গবেষকের কাজ। সত্য কী তাহা কেহই জানে না, সুতরাং বলিতেও পারে না, তবে সত্যের অনুসন্ধান করিতে পারে। সত্য-নির্ণয়ের প্রচেষ্টাই সত্যসন্ধা। রবীন্দ্রবাবু সেই কাজ, সত্যসন্ধান, অনুরাগের সঙ্গে নিষ্ঠার সঙ্গে সমাধা করিয়াছেন। সেই সাক্ষ্য দিবার জন্য আমি এই কয়টি কথা লিখিলাম।

রবীন্দ্রবাবুর বই সাধারণ পাঠকসমাজে সমাদৃত হইবে কিনা বলিতে পারি না; তবে বৈষ্ণবসাহিত্যজিজ্ঞাসুদের কাজে লাগিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

৭ সেপ্‌টেম্বর, ১৯৬২

শ্রীসুকুমার সেন

ভূমিকা

সভ্যতার ইতিহাসে পিরামিডের স্থান যেইরূপ, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ষোড়শ শতাব্দীর জীবনী-সাহিত্যের স্থানও অনেকটা সেইরূপ। ফারাওদিগের সহিত জীবনী-কারদিগের প্রচেষ্টার তুলনা হইতে পারে না; নৃপতিবর্গ নৃশংস উল্লাসে মাতিয়াছিলেন এবং জীবনীকারদিগের অন্তররুদ্ধ ভাবমন্দাকিনী যেন পথের সন্ধান পাইয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু উভয়ত্রই যে শোভা-সম্পদের ইমারত স্থাপিত হইয়াছে, তাহা তাহাদের অন্তর্দেশের দূরধিগম্যতাসত্ত্বেও সুমহান ও সমুজ্জ্বল। দূর হইতে দৃষ্টিপাত করিলে তাহার সরল-সুন্দর রূপটিই অন্তরকে আকর্ষণ করে।

ষোড়শ শতাব্দীর বহুপূর্বেই বাংলা সাহিত্যের গোড়াপত্তন হয়। কিন্তু এই সময়কার সাহিত্য যে কেন এমন মহিমোজ্জ্বল রূপ ধারণ করিল, তাহার কারণ অনুমান করা যাইতে পারে। জগৎ ও জীবনকে লইয়া সাহিত্য। জগৎ-প্রবাহ আসিয়া যখন জীবনের তটবন্ধনে কলমর্ম্মর জাগাইয়া তুলে তখনই সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভব হয়। তাই, জীবন যেখানে সংহত হয় নাই, সাহিত্যসৃষ্টিও সেইস্থলে সার্থক হইতে পারে না। আর, একটি বৃহত্তর জাতীয় জীবনের মধ্যে বহু মানবের জীবন যেখানে সুবিন্যস্ত হইয়া উপকূল-রেখার ন্যায় একটি দীর্ঘায়িত দৃঢ় সমাজ-বন্ধনের সৃষ্টি করে, বিশ্বপ্রবাহ সেই স্থলে নিশ্চিত-বন্ধনে ধরা পড়িয়া অবিরত মন্দ্রে সাহিত্যসৃষ্টিকে সম্ভব করিয়া তুলে।

বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এই কথা প্রযোজ্য। ব্রাহ্মণ-আরণ্যকের যুগে বর্তমান বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল পৃথকভাবে নামাঙ্কিত ছিল—পুণ্ড্র, বংগ, সুহ্ম ও রাঢ়। আবার পরবর্তি-কালে ইহাদের সীমারেখা পরিবর্তিত হওয়ায় ইহারাও কত পরিবর্তনের মধ্য দিয়া কত বিভিন্ন নামেই পরিচিত হইয়াছে—তাম্রলিপ্তি, কোটিবর্ষ, লৌহিত্য, হরিকেল, চন্দ্রদ্বীপ। আরও পরে—গৌড়, বরেন্দ্র, লক্ষ্মণাবতী, এবং ইহাদের সহিত যুক্ত হইয়াছে সমতট, কর্ণ-সুবর্ণ, প্রাগ্‌জ্যোতিষ বা কামরূপ। ক্রমেই ইহারা হয়ত একটি বৃহত্তর সীমাবন্ধনের মধ্যে ধরা পড়িতেছিল। কিন্তু এই সমস্ত অঞ্চলের অধিবাসী-বৃন্দ বহুকাল পর্যন্ত কোন একটি বিশেষ জাতি বলিয়া পরিচিত হইতে পারে নাই। অথর্বসংহিতায় সম্ভবত তাহাদিগকেই মগধ, অঙ্গ ও মুজবৎদিগের সহিত ব্রাত্য-পর্যায়ভুক্ত করা হইয়াছে। এমনকি, বহুপরে বোধায়নও তাঁহার শ্রৌতসূত্রে মগধের ব্রাহ্মণের প্রতি 'ব্রহ্মবন্ধুমাগধদেশীয়' বলিয়া কটাক্ষপাত করিয়াছেন। এইদিক হইতে বিচার করিলে হিরণ্যবাহের (বর্তমান শোন নদীর) পূর্বতীরবর্তী মগধ ও অঙ্গদেশকে একত্রে ধরিয়া এই সকল দেশের সভ্যতাকে শত-বৈচিত্র্য-সত্ত্বেও একটি নামে অভিহিত করা যাইতে পারে—প্রাচ্য বা পূর্বভারতীয়। বিদেহ রাজ্যের সভ্যতাও ইহারই অন্তর্গত। কারণ শতপথব্রাহ্মণ-বর্ণিত বিদেঘ-মাথভের গল্প হইতেও জানা যায় যে সদানীরা (গণ্ডক?) নদীর পূর্বে তখনও পর্যন্ত আর্য-উপনিবেশ ভালভাবে গড়িয়া উঠে নাই। প্রকৃতপক্ষে, সদানীরার পূর্বপার্শ্বস্থ এই বিদেহ-রাজ্যটি বরাবরই

আর্যাবর্ত কিংবা 'ধ্রুব-মধ্যম-প্রতিষ্ঠা'র বহির্ভূত ছিল। এমনকি, ঐতেরেয়ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে স্পষ্টতই বিদেহ-মগধের সহিত কাশী-কোশলকেও 'প্রাচী' আখ্যা দান করা হইয়াছে। সুতরাং কাশী-কোশলকে বাদ দিলেও দক্ষিণাভিমুখী 'সদানীরা' ও উত্তরাভিমুখী 'হিরণ্য-বাহে'র পূর্ববর্তী সমগ্র ভূখণ্ডকেই (অস্ট্রিক-দ্রাবিড়াদি জাতির সমন্বয়-সৃষ্ট?) আর্য-পূর্ব ভারতীয় সভ্যতার তৎকালীন আশ্রয়স্থল বলিয়া ধরা যাইতে পারে। প্রাচ্যভূমির এই সভ্যতাই খ্রীস্টপূর্ব যুগে বিশ্বের দরবারে ভারতের আসনকে সু-উচ্চে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। এই সভ্যতা একদিকে যেমন বুদ্ধের আবির্ভাব ঘটাইয়াছে, তেমনি অন্যদিকে বৌদ্ধধর্মের উজ্জ্বল আলোকে পৃথিবীকে প্রদীপ্ত করিয়াছে। কিন্তু ইহা চিরস্থায়ী হইতে পারে নাই। আর্যীকৃত হইয়া ইহা ক্রমেই তথাকথিত বুদ্ধ-পূর্ব ভারতীয় সভ্যতার অঙ্গীভূত হইয়া পড়ে। অবশ্য তাহাতে সময় লাগিয়াছিল। সার্ধসহস্র বর্ষযাবৎ প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হইয়া শেষ পর্যন্ত ইহার আর্যীকরণ অগ্রসরপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু তাই বলিয়া ইহার বিলুপ্তীকরণ সম্ভব হয় নাই। আর্যপূর্ব ভারত-সংস্কৃতি যেমন ক্রমাগত রূপান্তর লাভ করিতে থাকিলেও প্রায় দ্বিসহস্রবর্ষ পরেও আর্য-ভারতের পূর্ব-সীমায় ও প্রাচ্য-দেশের পশ্চিমপ্রান্তে এক মহাপুরুষের আবির্ভাবকে সম্ভব করিয়া তুলিয়াছিল, পূর্ব-ভারতীয় সংস্কৃতিও তেমনি প্রায় দ্বিসহস্রবর্ষযাবৎ রূপান্তরকরণের মধ্য দিয়া শেষে এই বাংলাদেশেরই পশ্চিমপ্রান্তে আর এক মহামানবের আবির্ভাবকে অবশ্যম্ভাবী করিয়া তুলে। অবশ্য দূরদর্শী আর্যগণ তাহাকে আর 'প্রাচী'-নামাঙ্কিত করিয়া পৃথক রাখা যুক্তিযুক্ত মনে করেন নাই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাহার একটি বিশিষ্ট রূপ ছিল। তাহাকে বৃহদ্বংগীয় বলা যাইতে পারে। মনে রাখিতে হইবে যে মহাভারতের যুগেও অংগ এবং বংগ উভয় দেশই একই বিষয়ান্তর্গত ছিল। এমন কি, কথাসরিৎসাগরেও অংগরাজধানী বিটংকপুরকে সমুদ্রতীরবর্তী বলা হইয়াছে। সুতরাং যে প্রাগার্য ভারতীয়-সভ্যতা বিদেহ-মগধ ও অংগ-বংগ দেশকে আশ্রয় করিয়া একবার উদ্দীপিত হইয়াছিল এবং ক্রমে ক্রমে আর্য-সম্প্রসারণের ফলে যাহা পূর্বভারতের সুবিস্তীর্ণ অঞ্চল ত্যাগ করিয়া বৃহদ্‌বংগ এবং আরও পরে কেবল বাংলাদেশের মধ্যেই তাহার সর্বশেষ আশ্রয়স্থল খুঁজিয়া পাইয়াছিল, তাহা কেবল বংগীয় বা অন্য যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, তাহার সহিত ভারতীয় অর্থাৎ আর্যপর-ভারতীয় সংস্কৃতির একটি বিরাট পার্থক্য থাকিয়া গিয়াছে। কিন্তু অসংখ্যবার ভাঙা-গড়ার মধ্যদিয়া আঞ্চলিক নামগুলির বিভিন্নতা সত্ত্বেও বাংলাদেশ যেমন একটি ভৌগোলিক সীমাবন্ধনের মধ্যে আসিয়া একটি অখণ্ডরূপ প্রাপ্ত হইতেছিল এবং অস্ট্রিক-দ্রাবিড়-আর্য ও মংগোল জাতির সমন্বয়ের মধ্যদিয়া যেমন একই দেহগত বৈশিষ্ট্য লইয়া বাঙালী জাতির উদ্ভব ঘটিয়া উঠিতেছিল, তেমনি সংগে সংগে সেই আর্য-পূর্ব ও আর্য-পরবর্তী সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্যদিয়া বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক অভ্যুদয়ও ঘটিতেছিল। খ্রীস্টীয়-সহস্রকের পরবর্তী কয়েকশত বৎসর ধরিয়া সেই দেশ, জাতি ও সংস্কৃতির পূর্ণতা-সাধনের কার্য অগ্রসর হইয়া চলিতেছিল। সংগে সংগে ভাব-প্রকাশক একটি উপযুক্ত ভাষাও সুগঠিত হইয়া উঠিতেছিল। এইভাবে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর

ম্বারদেশে আসিয়া এ-দেশের অধিবাসী তাহার প্রায় সকল বৈশিষ্ট্য লইয়া একটি সুসংহত সমাজ-বন্ধনের মধ্যে ধরা দিলে বাঙালী বলিয়া একটি বৃহত্তর জাতিসত্তার অভ্যুদয় ঘটিল এবং বাংলার সাহিত্য-লক্ষ্মীও ভাবজগৎ হইতে অবতরণ করিয়া সেই জাতীয়-জীবনের দৃঢ়ভিত্তির উপর পদস্থাপনা করিলেন।

বাংলা-সাহিত্যের সুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে কবি-সাহিত্যিকদিগের বিচরণপথ ধরিয়া দূরে অতীতের দিকে অগ্রসর হইয়া গেলে দশম-দ্বাদশ শতকের মধ্যেও তাঁহাদের পদচিহ্নের নিদর্শন মিলিতে পারে। কিন্তু সেই চিহ্ন বেলাবালুকার চরণচিহ্নসমই অস্পষ্ট ও ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন। অতীতে যে ধর্ম-সংঘাত ঘটিয়া গিয়াছে তাঁহাদের সাহিত্যমধ্যে তাহারই অস্পষ্ট তরঙ্গ-ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায় মাত্র। সে-সাহিত্য ছিল ধর্মাশ্রয়ী। কিন্তু যেখানে জাতীয় জীবনই ভালভাবে গড়িয়া উঠে নাই, সেখানে ধর্মের আশ্রয়ই বা কি? তাই দেখা যায় সেই সাহিত্য জাতিকে গড়িয়া তুলিতেই ব্যস্ত; কিন্তু নিজের দিক হইতে সে কম্পমান, আপনার ভারেই যেন আপনি টলমল করিতেছে।

পঞ্চদশ শতকে আসিয়া কিন্তু বাঙালী-জীবন অনেকটা সংহতি লাভ করিয়াছে। তাই তাহার সাহিত্য-মধ্যেও সেই অনিশ্চয়তার ভাব অনেকাংশেই প্রশমিত। দ্বন্দ্ব-সংঘাত তখনও আছে। কিন্তু তাহা জাতীয় জীবনের লৌকিক ধর্মমতসমূহের দ্বন্দ্ব। বালুকণা যতই ক্ষুদ্র হউক, এবং যেভাবেই সে তরঙ্গোৎক্ষিপ্ত হউক না কেন, তাহার দ্বারা একবার দ্বীপ-সৃষ্টি হইয়া গেলে, তারপর সে তাহার নিজের বুকেই তরঙ্গরেখার প্রত্যেকটি বৈচিত্র্য ধরিয়া রাখিতে পারে। পঞ্চদশ শতাব্দীর বাংলাসাহিত্যেও যেন সেইরূপ তৎকালীন লৌকিক ধর্মমতগুলির প্রত্যেকটি বিক্ষোভকেই স্বীয় বক্ষপটে প্রতিফলিত করিয়া এক অপরূপ রেখাচিত্রের সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু পূর্ব-কথিত বৃহত্তর সংস্কৃতি-সংঘাত তখনও সম্পূর্ণরূপে প্রশমিত হয় নাই। সমাজ-জীবনের গভীরে তাহার তরঙ্গ তখনও প্রবহমান ছিল। সেই সম্বন্ধে একটি নিশ্চয়তা না আসিলে জাতীয়-জীবন স্থিতিলাভ করিতে পারে না। কিন্তু সেই নিশ্চয়তা আসিতে আর অধিক বিলম্ব হয় নাই। জগতের দুইটি বৃহৎ সভ্যতার সংঘর্ষে জয়-পরাজয় স্থিরীকৃত হইবার জন্য সহস্র সহস্র বৎসর লাগিয়া গিয়াছে। শেষ-পর্যন্ত দেশীয় সভ্যতাই জয়লাভ করিয়াছে। কিন্তু এই দীর্ঘকালের যুদ্ধযাত্রায় তাহাকে অনেক কিছুই হারাইতে হইয়াছে। হয়ত বা কিছুটা নূতনভাবে যুদ্ধসজ্জা গ্রহণ করিতে হইয়াছে। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর বাঙালীর জাতীয়-জীবনে তাহারই চিহ্নগুলি পরি-লক্ষিত হইতে পারে। কিন্তু যুগে যুগে দেখা গিয়াছে যে জাতীয়-জীবনের প্রতিভূস্বরূপ যে সকল মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটে তাঁহাদের মধ্যে সেই সকল ছাপ সুপরিস্ফুট হইয়া উঠে। দীর্ঘকালের সংস্কৃতি-মন্থনের মধ্যদিয়া বাংলাদেশেও একটি অমৃতফল সমুদ্ভূত হইয়াছিল। বংগ-ভারত সংস্কৃতির প্রাণপুরুষ চৈতন্যমহাপ্রভুই সেই অমৃতফল বিশেষ। তাঁহার মধ্যেই সমগ্র বাঙালী জাতি আপনাকে প্রতিফলিত দেখিয়াছে, অথচ তাঁহারই মধ্যে অদৃষ্টপূর্ব রূপলাবণ্য প্রত্যক্ষ করিয়া আর্যভারত স্তব্ধ হইয়াছে। তিনি ছিলেন প্রেম-বিগ্রহস্বরূপ। তিনি যে ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন, তাহা জ্ঞান বা কর্মের ধর্ম নহে। তাহা

ভক্তির ধর্ম। তাহার বাহিরের রূপ যেমনই হউক না কেন, সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে জাতিধর্মসংস্কৃতি নির্বিশেষে তাহার অন্তঃসলিলা প্রেম-ফল্গুতে সকলেই অবগাহন করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষপাদে চৈতন্যমহাপ্রভুর আবির্ভাব ঘটে। ষোড়শ শতকের একেবারে প্রথম হইতে তাঁহার লীলা আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙালীও একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠাভূমি প্রাপ্ত হইয়া আত্মস্থ হয়। সে তখন দ্বিধামুক্ত ও নিঃশঙ্ক। তাই তাহার পদক্ষেপও সুদৃঢ়। সাহিত্যলক্ষ্মী তখন দেবলোক হইতে অবতরণ করিয়া নরলোকে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার আগমনীতে দিকে দিকে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। আমাদেরই কথা আমরা সকলকে জানাইব, আমাদেরই প্রিয়তম মানুষকে আমরা সাহিত্যের সাহায্যে অমর করিয়া রাখিতে পারিব, ইহা অপেক্ষা বড় আশা আর কিছু থাকিতে পারে না। এই আশ্বাসের মধ্যেই বাংলার সাহিত্য-সভায় সেদিন মহামহোৎসব লাগিয়া গেল। প্রত্যক্ষীভূত জীবনকে লইয়া ভক্ত-কবির দল মাতিয়া উঠিলেন। দেব-সম্পর্কিত অন্যান্য লৌকিক ধর্ম-গুলিও তখন বিদ্যমান ছিল। কিন্তু অল্প কয়েকজন ছাড়া প্রায় সকল কবিই বৈষ্ণবধর্মের বেদীমূলে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের প্রিয়তম মানুষটির অপরূপ রূপ-মাধুরী সন্দর্শন করিতে লাগিলেন।

চৈতন্য ছিলেন কৃষ্ণপ্রেমময়তনু। গয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে তাঁহার কৃষ্ণদর্শন ঘটে। তদবধি তিনি কৃষ্ণচরণার্পিতপ্রাণ হইয়া জীবন যাপন করিতে থাকেন এবং তাঁহার সকল ভক্তকেই কৃষ্ণভজনার নির্দেশ দান করিয়া তাঁহাদের আদর্শকেও তদভিমুখী করিয়া তুলেন। কিন্তু তিনি যাহা অনুভব করিয়াছিলেন, ভক্তবৃন্দের পক্ষে তাহা উপলব্ধি করা সম্ভব ছিল না। মুখে তাঁহারা যাহাই বলুন, কিংবা তাঁহাদের কোনও আচরণে যাহাই প্রকাশ পাউক না কেন, তাঁহাদের পক্ষে সেই আদর্শকে জীবনের সহিত একীভূত করিয়া লওয়া অসম্ভব ছিল। তাঁহারা নাম জপ করিয়াছেন, বিগ্রহ-সেবা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা বিগ্রহের মধ্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই। একবার এক বংগদেশীয় বিপ্র চৈতন্য-জীবনী নাটকাকারে গ্রথিত করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর নিকট তাহা পাঠ করিয়া শুনাইবার পূর্বে স্বরূপদামোদরের অনুমোদন গ্রহণকালে নান্দীশ্লোক লইয়া স্বরূপের সহিত কবির যে কথাবার্তা হইয়াছিল, 'চৈতন্যচরিতামৃত'-কার তাহার বিবরণ লিপিবন্ধ করিয়াছেনঃ

> কবি কহে জগন্নাথ সুন্দর শরীর।
> চৈতন্য গোসাঞি তাহে শরীরী মহাধীর॥
> সহজ জড় জগতের চেতন করাইতে।
> নীলাচলে মহাপ্রভু হৈলা আবির্ভূতে॥

ব্যাখ্যা শুনিয়া স্বরূপ-গোস্বামী সক্রোধে বলিয়াছিলেনঃ

> পূর্ণানন্দ চিৎস্বরূপ জগন্নাথ রায়।
> তাঁরে কৈলি জড় নশ্বর প্রাকৃত কায়॥
> পূর্ণানন্দ ষড়ৈশ্বর্য চৈতন্য স্বয়ং ভগবান।

তাঁরে কৈলি ক্ষুদ্র জীব স্ফুলিঙ্গ সমান॥
দুই ঠাঁই অপরাধে পাইবি দুর্গতি।
অতত্ত্বজ্ঞ তত্ত্ব বর্ণে তার এই রীতি॥

কিন্তু চৈতন্য বা জগন্নাথবিগ্রহ-সম্পর্কে স্বরূপদামোদরের যে ব্যাখ্যাই করুন না কেন, উহা 'তত্ত্ব'কথা মাত্র। চৈতন্যের নিকট যাহা প্রত্যক্ষ ছিল, অন্য সকলের নিকট তাহা ছিল তত্ত্বমাত্র। প্রকৃতপক্ষে, উক্ত অজ্ঞাতনামা বিপ্রটি যে অভিপ্রায় লইয়া শ্লোকগুলি রচনা করিয়াছিলেন, তাহাই ছিল তৎকালীন ভক্ত দেশবাসী-বৃন্দের 'মনের মরম কথা'। স্বরূপদামোদরাদি বৈষ্ণববৃন্দ যে যথার্থ ভক্ত ছিলেন, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু তত্ত্বের চাপে তাঁহাদের অনেকটা অংশই হয়ত পিষ্ট হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের ভক্তিভারের সকল উৎসই ছিলেন ঐ শরীরী মানুষটি। জগন্নাথবিগ্রহ তাঁহাদের কাছেও চিরকালই জড় থাকিয়া গিয়াছে; ঐ শ্রদ্ধাবান 'অতত্ত্বজ্ঞ' 'মূর্খ' বংগদেশীয় বিপ্রটি কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর ভক্ত দেশবাসীর প্রতিভূরূপে স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় তাঁহার 'বাংলার বৈষ্ণবধর্ম'-নামক গ্রন্থমধ্যে গৌরাংগ সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, "তাঁহার অলোকসামান্য সমুন্নত আকৃতি ও অসাধারণ সৌন্দর্য......তাঁহার প্রকৃতির দুর্দমনীয়তা......তাঁহার যে মধুর মূর্তি ও অনিয়ত মধুর ব্যবহার, তাহা নদীয়ার সকল শ্রেণীর নরনারীর হৃদয়ের মধ্যে তাঁহাকে যে বিশিষ্ট স্থান দিয়াছিল তাহা অতুলনীয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না।" তর্কভূষণ মহাশয় আরও জানাইয়াছেন, "তিনি শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণাবতার বা অংশাবতার অথবা অবতারই নহেন, এই বিষয় লইয়া বাদানুবাদের কোন আবশ্যকতা এস্থলে আছে বলিয়া, আমার মনে হয় না। কিন্তু তাঁহার সেই রাধাভাবদ্যুতিশবলিত সুবিশাল সমুন্নত ও সুগঠিত কনককান্তি গৌরদেহে যে অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, তাহা দীনদুর্গত, অজ্ঞ অসহায় লক্ষ লক্ষ নরনারীর ব্যথিত হৃদয়ের সাংসারিক সকল জ্বালা মিটাইয়া দিবার জন্যই যে অলোকসামান্যভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবার হেতু নাই।" প্রকৃতপক্ষে 'দীনদুর্গত অজ্ঞ অসহায় লক্ষ লক্ষ নরনারী'র প্রেমব্যাকুলতাই প্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে 'সেই রাধাভাবদ্যুতিশবলিত সুবিশাল সমুন্নত ও সুগঠিত কনককান্তি গৌরদেহ'খানিই নীলাচল-তীর্থমধ্যে 'সহজ জড় জগতের চেতন করাই'য়া দিতে সমর্থ হইয়াছিল।*

স্বরূপদামোদর শেষপর্যন্ত উক্ত বংগদেশীয় বিপ্রটির শ্রদ্ধা-ভক্তির ভাব লক্ষ্য করিয়া মহাপ্রভুর সহিত তাঁহার মিলন ঘটাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু প্রিয়তম মানুষেরই পদতলে অন্তরের শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধা ভক্তি ও প্রেমকে উজাড় করিয়া ঢালিয়া দেওয়ার ব্যাপারে তত্ত্বজ্ঞ মহাপণ্ডিতদিগকেও অতত্ত্বজ্ঞ মূর্খের সহযাত্রী হইতে হইয়াছিল। কবিরাজ-গোস্বামী জানাইয়াছেন যে একবার সার্বভৌম-ভট্টাচার্যও গৃহ হইতে বাহির হইয়াই 'জগন্নাথ না দেখি আইলা প্রভুস্থানে।' 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে'র অনুবাদক লিখিয়াছেন যে সেইদিন সার্বভৌম

*এই অংশটি স্বরূপদামোদরের জীবনী হইতে গৃহীত।

'জগন্নাথ না দেখিয়া সিংহদ্বার ছাড়ি। প্রভুর বাসার কাছে যান তাড়াতাড়ি॥' মন্দির সন্নিধানে আসিয়া তাঁহার ভৃত্য তাঁহার ভুল হইয়াছে মনে করিয়া তাঁহাকে মন্দির-পথ দেখাইয়া দিলেও তিনি সেইদিকে দ্রূক্ষেপমাত্র করেন নাই। কবিরাজ-গোস্বামী আরও জানাইয়াছেন যে দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণশেষে মহাপ্রভু নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করিলে স্বয়ং রামানন্দ-রায়ও যখন নীলাচলে আসিয়া জগন্নাথ দর্শন না করিয়াই চৈতন্য সমীপে উপস্থিত হন, তখন

প্রভু কহে রায় তুমি কি কর্ম করিলা।
ঈশ্বর না দেখি আগে এথা কেন আইলা॥
রায় কহে চরণ রথ হৃদয় সারথি।
যাঁহা লঞা যায় তাঁহা যায় জীব রথী॥
আমি কি করিব মন ইহা লঞা আইল।
জগন্নাথ দরশনে বিচার না কৈল॥

আবার 'চৈতন্যচরিতামৃত'-গ্রন্থ হইতেই জানা যায় যে গৌড়পথে বৃন্দাবন-গমনোদ্দেশ্যে মহাপ্রভুর যাত্রারম্ভকালে তাঁহার প্রায় সকল প্রিয়ভক্তই তাঁহার সহিত গমন করিবার অনুমতি লাভ করিলেও গদাধর-পণ্ডিতকে যখন তিনি 'ক্ষেত্রসন্ন্যাস না ছাড়ি'বার জন্য পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াছিলেন তখন পণ্ডিত-গোসাঁই বিনা দ্বিধায় জানাইয়া দিয়াছিলেন, "ক্ষেত্র-সন্ন্যাস মোর যাউক রসাতল।" অর্থাৎ জগন্নাথসেবা কিংবা ক্ষেত্রসন্ন্যাস রসাতলে যাউক, গদাধরের তাহাতে বিন্দুমাত্র আপত্তি থাকিবার কথা ছিল না। তিনি রক্তমাংসের মানুষটির প্রেমে মজিয়া তাঁহারই পশ্চাতে চলিতে লাগিলেন। বস্তুত এই ব্যাপারে

আকবর বাদশার সঙ্গে
হরিপদ কেরানীর কোনো ভেদ নাই।
বাঁশির করুণ ডাক বেয়ে
ছেঁড়া ছাতা রাজছত্র মিলে চলে গেছে
এক বৈকুণ্ঠের দিকে।

বাসুদেব-দত্ত ও শিবানন্দ-সেন একবার বাংলাদেশ হইতে মহাপ্রভুর জনাই দুই কলস গঙ্গাজল মাথায় করিয়া লইয়া গেলে মহাপ্রভু এক কলস জল জগন্নাথের জন্য ব্যবহার করিতে নির্দেশ দান করিলেও পাছে ভক্তদ্বয়ের একজন ব্যথাপ্রাপ্ত হন, তজ্জন্য তাঁহাকে উভয় পাত্র হইতেই অর্ধেক পরিমাণ করিয়া জল গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। আবার মহাপ্রভু যখন তাঁহারই উদ্দেশ্যে জগদানন্দকর্তৃক সুদূর গৌড় হইতে আনীত এক ভাণ্ড সুগন্ধি তৈল জগন্নাথের প্রদীপে ঢালিয়া দেওয়ার নির্দেশ-দান করিয়াছিলেন, তখন জগদানন্দ অভিমানভরে মহাপ্রভুর সম্মুখেই সেই তৈলভাণ্ড ভাঙিয়া ফেলিয়া রুদ্ধদ্বার গৃহমধ্যে প্রায়োপবেশন আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন।

মহাপ্রভুর তিরোভাবের পর স্বয়ং স্বরূপদামোদরের পক্ষে আর জগন্নাথবিগ্রহ লইয়া

জীবনধারণ করা সম্ভব হয় নাই। সার্বভৌম রামানন্দ প্রভৃতি নীলাচলের যে সমস্ত ভক্ত আরও কিছুকাল যাবৎ জীবনধারণ করিয়াছিলেন, আর কোন কিছুই তাঁহাদের মধ্যে নবশক্তি সঞ্চার করিতে পারে নাই। কিন্তু মানুষই মানুষের অন্তরের মধ্যে যে বিপুল প্রাণ-শক্তিকে উদ্দীপিত করিয়া তুলিতে পারে, তাহা হইতেই তাহার অন্তঃকরণে শিল্পী, কবি ও সাহিত্যিকের জন্মলাভ ঘটে। প্রাচীন ভারতের কামনাসৃষ্ট বুদ্ধদেব যেমন একদা স্বীয় ভাস্বর জ্যোতিতে সমগ্র ভারতভূমিকে প্রবুদ্ধ করিয়াছিলেন, সংস্কৃতি-সংঘাতে পর্যুদস্ত মধ্যযুগীয় বাঙালীর হৃদয়লোক হইতে আবির্ভূত হইয়া চৈতন্যমহাপ্রভুও তদ্রূপ দেশ-বাসীর অন্তরে চেতনা সঞ্চার করিয়া তাঁহাদের মধ্যে শিল্পী ও কবিকুলের পুনর্জন্ম দান করিলেন। তাঁহার জীবিতাবস্থাতেই তাঁহাকে লইয়া সংগীত ও কাব্যাদি রচনা আরম্ভ হইয়া গেল। অদ্বৈতপ্রভু একদিন নীলাচলে ভক্তবৃন্দকে একত্রিত করিয়া নির্দেশ দান করিলেনঃ

আজি আর কোন অবতার গাওয়া নাঞি।
সর্ব অবতারময়—চৈতন্যগোসাঞি॥

মহাপ্রভুর অসন্তোষ সত্ত্বেও ভক্তবৃন্দ প্রাণ ভরিয়া চৈতন্য-কীর্তন আরম্ভ করিলেন। মানুষী-প্রেমের সুড়ঙ্গ-পথে তাঁহাদের হৃদয়গুহাগহ্বরে তখন তরঙ্গোচ্ছ্বাস আসিয়া পৌঁছাইয়াছে। তাহারই প্রচণ্ড অভিঘাতে ধর্মানুশাসন অধ্যাত্মবিশ্লেষণ ও পূর্বাচরিত বিধিবন্ধনের অনড় প্রস্তরস্তূপও চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া ভাসিয়া গেলে, শিল্পী ও কবির বন্ধনমুক্তি ঘটিল এবং মুক্তির প্রথম আনন্দে অধীর হইয়া তাঁহারা যে কাব্যকল্লোলের সৃষ্টি করিলেন তাহাই যেন নানাভাবে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়া বংগ-ভারতীর সুপ্রতিষ্ঠাকে ঘোষণা করিয়া দিলে আধুনিক সাহিত্যের গোড়াপত্তন হইয়া গেল।

চৈতন্যের জীবন-বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া কাব্য-কবিতা রচনার জন্য কবিকুল অগ্রসর হইয়া আসিলেন। তাঁহার জীবৎকালে ও তাঁহার তিরোভাবের পর সেই প্রচেষ্টা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ক্রমে অদ্বৈত ও বংশীবদন প্রভৃতি ভক্তের জীবন লইয়াও চরিতগ্রন্থ রচিত হইতে থাকে। শ্রীনিবাস, নরোত্তম, শ্যামানন্দ এবং রসিকানন্দ প্রভৃতির জীবন-বৃত্তান্তও কাব্যাকারে গ্রথিত হয়। কিন্তু কোনও বিশেষ ভক্তের নামে জীবনচরিত লিখিত হইলেও এই সমস্ত গ্রন্থের নানাস্থানেই প্রসঙ্গক্রমে অন্যান্য ভক্তবৃন্দের জীবনকথা বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থোল্লেখিত ব্যক্তিবর্গের অধিকাংশই যে বৈষ্ণবভক্ত তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু মানুষের জীবনকে লইয়া যে সাহিত্যের সূত্রপাত হইল, তাহার মধ্যে নানাভাবেই সমাজের প্রতিফলন ঘটিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে দেবসমাজের অন্তরাল হইতে মনুষ্যসমাজকে উঁকি দিতে দেখা যায়। কিন্তু গোষ্ঠীকে অবলম্বন করিলেও, ষোড়শ শতকের সাহিত্যে বৃহত্তর সমাজের প্রতিচ্ছবি স্পষ্টতররূপেই ধরা পড়িয়াছে। স্নেহ-ভালবাসা, বাদ-বিসম্বাদ, সমাজ-ব্যবস্থার বহুবিধ ত্রুটি-বিচ্যুতি ও জীবনযাত্রা পদ্ধতির অসংখ্য খুঁটিনাটি বিষয় ছাড়াও নানাস্থানেই সে-যুগের ঐতিহাসিক এবং ভৌগোলিক বিবরণগুলিও লিপিবদ্ধ হইয়াছে। হোসেন-শাহ্, প্রতাপরুদ্র বা বীর-হাম্বীর প্রভৃতি সম্বন্ধে এমন বহুবিধ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, যাহা ইতিহাস-লেখকের নিকট অপরিহার্য। আবার গৌড়-নীলাচলের মধ্য-

বর্তী তৎকালীন-যাত্রাপথের বিবরণ কিংবা প্রতাপরুদ্রের রাজ্যের উত্তরসীমা নির্ধারণাদি ব্যাপারেও বৈষ্ণবজীবনী গ্রন্থগুলি অত্যাবশ্যকরূপে পরিগণিত হইতে পারে।

এই সকলের সহিত অবশ্যই ধর্মবিপ্লবের কাহিনী আছে এবং অধ্যাত্ম-ভাবনার ছাপও পরিস্ফুট হইয়াছে। কিন্তু লেখকের আত্মপ্রকাশের পথে এইগুলি অনতিক্রমণীয় বাধা হয় নাই। বরং জীবনের পরিচয় দিতে গিয়া এইগুলি তাহার আনুষঙ্গিক ও আবশ্যক উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। ফলে গ্রন্থগুলির মধ্যে জীবনের একটি বিস্তৃততর রূপ ও সমাজ-বিবর্তনের একটি পূর্ণাঙ্গ ছবিও ধরা পড়িয়াছে এবং যেন সমগ্র জাতিরই আত্ম-সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছে। জীবনের কথা ইতিপূর্বে আর এমন করিয়া বলা হয় নাই। মানুষের অন্তর্নিঃসৃত ভাবোচ্ছ্বাসগুলিও ইতিপূর্বে আর এমনভাবে উৎসারিত হয় নাই। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাস্তবিকই ইহা এক অভিনব ব্যাপার। এই সময়কার জীবন-বর্ণনাগুলির মধ্যে যে সম্পদ ও সমৃদ্ধি উচ্ছ্রিত হইয়া উঠিয়াছে তাহা যেন এক অপরূপ সৌন্দর্যে মণ্ডিত হইয়া তাহার পশ্চাতের সাহিত্যকে অস্পষ্ট করিয়া দিয়াছে।

অথচ, আলোচ্যমান জীবনী-সাহিত্যগুলির মধ্যে প্রবেশ করিলেও পিরামিডের আভ্যন্তর প্রদেশের সেইরূপ জটিলতাই পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু তাহারা যে বাস্তবজীবনকে প্রতিফলিত করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং যদি বাস্তব জীবনকে ভিত্তি করিয়াই সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে, তাহা হইলে সাহিত্যকে উপলব্ধি করিতে গেলে জীবনকেও বুঝিয়া লইবার একান্ত প্রয়োজন থাকে। সেই বিচারে শত জটিলতা সত্ত্বেও পূর্বোক্ত গ্রন্থগুলি তৎকালীন বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রবেশকরূপে কাজ করিতে পারে এবং শিক্ষা ও সাহিত্যা-মোদীর নিকট তাহাদের অনুধাবন কেবল আবশ্যক নহে, প্রায় অপরিহার্য হইয়া উঠে।

অপরপক্ষে, ষোড়শ শতাব্দী বাঙালী সাহিত্যিকের ঐতিহাসিক-বোধোদয়ের যুগ। তাহার সম্মুখ হইতে তখন অন্ধকারের আবরণ দূরে সরিয়া যাইতেছে এবং জীবনের বহু-বিচিত্র রূপটি তাহার কাছে আভাসে ইঙ্গিতে ধরা দিতেছে। কিন্তু তখনও পর্যন্ত সমীক্ষণ-সবিতার পূর্ণোদয় ঘটে নাই। সমস্তই যেন তাই অস্পষ্ট ও কুহেলিকাময়। সূর্যোদয়ের পূর্বমুহূর্তের গগনব্যাপী রক্তিমাভা দেখিয়া তাহারই আলোকে জীবনকে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য কবিদিগের 'আকুল পরাণ' উল্লাসে মাতিয়া উঠিলেও তাঁহাদিগের 'শত বরণের ভাবোচ্ছ্বাস'গুলি তখনও পর্যন্ত 'কলাপের মতো' বিকাশলাভ করিতে পারে নাই। লেখকগণ যাহাই দেখিয়াছেন, তাহাই তাঁহাদিগের নিকট সত্য মনে হইয়াছে। জীবনের মধ্যেও যে অসংখ্য মিথ্যার বেসাতি রহিয়াছে, অনেকেই তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। অথচ সমস্ত কিছুকেই বাস্তবতামণ্ডিত করিয়া প্রকাশিত করিবার একটি বিপুল আগ্রহও জাগিয়া উঠিয়াছে। তাহারই ফলে একদিকে যেমন অসংখ্য মিথ্যাকেও সত্য প্রমাণ করিতে চাহিয়া মন্দ কবিযশপ্রার্থী ব্যক্তিগণ উপহাসের পাত্র হইয়াছেন, অন্যদিকে তেমনি নিজ মতবাদ চালাইয়া দেওয়ার জন্য বা স্বীয় গোষ্ঠীবিশেষের মাহাত্ম্য, শক্তি ও প্রভাবকে বিঘোষিত করিবার জন্য সাহিত্যজগতের মধ্যে অনেক অ-কবি বা অ-সাহিত্যিকেরও প্রবেশ-লাভ ঘটিয়াছে। সুতরাং সেই সাহিত্য হইতে প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটিত করিতে পারিলে জীবনের

একটি অপরূপ সৌন্দর্য ধরা পড়ে বটে, কিন্তু সত্য মিথ্যা সব লইয়া সমগ্র জীবনী সাহিত্যটি যেন একটি অদ্ভুত ও বিচিত্ররূপ ধারণ করিয়াছে।

গ্রন্থকার-গণ যেরূপ অনবধানতার সহিত ভক্তবৃন্দের জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; তাহাতে জীবনের সামগ্রিক রূপটি সহজে ধরা পড়ে না। সেইজন্য সর্বপ্রথম প্রত্যেকটি ব্যক্তির জীবন সম্বন্ধে ঐতিহাসিক সত্যগুলিকে যথাসম্ভব অবিকৃত আকারে উন্মোচিত করিবার প্রয়োজন আছে। কিন্তু পূর্বোক্ত কারণে তাহা প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠে। প্রথমত, ষোড়শ শতকের বাংলা বৈষ্ণবসাহিত্যে অসংখ্য ভক্তের নাম উল্লেখিত হইয়াছে। কিন্তু তন্মধ্যে মাত্র দুই-চারিজন ছাড়া আর কাহারও জীবনের পূর্ণ পরিচয় প্রদান করা হয় নাই। আবার ঐ অত্যল্প কয়েকজনের জীবনের ঘটনাবলী ও তাহাদের সময়ক্রম সম্বন্ধে সকলে একমত নহেন। চৈতন্য-জীবন লইয়াই এইরূপ সাহিত্যের সূত্রপাত এবং চৈতন্য-পার্ষদ্‌গণেরও কেহ কেহ সংস্কৃত ভাষায় চরিতগ্রন্থ বা কড়চা ও নাটকাদি রচনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদিগের গ্রন্থ-ধৃত বিবরণগুলিও বহুস্থলেই পরস্পরবিরোধী। মহাপ্রভুর পার্ষদ্‌বৃন্দের মধ্যে মুরারি-গুপ্ত, স্বরূপদামোদর ও কবিকর্ণপুর সংস্কৃত ভাষায় এবং বাসুদেব-ঘোষ বাংলা ভাষায় চৈতন্যলীলা (বা তত্ত্ব) বর্ণনা করিয়াছেন। নরহরি, বংশীবদন, শিবানন্দ, প্রভৃতিও তদ্‌বিষয়ক পদাবলী রচনা করিয়াছেন। আবার বৃন্দাবনদাস, জয়ানন্দ, লোচনদাস, কৃষ্ণদাস-কবিরাজ প্রভৃতি চরিত-লেখকের সকলেই সম্ভবত তাঁহার জীবৎকালে জন্মলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু বহু বিখ্যাত ঘটনাবিষয়েও তাঁহাদের গ্রন্থমধ্যে বর্ণনা-বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। গৌরাঙ্গের বাল্যলীলা বর্ণনায় 'মুরারিগুপ্তের কড়চা' ও বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্য-ভাগবত', তাঁহার নীলাচল-বর্ণনায় কবিকর্ণপুরের 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক' ও কৃষ্ণদাস-কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' এবং বৃন্দাবন-প্রসঙ্গ ও চৈতন্য-পরবর্তিকালের গৌড়াদি সংবাদ সম্বন্ধে 'ভক্তিরত্নাকর'-গ্রন্থের বিবরণগুলি বিশেষভাবেই গ্রহণযোগ্য হইলেও গ্রন্থকার-গণ সর্বত্র প্রকৃত তথ্য প্রদান করিতে পারেন নাই, কিংবা পারিলেও প্রদত্ত তথ্যগুলি লিপিকরদিগের লেখনীমুখে পড়িয়া অবিকৃত থাকে নাই; তথ্যাশ্রিত বহুবিধ বিবরণের বিলুপ্তি, বিকৃতি বা বিস্তৃতি ঘটিয়াছে। অথচ চৈতন্য-সমসাময়িক ও চৈতন্য-পরবর্তী-কালের ঘটনাদি সম্বন্ধে পরবর্তী-কালের 'প্রেমবিলাস', 'কর্ণানন্দ', 'অনুরাগবল্লী' ও 'ভক্তিরত্নাকর' প্রভৃতি গ্রন্থগুলিতে এমন সংবাদ আছে যাহা পূর্ববর্তী গ্রন্থকার-গণ লিপিবদ্ধ করেন নাই। সেই বিবরণগুলির বহু বিষয়ই যেমন অবিশ্বাস্য, অন্য বহু বিষয়ও সেইরূপ গুরুত্বপূর্ণ ও অনুপেক্ষণীয়—তাহাদের ঐতিহাসিকত্ব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা থাকিলেও বিরুদ্ধ প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত সেইগুলিকে একেবারে উড়াইয়া দেওয়াও চলে না। আবার স্বয়ং মুরারি-গুপ্ত, কবিকর্ণপুর (চৈতন্যচরিতামৃতমহাকাব্যে), বৃন্দাবনদাস, জয়ানন্দ, লোচনদাস প্রভৃতি প্রাচীন ও বিখ্যাত লেখকবৃন্দও এমন কিছু কিছু তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন যাহা অদ্ভুত ও সত্যসম্বন্ধহীন।

পরবর্তিকালেও বহু অখ্যাত লেখকের আবির্ভাব ঘটিয়াছে, যাঁহারা কৃষ্ণদাস বৃন্দাবনদাসাদি বিখ্যাত কবিদিগের নামে স্বীয় গ্রন্থগুলিকে বিখ্যাত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

ইহা ছাড়া আরও নানাভাবে জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে। গ্রন্থমধ্যে কোথাও কোথাও স্বপ্নদর্শন ও প্রলাপ বা ভাবাবেশের কথাগুলিকেও সত্যের মর্যাদা দান করা হইয়াছে, কোথাও বা দেখা যায় যে চৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত প্রভৃতি তিরোধানের পরেও সশরীরে আবির্ভূত হইয়া ভক্তবৃন্দকে প্রভাবিত করিয়াছেন। কোথাও বা আবার জড়-বিগ্রহই ভক্তবৃন্দের সহিত কথাবার্তা চালাইতেছে এবং কোথাও কোথাও গ্রন্থকার-গণ কোন বিশেষ তত্ত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও তথ্যাশ্রয়ী করিতে চাহিয়া ঘটনা সৃষ্টি করিয়া লইয়াছেন। আবার নাম-বিভ্রাট ও পদবী-বিভ্রাট রহিয়াছে। গ্রন্থগুলির মধ্যে অন্ততপক্ষে পঁচিশ জন করিয়া কৃষ্ণদাস ও গোপাল, কুড়িজন করিয়া রামদাস ও গোবিন্দ, পনরজন করিয়া জগন্নাথ, হরিদাস ও পুরুষোত্তম এবং বলরাম, মুরারি, শংকর ও শ্যামাদাস--ইহাদের প্রত্যেকটি নামের অন্তত ৭।৮ জন করিয়া ভক্তের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। তাঁহাদের কে যে কোন ব্যক্তি তাহা সঠিক বলা দুঃসাধ্য। তাহার উপর প্রায় প্রত্যেকটি গ্রন্থের বৃহৎ বৃহৎ ভক্ত-তালিকাগুলির মধ্যে একই নামের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ ও তাহাদের অগ্রপশ্চাৎ দাস, আচার্য, পণ্ডিত, ঠাকুর ও গোস্বামী প্রভৃতি উপাধির যথেষ্ট প্রয়োগ গ্রন্থ-পত্রগুলিকে একেবারে যেন কণ্টকিত করিয়াছে। তারপর আবার এবম্বিধ গ্রন্থসমূহের দুষ্প্রাপ্যতা ও প্রাপ্ত পুথিগুলির পাঠভেদ রহিয়াছে।

এই সমস্ত কারণে আলোচনাকালে একদিকে যেমন সমস্যার উদ্ভব করিয়া পরে তাহার সমাধানে পৌঁছাইতে হয়, অন্যদিকে তেমনি বহুবিধ কল্পিত কাহিনীর মিথ্যা-ত্ব-টুকুও ধরাইয়া দিবার জন্য সেই সমস্ত কাহিনীর সারোদ্ধার করিয়া দিতে হয়। আবার যে-সমস্ত স্থলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ অসম্ভব হয় সেই সমস্ত স্থলে বিভিন্নপক্ষীয় গ্রন্থকারের এবং কোথাও বা আবার প্রাচীনাধুনিক নির্বিশেষে লেখক ও গবেষকবৃন্দের নামোল্লেখসহ তাঁহাদের মতকে কেবলমাত্র উপস্থাপিত করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতে হয়। তবে সতর্ক বিচারে অনেক স্থলে সমস্যা সমাহিত হইতে পারে। স্বপ্নবৃত্তান্তের মধ্যেও ঘটনাগত সত্য নিহিত থাকিতে পারে, কিংবা ভক্তবৃন্দের নামের যথেচ্ছ প্রয়োগযুক্ত তালিকাগুলির মধ্যেও সার্থকতা খুঁজিয়া পাওয়া যাইতে পারে, কিংবা গ্রন্থকার-কল্পিত প্রাচীন-ব্রাহ্মণোক্ত পূর্ববৃত্তান্ত-বর্ণনাগুলিও ঘটনার উপর আলোক সম্পাত করিতে পারে। আবার মনে রাখিতে হয় যে বর্ণনা যতই উদ্দেশ্যমূলক বা প্রক্ষিপ্ত হউক না কেন তাহা একেবারে অসার্থক নহে। কোনও প্রাচীন লেখকের বর্ণনা ভ্রান্ত হইতে পারে, কিন্তু ঘটনা সম্বন্ধীয় তাঁহার নিজস্ব জ্ঞান বা ধারণার একটি ঐতিহাসিক মূল্য থাকিয়া যায়। অন্যদিকে, কোনও সুপ্রাচীন লেখকের সকল বর্ণনাই যেমন বিশ্বাস্য হইতে পারে না, তেমনি অপেক্ষাকৃত পরবর্তিকালের গ্রন্থোক্ত সকল বর্ণনাকেই অবিশ্বাস্য বলিয়া পরিত্যাগ করাও অশ্রদ্ধেয় হইতে পারে। সুতরাং প্রত্যেকটি গ্রন্থের বর্ণনাকেই মর্যাদার সহিত লক্ষ্য করিতে হয়। বরং, কোন বিবরণের অনুল্লেখই পাঠকবর্গের নিকট উদ্দেশ্যমূলক বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে। বাস্তব জীবনের পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে কোনও সুপ্রাচীন ও সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকারের ঘটনা-সম্বন্ধীয় মন্তব্য কিংবা ব্যাখ্যাগুলিকে গ্রহণ করা বা কোনও তত্ত্বালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া প্রায়শই বিপজ্জনক ও বিভ্রান্তিসৃষ্টিকর, এবং তজ্জন্যই তাহা সর্বতোভাবে বর্জনীয়; কিন্তু ঘটনাকে সত্য বা মিথ্যা বলিতে গেলে ঘটনা

মাত্রকেই উল্লেখের বিষয়ীভূত করিতে হয়। তাহাতে অন্তত সুবিধামত ঘটনাকে বাদ দিয়া উদ্দেশ্যমূলকভাবে অভিপ্রায়সাধনের সুযোগ থাকে না এবং আলোচনার ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরিবার জন্য পাঠকবর্গকেও ঘটনা-অনুসন্ধানের অনভিপ্রেত-ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় না। অধিকন্তু, গ্রন্থনামসহ সকল ঘটনার উল্লেখ থাকিলে ইচ্ছুক ব্যক্তি পরে গবেষণা করিয়া স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন।

তবে বর্ণিত সকল ঘটনাকেই সত্য মনে করিবার কোনও কারণ থাকিতে পারে না। কারণ, ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, প্রত্যক্ষদ্রষ্টাও ভুল দেখিতে পারেন কিংবা ভুল বলিতে পারেন। মুরারি-কর্ণপুর-বৃন্দাবনদাস প্রভৃতির বর্ণনা হইতেও তাহার যথেষ্ট প্রমাণ মিলিতে পারে। সুতরাং এতৎসম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যাপারে কোনও সুনির্দিষ্ট মাপকাঠি থাকিতে পারে না। তবে যে-একটি জিনিসকে এ বিষয়ে বিশেষভাবে গণ্য করা যাইতে পারে, তাহা হইতেছে লেখকের ঐতিহাসিক বোধ। অপেক্ষাকৃত পরবর্তিকালের কৃষ্ণদাস-কবিরাজ, কিংবা বহু পরবর্তিকালের নরহরি-চক্রবর্তী মহাপণ্ডিত ছিলেন সত্য, কিন্তু ভবিষ্যৎ পাঠক-সমাজে তাঁহাদিগের গ্রন্থের সসম্মান স্বীকৃতি প্রধানত পূর্বোক্ত কারণেই; হইতে পারে যে এক ব্যক্তির পক্ষে সর্বত্রই সমভাবে সেই ঐতিহাসিক বোধকে জাগ্রত রাখা সম্ভবপর হয় নাই।

বর্তমান গ্রন্থ প্রণয়নকালেও যথাসম্ভব এই সকল কথা স্মরণে রাখিয়া অগ্রসর হইতে হইয়াছে। অথচ পদে পদে বহুবিধ অবিশ্বাস্য ঘটনা ভিড় জমাইয়াছে। চৈতন্য, রামাই, রসিকানন্দ, ও পরমেশ্বরদাসের প্রভাবে যথাক্রমে কুকুর, ব্যাঘ্র, হস্তী ও শৃগালের হরিনাম উচ্চারণ, নিত্যানন্দ প্রভাবে জাম্বীর বৃক্ষে কদম্বপুষ্পের প্রস্ফুটন ও রামচন্দ্রের প্রভাবে পৌষমাসে আম্রব্যঞ্জন রন্ধন, গোপীনাথবিগ্রহ কর্তৃক গোবিন্দ-ঘোষের অশৌচ পালন, অভিরাম কর্তৃক প্রণামের দ্বারা অসংখ্য বিগ্রহ-বিদারণ ও বহু জাতকের বিনাশ-সাধন, উচ্ছিষ্ট তাম্বূল ভক্ষণে গর্ভসঞ্চারের ফলে রঘুনন্দন, বৃন্দাবন ও গিত-গোবিন্দের জন্মলাভ, বিপাকে পড়িয়া সীতা, জাহ্নবা ও মালিনীর চতুর্ভুজা মূর্তি পরিগ্রহ, গৌরাঙ্গের সাদৃশ্যে নিত্যানন্দ, বীরচন্দ্র, পুরুষোত্তম-ঠাকুর প্রভৃতির অভিষেক ও বিভিন্ন লীলা প্রদর্শন, মহাপ্রভু এবং নিত্যানন্দ ও জাহ্নবাদেবীর মন্দিরস্থ বিগ্রহের সহিত লীন হইয়া যাওয়া, বীরচন্দ্র ও শ্রীনিবাসাদিকে অবলম্বন করিয়া চৈতন্যের পুনরাবির্ভাব ও জ্যেষ্ঠপুত্রবধূর গর্ভে বংশীবদনের পুনর্জন্মপ্রাপ্তি এবং তিরোধানের পরেও খেতুরি উৎসবাদি স্থানে চৈতন্যাদির পুনরাবির্ভাব প্রভৃতি অসংখ্য অবিশ্বাস্য ঘটনা রহিয়াছে। এই বিষয়ে 'অভিরামলীলামৃত'-নামক গ্রন্থখানিকে একটি আজগুবি ঘটনার সংগ্রহশালা বলা যাইতে পারে। এমনকি 'চৈতন্য-ভাগবতে'র মধ্যেও এইরূপ বহু ঘটনা আছে। এই সকল ঘটনা যেন সমগ্র পথকে দুর্গম করিয়া রাখিয়াছে। আবার অবৈধ ঘটনাগুলির পশ্চাতে বহুস্থলেই স্বপ্নাদেশ কিংবা চৈতন্যাবেশাদির কৈফিয়ত্ জুড়িয়া দেওয়ায় সেই পথ একেবারে কণ্টকাকীর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। এমনকি, লেখকগণের অপটু ও অসতর্ক বর্ণনার ফলে গৌরাঙ্গ সম্বন্ধেও বহুবিধ সন্দেহ ও জিজ্ঞাসা আসিয়া পথরোধ করিয়া দাঁড়ায়। সন্ন্যাসগ্রহণের অনিচ্ছা জানাইয়া শচীদেবীকে বাক্‌দান, মুহূর্তের দর্শনেই নিত্যানন্দপ্রভুকে স্ব-হৃদয়ের সর্বোচ্চস্থানে অধিষ্ঠিত করা,

অদ্বৈত-চাতুরী না বুঝিতে পারিয়া শান্তিপুরে গমনপূর্বক তাঁহাকে প্রহার এবং সেই স্থলে শংকর প্রভৃতি অদ্বৈত-শিষ্যের জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করা সত্ত্বেও নীরব থাকা, শান্তিপুর-গমন পথে হঠাৎ ললিতপুরে উপস্থিত হইয়া মদ্যপের গৃহে গমন এবং বিষ্ণুপ্রিয়া ও ছোট-হরিদাসের প্রতি কুলিশ-কঠোর ব্যবহার প্রদর্শন,—গৌরাঙ্গ-সম্পর্কিত এই সকল ঘটনা সম্ভবত লেখকবৃন্দের বর্ণনা-শৈথিল্যের ফলেই পাঠকচিত্তে ব্যর্থ অনুসন্ধিৎসার সৃষ্টি করে।

ইহা ছাড়াও অদ্বৈত-, সীতা-, ও বংশী-চরিতগ্রন্থ এবং অন্যান্য কোন কোন গ্রন্থের লেখকবৃন্দ সম্বন্ধেও সর্বত্র নিঃসংশয় হওয়া যায় নাই। ঐ সকল গ্রন্থে প্রক্ষিপ্তাংশ প্রচুর এবং গ্রন্থকর্তৃবৃন্দের অনেকেই হয়ত বহু পরবর্তিকালের লোক। সুতরাং গ্রন্থোক্ত বহু বিবরণই কাল্পনিক। ফলে **অদ্বৈত, সীতা, ঈশাননাগর, বীরচন্দ্র প্রভৃতির জীবনী-সংকলনে নানাবিধ ত্রুটি থাকিয়া যাওয়াই সম্ভব** এবং বর্তমান গ্রন্থেও হয়ত সেইরূপ বহুবিধ ত্রুটি থাকিয়া গিয়াছে। কিন্তু তজ্জন্য উক্ত গ্রন্থগুলির সকল ঘটনাকেই নির্বিচারে বর্জন করিলে সত্যসম্বন্ধযুক্ত বহু বিবরণও পরিত্যক্ত হইতে পারে। কারণ, অপেক্ষাকৃত পরবর্তিকালের গ্রন্থকারদিগের হস্তেও প্রাচীন অথচ অধুনালুপ্ত বহু মালমশলা থাকিতে পারে; সুতরাং ঐগুলিকে আলোচনাদির দ্বারা বিচারের বিষয়ীভূত করিতেই হয়। অবশ্য সর্বদাই মনে রাখা কর্তব্য যে ঘটনার উল্লেখমাত্রই ঘটনা বা সত্যের প্রতিষ্ঠা নহে। তাহাছাড়া আমরা বৈষ্ণব জীবনীগ্রন্থগুলিকে যে আকারে পাইতেছি, তাহাতে কয়েকটি ব্যতীত অন্য কোন্ গ্রন্থ প্রামাণিক এবং কোন্‌টি নয়, বা কোন্‌টির ঠিক কতটা অংশ জাল তাহাও কেহই জোর করিয়া বলিতে পারেন না। বিশেষ করিয়া, প্রাচীন ভক্তবৃন্দের পরবর্তিকালের জীবন ও পরবর্তি-কালের ভক্তবৃন্দের সমগ্র জীবন সম্বন্ধে জানিবার জন্য পরবর্তিকালের গ্রন্থের উপর নির্ভর করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। 'প্রেমবিলাসে'র শেষ কয়েকটি বিলাস সম্বন্ধে যথেষ্ট সংশয় থাকা সত্ত্বেও অনেক বিজ্ঞ এবং সতর্ক ব্যক্তিও উহার চতুর্বিংশ বিলাসাদি হইতে এমন ঘটনা সংগ্রহ করিয়াছেন, যাহার উল্লেখমাত্রও অন্য কোথাও নাই।

যাহাই হউক, বর্তমান গ্রন্থটি একটি বৃহত্তর পরিকল্পনার অংশবিশেষ মাত্র। সুতরাং প্রামাণিক অপ্রামাণিক নির্বিশেষে প্রায় সকলগ্রন্থের সকল ঘটনাকে সাজাইয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছি এবং প্রথমেই বিরাট বৈষ্ণব-সাহিত্যে বর্ণিত সকল ঘটনা সম্বন্ধেই একসঙ্গে সঠিক বিচার অসম্ভব বলিয়া প্রথমে যেইগুলি সম্বন্ধে বিচার সম্ভব, মাত্র সেইগুলির বিচার করিয়াই সত্যমিথ্যা নির্ণয় করিতে প্রয়াসী হইয়াছি। ফলে অবশ্য কতকগুলি বিষয় সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত-গ্রহণ সম্ভব হইয়াছে। অন্যান্য বহু বিষয়ের মধ্যে, মুকুন্দ ও সঞ্জয় যে পৃথক ব্যক্তি ছিলেন, বিজয়-আচার্য ও নন্দন-আচার্য যে একই পরিবারভুক্ত এবং বিষ্ণুদাস- ও গঙ্গাদাস-আচার্য প্রভৃতিও যে সেই পরিবারভুক্ত, শুক্লাম্বর-ব্রহ্মচারীই যে সর্বপ্রথম গৌরাঙ্গপ্রভুকে ভগবান বা দেবতা সিদ্ধান্ত করিয়া তাঁহার গলায় মাল্যদান করিয়াছিলেন, নিত্যানন্দপ্রভু যে মাধ্ব-সম্প্রদায়ভুক্ত কাহারও নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন নাই, নিত্যানন্দ, মুকুন্দ ও চন্দ্রশেখর-আচার্যরত্ন —মাত্র এই তিনজন যে মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণ দিনের সঙ্গী হইয়াছিলেন এবং নিত্যানন্দ, মুকুন্দ, জগদানন্দ ও দামোদর—মাত্র এই চারি ব্যক্তি যে তাঁহার প্রথমবার নীলাচলযাত্রার সঙ্গী

ছিলেন, কালিয়া-কৃষ্ণদাসই যে মহাপ্রভুর দক্ষিণ-ভ্রমণ সঙ্গী কৃষ্ণদাস, প্রবোধানন্দ-সরস্বতী যে গোপাল-ভট্টের পিতৃব্য ছিলেন না, দ্বারপাল-গোবিন্দের পক্ষেই যে বৃন্দাবনের গোবিন্দ-গোঁসাই হওয়া সম্ভব, দেবকীনন্দন ও গোপাল-চাপাল যে এক ব্যক্তি ছিলেন না, আউলিয়া-চৈতন্যদাস এবং আউলিয়া-মনোহরদাস যে একই ব্যক্তি, 'মঙ্গল' বা 'কবিচন্দ্র' যে উপাধি বিশেষ, কিংবা কবি জয়ানন্দ যে গদাধর-পণ্ডিত গোস্বামীর বংশধর ছিলেন—এই সকল সিদ্ধান্ত নূতন, বা নূতনভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বহু বিষয় বা বহু সমস্যাই উত্থাপিত হইয়াও অমীমাংসিত থাকিয়া গিয়াছে। কোথাও কোথাও কেবল যথা-দৃষ্ট ঘটনা-সংগ্রহই হইয়াছে এবং এমন অনেক ঘটনা উল্লেখিত হইয়াছে, যাহা পরবর্তী আলোচনায় নিশ্চয়ই বর্জন করিতে হইবে। কিন্তু একেবারে প্রথমেই ঘটনাগুলিকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ বা অপ্রমাণিক বলিয়া বর্জন, উভয়ই জটিলতার সৃষ্টি করে। এই কারণে আমি হয়ত অল্প কয়েকটি সমস্যার সমাধান করিলেও অসংখ্যবিধ সমস্যা বা বিষয়কে অন্য কর্তৃক সমাধানার্থ উপস্থাপিত করিয়াছি। ঘটনাগুলিকে আমরা যেভাবে পাইতেছি তাহাতে ঐগুলিকে অন্তত কিছু পরিমাণে সাজাইয়া না ধরিলে ঘটনারাজির তারিখ-নির্ণয়ও প্রাথমিক আলোচনায় অসম্ভব বলিয়া সে সম্বন্ধেও বিস্তৃত আলোচনা পরিহার করিতে হইয়াছে।

চৈতন্যমহাপ্রভুর প্রকৃত স্বরূপকে প্রতিফলিত করিয়া তাঁহার পূর্ণ জীবনী রচনায় প্রবৃত্ত হওয়া বিশেষ প্রতিভাসাপেক্ষ বিষয়। কিন্তু অন্যান্য ভক্তবৃন্দের মধ্যে তাঁহাকে যে স্থানে যেভাবে প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়, সেই স্থানে দাঁড়াইয়া সেইভাবেই দর্শন করিয়া লওয়া বোধ হয় অপেক্ষাকৃত সহজ এবং তাহাতে ভ্রান্তির সম্ভাবনাও প্রায় থাকে না। কারণ, তিনি নিজেই ভক্তবৃন্দের চিত্তমুকুরে নিজেকে নানাভাবে প্রতিফলিত করিয়াছেন। সুতরাং ভক্ত-বৃন্দের জীবন-বর্ণনায় মহাপ্রভুর কথা যেখানেই আসিয়াছে তাহাকে প্রাসঙ্গিকবোধে গ্রহণ করিতে হইয়াছে। বস্তুত, প্রাপ্তবিবরণ অনুযায়ী বৈষ্ণবভক্তবৃন্দের জীবনী বলিতে তৎসংক্রান্ত কতকগুলি জ্ঞাতব্যবিষয়ের বিশৃঙ্খলবিন্যস্ত ও অননুসৃতক্রম ঘটনাবলীর তালিকামাত্র, চৈতন্যলীলা-প্রকাশক না হইলে বহুস্থলেই যেন তাহাদের সার্থকতা থাকে না। সুতরাং ঘটনা-গ্রন্থনের ক্ষেত্রে অনেকস্থলে চৈতন্যকথাকেই সূত্ররূপে গ্রহণ করিতে হইয়াছে: অবশ্য চরিত্রবর্ণনা কিংবা প্রত্যেক ভক্তের ভক্তিভাব ও আচরণের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শনার্থ কিছু কিছু মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও ব্যঞ্জনাময় বর্ণনা একই কার্যের সহায়তা করিয়াছে। তাহা ছাড়া মূল নিবন্ধটিকে কিছু পরিমাণে সরস করিবার জন্যও মাঝে মাঝে গল্পাংশ যোগ করিতে হইয়াছে। এই সকল কারণে জীবনীগুলি হয়ত কোথাও কোথাও কিছুটা দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তাহাদিগকে অন্তত কিছু পরিমাণে শিল্পরূপ দান করিতে গেলে তাহা ছাড়া উপায় নাই; আর যতদূর মনে হয়, এই শিল্প-রূপায়ণের মধ্যেই সাহিত্য-কৃতির মূলতত্ত্ব গুহাহিত থাকে। হাল্কা বা গল্প অংশগুলি বর্জন করিয়া কেবলমাত্র বিচার-বিশ্লেষণাত্মক অংশ রক্ষা করিলে হয়ত পণ্ডিত সমাজের মধ্যে গ্রন্থকারের কৃতিত্ব স্বীকৃতির সম্ভাবনা সৃষ্টি হইত; কিন্তু তাহাতে পাঠকবর্গকেও অধিকতর অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইত। অবশ্য বহুস্থলেই এক ব্যক্তির জীবন বর্ণনার মধ্যে প্রায় অপরিহার্যভাবেই অন্য কতকগুলি ব্যক্তির

জীবনকথা আসিয়া পড়ায় পূর্বপ্রসঙ্গ-রক্ষার ব্যাপারে বিঘ্ন ঘটিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে নিত্যানন্দ জীবনী পাঠ করিবার সময় মধ্যপথে কালা-কৃষ্ণদাসের সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা পাঠ করিতে হইলে পাঠকবৃন্দের ধৈর্যচ্যুতির সম্ভাবনা যথেষ্টই। কিন্তু তাহা ছাড়া আর কোন উপায়ও ছিল না। কারণ, ভক্তবৃন্দের জীবনবৃত্তান্তগুলি পরস্পর-সম্বন্ধযুক্ত হওয়ায় ইহাতে কিছু কিছু ঘটনার পুনরুল্লেখ করা হইয়াছে সত্য, কিন্তু কোনও কোনও ভক্তের জীবনবৃত্তান্ত বর্ণনাকালে অনিবার্যভাবেই প্রাসঙ্গিক অন্য এক ব্যক্তির সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রদান করিবার পর আবার যদি ঐ দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্য পৃথক জীবনী লিপিবদ্ধ করিতে হইত, তাহা হইলে পুনরুক্তি আরও ভয়াবহ হইয়া উঠিত। সেক্ষেত্রে গ্রন্থের আয়তনও আরও বিপুলাকার ধারণ করিত।

গবেষণা-আরম্ভের পূর্বেই সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছিলাম, মূল গ্রন্থগুলি পাঠ করিবার পূর্বে তদ্‌বিষয়ক আধুনিক সমালোচনা বা মতবাদগুলি মনের উপর কী ভয়াবহ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে! তজ্জন্য গবেষণা-কার্য সমাপ্ত হইবার পরই আধুনিক গ্রন্থকার-গণের আলোচনা ও মতামতের সহিত পরিচিত হইয়াছি এবং যে-কয়েকটি স্থলে তাঁহাদিগের অভিমত গ্রহণ করিয়াছি, জ্ঞানবুদ্ধিমত তাহাদের সর্বত্রই তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়াছি। যেস্থলে কাঁহারও নামোল্লেখ করি নাই, সেইস্থলে তাঁহাদের অভিমতের সহিত নূতনভাবে পরিচিত হইতে পারি নাই বলিয়া তাহা করি নাই। আবার যেস্থলে প্রাচীন গ্রন্থাদির দুষ্প্রাপ্যতাবশত তাঁহাদের প্রদত্ত বিবরণগুলিকে মূল-গ্রন্থ হইতে স্বয়ং পাঠ করিতে সমর্থ হই নাই, সেইস্থলে তাঁহাদের নামেই ঘটনাগুলিকে গ্রহণ করিয়া প্রয়োজনবোধে তাহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই পুনরনুসন্ধানপূর্বক মূল বিবরণের সহিত পরিচিত হইবার পর তাঁহাদের নামোল্লেখ করিয়া স্বীয় মতামত ব্যক্ত করিয়াছি। সুতরাং এই শেষোক্ত বিষয়ে এবং অন্য সকল বিষয়ে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার ভালমন্দ সকল প্রকার দায়িত্বই বর্তমান গবেষকের।

সূচীপত্রটি সাজাইয়া লওয়াও এক দুরূহ ব্যাপার ছিল। নামগুলিকে অক্ষরানুক্রমিক-ভাবে সাজাইলে প্রসিদ্ধ গদাধর-পণ্ডিতের জীবনীর পরই অকিঞ্চিৎকর গরুড়-পণ্ডিতের জীবনী, এবং তাহার পরেই হয়ত মহাপ্রভুর নীলাচল-ভৃত্য গোবিন্দের জীবনী এবং তাহারও পরে 'গৌরাঙ্গ-পরিজন' পরিচ্ছেদ সন্নিবেশিত করিতে হয়। কিংবা হয়ত চন্দ্রশেখর-বৈদ্যের পরেই জগদানন্দ-পণ্ডিতের জীবনী বসাইয়া তাহার পরেই অনেক পরবর্তীকালের জয়ানন্দকে আনিতে হয়। অথবা, সর্বপ্রথম অচ্যুতানন্দের জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়া তাহার পরে তাঁহার পিতা বৈষ্ণব-গুরু অদ্বৈত-আচার্যকে আনিতে হয় এবং তাহার পরে আসেন ঈশ্বর-পুরী এবং তাহারই পরে হয়ত অখ্যাত উদ্ধবদাস ও তাহার পর প্রসিদ্ধ উদ্ধারণ-দত্ত। অথচ অসংখ্য ভক্তের মধ্যে সম্ভবত এমন একজনও নাই যাঁহার জন্ম-তারিখ সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়। সুতরাং এই বিষয়ে সময়ানুক্রমরক্ষাও অসম্ভব। বস্তুত, কবিকর্ণপুর (গৌর-গণোদ্দেশদীপিকা) হইতে আরম্ভ করিয়া নরহরি-চক্রবর্তী (নামামৃতসমুদ্র) পর্যন্ত প্রাচীন-

কালের বৈষ্ণববন্দনাকারী-বৃন্দের মধ্যে কেহই কোন সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি নির্ণয় করিতে পারেন নাই। তাই লেখকগণকে কৈফিয়ত দিতে দেখা যায়ঃ

আখর জোটন করিতে লিখন
আগে পাছে হয় নাম।
না লইবে দোষ মনের সন্তোষ
বন্দনা আমার কাম॥

এরূপ অবস্থায় মহাপ্রভুর লীলাকালের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই কতকগুলি পর্যায় ভাগ করিয়া তন্মধ্যে কতিপয় ভক্তের জীবনবৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়াছি। এক একটি পর্যায়ে আবার যে সকল ব্যক্তি আসিয়াছেন, তাঁহাদের প্রাধান্য বা প্রসিদ্ধি অনুযায়ী, কিংবা মহাপ্রভুর লীলার কোন্ পর্যায়ে ও কোথায় তাঁহারা তাঁহার সহিত যুক্ত হইয়াছিলেন, সেইদিকে লক্ষ্য রাখিয়াই মোটামুটিভাবে নামগুলি সাজাইয়া লইয়াছি। কিন্তু স্বভাবতই এই বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ কিছুতেই সম্ভব নহে বলিয়াই পরবর্তিকালের কতিপয় ব্যক্তি সম্বন্ধে এইরূপ ক্রমও হয়ত সর্বদা রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। তবুও যতদূর মনে হয়, বর্তমান অবস্থায় উপরোক্ত পন্থাই গৃহীত হইতে পারে। যদি কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি এই বিষয়ে অন্য কোন উৎকৃষ্ট পন্থা স্থির করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব এবং পরবর্তী সংস্করণের জন্য নিশ্চয়ই তাহা যথাযোগ্যভাবে বিবেচিত হইবে।

এইস্থলে গ্রন্থের কয়েকটি ত্রুটি সম্বন্ধে উল্লেখ করিতে চাই। গবেষণা সমাপ্তির পর প্রায় চার বৎসর মধ্যে গ্রন্থোক্ত **কোন কোন বিষয় সম্বন্ধে মত পরিবর্তন করিয়াছি।** প্রকাশক মহাশয়ের নিকট দেড় বৎসর পূর্বে পাণ্ডুলিপি প্রদত্ত হয়। ইতিমধ্যে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে আমার পূর্ব-সম্পাদিত 'অদ্বৈতমঙ্গল' গ্রন্থখানির ভূমিকা সম্পন্ন করিতে গিয়া নূতনভাবে কিছু গবেষণার কার্য করিতে হয়। তখন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে **'অদ্বৈতমঙ্গল' ব্যতিরেকে অন্যান্য অদ্বৈত- ও সীতা-জীবনী গ্রন্থগুলির প্রত্যেকটিই আধুনিককালে লিখিত, সুতরাং 'অদ্বৈতপ্রকাশা'দি গ্রন্থের বিবরণ বা অভিমত বর্জনীয় হইতে পারিত।** ইতিমধ্যে পাণ্ডুলিপির কিয়দংশও (নিত্যানন্দ জীবনীর প্রায় ১৮।২০ পৃষ্ঠা) হারাইয়া যায়। ফলে ঐ অংশের কোন স্থানে হয়ত যুক্তি বা ঘটনাস্থাপনের শৈথিল্য থাকিয়া যাওয়াও আশ্চর্যের বিষয় নহে। 'প্রেমবিলাস' গ্রন্থখানির মুদ্রণে কিছু ভুল থাকায় বর্তমান গ্রন্থের পাদটীকা-নির্দেশেও কিছু ভুল থাকিয়া গিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে, মুদ্রিত প্রেমবিলাসের ৩৪-৪০ পৃষ্ঠার বিবরণকে মুদ্রণানুযায়ী দ্বিতীয় বিলাসান্তর্গত না ধরিয়া তৃতীয় বিলাসান্তর্গত ধরিতে হইবে। এই সকল ছাড়াও, অসংখ্য ব্যক্তি ও ঘটনাবিধৃত এতবড় একটি গ্রন্থে অনবধানতাবশত আরও **বহুবিধ ত্রুটি থাকিয়া যাওয়া বিচিত্র নহে।** ছাপার ভুলও যথেষ্ট (যথা, ৮নং পৃষ্ঠায় 'তদবধস্তে'র স্থলে 'তদবর্ধতে' ছাপা হইয়া গিয়াছে।)। আবার ইতিহাসের মাপকাঠিতে ঘটনাবলীর বিচার করিতে গিয়া হয়ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও কাহাকে ক্ষুণ্ণ করিতে পারি। তজ্জন্য আমি পাঠকবর্গের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। ভক্তবৃন্দ সম্বন্ধে একটি মোটামুটি ধারণা অর্জন করা সত্ত্বেও কঠোর পরিশ্রম এবং বহুস্থলে

পুনর্গবেষণা করিয়া নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করিতে সাত শতাধিক ঘণ্টা ব্যয় করিতে হইয়াছে। কয়েকটি পৃষ্ঠার (৫৭৫, ৫৭৬, ৬০৭, প্রভৃতি) প্রায় প্রত্যেকটি শব্দকেই নির্ঘণ্টভুক্ত করিতে হইয়াছে। প্রাথমিক ও একক প্রচেষ্টায় ইহাতে ভুল থাকিতে বাধ্য এবং নির্ভুলভাবে ইহার ব্যক্তি-নির্ঘণ্ট অংশটি প্রস্তুত করিতে পারা কখনও সম্ভব কিনা জানি না। তবে এই নির্ঘণ্ট অংশটি হয়ত মূল গ্রন্থের ত্রুটিগুলিকে কিয়ৎপরিমাণে সংশোধন করিয়া একটি বাস্তবভিত্তিক ঐতিহাসিক জীবনীগ্রন্থ প্রস্তুত করিবার পথ উন্মুক্ত করিতে সাহায্য করিবে। ভবিষ্যতে কোনও গবেষক যদি সেই কার্য করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলেই আমার শ্রম ও প্রযত্ন সার্থক হইবে।

ডা. সুকুমার সেন, এম. এ., পি. আর এস., পি. এইচ. ডি., এফ্. এ. এস. বি. মহাশয়ের অধীনে আমি এই গবেষণা কার্য সম্পন্ন করিয়াছি। তাঁহার ঋণ অপরিশোধ্য। ডা. বিমানবিহারী মজুমদার, এম. এ., পি. আর. এস., পি. এইচ ডি. এবং ডা. শশিভূষণ দাসগুপ্ত, এম. এ.. পি. আর. এস., পি. এইচ. ডি. মহাশয়দ্বয় আমাকে দয়া-পূর্বক যে উপদেশ দান করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগের নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। শ্রীযুক্ত দেবদেব ভট্টাচার্য, এম. এ. (ডব্‌ল্), অষ্টতীর্থ মহাশয় সমগ্র থিসিস্-টি পাঠ করিয়া আমাকে যেভাবে উৎসাহিত করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার কথা চিরকাল স্মরণে থাকিবে। সমগ্র গ্রন্থটি দুইবার এবং ইহার বহু অংশ তাহারও অধিকবার নকল করিতে হইয়াছে। এতদ্বিষয়ে শ্রীমতী মায়ার নিকট সর্বাধিক সাহায্য লাভ করিয়াছি; শ্রীমতী ছায়ার নামও এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; এই প্রসঙ্গে নারায়ণ, গঙ্গানারায়ণ, বৈদ্যনাথ এবং সুনীল প্রভৃতি আমার কয়েকজন ছাত্রের নামও উল্লেখ না করিয়া পারি না;—ইহারা প্রত্যেকেই আমার একান্ত স্নেহভাজন। আজ ইহাদের সকলের কথাই আমার বিশেষভাবে মনে পড়িতেছে। যে সকল গ্রন্থাগার হইতে বিশেষ সাহায্য লাভ করিয়াছি তন্মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পাঠাগার ও তাহার পুথিশালা বিভাগ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পাটবাড়ী বৈষ্ণব গ্রন্থাগার, এশিয়াটিক সোসাইটি ও ন্যাশ্‌নাল লাইব্রেরির নাম বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। এই সকল প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের নিকটও আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। আমার প্রকাশক এবং মুদ্রাকরদ্বয়ও যে এইরূপ একটি পাদটীকা-কণ্টকিত গ্রন্থের প্রকাশনা ও মুদ্রণের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

সূচীপত্র*

পূর্বাভাস

প্রথম পর্যায়

নবদ্বীপ

* সূচীপত্রের অন্তর্গত ব্যক্তিবৃন্দের প্রায় প্রত্যেকেরই জীবনী মধ্যে অনিবার্যভাবে প্রাসঙ্গিক আরও কতকগুলি ব্যক্তির জীবনকথা আসিয়া পড়িয়াছে। তাঁহাদের পৃথক জীবনী লেখা হয় নাই। তাঁহাদের জীবনীর জন্য নাম-নির্ঘণ্ট দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয় পর্যায়

নীলাচল

তৃতীয় পর্যায়

বৃন্দাবন

গৌড়মণ্ডল

চতুর্থ পর্যায়

বৃন্দাবন

গৌড়মণ্ডল

পরিশিষ্ট

প্রথম পর্যায়

দ্বিতীয় পর্যায়

তৃতীয় পর্যায়

চতুর্থ পর্যায়

নির্ঘণ্ট

সাংকেতিক চিহ্ন*

এ. সো. = এশিয়াটিক সোসাইটি

ক. বি. = কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

খ. = খণ্ড

তু. = তুলনীয়

দ্র. = দ্রষ্টব্য

পা. টী. = পাদটীকা

পা. বা. = পাটবাড়ী

ব. সা. প. = বংগীয় সাহিত্য পরিষৎ

ব. সা. প. প. = বংগীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা

সং. = সংস্করণ

C. U. = Calcutta University

* [গ্রন্থ-সংকেত সম্বন্ধে শেষাংশে প্রদত্ত প্রমাণ-পঞ্জী দ্রষ্টব্য]

পূর্বাভাস

মাধবেন্দ্র-পুরী

মাধবেন্দ্র সম্বন্ধে গৌরাঙ্গের বাল্যলীলাসঙ্গী মুরারি-গুপ্ত জানাইয়াছেন[১] :

আদৌ জাতো দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ শ্রীমাধবপুরীপ্রভুঃ।
ঈশ্বরাংশো দ্বিধা ভূত্বাঽদ্বৈতাচার্য্যশ্চ সৎগুণঃ॥

বৃন্দাবনদাসও তাঁহাকে ভক্তিরসের আদি সূত্রধার বলিয়াছেন।[২] কৃষ্ণদাস-কবিরাজ বলিয়াছেন[৩] ভক্তিকল্পতরুর প্রথম অঙ্কুর এবং দেবকীনন্দন তাঁহাকে বিষ্ণুভক্তি পথের অবতার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।[৪] চৈতন্য-প্রদর্শিত ভক্তিধর্মের আদি সূত্রধার মাধবেন্দ্র-পুরীপাদের সম্বন্ধে এই সমস্ত উক্তি হইতেই তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের পূর্ণ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মাধবেন্দ্র-পুরী সম্ভবত জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। কারণ 'চৈতন্য-ভাগবতে' তাঁহাকে শিখাসূত্রত্যাগী সন্ন্যাসী-রূপে অভিহিত করা হইয়াছে। 'ভক্তিরত্নাকর'-মতে[৫] মাধব-সম্প্রদায়-ভুক্ত লক্ষ্মীপতিই ছিলেন তাঁহার দীক্ষাগুরু ; কিন্তু কোথায় কোন্ সময়ে যে এই দীক্ষাগ্রহণ সম্পন্ন হইয়াছিল, গ্রন্থমধ্যে তাহার উল্লেখ নাই। মাধবেন্দ্র ছিলেন কৃষ্ণপ্রেমময়তনু। কৃষ্ণ-প্রেমে বিভোর হইয়া তিনি বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্রে পরিক্রমা করিয়া বেড়াইতেন। কোন কোন গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে[৬] যে তাঁহার এই পরিভ্রমণকালে অদ্বৈতপ্রভুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটিলে পুরীপাদ তাঁহাকে ভক্তিধর্মে উদ্বোধিত করিয়া তুলেন এবং 'ভক্তিরত্নাকরে' বলা হইয়াছে যে, অদ্বৈতপ্রভু

গয়াছলে সর্বতীর্থ ভ্রমণ করিল।
মাধবেন্দ্র পুরী স্থানে দীক্ষামন্ত্র নিল॥

কিন্তু এই সমস্ত গ্রন্থের উল্লেখ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। কারণ 'চৈতন্যভাগবত' 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক' এবং 'চৈতন্যচরিতামৃত' প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থে এই সকল ঘটনার কোনও উল্লেখ দৃষ্ট হয় না।

'চৈতন্যচরিতামৃত' হইতে জানা যায় যে মাধবেন্দ্র-পুরী তীর্থভ্রমণকালে মথুরায় এক সনৌড়িয়া-ব্রাহ্মণের গৃহে গিয়া উঠেন। সনৌড়িয়া-বিপ্রের গৃহে সন্ন্যাসীর ভোজন অবিধেয়। কিন্তু মাধবেন্দ্রের নিকট জাতিকুলের অভিমান ছিল তুচ্ছ জিনিস। উক্ত বিপ্রকে ভক্তিমান

(১) শ্রীচৈ.চ.—১।৪।৫ (২) চৈ. ভা—১।৬,পৃ. ৪৫ ; তু —বৈ. ব. (বৃ.)—পৃ. ১ (৩) চৈ. চ.—১।৯,পৃ.৪৯ (৪) বৈ. ব. (দে)—পৃ. ১ (৫) ৫।২১৪৭ ; তু,—মু. বি.—পৃ. ৪১৮-১৯ (৬) প্রে. বি.—২৪.শ. বি. পৃ. ২৩০ ; অ. প্র.—৪র্থ. অ, ; ভ. র.—৫।২০৮১

বৈষ্ণব জানিয়া তিনি দ্বিধাহীনচিত্তে তাঁহাকে মন্ত্রদান করিয়া তাঁহার গৃহেই ভিক্ষানির্বাহ করিলেন। বস্তুত, মাধবেন্দ্রের এই প্রকার আচরণের মধ্যেই ভবিষ্যৎ-যুগের বৈষ্ণবসমাজ এক সুমহান আদর্শ প্রাপ্ত হয়। চৈতন্য মহাপ্রভুও এই মাধবেন্দ্রের সূত্রে উক্ত সনৌড়িয়া-বিপ্র হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীরঙ্গ-, রামচন্দ্র-পুরী প্রভৃতি বিখ্যাত সন্ন্যাসী-বৃন্দকে, এমন কি স্বয়ং অদ্বৈতাচার্যপ্রভুকেও[৭] যথেষ্ট শ্রদ্ধা বা গুরুমান্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

'চৈতন্যচরিতামৃতে' লিখিত হইয়াছে[৮] যে মথুরাবাসকালে মাধবেন্দ্র একদিন গিরিগোবর্ধনে অতি আশ্চর্যজনকভাবে গোপাল-বিগ্রহ আবিষ্কার করেন এবং গ্রামবাসীদের সাহায্যে বন-জঙ্গল কাটিয়া বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাতে বৃন্দাবনের অধিবাসী-বৃন্দ যেন নব প্রেরণা লাভ করিলেন। তাঁহাদের সাহায্যে প্রত্যহ অন্নকূট মহোৎসব চলিতে লাগিল এবং কিছুদিনের জন্য যেন বৃন্দাবনের পূর্বমাহাত্ম্য ফিরিয়া আসিল। ব্রজবাসী-ব্রাহ্মণগণ সকলেই মাধবেন্দ্রের নিকট দীক্ষিত হওয়ায় বৃন্দাবনে ভক্তিবৃক্ষের বীজ অঙ্কুরিত হইল। কিছুকাল পরে গৌড়দেশ হইতে দুইজন ব্রাহ্মণ বৃন্দাবনে আসিয়া পৌছাইলে মাধবেন্দ্র তাঁহাদের উপর স্থায়িভাবে বিগ্রহ সেবার ভারার্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন এবং দুই বৎসর পরে গোপাল-সেবার নিমিত্ত মলয়জ-চন্দন আনিবার জন্য নীলাচলাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

কোন কোন গ্রন্থে[৯] লিখিত হইয়াছে যে মাধবেন্দ্র-পুরী শান্তিপুরে অদ্বৈতপ্রভুকে দীক্ষাদান করিয়া রেমুণা গমন করেন। কিন্তু 'চৈতন্যভাগবতে' মাধবেন্দ্র কর্তৃক অদ্বৈতপ্রভুকে দীক্ষাদানের কথা লিখিত হইলেও[১০] ঐ দীক্ষাদানের স্থানকাল সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় নাই। তবে শান্তিপুরে অদ্বৈতপ্রভুর দীক্ষাগ্রহণ ব্যাপারটি অসত্য না হইতেও পারে। 'গৌরাঙ্গবিজয়' গ্রন্থে আছে[১১] যে গৌরাঙ্গ-আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্বে মাধবেন্দ্র শান্তিপুরে অদ্বৈতপ্রভুকে দীক্ষাদান করিয়াছিলেন। 'অদ্বৈতকড়চাসূত্র' নামক একটি গ্রন্থেও এইরূপ বিবরণ আছে।[১২] আবার 'চৈতন্যভাগবতে' বলা হইয়াছে যে মহাপ্রভু কানাইর-নাটশালা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া শান্তিপুরে অদ্বৈতগৃহে উপস্থিত হইলে অদ্বৈতপ্রভু মাধব-পুরীর আরাধনা-পুণ্যতিথি উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন। 'চৈতন্যচরিতামৃতে'ও এই ঘটনার সমর্থন আছে। তাছাড়া এই গ্রন্থে অদ্বৈতকে স্পষ্টই মাধবেন্দ্র-শিষ্য বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে এবং গ্রন্থের অন্য এক স্থলেও উক্ত হইয়াছে যে মাধবেন্দ্র বৃন্দাবন হইতে রেমুণা-গমন পথেই শান্তিপুরে আসিয়া পৌছাইলে অদ্বৈতপ্রভু 'তাঁর ঠাঁই মন্ত্র লইল যতন করিয়া'।[১৩] এই সমস্ত হইতে নিঃসন্দেহে উপরোক্ত ঘটনার যাথার্থ্য স্বীকার করিয়া লইতে পারা যায়।

(৭) চৈ. চ.—১।৬, পৃ. ৩৮ (৮) ২।৪, পৃ. ১০১-২ (৯) প্রে. বি.—২৪.শ.বি, পৃ. ২৩২ ; অ. ম.—পৃ. ২৫-২৮ ; অ. প্র.—৫ম. অ, পৃ. ১৭-১৮ (১০) ৩।৪, পৃ. ২৯৩ ; তু.—চৈ. গ., পৃ. ৩ (১১) পৃ. ১২ (১২) পৃ. ১-২ ; (১৩) ১।৬, পৃ. ৩৮ ; ২।৪, পৃ ১০৩ ;

'চৈতন্যচরিতামৃতে' বিবৃত হইয়াছে যে, রেমুণায় আসিয়া গোপীনাথ দর্শনান্তে মাধবেন্দ্র পূজারী-ব্রাহ্মণের নিকট শুনিলেন যে গোপীনাথের 'অমৃতকেলি' নামক ক্ষীর-ভোগ অতীব প্রসিদ্ধ। তাঁহার বাসনা জন্মাইল—

অযাচিত ক্ষীরপ্রসাদ যদি অল্প পাই।
স্বাদ জানি তৈছে ক্ষীর গোপালে লাগাই।

ভোগ এবং আরতি শেষ হইয়া গেলে তিনি নিকটবর্তী শূন্য হাটে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু অধিক রাত্রিতে ঠাকুরের পূজারী স্বয়ং ক্ষীরভাণ্ড লইয়া উপবাসী সন্ন্যাসীর নিকট হাজির হইলে গোপীনাথের অপার করুণায় কৃতার্থ হইয়া মাধবেন্দ্র প্রেমাবিষ্টচিত্তে সেই ক্ষীর ভক্ষণ করিলেন। তাহারপর ব্রাহ্মণ-পূজারী চলিয়া গেলেন। কিন্তু এই ক্ষীরপ্রাপ্তিরূপ বিপুল সৌভাগ্যের মধ্যে স্বয়ং গোপীনাথের ইচ্ছার কথা স্মরণ করিয়া এবং প্রভাতেই সেই স্থলে বহুলোকের ভিড় জমিয়া উঠিবে ভাবিয়া মাধবেন্দ্র তাঁহার বহু পূর্বেই পুনরায় যাত্রা আরম্ভ করিলেন।

নীলাচলে পৌঁছাইয়া মাধবেন্দ্র রাজপাত্রের সহায়তায় প্রভূত পরিমাণে চন্দন সংগ্রহ করিলেন। পথের জন্য ছাড়পত্রও যোগাড় করা হইল। এক বিপ্র-সেবক চন্দন লইয়া তাঁহার সহিত যাত্রা করিলেন। কিন্তু রেমুণা পর্যন্ত আসিয়া আর তাঁহার যাওয়া হয় নাই। 'চৈতন্যচরিতামৃত' হইতে জানা যায় যে নানাবিধ বাধাবিপত্তি অতিক্রম করিয়া কর্পূরচন্দন আনিতে হইয়াছিল। 'ম্লেচ্ছদেশে কর্পূরচন্দন আনিতে জঞ্জাল।' 'চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে'ও লিখিত হইয়াছে[১৪] যে 'বর্ত্মনঃ কণ্টকায়মানানাং ঘট্টপালানাং ঘট্টদেয়াদি নিম্নবিঘ্ন'ও ছিল প্রায় অনতিক্রমণীয়। তৎসত্ত্বেও মাধবেন্দ্র কোন রকমে রেমুণা পর্যন্ত আসিয়া সেইস্থানে গোপাল এবং গোপীনাথকে অভিন্ন-জ্ঞানে গোপীনাথের অঙ্গেই সমস্ত কর্পূরচন্দন লেপনের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। সারা গ্রীষ্মকাল তাঁহার উপস্থিতিতে চন্দনানুলেপন চলিতে লাগিল। গ্রীষ্মশেষে পুরীরাজ পুনরায় নীলাচলে ফিরিয়া চাতুর্মাস্য অতিবাহিত করিলেন।

ইহার পর কিন্তু মাধবেন্দ্র সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু[১৫] জানিতে পারা যায় না। 'চৈতন্যচবিতামৃত' হইতে জানা যায়[১৬] যে তিনি একবার গৌড়দেশে আসিয়া নবদ্বীপে জগন্নাথ-মিশ্রের গৃহে উঠিয়াছিলেন। দক্ষিণ-ভ্রমণকালে মহাপ্রভু যখন পাণ্ডুপুরে পৌছান,

---

(১৪) ১০।১ (১৫) প্রে.বি. (২৪ শ. বি.)-মতে তিনি রেমুণা হইয়া বৃন্দাবনে পৌছাইলে তাঁহার তিরোভাব ঘটে। অ. প্র.-মতে তিনি কিছুদিন রেমুণায় থাকিয়া নীলাচলে যান, তারপর রেমুণা ও নীলাচল মধ্যে তাঁহার যাতায়াত চলিতে থাকে এবং তিনি শেষে 'গোপীনাথ' পদে হইলা সিদ্ধিপ্রাপ্ত।'
(১৬) ২।৯, পৃ. ১৪৩-৪৪

তখন তাঁহার সহিত মাধবেন্দ্র-শিষ্য[১৭] শ্রীরঙ্গ-পুরীর সাক্ষাৎ ঘটে। উভয়ে পাঁচ সাত দিন একত্রে কৃষ্ণকথায় অতিবাহিত করেন। সেই সময় স্বয়ং শ্রীরঙ্গ-পুরীই মহাপ্রভুকে জানান যে মাধবেন্দ্রের নবদ্বীপ-গমনকালে তিনিও গুরুর সহিত বর্তমান থাকিয়া জগন্নাথ-মিশ্রের গৃহে তৎপত্নী শচীদেবীর নিপুণ হস্তের রন্ধন 'অপূর্ব' 'মোচার-ঘণ্ট' খাইয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন এবং সেই ব্রাহ্মণ দম্পতির এক অল্পবয়স্ক সুযোগ্য পুত্র সন্ন্যাস-গ্রহণান্তে শংকরারণ্য নাম ধারণ করিয়া উপরোক্ত তীর্থক্ষেত্রেই সিদ্ধিপ্রাপ্ত হন।

ইহা হইতেও বুঝা যাইতেছে যে মাধবেন্দ্র একবার নবদ্বীপ অঞ্চলে আগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা তাঁহার দ্বিতীয়বার আগমন কিনা বিচার্য। পূর্বোক্ত 'গৌরাঙ্গবিজয়' গ্রন্থে মাধবেন্দ্র-পুরীর দুইবার শান্তিপুরাগমনের উল্লেখ আছে[১৮]— একবার গৌরাঙ্গ-আবির্ভাবের পূর্বে এবং অন্যবার তাহার পরে। পরে যে তিনি নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন তাহার অন্য কোন সমর্থন নাই। কিন্তু তিনি যে দুইবার নবদ্বীপ-অঞ্চলে আসেন, 'গৌরাঙ্গ-বিজয়ে'র এই তথ্যটুকু অসত্য না হইতেও পারে। কারণ রেমুণার পথে যাত্রা করিবার সময় তাঁহার সহিত শ্রীরঙ্গ-পুরী থাকিয়া থাকিলে 'চৈতন্যচরিতামৃতে' তাহা অবশ্যই বর্ণিত হইত। সুতরাং মাধবেন্দ্রের পূর্বোল্লেখিত নবদ্বীপ-শান্তিপুরাগমনকে যদি প্রথমবারের আগমন বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে শ্রীরঙ্গ-পুরীর সহিত আগমনকে তাঁহার দ্বিতীয় বার আগমন বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

মাধবেন্দ্র নদীয়ায় আসিলে সম্ভবত সেই সময়ে কয়েকজন ভক্তিমান ব্যক্তি তাঁহার নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন। তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন পুণ্ডরীক-বিদ্যানিধি[১৯] এবং গদাধর-পণ্ডিতের পিতা মাধব-মিশ্র।[২০] প্রকৃতপক্ষে মাধবেন্দ্রের একদিকে[২১] ছিলেন ঈশ্বর-, পরমানন্দ-, ব্রহ্মানন্দ-, শ্রীরঙ্গ-, রামচন্দ্র-, বিষ্ণু-, কেশব-, কৃষ্ণানন্দ-, সুখানন্দ-, রাঘবেন্দ্র-পুরী, কেশব-, ব্রহ্মানন্দ-ভারতী, নৃসিংহানন্দ-তীর্থ প্রভৃতির সকল অথবা কোন কোন সন্ন্যাসী-শিষ্য, আর একদিকে ছিলেন অদ্বৈত, পুণ্ডরীক, মাধবাদি গৃহী-শিষ্যের দল। এই তালিকার সহিত জয়ানন্দ-প্রদত্ত রঘুনাথ-, অনন্ত-, অমর- ও গোপাল-পুরীর নামও বিবেচনার বিষয় হইতে পারে। আবার 'অদ্বৈতমঙ্গল'-মতে বিজয়-পুরীও তাঁহার সতীর্থ ছিলেন।[২২] ইহাদের সাহায্যে তিনি ভারতভূমিতে যে প্রেম-ধর্মের অভ্যুত্থানকে সম্ভব করিয়া তুলিয়াছিলেন তাহারই ফলে বৈষ্ণবধর্মের গোড়াপত্তন হইয়া গেল এবং তাহারই ফলে চৈতন্যরূপ বিরাট পুরুষের আবির্ভাবও সম্ভব হইয়া উঠিল। কিন্তু তখন

(১৭) তু.চৈ: দী.—পৃ. ৩ ; চৈ. দী. রামাই—পৃ. ৬ (১৮) পৃ. ১২, ৪৮ (১৯) গৌ. দী.—৫৬ ; প্রে. বি.-২২ শ.বি.,পৃ. ২১৭ ; ২৪ শ. বি., পৃ ২৬০ ; ভ. মা.—পৃ,২৬ (২০) প্রে.বি.—২২শ. বি , পৃ. ২১৭ (২১) চৈ.চ.—১।৯, পৃ. ৪৯ ; ইঁহাদের মধ্যে রাঘব-পুরীর নাম ভ. নি. (১৩৬)-গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে। (২২) পৃ.—৫,৮

মাধবেন্দ্রের কর্ম ফুরাইয়া আসিয়াছে। তিনি তাঁহার আরব্ধ কর্মকে উত্তরাধিকারী-বৃন্দের হস্তে তুলিয়া দিয়া মহাপ্রয়াণ করিলেন।[২৩] অন্তর্ধানকালে ঈশ্বর-পুরী প্রভৃতি ভক্ত তাঁহার নিকট উপস্থিত ছিলেন।[২৪] কৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য তখন তাঁহার কী ব্যাকুল আর্তনাদ! শেষে মথুরানাথকে ডাকিতে ডাকিতে নিম্নোক্ত স্বরচিত শ্লোকটি পাঠ করিয়া 'সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইল পুরীর শ্লোকের সহিতে।'[২৫]

অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্ ॥

১৩৩০ সালের 'ভারতবর্ষ'-পত্রিকার কার্তিক-সংখ্যায় বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 'ক্ষীরচোরা গোপীনাথ' নামক প্রবন্ধ মধ্যে লিখিয়াছেন, "মাধবেন্দ্র-পুরী রেমুণাতে দেহরক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার সমাধি ও পাতুকা অদ্যাপি সেখানে পূজিত হয়।" তিনি রেমুণা পরিদর্শন করিয়া এই প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। কিন্তু মাধবেন্দ্রের দ্বিতীয়বার নদীয়া-গমন সত্য হইলে বলিতে হয় যে রেমুণা-নীলাচল পথ হইতে তিনি একসময় প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। পরে তিনি পুনরায় রেমুণা গিয়াছিলেন কিনা তাহার বিবরণ কোথাও লিপিবদ্ধ হয় নাই। আবার 'চৈতন্যচরিতামৃত' হইতেও জানা যাইতেছে যে তাঁহার প্রাপ্তিকালে ঈশ্বর-পুরী রামচন্দ্র-পুরী[২৬] প্রভৃতি ভক্ত তৎসমীপে উপস্থিত ছিলেন। এই শিষ্যবৃন্দের উপস্থিতিতে ধারণা হইতে পারে যে সম্ভবত বৃন্দাবনেই তাঁহার তিরোভাব ঘটে। 'প্রেমবিলাসে'র চতুর্বিংশ বিলাসেও এইরূপ উক্ত হইয়াছে। তবে এ সম্বন্ধে সঠিক কিছু বলা চলেনা, 'কাশীশ্বর গোস্বামীর স্থচক' নামক একটি গ্রন্থে বলা হইতেছে যে মথুরায় যমুনাতীরে 'মাধব-ঈশ্বরপুরীর' সমাজ বর্তমান ছিল।[২৭] কিন্তু পুথিটির লিপিকাল জানা যায় নাই।

'পদ্যাবলী'তে মাধবেন্দ্র-রচিত কয়েকটি শ্লোক সংগৃহীত হইয়াছে।

(২৩) গৌ. বি.-এ. (পৃ.৪৮-৬২) বলা হইয়াছে যে গৌরাঙ্গের চূড়াকরণকালে মাধবেন্দ্র নবদ্বীপে জগন্নাথ ও অদ্বৈত-আচার্যের আতিথ্যগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং চূড়াকরণ-অনুষ্ঠানে বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। গৌরাঙ্গের সহিত তাঁহার নানাবিধ আলোচনাও হয়। কিন্তু অন্য কোথাও ইহার সমর্থন নাই। (২৪) চৈ. চ—৩।৮, পৃ. ৩২৭-২৮ (২৫) ঐ—২।৪, পৃ. ১০৫ (২৬) দ্র.—ঈশ্বর-পুরী ও পরমানন্দ-পুরী (২৭) পৃ.৪

ঈশ্বর-পুরী

'প্রেমবিলাসে'র সন্দিগ্ধ ত্রয়োবিংশ বিলাসে[১] লিখিত হইয়াছে যে ঈশ্বর-পুরী ছিলেন কুমারহট্টনিবাসী রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ শ্যামসুন্দর আচার্যের পুত্র, কিন্তু অন্য কোন গ্রন্থ হইতে ঈশ্বর-পুরীর পিতৃনাম পাওয়া যায় না। তবে তাঁহার পিতৃনিবাস যে কুমারহট্টগ্রামে ছিল এবং তিনি যে মাধবেন্দ্র-পুরীর নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন তাহা বহু গ্রন্থেই উল্লেখিত হইয়াছে। গৌরাঙ্গ-আবির্ভাবের পূর্বেই তিনি সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়া তীর্থ-পর্যটন করিতেছিলেন। সেই সময়ে তিনি গুরু মাধবেন্দ্র-পুরীর[২] নিকট অবস্থান করিয়া তৎপ্রবর্তিত প্রেম ও ভক্তি-ধর্মসম্বন্ধে সুশিক্ষিত হন। 'চৈতন্যচরিতামৃতে' বলা হইয়াছে যে মাধবেন্দ্র ছিলেন ভক্তি-কল্পতরুর প্রথম অঙ্কুর এবং 'শ্রীঈশ্বর-পুরী-রূপে অঙ্কুর পুষ্ট হইল।' ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে মাধবেন্দ্র-তিরোভাবের পর ঈশ্বর-পুরী গুরুর আদর্শ এবং ইচ্ছাশক্তির যথার্থ ও দায়িত্বশীল বাহক হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মাধবেন্দ্রের শেষজীবনে ঈশ্বর-পুরী সম্ভবত সর্বদাই গুরুসমীপে বর্তমান থাকিয়া গুরুর যথোচিত সেবা ও পরিচর্যাদি করিতেন। তাই দেখিতে পাওয়া যায়[৩] মাধবেন্দ্রের তিরোভাবের অব্যবহিত পূর্বেই

ঈশ্বরপুরী করে শ্রীপাদসেবন।
স্বহস্তে করেন মল মূত্রাদি মার্জন॥

সেই সময় তাঁহার সতীর্থ রামচন্দ্র-পুরী সেইস্থলে পৌছাইয়া গুরুকে ব্রহ্ম-উপদেশ প্রদান করিলে কৃষ্ণচরণার্থব্যাকুল মাধবেন্দ্র মর্মান্তিক পীড়া অনুভব করিতে থাকেন। তখন ঈশ্বর-পুরী গুরুর নিকট কৃষ্ণনাম জপ করিতে এবং তাঁহাকে কৃষ্ণলীলা পাঠ করিয়া শুনাইতে থাকেন। মাধবেন্দ্র তাঁহাকে বরদান করিয়া গেলেন, "কৃষ্ণে তোমার হউক প্রেমধন।" পুরীবরের উক্তি সর্বাংশে সার্থক হইয়াছিল।

'প্রেমবিলাস'-মতে[৪] গৌরাঙ্গের জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিশ্বরূপ ঈশ্বর-পুরীর নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন। কিন্তু ইহার সমর্থন অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। জয়ানন্দ বলেন[৫] যে তাঁহার দীক্ষাগুরু ছিলেন কেশব-ভারতী। তবে 'প্রেমবিলাসে'র মত অন্যান্য কোন কোন গ্রন্থ হইতে জানিতে পারা যায় যে নিত্যানন্দ তাঁহার পরিভ্রমণকালে হয়ত দুই একবার ঈশ্বর-পুরীর সাক্ষাৎপ্রাপ্ত হন।[৬] আবার গৌরাঙ্গের কৈশোরাবস্থায় একবার ঈশ্বর-পুরী নবদ্বীপে আসিয়া

(১) পৃ. ২২০ (২) তু.—মু. বি., পৃ. ৪২৮, ৪১৮-১৯; গৌ. বি.—পৃ. ১৪৬ (৩) চৈ. চ.—৩।৮, পৃ. ৩২৮ (৪) ২৪ শ. বি., পৃ. ২৪২ (৫) পৃ. ২০ (৬) দ্র.—নিত্যানন্দ

অদ্বৈতগৃহে উঠিয়াছিলেন।[৭] অদ্বৈত এবং ঈশ্বর-পুরী উভয়েই উভয়কে দেখিয়া আকৃষ্ট হন এবং সেই সময় একদিন গৌরাঙ্গ যখন অধ্যাপনা করিয়া ফিরিতেছিলেন, তখন পথিমধ্যে ঈশ্বর-পুরীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ও পরিচয় ঘটিয়া গেলে তিনি তাঁহাকে মহা আদরে নিমন্ত্রণ করিয়া গৃহে লইয়া যান।

ঈশ্বর-পুরী কয়েক মাস নবদ্বীপে থাকিয়া যান। নন্দন-আচার্যের গৃহে তাঁহার ভিক্ষা নির্বাহ হইত। সেই সময় গৌরাঙ্গ ও গদাধর-পণ্ডিত প্রত্যহ আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইতেন এবং গদাধরের বৈরাগ্যের পরিচয় পাইয়া ঈশ্বর-পুরী তাঁহাকে স্বরচিত পুথি 'কৃষ্ণলীলামৃত' পড়াইয়া শিক্ষাদান করেন। একদিন পুরীশ্বর গৌরহরিকে স্বীয় পুথি দেখাইয়া উহার মধ্যে কোনও দোষ আছে কিনা বাহির করিতে বলিলে গৌরাঙ্গ উত্তর দিলেন যে ভক্ত-কথিত কৃষ্ণকথায় কোনও দোষ থাকিতে পারে না। তাছাড়া,

মূর্খে বোলে 'বিষ্ণায়' 'বিষ্ণবে' বলে ধীর।
দুই বাক্য পরিগ্রহ করে কৃষ্ণবীর॥

ঈশ্বর-পুরী গৌরাঙ্গের ভক্তিপূত অন্তরের পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইলেন। কিন্তু তিনি এতদ্বিষয়ে বিশেষ অনুরোধ জানাইলে একদিন সত্য সত্যই গৌরাঙ্গ তাঁহার ভুল ধরিয়া বসিলেন। তিনি জানাইলেন, 'এ ধাতু আত্মনেপদী নয়।' পুরীশ্বর তখন নানাভাবে বিচার করিতে লাগিলেন এবং অন্যদিন তিনি যখন গৌরাঙ্গকে দেখাইয়া দেন যে উহাকে আত্মনেপদী রূপেও ব্যবহার করা যাইতে পারে, তখন ব্যাখ্যা শুনিয়া গৌরাঙ্গ সন্তুষ্ট হইলেন।

কিন্তু যে কারণে তিনি ঈশ্বর-পুরীর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন, তাহা হইতেছে পুরীর প্রেম ও ভক্তিভাব। 'চৈতন্যচরিতামৃত'-কার জানাইতেছেন যে, নীলাচলপথে মহাপ্রভুর রেমুণা উপস্থিত হইবার পূর্বেই ঈশ্বর-পুরী তাঁহাকে মাধবেন্দ্র-গোপীনাথ বৃত্তান্তটি শুনাইয়াছিলেন। নবদ্বীপে অবস্থানকালেই উভয়ের মধ্যে নানাবিধ আলাপআলোচনার সুযোগ মিলিয়াছিল। সম্ভবত এই সময়েই ঈশ্বরপুরী মাধবেন্দ্রের প্রেমভক্তির দৃষ্টান্ত দিয়া তদাভাসিত সেই উদার ধর্মের ক্ষেত্রে গৌরাঙ্গের লোকোত্তর প্রতিভাকে বিচরণ করিবার জন্য প্রলুব্ধ করিয়া যান।

ইহার পর ঈশ্বর-পুরীর সাক্ষাৎ মেলে গৌরাঙ্গের গয়াগমনকালে, গয়াধামেই। সেই সময় গৌরাঙ্গ পুরীশ্বরকে দেখিয়াই অধীর হন এবং তাঁহার নিকট দীক্ষামন্ত্র প্রার্থনা করেন। ঈশ্বর-পুরী তখন তাঁহাকে দশাক্ষরী গোপালমন্ত্র[৮] এবং উপযুক্ত উপদেশাদি[৯] প্রদান করিয়া তাঁহার জীবনের মোড় ফিরাইয়া দেন।

---

(৭) চৈ. ভা —১।৭, পৃ. ৫২ ; অ. প্র.—১৩ শ. অ , পৃ. ৫২ ; ভ. র.—১২।২২০৬(৮) চৈ. ভা.—১।১২ পৃ.৯০ ; চৈ. ম. (জ.)—পৃ.৩৩ ; তু.—চৈ. স.—পৃ. ৩০-৩১ ; গৌ. বি.—পৃ. ১৪৬-৪৭ ; চৈ. চ. ম.—৪।৫৯ বৈ ব. (দে.)—পৃ ২ (৯)—গৌ. দী. (রামাই)—পৃ. ৫.

ইহার পরেও ঈশ্বর-পুরী কয়েক বৎসর বাঁচিয়াছিলেন এবং খুব সম্ভবত মহাপ্রভুর নীলাচল গমনের অল্পকাল পরেই তাঁহার তিরোভাব ঘটে। সেই সময়ে কাশীশ্বর-ব্রহ্মচারী এবং গোবিন্দ নামে তাঁহার দুইজন শিষ্য ও অনুচর সন্নিকটে উপস্থিত ছিলেন।[১০] এই গোবিন্দ ছিলেন শূদ্র। কিন্তু শূদ্র-ভৃত্যকে 'পরিচারক'রূপে নিয়োজিত করিয়া ঈশ্বর-পুরী উদার ভক্তিধর্মের পথ নির্দেশ করিয়া গেলেন। অন্তর্ধানকালে তিনি কাশীশ্বর এবং গোবিন্দকে উপদেশ দিলেন, তাঁহারা যেন কৃষ্ণচৈতন্যের নিকট গিয়া তাঁহার সেবার্থে নিয়োজিত হন। পরে গোবিন্দ নীলাচলে পৌঁছাইলে মহাপ্রভু গুরুর আদেশ শিরোধার্য করিয়া গোবিন্দকে তাঁহার নিকটতম সেবকরূপে নিযুক্ত করিয়া লন। যে মর্যাদাবোধ মহাপ্রভুর জীবনের একটি প্রধান অবলম্বন ছিল, ঈশ্বর-পুরীর আদেশ-রক্ষার্থ তাহার কথা তিনি চিন্তাও করিলেন না। সার্বভৌম অনুযোগ করিলে তিনি জানাইলেন[১১], "হরেঃ স্বতন্ত্রস্য কৃপাপি তদ্বর্দ্ধতে ন সা জাতিকুলাদ্যপেক্ষাং।" চৈতন্যমহাপ্রভু কর্তৃক এই বিপুল সম্মান প্রদর্শনই ভক্তিধর্ম-প্রবর্তকদিগের মধ্যে ঈশ্বর-পুরীর স্থান নির্দেশ করিয়া দেয়। মহাপ্রভু স্বয়ং ঈশ্বর-পুরীর জন্মস্থান কুমারহট্টে গিয়া অঞ্জলি ভরিয়া সেই স্থানের স্বর্ণধূলি অঞ্চলবদ্ধ করিয়াছিলেন।[১২]

সম্ভবত মথুরাতে যমুনাতীরে 'মাধব-ঈশ্বর-পুরীর' সমাজ বর্তমান ছিল।[১৩] 'পদ্যাবলী'তে ঈশ্বর-পুরী রচিত কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

(১০) তু.—কা. দ্র, পৃ ১; দ্র. —কাশীনাথ পণ্ডিতের জীবনী (১১) চৈ. না—৮।১৮
(১২) চৈ. ভা—১।১২, পৃ ৯০; অ. প্র.—১৪ শ. অ., পৃ. ৫৬ (১৩) কা. দ্র.—পৃ. ৪

প্রথম পর্যায়

নবদ্বীপ

গৌরাঙ্গ-পরিজন

জয়ানন্দ লিখিয়াছেন যে মহাপ্রভুর পূর্বপুরুষগণ উড়িষ্যার অন্তর্গত জাজপুর নামক স্থানে বাস করিতেন। সেখান হইতে তাঁহারা 'রাজা ভ্রমরের ডরে' শ্রীহট্টদেশে চলিয়া যান।[১] ১৩০৪ সালের 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ'-পত্রিকায় নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় 'কবি জয়ানন্দ ও চৈতন্যমঙ্গল' নামক প্রবন্ধে লিখিতেছেন, "কটক জেলার অন্তর্গত গোপীনাথপুর হইতে উৎকলাধিপ কপিলেন্দ্র-দেবের শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে মহারাজ কপিলেন্দ্রদেবের 'ভ্রমর'-উপাধি দৃষ্ট হয়।" আবার রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার History of Orissa নামক গ্রন্থে[২] জানাইয়াছেন, "Kapilendra or Kapilesvara, originally a Mahapatra, obtained the throne in 1435-36 A. D." এবং "As the 2nd. Anka of his (Kapilesvara's) son and successor Purushottama fell in April, 1470, Kapilendra must have died before that date. His latest known date is his 41st. Anka or 33rd. yr.—Sunday, 14th. December, 1466 A. D." তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে মহাপ্রভুর পূর্বপুরুষগণ পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কোনও সময়ে উড়িষ্যা হইতে শ্রীহট্টে উঠিয়া যান। শ্রীহট্টে গিয়া জয়পুর নামক গ্রামে তাঁহারা গৃহাদি নির্মাণ করিয়া বাস করিতে থাকেন। কালক্রমে তাঁহাদের বংশে জগন্নাথ-মিশ্রের উদ্ভব ঘটে। শ্রীহট্টের নীলাম্বর-চক্রবর্তী[৩] তখন সেই স্থানের একজন বিশেষ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তাঁহার গৃহিণীর গর্ভে দুই পুত্র ও এক কন্যা জন্মলাভ করেন।

(১) উ. খ., পৃ. ৯৬ (২) VOL. 1—pp. 289, 303 (৩) চৈ. দী.—গ্রন্থে নীলাম্বরকে চৈতন্যের মামা বলা হইয়াছে (পৃ. ৪)। কিন্তু এই বর্ণনা ভ্রমাত্মক। প্রে. বি. (২৪ শ. বি., পৃ. ২৫৬)-এ তাঁহাকে অদ্বৈতজনক কুবের-আচার্যের ভ্রাতা বলা হইয়াছে। কিন্তু অন্য কোথাও ইহার সমর্থন নাই। বৈ. দ. (পৃ. ৩৫০)—মতে নীলাম্বর-পত্নীর নাম বিলাসিনী। ইহার সমর্থনও কোথাও নাই। সী. চ. (পৃ. ১৮) এবং সী. ক. (পৃ. ৯২) গ্রন্থদ্বয়ে একজন নীলাম্বরের নাম আছে। শচীদেবী এমন কি বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীরও তিরোভাবের পর তাঁহার নাম উল্লেখিত হইয়াছে। কিন্তু দুইটি গ্রন্থই প্রায় পুরাপুরি জাল।

জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ পুত্রের নাম ছিল যথাক্রমে যোগেশ্বর ও রত্নগর্ভ এবং কন্যার নাম শচীদেবী।[৪] শচীদেবীর সহিত পূর্বোক্ত জগন্নাথ-মিশ্রের শুভ-পরিণয় ঘটে এবং নব-দম্পতি সুখে কালযাপন করিতে থাকেন। এমন সময় শ্রীহট্টে অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, চুরি, অনাচার ইত্যাদি দেখা দিলে জগন্নাথ আত্মীয়-স্বজনের সহিত নবদ্বীপে আসিয়া গঙ্গাবাস করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রদ্যুম্ন-মিশ্রের 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী'তে নাকি লিখিত আছে যে নবদ্বীপে আগমনের পরেই শচী-জগন্নাথের শুভ পরিণয় ঘটে। কিন্তু যাহা হউক, নীলাম্বর-চক্রবর্তীও জগন্নাথের সহিত নদীয়ায় আসিয়া[৫] বেলপুকুর বা বেলপুখুরিয়াতে[৬] বাস করিতে থাকেন এবং নবদ্বীপেও তিনি একজন গণ্যমান্য ব্যক্তিরূপে পরিগণিত হইয়া উঠেন। স্বয়ং 'বিশারদের সমাধ্যায়ী' বলিয়া তাঁহার খ্যাতিও হইয়াছিল। সপ্তগ্রামের জমিদার হিরণ্যদাস ও তাঁহার ভ্রাতা গোবর্ধনও তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন।[৭]

জয়ানন্দ বলেন[৮] যে জগন্নাথের বৃদ্ধ-প্রপিতামহ ক্ষীরচন্দ্র ব্যাসতুল্য ব্যক্তি ছিলেন। ক্ষীরচন্দ্রের পুত্র বিরূপাক্ষও ছিলেন কবি। তৎপুত্র রামকৃষ্ণ 'দিগ্বিজয়ী' ছিলেন। রামকৃষ্ণ-তনয় ধনঞ্জয় 'রাজগুরু' হইয়াছিলেন এবং এই ধনঞ্জয়ের পুত্র জনার্দন মিশ্রই ছিলেন জগন্নাথ-মিশ্রের পিতা।[৯] কিন্তু 'চৈতন্যচরিতামৃত' হইতে জানা যায় যে জনার্দন ছিলেন জগন্নাথের ভ্রাতা এবং তাঁহাদের পিতার নাম ছিল উপেন্দ্র-মিশ্র। 'গৌর-গণোদ্দেশদীপিকা'য় এবং 'প্রেমবিলাসে'র চতুর্বিংশ বিলাসে উপেন্দ্রকেই জগন্নাথের পিতা বলা হইয়াছে। শেষোক্ত গ্রন্থে আরও বলা হইয়াছে[১০] যে উপেন্দ্র, রঙ্গদ, কীর্তিদ ও কৃত্তিবাস—ইঁহারা চারি ভ্রাতা ছিলেন; ইঁহাদের পিতা মধু-মিশ্র 'বাৎস্যমুনি-বংশ্য বৈদিক' ব্রাহ্মণ ছিলেন। বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের নামে প্রচলিত 'ভজন-নির্ণয়'-নামক একটি গ্রন্থেও[১১] জগন্নাথকে বৈদিক বিপ্র বলা হইয়াছে। কিন্তু এই সকল বিবরণ কতদূর সত্য তাহা না বলা গেলেও উপেন্দ্র মিশ্রই যে জগন্নাথের পিতা ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারেনা। জগন্নাথের মাতার নাম ছিল সম্ভবত কলাবতী বা কমলাবতী।[১২] উপেন্দ্র শ্রীহট্টের বড়গঙ্গা নামক স্থানে বাস

---

(৪) প্রে. বি—৭ম. বি., পৃ. ৬৯ ; প্রে. বি.-মতে (২৪শ. বি., পৃ. ২৫৬) নীলাম্বরের সর্বকনিষ্ঠা কন্যা সর্বজয়ার সহিত চন্দ্রশেখর-আচার্যের পরিণয় ঘটে। তু.—চৈ না., ১১১-৪ ; চৈ. চ. ম.—৪।২১ (৫) চৈ. ম. (জ.)—ন.খ., পৃ. ৯ ; প্রে. বি., ১ম. বি. পৃ. ৮ (৬) প্রে. বি.—৭ম বি., পৃ. ৬৯ (৭) চৈ চ.—২।১৬, পৃ. ১৯১ ; ৩।৬, পৃ ৩১৯ (৮) পৃ ৮৭—৮৮ (৯) চৈ. স. (পৃ ১০)-গ্রন্থে জগন্নাথের পিতৃনাম নীলকণ্ঠ। (১০) পৃ. ২৪২ (১১) ২য়. ক., পৃ. ২৯ (১২) প্রে. বি.—২৪শ. বি., পৃ. ২৪২ ; ভ. মা.—পৃ. ২৫ ; গৌ. দী.—৩৬ ; বৈ. দ.-গ্রন্থে ইঁহাকে কলাবতী বলা হইয়াছে। নামটি চৈতন্য-চন্দ্রোদয়াবলী হইতে গৃহীত।

করিতেন, কিংবা পরে জয়পুর হইতে সেইস্থানে উঠিয়া গিয়াছিলেন।[১৩] কিন্তু ১৩০৮ সালের 'গৌড়ভূমি'-পত্রিকার আষাঢ়-শ্রাবণ সংখ্যায় রাসবিহারী সাংখ্যতীর্থ মহাশয় লিখিয়াছেন, "গৌড়ব্রাহ্মণ মীমাংসা করেন যে চন্দ্রদ্বীপ ও কোটালিপাড়া গ্রামে চৈতন্যের পূর্বপুরুষ বাস করিতেন, তাহার কোন গ্রাম হইতে জগন্নাথ নবদ্বীপে গঙ্গা-বাস জন্য আগমন করেন। কৃষ্ণদাস (কবিরাজ) ইহাকেই শ্রীহট্ট হইতে আগমন বোধ করিয়াছেন। কারণ গঙ্গাতীরবাসী লোকদিগের ধারণা যে, বাঙ্গালেরা সকলেই শ্রীহট্টবাসী।" আবার 'ভক্তপ্রসঙ্গ'-গ্রন্থের সংকলয়িতা সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় জগন্নাথ-মিশ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র প্রদ্যুম্ন-মিশ্র-কৃত 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী' গ্রন্থের (পৃ. ২৫) বর্ণনানুযায়ী বলিতেছেন, "দত্তরালিতেই জগন্নাথের জন্ম হয়," এবং তাঁহার বর্ণনা হইতে জানা যায় যে গৌরাঙ্গকে গর্ভে ধারণ করিয়া শচীদেবী তাঁহার শ্বশ্রূ কলাবতীর নিবাসস্থল ঢাকাদক্ষিণে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। সুতরাং এই সকল বর্ণনা হইতে নবদ্বীপে আগমনের পূর্বে জগন্নাথ-মিশ্রের নিবাসস্থল সম্বন্ধে সঠিকভাবে কিছু বলা যায় না। তবে তিনি যে শ্রীহট্টবাসী ছিলেন তাহাতে সন্দেহ থাকে না।

'বাসুঘোষের পদাবলী' ও 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা' হইতে জানা যায়[১৪] যে উপেন্দ্র-মিশ্রের সাতজন পুত্র ছিলেন। 'চৈতন্যচরিতামৃতাদি'[১৫] গ্রন্থে তাঁহাদের নাম লিখিত হইয়াছে—কংসারি, পরমানন্দ, পদ্মনাভ, সর্বেশ্বর, জগন্নাথ, জনার্দন ও ত্রৈলোক্যনাথ। তাঁহাদের মধ্যে এক জগন্নাথ ছাড়া আর কাহারও সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানিতে পারা যায় না। জগন্নাথ-মিশ্র পুরন্দর-মিশ্র নামেও খ্যাত ছিলেন। কবিকর্ণপূর বলিয়াছেন[১৬], "নবদ্বীপে জগন্নাথনাম্নো মিশ্রপুরন্দরঃ" এবং কবিরাজ-গোস্বামীও জানাইতেছেন, "জগন্নাথ মিশ্র পদবী পুরন্দর। নন্দ-বসুদেব রূপ সদ্‌গুণ সাগর॥" পূর্বোক্ত 'গৌড়ভূমি'-পত্রিকায় সাংখ্যতীর্থ মহাশয় আরও লিখিয়াছেন যে 'জগন্নাথ মিশ্র বিদ্যাবত্তার জন্য পুরন্দর উপাধি প্রাপ্ত হয়েন।'

বসুদেবের মত জগন্নাথ বহু সন্তানের জনকও ছিলেন। 'চৈতন্যচরিতামৃত-মহাকাব্য, 'চৈতন্যভাগবত,' 'চৈতন্যচরিতামৃত' প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে জানা যায়[১৭] যে শচীদেবী অষ্ট কন্যার জননী হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার কোন কন্যাই বাঁচিয়া থাকেন নাই। আবার লোচনদাস জানাইতেছেন যে শচীদেবী সপ্ত কন্যার জননী হইয়াছিলেন এবং 'বাসু-ঘোষের পদাবলী'তে শচীদেবীর মোট সপ্ত পুত্র এবং 'অদ্বৈতমঙ্গলে' অষ্ট পুত্রের কথা

(১৩) চৈ.কৌ.পৃ.২৪৫ (১৪) বা. প.—পৃ. ১ ; গৌ. দী.—৩৫ (১৫) চৈ. চ —১।১৩, পৃ. ৬০ ; প্রে. বি.—বি. পৃ.২৪শ. ২৪২ (এই গ্রন্থে পরমানন্দের পরেই জগন্নাথের নাম আছে।) (১৬) চৈ. না—১।২৬ (১৭) চৈ. চ. ম.—১।১৭ ; চৈ. ভা.—১।২, পৃ. ১৩ ; চৈ. চ.— ১।১৩, পৃ. ৬১ ; প্রে. বি.—২৪শ. বি., পৃ. ২৪২

লিখিত হইয়াছে।[১৮] শেষোক্ত গ্রন্থ-মতে ছয় পুত্রের মৃত্যুর পর জগন্নাথ-মিশ্র নবদ্বীপে পৌঁছাইলে বিশ্বরূপের জন্ম হয়। এই সকল হইতে শচী-জগন্নাথের অষ্ট কন্যার সম্ভাবনা প্রবল হইলেও সে সম্বন্ধে জোর করিয়া কিছু বলা চলে না। কেবল এইটুকুই বলা চলে যে তাঁহারা অন্তত ছয় সাতটি সন্তানের জনক-জননী ছিলেন। কিন্তু জন্ম-গ্রহণের পর একে একে সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় শচীদেবী পুত্রকামনা করিয়া নিয়তই দেবপূজা ও দেবারাধনায় মগ্ন থাকিতেন। শেষে তাঁহারা একটি পুত্র-সন্তান লাভ করিলেন। সন্তানের নাম রাখা হইল বিশ্বরূপ।

পিতামাতার একমাত্র সন্তান বলিয়া বিশ্বরূপ পরম আদরে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। ছাত্রহিসাবে তাঁহার মেধা খুব তীক্ষ্ণ ছিল। একদিন জগন্নাথ তাঁহাকে বিদ্যাশিক্ষার জন্য নবদ্বীপের ভট্টাচার্য-সভায় লইয়া গেলে পণ্ডিতগণ তাঁহার পূর্বপঠিত শাস্ত্রের সম্বন্ধে জানিতে চাহিলেন। বিশ্বরূপ উত্তর দিলেন যে তিনি সমস্ত বিষয়ের কিছু কিছু শিক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু এইরূপ উক্তি শুনিয়া অধ্যাপকগণ তাঁহাকে শিশুজ্ঞানে ফিরাইয়া দিলেন। ইহাতে জগন্নাথ অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া পথিমধ্যে পুত্রকে চড় মারিয়া বলিলেন, "যে পুঁতি পড়িস বেটা তাহা না বলিয়া। কি বোল বলিলি তুই সভামাঝে গিয়া॥" জগন্নাথ গৃহে চলিয়া গেলে বিশ্বরূপ ভট্টাচার্য-সভায় ফিরিয়া বিদ্যাপরীক্ষা দিতে চাহিলেন। ভট্টাচার্যগণ তাঁহার পঠিত একটি সূত্রের ব্যাখ্যা করিতে বলিলে তিনি ব্যাখ্যা করিয়া সকলকেই চমৎকৃত করিয়া দিলেন। কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার ঐ সূত্রের বিপরীত ব্যাখ্যা করিয়া তিনি সকলের অহংকার চূর্ণ করিয়া গৃহে ফিরিলেন।[১৯]

বিশ্বরূপ কিন্তু শান্তিপুরে অদ্বৈত সকাশে গিয়া পাঠ্যাভাস করিতে লাগিলেন[২০] এবং নিয়মিতরূপে বিদ্যাভ্যাস করিয়া তিনি অচিরেই শাস্ত্রনিপুণ হইলেন। তাঁহার ব্যবহারের মধ্যেও এক স্নিগ্ধ-শ্রী ফুটিয়া উঠিল। ইহার কিছুকাল পূর্বে শচীদেবী পুনরায় ১৪০৭ শকের ফাল্গুনী পূর্ণিমায় যে সন্তান লাভ করিয়াছিলেন[২১] তিনিই জগদ্বরেণ্য গুরু শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন (বাংলার ইতিহাস—২য় ভাগ, পৃ. ২৯১), "বাংলার সুলতান জলালউদ্দীন ফতেশাহের রাজত্বকালে চৈতন্যদেবের জন্ম হইয়াছিল।"

(১৮) চৈ. ম. (লো.)—ম. খ., পৃ. ১৪৬; বা. প.—পৃ. ১; অ. ম.—প. ৫১ (১৯) চৈ. ভা.—২।১২, পৃ. ২১১ (২০) ঐ (২১) অ. ম. (পৃ. ৫১)-মতে বিশ্বরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া গৃহত্যাগ করিবার পর বিশ্বম্ভরের জন্ম হয়, কিন্তু এই বর্ণনা অবিশ্বাস্ত; কোথাও ইহার সমর্থন নাই।

গৌরাঙ্গের জন্মদিনে নবজাতকের অনুপম রূপ ও শুভ লক্ষণাদি দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন। অপরূপ সুন্দর বালকের 'ডাকিনী শাকিনী হৈতে শঙ্কা'র সম্ভাবনা থাকায় বালকের নাম রাখা হইল 'নিমাই'। কেহ কেহ অনুমান করেন যে নিম্ববৃক্ষতলে 'সূতিকাগৃহের ঠাঁই' হওয়ায় ঐরূপ নামকরণ হয়।[২২] যাহা হউক, শচীদেবীর পিতা মহা-জ্যোতির্বিদ বিপ্র নীলাম্বর-চক্রবর্তী নবজাত শিশুর লগ্নকাল গণনা করিয়া জগন্নাথকে গোপনে জানাইলেন :

বত্রিশ লক্ষণ মহাপুরুষ ভূষণ।
এই শিশু অঙ্গে দেখি সে সব লক্ষণ॥
নারায়ণের চিহ্নযুক্ত শ্রীহস্ত চরণ।
এই শিশু সর্বলোকের করিবে তারণ॥

তাঁহার পরামর্শ অনুযায়ী সমারোহ সহকারে বালকের নামকরণ-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইল। নাম রাখা হইল বিশ্বম্ভর। পুত্রের গৌরবর্ণ দেখিয়া জগন্নাথও তাঁহার একটি নাম রাখিলেন—গৌরাঙ্গ।[২৩]

ক্রমে বিশ্বম্ভরের হাতেখড়ি, কর্ণবেধ ও চূড়াকরণ অনুষ্ঠানও সম্পন্ন হইয়া গেল। জয়ানন্দ বলেন,[২৪] "সুদর্শন পণ্ডিত[২৫] সে হাতে খড়ি দিল।" তাঁহার গ্রন্থে বিশ্বম্ভরের বিদ্যাগুরু-হিসাবে কেবলমাত্র সুদর্শন ও গঙ্গাদাসের নাম করা হইলেও[২৬] অন্যান্য অনেক গ্রন্থে বিষ্ণু-পণ্ডিতের নামও উল্লেখিত হইয়াছে। মুরারি-গুপ্ত ও লোচনদাস জানাইয়াছেন[২৭] যে বিশ্বম্ভর প্রথমে বিষ্ণু-পণ্ডিত এবং তাহার পরে সুদর্শন ও গঙ্গা-দাসের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তথাকথিত 'অদ্বৈতপ্রকাশ'-গ্রন্থে গৌরাঙ্গের গুরুবৃন্দের মধ্যে একজন বিষ্ণু-মিশ্রের উল্লেখ আছে।[২৮] আবার বৈষ্ণবদাসের একটি পদমধ্যেও সুদর্শন-গঙ্গাদাসের সহিত বৈদ্য-বিষ্ণুদাসের নাম পাওয়া যায়।[২৯] অবশ্য এইস্থলে ভুলবশত বিষ্ণুদাসকে বৈদ্য বলা হইয়াছে। কিন্তু দেবকীনন্দনের 'বৈষ্ণব-বন্দনা'তেও বিষ্ণু, গঙ্গাদাস ও সুদর্শনের এবং বৃন্দাবনের 'বৈষ্ণববন্দনা'তে সুদর্শন-গঙ্গাদাসের সহিত বিষ্ণুদেবের নাম উল্লেখিত হইয়াছে।[৩০] কবি-কর্ণপূরও তাঁহার 'মহাকাব্য' মধ্যে প্রথমে 'সুপণ্ডিত বিষ্ণু' ও 'হর্ষভাজ সুদর্শনে'র নাম করিয়া

(২২) চৈ. ম.—পৃ. ২২ ; (২৩) অ, প্র.—২০শ. অ., পৃ. ৪৪ (২৪) ন. খ., পৃ. ১৭ ; উ. খ.—পৃ. ১৪৬ (২৫) বৈ, দ.মতে (পৃ. ৩৫০) ইনি 'নবদ্বীপবাসী' ও 'চৈতন্যের পুরোহিত' ছিলেন। কিন্তু আধুনিক গ্রন্থকার কোথা হইতে এইরূপ তথ্য সংগ্রহ করিলেন তাহার উল্লেখ করেন নাই। (২৬) ন. খ., পৃ. ২৪ (২৭) শ্রী চৈ. চ.—১।৯ ; চৈ. ম.—পৃ ৬৫ (২৮) (১২শ. অ., পৃ ৪৮) ১ম. গুরুই গঙ্গাদাস এবং ২য় ও ৩য় গুরু যথাক্রমে বিষ্ণু মিশ্র ও সুদর্শন। কিন্তু এই ক্রম যে ভ্রমাত্মক, পরবর্তী আলোচনায় তাহা জানা যাইবে। (২৯) গৌ. ত.—পৃ. ৩২৫ পৃ (৩০) বৈ. ব. (দে.)—. ২ ; বৈ. ব. (বৃ.)—পৃ. ২

তাহার পরে 'বৈয়াকরণ গঙ্গাদাসে'র নামোল্লেখ করিয়াছেন।[৩১] সুতরাং বিষ্ণু, বিষ্ণুদাস, বিষ্ণুদেব, বিষ্ণু-পণ্ডিত বা বিষ্ণু-মিশ্র যে নামেই অভিহিত হউন না কেন, তিনিও যে বিশ্বম্ভরের একজন বিদ্যাগুরু ছিলেন, মুরারি, কর্ণপূর, দেবকীনন্দনাদির উল্লেখ হইতে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যাইতে পারে। তবে কৃষ্ণদাস-কবিরাজ বা জয়ানন্দের গ্রন্থে তাঁহার নামের অনুল্লেখ হইতে এইটুকু বুঝিতে পারা যায় যে বিশ্বম্ভরের বিদ্যাশিক্ষা ব্যাপারে হয়ত তাঁহার তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল না।

বিশ্বম্ভরের লেখাপড়া চলিতে লাগিল। কিন্তু জগন্নাথ ও শচীদেবীকে আশৈশব-দুরন্ত দামাল ছেলের জন্য সর্বদাই উৎকণ্ঠিত থাকিতে হইত; কখন কি এক অসম্ভব বায়না করিয়া বসিবেন বা অন্য কোন দিক দিয়া কি বিপদ বাধাইয়া তুলিবেন! একবার বিশ্বম্ভর কাঁদিয়া আকুল হইলেন: জগদীশ-পণ্ডিত ও হিরণ্য-পণ্ডিত নামক প্রতিবেশী ভাগবতদ্বয় একাদশীর উপবাসান্তে বিষ্ণুপূজার জন্য যে নৈবেদ্য প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা তাঁহাকে ভক্ষণ করাইতে হইবে। জগন্নাথের সহিত সেই বিপ্রদ্বয়ের বিশেষ সদ্ভাব ছিল। তাঁহার একান্ত অনুরোধে তাঁহারা বিশ্বম্ভরের জন্য সেই নৈবেদ্য অর্পণ করিলে তবে বালক তাহা ভক্ষণ করিয়া শান্ত হইয়াছিলেন।

জগন্নাথ ছিলেন নবদ্বীপের একজন বিশেষ সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত ব্যক্তি। স্বয়ং বিশারদ এবং সার্বভৌমও তাঁহাকে মান্য করিতেন।[৩২] বিশিষ্ট লোকদিগের সহিত তাঁহার আদান-প্রদান ও উঠা-বসা ছিল। তাঁহাদিগের নিকট হইতে স্বীয় পুত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হইলে তাহা বড়ই পরিতাপের বিষয় হইবে। কিন্তু বিশ্বম্ভরেরর সেদিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র ছিল না। পথচারী মানুষ, স্নানরত বালক-বালিকা, পূজার্থী-ভক্ত, যখন যেখানে যাঁহাকে দেখিতে পান, তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলেন, তাঁহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়া দেন, তাঁহার নিকট খাদ্য বা অন্য কোন সামগ্রী থাকিলে তাহা কাড়িয়া লন। ব্রাহ্মণ-দম্পতী পুত্রের দুরন্তপনায় অস্থির হইয়া তাঁহাকে কখনও রজ্জুবদ্ধ করিয়া রাখিতে যান, কখনও বা যষ্টি লইয়া মারিতে উদ্যত হন। কিন্তু কাজেকর্মে কথাবার্তায় ও চাতুরীতে কোনমতেই তাঁহার সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারেন না। ছেলেকে লইয়া পিতামাতার যেন আর দুর্ভোগের অন্ত নাই। অথচ কী এক গভীর আকর্ষণে তাঁহার প্রতি তাঁহাদের সোহাগ যেন উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলে।

(৩১) ৩।২-৩ (৩২) চৈ. চ,—২।৬, পৃ. ১১১

নিমাইচন্দ্র কিন্তু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার একান্ত অনুগত ছিলেন। বিশ্বরূপ তখন শাস্ত্রবিদ্ হইয়া বিদ্বৎসমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার ধর্মব্যাখ্যা শুনিয়া সকলেই চমৎকৃত হন। নিমাইও মধ্যে মধ্যে তাহা শুনিতে থাকেন এবং জ্যেষ্ঠের কৃষ্ণভক্তি ক্রমাগত তাঁহার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে। মাতুল যোগেশ্বর-পণ্ডিত বা রত্নগর্ভ-পণ্ডিতের পুত্র[৩৩] লোকনাথ-পণ্ডিতও বিশ্বরূপের অনুরক্ত ও ঘনিষ্ঠ সঙ্গী-হিসাবে তাঁহার নিকট অবস্থান করিতেন। উভয়ে একস্থানে বিদ্যাভ্যাস করিতেন[৩৪] এবং উভয়ের মধ্যে নানারূপ তত্ত্বালোচনা চলিত। কিন্তু শৈশব হইতেই বিশ্বরূপ ধন-জন, বিষয়-আশয় ও পার্থিব সকল বস্তুতে নিস্পৃহ হওয়ায় পিতামাতার মনে উদ্বেগের সীমা ছিল না। ষোড়শ-বর্ষ বয়ঃক্রমকালে[৩৫] পুত্র যৌবনে প্রবিষ্ট হইলে[৩৬] তাঁহারা তাঁহার বিবাহের জন্য উদ্‌যোগী হইলেন। কিন্তু বিশ্বরূপ সমস্ত বুঝিতে পারিয়া একদিন অতিশয় গোপনে গৃহত্যাগপূর্বক সন্ন্যাসধর্ম[৩৭] অবলম্বন করিয়া দক্ষিণাভিমুখে[৩৮] প্রয়াণ করিলেন।[৩৯] পিতামাতার মস্তকে যেন বজ্র ভাঙিয়া পড়িল। বিশ্বরূপের সন্ন্যাসাশ্রমের নাম হইল শংকরারণ্য। লোকনাথ-পণ্ডিতও তাঁহার সেবকরূপে সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন।[৪০] অল্পকাল পরেই[৪১] দক্ষিণদেশস্থ পাণ্ডুপুর তীর্থে[৪২] শংকরারণ্যের সিদ্ধিপ্রাপ্তি ঘটিল।[৪৩]

বালক বিশ্বম্ভর পিতামাতাকে আশ্বাস দিলেন[৪৪] যে বিশ্বরূপ সন্ন্যাস লইয়া 'পিতৃকুল মাতৃকুল দুই উদ্ধারিল ॥' কিন্তু 'আমি ত করিব তোমা দুঁহার সেবন।' তিনি জানাইলেন যে বিশ্বরূপ তাঁহাকে সন্ন্যাস-গ্রহণের পরামর্শ দিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি উত্তর দিয়াছিলেন যে তিনি বালকমাত্র, সন্ন্যাসের কিই বা বুঝেন, তাঁহার 'অনাথ পিতামাতা' রহিয়াছেন, গৃহস্থ হইয়া তাঁহাদের সেবা করিলেই লক্ষ্মী-নারায়ণ সন্তুষ্ট হইবেন। শিশুপুত্রের

---

(৩৩) সম্ভবত তিনি যোগেশ্বরের পুত্র ছিলেন এবং লোকনাথের পুত্র ছিলেন কৃষ্ণানন্দ, শ্রীজীব ও যদুনাথ। (দ্র.—কবিচন্দ্র) (৩৪) প্রে. বি.—৭ম. বি., পৃ. ৬৯ (৩৫) শ্রীচৈ. চ.—১ম. প্রক্রম; চৈ. ম.—আ. খ., পৃ. ৫৫; ভ. র.—১২।১১৪২ (৩৬) চৈ. চ—১।১৫, পৃ. ৬৬; ব. শি.—পৃ. ১৬২ (৩৭) জয়ানন্দ (চৈ. ম.—পৃ. ২০)-মতে বিশ্বরূপও কেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। কিন্তু প্রে. বি. মতে (২৪শ. বি., পৃ. ২৪২) তাঁহার দীক্ষাগুরু ছিলেন ঈশ্বরপুরী। অ. ম. (পৃ. ৫১) হইতে জানা যায় যে বিশ্বরূপ পৌগণ্ড-বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। (৩৮) চৈ. চ.—২।৭, পৃ. ১২০ (৩৯) জয়ানন্দ (পৃ. ২০) বলিয়াছেন যে বিশ্বরূপ গঙ্গাপার হইয়া কাটোয়ায় গিয়া কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। (৪০) প্রে. বি.—৭ম. বি., পৃ. ৬৯ (৪১) 'অষ্টাদশবর্ষ বয়সে'—শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ চরিত (১ম. খণ্ড, পৃ. ৮৫)—জানকীনাথ পাল। (৪২) দ্র.—মাধবেন্দ্রপুরী (৪৩) প্রে. বি.—৭ম. বি., পৃ.৬৯; চৈ. চ.—২।৯, পৃ. ১৪৪; বৈষ্ণবদিগ্‌দর্শনীর গ্রন্থকার লিখিয়াছেন (পৃ. ২৬) "পুনানগরের নিকট পাণ্ডুপুর গ্রামে বিশ্বরূপ অতি আশ্চর্যরূপে অদর্শন হয়েন।" কিন্তু গ্রন্থকারের এইরূপ সংবাদপ্রাপ্তির উৎস সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। (৪৪) চৈ. চ.—১।১৫, পৃ ৬৬

এইরূপ উক্তিতে মাতাপিতা আপাতত কিছুটা সান্ত্বনাপ্রাপ্ত হইলেন বটে, কিন্তু বিশ্বম্ভরের মধ্যেও একটি বিরাট পরিবর্তন দেখা দিল। অগ্রজের গৃহত্যাগের পর তিনি শান্ত আকার ধারণ করিলেন। কোথায় গেল তাঁহার পূজার্থিনীদের নিকট হইতে বলপূর্বক চাল-কলা-নৈবেদ্য কাড়িয়া খাওয়া, বা মাতার সহিত ঝগড়া করিয়া গৃহের সমস্ত বস্তু ও মৃন্ময়-ভাণ্ডাদি ভাঙিয়া চুরিয়া লণ্ডভণ্ড করা! কোথায় গেল তাঁহার পুনঃ পুনঃ অতিথি-বিপ্রের অন্ন খাইয়া বার বার তাঁহার ভোজনেচ্ছাকে পণ্ড করিয়া দেওয়া, কিংবা সুকৌশলে পিতাকে প্রতারিত করিয়া গঙ্গার ঘাটে গিয়া স্নানার্থী বালক-বালিকাদিগের উপর জোর-জুলুম করা! এক সময় তিনি বিজ্ঞ ব্যক্তির মত অভিমত প্রকাশ করিয়া ও বায়না ধরিয়া শচীমাতাকে একাদশী ব্রত করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন, আর এক সময় তিনি সন্দেশ ফেলিয়া মাটি ভক্ষণ করিয়াছিলেন এবং সন্দেশ ও মৃত্তিকার একত্ব সম্বন্ধে মাতাকে শিক্ষাদান করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন তাঁহার সমস্ত দুরন্তপনা বা বাচালতা যেন কোথায় চলিয়া গেল। পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া পড়শীদিগকে উত্ত্যক্ত করাই যাঁহার কাজ ছিল, তিনি এখন সর্বক্ষণ স্বগৃহে থাকিয়া পুস্তকে মনোনিবিষ্ট হইলেন। পিতামাতাকে ছাড়িয়া আর কোথাও যাইতে চাহেন না, বা 'তিলার্ধেকো পুস্তক ছাড়িয়া নাহি নড়ে।' শচীদেবী কিছুটা আশ্বস্ত হইলেন; কিন্তু জগন্নাথ আরও চিন্তিত হইয়া পড়িলেন: বিশ্বরূপও তো এইভাবে সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়া সংসারকে অসত্য বলিয়া জানিতে শিখিয়াছিলেন। বিশ্বম্ভরের জীবনেও বিদ্যার তদনুরূপ প্রভাব কল্পনা করিয়া তিনি তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা বন্ধ করিয়া দিলেন। শচীদেবী অনেক অনুরোধ করিয়া জানাইলেন যে জগন্নাথের ঐ প্রকার ভয় অহেতুক, মূর্খ হইয়া থাকা একটা অভিশাপ; তাছাড়া, 'মূর্খেরে তো কন্যাও না দিব কোন জনে।' মিশ্র জানাইলেন যে শচীর ধারণাও অমূলক। পাণ্ডিত্যের যথার্থ সমাদর থাকিলে মূর্খের গৃহে পণ্ডিত-সভা বসিত না। 'পড়িয়াও আমার ঘরে নাহি কেনে ভাত।' আর বিবাহাদির ব্যাপারে মানুষের কোন হাত নাই। কৃষ্ণেচ্ছায় যাহা হইবার তাহাই হইবে।

বৃন্দাবনদাসের উপরোক্ত উক্তি[৪৫] পাঠ করিয়া সহজেই ধারণা জন্মায় যে জগন্নাথ-মিশ্র দরিদ্র ছিলেন।[৪৬] অবশ্য নিমাই-পণ্ডিত যে বিদ্যাদান নিমিত্ত পূর্ববঙ্গে গমন করিয়াছিলেন, দারিদ্র্যই তাহার প্রধান কারণ কিনা, একথা কোথাও স্পষ্ট

(৪৫) চৈ. ভা.—১।৫, পৃ. ৩৩ (৪৫) আধুনিক গ্রন্থকারদের অনেকেই এই মত পোষণ করেন: অমিয় নিমাই চরিত, ১ম. খণ্ড, পৃ. ৩০; উমেশচন্দ্র বটব্যাল—সাহিত্য, অগ্রহায়ণ ১৩০২, অগ্রহায়ণ ১৩০৩ ও পাদটীকা

করিয়া উল্লেখিত হয় নাই। তবে 'চৈতন্যভাগবত'-কার তাঁহার পূর্ববঙ্গ-ভ্রমণ ও বিদ্যাদানের সহিত 'অর্থ-বিত্তে'র কথা উল্লেখ করিয়া বহুবিধ 'উপায়ন'সহ তাঁহার গৃহ-প্রত্যাবর্তনের আভাস দান করিয়াছেন এবং 'চৈতন্যচরিতামৃত'-কার স্পষ্টই বলিয়াছেন:

ঘরে আইলা প্রভু লঞা বহু ধনজন।
তত্ত্ব কহি কৈলা শচীর দুঃখ বিমোচন॥

কিন্তু এই সমস্ত উক্তি হইতে মিশ্র-পরিবারের দারিদ্র্যের সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে জানিতে না পারা গেলেও বৃন্দাবনের পূর্বোক্ত উল্লেখ হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে জগন্নাথ পণ্ডিত-ব্যক্তি হইলেও তাঁহার 'ঘরে ভাত' ছিল না, বা তাঁহার সচ্ছলাবস্থা ছিল না। প্রকৃতই যে জগন্নাথ দরিদ্র ছিলেন, এ সম্বন্ধে বৃন্দাবনের কোনও সংশয় ছিলনা। 'শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র জন্ম বর্ণনা পরিচ্ছেদ-মধ্যে তিনি লিখিয়াছেন।[৪৭]

শুনি জগন্নাথ মিশ্র পুত্রের আখ্যান।
আনন্দে বিহ্বোল বিপ্রে দিতে চাহে দান॥
কিছু নাহি সুদরিদ্র, তথাপি আনন্দে।
বিপ্রের চরণে ধরি মিশ্র চন্দ্র কান্দে॥

এই বর্ণনায় জগন্নাথকে কৃপণ বলিয়া না মনে করিলে দরিদ্রই ধরিতে হয়। বৃন্দাবন অন্যত্র লিখিয়াছেন[৪৮]:

দেখি শচী-জগন্নাথে বড়ই বিস্মিত।
নির্ধন তথাপি দোঁহে মহা আনন্দিত॥

আবার বিশ্বম্ভর লক্ষ্মীদেবীকে বিবাহ করিয়া আনিবার পরে শচীদেবী বলিতেছেন:

পূর্বপ্রায় দরিদ্রতা দুঃখ এবে নাঞি॥

বৃন্দাবনদাসের এই সমস্ত উল্লেখ দ্ব্যর্থহীন। কবিকর্ণপূর কিন্তু স্বয়ং বিশ্বম্ভরের মুখ দিয়াই তাঁহার দারিদ্র্যের ঘোষণা করাইয়াছেন। লক্ষ্মীদেবীকে বিবাহ করিয়া আনিবার পর শচীদেবী বৈধব্য নিবন্ধন ব্রাহ্মণ-পত্নীদিগকে উপহারাদি লইয়া মঙ্গলকার্য নিমিত্ত আহ্বান জানাইলে বিশ্বম্ভর বলিয়াছিলেন যে তাঁহার ধনজন নাই বলিয়াই শচীদেবী ঐরূপ উক্তি করিলেন! বিশ্বম্ভর বলিতেছেন[৪৯]: "ধনানি কিংবা মনুজা ন সন্তি মে"। এই সমস্ত হইতে মিশ্র-পরিবারের দারিদ্র্য সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কারণ থাকেনা। অন্তত এইটুকু বলা চলে যে প্রথমের দিকে তাঁহারা 'সুদরিদ্র' না হইলেও তাঁহাদের অবস্থা সচ্ছল ছিলনা।

যাহা হউক, লেখাপড়া বন্ধ হইয়া যাওয়ায় বিশ্বম্ভর আবার বাঁকিয়া বসিলেন। আবার পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া যাঁহার যাহা পাইলেন ভাঙিয়া চুরিয়া অপচয় করিয়া

(৪৭) ১।২, পৃ. ১৭ (৪৮) চৈ. ভা.।—১।৩, পৃ. ২০ (৪৯) চৈ. চ. ম.—৩।৫৪

সকলকেই ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। রাত্রিকালেও কোনদিন বাড়ী ফেরেন না। একদিন তিনি পথের উপর পরিত্যক্ত অশুচি হাঁড়ির মধ্যে গিয়া বসিয়া রহিলেন। শেষে শচীদেবী ও প্রতিবেশিগণের অনুরোধ রক্ষার্থ জগন্নাথ একটি শুভদিনে বিশ্বম্ভরকে যজ্ঞসূত্র দিয়া নবদ্বীপের অধ্যাপক-শিরোমণি গঙ্গাদাস-পণ্ডিতের গৃহে বিদ্যাশিক্ষার্থ অর্পণ করিয়া আসিলেন।

নিমাই অল্পকাল মধ্যেই 'সটীক কলাপ' ব্যাকরণে[৫০] মহাপণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু প্রকৃত পণ্ডিত ও মহাজ্ঞানী হইয়া পুত্র যে একদিন পিতামাতার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া চলিয়া যাইবেন, সে সম্বন্ধে জগন্নাথ দৃঢ়প্রত্যয় হইলেন এবং তাহা একদিন শচীদেবীর নিকট খুলিয়াও বলিলেন। কিন্তু তাঁহাকে আর এইরূপ মর্মান্তিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করিতে হইলনা। জ্বরে আক্রান্ত হইয়া একদিন তিনি ইহধাম ত্যাগ করিলেন। 'চৈতন্যচরিতামৃতমহাকাব্য' হইতে জানা যায়[৫১] যে জগন্নাথ জরাগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। কিন্তু 'গৌরাঙ্গবিজয়ে' লিখিত হইয়াছে,[৫২] বিশ্বরূপ সন্ন্যাস-গ্রহণ করিলে জগন্নাথ সেই শোক সহ্য করিতে না পারিয়া পরলোকে যাত্রা করেন।

পিতৃহীন পুত্রের বেদনা লাঘবার্থ শচীদেবী নিজেকে সংযত করিলেন। কালের পদক্ষেপে সমস্তই আবার স্বাভাবিক হইয়া আসিল। বিশ্বম্ভর আবার তাঁহার পাঠে মনোযোগী হইলেন।

ক্রমে বিশ্বম্ভরের বিবাহকাল উপস্থিত হইল। একদিন বনমালী-আচার্য[৫৩] আসিয়া শচীদেবীর নিকট পুত্রের বিবাহ-সম্বন্ধ উত্থাপন করিলেন। ইতিপূর্বে নবদ্বীপের বল্লভ-আচার্যের[৫৪] কন্যা লক্ষ্মীদেবী একদিন দেবতাপূজার জন্য গঙ্গাস্নানে আসিলে বিশ্বম্ভর ও লক্ষ্মীদেবী পরস্পরকে দেখিয়া আকৃষ্ট হন[৫৫] এবং তাঁহাদের 'সাহজিক প্রীতি' জন্মাইল; বিশ্বম্ভরের ইচ্ছানুযায়ী লক্ষ্মীদেবী তাঁহাকেই দেবতাজ্ঞানে পূজা করিয়া ফিরিয়া যান।[৫৬] 'চৈতন্যচরিতামৃতমহাকাব্যে' লিখিত হইয়াছে[৫৭] যে গৌরাঙ্গ তখন বনমালী-আচার্যের গৃহে শাস্ত্রাদি আলোচনার পর প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন। তাহাতে মনে হয় যে বিপ্র বনমালী-আচার্যও সম্ভবত সেইস্থানে উপস্থিত ছিলেন[৫৮] এবং তিনি উভয়ের অন্তরের কথা বুঝিতে পারিয়া শচীমাতার নিকট লক্ষ্মীদেবীকেই বিশ্বম্ভরের পাত্রীরূপে

(৫০) চৈ. ম. (জ)—ন. খ., পৃ. ১৮ (৫১) ২।১১৭—২২ (৫২) পৃ. ১৩১ (৫৩) চৈ. স.-তে (পৃ.২৩) ইঁহাকে দ্বিজ-বনমালী বলা হইয়াছে। (৫৪) বল্লভ মিশ্র—চৈ. স. (পৃ. ২৩) (৫৫) চৈ. ভা.—১।৭ পৃ. ৪৮, চৈ.চ. ম.—৩।৬—১১ ; চৈ. ম. (লো.)-আদি, পৃ. ৬৫ (৫৬) চৈ. চ.—১।১৫, পৃ. ৬৫ (৫৭) ৩।৫ (৫৮) চৈ. ম. (লো.)—আদি,পৃ. ৬৫

নির্বাচন করিয়াছিলেন। কিন্তু শচীমাতার ইচ্ছা ছিল তাঁহার পিতৃহীন বালক 'জীউক পঢ়ুক আগে তবে কার্য আর।' সুতরাং মাতার অনিচ্ছা দেখিয়া আচার্য বিরূপ মনে ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু পথে বিশ্বম্ভরের সহিত দেখা হওয়ায় তিনি তাঁহার নিকট স্বীয় মনঃকষ্টের কথা জানাইলে বিশ্বম্ভর গৃহে ফিরিয়া মাতাকে বলিলেন, "আচার্যের সম্ভাষা না কৈলে ভাল কেনে?" শচীমাতা পুত্রের ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া বনমালীকে ডাকাইয়া পূর্বোক্ত প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলেন। শুভদিনে লক্ষ্মীদেবীর সহিত বিশ্বম্ভরের বিবাহ হইয়া গেল।

শচীদেবী নববধূকে পাইয়া পরিতৃপ্ত হইলেন। আশৈশব ভক্তিমতী লক্ষ্মীদেবী শ্বশ্রূ- ও পতি-সেবায় তৎপর হইলেন। কিছুকাল পরে নিমাইচন্দ্র পণ্ডিত হইয়া নবদ্বীপে অধ্যাপনা আরম্ভ করিলেন। শিষ্যগণকে লইয়া অধ্যাপনা, গঙ্গাস্নান ও বিষ্ণুপূজা ইত্যাদির মধ্য দিয়া তাঁহার দিনগুলি পরমানন্দে অতিবাহিত হইতে লাগিল। লক্ষ্মীদেবী তাঁহার পরিচর্যা ও চরণসেবাদির দ্বারা তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করেন। আবার মধ্যে মধ্যে অতিথি ও ভক্তবৃন্দ পৌঁছাইলে পতিব্রতা পত্নী তাঁহাদিগের জন্য একাকী রন্ধনাদি সম্পন্ন করিয়া এবং তাঁহাদিগকে যথাযথভাবে আপ্যায়িত করিয়া পতির সন্তোষ বিধান করিতেন।

কিছুকাল পরে নিমাই পদ্মাপারে বঙ্গদেশে গমন করেন। 'প্রেমবিলাসে'র চতুর্বিংশ বিলাসে লিখিত হইয়াছে[৫৯] যে বিশ্বম্ভর সেই সময়ে শ্রীহট্টের বড়গঙ্গা নামক গ্রামে গিয়া পিতামহ উপেন্দ্র-মিশ্র ও তৎপত্নী কলাবতীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। আবার 'ভক্ত প্রসঙ্গ' (২য় খণ্ড)-গ্রন্থের রচয়িতা 'শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যোদয়াবলী'-গ্রন্থের বর্ণনানুযায়ী বলিতেছেন (পৃ ২৫), "যে গর্ভে চৈতন্যের জন্ম হয়, সেই গর্ভাবস্থায় শচীদেবী এইস্থানে [দত্তরালিতে] ছিলেন, পরে নবদ্বীপে আসেন। উপেন্দ্র-মিশ্রের পত্নী কলাবতী শচীদেবীকে বলিয়া দিয়াছিলেন যে, তাঁহার সে গর্ভের পুত্র যেন একবার ঢাকাদক্ষিণে আসে। সে কথা গৌরাঙ্গ মাতার মুখে শুনিয়াছিলেন। পিতামহীর বাক্যরক্ষা বোধ হয় তাঁহার পূর্ববঙ্গে আগমনের অন্যতম হেতু।" আশ্চর্যের বিষয়, ঐ একই গ্রন্থের প্রমাণবলে অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয় তাঁহার 'শ্রীগৌরাঙ্গের পূর্বাঞ্চল ভ্রমণ'-নামক গ্রন্থে (পৃ ৫৪) লিখিয়াছেন যে মহাপ্রভু তাঁহার সন্ন্যাস-গ্রহণের পরেও শ্রীহট্টের বুরুঙ্গা ও ঢাকাদক্ষিণ স্থানে গিয়া তাঁহার পিতামহী শোভাদেবীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন

---

(৫৯) পৃ. ২৪৪-৪৬ ; গ্রন্থমতে তৎকালে একদিন উপেন্দ্র-মিশ্র 'চণ্ডী' লিখিবার জন্য তালপাতা লইয়া বসিলে পত্নী কলাবতী তাঁহাকে গৃহাভ্যন্তরে লইয়া গিয়া স্বীয় স্বপ্ন বৃত্তান্ত অনুযায়ী জানান যে বিশ্বম্ভরই সাক্ষাৎ নারায়ণ। উপেন্দ্র বাহিরে আসিয়া দেখিলেন 'চণ্ডী' লেখা শেষ হইয়া গিয়াছে। তিনি পৌত্রকে অভ্যন্তরে লইয়া গেলে কলাবতী তাঁহাকে কাঁঠাল ভক্ষণ করান এবং বৃদ্ধ-দম্পতির অনুরোধে বিশ্বম্ভর তাঁহাদিগকে নারায়ণের মধুর মূর্তি প্রদর্শন করেন।—প্রেমবিলাসোক্ত এইরূপ গল্প অন্য কোথাও নাই।

এবং তিনি ঐ সময়ে পূর্ববঙ্গ ভ্রমণান্তে আসামেও গিয়াছিলেন। প্রমাণস্বরূপ তিনি অবশ্য 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী'র সহিত 'শ্রীচৈতন্যরত্নাবলী,' 'রসতত্ত্ববিলাস,' ও 'শ্রীচৈতন্যবিলাসাদি'র উল্লেখ করিয়াছেন (পৃ ৪০-৫৫)। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় মনে করেন ('অমিয় নিমাই চরিত'—৩য় খণ্ড, পৃ ৪৫) যে সন্ন্যাস-গ্রহণান্তে নিমাইও মাতার প্রতিজ্ঞা পালনার্থে এক দেহ শান্তিপুরে রাখিয়া অন্য দেহ ধরিয়া অন্তরীক্ষে শ্রীহট্টে গমন করিয়া পিতামহীকে দর্শন দিয়াছিলেন। কিন্তু কোনও প্রামাণিক গ্রন্থেই কোনও প্রসঙ্গে মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণানন্তর পূর্ববঙ্গ বা আসাম-ভ্রমণের উল্লেখমাত্র দৃষ্ট হয় না। তবে তিনি সন্ন্যাস-গ্রহণের পূর্ববর্তিকালে যে পূর্ববঙ্গ ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ প্রায় সর্বত্রই আছে। ১২৮২ সালের 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার পৌষ-সংখ্যায় 'চৈতন্য' নামক প্রবন্ধে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে চৈতন্যের পূর্ববঙ্গ ভ্রমণকালে 'শাদির্খাঁরদিয়াড় অথবা মিরগঞ্জই তাঁহার বঙ্গদেশে অবস্থানের স্থান বলিয়া বোধ হয়।'

গৌরাঙ্গের পূর্ববঙ্গ গমন করিবার পর একদিন লক্ষ্মীদেবী যখন রাত্রিকালে শচীমাতার নিকট পালঙ্কে নিদ্রিতা ছিলেন সেই সময় রাত্রিশেষে একটি বিষধর সর্প আসিয়া তাঁহার দক্ষিণ পদের কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে দংশন করে।[৬০] মহাভীতিযুক্তা শচীদেবী 'জাঙ্গলিক'দিগকে ডাকাইয়া বধূকে বাঁচাইবার জন্য সমস্ত প্রকারের প্রচেষ্টা করিলেন।[৬১] কিন্তু কিছুই হইল না। লক্ষ্মীদেবী ইহধাম পরিত্যাগ করিলেন। নিমাই গৃহে ফিরিয়া ভবিতব্যের কথা স্মরণ করিয়া পুনরায় মাতাকে আশ্বস্ত করিলেন।

নিমাই পণ্ডিত আবার অধ্যয়ন-অধ্যাপনা আরম্ভ করিলেন। পার্শ্ববর্তী মুকুন্দ-সঞ্জয়ের গৃহে বসিয়া তিনি পড়ুয়াবৃন্দকে শিক্ষাদান করিতে থাকেন। গঙ্গাস্নান, বিষ্ণুপূজা ইত্যাদি প্রাত্যহিক কর্তব্য সম্পাদনার্থ অল্প সময় ব্যতিরেকে তিনি সর্বদা অধ্যাপনা-কার্যে রত থাকেন। রাত্রিকালে বাড়ী ফিরিয়া আসিতেও তাঁহার মধ্যরাত্রি হইয়া যায়, শচীমাতাকে একাকী অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয়। শেষে পুত্রের এইরূপ ক্রমোবর্ধমান ঔদাসীন্য লক্ষ্য করিয়া তিনি পুনরায় তাঁহার বিবাহার্থ উদ্যোগী হইলেন।

ইতিপূর্বে গঙ্গাস্নানে গিয়া তিনি নবদ্বীপের সনাতন-পণ্ডিতের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়াকে[৬২]

(৬০) চৈ. ম. (জ.)—ন. খ., পৃ. ৪৮ (৬১) শ্রীচৈ. চ.—১।১১ ; গৌ. ত.—পৃ. ৬৪ ; চৈ.চ ম.—৩।১০২-৩ চৈ. ম. (লো.) আ. খ., পৃ, ৮০ (৬২) ১২৮২ সালের 'বঙ্গদর্শন'—পত্রিকার মাঘ-সংখ্যায় 'চৈতন্য' নামক একটি প্রবন্ধে প্রবন্ধকার লিখিতেছেন যে চৈতন্যের প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় পত্নীর নামই 'লক্ষ্মী' এবং 'শ্রীচৈতন্য বিষ্ণুর অবতার' বলিয়া, কিংবা বিবাহের পূর্বে সনাতন-সুতা 'বিষ্ণুপ্রীতি কামনাতে রতা হইয়াছিলেন' বলিয়া, তিনি বিষ্ণুপ্রিয়া-নাম প্রাপ্ত হন। এইরূপ ব্যাখ্যা অবশ্য বড় একটা শুনিতে পাওয়া যায় না।

দেখিয়াছিলেন। বিষ্ণুভক্ত বালিকার ধীর- ও নম্র-স্বভাব এবং তাঁহার নিজের প্রতি সনমস্কার সম্ভ্রম-প্রদর্শন শচীদেবীকে মুগ্ধ করিয়াছিল। তাঁহার পিতা সনাতনও কুলে-শীলে সর্ববিষয়ে একজন যোগ্য ব্যক্তি। তাঁহার পিতার নাম ছিল সম্ভবত দুর্গাদাস-মিশ্র[৬৩] এবং মাতার নাম ছিল বিজয়া।[৬৪] তাঁহার পদবী ছিল 'রাজপণ্ডিত' এবং তিনি পরম বিষ্ণুভক্ত ও সদাচারসম্পন্ন, পরোপকারী, সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। শচীদেবী সনাতন ও তৎপত্নী মহামায়ার[৬৫] একমাত্র[৬৬] কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকেই বিশ্বম্ভরের যোগ্যা পাত্রীরূপে নির্ধারিত করিয়া নবদ্বীপস্থ[৬৭] কাশীনাথ-পণ্ডিতকে কথা পাড়িতে বলিলেন। দ্বিজ কাশীনাথ-মিশ্র[৬৮] রাজপণ্ডিত-সনাতনের নিকট প্রস্তাব জ্ঞাপন করিলে সকলেই প্রীত হইলেন।

ক্রমে ক্রমে সারা নবদ্বীপে সেই বার্তা রটিয়া গেল। নিমাই পণ্ডিতের শিষ্যগণ সকলেই উদ্‌যোগী হইলেন। বুদ্ধিমন্তখান[৬৯] জানাইলেন যে তিনিই বিবাহের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিবেন এবং 'বামনিঞামতে এ বিবাহ' হইতে দিবেন না, রাজকুমারের মত নিমাই-পণ্ডিতের বিবাহ হইবে। তদনুযায়ী মহা ধুমধামের সহিত বিবাহ হইয়া গেল।[৭০] পরে এই বুদ্ধিমন্ত তাঁহার বন্ধু মুকুন্দ ও সঞ্জয়ের সহিত গৌরাঙ্গের নবদ্বীপ-লীলাসঙ্গী হইয়াছিলেন। চন্দ্রশেখর-গৃহে অভিনয়কালে তিনি গৌরাঙ্গের আজ্ঞায় 'কাচ সজ্জ' করিয়াছিলেন।[৭১] মহাপ্রভুর নীলাচলাবস্থিতি-কালেও তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। এক্ষণে বিবাহান্তে এই বুদ্ধিমন্ত বিশ্বম্ভর কর্তৃক সম্মানিত ও আলিঙ্গনাবদ্ধ হইয়া কৃতার্থ হইলেন। কিছুকাল পরে নিমাই পিতৃপিণ্ডদান করিবার জন্য গয়া গমন করিলে সেই স্থানে তাঁহার কৃষ্ণদর্শন ঘটে। তদবধি তাঁহার জীবনের এক বিরাট পরিবর্তন সংসাধিত হইয়া যায়। গৃহে ফিরিয়া তিনি আত্মতন্ময়ভাবে কৃষ্ণান্বেষণ ও কৃষ্ণগুণগানে বিভোর হইলেন। তাঁহার আর সে চাঞ্চল্য নাই, বিদ্যাপ্রকাশের ইচ্ছাও নাই; সর্বদা যেন কোন এক হারান বস্তুর সন্ধানে উন্মত্তবৎ আচরণ করেন এবং বিষ্ণুগৃহের দুয়ারে একাকী বসিয়া থাকেন। বিষ্ণুপ্রিয়া-

(৬৩) প্রে. বি.-মতে (২৪শ. বি., পৃ. ২৪০) সনাতন বৈদিক ব্রাহ্মণ দুর্গাদাস-মিশ্রের পুত্র ও প্রসিদ্ধ মাধবাচার্যের পিতা কালিদাসের জ্যেষ্ঠভ্রাতা ছিলেন। দুর্গাদাস সস্ত্রীক শ্রীহট্ট হইতে নবদ্বীপে চলিয়া আসেন এবং তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র পরাশর কালীভক্ত হওয়ায় কালিদাস নামে পরিচিত হন। (৬৪) প্রে. বি.—১৯শ. বি., পৃ. ৩১৫ (৬৫) ঐ (৬৬) ঐ; সনাতনের পুত্রকন্যা সম্বন্ধে মাধবাচার্যের জীবনী দ্রষ্টব্য। (৬৭) ভ. র.—১২।২২৯৬ (৬৮) চৈ. চ. ম.—৩।১২৭; বৈ. ব.—পৃ. ২; চৈ. ম. (জ.)—পৃ. ৫১; চৈ. স.—পৃ. ২৫; চৈ. দী. (রামাই)—পৃ. ৭,; বৈ. ব. (বৃ.)—পৃ. ৩ (৬৯) বৃন্দাবনদাসের বৈষ্ণববন্দনা ও চৈতন্যগণোদ্দেশে ইঁহাকে সুবুদ্ধি-মিশ্রও বলা হইয়াছে। (৭০) বৈ. দি.-মতে (পৃ ৩৭) "বরকন্যা একত্রে বাসর ঘরে যাইবার সময় বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর পদাঙ্গুষ্ঠে উছট লাগিয়া রক্তপাত হয়।" কিন্তু গ্রন্থকার তাঁহার বিবরণের উৎস সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। (৭১) চৈ. ভা.—২।১৮, পৃ. ১৮৮

দেবী ভয়ভীতা হইয়া কাছে আসিতে পারেন না এবং "পুত্রের চরিত্র শচী কিছুই না বুঝে। পুত্রের মঙ্গল লাগি গঙ্গাবিষ্ণু পুজে॥"

কিছুদিন পরে বিশ্বম্ভর একটু প্রকৃতিস্থ হইলেন বটে, কিন্তু অধ্যাপনা করিতে গিয়া তিনি প্রতিটি সূত্রের মধ্যে কৃষ্ণ-ব্যাখ্যা করিয়া বসেন। মধ্যে মধ্যে আবার 'মুঞি সেই মুঞি সেই' বলিয়া তিনি যেন পাষণ্ডীগণকে সংহার করিবার জন্য ছুটাছুটি করিতে থাকেন। কখনও বা তাঁহার বাক্‌রোধ হয় এবং তিনি বৃক্ষশাখায় উঠিয়া বসিয়া থাকেন। কখনও বা আবার তিনি হাসিয়া উঠেন, কখনও মূর্ছাগ্রস্ত হইয়া পড়েন। এই সমস্ত দেখিয়া শচীদেবী সকলের নিকট গিয়া কাঁদিতে থাকেন। কেহ উন্মাদ বলিয়া বাঁধিয়া রাখিতে বলেন, কেহবা বায়ুরোগ বলিয়া তদনুরূপ ব্যবস্থার নির্দেশ দান করেন। সাধ্যাতিরিক্ত হইলেও শচীদেবী সমস্ত নির্দেশ পালনে তৎপর হন। একদিন বিশ্বম্ভরের কৃষ্ণানুসন্ধানমত্ততা দেখিয়া গদাধর তাঁহাকে তাঁহার স্বহৃদয়ের মধ্যেই কৃষ্ণাবস্থানের কথা জানাইলে তিনি হস্তনখদ্বারা আপনার বক্ষস্থল বিদীর্ণ করিবার চেষ্টা করেন। শেষে গদাধর তাঁহাকে নানাভাবে প্রবোধিত করেন। শচীদেবী ইহা শুনিয়া গদাধরকে তাঁহার সর্বক্ষণের সঙ্গী হইয়া থাকিবার জন্য অনুনয় জানাইলেন। আবার ধীরে ধীরে বিশ্বম্ভর সুস্থির হইয়া উঠিলেন।

এখন হইতে গৌরাঙ্গের লীলা আরম্ভ হইয়া গেল। কৃষ্ণগুণগান ও কৃষ্ণভক্তি-প্রচারই তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র হওয়ায় তাঁহার শিষ্য, সঙ্গী ও অনুরাগী ব্যক্তিগণ তাঁহার মধ্যে দেবভাব প্রত্যক্ষ করিলেন এবং চতুর্দিক হইতে ভক্তবৃন্দ আসিয়া তাঁহার চরণ-শরণ করিলেন। কিছুকাল পরে নিত্যানন্দ আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন এবং শচীমাতা তাঁহাকেও আপনার এক সন্তানরূপে গ্রহণ করিয়া লইলেন।[৭২] গদাধরের মত নিত্যানন্দও বিশ্বম্ভরের দিকে সযত্ন-লক্ষ্য রাখিবেন মনে করিয়া মাতার মন আবার কিছুটা সান্ত্বনালাভ করিল।

কিন্তু পুত্রের অমানুষিক কাণ্ডকারখানা দেখিয়া এক অজ্ঞাত শ্রদ্ধা-ভক্তিতে শচী-দেবীর মন যেন ভরিয়া উঠিতেছিল। এই সময় চন্দ্রশেখর-আচার্যের গৃহে লক্ষ্মীর ভূমিকায় পুত্রের অভিনয় দেখিয়া তিনি চমৎকৃত হন।[৭৩] বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীও শ্বশ্রূর নিকট থাকিয়া এই অভিনয় দর্শন করিতেছিলেন। প্রথম হইতেই স্বামীর আচরণাদি প্রত্যক্ষ করিয়া নববধূর মনও একপ্রকার বিস্ময়ে ভরিয়া রহিয়াছিল। এখন এই অভিনয় দর্শনের সময় শশ্রূ ও বধূ উভয়েই আধ্যাত্মিক রাজ্যে একই স্থানে আসিয়া পৌঁছাইলেন।

(৭২) চৈ. ভা.—২।৫, পৃ. ১২৬ ; ২।৮ পৃ. ১৩৮ ; চৈ. ম. (লো.)—ম. খ. পৃ. ১১৩ (৭৩) চৈ. চ. ম.—১১।৩ ; চৈ. ভা.—৩।৯, পৃ. ৩২৬ ; ২।১৮, পৃ. ১৯০ ; চৈ. চ.—১।১০, পৃ. ৫১

ইহার পর গৌরাঙ্গ একদিন স্বয়ং পরমগুরুর স্থান অধিকার করিয়া অদ্বৈত-আচার্যের নিকট মাতৃ-অপরাধ খণ্ডন করাইলেন।[৭৪] বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে বিশ্বম্ভরের উপর অদ্বৈতের প্রভাব লক্ষ্য করিয়া[৭৫] ইতিপূর্বে শচীদেবী একবার ব্যথাভরা চিত্তে বলিয়া ফেলিয়াছিলেন[৭৬] :

> কে বোলে 'অদ্বৈত',—'দ্বৈত' এ বড় গোসাঞি ॥
> চন্দ্রসম এক পুত্র করিয়া বাহির।
> এহো পুত্র না দিলেন করিবারে স্থির ॥
> অনাথিনী—মোরে ত কাহারো নাহি দয়া।
> জগতের অদ্বৈত ; মোরে সে দ্বৈত-মায়া ॥

অদ্বৈতের প্রতি এই অপরাধের জন্য সর্বজনসমক্ষে শচীদেবীকে অদ্বৈতের চরণধূলি গ্রহণ করিয়া ক্ষমাভিক্ষা করিতে হইল। তৎকালে শচী ও অদ্বৈত উভয়েই বিহ্বল হইয়াছিলেন ; কিন্তু পুত্রের প্রসাদলাভ করিবার জন্য শচীদেবীকে ইহাই করিতে হইয়াছিল। মাতা-পুত্রের মধ্যে এখন একটি দ্বৈতভাব জাগিয়া উঠিয়াছে এবং এইভাবে উভয়ের মধ্যে যে ব্যবধান সৃষ্টি হইতেছিল তাহাতে গৌরাঙ্গও যেন তাঁহার কঠিনতম বন্ধনটিকে ছিন্ন করিবার সুবর্ণ সুযোগ লাভ করিলেন।

ভক্তবৃন্দকে লইয়া লীলা করিবার মধ্যে বিশ্বম্ভর ক্রমাগত একটি চাপল্যের ভাব লক্ষ্য করিতে থাকেন। একদিন তিনি গোপীভাবে ভাবিত থাকায় তাঁহার মুখে নিরন্তর 'গোপী গোপী' ধ্বনি উত্থিত হয়। নিকটবর্তী এক দুর্বুদ্ধি পড়ুয়া কিছুই না বুঝিয়া বলিল :

> কি পুণ্য জন্মিব গোপী গোপী নাম লৈলে।
> কৃষ্ণনাম লইলে সে পুণ্য বেদে বোলে ॥

বিশ্বম্ভর বলিলেন, যে-কৃষ্ণ 'কৃতঘ্ন হইয়া বালি মারে দোষ বিনে। স্ত্রী-জিত হইয়া কাটে স্ত্রীর নাক-কানে' এবং 'সর্বস্ব লইয়া বলি পাঠায় পাতালে', সেই কৃষ্ণের নাম লইয়া কি হইবে। এই বলিয়া তিনি ভাবাবেশে সেই পড়ুয়াকে মারিবার জন্য তাহার পিছনে দৌড়াইয়া গেলে ভক্তবৃন্দ তাঁহাকে শান্ত করিয়া আনিলেন। কিন্তু ঐ পড়ুয়াটি পলাইয়া গিয়া অন্যান্য পড়ুয়াবৃন্দকে সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলে তাহারা চিন্তা করিল যে কেবল নিমাই-পণ্ডিত একাই নহেন, তাহারাও সকলেই ব্রাহ্মণ-সন্তান এবং সম্ভ্রান্ত। সুতরাং ব্রাহ্মণকে মারিতে যাওয়ায় নিমাই ধর্মভয়শূন্য হইয়াছেন বলিয়া সকলেই তাঁহার নিন্দা করিতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল, "সব দেশ ভ্রষ্ট কৈল একলা

---

(৭৪) চৈ. চ. ম.—১।৮২-৮৮ ; চৈ. ভা. ২।২২, পৃ. ২০৯-১০ ; চৈ. চ.—১।১৭, পৃ. ৭১ (৭৫) তু. —গৌ. বি.—পৃ. ১৩১ (৭৬) চৈ. ভা.—২।২২, পৃ. ২১২

নিমাঞি।" সমবেত হইয়া তাহারা সিদ্ধান্ত করিল যে নিমাই-পণ্ডিত পুনরায় এইরূপ আচরণ করিলে তাহারা একজোটে চলিয়া যাইবে। এদিকে নিমাইও চিন্তা করিলেন—

করিল পিপ্পলিখণ্ড কফ নিবারিতে।
উলটিয়া আরো কফ বাড়িল দেহেতে ॥......

এবং

আমারে দেখিয়া কোথা পাইব বন্ধ-নাশ।
এক গুণ বন্ধ আরো হৈলা কোটি পাশ ॥

তিনি নিত্যানন্দকে ডাকিয়া স্বীয় সিদ্ধান্ত জানাইলেন[৭৭] যে শিখাসূত্র মুণ্ডন করিয়া তিনি সন্ন্যাস-গ্রহণ করিবেন, তাহা হইলে আর কেহই তাঁহার সহিত বিরোধ করিতে আসিবে না, এবং তখন তিনি ভিক্ষুকবেশে গৃহে গৃহে ফিরিয়া সকলের চরণে ধরিয়া তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিতে পারিবেন।

গৌরাঙ্গের সন্ন্যাসগ্রহণ সম্বন্ধে লোচনদাস একটি কাহিনীর বর্ণনা দিয়াছেন[৭৮] 'চৈতন্যচরিতামৃতে'ও[৭৯] সেই ঘটনার সমর্থন আছে। তদনুযায়ী জানা যায় যে একবার এক বিপ্র কীর্তন শুনিতে আসিয়া ব্যর্থ হন। গৌরাঙ্গ তখন দ্বার রুদ্ধ করিয়া কীর্তন করিতেছিলেন। পরে একদিন সেই বিপ্র গঙ্গার ঘাটে গৌরাঙ্গকে দেখিয়া

পৈতা ছিঁড়িয়া শাপে প্রচণ্ড দুর্মুখ।
সংসার সুখ তোমার হউক বিনাশ।

বলা বাহুল্য শাপ শুনিয়া গৌরাঙ্গ পরম আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন।

১৫১০ খ্রীষ্টাব্দের মাঘী-শুক্লপক্ষ সংক্রমণ-উত্তরায়ণ দিবসে[৮০] গৌরহরি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তিনি যে সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন একথা তিনি নিজে ভক্তবৃন্দকে পূর্ব হইতে জানাইয়া রাখিয়াছিলেন।[৮১] ইতিপূর্বে একবার কেশব-ভারতী নবদ্বীপে আগমন করিলে[৮২] গৌরাঙ্গ তাঁহার প্রতি ভক্তিমান হইয়া পড়েন। কিন্তু বিশ্বরূপের গৃহত্যাগকাল হইতেই কোন সন্ন্যাসীর উপস্থিতি ঘটিলে শচীমাতার হৃদয় নিপীড়িত হইয়া উঠিত। জয়ানন্দ জানাইয়াছেন যে সেইজন্যই তিনি একবার নিত্যানন্দের অবধূত বেশ দেখিয়া সন্ন্যাসাশ্রমের ভীষণতার কথা স্মরণ হওয়ায় তাঁহাকে 'যজ্ঞসূত্র ধরিয়া, বিবাহ করিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছিলেন।[৮৩] এক্ষণে কেশব-ভারতীর সহিত গৌরাঙ্গের মিলন ঘটায় তাঁহার হৃদয় যাতনাক্লিষ্ট হইল।[৮৪] তিনি ভগিনী[৮৫] আচার্যরত্ন-পত্নীর সহিত মিলিত হইয়া বিশ্বম্ভরকে এতৎসম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে বিশ্বম্ভর সুকৌশলে

(৭৭) তু.—চৈ. ম., পৃ. ৩৫ (৭৮) চৈ. ম.—পৃ. ১৩১-৩২ (৭৯) ১।১৭, পৃ. ৭২ (৮০) চৈ. ভা.—২।২৬. পৃ, ২৪০ (৮১) দ্র.—দ্বারপাল-গোবিন্দ (৮২) দ্র.—কেশব ভারতী (৮৩) চৈ. ম. (জ.)—ন. খ., পৃ. ৫৬-৫৭ (৮৪) চৈ. না.—৪।১-২ ; তু—গৌ. স.—পৃ. ৩-২০ (৮৫) প্রে.বি.—২৪শ. বি., পৃ. ২৪২

ব্যাপারটিকে চাপা দিলেন। 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে', উক্ত হইয়াছে, তখন শচীমাতা কিছুটা প্রকৃতিস্থ হইয়া পুত্রকে জানাইলেন যে[৮৬] ইতিপূর্বে বিশ্বরূপ বিশ্বম্ভরের নিমিত্ত একখানি পুথি মাতার হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন, কিন্তু বিশ্বরূপ সন্ন্যাসী হইয়া গেলে ঐ পুথিটি বিশ্বম্ভরকেও সন্ন্যাস-গ্রহণে প্রবৃত্তিদান করিবে ভাবিয়া তিনি তাহা পুড়াইয়া ফেলিয়াছেন। বিশ্বম্ভর সমস্ত শুনিয়া দুঃখিত হইলেন। কিন্তু ব্যাপারটি আপাতত চুকিয়া গেলেও অল্পকালের মধ্যেই বিশ্বম্ভরের সন্ন্যাস-গ্রহণের সিদ্ধান্তের কথা ছড়াইয়া পড়িল। তখন শচীমাতা পুত্রকে নানাভাবে বুঝাইতে লাগিলেন[৮৭] এবং বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর নয়নাশ্রুতে বিশ্বম্ভরের চরণযুগল অভিষিক্ত হইয়া গেল।[৮৮] কিন্তু একদিন তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া তাঁহার দুই তিন জন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সঙ্গী-সহ[৮৯] কাটোয়ায় পৌঁছাইলেন। তথায় নাপিত[৯০] আসিয়া তাঁহার মস্তক মুণ্ডন করিয়া দিলে তিনি কেশব-ভারতীর নিকট সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সন্ন্যাসাশ্রমের নাম হইল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

ঘটনাটি সংক্ষিপ্ত। কিন্তু নবদ্বীপের জগন্নাথ-মিশ্রের পরিবারটি ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গেল। মিশ্র-পরিবারের কুল-প্রদীপ চিরতরে নিভিয়া গেল। চিরদুখিনী শচীদেবীর পক্ষে জীবন-ধারণ বিড়ম্বনামাত্র হইল। সেই কোন্ বাল্যকালে তাঁহাকে যে জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া বহু দূর দেশে চলিয়া আসিতে হইয়াছিল, তদবধি তাঁহার আর দুঃখভোগের সীমা নাই। পর পর সাত আটটি নবজাত সন্তানের মৃত্যু, তাহার পর বহুবাঞ্ছিত যে-সন্তান জন্মলাভ করিয়া মায়া-মমতায় ও আশা-আকাঙ্ক্ষায় পিতৃ-মাতৃ হৃদয়কে ভরিয়া তুলিলেন, যৌবনের প্রারম্ভেই তাঁহার আচম্বিতে গৃহত্যাগ, একটি শিশুপুত্রকে এক অসহায়া নারীর ক্রোড়ে তুলিয়া দিয়া স্বামীর পরলোকগমন, সদ্যোবিবাহিতা প্রাণপ্রিয়তমা পুত্রবধূর অকালমৃত্যু—এই মর্মান্তিক ঘটনাগুলি আঘাতের পর আঘাত হানিয়া তাঁহার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া দিতেছিল। তবুও তিনি সকল যাতনা সহ্য করিয়া শেষ সন্তানের মুখপানে তাকাইয়া আশায় বুক বাঁধিয়া কোন রকমে যেন জীবন-ধারণ করিতেছিলেন। কিন্তু আজ তাঁহার সেই পুত্রই যখন তাঁহাকে শেষ আঘাত দিয়া দূরে চলিয়া গেলেন, তখন তাঁহার পক্ষে মরণ-বাঁচন সমান হইয়া গেল।

(৮৬) চৈ. না.—৪।৪ (৮৭) চৈ. ম. (লো)—ম. খ., পৃ.১৪৬; চৈ. ম. (জ), বৈ. খ. পৃ. ৬৩; চৈ.না.—৪।৩-৬. চৈ. কৌ.—৪র্থ. অঙ্ক, পৃ. ৯৬ (৮৮) চৈ. ম. (লো.) —পৃ.১৪৯; চৈ. ম. (জ)—পৃ. ৭২, ৮১, তু—গৌ.স.—পৃ. ২২-৩৫; সী. ক.—পৃ. ৫২-৫৩, ৬৩ (৮৯) দ্র.—দ্বারপাল-গোবিন্দ (৯০) এই নাপিতের নাম বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্নরূপ: কলাধর—চৈ. ম.(জ.) স. খ, পৃ. ৮৯; হরিদাস—চৈ. ম. (লো.), ম. খ.—পৃ. ১৫৯; দেবা—গো.ক..—পৃ. ১১; মধু—গৌ. স.,—. পৃ. ৫২; চৈ. ভা. ও ভ. র.-তে নামবিহীন নাপিতের উল্লেখ আছে।

আর সতী-সাধ্বী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর মর্মবেদনার গভীরতা তো অপরিমেয়। বিবাহের নাম যে স্বামিসঙ্গবিরোধী নিষ্ঠুর বৈরাগ্য, এই সৃষ্টিছাড়া অভিজ্ঞতা বোধকরি জগতের ইতিহাসে এক মাতা-বিষ্ণুপ্রিয়া ছাড়া আর কাহাকেও লাভ করিতে হয় নাই, এমন কি গোপাদেবী বা সারদাদেবীকেও নহে। বিবাহের অব্যবহিত পরবর্তীকাল হইতেই তাঁহার হৃদয়ে যে দহন দান করা হইয়াছিল, তাহাই ক্রমাগত গৌরাঙ্গের বৈরাগ্য-বীজনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে হইতে তাহার গৃহত্যাগের দিবসে একেবারে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। পতিদর্শন-সৌভাগ্যটুকু হইতেও তিনি চিরবঞ্চিতা হইলেন।[৯১]

গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস-গ্রহণের কয়েক দিবস পরে শচীদেবী চন্দ্রশেখরের সহিত শান্তিপুরে অদ্বৈত-গৃহে গিয়া পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিলে[৯২] চৈতন্য অনুতাপের সুরে জানাইলেন যে তাঁহার পক্ষে মাতৃঋণ অশোধ্য, যাহা হইবার তাহা তো হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে আর তিনি তাঁহার প্রতি উদাসীন হইয়া তাঁহার মৃত্যুযন্ত্রণার কারণ হইবেন না, তাঁহার সন্ন্যাসাশ্রমে তিনি মাতৃনির্ধারিত স্থানেই বাস করিবেন। শচীদেবীর ইচ্ছানুযায়ী তিনি তাঁহার নিকট ভিক্ষা-গ্রহণও করিয়া মাতার ঐকান্তিক বাসনাকে চরিতার্থ করিলেন। তাহার পর তাহার চলিয়া যাইবার দিন প্রত্যাসন্ন হইলে ভক্তবৃন্দ যখন তাঁহার ভবিষ্যতের অবস্থান-ক্ষেত্র সম্পর্কে শচীদেবীর আজ্ঞা প্রার্থনা করিলেন তখন শচীদেবী যে স্থৈর্য ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন তাহা বাস্তবিকই অভাবিতপূর্ব। তিনি বলিলেন[৯৩] :

খল লোক নিন্দা করিবেক বিশ্বম্ভরে ॥
নিজ সুখ লাগি তার নিন্দা করাইব।
প্রেমের এ রীত নহে কেমনে কহিব ॥

সুতরাং তিনি সংযতচিত্তে জানাইলেন, "নীলাচলে[৯৪] রহে যদি দুই কার্য হয়," তাহাতে লোকমুখে তাঁহার সংবাদও পাওয়া যাইবে এবং চৈতন্যের পক্ষেও মধ্যে মধ্যে গঙ্গাস্নানার্থ নবদ্বীপ-সন্নিধানে আসিয়া দর্শনদান করা সম্ভব হইবে। 'চৈতন্যভাগবত' ও 'চৈতন্যমঙ্গল'(লোচনের)-মতে নীলাচলে থাকিবার সিদ্ধান্ত স্বয়ং মহাপ্রভুরই। কিন্তু

---

(৯১) বৈ. দি.—(পৃ. ৫৮-৮৯)-মতে মহাপ্রভু বৃন্দাবন গমনোদ্দেশ্যে গৌড়প্রদেশে আসিলে কুলিয়া হইতে একবার পিতৃগৃহ দর্শন করিতে আসিলেন, গৃহদ্বারে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভুর চরণে লুটাইয়া পড়িলেন। প্রভু তাঁহাকে নিজ কাষ্ঠপাদুকা দান করিয়া উহার দ্বারা তাঁহার বিরহ শান্তি করিতে আদেশ দিলেন।—এইরূপ বর্ণনা অন্য কোথাও নাই। (৯২) চৈ. চ.ম.—১১।৬২-৬৩; চৈ. চ.—২।৩, পৃ. ৯৮; দ্র.—নিত্যানন্দ; বাসুদেব-ঘোষ (বা. প—বাল্যলীলা, পৃ. ১৯-২০) বলেন যে শচীদেবী নিত্যানন্দের নিকট সংবাদ শুনিয়া তাঁহারই সহিত শান্তিপুরে যান। চৈ. কৌ.-তে (৫ম. অঙ্ক, পৃ. ১৩৯) লিখিত হইয়াছে যে অদ্বৈতপ্রভুই নবদ্বীপে সংবাদ দিয়া শ্রীবাসাদিসহ শচীদেবীকে শান্তিপুরে আনয়ন করেন। (৯৩) চৈ. কৌ.—৬ষ্ঠ. অঙ্ক, পৃ. ১৪৮ (৯৪) চৈ. না.—৬।৬-১২; চৈ. চ.—২।৩, পৃ. ৯৯; অ. প্র.—১৫শ. অ. পৃ. ৬৪

তাহা হইলে এই প্রসঙ্গে কবিকর্ণপূর ও কবিরাজ-গোস্বামী প্রভৃতি[৯৫] কর্তৃক শচী-দেবীর নামোল্লেখ করার প্রয়োজন হইত না। যাহাহউক, মাতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া চৈতন্য নীলাচলাভিমুখে গমন করিলেন। কিন্তু সেই আজ্ঞা-পালনের ফলস্বরূপই যে তাঁহার পক্ষে জগন্নাথদেবকে চিরারাধ্য প্রাণপতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় 'রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত'-স্বরূপকে সর্বতোভাবে সার্থক করিয়া তুলা সম্ভবপর হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

মহাপ্রভুর গর্ভধারিণী হিসাবে শচীদেবীকে ভক্তবৃন্দ 'আই' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। মহাপ্রভু দক্ষিণ-ভ্রমণান্তে নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করিলে গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দ আইর নিকট আজ্ঞা প্রার্থনা করিয়া নীলাচল-গমনে উদ্যোগী হইলেন। সেই সময় পরমানন্দ-পুরীও নবদ্বীপে পৌছান। কেশব-ভারতী, ঈশ্বর-, মাধবেন্দ্র- ও শ্রীরঙ্গ-পুরী প্রভৃতি সন্ন্যাসী-বৃন্দের সহিত ভিক্ষা-ব্যবহারের[৯৬] মধ্য দিয়া সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় সম্বন্ধে শচীদেবীর একটা মোটামুটি ধারণা হইয়া গিয়াছিল। এখন তিনি পরম বাৎসল্যসহকারে পরমানন্দ-পুরীর ভিক্ষা-নির্বাহ করাইয়া তাঁহাকেও নীলাচল-গমনে আজ্ঞা দান করিলেন।

চাতুর্মাস্যান্তে নীলাচল হইতে গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকালে মহাপ্রভু তাঁহাদিগের হস্তে মাতার নিমিত্ত মহাপ্রসাদ ও একটি বস্ত্র অর্পণ করিয়া পুনঃ পুনঃ অনুতাপ করিতে লাগিলেন যে মাতৃহৃদয়ে যাতনা দিয়া সন্ন্যাস-গ্রহণ করায় তিনি 'নিজ ধর্মনাশ' করিয়াছেন। সন্ন্যাসগ্রহণকালে তাঁহার 'ছন্ন হইল মন' বলিয়া তিনি নিজেকে ধিক্কার দিয়া নিঃসংকোচে জানাইলেন যে তিনি মাতার মনে শেল বিদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু মাতা যেন তাঁহার বাতুল পুত্রকে ক্ষমা করেন। ভক্তবৃন্দ প্রত্যাবর্তন করিলেন। নিত্যানন্দও সেই বৎসর নবদ্বীপে আসিয়া শচীমাতার সহিত সাক্ষাৎ করিলে শচীদেবী তাঁহাকে নদীয়ায় থাকিয়া মধ্যে মধ্যে দর্শন দিয়া যাইবার জন্য উপদেশ দিলেন।

পর বৎসর বৃন্দাবন গমনোদ্দেশ্যে চৈতন্যমহাপ্রভু নদীয়ায় আসেন। পানিহাটি-কুমারহট্ট-কুলিয়া হইয়া রামকেলির পথে তিনি শান্তিপুরে পৌছান। মুরারি-গুপ্ত, বৃন্দাবনদাস ও জয়ানন্দ জানাইতেছেন যে তিনি রামকেলি ও কানাইর-নাটশালা হইতে ফিরিবার পথেই শান্তিপুরে আসিয়াছিলেন। রামকেলির পথে তিনি শান্তিপুরে পৌছান কিনা, সে কথা ইঁহারা উল্লেখ করেন নাই। কৃষ্ণদাস-কবিরাজও মধ্যলীলার সূত্রমধ্যে অনুরূপ বর্ণনা দিয়াছেন। কিন্তু মধ্যলীলার ষোড়শ পরিচ্ছেদে তিনি স্পষ্টই জানাইতেছেন যে মহাপ্রভু গমন ও প্রত্যাবর্তন উভয় কালেই শান্তিপুরে গমন করেন। মুরারি-গুপ্তাদির

(৯৫) অ. প্র. (৯৬) দ্র.—ঈশ্বর-পুরী, মাধবেন্দ্র-পুরী

গ্রন্থে তাঁহার গমন-পথের মধ্যে শান্তিপুরের উল্লেখ নাই বলিয়া যে তিনি ঐস্থান হইয়া যান নাই, তাহা প্রমাণিত হয় না। মুরারি বলিতেছেন যে মহাপ্রভুর রামকেলি কৃষ্ণনাট্যস্থল পর্যন্ত গমন করিবার পর 'পুনঃ শ্রীলাদ্বৈতগেহ শুভাগমঃ'[৯৭] হইয়াছিল। সুতরাং 'পুনঃ' কথাটির ব্যবহার হইতে ধরা যায় যে তিনি ইতিপূর্বে অদ্বৈত-ভবনে গমন করিয়াছিলেন। কবিকর্ণপূরও 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে' উল্লেখ করিয়াছেন যে কুমারহট্ট অঞ্চল হইতে নবদ্বীপ-সন্নিকটস্থ কুলিয়াতে যাইবার সময় তিনি অদ্বৈত-ভবনে গিয়াছিলেন।[৯৮] তাছাড়া, বৃন্দাবন বা জয়ানন্দের গ্রন্থে এই সময়কার বর্ণনা সম্বন্ধে অনেক ত্রুটিও পরিলক্ষিত হয়। রামকেলির সম্পর্কে তাঁহারা মহাপ্রভুর সহিত সনাতন-রূপের মিলনের প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেন নাই। অথচ উহা একটি অপরিহার্য ঘটনা। জয়ানন্দ এমনও বলিয়াছেন যে মহাপ্রভু কুলিয়ায় পৌঁছাইলে স্বয়ং বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী তাঁহার দর্শনার্থে কুলিয়ায় হাজির হন এবং 'চৈতন্যঠাকুর' গৌড়রাজের ভয়েই 'কৃষ্ণকেলি' গ্রাম হইতে 'নিবর্ত্ত' হইয়া শান্তিপুরে চলিয়া আসেন।[৯৯] লোচনের গ্রন্থেও অনেকটা এই ধরণের সংবাদ পাওয়া যায়—[১০০]

> শচী বোলে নবদ্বীপ ছাড়ি যাহ তুমি।
> নবদ্বীপে দুষ্ট বিষ্ণুপ্রিয়া আর আমি॥
> মায়ের বচনে পুন গেলা নবদ্বীপ।
> বারকোণাঘাট নিজ বাড়ীর সমীপ॥
> শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী ঘরে ভিক্ষা কৈল।
> মায়ে নমস্কারি প্রভু প্রভাতে চলিল॥

'অদ্বৈতপ্রকাশ'-কার জানাইতেছেন যে মহাপ্রভু গমন- ও প্রত্যাবর্তন-কালে শান্তিপুরে গিয়াছিলেন। কিন্তু বিশেষ করিয়া কৃষ্ণদাস-কবিরাজের বর্ণনা হইতেই উক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থিত হয়। কৃষ্ণদাস এই প্রসঙ্গে বৃন্দাবনদাসের নাম করায় সহজে বুঝিতে পারা যায় যে বৃন্দাবনের এই অনুল্লেখ সম্বন্ধে তিনি বিশেষভাবে সচেতন ছিলেন বলিয়া ভিন্ন বর্ণনা হইলেও তিনি যথাযথ বর্ণনা দেওয়ার জন্য এই বিষয়ের সবিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন এবং ইহাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বিশেষভাবে শচীদেবীর প্রসঙ্গও উত্থাপন করিয়াছেন। তাহাছাড়া, রামকেলি হইতে ফিরিয়া আসিবার কোন পূর্ব পরিকল্পনা না থাকায় বৃন্দাবন-গমনের পথে মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্যই যে তাঁহার শান্তিপুর-গমনের প্রয়োজন ছিল, তাহাতে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না।

শান্তিপুরে পৌঁছাইয়া চৈতন্য মাতাকে অদ্বৈতগৃহে আনাইয়া তাঁহার অসহ্য যাতনার

(৯৭) শ্রীচৈ.চ.—৪।২৫।৩০-৩১ (৯৮) চৈ. না.—৯।৩১-৩৩ (৯৯) চৈ. ম. (জ.)—বি. খ. পৃ. ১৪০-৪১ (১০০) চৈ. ম. (লো.)—শে. খ., পৃ. ২০৪

কথঞ্চিৎ অপনোদন করিলেন।[১০১] মহাপ্রভু রামকেলি হইতে প্রত্যাবর্তন-কালেও[১০২] শচীমাতার নিকট কয়েকদিন[১০৩] ভিক্ষা-ব্যবহার করেন। দৈবক্রমে সেই সময় মাধবেন্দ্র-পুরীর আরাধনা-দিবস আসিয়া পড়ায় তৎশিষ্য অদ্বৈত-আচার্য চৈতন্য-সমক্ষে সেই পুণ্যতিথি উদ্‌যাপন করিবার ব্যবস্থা করিলে শচীমাতা সেই অনুষ্ঠানের জন্য সমস্ত রন্ধনের ভার গ্রহণ করিলেন।[১০৪] এই উপলক্ষে মাতা ও পুত্রের মধ্যে যে ভাব-বিনিময় ঘটিল তাহাই শচী-মাতার জীবনে পুত্র সম্পর্কিত শেষ স্মৃতি হইয়া রহিল।

বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া চৈতন্যমহাপ্রভু দামোদর-পণ্ডিতকে মাতার রক্ষণাবেক্ষণ ও সন্তোষবিধানার্থ নানাবিধ উপদেশ প্রদান করিয়া নবদ্বীপে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া প্রায় প্রতি বৎসর তিনি আবার জগদানন্দকেও বস্ত্র এবং মহাপ্রসাদাদি দিয়া মাতার নিকট পাঠাইয়া দিতেন।[১০৫] প্রকৃতপক্ষে

মাতৃভক্তগণের প্রভু হন শিরোমণি।
সন্ন্যাস করিয়া সদা সেবেন জননী॥১০৬

শচীদেবীও দামোদর এবং জগদানন্দকে পাইয়া তাঁহাদের মাধ্যমে যেন পুত্রকে লাভ করিতেন এবং পুত্রের অপার্থিব প্রেম-ভক্তির পরিচয় লাভ করিয়া তিনি যেন তাঁহার সমস্ত স্নেহ-মমতাকেও তদভিমুখী করিয়া পুত্রস্নেহের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। চৈতন্য একবার মাতার বিষ্ণুভক্তি সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ প্রশ্ন করায় নিরপেক্ষ ও সত্যভাষী দামোদর তাঁহাকে জানাইয়া দিয়াছিলেন :[১০৭]

কি বলিলা গোসাঞি আইর কি ভক্তি আছে?
ইহাও জিজ্ঞাস প্রভু তুমি কোন কাজে॥·····
যতেক তোমার বিষ্ণুভক্তির উদয়।
আইর প্রসাদে সব জানিহ নিশ্চয়॥·········
মূর্তিমন্ত ভক্তি আই কহিল তোমারে।
জানিঞাও মায়া করি জিজ্ঞাস আমারে॥

বিষ্ণুভক্তি ও বিষ্ণুবিগ্রহের সেবাপূজা ছাড়া শেষ জীবনে শচীমাতার ব্যক্তিগত সুখ বা দুঃখ বলিয়া কিছুই ছিল না। বধূ-বিষ্ণুপ্রিয়া পার্শ্বে থাকিয়া তাঁহার যথাবিধি সেবা করিতে থাকিলেও তাঁহাকে দেখিয়া শচীদেবীর আনন্দের কিছুই

---

(১০১) চৈ. চ. ম.—২০।২৩; চৈ. চ.—২।১৬, পৃ. ১৯০ (১০২) অ. প্র.-মতে (১৬শ. অ., পৃ., ৬৭) বৃন্দাবন-গমনপথে মহাপ্রভু শান্তিপুরে আসিলে শচীদেবী পুত্রের অভিপ্রেত ব্যঞ্জনাদি রন্ধন পূর্বক তিন প্রভুকে একত্রে বসাইয়া আহার করান। (১০৩) সাতদিন—চৈ.চ.—২।১, পৃ. ৮৮; তু.—শ্রী চৈ. চ. —৪।২৫ (১০৪) চৈ. ভা.—৩।৪, পৃ. ২৯৪ (১০৫) চৈ. চ.—৩।১২, পৃ. ৩৪১; ৩।১৯, পৃ. ৩৬৯; অ. প্র.—২১শ. অ., পৃ. ৯৩ (১০৬) চৈ. চ.—৩।১৯, পৃ. ৩৬৯ (১০৭) চৈ. ভা.—৩।১০, পৃ. ৩৩৩-৩৪

ছিল না। 'অদ্বৈতপ্রকাশে' বলা হইয়াছে[১০৮] যে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী চৈতন্যমহাপ্রভুর 'রূপসাম্যে' একটি 'চিত্রপট' নির্মাণ করিয়া 'প্রেমভক্তি মহামন্ত্রে' তাহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। 'বংশীশিক্ষা'-গ্রন্থের ভূমিকায় সম্পাদক মহাশয় 'বংশীশিক্ষা,' 'মুরলীবিলাস' ও 'বংশীবিলাস' অনুযায়ী বংশীবদনের যে জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি লিখিতেছেন যে নিমাইচন্দ্র কুলিয়ার ছকড়িচট্টের পঞ্চবর্ষবয়স্ক পুত্র বংশীবদনকে স্বীয় পুত্র-হিসাবে গ্রহণ করিলে বিষ্ণুপ্রিয়া মাতাও তাঁহাকে আনন্দিতচিত্তে পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর এই বংশীবদন তাঁহার দ্বারা স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া গৌরাঙ্গ যেই নিম্ববৃক্ষতলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সেই বৃক্ষের কাষ্ঠের দ্বারা মহাপ্রভুর দারুময় মূর্তি নির্মাণ করিয়া বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর মতানুসারে তাহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। 'বংশীশিক্ষা' গ্রন্থ-মতে[১০৯] মহাপ্রভু বিষ্ণুপ্রিয়া এবং বংশীবদন উভয়কেই স্বপ্নাদেশ দান করিলে মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই স্থলে সম্ভবত উক্ত বিগ্রহের কথাই বলা হইতেছে। মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের পর সম্ভবত ইহাই প্রথম গৌরাঙ্গ-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা। এই মূর্তিপূজার মধ্যেই সম্ভবত বিষ্ণুপ্রিয়া-মাতা যাহা কিছু[১১০] আশ্বাস ও সান্ত্বনা লাভ করিয়া স্থির হইয়াছিলেন। পতিপ্রদর্শিত আদর্শের অনুশীলন ছাড়া তাঁহারও ব্যক্তিগত কামনা-বাসনা বলিয়া আর কিছুই ছিল না।

চৈতন্য-তিরোভাবের পর শচীদেবী কিছুকাল জীবন্মৃত অবস্থায় বাঁচিয়াছিলেন।[১১১] তারপর তাঁহার অন্তর্ধানে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী 'ভক্তদ্বারে দ্বাররুদ্ধ কৈলা স্বেচ্ছাক্রমে।'[১১২] প্রাত্যহিক সেবার্থ যে গঙ্গাজলের প্রয়োজন হইত একমাত্র দামোদর-পণ্ডিত তাহা স্বহস্তে তুলিয়া আনিতে পারিতেন।[১১৩] বহিরাচরণের জল দাসীরাই আনিত। বিষ্ণুপ্রিয়া অতি প্রত্যুষে স্নান-আহ্নিক ও শালগ্রাম-পূজা সম্পন্ন করিয়া হরিনাম আরম্ভ করিতেন। তিনি প্রতি ষোলবার নামোচ্চারণের পর এক একটি তণ্ডুল রাখিয়া তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত সংগৃহীত

(১০৮) ২১ শ. অ. (পৃ. ৯৫)-মতে বিষ্ণুপ্রিয়া প্রত্যহ অতি প্রত্যুষে শ্বশ্রূর সহিত গঙ্গাস্নানান্তে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলে আর কেহ তাঁহাকে দেখিতে পাইতেন না। ভক্তবৃন্দ পর্দার আড়াল হইতে তাঁহার পাদপদ্ম দর্শন করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন। শচীদেবীর ভক্ষণ হইয়া গেলে তিনি ভুক্তাবশেষ গ্রহণ করিয়া কোন রকমে উদর পূর্তি করিতেন এবং হরিনাম গ্রহণ করিয়া দিন অতিবাহিত করিতেন। (১০৯) পৃ. ১৮৮-৮৯ (১১০) অ. প্র.-মতে (২১শ. অ. পৃ. ৯৫) জগদানন্দ নবদ্বীপ হইতে নীলাচলে গিয়া তাঁহার শচীসেবা, বিষ্ণুপূজা ও স্বামীর আদর্শানুধ্যানের কথা জানাইলে মহাপ্রভু তৎপ্রতি কঠোর ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন। (১১১) চৈ. ভা.—৩।৫, পৃ. ৩০৮,৩১০ ; গী.চ.—পৃ. ১০, ১৬ ; একমাত্র মু.বি.-মতে বংশী-পৌত্র রামচন্দ্র যখন জাহ্নবার দত্তক-পুত্র হিসাবে সর্বপ্রথম নবদ্বীপ হইতে খড়দহে আগমন করেন, তখনও শচীদেবী জীবিতা ছিলেন। (১১২) অ. প্র.—২২শ. অ., পৃ. ১০১., (১১৩) অ.র. —২য়. ম., পৃ. ১১

তণ্ডুলের দ্বারা পাক করিতেন[১১৪] এবং 'অলবণ অনুপকরণ অন্ন লঞা' মহাপ্রভুর ভোগ লাগাইতেন। তারপর সেই অন্নের কিঞ্চিন্মাত্র ভক্ষণ করিয়া অবশিষ্টাংশ সেবকদিগের জন্য বিলাইয়া দিতেন। নিশাকালেও আবার নাম জপ চলিত এবং অধিক রাত্রি হইলে তিনি ভূমিশয্যা গ্রহণ করিতেন। আমৃত্যু এইরূপ কঠোর তপশ্চরণের মধ্য দিয়াই তাঁহার দিন অতিবাহিত হইয়াছিল।

'প্রেমবিলাস' প্রভৃতি গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে যে গদাধর-পণ্ডিতের মৃত্যুর পর শ্রীনিবাস-আচার্য যখন নবদ্বীপে আসিয়া পৌছান তখন অনাহারক্লিষ্ট শ্রীনিবাসের দিবানিশি নিঃসহায়ভাবে ক্রন্দনের কথা শুনিয়া বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী তাঁহাকে স্বগৃহে আনাইয়া কৃপা প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং শ্রীনিবাস তাঁহার সান্ত্বনাবাক্যে আশ্বস্ত হইয়া পরে বৃন্দাবন-যাত্রার প্রাক্কালে তাঁহারই আজ্ঞাক্রমে সীতা ও জাহ্নবাদেবীর আশীর্বাদ গ্রহণার্থ শান্তিপুর-খড়দহের পথে যাত্রা করিয়াছিলেন। বৃন্দাবন হইতে গৌড়ে ফিরিয়া কিন্তু শ্রীনিবাস-আচার্য আর বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর দর্শন লাভ করিতে পারেন নাই।[১১৫]

(১১৪) প্রে. বি.— ৪র্থ. বি., পৃ. ৪০ (১১৫) অ. র.—৬ষ্ঠ ম., পৃ. ৩৮; ভ. র.—৭।৫৩৪-৩৫; একমাত্র মু. বি.-মতে রামচন্দ্রকে জাহ্নবার দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণকালে বিষ্ণুপ্রিয়া জাহ্নবাকে সাহায্য করেন এবং নীলাচল হইতে রামচন্দ্রের নবদ্বীপ প্রত্যাবর্তনকালে বিষ্ণুপ্রিয়া জীবিতা ছিলেন।

অদ্বৈত-আচার্য

সিদ্ধ শ্রোত্রিয়াখ্য আরু ওঝার বংশজাত নৃসিংহ- বা নরসিংহ-নাড়িয়াল রাজা-গণেশের একজন মন্ত্রণাদাতা ছিলেন। 'অদ্বৈতপ্রকাশ'-কার লিখিয়াছেন যে তাঁহার মন্ত্রণাবলে রাজা গণেশ

গৌড়িয়া বাদসাহে মারি গৌড়ে হৈইলা রাজা।

এবং
যার কন্যা-বিবাহে হয় কাপের উৎপত্তি।
লাউড়[১] প্রদেশে হয় যাহার বসতি॥
সেই বংশ উদ্দীপক শ্রীকুবেরাচার্য।
রাজধানীতে ছিল তার দ্বার পণ্ডিত কার্য॥

'প্রেমবিলাসে'র চতুর্বিংশ বিলাস[২]-অনুযায়ী অদ্বৈতাচার্যের বংশ-পরিচয় নিমোক্ত-রূপ :—

ভরদ্বাজ-গোত্রীয় গৌতম-ত্রিবেদীর পুত্র ও পৌত্রের নাম ছিল যথাক্রমে বিভাকর ও ভাস্কর। বৈদান্তিক ভাস্কর-পণ্ডিত হইতেই বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের গণনা আরম্ভ হয় এবং 'বল্লাল সভায় তাঁর পুত্র পৌত্র শ্রোত্রিয় কুলীন।' ভাস্করের পুত্র সায়ন-আচার্য এবং 'তাঁর পুত্র আড়ো ওঝা আরুণি যাঁরে কয়।' এই বংশের প্রভাকর-পুত্র নরসিংহ-নাড়িয়াল রাজা গণেশের মন্ত্রী ছিলেন : তাঁহার বাস ছিল শান্তিপুরে এবং তাঁহার কন্যার বিবাহেই 'কাপে'র উৎপত্তি হয়। নরসিংহ-নাড়িয়াল (বা, নাউড়িয়াল, বা, নাড়ুলী) শ্রীহট্টের লাউড়ে গিয়া বাস করিতে থাকেন। মধ্যে মধ্যে তিনি শান্তিপুরেও আসিতেন। তাঁহার সাত পুত্রের মধ্যে বিদ্যাধর ছিলেন অন্যতম। বিদ্যাধরের পুত্র ছকড়ি, এবং এই ছকড়িরই পুত্রদ্বয় কুবের ও নীলাম্বর-আচার্য ছিলেন যথাক্রমে অদ্বৈত ও শচীদেবীর জনক। অগ্নিহোত্রী যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ নরসিংহের বংশজাত এই কুবের-পণ্ডিত লাউড়স্থ নবগ্রামের রাজা দিব্যসিংহের সভাপণ্ডিত ছিলেন এবং সেই গ্রামের মহানন্দ-বিপ্রের কন্যা নাভাদেবীর সহিত তাঁহার শুভপরিণয় ঘটে। সম্ভবত এই মহানন্দের পুরোহিতকে নাভাদেবী ভ্রাতৃ-সম্বোধন করিতেন। সেই ব্যক্তি লক্ষ্মীপতির নিকট সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া বিজয়-পুরী নাম প্রাপ্ত হন। অদ্বৈতাচার্য তাঁহাকে দুর্বাসা আখ্যা দিয়াছিলেন এবং তিনি 'অদ্বৈতবাল্যলীলা' প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই সমস্ত বৃত্তান্ত 'অদ্বৈতমঙ্গল' দ্বারাও সমর্থিত হয়।[৩] নাভাদেবীর ছয় পুত্র ও এক কন্যা জন্মে। পুত্রদিগের নাম—শ্রীকান্ত, লক্ষ্মীকান্ত, হরিহরানন্দ, সদাশিব, কুশলদাস ও কীর্তিচন্দ্র।

---

(১) "শ্রীহট্টের অন্তর্গত সুনামগঞ্জ সাব্‌ডিভিসনের মধ্যে লাউড় পরগণা—" অচ্যুতচরণ চৌধুরী. (ব. সা. প. প.—১৩০৩) (২) পৃ. ২২৮, ২৫৮, ২৫৯ (৩) পৃ. ৪-২১

ইঁহারা তীর্থপর্যটনে গেলে ইঁহাদের চারিজন মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং দুইজন গৃহে ফিরিয়া সংসারধর্ম গ্রহণ করেন। পুত্রশোকাতুরা নাভাদেবী শান্তিপুরে গিয়া নারায়ণ-সেবা করিতে থাকেন। তাহার পর গর্ভবতী অবস্থায় তিনি শান্তিপুর হইতে নবগ্রামে ফিরিয়া আসিলে অদ্বৈতাচার্য ভূমিষ্ঠ হন। 'প্রেমবিলাসে'র এই বর্ণনা 'অদ্বৈতমঙ্গলে'র[৪] বর্ণনার বিরুদ্ধতাসূচক নহে। একটি মাত্র পার্থক্য দৃষ্ট হয় যে 'অদ্বৈতমঙ্গল'-কার কুবেরের ছয় পুত্রের মধ্যে প্রথমে লক্ষ্মীকান্ত ও তাহার পর শ্রীকান্তের নামোল্লেখ করিয়াছেন।

কিন্তু অদ্বৈতাচার্যের পূর্বপুরুষদিগের সম্বন্ধে এই সকল বিবরণের সমস্তই যে সত্য, তাহা যেমন সঠিকভাবে বলা যায় না, তেমনি তাহার সকলগুলিই যে অসত্য, তাহাও জোর করিয়া বলা যায়না। দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার Chaitanya and His Companions নামক গ্রন্থে তিনটি সূত্রে প্রাপ্ত তিনটি বংশ-তালিকার বিষয় আলোচনা করিয়াও শেষে লিখিয়াছেন: Advaita's genealogical accounts, so far as his remote ancestors are concerned, are therefore unreliable. কিন্তু সম্ভবত অদ্বৈত-জনক কুবের-আচার্য হইতে একটি মোটামুটি যথার্থ বিবরণ সংগৃহীত হইতে পারে।

'ভক্তিরত্নাকরে' লিখিত হইয়াছে[৫] :

বঙ্গদেশে শ্রীহট্ট নিকট নবগ্রাম।
কুবের পণ্ডিত তথা নৃসিংহ সন্তান।......
তৈছে তাঁর পত্নী 'নাভাদেবী' পতিব্রতা।

এই নাভাদেবীর পিত্রালয় ছিল বঙ্গে রাম-নবলাগ্রামে।[৬] অনেকগুলি সন্তানের মৃত্যু ঘটিলে পতি-পত্নী গঙ্গাসন্নিধানে শান্তিপুরে চলিয়া যান। সেখানে নাভা (বা লাভা)-দেবী পুনরায় গর্ভবতী হইলে সেই সময়ে তাঁহারা রাজপত্রী প্রাপ্ত হন এবং স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। কুবের-পণ্ডিতের আবাস ছিল লাউড়ের নবগ্রামে। তখন তাহা বঙ্গদেশভুক্ত[৭] এবং রাজা-দিব্যসিংহের অধীনস্থ ছিল।

উক্ত ঘটনার কিছুকাল পরে এক মাঘী শুক্লা সপ্তমী তিথিতে[৮] নাভাদেবী একটি পুত্রসন্তান লাভ করিলেন। পুত্রের নাম রাখা হয় কমলাক্ষ[৯] বা কমলাকান্ত।[১০] তিনিই ভবিষ্যৎকালে অদ্বৈত-আচার্য নামে খ্যাত হন। 'অদ্বৈতপ্রকাশে' লিখিত হইয়াছে যে ১৪০৭ শকের ফাল্গুনমাসে গৌরাঙ্গের জন্মকালে অদ্বৈতাচার্য দ্বিপঞ্চাশৎবর্ষবয়স্ক ছিলেন। কিন্তু ইহার সমর্থন অন্য কোথাও নাই।

যথাসময়ে অদ্বৈতের হাতেখড়ি হইয়া গেলে তিনি যথাবিধি বিদ্যাশিক্ষা করিয়া

---

(৪) পৃ. ৯-১০ (৫) ৫।২০৪১-৪৩; ১২।১৭৫১-৫৩ (৬) চৈ. ম. (জ.)—ন. খ., পৃ. ১১ (৭) গৌ. ত.—পৃ. ২৯৩ (৮) গৌ. ত.—পৃ. ২৯৩, ২৯৫-৯৬; অ.ম.—পৃ. ১০ (৯) প্রে. বি., এবং অন্যমত চৈ. চ. ম.—৭।৫৬ (১০) অ.ম.—পৃ. ১০-১১

অল্পবয়সেই প্রতিভার পরিচয় প্রদান করেন। তাঁহার পাঠসঙ্গী ছিলেন স্বয়ং রাজকুমার। উভয়ের মধ্যে কিরূপ সম্বন্ধ ছিল, ঠিক জানা যায় না। অদ্বৈত-জীবনী গ্রন্থগুলিতে[১১] এই সময়কার নানাবিধ বিবরণ প্রদত্ত হইলেও এই সম্বন্ধে কিংবা অদ্বৈত-বাল্যলীলাদি সম্বন্ধে যাহা জানা যায়, তাহাতে বড় জোর এইটুকু বলা চলে যে নির্ভীক স্বভাব অদ্বৈতের দুর্দান্তপনায় রাজপুত্রকেও ভীত সন্ত্রস্ত থাকিতে হইত এবং শক্তি-উপাসক রাজা দিব্যসিংহ যে বিষ্ণু-উপাসক হইয়াছিলেন, তাহাতেও কোন না কোন ভাবে অদ্বৈতের প্রভাব ছিল। কিন্তু অদ্বৈত কিংবা তাঁহার পিতামাতা যে ঠিক কোন সময় নাগাৎ শান্তিপুরবাসী হন, তাহা নির্ধারণ করা যায় না। 'অদ্বৈত-প্রকাশ'-মতে অদ্বৈত দ্বাদশবর্ষবয়ঃক্রমকালে শান্তিপুরে পৌছান। কিন্তু একমাত্র এই গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত করা চলে না। তবে তিনি যে শান্তিপুরে পৌছাইবার পর পূর্ণবাটী কিংবা ফুল্লবাটী গ্রামস্থ শান্ত বা শান্তনু-আচার্যের নিকট নানাবিধ শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া মহাপণ্ডিত হন, সে সম্বন্ধে প্রায় সকল গ্রন্থকারই একমত।[১২]

খুব সম্ভবত পিতামাতার পরলোক-প্রাপ্তির পর অদ্বৈতাচার্য পিণ্ডদানের নিমিত্ত গয়া গমন করিলে সেখান হইতেই তাঁহার তীর্থযাত্রা আরম্ভ হয়।[১৩] 'অদ্বৈত-প্রকাশে'র বিবরণ[১৪] অনুযায়ী সেই সময় তাঁহার সহিত মাধবেন্দ্র-পুরী ও 'পদকর্তা 'দ্বিজ বিদ্যাপতি'র সাক্ষাৎ ঘটে। ইঁহাদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তির সহিত মিলনের কথা 'প্রেমবিলাসে'র চতুর্বিংশ বিলাসেও বিবৃত হইয়াছে এবং 'ভক্তিরত্নাকর'-কারও অন্য প্রমাণ-অবলম্বনে অদ্বৈত-মাধবেন্দ্র-সাক্ষাৎকার ঘটনাটিকে স্বীকৃতিদান করিয়াছেন। খুব সম্ভবত, মাধবেন্দ্র কর্তৃক যে প্রেমভক্তির বীজ পূর্বেই উপ্ত হইয়াছিল তাহাই এখন অদ্বৈত স্পর্শে অঙ্কুরিত হওয়ার ফলে উভয়ের মিলিত-প্রত্যয় ও প্রচেষ্টার মধ্য দিয়াই ভারত-ভূমিতে ভবিষ্যৎ ভক্তিধর্ম-প্রচারের ভূমিকা প্রস্তুত হয়। এইজন্যই বোধকরি মুরারি-গুপ্ত জানাইয়াছেন যে প্রথমে মাধবেন্দ্র-পুরীর আবির্ভাব ঘটে এবং তাহার পর 'ঈশ্বরাংশো

(১১) অ. প্র.—৩য়. অ., পৃ. ৯ ; প্রে. বি.—২৪শ. বি., পৃ. ২২৯ ; তু.—অ. ম.—পৃ. ১১-১৬ (১২) অ. প্র.—৩য়.অ., পৃ. ৯ ; প্রে. বি.—(২৪শ. বি., পৃ. ২২৯)-মতে 'ফুল্লবাটী' গ্রামস্থ শান্তাচার্যের নিকট পড়িয়া তিনি 'আচার্য'-আখ্যা প্রাপ্ত হন। অ. ম.-এ (পৃ. ১৭) শান্তাচার্যকে শান্তনু আচার্য বা ভট্টাচার্যও বলা হইয়াছে। (১৩) ভ.র.—৫।২০৮০-৮১ ; ১২।১৭৭১-৭২ ; অ. ম.—পৃ. ১৮ (১৪) অ. প্র.-মতে মধ্বাচার্য-স্থানে পৌছাইলে অদ্বৈত মাধবেন্দ্রের সাক্ষাৎ পান এবং মাধবেন্দ্র তাঁহাকে জানান যে সেই মহাঘোর অধর্মের অভ্যুত্থানকালে ধর্ম সংস্থাপনার্থ স্বয়ং-ভগবানের আবির্ভাবকাল আগতপ্রায়। —এই বর্ণনা সম্ভবত কবিকল্পনাপ্রসূত।

দ্বিধা ভূত্বাঽদ্বৈতাচার্য্যশ্চ সংগুণঃ'।[১৫] কিন্তু বিদ্যাপতির সহিত অদ্বৈতের সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে ডা. বিমানবিহারী মজুমদার 'অদ্বৈতপ্রকাশো'ক্ত ঘটনাটিকে অস্বীকার করিয়াছেন।[১৬] তাঁহার অস্বীকৃতির কারণগুলি অনুপেক্ষণীয়।

কাশীতে আসিলে 'মহাভাগবতোত্তম' সন্ন্যাসী বিজয়-পুরীর সহিত অদ্বৈতের সাক্ষাৎ ঘটে। 'অদ্বৈতমঙ্গল' হইতে জানা যায়[১৭] যে অদ্বৈতের 'মামা' 'মাধবেন্দ্র-সতীর্থ' এই বিজয়পুরী মথুরা-বৃন্দাবনাদি পরিদর্শনান্তে শান্তিপুরে আসিয়া অদ্বৈতকে ভাগবত-পাঠ করিয়া শুনাইয়াছিলেন এবং পরে তিনি অদ্বৈত-নির্দেশে বালক গৌরাঙ্গের সহিত সাক্ষাৎ করেন। গ্রন্থকার বলেন যে বিজয়-পুরীর শান্তিপুরে বাসকালে গ্রন্থকার তাঁহার নিকট হইতে অদ্বৈতপ্রভুর বাল্যজীবনাদি সম্বন্ধীয় নানাবিধ তথ্য শ্রবণ করিয়াছিলেন।

উপরোক্ত 'প্রেমবিলাস' ও 'অদ্বৈতপ্রকাশ' এবং সম্ভবত 'ভক্তিরত্নাকর'[১৮] মতে মথুরা ও ব্রজধাম-পরিক্রমাকালে অদ্বৈত মদনমোহনবিগ্রহ আবিষ্কার করিয়া একটি বটবৃক্ষতলে তাহার অভিষেক ও স্থাপনা করিয়াছিলেন।[১৯] 'অদ্বৈতমঙ্গলে' ইহার সমর্থন[২০] আছে। গ্রন্থকার আরও জানাইতেছেন যে ঐ সময় যমুনাতীরে কাম্যবন-নিবাসী কৃষ্ণদাস নামক এক কিশোরবয়স্ক বিপ্রের সহিত অদ্বৈতের সাক্ষাৎ ঘটে এবং কৃষ্ণদাসের সেবায়[২১] তুষ্ট হইবার পর তিনি তাঁহাকে দীক্ষাদান করিয়াছিলেন। পরে কৃষ্ণদাস অদ্বৈত-জীবন সম্বন্ধীয় নানা বিবরণ সংবলিত একটি কড়চা লিখিয়া অদ্বৈত-শিষ্য শ্রীনাথ-আচার্যকে[২২] তাহা প্রদান করিয়াছিলেন এবং শ্রীনাথের নিকট সেই বিবরণ প্রাপ্ত, ও নানা বিষয় অবগত হইয়া হরিচরণদাস তাঁহার 'অদ্বৈতমঙ্গল' রচনা করেন।

পূর্বোক্ত গ্রন্থদ্বয়ে আরও লিখিত হইয়াছে যে যবন-ভয়ে একবার মদনমোহন-বিগ্রহকে লুকাইয়া ফেলা হয় এবং মদনগোপাল নাম দিয়া অদ্বৈত পুনরায় তাহার প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার পর মথুরার দামোদর-চৌবে ও তৎপত্নী বল্লভা[২৩] আসিয়া সেই বিগ্রহ চাহিয়া লইয়া যান এবং পরবর্তিকালে সনাতন-গোস্বামী চৌবের গৃহ হইতে ঐ বিগ্রহ উদ্ধার করেন। 'অদ্বৈতপ্রকাশ'-মতে[২৪] চৌবে-দম্পতী বিগ্রহ লইয়া গেলে অদ্বৈত বিশাখা-নির্মিত কৃষ্ণের চিত্রপটখানি প্রাপ্ত হন এবং তাহা লইয়া শান্তি-পুরে পৌঁছাইলে মাধবেন্দ্র-পুরী আসিয়া তাঁহাকে রাধিকার একটি চিত্রপট অঙ্কন করিয়া যুগল-মূর্তির আরাধনা করিতে বলিলে অদ্বৈত-আচার্য পুরীরাজের নিকট দীক্ষাগ্রহণান্তে[২৫]

(১৫) শ্রীচৈ. চ.—১।৪।৫ (১৬) চৈ. উ.—পৃ. ৪৫২ (১৭) পৃ. ৪-২১ (১৮) ৫।২০৯১ (১৯) তু.—অ. ম. পৃ. ৪, ২০-২১ (২০) পৃ. ২০, ২৪, ২৭, ৩১ (২১) দশবৎসরব্যাপী সেবা (২২) শ্রীনাথ-আচার্য সম্বন্ধে সনাতন-গোস্বামীর জীবনী দ্রষ্টব্য (২৩) প্রে. বি.—২৪. বি., পৃ. ২২৪, ২৩১-৩২ (২৪) ৪র্থ.অ., পৃ. ১৬. (২৫) চৈ. চ. ২।৪, পৃ. ১০৩; চৈ. ভা.—৩।৪, পৃ. ২৯৩; চৈ. গ.—পৃ.৩; দ্র.—মাধবেন্দ্র-পুরী

অহাই করিতে থাকেন। কিন্তু এই বিবরণ আর কোনও গ্রন্থকর্তৃক সমর্থিত হয় না। গ্রন্থকার সম্ভবত অদ্বৈত-মহিমা ঘোষণার্থে চৈতন্য-ভাবাদর্শের একটি স্বাভাবিক ও বিশ্বাসযোগ্য ভূমিকা প্রস্তুত করিতে চাহিয়া বৃন্দাবনে অদ্বৈতের মদনমোহন-বিগ্রহ প্রাপ্তি ও শান্তিপুরে মাধবেন্দ্রের নিকট তাঁহার দীক্ষাগ্রহণ, এই দুইটি ঘটনার মধ্যে অদ্বৈতকর্তৃক যুগলমূর্তি আরাধনার উপাখ্যানটিকে সুকৌশলে যোজনা করিয়া থাকিবেন।

'অদ্বৈতপ্রকাশ'-কার বলিতেছেন যে এই সময় 'বেদপঞ্চানন' কমলাক্ষ (=অদ্বৈত রাঢ়দেশবাসী দ্বিজ-দিগ্বিজয়ী শ্যামদাসকে পরাভূত করিয়া 'অদ্বৈত'-নাম প্রাপ্ত হন, এবং শ্যামদাসও অদ্বৈতের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। 'প্রেমবিলাসে'র চতুর্বিংশ বিলাস[২৬] মতে এই বড়-শ্যামদাস ইহার পর ভাগবত পাঠ করিয়া ভাগবতাচার্য আখ্যা প্রাপ্ত হন। 'অদ্বৈতমঙ্গলে'র শ্যামদাস-বিবরণ একটু ভিন্ন ধরণের।[২৭] আবার 'প্রেমবিলাসে' দেখা যায়[২৮] যে খেতরির মহামহোৎসব এবং মহা-অধিবেশন উপলক্ষে কামদেব, পুরুষোত্তম ও বনমালীদাস প্রভৃতির সহিত একজন শ্যামদাস উপস্থিত ছিলেন। তিনি এই শ্যামদাস কিনা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। 'গৌরপদতরঙ্গিণী'তে শ্যামদাস-ভণিতায় যে পাঁচটি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার শেষ তিনটি পদ[২৯] অদ্বৈত-প্রশস্তিমূলক হওয়ায় অন্তত সেইগুলিকে অদ্বৈত-শিষ্য আলোচ্যমান দ্বিজ-শ্যামদাসের রচিত বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। প্রথম দুইটি পদ একই পদের পুনরাবৃত্তিমাত্র। কিন্তু দুইটি পদই ব্রজবুলি ভাষায় লিখিত এবং উহাতে কবি 'সীতাপতি আচার্য্য'কেই 'দয়াময় পহুঁ মোর' বলিয়া বন্দনা করিয়াছেন।

ক্রমে অদ্বৈত-আচার্যের নাম-যশ ছড়াইয়া পড়িতে থাকে। একদিন লাউড় হইতে রাজা দিব্যসিংহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 'অদ্বৈতপ্রকাশ'-মতে এইসময় অদ্বৈত-আচার্য তাঁহার কৃষ্ণানুরাগ দেখিয়া তাঁহাকে 'কৃষ্ণদাস'-আখ্যায় অভিহিত করেন এবং কৃষ্ণদাস নিশ্চিন্ত মনে কৃষ্ণনাম জপ করিবার জন্য সুরধুনীতীরে একটি নিরালা-স্থানে কুটির নির্মাণ করাইলে 'তদবধি গ্রামের নাম হৈল ফুল্লবাটী।' এইস্থানে বসিয়া কৃষ্ণদাস অদ্বৈতপ্রভুর বাল্যলীলা অবলম্বন করিয়া 'অদ্বৈতবাল্যলীলাসূত্র' নামে একটি সংস্কৃত পুস্তিকা রচনা করেন।[৩০] গ্রন্থ রচনার পর জীবনের শেষাবস্থায় তিনি ব্রজধামে চলিয়া যান। 'প্রেমবিলাসে'র চতুর্বিংশ বিলাস-মতে[৩১] তিনিই সর্বপ্রথম গৌড় হইতে গিয়া বৃন্দাবনবাসী হন এবং তথায় কৃষ্ণদাস-ব্রহ্মচারী নামে বিখ্যাত হন; পরে রূপ-সনাতন ও কাশীশ্বর-গোস্বামীর সহিত তাঁহার সখ্য ঘটে। বৃন্দাবনেই তিনি তিরোহিত হন।

(২৬) পৃ. ২৩৩ (২৭) পৃ. ৩৭-৩৮ (২৮) ১৯শ. বি., পৃ. ৩০৯, ৩৩৭ (২৯) পৃ. ২৯১, ২৯৬, ২৯৯
(৩০) অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি লিখিতেছেন, "এতদ্ব্যতীত তিনি বঙ্গভাষায় 'বিষ্ণুভক্তিরত্নাবলী' নামক গ্রন্থের পদ্যানুবাদ করেন।"—বীরভূমি, পৌষ, ১৩১১ (৩১) পৃ. ২৩৩

এদিকে অদ্বৈতপ্রভু যবন-হরিদাসের সহিত বিশেষভাবে যুক্ত হন[৩২] এবং তিনি নিজ স্বচিত্তে হরিদাসকে আশীর্বাদ করিয়া তাঁহাকে ভক্তি-শিক্ষা প্রদান করেন। সেই সময় হরিদাস সর্বজনগম্য একটি সহজ পথের সন্ধান চাহিলে আচার্য তাঁহাকে নাম-প্রচারের যোগ্যতম ব্যক্তি মনে করিয়া হরিনাম-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে শিক্ষা দান করেন। সম্ভবত ম্লেচ্ছ বিধর্মীর মস্তকাদি মুণ্ডন করাইয়া ও তিলক-তুলসী, কৌপীন-ডোর দিয়া হরিদাসকে নামমন্ত্র দান করা হইয়াছিল।[৩৩] কিন্তু এইভাবে অদ্বৈত-হরিদাস মিলনে যে শক্তি-সমন্বয় ঘটিল তাহা জাতির গণ্ডীকে কোথায় ভাসাইয়া দিল। হরিদাসকে অবলম্বন করিয়াই অদ্বৈতাচার্যের অন্তর্নিহিত বিদ্রোহী শক্তিরও সার্থক প্রয়োগ ঘটিল। সম্ভবত এই সময়ে একদিন কৃষ্ণদাস-পণ্ডিতের সম্মুখে হরিদাসের সহিত তর্কযুদ্ধে পরাজিত হইয়া তর্কচূড়ামণি যদুনন্দন-আচার্যও অদ্বৈতের নিকট কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণ করেন[৩৪] এবং এইভাবে শ্যামদাস, কৃষ্ণদাস, হরিদাস, যদুনন্দন, ইঁহারা একে একে আসিয়া অদ্বৈতপ্রভুর পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। আর আসিলেন নবদ্বীপের শ্রীবাস-পণ্ডিত। ইঁহাদেরই চেষ্টা ও সাহচর্যে এবং বিশেষ করিয়া শ্যামদাসের উদ্যোগে ও যদুনন্দনের শিষ্য হিরণ্য ও গোবর্ধন নামক ধনী ভ্রাতৃদ্বয়ের অর্থানুকুল্যে সপ্তগ্রাম সন্নিকটস্থ নারায়ণপুরের কুলীনাগ্রগণ্য নৃসিংহ-ভাদুড়ীর কন্যা সীতা- ও শ্রী-দেবীর সহিত অদ্বৈত-আচার্যের পরিণয় ঘটে। বিবাহের পর তিনি সীতাদেবী ও সম্ভবত শ্রী-দেবীকেও মন্ত্রদান করিয়া দীক্ষিত করিয়া লন।[৩৫]

এইবার অদ্বৈত-আচার্য তাঁহার কঠোর সাধনায় অগ্রসর হইলেন। প্রধান সঙ্গী হইলেন হরিদাস। অনাচার ও অধর্মের সেই অভ্যুত্থানকালে হরিদাস হরিনাম প্রচার করেন; আর অদ্বৈত গঙ্গাবক্ষে দাঁড়াইয়া নিরন্তর তুলসী-পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিতে করিতে মুক্তি-দাতা মহামানবকে আহ্বান করিতে থাকেন।[৩৬] হরিদাস যেমন শান্তিপুর ফুলিয়া কুলীন প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, অদ্বৈতও তদ্রূপ নবদ্বীপে আসিয়া টোল খুলিয়া বসিলেন।[৩৭] ভক্ত-শ্রীবাসের গৃহে তাঁহার বিশেষ অধিষ্ঠান[৩৮] হইল। 'অদ্বৈতপ্রকাশ'-মতে এই সময় বিষ্ণুদাস-আচার্য[৩৯] অদ্বৈতের মন্ত্রশিষ্য হইয়া তাঁহার নিকট শ্রীমদ্ভাগবত

(৩২) চৈ. ভা.—১।১১ ; অ. প্র.—৭ম. অ. (৩৩) প্রে. বি.—২৪শ. বি., পৃ. ২৩৩ ; চৈতন্যচরিতামৃতের অদ্বৈত-শাখা-বর্ণনার মধ্যে কিন্তু এই হরিদাসের নাম উল্লেখিত হয় নাই। (৩৪) অ. প্র. (৩৫) প্রে. বি.—২৪শ. বি, পৃ. ২৩৭–৩৮ ; অ. ম.—পৃ. ৪২–৪৪ ; অ. প্র. ৮ম. অ., পৃ. ৩০; অ. প্র.-মতে সীতাদেবী নৃসিংহের পালিতা কন্যা ছিলেন, সীতাগুণকদম্ব-মতে গোবিন্দ নামক এক ব্যক্তির। কিন্তু এইরূপ বর্ণনার অন্য সমর্থন নাই। (৩৬) চৈ. ভা.—১।২, পৃ. ১১ ; চৈ. চ.—১।৬, পৃ. ৩৮, ৬১ ; অ. প্র.—৯ম. বি., ১০ম. অ. (৩৭) অ. প্র.—১০ম. অ., পৃ. ৪০. ; তু.—ভ. র.—১২।১৭৮ ; সী. ক.—পৃ. ১৫ (৩৮) ভ. র.—১২।১৭৯–৯০। (৩৯) ইনিই তথাকথিত সীতাগুণকদম্ব-রচয়িতা বিষ্ণুদাস-আচার্য কিনা বলা দুষ্কর। তবে এই নামের অন্য কাহাকেও অন্য কুত্রাপি পাওয়া যায়না।

অধ্যয়ন করিতে থাকেন এবং 'নন্দনী প্রভৃতি শ্রীমান বাসুদেব দত্ত। প্রভুস্থানে মন্ত্র লঞা হইলা কৃতার্থ॥'[৪০] এই সমস্ত শিষ্য ও ভক্তগণের সাহায্যে অদ্বৈতাচার্য বেশ একটি দল প্রস্তুত করিয়া ফেলিলেন এবং ইঁহাদের মনে ভক্তিভাব জাগাইবার জন্য তাঁহার গীতাপাঠ পূর্বক সমস্ত শ্লোকের ভক্তিধর্মানুমোদিত ব্যাখ্যা-প্রদান চলিতে লাগিল।[৪১]

১৪৮৬ খ্রী.-এর ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে, গৌরাঙ্গপ্রভুর আবির্ভাব ঘটিলে জন্ম-মুহূর্তের লক্ষণাদি দেখিয়া সকলেই বুঝিলেন যে নবজাতক একটি সাধারণ শিশুমাত্র নহেন। দীর্ঘকালের আকুল প্রতীক্ষার পর অদ্বৈতও মনে করিলেন যে সেই আবির্ভাব নিশ্চয়ই তাঁহার এতদিনকার আরাধনার অব্যর্থ ফলস্বরূপ। নীলাম্বর-চক্রবর্তীর গণনা তাঁহার সেই প্রত্যয়কে সুদৃঢ় করিয়া দিল এবং তিনি সেই ক্ষুদ্র শিশুকে অবলম্বন করিয়া এক বিরাট কল্পনা-সৌধ নির্মাণ করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার দিক হইতে তাহা কল্পনামাত্র ছিলনা। জগন্নাথ-পুত্রই যে মুক্তিদাতা মহামানব, সে বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ থাকিল না।

ক্রমে বিশ্বম্ভরের শৈশব অতিক্রান্ত হইতে চলিল। ইতিমধ্যে তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিশ্বরূপ অদ্বৈতাচার্যের নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিয়া শাস্ত্রজ্ঞ ও সংসারবিরাগী হইয়াছিলেন। সেই সূত্রে অদ্বৈত বিশ্বম্ভরের মধ্যেও একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ গড়িয়া উঠে। কিছুকাল পরে বিশ্বরূপ সন্ন্যাস লইয়া চলিয়া গেলে বিশ্বম্ভরই অদ্বৈতাচার্যের সকল আশা-ভরসার স্থল হইয়া উঠিলেন।

এইবার অদ্বৈত-মন্দিরে শ্রীবাস-মুকুন্দাদি পড়ুয়াবৃন্দের ভিড় জমিয়া উঠিতে লাগিল।[৪২] বিশ্বম্ভরও মধ্যে মধ্যে গদাধরাদি ভক্তের সহিত অদ্বৈত-সভায় গিয়া তাঁহার প্রতিভার ছাপ রাখিয়া যাইতে লাগিলেন এবং সেই অলৌকিক প্রতিভায় অদ্বৈতাচার্য যেন চুম্বকের ন্যায় আকৃষ্ট হইলেন। ক্রমে পিতৃবিয়োগ, বিবাহ, পুনর্বিবাহ ও গয়াযাত্রা প্রভৃতি ঘটনার মধ্যদিয়া যেমন বিশ্বম্ভরের জীবন পরিবর্তিত হইয়া চলিল, অদ্বৈত-জীবনেও সেইরূপ নানা ঘটনা ঘটিয়া গেল। তিনি কয়েকটি পুত্র সন্তান লাভ করিলেন,[৪৩] পদ্মনাভ-চক্রবর্তীর পুত্র লোকনাথ[৪৪] প্রভৃতি ভক্তকে মন্ত্রদীক্ষা দিলেন, ঈশ্বর-পুরী নবদ্বীপে পৌঁছাইলে তাঁহার গৌরাঙ্গ-সম্বন্ধীয় ধারণায় প্রভাবিত হইলেন[৪৫] এবং নিপীড়িত ভক্তবৃন্দ তৎসমীপে উপস্থিত হইলে তিনি বারংবার তাঁহাদিগকে আর কিছুকাল অপেক্ষা করিতে বলিয়া গৌরাঙ্গ-অভিমুখে তাকাইয়া রহিলেন।

(৪০) অ. প্র.—১০ম.অ., পৃ. ৪০ (৪১) চৈ.ভা.—২।১০, পৃ. ১৫৫ (৪২) ঐ.—১।৭, পৃ. ৫১ (৪৩) অ. প্র.—১১শ. অ., পৃ. ৪৫, ৪৬; ১৫শ. অ.; গ্রন্থকার ঈশান-নাগর বলেন যে এই সময় তিনি স্বীয় মাতার সহিত শ্রীহট্ট হইতে আসিয়া অদ্বৈত-গৃহে আশ্রয় প্রাপ্ত হন; তখন তিনি পঞ্চবর্ষবয়স্ক শিশুমাত্র। (৪৪) ভ. র.—১।২৯৮; অ. প্র.—১২শ. অ., পৃ. ৫০; ন. বি.—১ম. বি., পৃ. ৩. (৪৫) চৈ. ভা.—১।৭, পৃ. ৫২।

এদিকে বিশ্বম্ভরও স্পষ্টই দেখিতেছিলেন যে মহাপণ্ডিত বৃদ্ধ-অদ্বৈত ও প্রবীণ-ভক্ত শ্রীবাসাদিকে অবলম্বন করিয়া নির্যাতিত জনসমাজ যেন তাঁহারই দিকে তাকাইয়া বসিয়া আছে। স্বীয় শক্তি বা প্রতিভা সম্বন্ধে তিনি অচেতন ছিলেন না। সেই শক্তির সার্থক প্রয়োগ ঘটাইয়া বৃহত্তর জনসমাজের পার্শ্বে দাঁড়াইবার জন্য তিনিও ব্যাকুল হইলেন। জনগণের মিলিত শক্তি যে স্বীয় শক্তিকে জাগ্রত ও বহুগুণিত করিয়া দিতে পারে, সে সম্বন্ধে তিনি ক্রমেই স্থির-নিশ্চয় হইলেন। শ্রীবাসের প্রশ্নোত্তরে তিনি একদিন তাঁহাকে[৪৬] (এবং পরে অদ্বৈতপ্রভুকেও) জানাইয়া দিলেন যে তাঁহাদের কৃপা হইলে তিনি নিশ্চয়ই একদিন ভগবান-কৃষ্ণের বেদীমূলে আসিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইতে পারিবেন।

গয়া হইতে ফিরিয়া গৌরাঙ্গপ্রভু কৃষ্ণ প্রেমোন্মত্ত হইলে অদ্বৈতসহ ভক্তবৃন্দ তাঁহাকে বৈকুণ্ঠাধিপতি 'স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন' বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া বসিলেন। তাঁহাদের দুঃখ-দুর্দশা দেখিয়া শেষে একদিন তিনি তাঁহাদিগকে জানাইলেন[৪৭] :

> তোমা সভা সেবিলে কৃষ্ণভক্তি পাই।……
> তোমা সভা হৈতে হৈব জগত উদ্ধার।
> করাইবা তোমরা কৃষ্ণের অবতার॥
> সেবক করিয়া মোরে সভেই জানিবা।
> এই বর—মোরে কভু না পরিহরিবা॥

বৃহত্তর-সমাজশক্তির উপর এতবড় বিশ্বাস ও নির্ভরতা, এবং একমাত্র তাহাকেই অবলম্বন করিয়া এতবড় আত্মপ্রত্যয়াত্মক ঘোষণা জগতের ইতিহাসে বিরল। কিন্তু অদ্বৈতপ্রভু গৌরাঙ্গ-শক্তির কথাই সর্বসমক্ষে ঘোষণা করিতে লাগিলেন। একদিন গদাধর সহ গৌরাঙ্গ অদ্বৈত-মন্দিরে পৌছাইলে তিনি গদাধরের বিস্ময়সত্ত্বেও গৌরাঙ্গপূজা আরম্ভ করিলেন।[৪৮]

এইবার ভক্তবৃন্দসহ গৌরাঙ্গপ্রভু লীলা ও সংকীর্তন আরম্ভ করিলেন এবং কিছুকাল পরে নিত্যানন্দ আসিয়া তাঁহাদের সহিত যুক্ত হইলেন। কিন্তু তৎপূর্বে অদ্বৈতপ্রভু শান্তিপুরে চলিয়া যাওয়ায় একদিন নৃত্য-সংকীর্তনকালে প্রভুবিশ্বম্ভর ভাবাবেশে 'নাঢ়া' 'নাঢ়া' বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিলেন।[৪৯] কেহ কিছু বুঝিতে না পারায় গৌরাঙ্গ

(৪৬) ঐ—১।৮ পৃ. ৬১ (৪৭) চৈ. ভা.—২।২, পৃ.১০৬-৭ (৪৮) ঐ—পৃ. ১০৯ (৪৯) ঐ—২।৫, পৃ. ১২৩ ; বৈষ্ণব-চরণদাসের মতে (শ্রীবাসচরিত-উপসংহার, পৃ. ১) লাউড়=লাড়্লী=নাড়্লী=নাড়িয়াল=নাড়া, নাঢ়া। কালীকান্ত-বিশ্বাস বলেন (ব. সা. প. প.—রংপুর শাখা, Vol I+II), "লাউড়ে জন্ম বলিয়া সকলে অদ্বৈতাচার্যকে 'নাড়াবুড়া' বলিত।" ডা. সুকুমার সেন বলেন (বা. সা. ই.—অ. সং., ১ম. খণ্ড, পূর্বার্ধ, পৃ. ৪২৮), "আগে হিন্দু রাজাদের খাস ভৃত্যদের মাথা নেড়া থাকিত। তাহা হইতে রাজা-জমিদারের প্রিয় পার্শ্বচর ভৃত্যের সাধারণ নাম হয়, 'নাড়া'। এইজন্য আবেশ হইলে গৌরাঙ্গ অদ্বৈতকে 'নাড়া (নাঢ়া)' বলিয়া ডাকিতেন।

তাঁহাদিগকে জানাইলেন যে তিনি অদ্বৈতাচার্যকে আহ্বান করিয়াছেন। অদ্বৈতই তাঁহার আশৈশব গুরু এবং আধ্যাত্মিক প্রেরণার উৎসস্বরূপ। তাঁহার প্রবর্তনাতেই তিনি আজ ভক্তসহ নৃত্যগানে এমন উন্মত্ত হইয়াছেন। আর একদিন তিনি শ্রীবাস-ভ্রাতা রামাইকে শান্তিপুরে পাঠাইয়া সস্ত্রীক অদ্বৈতকে ডাকিয়া পাঠাইলে অদ্বৈত নিজ সৌভাগ্য-স্মরণে অভিভূত হইয়া ভাবিলেন, "মোর লাগি প্রভু আইলা বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া।" কিন্তু তিনি এই বিষয়ে স্থির-নিশ্চয় হইতে চাহিয়া প্রথমে নন্দন-আচার্যের গৃহে লুকাইয়া রহিলেন এবং গৌরাঙ্গের 'ঠাকুরালি' দেখিবার জন্য রামাইকে পাঠাইয়া দিলেন। গৌরাঙ্গ কিন্তু পূর্ব হইতেই তাঁহাদের আগমন সংবাদ পাইয়া ভিন্নপথে শ্রীবাসগৃহে[৫০] গিয়া বিষ্ণুমণ্ডপের বিষ্ণু-খট্টায় উপবিষ্ট রহিলেন। তাঁহার নির্দেশক্রমে নিত্যানন্দাদি ভক্ত তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। রামাই পৌঁছান মাত্রই তিনি অদ্বৈতের আগমনাদি সম্বন্ধে রামাইকে বলিয়া দিলে অদ্বৈতপ্রভুকে ডাকিয়া আনা হইল। অদ্বৈত আসিয়া দেখিলেন যে নিত্যানন্দ তাঁহার মস্তকে ছত্র ধরিয়াছেন, গদাধর তাঁহাকে তাম্বূল যোগাইতেছেন, ভক্তবৃন্দ তাঁহার স্তুতিবাদ করিতেছেন। অদ্বৈতের সমস্ত সংশয় চিরতরে দূরীভূত হইল। গৌরাঙ্গের পদতলে প্রণত হইয়া তিনি তাঁহাকে কৃষ্ণের অবতার জ্ঞানে[৫১] বহুবিধ উপচারে পূজা করিয়া নৃত্য-কীর্তন করিতে লাগিলেন। তারপর বিশ্বম্ভরপ্রভু তাঁহাকে বরদান করিতে ইচ্ছুক হইলে তিনি জানাইলেন যে তিনি যখন দুই চক্ষু ভরিয়া প্রাণের ঠাকুরকে দেখিতে পাইয়াছেন, তখন তাঁহার সকল সাধই মিটিয়াছে। তবুও তিনি একবার যে-প্রার্থনা জানাইলেন, তাহাতে তাঁহার চিত্তের বিপুল ঔদার্যের পরিচয় পরিস্ফুট হইল।[৫২]

> অদ্বৈত বোলেন, "যদি ভক্তি বিলাইবা।
> স্ত্রী-শূদ্র আদি যত মূর্খেরে সে দিবা॥
> বিদ্যাধন কুল আদি তপস্যার বাদে।
> তোর ভক্ত তোর ভক্তি যে যে জন বাধে॥
> সে পাপিষ্ঠ সব দেখি মরুক পুড়িয়া।
> চণ্ডাল নাচুক তোর নামগুণ গায়্যা॥"

অধর্মের অভ্যুত্থানের দিনে স্বয়ং-ভগবান ভক্তিধর্ম বিতরণ করিয়া জগৎকে উদ্ধার করিবেন,—ইহাই ছিল অদ্বৈতপ্রভুর ধারণা।

এখন হইতে গৌরাঙ্গ সম্বন্ধে অদ্বৈতাচার্যের মনুষ্যজ্ঞান প্রায় রহিত হইয়া আসিল। তিনি সর্বদা গৌরাঙ্গপদ-সেবার জন্য উন্মুখ থাকিতেন। কিন্তু গৌরাঙ্গ তাঁহাকে গুরুজ্ঞান

(৫০) ভ. র.—১২।১৭৪৯, ১৭৮৯। (৫১) চৈতন্যভাগবত-মতে (২।৬, পৃ. ১২৯) অদ্বৈতাচার্য কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন করেন। 'চৈতন্য চরিতামৃত' (১।১৭, পৃ. ১৭১)-কর্তৃক ইহা সমর্থিত হইয়াছে।
(৫২) চৈ. ভা.—২।৭, পৃ. ১৩১

করায়[৫৩] তিনি কখনও অদ্বৈতপ্রভুকে স্বীয় পদধূলি লইতে দিতেন না। গৌরাঙ্গপ্রভু ভাবাবিষ্ট হইলে অবশ্য অদ্বৈতাচার্য তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতেন। কিন্তু তিনি সচেতন থাকিলে অদ্বৈতকে ব্যর্থ হইতে হইত এবং গৌরাঙ্গই বলপূর্বক অদ্বৈত-পদধূলি মস্তকে লইতেন। শেষে তিনি স্থির করিলেন যে তিনি কোনও প্রকারে গৌরাঙ্গের ক্রোধোদ্রেক করিয়া অভীষ্ট সিদ্ধ করিবেন। এই সময় পাষণ্ডী-গণ গৌরাঙ্গের কীর্তিকলাপ ও তাঁহার 'গূঢ়রূপে সংকীর্তনে' ক্রুদ্ধ হইয়া একদিন তাঁহার নিকট রাজদণ্ডাজ্ঞার মিথ্যা সংবাদ দান করিলে অদ্বৈতপ্রভু দুঃখিত না হইয়া বরং কৌতুক করিতে লাগিলেন[৫৪]। কিন্তু হিতে বিপরীত হইল। সেইদিন গৌরাঙ্গ গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন এবং পরে নন্দন-আচার্যের গৃহে লুকাইয়া রহিলেন। উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগে অদ্বৈত যেন মৃতপ্রায় হইলেন। পরদিন শ্রীবাসের নিকট সেই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া গৌরাঙ্গ ফিরিয়া আসিয়া অদ্বৈতকে আশ্বস্ত করিলেন।

ক্রমে গৌরাঙ্গপ্রভু ভাবজগতের ঊর্ধ্বলোকে আরোহণ করিতে লাগিলেন। সঙ্গী হইলেন তাঁহার ভক্তবৃন্দ। তাই চন্দ্রশেখর-আচার্যের গৃহে অভিনয়ের দিন ভক্তবৃন্দকেও তাঁহার সহিত রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইতে হইল। তিনি নিজে শ্রীরাধার ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। আর শ্রীকৃষ্ণের অভিনয় করিতে হইয়াছিল তাঁহার ভাবলোকে বিচরণের গুরু ও সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গী অদ্বৈতাচার্যকে।[৫৫] অভিনয়, অভিনয়মাত্র। কিন্তু গৌরাঙ্গ-অভিপ্রেত অভিনয়ের মধ্যে গৌরাঙ্গের রাধিকা-ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবার যদি কোনও গূঢ়ার্থ থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে আর যাহাই হউক, কৃষ্ণ-ভূমিকার মধ্যেই যে তাহার চরিতার্থতা, একথাও বলা যাইতে পারে।

অদ্বৈতপ্রভুর মনে কিন্তু বেদনা ছিল। তাঁহার নিকট গৌরাঙ্গ ছিলেন স্বয়ং-ভগবান এবং তিনি নিজে একজন দীনাতিদীন ভক্ত ব্যতিরেকে কিছু নহেন। তাই গৌরাঙ্গপ্রভু যখন গুরুবুদ্ধি পোষণ করিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবান হন, তখন তিনি দ্বিধা ও সংকোচে অস্থির হন। এক দুর্নিবার কামনা লইয়া শেষে তিনি একটি বিশেষ পরিকল্পনা করিয়া বসিলেন। হঠাৎ একদিন শান্তিপুরে গিয়া তিনি বাশিষ্ঠ্য রামায়ণ ব্যাখ্যায় নিজেকে নিয়োজিত করিলেন। এ-ব্যাখ্যাও কিন্তু সম্পূর্ণ নূতন ধরনের। তিনি শ্রোতৃবর্গকে জানাইলেন[৫৬]

জ্ঞান বিনে কিবা শক্তি ধরে বিষ্ণুভক্তি।......

'বিষ্ণুভক্তি' দর্পণ লোচন হয় 'জ্ঞান।'

এদিকে বহুদিন যাবৎ অদ্বৈতের সাক্ষাৎ না পাইয়া একদিন বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দসহ শান্তিপুরে গিয়া[৫৭] দেখিলেন যে অদ্বৈতাচার্য পিঁড়ির উপর বসিয়া জ্ঞানযোগ প্রতিপাদন

(৫৩) দ্রু.—অ. ম.—পৃ. ৫৮ (৫৪) চৈ. ভা.—২।১৭, পৃ. ১৮৫ (৫৫) চৈ. না.—৩।১১ (৫৬) চৈ. ভা.—২।১৯, পৃ. ১৯৫ (৫৭) অদ্বৈতমঙ্গল (পৃ. ৬০)-মতে বিশ্বম্ভর প্রথমে গৌরীদাস-পণ্ডিতকে পাঠাইয়া অদ্বৈতকে নবদ্বীপে আনিবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইয়াছিলেন এবং গৌরীদাসের মারফত তিনি ইতিপূর্বে অদ্বৈতের তৎকালীন শিক্ষা বিষয়ে পরিচয়ও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

করিতেছেন। সীতাদেবী অচ্যুতানন্দ হরিদাস প্রভৃতি সকলেই বিশ্বম্ভরের আগমনে শশব্যস্ত হইলেন। কিন্তু বিশ্বম্ভর সরাসরি অদ্বৈতকে প্রশ্ন করিয়া বসিলেন :

বোল দেখি জ্ঞান ভক্তি হইতে কে বাড়া ?

কালবিলম্ব না করিয়া অদ্বৈত বলিয়া ফেলিলেন যে সর্বকালেই জ্ঞান বড় হইয়াছে ; যাঁর জ্ঞান নাই, ভক্তিতে তাঁর কি করিবে ! কথা শুনিয়া বিশ্বম্ভর যেন জ্ঞানশূন্য হইলেন এবং

ক্রোধে বাহ্য পাশরিলা শ্রীশচীনন্দন ॥
পিড়া হইতে অদ্বৈতেরে ধরিয়া আনিয়া।
স্বহস্তে কিলায় প্রভু উঠানে পাড়িয়া ॥

সীতাদেবী কাঁদিয়া উঠিলেন :

বুড়া বিপ্র বুড়া বিপ্র রাখ রাখ প্রাণ।

কিন্তু কে কাহার কথা শোনে! বিশ্বম্ভর যেন ক্রোধে আত্মহারা হইয়া প্রহার করিতে লাগিলেন।[৫৮] কিন্তু শেষে অদ্বৈত আনন্দে অধীর হইয়া গৌরাঙ্গগুণগান আরম্ভ করিলে বিশ্বম্ভর সম্বিৎ প্রাপ্ত হইয়া লজ্জিত হইলেন।

কিন্তু সম্ভবত এই ঘটনার ফলে একটি বিপর্যয় ঘটিয়া যায়। 'প্রেমবিলাসে'র চতুর্বিংশ-বিলাস-মতে কামদেব নাগরাদি[৫৯] কয়েকজন অদ্বৈত-শিষ্য সত্য সত্যই জ্ঞানবাদী হইয়া পড়েন। তাঁহাদের মধ্যে শঙ্করের নাম বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য।[৬০] অদ্বৈতপ্রভু তাঁহাকে নানাভাবে বুঝাইয়া বলিলেন :

মনোরথ সিদ্ধ মুই কৈনু এ প্রকারে ॥
ছাড় ছাড় ওরে রে পাগল ! নষ্ট হৈলা।

কিন্তু শঙ্করকে আর জ্ঞানমার্গ হইতে নিবৃত্ত করা সম্ভবপর হইলনা। অদ্বৈতপ্রভু শঙ্করাদি ভক্তবৃন্দকে বর্ণসংকর আখ্যা দিয়া[৬১] পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।

(৫৮) চৈ. ভা—২।১৯, পৃ. ১৯৮ ; অ. প্র.— ১৪ শ. অ., পৃ. ৫৯ ; চৈ. চ.—১।১৭, পৃ. ৭২ (৫৯)পৃ. ২৪০ (৬০) ভ. র.— ১২।১৯৮৫ ; তু.—অ. ম., পৃ.৫৯-৬১ (৬১) অ. ম.-পৃ. ৬১, [ডা. বিমান বিহারী মজুমদার মনে করেন যে (চৈ. উ.—পৃ. ৫৪০-৪৮) এই শঙ্করই আসামের বিখ্যাত প্রচারক শঙ্করদেব এবং ইনি একবার নীলাচলে গেলে মহাপ্রভুর সহিত ইঁহার সাক্ষাৎ ঘটে।] অ. ম.-মতে (পৃ. ৬২-৬৭) এই ঘটনার পর বিশ্বম্ভর অদ্বৈত-সীতাদেবীর সাহায্যে শান্তিপুরে অন্নকূট-উৎসবের অনুষ্ঠান করেন এবং তাহাতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, কায়স্থ ও বৈদ্য প্রভৃতি জাতির বিভিন্ন ব্যক্তি বিশ্বম্ভর-প্রভুর পার্শ্বে বসিয়া ভোজন. করিয়াছিলেন। পরিবেশন করিয়াছিলেন ঈশান শ্যামদাসাদি ভক্তবৃন্দ। তারপর এতদুপলক্ষে যে-দানলীলার অভিনয় সংঘটিত হইয়াছিল, তাহাতে অদ্বৈত, বিশ্বম্ভর, নিত্যানন্দ ও গৌরীদাস যথাক্রমে শ্রীকৃষ্ণ, রাধা, বড়াই ও সুবলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীবাস, কমলাকান্ত প্রভৃতিও অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। অ. ম.-বর্ণিত শান্তিপুরে এইরূপ দান-লীলাভিনয়ের কথা কিন্তু অন্য কোথাও নাই।

ক্রমে বিশ্বম্ভরের বয়ঃক্রম বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার উচ্চমার্গাশ্রয়ী আবেগানুভূতিসমূহ হৃদয়-হিমাদ্রির উন্নত স্তরে আসিয়া সঞ্চিত হইতে লাগিল। খেলাচ্ছলে এখন তিনি যাহা করিতে থাকেন, তাহার মধ্যেও গূঢ় অর্থ লুক্কায়িত থাকে কথাবার্তা ও চালচলনের মধ্যে আধ্যাত্মিক কার্য-কারণ সম্পর্কের সুস্পষ্ট ছাপ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীবাস-গৃহে প্রত্যহ যে সংগীত-নৃত্য চলিতে থাকে তাহা কেবল আবেগ-প্রসূত নহে, তাহার মধ্যে সত্যসন্ধান ও আত্মোপলব্ধির ঐকান্তিকতা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। ফলে ভক্তবৃন্দের মধ্যেও সেই ভাব কিছু পরিমাণে অনুপ্রবিষ্ট হইতে থাকে। অদ্বৈত ছিলেন গৌরাঙ্গের ঘনিষ্ঠতম ভক্ত—একদিকে গুরু, অন্যদিকে দাস। কিন্তু বালকের লীলাসঙ্গী হইতে বৃদ্ধের আর কোন সংকোচ রহিল না। এমনকি, শ্রীবাস-গৃহে কৃষ্ণজন্মোৎসবের দিনও তিনি গোপবেশ ধারণ পূর্বক অঙ্গনে দধি-হলদি ছড়াইয়াছিলেন।[৬২] গৌরাঙ্গপ্রভু কিন্তু তাঁহার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। অদ্বৈতের বিন্দুমাত্র অমর্যাদা তাঁহার কাছে অসহ্য ছিল। স্বয়ং শচীদেবী স্বীয় গুরু[৬৩] অদ্বৈতের প্রতি রূঢ়ভাবে সত্যবাক্য প্রয়োগ করায় গৌরাঙ্গের দৃঢ়তায় তাঁহাকেও সর্বজন সমক্ষে অদ্বৈত-অপরাধ খণ্ডন করিতে হইয়াছিল।[৬৪]

নবদ্বীপ-লীলা সাঙ্গ হইলে গৌরাঙ্গপ্রভু কাটোয়ায় গিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। দীক্ষাগ্রহণান্তে তিনি বৃন্দাবনোদ্দেশ্যে ছুটিতে থাকিলে নিত্যানন্দ গোপনে অদ্বৈতপ্রভুকে সংবাদ দিয়া চৈতন্যকে ভুলাইয়া গঙ্গাতীরে আনেন এবং উহাকেই যমুনা বলিয়া জানান। তিন দিবসের উপবাসক্লিষ্ট দেহ লইয়া ভাবোন্মত্ত চৈতন্য তখন গঙ্গাকেই যমুনা-ভ্রমে অবগাহন স্নান সম্পন্ন করিলেন। কিন্তু তিনি স্নানান্তে উপরে উঠিয়া দেখিলেন যে অদ্বৈতপ্রভু তাঁহার জন্য নদীতীরে অপেক্ষা করিতেছেন। যিনি তাঁহার আজন্ম আধ্যাত্মিক অবধায়ক ছিলেন, আজ তাঁহার সন্ন্যাস-গ্রহণের পরে যেন তিনি সমস্ত দায় হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হওয়ায় মাতৃমূর্তি ধারণ করিয়া উদাসীন পুত্রের সংবাদ লইবার জন্য পিছনে ছুটিয়াছেন। জগন্নাথ-মিশ্র তো বহুপূর্বেই পরলোকগত হইয়াছেন, শচীমাতার কাজও বোধকরি শেষ হইয়া আসিয়াছে। কৌপীন সম্বল করিয়া গৌরাঙ্গপ্রভু গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। আজ স্নানান্তে তিনি পরিধেয় বসন পাইবেন কোথায়! সম্মুখে তাকাইতেই দেখিতে পাইলেন যে কৌপীন-বহির্বাস লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন স্বয়ং অদ্বৈতপ্রভু। আচার্যকে দেখিয়া তিনি অবাক হইয়া গেলেন। তাঁহার

(৬২) ভ. র—১২।৩১৫৮ (৬৩) অ. ম.—পৃ. ৫৯ ; সী. চ.—পৃ. ৫ (৬৪) চৈ. ভা.—২।২২, পৃ. ২০৯-১০ ; চৈ. চ.—১।১৭, পৃ. ৭১ ; দ্র.—গৌরাঙ্গ-পরিজন।

বৃন্দাবনাবস্থিতির কথা আচার্য জানিলেন কেমন করিয়া![৬৫] অদ্বৈতাচার্যের সম্মুখ হইতে কিন্তু তখন বাস্তব জগতের একটি পর্দা অপসৃত হইয়া গিয়াছিল। তিনি জানাইলেন যে চৈতন্যপাদপূত স্থানের নামই তো বৃন্দাবন এবং তিনি যে স্থানে স্নান করিবেন তাহাইত যমুনা! সেইস্থলে গঙ্গা-যমুনা উভয়েই প্রবাহিত—পূর্বে গঙ্গা, পশ্চিমে যমুনা।[৬৬]

নৌকাযোগে আচার্যপ্রভু চৈতন্যকে তাঁহার পরপারস্থ[৬৭] গৃহে লইয়া গেলেন, স্বগৃহে তাঁহাকে প্রথম ভিক্ষাগ্রহণ[৬৮] করাইবেন। তাই তিনি যথাসাধ্য আয়োজন করিয়া চৈতন্যকে খাওয়াইলেন। কোন ওজর-আপত্তি টিকিল না। আচার্যের অনুরোধে চৈতন্যকে 'দিন দুই চারি' তাঁহার গৃহে অতিবাহিত করিতে হইল এবং অদ্বৈতপ্রভু স্বয়ং নৃত্য করিয়া ও মৃদঙ্গ বাজাইয়া[৬৯] মহাপ্রভুকে তৃপ্তিদান করিলেন। তারপর একদিন চৈতন্য নীলাচলের পথে ধাবিত হইলে নদীয়ার-নিমাই-এর প্রথম ও শেষ তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে অদ্বৈতাচার্যপ্রভু চৈতন্যের গমন-পথে তাঁহাকে দেখাশুনা করিবার জন্য নিত্যানন্দ, মুকুন্দ, জগদানন্দ ও দামোদর এই চারিজন[৭০] ভক্তকে সঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন।

চৈতন্যের নীলাচল-গমনের সঙ্গে সঙ্গে নদীয়ায় চাঁদের-হাট ভাঙিয়া গেল। অদ্বৈতাচার্যের পক্ষে তথায় থাকা সম্ভব হইল না। সম্ভবত তিনি এই সময় হইতেই শান্তিপুরে চলিয়া যান এবং তাঁহার নবদ্বীপস্থ বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানটির প্রয়োজন ফুরাইয়া আসে। প্রায় তিন বৎসর পরে যখন সংবাদ আসিল যে মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য পরিক্রমার পর নীলাচলে ফিরিয়াছেন, তখন গৌড়মণ্ডলের ভক্তবৃন্দ শান্তিপুরে অদ্বৈতের সহিত মিলিত হইয়া নীলাচলাভিমুখে যাত্রা করিলেন।[৭১]

ভক্তবৃন্দের ক্ষেত্রধামে পদার্পণ-মাত্রই স্বরূপদামোদর ও গোবিন্দ তাঁহাদিগকে প্রত্যুদ্গমন করিতে আসিয়া অদ্বৈতপ্রভুকে চৈতন্য-প্রেরিত মাল্যে বিভূষিত করিলেন। তারপর তাঁহাকে পুরোভাগে লইয়া[৭২] ভক্তবৃন্দ মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনিও সর্বপ্রথম অদ্বৈতকেই সংবর্ধনা জ্ঞাপন করিলেন। আজ যেন চৈতন্যমহাপ্রভু

(৬৫) চৈ. না.—৫।১৮; চৈ. চ.—২।৩, পৃ. ৯৫; অ. প্র.—১৫. অ., পৃ. ৬২ (৬৬) চৈ. চ.—২।৩, পৃ. ৯৬; চৈ. কৌ. (পৃ. ১৩৩)-মতে মহাপ্রভুর প্রশ্নোত্তরে নিত্যানন্দ বলিলেন, "উত্তরে গঙ্গার ধারা মধ্যে সরস্বতী। দক্ষিণে যমুনা বহে কি সন্দেহ ইথি॥" (৬৭) চৈ. না.—৫।১৯ (৬৮) ঐ—৫।২১; চৈ. চ.—২।৩, পৃ. ৯৬ (৬৯) চৈ. কৌ.—৬ষ্ঠ. অ., পৃ. ১৪৫ (৭০) দ্র.—দ্বারপাল-গোবিন্দ (৭১) অ. প্র.—১৫শ. অ., পৃ. ৬৫; এই গ্রন্থমতে অদ্বৈতের ২য়. পুত্র কৃষ্ণমিশ্রও নীলাচলে যাইতে চাহিলে সীতাদেবী তাঁহাকে তৎপত্নী বিজয়া সহ মন্ত্র গ্রহণ করিয়া গৃহে থাকিতে নির্দেশ দেন। সুতরাং পত্নী, পুত্র ও পুত্রবধূ সমভিব্যাহারে অবস্থান করায় মনে হয় যে অদ্বৈত তখন শান্তিপুরেই বাস করিতেছিলেন। (৭২) চৈ. না.—৮।৪২

তাঁহার গুরুরও গুরুর আসন লইয়া বসিয়াছেন। তাই তাঁহার এই নীলাচল-লীলার প্রারম্ভে গুরু অদ্বৈতকে যথোপযুক্ত মর্যাদা দান করিয়া

অদ্বৈতেরে প্রভু কহে বিনয় বচনে।
আজি আমি পূর্ণ হৈলাম তোমার আগমনে॥[৭৩]

অদ্বৈতও বুঝিলেন ঈশ্বরের স্বভাব এই যে, তিনি পূর্ণ ষড়ৈশ্বর্যময় হইয়াও ভক্তের সহিত এইরূপে লীলা করিয়া থাকেন।

নরেন্দ্র-জলকেলি, গুণ্ডিচা-মার্জন, উদ্যান-ভোজন, রথাগ্রে নর্তন, সমস্ত বিষয়েই অদ্বৈতপ্রভু বিশেষ স্থান অধিকার করিলেন। চৈতন্য এই বৎসর সম্প্রদায়-বিভাগে নৃত্যের প্রবর্তন করেন। তাহাতে এক একটি সম্প্রদায়ে এক-একজন মূল গায়ন ও নর্তকের অধীনে একই অঞ্চলের কয়েকজন বিশেষ ভক্তকে মিলিতভাবে জগন্নাথ-বিগ্রহের চতুষ্পার্শ্বে থাকিয়া কীর্তন করিতে হইয়াছিল। যাঁহারা নৃত্যগীতে বিশেষ দক্ষ এবং ভক্তিজগতের উচ্চতর স্থানাধিকারী, তাঁহাদিগের মধ্যে কয়েকজন বিশেষ ব্যক্তি মহাপ্রভুকর্তৃক নির্ধারিত হইয়া মূল-গায়ন ও নর্তকের সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে আবার অদ্বৈতপ্রভুকেই প্রধান সম্প্রদায়ের নর্তকরূপে নির্ধারিত করিয়া মহাপ্রভু তাঁহাকে বিপুল সম্মানের অধিকারী করিলেন।

মহাপ্রভু সর্বদা নিজেকে কৃষ্ণের দাস বলিয়া অভিহিত করিতেন। কাহারও সাধ্য ছিল না যে তাঁহাকে "ঈশ্বর করিয়া বলিবেক 'দাস' বিনে।" কিন্তু অদ্বৈতাচার্য এক-দিন পুষ্পতুলসী দিয়া তাঁহার পূজা আরম্ভ করিয়া দিলেন। অদ্বৈতকে কিছু বলিতে না পারিয়া শেষে মহাপ্রভুও নিজে পূজাপাত্র হইতে পুষ্পাদি লইয়া অদ্বৈতের পূজা করিতে লাগিলেন[৭৪] এবং উভয়ে 'এইমত অন্যোন্যে করেন নমস্কার।' কিন্তু এইখানেই মিটিয়া গেলনা। অদ্বৈতপ্রভু আর একদিন ভক্তবৃন্দকে জানাইলেন যে সেইদিন চৈতন্যের সম্বন্ধে কীর্তনগান করিতে হইবে। তিনি বলিলেন[৭৫] :

আজি আর কোন অবতার গাওয়া নাঞি।
সর্ব অবতারময়—চৈতন্য গোসাঞি॥

ভক্তবৃন্দও অদ্বৈতকে পুরোভাগে রাখিয়া নিঃসংকোচে প্রাণ ভরিয়া চৈতন্য-কীর্তন করিতে লাগিলেন। কিছু বলিতে না পারিয়া মহাপ্রভু ক্ষুব্ধ ও লজ্জিত চিত্তে সেই-স্থান পরিত্যাগ করিলেন। তথাপি ভক্তবৃন্দের সংগীত থামিল না।

যতদূর ধারণা জন্মে চৈতন্যলীলাবিষয়ক সংগীতের জন্ম এইখানেই[৭৬]। কারণ,

---

(৭৩) চৈ. চ.—২।১৮, পৃ. ১৫৫ (৭৪) চৈ. চ.—২।১৫, পৃ. ১৭৭; তু. চৈ. চ. ম.—১৮।৩১-৩৩ (৭৫) চৈ. ভা.—৩।১০, পৃ. ৩৩৬ (৭৬) পদাবলী-পরিচয় (পৃ. ২২-২৩)-গ্রন্থে শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণমুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্নও ঠিক একই মত প্রকাশ করিয়াছেন।

আপনে অদ্বৈত চৈতন্যের গীত করি।
বোলাইয়া নাচে প্রভু জগৎ নিস্তারি॥
"শ্রীচৈতন্য নারায়ণ করুণা সাগর।
দীন-দুঃখিতের বন্ধু মোরে দয়া কর॥"

এবং ইহার অব্যবহিত পরেই

অদ্বৈত সিংহের শ্রীমুখের এই পদ।
ইহার কীর্তনে বাড়ে সকল সম্পদ॥

চাতুর্মাস্যান্তে অদ্বৈতপ্রভু ভক্তবৃন্দসহ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। পর বৎসরও তিনি পুনরায় নীলাচলে গমন করেন। তাহারপর মহাপ্রভু বৃন্দাবন গমনোদ্দেশ্যে গৌড়ে আসিয়া কানাইর-নাটশালা হইতে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু তিনি গমন ও প্রত্যাবর্তন উভয়কালেই[৭৭] শান্তিপুরে পৌছাইলে অদ্বৈতপ্রভু তাঁহাকে স্বগৃহে আনিয়া বিপুল সম্মান প্রদর্শন করেন। এই সময় সপ্তগ্রামের জমিদার হিরণ্য দাস ও গোবর্ধন দাস নামক ভ্রাতৃদ্বয় অদ্বৈতের বিশেষ ভক্ত ছিলেন। মহাপ্রভুর প্রত্যাবর্তনকালে এই গোবর্ধনের পুত্র রঘুনাথ আসিয়া চৈতন্যচরণে পতিত হইলে অদ্বৈত-কৃপায় তিনি মহাপ্রভুর প্রসাদ শেষ প্রাপ্ত হন।[৭৮] আবার মহাপ্রভুর উপস্থিতিকালেই মাধবেন্দ্র-পুরীর আরাধনা-দিবস আসিয়া পড়ায় অদ্বৈতপ্রভু চৈতন্যসমক্ষে সাড়ম্বরে সেই উৎসব অনুষ্ঠিত করেন।[৭৯]

মহাপ্রভু বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে অদ্বৈতপ্রভু প্রতি বৎসর ভক্তবৃন্দসহ নীলাচলে গিয়া তাঁহার সাক্ষাৎলাভ করিতেন। সেই সময় প্রতিবারেই তিনি মহাপ্রভুকে সগণে নিমন্ত্রণ করিয়া ভিক্ষানির্বাহ করাইতেন এবং শাকের ব্যঞ্জন প্রভৃতি তাঁহার রুচি অনুযায়ী খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে ভোজন করাইতেন। একবার মহাপ্রভুকে একাকী খাওয়াইবার সাধ হইয়াছিল। অথচ তাঁহার প্রিয় ভক্তবৃন্দকে বাদ দিয়া তাঁহাকে একাকী ডাকিয়া আনা অনুচিত। আবার ভক্তবৃন্দের সহিত আসিলে তিনি সামান্যমাত্র আহার করিয়াই উঠিয়া পড়িবেন। সেইবার সীতাদেবীও নীলাচলে ছিলেন। উভয়ে মিলিয়া আয়োজন করিলেন এবং আচার্যপ্রভু স্বহস্তে রন্ধন করিয়া প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, মধ্যাহ্নে প্রবল মেঘ উঠিয়া ঝড়বৃষ্টি হওয়ায় ভক্তবৃন্দের দর্শন পাওয়া গেলনা। ফলে মহাপ্রভুকে একাকী অদ্বৈতের বাসায় আসিয়া ভিক্ষা নির্বাহ করিতে হইল।[৮০]

---

(৭৭) দ্র.—গৌরাঙ্গ-পরিজন (৭৮) দ্র.— রঘুনাথদাস (৭৯) চৈ. ভা.—৩।৪, পৃ. ২৯৫ (৮০) চৈ. ভা.—৩।১০, পৃ. ৩৩২ ; অ. প্র.—১৮শ. অ., পৃ, ৮০

এইস্থলে একটি বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। 'চৈতন্যচরিতামৃতমহাকাব্যে' বর্ণিত হইয়াছে[৮১] যে একবার গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দের নীলাচল-গমনকালে তাঁহারা যখন যাজপুরে বৈতরণী স্নান করিতেছিলেন, সেই সময় রাজা প্রতাপরুদ্র অদ্বৈতপ্রভুকে স্বীয় যানে আরোহণ করাইয়া কটকে লইয়া যান। মহাপ্রভু পাছে মনক্ষুণ্ণ বা রুষ্ট হন, সেইজন্য অদ্বৈতপ্রভু চৈতন্য-প্রিয় বাসুদেব-দত্ত প্রভৃতি কয়েকজন ভক্তকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য তিনি নীলাচল-গমন পর্যন্ত পথে যথেষ্ট সংকুচিত ও বিব্রতবোধ করিয়াছিলেন। এই বিবরণ অন্য কোথাও নাই। কিন্তু 'চৈতন্যচরিতামৃতে' উল্লেখিত অদ্বৈত-শিষ্য কমলাকান্ত বিশ্বাসের একটি পত্র হইতে জানা যায়[৮২] যে প্রতাপরুদ্র অদ্বৈতপ্রভুকে ঈশ্বরত্বে স্থাপন করিয়াছিলেন। আবার কবিকর্ণপূরের 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে'র অনুবাদ করিতে গিয়া প্রেমদাস তাঁহার 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়কৌমুদী'-গ্রন্থে জানাইয়াছেন[৮৩] যে পরমানন্দ-সেন বা কবিকর্ণপূরের প্রথমবার নীলাচল-গমনের পূর্ব বৎসর অদ্বৈতপ্রভু বিষয়ী রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন বলিয়া পর বৎসর ভক্তবৃন্দের নীলাচল-গমনের পূর্বমুহূর্তে মহাপ্রভু পরমানন্দ-পুরীর নিকট ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া অদ্বৈতপ্রভুর বিষয়ী সংস্পর্শের সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে তাঁহার মনস্তুষ্টির জন্য আবার 'বাসুদেব চরিত সে (অদ্বৈত) আমার রুচয়।' এই লইয়া যে মহাপ্রভুর সহিত অদ্বৈতপ্রভুর একটু-কথাকষি চলিয়াছিল এবং অদ্বৈতপ্রভু যে অভিমানভরে নীলাচলে গমন করিতে চাহেন নাই, দেবকীনন্দন ও বৃন্দাবনদাসের 'বৈষ্ণবন্দনা'র উল্লেখেও তাহাই স্পষ্টীকৃত হয়। প্রথমোক্ত গ্রন্থকার বলিতেছেন যে গৌরীদাস-পণ্ডিত 'আচার্য গোসাঞিরে নিল উৎকল নগরী।' পরবর্তী গ্রন্থকার গৌরীদাস সম্বন্ধে লিখিতেছেন :

প্রভু আজ্ঞা শিরে ধরি গিয়া শান্তিপুর।
যে লইল উৎকলেতে আচার্য ঠাকুর॥

'অদ্বৈতমঙ্গল'-গ্রন্থেও মহাপ্রভু ও অদ্বৈতের মনোমালিন্যে গৌরীদাস-পণ্ডিতের দৌত্য কর্মের কথা উল্লেখিত হইয়াছে।[৮৪] এই সমস্ত হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে প্রতাপরুদ্রকে অবলম্বন করিয়া অদ্বৈত ও চৈতন্যের মধ্যে সাময়িকভাবে কিছু মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, তাহাতে তাঁহাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয় নাই। 'চৈতন্যচরিতামৃত-মহাকাব্যে'র বর্ণনায় জানা যায় যে অদ্বৈতপ্রভু প্রতাপরুদ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নীলাচলে পৌঁছাইলে মহাপ্রভু তাঁহাকে পূর্ণ সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়কৌমুদী' হইতেও জানা যাইতেছে যে মহাপ্রভুকে লক্ষ্য করিয়া পরমানন্দ-পুরীর নিকট যে কটাক্ষপাত

(৮১) ১৪।৫৮-৬০ (৮২) চৈ. চ.—১।১২, পৃ. ৫৭ (৮৩) পৃ. ৩৪৬ (৮৪) অ. বি.-মতে গৌরাঙ্গের নবদ্বীপ-লীলাকালেই গৌরীদাসকে সেই কার্য করিতে হইয়াছিল। কিন্তু সম্ভবত তাহা ঠিক নহে। দ্র.—গৌরীদাস

করা হইয়াছিল তাহার উত্তরে পরমানন্দপুরী কিন্তু বলিয়াছিলেন যে মহাপ্রভুর উক্তি নিঃসন্দেহে অদ্বৈতপ্রভুর প্রতি পরোক্ষ প্রশংসাবাদ মাত্র। আবার 'চৈতন্যচরিতামৃতো'ক্ত কমলাকান্তের পত্রানুযায়ী মহাপ্রভুর সহিত অদ্বৈতপ্রভুর যে ভাববিনিময়ের কথা জানা যায়, তাহাও পরমানন্দ-পুরীর উক্তিকে বিশেষভাবে সমর্থন করে।

কিন্তু সত্যই অদ্বৈতের সহিত চৈতন্যের নানাভাবে লীলা চলিত। একবার চৈতন্যের প্রশ্নোত্তরে অদ্বৈত জানান যে তিনি জগন্নাথ-দর্শনকালে প্রতিবারই শ্রদ্ধার সহিত বিগ্রহ প্রদক্ষিণ করেন। মহাপ্রভু তৎক্ষণাৎ বলিলেন[৮৫] :

যতক্ষণ তুমি পৃষ্ঠ দিগেরে চলিলা।
ততক্ষণ তোমার যে দর্শন নহিলা॥
আমি যতক্ষণ ধরি দেখি জগন্নাথ।
আমার লোচন আর না যায় কোথাত॥

অদ্বৈতপ্রভু কিন্তু রথযাত্রা উপলক্ষে সেই সম্প্রদায়-কীর্তনের নর্তক-পদটি হইতে কোন দিন বঞ্চিত হন নাই। ইহা ছাড়া তাঁহার বিশেষ সম্মানত ছিলই। একদিন অদ্বৈত সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তরে শ্রীবাস বলিয়াছিলেন যে ভক্তপ্রবর অদ্বৈত নিঃসন্দেহে প্রহ্লাদ বা শুকেরই তুল্য সাধক। কিন্তু এই উক্তিতে মহাপ্রভু ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন :

কি বলিলি কি বলিলি পণ্ডিত শ্রীবাস।
মোহোর নাঁঢ়ারে কহে শুক বা প্রহ্লাদ॥
যে শুকেরে মুক্ত তুমি বোল সর্বমতে।
কালির বালক শুক নাঢ়ার অগ্রেতে॥

এবং 'মত্তুল্য এব তদয়ং হ্যবধারণায়ো নৈবাস্য কোঽপি ভুবনে সদৃশোঽস্তি জাতু।'[৮৬] একবার মুরারি-গুপ্তকেও মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন[৮৭] :

অদ্বৈত আচার্য গোসাঞি ত্রিজগতে ধন্য।
তারোধিক প্রিয় মোর কেহ নাহি অন্য॥
আপনে ঈশ্বর অংশ জগতের গুরু।.........
তার দেহে পূজা পাইলে কৃষ্ণ পূজা পায়॥

মহাপ্রভুর নিকট এতবড় শ্রদ্ধা আর কেহও লাভ করিতে পারেন নাই।

একবার বল্লভ-ভট্ট নীলাচলে পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতে থাকিলে মহাপ্রভু অসন্তুষ্ট হন। তখন অদ্বৈতপ্রভু তাঁহাকে তর্কে পরাস্ত করিয়া সমুচিত শিক্ষাদান করিয়াছিলেন।[৮৮] কিন্তু চৈতন্যের নীলাচল-লীলার একেবারে শেষদিকে সম্ভবত বৃদ্ধ অদ্বৈতাচার্যের পক্ষে বার বার

(৮৫) চৈ. ভা.—৩।১১, পৃ. ৩৪২ (৮৬) চৈ. চ. ম.—৬।৮২ (৮৭) চৈ.ম. (লো)—ম. খ., পৃ. ১৫১
(৮৮) চৈ. চ.—৩।৭, পৃ. ৩২৫

নীলাচলে যাওয়া সম্ভব হইত না। জগদানন্দ প্রভৃতি ভক্তের মারফত তিনি চৈতন্যের সংবাদ লইতেন। একবার জগদানন্দ শান্তিপুরে পৌঁছাইলে তিনি তাঁহার মারফত মহাপ্রভুর জন্য একটি তর্জা বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন।[৮৯] তাহা শুনিয়া মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন যে অদ্বৈত একজন শ্রেষ্ঠ পূজক এবং তিনি

আগম শাস্ত্রের বিধি-বিধানে কুশল।
উপাসনা লাগি দেবের করে আরাধন।
পূজা লাগি কতকাল করে আরাধন।
পূজা নির্বাহ হইলে পাছে করে বিসর্জন।
তরজার কিবা অর্থ না জানি তাঁর মন।

ইহারপর হইতেই মহাপ্রভুর বিরহদশা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং কিছুকাল পরেই তাঁহার তিরোভাব ঘটে।

মহাপ্রভুর তিরোভাবের[৯০] পর অদ্বৈতপ্রভু কতকাল বাঁচিয়াছিলেন তাহা ঠিক করিয়া বলা শক্ত। তখন তাঁহার কর্মপদ্ধতি কি ছিল তাহাও ঠিক বুঝা যায় না। মধ্যে মধ্যে নিত্যানন্দ আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন।[৯১] উভয়ের মধ্যে কিরূপ সম্পর্ক ছিল তাহাও বুঝিয়া উঠা কষ্টসাধ্য।[৯২] 'অদ্বৈতপ্রকাশ'-কার জানাইতেছেন যে নিত্যানন্দপ্রভুর তিরোভাব-দিবসে অদ্বৈতপ্রভু খড়দহে তাঁহার নিকট উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহার তিরোভাবের পর তাঁহার পুত্র বীরভদ্রকে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুকাল পরে বীরভদ্র শান্তিপুরে গিয়া অদ্বৈতপ্রভুর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিতে চাহিলে অদ্বৈতাচার্য নাকি তাঁহাকে জাহ্নবা-ঠাকুরাণীর নিকট দীক্ষাগ্রহণের নির্দেশ প্রেরণ করেন।[৯৩] কিন্তু এইরূপ বিবরণ যে কতদূর সত্য তাহা বলাও দুঃসাধ্য।

মহাপ্রভুর তিরোভাবের পরেও অদ্বৈতাচার্যপ্রভু মধ্যে মধ্যে নবদ্বীপে গমন করিতেন।[৯৪] কিন্তু শেষজীবনে তাহাও সম্ভব ছিলনা।[৯৫] 'প্রেমবিলাস' হইতে জানা যায় যে শ্রীনিবাস-আচার্যের বৃন্দাবন-গমনের বহুপূর্বেই অদ্বৈতাচার্যের স্বর্গপ্রাপ্তি

(৮৯) চৈ. চ.—৩।১৯, পৃ. ৩৬৯ ; অ. প্র.—২১শ. অ., পৃ. ৯৪ ; দ্র.—নিত্যানন্দ (৯০) জয়ানন্দ বলেন যে মহাপ্রভুর তিরোভাব-কালে অদ্বৈতাচার্য নীলাচলে উপস্থিত ছিলেন। (৯১) চৈ. ভা.—৩।৫, পৃ. ৩০৯ ; ভ. র.—১২।৩৮১৯ ; ৮।১৮৭ ; অ. প্র.—১২শ. অ, পৃ. ৯৯ (৯২) এই সম্বন্ধে নিত্যানন্দ-জীবনীর শেষাংশ দ্রষ্টব্য। (৯৩) অ. প্র.—২২শ. অ., পৃ. ১০২ ; আসল ঘটনাটি ঠিক ঠিক জানা যায়না। দ্র.—বীরচন্দ্র (৯৪) ভ.র.—১২।৪০২৩ (৯৫) অ. প্র. (২১শ.অ., পৃ. ৯৮)-মতে ইতিপূর্বে তিনি অচ্যুতানন্দ ও সীতাদেবীর সহিত আলোচনা পূর্বক কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ ও সংসারাশ্রমী পুত্র কৃষ্ণমিশ্রের উপর গৃহদেবতা মদনগোপালের সেবাপূজার ভার অর্পণ করেন। এতদুপলক্ষে অদ্বৈতের কনিষ্ঠ যমজ সন্তান স্বরূপ ও জগদীশ বিরোধিতা করিলেও তাঁহার তৃতীয় পুত্র গোপালদাস ও চতুর্থ পুত্র

ঘটিয়াছিল।[২৬] নরহরি-চক্রবর্তী জানাইতেছেন যে গদাধর পণ্ডিতের মৃত্যুবার্তা পাইয়া যাজপুর হইতে গৌড়ে ফিরিবার পথে শ্রীনিবাস অদ্বৈতের তিরোভাব সংবাদ প্রাপ্ত হন।[২৭] এই সকল বিবরণও যে কতদূর সত্য তাহা বলা প্রায় অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। 'চৈতন্যচরিতামৃতে' লিখিত হইয়াছে[২৮] যে অদ্বৈতাচার্যপ্রভুর জীবৎকালেই তাঁহার ভক্তবৃন্দের মধ্যে দুইটি দল হইয়া গিয়াছিল। তাঁহাদিগের মধ্যে

কেহ ত আচার্যের আজ্ঞায় কেহ ত স্বতন্ত্র।
স্বমত-কল্পনা করে দৈব পরতন্ত্র ॥
আচার্যের মত যেই সেই মত সার।
তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘি চলে সেই ত অসার ॥

কবিরাজ-গোস্বামী আরও লিখিয়াছেন যে অদ্বৈতপ্রভু কেবল মহাপ্রভু-নির্দিষ্ট ধর্মের প্রচার করিয়াছিলেন মাত্র। সেই ধর্মকে না মানিয়া যে মুষ্টিমেয় ভক্ত স্বমত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মতবাদ অল্পকালের মধ্যেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

'চৈতন্যচরিতামৃতে' অদ্বৈতপ্রভুর শাখা-বর্ণনার মধ্যে নিম্নোক্ত অনুগামী-বৃন্দের নাম উল্লেখিত হইয়াছে :—

অচ্যুতানন্দ, কৃষ্ণমিশ্র, গোপালদাস, বলরামদাস, স্বরূপ, জগদীশ, কমলাকান্ত-বিশ্বাস, যদুনন্দনাচার্য, বাসুদেব-দত্ত, ভাগবতাচার্য, বিষ্ণুদাসাচার্য, চক্রপাণি-আচার্য, অনন্ত-আচার্য, নন্দিনী, কামদেব, চৈতন্যদাস, দুর্লভ-বিশ্বাস, বনমালীদাস, জগন্নাথকর, ভবনাথ-কর, হৃদয়ানন্দ-সেন, ভোলানাথ-দাস, যাদবদাস, বিজয়দাস, জনার্দন দাস, অনন্তদাস, কানু-পণ্ডিত, নারায়ণদাস, শ্রীবৎস-পণ্ডিত, হরিদাস-ব্রহ্মচারী, পুরুষোত্তম-ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণদাস, পুরুষোত্তম-পণ্ডিত, রঘুনাথ, বনমালী, কবিচন্দ্র, বৈদ্যনাথ, লোকনাথ-পণ্ডিত, মুরারি-পণ্ডিত, মাধব-পণ্ডিত, বিজয়-পণ্ডিত, শ্রীরাম-পণ্ডিত, শ্রীহরিচরণ।

'অদ্বৈতমঙ্গল'-রচয়িতা হরিচরণদাস জানাইয়াছেন যে তিনি 'প্রভু' 'শান্তিপুরনাথ' অদ্বৈতাচার্যের পুত্র অচ্যুতানন্দের আজ্ঞায় গ্রন্থরচনা করিয়াছেন। সুতরাং তিনি 'চৈতন্য-

---

বলরাম কোনও অনুযোগ করেন নাই। গ্রন্থকার প্রদত্ত বিবরণ অনুযায়ী সওয়া শত বর্ষ বয়ঃক্রমকালে অদ্বৈতপ্রভুর তিরোভাব ঘটে (২২শ. অ., পৃ. ১০৩) ; তৎপূর্বে তিনি গ্রন্থকার ঈশানকে প্রভুর জন্মস্থানে গিয়া গৌরনাম প্রচারের নির্দেশ দেন। এই তারিখ সত্য কি অসত্য, তাহা জোর করিয়া বলা চলেনা। গ্রন্থকার তাঁহার গ্রন্থমধ্যে আরও বহু তারিখের স্পষ্ট উল্লেখ করায় উহাদের সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়। গ্রন্থকার আরও বলেন যে অদ্বৈত-তিরোভাবের কাল আগত জানিয়া অচ্যুতানন্দ ভক্তবৃন্দকে সংবাদ দিলে বীরচন্দ্র, গৌরীদাস, নরহরি-সরকার, কবিকর্ণপুর এবং শ্যামদাস, বিষ্ণুদাস ও যদুনন্দনাদি অদ্বৈত-শিষ্য তৎসকাশে উপস্থিত হন।—এইরূপ বিবরণেরও অন্য সমর্থন নাই। (২৬) প্রে. বি.—৪র্থ. বি., পৃ. ৪২ (২৭) ভ. র.—৩।৩৩০ ; ন. বি.—২য়. বি., . ১১৮ (২৮) ১।১২, পৃ. ৫৭

চরিতামৃতে'র অদ্বৈত-শাখান্তর্গত শ্রীহরিচরণ হইতেও পারেন, কিন্তু এ বিষয়ে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা চলে না। গ্রন্থকার হরিচরণের উল্লেখ কিন্তু অন্য কোথাও নাই। 'প্রেমবিলাসা'দি[৯৯] গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে একজন শ্রীহরি-আচার্য খেতরির মহামহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। সহোল্লেখিত ভক্তবৃন্দের নাম দেখিয়া তাঁহাকে অদ্বৈত-শিষ্য বলিয়া ধারণা করা যাইতেও পারে। জয়ানন্দ একজন শ্রীহরির নামমাত্র উল্লেখ করিয়াছেন।[১০০] তাঁহার সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারা যায় না।

(৯৯) ১৯শ. বি., পৃ. ৩০৯ ; ভ. র.—১০।৪১৪ (১০০) বৈ. খ.. পৃ. ৭২ ; ১৩০১ সালের মাঘ মাসের 'সাহিত্য পরিষৎ' পত্রিকায় রসিকচন্দ্র বসু মহাশয় হরিচরণদাসের অদ্বৈতমঙ্গলের রচনাকাল সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া জানাইয়াছেন যে হরিচরণ তাঁহার গ্রন্থমধ্যে কবিকর্ণপূরের চৈতন্যলীলা-বিষয়ক গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু কৃষ্ণদাস-কবিরাজের নামোল্লেখ করেন নাই। অতএব 'চৈতন্য-চন্দ্রোদয়ে'র পরে ও 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র পূর্বে অর্থাৎ ১৪৯৫ শকে (?) 'অদ্বৈতমঙ্গল' রচিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে লেখক তাঁহার গ্রন্থমধ্যে বৃন্দাবন-লোচনাদি অন্য কোনও পূর্ব-সূরীর উল্লেখ করেন নাই।

নিত্যানন্দ

রাঢ়দেশের অন্তর্গত বীরভূম জেলার একচক্রা বা একচাকা-খলকপুর[১] গ্রামে 'ওঝা' নামে অভিহিত এক পুণ্যবান বিপ্র বাস করিতেন।[২] তাঁহার সম্বন্ধে 'ভক্তিরত্নাকরে' লিখিত হইয়াছে[৩] :

যদ্যপি সুন্দরামল বন্দিঘটি গাই।
তথাপি বেষ্টিত শ্রেষ্ঠ, পূজ্য সর্ব ঠাই॥

ওঝা-দম্পতীর কয়েকটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। শেষে মুকুন্দ[৪] নামে একটি পুত্র ভূমিষ্ঠ হওয়ায় পিতামাতা তাঁহাকে হরপার্বতীর নামে সমর্পণ করিয়া তাঁহার নাম রাখিলেন হাড়ো।[৫] পুত্রের বিবাহযোগ্য বয়স উপস্থিত হইলে গ্রামের অদূরবর্তী এক ব্রাহ্মণ-কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। কন্যার নাম পদ্মাবতী। কিছুকাল পরে ওঝা-দম্পতী পরলোকগত হন।

হাড়-ওঝা[৬] নানাবিধ শাস্ত্রপাঠ করিয়া হাড়াই-পণ্ডিত নামে বিখ্যাত হন। ইহা প্রায় পঞ্চদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদের শেষ সময়কার কথা। এই সময়ে এক মাঘী শুক্লাত্রয়োদশী[৭] তিথিতে ব্রাহ্মণ-দম্পতী যে পুত্র-সন্তান লাভ করেন, তিনিই নিত্যানন্দপ্রভু।[৮] পিতৃমাতৃপ্রদত্ত নাম-অনুযায়ী বাল্যকালে তিনি কুবের-পণ্ডিত[৯] নামে অভিহিত হন। 'প্রেমবিলাস'-মতে[১০] "নিত্যানন্দ নাম গৃহে আশ্রমে অবধূত।" কিন্তু 'কুবের' নামের উল্লেখ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে 'আনন্দ'-যুক্ত নামটি

(১) চৈ. ম. (জ.)—পৃ. ৮-৯, ১১ ; চৈ. দী. (রামাই)—পৃ. ৩ ; গৌ. বি.—পৃ. ৮১—'খ অধিকাংশ গ্রন্থেই গ্রামের নাম একচক্রা বা একচাকা। (২) ভ. র.—১১।৪৩৮ ; প্রে. বি—২৪শ. বি., পৃ. ২৪৬ ; এই গ্রন্থে তাঁহার নাম নকড়ী-বাড়ুরী। (৩) ১১।৪৪১ ; নি. ব.-মতে (পৃ. ৩০) সাণ্ডিল্য গোত্র। (৪) ভ. মা.—পৃ. ২৫ ; গৌ. বি.—পৃ. ৮৫—মুকুন্দ-পণ্ডিত ; ভ. র.—১১।৪৪৭—"অন্তে অন্ত নাম রাখিলেন হর্ষচিত্তে।" (৫) ভ. র.—১১।৪৪৬ (৬) নি. বি. (পৃ. ২১)-মতে হাড়াই বন্দ্যোপাধ্যায়। (৭) চৈ. ভা.—১।২, পৃ. ১২ ; প্রে. বি.—৭ম. বি, পৃ. ৬৯-৭০ ; এই গ্রন্থ-মতে রামনবমীর দিনে ; চৈ. ম. (লো.)—সূ. খ, পৃ. ৩৩ ; গৌ. বি.—পৃ. ৮৭, কিন্তু ৮৫ পৃষ্ঠায় 'দ্বাদশী' ; অ. প্র.—১৪শ. অ., পৃ. ৫৭ ; গৌ. ভ.—পৃ. ২৭৩ ; অ. ম.—পৃ. ৪৮ (৮) প্রে. বি.-মতে (২৪শ. বি.) হাড়-ওঝার সাত পুত্র ছিলেন—নিত্যানন্দ, কৃষ্ণানন্দ, সর্বানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, পূর্ণানন্দ, প্রেমানন্দ ; একজনের নাম নাই। কিন্তু এই বর্ণনা নির্ভরযোগ্য নহে। কোথাও এই বর্ণনার ছায়ামাত্রও দেখা যায় না। কেবল সন্দেহজনক 'বংশীশিক্ষা'-গ্রন্থে নিত্যানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম বলা হইয়াছে চন্দ্রশেখর-পণ্ডিত (ব. শি.—পৃ. ৩৮৮)। (৯) চৈ. ম. (লো.)—সূ খ., পৃ. ৩৩ (১০) ৭ম. বি., পৃ. ৭০।

সম্ভবত সন্ন্যাসাশ্রমেই গৃহীত হইয়া থাকিবে।[১১] জয়ানন্দের উল্লেখ হইতেও জানা যায় যে নিত্যানন্দ নামটি অবধূতাশ্রমেরই।[১২]

নিত্যানন্দের বাল্যকাল সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। একমাত্র 'গৌরাঙ্গবিজয়' -গ্রন্থে এই সম্বন্ধে কিছু নূতন তথ্য প্রদত্ত হইয়াছে। বৃন্দাবনদাস এবং নরহরি-চক্রবর্তীর গ্রন্থ হইতে এইমাত্র জানা যায় যে বাল্যকালে তিনি বিদ্যাশিক্ষায় পারদর্শী হইলে তাঁহার চূড়াকরণ ও যজ্ঞোপবীত-ধারণাদি অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। তিনি সুশ্রী ও বলিষ্ঠদেহ ছিলেন। পিতামাতা যখন তাঁহার বিবাহের জন্য উদ্‌যোগী হইতে থাকেন, ঠিক সেই সময়ে এক অজ্ঞাতনামা সন্ন্যাসী আসিয়া হাড়াই-পণ্ডিতের গৃহে ভিক্ষানির্বাহ করেন। কিন্তু চলিয়া যাইবার সময় তিনি পণ্ডিতের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন যে তাঁহার পুত্রকে বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর তীর্থাদি-ভ্রমণের সঙ্গী-হিসাবে পাঠাইতে হইবে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও পুত্রকে প্রেরণ করিতে হয়।

নিত্যানন্দের এইসময়কার বয়স লইয়া মতভেদ দৃষ্ট হয়। 'চৈতন্যভাগবত' ও 'ভক্তিরত্নাকরে' তাঁহাকে এই সময়ে দ্বাদশবর্ষ-,[১৩] জয়ানন্দের গ্রন্থে অষ্টাদশবর্ষ-[১৪] ও প্রেমবিলাসে চতুর্দশবর্ষ-[১৫] বয়স্ক বলা হইয়াছে। আবার তাঁহার তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গ সম্বন্ধেও বিভিন্ন গ্রন্থের বর্ণনা বিভিন্ন প্রকার। জয়ানন্দ বলিতেছেন[১৬] যে তিনি প্রয়াগে ঈশ্বর-পুরীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া 'অবধূত প্রেমে নিত্যানন্দ নাম ধরিয়া' 'কাশীপুরে' অবস্থান করিতেছিলেন এবং সেখান হইতেই গৌরাঙ্গ-মহিমার কথা শুনিয়া নবদ্বীপে আসেন। 'প্রেমবিলাস-'মতে[১৭] পূর্বোক্ত সন্ন্যাসী নিত্যানন্দকে সঙ্গে লইয়া গিয়া 'তাঁরে শিষ্য কৈল, দণ্ড না কৈল গ্রহণ। অবধূত বেশে সঙ্গে করয়ে ভ্রমণ।।' কিন্তু এই গ্রন্থের চতুর্বিংশ বিলাসে[১৮] উল্লেখিত হইয়াছে যে স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া ঈশ্বর-পুরীই নিত্যানন্দকে গৃহ হইতে লইয়া গিয়া সন্ন্যাসী করেন এবং তাঁহাকে বিশ্বরূপের তেজ দান করিয়া বলিয়া যান যে নিত্যানন্দ যেন মাধবেন্দ্র-পুরীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। তদনুযায়ী নিত্যানন্দ মাধবেন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করেন; সেইস্থানে ঈশ্বর-পুরীও উপস্থিত ছিলেন। পরে আবার তীর্থাদি পরিক্রমার পর বৃন্দাবনে আসিলে ঈশ্বর-পুরীর নিকট গৌরাঙ্গ-আবির্ভাবের সংবাদ পাইয়া নিত্যানন্দ নবদ্বীপে চলিয়া আসেন। আবার 'ভক্তমাল' গ্রন্থের লেখক নিত্যানন্দকে মাধবেন্দ্র-শিষ্য বলিয়াছেন। চৈতন্যভাগবত'-কারও বলিতেছেন[১৯] যে বহু

---

(১১) অ. ম.-মতে (পৃ. ৪৮) নামকরণ করেন অদ্বৈতপ্রভু, কিন্তু অন্য কোথাও এই বিবরণের সমর্থন নাই। (১২) চৈ. ম. (জ.)—ন. খ., পৃ. ১১ (১৩) চৈ. ভা.—১।৬, পৃ. ৪৩ ; ভ. র—১১।৫৩১, ৫।২২৪৬; জানকীনাথ পাল এই কাল গ্রহণ করিয়াছেন (নিত্যানন্দচরিত—১ম, খণ্ড, পৃ. ৫) (১৪) ন. খ.—পৃ. ১১ (১৫) ৭ম. বি.—পৃ. ৭০ (১৬) ন. খ.—পৃ. ১১, ৫৪ (১৭) ৭ম. বি.—পৃ. ৭০ (১৮) পৃ. ২৪৩ (১৯) ১।৬, পৃ. ৪৩, ৪৫ ; ২।৩, পৃ. ১১৭।

তীর্থ ভ্রমণের পর নিত্যানন্দ প্রতীচীতে মাধবেন্দ্র-পুরীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং সেই-স্থলে ঈশ্বর-পুরী ব্রহ্মানন্দ-পুরী প্রভৃতি মাধবেন্দ্রের অন্যান্য শিষ্যের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে। তারপর তিনি মথুরায় অবস্থান করিতে থাকেন এবং বিংশতিবর্ষব্যাপী তীর্থ-পরিক্রমার পর মথুরা-বৃন্দাবন হইতেই নবদ্বীপে চলিয়া আসেন। 'ভক্তিরত্নাকর'-প্রণেতা বৃন্দাবনদাসেরই অনুগামী হইয়াছেন। তবে তাঁহার গ্রন্থে কিছু অতিরিক্ত বর্ণনাও আছে। নরহরি-চক্রবর্তী বলেন[২০] যে বহুবিধ তীর্থ পর্যটনের পর নিত্যানন্দ পাণ্ডুরপুরে বিঠ্ঠলনাথ দর্শন করেন। সেই গ্রামে মাধব-পুরীর সতীর্থ এক নিরীহ ব্রাহ্মণের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া নিত্যানন্দ গৃহকর্তার ও মাধবেন্দ্র-পুরীপাদের সাধারণ গুরু লক্ষ্মীপতির নিকট মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন। ইহার পরেই লক্ষ্মীপতি দেহত্যাগ করেন। নিত্যানন্দ ভ্রমণ করিতে করিতে প্রতীচী-তীর্থের সমীপে মাধবেন্দ্র-পুরীর সহিত মিলিত হন। মাধবেন্দ্রকেও তিনি গুরুরূপেই গ্রহণ করেন এবং মাধব-শিষ্য ঈশ্বর-পুরী প্রভৃতির সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে। তারপর তিনি মথুরা হইয়া বৃন্দাবনে উপস্থিত হন। বিংশতিবর্ষ তীর্থ-পরিক্রমার পর তিনি শেষে বৃন্দাবন হইতেই নদীয়ায় আসেন। 'অদ্বৈতপ্রকাশ'-মতে[২১] নিত্যানন্দ ব্রজধাম হইতে নবদ্বীপে যাত্রা করেন। 'নিত্যানন্দবংশবিস্তার'-গ্রন্থের লেখক লিখিয়াছেন যে দিগ্‌বসন ও কুণ্ডলধারী পরিব্রাজক অবধূত একবার জন্মভূমিতে আসিয়া এক বিভীষিকা-সৃষ্টিকারী ভয়াবহ অজগর সর্পকে বশীভূত করিবার পর উহাকে গর্তের মধ্যে পুরিয়া স্বীয় কুণ্ডল চাপা দিয়া রাখায় সেইস্থানের নাম কুণ্ডলীতলা হইয়াছে। সম্ভবত তিনি নবদ্বীপ অভিমুখে আসিবার পথে জন্মভূমি হইয়া আসিয়াছিলেন।

তাহা হইলে অধিকাংশ গ্রন্থ হইতে জানা যাইতেছে যে নিত্যানন্দ মাধ্ব-সম্প্রদায়ভুক্ত লক্ষ্মীপতি বা মাধবেন্দ্রের নিকট মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করেন।[২২] 'ভক্তিরত্নাকরে'র বিস্তারিত বর্ণনা দেখিয়া মনে হয় যে লক্ষ্মীপতিই তাঁহার মন্ত্রগুরু ছিলেন; কিন্তু মাধবেন্দ্রের নিকট এতৎসম্বন্ধীয় নানাবিধ শিক্ষালাভ করায় নিত্যানন্দ তাঁহাকেও গুরুর মর্যাদা দান করিয়াছিলেন এবং তিনি মাধবেন্দ্র-শিষ্য হিসাবে বিশেষভাবে পরিচিতও হইয়াছিলেন। তাঁহার সহিত ঈশ্বর-পুরীর সম্পর্ক সম্বন্ধেও একই কথা মনে হইতে পারে। সম্ভবত তাঁহার সহিত ঈশ্বর-পুরীর সাক্ষাৎ ঘটার জন্যই জয়ানন্দাদি তাঁহাকে ঈশ্বর-পুরীর মন্ত্রশিষ্য বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকিবেন। কিন্তু একটু গভীরভাবে অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে মাধ্ব-সম্প্রদায়ভুক্ত মাধবেন্দ্রাদি কাঁহারও নিকট নিত্যানন্দের এই দীক্ষাগ্রহণ ব্যাপারটি সত্য নহে বলিয়াই কেহ তাঁহাকে ঈশ্বর-পুরীর, কেহ বা ঈশ্বর-পুরীর গুরু মাধবেন্দ্রের, আবার কেহ বা

(২০) ভ. র.—৫।২২৬৩—২৩৫৮ (২১) এবং বৈ. দ. -মতে (২২) একমাত্র জয়ানন্দ (ন.খ., পৃ. ১১) বলেন যে ঈশ্বরের-পুরী প্রয়াগে তাঁহাকে দীক্ষা-দান করেন।

তাঁহাকে মাধবেন্দ্র-গুরু লক্ষ্মীপতির শিষ্যরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে প্রাচীনতম গ্রন্থের রচয়িতা বৃন্দাবনদাস স্বয়ং নিত্যানন্দের শিষ্য হইলেও তাঁহার বর্ণনা নির্ভরযোগ্য নহে। গ্রন্থকার জানাইয়াছেন[২৩] যে গৌরাঙ্গ-জন্মকালে নিত্যানন্দ রাঢ়দেশেই উপস্থিত ছিলেন। আবার গ্রন্থকার-মতে ৩২ বৎসর বয়সে[২৪] (গৃহে ১২ বৎসর + তীর্থভ্রমণে ২০ বৎসর) গৌরাঙ্গের সহিত নিত্যানন্দের সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল এবং তৎপূর্বে গৌরচন্দ্র গয়া হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। সুতরাং এই সাক্ষাৎকার কিছুতেই ১৫০৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ববর্তী হইতে পারে না। এবং তদনুযায়ী নিত্যানন্দের জন্মকালও কিছুতেই ১৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ববর্তী হওয়া সম্ভব নহে। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে নিত্যানন্দ (১৪৭৩ + ১২ =) ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বা তাহারও পরে তীর্থ-ভ্রমণে বাহির হন এবং বহু তীর্থ পরিভ্রমণান্তে মাধবেন্দ্রের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটে। সুতরাং ঐ সাক্ষাৎকার অন্তত ১৪৮৬ খ্রী.-এর অর্থাৎ গৌরাঙ্গ-আবিভার্বের পূর্বে নহে। এদিকে 'চৈতন্যচরিতামৃত' ও 'প্রেমবিলাস' ইত্যাদি[২৫] গ্রন্থ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে মাধবেন্দ্রের নীলাচল-গমনপথে শান্তিপুর-আগমনকালে গৌরাঙ্গের আবির্ভাব ঘটে নাই, এবং 'চৈতন্যচরিতামৃত'-কার স্পষ্টই জানাইয়াছেন যে বৃন্দাবনে মাধবেন্দ্র কর্তৃক গোবিন্দ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার দুই বৎসর পরে তিনি বৃন্দাবন হইতে যাত্রা করিয়া শান্তিপুর-রেমুণা হইয়া নীলাচলে গমন করেন। সুতরাং বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার কাল অন্ততপক্ষে ১৪৮৩ খ্রী.-এর পরবর্তী নহে। মাধবেন্দ্রের সহিত নিত্যানন্দের সাক্ষাৎ ঘটিয়া থাকিলে তাহা আরও পূর্বে সম্ভব হইতে পারে। ১৪৮৩ খ্রী.-এর পরবর্তী দুই বৎসরের মধ্যে সাক্ষাৎ ঘটিলে মাধবেন্দ্রের সহিত তাঁহার বৃন্দাবনেই সাক্ষাৎ ঘটিত এবং ১৪৮৩ খ্রী-এর পরবর্তী যে-কোনও সময়ে নিত্যানন্দ বৃন্দাবনে পৌঁছাইলে গোবর্ধন পরিক্রমাকালে তিনি নিশ্চয়ই মাধবেন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত গোবিন্দ-বিগ্রহ দর্শন করিতেন। কিন্তু বৃন্দাবনের গ্রন্থে নিত্যানন্দের মাধবেন্দ্র-সাক্ষাৎকার এবং বৃন্দাবন-ভ্রমণের বর্ণনা থাকা সত্ত্বেও উপরোক্ত কোনও সম্ভাবনার বাষ্প-মাত্রও পরিলক্ষিত হয় না। অথচ ১৪৮৩ খ্রী.-এর পূর্ববর্তী কোন সময়েও এই সাক্ষাৎ বা দীক্ষাগ্রহণ অসম্ভব ছিল। কারণ, নিত্যানন্দ তখন ৯।১০ বৎসরের বালকমাত্র। বৃন্দাবনও বলিয়াছেন যে নিত্যানন্দ দ্বাদশ বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন।

'চৈতন্যচরিতামৃত' হইতে আমরা জানিতে পারি[২৬] যে মহাপ্রভুর প্রথমবার নীলাচল-যাত্রাকালে তিনি সাক্ষীগোপালে পৌঁছাইলে বয়োজ্যেষ্ঠ এবং অভিজ্ঞ নিত্যানন্দ সাক্ষী-গোপাল-বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া সকলকে তৃপ্ত করেন। নিত্যানন্দের সাক্ষীগোপাল-বৃত্তান্তজ্ঞান সম্বন্ধে লেখক জানাইয়াছেন[২৭] :

(২৩) চৈ. ভা.—১।৬, পৃ. ৪১ (২৪) ঐ.—১।৬, পৃ. ৪৩ (২৫) অ. প্র. (২৬) ২।৪-৫ (২৭) চৈ. চ. ২।৭, পৃ. ১১৯

নিত্যানন্দ গোসাঞি যবে তীর্থ ভ্রমিলা।
সাক্ষীগোপাল দেখিবারে কটকে আইলা॥

ইহা ছাড়াও লেখক নিত্যানন্দের 'দক্ষিণের তীর্থপথ' অভিজ্ঞতা সম্বন্ধেও অন্যত্র উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে নিত্যানন্দের তীর্থ ভ্রমণের কথা গ্রন্থকার ভালভাবে জানিতেন। অথচ দেখা যায় যে রেমুণাতে মাধবেন্দ্র-গোপীনাথ প্রসঙ্গ বর্ণনাকালে নিত্যানন্দের উপস্থিতি সত্ত্বেও স্বয়ং মহাপ্রভুকেই বক্তা হইতে হইয়াছে এবং মহাপ্রভুর এতৎসম্বন্ধীয় জ্ঞানের উৎস সম্বন্ধে পাঠকের প্রশ্ন-নিরসনার্থে প্রভূত বাস্তবদৃষ্টিসম্পন্ন কবি জানাইয়াছেন যে স্বয়ং ঈশ্বর-পুরীর নিকটই মহাপ্রভু উক্ত বৃত্তান্তটি শ্রবণ করিয়াছিলেন। ইতিপূর্বে মাধবেন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ এবং অবস্থান ঘটিলে এইস্থলেও নিত্যানন্দই গল্পের বক্তা হইতেন, কিংবা অন্তত এই সম্বন্ধে তাঁহার পরিচয়ের কথা উল্লেখিত হইত। 'চৈতন্য-ভাগবত'-কারের সুপ্রসিদ্ধ স্তাবক কৃষ্ণদাস-কবিরাজ 'চৈতন্যভাগবত'-বর্ণিত প্রতিটি ঘটনার সম্বন্ধে বিশেষভাবেই অবগত ছিলেন এবং বৃন্দাবনের বর্ণনার কোনও প্রকার অশ্রদ্ধা না হয়, তজ্জন্য তিনি আশ্চর্যজনক-ভাবেই সচেতন ছিলেন। সেইজন্য উভয়ের বর্ণনার অসামঞ্জস্যমূলক ঘটনার ক্ষেত্রে কৃষ্ণ-দাসের বর্ণনাকেই পরীক্ষিত সত্য বলিয়া ধরিতে হয়। তাহা না হইলে তিনি কদাচ বৃন্দাবনের বিরুদ্ধ বর্ণনা পরিবেশন করিতেন না। তাহাছাড়া, তৎকালে সত্যকে যাচাই করিয়া লইবার কিছুটা ক্ষমতা একমাত্র তাঁহারই ছিল। অন্যসকলেই বহু ক্ষেত্রে প্রভাবিত হইয়াছেন। বৃন্দাবনের বর্ণনার মধ্যে স্থান বিশেষে যথেষ্ট ধৈর্যচ্যুতি ঘটায় তাহাই একপ্রকার বিরুদ্ধ-সিদ্ধান্তের পথকে প্রশস্ত করিয়া দেয়। উক্ত ঘটনার বর্ণনাতেও দেখা যায়[২৮] যে নিত্যানন্দের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিলে স্বয়ং মাধবেন্দ্রই ঈশ্বর-পুরী ও ব্রহ্মানন্দ-পুরী প্রমুখ তাঁহার জ্ঞানী ও প্রবীণ সকল শিষ্যের সহিত বালকের পরিচর্যায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং তাঁহার সহিত শাস্ত্র ও তত্ত্বালোচনা করিলেন। উক্ত বিবরণাদির কথা চিন্তা করিয়া ১৪৮২-৮৩ খ্রী.-এর পূর্ববর্তী কিংবা পরবর্তী কোন সময়েই নিত্যানন্দের সহিত মাধবেন্দ্রের সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল বলিয়া সিদ্ধান্ত-করা যায়না। লোচন, জয়ানন্দ, কবিকর্ণপুর এবং কৃষ্ণদাস-কবিরাজ কেহই বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেন নাই।

/ তবে নিত্যানন্দ যে বৃন্দাবন হইতেই নবদ্বীপে আসেন তাহা অযথার্থ না হইতে পারে। অবশ্য নবদ্বীপে আগমন-পথে তিনি কাশী হইয়াও আসিতে পারেন। বৃন্দাবন ও লোচন-দাস জানাইতেছেন যে তিনি লোকমুখে গৌরাঙ্গ আবির্ভাবের সংবাদ পাইয়া নবদ্বীপ যাত্রা

(২৮) চৈ. ভা.—১।৬, পৃ. ৪৫: এই প্রসঙ্গে বৃন্দাবন-বর্ণিত মাধবেন্দ্র-অদ্বৈত সাক্ষাৎকার ঘটনা (চৈ. ভা.—৩।৪, পৃ. ২৯৩-৯৪) পাঠ করিলেই উভয় স্থানের বর্ণনার পার্থক্য বুঝিতে পারা যাইবে।

করেন[২৯]। 'প্রেমবিলাস'-কারের মতে[৩০] ঈশ্বর-পুরীই তাঁহাকে গৌরাঙ্গ-আবির্ভাবের কথা জানাইয়া নবদ্বীপে যাইবার জন্য নির্দেশ দিলে তিনি নবদ্বীপে পৌছান। প্রকৃতপক্ষে, ঈশ্বর-পুরীও তৎপূর্বে নবদ্বীপে আসিয়া গৌরাঙ্গ-প্রতিভার সহিত পরিচিত হইয়া যান। সুতরাং ঈশ্বর-পুরী-প্রদত্ত সংবাদ অনুযায়ী যে নিত্যানন্দ নবদ্বীপে আসেন তাহা সত্য হইতেও পারে। ইহা অন্য গ্রন্থকারদিগের বর্ণনার বিরুদ্ধও নহে, অথচ জয়ানন্দের উক্তির সহিত ইহা অধিকাংশে মিলিয়া যাইতেছে। কোন কোন গ্রন্থে[৩১] দেখিতে পাওয়া যায় যে নিত্যানন্দপ্রভুর সর্বতীর্থাদি পরিক্রমার সঙ্গী ছিলেন উদ্ধারণ-দত্ত। পূর্বেই যদি উদ্ধারণের সহিত নিত্যানন্দের সম্পর্ক ও যোগাযোগ ঘটিয়া থাকে তাহাহইলে উদ্ধারণের নিকট গৌরাঙ্গ-আবির্ভাবের সংবাদ-শ্রবণও সম্ভব হইতে পারে[৩২]।

নবদ্বীপে আসিয়া[৩৩] নিত্যানন্দ নন্দন-আচার্যের গৃহে উঠিলেন। বিশ্বম্ভর তখন গয়া হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া লীলা আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি নিত্যানন্দের আগমন সংবাদ পাইয়া[৩৪] ভক্তবৃন্দসহ নন্দনের গৃহে হাজির হইলেন। 'ঘুর্ণিত লোচন বারুণীমদে মত্ত' নিত্যানন্দ অবধূতবেশে বসিয়া আছেন। তাঁহার বিরাট দেহ, 'কোটি সূর্যসম কান্তি,' 'ললাটে তিলক,' 'কণ্ঠে তুলসী কাষ্ঠের মালা,' 'কটিতটে পীতবাস,' 'শিরে লটপটি পাগ,' এবং 'ঝলমল অলঙ্কারে অঙ্গ মনোহর।' তিনি ভাবমদে প্রমত্ত এবং ধ্যানসুখে পরিপূর্ণ রহিয়াছেন। ভক্তবৃন্দ তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইলেন। গৌরচন্দ্র তাঁহার ভাবোন্মত্ত অবস্থা দেখিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। 'চৈতন্যমঙ্গল'-রচয়িতা লিখিয়াছেন[৩৫]:

সবাই পড়িবে পাছে নিত্যানন্দ ফান্দে।
এই কথা বলিলেন প্রভু গোরাচাঁদে॥

কিন্তু যে-রহস্যময় উদার-চিত্তবৃত্তি মানুষকে আত্মপর-জ্ঞান ভুলাইয়া এক নিমেষে

(২৯) চৈ. স.-মতে তিনি এক সন্ন্যাসীর নিকট গৌরাঙ্গ-আবির্ভাব-বার্তা প্রাপ্ত হন। (৩০) ৭ম. বি., পৃ. ৭০ ; তু.—চৈ. ভা.—২।৪, পৃ. ১২১ ; তু., চৈ. ম. (লো.)—ম. খ., পৃ. ১১২ (৩১) অ. ম. ; নি. বি.—পৃ. ৪৫ ; মু. বি.—১৪শ. বি., পৃ. ২৫৪ (৩২) গৌ. বি.-মতে (পৃ. ৮৩—১২৭) ; গৌর-নিতাই মিলনের পূর্বেই নিত্যানন্দ তাঁহার পিতৃসেবক শুভঙ্কর বা শুভাইকে নবদ্বীপে পাঠাইয়া গৌরাঙ্গের সহিত পত্র বিনিময় করিয়াছিলেন এবং তদনুযায়ী তিনি একদিন মহাসমারোহে শ্রীখণ্ডস্থ মুকুন্দদাসের বাটী হইয়া নবদ্বীপে আসিয়া বালক গৌরাঙ্গের সহিত মিলিত হন। কিন্তু এইরূপ বিবরণ অন্যান্য সমস্ত গ্রন্থের মতবিরুদ্ধ। (৩৩) ১৪৩০ শক, জ্যৈষ্ঠমাস—নিত্যানন্দচরিত (২য়. খ., পৃ. ৫)—জানকীনাথ পাল. (৩৪) চৈ ম. (জ.)-মতে (ন. খ., পৃ. ৫৫) মুকুন্দ-ভারতী নামক এক ব্যক্তি গৌরাঙ্গের নিকট নিত্যানন্দের আগমন সংবাদ জ্ঞাপন করেন। চৈ. জ্ঞা. ত. (পৃ. ত)-নামক পুঁথি-মতে নিত্যানন্দ মায়াপুরে আসিলে শ্রীবাস ও গৌরীদাসের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ ঘটিলে তাঁহাদের সাহায্যে তাঁহার গৌরাঙ্গদর্শন ঘটে। (৩৫) চৈ. ম. (লো.)—ম. খ., পৃ. ১১৩

অপরিচিতকেও আপনার করিয়া তুলে, সম্ভবত সেই মনোবৃত্তি বশত নিত্যানন্দও মুহূর্তের মধ্যে বিশ্বম্ভরের বাহুবন্ধনে ধরা দিলেন। সন্ন্যাসী-প্রসঙ্গ বিশ্বম্ভরকে আকর্ষণ করিত। বিশেষত, তাঁহার প্রাণপ্রিয় ভ্রাতাও এমনিভাবে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন! ঈশ্বর-পুরীর সহিত সম্পর্কিত অবধূত-নিত্যানন্দের মধ্যেও সেই জ্যেষ্ঠভ্রাতার কৃষ্ণপ্রেম দেখিয়া তিনি নিত্যানন্দকে অগ্রজের সম্মান দান করিলেন। ফলে গৌড়ীয় বৈষ্ণববৃন্দের হৃদয়েও নিত্যানন্দের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল।

এই স্থলে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, 'অবধূত'-নামক ব্যক্তির প্রকৃত স্বরূপ বুঝিয়া উঠা দুঃসাধ্য। 'শ্রীনিত্যানন্দ-চরিতে'র মহা-ভাষ্যকার রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয় একবিংশতি-পৃষ্ঠা সমন্বিত 'অবধূত শ্রীনিতাইচাঁদ'-নামক একটি পরিচ্ছেদের[৩৬] প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত এই সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াও অবধূত 'নিত্যানন্দ যে কি বস্তু' তাহার ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হন নাই। এমন কি অবধূতদিগের নানাপ্রকার শ্রেণী ও নানাবিধ কার্যকলাপের শাস্ত্রীয় প্রমাণ উত্থাপিত করিয়াও তিনি নিত্যানন্দ বা তাঁহার কর্মবিধিকে কোনও শ্রেণীভুক্ত করিতে পারেন নাই। তদ্বর্ণিত গ্রন্থের সারমর্ম এই যে শাস্ত্রও নিত্যানন্দ-শাসিত হইতে পারে, কিন্তু নিত্যানন্দের বিধি-নিয়ামক অবধূতত্ব আপনাতেই আপনি পূর্ণ একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীবিশেষ।

যাহা হউক, অবধূত-নিত্যানন্দের নবদ্বীপাগমনকালে অদ্বৈতপ্রভু কিন্তু উপস্থিত ছিলেন না। সুতরাং তাঁহার সহিত তখন নিত্যানন্দের পরিচয় ঘটিয়া উঠিল না।

'চৈতন্যভগবত'-কার জানাইয়াছেন যে উক্ত ঘটনার পর প্রভু-বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দকে ব্যাস-পূজার নির্দেশ দান করেন।[৩৭] এইরূপ করিবার কারণ বুঝা যায় না। কিন্তু এই প্রসঙ্গে তিনি নিত্যানন্দের মত জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীবাসকে নির্দেশ করিয়া

হাসি বোলে নিত্যানন্দ "শুন বিশ্বম্ভর।
ব্যাসপূজা এই মোর বামনের ঘর॥"

এতদনুযায়ী বিশ্বম্ভর শ্রীবাস-পণ্ডিতের উপর ব্যাসপূজার ভার দিয়া নিত্যানন্দ ও ভক্তগণসহ তাঁহার গৃহে আসিয়া কীর্তন আরম্ভ করিলেন। কিন্তু গুরু অদ্বৈতের অনুপস্থিতিতে তাঁহার নিকট সমস্তই নিরর্থক মনে হইতে লাগিল। অদ্বৈতের উদ্দেশে তিনি বারংবার 'নাঢ়া নাঢ়া' বলিয়া আকুল হইলেন। এদিকে নিত্যানন্দও ভাবাবিষ্ট হইয়া 'ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে ক্ষণে দিগম্বর। বাল্যভাবে পূর্ণ হৈল সর্ব কলেবর॥' পরদিনই ব্যাসপূজা। সেদিনের মত ভক্তবৃন্দ স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। শ্রীবাস-গৃহেই নিত্যানন্দের অধিষ্ঠান হইয়া গেল।

---

(৩৬) পৃ. ১১১-১৩১ (৩৭) ২।৫, পৃ. ১২২; ব্যাসপূজা ও অদ্বৈতমিলন প্রসঙ্গ দুইটি চৈতন্যভাগবত (২।৫,৬) হইতে গৃহীত হইয়াছে।

শ্রীবাস-গৃহে নিত্যানন্দ রাত্রিযাপন করিলেন। নিত্যানন্দ-জীবনে ইহা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ রজনী। এই রজনীতেই তাঁহার জীবনের একটি বিরাট পরিবর্তন সংসাধিত হয়। তাঁহার সন্ন্যাস-জীবনের একমাত্র নির্ভর যে দণ্ড-কমণ্ডলু, এক বিরাট ও নিদারুণ অন্তর্বিপ্লবের ফলে তিনি সেইগুলি ভাঙিয়া ফেলিলেন। বৃন্দাবনদাস জানাইয়াছেন যে প্রভাতে উঠিয়া রামাই-পণ্ডিত সমস্ত দেখিয়া শ্রীবাসের সহিত যুক্তিপূর্বক তদ্দণ্ডেই গৌরাঙ্গের নিকট সেই সংবাদ লইয়া গেলে গৌরাঙ্গ ছুটিয়া আসিলেন। নিত্যানন্দ তখন যেন বাহ্যজ্ঞান হারাইয়াছেন। গৌরাঙ্গ তাঁহাকে লইয়া গঙ্গাস্নানে গেলেন। কিন্তু কী যেন এক অন্তর্বিপ্লবের প্রভাবে নিত্যানন্দ তখন একেবারে অপ্রকৃতিস্থ। জীবনের প্রতিই যেন তাঁহার মায়া-মমতা টুটিয়া গিয়াছে। তাই তিনি 'কুম্ভীর দেখিয়া তারে ধরিবারে যায়।' বিশ্বম্ভর কোনপ্রকারে তাঁহাকে আনিয়া ব্যাসপূজায় বসাইলেন। ব্যাসপূজার আচার্য শ্রীবাস-পণ্ডিত নিত্যানন্দকে জানাইলেন যে তাঁহাকেই স্বহস্তে মাল্যদান করিতে হইবে, এবং ব্যাসদেবকে তুষ্ট করিতে পারিলেই সর্ব অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। কিন্তু নিত্যানন্দ কিছুতেই মাল্যদান করিতে চাহিলেন না।

যত শুনে নিত্যানন্দ কহে হয় হয়।
কিসের বচন পাঠ প্রবোধ না লয়॥

মাল্য হস্তে তিনি এদিক ওদিক চাহিতে লাগিলেন। শেষে গৌরাঙ্গের উপর দৃষ্টি পড়িলে তাঁহার নয়নদ্বয় ঝলসিয়া গেল। এমন দিব্যচ্ছটা মানুষে তো সম্ভব নহে![৩৮] তাঁহার বিবেক বুদ্ধি স্তম্ভিত হইল। তিনি মূর্ছিত হইলেন। মূর্ছাভঙ্গ হইলে গৌরাঙ্গের আদেশানুক্রমে ব্যাসপূজা সম্পন্ন হইল।

কিন্তু অদ্বৈতবিরহে গৌরাঙ্গের অন্তঃকরণে যেন একটি বেদনা লাগিয়া রহিল। 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়কৌমুদী'-গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে[৩৯] যে অদ্বৈতপ্রভু সেই সময় শান্তিপুরে অবস্থান করিতেছিলেন বলিয়াই 'সে কারণে আইল ব্যাপক নিত্যানন্দ।' তাই বোধকরি নিত্যানন্দকে প্রাধান্য দিয়া গৌরাঙ্গ যে 'সঙ্কীর্তনরঙ্গে' বিভোর হইলেন, এ সংবাদ গুরু অদ্বৈতের নিকট জ্ঞাপন না করা পর্যন্ত তিনি যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে পারিলেন না। অদ্বৈতপ্রভুর নিকট 'নির্জনে' সেই সংবাদ জানাইবার জন্য তিনি অচিরেই রামাই-পণ্ডিতকে শান্তিপুরে পাঠাইয়া সস্ত্রীক অদ্বৈতাচার্যকে নবদ্বীপে

(৩৮) চৈ. ভা. (২।৫, পৃ. ১২৪–২৫)-মতে এই সময় নিত্যানন্দ ষড়্‌ভুজ-মূর্তি দর্শন করেন। চৈ. চ.-তে (১।১৭, পৃ. ৭১) ইহার সমর্থন পাওয়া যায়। চৈ. ম. (লো.)-মতে (ম. ৭., পৃ. ২১৪) বিশ্বম্ভর প্রথমে চতুর্ভুজ-মূর্তি ও পরে ষড়্‌ভুজ-মূর্তি প্রদর্শন করেন। (৩৯) ২য়. অঙ্ক, পৃ. ৫৫।

আনাইলেন। অদ্বৈত আসিয়া দেখিলেন যে সাঙ্গোপাঙ্গ গৌরচন্দ্র তখন শ্রীবাসালয়ে বিষ্ণু-খট্টায় সমাসীন; ভক্তবৃন্দ তাঁহার সেবারত, নিত্যানন্দও ছত্রধররূপে সন্নিকটে দণ্ডায়মান।

বৃন্দাবনদাস তাঁহার 'ইষ্টদেব'[৪০] নিত্যানন্দের আজ্ঞাতেই[৪১] 'চৈতন্যভাগবত' রচনা করেন এবং তিনি নিত্যানন্দের 'প্রীত্যর্থে'ই তদ্বর্ণিত ষড়্‌ভূজদর্শনাদি বিষয়ের বিবরণ দিয়াছেন।[৪২] সুতরাং গুরুর গুণবর্ণনা সম্বন্ধে তাঁহার বৈষ্ণবোচিত অত্যুক্তির মধ্যে যদিও বা সন্দেহের অবকাশ থাকে, কিন্তু নিত্যানন্দ প্রসঙ্গে খাঁটি বাস্তব ঘটনাবলীর সম্বন্ধে তাঁহার বিবরণ নিশ্চয়ই কিছু পরিমাণে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ-সদৃশ মর্যাদা লাভ করিতে পারে। তাঁহার মন্তব্যগুলিকে না গ্রহণ করা যাইতে পারে, কিন্তু তদ্বর্ণিত মূল ঘটনাকে স্বীকার করিয়া লইতেই হয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, যে-নিত্যানন্দের আগমন- ও প্রকাশাদি-সংবাদ 'নির্জনে' অদ্বৈতকে জানাইবার জন্য গৌরচন্দ্র রামাইকে নির্দেশ দিয়াছিলেন, সেই-নিত্যানন্দের সহিত প্রথম সাক্ষাৎকারে উভয়ের (অদ্বৈত-নিতাইর) মধ্যে যে কিরূপে ভাবের আদান-প্রদান ঘটিয়াছিল, তাহার বিবরণ বৃন্দাবন লিপিবদ্ধ করেন নাই।

নিত্যানন্দ শ্রীবাস-গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। আচার্যকে তিনি 'বাপ' সম্বোধন করিতেন এবং আচার্যও তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। তাঁহার এই স্নেহের প্রকৃতি ছিল অকল্পনীয়। 'মদিরা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে' এবং তিনি যদি শ্রীবাসের 'জাতি প্রাণ ধন' সমস্তই বিনষ্ট করেন, তথাপি নিত্যানন্দের প্রতি বিশ্বাস অটুট রাখিতে হইবে,—ইহাই ছিল শ্রীবাসের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।[৪৩] অথচ একদিন ভ্রমণকালে স্বয়ং গৌরাঙ্গপ্রভু বলরামের ভাবাবেশে[৪৪] এক মদ্যপের গৃহে উঠিতে চাহিলে এই শ্রীবাস-পণ্ডিতই তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য জানাইয়াছিলেন যে গৌরাঙ্গ যদি মদ্যপের গৃহে গিয়া উঠেন তাহা হইলে তিনি শ্রীবাস) গঙ্গাগর্ভে প্রাণ বিসর্জন করিবেন।

যাহা হউক, তখন নিত্যানন্দের পূর্ণ যৌবন। কিন্তু তাঁহর সর্ব-কলেবর হইতে নিরন্তর একটি বাল্যভাব স্ফুরিত হইত এবং তাঁহার কাজকর্মের মধ্যে একটি অনাড়ম্বর ঔদার্য ও বালসুলভ চপলতা পরিলক্ষিত হইত। শ্রীবাস-পত্নী মালিনী তাঁহাকে কাছে বসাইয়া না খাওয়াইলে নিত্যানন্দ 'আপনি তুলিয়া হাতে ভাত নাহি খায়।'[৪৫] এবং স্পর্শমাত্রেই

(৪০) চৈ. ভা.—১।১, পৃ. ২ (৪১) ঐ—২।৪, পৃ. ১২১ ; ১।১, পৃ, ৫ ; ২।২, পৃ. ১১৪ ; ২।১০, পৃ. ১৬০ ; (ভ. নি.—১ম. ক., পৃ. ১) (৪২) চৈ. ভা. —২।৫, পৃ. ১২৩, ১২৫ (৪৩) চৈ. ভা—২।৮, পৃ. ১৩৭ (৪৪) প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য (৫ম. + ৬ষ্ঠ.—পৃ. ১০৮) গ্রন্থে শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় লিখিতেছেন, "এখানে নিত্যানন্দের পক্ষে যাহা হইবার কথা তাহা বিষন্তরে আরোপিত হইয়াছে। বলরামের সঙ্গেই বারুণীর সম্বন্ধ পৌরাণিক ঐতিহ্যে অপরিহার্য হইয়া আছে।" (৪৫) চৈ. ভা.—২।৮, পৃ. ১৩৬

মালিনীর 'অচিন্ত্য শক্তি-জাত স্বতঃস্ফূর্ত স্তন্যরসপানে তিনি অকুণ্ঠ তৃপ্তিলাভ করিতেন।[৪৬] এমন কি আচার্য-দম্পতীর লালন-সমাদর লাভ করিয়া তিনি এক এক সময় অনেক লোক-বিগর্হিত কর্মও করিয়া ফেলিতেন। তাঁহার এইরূপ ভাবভোলা অবস্থা দেখিয়া স্বয়ং গৌরাঙ্গকেও হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছিল। তিনি একদিন তাঁহাকে স্পষ্টই জানাইলেন,[৪৭] "চঞ্চলতা না করিবা শ্রীবাসের ঘরে।" নিত্যানন্দ তখন বিষ্ণুনাম উচ্চারণ করিয়া বলিলেন :

আমার চাঞ্চল্য তুমি কভু না পাইবা।
আপনার মত তুমি কারো না বাসিবা॥

বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দের এই প্রকার আত্মপ্রত্যয়াত্মক নির্ভীক কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। শেষে তিনি যখন বলিলেন যে নিত্যানন্দের অন্ন-নিক্ষেপাদি অপকীর্তি তাঁহার উন্মাদ ও চঞ্চলভাবের পরিচায়ক এবং সেইজন্যই বিশ্বম্ভর তাঁহাকে শিক্ষাদান করিতেছেন, তখন

হাসি বোলে নিত্যানন্দ "বড় ভাল ভাল।
চাঞ্চল্য দেখিলে শিখাইবে সর্বকাল॥
নিশ্চয় বলিলা তুমি—আমি ত চঞ্চল॥"

অসংযতবাক্ সরল বালকের মত তিনি স্বীয় পরিহিত বস্ত্র মস্তকে জড়াইয়া লাফ দিতে লাগিলেন। গৃহস্থের বাড়ীতে এইরূপ কর্ম অবিধেয় বলিয়া বিশ্বম্ভর তখন তাঁহাকে নানাভাবে বুঝাইয়া বস্ত্র পরিধান করাইলেন। অন্যের কথার প্রতি নিত্যানন্দের ভ্রূক্ষেপ-মাত্র না থাকিলেও 'চৈতন্যবচন'কে তিনি 'অঙ্কুশ'-সদৃশ মনে করিতেন। তিনি নিজেকে সংযত করিলেন।

নিত্যানন্দের সন্ন্যাসধর্ম এবং একটি উলঙ্গ সারল্য ও বাহ্যনিরপেক্ষ নির্ভীক আচরণ তাঁহাকে বিশ্বম্ভরের নিকট শ্রদ্ধেয় করিয়াছিল, সেই কারণে এবং তাঁহার দ্বারা বিশ্বরূপের শূন্য স্থান অনেকটা পূরণ হওয়ায় শচীদেবীর হৃদয়ও প্রেমোদ্বেল হইয়াছিল। তিনি ব্যাস-পূজার দিনেই বিশ্বম্ভরের পার্শ্বে সুদৃশ্য বলিষ্ঠ যুবকটিকে দেখিয়া উভয়কে 'দুইজন মোর পুত্র'-রূপে কল্পনা করিয়া লন।[৪৮] তারপর, যে-ধরনের উদার-ঔদাসীন্য ও বালসুলভ চাপল্যকে অতি সহজেই ভালবাসিয়া ফেলিবার প্রবণতা নারীর একটি চিরন্তন প্রকৃতি, নিত্যা-নন্দের সেইপ্রকার আচরণই ক্রমে শচীদেবীর হৃদয়কে স্নেহাভিষিক্ত করে এবং তাঁহাকে নিকটে রাখিয়া, উপদেশাদি দান করিয়া, বিশ্বম্ভরের সহিত নানাবিধ অন্ন-ব্যঞ্জনাদি ভোজন করাইয়া তাঁহার সেই রুদ্ধ হৃদয়াবেগ যেন বহিঃপ্রকাশের পথ খুঁজিতে থাকে। তিনি নিত্যানন্দের সমস্ত আবদার-অত্যাচারও নির্বিবাদে সহ্য করিতে লাগিলেন। এই সময় একদিন বিশ্বম্ভর গৃহে বসিয়া আছেন। বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁহাকে তাম্বূল যোগাইতেছেন, হঠাৎ নিত্যানন্দ কোথা

(৪৬-৪৭) ঐ—২।১১, পৃ. ৬১-৬২। (৪৮) চৈ. ভা.—২।৫, পৃ.১২৬

হইতে আসিয়া একেবারে 'বাল্যভাবে দিগম্বর হৈলা, দাণ্ডাইয়া'।[৪৯] গৌরাঙ্গ তাঁহাকে এবম্বিধ আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে "নিত্যানন্দ 'হয় হয়' করয়ে উত্তর।" গৌরাঙ্গ এক কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আর এক উত্তর দিতে থাকেন। গৌরচন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "এক এড়ি কহ কেনে আর?" কিন্তু নিতাই তখন কাণ্ডজ্ঞান হারাইয়াছেন। গৌরাঙ্গ তাঁহাকে ধরিয়া বস্ত্র পরিধান করাইলেন। কিন্তু শচীমাতা সমস্তই নির্বিবাদে সহ্য করিলেন এবং 'কাহারে না কহে আই পুত্র স্নেহ করে।' নিত্যানন্দ সম্বিৎ পাইতেই শচী-প্রদত্ত সন্দেশ খাইয়া আশ্বস্ত হইলেন।

নিত্যানন্দ কখনও কৃষ্ণানুরাগা, কখনও বা বিশ্বম্ভর-প্রেমে বিভোর, এবং কখনও বাল্য-ভাবে স্তন্য পান করিয়া ভাবাবিষ্ট, হইতেন কখনও বা দিগম্বর হইয়া নৃত্য করিতেন, কখনও বা আবার অন্ন-ব্যঞ্জনাদি ছড়াইয়া লণ্ড ভণ্ড করিতেন। অবধূত জীবনের দণ্ড ও কমণ্ডলু ভাঙিয়া তিনি গৃহবাসী হইয়াছিলেন, অথচ গৃহী-জীবনের মর্যাদা রক্ষা করেন নাই। কৃষ্ণভাবৈকরসচিত্ত গৌরাঙ্গ বা চৈতন্যমহাপ্রভু সর্বপ্রকার বাহ্যজ্ঞানরহিত উন্মাদ-অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াও কোনদিন অন্যের অনিষ্টজনক বা সমাজ-বিগর্হিত কোনও কার্য করেন নাই। অথচ নিত্যানন্দ পুনঃ পুনঃ এইরূপ করিতে থাকায় তাঁহার সম্বন্ধে অনেকেই সন্দেহাকুল হইলেন। কিন্তু তাঁহার এইরূপ আচরণকে প্রেমোন্মত্ততার লক্ষণমাত্র বলিয়াই বৃন্দাবনদাস বার বার উল্লেখ করিয়াছেন। কোনও গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "'চৈতন্যভাগবত' ইতিহাস নয়, পুরা-কাব্য বা জীবনচরিতও নয়। ইহা চৈতন্যপুরাণ এই পুরাণের ব্যাসদেব বৃন্দাবনদাস।" তিনি বৃন্দাবনদাস ও কবিরাজ-গোস্বামী উভয়কেই 'গৌর-নিত্যানন্দলীলার বেদব্যাসদ্বয়' আখ্যা প্রদান করিয়াছেন।[৫০] একথা সত্য যে 'চৈতন্যচরিতামৃত' রচনার পূর্ব পর্যন্ত বৃন্দাবনদাসই ছিলেন চৈতন্যলীলার 'বেদব্যাস'। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, সর্বকালের বিচারে তিনিই হয়ত নিত্যানন্দ-লীলার বাল্মীকি। অবশ্য তিনি যে ভক্ত-সমাজের মধ্যে চৈতন্যলীলা ও নিত্যানন্দ-স্বরূপ প্রচারার্থ জনপ্রিয় ভাষায় গ্রন্থ-রচনা করিয়াছিলেন, তাহার মূল প্রেরণা আসিয়াছিল স্বয়ং নিত্যানন্দপ্রভুর নিকট হইতেই। তিনি নিজেই বলিয়াছেন যে তাঁহার স্বতন্ত্র শক্তি বলিয়া কিছুই ছিল না, যেন কাষ্ঠপুত্তলিকাকে সহজে নাচান হইয়াছে।[৫১] ইহা যে বৃন্দাবনদাসের বৈষ্ণবোচিত দৈন্যোক্তি, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই বিনয়োক্তি সম্পূর্ণ মিথ্যা-প্রতিষ্ঠিত নহে। সুতরাং আলোচ্য লীলাকালে নিত্যানন্দ-হৃদয়ে ভারসাম্যের অভাব দেখা দিলেও তাঁহার পরবর্তী-কালের প্রকৃতিস্থ ও বলিষ্ঠ অবস্থায় কথিত বিবরণগুলি প্রণিধানযোগ্য। বৃন্দাবনদাসের অভিমতগুলি সেই বিবরণ ও উপদেশাদির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তাহা

---

(৪৯) ঐ—২।১১, পৃ. ১৬২-৬৩ (৫০) প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য (৫ম. ও ৬ষ্ঠ. খ.)—পৃ. ৯২। (৫১) চৈ. ভা.—১।১২, পৃ. ৯১

বিশেষভাবেই গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠে। কিন্তু সমস্ত বিরুদ্ধমতাবলম্বীর মতের কঠোর সমালোচনা করিয়া নিত্যানন্দের উক্ত রূপ অব্যবস্থিতচিত্ততা ও রহস্যময় কার্যকলাপের সম্বন্ধে বৃন্দাবন লিখিয়াছেন :[৫২]

এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে ॥

এবং তারপর

চৈতন্যের ভাবে মত্ত নিত্যানন্দ রায়।
এক শুনে আর কহে হাসিয়া বেড়ায় ॥

তাঁহার এই সমস্ত মন্তব্যকে পরবর্তী-গ্রন্থকার-গণ ও পরবর্তী বৈষ্ণবসমাজ নির্বিচারে ও সশ্রদ্ধচিত্তে মানিয়া আসিয়াছেন।

সন্ন্যাস-জীবনের প্রতি বিশ্বম্ভরের দুর্বার আকর্ষণ ছিল। অবধূতবেশী নিত্যানন্দের মধ্যে তিনি সেই অভীপ্সিত ভবিষ্যৎ-জীবনের উজ্জ্বল দিকটির সম্ভাবনাময় আভাস দেখিতে পাইয়াছিলেন। সুতরাং প্রথম দর্শনেই অবধূতবেশী নিত্যানন্দ বিশ্বম্ভরের জ্যেষ্ঠভ্রাতা সন্ন্যাসী-বিশ্বরূপের যে শূন্য স্থানটিতে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইলেন, সেই স্থানেই তিনি গৌরাঙ্গ-প্রভুর অচল নিষ্ঠা-ও প্রেম-পূত সিংহাসনে নিরাপদ হইয়া রহিলেন। শত ঝড়ঝঞ্ঝাও তাঁহাকে স্পর্শমাত্র করিতে পারিল না। বৈষ্ণবসমাজে এত বড় সৌভাগ্যের অধিকারী আর কেহ হইতে পারেন নাই। চৈতন্য কর্তৃক বিশ্বরূপের মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত সেই শ্রদ্ধা-সম্মানের মধ্যে যেন কোন বিরতিই ছিল না। গৌরাঙ্গের নবদ্বীপলীলার মধ্যে তাই দেখা যায় নিত্যানন্দের প্রতি সেই শ্রদ্ধা সমভাবেই বর্ধিত হইয়াছে। নিত্যানন্দের প্রতি শ্রীবাস-পণ্ডিতের শ্রদ্ধা দেখিয়া তিনি শ্রীবাসকে পুরস্কৃত করিয়াছিলেন।[৫৩] পার্শ্বো-পবিষ্ট নিত্যানন্দকে প্রণাম না করিয়া কেবল তাঁহাকেই প্রণাম করিবার জন্য তিনি মুরারিকে ভর্ৎসনা করিয়া নিত্যানন্দের মান বাড়াইয়া দিয়াছিলেন।[৫৪] আবার চন্দ্রশেখর-আচার্যের গৃহে গৌরাঙ্গের অঙ্কবিধানে নৃত্যকালেও নিত্যানন্দ বড়াইবুড়িরূপে নির্ধারিত হইয়াছিলেন।[৫৫] শ্রীবাস-গৃহে কৃষ্ণ-জন্মোৎসবকালে,[৫৬] গৌরাঙ্গের গোষ্ঠলীলাপ্রকাশ,[৫৭] বনভোজনলীলা[৫৮] ও রাসরস বিলাস-কালে[৫৯] সর্বদাই নিত্যানন্দ বিশেষ স্থান অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন। কাজীদলন[৬০] বা নগর-সংকীর্তনাদি বিখ্যাত ঘটনাবলীর মধ্যেও তাঁহার স্থান ছিল। এমনকি গৌরীদাস-পণ্ডিতের গৃহে যে গৌর-নিতাই-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, নরহরি-চক্রবর্তী বলেন যে সেই ঘটনাতেও গৌরাঙ্গপ্রভুর সমর্থন ছিল।[৬১]

---

(৫২) ঐ—২।১১, পৃ. ১৬২ (৫৩) ঐ—২।৮. পৃ. ১৩৭ (৫৪) ভ র.—১২।২৯৩৬ (৫৫) চৈ. ভা —২।১৮, পৃ. ১৮৮ ; চৈ. না.—৩।১১ (৫৬-৫৯) ভ. র.—১২।৩১৫৪, ৩১৭০, ৩২১০, ৩২৪৮, ৩৩৫০ (৬০) চৈ. ভা,—২।১৩, পৃ. ২১৭ ; চৈ. চ.—১।১৭, পৃ. ৭৪(৬১) ভ. র.—৭।৩৪৭ ; অ. প্র.—২০শ. অ., পৃ. ৯০ ; তু.—শ্রীচৈ. চ.—৪।১৪।১২-১৫ ।

গৌরাঙ্গ যখন ঈশ্বরভাবে ভাবিত হইয়া তদনুরূপ লীলায় প্রবৃত্ত হইতেন, নিত্যানন্দ তখন গদাধরাদির মত তাঁহার সন্নিকটে আসিয়া সেবা-পরিচর্যায় রত থাকিতেন। গদাধর তাম্বূল যোগাইতেন এবং নিত্যানন্দ ছত্র ধরিয়া দাঁড়াইতেন।[৬২] নৃত্য-কীর্তনাদির সময় বলিষ্ঠ নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গের নিকট থাকিয়া তাঁহাকে পতনাদি অপ্রত্যাশিত বিপদ হইতে সর্বদা রক্ষা করিয়া চলিতেন।[৬৩] তিনি ছিলেন প্রকৃতই বুদ্ধিমান এবং সমস্ত অবস্থার সহিত মানাইয়া চলিবার বুদ্ধি, ধৈর্য ও নমনীয় ঔদার্য যেন তাঁহার সহজাত ছিল। তিনি গৌরাঙ্গের বাল্যলীলার অনেক পরবর্তিকালে আসিয়া যুক্ত হইলেও, অতি অল্পকালের মধ্যেই স্বীয় প্রতিভাবলে গৌরাঙ্গ-পার্ষদবৃন্দের মধ্যে একরকম সর্বশ্রেষ্ঠ আসন দখল করিয়া বসিলেন।

নিত্যানন্দ-মহিমা সম্বন্ধে বৃন্দাবনদাস একটি গল্প বলিয়াছেন।[৬৪] 'চৈতন্যচরিতামৃত-মহাকাব্যে' লিখিত হইয়াছে[৬৫] যে একদিন গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দকে একটি নির্মল বসন গ্রহণ করিতে বলিলে নিত্যানন্দ একখানি বহির্বাস গ্রহণ পূর্বক কমলাক্ষ (অদ্বৈত) ব্যতীত অন্যান্য ভক্তবৃন্দকে সেই বস্ত্র প্রদান করেন এবং ভক্তবৃন্দও অভিবাদন-পূর্বক তাহা গ্রহণ করিয়া যথানিয়মে গঙ্গাজলে স্নান ও পূজাদি-কার্য সমাধা করেন। বৃন্দাবনদাস 'চৈতন্য-ভাগবতে' ঘটনাটিকে এইভাবে বলিতেছেন :—একদিন গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দের নিকট তাঁহার একটি কৌপীন প্রার্থনা করিলেন :

দেহ—ইহা বড় ইচ্ছা আছয়ে আমার !

নিত্যানন্দ কৌপীন দিলে তিনি সেই কৌপীনখানি অসংখ্য খণ্ড করিয়া ছিঁড়িলেন এবং বৈষ্ণবদিগের সকলকে এক এক খণ্ড মাথায় বাঁধিতে নির্দেশ দিয়া বলিলেন :

অন্যের কি দায় ইহা বাছে যোগেশ্বরে।

ভক্তবৃন্দ নির্দেশ মান্য করিলে শেষে গৌরাঙ্গ বলিলেন :

মহাযত্নে ইহা পূজা কর গিয়া ঘরে ॥

কিন্তু যে বিশেষ কারণে নিত্যানন্দ সর্বজনমান্য হইয়াছিলেন, তাহা হইল তাঁহার জগাই-মাধাই উদ্ধার বৃত্তান্ত। গৌরাঙ্গ কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া কৃষ্ণনাম প্রচারার্থ একবার হরিদাস ও নিত্যানন্দ পথে পথে নাম বিতরণ করিয়া বেড়াইতে থাকিলে হঠাৎ একদিন জগাই-মাধাই[৬৫] নামক অতি পাষণ্ড ব্রাহ্মণ ভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গে তাঁহাদের সাক্ষাৎ ঘটে। 'গোমাংসভক্ষণ, ডাকাচুরি, পরগৃহদাহ' মদ্যপান ও নারী-নির্যাতন প্রভৃতি এমন কোনও অপকর্ম ছিল না, যাহা তাঁহাদের পক্ষে গর্হিত বিবেচিত হইত। সেই মহালম্পট দুই মত্তপকে দেখিয়া নিত্যানন্দের হৃদয় মমতা ও সহানুভূতিতে ভরিয়া যায়, তিনি স্থির

(৬২) চৈ. ভা.—২।১০, পৃ. ১৫২ ; ২।২২, পৃ. ২০৯ ; গৌ. লী.—পৃ.৩৬ (৬৩) চৈ. ভা.—২।২৩, পৃ. ২২১ ; (ভ. নি.— ২য় ক., পৃ. ২৬) (৬৪) চৈ. ভা.— ২।১২, পৃ. ১৬৪ (৬৫) ৭।৫৫-৫৭।

করিলেন পাষণ্ড ভ্রাতৃদ্বয়কে[৬৬] কৃষ্ণনাম দিয়া উদ্ধার করিবেন। কিন্তু সন্ন্যাসীদিগের মুখে কৃষ্ণনাম শুনিয়া তাঁহারা উগ্রমূর্তি ধারণ করিয়া ছুটিয়া আসিলে নিত্যানন্দ এবং হরিদাস বহুদূরে ছুটিয়া পলাইয়া তাঁহাদের কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন।

অহৈতুকী করুণা প্রদর্শনের জন্য এতবড় বিপজ্জনক কর্ম করিতে যাওয়ায় নিত্যানন্দের প্রতি হরিদাস সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। বিশেষ করিয়া পথিমধ্যে নিত্যানন্দের নানাবিধ চঞ্চলতা, এবং এমনকি, তজ্জন্য সাবধান করিতে গেলে অদ্বৈত-বিশ্বম্ভরের প্রতিও তাচ্ছিল্য-সূচক দুর্বাক্য-প্রয়োগ, সংযতচিত্ত হরিদাসের চিত্তকে ভারাক্রান্ত করিল। সমস্ত শুনিয়া অদ্বৈতপ্রভু বিরক্ত হইলেন। গৌরাঙ্গ ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন যে সেই দুই পাপাশয়কে 'খণ্ড খণ্ড করিমু আইলে মোর হেথা।' কিন্তু নিত্যানন্দের হৃদয় দয়ার্দ্র হইয়াছিল। তিনি তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য গৌরাঙ্গের নিকট বারবার আবেদন জানাইলেন।

কিছুদিন পরে জগাই-মাধাই গৌরাঙ্গের গৃহ-সন্নিকটস্থ গঙ্গার ঘাটে আড্ডা গাড়িলেন। একদিন রাত্রিকালে নিত্যানন্দ সেই পথ দিয়া আসিতেছিলেন। দুই ভাই আসিয়া তাঁহাকে ধরিলেন এবং মুহূর্তেই মাধাই 'মারিল প্রভুর শিরে মুটুকী তুলিয়া।' নিত্যানন্দের মস্তক ক্ষতবিক্ষত হইয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। কিন্তু তিনি সমস্ত যাতনা সহ্য করিয়াও বলিলেন[৬৭]:

মেরেছিস মেরেছিস তোরা তাতে ক্ষতি নাই।
সুমধুর হরিনাম মুখে বল ভাই॥

এদিকে সংবাদ পাওয়া মাত্র গৌরাঙ্গ ভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়া ভক্তগণসহ ছুটিয়া আসিলেন। কিন্তু নিত্যানন্দ অম্লানবদনে জানাইলেন:

মাধাই মারিতে প্রভু! রাখিলে জগাই।
দৈবে সে পড়িল রক্ত দুঃখ নাহি পাই॥
মোরে ভিক্ষা দেহ প্রভু! এ দুই শরীর।
কিছু দুঃখ নাহি মোর তুমি হও স্থির॥

নিত্যানন্দ-হৃদয়ের ঔদার্য গৌরাঙ্গ-হৃদয়কে বিচলিত করিল। তিনি জগাইকে প্রেমালিঙ্গন দান করিলেন,[৬৮] মাধাই তখন অনুতপ্ত হৃদয়ে ছুটিয়া গিয়া গৌরাঙ্গ-চরণে পতিত হইলেন। গৌরাঙ্গ তাঁহাকে নিত্যানন্দের তুষ্টি সাধনের উপদেশ প্রদান করিলেন। কিন্তু সমস্ত অঙ্গ-যন্ত্রণা ভুলিয়া নিত্যানন্দ পুনরায় বলিলেন:

কোন জন্মে থাকে যদি আমার সুকৃত।
সব দিলুঁ মাধাইরে শুনহ নিশ্চিত॥

(৬৬) শ্রীবাসচরিতের গ্রন্থকার লিখিতেছেন (পৃ. ১৯০), "জগাই ও মাধাই দুইজন নবদ্বীপের কোটাল বা রক্ষক ছিলেন। কাজির ক্ষমতার নীচেই তাহাদের ক্ষমতা ছিল।"—গ্রন্থকার কোনও পূর্বসূত্রের উল্লেখ করেন নাই। (৬৭) চৈ. (লো.)—ম. খ., পৃ. ১২২ (৬৮) চৈ. ভা.-মতে (২।১৩, পৃ. ১৭০) এই সময়ে জগাইর চতুর্ভুজ-মূর্তি দর্শন ঘটে।

ভক্তগণের আনন্দ-সংকীর্তনে চতুর্দিকে কোলাহল পড়িয়া গেল। জগাই মাধাই সমস্ত পাপকর্ম হইতে বিরত হইয়া পরম ভক্তে পরিণত হইলেন। একটি অসাধ্য সাধন হইয়া গেল। নিত্যানন্দের যশোমহিমায় গ্রামাঞ্চল পরিপূরিত হইল এবং ভক্তবৃন্দের হৃদয়ে তাঁহার আসন দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত হইল। কিছুদিন পরে মাধাই প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ আগ্রহ প্রকাশ করিলে নিত্যানন্দ তাঁহাকে গঙ্গাঘাট সজ্জিত করিবার উপদেশ দিলেন। মাধাই ঘাট প্রস্তুত করিয়া তাঁহার পুর্ব পাপের ক্ষালন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন।[৬৯]

উক্ত ঘটনার পর গৌর নিতাইর মধ্যে যেন একটি অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। নিত্যানন্দ সর্বদা গৌরাঙ্গের পার্শ্বে থাকিয়া তাঁহার উদ্দেশ্যগুলি সিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি শক্তিমান ছিলেন। গৌরাঙ্গের সহিত আঁটিয়া উঠা তাঁহার দ্বারাই সম্ভব ছিল। একদিন অদ্বৈতাচার্যের কথায় আহত হইয়া ভাবোন্মত্ত গৌরাঙ্গ বিদ্যুৎবেগে ছুটিয়া গঙ্গায় ঝাঁপ দিলে নিত্যানন্দ ও হরিদাস বহুদূর পর্যন্ত তাঁহার পশ্চাতে গিয়া তাঁহাকে গঙ্গাবক্ষ হইতে তুলিয়াছিলেন। আর একদিন নিত্যানন্দসহ বিশ্বম্ভর শান্তিপুরে গিয়াছিলেন। পথিমধ্যে[৭০] মুলুকের নিকটস্থ ললিতপুর গ্রামে এক 'গৃহস্থ সন্ন্যাসী' বাস করিতেন। নিত্যানন্দ সম্ভবত তাঁহার কথা জানিতেন। তাই তাঁহার নিকট সন্ন্যাসীর নাম শুনা-মাত্রেই বিশ্বম্ভর আকৃষ্ট হইলেন এবং উভয়ে সন্ন্যাসীর গৃহে উঠিলেন। বিশ্বম্ভর সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিলে সন্ন্যাসী তাঁহাকে কামিনী-কাঞ্চন প্রাপ্তির আশীর্বাদ করিলেন। কিন্তু তাঁহার এইরূপ উক্তি যে আপত্তিকর ও অন্যায়, বিশ্বম্ভর তাহা প্রমাণ করিয়া দিলে সন্ন্যাসী আপনার সমগ্র ভারত-ভ্রমণের অভিজ্ঞতার বলে 'দুগ্ধের ছাওয়াল' বিশ্বম্ভরের যুক্তিকে বাল-ভাষিত বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিলেন। কিন্তু তখন:

হাসি বোলে নিত্যানন্দ "শুনহ গোসাঞি।
শিশু সঙ্গে তোমার বিচারে কার্য নাঞি॥
আমি সে জানিয়ে ভাল তোমার মহিমা।
আমারে দেখিয়া তুমি সব কর ক্ষমা॥"

সন্ন্যাসী সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহার গৃহে স্নানাহারের সুবন্দোবস্ত হইল। ভোজনান্তে বামপন্থী-সন্ন্যাসী ঠারেঠোরে নিত্যানন্দের নিকট প্রস্তাব করিলেন:

শুনহ শ্রীপাদ কিছু "আনন্দ আনিব?
তোমা হেন অতিথি বা কোথায় পাইব॥"

(৬৯) "তিনি স্বহস্তে কোদালি লইয়া প্রতিদিন গঙ্গার ঘাট পরিষ্কার করিতে লাগিলেন" —(?); তু.—বৈ. দি., পৃ. ৪২ (৭০) চৈ. ভ.—২।১৯, পৃ. ১৯৬

সমস্ত বুঝিয়া নিত্যানন্দ চুপ করিয়া রহিলেন, কিন্তু

"আনন্দ আনিব" ন্যাসী বোলে বার বার।
নিত্যানন্দ বোলে "তবে লড় সে আমার॥"
দেখিয়া দোঁহার রূপ মদন সমান।
সন্ন্যাসীর পত্নী চাহে জুড়িয়া ধেয়ান॥
সন্ন্যাসীরে বিরোধ করয়ে তার নারী।
"ভোজনেতে কেনে তুমি বিরোধ আচরি॥"

বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে 'আনন্দ' বলিতে সন্ন্যাসী মদ্যকে বুঝাইতেছেন। তখন তিনি অধৈর্য অন্তঃকরণে বিষ্ণুনাম লইয়া তৎক্ষণাৎ সেই স্থান পরিত্যাগ করিলেন।

ক্রমে গৌরাঙ্গের নবদ্বীপলীলাকাল ফুরাইয়া আসিল। তিনি সন্ন্যাস-গ্রহণের জন্য কৃতসংকল্প হইয়া নিত্যানন্দের নিকট স্বীয় সিদ্ধান্তের কথা ব্যক্ত করিলে নিত্যানন্দ জানাইলেন যে ইচ্ছাময় প্রভু যদৃচ্ছ কর্ম করিবেন, কে তাঁহাকে বাধা দিতে পারে![৭১] এই বলিয়া 'সন্ন্যাস রহস্য যত গৌরাঙ্গে প্রকাশি'[৭২] তিনি তাঁহাকে যথোপযুক্ত উপদেশ প্রদান করিলে গৌরাঙ্গপ্রভু নিত্যানন্দ ও অন্য দুই একজন অন্তরঙ্গ ভক্তসহ[৭৩] ইন্দ্রাণী সন্নিকটস্থ কাটোয়া গ্রামে গিয়া কেশব-ভারতীর নিকট[৭৪] মন্ত্র গ্রহণ করিলেন।

দীক্ষা-গ্রহণান্তে ভাবাবিষ্ট চৈতন্যের রাঢ়দেশ-পরিভ্রমণকালে নিত্যানন্দ তাঁহার সর্বক্ষণের সঙ্গী হইয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল তিনি চৈতন্যকে ভুলাইয়া লইয়া গিয়া অদ্বৈত-গৃহে উঠিবেন। শান্তিপুর ও নবদ্বীপে সেই সংবাদ দিবার জন্য চন্দ্রশেখর-আচার্যরত্ন নবদ্বীপে প্রেরিত হইয়াছিলেন।[৭৫] তারপর তিনদিন যাবৎ

(৭১) ঐ—২।২৫, পৃ. ২৩৭ (৭২) চৈ. ম. (জ.)—বৈ. খ., পৃ. ৮২ (৭৩) দ্র.—দ্বারপাল-গোবিন্দ (৭৪) চৈ. ভা.—২।২৬, পৃ. ২৪০ (৭৫) চৈ. না.—৪।৫০ ; চৈ. চ,—২।৩. পৃ. ৯৫ ; শ্রীচৈ. চ.—৩।৩-৪ ; চৈ. ম. (লো.)—ম. খ., পৃ. ১৬১ ; গৌ. ত.—পৃ. ১৪৪ ; মুরারি-গুপ্ত (শ্রীচৈ. চ.—৩।৪।৪) বলেন যে রাঢ়দেশ পরিভ্রমণাদির পর চৈতন্য শচীদেবীর নিকট সংবাদ প্রেরণের জন্য নিত্যানন্দকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনদাসও (চৈ. ভা.—৩।১, পৃ. ২৪৯) চৈতন্য-কর্তৃক নিত্যানন্দকে নবদ্বীপ-প্রেরণের কথা লিখিয়াছেন। তিনি জানাইতেছেন যে তদনুসারে নিত্যানন্দ নবদ্বীপে গিয়া শচীদেবী প্রভৃতিকে সান্ত্বনা দান করেন এবং তাঁহাদিগকে শান্তিপুরে লইয়া যান। চৈতন্যচরিতামৃত (২।৩, পৃ. ৯৫-৯৮) হইতে জানা যায় যে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর সহিত অদ্বৈত-গৃহে যাত্রা করেন, আচার্যরত্নই শচীদেবীকে দোলায় চড়াইয়া শান্তিপুরে লইয়া আসেন। নরহরি-চক্রবর্তী (ভ. র.—১২।৩৫৭০) জানাইয়াছেন যে মহাপ্রভু কুলিয়া গ্রামের সন্নিকটে আসিয়া নিত্যানন্দকে নবদ্বীপে পাঠান। লোচনদাসও (চৈ. ম.—ম. খ., পৃ. ১৬৩) বলেন যে নিত্যানন্দ নদীয়ায় প্রেরিত হন। বাসুদেব-ঘোষ (গৌ. ত.—পৃ. ২৪৫-৬৩) বলেন যে নিত্যানন্দ চৈতন্যকে শান্তিপুরে রাখিয়া নবদ্বীপে যান। অদ্বৈতপ্রকাশ-কার (১৫শ. অ., পৃ. ৬২) বলেন

রাঢ়-পরিভ্রমণের[৭৬] পর নিত্যানন্দের চাতুর্যপূর্ণ ইঙ্গিতে পথিমধ্যে ক্রীড়ারত কয়েকটি গোপ-বালক চৈতন্যমহাপ্রভুকে গঙ্গাতীর-পথে বৃন্দাবনের নিশানা মিলিবে বলিয়া জানাইলে তিনি মহাপ্রভুকে লইয়া শান্তিপুর অভিমুখে আনয়ন করিলেন।[৭৭] এদিকে অদ্বৈতপ্রভু গিয়া নৌকাযোগে চৈতন্যকে স্বগৃহে লইয়া আসেন। কয়েকটি দিন পরে মহাপ্রভু নীলাচলপথে যাত্রা আরম্ভ করিলে নিত্যানন্দও তাঁহার একজন সঙ্গী হইলেন ।[৭৮]

নিত্যানন্দ পূর্বে বহুতীর্থ পর্যটন করিয়াছিলেন। অনেক কথাই তাঁহার জানা ছিল। সাক্ষীগোপালে পৌছাইয়া তিনি সেই স্থানের গোপালবিগ্রহ সংক্রান্ত ইতিহাস বর্ণনা করিয়া মহাপ্রভু ও ভক্তগণকে আনন্দ দান করিলেন।[৭৯] ক্রমে যাত্রিবৃন্দ কমলপুরে আসিয়া ভার্গী নদীতে স্নান করিলেন। নিত্যানন্দ-হস্তে মহাপ্রভুর যে দণ্ডখানি ছিল সম্ভবত এইস্থানে তিনি তাহা ভাঙিয়া জলে নিক্ষেপ করেন।[৮০] সবে যে দণ্ডধনখানি অবশিষ্ট ছিল, তাহাও এইরূপ অনভিপ্রেতভাবে পরিত্যক্ত হওয়ায় মহা'প্রভু মনে কিছু দুঃখ প্রকাশিলা' এবং তিনি নিত্যানন্দের প্রতি 'ঈষৎ ক্রোধ করি কিছু কহিতে লাগিলা।' কিন্তু তিনি সর্ববন্ধন মুক্ত হইলেন। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ, অভিপ্রেত বা অনভিপ্রেত, যে-

যে নিত্যানন্দ চৈতন্যসহ শান্তিপুরে যান। জয়ানন্দ (বৈ. খ., পৃ. ৯০) বলেন যে চৈতন্যের সন্ন্যাস-গ্রহণের পরে মুকুন্দ নবদ্বীপে সেই সংবাদ লইয়া যান এবং মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে নীলাচলে প্রেরণ করিলে নিত্যানন্দ চলিয়া যান। এই বর্ণনা বিশ্বাসযোগ্য নহে। এই প্রসঙ্গে দ্বারপাল-গোবিন্দের জীবনী দ্রষ্টব্য।

(৭৬) চৈ. চ.—২।১, পৃ. ৮৪ ; শ্রীচৈ. চ—৪।২৫।১৬, ৩।৪।৩ ; চৈ. ভা.—৩।১, পৃ. ২৪৭ ; চৈ. না.—৫।১৪, ৪।৩৯ (৭৭) কবিকর্ণপূর (চৈ. না.—৫।৫-৯) বলিতেছেন যে গোপবালকদিগের হরিধ্বনি শ্রবণে আকৃষ্ট মহাপ্রভু তাহাদিগের নিকট গিয়া বৃন্দাবনের পথ জিজ্ঞাসা করিলে নিত্যানন্দ একজনকে ডাকিয়া গঙ্গাতীর-পথ দেখাইয়া দিতে বলেন। মুরারি-গুপ্ত (শ্রীচৈ. চ. ৩।৩।৮,৯) বলেন যে নিত্যানন্দের নির্দেশানুসারেই বালকগণ হরিধ্বনি করিতে থাকে। কবিরাজ-গোস্বামী (চৈ. চ.—২।৩, পৃ. ৯৫) লিখিয়াছেন যে নিত্যানন্দ বালকদিগকে শিখাইয়া রাখিয়াছিলেন ; মহাপ্রভু গিয়া তাহাদিগকে বৃন্দাবনের পথ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা গঙ্গাতীর পথ দেখাইয়া দেয়। (৭৮) দ্বারপাল-গোবিন্দের জীবনীতে এই সঙ্গীদিগের সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইবে। (৭৯) চৈ. চ.—২।৫, পৃ. ১০৬ (৮০) চৈ. চ.—২।৫, পৃ. ১০৯ ; চৈ. না.—৬।২৫ ; তু.—গৌ. ত.—পৃ. ২৪৮ ; চৈ. স.—পৃ. ৩৯ ; মুরারি-গুপ্ত (শ্রীচৈ. চ.—৩।৫।১০) বলেন যে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর দণ্ড বহন করিয়া চলিতেন এবং 'তমোলিপ্তে' পৌছাইবার পূর্বেই হস্তস্খলিত দণ্ডের উপর পদাঘাত লাগায় তাহা ভাঙিয়া যায়। বৃন্দাবনদাস (চৈ. ভা.—৩।২, পৃ. ২৫৯-৬০) বলেন যে দণ্ডখানি জগদানন্দই বহন করিতেন। জলেশ্বরে পৌছাইবার পূর্বে ভিক্ষা করিতে যাইবারকালে তিনি তাহা নিত্যানন্দকে দিয়া গেলে নিত্যানন্দ তাহা ইচ্ছাপূর্বক ভাঙিয়া ফেলিয়া মহাপ্রভুকে মায়ামুক্ত করেন। লোচনদাস (চৈ. ম.—ম. খ., পৃ. ১৭০) বলেন যে নিত্যানন্দের নিকট দণ্ড থাকিত। 'তমোলোকে' পৌছাইবার পূর্বে তিনিই সুদর্শন চৈতন্যের দণ্ডধর বৈরাগ্যময় মূর্তি সহ্য করিতে না পারিয়া স্বীয় উরুর উপর চাপ দিয়া দণ্ডখানি ভাঙিয়া ফেলেন।

ভাবেই হউক না কেন, নিত্যানন্দ কর্তৃক তাঁহার সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণের সকল অনুষ্ঠানই সম্পন্ন হইল। ভ্রাতৃহারা গৃহী-বিশ্বম্ভরের জীবনে নিত্যানন্দের যে প্রয়োজন ঐকান্তিক ছিল, মহাপ্রভু-চৈতন্যের সন্ন্যাসজীবনে তাহার আর সেই প্রয়োজন থাকিল না। এখন হইতে তিনি স্বতন্ত্র।

সেই বৎসর বৈশাখ মাসেই মহাপ্রভু দক্ষিণ-ভ্রমণের সিদ্ধান্ত করেন। ভক্তগণ সঙ্গী হইতে চাহিলে তিনি তাঁহাদিগকে নিবৃত্ত করেন। কেবল নিত্যানন্দের বিশেষ চেষ্টায় তিনি কৃষ্ণদাস নামক এক ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়াছিলেন। 'চৈতন্যচরিতামৃতমহাকাব্যে'[৮১] ইঁহাকে ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে। এই কৃষ্ণদাস-ব্রাহ্মণ সম্পর্কে কবিরাজ-গোস্বামী লিখিয়াছেন[৮২]:

কৃষ্ণদাস নাম শুদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণ।
যারে সঙ্গে লৈয়া কৈল দক্ষিণ গমন ॥

এবং ভ্রমণান্তে মহাপ্রভুর নীলাচল প্রত্যাবর্তনের পর[৮৩]

তবে গৌড়দেশে আইলা কালা কৃষ্ণদাস।
নবদ্বীপে গেলা তিঁহো শচী আই পাশ ॥

একই গ্রন্থোক্ত দুইটি উল্লেখ হইতে বুঝা যাইতেছে যে মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণসঙ্গীই কালা-কৃষ্ণদাস। আবার নিত্যানন্দস্কন্ধ-শাখাবর্ণন পরিচ্ছেদে উক্ত গ্রন্থকার লিখিয়াছেন[৮৪]:

কালা কৃষ্ণদাস বড় বৈষ্ণব প্রধান।
নিত্যানন্দচন্দ্র বিনা নাহি জানে আন ॥

এবং নিত্যানন্দ-শিষ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বৃন্দাবনদাসও বলিতেছেন[৮৫]:

প্রসিদ্ধ কালিয়া কৃষ্ণদাস ত্রিভুবনে।
গৌরচন্দ্র লভ্য হয় যাঁহার স্মরণে ॥

কবিরাজ-গোস্বামী এবং বৃন্দাবনদাসের নিত্যানন্দ-ভক্তবর্ণনার ক্রম যথাক্রমে এইরূপ:

রাঢ়দেশী দ্বিজবর-কৃষ্ণদাস, কালা-কৃষ্ণদাস, সদাশিব-কবিরাজ, সদাশিবপুত্র-পুরুষোত্তম, পুরুষোত্তমের পুত্র কানুঠাকুর, উদ্ধারণ-দত্ত ইত্যাদি;

এবং

রাঢ়দেশীয় বিপ্র-কৃষ্ণদাস, কালিয়া-কৃষ্ণদাস, সদাশিব-কবিরাজ, সদাশিবপুত্র-পুরুষোত্তম, উদ্ধারণ-দত্ত ইত্যাদি। সুতরাং শেষোক্ত দুইটি উল্লেখের কালা-কৃষ্ণদাস ও কালিয়া-কৃষ্ণদাস যে একই ব্যক্তি সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। এক্ষণে 'চৈতন্যচরিতামৃতো'ক্ত দুইজন কালা-কৃষ্ণদাস এক ব্যক্তি হইলে নিশ্চয়ই বলা যায় যে মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ-সঙ্গী কুলীন-ব্রাহ্মণ কৃষ্ণদাস ও নিত্যানন্দ-শিষ্য কালিয়া-কৃষ্ণদাস একই ব্যক্তি।

(৮১) ১৩|২৩-২৬ (৮২) চৈ. চ.—১|১০, পৃ. ৫৪ (৮৩) ঐ—২|১০, পৃ. ১৪৭ (৮৪) ঐ—১|১১, পৃ. ৫৬ (৮৫) চৈ. ভা—৩|৬, পৃ. ৩১৬

পক্ষে, আমরা দেখিতে পাই যে বিশেষ করিয়া নিত্যানন্দপ্রভুই কৃষ্ণদাস-ব্রাহ্মণকে মহাপ্রভুর সঙ্গে দক্ষিণে পাঠাইবার সম্মতি গ্রহণ করেন। আবার মহাপ্রভু এই কুলীন-কৃষ্ণদাসকে চিরতরে বিদায় দিতে চাহিলে তিনি নিত্যানন্দের কৃপাপাত্র হইয়াই গৌড়ে প্রেরিত হন এবং মহাপ্রভুর নিকট ফিরিয়া যাইবার পথ তাঁহার নিকট রুদ্ধ হইয়া যায়। সুতরাং নিত্যানন্দ গৌড়ে আসিয়া স্থায়িভাবে তথায় বাস করিতে থাকিলে অসহায় কৃষ্ণদাস যে তাঁহার আনুগত্য লাভ করিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইবেন এবং তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবেন, তাহাই স্বাভাবিক। কালিয়া-কৃষ্ণদাসকে বৃন্দাবনদাস নিত্যানন্দ-শিষ্য বলিলেও তিনি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার সম্বন্ধে জানাইতেছেন যে 'গৌরচন্দ্র লভ্য হয় যাঁহার স্মরণে।' অর্থাৎ তিনি নিত্যানন্দ-ভক্ত হইলেও কোননা কোন সময়ে বিশেষভাবে চৈতন্যচরণানুরাগী বা চৈতন্যের প্রিয়ভক্ত ছিলেন। এক্ষেত্রে মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণসঙ্গী কুলীন-ব্রাহ্মণ কৃষ্ণদাসই যে নিত্যানন্দভক্ত কালা- বা কালিয়া-কৃষ্ণদাস সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। দেবকীনন্দন যে 'কালা কৃষ্ণদাসে'র বর্ণনা দিয়াছেন, তিনিও 'উপবীত'ধারী ব্রাহ্মণ[৮৬]।

কবিরাজ-গোস্বামী কিংবা কবিকর্ণপূর অবশ্য নীলাচলবাসী একজন স্বর্ণবেত্রধারী জগন্নাথসেবক কৃষ্ণদাসের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সহিত এই কালা কৃষ্ণদাসের কোনও সম্বন্ধ নাই। কারণ, উভয়ের গ্রন্থেই তাঁহাকে মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের পরবর্তীকালের নবপরিচিত ভক্তবৃন্দের সহিত বর্ণনা করা হইয়াছে[৮৭]।

যাহা হউক, শুদ্ধ কুলীন-ব্রাহ্মণ কৃষ্ণদাস মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের সঙ্গী হইয়াছিলেন। নিত্যানন্দের একান্ত ইচ্ছানুযায়ী মহাপ্রভু তাঁহাকে সঙ্গে লইতে রাজী হইলে কৃষ্ণদাসও জলপাত্র, বস্ত্র বহন করিয়া পশ্চাতে চলিলেন। কবিকর্ণপূর জানাইতেছেন[৮৮] যে মহাপ্রভু চলিয়া গেলে নিত্যানন্দও গৌড়াভিমুখে ধাবিত হইয়াছিলেন, যাইবার সময় তিনি মুকুন্দাদিকে কেবল বলিয়া গেলেন যে মহাপ্রভুর প্রত্যাবর্তন সময় অনুমান করিয়া তিনি যথাকালে হাজির হইবেন। 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক' এবং 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়কৌমুদী'তে বলা হইয়াছে যে মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য হইতে নীলাচলে ফিরিয়া নিত্যানন্দের অনুপস্থিতি সম্বন্ধে মুকুন্দকে প্রশ্ন করিলে মুকুন্দ এই সংবাদ প্রদান করেন। নিত্যানন্দের গৌড়-গমন সংবাদটি জানাইবার জন্য সম্ভবত উক্তরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে এবং 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে'র মধ্যে গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দের নীলাচল-গমন সময়ে নিত্যানন্দকেও তাঁহাদিগের সঙ্গী-রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। কৃষ্ণদাস-কবিরাজের বর্ণনায় দেখা যায় যে মহাপ্রভুর

---

(৮৬) বৈ. ব. (দে.)—পৃ. ৪ (৮৭) চৈ. না.—৮।৬ ; চৈ. চ.—২।১০, পৃ. ১৪৬ ; ক. শা.-তে (পৃ. ১) কবিরাজ-শিষ্য মুকুন্দের শাখায় একজন 'কানিয়া কৃষ্ণদাস'কে পাওয়া যায়, তিনি আলোচ্য কালিয়া-কৃষ্ণদাস হইতেই পারেন না। (৮৮) চৈ. না.—৮।২৯ ;চৈ. কৌ.—পৃ. ২৪১

প্রত্যাবর্তনকালে নিত্যানন্দ নীলাচলে উপস্থিত রহিয়াছেন। কিন্তু দুইটি গ্রন্থেই উল্লেখিত হইয়াছে যে গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দ নীলাচলে উপনীত হইলে মহাপ্রভু স্বরূপদামোদর এবং গোবিন্দ, এই দুইজনকে দিয়া দুইবার মাল্যপ্রেরণ করিয়াছিলেন। একমাত্র অদ্বৈতের জন্যই দুই বার মাল্যপ্রেরণের প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না। কিংবা এমনও হইতে পারে যে সেই সময় নাগাদ্ নিত্যানন্দ গৌড় হইতে নীলাচলে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি যে মহাপ্রভুর দক্ষিণাভিমুখে গমনের পর গৌড়ে চলিয়া যান, এ সংবাদ সত্য না হইলে, পরে এ প্রসঙ্গ উত্থাপনেরই কোন কারণ থাকিত না। মুকুন্দাদি অন্যান্য ভক্ত সম্বন্ধে কিন্তু এইরূপ কোনও কথা উঠে নাই।

এদিকে বহুস্থান পরিভ্রমণের পর ভট্টমারিতে পৌঁছাইয়া কৃষ্ণদাস বিভ্রান্ত হন। ভট্টমারিগণ 'স্ত্রীধন দেখাইয়া তাঁর লোভ জন্মাইল' এবং 'আর্য সরল বিপ্রের বুদ্ধি নাশ হৈল'। শেষে মহাপ্রভু তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া বহুস্থান পরিভ্রমণের পর নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু তিনি কৃষ্ণদাসের প্রলুব্ধ হওয়ার কথা বিস্মৃত হন নাই। একদিন তিনি সার্বভৌম-ভট্টাচার্যের সম্মুখে কৃষ্ণদাসকে ডাকাইয়া আনিয়া জানাইলেন যে এখন হইতে কৃষ্ণদাসের সহিত আর তাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই, কৃষ্ণদাস যেন যথা ইচ্ছা চলিয়া যান এবং চৈতন্যমহাপ্রভু 'তং ক্ষেত্রমানীতমতিপ্রযত্নাদ্দাসঃচ্ছতি সমাশ্বিসসর্জ তত্র'[৮৯]। কৃষ্ণদাস কাঁদিতে থাকিলে তিনি মধ্যাহ্ন করিবার জন্য চলিয়া গেলেন। নিত্যানন্দাদি ভক্তবৃন্দ স্থির করিলেন যে শচীমাতা ও অদ্বৈতাদি ভক্তের নিকট মহাপ্রভুর আগমন-বার্তা নিবেদন করিবার জন্য কৃষ্ণদাসকে গৌড়ে প্রেরণ করিবেন। তদনুযায়ী মহাপ্রভুর নিকট গৌড়ে বার্তাবহ প্রেরণের প্রস্তাব করা হইলে তিনি সম্মতি প্রদান করিলেন। কৃষ্ণদাস গৌড়ে চলিয়া গেলেন।

মহাপ্রভু-চৈতন্য তাঁহার ব্যবহারিক জীবনে দুইটি জিনিসকে সর্বথা পরিহার করিয়া চলিতেন—বিষয় এবং স্ত্রী-সঙ্গ। তাই দেখি ভক্তোত্তম নৃপতি প্রতাপরুদ্রকে মাত্র দর্শনদান করিবার জন্য সার্বভৌম ও রামানন্দের অনুরোধ পর্যন্ত ব্যর্থ হইয়াছিল। আবার স্ত্রী-সম্ভাষণের অপরাধের জন্য[৯০] আর্ত ও করুণাকাতর ছোট-হরিদাসকে মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করিতে হইয়াছিল; স্বরূপদামোদর, বা এমন কি, স্বয়ং পরমানন্দ-পুরীর কোন অনুনয়ও তাঁহার সিদ্ধান্তকে পরিবর্তিত করিতে পারে নাই। অথচ তাঁহার পরিণত-ভাবজীবনের সঙ্গী ছিলেন ইঁহারাই—এই পরমানন্দ, সার্বভৌম, রামানন্দ ও স্বরূপদামোদর। বিশেষ করিয়া আবার স্ত্রী-সঙ্গ বিষয়ে তিনি ছিলেন বজ্র হইতেও কঠোর। ভবিষ্যৎ মানব-সমাজ যদি কোনদিন চৈতন্য-জীবনের কোনও বিষয় সম্বন্ধে অনুযোগ উত্থাপন করিতে পারে, তাহা হইলে তাহা

(৮৯) চৈ. চ. ম.—১৩।৫৪ (৯০) দ্র.—ছোট-হরিদাস

কেবল তাঁহার এতৎ-সম্বন্ধীয় কঠোরতার জন্যই। কৃষ্ণদাসতো দূরের কথা স্বয়ং-রুদ্রদেবকেও তিনি এই বিষয়ে ক্ষমা করিতে পারিতেন না। কিন্তু নিত্যানন্দ কৃষ্ণদাসকে সুকৌশলে বাঁচাইবার ব্যবস্থা করিলেন, মহাপ্রভুকে সম্ভবত তাহা জানিতেও দিলেন না। পূর্বোক্ত ভক্তবৃন্দের দ্বারা যাহা সম্ভব হয় নাই, নিত্যানন্দের দ্বারা সেই অসাধ্য সাধন হইয়াছিল।

কিন্তু নিত্যানন্দকেও আর অধিককাল মহাপ্রভুর সহিত একত্র বাস করিতে হয় নাই। গৌরাঙ্গ-চৈতন্য জীবন-প্রবাহের মূল-প্রস্রবণ ছিল অগ্রজ বিশ্বরূপ। বিশ্বরূপই জীবনের মর্ম্মমূলে বসিয়া তাঁহার সমগ্র জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন। বিশ্বরূপকে খুঁজিয়াই একরকম তাঁহার দক্ষিণ যাত্রা—

বিশ্বরূপ উদ্দেশে আমি অবশ্য যাইব।
একাকী যাইব কাঁহো সঙ্গে না লইব॥
সেতুবন্ধ হৈতে আমি না আসিব যাবৎ।
নীলাচলে চল তুমি সব রহিবে তাবৎ॥ ৯১

ইহার পর কবিরাজ-গোস্বামী ভক্তের দৃষ্টিতে ঘটনার বিবরণ দিয়া বলিতেছেন যে তিনি বিশ্বরূপের সিদ্ধি-প্রাপ্তির সকল কথা জানিয়াও সেই ছলে দক্ষিণদেশ উদ্ধার করিবার জন্য গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ঘটনাকে অস্বীকার করিতে না পারিয়া পুনরায় মহাপ্রভুর উক্তির উল্লেখ করিয়াছেন[৯২]:

সন্ন্যাস করি বিশ্বরূপ গিয়াছে দক্ষিণে।
অবশ্য করিব আমি তাঁর অন্বেষণে॥

অন্য কোন লেখকও ঠিক একই কথা বলিয়াছেন।[৯৩] রামানন্দের একটি পদেও এক কথা।[৯৪] মহাপ্রভু নীলাচলে বলিতেছেন:

বিশ্বরূপ মোর ভাই তাহার উদ্দেশ নাই
সেই গেল বৈরাগ্য করিয়া।

প্রকৃত পক্ষে, দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণপথে পাণ্ডুপুরে বিঠ্ঠল-ঠাকুর দেখিবার পর মাধবেন্দ্র-শিষ্য শ্রীরঙ্গপুরীর নিকটই সম্ভবত তিনি সর্বপ্রথম বিশ্বরূপের (শঙ্করারণ্যের) সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন:

এই তীর্থে শঙ্করারণ্যের সিদ্ধি প্রাপ্তি হৈল।

ইহার পর হইতেই সম্ভবত বিশ্বরূপের জন্য অভাববোধটি চৈতন্যের অন্তঃকরণ হইতে ঘুচিয়া যায়। নিত্যানন্দ-সম্পর্কের মধ্যে তাঁহার জীবনের দুইটি সার্থকতা ছিল—বিশ্বরূপের

(৯১) চৈ. চ.—২।৭ পৃ., ১১৯ (৯২) ঐ—২।৭, পৃ. ১২০ (৯৩) গৌরাঙ্গ-সন্ন্যাসের কবি বাসুদেব-ঘোষ লিখিয়াছেন (পৃ. ২৫): তখনে গৌরাঙ্গ শচীমাতাকে কহিতেছেন—বিশ্ব ছিল জ্যেষ্ঠ ভাই। আমি তার তালাইসে যাই। (৯৪) গৌ. ত.—পৃ. ২৬৫

স্থানপূরণ এবং সন্ন্যাস-জীবনের জন্য প্রবর্তনা গ্রহণ। এই দুইটির প্রয়োজন হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হওয়ায় নিত্যানন্দের সঙ্গলাভেচ্ছার প্রয়োজনও আর রহিল না।

মহাপ্রভুর নীলাচল-প্রত্যাবর্তনের পর গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দ আসিয়া পৌঁছাইলে কিছুদিন যাবৎ বেশ একটি আনন্দময় পরিবেশ গড়িয়া উঠে। এই সময়ে নিত্যানন্দের কৌশলপূর্ণ প্রচেষ্টায়[৯৫] রাজা প্রতাপরুদ্রের প্রতি মহাপ্রভু কিছুটা প্রসন্ন হন এবং তাঁহারই প্রস্তাবানুযায়ী মহাপ্রভু রাজার জন্য স্বীয় বহির্বাস একটি প্রেরণ করিতে সম্মত হন। ইহার পর গুণ্ডিচামার্জন ও রথযাত্রা আসিলে নিত্যানন্দ মহাপ্রভু-প্রবর্তিত বেড়াকীর্তনের একটি সম্প্রদায়ে প্রধান নর্তকরূপে নৃত্য করিলেন; বিশেষ দশজন ভক্তসহ মহাপ্রভুর উদ্দণ্ড নৃত্যকালে ভাবাবিষ্ট চৈতন্যকে তিনি সামলাইয়া চলিলেন, ভক্তবৃন্দের জলকেলি- ও ভোজন-কালে বিশেষ চাতুর্য ও রঙ্গরসের পরিচয় প্রদান করিলেন এবং চাতুর্মাস্যান্তে নন্দোৎসবকালে লগুড়চালনা প্রদর্শন করিয়া দর্শকবৃন্দকে আনন্দ দান করিলেন।[৯৬]

কিন্তু এইবার সত্যসত্যই মহাপ্রভুর সহিত নিত্যানন্দের একত্রবাসের দিন ফুরাইয়া আসিল। ভক্তসমাজ প্রথমে তাহার বিন্দুমাত্র জানিতে পারে নাই। মহাপ্রভুর সহিত নিত্যানন্দের প্রথম দর্শনের কাল হইতেই ভক্তবৃন্দ তাঁহার প্রতি মহাপ্রভুর যে বিপুল সম্মান ও শ্রদ্ধাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, আজ নীলাচলের বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠানাদির মধ্যে তাহার ব্যতিক্রম কল্পনা করা তাঁহাদের পক্ষে অশ্রদ্ধেয় ছিল। সেইরূপ কিছু দেখাও যায় নাই। কেবল দেখা গেল যে একদিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে নিভৃতে লইয়া গিয়া কী যেন বলিতে লাগিলেন।[৯৬] বিস্মিত হইবার ছিল না—'দুইভাই' মিলিয়া যে উচ্চভূমিক পরামর্শ করিতেছেন, তাহার মধ্যে অনধিকার প্রবেশের বাসনা নিরর্থক। অব্যবহিত পরেই ভক্তবৃন্দের গৌড় গমনকালে মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে ভক্তি-প্রচারার্থ গৌড়দেশে চলিয়া যাইতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন।[৯৭]

বিদায় দেওয়ার পূর্বে মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে নিভৃতে লইয়া গিয়া কী যেন বলিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা যে কি, তাহা চিররহস্যাবৃত থাকিয়া গিয়াছে। চৈতন্যমহাপ্রভুর শ্রেষ্ঠ জীবনীকার কবিরাজ-গোস্বামী জানাইতেছেন যে সেই কথা কেহই জানিতে পারেন নাই, তবে 'ফলে অনুমান পাছে কৈল ভক্তগণে' এবং মহাপ্রভু যাহা প্রকাশ্যে বলিয়াছিলেন তাহা এই: "অনর্গল প্রেমভক্তি করিহ প্রকাশে।" চৈতন্য-আবির্ভাবের বহুপূর্বেও যিনি গৌড়মণ্ডলে থাকিয়া সমস্ত বিরুদ্ধাবস্থার মধ্যেই সার্থকভাবে ভক্তিধর্ম প্রচার করিয়া আসিতেছিলেন

(৯৫) চৈ. চ.—২।১২, পৃ. ১৫৮ (৯৬) ঐ—২।১৫, পৃ. ১৭৮, ৮৯ (৯৭) ঐ; জানকীনাথ পাল বলেন (নিত্যানন্দচরিত—৩য়. খণ্ড, পৃ. ২৮), "প্রভু নিত্যানন্দ প্রথমবার গৌড়দেশে হরিনাম প্রচার করার জন্য প্রেরিত হন, এবং দ্বিতীয়বার সংসার গ্রহণ করার জন্য, অনুরুদ্ধ হইয়া প্রেরিত হন।"

সেই অদ্বৈতপ্রভু স্বয়ং, এবং অন্যান্য প্রাচীন ও যোগ্য ভক্তবৃন্দ গৌড়ে থাকা সত্ত্বেও আজ চৈতন্যপ্রেমপ্লাবিত ভূমিতে সর্বক্ষণের সঙ্গী নিত্যানন্দকেই একমাত্র ঐ কার্যের জন্য গৌড়ে প্রেরণ অপরিহার্য হইল কেন, তাহা দুর্বোধ্য। কিন্তু কবিরাজ-গোস্বামী যাহা বলিতেছেন, তাহা একমাত্র তাঁহার দ্বারাই সম্ভব। তিনি তাঁহার স্বীয় অনুমানকে সত্য কথা হিসাবে চালাইয়া ভবিষ্যৎ যুগের পাঠককে চির-মোহান্ধ করিতে চাহেন নাই। উপস্থিত ভক্তবৃন্দ কী অনুমান করিয়াছিলেন তাহাও তিনি অনুমান করেন নাই। অথচ উক্ত ঘটনার বহুকাল পরেও অন্যান্য জীবনীকার- বা পদকার-গণ কেবল 'ফলে অনুমান' করিয়া কপোলকল্পিত নানা তত্ত্বকে তথ্যাশ্রয়ী করিয়া চিরস্থায়ী করিতে চাহিয়াছেন। একজন পদকর্তা এমনও অনুমান করিয়াছেন যে মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে দুইটি বিবাহ করিয়া গৃহবাস করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন।[৯৮] একজন গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে মহাপ্রভু অদ্বৈত-পুত্রের ন্যায় নিত্যানন্দের ঔরসজাত এক পুত্রের কল্পনা করিয়া তাঁহারই উপরে একান্তভাবে নির্ভর করিয়া বলিতেছেন যে উভয়ের পুত্রগণ 'করিবে ধর্মের স্থিতি সংসারে নিশ্চয়।'[৯৯] এদিকে আবার স্বয়ং মুরারি-গুপ্তও জানাইতেছেন যে মহাপ্রভু বলিলেন, "তোমার দেহকে আমার দেহ জানিয়া তুমি সমস্ত কর্মই করিও"—"যথেচ্ছং ত্বং কর্তুমর্হসি।" আবার জয়ানন্দ মহাপ্রভুর উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন[১০০]:

নিত্যানন্দ গোসাঞি তোমার গৌড়দেশ।
আজি হৈতে ছাড়াবোঞি অবধূত বেশ॥

এবং

গোসাঞির মন বুঝি প্রতাপরুদ্র রাজা।
নানাধন দিয়া নিত্যানন্দে করে পূজা॥

ঋষিদিগেরও আদর্শস্থানীয় যে-জিতেন্দ্রিয় মহামানবকে মনুষ্যসমাজ 'ভগবান'-আখ্যা দিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই, সেই ভগবান-শ্রীচৈতন্যদেবও তাঁহার ব্যবহারিক জীবনে কামিনী-কাঞ্চনকে বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং তাঁহার কয়েকজন শ্রেষ্ঠ অন্তরঙ্গ ভক্তকেও একই পরামর্শ দিয়াছেন। অথচ, তিনি নিত্যানন্দকে যে কেন এই দুইটি বিষয়ই সেবনের উপদেশ দিবেন, তাহা ভাবনীয় নহে, সম্ভবত তত্ত্বজগতের সকল সম্ভাব্যতার কথা স্মরণে রাখিয়াও নহে। যে-মর্যাদাবোধ মহাপ্রভুর জীবনের মেরুদণ্ডস্বরূপ ছিল এবং যে লোক-মর্যাদার জন্য তিনি অন্তর্জগতের মধ্যে সবশ্রেষ্ঠ আসন দান করা সত্ত্বেও তাঁহার শ্রেষ্ঠ প্রচারক রূপ-সনাতন-হরিদাসকেও ব্যবহারিক জীবনে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছিলেন, নিত্যানন্দের ক্ষেত্রে সেই মর্যাদা-লঙ্ঘনের উপদেশ বাস্তবিকই বিস্ময়ের বিষয়। যদি ভগবান অপেক্ষা বৃহত্তর কিছু থাকিয়া থাকেন, তাহা হইলে হয়ত তাঁহার সম্পর্কে এইরূপ আচরণ

(৯৮) গৌ. ত.—পৃ ২৬৫ (৯৯) ভ. নি.—২য়. ক., পৃ. ৫৭ (১০০) বি. খ., পৃ. ১৩৯

বিস্ময়ের বস্তু না হইতে পারে। কিন্তু মহাপ্রভু যে নিত্যানন্দকে নিভৃতে লইয়া এরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন, 'চৈতন্যভাগবত'-কার বৃন্দাবনদাস প্রায় তাহাই বলিতে চাহিয়াছেন। ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়াছি যে তিনি স্বয়ং নিত্যানন্দ-মুখনিঃসৃত বাণী শ্রবণ করিয়া 'চৈতন্যভাগবত' রচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্বন্ধে তাঁহার বিবরণ গুরুত্বপূর্ণ। বৃন্দাবনদাস মহাপ্রভুর উক্তি এইরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন :[১০১]

তুমিও থাকিলা যদি মুনিধর্ম করি।
আপন উদ্দামভাব সব পরিহরি॥
তবে মূর্খ নীচ যত পতিত সংসার।
বোল দেখি আর কেবা করিব উদ্ধার॥······
তবে অবিলম্বে তুমি গৌড়দেশে যাও॥
মূর্খ নীচ পতিত দুঃখিত যে জন।
ভক্তি দিয়া কর গিয়া সবার মোচন॥

এবং

আজ্ঞা পাই নিত্যানন্দচন্দ্র সেইক্ষণে।
চলিলেন গৌড়দেশে লই নিজ গণে॥

আর একজন গোত্রকুলহীন বৃন্দাবনদাসও বলেন যে তারপর চারিভাবের অধিকারী 'রাজাধিরাজন' শ্রীপাদ

সন্তান করিল আসি স্থাপিতে ভজন।[১০২]

কিন্তু পূর্বোক্ত উক্তিগুলির মধ্যে কিছুমাত্র সত্য থাকিলে ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, যে-কারণেই হউক, মহাপ্রভু বুঝিয়াছিলেন নিতাইচন্দ্রের সংসারধর্ম গ্রহণ করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। নিত্যানন্দ কার্যকুশলী মানুষ ছিলেন। মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের পর তাঁহাকে গঙ্গাতীরে আনয়ন, প্রতাপরুদ্রের জন্য মহাপ্রভুর নিকট অনুরোধ জ্ঞাপন এবং কালিয়া-কৃষ্ণদাসকে গৌড়ে প্রেরণ প্রভৃতি বহুবিধ কার্যের মধ্য দিয়া তাঁহার চাতুর্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এই চাতুর্যই তাঁহার ধর্মপ্রচারের পক্ষে সহায়ক ছিল এবং তাহার ফলে পরবর্তীকালে সম্ভবত তাঁহার সংগঠনশক্তির পরিচয় সুবিদিত হইয়াছিল। গৃহী-জীবনকে কেন্দ্র করিয়া সেই সংগঠনশক্তির স্থিতি ও স্ফুরণ, ধর্মপ্রচারের একটি বিশেষ অস্ত্ররূপে সুপ্রযুক্ত হইলে যে কত বড় সমস্যার সমাধান হইতে পারে, তীক্ষ্ণধী ও দূরদর্শী চৈতন্য হয়ত তাহাই বুঝিয়া নিত্যানন্দ-শক্তির সার্থক প্রয়োগ ঘটাইতে চাহিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, ইহার মধ্যে যদি কিছু বিস্ময়ের বিষয় থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা কুশাগ্রবুদ্ধি মহাপ্রভুরই দূরদর্শিতা।

(১০১) চৈ. ভা.—৩।৫, পৃ. ৩০৩ (১০২) অ. নি.—৩য়. ক., পৃ. ১০১

নিত্যানন্দকে মহাপ্রভুর নিকট হইতে চলিয়া যাইতে হইল। রামদাস, সুন্দরানন্দ[১০৩] প্রভৃতি 'নিত্যানন্দ স্বরূপের সব আপ্তগণ। নিত্যানন্দ সঙ্গে সভে করিলা গমন।' এবং গৌড়ে প্রত্যাবর্তন-পথে সভক্ত-নিত্যানন্দের লীলা আরম্ভ হইয়া গেল ; 'নিত্যানন্দ শ্রীঅনন্তধাম, সভারে দিলেন ভাব পরম উদ্দাম।'[১০৪] ফলে রামদাস, গদাধরদাস ও রঘুনাথ-বৈদ্য যথাক্রমে গোপাল-, রাধিকা- ও রেবতী-ভাবে ভাবিত হইলেন। কৃষ্ণদাস, পরমেশ্বরদাসও 'গোপালভাবে হৈ হৈ করে সর্বক্ষণ।' আবার পুরন্দর-পণ্ডিত গাছে উঠিয়া 'মুঞিরে অঙ্গদ বলি লাফ দিয়া পড়ে।' ক্রমে তাঁহারা পাণিহাটিতে আসিয়া রাঘব-পণ্ডিতের গৃহে উঠিলেন।

একদিন গৌরাঙ্গপ্রভু শ্রীবাস-গৃহে বিষ্ণুখট্টায় বসিলে ভক্তবৃন্দ তাঁহার অভিষেক-ক্রিয়া করিয়াছিলেন। এখন নিত্যানন্দেরও সেই বাসনা জন্মাইল।[১০৫] তিনি

> কথোক্ষণে বসিলেন খট্টার উপরে।
> আজ্ঞা হৈল অভিষেক করিবার তরে॥

এবং তিনি রাঘবকে বলিয়া উঠিলেন :[১০৬]

> রাঘব কুরু শীঘ্রং মে সুবাসিত জলেরপি।
> অভিষেকং চন্দনাদি পুষ্পালঙ্করণাদিনা॥
> স্বর্ণরৌপ্যপ্রবালাদিমণিমুক্তাদিনির্মিতৈঃ।
> ভূষণৈশ্চ ত্বয়া কার্য্যং মদঙ্গপরিমণ্ডনম্॥

ইহার পর তিনি আর একটি চরম তাৎপর্যবোধক কথা বলিলেন—

> যেন মে প্রাণনাথস্য গৌরচন্দ্রস্য সর্বদা।
> সচ্চিদানন্দপূর্ণস্য পূর্ণো মনোরথো ভবেৎ॥

বৃন্দাবনদাস বলিতেছেন যে[১০৭] ইতিপূর্বে মহাপ্রভু যখন রাঘব-ভবনে আসিয়াছিলেন, তখন তিনি রাঘব-পণ্ডিতকে নিভৃতে লইয়া 'রহস্যময় 'গোপ্য' কথা বলিয়াছিলেন :

> আমার সকল কর্ম—নিত্যানন্দ দ্বারে।......
> তোমার ঘরেই সব জানিবা এথাই॥
> মহাযোগেন্দ্রেরো যাহা পাইতে দুর্লভ।
> নিত্যানন্দ হইতে তাহা হইব সুলভ॥......
> অতএব নিত্যানন্দ সেবিহ—যে হেন ভাগ্যবান॥

(১০৩) প্রে. বি.—১ম. বি., পৃ. ১২ ; গৌ. ত. (?)—পৃ. ২৬৪ ; শ্রীচৈ. চ. (?)—৪।২২।১১ (১০৪) চৈ. ভা.—৩।৫, পৃ. ৩০৩ (১০৫) ঐ—৩।৫, পৃ. ২৯৯-৩০০ (১০৬) শ্রীচৈ. চ.—৪।২২।৪-৬ (১০৭) চৈ. ভা.—৩।৫, পৃ. ২৯৯-৩০০

সুতরাং একরকম সেই মহাপ্রভুর ইচ্ছাপূরণ বা আদেশপালনক্রমেই রাঘবাদি ভক্তবৃন্দ গঙ্গাজল সুবাসিত দ্রব্যাদি উপকরণ সংগ্রহ করিয়া যথারীতি মন্ত্রগীত উচ্চারণপূর্বক অভিষেক-ক্রিয়া আরম্ভ করিলেন।

এইস্থলে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। বৃন্দাবনদাস বলিতেছেন যে এই ঘটনার পূর্বেই মহাপ্রভু নীলাচল হইতে গৌড়ে আসিয়াছিলেন এবং পুনরায় নীলাচল-প্রত্যাবর্তনপথে তিনি রাঘব-মন্দিরে উপনীত হইয়া তাঁহাকে উপদেশ প্রদান করেন। কিন্তু সম্ভবত এই কালক্রম ঠিক নহে। 'চৈতন্যচরিতামৃত'-অনুযায়ী নিত্যানন্দকে গৌড়ে প্রেরণের পরেই মহাপ্রভু গৌড়ে আসেন। নিত্যানন্দের কর্মপদ্ধতির সমর্থনহেতু সম্ভবত বৃন্দাবনদাস এইরূপ বর্ণনা দিয়াছেন। যাহাহউক, সর্বাঙ্গ চন্দনলিপ্ত করা হইলে তুলসী-পুষ্পমাল্যাদির দ্বারা ভূষিত হইয়া নিত্যানন্দপ্রভু খট্টায় গিয়া বসিলেন। রাঘবানন্দ মস্তকে ছত্র ধরিলেন এবং চতুর্দিকে আনন্দধ্বনি উত্থিত হইল। বৃন্দাবনদাসের বর্ণনায় দেখা যায় যে এই সময় নিত্যানন্দপ্রভুর কদম্ব-পুষ্পমাল্যে ভূষিত হইবার বাসনা হওয়ায় অসময়ে 'জম্বীরের বৃক্ষে সব কদম্বের ফুল' ফুটিয়া উঠিল। এইভাবে নানাবিধ ঐশ্বর্য প্রদর্শনের পর অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। নিত্যানন্দের অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইলেন। মহাপ্রভু-চৈতন্যের মত তাঁহারও অবতারত্ব সম্বন্ধে সকলেই নিঃসন্দেহ হইলেন।

এখন হইতে রাঘব-মন্দিরে নৃত্য-সংকীর্তন চলিতে লাগিল। নিত্যানন্দপ্রভু নৃত্য করিতে থাকেন এবং সুপ্রসিদ্ধ কীর্তনীয়া মাধব, গোবিন্দ ও বাসুদেব, এই ঘোষ ভ্রাতৃত্রয় গান করেন। রামাই সুন্দরানন্দ গৌরীদাসাদি ভক্ত সর্বদাই তাঁহার নিকট বিচরণ করিতেন। যে-পরিবেশের মধ্যে নিত্যানন্দ নীলাচল হইতে যাত্রা আরম্ভ করেন, তাহাতে গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দ, বিশেষ করিয়া নবাগতের দল তাঁহাকে চৈতন্য-প্রেরিত মঙ্গলদূত বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছিলেন। তাই গৌরচন্দ্রের পুণ্যস্পর্শে বৈষ্ণবভক্তবৃন্দের হৃদয়ে যে ভক্তিতরঙ্গ উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল, তাঁহার অনুপস্থিতিতে আজ অভিমুখী সেই মহাস্রোত নিত্যানন্দকে স্পর্শ করিয়া কল্লোলিত হইয়া উঠিল। পানিহাটিতে নিত্যানন্দের দীর্ঘ তিনমাস[১০৮] যাবৎ অবস্থানকালে পুরাতন ও নব্যভক্তবৃন্দ নিত্যানন্দ-মহিমাবলে যেন এক নবশিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া গৌড়-বিজয়ের জন্য প্রস্তুত হইলেন। এবং অসংখ্য বহুমূল্য অলংকারাদির দ্বারা শোভিত হইয়া প্রভুনিত্যানন্দ ভক্তগণসহ যাত্রা আরম্ভ করিলেন। নিত্যানন্দের এইরূপ অলংকরণের কোনও সংগত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।[১০৯] দয়িতের বা দয়িতার হৃদয়রঞ্জন করিবার জন্য এইরূপ লীলা বা দেহশোভার প্রয়োজন হয় এবং মুরারি-গুপ্তও বলিয়াছেন যে ইহার কারণ 'প্রাণনাথ গৌরচন্দ্রের মনোরথ পূরণ।'[১১০] কিন্তু তাহা হইলে

(১০৮) ঐ—৩।৫, পৃ. ৩০৫-৬; চৈ. ম. (জ.)—উ. খ., পৃ. ১৪৮ (১০৯) শ্রীচৈ. চ.—৪।২২।৬. ৪।২৪।২৯. (১১০) ভ. র.—১২।৩৬৭১-৭৪

মহাপ্রভুর সম্মুখেই এইরূপ অলংকার-সুশোভিত মোহন মূরতি প্রদর্শন সার্থকতাযুক্ত হইতে পারিত। এই ঘটনার পরেও নিত্যানন্দ কয়েকবার নীলাচলে গিয়াছিলেন। অথচ কোনও সময়ে তিনি এই বেশে মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রমাণ নাই। আবার 'ভক্তিরত্নাকর'-মতে নিত্যানন্দের তীর্থভ্রমণকালে গোবর্ধনস্থ এক ভক্তের তাঁহাকে অলংকার পরাইবার বাসনা জন্মাইলে 'প্রভু তাহা জানি কহে—কিছুদিন পরে,' এবং সেই-জন্যই 'ভক্ত ইচ্ছামত এবে পরয়ে ভূষণ।' ভক্তের ইচ্ছায় প্রভুনিত্যানন্দের এইরূপ বিলাস-ব্যসন সমর্থিত হইতে পারে কিনা, তাহা বিচার্য বিষয় না হইতেও পারে। কিন্তু জঙ্গলাকীর্ণ নির্জন বৃন্দাবনভূমিতে প্রত্যহ একৈক বৃক্ষতলে আশ্রয়লাভাকাঙ্ক্ষী মাধুকরী বৃত্তি-গ্রহণকারী করোয়া-কন্থা-সম্বল শ্রেষ্ঠ ভক্ত সনাতন-রূপগোস্বামীর ধর্মপ্রচার প্রচেষ্টার সহিত হয়ত নিত্যানন্দের ধর্মপ্রচার-বিধির তুলনা করা যাইতে পারে। যাহাহউক, ভক্তবৃন্দ-সহ নিত্যানন্দ গদাধরদাসের গৃহে কয়েকদিবস অতিবাহিত করিবার পর খড়দহে গিয়া পুরন্দর-পণ্ডিতের গৃহে নৃত্যকীর্তন আরম্ভ করিলেন। তারপর তিনি সেখান হইতে বাহির হইয়া প্রাচীন বাংলার ধনসমৃদ্ধ কেন্দ্র সপ্তগ্রামে গিয়া উপস্থিত হন। এইস্থানে তিনি বণিক-শ্রেষ্ঠ উদ্ধারণ-দত্তের প্রতি কৃপা-প্রকাশ করিয়া তাঁহার প্রভাবে সপ্তগ্রামের গৃহে গৃহে প্রেম-ভক্তি বিতরণ করিলেন। বণিক উদ্ধারণ-দত্তও চিরদিনের জন্য নিত্যানন্দের বশীভূত হইলেন।

ইহার পর নিত্যানন্দ শান্তিপুরে অদ্বৈতপ্রভুর এবং নবদ্বীপে শচীমাতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার পর তাঁহার অতীত লীলা-নিকেতন শ্রীবাস-গৃহে[১১১] অবস্থান করিয়া নবদ্বীপের গৃহে গৃহে নাম-সংকীর্তন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু এই সময় তিনি 'স্বর্ণরৌপ্য প্রবালাদ্যৈরলঙ্কারৈস্তমণ্ডিতঃ' থাকায়

> চৌরদস্যুগণাঃ সর্বে দৃষ্ট্বা তস্য বিভূষণম্।
> হর্তুং কুর্বন্তি তে নানা যত্নমাততায়িনঃ ॥১১২
> নিত্যানন্দ স্বরূপের অঙ্গে অলঙ্কার।
> সুবর্ণ প্রবাল মণি মুক্তা দিব্যহার ॥
> প্রভুর শ্রীঅঙ্গে দেখি বহুবিধ ধন।
> হরিতে হইল দস্যু ব্রাহ্মণের মন ॥১১৩

কিন্তু 'চৈতন্যভাগবত'-কার-মতে নবদ্বীপের হিরণ্য-পণ্ডিত নামক এক 'সুব্রাহ্মণের গৃহে অব-স্থানকালে নিত্যানন্দপ্রভু তাঁহার অলৌকিক শক্তির দ্বারা দস্যুবৃন্দকে স্বপ্নদর্শনপ্রভাবে ভীতি-যুক্ত করিয়া শেষে তাঁহাদের উদ্ধারসাধন করেন। ইহার পর তিনি ভক্তবৃন্দসহ গঙ্গাতীর-পথে বড়গাছি অভিমুখে ধাবিত হইলেন। এই বড়গাছিতেই নিত্যানন্দের বিবাহানুষ্ঠান

(১১১) ভ. র. ১২।৩৮৪১ (১১২) শ্রীচৈ. চ.—৪।২৩।১৩, ১৬ (১১৩) চৈ. ভা.—৩।৫, পৃ. ৩১১

সম্পন্ন হয়। তজ্জন্য বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন, 'নিত্যানন্দ স্বরূপের বিহারের স্থান। বিশেষ স্বুকৃতি অতি বড়গাছি গ্রাম ॥'

'প্রেমবিলাসে'র চতুর্বিংশবিলাস, 'ভক্তিরত্নাকর' ও 'অদ্বৈতপ্রকাশ' প্রভৃতি গ্রন্থে নিত্যানন্দের বিবাহ-বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। সেই সকল বিবরণ হইতে সত্য নির্ণয় দুরূহ ব্যাপার, প্রায় অসম্ভব বলিলেও চলে। বৃন্দাবনদাসের (নামে প্রচলিত ?) 'নিত্যানন্দবংশমালা বা 'নিত্যানন্দপ্রভুর বংশবিস্তার-'গ্রন্থে দেখা যায় যে নিত্যানন্দ উদ্ধারণ-দত্তকে লইয়া অম্বিকাতে সূর্যদাস-পণ্ডিতের নিকট গিয়া প্রস্তাব করিলেন, "বিবাহ করিব মোরে কন্যা দেহ তুমি।" 'অদ্বৈতপ্রকাশ'-মতে[১১৪] সূর্যদাস নিত্যানন্দকে গৃহে লইয়া গেলে তাঁহার রূপ দেখিয়া গ্রামের নারীগণ সূর্যদাস-পত্নী ভদ্রাবতীকে[১১৫] বলিলেন :

এই পাত্র হৈলে তোর কন্যার যোগ্য হয়।

কিন্তু সূর্যদাস গ্রামের বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের মত লইতে গেলে তাঁহারা বিবাহ-প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া দেন। গৌরীদাসাগ্রজ[১১৬] সূর্যদাস-পণ্ডিত একজন গণ্যমাণ্য ব্যক্তি ছিলেন। গৌড়ের যবনরাজদরবারে কার্য করিয়া তিনি সমর্থ কর্মচারী-হিসাবে 'সরখেল'-উপাধিও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।[১১৭] সুতরাং তাঁহার পক্ষে কন্যাসম্প্রদান-ব্যাপারে বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের মত গ্রহণ করা, বা নিজেই উক্ত প্রস্তাবে রাজী না হওয়া স্বাভাবিক ছিল। তিনি জানাইলেন যে নিত্যানন্দ 'পূর্ণ নারায়ণ' হইলেও 'বর্ণত্যাগী', সুতরাং ব্রাহ্মণ হইয়া কি করিয়া তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করিতে পারা যায়! 'অভিরামলীলামৃত' নামক একটি গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে[১১৮] যে সূর্যদাস কন্যাদান করিতে অস্বীকৃত হইলে নিত্যানন্দ-সুহৃদ, মহাশক্তিমান অভিরাম ক্রুদ্ধ হইয়া সূর্যদাসের প্রভূত ক্ষতিসাধন করায় তিনি সম্মতিপ্রদান করিতে বাধ্য হন। 'বংশবিস্তার'-মতে সূর্যদাস অসম্মত হইলে নিত্যানন্দ চলিয়া যান। কিন্তু রাত্রিকালে সূর্যদাস স্বপ্ন দেখিয়া বুঝিলেন যে তাঁহাকে কন্যাদান করিতেই হইবে। তাঁহার কন্যা বসুধা এই সংবাদ শ্রবণ করায় তাঁহার মনে 'স্বাভাবিক প্রেম' জাগ্রৎ হয় এবং তিনি হঠাৎ সম্বিৎ হারাইয়া মৃতপ্রায় হন।[১১৯] চিকিৎসকগণও শেষ পর্যন্ত জবাব দিয়া যান। এদিকে নিত্যানন্দের সহিত পথে গৌরীদাস-পণ্ডিতের দেখা। 'অদ্বৈতপ্রকাশ'-কার এই সংবাদ দিয়া জানাইতেছেন যে একসময়ে বালক-গৌরীদাসের বন্ধুগণের অনুরোধে মহাপ্রভু গৌরীদাসের বিবাহাজ্ঞা দান করিলে তিনি আজ্ঞা পালন করিয়া তদবধি গৌর-নিতাই বিগ্রহ সেবা করিয়া আসিতেছিলেন। 'চৈতন্যচরিতামৃতে'ও গৌরীদাসের চৈতন্য-নিত্যানন্দ

---

(১১৪) ২০শ. অ., পৃ. ৮৯ (১১৫) ভ. র.—১১।২৬২ (১১৬) দ্র.—গৌরীদাস; পাটনির্ণয় গ্রন্থে বোধখানা বা 'বালাতে'ও সূর্যদাসের পাটনির্ণয় করা হইয়াছে। (১১৭) ভ. র.—১২।৩৮৭০ (১১৮) পৃ. ৯৭-৯৮ (১১৯) নি. বি.—পৃ. ৯

ভক্তির কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু কবিরাজ-গোস্বামী তাঁহাকে নিত্যানন্দ-শাখাভুক্ত করিয়া বলিতেছেন যে গৌরীদাস 'নিত্যানন্দে সমর্পিল জাতিকুল পাঁতি'। এই সমস্ত হইতে মনে হয় যে তিনি ছিলেন নিত্যানন্দের একজন অনুরাগী ভক্ত। যাহাহউক, 'তাঁহার নিরাশে গৌরীদাস দুঃখী' হইয়া জ্যেষ্ঠভ্রাতার নিকট ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন:

ফিরায়া আনহ তারে ধরিয়া চরণে ।।......
মরিলে সম্বন্ধ থাকে কার সাথে কার ।।
বাঁচাইতে পারে যেই কন্যা দিব তারে।

নিত্যানন্দ ফিরিয়া আসিলেন। এবং

এ সময়ে শ্রীঅঙ্গের লাগিল বাতাস ।।
অঙ্গগন্ধ গিয়া নাসা প্রবেশ করিল।
মৃতসঞ্জীবনী স্পর্শে চেতনা পাইল ।।

'অদ্বৈত প্রকাশ'কার[১২০] বলেন যে বসুধার মৃতদেহ সৎকারার্থ সূর্যদাসাদি গঙ্গাতীরে আসিলে নিত্যানন্দ এই শর্তে বসুধাকে বাঁচাইয়া দেন যে জীবন ফিরিয়া আসিলে সেই কন্যাকে নিত্যানন্দ-হস্তে সম্প্রদান করিতে হইবে।

বসুধাদেবীর পুনর্জন্ম ঘটিল। কুলাচার্যগণ স্থির করিলেন যে

বেদ সংস্কার পুন দিব উপবীত।
পূর্বাশ্রমের গোত্র গাই যেন আছে নীত ।।[১২১]

নিত্যানন্দকে এই কথা জানান হইলে তিনি বলিলেন:

যা কর তাহাই কর মোর দায় নাই।
একলে স্বতন্ত্রমাত্র চৈতন্য গোসাঞি ।।

বিবাহের যথাবিধি আয়োজন চলিতে লাগিল।

সম্ভবত এই সময়ে নিত্যানন্দ নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তন করেন। 'ভক্তিরত্নাকর'-মতে জনৈক প্রাচীন ব্রাহ্মণ স্বপ্নানুপ্রাণিত সূর্যদাসের সম্মতি-সংবাদ নবদ্বীপে আনয়ন করেন। কিন্তু অন্যান্য গ্রন্থের সহিত এইরূপ মতের সামঞ্জস্য নাই। তবে নিত্যানন্দ যে এই সময়ে নবদ্বীপে ফিরিয়া সামাজিক রীতি ও ব্যবস্থানুযায়ী স্বজন-সমভিব্যাহারে যাত্রা করিয়া যথাকালে যথাবিধি বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহাই সঙ্গত মনে হয়। অদ্বৈত-শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দও নিত্যানন্দ-বিবাহের প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া উদ্যোগ-আয়োজন করিতে থাকেন।[১২২] স্থির হয় যে, সূর্যদাসের শালিগ্রামস্থ গৃহে বিবাহানুষ্ঠান হইলে, বড়গাছি গ্রামে গিয়া পাত্রপক্ষীয় লোকদিগের অবস্থান করা উচিত। বড়গাছি গ্রামে থাকিবার সুবিধা এই যে সেইস্থানে 'বিপ্র' কৃষ্ণদাস-হোড়ের বাড়ী।[১২৩] হরি-হোড়ের পুত্র কৃষ্ণদাস তখন নবদ্বীপেই অবস্থান করিতেছিলেন।

---

(১২০) ২০শ. অ.—পৃ. ৯১ (১২১) মু.—নি. বি., পৃ. ৮ (১২২) ভ. র.—১২।৩৮৭০-৭৩ (১২৩. ঐ, ১২।৩৯২৭-৩৩

এযাবৎ আমরা নবদ্বীপ-মধ্যে বহিরাগত কোনও কৃষ্ণদাসের সাক্ষাৎ পাই নাই। কেবল দেখিয়াছি যে মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ-সঙ্গী 'সরল ব্রাহ্মণ'[১২৪] কালিয়া-কৃষ্ণদাস মহাপ্রভু কর্তৃক চরমভাবে নিগৃহীত হইবার পর নবদ্বীপে শচীমাতা ও অন্যান্য ভক্তকে মহাপ্রভুর প্রত্যাগমন-সংবাদ দিবার জন্য গৌড়দেশে চলিয়া আসেন। তারপর আর তাঁহার কোনও সংবাদ পাওয়া যায় না। অথচ, বিভিন্ন গ্রন্থে কালা-বা কালিয়া-কৃষ্ণদাসের নাম যে কীর্তিত হইয়াছে, তাহা কদাপি তাঁহার দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের জন্য হইতে পারে না। নিশ্চয়ই তাঁহার পরবর্তী কোন না কোন কর্মের খ্যাতি ছড়াইয়াছিল। বস্তুত, এই কৃষ্ণদাস, কৃষ্ণদাস-হোড়ই। বড়গাছিগ্রাম-নিবাসী রাজা 'হরি-হোড়ের নন্দন'[১২৫] কৃষ্ণদাসের নবদ্বীপ-সম্পর্ক সম্বন্ধে ইতিপূর্বে অন্য কোন পরিচয় কোথাও পাওয়া যায় নাই।

প্রসঙ্গক্রমে, কালা-কৃষ্ণদাস ও আনুষঙ্গিক আলোচনাগুলি এই স্থানেই শেষ করিয়া লওয়া কর্তব্য। নিত্যানন্দ-বংশের অধস্তন দশম পুরুষ নবদ্বীপচন্দ্র-গোস্বামী তাঁহার বৈষ্ণবাচারদর্পণ' নামক গ্রন্থে লিখিতেছেন যে শালিগ্রাম সন্নিকটস্থ বড়গাছি-গ্রামের রাজা হরি-হোড়ের নন্দনই কালা-কৃষ্ণদাস[১২৬] এবং তিনি বোধখানাতেও বাস করিয়াছিলেন।[১২৭] কৃষ্ণদাসের এই বোধখানায় অবস্থিতির কথা কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। 'পাটনির্ণয়ে'র মহাপাট-বর্ণনায় বোধখানা বা খানাতে পুর্ষদাস-সরখেলের পাট বলা হইয়াছে, কিন্তু এই কালা-কৃষ্ণদাস পুর্ষদাস-সরখেলের সহিত সম্পর্কিত হওয়ার জন্যই বোধ করি 'বৈষ্ণবাচারদর্পণে'র লেখক তাঁহাকেও বোধখানার সহিত যুক্ত করিয়া থাকিবেন। 'চৈতন্য-সংগীতা'র[১২৮] দ্বাদশ-গোপাল বর্ণনায় কালা-কৃষ্ণদাস ছাড়াও যে আর একজন নিধু-কৃষ্ণদাসের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহাকেই লেখক বোধখানাবাসী বলিয়াছেন। 'পাট-পর্যটনে'র মধ্যে বড়গাছি-গ্রামস্থ একজন কৃষ্ণদাসের উল্লেখসত্ত্বেও কালিয়া-কৃষ্ণদাসকে একেবারে আকাইহাটবাসী বলায় জটিলতার উদ্ভব ঘটে এবং বৃন্দাবনদাসের বর্ণনা পাঠ করিলে 'পাটপর্যটনে'র মতকেও উপেক্ষা করা চলে না। বৃন্দাবনদাস 'চৈতন্যভাগবতে' নিত্যানন্দের শিষ্যদিগের বর্ণনা প্রসঙ্গে 'নিত্যানন্দবিলাস'-স্থল 'বড়গাছিনিবাসী সুকৃতি-কৃষ্ণদাসে'র কথা উল্লেখ করিয়া কিছু পরে 'প্রসিদ্ধ কালিয়া-কৃষ্ণদাসে'র নামোল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার বড়গাছি-নিবাসী কৃষ্ণদাসের আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। তিনি বহুস্থলেই 'সুকৃতি' কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন—সুকৃতি গদাধরদাস, সুকৃতি মাধব-ঘোষ, সুকৃতি প্রতাপরুদ্র, এমন কি সুকৃতি বড়গাছিগ্রাম। চন্দ্রশেখরের গৃহে মহাপ্রভুর অভিনয় বর্ণনাকালে তিনি লিখিয়াছেন :

দেখয়ে সুকৃতি সব মহা কুতূহলে।

---

(১২৪) চৈ. চ.—২।৭, পৃ. ১১৯ (১২৫) ভ. র.—১২।৩৯৩২-৩৩ (১২৬) পৃ. ১৪ (১২৭) পৃ. ৩০৭ (১২৮) পৃ. ১২

ইহাতে মনে হয় কৃষ্ণদাসের পূর্বে এই 'সুকৃতি' কথাটির ব্যবহার কোনও বিশেষ পরিচয় বা চিহ্নবাচক হইতে পারে না। সুতরাং সমগ্র 'চৈতন্যভাগবত'-গ্রন্থের মধ্যে বড়গাছি গ্রামস্থ সুকৃতি-কৃষ্ণদাসের এই একটিমাত্র প্রয়োগ সম্বন্ধহীন হইয়া পড়ে। আবার একটু গভীরভাবে অনুধাবন করিলে একমাত্র 'পাটপর্যটনে'র উক্ত বর্ণনাও ভ্রান্ত বলিয়া মনে হয়। 'শব্দ-কল্পদ্রুমে'র মধ্যে 'হোড়' কথাটির অর্থ দেওয়া হইয়াছে—'গৌড়দেশীয়শ্রোত্রিয়-ব্রাহ্মণবিশেষাণামুপাধিঃ।' কিন্তু 'কুলাচার্য'-অনুযায়ী ইহার অর্থ—'দক্ষিণরাঢ়ীয়মৌলিক-কায়স্থানাং দ্বিসপ্ততিপদ্ধত্যন্তর্গতপদ্ধতিবিশেষঃ।' প্রকৃতপক্ষে, এই হোড়-পদবী ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ, উভয়ের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র তাঁহার 'অন্নদা-মঙ্গল' গ্রন্থে বড়গাছি-গ্রামনিবাসী অন্নদাকৃপাপুষ্ট কায়স্থ হরি-হোড়ের সবিস্তার বর্ণনা দিয়াছেন। 'ভক্তিরত্নাকর'-প্রণেতা কর্তৃক উল্লিখিত বড়গাছির হরিহোড়-নন্দন কৃষ্ণদাস ছিলেন কিন্তু 'বিপ্র'। ষোড়শ শতকের তথাকথিত মেল-বন্ধনের দৌলতে যে উক্ত কায়স্থ-ব্রাহ্মণ সম্পর্ক ঘটিয়া উঠিতে পারে তাহার সম্ভাব্যতা আছে। হয়ত এই কারণের জন্যই নবোদ্ভূত 'বিপ্র' দেবীর আনুকূল্যে বা আর কোনও প্রকারে (হয়ত বা দেবীবরের মত কোনও ব্যক্তির আনুকূল্যে)'উপবীতধারী' হইয়াও অব্যাহতি না পাওয়ায় 'কালা' বা 'কালিয়া' শব্দের পশ্চাতে পড়িয়া হঠাৎ-প্রাপ্ত সৌভাগ্যের মাশুল যোগাইয়া আসিতেছেন। তাঁহার 'কুলীন'-আখ্যা প্রাপ্তি হয়ত নিত্যানন্দেরই সাহচর্যের ফল। আবার 'বৈষ্ণবাচারদর্পণে'র [১২৯] লেখক কিন্তু বলিয়াছেন, "কেহ কহে বৈদ্যজাতি কালা-কৃষ্ণদাস"। গ্রন্থকার সম্ভবত এই ব্যাপারে সন্দেহাকুল হইয়াছেন। হরিদাস দাস বাবাজী তাঁহার 'গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-তীর্থ' গ্রন্থে যে বলিয়াছেন বর্ধমানের আকাইহাটে কালা-কৃষ্ণদাসের পাট এবং পাবনা জেলার সোনাতলা গ্রামে কালা-কৃষ্ণদাসের আশ্রম ও ভিটার চিহ্ন আছে, তাহা কেবল কিংবদন্তীমূলক। তিনি সম্ভবত অমূল্যধন রায়ভট্ট-কৃত 'দ্বাদশ গোপালে'র দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন এবং স্বয়ং উক্ত স্থানগুলি পরিদর্শন করিয়াছেন। হরিদাস দাস ও অমূল্যধন রায়ভট্ট মহাশয়দ্বয়ের এই মত 'বৈষ্ণবদিগ্‌দর্শনী'-গ্রন্থেরই সমর্থন করে। কিন্তু অমূল্যধন রায়ভট্ট ও মুরারিলাল অধিকারী মহাশয়দ্বয় কোন্ গ্রন্থ দেখিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করেন নাই। 'অভিরাম-লীলামৃত' গ্রন্থের পরিশিষ্টে কিন্তু দ্বাদশ-গোপালের পাট-নির্ণয়স্থলে কালিয়া-কৃষ্ণদাসকে বড়গাছি-নিবাসী বলিয়াই ধরা হইয়াছে। এদিকে আবার 'পাট-পর্যটনে' কিন্তু সোনাতলায় কৃষ্ণদাসকে 'রজক কৃষ্ণদাস নিশ্চিত' বলা হইয়াছে। পানিহাটি গৌরাঙ্গ-গ্রন্থমন্দিরে রক্ষিত 'শ্রীপাটনির্ণয়'[১৩০] পুথিতে আকাইহাটের কৃষ্ণদাসের এইরূপ উল্লেখ আছে—"...ঠাকুর কৃষ্ণদাস। রঘুনন্দনের নূপুর পাইয়া উল্লাস।" কিন্তু উক্ত

---

(১২৯) পৃ. ৩৩৭ (১৩০) পৃ. ১

পুথিতে কালা-কৃষ্ণদাসের নাম পর্যন্ত নাই। অন্য কোন গ্রন্থেই আকাইহাটের কৃষ্ণদাসকে কালা-কৃষ্ণদাস বলিয়া উল্লেখ করা হয় নাই। বাস্তবিক পক্ষে আকাইহাটের কৃষ্ণদাস খুব বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন না। নিত্যানন্দদাস ও পরবর্তী-কালের নরহরি-চক্রবর্তী, মাত্র এই দুইজনের গ্রন্থে আকাইহাটের কৃষ্ণদাসের উল্লেখ আছে। তাহা হইতে জানা যায় যে তিনি একজন সুগায়ক ছিলেন।[১৩০] খেতুরি-উৎসবে যোগদানের জন্য আসিবার পথে জাহ্নবা-ঠাকুরাণী তাঁহার গৃহে রাত্রিযাপন করিয়াছিলেন; তিনি পরদিন তাঁহাকে লইয়া কণ্টকনগর যাত্রা করেন[১৩১] এবং সেখান হইতে কৃষ্ণদাস যদুনন্দনকে সঙ্গে করিয়া লন।[১৩২] তারপর তিনি খেতরিতে গিয়া বল্লভীকান্তের অধীনস্থ বাসায় অবস্থান করেন ও উৎসবে যোগদান করেন।[১৩৩] সুতরাং আকাইহাটের কৃষ্ণদাসকে কালিয়া-কৃষ্ণদাস মনে করিবার কোনও সংগত কারণ নাই। আর যদি দুইটি স্থানের সহিত এক ব্যক্তির এইরূপ বিশেষ সংযোগ ঘটিয়া উঠিতে পারে, তাহা হইলে তাঁহার তিনটি স্থানের সহিত সংযোগ থাকাও কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। কিন্তু সম্ভবত তাহার প্রয়োজন নাই। সৌভাগ্যক্রমে, সপ্তদশ শতাব্দীর সুবিখ্যাত কবি পুরুষোত্তম সিদ্ধান্তবাগীশ বা প্রেমদাস-মিশ্র তাঁহার 'বংশীশিক্ষা'-গ্রন্থে[১৩৪] অম্বিকানগরস্থ গৌরীদাসের প্রসঙ্গ উল্লেখের অব্যবহিত পরেই লিখিয়াছেন:

কালা কৃষ্ণদাস বন্দ অজন আখ্যান।
বড়গাছি গ্রামে যার রমণীয় স্থান॥

বড়গাছির সুকৃতি-কৃষ্ণদাস বা দ্বিতীয় কোন কৃষ্ণদাসের কোন উল্লেখই সেইস্থানে নাই। আকাইহাটের কৃষ্ণদাস যদি দ্বাদশ-গোপালের একজন হইতেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহার নাম উল্লেখিত হইত। আবার সুবিখ্যাত দ্বাদশ-গোপালের পরিচয় দিতে বসিয়া কবি তাঁহাদের অন্যতম কালা-কৃষ্ণদাসের স্থান-নির্ণয় করিতে যে ভুল করিয়া বসেন নাই, তাহা বলা যাইতে পারে। আশ্চর্যের বিষয়, বড়গাছির কালা-কৃষ্ণদাসের অব্যবহিত পরেই আকাইহাটের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে। অথচ তাহার মধ্যেও কোনও কৃষ্ণদাসের নাম নাই। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে পানিহাটি গৌরাঙ্গ-গ্রন্থমন্দিরে রক্ষিত ১০৭৫ সনে অনুলিখিত বৃন্দাবনদাসের নামে প্রচলিত 'বৈষ্ণববন্দনা'-নামক[১৩৫] পুথিতে লিখিত হইয়াছে:

বন্দ শ্রীকৃষ্ণদাস আকাইহাটেতে বাস
শান্ত পরম অকিঞ্চন।

[আর একটি পুথিতে 'বন্দ শ্রীকৃষ্ণদাসে'র স্থলে 'ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণদাস']

(১৩০) ন. বি.—৬ষ্ঠ. বি. পৃ. ৮৪ (১৩১) ভ. র.—১০।৪০৮-৯-(১৩২) প্রে. বি.—১৯শ. বি., পৃ. ৩০৯ ; বি.—৬ষ্ঠ.বি., পৃ. ৮৩ (১৩৩) ন. বি.—৬ষ্ঠ. বি., পৃ. ৮৭ ; ৮ম. বি., পৃ. ১০৭ (১৩৪) অ. উ., পৃ. ৮১ ১৩৫) পৃ. ৪, ৬

পরপৃষ্ঠায় আছে—

উন্মাদি বিনোদি বল কালিয়া কৃষ্ণদাস।
প্রেমেতে বিহ্বল হঞা না সম্বরে বাস॥

ঠিক ইহার পরপৃষ্ঠাতেই—

বড়গাছির বন্দিব ঠাকুর কৃষ্ণদাস।
নিত্যানন্দচন্দ্রে যার একান্ত বিশ্বাস॥

এবং ইনিই নিত্যানন্দকে গৃহে রাখিয়াছিলেন, শেষে গৌরীদাস-পণ্ডিত নিত্যানন্দকে 'কোচে ধরি লঞা গেল মোর প্রভু বলি ১৩৬।' 'অভিরামলীলামৃত'-গ্রন্থের পরিশিষ্টে প্রসন্নকুমার গোস্বামীও কালিয়া-কৃষ্ণদাসকে বড়গাছি-নিবাসী বলিয়া ধরিয়াছেন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে আকাইহাটের ঠাকুর-কৃষ্ণদাস ছাড়াও দুইজন কৃষ্ণদাস ছিলেন। একজন কালিয়া-কৃষ্ণদাস এবং আর একজন বড়গাছির ঠাকুর-কৃষ্ণদাস। আবার সূর্যদাস-সরখেলের গৃহ শালিগ্রামে হইলে, তাঁহার ভ্রাতা কৃষ্ণদাস-পণ্ডিতকেও শালিগ্রাম-বাসী বলিতে হয়। ইহাছাড়াও পূর্বে আমরা দেখিয়াছি যে কৃষ্ণদাস-হোড়ের নিবাস ছিল বড়গাছিতে। কিন্তু 'প্রেমবিলাসে'র চতুর্বিংশ বিলাসের লেখক স্থির করিয়াছেন যে তাঁহার নিবাস দোগাছিয়ায়। প্রকৃতপক্ষে, বড়গাছি, শালিগ্রাম ও দোগাছিয়া খুব সম্ভবত একই গ্রামের অন্তর্গত বিভিন্ন পল্লী, কিংবা অন্তত সকলগুলিই ইহাদের কোনও একটি সুপ্রসিদ্ধ নামে পরিচিত ছিল। **Nadia District Gazetteer (West Bengal-Hand Book, 1953)**-এও বড়গাছি, দোগাছিয়া ও শালিগ্রামের নাম পাশাপাশি উল্লেখিত হইয়াছে। উপরোক্ত 'শ্রীপাটনির্ণয়'-পুথিতে দেখা যায় যে আকাইহাটের পরে অনাড়িয়া গ্রামের উল্লেখ করিয়াই লেখক আর একজন কৃষ্ণদাসের নামোল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার নিবাস বড়গাছি-শালিগ্রামে। আবার 'চৈতন্যভাগবত'-গ্রন্থে দেখা যায় যে নিত্যানন্দপ্রভু

প্রতি গ্রামে গ্রামে ভ্রমে সঙ্কীর্তন রঙ্গে॥
খানাযোড়া আর বড়গাছি-দোগাছিয়া।

সুতরাং বেশ বুঝিতে পারা যায় যে আকাইহাটকে বাদ দিলে দোগাছিয়া, বড়গাছি ও শালিগ্রামের মধ্যে দুইজন কৃষ্ণদাস ছিলেন। শালিগ্রাম বা 'বড়গাছি-শালিগ্রামে'র একজন কৃষ্ণদাস।১৩৭ ইনিই সূর্যদাসানুজ বা গৌরীদাসানুজ১৩৮ কৃষ্ণদাস; এবং দোগাছিয়া বা 'বড়গাছি-দোগাছিয়া'র একজন কৃষ্ণদাস। ইনিই 'ভক্তিরত্নাকর'-উল্লেখিত বড়গাছির কৃষ্ণদাস-হোড় বা 'বংশীশিক্ষায়' উল্লেখিত বড়গাছির কালা-কৃষ্ণদাস।

---

(১৩৬) গ্রন্থ মধ্যে (পৃ. ৬৭) বলা হইয়াছে যে কালিয়া-কৃষ্ণদাস অদ্বৈতের নিকট অচ্যুতের মৃত্যু সংবাদ বহন করিয়া আনিয়াছিলেন।—এই বর্ণনার কোনও সমর্থন কোথাও নাই। বর্ণনা অবিশ্বাস্য।(১৩৭) চৈ. স.-এর (পৃ. ১২) দ্বাদশ-গোপালের পাটনির্ণয়ে কালী-কৃষ্ণদাসকে একবার দু (শা ?) লী-গ্রামবাসী বলা হইয়াছে। (১৩৮) দ্র.—গৌরীদাস-পণ্ডিত

যাহাহউক, এই কালিয়া-কৃষ্ণদাস বা কৃষ্ণদাস-হোড়কে আগেভাগেই বড়গাছি পাঠাইয়া দেওয়া হইল। তাঁহার সম্বন্ধে 'ভক্তিরত্নাকর'-কার বলিয়াছেন[১৩৯] :

নিত্যানন্দ পদে তাঁর সুদৃঢ় ভকতি।
করাইতে বিবাহ তাঁহার আর্তি অতি॥

'প্রেমবিলাসে'র চতুর্বিংশবিলাস-মতে-ইতিপূর্বে পণ্ডিত-কৃষ্ণদাস-হোড়ই নিত্যানন্দ ও উদ্ধারণ-দত্তকে নিজগৃহ দোগাছিয়ায়[১৪০] আনিয়া উক্ত বিবাহের পরিকল্পনা করেন। এখন তিনি বড়গাছিতে আসিয়া বিবাহের আয়োজন সম্পন্ন করিলেন। তারপর নবদ্বীপ হইতে নিত্যানন্দাদি সকলে আসিয়া পড়িলে সূর্যদাস বড়গাছিতে আসিলেন। গৌরীদাস পূর্ব হইতেই বড়গাছিতে ছিলেন। শেষে সূর্যদাসানুজ পণ্ডিত-কৃষ্ণদাস দ্রব্যাদিসহ গোধূলিকালে বড়গাছি পৌঁছাইলে নিত্যানন্দের শুভ অধিবাস হইয়া যায়, তারপর সূর্যদাস ফিরিয়া গেলে শালিগ্রামে কন্যারও অধিবাস হয়।

এইভাবে প্রাগ্বৈবাহিক কর্মাদির বিষয় 'নিত্যানন্দবংশবিস্তার'-গ্রন্থে বর্ণিত হয় নাই। যিনি 'চৈতন্যভাগবত'কে প্রায় পদে পদেই অনুসরণ করিয়াছিলেন, এই বিবরণ সেই নরহরি-চক্রবর্তীই দিয়াছেন। ইহার পর 'বংশবিস্তারে'র বর্ণনা[১৪১] অনুযায়ী দেখা যায় যে নিত্যানন্দ বিবাহ-বাসরে পৌঁছাইলে

পুরোহিত কহে পাত্রীদানের নিমিত্তে।

এবং তাহার কিছুক্ষণ পরে নিত্যানন্দ

এত কহি শুনাইল পুরোহিতের কাণে।
তেহো কহে এই ঘটে না হইবেক কেনে॥

কিন্তু এই স্থলে নিত্যানন্দের যে কি উদ্দেশ্য ছিল তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই। কিন্তু ইহার পর জামাতা-বরণ ও কন্যা-সম্প্রদানাদির কার্য সুসম্পন্ন হইলে কয়েক দিবস বেশ আনন্দে কাটিতে থাকে। নিত্যানন্দ-পত্নী বসুধার ভগিনীর নাম ছিল জাহ্নবী বা জাহ্নবা-দেবী। একদিন হঠাৎ পরিবেশনরতা স্খলিতশিরোবসনা জাহ্নবাকে দেখিতে পাইয়া প্রভু-নিত্যানন্দ বুঝিলেন [১৪২] :

এই মোর পূর্ণ শক্তি নিশ্চয় জানিল॥

ভোজনান্তে উপবেশন করিয়া স্বীয় পত্নী বসুধাকে

আকর্ষিয়া প্রভু বসাইল বাম পাশে।.........
সেইকালে শ্রীজাহ্নবা তথাতে মিলিলা।
প্রভু দেখি অতিশয় লজ্জাযুক্ত হৈলা॥
ইহা দেখি নিত্যানন্দ করে আকর্ষিয়া।

(১৩৯) ১২।৩৫৭০ (১৪০) চৈ. ভা.—৩।৫, পৃ. ৩১৬ (১৪১) পৃ. ৯-১৩ (১৪২) নি.বং.—৭৪-৭৮

বসাইলা জাহ্নবারে দক্ষিণে আনিয়া ॥
এই মোর প্রাণপ্রিয়া হৃদয়ে জানিয়া।
তারপর দিনে প্রভু মনে বিচারিয়া ॥
সূর্যদাস পণ্ডিতেরে কহিল এই কথা।
যৌতুকে লইলাম তোমার কনিষ্ঠা দুহিতা ॥

'প্রেমবিলাসে'র চতুর্বিংশবিলাসেও লিখিত রহিয়াছে,—'যৌতুক নিলেন প্রভু কনিষ্ঠা জাহ্নবারে' এবং 'অদ্বৈতপ্রকাশ'-মতে 'যৌতুক ছলে জাহ্নবারে আত্মসাৎ কৈলা।'

সূর্যদাস বলিলেন :

তোমারে আর অদেয় কি আছে আমার ॥
জাতি প্রাণ ধন গৃহ পরিবার মোর।
এককালে সমর্পণ কৈল পায়ে তোর ॥

ইহার পর সূর্যদাসের সংবাদ আর আমরা বড় একটা পাই না। সম্ভবত তিনি মধ্যে মধ্যে খড়দহে যাইতেন এবং শ্রীনিবাস-আচার্য যখন প্রথম খড়দহে যান তখন তিনি সেই স্থলে উপস্থিত ছিলেন।[১৪৩] সম্ভবত তিনি খেতরি-উৎসবেও যোগদান করিয়াছিলেন।[১৪৪] 'পাটনির্ণয়ে'র মহাপাট-বর্ণনায় খানা বা বোধখানাতে সূর্যদাসের পাট নির্ণীত হইয়াছে। কিন্তু তিনি যে কখন এই বোধখানায় বাস করিয়াছিলেন, তাহা কোথাও সঠিকভাবে লিখিত হয় নাই। 'অভিরামগোস্বামীর শাখানির্ণয়ে'[১৪৫] গোকুলদাস নামে সূর্যদাসের এক শিষ্যের বর্ণনা আছে।

যাহাহউক, সূর্যদাস নিত্যানন্দ-বাসনা পূর্ণ করিলে নিত্যানন্দ বসুধা-জাহ্নবাকে লইয়া নানাভাবে লীলা ও ঐশ্বর্য প্রকাশ করিলেন। ইহার পর নিত্যানন্দপ্রভুর

মন হৈল খড়দহ করিব শ্রীপাট।
প্রভু আজ্ঞা পালিবারে বসাইব হাট ॥

তদনুযায়ী তিনি খড়দহে আসিয়া 'দুই প্রিয়া সঙ্গে নানা রস বিলাসিয়া।' এবং তাঁহাদিগের '…বাঞ্ছা পূরণ করিয়া' শ্যামসুন্দরবিগ্রহ-সেবা প্রকাশ করিলেন এবং প্রেম প্রচার করিয়া সুখে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন।

উপরোক্ত গ্রন্থাদির বিবরণ কতদূর সত্য তাহা সঠিক করিয়া না বলা গেলেও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে সংসার ও সাংসারিক সকল প্রকার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়া মহাপ্রভু-চৈতন্যের সন্ন্যাস-গ্রহণ করিবার কিছুকাল পরেই অবধূত-নিত্যানন্দ দার-পরিগ্রহ করিয়া সম্ভোগ-সম্ভারের মধ্যে নিজেকে নিমজ্জিত করিলেন এবং "মহাপ্রভুর সাহচর্য হইতে বিচ্যুত হইয়া নিত্যানন্দ নিজের স্বাতন্ত্র্য বুদ্ধিতে প্রেমধর্ম প্রচার করিতে লাগিলেন।"[১৪৬]

(১৪৩) ভ. র.—৪।৯২ (১৪৪) প্রে. বি.—১৯শ. বি., পৃ. ৩০৮ (১৪৫) পৃ. ১০–১১ (১৪৬) প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য (৫ম. ও ৬ষ্ঠ. খণ্ড পৃ. ১১৫

কিন্তু তাঁহার এইরূপ আচরণ ও এই প্রকার বিবাহের আধ্যাত্মিক সার্থকতা খুঁজিতে যাওয়া বৃথা। চরিতকার-গণ ভবিষ্যৎ যুগের সকল প্রশ্নকেই প্রশমিত করিয়াছেন কেবল একটিমাত্র কথায় যে উহাই ছিল চৈতন্যমহাপ্রভুর আজ্ঞা। 'প্রেমবিলাসে'র চতুর্বিংশ বিলাসে এই সম্পর্কে কঠোরভাবে প্রশ্ন উত্থাপন করা হইয়াছে। সন্ন্যাসী গৃহাশ্রমী হইলে তাঁহাকে 'বিড়ালব্রতী' 'বান্তাশী' বা কুকুর সদৃশ ও অস্পৃশ্য বলা হইয়াছে। অথচ কবি একটিমাত্র কথাতেই সমস্ত প্রশ্নের সমাধান করিয়াছেন—

সাক্ষাৎ ঈশ্বর হয় রাম নিত্যানন্দ।
বিধি নিষেধের তাহে নাহিক সম্বন্ধ ॥

পুত্র বীরভদ্রের বিবাহ বিষয়ে যে গোলযোগ উত্থাপিত হইয়াছিল, নিত্যানন্দকে সম্ভবত তাহার ধাক্কা সামলাইতে হয় নাই। কিন্তু তিনিই তাঁহার কন্যা গঙ্গাদেবীর সহিত স্বীয় শিষ্য মাধব-আচার্যের বিবাহ দিয়াছিলেন। নিত্যানন্দের অবর্তমানে বীরভদ্রের বিবাহকে সমর্থিত করিবার জন্য নাকি নূতন বিধানের সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু গঙ্গাদেবীর বিবাহ রাঢ়ী-বারেন্দ্রের বিবাহ হওয়া সত্ত্বেও এবং 'গুরুকন্যা শিষ্যের বিয়ে শাস্ত্রে নিষিদ্ধ' হওয়া সত্ত্বেও

অঘট্য ঘটন হয় ঈশ্বরের ইচ্ছায়।

সুতরাং অঘটন-ঘটন-পটিয়ান্ ;নিত্যানন্দের আজ্ঞায় তাহা হইলেক সিদ্ধ।'[১৪৭]

কিন্তু সম্ভবত এইভাবে সকল প্রশ্নকে দাবাইয়া দেওয়া চলে না। মনীষী বিবেকানন্দ 'রাজযোগ'-গ্রন্থে লিখিয়াছেন,[১৪৮] "তর্কযুক্তি আমাদিগকে যতদূর লইয়া যাইতে পারে, ততদূর যাইতে হইবে। তৎপর যখন আর তর্কযুক্তি চলিবে না, তখন উহাই সর্বোচ্চ অবস্থা লাভের পথ আমাদিগকে দেখাইয়া দিবে। অতএব যখন কেহ নিজেকে প্রত্যাদিষ্ট বলিয়া দাবী করে অথচ যুক্তিবিরুদ্ধ যা-তা বলিতে থাকে, তাহার কথা শুনিওনা।...... কারণ প্রকৃত প্রত্যাদেশ বিচারজনিত জ্ঞানের অসম্পূর্ণতার পূর্ণতা সাধন করে," এবং আপ্ত ব্যক্তি সম্বন্ধে 'আমাদের দেখা উচিত যে, সে ব্যক্তি যাহা বলে, তাহা মনুষ্যজাতির পূর্বসত্যজ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বিরোধী কিনা।' নিত্যানন্দপ্রভু তাঁহার কর্মপদ্ধতির কিছু কৈফিয়ত দিয়াছিলেন কিনা, জানা যায় নাই। গৌরাঙ্গের নবদ্বীপ-লীলাকালে তিনি স্বয়ং গৌরাঙ্গের নিকট যে কোনও কৈফিয়ত দেন নাই, বা দিতে পারেন নাই, তাহা আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু জয়ানন্দ নাকি বলিয়াছেন[১৪৯] যে একবার নীলাচলে মহাপ্রভুর নিকট মুখামুখি জবাবদিহিতে পড়িয়া নিত্যানন্দ স্বীয় কর্মের সমর্থনে বলিয়াছিলেন, "কাঠিন্য কীর্তন কলিযুগ ধর্ম নহে।" স্বীয় ভোগবিলাসের সমর্থনে এইরূপ উক্তি যেমন

(১৪৭) প্রে. বি.—২৪ শ. বি., পৃ. ২৫১-৫২ (১৪৮) ১১শ. সং., পৃ. ১০৬-৭, ১৪৪ (১৪৯) বাঙ্গালাচরিত গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য

অযৌক্তিক, তেমনি অদ্ভুত। এদিকে আবার 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নামক একখানি গ্রন্থের সুচতুর গ্রন্থকার কৈফিয়ত দিতেছেন [১৫০] :

আপন মহিমা আজ্ঞা নাহিক কহিতে।

কিন্তু সরলস্বভাব কবি বৃন্দাবনদাস নিত্যানন্দ-মহিমা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা অপর্যাপ্ত। নিত্যানন্দ-প্রভুর ইচ্ছা ও আদেশানুযায়ী তিনি 'চৈতন্যভাগবত'-গ্রন্থ রচনা করেন। সুতরাং তৎপ্রদত্ত কৈফিয়ত হয়ত এ বিষয়ের চূড়ান্ত কৈফিয়ত বিবেচিত হইতে পারে। কিন্তু ঈশ্বরত্ব দূরের কথা, নিত্যানন্দপ্রভু প্রকৃতই 'প্রত্যাদিষ্ট' বা 'আপ্ত' ছিলেন কিনা, উপরোক্ত কারণবশত যে সে সম্বন্ধে তৎকালীন সমাজের মধ্যে বার বার প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে, তাহার বিবরণ 'চৈতন্যভাগবত' 'চৈতন্যচরিতামৃত'[১৫১] এবং 'প্রেমবিলাস' প্রভৃতি গ্রন্থেই পরিদৃষ্ট হয়। 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র রচয়িতা স্বয়ং কৃষ্ণদাসের বসতবাটিতে নিত্যানন্দ-শিষ্য মীনকেতন-রামদাস আসিয়া পৌঁছাইলে গৃহবিগ্রহসেবক গুণার্ণব-মিশ্র ও কৃষ্ণদাস-কবিরাজের ভ্রাতা যেরূপ আচরণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যেও তাহার আভাস মিলিতে পারে। নিত্যানন্দের ভগবত্তা সম্বন্ধীয় প্রশ্নগুলি এড়াইয়া যাওয়া সম্ভব নহে বলিয়াই বৃন্দাবনদাসও একেবারে প্রথম হইতেই বার বার উক্ত প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া বার বার তাহার সমাধানের চেষ্টা করিয়াছেন। নিত্যানন্দের প্রায় প্রতিটি উল্লেখযোগ্য কার্যকে সুবিহিত প্রমাণ করিবার জন্য তাঁহার প্রয়াসের অন্ত নাই; কিন্তু যুক্তির অভাববশত সাধারণের মনস্তুষ্টি সম্ভব নহে জানিয়া বার বার নানাবিধ অবিশ্বাস্য ও অলৌকিক ঘটনার অবতারণা করিয়াও শেষে সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন [১৫২] :

এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে॥

কবি-বৃন্দাবন এ সম্বন্ধে যে একটি ঘটনাকে চরম কৈফিয়ত বলিয়া মনে করিয়াছেন,[১৫৩] তাহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে এই প্রশ্নটি সেদিন কিরূপ উৎকট আকার ধারণ করিয়াছিল। নিত্যানন্দ-বিবাহের পর নবদ্বীপস্থ চৈতন্যানুরাগী এক ব্রাহ্মণ-ভক্ত তাঁহার কার্যকলাপের কোনও ঠিকানা করিতে পারেন নাই। তিনি নীলাচল পর্যন্ত গিয়া স্বয়ং চৈতন্যের সম্মুখে নিত্যানন্দ সম্বন্ধে জানাইয়াছিলেন :

সন্ন্যাস আশ্রম তান বোলে সর্বজন।
কর্পূর তাম্বূল সে ভক্ষণ অনুক্ষণ॥
ধাতুদ্রব্য পরশিতে নাহি সন্ন্যাসীরে।
সোনারূপা মুক্তা যে সকল কলেবরে॥

---

(১৫০) ১ম. অ., পৃ. ১৩৯ (১৫১) ১।৫, পৃ. ৩৫ (১৫২) চৈ. ভা.—৩।৭, পৃ. ৩২১ ; ২।১১, পৃ. ১৬২
(১৫৩) ঐ—৩।৭, পৃ. ৩১৮-২১

কাথায় কৌপীন ছাড়ি দিব্য পট্টবাস।
ধরেন চন্দন-মালা সদাই বিলাস॥
দণ্ড ছাড়ি লৌহদণ্ড ধারণ বা কেনে।
শূদ্রের আশ্রমে যে থাকেন সর্বক্ষণে॥

গ্রন্থকার জানাইতেছেন, মহাপ্রভু তখন বিপ্রকে নানা তত্ত্বকথা শুনাইয়া শেষে বলিলেন:

গৃহ্লীয়াদ্ যবনীপাণিং বিশেদ্‌বা শৌণ্ডিকালয়ম্।
তথাপি ব্রহ্মণো বন্দ্যং নিত্যানন্দ পদাম্বুজম্॥

অদূর-ভবিষ্যতে চৈতন্য-প্রবর্তিত ভক্তিধর্মের পরিণতির কারণ সম্বন্ধে বুঝিতে বাকী থাকে না। কিন্তু মহাপ্রভুকে কলার শরলার শয্যার পরিবর্তে একটু তুলি-বালিস ব্যবহার করাইবার জন্য স্বরূপ-জগদানন্দের ব্যর্থ আকুতি, গভীর নিশীথে অস্পষ্ট লণ্ঠনহস্তে স্বরূপ ও গোবিন্দের প্রাণপণ অন্বেষণের ফলে সিংহদ্বারের নিকট হইতে মহাপ্রভুর চেতনাহীন দেহের আবিষ্কার, এবং নিষ্ক্রমণ পথ না পাওয়ায় রুদ্ধদ্বার গম্ভীরার ভিত্তিগাত্রে মুখঘর্ষণজনিত রক্তাপ্লুতাননে পরমগুরু শ্রীচৈতন্যদেবের কাতর গোঙানি—এই সমস্ত ঘটনার কিছুমাত্র কি নীলাচলাগত অসংখ্য বৈষ্ণবভক্তের কাহারও না কাহারও মারফতে গৌড়বিজয়ী-মহিমামত্ত কবির কর্ণে আসিয়া পৌঁছায় নাই!

উক্ত ঘটনার পর নিত্যানন্দ নীলাচলে মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন নাই। তিনি এক পুষ্পের উদ্যানে গিয়া উঠিলেন। কিন্তু বৃন্দাবন বলিতেছেন যে মহাপ্রভু স্বয়ং তাঁহার নিকট আসিয়া পুনরায় সেই পূর্বকৃত শ্লোকটি উচ্চারণ করিতে করিতে সসম্ভ্রমে নিত্যানন্দপ্রভুকে প্রদক্ষিণ করিলেন। নিত্যানন্দের সর্বাধিকার অবাধ ও সর্বব্যাপ্ত হইয়া গেল। তিনি গদাধর-পণ্ডিতের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। গদাধর ভাল রন্ধন করিতেন। গৌড় হইতে তিনি যে এক মণ 'অতি সূক্ষ্ম শুক্ল দেবযোগ্য' চাউল সঙ্গে আনিয়াছিলেন, তাহা গদাধরকে দিয়া রন্ধন করিতে বলিলেন। বৃন্দাবন বলিয়াছেন যে মহাপ্রভুও তাঁহাদের ভোজন ব্যাপারে যোগ দিয়াছিলেন, এবং তাহা 'নিত্যানন্দ স্বরূপের তণ্ডুলের প্রীতে।' বৃদ্ধা-তপস্বিনী আর পরমা-বৈষ্ণবী মাধবীদেবীর নিকট হইতে উত্তম তণ্ডুল চাহিয়া আনায় ছোট-হরিদাসের ভাগ্যের পরিণতির কথা স্বতঃই মনে আসে।

কিন্তু 'চৈতন্যচরিতামৃত' হইতে জানিতে পারা যায় যে নিত্যানন্দপ্রভু পরবর্তী-বারে নীলাচলে গেলে চাতুর্মাস্যান্তে পুনরায় তৎসহ মহাপ্রভুর নিভৃত যুক্তির প্রয়োজন হইয়াছিল। অদ্বৈতপ্রভুও মহাপ্রভুকে কি যেন ঠারেঠোরে বলিয়াছিলেন। তিনি মুখে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাও তর্জার আকারে। ভক্তগণ কেবল মহাপ্রভুকে বলিতে শুনিলেন—

প্রতি বর্ষে নীলাচলে তুমি না আসিবা।
গৌড়ে রহি মোর ইচ্ছা সফল করিবা॥

নিত্যানন্দ গৌড়ে চলিয়া আসিলেন।

পর বৎসর গৌড়ে মহাপ্রভুর সহিত রূপ-সনাতনের সাক্ষাৎ ঘটিলে সেই সূত্রে নিত্যানন্দও তাঁহাদের সহিত পরিচিত হন। তারপর মহাপ্রভু নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করিলে তিনি প্রচারের কার্যে লাগিয়া যান। সেই সময় একদিন তিনি লোকজনসহ রামচন্দ্র-খানের দুর্গামণ্ডপে গিয়া উপবেশন করিলে রামচন্দ্র তাঁহাকে গোয়ালার সুবিস্তীর্ণ গোশালায় গিয়া বসিবার জন্য কর্মচারী মারফত নির্দেশ প্রদান করেন। অসম্মানিত নিত্যানন্দ চলিয়া যাইবার সময় বলিয়া গেলেন :[১৫৪]

সত্য কহে এই ঘর মোর যোগ্য নয়।
ম্লেচ্ছ গোবধ করে তার যোগ্য হয়॥

নিত্যানন্দ চলিয়া গেলে রামচন্দ্র সেবক দিয়া সেই স্থানের মাটি উঠাইলেন এবং 'গোময়জলে লেপিলা সব মন্দির প্রাঙ্গণ।' কিন্তু 'দস্যুবৃত্তি রামচন্দ্র রাজায় না দেয় কর।' সুতরাং অচিরে রাজার উজির আসিয়া তাঁহার দুর্গামণ্ডপে 'অবধ্যবধ' করাইয়া মাংস রন্ধন করাইলেন এবং সস্ত্রীক রামচন্দ্রকে বাঁধিয়া রাখিয়া তাঁহার গৃহ ও গ্রাম লুঠ করিয়া 'জাতি ধন জন খানের সকল লইল।' নিত্যানন্দ-মহিমা দেখিয়া ভক্তবৃন্দ চমৎকৃত হইলেন।

ইহার কিছুকাল পরে একদিন রঘুনাথদাস আসিয়া পাণিহাটিতে গঙ্গাতীরে নিত্যানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করেন।[১৫৫] ধনীর পুত্র রঘুনাথকে নিত্যানন্দ 'দধি চিড়া ভক্ষণ' করাইবার নির্দেশ দান করিলে রঘুনাথ কৃষ্ণদাস-হোড় প্রভৃতি সমবেত শিষ্যবৃন্দকে 'চিড়া দধি দুগ্ধ সন্দেশ আর চিনি কলা' ইত্যাদি ভোজন করান এবং পরদিন তিনি নিত্যানন্দের নিকট স্বীয় চৈতন্যচরণ-প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিলে নিত্যানন্দ তাঁহাকে মনোবাঞ্ছা পূরণের আশীর্বাদ জানাইয়া নীলাচলে গমন করিবার আজ্ঞাদান করেন। কিন্তু পর বৎসর,

যদ্যপি প্রভুর আজ্ঞা গৌড়ে রহিতে।
তথাপি নিত্যানন্দ প্রেমে চলিলা দেখিতে॥ ১৫৬

এইভাবে নিত্যানন্দ সম্ভবত প্রতি বৎসর গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দের সহিত নীলাচলে গিয়া নীলাচল-লীলায় অংশগ্রহণ করিতেন এবং নরেন্দ্র-জলকেলি ও সম্প্রদায়-কীর্তনাদিতে যোগদান করিতেন। একবার ভক্তবৃন্দ যাত্রা করিলে তিনিও বাহির হইলেন।

নিত্যানন্দ প্রভুরে যদ্যপি আজ্ঞা নাই।
তথাপি দেখিতে চলে চৈতন্য গোসাঞি॥১৫৭

শিবানন্দ-সেন পথের যাবতীয় ব্যবস্থা নির্বাহ করিতেন। একদিন পথিমধ্যে শিবানন্দের দেরি দেখিয়া,

---

(১৫৪) চৈ. চ.—৩।৩, পৃ. ৩০০ (১৫৫) চৈ. চ.—৩।৬, পৃ. ৩১৫-১৮ (১৫৬) ঐ—৩।১০, পৃ. ৩৩৪
(১৫৭) ঐ— ৩।১২, পৃ. ৩৪১

নিত্যানন্দ প্রভু ভোকে ব্যাকুল হইয়া।
শিবানন্দে গালি পাড়ে বাসা না পাইয়া॥
তিন পুত্র মরুক শিবার এখন না আইল।
ভোকে মরি গেনু মোরে বাসা না দেয়াইল॥

তারপর শিবানন্দ পৌছাইলে

উঠি তারে মারিল প্রভু নিত্যানন্দ।......
নিত্যানন্দ প্রভুর নব চরিত্র বিপরীত।
ক্রুদ্ধ হঞা লাথি মারি করে তার হিত॥

কিন্তু শিবানন্দের ভাগিনা শ্রীকান্ত-সেন ইহাতে মর্মাহত হইয়া একাকী আগেই মহাপ্রভুর নিকট গিয়া পৌছাইলেন এবং একেবারে 'পেটাঙ্গি গায় করে দণ্ডবৎ নমস্কার'। চৈতন্য-সেবক গোবিন্দ শ্রীকান্তকে পেটাঙ্গি খুলিয়া প্রণাম করিতে বলিলে মহাপ্রভু শ্রীকান্তকে কোনও তত্ত্বকথা বা কাহারও মাহাত্ম্যগাথা না শুনাইয়া একান্ত সহানুভূতির সুরে কেবল গোবিন্দকে বলিলেন "শ্রীকান্ত আসিয়াছে পাঞা মনোদুখ। কিছু না বলিহ করুক যাতে ইহার সুখ॥"

এইবার গৌড়ীয়-ভক্তবৃন্দের নীলাচল হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার পূর্বে মহাপ্রভু সকলকে সুস্থির করিয়া শেষে—

নিত্যানন্দে কহিল তুমি না আইস বার বার।
তথাই আমার সঙ্গ হইবে তোমার॥

কৃষ্ণদাস-কবিরাজ-গোস্বামী এইখানেই নিত্যানন্দ প্রসঙ্গ শেষ করিয়াছেন। অন্যান্য গ্রন্থেও তাঁহার সংবাদ আর বড় একটা পাওয়া যায় না। ইতিপূর্বে কবিরাজ-গোস্বামী জানাইয়াছেন যে জীব-গোস্বামী মথুরা-যাত্রাকালে গৌড় হইতে নিত্যানন্দের আদেশ লইয়া যাত্রা করিয়াছিলেন। আর তাঁহার তিরোভাব সম্বন্ধে কেবল জয়ানন্দ জানাইয়াছেন যে অদ্বৈতপ্রভুর তিরোভাবের কয়েক মাস পূর্বেই তিনি লোকান্তরিত হন এবং 'ভক্তি-রত্নাকরে' লিখিত হইয়াছে যে শ্রীনিবাস দ্বিতীয়বার নীলাচল হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে অদ্বৈত-নিত্যানন্দের তিরোভাব-সংবাদ প্রাপ্ত হন। কিন্তু এই সমস্ত অনিশ্চয়াত্মক বিবরণ হইতে এতৎসম্পর্কে সঠিকভাবে কোনও কিছু বলা যাইতে পারে না।

নিত্যানন্দের সন্তান-সন্ততি কয়জন ছিলেন, সে সম্বন্ধে প্রাচীন গ্রন্থাকারগণ নীরব রহিয়াছেন। পরবর্তী-কালের গ্রন্থগুলি হইতে কেবল এইটুকু জানা যায়[১৫৮] যে তাঁহার কয়েকটি পুত্রের মৃত্যুর পর বীরভদ্র জন্মগ্রহণ করেন। পুত্র বীরভদ্র এবং কন্যা

(১৫৮) বীরচন্দ্র-জীবনীতে এই সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইবে।

গঙ্গাদেবীই জীবিত থাকিয়া ধর্মপ্রচারে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন এবং এই বিষয়ে তাঁহারা প্রসিদ্ধিলাভও করিয়াছিলেন।[১৫৯]

মহাপ্রভুর অপ্রকটের পরবর্তিকালীন নিত্যানন্দের গতিবিধি ও কর্মপদ্ধতির পরিচয় সম্বন্ধে বিশেষভাবে কোথাও বর্ণিত হয় নাই। তখন অদ্বৈতপ্রভুও জীবিত ছিলেন এবং নিত্যানন্দ যে কখনও কখনও অদ্বৈতের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিতেন তাহা কোন কোন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কিরূপ সম্বন্ধ ছিল সে বিষয়ে নানাবিধ প্রশ্নের অবকাশ থাকিয়া গিয়াছে। নিত্যানন্দের কার্যকলাপ লইয়া যে প্রশ্ন উঠিয়াছিল, হয়ত তাহাও ইহার মূলে ইন্ধন যোগাইয়াছ। অদ্বৈতাচার্য যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের মধ্যে কেবল বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন তাহা নহে। যে-বৃন্দাবনপ্রদেশকে স্বয়ং চৈতন্যমহাপ্রভু ভক্তিধর্মপ্রচারের সর্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্ররূপে নির্বাচিত করিয়াছিলেন, গৌরাঙ্গ-আবির্ভাবের বহু পূর্বেই সেই হৃতশ্রী পুণ্যভূমিতে গিয়া তথায় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ও এইভাবে তাহার মাহাত্ম্য ঘোষণার প্রথম কৃতিত্ব ছিল অদ্বৈতাচার্যেরই। যে-নামপ্রচার বা নাম-বিতরণ গৌরাঙ্গ-আবির্ভাবের একটি প্রধান ও লৌকিক কারণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে, তিনিই সর্বপ্রথম ভক্ত হরিদাসকে দিয়া সেই নাম-প্রচারের পথ প্রশস্ত করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, গৌরাঙ্গ-আবির্ভাবের পূর্বে তিনিই ছিলেন গৌড়দেশে ভক্তিধর্মের প্রথম প্রচারক ও প্রধান বাহক। মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন[১৬০] যে পূর্ববর্তী ব্রাহ্মণ প্রথা অনুযায়ী 'পিতৃশ্রাদ্ধের সময় কুশময় ব্রাহ্মণকেই ব্রাহ্মণের আসনে সন্নিবেশিত করিয়া পাত্রীয়ান্ন সমর্পণ করি'বার যে রীতি তৎকর্তৃক অনুসৃত হইয়াছিল, 'প্রেমভক্ত যবন হরিদাসকেই পিতৃশ্রাদ্ধের ব্রাহ্মণের আসনে নিমন্ত্রণ ও বরণ করিয়া······তাঁহাকেই পিতৃশ্রাদ্ধের পাত্রীয়ান্ন ভোজন করাই'বার ফলে সেই রীতি লঙ্ঘিত হওয়ায় 'অদ্বৈতাচার্যকেই সেই সময়ের আস্তিক সমাজে যথেষ্ট অপমান ও লাঞ্ছনা সহিতে হইয়াছিল। কিন্তু শেষে তাঁহারই জয় হইয়াছিল'। সুতরাং সমাজের মধ্যে বাস করিয়াও যে সংসারধর্মপালনকারী গৃহবাসী অদ্বৈতাচার্য সর্বপ্রথম, এমন কি সম্ভবত গৌরাঙ্গ-আবির্ভাবের পূর্বেও তাঁহার জাত্যাভিমানশূন্য সার্বজনীন উদার প্রেমধর্মের বীজ বপন করিয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু শুধু ইহাই নহে। সমগ্র বৈষ্ণবসমাজ তাঁহাকেই গৌরাঙ্গ-আবির্ভাবের মূল কারণ বলিয়া মনে করে এবং স্বয়ং চৈতন্যও মনে করিতেন যে তিনি কেবল গৌরাঙ্গ-আবির্ভাবের কারণমাত্র নহেন, তিনিই তাঁহাকে তাঁহার লৌকিক স্বরূপে পূজা ও আরাধনা করিবার প্রথম ও শেষ অধিকারী এবং 'পূজা নির্বাহ হৈলে পাছে' তাঁহাকে আপনার ইচ্ছামত 'বিসর্জন' করিবার

(১৫৯) চৈ. চন্দ্র.-গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে যে 'পুরুষোত্তম-সুত শিশু কৃষ্ণদাস দ্বাদশ দিনের হইলে' নিত্যানন্দ তাঁহাকে লইয়া গিয়া 'যত্ন করি পুত্রভাবে পালন করি'য়াছিলেন। (১৬০) বাঙলার বৈষ্ণব ধর্ম—পৃ. ৭৩-৭৪

অধিকার ছিল একমাত্র তাঁহারই। অদ্বৈত-জীবনী বর্ণনা প্রসঙ্গেও আমরা দেখিয়াছি যে গৌরাঙ্গপ্রভুকে আবিষ্কার এবং ভক্তবৃন্দ সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের মধ্যে তাঁহার স্বরূপ-ঘোষণা, তাঁহারই অমর কীর্তি। বিশ্বরূপ-রূপ যে স্তম্ভকে অবলম্বন করিয়া গৌরাঙ্গ-জীবন দাঁড়াইয়া রহিয়াছিল তিনিই একরকম ছিলেন সেই স্তম্ভের স্থপতি। গৌরাঙ্গের বাল্যজীবন গঠনেও তাঁহার প্রভাব ছিল অপরিমেয়। আবার চৈতন্য-সমসাময়িক কবিকুলের হৃদি-মধ্যে 'চৈতন্যচরিত লইয়া কাব্যরচনা'র যে ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা কোনমতেই বহিঃপ্রকাশের পথ খুঁজিয়া পাইতেছিল না, তিনিই সর্বপ্রথম[১৬১] নীলাচলে চৈতন্যকীর্তন আরম্ভ করিয়া সেই ইচ্ছাকে নির্বারিত করিয়াছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গসাহিত্যের এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতকে সম্ভাবনাময় করিয়া তুলিয়াছিলেন। এক কথায় মৌলিক চিন্তা, ভাবাবেগ-সমৃদ্ধি, অধ্যাত্মভাবনা, কর্মকুশলতা এবং বিদ্যা, বুদ্ধি, ভক্তি, শক্তি ও সর্বোপরি দূরদৃষ্টিতে, সারা গৌড়মণ্ডলের মধ্যে চৈতন্য ব্যতিরেকে সেকালে তৎসদৃশ আর একজন ব্যক্তিও ছিলেন না। সুতরাং নিত্যানন্দ সম্বন্ধে তাঁহার ব্যবহার যে সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যবোধক হইয়া উঠে তাহাতে সন্দেহ থাকে না।

যে-ঘটনা ও অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণববৃন্দ নিত্যানন্দকে প্রথম স্বীকৃত দান করিয়াছিলেন, সেই ঘটনা ও অনুষ্ঠানে বৈষ্ণব-গুরু অদ্বৈতাচার্য অনুপস্থিত ছিলেন। কিশোর যুবক গৌরাঙ্গ সেদিন যেভাবে নিত্যানন্দকে প্রতিষ্ঠা দান করেন ও অব্যবহিত পরেই এক বিরাট অস্বস্তি অনুভব করিয়া অদ্বৈতপ্রভুর সাহচর্যের জন্য যে ভাবে উৎকন্ঠিত ও অধীর হন, তাহা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। ইহার পর গৌরাঙ্গ যখন অদ্বৈতের নিকট 'নির্জনে' নিত্যানন্দ-সংবাদ দেওয়ার কথা বলিয়া রামাই-পণ্ডিতকে শান্তিপুরে পাঠাইয়া অদ্বৈতকে ডাকাইয়া আনিলেন তখন অদ্বৈত যে নিত্যানন্দকে কিভাবে বরণ করিয়া লইলেন, তাহার বিশদ বিবরণ বৃন্দাবনদাস লিপিবদ্ধ করেন নাই। তিনি কেবল বলিয়াছেন[১৬২] যে অদ্বৈতপ্রভু

> নিত্যানন্দে দেখিয়া ভ্রূকুটি করি হাসে ॥
> হাসি বোলে "ভাল হৈল আইলা নিতাই।
> এতদিন তোমার নাগালি নাহি পাই ॥
> যাইবা কোথায় আজি এড়িমু বান্ধিয়া।"
> ক্ষণে বোলে 'প্রভু' ক্ষণে বোলে 'মাতালিয়া' ॥
> অদ্বৈত চরিত্রে হাসে নিত্যানন্দ রায়।

এবং তাহার একটু পরেই

(১৬১) দ্র.—অদ্বৈতাচার্য (১৬২) চৈ. ভা.—২।৬, পৃ. ১৩১

যে কিছু কলহলীলা দেখহ দোঁহার।
সে সব অচিন্ত্য রঙ্গ—ঈশ্বর ব্যভার ॥……
যেন না বুঝি দোঁহার কলহপক্ষ ধরে।
এক বন্দে, আর নিন্দে, সেই জন মরে ॥

সুতরাং স্পষ্টরূপেই বুঝিতে পারা যায় যে প্রথম হইতেই অদ্বৈত ও নিত্যানন্দের মধ্যে একটি কলহ-সম্পর্ক ছিল এবং একেবারে প্রথম হইতেই সেই কলহ-সম্পর্ককে লীলা বা 'অচিন্ত্যরঙ্গ' বলিয়া লঘু করিবার একটি অতি-সচেতন প্রচেষ্টাও বৃন্দাবনের ছিল। কিন্তু এইরূপ সজ্ঞান প্রচেষ্টার কারণ কি? আর কেনই বা উক্ত লীলাবাদ গ্রহণাশক্ত ব্যক্তি-বৃন্দের মস্তকে লাথি মারিয়া শাস্তি দেওয়ার কামনা এমন উৎকট ও উগ্র হইয়াছে! বৃন্দাবন ছিলেন প্রকৃত ভক্ত। কিন্তু নিত্যানন্দ-ব্যাপারটি সম্বন্ধে তাঁহার অকপট ঘোষণাগুলিই যেন জোর করিয়া পাঠকের দৃষ্টিকে তাঁহার কী এক দুর্বলতার অভিমুখে টানিয়া লইয়া গিয়া তৎপ্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে এবং তাঁহার বিশ্বাসের মূলে আঘাত হানিতে থাকে। পাঠকবর্গ একথা না ভাবিয়া পারেন না—এত কৈফিয়ত কেন? তাঁহাদের ভাবিতেই হয় 'চৈতন্য-মঙ্গল'-গ্রন্থেও কেনই বা কেবল নিত্যানন্দ-মাহাত্ম্য বর্ণনার জন্য বিশেষভাবে কয়েকটি অধ্যায়ের[১৬৩] সংযোজনাসত্ত্বেও অসংখ্য স্থানে এইরূপ বিস্তৃত মন্তব্য বা ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় যথার্থই লিখিয়াছেন,[১৬৪] "চৈতন্যভাগবতে নিত্যানন্দকে এত বেশি প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে যে, এক এক স্থলে মনে হয় গৌরচন্দ্রমা মেঘাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছেন…কারণে অকারণে যথাস্থানে অযথাস্থানে সর্বত্রই নিত্যানন্দের কথা আসিয়াছে। প্রত্যেক পরিচ্ছেদের শেষে নিত্যানন্দের স্তব আছে। বৃন্দাবনদাস বলিতে চাহিয়াছেন—নিত্যানন্দকে বাদ দিলে গৌরচন্দ্র অপূর্ণ।…গৌড়ীয় আদর্শে তাহা সত্য হইতে পারে, ভারতীয় আদর্শে তাহা নয়। রাধাকৃষ্ণের মিলিত রূপের পাশে বলরামের স্থান নাই।" অথচ বৃন্দাবনদাস গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন প্রধানত এই বলরামকে দিয়াই। অবশ্য তিনি প্রথমেই অবতার বিশ্বম্ভরের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বলিয়া রাখিয়াছেন:

'আমার ভক্তের পূজা আমা হৈতে বড়।'

সুতরাং এতেক করিল আগে ভক্তের বন্দন।

কিন্তু 'চৈতন্যমঙ্গল'-গ্রন্থের প্রারম্ভেই তিনি যেরূপ ব্যস্ততা সহকারে 'বলরাম-রাসক্রীড়া'কে পৌরাণিক প্রমাণ বলে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন তাহাতে নিত্যানন্দ-বিবাহের যৌক্তিকতা-বর্ণনের প্রয়োজন আর কোথায়? উল্লেখযোগ্য যে এই গ্রন্থ পরে 'চৈতন্য-ভাগবত' নাম ধারণ করিয়াছিল।

(১৬৩) ২।১১, ২।১২, ৩।৫,৩।৬,৩।৭ [১।৬,২।৩,৪,১৩] (১৬৪) প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য—ৎে. ওঁ., পৃ. ১১৮; পৃ. ১৭০

ইহার আর একটি দিক আছে। অদ্বৈত-নিত্যানন্দ সম্পর্ক স্বীকার লইয়া সেকালেও যে দুইটি প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি গড়িয়া উঠিয়াছিল, এহা একটি অনস্বীকার্য ঘটনা। নবদ্বীপের প্রতি গৃহে কৃষ্ণনাম-প্রচারার্থ প্রেরিত নিত্যানন্দের কার্যকলাপ দেখিয়া হরিদাস বিস্ময়বিমূঢ় হইয়াছিলেন।[১৬৫] ভ্রমণকালে বৃথাই শিশুদিগকে তাড়া করিয়া যাওয়া, গোয়ালাদিগের দধি ও ঘৃত লইয়া পলায়ন করা, কুমারী দেখিলে " মোরে বিবাহিয়ে" [১৬৬] বলিয়া ছুটিয়া যাওয়া, পরের গাভীর দুগ্ধ দোহাইয়া পান করিয়া ফেলা—এই সমস্তই শুদ্ধাচারী হরিদাসকে আঘাত করিতেছিল। শেষে দস্যু মদ্যপ ও চরম অসচ্চরিত্র জগাই-মাধাইয়ের প্রতি নিত্যানন্দের অহেতুক করুণা, ও তাহা লইয়া গৌরাঙ্গ-অদ্বৈতকে পর্যন্ত গালাগালি দিতে দেখিয়া হরিদাস যখন অদ্বৈতপ্রভুর নিকট সমস্তই ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তখন অদ্বৈতপ্রভু হরিদাসকে সেই 'তিন-মাতোয়াল সঙ্গ' হইতে দূরে থাকিতে নির্দেশ দিয়া বলিয়াছিলেন যে নিত্যানন্দের উক্ত আচরণ বিচিত্র নহে—

> মদ্যপের উচিত—মদ্যপ সঙ্গ হয়ে ।।……
> নিত্যানন্দ করিব সকল মাতোয়াল।
> উহান চরিত্র আমি জানে ভালে ভাল ।।……
> বলিতে অদ্বৈত হইলেন ক্রোধাবেশ।……
> "গুবিব সকল চৈতন্যের কৃষ্ণ ভক্তি।
> কেমনে নাচয়ে গায় দেখোঁ তাঁর শক্তি ।।"

জগাই-মাধাই উদ্ধারের পর গঙ্গায় জলক্রীড়া কালে অদ্বৈতপ্রভু 'মহাক্রোধাবেশে' নিত্যানন্দকে বলিলেন :

> কোথা হইতে মদ্যপের হৈল উপস্থান ।।
> শ্রীনিবাস পণ্ডিতের মূলে জাতি নাঞি।
> কোথাকার অবধূতে আনি দিল ঠাঞি।……
> সংহারিব সকল আমার দোষ নাঞি।

(১৬৫) চৈ. ভা.—২।১৩ (১৬৬) বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন (চৈ. ভা. ২।৪, পৃ. ২৮) যে বালক-বিশ্বম্ভরের উৎপাত সহ্য করিতে না পারিয়া স্নানার্থিনী বালিকাবৃন্দ শচীমাতার নিকট বিশ্বম্ভর সম্বন্ধে নালিশ উত্থাপন করিয়াছিল—কেহ বলে,' মোরে চাহে বিভা করিবারে ।।' কিন্তু বিশ্বম্ভর তখন বালকমাত্র এবং যাঁহাদিগকে তিনি এইরূপ বলিয়াছিলেন, তাঁহারাও অল্পবয়স্কা বালিকামাত্র। এইরূপ আপত্তি জানাইলেও তাহারা নিজেরাই কিন্তু বিশ্বম্ভরকে তাঁহার পিতৃরোষ হইতে রক্ষা করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন।

বৃন্দাবনদাস এ সমস্তকেই নিন্দাচ্ছলে 'নিত্যানন্দ-প্রতি স্তব' বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার তত্ত্ববর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে কোনও তথ্য থাকিয়া গিয়াছে কিনা, তাহা পরে দেখা যাইবে। আর একদিনও অদ্বৈতের সহিত নিত্যানন্দের বিশেষ সংযোগ ঘটিয়াছিল। বিশ্বম্ভর যেইদিন দ্বাররুদ্ধ করিয়া অদ্বৈতকে বিশ্বরূপ প্রদর্শন করেন, সেইদিন শেষের দিকে নিত্যানন্দও সেই স্থলে আসিয়া পড়েন। বিশ্বম্ভর চলিয়া গেলে দুইজনের মধ্যে বচসা সুরু হয়। বিশ্বম্ভর ও অদ্বৈতের মধ্যে অযাচিতভাবে নিত্যানন্দ আসিয়া পড়ায় অদ্বৈতপ্রভু তাঁহার প্রতি বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিলে নিত্যানন্দ বলিলেন [১৬৭]:

আরে বুড়ো বামনা তোমার ডর নাই।
আমি অবধূত-মত্ত ঠাকুরের ভাই॥
স্ত্রীয়ে পুত্রে গৃহে তুমি পরম সংসারী।
পরমহংসের পথে আমি অধিকারী॥

বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, যে-কবি স্বয়ং গৌরাঙ্গ কর্তৃক যোগেশ্বরারাধ্য নিত্যানন্দ-কৌপীন ভিক্ষার বর্ণনা দিয়াছেন এবং চৈতন্যমহাপ্রভু কর্তৃক নিত্যানন্দের যবনী-পাণিগ্রহণ ও শৌণ্ডিকালয়-গমনের সার্থকতা প্রতিপাদনের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন এবং 'ঠাকুরের ভাই' অবধূত নিত্যানন্দকে 'পরমহংস' বলিয়া আখ্যা দান করিয়াছেন, তিনিই কিন্তু অদ্বৈতপ্রভু-সম্বন্ধে জানাইতছেন:[১৬৮]

অদ্বৈতের প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।
যাঁর ভক্তি প্রসাদে অদ্বৈত সত্য ধন্য॥
জয় খড়্গ অদ্বৈতের যে চৈতন্যভক্তি।
যাহার প্রসাদে অদ্বৈতের সর্ব শক্তি॥
সাধুলোকে অদ্বৈতের এ মহিমা ঘোষে।
কেহো ইহা অদ্বৈতের নিন্দা হেন বাসে॥

যাহাহউক, নিত্যানন্দের উপরোক্ত উক্তির পর অদ্বৈতপ্রভু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন:

মৎস খায় মাংস খায় কেমত সন্ন্যাসী।...
খাইমু শুবিমু সংহারিমু সব থাক॥
তারে বলি সন্ন্যাসী যে কিছু নাহি চায়।
বোলয়ে সন্ন্যাসী দিনে তিনবার খায়॥......

নিত্যানন্দ যদি নিজেকে 'ঠাকুরের ভাই অর্থাৎ বলদেবের অবতার বলিয়া ঘোষণা

(১৬৭) ঐ—২।২৪ (১৬৮) ঐ—৩।৫, পৃ. ৩০৮

করিয়া থাকেন, তাহা হইলে এইরূপ উক্তি যে গুরুতর তাহাতে সন্দেহ নাই। মহাপ্রভু কাশীতে সনাতনকে শিক্ষাদান করিবার সময় জানাইয়াছিলেন ১৬৯ :

অবতার নাহি কহে আমি অবতার।
মুনি সব জানি করে লক্ষণ বিচার॥

কিন্তু নিত্যানন্দ নিজেকে 'অবধূত-মত্ত ঠাকুরের ভাই' বলিয়াছিলেন,—কবি বৃন্দাবনদাসের এইরূপ কল্পনা সম্ভবত আবেগ-প্রসূত। অন্যের সম্বন্ধেও কবির এই প্রকার বর্ণনা ভাবাবেগ ছাড়া আর কিছু হইতে পারে না। কিন্তু যিনি অবধূত-জীবন ও পরমহংসের পথের বর্ণনায় এমনি প্রশংসামুখর ও ইহাকেই অনৈহিক সম্পদের পন্থা বলিয়া নির্ণয় করিয়া থাকেন, তাঁহার পক্ষে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত মত ও পথকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য কোথাও 'বাল্যভাবে'র দোহাই দেওয়া, এবং কোথাও বা 'লীলা ও অচিন্ত্যরঙ্গ ঈশ্বর ব্যভার'-রূপ উক্তি করা ছাড়া উপায়ান্তর থাকে না। সুতরাং নররূপী ঈশ্বরের ইচ্ছার নিশ্চয় কোন গূঢ়ার্থ থাকিয়া থাকিবে, অল্পজ্ঞানী মানুষের সকল প্রশ্নই এখানে অবান্তর এবং অনুচিত।

এ জগৎ যে ইচ্ছাশক্তির খেলামাত্র, ইহা হয়ত সমস্ত যোগী এবং সাধকেরই একটি সুচিন্তিত ও পরীক্ষিত সত্য। সুতরাং ইচ্ছার প্রভাবে সমস্তই সম্ভব হয়, ইহাও হয়ত সত্য কথা। ইহার দ্বারা হয়ত সূর্য-চন্দ্রের গতিপথকেও পরিবর্তিত করা যাইতে পারে। কিন্তু দেহধারী মানব কর্তৃক জাগতিক নিয়মের পরিবর্তনে জাগতিক কোনও সার্থকতা নিষ্প্রয়োজন, ইহা অশ্রদ্ধেয়। সাধক সম্প্রদায় বা সাধারণ জনসমাজ যাহা অন্তরের সহিত মানিয়া লইতে পারে না, মানুষের শুদ্ধ বা মুক্ত চিন্তা যাহা গ্রহণ করিতে পারে না, ভবিষ্যতের সমাজ-জীবনে যাহার কোনও সুফল প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে না, কেবল 'অচিন্ত্যরঙ্গ' বলিয়া তাহার ব্যাখ্যা করা চলে না। মানুষের যুক্তিকে এমনিভাবে সম্পূর্ণরূপে পঙ্গু করিয়া দিয়া হয়ত কেহ কেহ ভক্তি-ধর্মের প্রাধান্য স্থাপন করিতে চাহেন। কিন্তু অনুভূতি বা ভাবাবেগ এবং চিন্তা বা বিচারবুদ্ধি উভয়ই মানুষের স্বভাবজ বৃত্তি। একটিকে বিধাতার দান বলিয়া স্বীকার করিলে অন্যটিকেও সম-মর্যাদা দান করিতে হয়। তাই স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন,১৭০ "পূর্ণ ভক্তির উপরে প্রকৃত জ্ঞান অযাচিত হইলেও আসিবেই আসিবে। আর পূর্ণ জ্ঞানের সহিত প্রকৃত ভক্তিও অভেদ—এ সত্য তাঁহারা যেন ভুলিয়া না যান।" আবার 'ভাবে কিনা করে?' বলিয়া সমস্তাকে লঘু করার চেষ্টা চলিতে পারে১৭১ এবং 'মুদ্রা বিশেষ' বলিয়া নিত্যানন্দ-ভোজ্য মৎস্য-মাংসের ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে, কিংবা তাঁহার দুইটি বিবাহের পশ্চাতে দ্বাপরের সহিত কলির সম্বন্ধ-রক্ষার্থে বলরাম-পত্নী রেবতী

(১৬৯) চৈ. চ.—২।২০, পৃ. ২২৯ (১৭০) ভক্তিযোগ (১৮শ. সং.), পৃ. ৪ (১৭১) শ্রীবাস চরিত—পৃ. ১৬৩

ও বারুণী সম্বন্ধীয় একটি পরিকল্পনা[১৭২] জুড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে, কিংবা পাণ্ডিত্য বলে একজনের সমূহ লোক-বিগর্হিত কর্মকেই শাস্ত্রানুমোদিত বলিয়া প্রমাণ করা যাইতে পারে; কিন্তু তত্ত্বের সহিত তথ্যের কোনও সদ্ভাব থাকে না, ইহা মনুষ্য জীবনের মধ্যে অদ্ভুত ও অসম্ভব বোধ করিয়াই তত্ত্ববেত্তাকেও শেষ পর্যন্ত পুনঃ পুনঃ চৈতন্যাদেশের দোহাই পাড়িতে হইয়াছে। নিত্যানন্দ যখন সবেমাত্র নবদ্বীপে আসিয়াছেন, যখন তাঁহার মাহাত্ম্য বা মহৎ কর্মের বিন্দুমাত্র পরিচয়ও পাওয়া যায় নাই, বরঞ্চ তাঁহার আচার ও নীতিবিগর্হিত কর্মগুলি সকলের নিকটই দৃষ্টিকটু হইয়া উঠায় গৌরাঙ্গপ্রভুকেও হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছিল, ঠিক সেই সময়ে নিত্যানন্দ যদি কখনও মদ্যাদি ধরিয়া শ্রীবাসের 'জাতি প্রাণ ধন' নাশ করেন তাহা হইলেও যে তাঁহার উপর শ্রীবাসের পূর্ণ বিশ্বাস থাকা উচিত, সে তো গৌরাঙ্গেরই প্রীত্যর্থে! শ্রীবাস-পত্নী মালিনীর সহিতও নিত্যানন্দের ব্যবহার নিশ্চয়ই দৃষ্টিকটু হইবে, সুতরাং মালিনী যাহাতে সেই সমস্ত 'অচিন্ত্যশক্তি'র কথা বাহিরে প্রকাশ করিয়া না দেন তজ্জন্য স্বয়ং গৌরাঙ্গপ্রভুকেই নিবারণ করিয়া দিতে হইবে![১৭৩] আবার রাঘব-পণ্ডিতের গৃহে নিত্যানন্দের কর্ম পদ্ধতি লইয়া বহুবিধ আপত্তিজনক কথা উঠিবে, সুতরাং তাঁহাকেও চৈতন্যমহাপ্রভুর 'রহস্যময় গোপ্য' কথা বলিয়া দিতে হইবে—যেন রাঘব 'মহাযোগেশ্বরেরো দুর্লভ' নিত্যানন্দের কর্মবিধিকে চৈতন্য-কর্ম বলিয়াই মনে করেন।[১৭৪] অর্থাৎ এক চৈতন্য-আজ্ঞার দোহাই দিয়াই সকলের সকল প্রশ্নকে স্তব্ধ করিতে হইয়াছে। সুতরাং পূর্বোক্ত কথাগুলির মধ্যে তথ্যগত সত্য যদি কিছুমাত্রও থাকিয়া থাকে, তাহা হইলেও বলা চলে যে অদ্বৈতপ্রভুর সহিত নিত্যানন্দের সম্বন্ধটি মধুর ছিল না এবং 'চৈতন্য-চন্দ্রোদয়কৌমুদী'তে যে লিখিত হইয়াছে[১৭৫] নবদ্বীপে অদ্বৈতপ্রভুর অনুপস্থিতির জন্য 'সে কারণে আইল ব্যাপক নিত্যানন্দ'—সেই উক্তির মধ্যেও হয়ত সত্য নিহিত আছে।

আশ্চর্যের বিষয়, গ্রন্থকারগণ উভয়ের সম্বন্ধ দেখাইয়াছেন প্রায়শই তাঁহাদের একত্র স্নান ও ভোজন প্রসঙ্গে। ক্ষুৎকাতর[১৭৬] ও ভোজনবিলাসী নিত্যানন্দের ভোজনপটুত্ব লইয়া অদ্বৈতাচার্য বার বার পরিহাস করিয়াছেন। নিত্যানন্দও বার বার তাহার উত্তর দিয়াছেন এবং উভয়ের মধ্যে বাগ্‌বিনিময় ঘটিয়াছে। নিত্যানন্দ ভোজনপ্রিয় ছিলেন এবং একমাত্র তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই ভোজন ও বিশেষ করিয়া জলকেলি-কালে অদ্বৈতপ্রভু যে বাক্যবাণ নিক্ষেপ করিতেন তাহা যেন এক এক সময় পরিহাসের মাত্রাকে ছাড়াইয়া তীব্র হইয়া উঠিত। মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পরে শান্তিপুরে অদ্বৈতগৃহে ভোজন-কালে সপ্তসপ্ততিবর্ষবয়স্ক (?) বৃদ্ধের সহিত সপ্তত্রিংশৎবর্ষ-বয়স্ক (?) যুবকের ভোজন-সম্বন্ধীয়

---

(১৭২) নিত্যানন্দচরিত—পৃ. ২৩৩ (১৭৩) চৈ. ভা.—২।১১, পৃ. ১৬১ (১৭৪) চৈ. ভা.—৩।৫, পৃ. ৩০০ (১৭৫) ২য়. অঙ্ক, . পৃ৫৫ (১৭৬) ভু., চৈ. চ.—৩।১২, পৃ. ৩৪১ ; মু. বি.—পৃ. ২৩৯

যে কথাবার্তা চলিয়াছিল, তাহার রীতি দেখিয়া মনে হয় না যে তাহার মধ্যে কোন বাস্তব সত্য ছিল না।[১৭৭] 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র মত 'অদ্বৈতপ্রকাশে'ও এই বিষয়ে সরস বর্ণনা আছে[১৭৮], এবং বর্ণনার মধ্যে কৃষ্ণদাস-কবিরাজের মত পরিহাসরসিকতার ভাবটি ফুটাইয়া তুলাও গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু তাঁহার বর্ণনায় দেখা যায় যে শেষে মহাপ্রভু যখন মধ্যস্থ হইয়া বলিলেন :

দোঁহার তুলনা হৈব তোজনের তুলে ॥

তখন শুনি মোর প্রভু কহে শুদ্ধ ভক্তি ভাবে।

একমাত্র তুহু পরিমাণশূন্য ভবে ॥

তোমাতে অনন্ত জগতের মান হয়।

অন্ত তৌল যন্ত্রের কাজ না দেখি হেথায় ॥

অদ্বৈত-হৃদয়ে নিত্যানন্দের স্থান কোথায় ছিল, 'অদ্বৈতপ্রকা'শ-কারের বর্ণনা (বা ধারণা) হইতে তাহার পরিচয় মিলিতে পারে। রচনাকালে কবির উদ্দেশ্যকে অতিক্রম করিয়া সত্য অনেক সময় আপনার পথ করিয়া লয়। বৃন্দাবন-কৃষ্ণদাস হইতে আরম্ভ করিয়া জয়ানন্দ-বলরামদাস পর্যন্ত সকল কবি সম্বন্ধেই একই কথা প্রযোজ্য হইতে পারে। জয়ানন্দ লিখিয়াছেন[১৭৯] যে সন্ন্যাস-গ্রহণকালে মহাপ্রভু সশ্রদ্ধচিত্তে তাঁহার পূর্ব-জীবনের সমস্ত কিছু বিসর্জন দিলেন।

নবদ্বীপে শচী বিষ্ণুপ্রিয়া সমর্পিল।

আচার্য গোসাঞির বিরোধ সঙ্গোপে কহিল ॥

মহাপ্রভু কি বলিয়াছিলেন, তাহা অন্যস্থলে বৃন্দাবনাদির অনুমানের মত জয়ানন্দেরও অনুমান মাত্র। কিন্তু 'আচার্য গোসাঞি'র বিরোধ সম্বন্ধে জয়ানন্দ যে নিঃসন্দেহ ছিলেন, সে বিষয়ে সংশয় নাই। বৃন্দাবনদাসের 'বৈষ্ণববন্দনা'য় গৌরীদাস-পণ্ডিত সম্বন্ধে বলা হইয়াছে[১৮০] যে একবার

প্রভুর আজ্ঞা শিরে ধরি গিয়া শান্তিপুর।

যে লইল উৎকলেতে আচার্য ঠাকুর ॥

নিত্যানন্দ-শিষ্য গৌরীদাসের এই প্রকার দৌত্যের কারণ সম্বন্ধেও প্রশ্ন উঠিতে পারে।

বলরাম- বা নিত্যানন্দ-দাস ছিলেন নিত্যানন্দপ্রভুর একজন সমর্থক। তাঁহার বর্ণনায় দেখা যায় যে শ্রীনিবাস শান্তিপুরে অদ্বৈতপত্নী সীতাদেবীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে সীতামাতা অনুরুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন[১৮১] :

জগাই মাধাই দুই উদ্ধারের কালে।

ক্রোধ করি গোসাঞি (অদ্বৈত) হরিদাস প্রতি বলে ॥

---

(১৭৭) চৈ. চ.—২।৩, পৃ. ৯৬-৯৭ (১৭৮) ১৩শ. অ., পৃ. ৬২ (১৭৯) স. খ., ৯০।১৫-১৬ (১৮০) পৃ. ৪ ; দ্র.—গৌরীদাস (১৮১) প্রে. বি.—৪র্থ. বি., পৃ. ৪৫-৪৬

যদি মোরে প্রেমযোগ না দেয় গোসাঞি।
শুষিব সকল প্রেম মোর দোষ নাই ॥
নিত্যানন্দ ক্রোধ করি বাড়ীতে আইলা।

এবং দুঃখ বেদনায় ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত অদ্বৈতপ্রভু মহাপ্রভুর নিকট

জগদানন্দ দ্বারে তর্জা লিখি পাঠাইলা ॥
সেইদিন হৈতে প্রভুর ক্রোধ উপজিল।
নিত্যানন্দ সঙ্গী রামাই সুন্দরাদি দিল ॥
কামদেব নাগর দিলা মোর ঠাকুরেরে।

অদ্বৈতপ্রভুর নিকট মহাপ্রভু তাঁহার প্রেম-ভাণ্ডার উজাড় করিয়াছিলেন। তৎসত্ত্বেও মহাপ্রভু জগাই-মাধাইকে প্রেমদান করিলে অদ্বৈতপ্রভু নিত্যানন্দের প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন কেন, বুঝিয়া উঠা শক্ত। এই সম্পর্কে বৃন্দাবনদাস বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন। কিন্তু সেই স্থলে তিনি কোথাও অদ্বৈতের প্রেমযোগপ্রাপ্তির বাসনার কথা উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু অদ্বৈতপ্রভু যে ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, ইহা 'প্রেমবিলাসে'র বর্ণনায় সুস্পষ্ট। সুতরাং 'শুষিব সকল চৈতন্যের কৃষ্ণভক্তি' বা 'সংহারিব সকল আমার দোষ নাঞি,' ইত্যাদি উক্তি যে নিন্দাচ্ছলে স্তুতি নহে, তাহা বোধ হয় বলা চলে। যদি তাহাই হইত, তাহাহইলে মহাপ্রভুর নিকট তর্জা লিখিয়া অভিযোগ করা এবং মহাপ্রভুরও ক্রুদ্ধ হইয়া উভয়ের জন্য পৃথক পৃথক অনুচর প্রেরণ করা কখনও সম্ভবপর হইত না। অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় এই যে 'বৈষ্ণবদিগ্‌দর্শনী'-গ্রন্থানুযায়ী খড়দহ-নিবাসী কামদেব-পণ্ডিতই নিত্যানন্দকে খড়দহে লইয়া গিয়াছিলেন এবং পরেও তদ্বংশীয় রামেশ্বর-মুখোপাধ্যায়ের সহিত নিত্যানন্দের প্রপৌত্রী ত্রিপুরাসুন্দরীর শুভ পরিণয় ঘটিয়াছিল।[১৮২] আবার মহাপ্রভু-প্রেরিত কামদেব-নাগরাদি ভক্ত যে অদ্বৈতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করায় পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন, তাহাও একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা[১৮৩] এবং স্বয়ং অদ্বৈতপ্রভুর তথা মহাপ্রভুর আদেশ অমান্য করিবার এই অভিপ্রায় প্ররোচনামূলক কিনা, তাহা জানা যায় না। কিন্তু এই ঘটনা বিবৃত করিতে গিয়া অদ্বৈতপত্নী সীতাদেবীকেও দুঃখ ও ক্ষোভ সহকারে বলিতে হইয়াছে[১৮৪]:

নাগরের মুখ আমি আর না দেখিল ॥......
সব পুত্র লৈল না লৈল অচ্যুতানন্দ।
গৌড়ে আসি প্রেমে ভাসাইল নিত্যানন্দ ॥
নাগরেরে গোসাঞি নিষেধ করিতে নারিল।
তে কারণে এইমত বিরুদ্ধ হইল ॥

কিন্তু সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য, উপরোক্ত প্রসঙ্গে অদ্বৈতপ্রভুর তর্জা-প্রেরণ। 'প্রেমবিলাস

(১৮২) পৃ. ২৪, ১০৮ (১৮৩) দ্র.—সীতাদেবী (১৮৪) প্রে. বি.—৪র্থ. বি., পৃ. ৩৬

মতে জগদানন্দের মারফত তর্জাপ্রাপ্তির পরই মহাপ্রভুর মধ্যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। স্বয়ং মহাপ্রভুর এই ক্রোধ, বা সেই যুগেরই কবিকর্তৃক ইহার সম্ভাব্যতার অনুমানই তৎকালীন বৈষ্ণব সমাজের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আবার ইহাও একটি অতি আশ্চর্যের বিষয় যে নিত্যানন্দেরই সদৃশ মহাপ্রভুর একজন অতি অন্তরঙ্গ পার্ষদ্ নরহরি-সরকারের নামমাত্রও বৃন্দাবনদাস কোথাও উল্লেখ করেন নাই।

বৃন্দাবনের উক্তপ্রকার অনুল্লেখের কারণ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী মহাশয় জানাইতেছেন[১৮৫], "নরহরি নদীয়ানাগরী-ভাবের প্রবর্তক। বৃন্দাবনদাস স্পষ্ট এই নদীয়ানাগরী-ভাবের বিরোধী।" কিন্তু গিরিজাবাবু নিজেই বৃন্দাবন কর্তৃক গদাধর-পণ্ডিতের উল্লেখের কথা বলিয়া উক্তপ্রকার যুক্তিকে খণ্ডন করিয়াছেন। তাহার পর তিনি বলিতেছেন, "অন্য গুরুতর কারণ থাকা সম্ভব, তবে তাহাও অনুমান মাত্র। প্রথম, কোন কারণে শ্রীপাদ নিত্যানন্দের সহিত নরহরির বিরোধ ছিল।" এই স্থলে গিরিজাবাবু তাঁহার গ্রন্থমধ্যে এই বিরোধের কারণ সম্বন্ধে কিছুই না বলিয়া পরক্ষণেই বলিতেছেন: "২য়, যদি বৃন্দাবনদাসের অলৌকিক জন্মের জন্য নরহরি শ্রীপাদ নিত্যানন্দের প্রতি কোন কুৎসিত ইঙ্গিত করিয়া থাকেন। কেন না নিত্যানন্দ শ্রীবাসের বাড়ীতে থাকাকালেই নিমাই নারায়ণীকে ভোজনাবশেষ দেন।" এই অনুমান ভিত্তিহীন না হইতেও পারে; কিন্তু নরহরিকে পুরোভাগে ধরিয়াই যে উক্তপ্রকার ইঙ্গিতকারীর দলকে আত্মগোপনের সুযোগ করিয়া দিতে হইবে, তাহা অসংগত। নরহরি যে নিত্যানন্দের প্রতি কোনও প্রকার কুৎসিত ইঙ্গিত করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ নাই। নিত্যানন্দ সম্বন্ধে প্রকাশ্যে যদি কেহ কিছু কটূক্তি প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি অদ্বৈতাচার্য। অদ্বৈতের বিরুদ্ধে লেখনীধারণের ক্ষমতা বৃন্দাবনের ছিল না। গিরিজাবাবুও তাঁহার গ্রন্থমধ্যে (পৃ. ১৬২) বলিয়াছেন, "অদ্বৈত নিত্যানন্দকে সর্বদাই মাতালিয়া বলিতেন। রহস্যও আছে, আবার কিছুটা সত্যও থাকিতে পারে।"

নরহরি ছিলেন গদাধর-পণ্ডিতের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। গদাধর গৌরাঙ্গের বামপার্শ্বে এবং নরহরি তাঁহার দক্ষিণে থাকিয়া তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের শ্রেষ্ঠ সহায়ক ও সঙ্গী-রূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। কিন্তু নিত্যানন্দ নবদ্বীপে আসিয়া নরহরির সেই স্থান অধিকার করিয়া লইবার পর মুহূর্ত হইতেই গৌরাঙ্গের অন্তরঙ্গলীলাসঙ্গী একনিষ্ঠ ভক্ত নরহরি তাঁহার বহুবাঞ্ছিত স্থানটি নীরবে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র সরিয়া দাঁড়ান। বৃন্দাবনদাস তাঁহার 'চৈতন্যভাগবতে' তখন হইতেই নিত্যানন্দকে গদাধরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত

(১৮৫) বাংলা চরিত গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য—পৃ. ১২১-২২

করিয়াছেন। সেই বর্ণনায় দেখা যায়, তখন হইতেই নরহরির কর্মগুলি নিত্যানন্দ কর্তৃক অনুষ্ঠিত হইতেছে। নরহরির জন্য নির্দিষ্ট স্থানটি নিত্যানন্দকে দিতে গিয়া বৃন্দাবনদাস সম্ভবত গদাধরের সহিত নিত্যানন্দের সম্বন্ধটিকে যথাসম্ভব নিবিড় করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন এবং সেইজন্যই বোধকরি গৌরাঙ্গের সন্ন্যাসগ্রহণকালীন সঙ্গীদিগের মধ্যেও নিত্যানন্দের সহিত গদাধরের নামও একত্রিত হইয়াছে।[১৮৬]

বৃন্দাবনদাস অবশ্য সম্যগ্‌ভাবেই অবগত ছিলেন যে গৌরাঙ্গলীলা হইতে নরহরিকে বাদ দেওয়ার প্রচেষ্টা অবাস্তব। সেইজন্য তিনি 'চৈতন্যভাগবতে' তাঁহার কথা এইভাবে উল্লেখ করিয়াছেন[১৮৭]:

বাম দিকে গদাধর তাম্বূল যোগায়।
চারিদিকে ভক্তগণ চামর ঢুলায়॥
অথবা কোন কোন ভাগ্যবান চামর ঢুলায়।[১৮৮]

বৃন্দাবনদাসের এই প্রকার উল্লেখের কারণ যতই নিগূঢ় হউক না কেন, ইহা অভিসন্ধি-মূলক এবং অশ্রদ্ধেয়। আশ্চর্যের বিষয়, নরহরির সহিত তাঁহার পরম ভক্ত-ভ্রাতা মুকুন্দদাস এবং ভ্রাতুষ্পুত্র গৌরাঙ্গপ্রিয় রঘুনন্দন এবং শ্রীখণ্ডের অন্যান্য সমস্ত চৈতন্যভক্ত-বৈষ্ণবও বৃন্দাবন কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছেন। এমন কি 'নিত্যানন্দ-বংশমালা'[১৮৯] গ্রন্থের লেখক যদি এই বৃন্দাবনদাস হইয়া থাকেন তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে ইনিই শূদ্র-নরহরি ও -রঘুনন্দনের নিকট যথাক্রমে ব্রাহ্মণ-শ্রীনিবাস-আচার্য ও তৎপুত্র গতিগোবিন্দের দীক্ষাগ্রহণের অবৈধতার প্রসঙ্গও উত্থাপন করিয়াছেন। অথচ যে-বীরচন্দ্র শূদ্র-রঘুনন্দনের নিকট দীক্ষাগ্রহণেচ্ছু গতি-গোবিন্দকে চাবুক মারিয়া তদ্বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিতেছেন, নিত্যানন্দ-পুত্র সেই বীরচন্দ্রই শূদ্র-নরোত্তমের কৃষ্ণদীক্ষায় দ্বিজত্বলাভের অধিকারকে মহতীসভার সম্মুখে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।[১৯০] কিন্তু 'চৈতন্যভাগবতে'র মধ্যে ভক্তোত্তম ও আজন্ম-ব্রহ্মচারী নরহরির নামের এই ইচ্ছাকৃত অনুল্লেখ প্রকারান্তরে একদিকে যেমন সরকার-ঠাকুরের যোগ্যতা ও শক্তিমত্তার পরিচয় দান করিয়াছে, অন্যদিকে তাহা তেমনি, সম্ভবত কবির অজ্ঞাতসারেই, যেন ভোগবিলাসী ও সংসারাশ্রমী নিত্যানন্দের একটি প্রতিদ্বন্দ্বী-স্বরূপকে উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছে। বস্তুত, নরহরির প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করাতো দূরের কথা, অন্যান্য গ্রন্থকার তাঁহার বিপুল সম্মানের মর্যাদা রক্ষা করিয়াছেন।[১৯১]

নিত্যানন্দ প্রসঙ্গে অদ্বৈতপ্রভু তর্জা বা হেঁয়ালি করিয়া কথা বলিতেন কেন তাহাও

(১৮৬) দ্র.—নরহরি-সরকার ও দ্বারপাল-গোবিন্দ (১৮৭) ২।২২, পৃ. ২০৯ ; দ্র.—শ্রীবাসচরিত—পৃ. ১১১, (১৮৮) দ্র.—চৈ. ম. (লো.), ভূমিকা, পৃ. ।।৶০ (১৮৯) নি. বি.—পৃ. ৩৫-৩৬ ; নি. ব.—পৃ. ৭৭ (১৯০) প্রে. বি.—১৯শ. বি., পৃ. ৩৩৯ (১৯১) মু. বি.—(পৃ.৪৬), ইত্যাদি

বিস্ময়ের বিষয়। কিন্তু জগদানন্দের মারফত তিনি যে মহাপ্রভুর নিকট তর্জা প্রেরণ করেন, তাহা একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা। তর্জার ভাষা ছিল[১৯২] :

বাউলকে কহিও লোকে হইল আউল।
বাউলেরে কহিও হাটে না বিকায় চাউল॥
বাউলকে কহিও কাজে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল॥

'অমিয় নিমাই চরিতে'র গ্রন্থকার ইহার অর্থ করিয়াছিলেন (৫ম. খ., পৃ.২০৩-৪), "...লোকে চাউল পাইয়া আউল হইয়াছে, অর্থাৎ তাহাদের অভাব পূর্ণ হইয়াছে। সুতরাং আর চাউল বিক্রয় হইতেছে না।...লোকের গোলা পূর্ণ হইল। আর চাউল বিকাইতেছে না, লোকের ঘর পুরিয়া গিয়াছে।" কিন্তু 'লোকের গোলা' বা 'লোকের ঘর' যে তখন প্রেম-তণ্ডুলে পূর্ণ হইয়া যায় নাই, একথা বোধ করি অদ্বৈতপ্রভু অপেক্ষা আর কেহই ভাল করিয়া বুঝিতেন না। বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মধ্যে তখন যে বিভেদ-বহ্নি প্রধূমিত হইয়া উঠিতেছিল তাহা কেবল নিত্যানন্দ-জীবনী নহে, সীতাদেবী, অদ্বৈত, নরহরি-সরকার, লোচনদাস, বৃন্দাবনদাস প্রভৃতির জীবনী আলোচনা করিলেও সহজেই বুঝিতে পারা যায়। যাহাহউক, 'প্রেমবিলাসের চতুর্বিংশবিলাসে'র একস্থলে লিখিত হইয়াছে[১৯৩], যে অদ্বৈত-শিষ্য শঙ্কর জ্ঞানবাদ পরিত্যাগ না করায় ক্ষুদ্ধ অদ্বৈতপ্রভু তাঁহাকে বলিতেছেন :

তোর মতে লোক সভ হইবে আউল।

যতদূর সম্ভব এই স্থলের অদ্বৈতাভিপ্রেত 'আউল' কথাটির অর্থই উপরোক্ত তর্জার মধ্যে সুপ্রযুক্ত হইতে পারে। আমরা জানি যে একমাত্র এই তর্জার অর্থ-ব্যঞ্জনার মধ্যেই মহাপ্রভুর মৃত্যুরহস্য লুক্কায়িত ছিল। যে প্রসঙ্গে 'প্রেমবিলাস'-কার উক্ত তর্জার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে বিন্দুমাত্র সত্য লুক্কায়িত থাকিলে একটি অতি জটিল সমস্যার অন্তত আংশিক সমাধান হইয়া যায় যে হাজার হাজার বৎসরের অগণিত বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া বুদ্ধ ও যিশুর বাণী যেখানে সম্যক্-আচরিত না হইয়াও মানব-হৃদয়াকাশে ক্রমোজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে, সেইস্থলে বঙ্গ-ভারত সংস্কৃতির প্রাণপুরুষ শ্রীচৈতন্যের তেজোদৃপ্ত মহিমাবাণী কয়েকটি মাত্র দুর্বল হৃদয়কে অবলম্বন করিয়া কোনও প্রকারে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে কেন; 'ঈশ্বর ব্যভারে'র 'অচিন্ত্যরঙ্গ'রস-সিঞ্চনে স্বর্ণপ্রসূ বঙ্গভূমিতে কেনই বা কেবল 'গোপাল'গণেরই সৃষ্টি হইল, অথচ আর একজনও শান্ত-শীল বা কমল-রক্ষিত, শীলভদ্র বা দীপংকর, সনাতন- বা রূপ-গোস্বামীর সৃষ্টি হইল না! অব্যবহিত পরবর্তিকালের বীরচন্দ্র-প্রভুর কার্যকলাপও এই ধারণাকে দৃঢ় করিয়া দেয়। গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে অদ্বৈতাচার্যের কথাগুলির মর্মানুসন্ধান করিলে সকল ব্যাপারই স্পষ্ট হইয়া উঠে। একমাত্র

(১৯২) চৈ. চ.—৩।১৯, পৃ. ৩৬৯; অ. প্র.—২১ শ. অ., পৃ. ৯৪ (১৯৩) পৃ. ২৪০

অদ্বৈতাচার্য-গোসাঞি (দামোদর-পণ্ডিতের কথাও স্মরণীয়) ছাড়া সে যুগে গৌড়দেশে এমন আর একজনও ছিলেন না যিনি স্বয়ং গৌরাঙ্গ বা চৈতন্যের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অঙ্গুলি-নির্দেশ করিতে পারেন। বিশ্বম্ভর-জীবন নিয়ন্ত্রণেও অদ্বৈতপ্রভুর অনুভবযোগ্য অবদান ছিল।

অদ্বৈতপ্রভুর পক্ষে যাহা সম্ভব ছিল, বৃন্দাবনদাসাদি ব্যক্তির মধ্যে তাহার কণামাত্র প্রত্যাশা করাও বৃথা। বৃন্দাবনদাস পরম ভক্ত ছিলেন সন্দেহ নাই, তাঁহার সারল্যও অবিস্মরণীয়। কিন্তু বৃন্দাবন ছিলেন নিত্যানন্দেরই সৃষ্টি। তিনি তাঁহার মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং কিভাবে তিনি নিত্যানন্দের দ্বারা প্রভাবিত ও আদিষ্ট হইয়া 'চৈতন্যভাগবত' রচনা করিয়াছিলেন তাহার পরিচয় ইতিপূর্বে কিছু কিছু পাওয়া গিয়াছে। আশ্চর্যের বিষয়, ষোড়শ শতকের যে সমূহ কবি বাংলাভাষায় জীবনীগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরও প্রায় প্রত্যেকেই নিত্যানন্দপ্রভুর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। বৃন্দাবনদাসের পরেই কৃষ্ণদাস-কবিরাজের নাম করিতে হয়। এই কৃষ্ণদাস তাঁহার 'চৈতন্যচরিতামৃত'-গ্রন্থের 'নিত্যানন্দ-তত্ত্বনিরূপণ'-পরিচ্ছেদে নিত্যানন্দের সহিত আপনার নিবিড় সম্পর্কের বিবরণ দিয়াছেন। বাসুদেব-ঘোষও নিত্যানন্দ শাখাভুক্ত হইয়াছিলেন। আবার জয়ানন্দ স্পষ্টই বলিয়াছেন যে তাঁহার 'মা রোদনী ঋষি নিত্যানন্দের দাসী' ছিলেন এবং এই প্রসঙ্গে দ্বিতীয়-নিত্যানন্দের কল্পনা সম্ভবত কষ্টকল্পনা। আর 'প্রেমবিলাস'-রচয়িতা নিত্যানন্দদাসের দীক্ষাগুরুই ছিলেন নিত্যানন্দ-পত্নী জাহ্নবা! ঈশান-নাগরকে স্বীকৃতিদান করিলে বলিতে হয় যে তিনি অদ্বৈতপ্রভুর ভৃত্য ছিলেন ; কিন্তু তিনিও যে শেষের দিকে 'শ্রীপাদ নিত্যানন্দপ্রভুর মুখাব্জ নিঃসৃত লীলারসামৃত' পান করিয়া 'পূত' হইয়াছিলেন, তিনি নিজেই তাহার উল্লেখ করিয়াছেন।[১৯৪] একমাত্র কবি লোচনদাস ছিলেন নিত্যানন্দ-মণ্ডলের বহির্ভূত ব্যক্তি। শুনিতে পাওয়া যায়, তাঁহার গ্রন্থে নিত্যানন্দের যতটুক স্তুতি আসিয়াছে, তাহা কবির অনভিপ্রেতভাবে এবং স্বীয়গুরু নরহরির ঔদার্যবশত ও স্বয়ং বৃন্দাবনদাসের প্রভাবেই।[১৯৫] অবশ্য লোচনের গ্রন্থে বহুস্থলেই নিত্যানন্দের স্তুতি আছে এবং কবি তাঁহার পূর্বসূরী বৃন্দাবনেরও বন্দনা গাহিয়াছেন। এতগুলি অংশকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। অথচ বৃন্দাবন-স্তুতি বর্ণনায় 'চৈতন্যমঙ্গলে'র সূত্রখণ্ডে লোচন স্পষ্টই লিখিয়াছেন[১৯৬] :

শ্রীবৃন্দাবনদাস বান্ধব একচিতে।
জগত মোহিত যার ভাগবতগীতে ॥

লোচনের 'চৈতন্যমঙ্গল' (অন্তত তাহার সূত্র খণ্ড)-রচনার পূর্বে যে বৃন্দাবনের গ্রন্থখানি 'চৈতন্যভাগবত' নাম ধারণ করে নাই তাহা সর্বজনবিদিত। 'চৈতন্যভাগবত'-নাম অনেক পরে বৃন্দাবন-ভক্তবৃন্দের দ্বারা প্রদত্ত হইয়াছিল।[১৯৭] সুতরাং যতদূর মনে হয় এই সকল

(১৯৪) ১৩শ. অ., পৃ. ৬৬ (১৯৫) চৈ. ম. (লো.)—ভূমিকা (১৯৬) পৃ.৩ (১৯৭) দ্র.—বৃন্দাবনদাস

অংশ পরে স্বয়ং কবিরই এক বা একাধিকবারের যোজনা। ডা. বিমানবিহারী মজুমদার জানাইতেছেন যে[১৯৮] স্বয়ং রঘুনাথদাস-গোস্বামী তাঁহার 'মুক্তাচরিত্র', 'দানকেলিচিন্তামণি' ও 'স্তবাবলী'তে নিত্যানন্দপ্রভুর উল্লেখ করেন নাই এবং বৃন্দাবনদাসও তাঁহার 'চৈতন্যভাগবতে' ইচ্ছা করিয়া রঘুনাথদাসের নাম উল্লেখ করেন নাই। বৃন্দাবন অবশ্য রঘুনাথভট্ট, গোপালভট্ট ও লোকনাথ ভূগর্ভাদির নামও উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু তিনি যেস্থলে নিত্যানন্দের গৌড়লীলার পূর্ণ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, সেই স্থলে রঘুনাথদাসকে অবলম্বন করিয়া নিত্যানন্দের যে বিখ্যাত পুলিন-ভোজনলীলা, তাহার উল্লেখ করেন নাই কেন, তাহা সত্যই বিস্ময়ের বিষয়। কিংবা রঘুনাথও কেন নিত্যানন্দের নামোল্লেখ করিলেন না, তাহাও আশ্চর্যজনক ব্যাপার। ডা. মজুমদার তাঁহার গ্রন্থের অন্যত্র জানাইয়াছেন[১৯৯] যে রূপ-গোস্বামীও তাঁহার চৈতন্যাষ্টকগুলিতে স্বরূপ-অদ্বৈত-শ্রীবাসাদির নামোল্লেখ করা সত্ত্বেও নিত্যানন্দের কোনও উল্লেখ করেন নাই। অথচ মহাপ্রভু গৌড়সন্নিকটে রূপ-সনাতনের সহিত সাক্ষাৎ করিলে সেই সূত্রে নিত্যানন্দও তাঁহাদের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। সনাতন-গোস্বামী তাঁহার 'বৈষ্ণবতোষণী'র মঙ্গলাচরণে অদ্বৈতাদির সহিত নিত্যানন্দের নামোল্লেখ করিলেও রঘুনাথদাস ও রূপ-গোস্বামী কর্তৃক সর্বত্র (একমাত্র রূপের 'বৃহৎকৃষ্ণগণোদ্দেশ দীপিকা'র মঙ্গলাচরণের সন্দেহজনক উল্লেখ ছাড়া)এই অনুল্লেখ সন্দেহকে ঘনায়িত করিয়া তুলে।

নিত্যানন্দ-স্তুতির প্রকার সম্বন্ধে নিত্যানন্দ-গোষ্ঠীর বহির্ভূত পরবর্তিকালের অন্যান্য কবিদিগের বর্ণনাও প্রণিধানযোগ্য। 'মুরলীবিলাসে'[২০০] বলা হইয়াছে :

> শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যপ্রভু স্বয়ং ভগবান।
> ত্রিজগতে তাহা বিনা গুরু নাহি আন ॥

কিন্তু পরবর্তিযুগে নিত্যানন্দ-শাখার বিস্তৃতিও বড় একটা কম হয় নাই এবং সেই সমস্ত শাখার ভক্তবৃন্দও যথাবিধি কর্তব্যপালনে পরাঙ্‌মুখ হন নাই। তাঁহাদের সম্বন্ধে একটি কথা ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয় যে নিত্যানন্দের কর্মবিধিকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য স্বয়ং চৈতন্যমহাপ্রভুর কথাবার্তা ও কর্মবিধির পশ্চাতেও তাত্ত্বিক-ব্যাখ্যা জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে ; অথচ মহাপ্রভুর কর্মবিধিকে অনুসরণ করিয়া নিত্যানন্দ-কর্মপদ্ধতির বিচার করা তাঁহাদের দ্বারা আর কিছুতেই সম্ভব হইয়া উঠে নাই। আবার প্রাচীন বৈষ্ণবগ্রন্থ রচয়িতৃগণের মধ্যে স্ব স্ব মূলগুরুর সম্বন্ধে অভিপ্রায়ানুযায়ী মতবাদ ঘোষণাকারীদিগের সংখ্যাও অত্যল্প নহে। তাই যেস্থলে কেহ কেহ চৈতন্য ও অদ্বৈতকে এক শক্তি বলিয়া কল্পনা করেন এবং কেহ কেহ হয়ত গদাধর, নরহরি, রঘুনন্দন, বা, এমন কি অভিরামের মত ব্যক্তিকেও চৈতন্যের

---

(১৯৮) চৈ.উ.—পৃ.১১৬ (১৯৯) পৃ. ১৪২ (২০০) পৃ.৪২১

দ্বিতীয় স্বরূপ বলিয়া প্রচার করিতে চাহেন, কিংবা এমন কি শ্রীনিবাস, বীরভদ্র, রামচন্দ্র প্রভৃতিকেও চৈতন্যের পরবর্তী অবতার বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন, সেখানে বিশেষ করিয়া একজনকেই দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে শক্তির সুকৌশল প্রয়োগ এবং পুনঃ পুনঃ ঘোষণা ছাড়া 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।' অবশ্য তাহাতে কাজ হইয়াছিল। নিত্যানন্দের সুযোগ্য প্রাচীন শিষ্যবৃন্দের দৃঢ় অভিমতকে অতিক্রম করিয়া নিত্যানন্দেরই সমসাময়িক ঘটনাবলীর ঐতিহাসিকত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে যাওয়া পরে আর কাহারও পক্ষে সম্ভব হয় নাই। পরবর্তী-যুগ কেবল বৃহৎ-বৃত্ত উর্ণনাভতন্তু বয়ন করিয়া চলিয়াছে মাত্র।

ইহা একটি অতি সত্যকথা যে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দাঁড়াইয়া যোড়শ শতকের মধ্যভাগে বিচরণশীল ব্যক্তি বা দল বিশেষের গতিবিধি বা কর্মপদ্ধতির নিখুঁত হিসাব প্রস্তুত করিতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র। কিন্তু সেই কথা বিশেষভাবে স্মরণে থাকিলে বোধ করি নানাবিধ উদ্ভট কল্পনার উস্কানি বা তজ্জনিত জঞ্জাল-সৃষ্টির হাত হইতে উদ্ধার পাওয়া যাইতে পারে। পূর্ববর্তী আলোচনা হইতে অন্তত একটি জিনিস স্পষ্ট হইয়া উঠে যে মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে দুইটি বিবাহের আজ্ঞা দিয়াছিলেন, ইহাও যেমন অসত্য, তেমনি তিনি যে মূলত ধর্ম-প্রচারের উদ্দেশ্যেই তাঁহাকে গৌড়ে প্রেরণ করেন, তাহাও তেমনি অসত্য। আর এই শেষোক্ত বিষয় যদি সত্যও হইয়া থাকে তাহা হইলে ইহা বলা চলে যে উক্ত প্রকার মহদুদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত গৌড়ে-প্রেরিত নিত্যানন্দপ্রভুর ধর্ম-প্রচারার্থ কোন উল্লেখযোগ্য অবদানের হিসাব কোনও প্রাচীন গ্রন্থে প্রদত্ত হয় নাই। 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র 'নিত্যানন্দস্কন্ধশাখা'-বর্ণন পরিচ্ছেদে একটি বিরাট তালিকা দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু উহা কেবল দেখিতেই বিরাট। উহার মধ্যে নিত্যানন্দ-শিষ্য বা নিত্যানন্দ কর্তৃক নূতনভাবে অনুপ্রাণিত দুই-চারিজন খ্যাতনামা ব্যক্তিও আছেন কিনা সন্দেহ। স্বয়ং 'সর্বশাখাশ্রেষ্ঠ বীরভদ্র গোসাঞি'ও নিত্যানন্দ কর্তৃক দীক্ষিত হন নাই। নিত্যানন্দ-তিরোভাবের বেশ কিছুকাল পরে তিনি জাহ্নবা কর্তৃক দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তালিকামধ্যে যে জ্ঞানদাসের নাম উল্লেখিত হইয়াছে, তিনি যদি বিখ্যাত কবি জ্ঞানদাস হইয়া থাকেন, তাহাহইলে তাঁহার সহিত জাহ্নবাদেবীরই বিশেষ যোগ ছিল ; নিত্যানন্দের সহিত তাঁহার কোনও প্রকার সম্বন্ধের কথা কোথাও উল্লেখিত হয় নাই। গদাধরদাস, মাধব-ঘোষ, বাসু-ঘোষ, জগদীশ-পণ্ডিত, মহেশ-পণ্ডিত, রামানন্দ-বসু, গঙ্গাদাস-বিষ্ণুদাস-নন্দন, পুরন্দর-আচার্য, রঘুনাথ-বৈদ্য প্রভৃতি মূলস্কন্ধশাখাভুক্ত প্রসিদ্ধ ভক্তবৃন্দই নিত্যানন্দ-শাখায় অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন। এমনকি কালা-কৃষ্ণদাস, রামদাস-অভিরামাদি ভক্তবৃন্দও প্রথমে মূলস্কন্ধ-শাখাভুক্ত ব্যক্তি। গৌরীদাস, সদাশিব-কবিরাজ প্রভৃতি বিখ্যাত ভক্তও প্রথমে গৌরাঙ্গ-প্রভাব প্রাপ্ত হইয়া অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। আবার 'প্রেমবিলাসোক্ত' কৃষ্ণানন্দ-জীব-যদুনাথ কবিচন্দ্র প্রভৃতি ব্যক্তিও যে গৌরাঙ্গ-স্পর্শলাভ করিয়া ভক্তপদবাচ্য হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের জীবনী হইতে তাহাই প্রতিপন্ন হয়। নারায়ণ,

দেবানন্দ, পুরুষোত্তম প্রভৃতি আরও কতিপয় ভক্ত যে কোন্ শাখাভুক্ত বা কাঁহার দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিলেন, তাহা সঠিকভাবে নির্ণয় করা দুঃসাধ্য ; এবং বিহারী, সূর্য, মহীধর, শ্রীমন্ত, হরিহরানন্দ, বসন্ত, নবনী-হোড়, সনাতন, বিষ্ণাই-হাজরা প্রভৃতি পরিচয়হীন অখ্যাতনামা ভক্তের সম্বন্ধে যে কোন উক্তিই অনিশ্চয়াত্মক। উল্লেখযোগ্য যে উপরোক্ত ভক্তবৃন্দের নাম নিত্যানন্দশাখামধ্যে বর্ণিত হইলেও উঁহাদের মধ্যে মাধব-ঘোষ, বাসু-ঘোষ, গদাধর দাস, জগদীশ-পণ্ডিত, নন্দন, রামানন্দ-বসু প্রভৃতি গৌরাঙ্গের প্রাচীন ভক্ত, এবং শ্রীবাস, গঙ্গাদাস, দামোদর পণ্ডিত, বাসুদেব-দত্ত, মুরারি-গুপ্ত প্রভৃতি তাঁহার নবদ্বীপলীলা-পার্ষদবৃন্দের সহিত গৌড়ভ্রমণরত নিত্যানন্দের কোনও নিবিড় সংযোগ অব্যাহত ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না। আর তালিকাভুক্ত রামচন্দ্র- ও গোবিন্দ-কবিরাজাদি যে শ্রীনিবাস-শিষ্য ছিলেন এবং তাঁহারা কিছুতেই নিত্যানন্দ-শাখাভুক্ত হইতে পারেন না, তাহার প্রমাণের কোনও প্রয়োজন নাই।

নিত্যানন্দপ্রভুর তিরোভাব সম্বন্ধে বিভিন্ন গ্রন্থের বর্ণনা বিভিন্ন প্রকার। 'ভক্তিরত্নাকর'-মতে শ্রীনিবাস দ্বিতীয়বার নীলাচল হইতে ফিরিবার পথে নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত, উভয়ের অপ্রকট বার্তা শুনিয়াছিলেন। 'অনুরাগবল্লী'র মত অনেকটা একই প্রকার। 'প্রেমবিলাসের চতুর্বিংশবিলাসে' লিখিত হইয়াছে যে মহাপ্রভুর অপ্রকটের দুই বৎসর পরে নিত্যানন্দপ্রভু অপ্রকট হন। জয়ানন্দের গ্রন্থ হইতে এইটুকু জানা যায় যে অদ্বৈতপ্রভুর তিরোভাবের কয়েক মাস পূর্বে তাঁহার তিরোভাব ঘটে। 'প্রেমবিলাসে'র ঊনবিংশবিলাস হইতে মনে হয় যেন অদ্বৈতের পরেই নিত্যানন্দের অন্তর্ধান ঘটে। 'অদ্বৈতপ্রকাশ'-কার বলেন যে খড়দহে নিত্যানন্দের ইচ্ছামৃত্যুকালে অদ্বৈতপ্রভু সেইস্থানে উপস্থিত ছিলেন। 'নিত্যানন্দ বংশমালা'-গ্রন্থের রচয়িতা বৃন্দাবনদাস জানাইতেছেন যে মহাপ্রভুর অপ্রকটে মুহ্যমান নিত্যানন্দ একদিন তাঁহার দুই পত্নীকে লইয়া স্বীয় জন্মভূমি একচাকায় গিয়া বঙ্কিমদেবের মন্দিরে প্রবেশ করত বঙ্কিমদেবের দেহের সহিত মিশিয়া যান। 'মুরলিবিলাস'-মতে[২০১] বংশীবদনের পৌত্র রামচন্দ্রের প্রথম খড়দহ আগমনের পূর্বে নিত্যানন্দের তিরোভাব ঘটিয়াছে।

'চৈতন্যচরিতামৃত'-গ্রন্থে নিত্যানন্দের অনুগামী-বৃন্দের তালিকা নিম্নোক্ত রূপ :—

বীরচন্দ্র-গোসাঞি, রামদাস, গদাধরদাস, মাধব-ঘোষ, বাসুদেব-ঘোষ, মুরারি-চৈতন্যদাস রঘুনাথ-বৈদ্য-উপাধ্যায়, সুন্দরানন্দ, কমলাকর-পিপিলাই, সূর্যদাস-সরখেল, কৃষ্ণদাস-সরখেল, গৌরীদাস-পণ্ডিত, পুরন্দর-পণ্ডিত, পরমেশ্বর-দাস, জগদীশ-পণ্ডিত, ধনঞ্জয়-পণ্ডিত, মহেশ-পণ্ডিত, পুরুষোত্তম-পণ্ডিত, বলরাম-দাস, যদুনাথ-কবিচন্দ্র, কৃষ্ণদাস-দ্বিজবর, কালা-কৃষ্ণদাস, সদাশিব-কবিরাজ, পুরুষোত্তম-কবিরাজ, কানু-ঠাকুর, উদ্ধারণ-দত্ত, রঘুনাথ-পুরী বা

---

(২০১) পৃ. ৮৫

বৈষ্ণবানন্দ-আচার্য, বিষ্ণুদাস, নন্দন, গঙ্গাদাস, পরমানন্দ-উপাধ্যায়, শ্রীজীব-পণ্ডিত, পরমানন্দ-গুপ্ত, নারায়ণ, কৃষ্ণদাস, মনোহর দেবানন্দ, বিহারী, কৃষ্ণদাস, নকড়ি, মুকুন্দ, সূর্য, মাধব, শ্রীধর, রামানন্দ-বসু, জগন্নাথ, মহীধর, শ্রীমন্ত, গোকুলদাস, হরিহরানন্দ, শিবাই, নন্দাই, অবধূত-পরমানন্দ, বসন্ত, নবনী-হোড়, গোপাল, সনাতন, বিষ্ণাই-হাজরা, কৃষ্ণানন্দ, সুলোচন, কংসারি-সেন, রাম-সেন, রামচন্দ্র-কবিরাজ, গোবিন্দ-কবিরাজ, শ্রীরঙ্গ-কবিরাজ, মুকুন্দ-কবিরাজ, পীতাম্বর, মাধবাচার্য, দামোদরদাস, শঙ্কর, মুকুন্দ, জ্ঞানদাস, মনোহর, নর্তক-গোপাল, রামভদ্র, গৌরাঙ্গদাস, নৃসিংহ-চৈতন্যদাস, মীনকেতন-রামদাস, বৃন্দাবনদাস।

'চৈতন্যভাগবত'-গ্রন্থে 'চতুর্ভুজ-পণ্ডিত নন্দন গঙ্গাদাস' ও মহান্ত-আচার্যচন্দ্রের নামও দৃষ্ট হয়।

শ্রীবাস-পণ্ডিত

শ্রীবাস-পণ্ডিত তাঁহার পিতৃভূমি শ্রীহট্টেই ভূমিষ্ঠ হন।[১] তাঁহার পিতার নাম জানা যায় না। প্রেমবিলাসের সন্দিগ্ধ ত্রয়োদশবিলাসে তাঁহাকে জলধর-পণ্ডিত বলা হইয়াছে।[২] কিন্তু অন্য কোথাও ইহার সমর্থন নাই। এই গ্রন্থে আরও বলা হইয়াছে যে জলধরের পঞ্চপুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ নলিন-পণ্ডিতই বৃন্দাবনদাসের মাতা নারায়ণীর জনক ছিলেন। কিন্তু নলিনের কথাও অন্য কোথাও নাই। গৌরাঙ্গ-আবির্ভাবের বেশ কিছুকাল পরেই নারায়ণীর জন্ম হয়।[৩] সুতরাং প্রাচীন গ্রন্থকর্তৃগণ যেখানে গৌরাঙ্গ-আবির্ভাবকাল হইতেই শ্রীবাসাদি চারি ভ্রাতাকে তাঁহার সহিত সম্পর্কিত করিয়াছেন, সেখানে তাঁহারা তৎকালে জীবিত নলিন-পণ্ডিতের নামের উল্লেখমাত্র করিবেন না কেন, তাহা বুঝা যায় না। আবার স্বয়ং বৃন্দাবনদাসও কোথাও তাঁহার মাতামহের নামোল্লেখ করেন নাই। সুতরাং প্রেমবিলাসোক্ত জলধর বা নলিন-পণ্ডিতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সত্য মিথ্যা জানিবার কোন উপায় নাই। গ্রন্থমতে শ্রীবাসের অনুজ ছিলেন শ্রীরাম, শ্রীপতি ও শ্রীকান্ত; শ্রীকান্তের অন্য নাম শ্রীনিধি। নবদ্বীপ ও কুমারহট্ট উভয় স্থানেই তাঁহাদের বাসগৃহ থাকিলেও তাঁহারা বেশি সময় কাটাইতেন নবদ্বীপে। গ্রন্থের এই বিবরণগুলি কিন্তু অসত্য নহে।

বাল্যকালে শ্রীবাস অত্যন্ত দুর্দান্ত ও অসদাচারী ছিলেন। কিন্তু ষোড়শবর্ষবয়ঃক্রম-কালে[৪] তিনি স্থিরবুদ্ধি হন এবং তাঁহার মনে ভক্তিভাবের উদয় হয়। সেই সময় একদিন তিনি পরিভ্রমণ করিতে করিতে 'শ্রীমদ্ভাগবতের অধ্যাপক' দেবানন্দ-পণ্ডিতের নিকট আসিয়া সেই 'আজন্ম উদাসীন জ্ঞানবন্ত তপস্বী'র নিকট প্রহ্লাদচরিত্র পাঠ শ্রবণ করিতে থাকেন। কিন্তু পাঠনের মধ্যে ভক্তি-ব্যাখ্যা না থাকিলেও শ্রীবাসের উদ্ভিন্নপ্রেমাকুল চিত্ত তাহার মধ্যে ভক্তি কল্পনা করিয়া বিগলিত হইল এবং তিনি অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না। তখন অন্যান্য পড়ুয়াবৃন্দ ইহাকে এক উৎপাত ও 'জঞ্জাল' মনে করিয়া 'বাহিরে এড়িল নিঞা শ্রীবাসে টানিয়া।' দেবানন্দ-পণ্ডিত কিছুই বলিলেন না। শ্রীবাস অঙ্গনে পতিত হইয়া

(১) চৈ. ভা—১।২, পৃ. ১০ ; শ্রীবাস-চরিত্রের লেখক বলেন (পৃ. ২) যে ১৩৫০ ও ১৪০০ শকের মধ্যে শ্রীহট্টের ঢাকা-দক্ষিণ পরগণায় শ্রীবাসের জন্ম হয়। কিন্তু এই তথ্য কোথায় পাওয়া গেল তাহা গ্রন্থকার বলেন নাই। (২) পৃ. ২২০ (৩) চৈ. ভা.-এ (২।২, পৃ. ১১৩) আছে গৌরাঙ্গ চারি বৎসরের শিশু-নারায়ণীর মুখে হরিনাম প্রদান করেন। (৪) চৈ. না.—১।৭১-৭৫ ; চৈ. ভা.—২।২১, পৃ. ২০৭-৮ ; প্রে. বি.—২৩শ. বি., পৃ ২২১ ; চৈ. কৌ.—পৃ. ৩০, ৩২

প্রায় জ্ঞানহারা হইলেন।[৫] কিন্তু এই ঘটনার পর[৬] তাঁহার চরিত্রের পরিবর্তন ঘটে এবং তিনি যেন এক নূতন জগতের সন্ধান প্রাপ্ত হন।

এই সময় অদ্বৈতপ্রভু আসিয়া নবদ্বীপে বাস করিতে থাকেন। শ্রীবাস-গৃহেই তাঁহার অধিকাংশ সময় কাটিত।[৭] কিন্তু তিনি যে টোল খুলিয়া বসিলেন তাহাতে তাঁহার প্রধান ভক্ত ও সহায়ক হইলেন শ্রীবাস-পণ্ডিত। ক্রমে তিনি যেন অদ্বৈতপ্রভুর এক মনোযোগী ছাত্রের স্থান অধিকার করিয়া বসিলেন।[৮] শ্রীবাস-আচার্য ও জগন্নাথ-মিশ্রের পরিবারের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।[৯] তাই দেখা যায় শ্রীবাস-পত্নী মালিনী যে কেবল গৌরাঙ্গ-অবির্ভাবকালে প্রতিবাসিনী-হিসাবে নবজাতকের নিমিত্ত মঙ্গলকর্মাদি সম্পাদন করিয়াছিলেন[১০] তাহা নহে, তিনি তাঁহার স্তন্যদাত্রী মাতার স্থানও অধিকার করিয়াছিলেন।[১১] এবং শ্রীবাস-পণ্ডিত ও তাঁহার কনিষ্ঠ[১২] সহোদর 'অহিংসক' ও 'পরহিতকারী'[১৩] শ্রীরাম-পণ্ডিত এই দুইজনকে চৈতন্যের দুইটি প্রধান শাখা[১৪] ধরা হইলেও ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের সকলেই গৌরাঙ্গের বাল্যকাল হইতেই তাঁহার নিত্যসহচর'[১৫] হইয়াছিলেন। খুব সম্ভবত তাঁহারা প্রথমে সম্পন্ন পরিবার ছিলেন। 'চারি ভাইর দাসদাসী গৃহ পরিকরে' গৃহ পরিপূর্ণ থাকিত।[১৬] কিন্তু তাহারা 'সবংশে করে চারি ভাই চৈতন্যের সেবা।'[১৭] গৌরাঙ্গ-আবির্ভাবক্ষণ হইতেই শ্রীবাস-পত্নী মালিনীর মধ্যে যে বাৎসল্যভাব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছিল, তাহার প্রভাব শ্রীবাসের উপর পড়িলেও তিনি ছিলেন মূলত দাস্যভাবেরই ভাবুক।[১৮] ফলে তাঁহার ভ্রাতৃবৃন্দও সেই পথ অবলম্বন করিলেন।

গৌরাঙ্গ-আবির্ভাবের পূর্বে তৎকালীন সমাজের এক নিদারুণ অধঃপতন ঘটায় অদ্বৈত এবং তৎপ্রভাবে শ্রীবাসাদি ভক্ত একজন মহাপুরুষের আবির্ভাব প্রার্থনা করিতেছিলেন। জগন্নাথ-মিশ্রের দ্বিতীয় পুত্র ভূমিষ্ঠ হইলে লক্ষণাদি দেখিয়া তাঁহারা তাহাকেই ত্রাণকর্তা মনে করিয়াছিলেন এবং আচার্যরত্ন ও শ্রীবাসাদি ভক্ত সেই শুভ মুহূর্তে তথায় থাকিয়া 'বিধিধর্ম'-মত জাতকর্মাদি সম্পন্ন করিয়াছিলেন।[১৯] কিন্তু বয়সের বিরাট পার্থক্যবশত গৌরাঙ্গের বাল্যকালে বোধকরি তাঁহার সহিত শ্রীবাসের বিশেষ যোগসম্বন্ধ ঘটিয়া উঠে নাই। সেই সম্বন্ধ ঘটে বিশ্বম্ভরের অধ্যাপনাকালে, যখন তিনি 'শ্রীবাসাদি দেখিলেও ফাঁকি

---

(৫) চৈ. ভা.—২।৯, পৃ. ১৪৮ (৬) ঐ—২।২১, পৃ. ২০৮ (৭) ভ. র.—১২।১৭৮৮-৮৯ ; অ. প্র.-মতে শ্রীবাসাদির সহায়তায় অদ্বৈত-বিবাহানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। (৮) গৌ. বি.—পৃ. ৬৩ (৯) গৌ. লী., ইত্যাদি (১০) ভ. র.—১২।৯৩৯ ; চৈ. চ.—১।১৩, পৃ. ৬২ ; চৈ. ম. (জ.)—ন. খ., পৃ. ২৩ (১১) গৌ. দী.—৪২ ; চৈ. দী.—পৃ. ৩ ; বৈ. ব. (বৃ.)—পৃ. ১ (১২) গৌ. দী.—৯০ (১৩) বৈ. ব. (বৃ.) পৃ. ২ (১৪) চৈ. চ.—১।১০, পৃ. ৫১ (১৫) ব. শি.—পৃ. ১৫৯ (১৬) চৈ. চ.—১।১০, পৃ. ৫১ ; গৌ. ত.—পৃ. ২৯৯ (১৭) চৈ. চ.—১।১০, পৃ. ৫১ (১৮) ঐ—১।৬, পৃ. ৩৮ (১৯) ঐ—১।১৩, পৃ. ৬২

জিজ্ঞাসেন।[২০] ক্রমে শ্রীবাস-পণ্ডিত স্বীয় ভ্রাতৃবৃন্দকে লইয়া এমন ভাবে অহর্নিশি কৃষ্ণগুণগানে মাতিলেন যে ভক্তগোষ্ঠী-বহির্ভূত নবদ্বীপবাসী-বৃন্দ সকলেই তাঁহার প্রতি বক্রোক্তি করিতে লাগিলেন।[২১] কিন্তু ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া শ্রীবাসেরা গৌরাঙ্গ-শক্তি প্রকাশের জন্য অধীরভাবে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। একদিন পথে বিশ্বম্ভরের সহিত দেখা হইলে শ্রীবাস তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে 'উদ্ধতের চূড়ামণি' যদি লোককে কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ করিতে না পারিলেন, তাহা হইলে তাঁহার অধ্যয়ন-অধ্যাপনা বৃথা।[২২] শ্রীবাসের ইঙ্গিতে বিশ্বম্ভর বুঝিলেন, তিনিই অপেক্ষমাণ নিপীড়িত জনসমাজের একমাত্র আশাভরসা-স্থল। তিনি শ্রীবাসকে জানাইলেন যে তাঁহাদের কৃপা হইলে তিনি নিশ্চয়ই তাঁহাদের সহিত মিলিত হইবেন।

ইতিপূর্বে গৌরাঙ্গের বিবাহাদি ব্যাপারে শ্রীবাস-পণ্ডিত অভিভাবকত্বের পদ গ্রহণ করিলেও[২৩] তাঁহাদের মধ্যে প্রকৃত ভাব-মিলন ঘটিয়াছিল গৌরাঙ্গের গয়াধাম হইতে প্রত্যাবর্তনের পরেই[২৪]। গৌরাঙ্গ তখন কৃষ্ণপ্রেমে অস্থির ও উন্মাদ হইয়াছেন। সকলেই বলিলেন বায়ুরোগ। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, অন্যত্র অস্বাভাবিক আচরণ প্রদর্শন করিলেও শ্রীবাসকে দেখিলে বিশ্বম্ভর প্রাণামাদি জানাইয়া গুরু-মর্যাদা দান করিতেন।[২৫] জগন্নাথের মৃত্যুর পর মিশ্র-পরিবারের অভিভাবকত্বের কিছুটা ভার শ্রীবাসের উপর আপনা হইতেই বর্তাইয়াছিল এবং শ্রীবাসও সেই দায়িত্ব বহন করিয়াছিলেন। কিন্তু শচীদেবীর ধারণা ছিল যে শ্রীবাসাদি হইতেই বিশ্বম্ভরের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। শ্রীবাস-পণ্ডিত একদিকে যেমন তাঁহার এই ভ্রান্ত ধারণাকে বিনষ্ট করিয়া গৌরাঙ্গ সম্পর্কে তাঁহার পুত্রভাব বিদূরিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন,[২৬] তেমনি অন্যদিকে বিশ্বম্ভরের উক্তরূপ অবস্থায় তিনি শচীদেবীকে সান্ত্বনা দিলেন যে উহা কদাপি বায়ুরোগ নহে, উহা প্রগাঢ় ভক্তিভাবের লক্ষণমাত্র। বিশ্বম্ভর বুঝিলেন যে মহাভক্ত বলিয়াই শ্রীবাস-পণ্ডিত ভক্তির লক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছেন। শ্রীবাসের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাঁহার অন্তঃকরণ ভরিয়া উঠিল।

গৌরাঙ্গ তখন হইতে শ্রীবাস-গৃহে কীর্তন আরম্ভ করিলেন। কিন্তু গভীর রাত্রি পর্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন চলিতে থাকায় পাষণ্ডীগণ ক্রুদ্ধ হইয়া সমস্ত কথা রাজার কাছে গিয়া লাগাইল। তাঁহাকে ধরিবার জন্য রাজাজ্ঞায় দুইটি নৌকা আসিতেছে বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিলে শ্রীবাস যখন রাজার ভয়ে ভীত হইয়া কৃষ্ণ-স্মরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইতি-মধ্যে পাষণ্ডী-বৃন্দের সমস্ত কৌশল বুঝিতে পারিয়া বিশ্বম্ভর হঠাৎ এক প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হইলেন এবং তাঁহার সমূহ চিত্তবৃত্তি যেন একদিকে ধাবিত হইল। তিনি

---

(২০) চৈ. ভা.—১।৭, পৃ. ৫১ (২১) ঐ—১।৭, পৃ. ৫২ (২২) ঐ—১।৮, পৃ. ৬১ (২৩) গৌ. বি.—পৃ. ১৪১-৪২ (২৪) চৈ. ভা.—২।১, পৃ. ৯৫ (২৫) ঐ—২।২, পৃ. ১০৬-৮ (২৬) চৈ. না.—১।৮২

শ্রীবাস-গৃহে উপস্থিত হইয়া [২৭] পূজারত শ্রীবাসকে জানাইলেন যে তাঁহার আর নৃসিংহদেবকে পূজা করিয়া লাভ নাই। এই বলিয়া তিনি স্বয়ং বীরাসনে বসিয়া স্তব্ধ হইলে ভয়ভীতচিত্ত শ্রীবাস গৌরাঙ্গকেই মহাশক্তির প্রকাশান্তর মনে করিয়া[২৮] তাঁহার স্তব আরম্ভ করিলেন শেষে গৌরাঙ্গ তাঁহাকে আশ্বাস দিলেন যে 'রাজানাও' পৌঁছাইলে তিনিই সর্বপ্রথম রাজ-সমীপে উপস্থিত হইয়া সভাসদ্‌সহ রাজাকে ভক্তিপরায়ণ করিয়া ছাড়িবেন। তখন হইতে ভ্রাতৃবৃন্দসহ শ্রীবাস-পণ্ডিত তনু-মন সমর্পণ করিয়া গৌরাঙ্গ-সেবায় নিয়োজিত হইলেন।[২৯]

কিছুকাল পরে নিত্যানন্দ নবদ্বীপে পৌঁছাইলে শ্রীবাস-মন্দিরে তাঁহার ব্যাসপূজা[৩০] উপলক্ষে শ্রীবাস-পণ্ডিত আচার্যের পদে ব্রতী হন এবং সেই সূত্রে শ্রীবাস-পরিবারের সহিত নিত্যানন্দের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। তিনি শ্রীবাস-গৃহেই বাস করিতে থাকেন এবং শ্রীবাস ও তৎপত্নী মালিনীদেবী পরম বাৎসল্য সহকারে[৩১] তাঁহাকে অভিন্ন গৌরাঙ্গরূপে বরণ করিয়া লন। সেই সময় অদ্বৈতপ্রভু শান্তিপুরে ছিলেন। গৌরাঙ্গ শ্রীরাম-পণ্ডিতকে পাঠাইয়া তাঁহাকে নবদ্বীপে আনাইলে শ্রীবাস-গৃহে গৌরাঙ্গের লীলা আরম্ভ হইয়া গেল।

প্রত্যহ সন্ধ্যায় কীর্তন চলিত। তাহাতে 'শ্রীবাস পণ্ডিত লৈয়া এক সম্প্রদায়' একটি বিশেষ অংশ গ্রহণ করিতেন।[৩২] একদিন গৌরাঙ্গ

সাত প্রহরিয়া ভাবে ছাড়ি সর্বমায়া।
বসিলা প্রহর সাত প্রভু ব্যক্ত হইয়া॥

সেইদিন গৌরাঙ্গ-অভিপ্রায়ানুযায়ী শ্রীবাস-গৃহে তাঁহার অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। সেই উৎসবে বিশেষভাবে কর্মতৎপর হইয়াছিলেন শ্রীবাসাদি চারিভ্রাতা[৩৩] এবং শ্রীবাস-গৃহের দাসদাসী সকলেই। দুঃখী নামক এক ভাগ্যবতী দাসী বিশেষ শ্রমসহকারে জল বহন করিয়া আনিতে থাকিলে গৌরাঙ্গ সেই ভক্তিভাব প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার 'দুঃখী' নাম ঘুচাইয়া তাঁহাকে 'সুখী' নামে অভিহিত করেন।[৩৪] পরেও একবার তিনি এই দুঃখীর জলবহন-নিষ্ঠার কথা শুনিয়া তাঁহাকে 'সুখী' নামে অভিহিত করিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন।[৩৫] কিন্তু উপরোক্ত উৎসব সম্পন্ন হইলে গৌরাঙ্গ সর্বপ্রথম শ্রীবাসের এবং তারপর অন্যান্য

(২৭) চৈ. ভা.—২।২, পৃ. ১১২ (২৮) বৃন্দাবনদাস (চৈ. ভা.—২।২, পৃ. ১১২) বলেন যে এই সময়ে তিনি গৌরাঙ্গের চতুর্ভুজ-মূর্তি দর্শন করেন। (২৯) শ্রীচৈ. চ.—২।৪; ২।৭।২৫; চৈ. ম. (লো.)—ম. খ, পৃ. ১০৬ (৩০) চৈ. ভা.—২।৫; ২।৮, পৃ. ১৩৭; ব্যাসপূজার বিস্তৃত বিবরণ, তৎপরবর্তী ঘটনা ও নিত্যানন্দের সহিত শ্রীবাস ও মালিনীর স্নেহ সম্পর্কের প্রকৃতি সম্বন্ধে নিত্যানন্দ-জীবনী অবশ্যই দ্রষ্টব্য। (৩১) ঐ (৩২) চৈ. ভা.—২।৮, পৃ. ১৪০ (৩৩) গৌ. ত.—পৃ. ১৫১ (৩৪) চৈ. ভা.—২।৯, পৃ ১৪৬ (৩৫) ঐ—২।১৫, পৃ. ২৩১; জয়ানন্দ জানাইতেছেন (স. খ., পৃ. ৮৮) যে সন্ন্যাস গ্রহণ কালে গৌরাঙ্গপ্রভু প্রিয় ভক্তবৃন্দের তৃপ্তি সম্পাদনার্থ গঙ্গাজলে তর্পণকালে যাঁহাদের নামোচ্চারণ করেন তাঁহাদের মধ্যে একজন দুঃখী দাসী ছিলেন।

সকলের ভক্তিভাবের উল্লেখ করিলে সকলেই তাঁহার নিকট আশীর্বাণী লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। শ্রীবাসের হস্তক্ষেপের ফলে গৌরাঙ্গ মুকুন্দ-দত্তের পূর্বাপরাধ ক্ষমা করিয়া তাঁহাকেও পুরস্কৃত করিলেন। বৈষ্ণবগণ গৌরহরিকে কৃষ্ণাবতার জ্ঞানে নূতন জীবন আরম্ভ করিলেন।

গৌরাঙ্গ-লীলায় নিত্যানন্দও একজন আনুষঙ্গিক অবতার বলিয়া গণ্য হইলেন। শ্রীবাস-গৃহে তাঁহার গতিবিধি মাহাত্ম্যময় বলিয়া প্রতিভাত হইল এবং তাঁহার যদৃচ্ছ সকল কর্মই সমর্থন লাভ করিল।[৩৬] এই কারণে সেই সময়ে শ্রীবাসকে নানাবিধ কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হইলেও গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ এই উভয়কে অবলম্বন করিয়াই তাঁহার ভক্তিভাব বিকশিত হইতে লাগিল।

জগাই-মাধাই উদ্ধার, নগর-সংকীর্তন প্রভৃতি গৌরাঙ্গের সমস্ত উল্লেখযোগ্য কর্মেই শ্রীবাস ও শ্রীরাম-পণ্ডিতকে অংশ গ্রহণ করিতে দেখা যায়। বিশেষ করিয়া তাঁহাদের গৃহেই প্রভু বিশ্বম্ভরের নৃত্যকীর্তন চলিতে থাকায় তাঁহাদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব থাকিয়া গিয়াছিল। পাছে গৌরাঙ্গের কৃষ্ণগুণগানের ব্যাঘাত ঘটে তজ্জন্য একদিন শ্রীবাস-পণ্ডিত সংকীর্তন-গৃহে লুক্কায়িত স্বীয় শ্বশ্রূকে পর্যন্ত 'আজ্ঞা দিয়া চুলে ধরি করিলা বাহির।[৩৭] আবার তাঁহার অভিভাবকত্বের দায়িত্ব সম্বন্ধেও ঠাকুর-পণ্ডিত শ্রীবাস সর্বদা সচেতন থাকিতেন। একদিন তাঁহারই 'বৃহৎসহস্রনাম' পাঠ শ্রবণে নৃসিংহাবেশে[৩৮] ভাবিত হইয়া গৌরাঙ্গপ্রভু গদাহস্তে পাষণ্ডী-সংহার নিমিত্ত ছুটিয়া বেড়াইতে থাকিলে শ্রীবাস-পণ্ডিত তাঁহাকে সুস্থ ও তুষ্ট করিয়া গৃহে পাঠাইয়াছিলেন। আর একদিন নগর-পরিভ্রমণকালে ভাবাবিষ্ট বিশ্বম্ভর এক মদ্যপের গৃহে উঠিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে থাকিলে তিনিই তাঁহাকে সুকৌশলে প্রকৃতিস্থ করেন।[৩৯] সেই সময় দেবানন্দ-পণ্ডিত বিশারদের-জাঙ্গালে বাস করিতেন।[৪০] সেইদিন তাঁহার সহিত বিশ্বম্ভরের সাক্ষাৎ ঘটিলে তিনি দেবানন্দকে সরোষে জানাইলেন যে যে-ভাগবতগ্রন্থ ভক্তি ও প্রেমের উৎসস্বরূপ তাহা পাঠ করিতে করিতে তিনি যে পরম ভক্তিমান শ্রীবাস-পণ্ডিতের লাঞ্ছনার কারণ হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার ভাগবতজ্ঞানহীনতারই অনপনেয় কলঙ্কস্বরূপ। দেবানন্দ অনুতপ্ত হৃদয়ে গৃহে ফিরিয়া যান।

(৩৬) দ্র.—নিত্যানন্দ (৩৭) চৈ. ভা.—২।১৬, পৃ. ১৮১ ; দ্র.—চৈ. ম. (লো.)—ম. খ., পৃ. ১০৬ ; ভক্তিরত্নাকর-মতে (১২।১৯৩৪) একবার গৌরাঙ্গপ্রভু শ্রীবাস-আলয়ে গিয়া তাঁহার শাশুড়ীকে অনুগ্রহ করিয়াছিলেন। (৩৮) চৈ. চ.—১।১৭, পৃ. ৭৩ ; তু.—চৈ. ম. (লো.)—ম. খ., পৃ. ১২৬ ; তু.—ভ. র. —১২।৩৪৭৯-৮১ (৩৯) চৈ. ভা.—২।২১, পৃ. ২০৭ (৪০) ঐ—২।২১, পৃ. ২০৬-৭ ; বৈ. দ.-মতে (পৃ. ৩৪৩) দেবানন্দের বাস কুলিয়াতেই ছিল।

শ্রীবাস ছিলেন একজন অতি উচ্চ শ্রেণীর লেখক, পাঠক, কথক ও বক্তা।[৪১] তাই তাঁহারই পাঠ শ্রবণে গৌরাঙ্গ যেমন নৃসিংহভাবে আবিষ্ট হইয়াছিলেন তেমনি তাঁহারই বৃন্দাবনলীলা-কথনে বিহ্বল হইয়া তিনি 'বংশী' প্রার্থনা করিয়া আকুলিতচিত্তে ভগ্ননিদ্র অবস্থায় রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন।[৪২] আবার অন্যদিকে গৌরাঙ্গের জন্য তাঁহাকে যেভাবে পাষণ্ডীদিগের কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল[৪৩], এমন আর কাহাকেও হইতে হয় নাই। গোপাল-চাপাল নামে পাষণ্ডী-সর্দার এক বিপ্র একবার রাত্রিকালে শ্রীবাসের দুয়ারে ভবানীপূজার সামগ্রী রাখিয়া যান। অঙ্গনের একটি স্থান পরিষ্কার করিয়া ও লেপাইয়া তাহার উপর একটি কলাপাতায় ওড় ফুল, হরিদ্রা, সিন্দুর, রক্তচন্দন ও তণ্ডুল সমস্তই রাখিয়াছিলেন। পার্শ্বে মদ্যভাণ্ডও বাদ পড়ে নাই। প্রভাতে শ্রীবাস এই সমস্ত দেখিয়া 'হাড়ি আনাইয়া সব দূর করাইল'।[৪৪] এইরূপ কত দুর্ভোগই যে তাঁহাকে সহ্য করিতে হইত তাহার ঠিকানা নাই।

কেবল তাহাই নহে, গৌরাঙ্গ-প্রীতির জন্য তিনি যেরূপ হৃদয়বিদারক বেদনাকেও হাসিমুখে উড়াইয়া দিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত অলব্ধ। একবার সংকীর্তনকালে 'দৈবে ব্যাধিযোগে শ্রীবাস-নন্দনে'র[৪৫] মৃত্যু ঘটে। গৃহমধ্যে নারীগণের ক্রন্দনের রোল[৪৬] কীর্তনাদিতে বিঘ্ন ঘটাইবে বলিয়া শ্রীবাস নানাভাবে স্তোকবাক্য দিয়া তাঁহাদিগকে নিবৃত্ত করেন এবং অতি সহজভাবেই আসিয়া সংকীর্তনে যোগদান করেন।[৪৭] কিন্তু গৌরাঙ্গপ্রভু যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তাঁহার গৃহে কোনও বিষাদময় ঘটনা ঘটিয়াছে কিনা, তখন

> পণ্ডিত বোলয়ে প্রভু! মোর কোন দুঃখ।
> যার ঘরে সুপ্রসন্ন তোমার শ্রীমুখ॥

অন্যান্য ভক্তের নিকট সমস্ত শুনিয়া গৌরাঙ্গ বিস্মিত হইলেন। তিনি স্বয়ং শ্রীবাসের পুত্রের স্থান অধিকার করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দান করিলেন। তারপর তিনি শ্রীবাস-পুত্রের সংকার করিয়া আসিলে চারিভ্রাতার সহিত শ্রীবাস তাঁহার পদযুগল ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন:

> জন্ম জন্ম তুমি পিতা মাতা পুত্র প্রভু।
> তোমার চরণ যেন না পাশরি কভু॥

---

(৪১) চৈ. ভা.—২।২২, পৃ. ২০৯; ৩।১০, পৃ. ৩৩৭; গৌ. ত.—পৃ. ২৭৭ (৪২) চৈ. চ.—১।১৭, পৃ. ৭৭; তু.—চৈ. ম. (লো.) ম. খ., পৃ. ১৩৫; তু.—ভ. র.—১২।৩৪৭৬ (৪৩) গৌ. ত.—পৃ. ১৭৫ (৪৪) চৈ. চ.—১।১৭, পৃ. ৭২ (৪৫) গৌ. ত.-তে (পৃ. ২৩২) সম্ভবত শ্রীবাস-নন্দনের নাম বাসুদেব বলা হইয়াছে। (৪৬) চৈ. ভা.—২।২৫ পৃ. ২৩২; তু.—চৈ.চ.—১।১৭, পৃ. ৭৬; ভ. র.—১২।৩৪৩৬ (৪৭) তু.—গৌ. ত.—পৃ. ২৯৯

এই সকল কারণে শ্রীবাসের প্রতিও গৌরাঙ্গের করুণার সীমা ছিল না। তাঁহার হস্তক্ষেপের ফলেই গৌরাঙ্গ শচীদেবীর অদ্বৈত-অপরাধ খণ্ডন করিয়াছিলেন[৪৮] এবং চন্দ্রশেখর-গৃহে নাট্যাভিনয়কালেও শ্রীবাস-পণ্ডিত নারদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবার সৌভাগ্যপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শেষোক্ত ঘটনায় গৌরাঙ্গপ্রভু তাঁহারই উপরে নাট্যাভিনয়-ব্যবস্থাপনার সমস্ত ভার অর্পণ করেন এবং তিনিই 'সামাজিকে'র কাজ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা শ্রীরামও 'স্নাতক' সাজিয়া সকলকে আনন্দদান করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অন্য তিনজন সহোদরই গায়কের কর্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সেই অপূর্ব নাট্যাভিনয়কালে শ্রীবাস-পত্নী মালিনীর সহিত শ্রীবাসের ভ্রাতৃজায়াগণও উপস্থিত থাকিয়া আনন্দলাভের সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছিলেন।[৪৯] আবার গৌরাঙ্গ-হৃদয়ে শ্রীরাম-পণ্ডিতেরও একটি বিশেষ স্থান ছিল। কোনও বিশেষ সংবাদ গ্রহণ বা প্রেরণাদি ব্যাপারে তিনি বিশ্বস্ত ভক্তরূপে তৎকর্তৃক প্রেরিত হইতেন।[৫০] কীর্তনাদি ব্যাপারে এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাঁহার চারিভ্রাতাই অংশ গ্রহণ করিয়া[৫১] গৌরাঙ্গ-অনুগ্রহ লাভ করিতেন। শ্রীবাসের ভ্রাতৃতনয়া নারায়ণীও তাঁহার প্রসাদপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দুঃখী-দাসীর কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। এমন কি যে-যবন দরজী শ্রীবাসের বস্ত্র সেলাই করিয়া দিতেন, তিনিও গৌরাঙ্গের করুণা লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন।[৫২] আর গৌরাঙ্গের নবদ্বীপলীলার প্রধান কেন্দ্রই ত ছিল শ্রীবাস-গৃহ! শ্রীকৃষ্ণ জন্মোৎসব দানগোষ্ঠাদিলীলা, পাশাখেলা, বনভোজন, অভিষেক, গোপীভাবে নৃত্য ইত্যাদি প্রথম হইতে গৌরাঙ্গের সন্ন্যাসগ্রহণ পর্যন্ত সমূহ লীলানুষ্ঠানেরই সঙ্গী ও প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিলেন এই শ্রীবাস ও শ্রীরাম-পণ্ডিত এবং তাঁহাদের অন্য ভ্রাতৃদ্বয়।

সন্ন্যাস-গ্রহণের পূর্বে গৌরাঙ্গ শ্রীবাসের নিকট স্বীয় অভিলাষ ব্যক্ত করিলেও[৫৩] তাঁহার সন্ন্যাস-গ্রহণকালে কিন্তু শ্রীবাস-আচার্য কণ্টকনগরে উপস্থিত থাকিবার সুযোগ পান নাই।[৫৪] সন্ন্যাস-গ্রহণান্তে চৈতন্যমহাপ্রভু শান্তিপুরে পৌঁছাইলে শ্রীবাস-পণ্ডিত বিধ্বস্ত হৃদয় লইয়াও শচীমাতাকে 'নবযানে'[৫৫] আরোহণ করাইয়া নবদ্বীপবাসীদিগের সহিত শান্তিপুরে আসিয়া[৫৬] তাঁহাকে বিদায় দিয়া যান। জয়ানন্দ জানাইয়াছেন

(৪৮) চৈ. ভা.—২।২২, পৃ. ২০৯ (৪৯) ঐ—২।১৮, পৃ.১৮৮-৯০ ; চৈ. না.—৩।১২-১৩ ; চৈ. কৌ.—পৃ. ৬৫-৬৬ (৫০) চৈ. ভা.—২।৬, পৃ. ১২৭ ; চৈ. কৌ.—পৃ. ১০০ ; শ্রীচৈ. চ.—২।৮।৪ ; চৈ. ম. (লো.)—ম. খ., পৃ. ১১৫ (৫১) চৈ. কৌ.—পৃ. ১০২ (৫২) চৈ. চ.—১।১৭, পৃ. ৭৭ (৫৩) শ্রীচৈ. চ.—২।১৮।১৯ ; চৈ. ম. (জ.)—বৈ. খ., পৃ. ৬২ ; চৈ. ম. (লো.)—ম. খ., পৃ. ১৪২, ১৫২—এই গ্রন্থানুযায়ী কেশব-ভারতী নবদ্বীপে আসিলে গৌরাঙ্গ শ্রীবাসকেই তাঁহার গৃহে ইঁহার ভিক্ষানির্বাহের ব্যবস্থা করিতে আজ্ঞা দেন। (৫৪) চৈ. ভা.—২।২৬, পৃ. ২৪১ (৫৫) চৈ. কৌ.—পৃ. ১৩৯ (৫৬) চৈ. চ.—২।৩, পৃ. ৯৮ ; চৈ. না.—৫।৩২ ; চৈ. ম. (লো.)—ম. খ., পৃ. ১৬৫

যে সন্ন্যাসগ্রহণের অব্যবহিত পূর্বেই মহাপ্রভু একবার শ্রীবাসকে কুমারহট্ট-বাসের নির্দেশ দিয়াছিলেন।[৫৭] সম্ভবত শ্রীবাস-পণ্ডিতও তদনুযায়ী মহাপ্রভুর নীলাচল-গমনের পরে কুমারহট্টে চলিয়া যান। 'চৈতন্যচরিতামৃত' হইতে অবশ্য জানা যায় যে মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য হইতে নীলাচলে ফিরিলে শ্রীবাস ও শ্রীরাম-পণ্ডিত তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য নবদ্বীপ হইতেই যাত্রা করেন। কিন্তু উক্ত বর্ণনা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে শচীমাতার আজ্ঞাগ্রহণার্থ শান্তিপুর, কাঞ্চনপল্লী, শ্রীখণ্ড, কুলীনগ্রাম প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানের ভক্তবৃন্দ সকলেই সেইবারে নবদ্বীপে আসিয়া সমবেত হইয়াছিলেন।

সেই বৎসর শ্রীবাস ও তাঁহার ভ্রাতৃবৃন্দ সকলেই নীলাচলে গিয়াছিলেন[৫৮] এবং জলক্রীড়া, উদ্যান-ভোজন, বেড়াকীর্তন প্রভৃতি সমস্ত আনন্দানুষ্ঠানের মধ্যে তাঁহাদের প্রধান অংশ ছিল। বিগ্রহ-সম্মুখে সম্প্রদায়-নৃত্যেও শ্রীরাম নৃত্য-কীর্তন করিয়াছিলেন। শ্রীবাসের ছিল একটি সম্প্রদায়ের উপর নেতৃত্ব। এমনকি মহাপ্রভুর উদ্দণ্ড-নৃত্যেও শ্রীবাস এবং তাঁহার অনুজ রামাইও অংশ গ্রহণ করেন। বস্তুত, শ্রীবাসের প্রাধান্যের কথা সম্ভবত নীলাচলবাসাদিগের দ্বারাও বিশেষভাবে অনুভূত হইয়াছিল। তাই দেখা যায় যে রথযাত্রাকালে মহাপ্রভুর নৃত্যদর্শনরত শ্রীনিবাস প্রতাপরুদ্রের সম্মুখে আসিয়া পড়ায় রাজার দর্শনে ব্যাঘাত ঘটিলে রাজ-মহাপাত্র হরিচন্দন যখন তাঁহাকে ধীরে ধীরে কয়েকবার মৃদু স্পর্শের দ্বারা রাজার সম্মুখ হইতে সরাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিতে থাকেন, তখন ভাবাবিষ্ট শ্রীনিবাস হরিচন্দনকে চাপড় মারিয়া নিবারণ করিলে স্বয়ং প্রতাপরুদ্রই ক্রুদ্ধ হরিচন্দনকে নিরস্ত করিয়া জানাইয়াছিলেন যে শ্রীনিবাসের হস্তস্পর্শ পাওয়ায় হরিচন্দনের নিজেকে কৃতার্থ মনে করা উচিত এবং স্বয়ং রাজা সেই স্পর্শ লাভ করিতে না পারায় নিজেকে হতভাগ্য মনে করিয়াছেন।[৫৯] রথযাত্রার পর হোরাপঞ্চমীতিথি উপলক্ষেও যে সম-মর্যাদার উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাতেও শ্রীবাসই প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। লক্ষ্মী এবং জগন্নাথের পক্ষ লইয়া যথাক্রমে শ্রীবাস ও দামোদরের মধ্যে যে পরিহাস চলিতেছিল তাহা ভক্তবৃন্দসহ চৈতন্য-মহাপ্রভুকে প্রভূত পরিমাণে আনন্দদান করিয়াছিল।[৬০]

পর বৎসরও শ্রীনিবাস মহাপ্রভু দর্শনে গিয়াছিলেন,[৬১] এবং সম্ভবত তাহার পর বৎসরও। কিন্তু তাহারপর মহাপ্রভু বৃন্দাবন-গমনোদ্দেশ্যে আসিয়া কুমারহট্টে

---

(৫৭) বৈ. খ., পৃ. ৭১ ; প্রে. বি.-এর ২৩শ. বিলাসেও দেখা যায় (পৃ. ২২২ ; তু.—পা. নি, পৃ.২) যে মহাপ্রভুর নীলাচল-গমনের পরেই শ্রীবাস ও শ্রীরাম-পণ্ডিত প্রভৃতি কুমারহট্টে গিয়া বাস করিতে থাকেন। (৫৮) চৈ.চ.—২।১০, পৃ. ১৪৭ ; ২।১১, পৃ-১৫৩ ; চৈ না.—৮।৪৩-৪৪ (৫৯) চৈ. না.—১০।৫৯ ; চৈ. চ.—২।১৩, পৃ. ১৬৬ (৬০) চৈ. চ.—২।১৪, পৃ. ১৭৫-৭৬ (৬১) ঐ— ২।১৬, পৃ. ১৮৬

শ্রীবাসের গৃহে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন।[৬২] তার পর তিনি কুলিয়ায় মাধবাচার্যের গৃহে পৌঁছাইলে 'ভাগবতী' বা 'ভাগবতীয়া' দেবানন্দ-পণ্ডিত মহাপ্রভুর চরণে আশ্রয় গ্রহণ করেন।[৬৩] ইতিপূর্বে বক্রেশ্বর-পণ্ডিত যখন তাঁহার আশ্রমে বাস করিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহার ভক্তি-নৃত্য দেখিয়া দেবানন্দের আমূল পরিবর্তন ঘটে এবং তিনি বক্রেশ্বরের অঙ্গধূলি সর্বাঙ্গে লেপন করিয়া ভক্তিবিগলিত হন। এক্ষণে তিনি পূর্বকৃত পাপের জন্য অনুতাপ করিতে করিতে চৈতন্য-চরণ শরণ করিলে মহাপ্রভু তাঁহার শ্রীবাসাপরাধ প্রভৃতি সকল দোষ ক্ষমা করিয়া তাঁহাকে নানাবিধ তত্ত্বোপদেশ দান করিলেন। তারপর মহাপ্রভু কানাইর-নাটশালা হইতে ফিরিয়া শান্তিপুরে অদ্বৈতগৃহে পৌঁছাইলে শ্রীবাসের প্রতি চরম নিগ্রহকারী সেই গোপাল-চাপাল নামক বিপ্রও আসিয়া তাঁহার পদতলে পতিত হইলেন।[৬৪] তিনি ইতিপূর্বে আরও একবার গৌরাঙ্গের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জানাইয়াছিলেন যে গ্রাম-সম্বন্ধে তিনি গৌরাঙ্গেরই মাতুল এবং তাঁহার সর্বাঙ্গে কীট লাগিয়াছে; তিনি সেই অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিতেছিলেন না; সুতরাং গৌরাঙ্গ যেন তাঁহাকে ব্যাধিমুক্ত করিয়া দেন।[৬৫] কিন্তু শ্রীবাসের অপমানের কথা মনে করিয়া তিনি সেইবার এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই। এইবার মহাপ্রভু তাঁহার অনুতাপ ও বৈষ্ণবপ্রীতি দেখিয়া তাঁহাকে শ্রীবাস-চরণাশ্রয় করিতে উপদেশ দিয়া ভক্ত শ্রীবাসের মাহাত্ম্যবৃদ্ধি করিলেন। শ্রীবাস তখন মহাপ্রভুর সঙ্গেই কানাইর-নাটশালা[৬৬] হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। সেই কুষ্ঠরোগী তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া গিয়া শ্রীবাসের চরণে দণ্ডবৎ হইলে শ্রীবাস তাঁহার সকল অপরাধ ভুলিয়া তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন।

শান্তিপুর হইতে মহাপ্রভু পুনরায় কুমারহট্টে গিয়া[৬৭] শ্রীবাস-গৃহে কয়েকটি দিন অতিবাহিত করিলেন। কিন্তু শ্রীবাসাদির তখন অত্যন্ত দুরবস্থা। তৈল তখন প্রদীপের তলদেশে ঠেকিয়াছে। চৈতন্য শ্রীবাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে গৃহ হইতে বহির্গত না হইয়াও তিনি কেমন করিয়া সংসার নির্বাহ করেন। শ্রীবাস উত্তর দিলেন যে ভিক্ষা করা তাঁহার দ্বারা সম্ভবপর নহে, কাজেই অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হইবে। মহাপ্রভু শ্রীবাসের সন্ন্যাস-গ্রহণের প্রস্তাব করিলেও তিনি অসম্মতি জানাইলেন। তখন

(৬২) ঐ.—২।১৬, পৃ. ১৯০ ; চৈ. না.—৯।৩১ (৬৩) চৈ. ভা.—৩।৩, পৃ. ২৮০-৮২ ; তু.— চৈ. চ.—১।১০, পৃ. ৫২ ; ২।১, পৃ. ৮৫ ; শ্রীচৈ. চ.—৩।১৭।১৭ ; ৪।২৫।২৯ ; চৈ.ম. (জ.)—বি. খ, পৃ. ১৪১ (৬৪) চৈ. ভা.—৩।৪, পৃ. ২৯২-৯৩ ; তু.—চৈ. চ.—২।১, পৃ. ৮৫ (৬৫) চৈ. ম. (লো.)—ম. খ., পৃ ১২৯-৩০ ; চৈ. ম.—১।১৭, পৃ. ৭২ (৬৬) চৈ. চ.—২।১ পৃ. ৮৭ (৬৭) চৈ. ভা.—৩।৫, পৃ. ২৯৭ ; চৈ. ম. (লো.) —বি. খ.,পৃ. ১৪২

প্রভু বোলে "সন্ন্যাসগ্রহণ না করিবা।
ভিক্ষা করিতেও কারো দ্বারে না যাইবা॥
কেমতে করিবা পরিবারে পোষণ।
কিছু তো না বুঝোঁ মুঞি তোমার বচন॥..."

শ্রীবাস হাতে তিনটি তালি দিয়া বলিলেন যে তিন-উপবাসের পরেও আহার না মিলিলে গলায় কলসী বাঁধিয়া গঙ্গায় ডুব দিবেন। চৈতন্য আশীর্বাদ করিলেন যে এরূপ নিষ্ঠাবান ভক্তের গৃহে লক্ষ্মী আপনা হইতেই আসিবেন। তিনি প্রিয়ভক্ত শ্রীরামের উপর জ্যেষ্ঠের ভারার্পণ[৬৮] করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

শ্রীবাস-পণ্ডিত প্রতি বৎসর নীলাচলে গিয়া চৈতন্য দর্শন লাভ করিতেন,[৬৯] রামাই-পণ্ডিত এবং তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতৃবৃন্দও[৭০] সঙ্গে যাইতেন।[৭১] মালিনীও দুই একবার সঙ্গে গিয়াছেন।[৭২] নীলাচলে সম্প্রদায়-কীর্তনাদি বিশেষ অনুষ্ঠানগুলিতে শ্রীবাসের স্থান চিরকালই অক্ষুণ্ণ ছিল।[৭৩] আবার মালিনীদেবীও ঠিক নবদ্বীপের মতই নীলাচলেও মহাপ্রভুকে বারবার নিমন্ত্রণ করিয়া এবং তাঁহার প্রিয় ব্যঞ্জনাদি ভক্ষণ করাইয়া বাৎসল্যভাবে তাঁহার সেবা করিয়াছেন।[৭৪] শ্রীবাস-পণ্ডিততো অদ্বৈতপ্রভুর সহিত মহাপ্রভুকে স্বয়ং-ভগবান বলিয়াই প্রচার করিতেন। অদ্বৈতপ্রভু যেইবার ভক্তবৃন্দসহ চৈতন্য-কীর্তন[৭৫] করিতে থাকিলে মহাপ্রভু অসন্তুষ্ট হইয়া জানাইয়াছিলেন যে তিনি ত' একজন দীন কৃষ্ণদাস মাত্র, তবে তাঁহারা তাঁহার কীর্তন করিলেন কেন, তখন কৈফিয়ত দিতে হইয়াছিল শ্রীবাসকেই।[৭৬] চৈতন্যভাগবত-কার পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে 'মহাবক্তা' বিশেষণে ভূষিত করিয়াছেন। আবার তিনি যথেষ্ট বয়োবৃদ্ধ থাকায় চিরকালই অদ্বৈতপ্রভুর মত তাঁহারও একটি 'গুরু'ত্বের অধিকার থাকিয়া গিয়াছিল। মুকুন্দ-দত্ত এবং শচীমাতা প্রভৃতির অপরাধ থাকা সত্ত্বেও তাই তিনিই শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট তাঁহাদের হইয়া ওকালতি করিয়াছিলেন। তাছাড়া, তিনি বেশ গুছাইয়া বলিতেও পারিতেন এবং মধ্যে মধ্যে হেঁয়ালি করিয়া সুকৌশলে কথা বলিতেন। মহাপ্রভুর প্রশ্নোত্তরে শ্রীবাস জানাইলেন যে জীবের স্বতন্ত্র শক্তি বলিয়া কিছুই নাই, ঈশ্বর যেরূপ প্রেরণা দান করিয়াছেন, চৈতন্যগুণ-কীর্তনকারী উপরোক্ত ভক্তবৃন্দও তাহা ব্যতিরেকে আর কিছুই করেন নাই। মহাপ্রভু বলিলেন, যে একান্তে থাকিতে চাহে তাহাকে সর্বসমক্ষে টানিয়া আনা কখনই সংগত নহে। শ্রীবাস তখন হস্তের দ্বারা সূর্যকে আচ্ছাদন করিবার চেষ্টা করিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

---

(৬৮) চৈ. ভা.—৩।৫, পৃ. ২৯৯ ; তু.—চৈ. ম.—ম. খ., পৃ. ১১১ (৬৯) চৈ. চ.—২।১, পৃ. ৮৮ ; ৩।২, পৃ. ২৯৫ (৭০) ঐ.—৩।১২, পৃ. ৩৪১ (৭১) শ্রীচৈ. চ.—৪।১৭।১৩ (৭২) ঐ—৪।১৯।১৫ ; চৈ. চ.—৩।১২, পৃ. ৩৪১ (৭৩) চৈ. চ.—৩।৭, পৃ. ৩২৪ ; ৩।১০, পৃ. ৩৩৫ (৭৪) ঐ—৩।১২, পৃ. ৩৪২ (৭৫) দ্র.—অদ্বৈত (৭৬) চৈ. চ.—২।১, পৃ. ৮৮-৮৯ ; চৈ. ভা.—৩।১০, পৃ. ৩৩৬-৩৭

ঠিক সেই সময় হরিধ্বনিরত এক বৃহৎ জনতা বহুদূর হইতে আসিয়া চৈতন্যদর্শন প্রার্থনা জানাইলে মহাপ্রভুর হৃদয় বিগলিত হইল। তিনি বাহিরে আসিয়া তাঁহাদের সহিত উর্দ্ধ-বাহু হইয়া কীর্তন করিতে থাকিলে তাঁহারা তখন 'প্রভুকে ঈশ্বর বলি করয়ে স্তবন।' শ্রীবাস তখন সুযোগ বুঝিয়া বলিলেন :

কে শিখাইল এই লোকে কহে কোন বাত।
ইহা সবার মুখ ঢাক দিয়া নিজ হাত ॥
সূর্য্য যেন উদয় করি চাহে লুকাইতে।
বুঝিতে না পারি তোমার ঐছন চরিতে ॥
তখন প্রভু কহে শ্রীনিবাস ছাড় বিড়ম্বনা।
সবে মিলি কর মোর যতেক লাঞ্ছনা ॥

মহাপ্রভু সকলকে দর্শন দান করিয়া অভ্যন্তরে চলিয়া গেলেন।

লোচনদাস জানাইয়াছেন যে মহাপ্রভুর তিরোভাবকালেও শ্রীবাস-পণ্ডিত নীলাচলে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু অন্য কোন প্রাচীন ও প্রামাণিক গ্রন্থে এইরূপ উল্লেখ দেখা যায় না। গৌড়ে প্রেরিত হইবার পর নিত্যানন্দ সম্ভবত মধ্যে মধ্যে শ্রীবাসের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। শ্রীরামকেও মধ্যে মধ্যে তাঁহার সহিত নৃত্য করিতে দেখা যায়[৭৮] বটে। কিন্তু চৈতন্য-বিরহের ফলে আর তাঁহাদের ভাবসম্বন্ধের মধ্যে সম্ভবত সেইরূপ মাদকতা ছিল না। তাই নিত্যানন্দের সংসারধর্ম-গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করায় শ্রীবাস ও মালিনী উভয়েই তাঁহাকে বিবাহ বিষয়ে সাহায্য করিয়া[৭৮] সম্ভবত তাঁহার সম্বন্ধে একেবারে নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। কারণ তাহার পরে মহাপ্রভুর জীবদ্দশাতেই নিত্যানন্দের দীর্ঘকাল যাবৎ গৌড়বাসকালে শ্রীবাসের সহিত তাঁহার লীলার কোন কথাই আর শুনিতে পাওয়া যায় নাই। মহাপ্রভুর তিরোভাবের পরেও তাঁহাদের তদানীন্তন সম্পর্ক সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারা যায় না।

মহাপ্রভুর তিরোভাবের পর শ্রীবাস-পণ্ডিত কতদিন বাঁচিয়াছিলেন তাহা সঠিক বলা যায় না, তবে শ্রীজীবের বৃন্দাবন-যাত্রাকালে[৭৯] কিংবা তাহারও অনেক পরে শ্রীনিবাস-আচার্যের নবদ্বীপ আগমনকালে তিনি যে তাঁহাদিগকে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন তাহা নরহরি-চক্রবর্তীর গ্রন্থ হইতে জানা যায়।[৮০] সম্ভবত তখন শ্রীবাস ও শ্রীরাম বিষ্ণুপ্রিয়া-মাতার তত্ত্বাবধানের জন্য নবদ্বীপে থাকিয়াই প্রভুর প্রতি তাঁহাদের শেষ কর্তব্যটুকু সাধন করিয়া চলিয়াছিলেন।[৮১] কিন্তু শ্রীনিবাস-আচার্য যখন বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তন করেন,

(৭৭) ভ. র.—১২।৩৭৪৮ (৭৮) ঐ.—১২।৩৯২০-৩০, ৩৯৮৯ (৭৯) ঐ—১।৭৬৮ (৮০) ঐ—৪।৫৬ ; ন. বি.—২য়. বি., পৃ. ১৯ (৮১) তু.—ন. বি.—২য়. বি., পৃ. ১৯ ; অ. প্র —২৩শ. বি., পৃ. ১০২

তখন শ্রীবাস-পণ্ডিত ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন।[৮২] রামাই-পণ্ডিতের সম্বন্ধেও আর বড় একটা খোঁজ পাওয়া যায় না।[৮৩] কিন্তু শ্রীবাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় শ্রীপতি ও শ্রীনিধি গদাধর-দাস প্রভু এবং নরহরি-সরকার ঠাকুরের তিরোভাব-উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।[৮৪] খেতুরির উৎসবেও তাঁহাদিগকে বিশেষ অংশ গ্রহণ করিতে দেখা যায়।[৮৫]

(৮২) ভ. র.—৭।৬১৯ ; ৮।৪৭ (৮৩) ভক্তিরত্নাকরে (১১।৯৮, ১৩৩) বোরাকুলি-মহোৎসব বর্ণনায় যে রামাই-ঠাকুরের নাম পাওয়া যায় তিনি সম্ভবত বংশীবদনের পৌত্র। মুরলীবিলাস (পৃ. ২১০)-মতে ইনি শ্রীবাসের জীবৎকালেই নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন (৮৪) ভ. র.—৯।১৯৩, ৫৩১, ৭১৬ (৮৫) ঐ—১০।৪০৭, ৬৪২ ; প্রে. বি —১৯শ. বি ; পৃ. ৩০৯ ; ন. বি.—৬ষ্ঠ. বি., পৃ. ৮৩ ; ৭ম. বি., পৃ. ৯৭ ; ৮ম. বি., পৃ. ১১১

গদাধর-পণ্ডিত

প্রাচীন গ্রন্থকার-গণ গদাধর-পণ্ডিতকে 'রাধা', 'লক্ষ্মী' বা 'রুক্মিণী' আখ্যাদান করিয়াছেন।[১] প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন আবাল্য গৌরানুরাগী মুগ্ধ ভক্ত। ইহাই তাঁহার প্রকৃত পরিচয়। যজ্ঞসূত্র গ্রহণের পূর্বেই গৌরাঙ্গ স্বয়ং শচীদেবীর নিকট তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। তখন হইতেই গদাধরও পঠনে-ভ্রমণে, ভোজন-শয়নে প্রায় সর্বদা নিমাইচন্দ্রের অতি অন্তরঙ্গবন্ধুরূপে কাছে কাছে থাকিতেন।[২] তিনি ছিলেন স্বরূপ-জগদানন্দের মত ভক্তিজগতের মধুরভাব-পথের পথিক।[৩]

'প্রেমবিলাসে'র দ্বাবিংশ ও চতুর্বিংশ বিলাসে[৪] গদাধর-পণ্ডিতের যে বংশ পরিচয় দেওয়া হইয়াছে তদনুযায়ী কাশ্যপ-গোত্রীয় বিপ্র দিবাকর কৌলিন্য মর্যাদা হারাইলে শ্রোত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া করঞ্জগ্রামে বাস করেন। তৎপুত্র 'ন্যায়কুসুমাঞ্জলি-'প্রণেতা উদয়ন-আচার্য বারেন্দ্র-কুলের সংস্কার করিয়া বাণীয়াটি গ্রামে বাস করেন। পিতৃবাক্য লঙ্ঘনে তাঁহার ছয় পুত্রের কুল নষ্ট হওয়ায় তিনি তাঁহাদিগকে 'কাপ'-আখ্যা দিয়া বর্জন করেন, কিন্তু তাঁহার অন্য পত্নীর গর্ভজাত সন্তান পশুপতি কুলীন থাকেন। পশুপতির বহুপুত্রের একজন বিলাস-আচার্য চট্টগ্রামরাজ চিত্রসেনের সভাপণ্ডিত হইয়া চট্টগ্রামের বেলেটিগ্রামে বাস করেন। তাঁহার পুত্র মাধব-আচার্য চক্রশালার জমিদার পুণ্ডরীক-বিদ্যানিধির সখা বা বন্ধু ছিলেন। উভয়ের পত্নীর নামও রত্নাবতী। তাঁহারাও পরস্পরের সখী ছিলেন। চট্টগ্রামেই মাধবের এক পুত্র জন্মে—বাণীনাথ। ইনি জগন্নাথ নামেও অভিহিত ছিলেন। মাধবকে কেহ কেহ মাধব-মিশ্র বলিত। মাধব ও পুণ্ডরীক নবদ্বীপে বাস করেন এবং মাধবেন্দ্র-পুরী কর্তৃক দীক্ষিত হন। নদীয়াতেই এক বৈশাখের 'কুহুদিনে' মাধবের আর এক পুত্র জন্মান—গদাধর। তিনিই গৌরাঙ্গের আশৈশব সুহৃদ্ গদাধর-পণ্ডিত। বাণীনাথ বা জগন্নাথ-আচার্যও নবদ্বীপবাসী হন। তৎপুত্র নয়নানন্দ[৫] বা নয়ন-মিশ্র গদাধর কর্তৃক দীক্ষিত হন। গদাধর তাঁহাকে স্বীয় বক্ষোদেশে রক্ষিত শ্রীকৃষ্ণমূর্তি এবং মহাপ্রভুর হস্তলিখিত শ্লোকসম্বলিত একটি গীতা প্রদান কারন। গদাধরের তিরোভাবে তিনিই পিতৃব্যের

---

(১) ভ. র.—৮।৩১৩ ; গৌ. দী.—১৪৭, ১৪৮ ; চৈ. চ.—১।১০ ; পৃ. ৫১ ; ৩।৭, পৃ. ৩২৬ (২) চৈ. চ. ম.—৫।১২৮, ৬।১২-১৪ ; চৈ. ম. (জ.)—পৃ. ২৭ ; শ্রী.চৈ. চ.—১।৩ ; চৈ. ম. (লো.)—ম. খ., পৃ. ১০১ (৩) চৈ. চ.—২।২, পৃ. ৯৩ (৪) ২২শ. বি., পৃ. ২১৬-১৯ ; ২৪শ. .বি., পৃ. ২৫৯-৬০ (৫) ম. আ. তি.-পুঁথিতে নয়নানন্দ-গোস্বামীর তিথি ফাল্গুনী পূর্ণিমা বলিয়া নির্দিষ্ট আছে, সম্ভবত ইনি বাণীনাথেরই পুত্র।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া রাঢ় দেশের ভরতপুরে বাস স্থাপন করেন। 'প্রেমবিলাসে'র এই বিবরণগুলির সমস্তই যে অসত্য তাহা বলা যায় না। কারণ মাধব-মিশ্রের জন্ম হইতে পরবর্তী অংশের বিবরণগুলির সমর্থন অন্যান্য গ্রন্থেও কিছু কিছু পাওয়া যায়।

'চৈতন্যচরিতামৃত' হইতে জানা যায় যে নয়নানন্দের পিতা বাণীনাথ-মিশ্র নীলাচলে থাকিতেন।[৬] হরিদাস-ঠাকুরের তিরোভাবকালে

বাণীনাথ পট্টনায়ক প্রসাদ আনিলা।
আর বাণী মিশ্র অনেক প্রসাদ পাঠাইলা॥

কিন্তু বাণীনাথ সম্বন্ধে আর অধিক কিছু[৭] জানা যায় না। জয়ানন্দ খুব সম্ভবত এই বাণীনাথের সহিতই নিজেকে সম্পর্কযুক্ত করিয়াছেন।[৮] সম্ভবত গদাধরের তিরোভাবের পূর্বেই তিনি দেহরক্ষা করিয়াছিলেন। 'পাটপর্যটনে'ও লিখিত হইয়াছে যে গদাধরের ভ্রাতুষ্পুত্র নয়নানন্দ-মিশ্র ভরতপুরেই থাকিতেন। কিন্তু লেখকের মতে গদাধরের জন্ম হয় শ্রীহট্টে। আবার রামাই-বিরচিত 'চৈতন্যগণোদ্দেশদীপিকা'য় লিখিত হইয়াছে, "নবদ্বীপে জন্ম তার নীলাচলে স্থিতি।" নরহরি-ভণিতার একটি পদেও[৯] লিখিত হইয়াছে যে 'নদীয়াপুরে মাধব-মিশ্রের ঘরে' এক 'বৈশাখের কুহুদিনে' গদাধরপ্রভু জন্মলাভ করেন। আবার গদাধরলীলার প্রথম হইতে আমরা তাঁহাকে নবদ্বীপেই দেখিতে পাই। সুতরাং তিনি যে নবদ্বীপে জন্মলাভ করিতে পারেন, তাহারই সম্ভাবনা অধিক বলিয়া মনে হয়।

নরহরি-চক্রবর্তী জানাইয়াছেন যে[১০] মঙ্গল-বৈষ্ণব সহ একজন নয়ন-মিশ্র খেতরি-মহামহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। 'চৈতন্যচরিতামৃতে' মঙ্গল-বৈষ্ণবকে গদাধর-শাখাভুক্ত দেখিয়া বুঝা যায় যে আলোচ্যমান নয়নানন্দই খেতরি-উৎসবে যোগদান করেন। এইস্থলে উল্লেখযোগ্য যে 'ভক্তিরত্নাকরে'র[১১]

রাঢ়দেশে কাঁদরা নামেতে গ্রাম হয়।
তথা শ্রীমঙ্গল জ্ঞানদাসের আলয়॥

এইরূপ উল্লেখ দেখিয়া কেহ কেহ 'মঙ্গল' কথাটিকে জ্ঞানদাসের সহিত যুক্ত একটি বিশেষণ-বোধক পদ বলিয়া মনে করেন। 'পদামৃতমাধুরী'র চতুর্থ খণ্ডের ভূমিকায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় লিখিয়াছেন, "জ্ঞানদাস ব্রাহ্মণ এবং 'মঙ্গল-ঠাকুর নামে' পরিচিত ছিলেন।" আবার কেহ কেহ মনে করেন যে ইহা মঙ্গল-ঠাকুর বা মঙ্গল-বৈষ্ণবেরই নাম। 'বীরভূম বিবরণে'র তৃতীয় খণ্ডে[১২] শেষোক্ত মত প্রচারিত হইয়াছে।

(৬) চৈ. চ.—৩।১১, পৃ. ৩৪০ (৭) পূর্বোক্ত প্রেমবিলাসের শেষ বিলাসগুলির বর্ণনা ছাড়া (৮) দ্র.—জয়ানন্দ, গৌরীদাস (৯) গৌ. ত.—পৃ. ৩০০ (১০) ন. বি.—৬ষ্ঠ বি., পৃ. ৮৪; ৮ম. বি., পৃ. ১০৮; ভ. র.—১০।৪১৬; ১৪।১০১, ১৩২ (১১) ১৪।১৮০ (১২) পৃ. ১৫১

গ্রন্থকার জানাইতেছেন, "মঙ্গল ও জ্ঞানদাস দুইজন পৃথক ব্যক্তি।...মঙ্গল-ঠাকুরের নিবাস ছিল মুর্শিদাবাদ জেলার কীরিটকোনায়..." ইহার পর গ্রন্থকার মঙ্গল-ঠাকুর সম্বন্ধে নানাবিধ তথ্য[১৩] প্রদান করিয়াছেন। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয় তাঁহার 'জ্ঞানদাসের পদাবলী'র ভূমিকা মধ্যেও একই তথ্য পরিবেশন করিবার পর লিখিতেছেন, "মঙ্গল-ঠাকুরের তিন পুত্র—রাধিকাপ্রসাদ, গোপীরমণ এবং শ্যামকিশোর।"

কিন্তু মঙ্গল-বৈষ্ণব সম্বন্ধে কোথা হইতে উপরোক্ত তথ্যগুলি সংগৃহীত হইয়াছে তাহা উল্লেখিত হয় নাই। 'ভক্তিরত্নাকরে'র একটি মাত্র অস্পষ্ট উল্লেখ হইতে মঙ্গল-বৈষ্ণবকে জ্ঞানদাসের সহিত এইভাবে যুক্ত করিবার যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অবশ্য তিনি যে কাঁদরাবাসী ছিলেন না তাহাও জোর করিয়া বলা যায় না। 'গৌরপদতরঙ্গিণী'-ধৃত নরহরিদাসের একটি পদমধ্যে লিখিত হইয়াছে[১৪] :

মদন মঙ্গল নাম রূপে গুণে অনুপাম
আর এক উপাধি মনোহর।
খেতুরির মহোৎসবে জ্ঞানদাস গেলা যবে
বাবা আউল ছিলা সহচর॥

এই স্থলেও 'আউলিয়া'-মনোহর দাসই 'মদন-মঙ্গল' নামে পরিচিত ছিলেন বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু বৈষ্ণব সাহিত্যের মধ্যে যে তিনটি স্থলে মঙ্গলের স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়, সেইগুলির কোনটিতেই তাঁহাকে জ্ঞানদাসের সহিত যুক্ত করা হয় নাই। স্বয়ং নরহরি-চক্রবর্তীই খেতুরি-উৎসবের বর্ণনায় যে দুইবার তাঁহার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন, সেই দুইবারই 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র গদাধর-শাখার অনুসরণে নয়নানন্দ বা নয়ন-মিশ্রের নামের সহিত তাঁহার নামোল্লেখ করিয়াছেন। বস্তুত, 'কবিচন্দ্রে'র মত 'মঙ্গল'ও সম্ভবত একটি গুণবর্ধক উপাধিবিশেষ ছিল। কিন্তু ক্রমে ইহা কবিচন্দ্রের মতই বিশেষ এক ব্যক্তির সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়া গিয়াছে। 'নামামৃতসমুদ্রে' মঙ্গলের উল্লেখ আছে[১৫] :

অনন্ত আচার্য যদু গাঙ্গুলী মঙ্গল।

আবার স্বয়ং কবিকর্ণপূরও 'চৈতন্যচরিতামৃতমহাকাব্যে' মঙ্গলের উল্লেখ করিয়াছেন[১৬] :

আশৈশবং প্রভুচরিত্রবিলাসবিজ্ঞৈঃ
কেচিন্মুরারিরিতি মঙ্গলনামধেয়ৈঃ।

---

(১৩) গ্রন্থমতে ইনি রাঢ়ীপুরে বাস করিয়া কুলদেবতা নৃসিংহদেবের (শালগ্রাম) সাধনায় এমনি মগ্ন হন যে গদাধর-পণ্ডিত তাহা শুনিয়া নিজে আসিয়া ইঁহাকে দীক্ষাদান ও স্ব-পূজিত গৌরাঙ্গগোপাল বিগ্রহের সেবার ভার দেন। পণ্ডিতের অনুমতি পাইয়া ইনি তিনজন লোককে দীক্ষা দেন। গ্রন্থমধ্যে আরও বর্ণিত হইয়াছে যে রাঢ়ীপুরী নদীগর্ভে যায় এবং অঞ্চলটি কাঁদরা নামে অভিহিত হয়। (১৪) গৌ. ত.—পৃ. ৩১৩ (১৫) না. স.—৭৪ (১৬) চৈ. চ. ম.—৪২

যদ্বংশিলাস ললিতং সমলেখিতজ্ঞৈ
স্তত্তথিলোক্য বিলিলেখ শিশুঃ স এবঃ।

সুতরাং মঙ্গলকে পৃথক ব্যক্তি ধরিয়া জ্ঞানদাসের সহিত যুক্ত করা সমীচীন মনে হয় না।

যাহাহউক, 'ভক্তিরত্নাকর' হইতে জানা যায় যে নয়নানন্দ বোরাকুলি-মহামহোৎসবেও যোগদান করেন। নয়নানন্দের ভণিতায় কতকগুলি উৎকৃষ্ট বাংলা এবং ব্রজবুলি পদও দৃষ্ট[১৭] হয়। সম্ভবত পদকর্তা বৈষ্ণবদাস ইঁহাকেই নয়নানন্দ-দাস নামে অভিহিত করিয়াছেন।[১৮]

পূর্ব প্রসঙ্গে আসা যাইতে পারে। গদাধর শিশুকাল হইতেই সংসার-বিরক্ত ছিলেন।[১৯] পিতা মাধব-মিশ্র ছিলেন পরম বৈষ্ণব। মাধবেন্দ্র-পুরী তাঁহার গুরু ছিলেন[২০] এবং সেই সূত্রে তিনিও বৈষ্ণবসমাজ কর্তৃক বন্দিত হইতেন। তাঁহার স্ত্রী রত্নাবতীও ছিলেন পরমা ভক্তিমতী রমণী, এবং পিতামাতার যোগ্য সন্তান হিসাবে গদাধরও ছিলেন—

বিষ্ণুভক্তি বিরক্তি শৈশবে বৃদ্ধরীত।
মাধব মিশ্রের কুলনন্দন-উচিত॥২১

ঈশ্বর-পুরী নবদ্বীপে আসিলে গদাধরের এই ভক্তিভাব দেখিয়া স্বরচিত 'কৃষ্ণলীলামৃত' গ্রন্থখানি পড়াইয়া তাঁহার মনকে কৃষ্ণপ্রেমের প্রতি অধিকতর অনুরাগী করিয়া তুলেন। গদাধর তখন বালক মাত্র।

এই সময় নিমাইচন্দ্র পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছেন। একদিন তিনি পথের উপর হঠাৎ গদাধরকে ধরিলেন। গদাধর ন্যায় পড়িতেছেন, সুতরাং ন্যায়শাস্ত্রসম্মত আলোচনায় তাঁহাকে নিমাইএর প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে। উত্তর-প্রত্যুত্তর চলিল। গদাধর গলদঘর্ম হইয়া পড়িলে নিমাই তাঁহাকে অদূর ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করিয়া দিয়া সেদিনের মত নিষ্কৃতি দিলেন।

গৌর-গদাধরের মধ্যে আবাল্য সখ্য থাকায় তাঁহারা পুনরায় মিলিয়া মিশিয়া পাঠ অভ্যাস করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে একত্র হইয়া অদ্বৈত-গৃহে হাজির হইতেন। সেই স্থানে গদাধর লক্ষ্য করিতেন যে গৌরাঙ্গের প্রতি স্বয়ং অদ্বৈতপ্রভুর স্নেহাভিব্যক্তি প্রায়শই শ্রদ্ধা-ভক্তির সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া বন্দনায় গিয়া দাঁড়াইত। কিন্তু নিমাইত তাঁহারই একজন সঙ্গী। তাঁহার বালকচিত্ত অদ্বৈতের ঐরূপ অদ্ভুত আচরণে একপ্রকার কৌতুক অনুভব করিত। সম্ভবত এই সময় অদ্বৈতের নিকট তাঁহার পাঠাভ্যাসকালে লোকনাথ-চক্রবর্তী আসিয়া তাঁহার সতীর্থ হইলেন।

(১৭) ভ. র—১২।৩০৭৫; গৌ. ত.—পৃ. ১০৪, ১১১; H.B.L.—p. 44 (১৮) গৌ. ত.—পৃ. ৩২২; ম. আ. ত্রি.—পৃ. ১; বৈষ্ণবদিগ্দর্শনী মতে (পৃ. ২১), 'নবদ্বীপস্থ চাঁপাহাটি গ্রামে' (১৯) চৈ. ভা.—২।৭, পৃ. ১৩৯ (২০) ভ. মা.—ম. মা., পৃ. ২৬ (২১) চৈ. ভা.—২।৭, পৃ. ১৩৫

কিন্তু অদ্বৈতের মত পণ্ডিত ব্যক্তির আচরণ গদাধরের মনে প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে। তাছাড়া তিনি নিজেই দেখিয়াছেন স্বয়ং ঈশ্বরপুরী পর্যন্ত নিমাইর পাণ্ডিত্যের প্রতি কিরূপ শ্রদ্ধাবান ছিলেন। আর ইহাও তো সত্য যে বালবৃদ্ধ নির্বিশেষে কেহই তখন তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞানের নিকট আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। অথচ, পঠনে, কথোপকথনে, খেলাধূলায় নিমাই তাঁহারই একজন নিত্যসঙ্গী বলিয়া বালক-গদাধরের পক্ষে তাঁহার মধ্যে এক অলৌকিক সত্তাকে প্রত্যক্ষ করাও সম্ভব ছিল না। রহস্যোদ্ঘাটন করিতে না পারিয়া তাঁহার মন বিস্ময়াবিষ্ট হয়। বিদ্যাভ্যাস ক্ষেত্রে নিমাইর অনস্বীকার্য ধী-শক্তির স্মরণ-সূত্রে বিমুগ্ধাত্মা গদাধর একরকম আপনার অজ্ঞাতেই বৃহত্তর প্রতিভার নিকট আত্মসমর্পণ করিতে থাকেন।

কিশোর-বালক যৌবনে পদার্পণ করেন। ক্রমে তাঁহার মুগ্ধভাব কাটিয়া যায়। এই সময় গৌরাঙ্গপ্রভু গয়া হইতে ফিরিলেন।[২২] তখন তিনি এক সম্পূর্ণ নূতন মানুষ। তাঁহার পূর্ব চাঞ্চল্য সংহৃত, কৃষ্ণদর্শনের জন্য তিনি একান্তভাবে ব্যাকুল। ভাল করিয়া কথা পর্যন্ত বলিতে পারেন না। অবস্থা দর্শনে প্রতিবেশীদের মধ্যে সাড়া পড়িয়া গেল। একদিন তাঁহার নির্দেশে সকলে শুক্লাম্বর গৃহে মিলিত হইলেন। সদাশিব মুরারি শ্রীমান সকলে জড় হইয়াছেন।[২৩] গদাধরও আসিয়াছেন। তাঁহার নিকট তখন সমস্তই দুর্বোধ্য মনে হইতেছে। অথচ গৌরাঙ্গের প্রতি তাঁহার আকর্ষণ বোধকরি সর্বাধিক। তিনি একটু দূরে একাকী বসিয়া রহিলেন। এদিকে গৌরাঙ্গ আসিয়া ভাবাবেশে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিয়া অবিরত ক্রন্দন করিতে থাকিলে ভক্তবৃন্দ অস্থির হইলেন। কিছুক্ষণ পরে গদাধরও আর স্থির থাকিতে পারিলে না। তাঁহার হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। এবং তিনি প্রায় মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। গৌরাঙ্গ তাঁহাকে সান্ত্বনা দান করিলেন। কিন্তু গৌরাঙ্গজীবন পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যেন গদাধরের জীবনেরও পরিবর্তন ঘটিয়া গেল। এই সময় হইতে গদাধর ছায়ার মত অনুগত হইয়া গৌরাঙ্গপ্রভুকে অনুসরণ করিতে লাগিলেন। একদিন কৃষ্ণদর্শনাকাঙ্ক্ষী উন্মাদ গৌরাঙ্গ তাঁহাকে কৃষ্ণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাঁহার ব্যাকুলতা দেখিয়া জানাইলেন যে তাঁহার হৃদয়ের মধ্যেই কৃষ্ণ অধিষ্ঠিত আছেন। তৎক্ষণাৎ গৌরাঙ্গ নখাগ্রে বক্ষোদেশ ছিন্ন করিতে থাকিলে গদাধর ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে বিরত করিলেন। শচীদেবী ইহা শুনিয়া গদাধরকে গৌরাঙ্গের সর্বক্ষণের সঙ্গী হইবার অনুরোধ জানাইলে গদাধরও তখন হইতে নিজেকে প্রিয়রক্ষণের কার্যে নিয়োজিত করিলেন। চৈতন্যের অন্ত্যলীলার স্বরূপ-

---

(২২) গৌ. বি.-মতে (পৃ. ১৪৬) গদাধরও তাঁহার গয়াগমনসঙ্গী হন। কিন্তু অন্যত্র ইহার স্বপক্ষে একটা সমর্থন নাই। (২৩) চৈ. ভা.—২।১, পৃ. ৯৫

দামোদরকে যে ভার বহন করিতে হইয়াছিল, গৌরাঙ্গের যৌবনারম্ভেই গদাধর তাহা মস্তকে তুলিয়া লইলেন। এইভাবে স্বহৃদয়ে যে ভক্তিভাবের উদ্বোধন হইয়াছিল, তাহাই একনিষ্ঠ সেবার মধ্য দিয়া পথ করিয়া লইল।

মুকুন্দ-দত্ত গদাধরকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। একদিন চট্টগ্রাম হইতে বৈষ্ণব-শিরোমণি পুণ্ডরীক-বিদ্যানিধি নবদ্বীপে পৌঁছাইলে মুকুন্দ তাঁহাকে লইয়া পুণ্ডরীকের নিকট গেলেন। ধনবান পুণ্ডরীকের বিষয়স্পৃহার ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া গদাধরের মন সংশয়াচ্ছন্ন হইল। কিন্তু মুকুন্দের কৃষ্ণকীর্তনে পুণ্ডরীক ভাববিহ্বল হইলে গদাধর আপনার ভুল বুঝিতে পারিয়া প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণের জন্য মুকুন্দের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। তদনুযায়ী পুণ্ডরীক-বিদ্যানিধি পরবর্তী শুক্লাদ্বাদশীতে দীক্ষাদানের অভিপ্রায় জানাইলে গদাধর গৌরাঙ্গের সম্মতি গ্রহণ করিয়া দীক্ষা গ্রহণ করিলেন।

গদাধরের চিত্ত এখন স্থির হইয়াছে। তিনি নির্দ্বন্দ্ব চিত্তে সেবার পথে অগ্রসর হইতেছেন। বিশেষ লীলাকালে তিনি গৌরাঙ্গ প্রভুকে তাম্বূল যোগাইতেন। আবার রাত্রিতে তিনি গৌরাঙ্গ-শয্যাস্তিকে শয্যা রচনা করিয়া নিদ্রা যাইতেন[২৪] এবং এইভাবে উভয়ের মধ্যে যে ভাববিনিময় চলিত তাহারই ফলে পরস্পর পরস্পরকে[২৫] মাল্যাদি অর্পণ করিয়া শ্রদ্ধাবিনিময় করিতেন। এখন সত্যসত্যই যেন গদাধর মরমী পত্নীর মত গৌরাঙ্গের ভাবজগতের সঙ্গী হইয়াছেন। তাঁহার লীলায় তিনি নিজেই অংশগ্রহণ করেন। তাঁহার সহিত গৌর-লীলায় বিশেষ অংশ গ্রহণ করিতেন নরহরি-সরকার। তাঁহাদের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য মিলন ঘটিয়াছিল।[২৬] গৌরাঙ্গের দুইপার্শ্বে দুইজন অবস্থান করিয়া সঙ্গীত-নৃত্যাদির দ্বারা তাঁহার লীলাসঙ্গী হইতেন এবং তাঁহাকে বিপৎপাত হইতে রক্ষা করিতেন। পরে নিত্যানন্দ আসিয়া নরহরির স্থানে অধিষ্ঠিত হইলে গদাধরের সহিত তাঁহারও ঘনিষ্ঠতা হইল। আরও কিছুকাল পরে চন্দ্রশেখরের গৃহে কৃষ্ণলীলা নাটকাভিনয়ে গৌরাঙ্গপ্রভু স্বয়ং লক্ষ্মীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়া মর্মসঙ্গী গদাধরকে রুক্মিণীর ভূমিকায় অবতীর্ণ করাইলেন।

এই সকল কারণে এবং আশৈশব কৃষ্ণানুরাগী হওয়ায় গদাধর সমগ্র বৈষ্ণব সমাজের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন। ভূগর্ভ প্রভৃতি ভক্ত তাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করিয়া লন এবং তিনিও বিবিধ উপদেশাদি প্রদান করিয়া এবং তাঁহাদের অভিলাষাদি পূর্ণ করিয়া যথার্থ গুরুর কর্তব্য সম্পাদন করেন। কিন্তু স্নেহ-মমতায় তাঁহাদের প্রাণ মন ভরিয়া দিলেও তিনি নিজে ছিলেন নিস্পৃহ। যে-হৃদয়ানন্দকে তিনি বাল্যকালাবধি একান্ত মমতা ও বাৎসল্য-

(২৪) শ্রীচৈ. চ.—১।২।১৬-১৭ ; গৌ. লী., পৃ. ২৩, ৪৪ (২৫) ঐ—১।২।১২, ১৫-১৭ ; চৈ. ম. (লো.) ম. খ., পৃ. ১০১ (২৬) তু.—গৌ. লী—.পৃ . ২১, ২৩

সহকারে প্রতিপালন করিয়া এবং শাস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দিয়া উপযুক্ত শিষ্য করিয়া তুলিয়াছিলেন, একদিন গৌরীদাস-পণ্ডিত আসিয়া সেই হৃদয়কে লইয়া যাইতে চাহিলে তিনি তাঁহাকে সহজেই গৌরীদাসের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন।[২৭]

নিজে সংসারবিরাগী হইলেও গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস-গ্রহণ সিদ্ধান্ত অবগত হইবার পর কিন্তু গদাধর তাঁহার বসন-ভূষণ ও কৃচ্ছ্রসাধনাদির কথা স্মরণ করিয়া অভিভূত হইয়া পড়েন। সেই সময় তিনি স্বয়ং তাঁহাকে নানাভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। তখন আর তাঁহার সেই মুগ্ধভাব নাই, তিনি স্থিরনিশ্চয়। নানা যুক্তির অবতারণা করিলেন, সুকৌশলে শচীমাতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইলে তিনি শেষে ব্যক্তিগত ইচ্ছাকেও জলাঞ্জলি দিয়া বলিলেন[২৮]:

ঘরে থাকিলে কি ঈশ্বরে ব্রতী নহে।
গৃহস্থ সে সভার প্রীতের স্থল হয়ে॥
তথাপিহ মাথা মুণ্ডাইলে স্বাস্থ্য পাও।
যে তোমার ইচ্ছা তাই কর চল যাও॥

ইহা গদাধরের কেবল অভিমানসূচক উক্তি নহে। মধ্যে মধ্যে গৌরাঙ্গের কামনাই হইয়া উঠিত তাঁহারও বাসনা।

মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণ ও দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের পর গদাধর-পণ্ডিত ভক্তবৃন্দের সহিত নীলাচলে চলিয়া যান।[২৯] কিন্তু কয়েক মাস পরে ভক্তবৃন্দ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলে 'গদাধর পণ্ডিত রহিলা প্রভুপাশে।'[৩০] সমুদ্রতীরে যমেশ্বর-টোটাতে চিরস্থায়ী বাসা বাঁধিয়া তিনি মহাপ্রভুর আজ্ঞাতে গোপীনাথ-সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। এইস্থানে থাকিয়া তিনি পুনরায় তাঁহার আরাধ্য চৈতন্যের নিকটই দীক্ষা গ্রহণের ঐকান্তিক বাসনা জানাইয়াছিলেন। কিন্তু চৈতন্যের উপদেশানুসারে তিনি পর বৎসর বিদ্যানিধির নিকট পুনর্দীক্ষিত হন।

পর বৎসর মহাপ্রভু গৌড়পথে ধাবিত হইলে ভক্তবৃন্দের সহিত গদাধরও বাহির হইলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে ক্ষেত্র-সন্ন্যাস ছাড়িতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু বাহিরে যাহাই প্রতিভাত হউক না কেন, মহাপ্রভুর আদর্শকে তদনুরূপে গ্রহণ করা তাঁহার কোনও ভক্তের পক্ষে সম্ভব ছিল না। সেই আদর্শের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট থাকিলেও যখন তাহা তাঁহাদের ব্যক্তিগত আদর্শের প্রতিকূল হইয়াছে, তখনই ভক্তবৃন্দের মধ্য হইতে গুঞ্জন ধ্বনি উত্থিত হইয়াছে। সে আদর্শ বিগ্রহ-সেবা নহে। সে আদর্শ সম্মুখস্থ রক্তমাংসের

---

(২৭) ভ. র.—৭।৩৯২-৪০৬ (২৮) চৈ. ভা.—২।১৫, পৃ. ২৩৮ (২৯) চৈ. চ.—২।১০, পৃ. ১৪৭, ১৫৫; চৈ. না.—৮।৪৪ (৩০) চৈ. চ.—২।১৫, পৃ. ১৮২; শ্রীবাস-চরিত-লেখক বলিতেছেন (পৃ. ১১১), "প্রভু সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করিলে গদাধরপ্রভু বিরহে থাকিতে না পারিয়া নীলাচলে যাইয়া ক্ষেত্র-সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।"

মানুষটির প্রতি ভক্তি ও প্রেম। গদাধরের নিকট সেই মানুষটি ছেলেখেলার জিনিস ছিলেন না। তিনি সরাসরি জানাইয়া বসিলেন যে চৈতন্য-বিহার স্থলই তাঁহার পক্ষে নীলাচল; ক্ষেত্র-সন্ন্যাস রসাতলে যাউক, তাহাতে তাঁহার আপত্তি থাকার কথা নহে, চৈতন্যচরণ-দর্শনই তাঁহার নিকট কোটি বিগ্রহ সেবাপেক্ষা শ্রেয়। মহাপ্রভু জানাইলেন যে সেবাত্যাগ করিলে গদাধর প্রতিজ্ঞাভ্রষ্ট হইবেন। কিন্তু গদাধর অম্লানবদনে সে দায় মাথায় পাতিয়া লইলেন। শেষে মহাপ্রভু বলিলেন যে শ্রীক্ষেত্রে থাকিয়া গদাধর গোপীনাথ-সেবানিরত থাকিবেন, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা এবং তিনি তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে রাজী নহেন। গদাধর বিব্রত বোধ করিলেন, কিন্তু নিরুপায় হইয়া শুনাইয়া দিলেন যে চৈতন্যের জন্য তিনি যাইতেছেন না, গৌড়ে শচীমাতাকে দর্শন করিবার জন্য তাঁহাকে যাইতেই হইবে, সুতরাং মহাপ্রভু সঙ্গে না লইলেও তিনি একাকী যাইবেন।

ভক্তবৃন্দসহ মহাপ্রভু অগ্রসর হইলেন। গদাধরও কিছু দূরে থাকিয়া পৃথকভাবে চলিতেছেন। কটকে পৌঁছাইলে মহাপ্রভু তাঁহাকে ডাকাইয়া পুনর্বার নানাপ্রকার যুক্তির অবতারণা করিলেন: নীলাচল ত্যাগ করায় গদাধর তো প্রতিজ্ঞাভ্রষ্ট হইয়াছেনই, কিন্তু চৈতন্যসঙ্গলিপ্সারূপ একান্ত ব্যক্তিগত সুখের জন্য যে তিনি এতবড় ধর্মবিগর্হিত কর্ম করিয়া বসিলেন তাহাতে তিনি নিজেই যথেষ্ট যাতনা পাইতেছেন, গদাধর যদি নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করিয়া স্বীয় কর্তব্যকর্মে লিপ্ত হন, তাহাহইলে মহাপ্রভু সন্তোষলাভ করিবেন। মহাপ্রভু যাহাতে প্রকৃত সুখী হইতে পারেন, তাহাই গদাধর চিরকাল করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার ব্যক্তিগত কামনা-বাসনা বলিয়া বিশেষ কিছুই ছিল না। চৈতন্য ছিলেন তাঁহার নিকট প্রত্যক্ষ ভগবান। আর তিনি নিজে ছিলেন ভক্তিজগতের অতন্দ্র পথিক। ভগবানের জন্য তাঁহার অপরিম্লান ভক্তি তাঁহাকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করিল। নৌকারোহণের ঠিক সেই পূর্ব মুহূর্তটিতেই মহাপ্রভু বলিয়া ফেলিলেন, "আমার শপথ যদি আর কিছু বল।" গদাধর মূর্ছিত হইলেন।

মহাপ্রভু কিন্তু সেবার আর বৃন্দাবন-দর্শনের সাধ মিটাইতে পারেন নাই। গৌড় হইতে ফিরিয়া তাঁহাকেও বলিতে হইয়াছিল:

গদাধর ছাড়ি গেলাম ইহোঁ দুঃখ পাইল।
সেই হেতু বৃন্দাবন যাইতে নারিল॥

সর্বংসহ গদাধর কিন্তু এই প্রকার উক্তিতে ব্যথিত হইয়া বলিলেন যে চৈতন্যের অবস্থান-ভূমিই ত বৃন্দাবন; কিন্তু তৎসত্ত্বেও মহাপ্রভুর বাসনার মধ্যে বিপুল সার্থকতা আছে, লোক-শিক্ষার জন্যই তাঁহাকে বৃন্দাবন যাইতে হইবে। মহাপ্রভু যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলে গদাধর তাঁহাকে বর্ষার কয়েকটি মাস অপেক্ষা করিবার জন্য অনুরোধ জানাইলেন। মহাপ্রভু আর 'না' বলিতে পারিলেন না।

নীলাচলে গদাধরের প্রধান কার্য ছিল গোপীনাথ-সেবা আর ভাগবত-পাঠ। তিনি সুকণ্ঠ পাঠক ছিলেন এবং তাঁহার ভাগবতপাঠ ছিল অতুলনীয়। তাই তিনি মহাপ্রভুকে ভাগবতপাঠ শুনাইয়া তৃপ্তিদান করিতেন। ইহা ছাড়া তিনি একজন সুপাচকও ছিলেন। তিনি মহাপ্রভুকে যথানিয়মে তাঁহার বাসায় আনাইয়া ভিক্ষা-নির্বাহ করাইতেন। তিনি নিমন্ত্রণ জানাইলে মহাপ্রভুকে অনুরোধ রক্ষা করিতেই হইত। একবার নিত্যানন্দ তাঁহার জন্য গৌড় হইতে কিছু ভাল চাউল আনিলে তিনি স্বহস্তে রন্ধন করিয়া চৈতন্য ও নিত্যানন্দ উভয়কেই ভোজন করাইয়াছিলেন।

একবার বল্লভ-ভট্ট নীলাচলে আসিয়া স্ব-কৃত ভাগবতের টীকাটি মহাপ্রভুকে শুনাইতে চাহিয়া ব্যর্থ হন। তারপর তিনি একে একে স্বরূপাদি সকলের নিকটও বিফল-মনোরথ হইয়া শেষে গদাধর-পণ্ডিতের নিকট গিয়া একরকম জোর করিয়াই পাঠ আরম্ভ করিলে গদাধর তাঁহাকে অশ্রদ্ধা করিতে না পারিয়া তাহা শুনিতে বাধ্য হন। ক্রমে তাঁহার শুদ্ধ স্বভাবের প্রভাবে বল্লভের মন ফিরিয়া যায়। কিন্তু তিনি তাঁহার নিকট 'মন্ত্রাদি শিখিতে চাহিলে' গদাধর কিছুতেই রাজী হইতে পারেন নাই। তিনি স্পষ্ট জানাইলেন:

আমি পরতন্ত্র আমার প্রভু গৌরচন্দ্র।
তাঁর আজ্ঞা বিনা আমি না হব স্বতন্ত্র॥

বল্লভ-ভট্টের অহংকার দূরীভূত হইলে কিছুদিন পরে তিনি মহাপ্রভুর কৃপাপ্রাপ্ত হইয়া একদিন ভক্তবৃন্দসহ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ জানাইলেন। গদাধরের সহিত ইতিমধ্যে মহাপ্রভুর আর দেখা সাক্ষাৎ নাই। ভট্টের প্রতি উক্তরূপ আচরণে প্রভুর বিরাগভাজন হইয়াছেন মনে করিয়া গদাধর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। মহাপ্রভু তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। আজ তিনি তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

পথে পণ্ডিতেরে স্বরূপ কহেন বচন।
পরীক্ষিতে প্রভু তোমাকে কৈল উপেক্ষণ॥
তুমি কেন আসি তাঁরে না দিলা ওলাহন।
ভীতপ্রায় হঞা কেন করিলে সহন॥
পণ্ডিত কহেন প্রভু সর্বজ্ঞ শিরোমণি।
তাঁর সনে হট করি ভাল নাহি মানি॥

মহাপ্রভুর নিকটে আসিয়া তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে পদতলে পতিত হইলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে তুলিয়া বলিলেন:

আমি চালাইল তোমা তুমি না চলিলা।
ক্রোধে কিছু না কহিলা সকল সহিলা॥
আমার ভঙ্গীতে তোমার মন না চলিলা।
সুদৃঢ় সরলভাবে আমারে কিনিলা॥

দিনান্তরে গদাধর মহাপ্রভুকে ভক্তগণসহ নিমন্ত্রণ করিলেন। সেইস্থানে বল্লভ-ভট্টও চৈতন্যের আজ্ঞায় পণ্ডিতের নিকট হইতে তাঁহার পূর্বপ্রার্থিত সকল বাঞ্ছা পূরণ করিয়া লইলেন।

মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর শ্রীনিবাস-আচার্য নীলাচলে আসিয়া গদাধরের নিকট ভাগবত অধ্যয়ন করিতে চাহিলে পুরাতন ভাগবতটি ছিন্নপ্রায় হইয়া যাওয়ায় তিনি শ্রীনিবাসকে গৌড়ে গিয়া নরহরির নিকট হইতে একটি নূতন গ্রন্থ আনিবার জন্য নির্দেশ দান করেন।[৩১] বাল্যসঙ্গীদিগের সম্বন্ধেও তিনি নানা কথা বলিয়াছিলেন।[৩২] কিন্তু শ্রীনিবাস গৌড়ে ফিরিয়া পুনরায় নীলাচল-যাত্রাকালে পথিমধ্যে সংবাদ পান যে পণ্ডিত-গোস্বামী দেহরক্ষা করিয়াছেন।[৩৩]

কৃষ্ণদাস-কবিরাজ তাঁহার 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে গদাধর-পণ্ডিত-গোসাঁইর শিষ্যবৃন্দের একটি তালিকা দিয়াছেন :—

ধ্রুবানন্দ, শ্রীধর-ব্রহ্মচারী, ভাগবতাচার্য, হরিদাস-ব্রহ্মচারী, অনন্ত-আচার্য, কবিদত্ত, নয়ন-মিশ্র, গঙ্গামন্ত্রী, মামু-ঠাকুর, কণ্ঠাভরণ, ভূগর্ভ-গোঁসাই, ভাগবতদাস, বাণীনাথ-ব্রহ্মচারী, বল্লভ-চৈতন্যদাস, জিতা-মিশ্র, কাঠকাটা-জগন্নাথদাস, শ্রীহরি-আচার্য, সাদিপুরিয়া-গোপাল, কৃষ্ণদাস-ব্রহ্মচারী, পুষ্পগোপাল, শ্রীহর্ষ, রঘু-মিশ্র, লক্ষ্মীনাথ-পণ্ডিত, বঙ্গবাটী-চৈতন্যদাস, শ্রীরঘুনাথ, শিবানন্দ-চক্রবর্তী, অমোঘ-পণ্ডিত, হস্তি-গোপাল, চৈতন্য-বল্লভ, যদু-গাঙ্গুলী ও মঙ্গল-বৈষ্ণব।

ইঁহাদের মধ্যে মামু-ঠাকুর দীর্ঘজীবন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নরোত্তম নীলাচলে আসিলে তিনি তাঁহাকে নানাভাবে সংবর্ধনা জানাইয়া পূর্ববৃত্তান্ত শ্রবণ করাইয়াছিলেন।[৩৪] কবিকর্ণপূর তাঁহাকে 'জগন্নাথো মামুপাধির্দ্বিজোত্তমঃ' বলিয়াছেন।[৩৫] জিতামিত্র বা জিতামিশ্র এবং কাঠকাটা-জগন্নাথদাস উভয়েই খেতরি-মহামহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।[৩৬] কবিকর্ণপূর বলেন যে জিতামিত্র কামাদি ছয় রিপুকে জয় করিয়া

(৩১) প্রে. বি.—৪র্থ. বি., পৃ. ৩৫ (৩২) দ্র.—শ্রীনিবাস (৩৩) ভ. র.—১।৮৭১ ; ৩।৩০৯ ; মু.বি.-মতে (পৃ. ১৭৮–৮৫, ২০৪) বংশীবদনের পৌত্র রামচন্দ্র নীলাচলে আসিলে গদাধর তাঁহার প্রতি যথেষ্ট কৃপা প্রদর্শন করেন। (৩৪) ভ. র.—৮।২৬৯–৩৮১ ; ন. বি.—২য়. বি., পৃ. ৪৯, ৫০ (৩৫) গৌ. দী.—২০৫ ; ১৩২৭ সালের 'গৌরাঙ্গসেবক'-পত্রিকার বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় ভূষণচন্দ্র দাস মহাশয় লিখিয়াছেন যে মামু-গোস্বামীর 'পূর্বপুরুষগণের নিবাস বর্ধমান জেলায় ছিল' এবং মহাপ্রভু তাঁহাকে মামুঠাকুর সম্বোধন করিতেন বলিয়াই তিনি বৈষ্ণবসমাজে 'মামুঠাকুর বা মামু গোস্বামী নামেই পরিচিত' হন। (৩৬) প্রে. বি.—১৯শ. বি., পৃ. ৩০৯ ; ভ. র.—১০।৪১৫–১৬ ; ন.বি.—৬ষ্ঠ. বি., পৃ ৮৪, ৮৭ ; ৮ম. বি., পৃ. ১০৭

এই নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।[৩৭] ইহা সত্য হইলে তাঁহার নাম জিতা-মিশ্র না ধরিয়া জিতামিশ্রই ধরিতে হয়। জয়ানন্দও মহাপ্রভুর নীলাচল-লীলাবর্ণনা প্রসঙ্গে তাঁহার নামোল্লেখ করিয়াছেন।[৩৮]

কর্ণপূর, জয়ানন্দ এবং বৃন্দাবনদাসাদির গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে অদ্বৈতপুত্র স্বয়ং অচ্যুতানন্দও[৩৯] গদাধর শিষ্য ছিলেন।

(৩৭) গৌ. দী.—২০২ (৩৮) চৈ. ম. (জ.)—বি. খ., পৃ. ১৪৩ (৩৯) গৌ. দী.—৮৭ ; চৈ. ম. (জ.)—বি. খ., পৃ. ১৪২ ; চৈ. ভা.—৩।৪, পৃ. ২৮৮ ; ব. শি.—পৃ. ২৩৪

নরহরি-সরকার

ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে বর্ধমানের অন্তর্গত শ্রীখণ্ডের সরকার-বংশের খ্যাতি 'রাঢ়ে বঙ্গে সুপ্রচারিত' হইয়াছিল।[১] সম্ভবত সেই কারণে শ্রীখণ্ড গ্রামটি 'বৈদ্যখণ্ড' নামেও অভিহিত হইত।[২] গৌরাঙ্গ-আবির্ভাবের পূর্বে সেই বংশে নারায়ণদাস নামক এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন।[৩] জাতিতে বৈদ্য[৪] হইলেও 'দাস'-পদবীর দ্বারা তাঁহার বৈষ্ণবত্বই সূচিত হয়। তিনি রাজবৈদ্য[৫] ছিলেন এবং খ্যাতিমান ও প্রভাবশালী হইতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মুকুন্দও 'মহাবিদগ্ধ' 'ম্লেচ্ছরাজা'র দরবারে সম্মানিত রাজবৈদ্য[৬] হিসাবে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।[৭] মুকুন্দ ছাড়াও তাঁহার আর দুইজন পুত্র ছিলেন—মাধব এবং নরহরি।[৮] এই নরহরিই গৌরাঙ্গপ্রভুর অন্তরঙ্গ সাধন-সঙ্গী নরহরি-সরকার বা সরকার ঠাকুর।

শেখরের একটি পদে[৯] বলা হইয়াছে যে নরহরি 'গৌরাঙ্গ জন্মের আগে বিবিধ রাগিণী রাগে ব্রজরস করিলেন গান'। তাহা হইলে নরহরির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মুকুন্দ যে গৌরাঙ্গ অপেক্ষা অন্তত পক্ষে বার-চৌদ্দ বৎসরের বড় ছিলেন তাহা বলা যায়। বাল্যকাল হইতেই মুকুন্দ কৃষ্ণানুরাগী ছিলেন। তাঁহার রাজদরবারে অবস্থানকালে[১০] একদিন রাজশিরোপর একটি 'ময়ূর পুচ্ছের আড়ানি' উত্তোলিত হইলে তিনি শিখিপুচ্ছ দর্শনে প্রেমাবিষ্ট হইয়াছিলেন।

শেখরের পূর্বোল্লেখিত পদের বিবরণ ছাড়া নরহরির বাল্যকাল সম্বন্ধেও বিশেষ কিছু জানা যায় না। তিনি যে ঠিক কোন্ সময়ে গৌরাঙ্গ-পার্ষদরূপে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হন তাহাও

---

(১) গৌ. ত.—পৃ. ৩০২ (২) পা. নি.; বৈ.ব. (বৃ.)—পৃ. ৪ (৩) ভ. র.—১১।৭৩০; 'শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব' মতে নরহরির পিতার নাম নারায়ণদেব এবং মাতার নাম গোরী দেবী। (৪) চৈ. ম. (লো)—শে.খ., পৃ. ২১১; সূ. খ., পৃ. ৩৪ (৫) গৌ. বি.,—পৃ. ১১৫ (৬) দেবকীনন্দনের কোনও কোনও পুথিতে ইঁহাকে ভুলক্রমে মুকুন্দ-দত্ত বলা হইয়াছে। সম্ভবত সেই কারণে 'অভিরামলীলামৃত'-গ্রন্থেও (১৬শ.প., পৃ. ১২৯) ইনি মুকুন্দ-দত্ত হইয়া গিয়াছেন। (৭) চৈ. চ.—২।২৫, পৃ. ১৮০ (৮) ভ. র.——১১।৭৩০; ১৩৩৪ সালের 'গৌরাঙ্গ মাধুরী' পত্রিকার ফাল্‌গুন সংখ্যায় বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মাধবকে মধ্যমভ্রাতা বলিয়াছেন এবং উক্ত পত্রিকার ১৩৩৫ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় ভোলানাথ ব্রহ্মচারী মহাশয় কিন্তু নরহরির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হিসাবে একমাত্র মুকুন্দেরই নাম করিয়াছেন। কিন্তু মাধব এবং নরহরির মধ্যে কে যে বয়োজ্যেষ্ঠ কোথাও তাহা উল্লিখিত হয় নাই। (৯) গৌ. ত.—পৃ. ৩০২ (১০) চৈ. চ.—২।১৫, পৃ. ১৮০; চৈ, ম. (লো.)—স. খ., পৃ. ৩৪; বৈ. ব. (দে.)—পৃ, ভ; বৈ. ব—(বৃ.)—পৃ. ৪; অ.লী পৃ. ১২৯

বলা শক্ত। বৃন্দাবনদাস 'চৈতন্যভাগবত'-গ্রন্থে 'নরহরি'র নাম পর্যন্ত উল্লেখ করেন নাই। আবার 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র মধ্যেও গৌরাঙ্গ বাল্যলীলার সবিস্তার পরিচয় নাই। 'ভক্তি-রত্নাকর-গ্রন্থে'[১১] দেখিতে পাওয়া যায় যে গৌরাঙ্গের নগরসংকীর্তনকালে নরহরি উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু নরহরির মন্ত্রশিষ্য লোচনদাসের গ্রন্থ[১২] হইতে জানা যাইতেছে যে শ্রীবাসের গৃহে সংকীর্তনারম্ভকালে তিনি গৌরাঙ্গের অন্তরঙ্গ পার্ষদরূপে পরিগণিত হইয়াছেন। সুতরাং সঠিক সময় নির্দেশ করিতে[১৩] না পারা গেলেও গৌরাঙ্গলীলার প্রাগ্‌মধ্যাহ্নকালেই যে তিন তাঁহার হৃদয়ের উচ্চস্থানে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। গ্রন্থাদিতে তাঁহাকে ব্রজের মধুমতী[১৪] বলা হয়। কিন্তু এই নামকরণ সম্ভবত পরবর্তী-কালের। একদিন তিনি পিপাসার্ত বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দকে 'ভাজনে ভরিয়া' জল আনিয়া পান করাইয়াছিলেন।[১৫] মধু সদৃশ জল পানে ভক্তগণ পরিতৃপ্ত হন বলিয়াই সম্ভবত তাঁহার ঐরূপ নামকরণ হয়। উক্ত ঘটনাস্থলে কিন্তু নিত্যানন্দপ্রভুও উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং উহা পরবর্তিকালের ঘটনা। কিন্তু নবদ্বীপে প্রভুনিত্যানন্দ আসিয়া পৌঁছাইবার বহু পূর্বেই নরহরির স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল। তৎকালে তিনি গদাধর-পণ্ডিত প্রভৃতি গৌরাঙ্গের বাল্যসুহৃদবর্গের সহিত একত্রে গৌরাঙ্গের 'বেশের সামগ্রী সব দেন সজ্জ করি'।[১৬] সম্ভবত নবদ্বীপে তাঁহার একটি বাড়ীও ছিল[১৭] এবং তিনি ইচ্ছামত গৌরাঙ্গের গৃহে তাঁহার সহিত মিলিত হইতে পারিতেন।

গদাধর-পণ্ডিতের সহিত নরহরির ঘনিষ্ঠতা ছিল সর্বাধিক। গৌরাঙ্গ-লীলা বর্ণনায় পদ-কর্তৃগণ যেন নরহরিকে বাদ দিয়া গদাধরের কথা ভাবিতেই পারেন নাই।[১৮] গদাধর-নরহরির এই সম্পর্ক অনুধাবন করিলেই নরহরির সহিত গৌরাঙ্গসম্পর্কটিও স্পষ্ট হইয়া উঠে। কারণ গৌরাঙ্গ-পার্ষদবৃন্দের মধ্যে গৌরাঙ্গসম্বন্ধনিরপেক্ষ কোন প্রকারের মিলন অবাস্তর ছিল। এক্ষেত্রেও, নরহরি-গদাধরের বন্ধুত্ব গৌরাঙ্গ প্রেমনির্ভর ছিল। তাই গৌরাঙ্গের কৈশোর-যৌবনলীলা হইতে গদাধরকে বাদ দেওয়ার কল্পনা যেমন অবাস্তব, নরহরির প্রসঙ্গ বাদ দেওয়াও তেমনি নিরর্থক। উভয়ে তাঁহার নিকটে থাকিয়া তাঁহাকে পতনাদি বিপদের হাত হইতে রক্ষা করিতেন। কীর্তন আরম্ভ হইলেই 'গদাধর নরহরি করে ধরি

(১১) ১২।২০২১, ২০৬৪ (১২) ম. খ., পৃ. ৯৭,১০১,১০৭,১১৫,ইত্যাদি। (১৩) 'শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব' গ্রন্থে (পৃ. ৩) লিখিত হইয়াছে যে নরনারায়ণদেবের মৃত্যুর কিছুকাল পরে মুকুন্দ গৌড়গমনের পূর্বে নরহরিকে নবদ্বীপে অধ্যয়নের জন্য রাখিবার ব্যবস্থা করেন। (১৪) গৌ. ত.—পৃ. ৩০২ (১৫)ঐ—পৃ. ৩০৩ (১৬) ভ. র.—১২।২০২৩ (১৭) গৌ. লী.—পৃ. ৪৪ (১৮) ভ. র.—১২।৩০০৮; চৈ. ম. (লো.)—ম. খ., ১১৫, ১১৯; গৌ. লী.—পৃ. ২১, ২৩

গৌরহরি প্রেমাবেশে ধরণী লোটায়'।[১৯] এবং 'নরহরি অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া'[২০] তাঁহাকে প্রায়শই মূর্ছিত হইতে দেখা যায়। গদাধর বামপার্শ্বে থাকিতেন এবং নরহরির স্থান গৌরাঙ্গের দক্ষিণে একেবারে যেন সুনির্দিষ্ট ছিল।[২১]

গৌরাঙ্গ-হৃদয়ে নরহরির স্থান চির অক্ষুণ্ণ থাকিলেও ব্যবহারিক জীবনে কিন্তু ব্যত্যয় ঘটিয়াছিল। নিত্যানন্দ নবদ্বীপে আসিয়া সেই স্থান অধিকার করিলে নরহরি নীরবে তাঁহার বহুবাঞ্ছিত স্থানটি পরিত্যাগ করিয়া সরিয়া দাঁড়ান। 'চৈতন্যভাগবতে'র বর্ণনায় নবদ্বীপ-আগমনের পর হইতেই নিত্যানন্দকে গদাধরের সহিত গৌরাঙ্গের পার্শ্বে অবস্থিত দেখা যায়। দুইদিকে দুইজন থাকিতেন।[২২] নিত্যানন্দ দক্ষিণে থাকিয়া গৌরাঙ্গপ্রভুকে পতনাদি বিপদের হাত হইতে রক্ষা করিতেন। এমনকি, নীলাচলে গিয়াও তিনি সম্ভবত উক্তস্থানেই বিরাজমান ছিলেন।[২৩] কিন্তু তাহাতে অবশ্য নরহরির মাহাত্ম্য খর্ব হয় নাই। বরং 'চৈতন্যভাগবতে'র মধ্যে নরহরির নামের ইচ্ছাকৃত অনুল্লেখই তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব ও যোগ্যতার প্রকৃষ্ট পরিচয় বহন করিতেছে। কিন্তু এত বড় সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হওয়ার জন্য নরহরির হৃদয়-সমুদ্র হইতে কোনও উচ্ছল তরঙ্গধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায় নাই। তাঁহার আরাধ্য মানুষটি নিত্যানন্দকে যে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা লক্ষ্য করিতে গিয়া তিনি নিজেই যে কতখানি হারাইলেন, তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিবার অবসরই যেন তিনি পান নাই; বৈষ্ণব ধর্মের যে বিরাট তরঙ্গোচ্ছ্বাস সমগ্র ভারতভূমিকে প্লাবিত করিতে চলিয়াছিল, তাহা তাহার অভ্যুদয়-কেন্দ্রকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিবে কিনা, তাহা বিচার করিয়া দেখিবার চিত্তবৃত্তিও তাঁহার ছিল না।

নরহরি তাঁহার পূর্বস্থান হইতে সরিয়া আসিয়া গৌরাঙ্গসেবায় মনোনিবেশ করিলেন 'চৈতন্যভাগবত' হইতে জানা যায় যে অদ্বৈতপ্রভু যেইদিন গৌরাঙ্গ-প্রেরিত রামাই-পণ্ডিতের সহিত নবদ্বীপে পৌঁছান, সেইদিন গৌরাঙ্গ বিষ্ণুখট্টায় উঠিয়া বসিলে নিত্যানন্দ ছত্রধারণ করেন এবং গদাধর তাঁহাকে কর্পূর ও তাম্বূল যোগাইতে থাকেন।[২৪] পরবর্তিকালে আমরা দেখিতে পাই যে তাঁহাদের জীবনে উক্ত প্রকার কর্ম-বিভাগ বহাল থাকিয়া গিয়াছে।[২৫] আর নরহরি গ্রহণ করিয়াছেন গৌরাঙ্গসমীপে চামর ঢুলাইবার কার্য।[২৬] ইহাতে মনে হয় যে উপরোক্ত বিশেষ দিনটিতেই তাঁহার উপর এই কার্যভার আসিয়া পড়ে।

নরহরির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মুকুন্দের অন্তরেও 'চৈতন্যসম্মত-পথে নির্মল বিশ্বাস' চিরকাল

(১৯) ভ. র.—১২।২৯৯৩ (২০) ঐ—১২।২৯৯১ ; চৈ. ম. (লো.)—ম.খ., পৃ. ১০৭ (২১) গৌ. ত. —পৃ ১৬৫, ৭৩, ৩০২ (২২) চৈ. ভা.—২।২৩, পৃ. ২১৮, ২২৭ ; ২।২২, পৃ. ২০৯ ; গৌ. লী.—পৃ ১৬, ২৩, ২৫, ৩২, ৩৬, ৩৭ (২৩) গৌ. ত.—পৃ. ২৬৩ (২৪) ২।৬, পৃ. ১২৯ (২৫) ঐ—২।১০, পৃ. ১৫২ (২৬) গৌ. ত.—পৃ. ১৪৯, ১৫০, ১৫৪ ; গৌ. লী.—৩৭ ; দ্র.—নিত্যানন্দ

অটুট ছিল এবং তাঁহার পুত্র[২৭] রঘুনন্দনও আশৈশব অনুরাগী ভক্তে পরিণত হন। শ্রীখণ্ডে তাঁহাদের গৃহে প্রত্যহ গোপীনাথ-সেবা[২৮] চলিত এবং রঘুনন্দন পিতার সেবাবিধি আয়ত্ত করিয়াছিলেন। মুকুন্দ কার্যান্তরে গেলে বালকের উপরই গৃহদেবতার সেবাভার পড়িত এবং রঘুনন্দন পরমাভক্তি-সহকারে নৈবেদ্য নিবেদন করিয়া পূজা করিতেন। লোচনদাস, নরহরি-চক্রবর্তী এবং উদ্ধবদাস অন্যভাবে জানাইতেছেন[২৯] যে বালক রঘুনন্দনের ঐকান্তিক অনুরাগে বিগলিত হইয়া একদিন তাঁহার দেবতা প্রকৃতই নিবেদিত নৈবেদ্য ভক্ষণ করিয়াছিলেন। এইরূপ বর্ণনা গল্পকথা-মাত্র হইলেও রঘুনন্দনের সর্বজন-স্বীকৃত অনুরাগ এবং ভক্তিই হয়ত এইরূপ গল্পের সৃষ্টি করিয়া থাকিবে। তাঁহার সাহসিকতা সম্বন্ধেও একটি বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে।[৩০] তৎকালে অভিরাম-নামক নিত্যানন্দের জনৈক রহস্যময় সহচর দেশবাসীর নিকট একটি ভীতির বস্তু হইয়াছিলেন। একদিন রঘুনন্দনের শক্তি ও সাহস দেখিয়া স্বয়ং অভিরামও বিস্মিত হন এবং তাঁহার সুন্দররূপে[৩১] মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে অভিন্নমদনজ্ঞানে শ্রীখণ্ডের নিকটবর্তী বড়ডাঙা নামক গ্রামে তাঁহার সহিত আনন্দনৃত্য করেন।

প্রধানত, মুকুন্দ ও রঘুনন্দন গৃহেই থাকিতেন এবং নরহরি থাকিতেন নবদ্বীপে। কিন্তু নবদ্বীপ ও শ্রীখণ্ডের মধ্যে সকলেরই যাতায়াত চলিত। শ্রীখণ্ডে আর দুইজন পরমভক্ত বাস করিতেন—সুলোচন ও চিরঞ্জীব-সেন। উভয়েই গৌরভক্ত ছিলেন এবং 'খণ্ডবাসো নরহরেঃ সাহচর্য্যান্মহোত্তরৌ' হইয়াছিলেন।[৩২] তাঁহাদের সকলকে লইয়া বেশ একটি ছোট্ট দল হইয়াছিল। নবদ্বীপ-সূর্যের নিকট প্রভা সংগ্রহ করিয়া শ্রীখণ্ডে যেন একটি চন্দ্রমণ্ডল গড়িয়া উঠিতেছিল। প্রতি সন্ধ্যায় শেখর, শ্রীবাস-ভবনে যে সংকীর্তনধ্বনি উত্থিত হইয়া নবদ্বীপ-গগনকে প্লাবিত করিত, শ্রীখণ্ডে বসিয়া যেন তাহারই প্রতিধ্বনি শুনা যাইত। রঘুনন্দনাদির উৎসাহে 'খণ্ডের সম্প্রদায়' যে কীর্তন দলটি গড়িয়াছিলেন, সম্ভবত মধ্যে মধ্যে নরহরির আগমনে তাহা নব প্রেরণা লাভ করিত। গৌরাঙ্গ সকাশে নরহরির নৃত্য ও গান

(২৭) 'শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব'-গ্রন্থের লেখক বলিতেছেন (পৃ. ১৬, ৪৫) যে গৌরাঙ্গ মুকুন্দকে বলেন, "তোমার পত্নীর গর্ভে আমার স্বীকৃত পুত্র সাক্ষাৎ মদনাবতার শ্রীরঘুনন্দন জন্মগ্রহণ করিবেন। অতএব তোমাকে বিবাহ করিতে হইবে।" এবং "গুরু-পরম্পরা শুনিতে পাওয়া যায় যে, মহাপ্রভুর চর্বিত তাম্বূল সেবনে মুকুন্দ-পত্নী গর্ভবতী হয়েন। সেই গর্ভে রঘুনন্দনের জন্ম হয়।"—তথ্যের উৎস কি বলা হয় নাই। (২৮) গৌ. ত.—পৃ. ৩০৩; একই পদশেষে কিন্তু মদনের কথা বলা হইয়াছে এবং 'ভক্তি রত্নাকর' (১১।৭৪১)-মতেও রঘুনন্দন মদনগোপালকে নাড়ু খাওয়াইয়াছিলেন। (২৯) চৈ. ম. (লো.)—সূ. খ., পৃ. ৩৪; ভ. র.—১১।৭৪১; গৌ. ত.—পৃ. ৩০৩-৪—(৩০) গৌ. ত.—পৃ. ৩০৪; তু.—চৈ. ম. (লো.)—সূ. খ., পৃ. ৩৪; অ. লী.—পৃ. ৯৬-৯৮; অ. গো. ব.—পৃ. ৫ (৩১) বৈ. ব. (বৃ.)—পৃ. ৪; বৈ. ব. (দে.)—পৃ. ৩ (৩২) গৌ. দী.—২০৯

প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। তাই গৌরাঙ্গ-অভিষেককালে[৩৩] তাঁহাকে একটি দলের নেতৃত্ব করিতে দেখা যায়। আবার রঘুনন্দনাদি খণ্ডের ভক্তবৃন্দও মধ্যে মধ্যে নবদ্বীপে যাতায়াত করিতেন এবং বালক রঘুনন্দনের পরমাভক্তি লক্ষ্য করিয়া[৩৪] গৌরাঙ্গ তাঁহাকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন এবং মাল্যচন্দনাদির দ্বারা ভূষিত করিতেন। 'ভক্তমাল'-গ্রন্থে[৩৫] রঘুনন্দনকে চৈতন্যপার্ষদরূপেই গণ্য করা হইয়াছে। বৃন্দাবনদাসের একটি পদেও[৩৬] তাঁহাকে গৌরহরির সহিত নৃত্য করিতে দেখা যায়। শুধু রঘুনন্দন কেন, শ্রীখণ্ডের সকল ভক্তের প্রতিই গৌরাঙ্গের বিশেষ করুণা ছিল। একবার খণ্ডপুরে মহোৎসব উপলক্ষে গৌরাঙ্গপ্রভু সপার্ষদ্ নরহরি-গৃহে আসিয়া খণ্ডের ভক্তবৃন্দকে তৃপ্তিদান করিয়াছিলেন। সেদিন পরিবেশন করিয়াছিলেন স্বয়ং রঘুনন্দন।[৩৭]

রঘুনন্দনকে তথা শ্রীখণ্ডের বৈষ্ণবসম্প্রদায়কে গড়িয়া তুলিবার ব্যাপারে নরহরির প্রভাবের কথা ছাড়িয়া কেবলমাত্র তাঁহাকে একজন গৌরাঙ্গসেবক হিসাবে আখ্যাত করিলে তাঁহার সম্যক্ পরিচয় দেওয়া হয় না। তাছাড়া সমগ্র বৈষ্ণব-জগতের কাঠামো গঠনের মধ্যেও তাঁহার অবদান অবিস্মরণীয়। যে প্রতিভার বলে স্বরূপদামোদর এক সময় চৈতন্যমহাপ্রভুকে 'রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত' বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন, সেই প্রতিভা বা মৌলিক শক্তির অধিকারী-রূপেই সম্ভবত নরহরিও তাঁহাকে সর্বপ্রথম কৃষ্ণের অবতার বলিয়া অনুভব করিয়াছিলেন।[৩৮] চৈতন্য-প্রবর্তিত ভক্তিধর্মের ব্যাখ্যায় যিনিই পূজার্হ হউন না কেন, কিংবা স্বয়ং চৈতন্য যাঁহাকেই ভক্তির পাত্র বলিয়া গ্রহণ করুন না কেন, বৈষ্ণব-সমাজের সমস্ত প্রেরণার উৎস ছিলেন তাঁহাদের চর্মচক্ষুর সম্মুখস্থ রক্তমাংসের মানুষটিই। মুখে তাঁহারা যাহাই বলুন, তাঁহাদের ভক্তি ও প্রেমের একমাত্র আশ্রয়স্থল ছিলেন তিনিই। মানুষকে ভালবাসিয়াই মানুষের ভালবাসার তৃপ্তিময় সার্থকতা। কিন্তু মানুষের ভালবাসা কি এতটুকু যে সসীমকে অবলম্বন করিয়াই তাহা নিঃশেষিত হইবে! তাই সে তাহার প্রেমাস্পদকে অসীমের মর্যাদা দান করিতে চাহে, দেবতার আসনে বসাইয়া পূজা করিতে চাহে। নরহরি সে-যুগের ভক্তসমাজের মুখপাত্র হইয়া তাঁহাদের অন্তরাত্মার আকুতিকে ভাষাদান করিয়াছিলেন এবং অদ্বৈতপ্রভুর সকল প্রচেষ্টাকে যেন সার্থক করিয়াছিলেন। কোনও দ্বিধাসংকোচ তাঁহার পথে বাধা সৃষ্টি করিতে পারে নাই। তিনি এক নূতন গৌরাঙ্গমন্ত্রে গৌরাঙ্গ-পূজা প্রবর্তন করিলেন। বস্তুত, 'চৈতন্যের অন্তরঙ্গ ভক্ত' 'প্রেমের গাগরি' ঠাকুর-নরহরির প্রবর্তিত

(৩৩) গৌ. ত.—পৃ. ১৫০, ১৫২, ১৫৫ (৩৪) চৈ. ম. (লো.)—সূ. খ., পৃ. ২, ৩৪ ; ম. খ., পৃ. ১০৭, ১১৫, ১১৯, ১২৮ (৩৫) পৃ. ২৭ (৩৬) গৌ. ত.—পৃ. ১৬২ (৩৭) ঐ—পৃ. ২২৮ (৩৮) দ্র.—বৈ. দ., পৃ. ১৩

গৌরাঙ্গ-পূজাপদ্ধতি[৩৯] বিষয়ক রচনাগুলি লইয়াই 'শ্রীভক্তিচন্দ্রিকপটল' নামে একখানি পদ্ধতি-গ্রন্থও সংকলিত হয়। "এই গ্রন্থ শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীশ্রী ৺জগন্নাথদেবের সাক্ষাতে মহাভাগবতোত্তম সভায় ইঁহারই মন্ত্রশিষ্য শ্রীলোকানন্দাচার্য দিগ্বিজয়ী কর্তৃক প্রকাশিত হইয়া সকলের স্বাক্ষরিত হইয়াছিল।"[৪০] গ্রন্থের উপসংহারে লিখিত হইয়াছে—ইতি শ্রীমন্নরহরিমুখচন্দ্র বিনিঃসৃত শ্রীচৈতন্যমন্ত্র সুধানিকরাঃ শ্রীলোকানন্দাচার্যেণ যৎকিঞ্চিদাস্বাদ্য শ্রীশ্রীজগন্নাথসাক্ষাৎ শ্রীভাগবতোত্তমসভায়াং প্রকাশিতাঃ।

বাসু-ঘোষের পদ হইতে জানা যায় যে মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের সময় নরহরি এবং রঘুনন্দন উভয়েই নবদ্বীপে ছিলেন।[৪১] কিন্তু তিনি নীলাচলে গেলেও তাঁহাদের সহিত তাঁহার সংযোগ কোনদিনই ছিন্ন হয় নাই। নরহরি তখন নবদ্বীপ হইতে আসিয়া শ্রীখণ্ডেই বাস আরম্ভ করেন এবং শ্রীখণ্ড হইতেই তিনি প্রতি বৎসর নীলাচলে গিয়া মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিতেন; রঘুনন্দনও তাঁহার সহিত গমন করিতেন।[৪২] খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব সুলোচনও একত্রে গিয়া মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইতেন।[৪৩] নীলাচলে মহাপ্রভু নরহরিকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেন।[৪৪] প্রথমবার রথযাত্রা-উপলক্ষে বেড়া-কীর্তন অনুষ্ঠানের মধ্যে নরহরি এবং রঘুনন্দন যথাযোগ্যস্থলে নিযুক্ত হইয়া পুরস্কৃত হইয়াছিলেন[৪৫] এবং নরহরিকে একটি সম্প্রদায়ের প্রধান হইয়া নৃত্য করিতে হইয়াছিল। তাঁহার সেই মর্যাদাপূর্ণ স্থান চির-অক্ষুণ্ণ ছিল।[৪৬] সম্ভবত নীলাচলেই[৪৭] দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত লোকানন্দাচার্য নরহরির নিকট পরাজিত হইলে পূর্ব-শর্তানুযায়ী তাঁহাকে নরহরির শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে হয়।[৪৮]

নরহরি, মুকুন্দ ও রঘুনন্দন, ইঁহারা প্রত্যেকেই ছিলেন মহাপ্রভুর গর্বের বস্তু। নীলাচলে প্রথমবার গৌড়ীয় ভক্তগণকে বিদায় দেওয়ার সময় তিনি নানাভাবে মুকুন্দের প্রশংসা করিয়া[৪৯] এবং হোসেন-শাহের রাজদরবারে ঘটিত মুকুন্দের কৃষ্ণপ্রেমপরিচায়ক বৃত্তান্তটি আদ্যোপান্ত বিবৃত করিয়া সকলের নিকট তাঁহার 'দগ্ধহেম'সম 'নিগূঢ় নির্মল প্রেমে'র

---

(৩৯) দ্র.—শ্রীবাসচরিত, পৃ. ১১৭; অ. প্র.-মতে (২০শ. অ., পৃ. ৯১) গৌরীদাস-গৃহে গৌর-নিতাই বিগ্রহপ্রতিষ্ঠাকালে অদ্বৈতপ্রভু অচ্যুতানন্দের নিকট নরহরি-প্রবর্তিত গৌরাঙ্গপূজাপদ্ধতি অনুমোদন করেন। (৪০) শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব, পৃ. ১১৮ (৪১) গৌ. ত.—পৃ. ২৪২ (৪২) চৈ.চ.—২।১০, পৃ. ১৪৭; ২।১১ পৃ. ১৫৩; ২।১৬, পৃ. ১৮৬; শ্রীচৈ. চ.—৪।১৭।১৩; চৈ. না.—৯।৫, ১০।৭, ১০।১৩; চৈ. ম. (লো.)—বি. খ., পৃ. ১৪৪ (৪৩) শ্রীচৈ.চ.—৪।১৭।১৩ (৪৪) ভ. র.—৮।২৮৬ (৪৫) চৈ.চ.—২।১৩, পৃ. ১৬৪; শ্রীচৈ. চ. (?)—৪।১।৫ (৪৬) চৈ. চ.—৩।১০ পৃ. ৩৩৫ (৪৭) ন. শা. নি. (৪৮) 'শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণবে' (পৃ. ২৮, ২৯) বলা হইয়াছে যে লোকানন্দ পরে 'ভক্তিসার সমুচ্চয়'-গ্রন্থে স্বীয় গুরুকে প্রণাম নিবেদন করিয়াছেন। (৪৯) চৈ. চ.—২।১৫, পৃ. ১৮০

উল্লেখ করিলেন। শ্রীখণ্ডের একটি পুষ্করিণীর বাঁধাঘাটের নিকটে স্থাপিত কৃষ্ণমন্দিরে রঘুনন্দন প্রত্যহ পূজা করিতেন। তন্নিকটস্থ কদম্ব বৃক্ষে যে বারমাসই ফুল ফুটিত তাহা যে রঘুনন্দনেরই কৃষ্ণানুরাগের ফল, মহাপ্রভু তাহারও উল্লেখ করিলেন এবং তাঁহাকে বিশেষভাবে সম্মানিত করিয়া[৫০] একমাত্র 'শ্রীকৃষ্ণসেবনে' আত্মনিয়োগ করিতে আজ্ঞাদান করিলেন। কিন্তু মুকুন্দ সংসারী ও গৃহকর্তা ছিলেন বলিয়া মহাপ্রভু তাঁহাকে পরিবারের ব্যয় নির্বাহার্থ 'ধর্মধন উপার্জনে'র জন্য উপদেশ দিলেন। আর, রঘুনন্দন-মুকুন্দাদির সহিত সংসার-বন্ধনে বদ্ধ থাকিলেও নরহরি ব্যক্তিগতভাবে ছিলেন ব্রহ্মচারী। তাই মহাপ্রভু তাঁহাকে ভক্তবৃন্দের সাহচর্যে দিনযাপন করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। পাত্রবিশেষে মহাপ্রভুর নির্দেশ ছিল বিভিন্ন। ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য তাঁহার নিকট তৃণবৎ অকিঞ্চিৎকর ছিল। এত বড় শক্তিমান ধর্মগুরুর এমন নিস্পৃহ আচরণানুষ্ঠানের তুলনা জগতে বিরল; এবং নরহরি ছিলেন গুরুরই যথার্থ অনুগামী। 'চৈতন্যভাগবত'-গ্রন্থে আপনার ও শ্রীখণ্ড-ভক্তবৃন্দের ইচ্ছাকৃত অনুল্লেখ সত্ত্বেও স্বীয় শিষ্য লোচনের গ্রন্থে নিত্যানন্দ-প্রশস্তি জ্ঞাপনার্থে তাঁহার ঐকান্তিক ইচ্ছা-সম্বন্ধীয় কিংবদন্তীর[৫১] মধ্যে যদি বিন্দুমাত্র সত্যও লুক্কায়িত থাকে তাহা হইলে তাহা তাঁহার অকপটভাবেই চৈতন্য-পদাঙ্ক অনুসরণের প্রমাণ বহন করিয়া আসিতেছে।

নরহরি গীতাকারে গৌরাঙ্গ বিষয়ক ছোট ছোট পদ্যের রচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন।[৫২] ইহাতেই গৌরচন্দ্রিকার প্রথম সৃষ্টি। গৌরলীলাঘটিত পদ রচনা করিবার প্রথম পথ-প্রদর্শক যে ঠাকুর-নরহরি, তাহা বাসুদেব-ঘোষ নিজ পদে ব্যক্ত করিয়াছেন

শ্রীসরকার ঠাকুরের পদামৃত পানে।

পদ্য প্রকাশিব বলি ইচ্ছা কৈনু মনে॥

নরহরি যে গৌরাঙ্গলীলা বিষয়ক পদ রচনা করেন এবং তিনি যে গৌর-গদাধর পূজা ও নাগরী-ভাবের উপাসনার প্রবর্তক সে-সম্বন্ধে প্রায় সকল পণ্ডিত ব্যক্তিই[৫৩] একমত। অল্পসংখ্যক হইলেও তাঁহার কয়েকটি ব্রজবুলি পদও পাওয়া যায়।[৫৪] কিন্তু

(৫০) 'শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণবে' লিখিত হইয়াছে (পৃ. ৫২, ৫৩) যে মহাপ্রভুর স্বীকৃত পুত্র রঘুনন্দন ৮ বৎসর বয়সে গৌরভাবামৃত স্তোত্র দ্বারা চৈতন্যবন্দনা করেন এবং নীলাচলে সংকীর্তনাধিবাসকালে চৈতন্য সমস্ত ভক্তসমক্ষে রঘুনন্দনের দ্বারা মাল্যচন্দন প্রদান করাইয়া ও কীর্তনান্তে দধিহরিদ্রাভাণ্ড ভাঙ্গাইয়া তাঁহাকে উক্ত কার্যের অধিকারী করেন। রঘুনন্দনের বংশধরগণ এযাবৎ উক্ত কার্য করিয়া আসিতেছেন। (৫১) চৈ. ম. (লো.)—পৃ. ॥৶—॥৶৹ (৫২) শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব—পৃ. ৩১-৩২ (৫৩) হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন (পদাবলী পরিচয়), রায়সাহেব দীনেশচন্দ্র সেন (Chaitanya and His Companions, p. 12), ডা. সুকুমার সেন (বিচিত্র সাহিত্য, পৃ. ১১১), ডা. বিমানবিহারী মজুমদার (চৈ. উ., পৃ. ২৬৭) (৫৪) HBL.—p. 3২.

তাঁহার গৌরলীলাত্মক পদ-রচনা সম্বন্ধে বলা যায় যে সম্ভবত মহাপ্রভুর নীলাচল-বাসকালেই বিয়োগবেদনা স্পষ্ট উৎসমুখ হইতে গৌরাঙ্গ-সঙ্গোদ্ভূত সঞ্চিত আবেগরাশি তাঁহার স্মৃতির দুয়ার উদ্ঘাটিত করিয়া কাব্যরস-নির্ঝরিণীরূপে প্রবাহিত হয় এবং তিনি অসংখ্য নদীয়া-নাগরীভাবের পদও রচনা করিয়া যান। মীরাবাঈ-এর নিকট বৃন্দাবন মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া অন্য পুরুষের অস্তিত্ব যেমন অবিশ্বাস্য ছিল, গৌরচরণার্পিতপ্রাণ নরহরির পক্ষেও যেন তেমনি নবদ্বীপধামে দ্বিতীয় পুরুষের অস্তিত্ব-কল্পনা অবান্তর ছিল। চৈতন্য-তিরোভাবের পরেও সম্ভবত তিনি তাঁহার অতীত স্মৃতিগুলিকে কাব্য রচনার মধ্য দিয়া অনুধ্যান করিতে থাকেন। কারণ তাঁহার কয়েকটি পদে মহাপ্রভুর জীবনের শেষদিকের কথা[৫৫] এবং কয়েকটিতে তাঁহার রাধাভাবের কথা বর্ণিত[৫৬] দেখা যায়। কিন্তু সমস্ত গৌরাঙ্গলীলাকে 'ভাষা'য় ('অর্থাৎ বাঙ্গালা ও ব্রজবুলী'তে[৫৭]) লিপিবদ্ধ করিয়া জনসমাজের বোধগম্য করাইবার জন্য তাঁহার উদগ্র আকাঙ্ক্ষা ছিল। তিনি লিখিয়াছেন[৫৮]:

এ গ্রন্থ লিখিবে যে এখনো জন্মে নাই সে
জন্মিতে বিলম্ব আছে বহু।

তাই নিজের দ্বারা আর তাহা সম্ভব না হওয়ায় অন্য কাহারও দ্বারা লিখিত হইবে বলিয়া তিনি আশা করিয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে বাসুদেব ঘোষ এবং বিশেষ করিয়া লোচনদাস কর্তৃক রচিত কাব্য-কবিতার দ্বারা তাঁহার সেই আশা কথঞ্চিৎ পূর্ণ হইয়াছিল।[৫৯] প্রকৃতপক্ষে, নরহরির সহিত বাসুদেব এবং লোচনকেও এই পদ-রচনারম্ভের কৃতিত্ব-গৌরব দিতে হয়। তাঁহাদের মধ্যে আবার লোচন ছিলেন নরহরির অনুরক্ত শিষ্য।

লোচনদাসের নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার কোগ্রামে এবং তিনিও বৈদ্যবংশসম্ভূত[৬০] ছিলেন। পিতামাতার নাম যথাক্রমে কমলাকর দাস ও সদানন্দী। পিতৃকুল মাতৃকুল একই গ্রামে বাস করিত। মাতামহের নাম ছিল পুরুষোত্তম-গুপ্ত এবং মাতামহীর নাম অভয়া দাসী। পিতৃ-মাতৃ উভয়কুলেই লোচন একমাত্র পুত্রসন্তান ছিলেন। সম্ভবত সেই কারণেই তিনি অতিশয় আদুরে ও বিদ্যাশিক্ষায় অমনোযোগী হইয়াছিলেন। কিন্তু মাতামহ পুরুষোত্তম-গুপ্ত একটু শক্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি মারধর করিয়া লোচনকে অক্ষর শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং বিদ্যাভ্যাস করাইয়াছিলেন। কিন্তু লোচনের বাল্য-কৈশোরাদি সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু জানা যায় না, কিংবা কোন্ সময়ে কেমন করিয়া

(৫৫) গৌ. ত.—পৃ. ১৯২, ২০১ (৫৬) ঐ—পৃ. ৮ (৫৭) বিচিত্র সাহিত্য—পৃ. ১১০ (৫৮) গৌ. ত.—পৃ. ৮ (৫৯) উপরোক্ত উদ্ধৃতি দেখিয়া চৈ. উ.-গ্রন্থে (পৃ. ৪০) ডা. বিমানবিহারী মজুমদার লিখিতেছেন যে তখনও পর্যন্ত গৌরাঙ্গ-জীবনলীলার : রতে হয় যে নরহরি বাসুদেব লোচনাদির গৌরলীলা বিষয়ক 'ঐরূপ পদ শ্রীচৈতন্যের জীবন৮ · পূর্বে রচিত হইয়াছিল।' (৬০) চৈ. ম. (লো.)—শে. খ., পৃ. ২১৩; প্রে. বি.—১৯ অ. † ব., পৃ. ৩১৫

তিনি নরহরির সংস্পর্শে আসিলেন তাহাও অজ্ঞাত রহিয়াছে। তবে তাঁহার কোন কোন পদ[৬১] পাঠ করিয়া ধারণা জন্মে যে 'গৌরপ্রেম মহাধন' ভজনা করিবার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও প্রায় দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি তাহা করেন নাই। চৈতন্য-তিরোভাবের এবং সম্ভবত পিতৃমাতৃ-বিয়োগের পর তিনি -'অনাথ'[৬২] হইয়া নরহরির পদাশ্রয় গ্রহণ করিলে সরকার ঠাকুর তাঁহার প্রতি কৃপাপরবশ হন এবং 'তাঁর পদপ্রসাদে' লোচনের চরিত-কাব্য রচনার "পথের প্রতি আশ' জন্মে।[৬৩] তৎপূর্বে একমাত্র বৃন্দাবনদাসই বাংলা ভাষায় চৈতন্য-চরিত-কাব্য রচনা করেন।[৬৪] তাহারও পূর্বে দামোদর-পণ্ডিতের প্রশ্নোত্তর হিসাবে গৌরাঙ্গলীলা সহচর মুরারি-গুপ্ত সংস্কৃত ভাষায় কড়চা রচনা করায় তাহাই এবম্প্রকার সমস্ত রচনার মূলসূত্ররূপে গৃহীত হইয়াছিল।[৬৫] সেই 'মুরারি-মুখোদিত দামোদর-সংবাদ শুনিয়া'[৬৬] লোচনের মধ্যেও কবিত্ব শক্তি স্ফুরিত হয়। তিনি 'পাঁচালী প্রবন্ধে…গৌরাঙ্গচরিত' রচনা করিয়া স্বীয় গুরুর অভিলাষ পূর্ণ করিতে প্রয়াসী হন। কিন্তু নিজেকে মূর্খ, অজ্ঞান ও অযোগ্য মনে করিয়া সংকুচিত হইলে সম্ভবত নরহরিই তাঁহাকে উৎসাহিত করিয়া কর্মে প্রবুদ্ধ করেন। এইভাবে তিনি 'মুরারির কড়চা'কে মূলসূত্ররূপে গ্রহণ করিয়া, সম্ভবত বৃন্দাবনের 'চৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থ পাঠ করিয়া[৬৭] নরহরি ও মহান্তদিগের মুখে নানাবিধ বিবরণ শুনিয়া[৬৮] এবং সর্বোপরি নরহরির নিকট উৎসাহ ও প্রসাদ লাভ করিয়া তাঁহার 'চৈতন্য মঙ্গল' কাব্য সমাপ্ত করেন।[৬৯]

'চৈতন্যমঙ্গল'ই লোচনের একমাত্র কবিকৃতি নহে। লোচন বা সুলোচনদাসই বোধ হয় 'ধামালী' পদের প্রথম স্রষ্টিকর্তা।[৭০] এবং 'লোচন ছিলেন নরহরিঠাকুর-প্রবর্তিত নদীয়া-নাগরীভাবের প্রধান সাধক-কবি'। গুরুর পদাঙ্ক অনুসরণে তিনি নদীয়া-নাগরীভাবের যে অসংখ্য সুন্দর সুন্দর পদ রচনা করেন, তাহাতে তিনি তাঁহার কবিত্বে সুস্পষ্ট ছাপ রাখিয়া গিয়াছেন। 'শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব'-গ্রন্থের গ্রন্থকার বলেন যে ইহা ছাড়াও তিনি 'দুর্লভসার', 'আনন্দলতিকা', 'দেহনিরূপণ,' 'চৈতন্যপ্রেমবিলাস', 'ধাতুতত্ত্বসার', 'রাগলহরী', 'রাসপঞ্চাধ্যায় পদ্যানুবাদ' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন[৭১] এবং ১৩৫৬ সালের 'বংগশ্রী'-পত্রিকার বৈশাখ-সংখ্যায় রামশশী কর্মকার মহাশয় 'আনন্দলতিকা'

(৬১) ভ. র.—১২।৩৭৬৪-৬৫ ; গৌ. ত.—পৃ. ২১ (১২শ.) (৬২) চৈ. ম. (লো.)—শে. খ., পৃ. ২১২ ; সূ. খ., পৃ. ৩৫ (৬৩) ঐ.—পৃ. ২১২ (৬৪) অ. ব.—১ম. ম., পৃ. ১ (৬৫) চৈ. ম. (লো.)—শে. খ., পৃ. ২১২ (৬৬) ঐ—সূ. খ., পৃ. ৪ ; ম. খ., পৃ. ৮০ ; শে. খ., পৃ. ২১২ (৬৭) ঐ—সূ. খ., পৃ. ৩ (৬৮) ঐ—সূ. খ., পৃ. ৩৩, ৩৫ ; (শে. খ.—পৃ. ২১২) (৬৯) গ্রন্থরচনার কাল স্থিরীকৃত হয় নাই। দীনেশচন্দ্র সেন বলেন (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পৃ. ৩৬), ১৫৭৫ খ্রী.। কিন্তু ইহা তাঁহার সিদ্ধান্ত নহে ; প্রবাদ মাত্র। (৭০) বিচিত্র সাহিত্য—পৃ. ১১৮ ; প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য (৫ম. ও ৬ষ্ঠ. খণ্ড)—পৃ. ২২৮ (৭১) পৈ. ৮২ ; ব. দি.—পৃ. ৭১

ও 'দুর্লভসারের সহিত লোচনের লিখিত 'বস্তুতত্ত্বসার' ও 'শিবদুর্গা সংবাদ' নামক আরও দুইটি পুথির সংবাদ দিয়াছেন। এই গ্রন্থগুলির সকলের সম্বন্ধে অবশ্য নিঃসংশয় হওয়া যায় না। কিন্তু এই সমস্ত গ্রন্থ ছাড়াও 'ললিতলাবণ্যময় প্রাণস্পর্শী ভাষায়' রামানন্দের 'জগন্নাথবল্লভনাটকে'র পদ্যানুবাদও লোচনের এক অপূর্ব সৃষ্টি। নাটকের কয়েকটি গান তিনি ব্রজবুলি ভাষাতেও অনুবাদ করিয়াছেন।[৭২]

এদিকে অস্তাচলগত চৈতন্য-সূর্য ভক্ত নরহরির হৃদয়াকাশকে সায়াহ্ন-রাগলিপ্ত করিয়া দিতেছিল। কিন্তু কোনদিনই তিনি নিশ্চিন্ত আরামে বসিয়াছিলেন না। সপ্তদশ শতকের শেষভাগে[৭৩] ভরত-মল্লিক রচিত 'চন্দ্রপ্রভায়'[৭৪] লিখিত হইয়াছে যে নরহরি গরুড়ধ্বজ-সেনের কন্যার পাণিগ্রহণ করিলে তাঁহার চারিটি কন্যা সন্ততি জন্মগ্রহণ করেন এবং মালঞ্চ-নিবাসী সুপ্রভাত সেন, খানাগ্রাম-নিবাসী মাধব-মল্লিক ও বিষ্ণু-মল্লিক এবং বরাহনগর-গ্রামনিবাসী রমাকান্ত-সেনের সহিত ঐ কন্যা চতুষ্টয়ের বিবাহ ঘটে।[৭৫] কিন্তু নরহরির 'শ্রীকৃষ্ণভজনামৃত'-গ্রন্থে পূর্ববর্তী পরমহংসবৃন্দ এবং তাঁহাদের গুরু শুকদেবের বন্দনাদি পাঠ করিয়া গৌরগুণানন্দঠাকুর মহাশয় সুসিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে নরহরি আকুমার ব্রহ্মচারী বা পরমহংস ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, এই ব্রহ্মচর্যের পথেই ছিল তাঁহার কঠোর তপশ্চরণ। একদিকে যেমন বড়ডাঙার জঙ্গলে বসিয়া তাঁহার সাধন ভজন চলিত অন্য দিকে তেমনি কর্মসাধনার মধ্য দিয়াও তিনি তাঁহার আরাধ্য মহামানবের প্রজ্বলিত দীপশিখামূলে তৈল-সিঞ্চন করিয়া চলিতেছিলেন। 'ভক্তিচন্দ্রিকা', 'শ্রীকৃষ্ণভজনামৃত', 'শ্রীচৈতন্যসহস্রনাম' ও 'ভাবনামৃত' প্রভৃতি গ্রন্থ-রচনার[৭৬] মধ্য দিয়া তিনি স্বীয় শক্তি ও সামর্থ্যকে সার্থক করিয়াছিলেন। আবার চৈতন্য-প্রবর্তিত ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য মতবাদ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে কার্যকরিভাবে তাহা প্রচারের ব্যবস্থার দিকেও তাঁহার দৃষ্টি ছিল। লোচন রঘুনন্দনাদি কয়েকজন ভক্তকে দীক্ষাদানের মধ্যে তাঁহার সেই শক্তির প্রয়োগ ঘটিয়াছিল। অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ তখন পরলোকগত। বৈষ্ণবধর্ম-মহাসমুদ্রের উপর তখন বিভেদের দ্বীপগুলি জাগিয়া উঠিতেছে। বৃদ্ধ নরহরি সংস্কৃতি-রক্ষার ভার মাথায় তুলিয়া লইলেন। দূর বৃন্দাবনে যখন বৈষ্ণব-গোস্বামী-বৃন্দ এক বিরাট আধ্যাত্মিক উপনিবেশ গঠনের মধ্য দিয়া চৈতন্য-স্বপ্নকে সার্থক করিতেছিলেন, তখন বৃদ্ধ নরহরি যেন গৌড়বংগের একান্তে এক-জীর্ণপ্রায় বিশাল সৌধের দ্বারপ্রান্তে বসিয়া তাহার সুবিপুল ঐশ্বর্য-সম্ভার রক্ষার্থ অতন্দ্র প্রহরীর মত নিশাযাপন করিতে লাগিলেন।

---

(৭২) প. ক. (প. প.)—পৃ. ২০১ ; গৌ. ত. (প. প.) —পৃ. ২৪৫ ; HBL—p. 66 (৭৩) ১৬৭৫ খ্রী ? (৭৪) পৃ. ৩৫৫ (৭৫) ঠাকুর নরহরি-সরকার ও রঘুনন্দন-ঠাকুর—ব. সা. প. প., ১৩০৬ (৭৬) শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব—পৃ. ২৮-৩১

পরবর্তিযুগে আবার একবার প্লাবন আসিয়াছিল। বৃন্দাবনাগত সেই মহাস্রোতের ভগীরথ ছিলেন শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ। কিন্তু ইঁহাদিগের মধ্যে নরোত্তমের উপর নরহরির পরোক্ষ প্রভাব পড়িয়াছিল বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে। গৌড়ে যাতায়াতকালে নরোত্তমের পিতা কৃষ্ণানন্দ-রায়ের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটিয়াছিল।[৭৭] সেই সূত্রে কৃষ্ণানন্দ তাঁহার দ্বারা প্রভাবিত হইয়া থাকিবেন। নচেৎ নরোত্তমের আবাল্য চৈতন্যানুরাগের বিশেষ কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রচারকত্রয়ের মধ্যে যিনি সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীনিবাসের উপর তাঁহার অনস্বীকার্য প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়িয়াছিল। শ্রীনিবাসকে মন্ত্রদীক্ষা দান করায় গোপাল-ভট্টের মর্যাদা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল এবং শ্রীনিবাসের মধ্যে প্রভূত শক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়ায় তাঁহার মধ্যে চৈতন্যের পুনরাবির্ভাব ঘটিয়াছে বলিয়া সুবিধাজনক ব্যাখ্যাও প্রদান করা হইয়াছে। কিন্তু যিনি সেই বালক শ্রীনিবাসের অন্তর্নিহিত শক্তিকে জাগ্রত করিয়া এবং তাঁহাকে বার বার নীলাচল-বৃন্দাবনাভিমুখে প্রেরণ করিয়া এক স্তূপীকৃত কঙ্কাল-ভস্মের সন্নিকটে বসিয়া সেই মহাস্রোতের আগমন-প্রতীক্ষায় প্রহর গুণিতেছিলেন, তাঁহার কথা বড় একটা বলা হয় না। গ্রন্থকারদিগের মধ্যে, বিখ্যাত ঘটনাগুলিকে কোন পূর্বনির্দিষ্ট বিধানের অনুযায়িরূপে বর্ণিত করিয়া বিধায়ক বা বক্তাদিগকে ত্রিকালজ্ঞ ঋষির মাহাত্ম্য দান করিবার একটি প্রবণতা দৃষ্ট হয়। তাহার ফলে বহু তথ্য বিকৃত হইয়াছে, কোথাও বা একেবারে চাপা পড়িয়াছে। সেই সমস্ত পূর্ববিধান বা ভবিষ্যৎবাণীর আবর্জনাকে একটু মাত্র সরাইয়া দিলেই বহুস্থলে সত্য প্রকাশিত হইয়া পড়ে। নরহরি-শ্রীনিবাস-সম্পর্ক সম্বন্ধেও একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। পূর্ববিধান, ভবিষ্যৎবাণী, আকাশবাণী বা স্বপ্নাদেশগুলির কথা বাদ দিলে আমরা দেখিতে পাই যে নরহরিই শ্রীনিবাসের প্রথম আবিষ্কারক ও প্রবর্তনাদানকারী।

বৈষ্ণব পিতার পুত্র-হিসাবে শ্রীনিবাস বাল্যকালেই শ্রীখণ্ডের কথা শুনিয়া নরহরি-রঘুনন্দনাদি ভক্তবৃন্দের সহিত মিলিত হইবার জন্য যাজিগ্রামে মাতুলালয়ে চলিয়া আসেন। এই সময় একদিন নরহরিও যাজিগ্রাম হইয়া গঙ্গাস্নানে চলিয়াছেন। পথে শ্রীনিবাসের সহিত দেখা।[৭৮] প্রথম দৃষ্টিতেই তিনি শ্রীনিবাসকে চিনিয়া লইলেন। শ্রীনিবাসের সহিত তাঁহার নানাবিধ কথাবার্তা হইল এবং তিনি বালককে নানাভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়া তখনকারমত গৃহে পাঠাইয়া দিলেন।

কিন্তু ফল ফলিতে দেরি হইল না। কিছুকাল পরে পিতৃবিয়োগ-ঘটিলে অসহায় বালক মাতাকে লইয়া যাজিগ্রামে আসিলেন এবং একদিন নরহরির নিকট উপস্থিত হইলেন

(৭৭) ভ. র.—৮।৪২২ ; ন্র.—নরোত্তম (৭৮) প্রে. বি.—৪র্থ বি., পৃ. ২৬ ; ভ. র.—২।২৯২

সেইদিন নরহরি প্রতিবেশী নয়ান-সেনের 'গুরু আরাধনা পিতৃবাসর' উপলক্ষে সেই স্থানে ছিলেন। রঘুনন্দন শ্রীনিবাসকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলে শ্রীনিবাস জানাইলেন যে প্রথম দর্শনাবধি তিনি নরহরির-চরণে 'আত্মসমর্পণ' করিয়াছিলেন ; এক্ষণে তিনি নিরাশ্রয় হইয়া তাঁহার নিকট আসিয়াছেন। নরহরি শ্রীনিবাসকে আপাতত সেইস্থানে বাস করিয়া হরিনাম-মহামন্ত্র গ্রহণ করিতে আজ্ঞা দিলেন। শ্রীনিবাস নরহরিকেই গুরুর আসনে বসাইয়া আত্মনিবেদন করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু প্রজ্ঞাবান ও দূরদর্শী নরহরি বুঝিলেন যে পিতৃহীন বালকের আধ্যাত্মিক অবধায়ক হওয়া এক কথা, এবং গৌরবময় ভবিষ্যতের স্রষ্টা ব্রাহ্মণবালকের দীক্ষাগুরু হওয়া আর এক কথা। মর্যাদা-রক্ষায় তিনি ছিলেন মহাপ্রভুর অকপট অনুগামী। তিনি শ্রীনিবাসকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিয়া[৭৯] শেষে তাঁহার নীলাচল-গমনের জন্য পথের সংগতি করিয়া দিলেন।[৮০] রঘুনন্দনও তাঁহাকে নানাভাবে সাহায্য করিয়া গমনের আজ্ঞাদান করিলে শ্রীনিবাস চলিয়া গেলেন। নরহরি তাঁহার সহিত একজন সঙ্গী এবং একটি পত্রও লিখিয়া পাঠাইলেন।[৮১]

মহাপ্রভুর সহিত শ্রীনিবাসের সাক্ষাৎ ঘটে নাই ; কিন্তু গদাধর-পণ্ডিত নূতন একখান ভাগবত পাঠাইবার জন্য শ্রীনিবাসের মারফত বাল্যবন্ধু নরহরির নিকট পত্র লিখিলে[৮২] নরহরি সাগ্রহে সঙ্গী ও গ্রন্থসহ শ্রীনিবাসকে পুনরায় নীলাচল-অভিমুখে পাঠাইলেন। কিন্তু পথে গদাধরের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া শ্রীনিবাস পুনরায় নরহরির নিকট প্রত্যাবর্তন করিলে[৮৩] নরহরি তাঁহাকে বৃন্দাবনে পাঠাইতে উদ্যোগী হইলেন। কিন্তু নানা কারণে দীর্ঘকাল বিলম্ব হইয়া গেল। শেষে একদিন তিনি শ্রীনিবাসকে মাতৃসমীপে বিদায়-গ্রহণ করাইয়া বৃন্দাবনাভিমুখে প্রেরণ করিলেন। তখন তিনি বার্ধক্যে উপনীত হইয়াছেন। রঘুনন্দনও শ্রীনিবাসকে বৃন্দাবন গমনের আজ্ঞা দিলেন।[৮৪]

শ্রীনিবাস যখন বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তন করিলেন তখন :

> মৃতপ্রায় আছেন ঠাকুর নরহরি।
> দিবারাত্রি মূর্ছাপন্ন লোটায় ভূতলে।
> করয়ে প্রলাপ সদা ভাসে নেত্রজলে। ৮৫

'প্রেমবিলাস'-মতে[৮৬] নরহরি তখন পরলোকগত। কিন্তু উপরোক্ত উদ্ধৃতি হইতে জানা যাইতেছে যে 'ভক্তিরত্নাকরে' সেই সংবাদ সমর্থিত হয় নাই। এই স্থলে

(৭৯) প্রে. বি.—৪র্থ. বি., পৃ. ৩২ (৮০) ভ. র—৩।৪৬-৪৯ (৮১) প্রে. বি.—৪র্থ. বি, পৃ. ৩৪ (৮২) ঐ—পৃ. ৩৫ ; ৬ষ্ঠ. বি., পৃ. ৬৪, তু.—ভ. র.—৩।২৮২, ২৯৭, ৩০৪ (৮৩) ন. বি.—২য় বি., পৃ. ১৮ ; প্রে. বি.—৪র্থ. বি., পৃ. ৩৬ (৮৪) প্রে. বি.—৫ম. বি., পৃ. ৫২ ; ভ. র.—৪।১৫২ ; কর্ণপুর-কবিরাজ-কৃত 'শ্রীনিবাস-আচার্যের গুণলেশ সূচক' ; ন. বি.—২য়. বি., পৃ.১৮ (৮৫) ভ.র.—৭।৫২২-২৩ (৮৬) ১৪ শ. বি., পৃ. ১৮৮

সম্ভবত 'প্রেমবিলাসের' উক্তি ভ্রান্তিপূর্ণ।[৮৭] তবে 'প্রেমবিলাসা'নুযায়ী[৮৮] জাহ্নবা দেবীর প্রথমবার (?) বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনকালে মুকুন্দ-সরকার জীবিত থাকিলেও শ্রীনিবাসের প্রত্যাবর্তনকাল নাগাৎ তিনি যে জীবিত ছিলেন, তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। যাহা হউক, শ্রীনিবাস প্রত্যাবর্তন করিলে রঘুনন্দন নরহরিকে সংবাদ দিয়া শ্রীনিবাসকে সেই নির্জন স্থানে লইয়া গেলে বৃদ্ধ তাঁহাকে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রচারের জন্য নির্দেশ দান করিলেন এবং তিনি শ্রীনিবাসকে ভক্তিধর্ম প্রচারের যোগ্য উত্তরাধিকারী মনে করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। এতদিন পরে শ্রীনিবাসকে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া তিনি তাঁহাকে মাতৃ-অভিলাষ-অনুযায়ী বিবাহ করিতেও অনুমতি দান করিলেন।[৮৯] 'প্রেমবিলাস'-অনুযায়ী[৯০] রঘুনন্দনের প্রস্তাবানুসারে সুলোচনাদির উদ্যোগে শ্রীনিবাসের মাতার মৃত্যুর দুই তিন মাসের মধ্যেই তাঁহার বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু সম্ভবত এই বিবরণও ভ্রমাত্মক।[৯১]

কিছুকাল পরে নরোত্তম-ঠাকুর নীলাচল হইতে শ্রীখণ্ডে আসিলে নরহরি তাঁহাকে রঘুনন্দনের হস্তে অর্পণ করিলেন।[৯২] রঘুনন্দন নরোত্তমকে যাজিগ্রামে পাঠাইয়া দিলেন এবং কিছুদিন পরে নিজেও তথায় গিয়া শ্রীনিবাসের বিবাহকার্য সুসম্পন্ন করিলেন। এই ঘটনার কয়েক মাস পরেই বন্ধু গদাধরদাসের মৃত্যুবার্তা পৌছাইলে নরহরি ব্যাকুল হইলেন এবং তাহার কয়েকদিন পরে তিনিও ইহধাম ত্যাগ কারিলেন।[৯৩]

শ্রীনিবাস এতদিনে সত্যসত্যই অভিভাবকহীন হইলেন। তিনি সেই বেদনা সহ্য করিতে না পারিয়া বৃন্দাবনে চলিয়া গেলেন।[৯৪] নরহরির সহিত তাঁহার সম্পর্ক যে কতখানি নিবিড় ছিল, এই ঘটনা হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। এদিকে নরহরির বিয়োগ রঘুনন্দনকে যেন শেলবিদ্ধ করিল। কিন্তু তাঁহাকে পিতৃব্যের স্থানে আসিয়া বসিতে হইল।

(৮৭) দ্র.—শ্রীনিবাস-আচার্য (৮৮) ১৮শ. বি, পৃ. ২৩৫ (৮৯) ভ. র.—৭৫৮৩-৮৬; ন. বি.—৬ষ্ঠ. বি., পৃ. ৭৩; (৯০) ১৭ শ. বি., পৃ. ৭৩; (৯১) দ্র.—শ্রীনিবাস-আচার্য; (৯২) ভ. র.—৮।৪৩১; ন. বি.—৪র্থ. বি., পৃ. ৬০ (৯৩) দ্র.—ভ. র., ৯।৬৩; গোপালদাসের 'নরহরির শাখা নির্ণয়ে' আছে যে কুলাই গ্রামের যাদব-কবিরাজ এবং দৈত্যারি-ও কংসারি-ঘোষ প্রভৃতি নরহরিকে নিম্বকাঠের তিনটি গৌরাঙ্গমূর্তি দিলে তিনি ছোটটিকে শ্রীখণ্ডের বাড়িতে রাখিয়া মধ্যমটিকে গঙ্গানগরে পাঠান। বড়টিকে গদাধরদাসের শিষ্য কাটোয়ার বিষ্ণানন্দ-পণ্ডিতকে দিলে তিনি নরহরি-আজ্ঞায় বনমধ্যে এক 'চুপরী' বানাইয়া তন্মধ্যে উহার প্রতিষ্ঠা করেন। 'শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণবে'র লেখক বলিতেছেন যে (পৃ. ১০২) তাঁহারা গুরু পরম্পরায় শুনিয়া আসিতেছেন, নরহরির গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার যুগলমূর্তি স্থাপনের ইচ্ছা ছিল। মু. বি.-মতে (পৃ. ২৪১) বংশী-পৌত্র রামচন্দ্র নীলাচল হইতে ফিরিয়া নরহরি ও রঘুনন্দনের সহিত সাক্ষাৎ করেন। (৯৪) ভ. র.—৯।৭১; ন. বি.—৬ষ্ঠ. বি., পৃ. ৭৩

অল্পকাল মধ্যেই তিনি শ্রীনিবাস-পত্নীর ইচ্ছায় সম্মতি প্রদান করিয়া [৯৫] শ্রীনিবাসকে বৃন্দাবন হইতে ফিরাইয়া আনিলেন [৯৬] এবং তদ্দ্বারা গদাধরদাসের তিরোভাব-উৎসব সম্পন্ন করাইলেন। নিজেও তিনি উৎসবে বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তারপর তিনি পিতৃব্যের তিরোভাব-উৎসবে উদ্যোগী হইলে শ্রীখণ্ডেও মহামহোৎসব আরম্ভ [৯৭] হইল। উৎসব-উপলক্ষে শ্রীনিবাস ভাগবতপাঠ করিলেন, লোচনদাস সকলকে চন্দন-লিপ্ত পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করিলেন এবং বীরচন্দ্র [৯৮] ও অদ্বৈতপুত্র কৃষ্ণ-মিশ্র ও গোপাল উৎসবে বিশেষ অংশ গ্রহণ করিলেন। আর সমগ্র অনুষ্ঠানের নির্বাহক হিসাবে রঘুনন্দনের যোগ্যতা সকলকেই চমৎকৃত করিল। সমগ্র গৌড়বঙ্গের বিশিষ্ট ভক্তবৃন্দ অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। তিরোভাব-উৎসবকে অবলম্বন করিয়া বৈষ্ণব-জগতে বোধ করি আর এমন মহামিলন অনুষ্ঠিত হয় নাই।

উক্ত ঘটনার অল্পকাল পরেই খেতরির উৎসব আরম্ভ হইলে রঘুনন্দন লোচন-সুলোচনাদি ভক্তসহ তথায় গিয়া সেই উৎসবেও বিশেষ উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেন। [৯৯] তারপর উৎসবান্তে জাহ্নবাদেবী বৃন্দাবনে গিয়া সেখান হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে রঘুনন্দন তাঁহাকে শ্রীখণ্ডে আনয়ন করিয়া যথাযোগ্যভাবে আপ্যায়িত করেন। [১০০] তাঁহার পুত্র কানাই-ঠাকুর তখন বালক মাত্র।

ইহার পর রঘুনন্দনের কার্যবিধির আর বিশেষ সংবাদ পাওয়া যায় না। কিন্তু তৎকালীন বৈষ্ণব-সংস্কৃতির ধারক ও বাহক স্বয়ং শ্রীনিবাস-আচার্যও চিরকাল তাঁহাকে মর্যাদা দান করিয়া গিয়াছেন। নবদ্বীপ-পরিক্রমা বা তাহারপরে খেতুরি যাতায়াতের সময় তিনি রঘুনন্দনের আজ্ঞা লইয়াছিলেন। [১০১] কিন্তু তখন রঘুনন্দনের দিনও ফুরাইয়া আসিয়াছে। শ্রীনিবাস খেতুরি হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে তিনি একদিন তাঁহাকে নানাবিধ উপদেশ প্রদান করিয়া স্বীয় পুত্র রামাই-ঠাকুরকে গোপাল-চরণে সমর্পণ করিলেন। তারপর তিনদিন সংকীর্তনে 'মহামত্ত' হইয়া তিনি কৃষ্ণচৈতন্য নাম উচ্চারণ করিতে করিতে ইহলীলা সংবরণ করিলেন। [১০২]

রঘুনন্দনের পুত্র কানাই-ঠাকুর পিতার তিরোভাব-উৎসব সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন।

(৯৫) অ. র.—৬ষ্ঠ. ম., পৃ. ৩৯ ; দ্র.—রামচন্দ্র-কবিরাজ (৯৬) ভ. র.—৯।১১১ (৯৭) ঐ—৯।৫০৫-৭৪৯ (৯৮) অ. প্র.-মতে (২২ শ. অ., পৃ. ১০৩) বীরচন্দ্রের দীক্ষাগ্রহণ অনুষ্ঠানে নরহরি অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। (৯৯) ভ. র.—১০ম. তরঙ্গ ; ন. বি.—৬ষ্ঠ. বি., পৃ. ৮৪, ১০৮ ; ৭ম. বি., পৃ. ৯৩ ; প্রে. বি.—১৯শ. বি., পৃ. ৩০১, ৩৩৭ (১০০) ভ. র.—১১শ. তরঙ্গ ; ন. বি.—৯ম. বি., পৃ. ১৪১-৪৪ (১০১) ভ. র.—১২।২৫ ; ১৩।১৮ (১০২) ভ. র.—১৩।১৮৩ ; মু. বি.-মতে (পৃ. ৩৯৮) বারাপাড়াতে রামচন্দ্র কর্তৃক কানাই-বলাই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠাকালে তিনি তথায় উপস্থিত ছিলেন।

উৎসবে তাঁহার পুত্র মদন সংকীর্তনের সহিত অদ্ভুত নৃত্য প্রদর্শন করেন।[১০৩] অল্প বয়সেই কানাইর দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন—মদন এবং বংশী। মদন পৌগণ্ডে 'ভক্তিরত্ন' প্রকাশ করিয়া প্রভুনরহরি-পদে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। তিনি সম্ভবত পদকর্তাও ছিলেন।[১০৪] বীরচন্দ্রপ্রভু বৃন্দাবন-গমনপথে শ্রীখণ্ডে আসিলে কানাই-ঠাকুর তাঁহাকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। বোরাকুলি-গ্রামে শ্রীনিবাস-শিষ্য গোবিন্দ-চক্রবর্তীর গৃহে মহামহোৎসবকালেও কানাই-ঠাকুর উপস্থিত ছিলেন।[১০৫]

রামগোপালদাস কৃত 'শাখানির্ণয়'[১০৬] গ্রন্থে নরহরির প্রধান শিষ্যদিগের নিম্নোক্তরূপ তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে :—কানাই-ঠাকুর, মদনরায়-ঠাকুর (কানাই-পুত্র), বংশী-ঠাকুর (মদন-সহোদর), গোপালদাস-ঠাকুর (শ্রীখণ্ড হইতে গিয়া তকিপুরে বাস করেন), লোচনদাস ('গুরুর অর্থে বিকাইলা ফিরিঙ্গি সদন'), চক্রপাণি-মজুমদার, জনানন্দ ও নিত্যানন্দ-চৌধুরী [ইঁহারা চক্রপাণির পুত্র ; চক্রপাণির ভ্রাতা মহানন্দ ; নরহরি চক্রপাণিকে বিগ্রহদান করেন। চক্রপাণির অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র রামগোপাল দাস তাঁহার 'রসকল্পবল্লী' নামক গ্রন্থে স্বীয় পরিচয় প্রদান-প্রসঙ্গে জানাইয়াছেন :

> চক্রপাণি মহানন্দ দুই মহাশয়।
> নীলাচলে দুইভাই প্রভুকে মিলয়॥
> রঘুনন্দনের সেবক বলি প্রীতি করিলা।
> দুই জনের মস্তকে নিজ চরণ ধরিলা॥],

দিগ্বিজয়ী কবি লোকানন্দাচার্য (ইনি নীলাচলে নরহরি কর্তৃক পরাজিত হইয়া মহাপ্রভুর নিকট পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী নরহরির নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন), কৃষ্ণ-পাগলিনী ব্রাহ্মণী (নবদ্বীপে বিষ্ণুপ্রিয়া সেবার্থ নরহরি-প্রেরিতা), রামদাস ('একব্বরপুরে আছে তাহার বিধান'), চন্দ্রশেখর (শ্রীখণ্ডের বৈদ্য ও পদকর্তা, নামান্তরে শশিশেখর[১০৭] ; মুসলমানগণ গৃহদেবতা রসিক-রায়কে হরণ করিতে আসিলে যথাশক্তি হৃদয়ে ধারণ করেন। মুসলমানেরা তাঁহার মস্তক ছিন্ন করিয়া ফেলে। শশিশেখর চন্দ্রশেখরের ভ্রাতা ছিলেন এবং তাঁহারা উভয়েই বিখ্যাত পদকর্তা ছিলেন। ব্রজবুলি পদ রচনায় তাঁহারা যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন।), লক্ষ্মীকান্ত,[১০৮] (নিবাস শ্রীখণ্ড, নরহরির গৃহপূজারী), গৌরাঙ্গদাস-ঘোষাল (শ্রীখণ্ডের ব্রাহ্মণ), মধুসূদনদাস (বৈদ্য, নরহরির সংকীর্তন-বাদক), মিশ্র-কবিরত্ন (ব্রাহ্মণ, এড়ুয়াগ্রাম), কৃষ্ণকিংকরদাস (রূপপুর,

(১০৩) ভ. র.—১৩।১৮৯ (১০৪) HBL.—p.420 (১০৫) ভ. র.—১৪।৯৯ (১০৬) নরহরি ও রঘুনন্দনের শাখানির্ণয় (১০৭) প. ক. (প.)—পৃ. ১০৮ ; গৌ. ত. (প. প.)—পৃ. ১১৬—৩৭ ; HBL—p.367 (১০৮) গৌ-ত-তে মুদ্রিত লক্ষ্মীকান্তদাস-ভণিতার পদগুলি খুব সম্ভবত ইঁহারই।

গোবিন্দরায়ের সেবা প্রকাশ করেন), কবিরাজ-যাদব (কায়স্থ, কুলাইগ্রাম), দৈত্যারি-কংসারি-ঘোষ (কায়স্থ, কুলাই গ্রাম)

গোপালদাস-কৃত 'রঘুনন্দনের শাখানির্ণয়' গ্রন্থানুযায়ী রঘুনন্দনের শিষ্যগণ :—নয়নানন্দ-কবিরাজ (বৈদ্য, শ্রীখণ্ড, পদকর্তা), শ্রীকৃষ্ণদাস-ঠাকুর (আকাইহাট), মহানন্দ কবিরাজ (বৈদ্য, চৌধুরী, শ্রীখণ্ড ; ইনি খণ্ড ত্যাগ করিয়া গৌড় যাত্রা করিলে পদ্মাতে নৌকাডুবি হয় এবং ইনি তিন দিন অনাহারে থাকিয়া বৃন্দাবনচন্দ্রকে বুকে লইয়া ভাসিতে থাকেন।[১০৯] শেষে ইনি পোখরিয়া গ্রামে আসিয়া লাগিলে সেই স্থান হইতে উঠিয়া খণ্ডে প্রত্যাবর্তন করেন ও সেবা প্রকাশ করেন), মালিনী-ঠাকুরাণী (মহানন্দ-পত্নী), শ্রীমান-সেন, বনমালী-কবিরাজ (ঘোরাঘাট), হোরকী-ঠাকুরাণী (বনমালী-পত্নী), রামচন্দ্র (শ্রীখণ্ড, সম্ভবত ইনি পদকর্তাও ছিলেন[১১০]) কবিশেখর রায়[১১১] (শ্রীখণ্ড, বৈদ্য, পদকর্তা), কবিরঞ্জন[১১২] (শ্রীখণ্ড, বৈদ্য, পদকর্তা, নামান্তরে ছোট বিদ্যাপতি)

(১০৯) র. শা. নি (১১০) HBL—p.204 (১১১) শ্রীকবিশেখর রায় বিকাইল রাঙা পায় শ্রীরঘুনন্দন প্রাণেশ্বর।—স্থ., পৃ. ৯ (১১২) ডা. মনোমোহন ঘোষ তাঁহার 'বাংলা সাহিত্যে'র অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে জানাইতেছেন যে তিনি হোসেন শাহের কর্মচারী ছিলেন।

হরিদাস

হরিদাসের জাতি ও জন্ম[1]-বৃত্তান্ত রহস্যাবৃত। জয়ানন্দ লিখিয়াছেন যে হরিদাস 'সুরনদী তীরে ভাটকলাগাছি গ্রামে হীন কুলে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার পিতার নাম ছিল মনোহর এবং মাতার নাম উজ্জ্বলা।[2] ভাটকলাগাছির কথা কিন্তু অন্য কোনও গ্রন্থ কর্তৃক সমর্থিত হয় না। বরং বূঢ়ন-গ্রামের কথাই 'পাটপর্যটন' ও 'চৈতন্যভাগবতা'দি গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে, এবং 'মহাপ্রভুরগণের পাটনির্ণয়'-পুথিতে বেনাপোলের নাম দৃষ্ট হয়। অবশ্য বেনাপোলে হরিদাসের পাট ছিল বলিয়া যে উহা তাঁহার জন্মস্থান হইবে এমন কোন কথা নাই। ১৩১৮ সালের 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা'র দ্বিতীয়-সংখ্যায় চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিশেষ আলোচনাপূর্বক দেখাইয়াছেন যে হরিদাসের গ্রাম সম্বন্ধে বৃন্দাবনদাসের 'বূঢ়ন' ও জয়ানন্দের 'স্বর্ণনদীতীরে ভাটকলাগাছিগ্রাম' উভয়ই ঠিক। প্রবন্ধলেখক বলিয়াছেন, "বূঢ়ন একটি বৃহৎ পরগণার নাম।......ভাটলী নামে এক গ্রাম সোনাই তীরে এখনও আছে এবং তাহার নিকট কেরাগাছী গ্রামও আছে।......এই গ্রাম বূঢ়ন হইতে ২॥ ক্রোশ মাত্র......স্বর্ণনদীকে গঙ্গা বলিয়া বুঝিবার আবশ্যক হইতেছে না। বূঢ়নের নিচেই স্বর্ণনদী বা সোনাই পাওয়া যাইতেছে।......পল্লীগ্রামে এখনও কোন গ্রামের নির্দেশ করিতে হইলে যুক্ত নাম ব্যবহৃত হয়।......এখনও বিক্রমপুর......নিবাস বলিয়া পরিচয় দিলে একটি গ্রাম বুঝায় না। পরগণা বুঝাইয়া থাকে।"

জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে বর্ণিত হরিদাসের পিতা-মাতার নামগুলি দেখিয়া তাঁহাকে অবশ্য যবন-সন্তান বলিয়া মনে হয় না। অথচ 'চৈতন্যভাগবত' ও 'চৈতন্যচরিতামৃতে' এ সম্বন্ধে কোনও সুস্পষ্ট বিবরণ না থাকিলেও গ্রন্থগুলি পাঠে তাঁহাকে যবন বলিয়াই প্রতীতি জন্মে। বৈষ্ণব-সমাজের মধ্যে তাঁহার এক বিশেষ অবস্থান দেখিয়া তাহাই সমর্থিত হয়। কেহ কেহ[3] তাহাই প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সেক্ষেত্রেও তাঁহার পূর্ববর্তী যবন নামটি কি ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিয়া যায়। কিন্তু ব্রাহ্মণ হইয়াও স্বয়ং রূপ- বা সনাতন-গোস্বামী যেভাবে জীবন-যাপন করিতেন, তাহা দেখিয়া জয়ানন্দ-প্রদত্ত সংবাদকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না।

---

(১) অ. প্র.-মতে জন্ম ১৩৭২ শকে। অচ্যুতচরণ চৌধুরী তাঁহার 'শ্রীমৎ হরিদাস ঠাকুরের জীবন-চরিতে' (পৃ. ৩) সম্ভবত এই তারিখ গ্রহণ করিয়াছেন। (২) পৃ. ২৬ (৩) শ্রীহরিদাস ঠাকুর—পরিশিষ্ট; 'নীলাচলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'-গ্রন্থের গ্রন্থকারও তাঁহাকে 'যবন বংশোদ্ভব' বলিয়াছেন।—পৃ. ৮৯

অন্যান্য কয়েকটি গ্রন্থের বর্ণনা[৪] দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় যে হরিদাসের যবনত্ব তাঁহার জন্মগত ছিল না, যবনগৃহে প্রতিপালিত হওয়ার ফলেই তাঁহার এইরূপ যবনদোষপ্রাপ্তি ঘটে। অস্পষ্টভাবে হইলেও 'চৈতন্যভাগবত' হইতেও[৫] সম্ভবত ইহার সমর্থন লাভ করা যায়। একবার হরিদাস নাম-মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে থাকিলে হরিনদী গ্রামের এক দুর্জন ব্রাহ্মণ বলিয়াছিলেন :

দরশন কর্তা এবে হৈল হরিদাস।
কালে কালে বেদপথ হয় দেখি নাশ।
'যুগ-শেষে শূদ্রে বেদ করিব ব্যাখ্যানে।'
এখনেই তাহা দেখি শেষে আর কেনে।

সম্ভবত এই স্থলে হরিদাসের শূদ্রত্বের সম্বন্ধে ইঙ্গিত রহিয়াছে। কিন্তু যে জাতি হইতেই তাঁহার উদ্ভব হউক না কেন, তিনি আশৈশব ভক্তিমান ছিলেন এবং বাল্যকালেই অদ্বৈত-সাহচর্যে আসিবার পর তিনি সম্ভবত মস্তক-মুণ্ডন ও তিলক-ধারণপূর্বক হরিনাম-মন্ত্র গ্রহণ[৬] করিয়া শান্তিপুর, ফুলিয়া ও কুলীনগ্রাম প্রভৃতি স্থানে নৃত্য ও নামগান করিয়া বেড়াইতে থাকেন। কেহ কেহ বলেন[৭] যে তাঁহার এইরূপ নৃত্য ও নামগান হইতেই নাকি হাফ্-আখড়াই, কবি ও তর্জাগানের সৃষ্টি হয় এবং তিনি "নিজেও ছিলেন একজন সঙ্গীতজ্ঞ, তানে মানে লয়ে রাগে মধুর কণ্ঠে তিনি কীর্তন গান করিতে পারিতেন।" বস্তুত, কুলীনগ্রামের সত্যরাজখান প্রভৃতি ভক্ত এইভাবে তাঁহার নাম কীর্তন শ্রবণের মধ্য দিয়াই তাঁহার কৃপা ভাজন হইয়াছিলেন এবং সেই গ্রামের অন্যান্য অধিবাসিবৃন্দও এইভাবে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন। তাই কৃষ্ণদাস-কবিরাজ লিখিয়াছেন, "তাঁর উপশাখা যত কুলীন গ্রামীজন।[৮]" আবার সম্ভবত ফুলিয়াতেও তাঁহার এইরূপ প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল।[৯]

(৪) প্রে. বি.-মতে (২৪শ. বি., পৃ. ২৩৩) "বুঢ়নে হইল জন্ম ব্রাহ্মণের বংশে। যবনত্ব প্রাপ্তি যাঁর যবনত্ব দোষে।" এবং শৈশবে মাতৃপিতৃহীন হইলে 'আব্দুল্লার অধিকারী মলয় কাজী' হরিদাসকে পালন করিতে থাকিলে তিনি 'পালিত হঞা তার অন্ন খান।' অ. ম.-মতে (পৃ. ৩৪) জন্ম নীচ কুলে, বাল্যাবধি দুগ্ধ পান করেন, জন্মমাত্রেই মাতৃহীন হইয়া প্রতিবাসীর দ্বারা পালিত হন এবং পাঁচ বৎসর বয়সে শান্তিপুরে অদ্বৈত সকাশে আসেন। চৈ. স.-মতে (পৃ. ২৫-২৬) ব্রাহ্মণ-সন্তান, পিতা-মাতার নাম যথাক্রমে সুমতি ও গৌরী। তাঁহারা 'হরিনাম ব্রহ্ম এই করিয়াছে সার' বলিয়া পুত্রের নাম ব্রহ্ম হরিদাস। পুত্র ছয় মাসের হইলে পিতার মৃত্যু ঘটে। মাতাও সহমৃতা হন। হরিদাস যবনালয়ে পালিত হন। হরিদাসের তুলসীমালা ও হিন্দু আচরণ দেখিয়া গোরাই-কাজী মুলক(মলয় ?)-কাজী ও জমিদারের নিকট তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া তাঁহাকে বাইশ-বাজারে বেত্রাঘাতের ব্যবস্থা করেন। (৫) ১।১১, পৃ. ৮৭ (৬) সম্ভবত অদ্বৈতপ্রভুর নিকট—অ. প্র.—৭ম., পৃ. ২৭ ; প্রে. বি.—২৪শ. বি., পৃ. ২৩৩ (৭) স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ—পদাবলী কীর্তনের পরিচয়, 'বলরাম দাসের পদাবলী', পৃ. ৩৬ (৮) চৈ. চ.—১।১০, পৃ. ৫২ (৯) এইস্থানে রামদাস নামে এক শাস্ত্রজ্ঞ ও ধর্মপরায়ণ বিপ্র তাঁহার নামগানে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে প্রণতিজ্ঞাপনপূর্বক তাঁহার অনুরাগী ভক্ত হইয়া ফুলিয়াতে এক নির্জন স্থানে একটি ছোট্ট বাসা নির্মাণ করিয়া দিলে হরিদাস তন্মধ্যে বাস করিতে থাকেন। অ. প্র.—৯ম. অ., পৃ. ৩৪ ; চৈ. কৌ.—পৃ. ২৩৪ ; রামদাস দ্বিজ সম্বন্ধে অভিরামের জীবনী দ্রষ্টব্য।

এই নামগানই ছিল যেন হরিদাসের জীবনের একমাত্র কর্তব্য। প্রত্যহ তিনি তিন লক্ষ বার নাম জপ করিতেন। এইরূপ কঠোর নিষ্ঠার দৃষ্টান্ত জগতে বিরল। অবিরত এই নাম গানের মধ্য দিয়া তাঁহার মন সংযত হইয়াছিল এবং তিনি ভাব-জগতের উচ্চমার্গে পৌছাইয়াছিলেন। অধ্যয়নজ্ঞান সেখানে তুচ্ছ ছিল। 'অদ্বৈতপ্রকাশ' এবং 'প্রেমবিলাসে'র চতুর্বিংশ বিলাসে লিখিত হইয়াছে যে যদুনন্দন-তর্কচূড়ামণি তাঁহাকে নামজপমত্ত দেখিয়া 'বাউল' বলিয়া উপহাস করিলেও তাঁহাকেই হরিদাস যুক্তিতর্কের দ্বারায় প্রভাবিত করায় তিনি জ্ঞানবাদ পরিত্যাগপূর্বক অদ্বৈতপ্রভুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। প্রকৃতপক্ষে, অদ্বৈতও তাঁহাকে স্বীয় দক্ষিণ হস্ত মনে করিতেন। অদ্বৈতপ্রভুর বিবাহকালে তিনি একটি বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

একবার হরিদাস বেনাপোলে বাস করেন। বনমধ্যে নির্জন স্থানে কুটির বাঁধিয়া প্রত্যহ তিন লক্ষ বার নাম জপ চলিতে থাকে। কিন্তু 'দেশাধ্যক্ষ' রামচন্দ্র-খানের তাহা সহ্য হইল না। তিনি হরিদাসের মধ্যে কোন ছিদ্র বাহির করিতে না পারিয়া এক জঘন্য পন্থা অবলম্বন করিলেন।[১০] তদনুযায়ী একটি পরমা সুন্দরী যুবতী-বেশ্যা একদিন সন্ধ্যাকালে কৃষ্ণনামরত হরিদাসকে প্রলুব্ধ করিবার বাসনায় তাঁহার সহিত মিলনাকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে। হরিদাস যুবতীকে অপেক্ষা করিতে বলিলেন, নাম জপ শেষ হইলেই তিনি তাঁহার বাসনা পূর্ণ করিয়া দিবেন। রাত্রি শেষ হইয়া গেল, কিন্তু নাম জপ শেষ হইল না। যুবতী রামচন্দ্র-খানের নিকট সংবাদ দিল এবং পুনরায় পরদিন সন্ধ্যায় আসিয়া আশ্রমে বসিল। পূর্ব রাত্রিতে কষ্ট দেওয়ার জন্য হরিদাস ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাহাকে অপেক্ষা করিতে বলিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় রাত্রিও অতিবাহিত হইলে বারবনিতাটি অস্থির হইয়া উঠিল। হরিদাস বলিলেন যে তিনি মাসাবধি কোটি নাম গ্রহণের যজ্ঞ উদ্‌যাপন করিতেছেন, পরদিন যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে তিনি নিশ্চয় তাহার কামনা পূর্ণ করিবেন। পরদিন রামচন্দ্রের নিকট সংবাদ গেল এবং যথাসময়ে যুবতীটি যথাস্থানে আসিয়া আবার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। তৃতীয় রাত্রিও শেষ হইয়া গেল। কিন্তু নাম শ্রবণ করিতে করিতে তাহার মনের আমূল পরিবর্তন সাধিত হইল। হরিদাসের চরণে পতিত হইয়া সে রামচন্দ্র-সম্বন্ধীয় সকল কথা জানাইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলে হরিদাস তাহাকে নাম-গ্রহণের উপদেশ দিলেন। তদনুযায়ী সে তাহার সমস্ত ধন-সম্পদ ব্রাহ্মণকে বিতরণ করিয়া তুলসী-সেবন ও নামকীর্তন করিতে তৎপর হইল।[১১]

(১০) চৈ. চ.—৩।৩, পৃ. ২৯১ ; প্রে. বি.—২০শ. বি., পৃ. ২৩৫ (১১) অ. প্র.—৯ম. অ., পৃ. ৩৫ ; হরিদাস ও বারবনিতার বৃত্তান্তটি চৈ. চ. এবং অ. প্র., উভয় গ্রন্থেই বর্ণিত হইয়াছে। অবশ্য বর্ণনাতে কিছু কিছু পার্থক্য আছে। অ. প্র.-মতে বেশ্যাটির নূতন নামকরণ হয়—কৃষ্ণদাসী।

আর একবার হরিদাস ফুলিয়াতে বাস করিতে থাকেন। সম্ভবত ইহা গৌরাঙ্গ-আবির্ভাবেরও পূর্ববর্তী ঘটনা। 'চৈতন্যভাগবত' হইতে জানা যায়[১২] যে একবার গৌরাঙ্গ হরিদাসকে জানাইয়াছিলেন :

শুন শুন হরিদাস! তোমারে যখনে।
নগরে নগরে মারি বেড়ায় যবনে॥......
তোমার মারণ নিজ অঙ্গে করি লঙো।
এই তার চিহ্ন আছে মিছা নাহি কহোঁ॥
যে বা গৌণ ছিল মোর প্রকাশ করিতে।
শীঘ্র আইলুঁ তোর দুঃখ না পারোঁ সহিতে॥

সুতরাং হরিদাস ফুলিয়াতেই যবন কর্তৃক নিপীড়িত হওয়ায় উক্ত প্রকার সিদ্ধান্ত করিতে হয়। যাহাহউক, হরিদাস ফুলিয়ায় পৌঁছাইলে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং ব্রাহ্মণেরা পর্যন্ত তাঁহার সমাদর করেন। তাহা দেখিয়া স্থানীয় কাজী[১৩] মুলুকের অধিপতির নিকট তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিয়া যবনপতির মনকে বিষাইয়া তুলিলেন এবং হরিদাসকে বন্দিশালায় বন্দী রাখা হইল। হরিদাস হরিনাম করিতে করিতে বন্দী-গণকে সাহস দিয়া জানাইলেন যে কারাগারই বিষয়ভোগ হইতে দূরে থাকিয়া নামকীর্তন করিবার প্রশস্ত স্থান। তাহার পর তিনি বিচারার্থ যবনাধিপতির নিকট আনীত হইলে তিনি হরিদাসকে হিন্দু আচার ত্যাগ করিয়া যবনধর্ম পালনের জন্য নির্দেশ দিলেন। কিন্তু হরিদাসের অকাট্য যুক্তি ও মধুর বচন শুনিয়া তাঁহার চিত্ত বিগলিত হইল। কাজী কিন্তু অবিচলিত রহিলেন। কাজী যে কতদূর স্বেচ্ছাচারী[১৪] ছিলেন, ইহা হইতেই তাহা উপলব্ধ হয়। কিন্তু নির্ভীক হরিদাসও বিচলিত না হইয়া হরিনাম আরম্ভ করিলেন। শেষে কাজীর উপদেশ অনুযায়ী তাঁহাকে বাইশ বাজারে ঘুরাইয়া প্রহার করা হইল।[১৫] সহিষ্ণুতার অবতার হরিদাস হরিনাম করিতে করিতে সকল যাতনা সহ্য করিলেন। কিন্তু নৃশংসভাবে আঘাতের ফলে তাঁহার সংজ্ঞা লুপ্ত হইল।

(১২) ২।১০, পৃ. ১৫৩ (১৩) চৈতন্যসংগীতায় বলা হইয়াছে (পৃ. ২৫-২৬) ইঁহার নাম গোরাইকাজী এবং জমিদারের নাম ছিল মুলক-কাজী।

বজ্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ বলেন (নিত্যানন্দচরিত—১৩১৫, পৃ. ৭৮, ৮৩) যে মুসলমান রাজাধীনে কয়েকজন কাজী ছিলেন। "ইঁহাদের মধ্যে নবদ্বীপের অন্তর্গত বেলপুখুরিয়া গ্রামনিবাসী চাঁদকাজী, মুলুককাজী ও শান্তিপুরের নিকটবর্তী গোরাইকাজী প্রধান ছিলেন।" বজ্রেশ্বরবাবু 'চৈতন্য-সংগীতা' হইতে তথ্য গ্রহণ করিয়া লিখিয়াছেন যে হরিদাস প্রসঙ্গে যাঁহার নাম করা হইয়াছে তিনি গোরাই- বা গোড়াই-কাজী। এই প্রসঙ্গে তাঁহার 'শ্রীহরিদাস ঠাকুর' গ্রন্থখানিও (পৃ. ২৬-২৭) দ্রষ্টব্য।

(১৪) দ্র.—প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান (পৃ.১৯), প্রমথ চৌধুরী (১৫) চৈ. ভা.—১।১১, পৃ. ৮১ ; তু.—চৈ. স.—পৃ.২৫-২৬

তাঁহাকে মৃত মনে করিয়া কবরস্থ করার ব্যবস্থা করা হইল। কিন্তু পাছে তাঁহার আত্মা সদ্‌গতি প্রাপ্ত হয়, সেইজন্য কাজীর নির্দেশে তাঁহাকে গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করা হইল। তাহাতে শাপে বর হইল। তাঁহার দেহ গঙ্গাস্রোতে নিরাপদ স্থানে পৌছাইলে তিনি পুনর্জন্ম লাভ করিয়া আবার তাঁহার সাধনায় মগ্ন হইলেন। মুলুকের পতি সংবাদ শুনিয়া গঙ্গাতীরের গোফায়[১৬] তাঁহাকে স্বাধীনভাবে বাস করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন।

কিছুকাল পরে হরিদাস ফুলিয়া বেনাপোল হইতে গিয়া চাঁদপুরে বলরাম-আচার্যের গৃহে কিছুদিনের জন্য আতিথ্য গ্রহণ করেন। এই বলরাম ছিলেন গোবর্ধন- ও হিরণ্য-দাসের পুরোহিত। তাঁহার ইচ্ছায় এই সময়ে গোবর্ধনের পুত্র বালক রঘুনাথদাস হরিদাসের সাক্ষাৎলাভ করিয়া তৎপ্রতি আকৃষ্ট হন এবং তাঁহার নিকট শিক্ষালাভ করিয়া সাধন-ভজন-মার্গে বিচরণ করিবার প্রথম প্রেরণা লাভ করেন।[১৭] তারপর একদিন হরিদাস বলরামের মিনতি রক্ষার্থে হিরণ্য-গোবর্ধনের সভায় নাম-মাহাত্ম্য বর্ণনা করেন। সেই সময় মজুমদারের গৃহে গোপাল-চক্রবর্তী বাস করিতেন। তিনি 'গৌড়ে রহে পাদ্‌শাহা আগে আরিন্দাগিরী করে। বারলক্ষ মুদ্রা সেই পাদশাহেরে ভরে॥' হরিদাসের নাম-মাহাত্ম্য-বর্ণন শুনিয়া সেই সুদর্শন যুবকটি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন যে হরিদাসের বিবৃতি অনুযায়ী 'যদি নামাভাসে মুক্তি হয়, তবে তোমার নাক কাটি করহ নিশ্চয়॥' হরিদাসও তৎক্ষণাৎ জানাইলেন, "যদি নামাভাসে নয়। তবে আমার নাক কাটি এই সুনিশ্চয়॥" বিপ্রের প্রগল্‌ভতা দেখিয়া মজুমদার এবং বলাই-পুরোহিত গোপালকে ধিকৃত করিলেন এবং মজুমদার তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু অল্প কয়েকদিন পরে গোপাল দুর্দশাগ্রস্ত হইলে দরদী হরিদাস আর বেশিদিন সেই স্থানে থাকিতে পারিলেন না, বলাইকে বলিয়া তিনি শান্তিপুরে অদ্বৈত-আচার্যের নিকট চলিয়া আসিলেন।[১৮]

গৌরাঙ্গপ্রভু নাম-মাহাত্ম্য প্রচার করিবার জন্য কীর্তন নামক এক শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত-রীতির উদ্‌ভাবন বা সংস্কার করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার বহু পূর্বেই হরিদাস তাঁহার স্বীয় জীবনের মধ্যে ইহার যে মহিমা ও কার্যকারিতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহা অতুলনীয়।

(১৬) চৈ. ভা.-এ বর্ণিত হইয়াছে যে. কিছুদিন পরে গোফাটি জঙ্গলাকীর্ণ হইলে একটি সর্প আসিয়া গোফার নিচে বাস করে; কিন্তু হরিদাসকে নিরাপদে নাম গান করিতে দেওয়ার জন্য তাহাকে শেষে উক্ত স্থান ত্যাগ করিতে হয়। (১৭) গৌ. ত.—পৃ. ৩১১ ; চৈ. চ.—৩।৩, পৃ. ৩০০ (১৮) অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন (শ্রীহরিদাস ঠাকুর—পৃ. ৬৬), "বেনাপোলের তপস্যাশ্রম পরিত্যাগের অন্তত ১৮ বৎসর পরে ১৪২৮।২৯ শকে শান্তিপুর হইতেই চান্দপুর আসিয়াছিলেন।"

নামজপ ও নামকীর্তন বৈষ্ণবমাত্রেরই অপরিহার্য কর্তব্য। যতদিন বৈষ্ণব সমাজ বলিয়া কিছু থাকিবে, ততদিন হরিদাসের নামও বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দের স্মৃতিপটে অঙ্কিত থাকিবে। তাঁহার এই উচ্চৈঃস্বরে নাম গ্রহণের জন্য হরিনদী-গ্রামের পূর্বোক্ত দুর্জন ব্রাহ্মণ একবার তাঁহাকে আক্রমণ করায় তিনি জানাইয়াছিলেন[১৯] যে জপ করিলে তো কেবল স্বীয় স্বার্থই সাধিত হয়, কিন্তু বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের এই যে অসংখ্য বেদনাক্লিষ্ট মূক পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ, তাহাদের কি হইবে! সকল প্রাণীরই জিহ্বা রহিয়াছে, কিন্তু নামোচ্চারণ করিতে সক্ষম একমাত্র মানুষই। মানুষ যে এত বড় শক্তির অধিকারী হইয়াছে, সে কি কেবল তাহার নিজেরই হিতার্থে! শূদ্র হরিদাসের এই কথাগুলিকে অনধিকারীর বেদব্যাখ্যা ও দার্শনিক বুলি বলিয়া সেই দুষ্ট ব্রাহ্মণ তাঁহাকে তিরস্কৃত করিলেন। হরিদাস কিন্তু নামগ্রহণে পুনঃপ্রবৃত্ত হইলেন। প্রকৃতপক্ষে, যবন- বা শূদ্র-হরিদাসের দর্শনজ্ঞানের সহিত আমরা সম্যক পরিচিত নহি। কিন্তু তুচ্ছাতিতুচ্ছ প্রাণীটিরও ব্যথা-বেদনা তাঁহার হৃদয়-দুয়ারে যে গুঞ্জনধ্বনি তুলিয়াছিল, তৎকালীন দ্বিজোত্তম দার্শনিক সমাজের জ্ঞানগর্ভ সিদ্ধান্ত ও স্পর্ধিত আওয়াজ হয়ত তাহার তলায় চাপা পড়িয়া যাইতে পারে। এইজন্য অদ্বৈতপ্রভু মহা মহা কুলীন ব্রাহ্মণদিগেরও পূর্বে হরিদাসকে অন্ন নিবেদন করিয়া সর্বাগ্রে তাঁহার অভ্যর্থনা করিতেন এবং বলিতেন[২০] "তুমি খাইলে হয় কোটি ব্রাহ্মণ ভোজন।"

পঞ্চদশ শতকের ৭ম.-৮ম. দশকের দিকে হরিদাস অদ্বৈতপ্রভুর সহিত বসবাস করিবার কালে তাঁহারা আরও নিবিড়ভাবে যুক্ত হন। তৎকালীন দেশ ও সমাজের অবস্থা এক ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছিল। বৃন্দাবনদাস তাঁহার 'চৈতন্যভাগবতে' তাহার বিশদ বিবরণ দিয়াছেন। দেশের অর্থনৈতিক এবং বিশেষ করিয়া তাহার ধর্মনৈতিক ও সমাজনৈতিক অবস্থা বীভৎস হইয়াছিল। আচার-অনুষ্ঠানের ব্যভিচার সমাজকে পঙ্গু করিয়া দিতেছিল এবং যুক্তি বা ভক্তি যেন সমগ্র দেশ হইতেই নির্বাসিত হইয়াছিল। এইরূপ ভয়াবহ অবস্থার মধ্যেই অদ্বৈত ও হরিদাস নাম-মহিমা প্রচারের মাধ্যমে মিলিত অভিযান চালাইয়া মানুষের ঊষর মনোমরুতে ভক্তির বীজ বপন করিতে লাগিলেন। আঘাতও তাঁহাদের কম সহ্য করিতে হয় নাই। 'পাষণ্ডী-গণ' তাঁহাদের জীবনকে দুর্বিষহ করিয়াছিল। কিন্তু সকল বাধা সহ্য করিয়া হরিদাস অদ্বৈতপ্রভুর সহিত মরুভূমির বক্ষ চিরিয়া খুঁজিতে

(১৯) চৈ. ভা.—১।১১, পৃ. ৮৬-৮৭ (২০) চৈ. চ. ; চৈ. চন্দ্র ; প্রে. বি. (২৪শ. বি.) ; অ. প্র.। শেষোক্ত গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে এইজন্য কুলীন ব্রাহ্মণসমাজ অদ্বৈতকে পরিত্যাগ করিলে হরিদাস একদিন সন্ন্যাসী-বেশে তাঁহাদিগের এক বিশেষ অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের দ্বারা বন্দিত হন এবং তাঁহাদের সহিত একত্রে ভোজন করেন, ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে চিনিতেও পারেন নাই। এই বর্ণনা বিশ্বাস্য নহে, হরিদাসের মত ব্যক্তির পক্ষে এইরূপ ছলনা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

লাগিলেন কোথায় একবিন্দু বারি। অবশ্য বারিধারা চুয়াইয়া আসিল। মরুভূমির বক্ষাবরণ ভেদ করিয়া স্বচ্ছতোয়া ফল্গুধারা প্রবাহিত হইয়া আসিল গৌরাঙ্গরূপে।

গৌরাঙ্গের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হরিদাসের দায়িত্বভার যেন লাঘব হইয়া আসিল। ক্রমে গৌরাঙ্গ যৌবনে পদার্পণ করিলে গুণগ্রাহী ভক্তবৃন্দ মধুমত্ত ভৃঙ্গবৎ তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। হরিদাসও তাঁহার নিকট আনাগোনা করিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ আসিলে তিনি গৌরাঙ্গসহ নন্দন-আচার্যের গৃহে গিয়া তাঁহার সহিতও পরিচিত হইলেন। তারপর একদিন স্বয়ং গৌরাঙ্গপ্রভু হরিদাসের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করিয়া বলিলেন :

এই মোর দেহ হৈতে তুমি মোর বড়।
তোমার যে জাতি, সেই জাতি মোর দঢ়। ২১

বৈষ্ণব-সমাজে ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্যের মধ্যেই যবন বা শূদ্রের অনস্বীকার্য স্থানটিও সুনির্দিষ্ট হইয়া গেল। চৈতন্যের জীবদ্দশায় হরিদাসকে কেহ যবন বলিয়া মনেও করিতে পারিতেন না। বৈষ্ণবসমাজে তিনি 'ঠাকুর হরিদাস' নামে অখ্যাত হইয়াছিলেন।

হরিদাস গৌরাঙ্গের সহিত অচ্ছেদ্যসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। একদিন তিনি গৌরাঙ্গ-আদেশে নিত্যানন্দসহ কৃষ্ণনামের উপদেশ দিতে দিতে নগর-পরিভ্রমণকালে জগাই-মাধাই কর্তৃক উত্ত্যক্ত হইয়াছিলেন। অন্যদিন কাজীদলনার্থ গৌরাঙ্গের নগর-পরিভ্রমণকালে তিনি ভক্তবৃন্দসহ পথে পথে নাম প্রচার করিয়া বেড়াইলেন। আর একদিন অদ্বৈত-গৃহে (শান্তিপুরে ?) গৌরাঙ্গের নৃত্যাবসানে এক ব্রাহ্মণ পুনঃ পুনঃ তাঁহার চরণধূলি লইতে থাকায় গৌরাঙ্গপ্রভু বেদনা-বিগলিত চিত্তে গঙ্গাবক্ষে ঝাঁপ দিলে হরিদাস নিত্যানন্দসহ সন্তরণ করিয়া তাঁহাকে বাঁচাইলেন।[২২] এইভাবে তিনি নবদ্বীপ-লীলার প্রত্যেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার সহিত যুক্ত হইলেন এবং গৌরাঙ্গপ্রভুকেই দেবতাজ্ঞান করিয়া দাস্য-ভাবের[২৩] মধ্য দিয়াই ভক্তিমার্গের উচ্চতর ভূমিতে আরোহণ করিলেন। তখন তিনি গৌরাঙ্গ-চরণে সকল ভার অর্পণ করিয়া দায়মুক্ত হইয়াছিলেন এবং একজন লীলাসঙ্গী ও দীন সেবকরূপে আপনার উপর ন্যস্ত কর্মটুকুই সম্পন্ন করিতে চাহিয়াছিলেন। আর গৌরাঙ্গও হরিদাসের মধ্যে তাঁহার নাম-মাহাত্ম্য প্রচারের যোগ্যতম সহায়ককে দেখিতে পাইয়া প্রথম হইতেই[২৪] তাঁহাকে নবদ্বীপ-লীলার এক অন্তরঙ্গ সংগী-হিসাবে গ্রহণ করিয়া লন। চন্দ্রশেখর-আচার্যের গৃহে যে-কয়জন একান্ত অন্তরঙ্গ ভক্তকে লইয়া তিনি স্বয়ং নাটকাভিনয়ে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে এই হরিদাস ছিলেন অন্যতম। কবিকর্ণপুর বলিয়াছেন যে তাঁহাকেই নাটকের সূত্রধারের কার্য করিতে

(২১) চৈ. ভা.—২।১০, পৃ. ১৫৩ (২২) চৈ. চ.—১।১৭, পৃ. ৭৭ ; চৈ. ভা.—২।১৭, পৃ. ১৮৬ (২৩) চৈ. চ.—১।৬, পৃ. ৩৮ (২৪) গৌ. জী.—পৃ. ২১, ৩৭, ৪৪

হইয়াছিল।[২৫] বৃন্দাবনদাস বলিয়াছেন যে তিনি 'কতোয়ালে'র ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।[২৬] লোচনদাসও জানাইতেছেন যে তিনি যখন দণ্ড হস্তে রঙ্গমঞ্চে আসিয়া দাঁড়াইলেন তখন তাঁহার অভিনয় দর্শন করিয়া বৈষ্ণববৃন্দ চমৎকৃত হইয়াছিলেন।[২৭] কিন্তু স্বরূপ-রামানন্দ-রূপ-সনাতন ও হরিদাসের মধ্যে চৈতন্যমহাপ্রভু যেন তাঁহার স্বরূপ শক্তিকে বিভক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। যেমন তিনি সনাতন দ্বারা 'ব্রজের ভক্তি সিদ্ধান্ত' ও শ্রীরূপের দ্বারা 'ব্রজের রস প্রেমলীলা' প্রকাশ করিতে চাহিয়াছিলেন, ঠিক সেইরূপ তিনি হরিদাস দ্বারা নাম-মাহাত্ম্য প্রকাশ[২৮] করিয়াছিলেন। হরিদাসও তাঁহার উপর অর্পিত এই কর্মভারটিকে সানন্দে নির্বাহ করিয়াছিলেন।

সন্ন্যাস-গ্রহণের পর মহাপ্রভুকে অদ্বৈত-গৃহে আনা হইলে অদ্বৈত ও মুকুন্দের সহিত হরিদাস তাঁহার প্রসাদ-শেষ ভোজন করিয়া নিজে পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন এবং নিত্যানন্দসহ নৃত্যগান করিয়া মহাপ্রভুকেও পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু মহাপ্রভু নীলাচল-গমনের জন্য প্রস্তুত হইলে তিনি কিছুতেই স্থির থাকিতে পারেন নাই। মহাপ্রভুর সহিত বিচ্ছেদে সহায়সম্বলহীনভাবে তাঁহার জীবন যে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে, সেই কথা স্মরণ করিয়া তিনি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু আশ্বাস দিলেন যে পরে তিনি তাঁহাকেও নীলাচলে লইয়া যাইবেন।

মহাপ্রভুর দক্ষিণ-ভ্রমণের পর হরিদাস নীলাচলে গিয়া হাজির হন।[২৯] ভক্তবৃন্দ মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে তিনি রাজপথপ্রান্তে দণ্ডবৎ হইয়া পড়িয়া রহিলেন। মহাপ্রভুর আদেশে তাঁহাকে আনিবার জন্য লোক পাঠান হইলে তিনি বলিয়া পাঠাইলেন, তাঁহার নীচ কুলে জন্ম, পথপ্রান্তই তাঁহার উপযুক্ত স্থান। 'নিভৃতে টোটা মধ্যে যদি স্থান খানিক'টা পান তো সেই নির্জন স্থানে থাকিয়া তিনি অক্লেশে নাম জপ করিতে পারিবেন। মহাপ্রভু তখন কাশী-মিশ্রের নিকট স্বীয় বাসস্থানের সন্নিকটস্থ পুষ্পোদ্যানের একখানি ক্ষুদ্র গৃহ ভিক্ষা করিয়া লইলেন এবং হরিদাসের সহিত আসিয়া মিলিত হইলেন। হরিদাস বার বার বলিতে লাগিলেন, "প্রভু না ছুঁইহ মোরে। মুঞি নীচ অস্পৃশ্য পরম পামরে॥" কিন্তু মহাপ্রভু তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের কথা ঘোষণা করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন দান করিলেন এবং তাঁহাকে পূর্বোক্ত উদ্যানে লইয়া গিয়া সেই স্থানের নিভৃত

(২৫) চৈ. না.—৩।১১ (২৬) চৈ. ভা.—২।১৮, পৃ. ১৮৮; তু.—গৌ. ত.—পৃ. ২৭৭ (২৭) চৈ. ম.—মধ্য, পৃ. ১৩৭ (২৮) চৈ. চ.—৩।৫, পৃ. ৩১২ (২৯) চৈ. চ.—২।১০, পৃ. ১৪৭, ১৫৩; চৈ. না.—৮।৪৩; চৈ. ভা.—৩।৯, পৃ. ৩২৬; একমাত্র জয়ানন্দ জানাইতেছেন (বি. খ., পৃ. ১৪০) যে হরিদাস তখন ফুলিয়ায় বাস করিতেছিলেন। অদ্বৈতাচার্য নীলাচল হইতে ফিরিয়া তাঁহাকে মহাপ্রভুর ইচ্ছানুযায়ী নীলাচলে যাইতে বলিলে তিনি নীলাচলে গমন করেন।

গৃহখানিতে স্থায়িভাবে বসবাস ও নাম-সংকীর্তন করিবার নির্দেশ দিলেন। তারপর তিনি হরিদাসের জন্য প্রত্যহ প্রসাদান্ন প্রেরণের ব্যবস্থাও করিয়া দিলেন এবং তদবধি তিনি প্রত্যহ তথায় গিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইতেন। বিশিষ্ট ভক্তবৃন্দও প্রত্যহ তথায় যাতায়াত করিতেন। হরিদাস পরমানন্দে তাঁহার আজীবনের সাধনায় নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করিলেন।

হরিদাস কিন্তু কোনদিন 'মর্যাদা' লঙ্ঘন করেন নাই। মন্দির-সন্নিধানে গমন করা তো দূরের কথা, মহাপ্রভুর কাছাকাছি থাকিয়া তিনি তাঁহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন বটে, কিন্তু কখনও তিনি নিজের কথা ভুলিয়া গিয়া তৎসন্নিকটবর্তী হইয়া আপনার উপর প্রদত্ত শক্তির সুযোগ গ্রহণ করেন নাই।[৩০] কিন্তু মহাপ্রভু প্রত্যহ উপল-ভোগ দর্শনের পর হরিদাসের কুটিরে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইতেন। সেইস্থানে রূপ কিংবা সনাতন থাকিলেও তিনি তৎসহ মিলিত হইতেন। ইহা যেন তাঁহার একটি অবশ্য-পালনীয় নিয়ম হইয়া গিয়াছিল।[৩১] আবার বিশেষ কার্যোপলক্ষেও তিনি হরিদাসকে কোনদিন বিস্মৃত হন নাই। প্রথম রথযাত্রা-উপলক্ষে তৎপ্রবর্তিত সম্প্রদায় কীর্তনের মধ্যে একটি সম্প্রদায়ের প্রধান নর্তক হিসাবে তাঁহাকে যে স্থানটি দেওয়া হয়, নৃত্যবিলাসী হরিদাসের সেই স্থানটি চিরতরে সুনির্দিষ্ট রহিয়াছিল।[৩২]

মহাপ্রভুর গৌড়যাত্রাকালে হরিদাসও তাঁহার সঙ্গী-রূপে গমন করিয়াছিলেন।[৩৩] মহাপ্রভু রামকেলিতে পৌঁছাইলে হরিদাসের সহিত রূপ-সনাতনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়।[৩৪] এই সম্পর্ক চির-অক্ষুন্ন ছিল। রূপ ও সনাতনের মধ্যে যিনিই যখন নীলাচলে পৌঁছাইতেন, হরিদাস সর্বদাই তাঁহাকে পরম আদরে আপনার নিকট অবস্থান করাইতেন এবং ভক্তগণসহ মহাপ্রভুর শাস্ত্রালোচনা শুনিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতেন।

নরহরি-চক্রবর্তী বলিয়াছেন যে মহাপ্রভু দামোদর-পণ্ডিতের মধ্য দিয়া যেমন নিরপেক্ষত প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেইরূপ তিনি 'হরিদাস দ্বারে সহিষ্ণুতা জানাইল'।[৩৫] হরিদাস সম্বন্ধে এই উক্তি সম্পূর্ণতই সত্য। কিন্তু কৃষ্ণদাস-কবিরাজ তাঁহার সঙ্গী সনাতনের মুখে তাঁহার সম্বন্ধে যে কথা বলাইয়াছেন[৩৬] তাহাই বোধকরি হরিদাস সম্বন্ধে চরম কথা। সনাতন বলিয়াছেন :

অবতার কার্য প্রভুর নাম প্রচারে।
সে নিজ কার্য প্রভু করেন তোমা দ্বারে ॥
প্রত্যহ কর তিন লক্ষ নাম সঙ্কীর্তন।
সবার আগে কহ নামের মহিমা কথন ॥

(৩০) চৈ. চ.—২।৩, পৃ. ৯৭ ; ২।১২, পৃ. ১৬১ ; ২।১৩, পৃ, ১৬৫ ; চৈ. চ. ম.—১৯।৫২ (৩১) চৈ. চ.—২।১, পৃ. ৮৩ (৩২) ঐ—২।১৩, পৃ. ১৬৪ (৩৩) ঐ—২।১৬, পৃ. ১৮৮ ; চৈ. না.—৯।৩৩ ; চৈ.ম.—পৃ. ১৪১ (৩৪) চৈ. চ.—২।১, পৃ. ৮৬-৮৭ (৩৫) ভ. র.—১।৬৩১ (৩৬) চৈ. চ.—৩।৪ পৃ. ৩০৬

আপন আচারে কেহ না করে প্রচার।
প্রচার করেন কেহ না করে আচার॥
আচার প্রচার নামের করহ দুই কার্য।
তুমি সর্বগুরু তুমি জগতের আর্য॥

বার্ধক্যে হরিদাসের পক্ষে তাঁহার সেই কঠোর নিয়ম সর্বদা পালন করিয়া চলা সম্ভব হয় নাই বলিয়া তাঁহার বেদনার অন্ত ছিলনা। গোবিন্দ একদিন মহাপ্রসাদ আনিলে তিনি অত্যন্ত কুন্ঠিত হইলেন, তখনও তিন লক্ষ বার নাম গ্রহণ পূর্ণ হয় নাই। অথচ মহাপ্রসাদকে উপেক্ষা করা চলেনা। কোনরকম কণামাত্র । করিয়া তিনি উপবাসেই কাটাইলেন। আর একদিন তাঁহার ভগ্ন স্বাস্থ্য দেখিয়া মহাপ্রভু তাঁহার দৈহিক সুস্থতা কামনা করিলে তিনি জানাইলেন:

শরীর সুস্থ হয় মোর অসুস্থ বুদ্ধিমন॥
প্রভু কহে কোন ব্যাধি কহত নির্ণয়।
তেঁহো কহে সংখ্যা কীর্তন না পূরয়॥

মহাপ্রভু তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলেন যে তিনি সিদ্ধদেহ, তাঁহার ত' সাধনার আর কোন প্রয়োজন নাই। হরিদাস তাঁহার নিকট একটি প্রার্থনা জানাইলেন: যেন তিনি মহাপ্রভুর তিরোভাবের পূর্বেই চক্ষু মুদ্রিত করিতে পারেন। মহাপ্রভু আপত্তি জানাইলে তিনি বলিলেন:

তোমার লীলার সহায় কোটি ভক্ত হয়॥
আমা হেন যদি এক কীট মরি গেল।
এই পিপীলিকা মৈল পৃথিবীর কাঁহা ক্ষতি হৈল॥

হরিদাসের পক্ষে আর প্রাণ ধারণ করা সম্ভব হইলনা। চরম মুহূর্তটি ঘনাইয়া আসিল। প্রাতঃকালে মহাপ্রভু তাঁহার কুটিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নামসংকীর্তন চলিতে লাগিল। শেষে ঠাকুর-হরিদাস ভক্তগণের পদরেণু মস্তকে লইয়া চৈতন্যকে সম্মুখে বসাইলেন এবং স্বীয় নয়ন-ভৃঙ্গ তাঁহারই পদ্মাননে সংযুক্ত হইলে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে তিনি বিগতপ্রাণ হইলেন। মহাপ্রভু তাঁহার মৃতদেহকে সমুদ্র-জলে অবগাহন করাইয়া সমুদ্রতীরে প্রোথিত করিলেন। ভক্তগণের ক্রন্দন ও সংকীর্তন-ধ্বনির মিলিত ঐকতানে সাগর ও আকাশ ব্যাপিয়া উঠিল।

গঙ্গাদাস-পণ্ডিত

গৌরাঙ্গের শিক্ষাগুরু গঙ্গাদাস-পণ্ডিত সম্বন্ধে 'চৈতন্যভাগবত' হইতে জানা যায়[১] যে গৌরাঙ্গ-আবির্ভাবের পূর্বে একবার তিনি যবন-রাজার কোপদৃষ্টিতে পড়িয়া পরিজনসহ গঙ্গাপার হইয়া অন্যত্র চলিয়া যান। 'গৌরাঙ্গ-বিজয়'-মতে[২] বিশ্বম্ভরের এই গুরুর নাম ছিল গঙ্গাদাস-চক্রবর্তী। জয়ানন্দ[৩] গৌরাঙ্গের 'গুরুপত্নী' সুলোচনার নামোল্লেখ করায় ধারণা জন্মায় যে তিনি হয়ত গঙ্গাদাসেরই পত্নী ছিলেন।

বিশ্বম্ভর গঙ্গাদাসের[৪] নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিতেন। বিশেষ করিয়া তিনি তাঁহার নিকট ব্যাকরণ শাস্ত্র[৫] অধ্যয়ন করিয়া যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। কিশোর-নিমাই যখন শাস্ত্রজ্ঞ হইয়া উঠিলেন তখন একমাত্র গঙ্গাদাস ছাড়া নবদ্বীপে[৬] আর কেহই ছিলেন না যিনি তাঁহার সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিতেন।[৭]

গৌরাঙ্গপ্রভু গয়া হইতে ফিরিবার পর গঙ্গাদাসের গৃহে অধ্যাপনা আরম্ভ করিলে একদিন পড়ুয়াগণ গঙ্গাদাসের নিকট অভিযোগ উত্থাপন করিলেন যে নিমাই-পণ্ডিত সকল গ্রন্থের মধ্যেই কৃষ্ণ-ব্যাখ্যা করিতে থাকেন। তখন

> উপাধ্যায় শিরোমণি বিপ্র গঙ্গাদাস।
> শুনিয়া সভার বাক্য উপজিল হাস ॥
> ওঝা বলে ঘরে যাহ, আসিহ সকালে।
> আজি আমি শিখাইব তাঁহারে বিকালে ॥[৮]

কিন্তু নিমাইর নিকট তখন সমস্ত জগৎই কৃষ্ণময়। গঙ্গাদাস তাঁহাকে ডাকাইয়া 'ব্যতিরিক্ত অর্থ' না করিবার উপদেশ দিলে তিনি সসংকোচে গুরুকে জানাইলেন যে তিনি যথাযথ ব্যাখ্যা করিতেছেন। এই প্রসঙ্গে নিমাইর মধ্যে অসাধারণ শক্তির পরিচয় পাইয়া গঙ্গাদাস বিস্মিত হইলেন।

ক্রমে ভক্তবৃন্দকে লইয়া গৌরাঙ্গের লীলা আরম্ভ হইল। মধ্যে মধ্যে তিনি গঙ্গাদাসের গৃহে গিয়া[৯] নানাভাবে লীলা করিতেন। আবার গঙ্গাদাসও কখনও কখনও শ্রীবাসাদি ভক্তের গৃহে আসিয়া গৌরাঙ্গলীলায় যোগ দিতেন। চন্দ্রশেখর-আচার্যের গৃহে

---

(১) ২।৯, পৃ. ১৪৮ (২) পৃ. ৭০,৭৪ (৩) ন.খ.,পৃ.২৩ (৪) গঙ্গাদাস সম্বন্ধে গৌরাঙ্গ-পরিজন দ্রষ্টব্য। (৫) জয়ানন্দ জানাইয়াছেন (পৃ. ১৮) যে নিমাই নবদ্বীপে গঙ্গাদাস-পণ্ডিতের গৃহে কলাপ ব্যাকরণ পড়িতেন। (৬) বৃন্দাবনদাসের বৈষ্ণববন্দনা ও (আধুনিক)বৈষ্ণবাচারদর্পণ-গ্রন্থে (পৃ. ৩৪০) গঙ্গাদাসের আবাস বিদ্যানগরে বলা হইয়াছে। (৭) চৈ. ভা.—১।৭, পৃ. ৫১ (৮) ঐ—২।১, পৃ. ১০১ (৯) ঐ—২।৮, পৃ. ১৩৮; ভ.র.—১২।২৫৩৫

অভিনয়কালে যাঁহারা রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন গঙ্গাদাস তাঁহাদিগের মধ্যে অন্যতম ছিলেন।[১০] ইহাছাড়া, উল্লেখযোগ্য প্রায় সকল ঘটনাতেই গৌরাঙ্গের সহিত তিনি বিশেষভাবেই যুক্ত ছিলেন।

মহাপ্রভুর দক্ষিণ-ভ্রমণের পর গঙ্গাদাস-পণ্ডিত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান এবং সেই বৎসর তিনি শ্রীবাসাদির সহিত নবদ্বীপ-সম্প্রদায়ে যুক্ত হইয়া জগন্নাথের সম্মুখে নৃত্য ও কীর্তন করিয়াছিলেন। তারপর তিনি ভক্তবৃন্দের সহিত ফিরিয়া আসিয়া নবদ্বীপেই বাস করিতে থাকেন এবং শচীমাতার মঙ্গলার্থী তত্ত্বাবধায়করূপে থাকিয়া মহাপ্রভুর কর্তব্যভারকেই মাথায় তুলিয়া লন। মহাপ্রভু যখন কানাইর-নাটশালা হইতে প্রত্যাবর্তনের পর শান্তিপুরে অদ্বৈত-গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন গঙ্গাদাস-পণ্ডিতই শচীমাতাকে সঙ্গে লইয়া শান্তিপুরে গমন করেন।[১১] ইহার পরেও গঙ্গাদাস মধ্যে মধ্যে নীলাচলে গিয়া চৈতন্যের দর্শনলাভ করিয়া আসিতেন।[১২]

(১০) চৈ. ভা.—২।১৮, পৃ. ১৯১ (১১) ঐ—৩।৪, পৃ. ২৮৯ (২১) ঐ—৩।৯, পৃ. ৩২৬ ; চৈ. চ.—৩।১০, পৃ. ৩৩৪

চন্দ্রশেখর আচার্যরত্ন

চন্দ্রশেখর-আচার্যরত্নের আদি নিবাস ছিল শ্রীহট্টে। 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক' হইতে জানা যায় যে শচীদেবীর সহিত আচার্যরত্ন-গৃহিণীর ভগিনী-সম্বন্ধ ছিল এবং তিনি শচীদেবীর একজন ঘনিষ্ঠ সঙ্গিনী ছিলেন।[১] গৌরাঙ্গ-আবির্ভাবের পূর্বেই চন্দ্রশেখর নবদ্বীপে চলিয়া আসেন। তাই সস্ত্রীক[২] চন্দ্রশেখরের পক্ষে গৌরাঙ্গের জন্ম ও শৈশব-লীলা প্রভৃতির প্রত্যক্ষদ্রষ্টা হওয়া সম্ভব হইয়াছিল এবং বহু পূর্ব হইতেই তিনি চৈতন্যের দাস্যপ্রেমে পাগল হইয়া তাঁহারই একজন মহাভক্ত ও একটি শ্রেষ্ঠশাখারূপে পরিগণিত হইতে পারিয়াছিলেন।[৩] বয়সের পার্থক্যবশত গৌরাঙ্গের শৈশবকাল হইতেই হয়ত উভয়ের মধ্যে তেমন ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটিয়া উঠে নাই। কিন্তু 'চৈতন্যচরিতামৃতমহাকাব্য' হইতে জানা যায়[৪] যে গৌরাঙ্গ গয়াগমনকালে 'জননীভগিনীপতিনা' সহ গমনেচ্ছু হইয়া তাঁহাকে অভিভাবক হিসাবে সঙ্গে লইয়া গয়া যাত্রা করেন। তাহার পর শ্রীবাস-গৃহে প্রাত্যহিক কীর্তনের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস-গ্রহণকাল পর্যন্ত জগাই-মাধাই উদ্ধার, নগর-সংকীর্তন প্রভৃতি বিশেষ ঘটনাগুলির প্রায় প্রত্যেকটিতেই তাঁহার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।[৫] এমনকি জয়ানন্দ তাঁহাকে গৌরাঙ্গের গয়াযাত্রা এবং পূর্ববঙ্গ ভ্রমণাদি আরও পূর্ববর্তী ঘটনাগুলির সহিতও যুক্ত করিয়াছেন।[৬]

শ্রীবাস-গৃহের মত শেখর-ভবনও গৌরাঙ্গের একটি প্রধান লীলাস্থলে পরিণত হইয়াছিল।[৭] তাই দেখা যায় গৌরাঙ্গের নবদ্বীপলীলার সার্থকতম ঘটনাটি এই চন্দ্রশেখর-ভবনেই অনুষ্ঠিত হয়। গৌরাঙ্গের নৃত্যলীলা তথা জীবনলীলার সেই শ্রেষ্ঠ অভিনয়টির বর্ণনা প্রদান করিতে গিয়া প্রাচীন গ্রন্থকার-গণ সকলেই বিশেষভাবে সচেতন হইয়াছেন[৮] এবং গৌরাঙ্গের সেই দানলীলার[৯] অভিনয়ই বোধকরি বাংলাভাষায়

(১) চৈ. না.—৪।১-৪ ; চৈ. চ. ম.—৪।২১; প্রে. বি.-এ (২৪শ. বি.) বলা হইয়াছে যে আচার্যরত্নের পত্নী সর্বজয়া শচীদেবীর কনিষ্ঠা ভগিনী ছিলেন। (২) চৈ.চ.—১।১৩, পৃ.৬২ (৩) চৈ. ভা.—১।২, পৃ. ১০,১২ ; চৈ.চ.—১।১৩, পৃ. ৬০, ৬২ ; ১।৬, পৃ. ৩৮ ; ১।১০, পৃ. ৫১ ; চৈ. না.—৪।১ ; চৈ. কৌ.—পৃ. ১৬,১৪ ; চৈ. ম. (জ.)—ন. খ., পৃ. ২৪ ; বৈ.দ.—পৃ ৩৪২ (৪) ৪।২১ (৫) চৈ. ভা.—২।৮, পৃ. ১৩৯ ; ২।১৩, পৃ. ১৭১, ২।২৩, পৃ. ২১৭, ২২৫ ; চৈ. চ.-মতে (১।১৭, পৃ. ৭৪) একবার 'আচার্য-শেখর তাঁরে দেখে রামাকার।' (৬) ন. খ., পৃ. ২৮, ৩২, ৪৭ (৭) চৈ. মা.—২।২০ ; চৈ. ভা.—২।৮, পৃ. ১৩৮-৩৯ (৮) শ্রীচৈ. চ.—২।১৫-১৭ ; চৈ. ভা —২।১৮ ; চৈ. ম. (লো.)—পৃ. ১৩৭-৩৯ ; চৈ. ম. (জ.)—বৈ. খ., পৃ. ৬২ ; চৈ. না.—৩য়. অঙ্ক ; চৈ. চ. ম.—১১।২ ; চৈ. চ.—১।১০, পৃ. ৫১ ; ১।১৭, পৃ. ৭৭ (৯) চৈ. মা.—৩।২৪

'অঙ্কের বিধানে'[১০] অভিনীত প্রথম নাট্যাভিনয়।[১১] সেই অভিনয়ে আচার্যরত্ন ও বিদ্যানিধি প্রমুখ ভক্তবৃন্দ গায়কের কাজ করিয়াছিলেন। আচার্যরত্নের গৃহিণীও দর্শক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। খুব জাঁকজমকের সহিত নৃত্যাভিনয় সংঘটিত হয়। অনুষ্ঠানের কোথাও ত্রুটি ছিলনা এবং গৌরাঙ্গের অনতিক্রমণীয় অভিনয়-নৈপুণ্য ও অভিনেতৃবৃন্দের কার্যকুশলতার ফলে অভিনয় এমন সুন্দর হইয়াছিল যে জীবনই যেন তাহার নিকট অবাস্তব অভিনয়মাত্রে পর্যবসিত হইয়া যায়। এমনকি

শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য রত্নবাট্যাং মহাপ্রভুঃ।
ননর্ত যত্র তত্রাসীত্তেজস্তত্ত্বমদ্ভুতম্ ॥
সপ্তাহং শীতলং চন্দ্রতেজসা সদৃশং হরিম্
চঞ্চলেব সুহৃ (?) প্রেক্ষং চিত্তাহ্লাদকরং শুচিঃ ॥১২

গৌরাঙ্গের সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্বে তাঁহাকে তদ্বিষয়ে নিবৃত্ত করিবার জন্য শচীদেবী সম্ভবত একবার আচার্যরত্ন-গৃহিণীর উপস্থিতিতে তাঁহারই সাহায্য গ্রহণ করিয়া পুত্রকে নানাভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।[১৩] তাঁহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইলেও গৌরাঙ্গ কিন্তু সন্ন্যাস-গ্রহণের গোপনীয় ও পবিত্রতম দিবসটিতে চন্দ্রশেখরকে ভুলেন নাই। প্রধান সঙ্গী-হিসাবে তিনি সেই স্থিতধী ব্যক্তিটিকে কাটোয়ায় লইয়া গিয়া তাঁহাকেই স্বীয় জীবনের কঠোরতম কর্মসম্পাদনার 'প্রতিনিধি'-পদে নিয়োজিত করেন। মহাভক্ত চন্দ্রশেখর অবশ্য সেই গুরু দায়িত্ব মাথায় পাতিয়া লন; কিন্তু তদনুযায়ী তাঁহাকে অন্তরের একান্ত প্রতিকূলাচরণ সত্ত্বেও যথাবিধি সকল কর্ম সুসম্পন্ন করিয়া চৈতন্যমহাপ্রভুকে যেন এক অনধিগম্য দেবলোকে উত্তরণ করিবার সমস্ত বাধাবিঘ্ন দূর করিতে গিয়া নিজেকেই কণ্টকশয্যা গ্রহণ করিতে হয়।[১৪]

সন্ন্যাস-গ্রহণান্তে মহাপ্রভুর রাঢ়-পরিভ্রমণকালেও আচার্যরত্নকেই নবদ্বীপে সেই হৃদয়-বিদারক সংবাদটি বহন করিয়া আনিতে হয়।[১৫] আবার মহাপ্রভু শান্তিপুরে পৌছাইলেও

---

(১০) চৈ. ভা.—২।১৮, পৃ. ১৮৮ (১১) শ্রীবাসচরিত্রের গ্রন্থকার-মতে (পৃ. ১৫৮, ২১ শ. পরিচ্ছেদ) কৃষ্ণলীলাভিনয় দুইবার হয়, "দানলীলার অভিনয় সম্ভবত অন্য একদিনে সম্পন্ন হইয়া থাকিবে।" (১২) শ্রীচৈ.চ.—২।১৭।১-২ (১৩) চৈ. না.—৪।১-৪ ; তু.—চৈ. কৌ.—পৃ. ৯৪ (১৪) চৈ. ভা.—২।২৬, পৃ. ২৪০, ২৪২-৪৩; শ্রীচৈ. চ.—৩।১।১১, ৩।২।৬; চৈ. ম. (জ.)—বৈ. খ., পৃ. ৮৩; চৈ. ম. (লো). —ম. খ., পৃ. ১৫৫, ১৫৮; চৈ. না.—৪।৩৫-৫০, চৈ. চ.—১।১৭, পৃ. ৭৭; ২।৩, পৃ. ৯৫ (১৫) উপরোক্ত গ্রন্থগুলির পরবর্তী অংশগুলি দ্রষ্টব্য; চৈ. কৌ.—পৃ. ১১২; অ. প্র.—১৫শ. অ., পৃ. ৬২; গৌ ত.—পৃ. ১৪৪

প্রভাতে আচার্যরত্ন দোলায় চড়াইয়া।
ভক্তগণ-সঙ্গে আইলা শচীমাতা লৈয়া ॥ ১৬

'চৈতন্যচরিতামৃতমহাকাব্য' হইতে জানা যায়[১৭] যে মহাপ্রভু দক্ষিণ-ভ্রমণে চলিয়া গেলে পরমানন্দ-পুরী নবদ্বীপে আসিয়া শচীমাতা এবং আচার্যরত্ন উভয়ের নিকটই ভিক্ষা-নির্বাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু চন্দ্রশেখরের তৎকালীন কর্ম-পদ্ধতি সম্বন্ধে গ্রন্থকার কিছুই লিপিবদ্ধ করেন নাই। মহাপ্রভুর নবদ্বীপ-ত্যাগের পর তিনি কখনও একাকী, আবার কখনও বা স্বীয় পত্নীকে সঙ্গে লইয়া ভক্তবৃন্দের সহিত গিয়া মহাপ্রভুকে দর্শন করিতেন এবং তাঁহার নীলাচল-লীলাতেও অংশ-গ্রহণ করিতেন[১৮] সত্য, কিংবা মহাপ্রভু গৌড়ে পৌঁছাইলে তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন[১৯] সত্য, কিন্তু কখনও তাঁহাকে আর বড় বেশি একটা সক্রিয় অবস্থায় দেখা যায় নাই। আত্মপ্রচারের কোন বাসনাই তাঁহার ছিলনা।

চৈতন্য-তিরোভাবের পর বৃদ্ধ আচার্যরত্নের সম্বন্ধে আর কিছুই জানা যায়না। 'ভক্তি-রত্নাকরে'র বর্ণনায় গদাধরদাসপ্রভুর তিরোধানতিথি-উৎসবে সমাগত ব্যক্তিদিগের মধ্যে একজন চন্দ্রশেখরকে দেখা যায়।[২০] কিন্তু তিনি নিশ্চয় আর কোনও চন্দ্রশেখর হইবেন। নরোত্তম-শাখা মধ্যেও একজন চন্দ্রশেখরকে পাওয়া যায়। 'প্রেমবিলাস'-বর্ণিত এই নরোত্তম-শিষ্যের পক্ষেই উক্ত উৎসবে যোগদান করা অধিকতর সম্ভব মনে হয়। আবার বল্লভের একটি পদে বলা হইয়াছে যে 'আচার্যরত্ন' গোবিন্দদাস-কবিরাজের পদাবলী আস্বাদন করিয়াছিলেন।[২১] 'আচার্যরত্ন' উপাধি-বিশিষ্ট অন্য নাম না পাওয়া গেলেও চন্দ্রশেখর-আচার্যরত্নই যে দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া শতাধিক বর্ষ বয়ঃক্রমকালেও গোবিন্দদাসের পদাস্বাদন করিয়াছিলেন, তাহা মনে হয় না। 'গৌরপদতরঙ্গিণী' ও 'পদকল্পতরু'তে চন্দ্রশেখর-ভণিতার তিনটি পদ পাওয়া যায়। মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয় জানাইতেছেন,[২২] "এই তিনটিই মহাপ্রভুর লীলাবিষয়ক এবং প্রত্যক্ষদর্শন করিয়া রচিত বলিয়া মনে হয় এইগুলি আচার্যরত্নের পদ বলিয়া অনেকের বিশ্বাস।" তৎপূর্বে সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ও এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।[২৩] ডা. সুকুমার সেনের মতে[২৪] এই বিষয়ে

---

(১৬) চৈ. চ.—২।৩, পৃ. ৯৮; তু.—চৈ. ম. (জ.)—স. খ., পৃ.৯৪ (১৭) ১৩।১১৯ (১৮) চৈ. চ.—২।১০, পৃ. ১৪৭; ২।১১, পৃ. ১৫৩; ২।১২. পৃ ১৬১; ২।১৬, পৃ. ১৮৬; ৩।৭ পৃ. ৩২৪; ৩।১০, পৃ. ৩৩৪; ৩।১২, পৃ. ৩৪১; শ্রীচৈ. চ.—৪।১৭।৩; চৈ. না.—৮।৪৩; চৈ. ভা. —৩।৯, পৃ. ৩২৬, ৩২৯ (১৯) চৈ. ম. (জ.)—বি. খ., পৃ, ১৪০, ১৪২ (২০) নি. বি.-মতে বীরচন্দ্র অদ্বৈতের নিকট দীক্ষা-গ্রহণার্থ শান্তিপুরাভিমুখে গমন করিলে জাহ্নবাদেবী তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য একজন চন্দ্রশেখর-পণ্ডিতকে পাঠান। (২১) গৌ. ত.—পৃ. ৩২১ (২২) গৌ. ত. (প. প.) (২৩) পু. ক. (প.) (২৪)—HBL.—p.396

নরহরি-ঠাকুরের শিষ্য চন্দ্রশেখরের কর্তৃত্বও সমধিক। কিন্তু নরহরি-শিষ্য চন্দ্রশেখর চৈতন্য-পরবর্তিকালের কবি ছিলেন।

'চৈতন্যভাগবতে'র নিত্যানন্দ-শিষ্য তালিকার মধ্যে[২৫] একজন নিত্যানন্দ-শিষ্য 'মহান্ত আচার্যচন্দ্রে'র নাম আছে। জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' এবং দেবকীনন্দনের 'বৈষ্ণববন্দনা'য় একবার করিয়া তাঁহার উল্লেখ[২৬] ছাড়া আচার্যচন্দ্রকে আর কোথাও পাওয়া যায়না। ডা. সুকুমার সেন তাঁহার নিত্যানন্দ-প্রশস্তিমূলক একটি মিশ্র ব্রজবুলি পদের সন্ধান দিয়া[২৭] বলিতেছেন যে তিনি চন্দ্রশেখর-আচার্যরত্ন হইয়া থাকিলে আচার্যরত্নেরও কবিতা রচনার নিদর্শন মিলিতেছে। কিন্তু আচার্যরত্নকে নিত্যানন্দ-শিষ্য ধরিয়া লইবার কারণ নাই। আচার্যচন্দ্র সম্ভবত পৃথক ব্যক্তি।

(২৫) চৈ. ভা.—৩।৬, পৃ. ৩১৬ (২৬) বি. ধ., পৃ. ১৪৪ ; বৈ. ব., পৃ. ৩ (২৭) HBL—pp. 211, 212

মুরারি-গুপ্ত

মুরারি-গুপ্তের আদি নিবাস শ্রীহট্টে এবং তিনি জাতিতে বৈদ্য ছিলেন।[১] শ্রীহট্টের বৈষ্ণববৃন্দ নবদ্বীপের সহিত সংযোগ রক্ষা করিতেন। সেই সূত্রে সম্ভবত যৌবনারম্ভেই মুরারি নবদ্বীপে চলিয়া আসেন। নবদ্বীপে তাঁহার চিকিৎসা-ব্যবসায় চলিত এবং তিনি সুচিকিৎসক ছিলেন। আবার এদিকে তিনি ছিলেন সজ্জন ব্যক্তি। 'প্রতিগ্রহ নাহি করে না লয় কারো ধন।'[২] কেবলমাত্র আত্মবৃত্তির দ্বারাই তিনি স্বোপার্জিত অর্থে আত্মীয়-কুটুম্বাদি পালন করিতেন। এই সমস্ত কারণে এবং বিদ্যানুরাগ ও চরিত্র-মাধুর্যাদির দ্বারা পরম সুধীরস্বভাব এই ব্যক্তিটি অল্পকালমধ্যে নবদ্বীপবাসীর বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছিলেন।[৩] তাঁহার এই নবদ্বীপ-বাসকালেই গৌরাঙ্গ-আবির্ভাব ঘটে; তাই মুরারির পক্ষে তাঁহার সমস্ত লীলা প্রত্যক্ষ করা বা তাঁহার সহিত যুক্ত হওয়া সম্ভব হইয়াছিল।[৪]

অবশ্য মুরারি-গুপ্ত বিশ্বম্ভরের শৈশবের ক্রীড়াসঙ্গী ছিলেন না; তাঁহাদের মধ্যে বয়সের যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। কিন্তু উভয়ে উভয়কে বেশ ভাল করিয়াই চিনিতেন। দুর্দান্তপনায় বিশ্বম্ভর তখন লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছেন। আর মুরারি তখন জ্ঞানযোগ অধ্যয়নে নিবিষ্টচিত্ত হইতেছেন। একদিন তিনি সঙ্গীদিগের সহিত জ্ঞানবিষয়ক ব্যাখ্যায় হস্তমস্তকাদি চালনা করিতে করিতে চলিতেছিলেন। ক্রীড়ারত বিশ্বম্ভর হঠাৎ মুরারিকে দেখিয়া পশ্চাতে চলিলেন। মুরারি তাঁহাকে কটাক্ষে দেখিয়া অগ্রসর হইলে বিশ্বম্ভরও মুরারির অনুকরণে অঙ্গভঙ্গী করিতে করিতে যোগব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। কিছুক্ষণ পরে অসহ্য হওয়ায় মুরারি বলিয়া উঠিলেন[৫] :

> এচ্ছারে কে বোলে ভাল দেখিল ত ছাওয়াল
> মিশ্র পুরন্দর সুত এই।

বিশ্বম্ভর ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন যে মুরারিকে উপযুক্ত ফল পাইতে হইবে। মুরারি চলিয়া গেলেন এবং অল্পক্ষণ পরেই সমস্ত ভুলিয়া গেলেন। কিন্তু বিশ্বম্ভর যথাসময়ে মুরারির গৃহে হাজির হইলেন। মুরারি তখন ভোজনে বসিয়াছেন। অর্ধেক ভোজন হইয়াছে। এমন সময় বিশ্বম্ভর তাঁহার থালায় মূত্র-ত্যাগ করিয়া দৌড় দিলেন।[৬] মুরারির জন্মের মত শিক্ষা হইয়া গেল।

(১) চৈ. ভা.—১।১, পৃ. ১০ (২) চৈ. চ.—১।১০, পৃ. ৫২ (৩) ঐ—১।৬, পৃ. ৩৮; ভ. র.—১২।১১২৭ (৪) চৈ. ম. (লো.)—সূ. খ., পৃ. ৪ (৫) চৈ. ম. (লো.)—আ. খ., পৃ. ৫২ (৬) ঐ; ভ. র. ১২।১১২৮, ২১৫১

আর একটু অধিক বয়সে গঙ্গাদাসের নিকট পাঠশিক্ষাকালেই বিশ্বম্ভর মুরারির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হন। কমলাকান্ত কৃষ্ণানন্দ প্রভৃতিও তখন গঙ্গাদাসের ছাত্র। বিশ্বম্ভর এই সমস্ত পড়ুয়াকে শাস্ত্রের ফাঁকি জিজ্ঞাসা করিয়া বেড়াইতেন। শিশু বলিয়া মুরারিরা প্রথমে তাঁহার দিকে নজর না দিলেও পরে তাঁহাকে উপেক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। তিনি নিজেই যেন তেন প্রকারেণ একে একে সকলকে ধরিয়া ব্যতিব্যস্ত করিতেন। শান্তস্বভাব মুরারি আপনার কাজ লইয়াই থাকিতেন। কিন্তু 'তথাপিহ প্রভু তারে চালেন সদায়'। একদিন তিনি হঠাৎ মুরারিকে বলিয়া বসিলেন:

…বৈদ্য তুমি ইহা কেনে পড়।
লতাপাতা নিঞা গিয়া রোগী কর দঢ়॥
ব্যাকরণ শাস্ত্র এই বিষমের অবধি।
কফ পিত্ত অজীর্ণ ব্যবস্থা নাহি ইথি॥

সুতরাং গৃহে গিয়া রোগী দেখাশুনা করিলে মুরারি লাভবান হইবেন। মুরারি ধীরভাবে উত্তর দিলেন যে বিশ্বম্ভর কবে কোন প্রশ্নের উত্তর পান নাই যে ঐরূপ শুনাইতেছেন। বিশ্বম্ভর তদ্দণ্ডেই সেইদিনকার অধীত বিষয় লইয়া তর্ক আরম্ভ করিলেন, কিন্তু মুরারির পাণ্ডিত্য দর্শনে আনন্দিত হইলেন। মুরারিও বিশ্বম্ভরের প্রতিভার পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইলেন। ক্রমেক্রমে তিনি সেই অসামান্য প্রতিভার নিকট নিজেকে বিক্রীত করিতে লাগিলেন।

পাণ্ডিত্যের ছেলেখেলা সাঙ্গ হইলে গয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পর কীর্তনারম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্বম্ভর যেন নবদ্বীপবাসীর সকলের হৃদয়রাজ্যের একচ্ছত্র অধীশ্বর হইয়া বসেন। সই সময়ে প্রায়ই তাঁহার ভাবাবেশ হইত এবং তিনি প্রিয় সঙ্গীদিগের নিকট নিজেকে উন্মুক্ত করিতেন। মুরারি-গুপ্তও ছিলেন তাঁহার এইরূপ একজন ঘনিষ্ঠ সঙ্গী। তাঁহার গৃহে প্রায়শই বিশ্বম্ভরের যাতায়াত চলিত। জগন্নাথ-মিশ্রের গৃহের নিকটবর্তী 'মুরারিগুপ্তের পাড়া' নামক একটি পল্লীও ছিল।[৭] বিশ্বম্ভরকে অনেক সময় সেখানে দেখা যাইত। একদিন তিনি বরাহ-আবেশে মুরারির গৃহে গিয়া বরাহবৎ আচরণ করিতে থাকিলে[৮] ভাতি-বিহ্বল মুরারি শ্রদ্ধাবান হইয়া তাঁহাকে এক অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন মহামানব মনে করিয়া তাঁহার স্তব করিতে থাকেন। তদবধি উভয়ের মধ্যে ভাবসম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হয়।

কিন্তু রামভক্ত মুরারি বশিষ্ঠকৃত যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া অধ্যাত্মচর্চায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। এইরূপ অধ্যাত্মচর্চা প্রকৃত ভক্তিবাদীর নিকট বাহুল্য বলিয়া গৌরাঙ্গপ্রভু

(৭) গৌ. ত.—পৃ. ১৪৭ (৮) চৈ. ভা.—২।৩, পৃ. ১১৫ ; চৈ. ম. (লো.)—ম. খ., পৃ. ৯৮

একদিন অদ্বৈতকে স্পষ্টই জানাইলেন যে মুরারি শ্রীবাস-গৃহে কীর্তনে যোগদান করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার অন্তঃকরণে ভক্তিভাব প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।[৯] লশুনের দুর্গন্ধবৎ অতি কটুতর অধ্যাত্ম-ভাবনাতে তাঁহার মন দোষদুষ্ট রহিয়াছে। মুরারি তখন সভয়ে সর্বসমক্ষে তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। আঘাত ও কঠোরতার মধ্য দিয়া তাঁহার মন গৌরনিবিষ্ট হইল।

মধ্যে মধ্যে মুরারি-গৃহেও গৌরাঙ্গের নৃত্য কীর্তন চলিত।[১০] তদুপলক্ষে তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসায় রামচন্দ্রের উদ্দেশ্যে মুরারির মন শুদ্ধ দাস্যভাবে পরিপূরিত হইল। এই কথা বুঝিতে পারিয়া একদিন গৌরাঙ্গ মুরারির নিকট রঘুনাথের প্রশস্তি শুনিতে চাহিলেন। মুরারিও তৎক্ষণাৎ পরমাগ্রহে স্ব-কৃত রঘুবীরাষ্টক পাঠ করিয়া শুনাইলে গৌরাঙ্গপ্রভু তাঁহার কপালে 'রামদাস' কথাটি লিখিয়া দিলেন।[১১] কিন্তু রামচন্দ্রের প্রতি অনুরাগের জন্য গৌরাঙ্গ যে এইরূপ পরিতৃপ্ত হইবেন তাহা মুরারির কল্পনাতীত ছিল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, তাহা হইলে গৌরাঙ্গ হয়ত তাঁহার ইষ্টদেব রঘুনন্দন![১২]

মুরারির সর্বপ্রকার স্বাতন্ত্র্য তখন লোপ পাইতে বসিয়াছে। তাই গৌরাঙ্গ তাঁহাকে কৃষ্ণচিন্তার আদেশ দান করিলে আজ্ঞাবাহী ভৃত্যের ন্যায় তিনি গৌরাঙ্গ-আদেশকে শিরোধার্য করিলেন। কিন্তু বিনিদ্র-রজনীতে তিনি কেবলই চিন্তা করিতে লাগিলেন[১৩] :

কেমনে ছাড়িব রঘুনাথের চরণ।
আজ রাত্রে রাম মোর করাহ মরণ॥

প্রভাতে আসিয়া তিনি গৌরাঙ্গের নিকট অকপটে সমস্তই বলিয়া ফেলিলেন :

শ্রীরঘুনাথ চরণ ছাড়ান না যায়।
তোমার আজ্ঞা ভঙ্গ হয় কি করোঁ উপায়॥
তবে মোরে এই কৃপা কর দয়াময়।
তোমার আগে মৃত্যু হউক যাউক সংশয়॥

গৌরাঙ্গ তাঁহাকে পুনঃপুনঃ আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন :

সাক্ষাৎ হনুমান তুমি শ্রীরামকিঙ্কর।
তুমি কেন ছাড়িবে তাঁর চরণ কমল॥

এবার মুরারি গৌরাঙ্গ-চরণে সর্বস্ব বিলাইয়া কতুর হইলেন।

(৯) চৈ. না.—১।৭৬ ; চৈ. ম. (লো.)—ম. খ., পৃ. ১০৫ (১০) চৈ. না.—২।২০,২৬ (১১) চৈ. ম. (লো.)—ম. খ., পৃ ১১১ ; শ্রীচৈ. চ.—২।৭ ; চৈ. চ.—১।১৭, পৃ. ৭২ ; ভ. র.—১২।২৬০৯ ; চৈ. ভা.-মতে (৩।৪, পৃ ২৯১) এই ঘটনা ঘটিয়াছিল মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণের পর, শান্তিপুরে অদ্বৈত-আচার্যের গৃহে। (১২) চৈ. ভা.-মতে (২।১০, পৃ. ১৫২) গৌরাঙ্গ মুরারিকে রঘুনাথ-রূপ দর্শন করাইয়াছিলেন। দ্র.—ভ. র., ১২।২৬৯৩ (১৩) চৈ.চ.—২।১৫, পৃ. ১৮১

প্রভুবিশ্বম্ভরকেও ভক্তের দাস হইতে হইল। তাই মুরারি যখন তাঁহার 'মহা-পতিব্রতা পত্নী'র পুনঃপুনঃ পরিবেশিত ঘৃতমিশ্রিত অন্ন লইয়া বারবারই কৃষ্ণসেবা ও গৌরাঙ্গ-ধ্যানে বিভোর হইয়াছিলেন তখন অসুখের বিড়ম্বনা সত্ত্বেও মুরারি-নিবেদিত অনুরাগান্ন গ্রহণ না করিয়া তিনি নিজেও কোনপ্রকারে শান্তিলাভ করিতে পারেন নাই।[১৪] আবার অজীর্ণ রোগাক্রান্ত হইলে বৈদ্য মুরারি-গুপ্তের নিকট আসিয়াই তাঁহাকে প্রেম-মহৌষধি পান করিয়া আরোগ্যলাভ করিতে হইয়াছিল। অন্যদিকে মুরারিও বাহ্যজ্ঞান-লুপ্ত হইয়া দাস্যভাবের চূড়ান্ত প্রদর্শন করিলেন। একদিন বিশ্বম্ভর শ্রীবাস-গৃহে 'গরুড় গরুড়' বলিয়া চিৎকার করিতে থাকিলে তিনি গরুড়ভাবে[১৫] সম্মুখে হাজির হইলেন এবং বিশ্বম্ভর তাঁহার স্কন্ধে চড়িয়া সমস্ত অঙ্গনে নাচিয়া বেড়াইলেন। পরমাভক্তির প্রভাবে সেবক-সেব্যের বাহ্যজ্ঞান-বিলুপ্তি ঘটিল।

কিন্তু মুরারির অবস্থা ক্রমাগত অপ্রকৃতিস্থ হইতে লাগিল। রাম বা কৃষ্ণের অবতার-কালে স্বয়ং সীতাদেবীর দেহত্যাগ ও যাদবগণের ধ্বংসের দুঃখময় পরিণতির কথা চিন্তা করিয়া তিনি একদিন সিদ্ধান্ত করিলেন যে গৌরাঙ্গ-অবতারেও দেহত্যাগ বিধেয়। তিনি এক খরশান অস্ত্র লইয়া গৃহের মধ্যে লুকাইয়া রাখিলেন।[১৬] কিন্তু প্রভুবিশ্বম্ভর তাহা অবগত হইয়া মুরারির নিকট আসিয়া জানিতে চাহিলেন, মুরারির দেহের উপর তাঁহার অধিকার আছে কিনা। কিছুই না বুঝিয়া মুরারি জানাইলেন, 'প্রভু! মোর শরীর তোমার।' বিশ্বম্ভর লুক্কায়িত অস্ত্রখানি আনিবার জন্য মুরারিকে আজ্ঞাদান করিলেন। মুরারি আপত্তি জানাইলেও শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে দেহত্যাগের সংকল্প ত্যাগ করিতে হইল। মুরারির দেহমন সমস্তই গৌরাঙ্গ-চরণে বিক্রীত হইল।

নগর-সংকীর্তন প্রভৃতি[১৭] নবদ্বীপ-লীলার প্রতিটি উল্লেখযোগ্য ঘটনাতেই মুরারি অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।[১৮] এমনকি, শেখর-গৃহে গৌরাঙ্গের অভিনয়কালেও তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন।[১৯] তাঁহার পত্নীও দর্শকরূপে তথায় উপস্থিত ছিলেন।[২০]

সন্ন্যাস-গ্রহণান্তে মহাপ্রভু শান্তিপুরে পৌঁছাইলে শচীমাতার সহিত মুরারিও সেইস্থানে গিয়া চৈতন্যের সহিত নৃত্য-কীর্তন করিয়াছিলেন এবং মহাপ্রভুও সেই সময়ে তাঁহাকে বিশেষভাবে অনুগৃহীত করেন।[২১] আবার প্রথমবার গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দের সহিত নীলাচলে

(১৪) চৈ. ভা.—২।২০, পৃ. ২০৩-৪ (১৫) ঐ ; চৈ. চ.—১।১৭, পৃ. ৭১ (১৬) চৈ. ভা.—২।১০, পৃ. ২০৫ (১৭) গৌ. ত.—পৃ. ১৫০, ১৫৫, ২৬৫; চৈ. ম. (লো.)—ম. খ., পৃ. ১১৫-১৭, ১২২, ১৪০-৪১, ১৪৩, ১৫১; চৈ. ম. (জ.)—পৃ. ৩২ (১৮) গৌ. বি.-মতে (পৃ. ১৪৬) মুরারি গৌরাঙ্গের গয়াযাত্রাসঙ্গীও হইয়াছিলেন। (১৯) চৈ. ভা.—২।১৮, পৃ. ১৮৯ (২০) চৈ. না.—৩।১৩ (২১) চৈ. ভা.—৩।৪, পৃ. ২৯১-৯২

পৌঁছাইলেও[২২] মুরারি যথেষ্ট সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কাশী-মিশ্রের গৃহের নিকটে গিয়া তিনি গৃহের বহির্ভাগেই[২৩] দণ্ডবৎ হইয়া পড়িয়া রহিলেন। কিন্তু মহাপ্রভু তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিয়া মিলিত হইতে গেলে মুরারি শশব্যস্তে পশ্চাতে সরিয়া জানাইলেন যে তাঁহার পাপপূর্ণ কলেবর চৈতন্যের পূতস্পর্শের যোগ্য নহে। মুরারির দৈন্য দেখিয়া মহাপ্রভুর হৃদয় বিদীর্ণ হইল। তিনি তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গন দান করিয়া নিকটে বসাইলেন এবং স্বহস্তে সেবা করিয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করিলেন।

নীলাচলে মুরারি চৈতন্য-প্রবর্তিত সম্প্রদায়-কীর্তনাদি ঘটনার সহিত বিশেষভাবে যুক্ত হইয়াছিলেন এবং চাতুর্মাস্যান্তে বিদায়কালে মহাপ্রভু পুনঃপুনঃ মুরারির মহিমা কীর্তন করিয়াছিলেন।[২৪] পরবর্তী বৎসরগুলিতেও তাঁহার সেই সম্মান অক্ষুণ্ণ ছিল।[২৫] তিনি নবদ্বীপে অবস্থান করিতেন বটে, কিন্তু চিরকাল মহাপ্রভুর সহিত যোগরক্ষা করিয়া চলিতেন। মহাপ্রভু গৌড়ে আসিলেও তিনি তাঁহার সহিত বৃন্দাবনাভিমুখে ধাবিত হইয়াছিলেন। কিন্তু সেইবার মহাপ্রভুকে কানাইর-নাটশালা হইতে প্রত্যাবর্তন করিতে হইয়াছিল।

মহাপ্রভুর দেশত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই নবদ্বীপের চাঁদের-হাট ভাঙিয়া গিয়াছিল। সম্ভবত সেই বিচ্ছেদ বেদনার হোমানলে দগ্ধ হওয়ায় নরহরি-বাসুদেব-মুরারি প্রভৃতির হৃদয় হইতে কাব্যামৃতের উদ্ভব হইয়াছিল। মুরারি-গুপ্তের বাংলা কবিতা রচনার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।[২৬] এবং তিনি দুইটি ব্রজবুলি পদও রচনা করিয়াছিলেন। ডা. সুকুমার সেন মনে করেন যে 'মুরারি-গুপ্ত-', 'মুরারি-', 'গুপ্ত-' ও 'গুপ্তদাস'-ভণিতাবিশিষ্ট পদগুলি এই মুরারি-গুপ্তেরই রচিত।[২৭] আবার-তৎকালের নিয়মানুযায়ী সংস্কৃত ভাষাকে অবলম্বন করিয়া চৈতন্যজীবনবৃত্তান্ত লইয়া তিনিই সর্বপ্রথম যে কড়চা বা কাব্য রচনা করিয়াছিলেন তাহাই ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলাভাষায় লিখিত প্রায় সকল চরিতকাব্যের আদর্শরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। দামোদর-পণ্ডিত তখন নবদ্বীপেই থাকিতেন। শ্রীবাসের আজ্ঞাক্রমে দামোদরের প্রশ্নোত্তর দান করিতে গিয়াই মুরারির 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং' কাব্য বা সমধিক প্রসিদ্ধ 'মুরারি গুপ্তের কড়চা' রচিত হয়। গ্রন্থটির রচনাকাল সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। মুদ্রিত গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের পুষ্পিকা শ্লোকানুযায়ী গ্রন্থ-সমাপ্তির তারিখ 'চতুর্দশ শতাব্দান্তে পঞ্চবিংশতি

(২২) ঐ—৩।৯, পৃ. ৩২৭-২৯ ; চৈ. না.—৮।৪৩; চৈ. চ.—২।১১, পৃ. ১৫৩, ১৫৫ (২৩) চৈ. চ. মধ্যখণ্ডে (১৪।৭৯-৮০) তিনি নরেন্দ্রসরোবর-তীর পর্যন্ত আসিয়াই বসিয়া রহিয়াছিলেন। (২৪) চৈ. চ.—২।১৫, পৃ. ১৮০-৮১ ; ৩।৪. পৃ. ৩০৪ (২৫) ঐ.—৩।৭, পৃ. ৩২৪ (২৬) গৌ. ত.—পৃ. ৩৩, ৫৫, ১১৪, ১৭৯, ২৪৬, ২৪৭ ; ভ. র.—১২।৩০৩৮ (২৭)HBL.—p29

বৎসরে।' এতদ্দৃষ্টে রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন, বি. এ., ডি.লিট. মহাশয় তাঁহার Chaitanya and His Age-নামক গ্রন্থে গ্রন্থরচনার কালকে ১৪২৫ শক অর্থাৎ ১৫০৩ খ্রী. নির্দেশিত করিয়াছিলেন। কিন্তু মৃণালকান্তি ঘোষের সংস্করণ হইতে জানা যায় যে পূর্ববর্তী পুষ্পিকা-শ্লোকের 'পঞ্চবিংশতি বৎসর' স্থলে 'পঞ্চত্রিংশতি বৎসর'-পাঠই শুদ্ধ। তদনুযায়ী গ্রন্থ-সমাপ্তির কালকে ১৫১৩ খ্রী. ধরিতে হয়। গ্রন্থমধ্যে তাহারও বহু পরবর্তিকালের ঘটনাসমূহ বিবৃত হওয়ায় অনেকে উহার রচনাসমাপ্তিকালকে পিছাইয়া দিতে চাহেন। ডা. সুকুমার সেন বলেন,[২৮] "সম্ভবত ইহা ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে লেখা হইয়াছিল।" ডা. বিমানবিহারী মজুমদার বলেন, "মুরারির গ্রন্থ ১৫৩৩ হইতে ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে লিখিত হইয়াছিল।" এবং "গ্রন্থের শেষকালে বালক শ্লোকটি পরবর্তীকালে কেহ বসাইয়া দিয়াছেন।" এই সকল কারণে ডা. সুশীলকুমার দে মহাশয়ও জানাইতেছেন[২৯] যে গ্রন্থের পরবর্তী অংশের বিবরণগুলি গুরুতরভাবেই সন্দেহজনক। তবে তিনি বলেন যে গ্রন্থটি চৈতন্যের জীবদ্দশাতেই লিখিত হইয়াছিল, কিন্তু সম্ভবত তাঁহার তিরোভাবের পরেই প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের Indian Historical Quaterly-র 'The Date of Chaitanya Charitamirta of Murari Gupta-'নামক প্রবন্ধে বিশ্বরঞ্জন ভাদুড়ী, এম. এ কতকগুলি কারণ (চতুর্থ কারণটি দৃঢ়ভিত্তি নহে) প্রদর্শন করিয়া জানাইয়াছেন যে তৃতীয় প্রক্রমের কতকগুলি শ্লোকসহ সমগ্র চতুর্থ প্রক্রমটি অন্য ব্যক্তির লিখিত বলিয়া মনে করিবার এবং যথার্থভাবে মুরারি কর্তৃক লিখিত অংশটুকুর উপরেও দ্বিতীয় ব্যক্তির হস্তক্ষেপ আছে বলিয়া ধরিয়া লইবার যথেষ্ট কারণ থাকিলেও ইহা বলা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক যে চৈতন্য-তিরোভাব প্রসঙ্গ-সংবলিত শ্লোকটি কাব্যসমাপ্তিকারক দ্বিতীয় ব্যক্তির দ্বারাই রচিত হইয়াছে। তিনি আরও বলেন যে রচনার তারিখযুক্ত শ্লোকটির সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। সম্ভবত ইহা তৃতীয় প্রক্রমের সপ্তদশ সর্গের পূর্ববর্তী কোনও অংশে অনুপ্রবিষ্ট ছিল, কিন্তু পরবর্তী অংশগুলি যোজনার পরেও ইহা থাকিয়া গিয়াছে।

তৎকালেই মুরারি-গুপ্তের গ্রন্থখানি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। লোচনদাসাদি কবি তো দূরের কথা, স্বয়ং কবিকর্ণপূরই 'চৈতন্যচরিতামৃতমহাকাব্যে'র শেষ সর্গে মুরারির নিকট অশোধ্য ঋণ স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীবাস-পণ্ডিতাদি সকলেই মুরারিকৃত গ্রন্থের শ্রোতা ছিলেন। খুবসম্ভবত চৈতন্যের জীবন-সায়াহ্নে শ্রীবাস, গদাধরদাস, গঙ্গাদাস, দামোদর-পণ্ডিত প্রভৃতি তাঁহার বাল্যলীলার এই সঙ্গী-সমূহ নবদ্বীপ ও তৎসংলগ্ন স্থানে একত্রিত হইয়া অতীত দিনের স্মৃতিকে কোনরকমে জাগাইয়া রাখিতেছিলেন। কিন্তু যতদূর

---

(২৮) বা. সা. ই. (২য় সং.) (২৯) VFM.—p. p. 38, 39

মনে হয়, চৈতন্যসূর্যের শেষরশ্মিটুকু অপসৃত হইয়া গেলে তৎসৃষ্ট ভাবমন্দাকিনীর স্রোত দিক পরিবর্তন করে। অদ্বৈত-আচার্য তখন অতিবৃদ্ধ। নিত্যানন্দের হস্তেই চৈতন্যের উত্তরাধিকার আসিয়া পড়ে। মুরারি পূর্ব হইতেই নিত্যানন্দের পন্থা অনুসরণ করিয়া[৩০] তাঁহার দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তখন তিনিও জীবন-সায়াহ্নে উপনীত হইয়াছেন। চৈতন্য-প্রেমস্মৃতিকে সম্বল করিয়া তাঁহার দিনগুলি কোনরকমে অতিবাহিত হইতে থাকে। 'ভক্তিরত্নাকর' হইতে জানা যায় যে শ্রীনিবাস-আচার্য প্রথমবারে নবদ্বীপে আসিয়া মুরারির কৃপালাভ করিয়াছিলেন।[৩১] কিন্তু তাহারপর আর কোথাও তাঁহার উল্লেখ নাই।

(৩০) চৈ. চ.—৩।৬. পৃ. ৩১৬ (৩১) ভ. র.—৪।৫৭ ; মু. বি.-মতে (পৃ. ২১০) বংশী-পৌত্র রামচন্দ্র নীলাচল হইতে ফিরিয়া মুকুন্দ মুরারি প্রভৃতির সহিত কৃষ্ণগুণগানে যোগ দিয়াছিলেন।

মুকুন্দ-দত্ত

'চৈতন্যচরিতামৃতে' লিখিত হইয়াছে[১] :

রাঢ়দেশে জন্মিলা ঠাকুর নিত্যানন্দ।
গঙ্গাদাস পণ্ডিত গুপ্ত মুরারি মুকুন্দ॥

ইহা হইতে মুকুন্দকে রাঢ়দেশী মনে হইতে পারে। কিন্তু কৃষ্ণদাস-কবিরাজ সম্ভবত এখানে কেবল নিত্যানন্দ সম্বন্ধেই রাঢ় দেশের উল্লেখ করিয়াছেন এবং প্রসঙ্গক্রমে গঙ্গাদাস মুরারি ও মুকুন্দের নাম আসিয়াছে। কারণ, চট্টগ্রামবাসী পুণ্ডরীক-বিদ্যানিধির কথা বলিতে গিয়া বৃন্দাবনদাস জানাইয়াছেন[২] :

শ্রীমুকুন্দ-বেজ ওঝা তাঁর তত্ত্ব জানে।
একসঙ্গে মুকুন্দেরও জন্ম চট্টগ্রামে॥

ইহা হইতে স্পষ্টই জানা যায় যে মুকুন্দ-দত্ত ছিলেন চট্টগ্রামের[৩] লোক এবং চট্টগ্রামেই তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। ইহা ছাড়াও, চৈতন্য-ভক্তবৃন্দের জন্মস্থানের উল্লেখ করিতে গিয়া বৃন্দাবনদাস উক্ত পুণ্ডরীক-বিদ্যানিধির সহিত বাসুদেবের নামও উল্লেখ করিয়াছেন।[৪] এই বাসুদেব ছিলেন মুকুন্দ-দত্তের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।[৫] ভ্রাতৃদ্বয় যে অম্বষ্ঠ-কুলজাত ছিলেন, তাহা দেবকীনন্দনের বৈষ্ণববন্দনা হইতে জানা যায়।[৬]

'চৈতন্যভাগবতে' অন্য একজন মুকুন্দের উল্লেখ আছে। ইনি সঞ্জয়ের সহিত যুক্ত। প্রায় সর্বত্রই সঞ্জয়ের পূর্বে মুকুন্দের নাম এরূপভাবে ব্যবহৃত যে উভয়কে এক ব্যক্তি বলিয়া প্রতীতি জন্মে। নরহরি-চক্রবর্তীও বহুস্থলে এই মুকুন্দ ও সঞ্জয়ের নামকে একত্র যুক্ত করিয়াছেন।[৭] 'চৈতন্যচরিতামৃতে'ও দেখা যায় যে মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণের পর অদ্বৈত-গৃহে তিনি যে-ভক্তবৃন্দের সহিত মিলিত হইতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে বাসুদেব দামোদর মুকুন্দ সঞ্জয় উপস্থিত ছিলেন। খুব সম্ভবত, এই সমস্ত দেখিয়াই ৪১৩ গৌরাব্দের 'বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা'র 'মুকুন্দ' নামক প্রবন্ধটিতে চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী মহাশয় মুকুন্দ সঞ্জয়কে একই ব্যক্তি সিদ্ধান্ত করিয়া লিখিয়াছিলেন, "মুকুন্দ সঞ্জয়। নিবাস নবদ্বীপ, ইনি পুরুষোত্তম সঞ্জয়ের পুত্র।"

যাহাহউক, এই মুকুন্দ-সঞ্জয় ছিলেন গৌরাঙ্গপ্রভুর বিশেষ ভক্ত। নবদ্বীপে ইঁহার বা ইঁহাদের বাড়ীতে বেশ একটি বড় চণ্ডীমণ্ডপ ছিল। বাল্যকালে নিমাই এই চণ্ডীমণ্ডপে

---

(১) ১।১৩, পৃ. ৬০ (২) চৈ. ভা.—২।৭, পৃ. ১৩৩ (৩) দ্র.—বাসুদেব-দত্ত (৪) চৈ. ভা.—১।১, পৃ. ১০ (৫) চৈ. ম. (জ.)—পৃ. ৪৭ (৬) পৃ.—১৲ (৭) ভ.র.—১২।১০৮৩, ২২১৩; ন. বি.—২য় বি.—পৃ. ১৬

গিয়া পড়ুয়াগণকে ফাঁকি জিজ্ঞাসা করিতেন এবং তাঁহাদিগকে বিদ্যাশিক্ষা দিতেন।[৮] মুকুন্দ-সঞ্জয়ও নিমাইর গৃহে আসা যাওয়া করিতেন এবং চন্দ্রশেখর বা শ্রীবাসের গৃহে কীর্তনকালেও উপস্থিত থাকিতেন। নিমাইর নবদ্বীপলীলার অন্যান্য স্থলেও মুকুন্দ-সঞ্জয়ের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। গৌরাঙ্গের দ্বিতীয়বার বিবাহকালে বুদ্ধিমন্ত-খানের সহিত মুকুন্দ-সঞ্জয় বিবাহে বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।[৯]

বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন [১০]:

মুকুন্দ-সঞ্জয় বড় মহাভাগ্যবান।
যাহার মন্দিরে বিদ্যা-বিলাসের স্থান॥
তাহার পুত্রেরে প্রভু আপনে পড়ায়ে।
তাহারও তাঁহার প্রতি ভক্তি সর্বথায়ে॥

এই পুত্রের নাম পুরুষোত্তম দাস।[১১]

অনেক জন্মের ভৃত্য মুকুন্দ-সঞ্জয়।
পুরুষোত্তম দাস হেন যাহার তনয়॥
প্রতিদিন সেই ভাগ্যবন্তের আলয়।
পড়াইতে গৌরচন্দ্র করেন বিজয়॥

আবার কৃষ্ণদাস-কবিরাজ বলিয়াছেন [১২]:

প্রভুর পড়ুয়া দুই পুরুষোত্তম সঞ্জয়।
ব্যাকরণে মুখ্য শিষ্য দুই মহাশয়॥

বৃন্দাবনদাস ও কবিরাজ-গোস্বামী উভয়ে 'পুরুষোত্তমের সহিত সর্বত্র সঞ্জয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। মুরারি-গুপ্তও 'পুরুষোত্তমোসঞ্জয়স্য' কথাটি লিখিয়াছিলেন। পুরুষোত্তম শ্রীবাসগৃহে কীর্তনকালে উপস্থিত থাকিতেন। মহাপ্রভুর দক্ষিণ-ভ্রমণের পর যখন গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দ প্রথমবার নীলাচলে গিয়াছিলেন, তখন পুরুষোত্তম এবং সঞ্জয়ও তাঁহাদের সহিত গিয়া শ্রীক্ষেত্রে উপনীত হন।[১৩] ইহার পরেও তাঁহারা মধ্যে মধ্যে নীলাচলে গিয়া মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিতেন।[১৪] মহাপ্রভুর তিরোভাবের পরে শ্রীনিবাস-আচার্যের প্রথমবার নবদ্বীপ আগমনকালেও সঞ্জয় নবদ্বীপে উপস্থিত ছিলেন এবং উভয়ের সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল।[১৫] গদাধরদাসপ্রভুর তিরোধানতিথি-উৎসবের সময় পুরুষোত্তম ও সঞ্জয় রঘুনন্দনপ্রভুর সহিত কাটোয়া যাত্রা করিয়াছিলেন।[১৬] সঞ্জয় ভাল খোল বাজাইতে পারিতেন।[১৭]

(৮) চৈ. ভা.—১।৮, পৃ ৫৬ (৯) ভ. র.—১২।১৩-৩ (১০) চৈ. ভা.—১।৭, পৃ. ৪৮ (১১) ঐ—১।১০, পৃ ৭০ (১২) চৈ. চ.—১।১০, পৃ. ৫২ (১৩) ঐ—২।১১, পৃ. ১৫৩; শ্রীচৈ. চ.—৪।১৭।৭ (১৪) চৈ. ভা.—৩।৯, পৃ. ৩২৭ (১৫) ভ. র.—৪।৫৭ (১৬) ভ.র.— ৯।৩৯৪ (১৭) গৌ. ত.—পৃ. ২১৭

কিন্তু 'চৈতন্যভাগবতে' সঞ্জয়ের নাম একটি ক্ষেত্র ছাড়া সর্বত্রই মুকুন্দের নামের অব্যবহিত পরেই সংযুক্ত থাকায় মুকুন্দ ও সঞ্জয় এক ব্যক্তি ছিলেন কিনা সন্দেহ থাকিয়া যায়। জয়ানন্দের গ্রন্থে মুকুন্দ-সঞ্জয় নামের ব্যবহার আছে।[১৮] কিন্তু তিনি গ্রন্থমধ্যে অন্যত্র সঞ্জয়ের পরেও মুকুন্দ নামের উল্লেখ[১৯] করায় মুকুন্দ এবং সঞ্জয়কে পৃথক ব্যক্তি ধরিয়া লইতে বাধা থাকেনা। তাছাড়া, 'চৈতন্যচরিতামৃতে' বলা হইয়াছে যে পুরুষোত্তম এবং সঞ্জয় দুইজন পৃথক ব্যক্তি এবং দুইজনেই মহাপ্রভুর পড়ুয়া ও ব্যাকরণের মুখ্য শিষ্য। সুতরাং দুইজনকে প্রায় সমবয়সী ধরিতে হয়; অন্ততপক্ষে, দুইজনের মধ্যে যে পিতা পুত্রের সম্বন্ধ ছিলনা তাহা বলা চলে। সুতরাং বৃন্দাবন যে বলিয়াছেন,

> অনেক জন্মের ভৃত্য মুকুন্দ-সঞ্জয়।
> পুরুষোত্তম দাস হেন যাহার তনয়॥

এখানে তিনি নিশ্চয় পুরুষোত্তমকে মুকুন্দেরই পুত্ররূপে উল্লেখ করিয়া থাকিবেন। এই সকল হইতে মুকুন্দ ও সঞ্জয় যে নিশ্চয়ই পৃথক ব্যক্তি ছিলেন, এইরূপ সিদ্ধান্ত সংগত হয়। 'ঘনশ্যাম'-ভণিতার একটি পদে[২০] পুরুষোত্তমবিহীন কেবলমাত্র বিজয়-নামধারী অন্য এক ব্যক্তির সহিত সঞ্জয়ের উল্লেখ এবং 'নরহরি'-ভণিতার অন্য একটি পদে[২১] সঞ্জয়বিহীন অথচ উক্ত বিজয়ের সহিত পুরুষোত্তমের নামোল্লেখ একই সিদ্ধান্তের সমর্থন করে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যে তাঁহাদের একত্র উল্লেখ, ইহার কারণ মনে হয়, তাঁহাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। সম্ভবত সঞ্জয় মুকুন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে বয়সের বিশেষ পার্থক্য থাকায় তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র পুরুষোত্তমের প্রায় সমবয়সী সঙ্গী-হিসাবে গৃহীত হইয়াছেন।

আর একটি বিষয় লক্ষণীয়। যেই সকল স্থলে উক্ত মুকুন্দের উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই সব স্থলে প্রায় কোথাও মুকুন্দ-দত্তের নামোল্লেখ নাই। 'চৈতন্যভাগবতে'[২২] গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দের নীলাচল-গমন বর্ণনায় বাসুদেব-দত্ত ও মুকুন্দ-দত্তের[২৩] নাম একত্রে এবং পুরুষোত্তম ও সঞ্জয়ের নাম একত্রে উল্লেখিত হইয়াছে। 'চৈতন্যচরিতামৃতে'ও দেখা যাইতেছে যে গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দের প্রথমবার নীলাচলে আগমনকালে তাঁহাদের মধ্যে পুরুষোত্তম ও সঞ্জয় উপস্থিত রহিয়াছেন, সেখানেও মুকুন্দের উল্লেখ নাই।[২৪] মুকুন্দ-দত্ত পূর্ব হইতে নীলাচলে উপস্থিত ছিলেন।[২৫] সুতরাং মনে হয় যে সঞ্জয়-সংশ্লিষ্ট মুকুন্দ ও মুকুন্দ-দত্ত

---

(১৮) পৃ. ২৪ (১৯) পৃ. ৪৭ (২০) গৌ. ত.—পৃ. ২১৭ (২১) ঐ—পৃ. ১৫৪ (২২) ৩।৯, পৃ. ৩২৬-২৭ (২৩) প্রকৃতপক্ষে, মুকুন্দ-দত্তের নাম ভুল করিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। দ্বারপাল-গোবিন্দের জীবনীর আলোচনাভাগ দ্রষ্টব্য। (২৪) ২।১১, পৃ. ১৫৩ (২৫) দ্বারপাল-গোবিন্দের জীবনীর আলোচনাভাগ দ্রষ্টব্য।

যদি পৃথক ব্যক্তি হইতেন তাহা হইলে পুরুষোত্তম ও সঞ্জয়ের সহিত প্রথমোক্ত মুকুন্দের নাম নিশ্চয়ই উল্লেখিত হইত। আবার 'চৈতন্যমঙ্গলেও' দেখা যায় যে চৈতন্য-ভক্তাবতার বর্ণনাপ্রসঙ্গে লোচনদাস মুকুন্দ (দত্ত) ও সঞ্জয়ের নাম পৃথকভাবে উল্লেখ করিয়াছেন,[২৬] কিন্তু কোনস্থলেই দুইজন মুকুন্দের একত্র উল্লেখ করেন নাই। এই সমস্ত হইতে দুই মুকুন্দকে এক ও অভিন্ন বলিয়া ধারণা জন্মে।

কিন্তু 'চৈতন্যভাগবতে'র একটি উল্লেখ বিশেষভাবেই প্রণিধানযোগ্য। বৃন্দাবনদাস লিখিতেছেন[২৭] যে জগাই-মাধাই উদ্ধারের পর গৌরাঙ্গের গঙ্গায় জলকেলিকালে

ক্ষণে কেলি হরিদাস শ্রীবাস মুকুন্দে।
শ্রীগর্ভ সদাশিব মুরারি শ্রীমান।
পুরুষোত্তম মুকুন্দ সঞ্জয় বুদ্ধিমন্তখান॥

এস্থলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে এই দ্বিতীয় মুকুন্দ হইতেছেন সঞ্জয়-ভ্রাতা পুরু-ষোত্তম-জনক ও বুদ্ধিমন্ত-সুহৃদ, মুকুন্দ এবং প্রথম মুকুন্দ স্বয়ং মুকুন্দ-দত্ত। একটিবার মাত্র হইলেও পাশাপাশি বর্ণিত এই উল্লেখ এতই স্পষ্ট যে ইহার ইঙ্গিতকে অস্বীকার করা চলেনা। সুতরাং উপরোক্ত আলোচিত সঞ্জয়-সংশ্লিষ্ট মুকুন্দ হইতে মুকুন্দ দত্তকে পৃথক বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়।

মুকুন্দ-দত্ত ছিলেন মহাপ্রভুর আশৈশব সঙ্গী এবং ভক্তি-মার্গীর জন্য চৈতন্য-উদ্ভাবিত নিশ্চিতপন্থা যে নাম-সংকীর্তন, তাহারই উপযুক্ত সাধক। "মহাপ্রভুর পূর্বে বাঙ্গলায় কীর্তন ছিল, তবে তার তেমন প্রচার ছিল না, তা প্রণালীবদ্ধ ছিল না। এই প্রণালীবদ্ধ কীর্তনের প্রবর্তক স্বয়ং…চৈতন্যদেব।[২৮]" এবং "চৈতন্যের প্রেমধর্ম কীর্তনকে যেরূপ ভজন সাধনের অঙ্গ করিয়া তুলিল, এরূপ আর কোনও ধর্মে আছে কিনা সন্দেহ"।[২৯] মুকুন্দ-দত্ত সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কথা এই যে এই কীর্তনই ছিল তাঁহার 'ভজন-সাধনে'র সর্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গ।

নবদ্বীপে আগমন করিবার পূর্বেই মুকুন্দ পুণ্ডরীকের তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞাত হইয়াছিলেন। সুতরাং নবদ্বীপ-আগমনকালে তাঁহার প্রথম বাল্যাবস্থা অতিক্রান্ত হইয়াছে ধরা যায়। তখনও গৌরাঙ্গের আবির্ভাব ঘটে নাই। তাহাছাড়া, এই পুণ্ডরীক ছিলেন গদাধর-পণ্ডিতের পিতৃবন্ধু ও দীক্ষাগুরু এবং গদাধর গৌরাঙ্গের প্রায় সমবয়সী; সুতরাং মুকুন্দ-দত্তও গৌরাঙ্গ অপেক্ষা বয়সে অনেক বড় ছিলেন।[৩০] কিন্তু তিনি ছিলেন গৌরাঙ্গের

(২৬) চৈ. ম. (লো.)—পৃ. ৯৭, ১১৯ (২৭) ২।১৩, পৃ. ১৭৪ (২৮) অপর্ণাদেবী—কীর্তন প্রসঙ্গ, শারদীয়া আনন্দবাজার, ১৩৫৯; তু.—চৈ. মা., ৮।৪২ (২৯) কীর্তন (আষাঢ়, ১৩৫২)—পৃ. ২০ (৩০)তু.—চৈ. মা.—৮।৫৭; চৈ. ম. (জ.)—ন. খ., পৃ. ২৪; চৈ. চ.—২।১১, পৃ. ১৫৫; দ্র.—বাসুদেব-দত্ত

'সমাধ্যায়ী' বন্ধু।[৩১] সেই কারণে পরস্পরের মধ্যে একটি প্রীতি-সম্বন্ধও গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং তাই বোধকরি প্রশ্ন- ও ফাঁকি-জিজ্ঞাসা বিষয়ে মুকুন্দের উপর তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি পড়িত। সেই সময় মুকুন্দ তাঁহার সংগীত-নৈপুণ্যে সকলকেই আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। অপরাহ্ণে ভাগবতগণ আসিয়া অদ্বৈত-সভায় মিলিত হইতেন এবং মুকুন্দ কৃষ্ণনাম-সংগীত গাহিয়া সকলকেই মুগ্ধ করিতেন। ফলে সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিতেন এবং তাঁহার পাণ্ডিত্য-খ্যাতিও ছড়াইয়াছিল। এইসব কারণে নিমাই মুকুন্দকে বিশেষভাবে জব্দ করিবার চেষ্টা করিতেন। পথে ঘাটে যে স্থানেই হউক, দেখা হইলে তিনি তাঁহাকে ধরিতেন। এজন্য মুকুন্দকে সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকিতে হইত। তিনি হয়ত সরলমনে গঙ্গাস্নানে চলিয়াছেন, হঠাৎ পথিমধ্যে নিমাইচন্দ্রের আবির্ভাব। অমনি মুকুন্দ গা-ঢাকা দিলেন। কিন্তু দৈবে একদিন ধরা পড়িয়া গেলে নিমাই বলেন যে ফাঁকি দিয়া বা লুকাইয়া থাকা আর কতদিন চলে। প্রশ্নোত্তর আরম্ভ হয়। মুকুন্দ-পণ্ডিতও মনে করেন, বাস্তবিক এভাবে এড়াইয়া কিছু লাভ নাই; আজ যাহা হউক একটা রফা করিতে হইবে, এমন প্রশ্ন্ উত্থাপন করিতে হইবে যাহাতে নিমাইচাঁদ আর কোনদিন তাঁহার কাছেও না আসিতে পারেন। নিমাই ছিলেন ব্যাকরণের পণ্ডিত। মুকুন্দ তাঁহাকে অলংকার সম্বন্ধীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজেই পরাভূত হইলে তিনি বালকের ধী ও স্মৃতিশক্তি প্রত্যক্ষ করিয়া বিমূঢ় হইলেন। এমন পাণ্ডিত্য যে মানুষের মধ্যে সম্ভব, ইহা তাঁহার কল্পনাতীত ছিল। মনুষ্য-সন্তান সম্বন্ধে তাঁহার ভিন্ন জ্ঞান উপজাত হইল।

মুকুন্দ কেবল সুগায়ক ছিলেন না। তিনি ছিলেন যথার্থ মরমী ও ভাবুক। কোন্ সময় কোথায় কী ভাবের সমাবেশ হইয়াছে, তিনি তাহার মর্ম সহজেই উপলব্ধি করিয়া সংগীত আরম্ভ করিতেন। ঈশ্বর-পুরী যখন নবদ্বীপে আসিয়া গৌরাঙ্গের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন, তখন

> বুঝিয়া মুকুন্দ এক কৃষ্ণের চরিত্র।
> গাইতে লাগিলা অতি প্রেমের সহিত
> যেই মাত্র শুনিলেন মুকুন্দের গীতে॥
> পড়িলা ঈশ্বরপুরী ঢলি পৃথিবীতে॥[৩২]

আবার পুণ্ডরীক-বিদ্যানিধি নবদ্বীপে আসিলে মুকুন্দ যখন গদাধর-পণ্ডিতকে তাঁহার নিকট লইয়া যান, তখন বিদ্যানিধির বিলাসব্যসন দেখিয়া গদাধর সন্দেহাকুল হইলে

(৩১) চৈ. চ. —১।১৩, পৃ.৫২ (৩২) চৈ. ভা.—১।৭, পৃ. ৫২

বুঝি গদাধর চিত্ত শ্রীমুকুন্দানন্দ।
বিদ্যানিধি প্রকাশিতে করিলা আরম্ভ ॥…
মুকুন্দ সুস্বর বড় কৃষ্ণের গায়ন।
পড়িলেন শ্লোক-ভক্তি মহিমাবর্ণন ॥…

এবং

শুনিলেন মাত্র ভক্তিযোগের স্তবন।
বিদ্যানিধি লাগিলেন করিতে ক্রন্দন ॥

পরে তিনি প্রকৃতিস্থ হইলে মুকুন্দ গদাধরের সম্যক পরিচয় দিয়া গদাধরের ইচ্ছানুযায়ী বিদ্যানিধির নিকট তাঁহার মন্ত্রদীক্ষার সম্মতি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কিন্তু মুকুন্দ প্রথম জীবনে ভগবানের চতুর্ভুজ মূর্তির উপাসক ছিলেন।[৩৩] অথচ গৌরাঙ্গ ছিলেন দ্বিভুজ কৃষ্ণমূর্তির উপাসক। একদিন গৌরাঙ্গপ্রভু অদ্বৈত-শ্রীবাসাদি ভক্তের দোষগুণ ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা করিয়া তাঁহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতেছিলেন। কিন্তু সেই সভায় মুরারি-গুপ্ত ও মুকুন্দ-দত্তের প্রবেশাধিকার না থাকায় তাঁহারা বিষণ্ণ- ও শোকার্ত-চিত্তে বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিলেন। অদ্বৈত-শ্রীবাসাদি ভক্তগণ মুকুন্দ সম্বন্ধে গৌরাঙ্গপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে ভক্তি সম্বন্ধে মুকুন্দের মন তখনও পর্যন্ত সংশয়দোদুল থাকায় সেই কপটতার জন্য তিনি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। তিনি বলিলেন[৩৪]:

খড় লয় জাঠি লয় পূবে যে শুনিলা।
অই বেটা সেই হয়, কেহো না চিনিলা ॥
ক্ষণে দন্তে তৃণ লয়, ক্ষণে জাঠি মারে।
ও খড়-জাঠিয়া বেটা না দেখিব মোরে ॥

অর্থাৎ মুকুন্দ দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া সম্মুখে ভক্তিভাব প্রদর্শন করিলেও অন্যত্র বা অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে গিয়া তিনি যে অন্যরূপ ব্যবহার করিতে থাকেন, ইহা ক্ষমণীয় নহে। কিন্তু মুকুন্দ একান্ত ব্যাকুলভাবে দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইলে তিনি জানাইলেন যে কোটি জন্মের পরে মুকুন্দ তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারিবেন। বাহির হইতে ইহা শুনিয়া মুকুন্দ আনন্দে আত্মহারা হইলেন এবং "পাইব পাইব' বলি করে মহানৃত্য।" কোটি জন্মের পরেও তিনি গৌরাঙ্গের সহিত মিলিত হইতে পারিবেন—এই কল্পনাতেই তিনি আনন্দবিভোর হইলেন, গৌরাঙ্গের এই 'অব্যর্থ' বাক্যের উপর অসীম বিশ্বাসে তিনি জীবনকে সার্থক মনে করিলেন। গৌরাঙ্গ বুঝিলেন ভক্তের হৃদয়-দুয়ার খুলিয়া গিয়াছে। তিনি সেই মুহূর্তে মুকুন্দকে নিকটে আনাইয়া আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ করিলেন। মুকুন্দ-দত্ত সেইদিন হইতে তৎকর্তৃক তাঁহার গায়নরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন।

(৩৩) চৈ. ম. (লো.)—পৃ. ১০৫ ; চৈ. না.—১।৭৮ (৩৪) চৈ. ভা.—২।১০. পৃ. ১৫৭

শ্রীবাস বা চন্দ্রশেখরের গৃহে যে সংকীর্তন ও নৃত্য চলিত তাহাতে একরকম মুকুন্দই ছিলেন মুখ্য গায়ন। আর ছিলেন গোবিন্দ-ঘোষ। ইঁহারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া নর্তন-কীর্তন করিতেন। ইঁহাদের কীর্তন-সংগীতে গৃহের অণু-পরমাণুটি পর্যন্ত যেন এক ভাবময় চেতনরূপ ধারণ করিত। প্রভুগৌরহরি ইঁহাদিগের দ্বারা যেন সমগ্র বৈষ্ণব-সমাজকেই প্রেমভক্তির উচ্চতম মার্গে টানিয়া লইয়া যাইতেন। পর-হিতের জন্য ইঁহাদের জীবন এইভাবেই সার্থক-প্রযুক্ত হইয়াছিল এবং গৌরাঙ্গের একজন মূল-গায়ন হিসাবে মুকুন্দের এইস্থান চির-অক্ষুণ্ণ ছিল। গৌরচন্দ্র ভক্তবৃন্দকে লইয়া যেইবার নাট্য-মঞ্চে অবতীর্ণ হন, সেই স্মরণীয় ঘটনা উপলক্ষেও 'কীর্তনের শুভারম্ভ করিল মুকুন্দ।'[৩৫] এবং 'হরিদাসঃ সূত্রধারো মুকুন্দঃ পারিপার্শ্বিকঃ'।[৩৬] গৌরাঙ্গের নগর-কীর্তনাদি অন্যান্য ঘটনাক্ষেত্রেও মুকুন্দের উপস্থিতি অনস্বীকার্য।

গৌরাঙ্গের জীবনের এমন কোনও উল্লেখযোগ্য ঘটনা নাই, যাহার সহিত মুকুন্দ যুক্ত হন নাই। সংকীর্তনের দ্বারা নাম-মহাত্ম্য প্রচারের মধ্য দিয়াই গৌরাঙ্গ-জীবনের কার্য-কারিতা সুস্পষ্ট ; আর একরকম জীবনের প্রারম্ভ হইতেই তাঁহার সংকীর্তন-সঙ্গী ছিলেন মুকুন্দ-দত্ত। তিনি সুকণ্ঠ ও সুপাঠক ছিলেন। তিনি সুললিত কণ্ঠে 'ভক্তিযোগ-সম্মত শ্লোক'গুলি পাঠ করিলে কিংবা সংকীর্তন আরম্ভ করিলে গৌরাঙ্গপ্রভুরও হৃদয়দুয়ার খুলিয়া যাইত[৩৭] এবং এইভাবে তিনি গৌরাঙ্গের আনন্দ-লোকে বিচরণ করিবার পথগুলি উন্মুক্ত করিয়া দিতেন। গৌরাঙ্গপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণ দিনেও মুকুন্দ উপস্থিত থাকিয়া[৩৮] তাঁহার 'সর্বকার্য' সমাধা করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার দীক্ষা-গ্রহণের পূর্বে সংকীর্তন করিয়াছিলেন। সেইদিন[৩৯] মহাপ্রভু নিশাকালেও 'মুকুন্দেরে আজ্ঞা কৈল করিতে কীর্তন'।[৪০] এবং মুকুন্দ সংকীর্তন আরম্ভ করিলে তিনিও ভাবাবেশে নৃত্য করিয়াছিলেন।

পরদিন চৈতন্য ভাবাবেশে অগ্রসর হইলে ভক্তবৃন্দ পশ্চাতে ছুটিলেন। কিন্তু মুকুন্দের দায়িত্ব ছিল কঠোর, তাঁহাকে সঙ্গে থাকিয়া অবিরত কীর্তন গাহিতে হইয়াছিল।[৪১] মহাপ্রভু অদ্বৈত-গৃহে পৌঁছাইলেও রাত্রিতে মুকুন্দ-দত্ত তাঁহার প্রসাদশেষ গ্রহণ করিবার পর 'ভালমতে প্রভুর অন্তর' বুঝিয়া 'ভাবের সদৃশ পদ লাগিলা গাইতে।' তারপর

(৩৫) ঐ.—২।১৮, পৃ. ১৮৯ (৩৬) চৈ. না.—৩।১১ (৩৭) চৈ. ভা.—২।২, পৃ. ১১০ (৩৮) বাসুঘোষ-গোবিন্দের জীবনীর আলোচনাভাগ দ্রষ্টব্য। (৩৯) চৈ. ভা.—২।১৬, পৃ. ২৪৩ (৪০) ঐ—৩।১, পৃ. ২৪৬ ; চৈ. ম. (জ.)—পৃ. ৮৯ (৪১) তু.—ভ. নি.—২য়. ক., পৃ. ৩৬ ; জয়ানন্দ লিখিয়াছেন যে মুকুন্দ মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের সংবাদ লইয়া নবদ্বীপে গিয়াছিলেন (বৈ. খ., পৃ. ৯০)। কিন্তু কৃষ্ণদাস-কবিরাজ জানাইয়াছেন যে সংবাদ লইয়া গিয়াছিলেন আচার্যরত্ন (চৈ. চ. —২।৩, পৃ. ৯৫)। এই প্রসঙ্গে নিত্যানন্দ-জীবনী দ্রষ্টব্য।

কয়েকদিনের মধ্যেই অদ্বৈতপ্রভুর নির্দেশে নিত্যানন্দাদি সহ মুকুন্দ-দত্ত পুনরায় মহাপ্রভুর নীলাচল-যাত্রার সঙ্গী হইলেন।[৪২] কিন্তু এইবারেও পথিমধ্যে তাঁহাকে সর্বদাই মহাপ্রভুর কাছে থাকিতে হইল। তিনি কীর্তন দ্বারা মহাপ্রভুর ভাবকে সংহত করেন, আর কখনও কোন কারণে তাঁহার মন অভিমানক্ষুব্ধ হইলে মুকুন্দ তাঁহাকে একাকী অগ্রসর করিয়া দেন এবং পরে একত্র মিলিত হইয়া নামকীর্তন দ্বারা তাঁহাকে বিমোহিত করেন দেবকীনন্দন মুকুন্দ সম্বন্ধে বলিয়াছেন[৪৩] "গন্ধর্ব জিনিঞা যার গানের মহত্ব।" প্রকৃতই ছত্রভোগ জলেশ্বর[৪৪] প্রভৃতি স্থানে যখনই যেখানে গিয়া পৌছান না কেন, তিনি গন্ধর্বসম সংগীত আরম্ভ করিলে গ্রামবাসীরাও দলে দলে আসিয়া তাঁহাদের নৃত্য-সংগীতে মোহিত হইয়া যাইতেন।

মহাপ্রভুর সঙ্গীদিগের মধ্যে মুকুন্দই ছিলেন সর্বপ্রাচীন এবং সম্ভবত বয়োজ্যেষ্ঠ, তাঁহার সহিত বিশারদ-জামাতা নীলাচলবাসী গোপীনাথ-আচার্যের বিশেষ পরিচয় ছিল। তাই নীলাচলে পৌছাইবার পর এই গোপীনাথের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিলে মুকুন্দই সঙ্গী-দিগের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটাইয়া দিলেন এবং গোপীনাথের উপর চৈতন্যসহ সকলের ভারার্পণ করিয়া মহাপ্রভুর একজন দীন সেবকরূপে নীলাচলে অবস্থান করিতে লাগিলেন সম্ভবত এই সময়েই[৪৫] একদিন সার্বভৌম-ভট্টাচার্য মহাপ্রভুর বন্দনামূলক দুইটি শ্লোক রচনা করিয়া পাঠাইলে মহাপ্রভু তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলেন। কিন্তু তৎপূর্বে মুকুন্দ সেই দুইটি শ্লোক প্রাচীর-গাত্রে লিখিয়া রাখায় তৎকর্তৃক একটি মহামূল্য বস্তুর উদ্ধারসাধন সম্ভব হয়।

'চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক' এবং 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থদ্বয়ে প্রথমবার নীলাচলাগত গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে মুকুন্দের নাম নাই। সুতরাং মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণকালে মুকুন্দ যে নীলাচলেই অবস্থান করিতেছিলেন তাহাতে সন্দেহ থাকেনা। যাহা হউক, মহাপ্রভুর প্রত্যাবর্তনের পর তিনি সেই বৎসর রথযাত্রা উপলক্ষে রথাগ্রে যে বেড়াকীর্তন প্রবর্তন করেন তাহাতে মুকুন্দও একজন শ্রেষ্ঠ গায়নরূপে একটি সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।[৪৬] তাহারপর উদ্দণ্ড নৃত্যের সময়ও মহাপ্রভু তাঁহার প্রিয় গায়ন মুকুন্দকে সঙ্গে গ্রহণ করিয়াছিলেন।[৪৭] ইহাই ছিল মুকুন্দের জীবনের শ্রেষ্ঠ গৌরব। তিনি যথার্থ পণ্ডিত বা তত্ত্বজ্ঞানী ছিলেন কিনা তাহা আমরা জানিনা, কিন্তু কীর্তন-গানই যদি গৌরচন্দ্রের উদ্ভাসরূপে ভক্তিজগতের দিকৃদিগন্ত প্লাবিত করিয়া থাকে, তাহা হইলে

(৪২) দ্বারপাল-গোবিন্দ-জীবনীর আলোচনাভাগ দ্রষ্টব্য। (৪৩) বৈ. ব.—১৲ (৪৪) চৈ. ভা.—৩।২
(৪৫) দ্র.—সার্বভৌম (৪৬) চৈ. চ.—১।১৩, পৃ. ১৬৪ (৪৭) ঐ—পৃ. ১৬৫

বলিতেই হইবে যে মুকুন্দ-দত্ত ছিলেন সেই ভক্তি-গগন-সমুদ্ভূত একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। সংকীর্তন-গানই ছিল যেন তাঁহার জীবনের ব্রত ; আর সেই ব্রত উদ্‌যাপনের বস্তু ও বিষয় ছিল সেবা-ভক্তি ও প্রেম। সংগীত সাধনার মধ্য দিয়াই মুকুন্দের সেবা-ভক্তির সাধনা।[৪৮]

মহাপ্রভুর গৌড়যাত্রাকালে মুকুন্দ আবার সেই পুরাতন পথে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং যিনি লক্ষ লক্ষ মানুষের পথনির্দেশ করিয়াছিলেন তিনি যেন তাঁহারই পথ-প্রদর্শক হইয়া চলিলেন। উড়িষ্যার প্রান্তদেশে যবনরাজ আসিয়া মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিলে মুকুন্দ জানাইলেন[৪৯] যে রাজা যদি দয়াপূর্বক মহাপ্রভুর গঙ্গাতীর-গমনপথের সুব্যবস্থা করিয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহারা পরম উপকৃত হইবেন। মুকুন্দের হস্তক্ষেপে সকল বিষয়ের ব্যবস্থা হইলে তাঁহারা পুনরায় যাত্রা আরম্ভ করিলেন।

গৌড়ে আসিয়া মহাপ্রভু যখন রামকেলিতে রূপ-সনাতনের সহিত মিলিত হন, সেই স্থলেও আমরা মুকুন্দের উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি।[৫০] ইহার পর আর আমরা মুকুন্দের বড় বেশি একটা সাক্ষাৎ পাইনা। তিনি এবারেও মহাপ্রভুর সহিত নীলাচলে ফিরিয়াছিলেন কিনা, তাহা বলা দুঃসাধ্য। মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্তরূপে স্বরূপদামোদর আসিয়া পড়ায় মুকুন্দ-দত্ত বা গোবিন্দ-ঘোষের ততটা প্রয়োজন হয়ত আর ছিল না। কিন্তু তদবধি গৌড়ে অবস্থান করিতে থাকিলেও তিনি মধ্যে মধ্যে নীলাচলে গমন করিয়া সেইস্থানে দীর্ঘকাল কাটাইয়া আসিতেন। কবিরাজ-গোস্বামী তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,[৫১] "প্রতি বর্ষে আইসে সঙ্গে রহে চারিমাস।" 'চৈতন্যভাগবতে'ও ইহার সমর্থন আছে।[৫২] 'চৈতন্যচরিতামৃতে' আর এক বৎসর তাঁহার নীলাচল-গমনের উল্লেখ দৃষ্ট হয়[৫৩] এবং এই গ্রন্থের বর্ণনানুযায়ী আরও দুই একবার তথায় মুকুন্দের সাক্ষাৎলাভ করা যায়। ছোট-হরিদাসের মৃত্যুর কিছুকাল পরে মহাপ্রভু যেইদিন সৈকতভূমি হইতে সুমধুর সংগীত শ্রবণ করেন, সেইদিন ভক্তবৃন্দের মধ্যে এই মুকুন্দকেও দেখিতে পাই।[৫৪] ইঁহাদের মধ্যে কিন্তু সদ্যোগৌড়াগত কোনও ভক্ত ছিলেন না। তাহাতেই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে সেই সময় সম্ভবত মুকুন্দ-দত্ত নীলাচলে বাস করিতেছিলেন। ইহা গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দের রথযাত্রা উপলক্ষে চারিমাস নীলাচল-বাসকালীন ঘটনা হইলে এইস্থলে তাঁহাদের নামও উল্লেখিত হইত। আবার রঘুনাথদাস যেইদিন প্রথম নীলাচলে উপস্থিত হন, সেই দিনও মুকুন্দই সর্বপ্রথম মহাপ্রভুর নিকট রঘুনাথের আগমন-বার্তা নিবেদন করেন।[৫৫] তখনও কিন্তু

---

(৪৮) গৌ. ত.—পৃ. ১৫০-৫২, ১৫৫ ; তু.—বৈ. ব. (বৃ.)—পৃ. ১ ; চৈ. গ.—পৃ. ১১ (৪৯) চৈ. চ.—২।১১, পৃ. ১৯০ (৫০) ঐ—২।১, পৃ. ৮৭ ; ন. বি.—১ম. বি., পৃ. ১০ (৫১) চৈ. চ.—২।১, পৃ. ৮৮ (৫২) ৩।৯, পৃ. ৩২৬ (৫৩) ৩।১২, পৃ. ৩৪১ (৫৪) ৩।২, পৃ. ২৯৫ (৫৫) ৩।৬, পৃ. ৩১৯

রথযাত্রা-দর্শনার্থী গৌড়ীয় বৈষ্ণববৃন্দ নীলাচলে পৌছান নাই। সুতরাং মুকুন্দের নীলাচল-গমন ও নীলাচলাবস্থান যে তাঁহাদের সহিত সম্পর্কিত ছিলনা ইহা বলা চলে।

মুকুন্দের শেষজীবন বা তিরোভাব সম্বন্ধে গ্রন্থকর্তৃগণ নীরব রহিয়াছেন।[৫৬] ভক্ত মুকুন্দও নিজের সম্বন্ধে চিরকালই নীরব থাকিয়াছেন। আপনার দুঃখ-বেদনা সম্পর্কে কখনও তাঁহার মুখে কথাটি পর্যন্ত বাহির হয় নাই। মহাপ্রভু বলিয়াছেন[৫৭]:

অন্তরে দুঃখী মুকুন্দ কথা নাহি মুখে।
ইঁহার দুঃখ দেখি মোর দ্বিগুণ হয় দুঃখে॥

---

(৫৬) সু. বি.—গ্রন্থমতে (পৃ. ২১০) জাহ্নবার দত্তকপুত্র রামচন্দ্র নীলাচল হইতে নবদ্বীপে ফিরিয়া মুকুন্দাদির সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। ব. শি.-গ্রন্থে (পৃ. ৮১) লিখিত হইয়াছে "শ্রীমুকুন্দ দত্ত বন্দ মহাজন। আকাইহাটের বিংহ তারিলা সকল॥" (৫৭) চৈ. চ.—২।৭, পৃ. ১১৯

বাসুদেব-ঘোষ

'চৈতন্যচরিতামৃতে' বলা হইয়াছে[১] :

> গোবিন্দ মাধব বাসুদেব তিনভাই।
> যাঁ সবার কীর্তনে নাচে চৈতন্য নিতাই॥

গোবিন্দ-ঘোষ, মাধব-ঘোষ এবং বাসুদেব-ঘোষ এই 'তিন ভাই' গৌরাঙ্গের লীলারম্ভের সময় হইতে নবদ্বীপে থাকিয়া তাঁহার কৃপালাভ করিয়াছিলেন।[২] তাঁহার 'মুখ্য কীর্তনীয়া' বা প্রধান গায়নরূপেও তাঁহারা তাঁহার লীলাসঙ্গী হইতে পারিয়াছিলেন। কতকগুলি পদ হইতে জানা যায় যে 'রাধিকাজনমচরিতা'দি গাহিয়া তাঁহারা গৌরাঙ্গপ্রভুকে আনন্দ দান করিতেন।

কিন্তু ঘোষ-ভ্রাতৃত্রয়ের জীবনবৃত্তান্ত সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। 'পাটপর্যটনে' তাঁহাদের সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে, "অগ্রদ্বীপে তিন ঘোষ লভিলা জনম।" 'পাটনির্ণয়ে' ইহারই সমর্থন পাওয়া যায়।[৩] গৌরাঙ্গসঙ্গী-হিসাবে তৎকালে তাঁহাদের মধ্যে গোবিন্দ-ঘোষই সর্বাপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন।

গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দের প্রথমবার নীলাচল-গমনকালে বাসুদেব প্রভৃতি তাঁহাদের সহিত গিয়া মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হন এবং সম্প্রদায়-কীর্তনাদিতেও যোগদান করেন। মাধব এবং গোবিন্দ মহাপ্রভুর সহিত তাঁহার 'উদ্দণ্ড নৃত্যে'ও যোগদান করিয়াছিলেন।[৪] তারপর চাতুর্মাস্যান্তে তিন ভ্রাতা গৌড়ে প্রত্যাবর্তন করিয়া পাণিহাটীতে নিত্যানন্দ প্রভুর অভিষেক অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন।[৫] এই অভিষেকের কিছুকাল পরে নিত্যানন্দ একবার গদাধর-দাসের গৃহে পৌঁছাইলে 'গায়ন মাধবানন্দ-ঘোষ' 'দানখণ্ড' গান করিয়া ভক্তবৃন্দকে পরমানন্দ দান করেন।[৬] পর বৎসর আবার তাঁহারা তিন ভাই নীলাচলে গিয়াছিলেন।[৭] কিন্তু মহাপ্রভু গোবিন্দ-ঘোষকে নিকটে রাখিয়া মাধব আর বাসুদেবকে নিত্যানন্দের সহিত গৌড়ে পাঠাইয়া দেন।[৮]

(১) ১।১০, পৃ. ৫৩ (২) এই সম্বন্ধে দ্বারপাল-গোবিন্দের জীবনীতে গোবিন্দ-ঘোষের প্রসঙ্গটুকুও দ্রষ্টব্য। (৩) খগেন্দ্রনাথ মিত্র বলেন (প. মা.—৪র্থ. খণ্ড, ভূমিকা) যে ইঁহাদের 'পৈত্রিক নিবাস ছিল কুমারহট্ট গ্রামে।' ডা. সুকুমার সেন বলেন (HBL—p. 35) যে তাঁহারা শ্রীহট্টের বুর্ণা অথবা বুর্ণাগী (Burna or Burnagi in Sylhet, which were probably the place of their mothers people) নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন এবং তাঁহাদের পিতা কুমারহট্টে বাস স্থাপন করিয়াছিলেন কিন্তু ভ্রাতৃবৃন্দ নবদ্বীপে উঠিয়া আসেন। (৪) চৈ. চ.—২।১১, পৃ. ১৫৩ ; ২।১৩, পৃ. ১৬৪-৬৫ (৫) চৈ. ভা.—৩।৫, পৃ. ৩০৪ (৬) ঐ—৩।৫, পৃ. ৩০৭ (৭) চৈ. চ.—২।১৬, পৃ. ১৮৬ (৮) ঐ—১।১০, পৃ. ৫৩ ; ১।১১, পৃ. ৫৫

ইহার পর আর মাধব ও বাসুদেব সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না।[৯] তবে তাঁহারা পরবর্তী-কালে গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদাদি রচনা করিয়াছিলেন। মাধবের কীর্তন ও বাসু-ঘোষের গীত সম্বন্ধে কৃষ্ণদাস-কবিরাজ যথেষ্ট তারিফ্ করিয়াছেন।[১০] খেতরির উৎসবানুষ্ঠানগুলিও 'প্রথমেই বাসু-ঘোষের গৌরলীলা গান' দিয়া আরম্ভ করা হইত।[১১] বাসু-ঘোষ গৌরাঙ্গের বাল্যলীলা- বা গোষ্ঠলীলা-বিষয়ক পদে নিত্যানন্দ সহ রামাই, সুন্দরানন্দ, গৌরীদাসাদির যে লীলা-বর্ণনা করিয়াছেন, সম্ভবত তাহা হইতেই 'দ্বাদশ গোপালে'র ধারণার উদ্ভব হইয়া থাকিবে।[১২] বাসুদেব-ঘোষের রচিত অসংখ্য কবিতার মধ্যে কয়েকটি ব্রজবুলি পদও রহিয়াছে।

মাধব-ঘোষও একজন পদকর্তা ছিলেন। 'চৈতন্যভাগবত'-কার মাধবকে 'বৃন্দাবনের গায়ন' বলিয়াছেন।[১৩] উক্তিটির মধ্যে কোনও তথ্যগত সত্য আছে বলিয়া মনে হয় না। একমাত্র 'মুরলীবিলাস'-গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে[১৪] যে নিত্যানন্দ-ভক্ত মীনকেতন এবং কায়স্থ মাধব-দাস একবার ব্রজধাম হইতে কানাই ও বলাই নামক দুইটি বিগ্রহ আনিয়া বাঘ্নাপাড়ায় রামাই-ঠাকুরের হস্তে তাহা অর্পণ করিয়াছিলেন। কায়স্থকুলোদ্ভব মাধবের নাম দেখিয়া মাধব-ঘোষের নামই মনে পড়ে। মাধব-ঘোষের পক্ষে বৃন্দাবন-দর্শনার্থী হইয়া একবার তথায় গমন করাও অসম্ভব না হইতে পারে। কিন্তু বাঘ্নাপাড়ার উক্ত ঘটনা বহু পরবর্তী-কালের, মাধব-ঘোষ ততদিন জীবিত থাকিয়া শক্তসমর্থ ছিলেন বলিয়া মনে করা যায় না।

'পাটনির্ণয়ে' কৃষ্ণনগর-পাটের বর্ণনায় বলা হইয়াছে যে 'বাসু-ঘোষের সেইখানে গৌরাঙ্গপুর হয়,' এবং আরও বলা হইয়াছে যে মাধব-ঘোষের পাট ছিল তমলুকে। কিন্তু আধুনিক 'বৈষ্ণবাচার দর্পণ'[১৫], 'বৈষ্ণবদিগ্দর্শনী'[১৬] ও 'গৌড়ীয় বৈষ্ণবজীবনী' প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে মাধব-ঘোষের পাট ছিল দাঁইহাটে। শেষোক্ত গ্রন্থে পুনরায় উক্ত হইয়াছে, "কিন্তু দাঁইহাটে ইঁহার কোনও চিহ্ন নাই। এইস্থান মুকুন্দ-দত্তের শ্রীপাট বলিয়া খ্যাত।" কিন্তু বাসু-ঘোষের পাট যে তমলুকে ছিল, সে সম্বন্ধে সকলেই একমত।

(৯) কেবলমাত্র জয়ানন্দের নিকট দীর্ঘ তালিকার মধ্যে (বি. খ., পৃ. ১৪৪) বাসুদেব-ঘোষ ও মাধবানন্দের একবার নামোল্লেখ আছে মাত্র। (১০) চৈ. চ.—১।১১, পৃ. ৫৫ (১১) প্রে. বি.—১৯শ. বি., পৃ. ৩২০ (১২) দ্র.—সুন্দরানন্দ (১৩) ৩।৫ ; পৃ. ৩০৪ (১৪) পৃ. ৩৯৭ (১৫) পৃ. ৩৪৬ (১৬) পৃ. ৬০

পুণ্ডরীক-বিদ্যানিধি

গৌরাঙ্গের পূর্বগামীদিগের[১] বিশেষ কয়েকজনই শ্রীহট্ট চট্টগ্রাম প্রভৃতি দূরদেশে বাস করিতেন এবং পঞ্চদশ শতাব্দ কিংবা তাহারও পূর্ব হইতে তাঁহারা ক্রমে ক্রমে বাংলার শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র গঙ্গাতীরস্থ নবদ্বীপে কিংবা তৎপার্শ্ববর্তী স্থানসমূহে আসিয়া বসবাস করিতে থাকেন। সেই সমস্ত বিদ্যালাভার্থী বা পুণ্যকামীদের মধ্যে পুণ্ডরীক-বিদ্যানিধিও একজন ছিলেন। তাঁহার পূর্বনিবাস ছিল চট্টগ্রামের[২] নিকটবর্তী চক্রশালা[৩] নামক গ্রামে। 'প্রেমবিলাসে'র দ্বাবিংশ ও চতুর্বিংশ বিলাসেও বর্ণিত হইয়াছে[৪] যে বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ পুণ্ডরীক চক্রশালা-গ্রামের জমিদার ছিলেন এবং গদাধর-পণ্ডিতের পিতা মাধব-মিশ্রের সহিত তাঁহার বিশেষ সখ্য ছিল। উভয়েই নবদ্বীপে বাসগৃহ নির্মাণ করিয়াছিলেন এবং উভয়েই মাধবেন্দ্র-পুরী কর্তৃক দীক্ষিত হইয়াছিলেন। উভয়ের পত্নীর নাম রত্নাবতী হওয়ায় তাঁহাদের মধ্যেও বিশেষ সখিত্ব ছিল। পুণ্ডরীক ও মাধব উভয়েই 'মহাপ্রভুর শাখা মধ্যে করয়ে বর্ণন।' 'প্রেমবিলাসো'ক্ত এই বিবরণগুলি অসত্য কিনা তাহার কোন প্রমাণ নাই। মূলস্কন্ধ-শাখা-নির্ণয় অধ্যায়ে 'চৈতন্যচরিতামৃত'-কারও জানাইয়াছেন, 'পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি বড় শাখা জানি।'

পুণ্ডরীক মধ্যে মধ্যে নবদ্বীপে আসিয়া বাস করিতেন। কিন্তু গৌরাঙ্গমাহাত্ম্য সম্বন্ধে সকলেই নিঃসন্দেহ হইবার পর সম্ভবত তিনি তথায় স্থায়িভাবে বাস করিতে থাকেন।[৫] তাঁহার ও বিশ্বম্ভরের মধ্যে বয়সের যে বিরাট ব্যবধান ছিল, বিশ্বম্ভরের প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের দ্বারা তাহার বাধা সহজে অপসারিত হইয়া গেলেও, তিনি কিন্তু মহাভক্ত পুণ্ডরীককে 'বাপ' সম্বোধন[৬] করিয়া সেই ব্যবধানটিকে চিরশ্রদ্ধেয় করিয়া রাখিয়াছিলেন।

(১) চৈ.চ.—১।১৩, পৃ. ৬০ (২) চৈ.ভা.—১।২, পৃ. ১০ ; ২।৭, পৃ. ১৩২-৩৩ (৩) ভ.র.—১২।১৮০২ (৪) পৃ. ২১৭, ২৫০ ; ১৩০১ সালের 'গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া'-পত্রিকার আশ্বিন-সংখ্যায় অশ্বিনীকুমার বসু মহাশয় লিখিয়াছেন, "অনেক অনুসন্ধানের পর……আমি শ্রীবিদ্যানিধির বংশধর পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিঙ্কর বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের নিকট শ্রীবিদ্যানিধির সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়াছি।"

"চট্টগ্রামের ছয়ক্রোশ উত্তরে……হাটহাজারির পূর্বদিকে প্রায় এক ক্রোশ উত্তরে মেখলে নামক গ্রামে শ্রীপুণ্ডরীক-বিদ্যানিধির জন্ম হয়।………পিতার নাম ৺বাণেশ্বর ব্রহ্মচারী।……ইনি ৺শিবরাম গঙ্গোপাধ্যায়ের বংশজাত সন্তান। ৺বাণেশ্বর ব্রহ্মচারীর পত্নী ৺গঙ্গাদেবী……। ইঁহাদের পূর্ব নিবাস ঢাকা বিক্রমপুরের অন্তর্গত বাঘিয়া।……ইনি (বাণেশ্বর) ৺চন্দ্রনাথ দর্শন করিয়া ৺আদিনাথ দর্শন করিতে গমন করেন। প্রত্যাবর্তনকালে মেখলে উপস্থিত হয়েন।……আর বাঘিয়ায় গমন করেন নাই।"

(৫) তু.—ব.শি., ১৫৯ ; চৈ.কৌ.—পৃ. ১৬ (৬) চৈ. ভা.—২।৭ ; ৩।১১, পৃ. ৩৪৪ ; গৌ.বী.—৫৫ ; জয়ানন্দ (চৈ. ম.—ন. খ., পৃ.৪৭) তাঁহাকে গৌরাঙ্গের বঙ্গভ্রমণ ঘটনার সহিতও যুক্ত করিয়াছেন।

বিদ্যানিধি মহাবিষয়ীর মত থাকিতেন।[৭] বেশভূষা ও পরিচ্ছদের মধ্যে যথেষ্ট আড়ম্বর ছিল এবং তিনি প্রায় সর্বদাই দাসদাসী ও শিষ্যভক্তদিগের দ্বারা পরিবৃত থাকিতেন। কিন্তু পূজা-অর্চনার মধ্যদিয়াই তাঁহার দিন কাটিত। পাদস্পর্শ-ভয়ে তিনি গঙ্গায় নামিতেন না এবং গঙ্গার জলে সাধারণের 'কুল্লোল, দন্তধাবন, কেশসংস্কারাদি' সহ্য করিতে পারিতেন না বলিয়া তিনি 'গঙ্গা দরশন করে নিশির সময়ে।' মুকুন্দ-দত্ত প্রভৃতি ভক্ত পুণ্ডরীকের চট্টগ্রামস্থ প্রতিবেশী ছিলেন বলিয়া তাঁহার মর্ম বুঝিতেন। একবার বিদ্যানিধি নবদ্বীপে পৌছাইলে গদাধর-পণ্ডিত মুকুন্দ-দত্তের সহিত সেই 'অদ্ভুত বৈষ্ণব'টির নিকট গিয়া তাঁহার সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হন।[৮] পিতৃবন্ধুর সহিত কোনও যোগাযোগ না থাকায় তিনি তাঁহার বিষয় কিছুই জানিতেননা। তিনি দেখিলেন 'হিঙ্গুল-পিত্তল' শোভিত দিব্যখট্টার উপরে চন্দ্রাতপত্রয়ের নিম্নে অতি সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিহিত যেন এক রাজপুত্র দিব্যশয্যায় বসিয়া রহিয়াছেন। পার্শ্বে

বড় ঝারি ছোট ঝারি গুটি পাঁচ সাত।
দিব্য পিতলের বাটা, পাকা পান তাত॥
দিব্য আলবাটি দুই শোভে দুই পাশে।

এব রাজপুত্রের ওষ্ঠাধর তাম্বূলরাগরঞ্জিত। কপালে চন্দনের উর্ধ্বপুণ্ড্র-তিলক, তাহার সহিত সুগন্ধিযুক্ত ফাগবিন্দু। দুইজন সেবক ময়ূর-পাখা লইয়া বাতাস করিতেছে। চতুর্দিকে সৌগন্ধ্যের হিল্লোল এবং 'সম্মুখে বিচিত্র এক দোলা সাহেবান।' গদাধর স্তম্ভিত হইলেন কিন্তু মুকুন্দ ভাব বুঝিয়া যেই একটি সংগীত আরম্ভ করিলেন, অমনি

কোথা গেল দিব্য বাটা দিব্য গুয়া পান।
কোথা গেল ঝারি যাথে করে জল পান॥
কোথায় পড়িল গিয়া শয্যা পদাঘাতে।
প্রেমাবেশে দিব্য বস্ত্র চিরে দুই হাথে॥
কোথা গেল সেবা দিব্য কেশের সংস্কার।
ধূলায় লোটায়ে করে ক্রন্দন অপার॥
"কৃষ্ণরে, ঠাকুর রে, কৃষ্ণ মোর প্রাণ।
মোরে সে করিলা কাষ্ঠ পাষাণ সমান॥"

ঝাঁরি বাটা প্রভৃতি পদাঘাতে ভাঙিয়া গেল। নিজে আছাড় খাইয়া পড়িলেন। তাঁহার শরীরে অশ্রু, স্বেদ, কম্প, মূর্ছা, পুলকাদি সাত্ত্বিকভাব প্রকটিত হইতে লাগিল। গদাধর

(৭) চৈ. ভা.—২।৭, ৩।১১, পৃ.৩৪৪ ; ভ. র.—১২।১৮০৪ (৮) চৈ. ভা.—২।৭ ; দ্র.—প্রে.বি.—২১শ. বি., পৃ. ২১৮ ; ভ. র.—১২।২৫০৩-২২

আপনার ভুল বুঝিতে পারিয়া অনুতপ্ত হইলেন। প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তিনি তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে চাহিলে মুকুন্দের সাহায্যে একদিন তাঁহার মন্ত্রদীক্ষা হইল।

এইবারেই পুণ্ডরীক গৌরাঙ্গের সহিত দেখা করিতে আসিলে উভয়ের মধ্যে মিলন ঘটে এবং গৌরাঙ্গ তাঁহাকে 'প্রেমনিধি' উপাধিতে ভূষিত করেন। সম্ভবত এই ঘটনার পর হইতেই পুণ্ডরীকও গৌরাঙ্গের নবদ্বীপ-লীলার সহিত বিশেষভাবে যুক্ত হইয়া পড়েন। গৌরাঙ্গ মধ্যে মধ্যে তাঁহার গৃহে গিয়া সংকীর্তন ও রাধিকা-জন্মোৎসব ইত্যাদি অনুষ্ঠান উদযাপন করিলেও[৯] তিনি কিন্তু শ্রীবাস-গৃহে কীর্তনারম্ভ হইলে তথায় গমন করিতে থাকেন। তারপর জগাই-মাধাই উদ্ধার প্রভৃতি অন্যান্য ঘটনাতেও পুণ্ডরীকের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। আচার্যরত্নের গৃহে অভিনয়কালেও তিনি একজন গায়কের কার্য করিয়াছিলেন।[১০]

সন্ন্যাস-গ্রহণের পর মহাপ্রভু শান্তিপুরে পৌঁছাইলে পুণ্ডরীক সেইস্থানে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।[১১] তারপর তিনি প্রতি বৎসর শ্রীক্ষেত্রে গিয়া[১২] তাঁহার নীলাচল-লীলার সহিতও যুক্ত হইতেন। স্বরূপদামোদরের সহিত পূর্ব হইতেই তাঁহার বিশেষ সখ্য থাকায় নীলাচল-বাসকালে উভয়ে প্রায়ই একত্রে বসবাস করিতেন। মহাপ্রভুর হৃদয়রাজ্যে পুণ্ডরীকের স্থান ছিল অতি উচ্চে। একবার গদাধর-পণ্ডিত স্বয়ং মহাপ্রভুর নিকট পুনর্দীক্ষা-গ্রহণের অভিলাষ জ্ঞাপন করিলে মহাপ্রভু তাঁহাকে বিদ্যানিধির নকটই উপদেশ গ্রহণের আজ্ঞা দান করিয়া তাঁহার বিপুল মাহাত্ম্যের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। সেই বৎসর বিদ্যানিধি নীলাচলে গেলে গদাধর তাঁহার নিকট পুনর্দীক্ষা লাভ করেন।[১৩]

সেই বৎসর মহাপ্রভু বিদ্যানিধির জন্য সমুদ্রতটে যমেশ্বর-টোটায় থাকিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তথা হইতে বিদ্যানিধি বন্ধু দামোদরের সহিত জগন্নাথ-দর্শনে যাইতেন। 'ওড়ন ষষ্ঠী'র দিন জগন্নাথ 'নয়াবস্ত্র পরিধান করিতেন এবং তাঁহাকে নানাবিধ বিচিত্র বস্ত্র পরিধান করাইয়া যে-উৎসব আরম্ভ হইত তাহা মকর পর্যন্ত চলিত। সেবারও ওড়ন-ষষ্ঠীর দিন উৎসব আরম্ভ হওয়ায় মহাপ্রভু ভক্তবৃন্দসহ ঠাকুর-দর্শনে গেলেন। স্বরূপের সহিত বিদ্যানিধিও গিয়াছিলেন।[১৪] কিন্তু জগন্নাথকে নূতন 'মাণ্ডুয়া বস্ত্র' পরিহিত

(৯) চৈ. না.—২।২০ ; গৌ. ত.—পৃ. ২১১ ; ভ. র.—১২।৩১৭৯ (১০) চৈ. না.—৩।১৩ (১১) চৈ. চ.—২।৩, পৃ. ৯৮ ; চৈ. ম. (জ.)—স. খ., পৃ. ৯৪ ; জয়ানন্দ বলেন যে মহাপ্রভু নীলাচল হইতে বাংলাদেশে আসিলে বিদ্যানিধি কুলিয়াতে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। (১২) চৈ. না.—৮।৪৩ ; শ্রীচৈ. চ.—৪।১৭।৩ ; চৈ. ভা.—৩।৯, পৃ. ৩২৬ ; ৩।১১ ; চৈ. চ.—২।১, পৃ. ৮৮ (১৩) চৈ. ভা.—৩।১১, পৃ. ৩৪৪ ; চৈ. চ.—২।১৬, পৃ. ১৮৭ (১৪) ঐ

দেখিয়া পুণ্ডরীক 'সঘৃণ'ভাবে স্বরূপকে কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে তাহাই সেইস্থানের রীতি! পরমব্রহ্মস্বরূপ জগন্নাথের সম্বন্ধে এইরূপ আরচণ তর্কাতীত হইলেও রাজা-রাজপাত্র হইতে আরম্ভ করিয়া 'পূজাপাণ্ডা, পত্তপাল, পড়িছা বেহারা' প্রভৃতি সকলেই যে ব্রহ্মসদৃশ নহেন এবং তাঁহাদের পক্ষে যে মাণ্ডুয়া-বস্ত্র-স্পর্শ অবিধেয় ও অশুচিজনক, বিদ্যানিধি সেই কথার উল্লেখ করিয়া হাস্য-পরিহাস করিতে করিতে স্বরূপের সহিত প্রত্যাবর্তন করিলেন। কিন্তু সেদেশে শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র বিদ্যমান ছিল, এবং এরূপ বিধান দেশাচারগ্রাহ্য বলিয়াই তাহা অশুচি নহে, স্বরূপের এই যুক্তিও তাঁহাকে চিন্তিত করিয়াছিল। নিজের মনোভাবে বোধকরি তিনি নিজেই বিচলিত হইয়াছিলেন। রাত্রিকালে স্বপ্ন দেখিলেন, স্বয়ং জগন্নাথ যেন তাঁহার জাত্যভিমানের জন্য গণ্ডদেশে চপেটাঘাত করিতেছেন।[১৫] জাগরিত হইলে তিনি নিজের অবস্থায় নিজেই লজ্জিত হইলেন এবং বন্ধু স্বরূপদামোদর আসিয়া পড়িলে তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইয়া অনুতপ্ত হইলেন।

'চৈতন্যচরিতামৃত' হইতে জানা যায় যে মহাপ্রভুর জীবৎকালের শেষ পর্যন্ত পুণ্ডরীক নীলাচলে গমন করিতেন। কিন্তু মহাপ্রভুর তিরোভাবের পর কোনও গ্রন্থে আর তাঁহার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। 'চৈতন্যচরিতামৃত'-গ্রন্থে[১৬] বিঠ্‌ঠলেশ্বর-গৃহে বৃদ্ধ রূপগোস্বামীর গোপালদর্শন-সঙ্গীদিগের মধ্যে একজন পুণ্ডরীকাক্ষের নাম পাওয়া যায়। কিন্তু পুণ্ডরীক-বিদ্যানিধিকে কোথাও পুণ্ডরীকাক্ষ বলা হয় নাই। তিনি যে অতিবৃদ্ধ অবস্থায় বৃন্দাবনে গিয়া বৃদ্ধ শ্রীরূপের একজন নামমাত্র সঙ্গী-রূপে পরিগণিত হইবেন, তাহাও সম্ভব নহে। 'প্রেমবিলাসে' উক্ত হইয়াছে যে শ্রীনিবাস-আচার্যের চূড়াকরণকালে বিদ্যানিধি নামক এক ব্যক্তি তাঁহার গৃহে গিয়া উপস্থিত হন।[১৭] পুণ্ডরীক-বিদ্যানিধি যে বিদ্যানিধি-পণ্ডিতে পরিণত হইয়া শ্রীনিবাসের 'পাঠবাদ শুনিয়া আনন্দিত' হইতে যান নাই তাহাও ধরিয়া লইতে পারা যায়।

(১৫) বিবরণ অনুযায়ী তিনি জাগরিত হইয়া দেখিলেন যে তাঁহার গাল ফুলিয়া গিয়াছে।
(১৬) ২।১৮, পৃ. ২০১ (১৭) প্রে. বি.—৩য় বি., পৃ. ২৪

মাধব-আচার্য-পণ্ডিত

প্রেমবিলাসের ১৯শ. ও ২৪শ. বিলাসানুযায়ী[১] শ্রীহট্ট হইতে নবদ্বীপে আগত বৈদিক-বিপ্র দুর্গাদাস ও তৎপত্নী বিজয়ার দুই পুত্র সনাতন ও পরাশরের মধ্যে দ্বিতীয় পুত্র কালা-ভক্ত পরাশর কালিদাস[২] নামে খ্যাত হন। সনাতন ও তৎপত্নী মহামায়ার একমাত্র সন্তান ছিলেন বিষ্ণুপ্রিয়া (গৌরাঙ্গপত্নী), এবং কালিদাস ও তৎপত্নী বিধুমুখীর একমাত্র সন্তান মাধব[৩]; বিধুমুখী অল্প বয়সে বিধবা হন এবং মাধব মহাপণ্ডিত হইয়া আচার্য-উপাধি প্রাপ্ত হন। শ্রীবাস-গৃহে গৌরাঙ্গ-অভিষেককালে গৌরাঙ্গোচ্চারিত নাম-মহামন্ত্র শ্রবণে তাঁহার হৃদয়ে পরমাভক্তির উদয় হইলে তাঁহারই উপদেশে তখন হইতে তিনি 'সংখ্যা করি লক্ষ নাম লয় অনুরাগে'। এবং 'সেই হৈতে হৈল তার সংসার বিরাগে'। চতুর্বিংশ বিলাস-মতে[৪] তিনি সংসারবিরক্ত হইয়া 'নবদ্বীপ হইতে কৈলা কুলিয়া বসতি'। অন্যান্য গ্রন্থের প্রমাণ-বলেও[৫] জানা যায় যে মহাপ্রভু নীলাচল হইতে আসিয়া কুলিয়ায় অবস্থান-কালে এই মাধবের গৃহেই উঠিয়াছিলেন।

মাধবাচার্য ভাগবতের প্রতি অনুরাগী হন এবং শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধ অবলম্বনে তিনি তাহার প্রসিদ্ধ 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' কাব্য রচনা করিয়া[৬] তাহা গৌরাঙ্গ-চরণে অর্পণ করিলে গৌরাঙ্গ তাঁহার ভক্তিভাব দেখিয়া তাঁহাকে অনুগৃহীত করেন। তারপর তিনি তাঁহাকে দীক্ষামন্ত্র দেওয়ার জন্য অদ্বৈতপ্রভুকে নির্দেশদান করিলে অদ্বৈত একদিন তাঁহাকে মন্ত্রদীক্ষা দিয়া নাম-মাহাত্ম্যের তত্ত্ব শিখাইয়া দেন।

(১) পৃ. ৩১৫, ২৪০ (২) পা. নি. (ব. সা. প.)-গ্রন্থে সপ্তগ্রামস্থ যে কালিদাসকে পাওয়া যায় তিনি সম্ভবত ভিন্ন ব্যক্তি। (৩) ৪০৪ চৈতন্যাব্দের 'বিষ্ণুপ্রিয়া-পত্রিকা'র 'শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া' প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে যে বিষ্ণুপ্রিয়ার বিবাহের পর সনাতন স্বীয় পুত্র যাদবকে গৌরাঙ্গের হস্তে সমর্পণ করিলে তিনি সেই ভার গ্রহণ করেন। এই তথ্যের উৎস কি বলা হয় নাই ; সম্ভবত বৈষ্ণবদিগ্দর্শনী (পৃ. ৩৪৭)। আবার ১৩০৬ সালের 'সাহিত্য'-পত্রিকার ফাল্‌গুন-সংখ্যায় ঠাকুরদাস দাস লিখিয়াছেন "এতদ্বিষয়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতদ্বৈধ থাকিলেও ইহা সর্ববাদিসম্মত যে গৌরাঙ্গপত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী সর্বজ্যেষ্ঠা, যাদব তাহার ছোট, মাধব তদপেক্ষাও বয়ঃকনিষ্ঠ।" প্রবন্ধকার সনাতনের 'মহাবংশসম্ভূত পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত শশিভূষণ ভাগবতরত্ন গোস্বামীপ্রভু' কর্তৃক বঙ্গানুবাদসহ মুদ্রিত ও প্রকাশিত শ্রীচৈতন্যতত্ত্বদীপিকা-গ্রন্থ হইতে প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন। কিন্তু এই গ্রন্থখানি প্রামাণিক কিনা জানা যায় নাই। (৪) পৃ. ২৪০ (৫) চৈ. ম.—৯।৩৩ ; চৈ. চ.—২।১৬, পৃ. ১৯০ ; ব. নি.—পৃ. ১৭৫ (৬) প্রে. বি. ১৯শ. বি., পৃ. ৩১৫-১৭ ; ২৪শ. বি., পৃ. ২৫২ ; ১৯শ. বি.-মতে গ্রন্থরচয়িতা মাধব-আচার্য, ২৪শ. বি.-মতে মাধব-পণ্ডিত।

এই ঘটনার পর মাধবাচার্য সংসার-বিরাগী হইলে তাঁহার সংসার ত্যাগের সম্ভাবনা বুঝিয়া তাঁহার মাতা তাঁহার বিবাহের উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু মাধবাচার্যও সমস্ত বুঝিয়া বৃন্দাবনে পলাইয়া রূপ-গোস্বামীর নিকট আপনাকে সমর্পণ করিলেন এবং বৃন্দাবনবাসী সন্ন্যাসী-রূপে ব্রজের মধুর-ভাবের ভজনা করিতে লাগিলেন। 'প্রেমবিলাসে'র চতুর্বিংশ বিলাসানুযায়ী[৭] তিনি বৃন্দাবনে পরমানন্দ-পুরীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া রূপ-সনাতনের নিকট ভজন শিক্ষা করিতে থাকেন। কিন্তু এই বর্ণনা সম্ভবত ঠিক নহে। কারণ অদ্বৈতের নিকট মন্ত্রদীক্ষা লইবার পর পুনরায় পরমানন্দের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণের তাৎপর্য বুঝা যায় না। 'মুরলীবিলাস' গ্রন্থে[৮] অবশ্য লিখিত হইয়াছে যে জাহ্নবা-রামচন্দ্রের বৃন্দাবনাগমনকালে রূপ-গোস্বামী প্রভৃতির সহিত একজন মাধবাচার্য তথায় উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু মাধবাচার্যের বৃন্দাবন-গমন বা বাসকালে পরমানন্দ-পুরী বৃন্দাবনে ছিলেন বলিয়া প্রমাণ নাই। 'প্রেমবিলাসে'র ঊনবিংশ বিলাস মতে মাধবাচার্য তাঁহার মাতার জীবৎকালে সম্ভবত আর দেশে ফিরেন নাই। তবে মাতার মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া তিনি শান্তিপুরে আসেন। তারপর খেতরির মহামহোৎসবকালে তিনি শান্তিপুর হইতে অদ্বৈত-পুত্র অচ্যুতের সহিত খেতরি গিয়া বিগ্রহাভিষেক-দর্শনের[৯] পর পুনরায় বৃন্দাবনে ফিরিয়া যান। জাহ্নবাদেবী বৃন্দাবনে পৌছাইলে তাঁহার ভক্ত-সঙ্গী নিত্যানন্দদাস মাধবাচার্যের সহিত বৃন্দাবনের বহুস্থান পরিভ্রমণ করেন।

'প্রেমবিলাসে'র উক্তপ্রকার বর্ণনা সত্য হইতেও পারে। গ্রন্থকার নিত্যানন্দদাস জানাইতেছেন :

বৃন্দাবনে গেলুঁ আমি ঈশ্বরীর সঙ্গে।
মাধব আচার্য সনে ভ্রমিনু এই রঙ্গে ॥
এই করিলা মোরে তত্ত্ব উপদেশ।
তাঁর পাদপদ্মে মোর প্রণতি বিশেষ ॥ ১০

'চৈতন্যচরিতামৃতে'ও মূলস্কন্ধ-শাখা-বর্ণনায় মাধবাচার্যকে পাওয়া যায় এবং শ্রীরূপ যখন বৃদ্ধবয়সে একমাসকাল মথুরায় অবস্থান করিয়া গোপাল-দর্শন করিয়াছিলেন তখনও মাধব নামক এক ভক্ত তাঁহার সঙ্গী-হিসাবে সেইস্থানে উপস্থিত ছিলেন।[১১] সেই মাধবকে এই মাধবাচার্য বলিয়াই মনে হয়।

ডা. সুকুমার সেন বলেন যে মাধবদাস-, দ্বিজ-মাধব- ও মাধব-ভণিতার বহু পদই এই মাধব-আচার্য রচিত।[১২]

---

(৭) পৃ. ২৪১ (৮) পৃ. ২৯১, ৩০৯ (৯) প্রে. বি.—১৯শ. বি., পৃ. ৩০৯, ৩১৭, ৩৩৭ (১০) প্রে. বি.—১৯শ. বি., পৃ. ৩১৭ (১১) ২।১৮, পৃ. ২০১ (১২) HBL—p. 54

বক্রেশ্বর-পণ্ডিত

বক্রেশ্বর ছিলেন গৌরাঙ্গের নবদ্বীপ-লীলা-সঙ্গী।[১] আশৈশব সঙ্গী না হইলেও শ্রীবাস-চন্দ্রশেখরের গৃহে কীর্তনারম্ভকাল হইতে তাঁহাকে গৌরাঙ্গলীলার উল্লেখযোগ্য ঘটনাতে অংশগ্রহণ করিতে দেখা যায়। তিনি ছিলেন বিশেষ করিয়া গৌরাঙ্গের নৃত্য-সঙ্গী। "গৌরহরির প্রেমভক্তি প্রভৃতি অলৌকিক ঐশ্বর্যলীলা চমৎকার।" কিন্তু "তাহা অপেক্ষাও লোভনীয় হইল তাঁহার নৃত্যগীত অভিনয়াদি লৌকিকী লীলা।[২]" "নৃত্য যে কীর্তনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল, তাহা চৈতন্যজীবনী হইতে উপলব্ধ হয়।[৩]" যতদূর বুঝিতে পারা যায়, নবদ্বীপ-লীলার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় হইতেছে তাঁহার এই সনৃত্য সংকীর্তন, এবং মুকুন্দ যেমন দিবারাত্র নামকীর্তন করিয়া মহাপ্রভুকে আনন্দ দান করিতেন, বক্রেশ্বরও সেইরূপ 'একভাবে চব্বিশ প্রহর' নৃত্য করিয়া তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করিতেন।[৪] তাঁহার সেবা ছিল দাস্যভাবের সেবা এবং এই নৃত্য-গীতের মধ্য দিয়াই তাহা চরিতার্থতার পথ পাইয়াছিল। মহাপ্রভুও তাঁহার এইপ্রকার সাধনার প্রকৃত সমঝদার ছিলেন। একবার বক্রেশ্বর যখন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন[৫] :

দশ সহস্র গন্ধর্ব মোরে দেহ চন্দ্রমুখ।
তারা গায় মুক্রি নাচি তবে মোর সুখ॥

তখন

প্রভু বলে তুমি মোর পক্ষ এক শাখা।
আকাশে উড়িয়া যাও পাও আর পাখা॥

মহাপ্রভুর একজন উল্লেখযোগ্য পার্ষৎ-হিসাবে বক্রেশ্বরের নাম যে চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, প্রবোধানন্দ-সরস্বতীর 'চৈতন্যচন্দ্রামৃত' গ্রন্থে চৈতন্যভক্তবৃন্দের মধ্যে একমাত্র অদ্বৈতপ্রভুর ও তাঁহার নামের উল্লেখ হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যায়।[৬]

মহাপ্রভু নীলাচলে চলিয়া গেলে বক্রেশ্বর-পণ্ডিত একবার দেবানন্দ-পণ্ডিতের আশ্রমে বাস করিতে থাকেন। সেই সময় ভক্তিবিমুখ দেবানন্দ তাঁহারই নৃত্য-সম্পদ দর্শনে মুগ্ধ হইয়া চৈতন্যানুরাগী হইয়াছিলেন। ইতিপূর্বে ভাগবতপাঠকালে তাঁহার মনে ভক্তিভাব

(১) চৈ. কৌ.—পৃ. ১৬ ; ব. শি.—পৃ. ১৫৯ ; গৌ. বি.—পৃ. ১৪৬ ; গৌ. লী.—পৃ. ২১,৪৪ ; 'বক্রেশ্বর-চরিত্তে'র গ্রন্থকার লিখিয়াছেন (পৃ. ৪৬-৪৮) যে বক্রেশ্বরের জন্ম ত্রিবেণীর নিকট গুপ্তিপাড়ায় এবং তিনি দার-পরিগ্রহ করেন নাই ; তিনি শান্তিপুরে গিয়া অদ্বৈতের নিকট যোগশিক্ষা করেন। (২) ক্ষিতিমোহন সেন—বাংলার সাধনা, পৃ. ৯৪ (৩) খগেন্দ্রনাথ মিত্র—কীর্তন, পৃ. ২২ (৪) চৈ.—সূ. (ব. সা. প.), পৃ. ৯৭ (৫) চৈ. চ.—১।১০, পৃ. ৫১ (৬) শ্রী. চ.—৪৬

জাগ্রত হইত না। কিন্তু বক্রেশ্বরের নৃত্য দর্শনে প্রভাবিত হইয়াই তিনি ভক্তিপথযাত্রী হইয়াছিলেন।[৭]

সংগীতনিপুণ মুকুন্দের মত নৃত্যনিপুণ বক্রেশ্বরও মহাপ্রভুর জীবনের পক্ষে অপরিহার্য ছিলেন। তাই গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দের প্রথমবার নীলাচল-গমনকালে বক্রেশ্বর শ্রীক্ষেত্রে পৌঁছাইলে মহাপ্রভু সম্ভবত তখন হইতেই তাঁহাকে আপনার নিকট রাখিয়া দেন এবং জগন্নাথ-মন্দিরে বেড়াকীর্তন, রথযাত্রা উপলক্ষে বিগ্রহসম্মুখে সম্প্রদায়-বিভাগে কীর্তন ও মহাপ্রভুর উদ্যান-নৃত্য ইত্যাদি প্রাসঙ্গিক সকল অনুষ্ঠানে তখন হইতে তাঁহাকে বিশেষভাবে যুক্ত হইতে হয়। সম্প্রদায়-কীর্তনের সময় যে চারিজন ভক্ত প্রধান নর্তক হিসাবে নেতৃত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে বক্রেশ্বর ছিলেন অন্যতম এবং মহাপ্রভু তাঁহার উদ্যান-নৃত্যকালে একমাত্র এই বক্রেশ্বরকেই স্বীয় নৃত্যসঙ্গী হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে মহাপ্রভু যখন গৌড়ে গমন করেন তখন তিনি তাঁহার সহিত গিয়া রামকেলিতে রূপ-সনাতনের সহিত মিলিত হন এবং চৈতন্যের সহিত পুনরায় নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করেন। তাহারপর হইতেই তিনি নীলাচলে 'প্রভু সঙ্গে কৈল নিত্য স্থিতি।[৮]

বক্রেশ্বরের নীলাচল-বাসকালে মহাপ্রভু মধ্যে মধ্যে তাঁহার গৃহে ভিক্ষানির্বাহ করিতেন। হরিদাস-ঠাকুরের তিরোভাব-দিবসে তাঁহাকে তাঁহার কর্তব্যকর্মে বিশেষভাবে সক্রিয় দেখা যায়। মহাপ্রভুর তিরোধানের পরেও তিনি কিছুকাল নীলাচলে অবস্থান করিতেছিলেন।[৯] শ্রীনিবাস-আচার্য[১০] আসিয়া তাঁহার সাক্ষাৎলাভ করিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু নরোত্তম-ঠাকুর তাঁহাকে নীলাচলে দেখিতে পান নাই।[১১] তাঁহার শিষ্য গোপালগুরু[১২] তখন কাশী-মিশ্রের গৃহে বাস করিতেছিলেন।[১৩] সম্ভবত তিনিই তখন গম্ভীরা-রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। গোপালগুরু সম্ভবত কবি ছিলেন। 'ভক্তিরত্নাকরে'[১৪] তৎকৃত পদ্য হইতে উদ্ধৃতি প্রদত্ত হইয়াছে। বক্রেশ্বর-শিষ্য এই গোপালগুরু-গোসাঁইর একটি সমাজ[১৫] বৃন্দাবনে বাস করিতেছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে বৃন্দাবনে সেই শাখান্তর্গত রাধাবল্লভদাসের সহিত 'অনুরাগবল্লী'-রচয়িতা মনোহরদাসের সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল।[১৬] তখন রাধাবল্লভ বৃদ্ধ।

---

(৭) চৈ. ভা.—৩।৩, পৃ. ২৮০ ; চৈ. চ.—১।১০, পৃ. ৫২ ; শ্রীচৈ.চ.—৩।১৭।১৭ (৮) চৈ.চ.—২।১, পৃ.৮৮ ; পা. নি. (৯) "প্রভুর অপ্রকটের পর……বক্রেশ্বর পণ্ডিত গম্ভীরা আশ্রমের মহান্ত হইলেন এবং তথায় শ্রীশ্রীরাধাকান্ত বিগ্রহের সেবা স্থাপন করিলেন।"……বক্রেশ্বর পণ্ডিত নিজ সম্প্রদায়কে "নিরানন্দ সম্প্রদায় নামে অভিহিত করেন।"—বৈ. দি.—পৃ. ৭৬ (১০) ভ.র.—৩।১৬৫ (১১) নি. বি.-মতে (পৃ.২২) বীরভদ্র নীলাচলে তাঁহার সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (১২) ভ.র.—৫।২১৬৮-৬৯ ; তু.—অ.লী.—পৃ. ১১৮ ; গৌ. গ.—পৃ.৫১ ; চৈ.দী.—পৃ.৪ ; সূ. (ব. সা. প.)—পৃ.৯৭ ; চৈ. গ. দী. (রামাই)—পৃ.৮ (১৩) ভ. র—৮।৩৮২ (১৪) ঐ—৫।২১৬৯-৭১ (১৫) ভ. মা.—২৬ শ. মালা., পৃ. ৫ (১৬) অ.ব.—৮ম. ম., পৃ. ৪৭

নন্দন-আচার্য

প্রাচীন বৈষ্ণবজীবনী-গ্রন্থগুলি হইতে জানা যায়[1] যে নবদ্বীপবাসী নন্দন-আচার্য প্রায় আগাগোড়াই গৌরাঙ্গের নবদ্বীপলীলা প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছিলেন এবং তিনি নীলাচলে গিয়াও মহাপ্রভুর দর্শন-লাভ করিতেন। কিন্তু তাঁহার সহিত আমাদের বিশেষ পরিচয় ঘটে নিত্যানন্দের নবদ্বীপ-আগমনকালে। নিত্যানন্দ নবদ্বীপে আসিয়া প্রথমে নন্দন-আচার্যের গৃহেই উঠিয়াছিলেন এবং গৌরাঙ্গ ভক্তবৃন্দসহ নন্দনের গৃহে গিয়াই তাঁহাকে সম্বর্ধনা জানাইয়াছিলেন। শ্রীরাম-পণ্ডিতকে দিয়া গৌরাঙ্গ অদ্বৈতপ্রভুকে শান্তিপুর হইতে ডাকাইয়া আনিলে অদ্বৈতাচার্যও এই নন্দন-আচার্যের গৃহে কিছুক্ষণ লুকাইয়া রহিয়াছিলেন এবং আরও একবার অদ্বৈতের উপর রাগ করিয়া তাঁহাকে শিক্ষা দিবার জন্য স্বয়ং বিশ্বম্ভরও এই নন্দনের গৃহে একরাত্রি আত্মগোপন করিয়াছিলেন।[2] এই সকল হইতে বুঝিতে পারা যায় যে নন্দনের বসতবাটীটি সম্ভবত নবদ্বীপের একান্তে কোনও নিভৃত অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। তাই গৌরাঙ্গ, অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ সকলেই আত্মগোপনের জন্য তাঁহারই গৃহে গিয়া উঠিতেন এবং তাঁহার গৃহে ভিক্ষানির্বাহ করিতেন।[3] সম্ভবত এই সূত্রেই তাঁহার সহিত প্রভুত্রয়ের নৈকট্য ও আত্মীয়তা ঘটিয়া যায়।

নন্দনের সম্বন্ধে ইহা ছাড়া আর কিছুই জানা যায় না। কেবল 'ভক্তিরত্নাকরে'র বর্ণনায় দেখিতে পাওয়া যায়[4] যে গদাধরদাসের তিরোধান-তিথি-উৎসব উপলক্ষে 'বিষ্ণুদাস, নন্দন-পণ্ডিত, পুরন্দর' প্রভৃতি ভক্ত রঘুনন্দনপ্রভুর সহিত কাটোয়ায় গমন করিয়াছিলেন। মুদ্রিত গ্রন্থে এইরূপ লিখিত থাকিলেও 'পণ্ডিত' উপাধিটি সম্ভবত 'পুরন্দর'-এর সহিত যুক্ত হইয়া থাকিবে। অবশ্য গৌরাঙ্গ যাঁহাকে 'বাপ'-সম্বোধন করিতেন, তাঁহার পক্ষে এতদিন বাঁচিয়া থাকা সম্ভব না হইলে নন্দনের সম্বন্ধেও সেই একই সন্দেহ থাকিয়া যায়। তাছাড়া বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দের মধ্যে পুরন্দর-পণ্ডিতের নাম পাওয়া যায়, কিন্তু নন্দন-পণ্ডিতের নাম কোথাও দৃষ্ট হয় না। সুতরাং উপরোক্ত উল্লেখের

(১) চৈ. ভা.—২।৩,৬,৮ (পৃ. ১৩৯), ১৭, ২৩ (পৃ. ২১৭, ২২৫); ৩।৯, পৃ. ৩২৭; শ্রীচৈ. চ—৪।১৭।৮; চৈ. চ.—১।১০, ১১; ২।৩, পৃ. ৯৮; ২।১০, পৃ. ১৪৭; ২।১১, পৃ. ১৫৩; চৈ. ম. (লো.)—ম.খ., পৃ. ৯৭, ১১২; অ. প্র.—১৪শ. অ., পৃ. ৫৭,৫৮; চৈ. ম. (জ)—ন. খ., পৃ. ২৮, ৩৮, ৪৬, ৫৫; বৈ.খ., পৃ. ৭২; বি. খ., পৃ.১৪২, ১৪৫; ভ. র—১২।৩৩৩৫ (২) চৈ. চ. (৩) চৈ. ভা.—২।৩, পৃ. ১১৮; ২।১৭, পৃ. ১৮৬; চৈ. চ. ম.—৬।১১১ (৪) ৯।৩৯৫

পুরন্দরকে পুরন্দর-পণ্ডিত ধরিলে নন্দনের সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মায়, ইনি নন্দন-আচার্য কিনা। কিন্তু 'চৈতন্যচরিতামৃত' হইতে জানা যায়[৫] যে নিত্যানন্দ পূর্বে যাঁহার গৃহে উঠিয়াছিলেন, সেই নন্দনের আরও দুই ভ্রাতা ছিলেন—বিষ্ণুদাস ও গঙ্গাদাস। সুতরাং 'ভক্তিরত্নাকরে'র নন্দন, বিষ্ণুদাসের সহিত যুক্ত থাকায় তাঁহাকে নন্দন-আচার্য বলিয়া ধরিতে হয় এবং বুঝিতে পারা যায় যে নন্দন-আচার্য গদাধরদাসের তিরোভাব-তিথি মহোৎসবের পূর্ব পর্যন্ত পরলোকগত হন নাই। কিন্তু 'ভক্তিরত্নাকরে'র উপরোক্ত নন্দনকে যদি মুদ্রিত-গ্রন্থানুযায়ী নন্দন-পণ্ডিত বলিয়া ধরিতে হয়, তাহা হইলে নানাবিধ সমস্যার উদ্ভব হয়। সেক্ষেত্রে বিষ্ণুদাসকেও 'পণ্ডিত' আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে কিনা তাহাই প্রথম আলোচ্য বিষয় হইতে পারে এবং সেই সূত্রে 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র নিত্যানন্দ-শাখায় বর্ণিত বিষ্ণুদাস এবং নন্দনের ভ্রাতা গঙ্গাদাসকেও পণ্ডিতাখ্য বলিয়া ধরা যায় কিনা, তাহাও আলোচ্য বিষয় হইয়া উঠে। গৌরাঙ্গের গুরু-হিসাবে গঙ্গাদাস-পণ্ডিতের নাম সুপ্রসিদ্ধ। গঙ্গাদাস-পণ্ডিত নামে অন্য কোনও ব্যক্তি ছিলেন কিনা জানা যায় না। তবে জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে' সম্ভবত আর একজন গঙ্গাদাস-পণ্ডিতের নাম পাওয়া যায়। জয়ানন্দ-প্রদত্ত নিত্যানন্দকৃত্য-বর্ণনা প্রসঙ্গে একটি তালিকার[৬] অংশ এইরূপ :

……নবদ্বীপে ঘর নন্দন আচার্য পরমেশ্বর রামদাস
চতুর্ভুজ পণ্ডিত উদ্ধারণ দত্ত…
……নারায়ণ পণ্ডিত গঙ্গাদাস (পূর্বে যার ঘরে নিত্যানন্দের বিলাস)
জগদীশ হিরণ্য…

আবার গৌরাঙ্গের বাল্যকালীন অঙ্গসেবকদের একটি তালিকার অংশবিশেষ[৭] নিম্নোক্তরূপ :

…মুরারিগুপ্ত বক্রেশ্বর গঙ্গাদাস গোসাঞি
নন্দন চন্দনেশ্বর আর লেখক জগাই।

গৌরাঙ্গ তাঁহার সন্ন্যাস-গ্রহণের সিদ্ধান্ত যাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের একটি তালিকার[৮] অংশবিশেষও নিম্নে প্রদত্ত হইল :

…কাটা গঙ্গাদাস গঙ্গাদাস পণ্ডিত।
গোসাঞির মামা রামানন্দ…

প্রথমোক্ত উল্লেখের গঙ্গাদাসকে গঙ্গাদাস-পণ্ডিত বলিয়া ধরিয়া লইলে বলিতে হয় যে নিত্যানন্দ যাঁহার গৃহে উঠিয়াছিলেন তিনিও নন্দন ভ্রাতা গঙ্গাদাস-পণ্ডিত। তবে তাঁহাকে গৌরাঙ্গের শিক্ষাগুরু গঙ্গাদাস-পণ্ডিত বলিয়া ধরিবার কোনও কারণ নাই।

(৫) ১।১১, পৃ. ৫৬ (৬) বি.খ., পৃ. ১৪৫ (৭) ন.খ., পৃ. ২৮ (৮) বৈ.খ., পৃ. ৭২

সম্ভবত তাঁহারা ভিন্ন ব্যক্তি এবং নবদ্বীপে দুইজনেরই পৃথক গৃহ বিদ্যমান ছিল। আবার দ্বিতীয় তালিকার গঙ্গাদাসের উপাধি হইতেছে গোসাঁই। এই গঙ্গাদাস-গোসাঁইর উল্লেখ একমাত্র জয়ানন্দের গ্রন্থে ছাড়া অন্য কোথাও দেখা যায় না। অথচ গঙ্গাদাস-গোসাঁইর অব্যবহিত পরে নন্দনের নাম থাকায় তাঁহাকে প্রথম তালিকার নন্দন-ভ্রাতা গঙ্গাদাস-পণ্ডিত বলিয়াই ধারণা জন্মে। তৃতীয় উল্লেখের গঙ্গাদাস-পণ্ডিত বা গঙ্গাদাস-পণ্ডিত-গোসাঁইর উল্লেখ এই ধারণাকে যেন স্পষ্টীকৃত করিয়া তুলে এবং তাঁহাকেও নন্দন-আচার্যের ভ্রাতা-রূপে স্বীকার করিয়া লইবার সম্ভাবনা আসে। তৃতীয় উল্লেখে একজন কাটা-গঙ্গাদাসকেও পাওয়া যাইতেছে। জয়ানন্দের গ্রন্থে কয়েকটি নূতন নাম পাওয়া যায়। সর্বাণী, সত্যভামা, সত্যবতী, সুলোচনা, রত্নমালা, ছিরু প্রভৃতির[৯] নাম অন্যত্র দেখা যায় না। গীত-রচয়িতা গোপাল-বসু[১০] মুকুন্দ-ভারতী,[১১] একজন নূতন কৃষ্ণদাস ও গঙ্গাধর,[১২] অন্য এক নূতন নিত্যানন্দ,[১৩] গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস-গ্রহণকালীন নাপিত কলাধর,[১৪] গৌরাঙ্গ-বংশীয় জাজপুরস্থ কমললোচন,[১৫] প্রতাপরুদ্রের রাজকর্মচারী 'রাউত রায় বিদ্যাধর'[১৬] দাক্ষিণাত্যের ত্রিপথা-গ্রাম সন্নিকটস্থ ব্রাহ্মণ কুড়্যা গরুড়-মিশ্র,[১৭] অন্য একজন ভবানন্দ,[১৮] আনন্দগিরি,[১৯] 'প্রসিদ্ধ ছাওয়াল কৃষ্ণদাস মহাশয়,' উপাধিবিহীন একজন বল্লভ,[২০] মহেন্দ্র-ভারতী,[২১] এবং 'জাহ্নবানন্দন রামভদ্র মহামর্দ',[২২]—এই সমস্ত নামও একমাত্র জয়ানন্দের গ্রন্থেই দৃষ্ট হয়। আবার নন্দন গঙ্গাদাস প্রভৃতির সহিত উপরোক্ত কাটা-গঙ্গাদাস[২৩] এবং অন্য এক 'ভগাই-গঙ্গাদাস[২৪] ও লেখক-জগাইর[২৫] নামও গ্রন্থের প্রায় সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। শেষোক্ত এই তিন ব্যক্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোন কারণ না থাকিলেও তাঁহাদের কুলশীল এবং জ্ঞাতব্য অন্যান্য পরিচয় পাওয়াও সম্ভবপর নহে। সুতরাং কাটা-গঙ্গাদাস ও ভগাই-গঙ্গাদাসকে বাদ দিয়া নন্দন-আচার্যের ভ্রাতা গঙ্গাদাসকে আপাতত গঙ্গাদাস-পণ্ডিত (বা গঙ্গাদাস-গোসাঁই) বলিয়া ধরিয়া লইতে পারা যায়। 'পাট-নির্ণয়' গ্রন্থে অনাডিহি বা অনাড়ি গ্রামস্থ একজন ঠাকুর-

(৯) ন. খ., পৃ. ২০, ২৩, ২৯ ; পরিবর্তিকালের রামচন্দ্র-কবিরাজের পত্নীর নাম রত্নমালা (প্রে. বি. ২০শ. বি., পৃ. ৩৪৭) এবং শ্রীনিবাস-আচার্যের প্রথমা পুত্রবধূর নাম সত্যভামা (কর্ণ.—২য় নি., পৃ ২৭-২৮) পাওয়া যায়। (১০) পৃ. ৩ (১১) ন. খ., পৃ. ৫৫ (১২) ন. খ., পৃ. ৫৫ (১৩) বৈ. খ., পৃ. ৮৮ (১৪) বৈ. খ., পৃ. ৮৯ (১৫) উ. খ., পৃ. ৯৬ (১৬) পৃ. ১০৩ (১৭) তী. খ., পৃ. ১৩৭ ; উ. খ., পৃ. ১৪৯ (১৮) বি. খ.—পৃ. ১৪২ (১৯) বি. খ., পৃ. ১৪৩ (২০) পৃ. ১৪৪. (২১) উ. খ., পৃ. ১৫০ (২২) পৃ. ১৫১ (২৩) ন. খ., পৃ. ২৪, ৩৮, ৫৫ ; বৈ. খ., পৃ. ৭২, ৯৪ (২৪) ন. খ., পৃ. ২৯, ৩৮, ৪৬, ৪৭, ৫৫ ; বৈ. খ., পৃ. ৮৩, ৯৪ (২৫) ন. খ., পৃ. ২৪, ২৮, ৪৬, ৪৭, ৫৫ ; বৈ. খ., পৃ. ৭২, ৯৪,

গঙ্গাদাসকে পাওয়া যায়। ঠাকুর-গঙ্গাদাসের উল্লেখ অন্যত্র নাই। 'ভক্তিরত্নাকরে' একজন বড়ু-গঙ্গাদাস আছেন। তিনি নবদ্বীপের নন্দন-ভ্রাতা নহেন।

নন্দনের অন্য ভ্রাতার নাম ছিল বিষ্ণুদাস। চৈতন্যচরিতামৃতে' মূল-, অদ্বৈত- ও নিত্যানন্দ- স্কন্ধশাখার প্রত্যেকটিতেই একজন করিয়া বিষ্ণুদাস আছেন। তন্মধ্যে নিত্যানন্দ-শাখার বিষ্ণুদাস যে নন্দনের ভ্রাতা, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে। অথচ মূল-শাখার বিষ্ণুদাসকেও একজন গঙ্গাদাসের সহিত যুক্ত করা হইয়াছে। তাঁহার নাম নির্লোম-গঙ্গাদাস।[২৬] দুইজনেই মহাপ্রভুর সহিত নীলাচলে অবস্থান করিতেন। কিন্তু তাঁহারা উড়িষ্যাবাসী ছিলেন কিনা, সহজে বুঝা যায় না। তবে লোচনের 'চৈতন্যমঙ্গলে'[২৭] একজন 'বিষ্ণুদাস উড়িয়া'র উল্লেখ আছে এবং 'চৈতন্যচরিতামৃতমহাকাব্য' ও 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র অন্যত্রও[২৮] উড়িষ্যাবাসীদিগের সহিত উড়িষ্যাবাসী হিসাবে একজন বিষ্ণুদাসের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাতে মনে হয় যে উপরোক্ত নির্লোম-গঙ্গাদাস এবং বিষ্ণুদাস উড়িষ্যাবাসী হইতেও পারেন। কিন্তু আনুপূর্বিক বর্ণনা-পাঠে এই বিষয়ে নিঃসংশয় হওয়া যায় না। কারণ, 'চৈতন্যচরিতামৃত'-কার উড়িষ্যাবাসীদিগের বর্ণনার পরে মহাপ্রভুর 'গৌড়ে পূর্বভৃত্য' কমলানন্দ[২৯] ও অদ্বৈতপুত্র অচ্যুতানন্দের নামোল্লেখ এবং তাহার পরে উক্ত দুই ব্যক্তির নামোল্লেখ করিয়া পুনরায় গৌড়ীয় ভক্তের বর্ণনা করায় তাঁহাদিগকেও গৌড়ের 'পূর্বভৃত্য' বলিয়া ধারণা জন্মায়। সেক্ষেত্রে অবশ্য তাঁহাদিগকে নন্দনের ভ্রাতা বলিয়া ধরা যাইতে পারে। কিন্তু কোন কোন পুথিতে[৩০] বৈদ্য-কৃষ্ণদাসের সহিত একজন বৈদ্য-বিষ্ণুদাসের নাম পাওয়া যায়। তিনি মহাপ্রভুর গায়ন ছিলেন। ইহা সত্য হইলে নির্লোম-গঙ্গাদাসের সহিত উল্লেখিত বিষ্ণুদাসকে এই বৈদ্য-বিষ্ণুদাস বলিয়া ধরিয়া লইবারও কারণ উপস্থিত হয়। অবশ্য বৈষ্ণবদাস একটি পদে[৩১] ভক্ত-বন্দনার মধ্যে লিখিতেছেন:

বৈদ্য বিষ্ণুদাস দ্বিজ হরিদাস
গঙ্গাদাস সুদর্শন।

এই স্থলে গঙ্গাদাস, সুদর্শনের সহিত বিষ্ণুদাসকে দেখিয়া গৌরাঙ্গের বাল্যগুরু বিষ্ণুদাস-পণ্ডিতের কথাই মনে আসে। কিন্তু জগন্নাথ-আচার্যের পুত্রের বাল্যগুরু ব্রাহ্মণই হইয়া থাকিবেন।[৩২] সুতরাং গঙ্গাদাসাদির নামের সহিত যুক্ত থাকিলেও মহাপ্রভুর গায়ন-হিসাবে বৈদ্য-বিষ্ণুদাসের পক্ষে নীলাচলে গিয়া অবস্থান করা অসম্ভব না হইতেও পারে। 'চৈতন্যচরিতামৃতে'ও[৩৩] দেখা যায় যে রথযাত্রা উপলক্ষে সম্প্রদায়-কীর্তনের সময় একজন

(২৬) ১।১০, পৃ. ৫৪ (২৭) শে. খ., পৃ. ১৮৭ (২৮) চৈ. চ. ম.—১৩।৭৮; চৈ. চ.—২।১০, পৃ. ১৪৬ (২৯) কমলানন্দ সম্বন্ধে পরমানন্দ-পুরীর জীবনী দ্রষ্টব্য। (৩০) বৈ. ব. (বৃ.)—পৃ. ৫; চৈ. গ.—পৃ. ১২; চৈ. গ. (রামাই)—পৃ. ১৫ (৩১) গৌ. ত.—পৃ. ৩২৫ (৩২) অ. প্র.-গ্রন্থে (১২ শ. অ., পৃ. ৪৮) তাঁহাকে বিষ্ণুমিশ্র বলা হইয়াছে। (৩৩) ২।১৩, পৃ. ১৬৪

বিষ্ণুদাস গায়ক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। দেবকীনন্দনের গ্রন্থ হইতে কিন্তু এবিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। দেবকীনন্দন বলিতেছেন[৩৪]:

দ্বিজ হরিদাস বন্দো বৈদ্য বিষ্ণুদাস॥
তার ভাই বন্দো বনমালিদাস।
যার গীত শুন্যা প্রভুর অধিক উল্লাস॥

এস্থলে দ্বিজ-হরিদাসের সহিত যুক্ত থাকিলেও বিষ্ণুদাসকে বৈদ্য বলিয়া বুঝা যাইতেছে এবং আরও জানা যাইতেছে যে তাঁহার ভ্রাতা বনমালীদাসের সংগীত শ্রবণেও মহাপ্রভু তৃপ্তি লাভ করিতেন। দেবকীনন্দন উড়িষ্যা-ভক্তবৃন্দের মধ্যে ইঁহাদের নামোল্লেখ করায় ইঁহাদিগকে উড়িষ্যাবাসী বলিয়াও ধরিয়া লইতে পারা যায়। ইহা সত্য হইলে 'চৈতন্যচরিতামৃতো'ক্ত নির্লোম-গঙ্গাদাসের সহিত উল্লেখিত বিষ্ণুদাসকে বৈদ্য-বিষ্ণুদাস বলিয়া ধরিয়া লওয়া চলে এবং উভয়েই যে উড়িষ্যাবাসী ছিলেন, তাহাও বলিতে পারা যায়। বৈদ্য-বিষ্ণুদাসের পক্ষে যে নন্দনের ভ্রাতা হওয়া সম্ভব ছিল না, এইসকল হইতে তাহাও নিশ্চয় করিয়া বলা চলে। বিশেষ করিয়া নন্দনের ভ্রাতা-হিসাবে কোনও গায়ক বনমালীকে কোথাও পাওয়া যায় নাই।

আবার নন্দন-ভ্রাতা বিষ্ণুদাসকে কোথাও বিষ্ণুদাস-পণ্ডিত বা বিষ্ণুদাস-আচার্যও বলা হয় নাই। গৌরাঙ্গের বাল্যগুরু বিষ্ণুদাস-পণ্ডিত ছিলেন একজন পৃথক বিষ্ণুদাস এবং অদ্বৈত-শাখাভুক্ত বিষ্ণুদাসাচার্যও ছিলেন অন্য একজন বিষ্ণুদাস। খেতরি-উৎসবে যোগদানার্থ যে বিষ্ণুদাসাচার্য অচ্যুতানন্দের সহিত শান্তিপুর হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন তিনি অদ্বৈত-শিষ্য।[৩৫] সুতরাং 'ভক্তিরত্নাকরে' বর্ণিত গদাধরদাসের তিরোধান-তিথি-উৎসবে যোগদানার্থ যে 'বিষ্ণুদাস, নন্দন পণ্ডিত, পুরন্দর'-এর কথা প্রথমে উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই বিষ্ণুদাস ও নন্দনকে একমাত্র জয়ানন্দ-বর্ণিত নন্দন-ভ্রাতা সন্দিগ্ধ গঙ্গাদাস-পণ্ডিতের জোরেই বিষ্ণুদাস-পণ্ডিত বা নন্দন-পণ্ডিত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যুক্তিযুক্ত নহে। সম্ভবত 'পণ্ডিত' পদবীটি পুরন্দরের সহিত যুক্ত হইয়া থাকিবে। প্রকৃতপক্ষে, পুরন্দর-পণ্ডিতও ছিলেন খ্যাতনামা ব্যক্তি। কিন্তু তাই বলিয়া উক্ত উল্লেখ হইতে ইহা বুঝিতে অসুবিধা হয় না যে বিষ্ণুদাস তাঁহার ভ্রাতা নন্দনের সহিত উক্ত উৎসবে যোগদান করিতে গিয়াছিলেন।

কিন্তু একটি প্রশ্ন থাকিয়া যায় যে তাহা হইলে নন্দন-ভ্রাতা বিষ্ণুদাস বা গঙ্গাদাসের পদবী কি ছিল। 'চৈতন্যভাগবত'-কার নিত্যানন্দ-শিষ্য-বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন[৩৬]:

চতুর্ভুজ পণ্ডিত-নন্দন গঙ্গাদাস।
পূর্বে যাঁর ঘরে নিত্যানন্দের বিলাস॥

---

(৩৪) বৈ. ব. —পৃ. ৪ (৩৫) দ্র.—বিষ্ণুদাসাচার্য (৩৬) ৩।৬, পৃ. ৩১৭

মুদ্রিত গ্রন্থানুযায়ী ইহার অর্থ দাঁড়ায় চতুর্ভুজ-পণ্ডিতের পুত্র গঙ্গাদাসের গৃহে নিত্যানন্দ পূর্বে বিলাস করিয়াছিলেন। কিন্তু এই চতুর্ভুজ-পণ্ডিত যে নন্দন বা গঙ্গাদাসের পিতা ছিলেন; তাহার উল্লেখ কোথাও নাই। অন্য একটিমাত্র স্থলে চতুর্ভুজ-পণ্ডিতের উল্লেখ পাওয়া যায়। পূর্বে জয়ানন্দের গ্রন্থ হইতে তিনটি তালিকার যে অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার প্রথমটিতেও ইঁহাকে দেখা যায়। সেই স্থলে একেবারে চতুর্ভুজ-পণ্ডিতের নাম পাওয়ায় 'চৈতন্যভাগবতে'র নন্দন কথাটিকে পুত্রার্থে প্রয়োগ করা চলে না; চতুর্ভুজ-পণ্ডিত, নন্দন এবং গঙ্গাদাস তিনজনকেই পৃথক ব্যক্তি বলিয়া ধরিতে হয়। তবে চতুর্ভুজ ও বিষ্ণু যদি একই ব্যক্তির নাম হইয়া থাকে এবং সুদর্শনকেও যদি তাঁহাদের সহিত যুক্ত করা হয়, তাহা হইলে তিনি গৌরাঙ্গের বাল্যগুরু হইতে পারেন কিনা, তাহা পৃথকভাবে বিচার্য হইয়া উঠে। কিন্তু সেইরূপ কল্পনা কষ্টকল্পনা মাত্র। যাহাহউক, জয়ানন্দের উল্লেখের মধ্যে নবদ্বীপের নন্দন-আচার্য ও নিত্যানন্দ যাঁহার গৃহে বিলাস করিয়াছিলেন, সেই গঙ্গাদাসের কথা উল্লেখিত হইলেও চতুর্ভুজ-পণ্ডিত যে তাঁহাদের পিতা ছিলেন, তাহা নির্দিষ্ট করিয়া বলা হয় নাই। সুতরাং অন্য প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত চতুর্ভুজ-পণ্ডিতকে বড়জোর নন্দন-গঙ্গাদাসের সহিত সম্পর্কিত অন্য কোনও ব্যক্তি বলিয়া ধরা যায়। কিন্তু নন্দনের উপাধি যে পণ্ডিত ছিল তাহা কোথাও দেখিতে পাওয়া যায়না। বরং বিজয়-আচার্য ও নন্দন-আচার্য যে একই পরিবারভুক্ত ছিলেন তাহাই জানা যায়।[৩৭] সুতরাং নন্দন-বিজয়ের সহিত এক পরিবারভুক্ত হওয়ায় বিষ্ণুদাস ও গঙ্গাদাসকেও একই পদবীবিশিষ্ট বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়।

পরবর্তিকালে কোথাও গঙ্গাদাসের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়না।

(৩৭) দ্র.—শুক্লাম্বর-ব্রহ্মচারী ও বিজয়-আচার্য প্রসঙ্গ

বনমালী-আচার্য

প্রাচীন বৈষ্ণবচরিত-গ্রন্থগুলিতে ঘটক বনমালী-আচার্য ছাড়া আরও দুইজন বনমালীর নাম পাওয়া যায়। একজনের সম্বন্ধে লোচনদাস বলিতেছেন যে তাঁহার 'বিপ্রকুলে জন্ম' এবং নিবাস ছিল 'পূর্বদেশ বঙ্গে'। তিনি 'দারিদ্র্য জ্বালায় দগ্ধ' হইয়া স্বীয় পুত্রকে সঙ্গে লইয়া ভিক্ষুক বেশে এদেশে চলিয়া আসেন। নবদ্বীপে গৌরাঙ্গের অলোকসামান্য রূপমাধুরী প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি তাঁহাকে স্বয়ং-ভগবান জ্ঞানে মূর্ছিত হইলে গৌরাঙ্গ নৃত্য সংবরণ করিয়া সেই দুইজন বিপ্রকে কোলে তুলিয়া লন।[১]

এই বর্ণনার চার পাঁচ পৃষ্ঠা পরেই লোচন আর একজন বনমালীর কথা বলিতেছেন। তিনিও ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং তিনিও একদিন সংগীত-নৃত্যরত গৌরহরিকে 'হলায়ুধ বেশে' প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র মূল-স্কন্ধ শাখায় তাঁহার সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে :

বনমালী পণ্ডিত হয় বিখ্যাত জগতে।
সোনার মুষল হল যে দেখিল প্রভুর হাতে॥

আবার একই ব্যক্তির সম্পর্কে একই গ্রন্থের অন্যত্র[২] উক্ত হইয়াছে :

বনমালী আচার্য দেখে সোনার লাঙ্গল।

সুতরাং এই বনমালী যে আচার্য ও পণ্ডিত উভয় উপাধিতে পরিচিত ছিলেন, তাহা বুঝা যাইতেছে। আবার ইঁহাকেই দেবকীনন্দন 'ভিক্ষুক বনমালী' এবং কবিকর্ণপূর ব্রাহ্মণ বনমালী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।[৩] 'চৈতন্যভাগবত' হইতে জানা যায় যে এই বনমালী-পণ্ডিতই নীলাচলে গিয়া মহাপ্রভুর দর্শন-লাভ করিতেন।[৪]

গৌরাঙ্গ-বিবাহের 'ঘটক' বনমালীকে কিন্তু সমস্ত গ্রন্থকারই বনমালী-ঘটক বা বনমালী-আচার্য বলিয়াছেন, কেহই তাঁহাকে বনমালী-পণ্ডিত বলেন নাই। তাহাছাড়া, কবিকর্ণপূরও তাঁহার 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'তে উপরোক্ত তিনজন বনমালীরই পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন।[৫] তিনি একজন চতুর্থ বনমালীরও উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার নাম বনমালী-কবিরাজ।[৬] কবিকর্ণপূরকে অনুসরণ করায় 'ভক্তমালে'ও এই চারিজনের নাম উল্লেখিত হইয়াছে। কিন্তু বনমালী-কবিরাজের নাম

(১) চৈ. ম.—ম.খ., পৃ. ১২৪-২৫ ; ভ. র.—১২।২০৮০-৮৩ (২) ১।১৭, পৃ. ৭৪ (৩) বৈ. ব.—পৃ.২ ; চৈ. চ. ম.—৮।৪৬, ৪৭ (৪) ৩।৯, পৃ. ৩২৭ ; তু.—শ্রীচৈ. চ.—৪।১৭।১০ (৫) ৪৯, ১১৪, ১৪৪ (৬) ১৬১

অন্যত্র[৭] দৃষ্ট হয় না। 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র অদ্বৈতশাখায়[৮] একজন উপাধিবিহীন বনমালীর নাম পাওয়া যায়। 'প্রেমবিলাস' 'নরোত্তমবিলাস' ও 'ভক্তিরত্নাকরে'র মধ্যে[৯] গদাধরের তিরোধান-তিথি-উৎসব ও খেতরি-উৎসবের যাত্রী-হিসাবে বর্ণিত একজন বনমালী বা বনমালীদাস 'চৈতন্যচারিতামৃতো'ক্ত অদ্বৈত-ভক্তবৃন্দের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকায় ধারণা জন্মে যে তিনি পূর্বোক্ত 'অদ্বৈত-শাখার' বনমালী। কিন্তু এই বনমালীদাসই বনমালী-কবিরাজ কিনা বুঝিতে পারা যায় না। 'চৈতন্যভাগবতে' শ্রীবাসগৃহে প্রাত্যহিক কীর্তনারম্ভ কালে এবং জয়ানন্দের গ্রন্থের অন্য দুইটি স্থলে[১০] যে সকল বনমালীর নাম পাওয়া যায় তাঁহারা নিশ্চয়ই ভিক্ষুক-বনমালী বা বনমালী-পণ্ডিত হইবেন।

(৭) বৈ. দ.-মতে (পৃ. ৩৪৪) ইঁহার 'গরিফায় বাস' ছিল এবং ইনি চৈতন্যের অঙ্গ-সেবাধিকার প্রাপ্ত হন। গ্রন্থকার এই বনমালী এবং ঘটক-বনমালী ছাড়া চৈতন্যশাখাভুক্ত আরও একজন ওঝা-বনমালীদাসের উল্লেখ করিয়াছেন (পৃ. ৩৪২), তাঁহার নিবাস ছিল 'ফুল্যাপাড়াপুরে'। (৮) এবং সীতাগুণকদম্বের একটি অদ্বৈতশিষ্য-তালিকায়—সী. ক., পৃ. ৯১ (৯) ভ. র.—৯।৪০৩; ১০।৪০৪; প্রে. বি.—১৯শ. বি., পৃ. ৩০৯; ন. বি.—৬ষ্ঠ. বি., পৃ. ৮৩; ৮ম. বি., পৃ. ১০৭ (১০) চৈ. ভা.—২।৮, পৃ. ১৬৯; চৈ. ম.—ন. খ., পৃ. ৪৭; বৈ. খ., পৃ. ৭২

শুক্লাম্বর-ব্রহ্মচারী

শুক্লাম্বর-ব্রহ্মচারী ছিলেন নবদ্বীপবাসী। তাঁহার কুটিরখানি জাহ্নবী-তীরে অবস্থিত ছিল।[১] তিনি অতি দরিদ্র ছিলেন, ভিক্ষা করিয়াই তাঁহার দিন চলিত। গৌরাঙ্গ-আবির্ভাবের বহুপূর্বেই তিনি অদ্বৈতপ্রভুর সহিত পরিচিত[২] হন এবং সম্ভবত তৎপ্রভাবেই তিনি ভক্তিমান হইয়া উঠেন। কিন্তু সজ্ঞানভাবে তত্ত্বজগতে বিচরণ করিবার শক্তি বা সময় তাঁহার ছিল না। তিনি সাধারণভাবেই জীবন যাপন করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে তীর্থাদি-দর্শন করিয়া আপনার দেহমনকে পবিত্র রাখিবার চেষ্টা করিতেন।[৩]

গৌরাঙ্গ তাঁহার বাল্যলীলাকালেই প্রতিবেশী এই দরিদ্র অথচ সরলস্বভাব ভক্তটিকে চিনিয়া লইয়াছিলেন। তাই তিনি ইঁহাকে একান্ত আপনার জন বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহাকে ভালবাসিবার লোকের অভাব ছিল না। তিনি কিন্তু বিশেষ করিয়া ভালবাসিতেন এই সব দীন হীন দরিদ্র বন্ধুদিগকে। স্কন্ধে ঝুলি তুলিয়া শুক্লাম্বর নবদ্বীপের গৃহে গৃহে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেন। আর বিশ্বম্ভর তাঁহার ঝুলির মধ্যে হাত পুরিয়া মুঠা-মুঠা চাউল লইয়া ভক্ষণ করিতেন।[৪] শুক্লাম্বর অস্থির হইয়া উঠিতেন, 'এ তণ্ডুলে ক্ষুদকণ বিস্তর' রহিয়াছে যে! কিন্তু বিশ্বম্ভর কোনও কথা শুনিতেন না, ক্ষুদ কুঁড়া ভক্ষণ করিয়া তিনি ভক্ত-মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়া দিতেন।

বহুতীর্থ পর্যটন করাসত্ত্বেও শুক্লাম্বরের দুঃখদুর্দশাগ্রস্ত যে কঠোর চিত্তখানি প্রসন্নতা লাভ করিতে পারে নাই, গৌরাঙ্গ-চরণে আত্মসমর্পণ করায় তাহা শীতল হইয়াছিল,[৫] এবং বাহ্য আচরণানভিজ্ঞ এই প্রেমোন্মত্ত শুক্লাম্বরই প্রেমানুভূতির অনাড়ম্বর প্রকাশের মধ্য দিয়া বিজ্ঞজনসমাজেরও পূর্বে গৌরাঙ্গপ্রভুকে দেবতার মর্যাদা দান করিয়া তাঁহার গলায় চন্দনলিপ্তমাল্য দুলাইয়া দিয়াছিলেন।[৬] গৌরাঙ্গও কোন দিন তাঁহাকে বিস্মৃত হন নাই। গয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ করিয়া বলিবার জন্য শ্রীমান, সদাশিব প্রভৃতি সকলকে এই শুক্লাম্বরের গৃহেই সমবেত হইবার নির্দেশ দান করিয়াছিলেন।[৭]

সদাশিব ছিলেন গৌরাঙ্গের পরমভক্ত এবং পরবর্তিকালে নিত্যানন্দ ইঁহার গৃহে

(১) গৌ. জী.—পৃ. ২৪ ; চৈ. ভা.—২।২৫, পৃ. ২৩৪ (২) চৈ. ভা.—১।২, পৃ. ১২ (৩) চৈ. ম. (লো.) —ম. খ., পৃ. ১০০ (৪) চৈ. ভা.—২।১৬, পৃ. ১৮৪ ; চৈ. চ.—১।১৭, পৃ. ৭১ (৫) চৈ. না.—১।৮১-৮২ (৬) চৈ.ম.(জ) —ন. খ., পৃ. ২৯-৩০ (৭) চৈ. ভা.—২।১, পৃ. ৯৪-৯৫

কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন।[৮] আর নদীয়াবাসী শ্রীমান-পণ্ডিত গৌরাঙ্গ অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন।[৯] 'চৈতন্যচরিতামৃতে' শ্রীমান-সেন নামক মহাপ্রভুর অন্য একজন 'ভক্তপ্রধানে'র কথা বলা হইয়াছে[১০] এবং তাঁহাকে একবার শ্রীমান-পণ্ডিত প্রভৃতির সহিত মহাপ্রভু-দর্শনে নীলাচলে যাইতেও দেখা যায়।[১১] 'চৈতন্যগণোদ্দেশ'-নামক একটি পুথিতে এই শ্রীমান-সেন বা শ্রীমান-সেন-ঠাকুরকে প্রভুর সংকীর্তনে দেউটিধারী বলা হইয়াছে,[১২] কিন্তু 'চৈতন্যচরিতামৃত' এবং 'চৈতন্যভাগবতে' 'প্রভুর নিজ ভৃত্য' শ্রীমান-পণ্ডিতকেই গৌরাঙ্গের নৃত্যকালে দেউটি-ধারী বলা হইয়াছে।[১৩] তাছাড়া শ্রীমান-সেনের নাম অন্য কোথাও পাওয়া যায় না; কিন্তু বিভিন্ন স্থানে এই শ্রীমান-পণ্ডিতের নামই বিশেষভাবে উল্লেখিত হইয়াছে।

যাহা হউক, শ্রীমান-পণ্ডিতের মারফত সংবাদ পাইয়া সদাশিব, গদাধর, মুরারি প্রভৃতি সকলেই শুক্লাম্বর-গৃহে পৌছাইলে গৌরাঙ্গ আসিয়া "হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ" বলিয়া অভিভূত হইয়া পড়েন। তিনি কেবলমাত্র একই কথা বার বার বলিতে লাগিলেন, "পাইলু ঈশ্বর মোর, কোনদিগে গেলা?" কিংবা, "কৃষ্ণরে প্রভুরে মোর কোন দিগে গেলা।" ভক্তগণ তাঁহার এই অদ্ভুত পরিবর্তন দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলেন। গৌরাঙ্গ-ভাবমূর্ছনা তাঁহাদিগকেও আবিষ্ট করিল।

সান্ধ্য কীর্তন, জগাই-মাধাই উদ্ধার, নগর-সংকীর্তন প্রভৃতি নবদ্বীপলীলার উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলির মধ্যে[১৪] শুক্লাম্বর এবং শ্রীমান উভয়েরই নাম উল্লেখিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে গৌরাঙ্গপ্রভুর সহিত একেবারে অবিমিশ্র আবেগানুভূতির যোগ ছিল এই অতি-সাধারণ শুক্লাম্বর-শ্রীমানাদি ভক্তেরই। তাই দেখা যায় শুক্লাম্বর ভিক্ষালব্ধ-তণ্ডুল লইয়া গৃহে ফিরিলে সেই তণ্ডুল হইতে অন্ন রন্ধন করিয়া তাঁহাকে খাওয়াইবার জন্য শুক্লাম্বরের নিকট তাঁহার সে কী সাগ্রহানুরোধ![১৫]

হেন প্রভু বোলে, "জন্ম যাবত আমার।
এমন অন্নের স্বাদ নাহি পাই আর॥
কিবা গর্ভ থোড় না পারি বলিতে।
আলগোছে এমত বা রান্ধিলা কেমতে॥
হেন জন সে আমার বন্ধুকুল॥তুমি
তুমি সব লাগি সে আমার আদি মূল॥"

---

(৮) চৈ. চ.—১।১০, পৃ. ৫১ (৯) চৈ. ভা.—১।২, পৃ. ১২ (১০) ১।১০, পৃ. ৫২ (১১) ঐ—৩।১০, পৃ. ৩৩৪ (১২) চৈ. দী.—পৃ. ১০; চৈ. গ.—পৃ. ১০ (১৩) চৈ. চ.—১।১০, পৃ. ৫১; চৈ. ভা.—৩।৯, পৃ. ৩২৭ (১৪) ঐ—২।৮, পৃ. ১২৯; ২।১৩—পৃ. ১৭৪; ২।২৩, পৃ. ২২৫; চৈ. ম. (লো.)—ম.খ., পৃ. ৯৭, ১১৯-২০, ১২৭-২৮; চৈ. ম. (জ.)—ন. খ., পৃ. ৩৮, ৪৭; বৈ. খ.—পৃ. ৭২, ৮৩ (১৫) চৈ. ভা.—২।২৫, পৃ. ২৩৩-৩৪; গৌ. দী.—১৯১; চৈ. চ.—১।১০, পৃ. ৫২

একদিন এইভাবে শুক্লাম্বরকে পুরস্কৃত করিয়া গৌরাঙ্গপ্রভু শয়ন করিয়াছেন। সেই স্থলে আর একভক্ত উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার নাম বিজয়দাস। তাঁহার হস্তাক্ষর ছিল অতীব চমৎকার। গৌরহরিকে তিনি স্বীয় রত্নাক্ষর দিয়া পুথি নকল করিয়া দিতেন বলিয়া গৌরাঙ্গ তাঁহাকে 'রত্নবাহু' আখ্যা দিয়াছিলেন[১৬] এবং একই কারণে সাধারণ লোকেও তাঁহাকে 'আঁখরিয়া বিজয়' বলিতেন।[১৭] শায়িত অবস্থায় গৌরহরি সেই বিজয়ের অঙ্গে হস্ত স্পর্শ করায় তাঁহার ভাবান্তর ঘটিল।[১৮] লাবণ্যময় গৌরাঙ্গের কৃষ্ণদর্শনাবেশ-সমৃদ্ধ মহৎ রূপখানি দেখিয়া তি'নি অস্থিরচিত্তে চিৎকার করিতে উদ্যত হইলে গৌরাঙ্গ স্বহস্তে তাঁহার মুখ ঢাকিয়া বারণ করিলেন। কিন্তু বিজয় স্থির থাকিতে না পারিয়া মূর্ছিত হইলেন। চেতনা-প্রাপ্তির পর প্রায় সপ্তাহকাল যাবৎ তিনি অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। শুক্লাম্বর গৃহের এই ঘটনাগুলিকে অবলম্বন করিয়া গৌরাঙ্গের দেবভাব সম্বন্ধে সকলের মনেই আনাগোনা চলিতে লাগিল।

লীলাসমৃদ্ধিকালেও গৌরাঙ্গপ্রভু শুক্লাম্বর প্রভৃতিকে বিস্মৃত হন নাই। আচার্যরত্ন-ভবনে নৃত্যাভিনয়কালে তিনি শুক্লাম্বরকে এক বিশেষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবার আজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন। শুক্লাম্বর নারদ-শিষ্যের ভূমিকায়[১৯] এবং শ্রীমান 'দিয়ড়িয়া হাড়ি'র ভূমিকায় নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। সদাশিবও অভিনয় হইতে বাদ পড়েন নাই।[২০]

মহাপ্রভুর নীলাচল-গমনের প্রাক্কালে শুক্লাম্বর প্রভৃতি ভক্ত শান্তিপুরে উপস্থিত ছিলেন।[২১] তাহার পর শ্রীমান-পণ্ডিত ও শুক্লাম্বর-ব্রহ্মচারী, আঁখরিয়া-বিজয়, ও সদাশিব-পণ্ডিত প্রভৃতি ভক্ত নীলাচলে গিয়া চৈতন্য-দর্শন লাভ করিয়া আসিতেন।[২২] 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র বর্ণনায় প্রথম বৎসর জগন্নাথের চতুষ্পার্শ্বস্থ সম্প্রদায়-কীর্তনের মধ্যে যে শ্রীমানকে দেখা যায়, খুব সম্ভবত তিনি এই শ্রীমান-পণ্ডিতই। মহাপ্রভুর জীবৎকালের শেষের দিকেও শুক্লাম্বর এবং শ্রীমান-পণ্ডিতকে নীলাচলে যাইতে দেখা যায়। কিন্তু তাঁহার তিরোভাবের পর আর শ্রীমানকে দেখা যায় না। তবে 'ভক্তিরত্নাকর' হইতে জানা যায় যে শ্রীনিবাস-আচার্য প্রথমবারে নবদ্বীপে আসিলে শুক্লাম্বরের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটে। নরোত্তমও বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া নবদ্বীপে তাঁহার সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হন। কিন্তু শ্রীনিবাস-আচার্য প্রথম বারে বনবিষ্ণুপুর হইতে ফিরিয়া আর তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারেন নাই।[২৩] বিজয় দাস আঁখরিয়া সম্বন্ধেও বড় একটা নির্ভরযোগ্য সংবাদ পাওয়া যায় না। 'চৈতন্যচরিতামৃতে' অদ্বৈত-শাখায় একজন বিজয়কে দেখা যায়। ইনি কোন বিজয় বলা শক্ত। 'চৈতন্য-

---

(১৬) ঐ—১।১০, পৃ. ৫২ ; চৈ. ভা.—৩।৯, পৃ. ৩২৬ (১৭) ঐ—২।২৫, পৃ.২৩৪ (১৮) ঐ (১৯) চৈ. না.—৩।১৩ (২০) চৈ. ভা.—২।১৮, পৃ. ১৮৮ (২১) চৈ. চ.—২।৩ (২২) ঐ—২।১০, পৃ. ১৪৭ ; ২।১১, পৃ.১৫৩ ; ৩।১০, পৃ. ৩৩৪ ; শ্রীচৈ. চ.—৪।১৭।৮ ; চৈ. ভা.—৩।৯, পৃ. ৩২৬–২৭ (২৩) ভ. র. —৪।৫৭ ; ৮।৮০, ৮৫; ৯।৫৩

ভাগবতে' শ্রীবাস-গৃহে প্রাত্যহিক সান্ধ্য-সংকীর্তনারম্ভ কালে এবং 'চৈতন্যচরিতামৃতে' মহাপ্রভুর নীলাচল-যাত্রার প্রাক্কালে শান্তিপুরে অদ্বৈত-গৃহে শ্রীধরের সহিত এক বিজয়কে পাওয়া যায়। 'চরিতামৃতে'র বর্ণনায় শ্রীমান-পণ্ডিতের নামও একত্রে যুক্ত হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে, "শুক্লাম্বর দেহ এই শ্রীমান্ বিজয়।" শ্রীধর ও শ্রীমানের সহিত এইভাবে যুক্ত থাকায় মনে হয় যে সম্ভবত এই বিজয়ও পূর্বোক্ত আঁখরিয়া-বিজয়দাসই। হরিদাস ও নিত্যানন্দ একবার গৌরাঙ্গপ্রভুকে গংগাবক্ষ হইতে তুলিয়া আনিলে তিনি সেই রাত্রিতে বিজয়-আচার্যের গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন।[২৪] কিন্তু 'চৈতন্যভাগবতে' লিখিত হইয়াছে যে তিনি সেই রাত্রিতে নন্দন-আচার্যের গৃহেই অবস্থান করেন।[২৫] সুতরাং ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে বিজয়-আচার্য নন্দন-আচার্যের সহিতই সম্পর্কিত ছিলেন। আবার দেবকীনন্দন লিখিয়াছেন,[২৬] "নন্দন-আচার্য বন্দো লিখক বিজয়"। ইহা হইতে নন্দন-আচার্য সম্পর্কিত বিজয়ই যে পূর্বোক্ত আঁখরিয়া-বিজয়দাস, তাহাতে সন্দেহ থাকে না। ইহাছাড়াও, পুরুষোত্তম ও সঞ্জয়াদির সহিত নবদ্বীপ-লীলার মধ্যে প্রায়শই একজন বিজয়ের সাক্ষাৎ ঘটে।[২৭] সঞ্জয় ও বিজয় একসঙ্গে খোল বাজাইতেন। খুব সম্ভবত, নন্দন-আচার্যেরই পুত্র বা ভ্রাতা বা তৎস্থানীয় কোনও ব্যক্তি গৌরাঙ্গের ব্যকরণ-শিষ্য পুরুষোত্তম ও সঞ্জয়ের গৃহে তাঁহাদের সহিত যুক্ত হইয়া শিক্ষালাভ করিতে থাকিলে গৌরাঙ্গ তাঁহার ভক্তিভাব ও সুন্দর হস্তাক্ষর দেখিয়া তাঁহাকে স্বীয় আঁখরিয়া রূপে নিযুক্ত করেন এবং পরে শুক্লাম্বর-গৃহে তাঁহাকে কৃপাদান করেন। উল্লেখযোগ্য যে, 'চৈতন্যচরিতামৃতে' যেরূপ শ্রীমান ও বিজয়ের নাম একত্রে উল্লেখিত হইয়াছে, দেবকীনন্দনের গ্রন্থেও সেইরূপ শ্রীমান ও সঞ্জয়ের নাম একত্রিত হইয়াছে। 'ভক্তিরত্নাকর'-মতে শ্রীনিবাস-আচার্যের প্রথমবার নবদ্বীপ-আগমন কালে বিজয় এবং সঞ্জয়ও শুক্লাম্বরের সহিত বিদ্যমান ছিলেন। 'পদকল্পতরু'তে উদ্ধৃত 'বিজয়ানন্দ'-ভনিতায় লিখিত বাংলা পদটি মহাপ্রভুর 'আঁখরিয়া বিজয়ে'র বলিয়া ধরা হয়।[২৮]

(২৪) চৈ.চ.—১।১৭, পৃ. ৭৭ (২৫) চৈ. ভা.—২।১৭, পৃ. ১৮৬ (২৬) বৈ. ব.—পৃ.২ (২৭) ভ. র. —১২।২০২২, ৩৩৩৪ ; চৈ. ম.—ন. খ., পৃ. ২৪ (২৮) প. ক. (প.)—পৃ. ১৬২ ; HBL— 397

শ্রীধর-পণ্ডিত

(খোলাবেচা)

শ্রীধর সম্বন্ধে কবিকর্ণপূর বলিতেছেন[১] :

খোলাবেচাতয়া খ্যাতঃ পণ্ডিতঃ শ্রীধরো দ্বিজঃ।

খোলাবেচা-খ্যাতিসম্পন্ন[২] শ্রীধর যে ব্রাহ্মণ এবং 'পণ্ডিত'-উপাধিযুক্ত ছিলেন তাহা সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থ হইতেই সমর্থিত হয়।[৩] আরও বলা হইয়াছে যে তিনি নবদ্বীপ-নিবাসী ছিলেন এবং 'চৈতন্যভাগবত' হইতে জানা যায় যে শঙ্খবণিক-নগর ও তন্তুবায়-পাড়া ইত্যাদি অতিক্রম করিয়া তাঁহার গৃহে যাওয়া যাইত।[৪] তাঁহার কুটিরখানি ছিল নবদ্বীপের একান্তে।[৫] শ্রীধর সম্বন্ধে যাহা কিছু জানা যায়, তাহা মূলত 'চৈতন্যভাগবত' হইতেই।

শ্রীধরের একটি ব্যবসায় ছিল। থোড়, কলা, মূল, খোলা ইত্যাদি বিক্রয় করিয়াই তাঁহার জীবিকা নির্বাহ হইত। কিন্তু তিনি ছিলেন 'পরম সুশান্ত' ও যুধিষ্ঠির সম 'মহাসত্যবাদী' এবং প্রকৃত বিষ্ণুভক্ত। প্রত্যহ খোলাগাছি বা কলাপাতার আঁটি আনিয়া তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া বিক্রয় করিতেন এবং লব্ধার্থের অর্ধেক পরিমাণ গঙ্গাপূজার নৈবেদ্যের জন্য ব্যয় করিয়া কোনও রকম কষ্টেস্যষ্টে দিনাতিপাত করিতেন। কিন্তু গৃহে রীতিমত 'লক্ষ্মীকান্ত সেবন' ও অধিক রাত্রি পর্যন্ত হরিনাম চলিত। তাহাতে পাষণ্ডী-গণ বিরক্ত হইয়া বলিত :

রাত্রে নিদ্রা নাহি যাই দুইকর্ণ ফাটে ॥
মহা চাষা বেটা ভাতে পেট নাহি ভরে।
ক্ষুধায় ব্যাকুল হৈয়া রাত্রি জাগি মরে ॥

কিন্তু এই সরল-স্বভাব শ্রীধরের প্রতি গৌরাঙ্গপ্রভুর প্রেম ছিল কিছু অধিক। গৌরাঙ্গের নিকট হইতে যে দণ্ড-প্রাপ্তির জন্য স্বয়ং অদ্বৈতপ্রভুকে একদিন লালসাগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল, সেইরূপ দণ্ডদানের মধ্য দিয়াই যেন গৌরাঙ্গ-শ্রীধরের প্রেমের সূত্রপাত। সুতরাং সূত্রপাতেই এই প্রেমের পরিপক্কতা উপলব্ধ হয়। শ্রীধর তাঁহার থোড়-কলা-মূলা-খোলার পশরা লইয়া বসিয়া আছেন ; হঠাৎ গৌরচন্দ্র আবির্ভূত হইয়া বলিয়া বসিলেন—

---

(১) গৌ. দী.—পৃ.১৩৩ (২) এই খোলা বিক্রয়ের জন্যই বোধকরি জয়ানন্দ (চৈ.ম.—পৃ. ২২, ৩৮, ৪২, ৪৭) শ্রীধরকে 'পাটুয়া শ্রীধর' আখ্যা দান করিয়াছেন। (৩) পা. প.—পৃ. ২৬ ; অ. বি.—পৃ. ১ ; গৌ. দী.—পৃ. ৩৭ ; গৌ. ত.—পৃ ১৫৪ ; ভ. মা.—পৃ. ২৯ (৪) চৈ. ভা.—২।২৩, পৃ. ২২৫ (৫) ঐ—২।৯, পৃ. ১৪৯

বিষ্ণুসেবা করিয়া তোমার কি লাভ হয়? তোমার বহু ধনরত্ন লুক্কায়িত আছে, সেই সমস্ত পোতা ধনের কথা আমি সকলকে বলিয়া দিব। তবে যদি 'কড়িবিনে' আমাকে তোমার ঐসব থোড়-কলা-মূলা কিছু দিতে পার তাহা হইলে আর তোমার সহিত আমার কোনও কোঁদল নাই। নানাচিন্তা করিয়া শ্রীধরকে শেষে রাজী হইতে হয়। গৌরহরি তখন অকুণ্ঠ আলাপ আলোচনা ও প্রাণভরা ভালবাসার দ্বারা শ্রীধরকে যেন অভিভূত করিয়া চলিয়া যান।

গৌরাঙ্গ এইভাবে শ্রীধরকে উত্ত্যক্ত করিতেন। অর্ধমূল্যের বিনিময়ে তাঁহার মাল ধরিয়া টানাটানি করিতেন এবং 'এইমত শ্রীধর ঠাকুরে হুড়াহুড়ি' লাগিয়া যাইত। কিন্তু এই দীন ও দরিদ্র ভক্তটির জন্য গৌরাঙ্গপ্রেম-নির্ঝরিণী ছিল ফল্গুস্রোতা। যখন সময় উপস্থিত হইয়াছে, তখন কুণ্ঠিত শ্রীধর দূরে সরিয়া থাকিলেও তিনি কিন্তু তাঁহাকে আহ্বান করিতে ভুলিয়া যান নাই। শ্রীবাস-গৃহে সান্ধ্যকীর্তনের মধ্যদিয়া তাঁহার মহিমময় যাত্রার আরম্ভকালে তিনি তাই লোক পাঠাইয়া শ্রীধরকে ডাকাইয়া আনিয়াছিলেন। কিন্তু শংকা ও সংকোচে শ্রীধরের হৃদয় কম্পিত হইলে গৌরাঙ্গ জানাইলেন:

> বিস্তর করিয়া আছ মোর আরাধন।
> বহু জন্ম মোর প্রেমে ত্যজিলা জীবন ॥
> এহ জন্মে মোর সেবা করিলা বিস্তর।
> তোমার খোলার অন্ন খাইলুঁ নিরন্তর ॥
> তোমার হস্তের দ্রব্য খাইলুঁ বিস্তর।
> পাসরিলা আমা সঙ্গে যে কৈলা উত্তর ॥

প্রকৃতিস্থ হইলে শ্রীধর গৌরাঙ্গের করুণাময় মোহন-মূর্তি প্রত্যক্ষ করিয়া স্থিরনিশ্চয় হইলেন যে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিলেও গৌরাঙ্গ স্বয়ং-ভগবান কৃষ্ণ ছাড়া আর কিছুই নহেন।[৬] তিনি তাঁহার স্তব আরম্ভ করিয়া দিলেন।

আর একবার নগরসংকীর্তনের দিন কাজীকে উপযুক্ত শাস্তিদানের পর গৌরাঙ্গপ্রভু অসংখ্য ভক্তসহ নগর-পরিভ্রমণ করিয়া শ্রীধরের গৃহে উপস্থিত হইলেন। তখন তিনি পরিশ্রান্ত ও পিপাসার্ত। দরিদ্র শ্রীধর কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারেন না। তাঁহার গৃহে একটি 'ফুটা লৌহপাত্র' পড়িয়াছিল। গৌরাঙ্গ ছুটিয়া গিয়া সেই ফুটাপাত্রে করিয়াই পরমানন্দে জলপান করিতে লাগিলেন।[৭] কুণ্ঠায় শ্রীধর দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া

(৬) চৈ.ভা.-মতে (২।৯, পৃ. ১৫০) এই সময় গৌরাঙ্গ শ্রীধরকে শ্যামল বংশীবদন রূপ দেখাইয়া অষ্টসিদ্ধি প্রদান করেন। (৭) চৈ. চ.—১।১০, পৃ. ৫২; ১।১৭, পৃ. ৭২

কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং 'হায় হায়' করিয়া উঠিলেন। কিন্তু ভক্তের গৌরব বৃদ্ধি করিয়া গৌরাঙ্গ তাঁহার প্রাঙ্গণে নৃত্য-সংকীর্তন করিতে লাগিলেন।

নবদ্বীপলীলার প্রায় সমূহ উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলিতেই আমরা শ্রীধরের সাক্ষাৎলাভ করিয়া থাকি।[৮] কিন্তু গৌরাঙ্গের নবদ্বীপ-ত্যাগের ঠিক পূর্বদিনই তিনি আকস্মিকভাবে একটি লাউ লইয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীধরের লাউ ভক্ষণ করিবার জন্য গৌরাঙ্গ ইতিপূর্বে তাঁহার সহিত কতদিনই কত কোঁদলের সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু আজ তিনি স্বয়ং শ্রীধরকেই সেই 'লাউভেট' দিতে দেখিয়া সর্বান্তঃকরণে পরিতৃপ্ত হইলেন। দৈবাৎ আর একজন ভক্তও সেইদিন 'দুধ ভেট' দিয়াছিলেন। গৌরাঙ্গ মাতাকে লাউ দিয়া বলিলেন:

……বড় লাগে ভাল।
দুগ্ধ লাউ পাক গিয়া করহ সকাল॥

সন্ন্যাস-গ্রহণের পর মহাপ্রভু শান্তিপুরে পৌঁছাইলে শ্রীধরও সেই স্থানে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।[৯] তাহারপর গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দের প্রথমবার নীলাচল-মনকালেও শ্রীধরকে তাঁহাদের সহিত শ্রীক্ষেত্রে যাইতে দেখা যায়।[১০] সম্ভবত অন্যান্য বৎসরেও তিনি নীলাচলে গিয়া চৈতন্য দর্শন করিয়া আসিতেন।[১১]

(৮) চৈ. ভা—২।৮, পৃ. ১৩৯; ২।১৩, পৃ. ১৭৪; ২।২৩, পৃ. ২১৫, ২১৭, ২২৫; চৈ. ম. (জ.)—ন. খ., পৃ. ২২, ২৪. ৩৮, ৪৭; বৈ. খ., পৃ. ৭২ (৯) চৈ. চ.—২।৩, পৃ. ৯৮ (১০) ঐ—২।১০, পৃ. ১৪৭; ২।১১, পৃ. ১৫৩ (১১) ঐ—৩।৯, পৃ. ৩২৭; শ্রীচৈ. চ.—৪।১৭।৮

দামোদর-পণ্ডিত

'চৈতন্যভাগবত' হইতে আমরা দামোদর সম্বন্ধে মোটামুটি এইটুকু জানিতে পারি যে তাঁহারা দরিদ্র ছিলেন এবং মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে কৃপা করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু নীলাচল-গমনের কিছুকাল পরে দামোদর-পণ্ডিত ভ্রাতা শংকর-পণ্ডিতের সহিত তথায় গিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হন। ইহার পরে কোন এক সময়ে তিনি শচীদেবীকে দেখিবার জন্য নবদ্বীপে গিয়াছিলেন। আবার কোন এক রথযাত্রা উপলক্ষে গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দের সহি তিনি নবদ্বীপ হইতে নীলাচলে যাইবার পর মহাপ্রভু তাঁহাকে শচীদেবীর বিষ্ণুভক্তি সম্ব সন্দিগ্ধভাবে প্রশ্ন করিলে তিনি সক্রোধ বচনে বলিয়াছিলেন যে স্বয়ং শচীদেবী হইতেই মহাপ্রভুর বিষ্ণুভক্তির উদয় হইয়াছে, সুতরাং মহাপ্রভুর উক্তপ্রকার সন্দেহ সম্পূর্ণতই নিরর্থক। 'মুরারি গুপ্তের কড়চা' হইতেও এই উক্তির সমর্থন পাওয়া যায়।[১]

গৌরাঙ্গের নবদ্বীপ-লীলাতে দামোদরের অংশ গ্রহণ সম্পর্কে কোন উল্লেখই বৃন্দাবনের গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। কিন্তু মহাপ্রভুর নীলাচল-গমনের পূর্বেই যে দামোদর-পণ্ডিত তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই।[২] তবে খুব সম্ভবত মহাপ্রভুর নবদ্বীপ-লীলার শেষদিকে তিনি তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন।[৩]

লোচনের 'চৈতন্যমঙ্গল' এবং দেবকীনন্দন ও বৃন্দাবনদাসের 'বৈষ্ণববন্দনা'-গুলিতে লিখিত হইয়াছে যে দামোদর-পণ্ডিতেরা পঞ্চভ্রাতা[৪] ছিলেন। পীতাম্বর, দামোদর, জগন্নাথ (?), শংকর ও নারায়ণ। সকলেই ছিলেন 'বাসনাহীন, নিরপেক্ষ, উদাসীন।' ভ্রাতৃবৃন্দের মধ্যে অনুজ[৫] শংকরই ছিলেন সম্ভবত দামোদরের সর্বাপেক্ষা প্রিয়। একবার মহাপ্রভুর নিকট

> দামোদর কহে শঙ্কর ছোট আমা হৈতে।
> এবে আমার বড় ভাই তোমার কৃপাতে॥

'বৈষ্ণববন্দনা' হইতে আরও জানা যায় যে পীতাম্বর ছিলেন দামোদরের জ্যেষ্ঠ। ইহারা দরিদ্র পরিবারস্থ ছিলেন।

সম্ভবত, গৌরাঙ্গপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের কিছুকাল পূর্বে[৬] দামোদর-পণ্ডিত তাঁহার নবদ্বীপ-লীলার সহিত যুক্ত হন এবং প্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের দিন তিনি নবদ্বীপে উপস্থিত

---

(১) ৪।২০।১-২ ; চৈ. ভা.—২।১৬, পৃ. ১৮৪ ; ৩।৩, পৃ. ২৭৩ ; ৩।৯, পৃ. ৩২৭ ; ৩।১০, পৃ. ৩৩৩-৩৪ (২) দ্বারপাল-গোবিন্দ ও গোপীনাথ-আচার্যের জীবনীর আলোচনা-অংশগুলি দ্রষ্টব্য। (৩) ঐ (৪) বৈ. ব. (বৃ.)—পৃ. ২ ; বৈ. ব. (দে.)—পৃ. ২ ; চৈ. ম. (লো.)—সূত্র, পৃ. ৩৪ ; বৈ. দ.(পৃ.৩৪৩)-মতে দামোদর-পণ্ডিতের বাস ছিল অভিরামপুরে। (৫) চৈ.না.—৮।৫৮ ; চৈ. চ.— ১।১০, পৃ. ৫১ ; তু.—চৈ. দী. (রামাই)—পৃ. ৯ ; গৌ. গ.(কৃষ্ণদাস)—পৃ. ৫ (৬) দ্র.—নারায়ণ-পণ্ডিতের জীবনী

ছিলেন।[৭] তারপর চৈতন্যের নীলাচল-গমনকালে অদ্বৈতপ্রভু তাঁহাকে মুকুন্দাদির সহিত তাঁহার সঙ্গী-রূপে প্রেরণ করেন। বিশেষ করিয়া এই সময় হইতে দামোদর মহাপ্রভুর জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হন। চৈতন্যের দক্ষিণ-যাত্রাকালে তিনি তাঁহাকে আগাইয়া দেন। কিন্তু মহাপ্রভুর গৌড়-যাত্রাকালে তিনি তাঁহার সঙ্গী-রূপেই গৌড়ে আসিয়া[৮] পুনরায় তাঁহার সহিত[৯] নীলাচলে ফিরিয়া যান।

নীলাচলে দামোদরের কর্মপদ্ধতি যে কিরূপ ছিল তাহাও বুঝিতে পারা যায় না। কেবল মধ্যে মধ্যে বৈষ্ণব-ভোজনাদিকালে তাঁহাকে স্বরূপ, গোপীনাথ ও কাশীশ্বরাদির সহিত পরিবেষণাদি কর্মে লিপ্ত দেখা যায় এবং রথযাত্রা- বা বেড়াকীর্তনাদি-কালেও তাঁহার উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করা যায়। কিন্তু তাঁহার উপর যে মহাপ্রভুর একটি 'সগৌরব প্রীতি'[১০] ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। দামোদর ছিলেন ব্রহ্মচারী, তাঁহার চরিত্রবল অত্যন্ত দৃঢ় ছিল। স্বরূপ-রামানন্দ বা রূপ-সনাতনের মধ্যে যেমন মহাপ্রভু আপনার স্বরূপ দর্শন করিয়া আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, দামোদরের মধ্যেও তিনি তদনুরূপ স্বীয় শক্তির বিকাশ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। সেই শক্তির আশ্রয় ছিল দামোদরের স্পষ্টভাষণ ও নিরপেক্ষতা। এই সম্বন্ধে 'ভক্তিরত্নাকর'-প্রণেতা বলিয়াছেন যে মহাপ্রভু 'দামোদরের দ্বারে নিরপেক্ষ পরকাশে'।[১১] 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র মধ্যেও তাঁহার চরিত্রের এইদিকটিই সমুজ্জ্বলরূপে ধরা পড়িয়াছে। গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে তাঁহার সেই স্পষ্টভাষণের তীক্ষ্ণবাণ হইতে স্বয়ং চৈতন্যও বাদ যান নাই। কিন্তু সেই জন্যই আবার মহাপ্রভু তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও সমীহ করিয়া চলিতেন।[১২] দক্ষিণ-ভ্রমণে বহির্গত হইবার পূর্বে তিনি বলিয়াছিলেন :

> আমিত সন্ন্যাসী দামোদর ব্রহ্মচারী।
> সদা রহে আমার উপর শিক্ষাদণ্ড ধরি॥
> ইঁহার অগ্রেতে আমি না জানি ব্যবহার।
> ইঁহারে না ভাব স্বতন্ত্র চরিত্রে আমার॥
> লোকাপেক্ষা নাহি ইঁহার কৃষ্ণকৃপা হৈতে।
> আমি লোকাপেক্ষা কভু না পারি ছাড়িতে॥

এই জন্যই শ্রদ্ধেয় ভক্তবৃন্দ যখন প্রতাপরুদ্রের সহিত মিলিত হইবার জন্য মহাপ্রভুর নিকটে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়াছিলেন, তখন মহাপ্রভু একমাত্র এই দামোদর-পণ্ডিতের উপদেশ শ্রবণ করিবার জন্যই একান্তভাবে অপেক্ষা করিয়া বসিয়াছিলেন।

আর একবার এক উড়িয়া ব্রাহ্মণকুমার পিতৃহীন হইয়া শোকার্তচিত্তে মহাপ্রভুর

---

(৭) চৈ. ম।.—৪।৩২ (৮) গোপীনাথ-আচার্যের জীবনীর আলোচনাভাগ দ্রষ্টব্য। (৯) চৈ. চ.—১।১, [. ৮৮ (১০) চৈ. চ.—২।১১, পৃ. ১৫৫ (১১) ১।৬৩০ (১২) দ্র.—অ. বি.—পৃ. ২ ; গৌ. প. (কৃষ্ণদাস) —পৃ. ৫

শরণাপন্ন হইলে মহাপ্রভু তাহাকে সান্ত্বনা দান করেন। তখন হইতে সেই বালক প্রত্যহ তাঁহার নিকট আশ্বাস-বাণী শ্রবণ করিতে আসিত। মহাপ্রভুও তাহার সরল-সুন্দর ব্যবহারে আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে স্নেহ প্রদর্শন করিতেন। কিন্তু বালকের এই বারংবার আসা-যাওয়াতে দামোদর অস্বস্তিবোধ করিলেন। অথচ বালকের অবস্থা দেখিয়াও তিনি তাহাকে কিছু বলিতে পারিলেন না। শেষে একদিন তিনি সমস্ত সংকোচ কাটাইয়া মহাপ্রভুকে তীব্রভাবে কটাক্ষ করিয়া বসিলেন[১৩] :

> এবে গোসাঞির গুণ সব লোকে গাইবে।
> গোসাঞির প্রতিষ্ঠা সব পুরুষোত্তমে হৈবে ॥…
> রাণ্ডী ব্রাহ্মণীর বালকে প্রীতি কেন কর ॥
> যদ্যপি ব্রাহ্মণী সেই তপস্বিনী সতী।
> তথাপি তাহার দোষ সুন্দর যুবতী ॥
> তুমিহ পরম যুবা পরম সুন্দর।
> লোকে কানাকানি বাতে দেহ অবসর ॥

দামোদর অবশ্য নিজেই মহাপ্রভুকে 'স্বতন্ত্র ঈশ্বর'[১৪] বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের চক্ষে যে তিনি মানুষ হিসাবে পরিগণিত হইতে পারেন, সে কথা তিনি নিজে ভুলিয়া যান নাই, তাঁহার প্রাণের ঠাকুরকেও ভুলিতে দেন নাই।

দামোদর-চরিত্রের এই দৃঢ়তার জন্য মহাপ্রভু তাঁহার উপর শচীদেবীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়া তাঁহাকে নদীয়ায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। তদবধি তিনিও শচীমাতার সেবা ও সন্তোষ-বিধানের মধ্যে আত্মনিয়োগ করেন। সম্ভবত মহাপ্রভুর এই আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের মধ্যেই ভক্ত-দামোদর তাঁহার সেবাব্রত উদ্‌যাপনের সুপ্রশস্ত পথের সন্ধান পাইয়াছিলেন। নীলাচলে মহাপ্রভুর সগৌরব যাত্রাধ্বনি হইতে বহুদূরে নদীয়ার এক নিভৃত নিকেতনে অতি নীরবে তিনি তাঁহার যাত্রা সুরু করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার পদধ্বনি শোনা যায় না বটে, কিন্তু ভক্তি-জগতের সু-উচ্চ ভূমিতে আসিয়া পৌঁছাইতে তাঁহার যে অন্য কাহারও অপেক্ষা দেরি হইয়া যায় নাই, ইহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়।

মহাপ্রভুর উপদেশ অনুযায়ী দামোদর মধ্যে মধ্যে নীলাচলে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। 'অনুরাগবল্লী' হইতে জানা যায় যে শচীদেবীর অন্তর্ধানে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী যখন 'ভক্তদ্বারে দ্বাররুদ্ধ কৈলা স্বেচ্ছাক্রমে,' তখন মহাপ্রভুর ইচ্ছাক্রমে একমাত্র এই দামোদরই তাঁহার খবরাখবর লইতে পারিতেন এবং বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর প্রাত্যহিক সেবার জন্য যে গঙ্গাজল প্রয়োজন হইত, তাহাও তিনিই স্বহস্তে তুলিয়া আনিতেন।[১৫]

---

(১৩) চৈ. চ.—৩।৩, পৃ. ২৯৬ (১৪) চৈ. চ.—২।১২, পৃ. ১৫৮ (১৫) অ. প্র.-গ্রন্থেও (১২শ. অ., পৃ ১০১-২) এইরূপ বর্ণনা আছে।

'ভক্তিরত্নাকরে'র লেখক বলেন[১৬] যে শ্রীনিবাস-আচার্য দ্বিতীয়বার শ্রীক্ষেত্রে গিয়া ফিরিবার পথে দামোদরের সাক্ষাৎলাভ করিয়াছিলেন এবং নরোত্তম যখন নীলাচলের পথে নদীয়ায় হাজির হন, তখন বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর তিরোভাবে দামোদরের জীবন-প্রদীপখানি নিভু-নিভু করিতেছিল। গদাধরদাসপ্রভুর তিরোধান-তিথি মহামহোৎসবে যোগদান করিবার জন্য যাত্রী-হিসাবে একজন দামোদরকে পাওয়া যায়। একই শ্লোকের মধ্যে একজন পীতাম্বরের উল্লেখ থাকায় তাঁহাকে পীতাম্বর-ভ্রাতা দামোদর-পণ্ডিত বলিয়া মনে হইতে পারে বটে। কিন্তু দামোদরের জ্যেষ্ঠভ্রাতা পীতাম্বর যে তখনও পর্যন্ত বাঁচিয়াছিলেন তাহা সম্ভব মনে হয়না।

(১৬) ৪।৫৭ ; ৮।৪৯, ৯৪ ; ৯।৪০১ ; ন. বি.—২য় বি., পৃ. ৪০

শংকর-পণ্ডিত

শংকর-পণ্ডিত ছিলেন দামোদর-পণ্ডিতেরই ভ্রাতা।[১] কৃষ্ণদাস-কবিরাজ লিখিয়াছেন যে মহাপ্রভুর পূর্বসঙ্গীদিগের মধ্যে যাঁহারা তাঁহার সহিত পরবর্তিকালে নীলাচলে বাস করিয়াছিলেন শংকর-পণ্ডিত তাঁহাদিগেরই একজন।[২] বৃন্দাবনদাসের একটি পদেও তাঁহাকে গৌরহরির সহিত নর্তনরত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়।[৩] ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে তিনি মহাপ্রভুর নবদ্বীপ-লীলাতেও অংশ-গ্রহণ করিয়াছিলেন। তবে দামোদর-পণ্ডিত সম্ভবত নবদ্বীপলীলার একেবারে শেষদিকে মহাপ্রভুর সহিত যুক্ত হওয়ায় তৎকালে শংকরাদির বিশেষ প্রাধান্য ছিল না। কিন্তু মহাপ্রভুর নীলাচল-গমনের পরে গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দের সহিত শংকর নীলাচলে গিয়া[৪] তাঁহার নিকট থাকিয়া যান।[৫] সেই সময় শংকরকে পাশে রাখিয়া একদিন মহাপ্রভু স্বরূপকে বলিলেন[৬] :

যদি হন দামোদর কনিষ্ঠ শংকর।
তথাপি আমার·········

এই বলিয়া তিনি দামোদরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দামোদর সানন্দে মহাপ্রভুকে তাঁহার উক্তি সমাপ্ত করিবার জন্য অনুরোধ জানাইলেন। তখন

প্রভু কহে দামোদরে স্নেহ সে সাদর।
সাহজিক প্রেমপাত্র আমার শংকর॥

এই বলিয়া তিনি স্বয়ং স্বরূপ ও গোবিন্দ উভয়ের উপরই তাঁহার প্রিয় শংকরের ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। মহাপ্রভু নিজেই বলিয়াছেন যে দামোদরের প্রতি তাঁহার সাদর স্নেহ ও 'সগৌরব প্রীতি' থাকিলেও শংকরের প্রতি কিন্তু তাঁহার ছিল "বিশুদ্ধ প্রেম।"[৭]

নীলাচলে থাকিয়া শংকর-পণ্ডিত প্রথম হইতে একেবারে মহাপ্রভুর তিরোভাব-কাল পর্যন্ত তাঁহার সেবা করিয়া গিয়াছেন। উৎসবাদি উপলক্ষে ভোজনকালে তাঁহাকে প্রায়ই স্বরূপ, জগদানন্দ ও কাশীশ্বরাদির সহিত পরিবেষণ-কার্যে নিযুক্ত দেখা যাইত।[৮] মধ্যে মধ্যে তিনি মহাপ্রভুকে ঘরভাতে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন।[৯] মহাপ্রভুর

---

(১) দ্র.—দামোদর-পণ্ডিত (২) চৈ. চ.—১।১০, পৃ. ৫৪ ; শ্রীচৈ. চ.—৪।১।৪, ৪।১৭।১৮ (৩) গৌ. ত.—পৃ. ১৬২ (৪) চৈ. চ.—২।১১, পৃ. ১৫৩ ; বৃন্দাবন লিখিয়াছেন যে শংকর ও দামোদর একত্রেই নীলাচলে যান, কিন্তু তাহা ঠিক নহে। দ্র.—দামোদর-পণ্ডিত (৫) চৈ. ভা.—৮।৫৮ ; চৈ. চ.—২।১, পৃ. ৮৮ (৬) চৈ. কৌ.—২৫৭-৫৮ (৭) চৈ. চ. ; চৈ. ভা.—৮।৫৮ ; চৈ. চ.—২।১১, পৃ. ১৫৫ (৮) চৈ. চ.—২।১২, পৃ. ১৬১ ; ৩।৭, পৃ. ৩২৪ ; ৩।১১, পৃ. ৩৪০ (৯) ঐ—৩।১০, পৃ. ৩৩৮

শেষজীবনে শংকরকে উৎকণ্ঠিতভাবে তাঁহার জন্য ব্যস্ত থাকিতে দেখা যায়। রাত্রিকালে মহাপ্রভু ভাবাবেশে উন্মত্ত হইয়া ছটফট করিতেন। স্বরূপ ও গোবিন্দ গম্ভীরার দরজায় শুইয়া থাকিবার জন্য তিনি আর বাহিরে যাইতে পারিতেন না। কিন্তু একদিন দেখা গেল বাহির হইতে না পারায় তিনি গম্ভীরার গাত্রে মুখমণ্ডল ঘর্ষণ করিতে করিতে তাহা একেবারে ফুলাইয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহার প্রলাপোক্তি ও গোঙানি শুনিয়া গোবিন্দ ও স্বরূপ আলো জ্বালিয়া দেখিলেন যে তাঁহার মুখ ক্ষতবিক্ষত হইয়া দরবিগলিত ধারায় রক্ত পড়িতেছে। পরদিন শংকর-পণ্ডিত আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। ভক্তবৃন্দের সহায়তায় মহাপ্রভুর আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া তিনি তদবধি রাত্রিকালে তাঁহার পদতলে শয্যা-গ্রহণ করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু পাদ-প্রসারণ করিলেই তাঁহার গায়ে লাগিত। অমনি তিনি সচকিত হইয়া তাঁহার প্রতি যত্নবান হইতেন। সেই জন্য তখন হইতে 'প্রভু পাদোপাধান' বলিয়া তাঁহার নাম প্রচারিত হইয়া গিয়াছিল।[১০] মহাপ্রভুর তিরোভাবের পর শ্রীনিবাস-আচার্য নীলাচলে আসিয়া গোবিন্দ এবং শংকরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।[১১]

(১০) দ্র.—গৌ. প্র. (কৃষ্ণদাস)—পৃ. ৫ (১১) ভ. র.—৩।১৬৮; 'বৈষ্ণবাচারদর্পণ'-মতে (পৃ.৩৪০) তাঁহার বাস ছিল শাহাজাদপুরে।

পরমেশ্বর-মোদক

'চৈতন্যচরিতামৃত' হইতে জানা যায়[১] যে নদীয়াতে পরমেশ্বর নামক এক ব্যক্তি মোদক বিক্রয় করিয়া জীবিকা-নির্বাহ করিতেন। গৌরাঙ্গপ্রভু বাল্যকালে তাঁহার বাড়ীতে গিয়া হাজির হইলে 'দুগ্ধখণ্ড মোদক দেন প্রভু তাহা খান'। ফলে উভয়ের মধ্যে একটি অবিচ্ছেদ্য স্নেহসম্পর্ক গড়িয়া উঠে। শ্রীবাস, আচার্যরত্ন ও শিবানন্দ প্রভৃতি ভক্ত যেইবার তাঁহাদিগের স্ব স্ব পত্নীসহ নীলাচলে গমন করেন এবং শিবানন্দ-সেন তাঁহার ভাগিনা শ্রীকান্ত-সেন ও স্বীয় পুত্রত্রয়কে সঙ্গে লইয়া যান, সেইবার পরমেশ্বর-মোদকও মুকুন্দার মাতাকে সঙ্গে লইয়া চৈতন্য-সন্দর্শনে গিয়াছিলেন। তিনি মহাপ্রভুর নিকট গিয়া দণ্ডবৎ করিলে মহাপ্রভু বলিলেন, "পরমেশ্বর কুশলে হও ভাল হৈল আইলা।" কিন্তু তিনি যখন জানাইলেন যে মুকুন্দার মাতাও সঙ্গে অসিয়াছেন, তখন

মুকুন্দার মাতার নাম শুনি প্রভু সংকোচ হৈলা।
তথাপি তাহার প্রীতে কিছু না বলিলা॥
প্রশ্রয় পাগল শুদ্ধ বৈদগ্ধ্য না জানে।
অন্তরে সুখী হৈল প্রভু তার সেই গুণে॥

---

(১) অ১২, পৃ. ৪৪২

জগন্নাথ-আচার্য

'চৈতন্যচরিতামৃত'-কার জগন্নাথ-আচার্যকে মূলস্কন্ধ-শাখাভুক্ত করিয়া বলিতেছেন যে তিনি চৈতন্যের 'প্রিয়দাস' ছিলেন এবং তাঁহারই আজ্ঞায় তিনি 'গঙ্গাবাস' করিয়াছিলেন। 'অদ্বৈতবিলাস' হইতে ইহার সমর্থন পাওয়া যায়।[১] জয়ানন্দের গ্রন্থে মহাপ্রভুর প্রথমবার নীলাচল-গমনপথে সম্ভবত গঙ্গাতীরবর্তী এই জগন্নাথ-আচার্যের গৃহের কথাই উল্লেখিত হইয়াছে। কবিকর্ণপূর বলিতেছেন[২]:

আচার্য্যঃ শ্রীজগন্নাথো গঙ্গাদাসঃ প্রভুপ্রিয়ঃ।
আসীন্নিধুবনে প্রাগ্‌ যো দুর্ব্বাসা গোপিকাপ্রিয়ঃ॥

---

(১) অ. বি.—পৃ. ২ (২) গৌ. দী—১১১; বৈষ্ণবাচারদর্পণ-মতে (পৃ. ৩৩২) দুর্বাসার অবতার এই জগন্নাথ-আচার্য শ্রীহট্টবাসী ছিলেন।

গরুড়-পণ্ডিত

গৌড়বাসী[১] গোবিন্দ ও গরুড় দুই[২] ভ্রাতা ছিলেন। গরুড়-পণ্ডিত সম্বন্ধে 'চৈতন্য-ভাগবত' ও 'চৈতন্যচরিতামৃত' উভয় গ্রন্থেই বর্ণিত আছে[৩] যে নামের প্রভাবে সর্পবিষও তাঁহার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। গরুড় মূলস্কন্ধ-শাখাভুক্ত[৪] ছিলেন এবং তিনি গৌরাঙ্গ অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠও ছিলেন।[৫] নবদ্বীপ-লীলার প্রায় প্রতিটি বিশেষ ঘটনার সহিত তিনি যুক্ত হইয়াছিলেন[৬] এবং তিনি নীলাচলে গিয়াও মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিতেন।[৭] পৃথক এই গরুড়কে কেহ কেহ 'গরুড়াই' নামে অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু গরুড়াবধূত নামে যে ব্যক্তিটিকে মধ্যে মধ্যে দেখা যায়[৮] তিনি সম্ভবত পৃথক ব্যক্তি, একজন সন্ন্যাসী। দেবকীনন্দন তাঁহাকে সন্ন্যাসী-বৃন্দের মধ্যেই উল্লেখিত করিয়াছেন। 'গৌরচরিত্রচিন্তামণি'-গ্রন্থে[৯] গরুড়-পণ্ডিত এবং গরুড়াবধূতকে পৃথক ব্যক্তি ধরা হইয়াছে, যথা—'জয় জয় সুলোচন, সত্যরাজ, পণ্ডিত গরুড়, গরুড়াবধূত, দেবানন্দ আচার্য', ইত্যাদি।

---

(১) গৌ. দী.—১১৬ (২) বৈ. ব. (বৃ.)—পৃ. ১২ ; গৌ. দী. (বলরাম)—পৃ. ১৬ (৩) চৈ. ভা.—৩।৯, পৃ. ৩২৭ ; চৈ. চ.—১।১০, পৃ. ৫২ (৪) ঐ—১।১০, পৃ. ৫২ ; বৈ. দ.-মতে (পৃ. ৩৫২) ইঁহার নিবাস চৌটাগ্রামে। (৫) চৈ. ভা.—১।২, পৃ. ১২ (৬) ঐ—২।৮, পৃ. ১৩৯ ; ২।১৩, পৃ. ১৭১, ১৭৪ ; ২।২৩, পৃ. ২২৫ ; চৈ. ম. (জ.)—ন. খ., পৃ. ৪৭ ; বৈ. ব., পৃ. ৭২ (৭) চৈ. ভা.—৩।৯, পৃ. ৩২৭ ; চৈ. ম.—৩।১০, পৃ. ৩৩৪ ; শ্রীচৈ. চ.—৪।১৭।১১ ; দ্র.—চৈ. চন্দ্র. পৃ. ১২৭ (৮) ভ. মা.—পৃ. ২৮ ; চৈ. ম. (জ.)—বৈ. ব., পৃ. ৭২ ; বৈ. ব. (জে.)—পৃ. ২ (৯) পৃ. ৭

কেশব-ভারতী

গৌরাঙ্গ আবির্ভাবের পূর্বেই তাঁহার যে গুরু-পরিবার আবির্ভূত হইয়াছিলেন[১], তন্মধ্যে কেশব-ভারতী ছিলেন অন্যতম। একমাত্র 'প্রেমবিলাসে'র সন্দিগ্ধ ত্রয়োবিংশ বিলাসের[২] বর্ণনা ব্যতিরেকে তাঁহার বংশ ববরণাদি সম্বন্ধে অন্য কোন প্রাচীন গ্রন্থকার কিছুই লিপিবদ্ধ করেন নাই। তবে তিনি যে ভারতী-সম্প্রদায়ে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, তাহা তৎকালীন সন্ন্যাসী-সমাজের মধ্যে বিশেষভাবে গণ্য হইলেও[৩] তাহা যে উত্তম সম্প্রদায় নহে, তাহা 'চৈতন্যচরিতামৃত' ও 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক' হইতে বুঝিতে পারা যায়।[৪] কাশীতে শেষপর্যন্ত প্রকাশানন্দ এই সম্প্রদায়ের মর্যাদা স্বীকার করিলেও তৎপূর্বে শ্রীক্ষেত্রে সার্বভৌম-ভট্টাচার্য ইহাকে কৌলীন্য সম্মান দান করেন নাই।

সম্ভবত মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে কেশব-ভারতী তৎকালীন বিখ্যাত সন্ন্যাসী-বৃন্দের[৫] সহিত পর্যটনাদি করিয়াছিলেন। মুরারি-গুপ্ত ও লোচনদাসাদি কেহ কেহ তাঁহাকে 'ন্যাসী-শ্রেষ্ঠ' বা 'ন্যাসীবর' ইত্যাদি আখ্যা প্রদান করিলেও তৎকালে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বসূচক কোনও ক্রিয়াকলাপের পরিচয় পাওয়া যায় না।[৬] গৌরাঙ্গ-আবির্ভাবের বহুকাল পরে যোড়শ শতকের প্রথম দশকের একেবারে শেষের দিকে তাঁহার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে। আচার্যরত্নের গৃহে গৌরাঙ্গের অভিনয়ের অব্যবহিত পরেই কেশব-ভারতী নদীয়ায় হাজির হন। 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক'[৭] ছাড়া অন্য কোনও গ্রন্থে উক্তপ্রকার কাল নির্দেশ না থাকিলেও তিনি যে ঐ রকম কোন সময়ে অর্থাৎ গৌরাঙ্গের সন্ন্যাসগ্রহণের অল্পকাল পূর্বেই নদীয়ায় আসিয়াছিলেন, এ সম্বন্ধে প্রায় সমুহ চৈতন্যচরিতগ্রন্থ[৮] একমত। সেই সময়ে গৌরাঙ্গের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিলে তিনি তৎকর্তৃক নিমন্ত্রিত হন এবং তাঁহার গৃহে ভিক্ষানির্বাহ করেন। সম্ভবত সেই কালেই কেশব-ভারতী

(১) চৈ.চ.—১।১৩, পৃ. ৬০ (২) গ্রন্থ-মতে (পৃ. ২০) তিনি কুলিয়া-গ্রামবাসী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ কালীনাথ-আচার্যের পুত্র ছিলেন। তিনি মাধবেন্দ্র-পুরীর নিকট সন্ন্যাস লইয়া কেশব-ভারতী নাম প্রাপ্ত হন। ঈশ্বর-পুরীর সহিত তিনি অভিন্নাত্মা ছিলেন। (৩) চৈ. চ.—১।৭, পৃ. ৪৩ (৪) চৈ. চ.—২।৬, পৃ. ১১১; চৈ. না.—৬।৩৭ (৫) চৈ. চ.—১।১৩, পৃ. ৬০; বা. প.—পৃ. ২১; গৌ. ত., পৃ. ২৫১; বৈ. দি.—পৃ. ৫৫ (৬) কেবল জয়ানন্দ (পৃ. ২০) জানান যে কেশব-ভারতী বিশ্বরূপের অগ্রজ বিশ্বরূপকেও দীক্ষাদান করেন। কিন্তু প্রেমবিলাস (২৩শ. বি., পৃ. ২৫২)-মতে বিশ্বরূপের দীক্ষাগুরু ছিলেন ঈশ্বরপুরী। (৭) ৩।৮০; চৈ. চ. ম.—১১।৪৩-৪৪ (৮) চৈ. চ.—২।১৭, পৃ. ৭৭; বা. প.—পৃ. ২১; শ্রীচৈ. চ.—২।১৮।৭; চৈ. ম.—ম. খ., পৃ. ৬; ম. খ, পৃ. ১৪১; গৌ. ম.—পৃ. ১৫-২২; অ. বি.—পৃ. ৩১; গৌ. ম.—পৃ. ১৪

গৌরচন্দ্রকে ভক্তিতত্ত্ব শ্রবণ করান[৯] এবং গৌরাঙ্গ তাঁহার নিকট সন্ন্যাস-গ্রহণের প্রস্তাব করিয়া বসেন।[১০] ভারতী শেষ পর্যন্ত সম্মতি প্রদান করিয়া কণ্টকনগরীতে চলিয়া যান। তৎকালে তিনি গঙ্গা-সন্নিধানে কণ্টকনগরীতেই বাস করিতেছিলেন।[১১]

অল্পকাল পরেই মাঘমাসের সংক্রমণ উত্তরায়ণ দিবসের পূর্বদিন গৌরাঙ্গ কণ্টকনগরে পৌঁছাইলেন। তাঁহার যৌবন-শ্রী ও রূপলাবণ্য দেখিয়া কেশব-ভারতী প্রথমে দীক্ষাদান করতে রাজী হন নাই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁহার দৃঢ়তায় চমৎকৃত হইয়া তিনি তাঁহাকে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত করেন[১২] এবং তাঁহার সন্ন্যাস-আশ্রমের নামকরণ করেন 'শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য'। 'চৈতন্যভাগবত'-মতে স্বয়ং গৌরচন্দ্রই কেশব-ভারতীর কর্ণে দীক্ষামন্ত্রটি বলিয়া দিয়াছিলেন।[১৩]

দীক্ষাদান করিবার পর ভারতী চৈতন্যকে সেই রাত্রিটিও কণ্টকনগরে অবস্থান করিতে বলিলেন এবং রাত্রিকালে গুরুশিষ্য একত্রে নর্তন-কীর্তন করিলেন। পরদিন কেশব-ভারতী চৈতন্যের সহিত কিছুদূর যাত্রা করিয়াছিলেন।[১৪] তাহার পরে গ্রন্থকার-গণের চৈতন্যভাবব্যাকুলতা ও রাঢ়ভ্রমণ-বর্ণনার মধ্যে গুরু কেশব-ভারতীর প্রসঙ্গ একেবারেই চাপা পড়িয়া গিয়াছে। সম্ভবত কণ্টকনগরেই কেশব-ভারতীর তিরোভাব ঘটে। পরবর্তিকালে গদাধরদাস 'ভারতীর স্থানে' আসিয়া গৌরাঙ্গ-বিগ্রহ স্থাপন করেন।[১৫]

(৯) চৈ. ভা.—৩।১০, পৃ. ৩৩৪ (১০) চৈ. চ.—১।১১, পৃ. ৭৭ (১১) ভ. র.—২।৩২১-২৮ (১২) চৈ. ভা.—২।২৬; পৃ. ২৪৩ ; গৌ. স.—পৃ. ৫৭ ; চৈ. ম.—পৃ. ৩৭ (১৩) গৌ. স.- এবং চৈ. ম.- গ্রন্থে ইহার সমর্থন পাওয়া যায়। (১৪) চৈ. ভা.—৩।১, পৃ. ২৪৭ (১৫) দ্র.—প. বি.—৩য়. বি., পৃ. ৬৩-৬৫ ; ৯ম. বি., পৃ. ১৪১

দ্বিতীয় পর্যায়

নীলাচল

অচ্যুতানন্দ

বৃন্দাবনদাস তাঁহার 'চৈতন্যভাগবতে'[১] এবং সম্ভবত তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া কৃষ্ণদাস-কবিরাজ তাঁহার 'চৈতন্যচরিতামৃতে'[২] উল্লেখ করিয়াছেন যে অদ্বৈতপ্রভু কোন সন্ন্যাসীর প্রশ্নের উত্তরে কেশব-ভারতীকে গৌরাঙ্গের গুরু বলিয়া অভিহিত করায় পঞ্চবর্ষবয়স্ক অচ্যুতানন্দ প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিলেন যে জগৎগুরু চৈতন্যের গুরু থাকিতে পারেনা। জয়ানন্দ ও বৃন্দাবনদাস উভয়েই বলিয়াছেন যে মথুরাগমনেচ্ছু মহাপ্রভু রামকেলি হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে অচ্যুতানন্দ এইপ্রকার উক্তি করিয়াছিলেন। সুতরাং ইহা ১৫১৪ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা। জয়ানন্দও তখন তাঁহাকে 'পাঁচ বৎসরের ছাওয়াল' বলিয়াছেন।[৩] গৌরাঙ্গ-কেশবভারতীর প্রসঙ্গ যখন উত্থাপিত হইয়াছে, তখন ইহা অন্ততপক্ষে ১৫১০ খ্রী.-এর পূর্ববর্তী ঘটনা হইতেই পারেনা। তৎকালে অচ্যুতানন্দের বয়স পঞ্চবর্ষ হইলে তাঁহার জন্মকাল কিছুতেই ১৫০৫ খ্রী.-এর পূর্ববর্তী হইতে পারেনা। আবার 'অদ্বৈতপ্রকাশ'-কারের বিবরণ অনুযায়ী অদ্বৈতের জ্যেষ্ঠপুত্র অচ্যুতানন্দের জন্মকাল ১৪৯২ খ্রী. ধরিলে উক্ত ঘটনাকালে তাঁহার বয়স অষ্টাদশ কিংবা দ্বাবিংশ বর্ষে আসিয়া দাঁড়ায়। এই বয়সে উক্ত প্রকার উক্তির গুরুত্ব থাকিলেও বিশেষত্ব থাকেনা। কিন্তু গ্রন্থকার বলেন যে পঞ্চবর্ষ বয়সে অচ্যুতের হাতেখড়ি উৎসবের দিনই তিনি শান্তিপুরে পৌঁছান এবং তখন তিনিও পঞ্চবর্ষবয়স্ক। সুতরাং এই বিবরণকে সত্য ধরিলে বলিতে হয় যে হয়ত বৃন্দাবনদাসই কোনও প্রকারে ভুল করিয়া থাকিবেন। 'অদ্বৈতমঙ্গল'-মতে[৪] গঙ্গায় তপস্যারত অদ্বৈতপ্রভু উজানবাহী দুইটি তুলসী মঞ্জরীর মধ্যে একটি শচীদেবী এবং অপরটি সীতাদেবীকে ভক্ষণ করিতে দিলে গৌরাঙ্গ ও অচ্যুতের জন্ম হয়। সুতরাং গ্রন্থমতে গৌরাঙ্গ ও অচ্যুত সমবয়স্ক। ইহা হইতেও বৃন্দাবনের উক্তি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়না। কেশব-ভারতীর স্থলে ঈশ্বর-পুরী, কিংবা অচ্যুতানন্দের স্থলে অদ্বৈতের অন্য কোন পুত্রও হইতে পারেন। প্রাপ্তবয়স্ক অচ্যুতানন্দেরও এইপ্রকার উক্তি উল্লেখ-যোগ্য হইতে পারে। 'চৈতন্যভাগবত'- অনুযায়ী অচ্যুতানন্দকে গৌরাঙ্গের নবদ্বীপলীলার সহিত যুক্ত দেখা যায়। কিন্তু অচ্যুতের জন্ম ১৫০৫ বা ১৫০৭ খ্রী. ধরিলে তাহা

(১) ৩।৪, পৃ. ২৮৬-৮৭ (২) ১।১২, পৃ. ৫৭; তু.—অ. বি., পৃ. ১ (৩) পৃ. ১৪২ (৪) পৃ. ৫১-৫৩

অসম্ভব হইয়া উঠে। এই সকল কারণে অচ্যুতানন্দের জন্মকাল সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়না। বড়জোর এইটুকু বলিতে পারা যায় যে তিনি মহাপ্রভু অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন। কবিরাজ-গোস্বামী সম্ভবত এইস্থলে বৃন্দাবনের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া থাকিবেন।

'অদ্বৈতপ্রকাশ'-গ্রন্থ অনুযায়ী[৫] অচ্যুতেরা ছয় ভ্রাতা ছিলেন—অচ্যুতানন্দ, কৃষ্ণদাস, গোপালদাস, বলরাম ও যমজ সন্তান স্বরূপ-জগদীশ। গ্রন্থখানির সমস্ত কিছু প্রামাণিক না হইলেও অদ্বৈতপুত্রের সংখ্যা বা নাম সম্বন্ধে এই বিবরণ অসত্য না হইতেও পারে। 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে'[৬] বিষ্ণুদাস নামক অদ্বৈতের এক পুত্রকে পিতার সহিত নীলাচলে যাইতে দেখা যায়। কিন্তু অন্য কোনও গ্রন্থ হইতে অদ্বৈতপুত্র হিসাবে এই বিষ্ণুদাসের নাম সমর্থিত হয়না। এইস্থলে সম্ভবত কৃষ্ণমিশ্র বা কৃষ্ণদাসই বিষ্ণুদাসে পরিণত হইয়াছেন। তবে বিষ্ণুদাস-আচার্য নামে অদ্বৈতের একজন শিষ্য থাকা অসম্ভব না হইতেও পারে।[৭]

'অদ্বৈতপ্রকাশ'-মতে উপরোক্ত ছয় পুত্রই ছিলেন সীতাদেবীর গর্ভজাত সন্তান। কিন্তু দ্বিতীয় পুত্র কৃষ্ণদাসের জন্মকালে অদ্বৈত-পত্নী শ্রীদেবীর গর্ভজাত একটি নবপ্রসূত সন্তানের মৃত্যু ঘটায় সীতাদেবী স্বামীর নিকট মত গ্রহণ করিয়া স্বীয় ভগিনীর দুঃখাপনোদনের জন্য কৃষ্ণদাসকে শ্রীদেবীর হস্তেই সমর্পণ করেন এবং তদবধি এই সন্তান শ্রীদেবীর বলিয়াই সুপরিচিত হন। সম্ভবত এই কারণেই 'অদ্বৈতমঙ্গলে'[৮] সীতাদেবীর পঞ্চপুত্রের মধ্যে বলরামকে দ্বিতীয় বলিয়া ধরা হইয়াছে এবং কৃষ্ণমিশ্রকে শ্রী-ঠাকুরাণীর পুত্ররূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। 'প্রেমবিলাসে'র পরবর্তী যোজনায়[৯] অদ্বৈতের ছয়পুত্রের মধ্যে অচ্যুতকেই শ্রীদেবীর গর্ভজাত এবং বাকি পাঁচজনকে সীতাদেবীর মোট 'পঞ্চজন' পুত্ররূপে বর্ণিত করা হইয়াছে। পরবর্তী-কালের 'সীতাচরিত্র'-গ্রন্থে[১০] আবার স্বরূপ ছাড়া উপরোক্ত অন্য পাঁচজনকে তাঁহার 'পঞ্চপুত্র'-রূপে গ্রহণ করা হইয়াছে; এবং এই গ্রন্থের অন্য একটি সংস্করণ 'সীতাগুণকদম্বে'ও[১১] সীতাদেবীর ছয় পুত্রের কথা বলা হইয়াছে—প্রথম অচ্যুতানন্দ, দ্বিতীয় কৃষ্ণমিশ্র, তৃতীয় গোপাল, চতুর্থ জগদীশ, পঞ্চম বলরাম ও ষষ্ঠ রূপসখা। স্বরূপই যে রূপসখায় পরিণত হইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। এদিকে 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র অদ্বৈতশাখা-বর্ণনায় কিন্তু অদ্বৈতপুত্র হিসাবে স্বরূপসহ উক্ত ছয় পুত্রের কথাই উল্লেখিত হইয়াছে। সেইস্থলে তাঁহাদের মাতৃনাম নাই। অথচ, 'অদ্বৈতমঙ্গল', 'প্রেমবিলাস' এবং 'সীতাচরিত্র' এই তিনটি গ্রন্থে সীতাদেবীর পুত্রদিগের সংখ্যার হিসাবে 'পঞ্চ' কথাটির ব্যবহার করা হইয়াছে। এক্ষেত্রে 'অদ্বৈতপ্রকাশ'-কার যে বিবরণ দিয়াছেন তাহাই উক্ত

(৫) ১১শ. অ., পৃ. ৪৫-৪৭ ; ১৫শ. অ., পৃ. ৬০-৬১ (৬) ১০।১৭ (৭) অ. প্র.—১০ম. অ., পৃ. ৪০ (৮) পৃ. ৫৭ (৯) ২৪শ. বি., পৃ. ২৩৮-৩৯, ২৫৯ (১০) পৃ. ১-২ (১১) পৃ. ১৭

সমস্যার সমাধান করে। সুতরাং তৎপ্রণেতা শ্রীদেবী এবং কৃষ্ণদাসের বর্ণনাকেই নির্ভরযোগ্য বা সমীচীন বলিয়া ধরিতে হয়। অন্যান্য বৈষ্ণবগ্রন্থ হইতেও ধারণা জন্মে যে সীতাদেবীর পুত্র হিসাবেই অচ্যুতানন্দ মাতৃসমীপে বসবাস করিতেন।

'অদ্বৈতপ্রকাশ'-অনুযায়ী অদ্বৈতাচার্যের পুত্র কৃষ্ণদাস ১৪৯৭ খ্রী.-এ জন্মগ্রহণ করেন তারপর অদ্বৈতপ্রভুর দ্বিতীয় পত্নী শ্রী-ঠাকুরাণীর গর্ভে একটি পুত্রসন্তান জন্মলাভ করিয়া জন্মমুহূর্তেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। ১৫০০ খ্রী.-এ সীতাদেবীর গর্ভে তৃতীয় পুত্র জন্মলাভ করেন। ইঁহার নাম রাখা হইয়াছিল গোপালদাস। সীতামাতার চতুর্থ পুত্র বলরামের জন্ম হয় ১৫০৪ খৃ.-এ এবং ১৫০৮ খৃ.-এ স্বরূপ ও জগদীশ নামে তাঁহার দুইটি যমজ-সন্তানের জন্ম হয়। কিন্তু ঠিক চারি বৎসর অন্তর সন্তানদিগের জন্মকাল নিরূপিত হওয়ায় এই তারিখগুলি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না।

অদ্বৈতপ্রভুর দ্বিতীয়পুত্র কৃষ্ণদাসও শৈশবাবধি গৌরাঙ্গভক্ত হইয়া উঠেন। গৌরাঙ্গ তাঁহার নাম 'কৃষ্ণমিশ্র'[১২] রাখায় তিনি সেই নামেই সমধিক পরিচিত হন। 'অদ্বৈত-প্রকাশে'র বর্ণনা[১৩] অনুযায়ী গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দের প্রথমবার নীলাচল-গমনকালে কৃষ্ণমিশ্র অদ্বৈতপ্রভুর সহিত শ্রীক্ষেত্রে গমন করিতে চাহিলে সীতামাতা অচ্যুতানন্দের কুমার-বৈরাগ্যের[১৪] কথা স্মরণ করিয়া বিচলিত হন। তিনি তাঁহাকে কিছুতেই যাইতে দিলেন না কিন্তু তাহাতে পাছে পুত্র কৃষ্ণবিমুখ হইয়া পড়েন, তজ্জন্য তিনি কৃষ্ণমিশ্র এবং তৎপত্নী বিজয়াকে[১৫] কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত করেন। তদবধি এই সংসারাশ্রমী দম্পতী মাতৃআজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া মাতৃসমীপে বাস করিতে থাকেন।[১৬] অদ্বৈতপ্রভুর তৃতীয় পুত্র গোপালদাসও বাল্যাবধি গৌরাঙ্গানুরাগী ছিলেন।[১৭] একবার নীলাচলে গুণ্ডিচা-মার্জনকালে মহাপ্রভুর আজ্ঞাক্রমে নৃত্য করিতে করিতে তিনি ভাবাবেশে চৈতন্য হারাইয়া ফেলিলে মহাপ্রভুর হস্তক্ষেপে শেষ পর্যন্ত তাঁহার চৈতন্য-সঞ্চার হয়।[১৮]

কিন্তু অদ্বৈত-তনয়দিগের মধ্যে অচ্যুতানন্দই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। নবদ্বীপলীলাকালে গৌরাঙ্গ মধ্যে মধ্যে অদ্বৈত-গৃহে উপস্থিত হইতেন। সেই সময় গৌরাঙ্গের

(১২) অ.প্র.-মতে (১২শ. অ., পৃ.৫৮-৫৯) একবার কৃষ্ণমিশ্র বিষজরের জন্য সঞ্চিত পক্ক কদলী ভক্ষণ করিয়া মাতা-কর্তৃক ভর্ৎসিত হইলে বিষজর দূর হয় এবং পরে তাঁহার উদ্গারে কদলী গন্ধ পাইয়া সকলে বুঝিয়াছিলেন যে কৃষ্ণমিশ্র গৌরাঙ্গ-মন্ত্রের দ্বারা নিবেদন করিয়া যে-কদলী ভক্ষণ করিয়াছিলেন, তাহা গৌরাঙ্গ সত্যসত্যই গ্রহণ করিয়াছিলেন। (১৩) ১৫ শ. অ., পৃ. ৬৫ (১৪) দ্র.—বৈ. ব. (বৃ.)—পৃ.১ (১৫)—জননীকে (?) (১৬) অ. প্র.—১৫শ. অ., পৃ.৬৫ ; ১৬ শ. অ., পৃ. ৭২ (১৭) অ. প্র.-মতে (১২ শ. অ., পৃ. ৫০) তিনি আরাধনের সময়েই সজ্জিত দ্রব্যসম্ভার স্পর্শ না করিয়া গৌরাঙ্গ-চরণ স্পর্শ করিয়াছিলেন। (১৮) চৈ.চ.—১।১২, পৃ ৫৭ ; ২।১২, পৃ. ১৬৯ ; অ. প্র.—১৩শ. অ., পৃ. ৭৯

প্রতি স্বীয় পিতামাতা এবং হরিদাসাদি অন্যান্য অদ্বৈত-পার্শ্বচরবৃন্দের স্নেহ-শ্রদ্ধামিশ্রিত আচরণ অচ্যুতানন্দকে যথেষ্ট প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। সম্ভবত তিনি সেইসময় নিমাই-পণ্ডিতের নিকট কিছু কিছু বিদ্যাভ্যাস ও শিক্ষাগ্রহণ করিয়া অতি অল্পকালের মধ্যে সুশিক্ষিত হইয়া উঠেন। গৌরাঙ্গ মধ্যে মধ্যে অদ্বৈতগৃহে লীলা আরম্ভ করিতেন[১৯] এবং অচ্যুতানন্দ তাঁহার ভাবগতি দেখিয়া ক্রমাগত সংসারবিরাগী হইয়া পড়েন। তাঁহার ভক্তিভাব প্রত্যক্ষ করিয়া তৎপ্রতি গৌরাঙ্গেরও স্নেহ-দৃষ্টি উত্তরোত্তর বর্ধিত হইতে থাকে।[২০] তখন তাঁহার জীবন যেন 'অচ্যুতানন্দময়' হইয়া উঠিয়াছিল।

মহাপ্রভু নীলাচলে চলিয়া গেলে অচ্যুতানন্দও কিছুকাল পরে তাঁহার নিকট চলিয়া যান।[২১] সম্ভবত ভাগবত-গ্রন্থের প্রতি তিনি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন[২২] এবং গদাধর-পণ্ডিত ভাগবত-পাঠ করিয়া যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি গদাধরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।[২৩] ইহাছাড়া অচ্যুতানন্দ নৃত্যপটুও ছিলেন। তাই, রথযাত্রাদি উপলক্ষে

শান্তিপুরের আচার্যের এক সম্প্রদায়।
অচ্যুতানন্দ নাচে তাঁহা আর সব গায়॥২৪

মহাপ্রভুর তিরোভাবের পর অচ্যুতানন্দ শান্তিপুরে ফিরিয়া তথায় বাস করিতে থাকেন[২৫] এবং অদ্বৈতাচার্যের তিরোভাবের পরও তিনি সীতামাতার নিকট অবস্থান

(১৯) চৈ. ভা.—২।১৯, পৃ. ১৯৮-৯৯ (২০) অদ্বৈতপ্রকাশাদি গ্রন্থে এই সম্বন্ধে একটি গল্প লিখিত হইয়াছে যে গৌরাঙ্গের নিমিত্ত রক্ষিত দুগ্ধ পান করিয়া ফেলায় একবার সীতাদেবী অচ্যুতানন্দকে চাপড় মারিয়াছিলেন; কিন্তু পরে গৌরাঙ্গ স্বীয় অঙ্গে সেই চাপড়ের দাগ দেখাইয়া অচ্যুতের সহিত স্বীয় অভিন্নত্ব প্রতিপাদন করিয়াছিলেন। আবার 'চৈতন্যভাগবত'-কার (৩।১, পৃ. ২৫২) লিখিতেছেন যে গৌরাঙ্গ কখনও কখনও অচ্যুতের মুখে অপ্রত্যাশিত তত্ত্বকথা শুনিয়া মুগ্ধ হইতেন এবং তিনি তাঁহাকে পতৃ-সম্বোধনে ভূষিত করিতেন। 'অদ্বৈতপ্রকাশ'-মতে (২০ শ. অ, পৃ. ৯০-৯১) গৌরীদাস-পণ্ডিতের গৌর-নিতাই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠাকালে অচ্যুতানন্দ পিতৃ-আজ্ঞা লইয়া অম্বিকায় গিয়া সেই অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করেন। (২১) চৈ.চ.—১।১০. পৃ. ৫৪; শ্রীচৈ.চ.—৪।১৭।২২; চৈ. ভা.—৩।৯, পৃ. ৩২৮ (২২) অ.প্র.-মতে (১৯শ. অ., পৃ.৮৫) মধ্যে মধ্যে মহাপ্রভুর সহিত 'ভাগবতের ভক্তিটীকা' লইয়া তাঁহার আলোচনা চলিত। (২৩) চৈ.ভা.—৩।৪, পৃ.২৮৮; র. শি.—পৃ. ২৩৪; গৌ. দী.—৮৭ (২৪) চৈ.চ.—২।১৩, পৃ. ১৬৪; ৩।১০, পৃ. ৩৩৫ (২৫) 'অদ্বৈত প্রকাশ'-মতে (২১ শ. অ., পৃ. ৯৯) সেইসময় অদ্বৈতাচার্য একদিন অচ্যুতানন্দের সম্মতি গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণমিশ্রের উপর গৃহদেবতা মদনগোপালের সেবাপূজার ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হন। অদ্বৈতমঙ্গল-মতে (পৃ. ৫৭) বলরামের উপরেও ভাগবত-সেবার ভার সমর্পিত হইয়াছিল। সেই সময় রঘুনাথ ও দোলগোবিন্দ নামে কৃষ্ণমিশ্রের দুইজন পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পুত্রদ্বয়ের মধ্যে রঘুনাথ ছিলেন জ্যেষ্ঠ। উভয়েই ভক্তিমান ছিলেন। তাঁহারা ভবিষ্যতে বিগ্রহের যথাবিধি সেবাপূজায় যত্নবান হইবেন এইরূপ চিন্তা করিয়া অচ্যুতানন্দ ও সীতাদেবীর সহিত যুক্তিপূর্বক অদ্বৈতপ্রভু একদিন সমারোহ সহকারে কৃষ্ণমিশ্রের উপর সমস্ত ভার অর্পণ করিলেন। অদ্বৈতপ্রকাশের বর্ণনা অনুযায়ী (পৃ.৯৯) আচার্যপুত্র বলরাম ও জগদীশ কিন্তু রুষ্ট হইয়া দ্বিতীয় কৃষ্ণমূর্তি স্থাপন পূর্বক 'আপনার গণ লইয়া মহোৎসব কৈলা।' কিছুদিন পরে নিত্যানন্দের আমন্ত্রণে অদ্বৈতাচার্য খড়দহে পৌঁছাইলে অচ্যুতানন্দ খড়দহে যান এবং তথায় কৃষ্ণকীর্তন করিয়া খ্যাতি অর্জন করেন।

করিতে থাকেন। শ্রীনিবাস-আচার্য শান্তিপুরে আসিয়া সীতাদেবীর নিকট শুনিয়াছিলেন যে মহাপ্রভু-প্রেরিত নাগর ও নন্দিনী প্রভৃতি ভক্ত নিজেদের স্বাতন্ত্র্য প্রচার করিতে থাকিলে সীতামাতা যখন নন্দিনী প্রভৃতিকে পৃথক করিয়া দেন, তখন তিনি জ্যেষ্ঠপুত্র সংসারবিরাগী এই অচ্যুতানন্দকে একমাত্র সহায়রূপে পাইয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিয়াছিলেন। শ্রীনিবাস যদিও গোপালকে সীতাদেবীর যথেষ্ট স্নেহভাজন দেখিতে পাইয়াছিলেন, তৎসত্ত্বেও সীতামাতা পুত্রদের প্রসঙ্গে শ্রীনিবাসকে বলিয়াছিলেন, "পুত্রসঙ্গে বিরোধ করি ঘরে নিদ্রা যাই।"[২৬]

প্রকৃতপক্ষে, জ্যেষ্ঠ অচ্যুতানন্দই অদ্বৈত-সীতাদেবীর প্রাণস্বরূপ ছিলেন, এবং তিনি পিতার মর্যাদাও বিশেষভাবে রক্ষা করিয়া চলিতেন। তাই ভক্ত-সমাজেও অদ্বৈত-পুত্রদিগের মধ্যে তাঁহারই প্রাধান্য ছিল সর্বাধিক। হরিচরণদাস জানাইতেছেন যে 'অদ্বৈতমঙ্গল' রচনায় তাঁহার সমস্ত প্রেরণাই আসিয়াছিল অচ্যুতানন্দের নিকট হইতে।[২৭]

নরোত্তম নীলাচলের পথে শান্তিপুরে পৌঁছাইলে অচ্যুতানন্দ তাঁহাকে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করেন।[২৮] তাহারপর তিনি গদাধরদাস ও নরহরি-সরকার-ঠাকুরের তিরোধান-তিথিতে যোগদান করিয়াছিলেন। এই উৎসব দুইটিতে কৃষ্ণমিশ্র এবং গোপালদাসও অংশগ্রহণ করিয়া নৃত্যনৈপুণ্য প্রদর্শনে ভক্তবৃন্দকে যথেষ্ট আনন্দ দান করিয়াছিলেন।[২৯] পরে নরোত্তম যখন খেতরিতে ষড়্‌বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান আরম্ভ করেন তখন অচ্যুতানন্দ সেই উৎসবে যোগদান করিয়া তাহাকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলেন। গোপালদাসও সেই উৎসবে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। উৎসবান্তে ভক্তবৃন্দ বৃন্দাবন-গমনোন্মুখ জাহ্নবাদেবীর নিকট বিদায় লইতে গেলে

> শ্রীঅচ্যুতানন্দ কহে করিয়া ক্রন্দন।
> পুনঃ না দেখিব ঐছে লয় মোর মন।।[৩০]

তখন তাঁহার দিন ফুরাইয়া আসিয়াছিল।[৩১] বীরচন্দ্র বৃন্দাবন-যাত্রার প্রাক্কালে শান্তিপুরে আসিয়া সম্ভবত আর তাঁহার দর্শনলাভ করিতে পারেন নাই। কৃষ্ণমিশ্রের নিকট সংবর্ধনা লাভ করিয়া তিনি বৃন্দাবন গমন করেন।[৩২] শ্রীনিবাস-আচার্যের বোরাকুলি গ্রামে রাধাবিনোদ-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠাকালে যে মহোৎসব হইয়াছিল, কৃষ্ণমিশ্র তাহাতেও যোগদান করিয়াছিলেন।[৩৩]

---

(২৬) প্রে. বি.—৪র্থ. বি., পৃ.৪৬ (২৭) পৃ ১, ২৭, ৩৩, ৫৩ (২৮) ভ.র.—৮।১২৮-৩১ (২৯) ঐ—৯।৪৫২, ৬১৪, ৭৩২ (৩০) ম. বি.—৮ম. বি., পৃ. ১১১ (৩১) মু. বি.-মতে (পৃ. ৩১৮) বংশী-পৌত্র রামাই কর্তৃক বাঘনাপাড়ায় গোপীনাথের মূর্তিদ্বয় প্রতিষ্ঠাকালে অচ্যুতানন্দ তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। অভিরামলীলামৃত-মতে (পৃ. ৬৭) অদ্বৈতাচার্যের তিরোভাবের পূর্বেই অচ্যুতানন্দের মৃত্যু ঘটে। এই বর্ণনা অবিশ্বাস্য। (৩২) ভ.র.—১০।২৮৬-৮৭ (৩৩) ঐ—১৪।৯৬, ১৩০; রসিকমঙ্গল-গ্রন্থ-মতে (দ্র.—শ্যামানন্দ) উৎকলের ধারেন্দাবাহাদুরপুরে 'মহারাসযাত্রা'কালে 'অদ্বৈতের পুত্র পৌত্র সব' শ্যামানন্দের আমন্ত্রণে [illegible] সহিত তথায় গমন করিয়া উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

জগদানন্দ-পণ্ডিত

জগদানন্দ-পণ্ডিত ছিলেন গৌরাঙ্গের নবদ্বীপ-লীলার অন্যতম সঙ্গী। আশৈশব সঙ্গী নহে[১]; কিন্তু গৌরাঙ্গের কীর্তনারম্ভ কাল হইতে আরম্ভ করিয়া কাজী-দলন, নগর-সংকীর্তন, জগাই-মাধাই উদ্ধার প্রভৃতি ঘটনাগুলিতে তাঁহাকে তাঁহার সহচররূপে দেখা যায়। কিন্তু জগদানন্দ সম্বন্ধে আমরা বিশেষভাবে অবহিত হই গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস-গ্রহণের সময় হইতে। তৎকালে তিনি নবদ্বীপেই উপস্থিত ছিলেন।[২] কিন্তু মহাপ্রভুর নীলাচল-যাত্রাকালে অদ্বৈতপ্রভু নিত্যানন্দাদির সহিত তাঁহাকেও চৈতন্যের পথ-সঙ্গী হিসাবে প্রেরণ করিলে তিনি নীলাচল যাত্রা করেন।[৩]

জগদানন্দ ভাল রন্ধন করিতে পারিতেন। পথে তিনি মহাপ্রভু ও সঙ্গীদিগকে রন্ধন করিয়া খাওয়াইতেন। ক্রমে তাঁহারা জলেশ্বরে পৌঁছাইলেন। মহাপ্রভু সর্বাগ্রে চলিয়াছেন। নিত্যানন্দ পিছনে পড়িয়াছেন। জগদানন্দ মহাপ্রভুর সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার দণ্ডখানি বহন করিতেছেন। কিছু দূর গিয়া মহাপ্রভু নিত্যানন্দের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। জগদানন্দ একস্থানে নিত্যানন্দের উপর মহাপ্রভুর দণ্ড-রক্ষার ভারার্পণ করিয়া ভিক্ষা-অন্বেষণে অন্যত্র গিয়াছিলেন। সকলে যখন পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া বিশ্রামার্থ উপবেশন করিতেন, জগদানন্দ তখন গৃহে গৃহে গিয়া ভিক্ষা করিতেন এবং ভিক্ষা-শেষে ফিরিয়া রন্ধন সমাপ্তির পর সকলের ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেন। সেইদিনও ভিক্ষালব্ধ-ধন লইয়া ফিরিলেন। কিন্তু ফিরিয়া দেখিলেন যে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর দণ্ডখানি ভাঙিয়া ফেলিয়াছেন। তখন তিনি মর্মাহত চিত্তে সেই ভগ্ন-দণ্ডসহ মহাপ্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সকল বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিলেন। মহাপ্রভু তিরস্কারের ছলে নিত্যানন্দকে নানা কথা বলিয়া অগ্রসর হইলে জগদানন্দ তাঁহাকে অনুসরণ করিলেন।

শ্রীক্ষেত্রে পৌঁছাইবার পর জগদানন্দ মহাপ্রভুর সেবা ও পরিচর্যায় কায়-মন অর্পণ করিয়াছিলেন। গদাধর বা স্বরূপের মত তিনি নিজেকে মধুরভাবে ভাবিত করিয়া[৪] সেবা করিতেন এবং সেই সেবার মধ্যে কোনপ্রকার কার্পণ্য বা কাপট্য ছিলনা। বোধ করি সেইজন্যই মহাপ্রভুর দেহ-মনের উপরও যেন তাঁহার একপ্রকারের বিশেষ অধিকার জন্মিয়া গিয়াছিল। সেই অধিকারের বলে তিনি মহাপ্রভুকে 'বিষয় ভুঞ্জাইতে'ও দ্বিধাবোধ করিতেন না এবং সেই ঐকান্তিক দাবির মধ্যে এমন একটি জোর ছিল যে মহাপ্রভুও যেন তাহা

---

(১) গোপীনাথ-আচার্যের জীবনীর প্রসঙ্গক্রমে এই সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। (২) চৈ. ম.—৪।৩১ (৩) দ্বারপাল-গোবিন্দের জীবনীর প্রসঙ্গক্রমের আলোচনা দ্রষ্টব্য।
(৪) চৈ. চ.—২।২ পৃ. ৯৩

উপেক্ষা করিতে পারিতেন না। যদি তিনি কখনও তাঁহার বাক্যের অন্যথা করিতেন, তাহা হইলে অভিমানী ভাবীর ন্যায় জগদানন্দ ক্রুদ্ধচিত্তে তাঁহার সহিত কথাবার্তা পর্যন্ত বন্ধ করিয়া দিতেন।[৫] তাঁহার এবম্প্রকার আচরণ লক্ষ্য করিয়া ভক্তবৃন্দ তাঁহাকে সত্যভামার সহিত তুলনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার অভিমান এক এক সময় হইয়া উঠিত একান্তই দুর্জয়।

গৌড়যাত্রাকালে মহাপ্রভু যখন কুমারহট্টে শ্রীবাসগৃহে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় জগদানন্দও তৎসহ নীলাচল হইতে আসিয়াছিলেন।[৬] সেই সময় একদিন তিনি অলক্ষিতভাবে শিবানন্দ-ভবনে হাজির হন। তিনি জানিতেন যে মহাপ্রভু নিশ্চয় সেইস্থানে পৌঁছাইবেন। তদনুযায়ী তিনি তাঁহার আগমন পথ সুসজ্জিত করিতে লাগিলেন। পথের উভয় পার্শ্বে কদলীস্তম্ভ, পূর্ণকুম্ভ, নবপল্লব, দীপাবলী প্রভৃতির দ্বারা তিনি শিবানন্দের বাটী পর্যন্ত সমস্ত পথ সুশোভিত করিলেন। তারপর মহাপ্রভু সেই পথে শিবানন্দের গৃহে পৌঁছাইলে জগদানন্দ সবংশে তাঁহার চরণোদক পান করিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করিলেন।[৭] ইহার পর মহাপ্রভু রামকেলি গমন করিলে তিনি তাঁহার সহিত তথায় গিয়া রূপ-সনাতনের সাক্ষাৎপ্রাপ্ত হইলেন।

মহাপ্রভু বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে জগদানন্দ নীলাচলে গিয়া তাঁহার সহিত বাস করিতে থাকেন। সেই সময় তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে নদীয়ায় আসিয়া শচীদেবীর নিকট অবস্থান করিতে হইত। শ্রীকান্ত-সেন যেই বৎসর একাকী শ্রীক্ষেত্রে গিয়াছিলেন সেই বৎসর জগদানন্দ বাংলা দেশে থাকিয়া শিবানন্দের গৃহে বাস করিতেছিলেন।[৮] শ্রীকান্তের মারফতে মহাপ্রভু বলিয়া পাঠাইলেন যে তিনি পৌষ মাসে জগদানন্দের নিকট ভিক্ষা-গ্রহণ করিবেন। তদনুযায়ী জগদানন্দ ও শিবানন্দ তাঁহার জন্য আকুল-চিত্তে অপেক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু মহাপ্রভুর আর সশরীরে গিয়া নদীয়া-বাস বা তথায় ভিক্ষা গ্রহণ করা হয় নাই। জগদানন্দ ইহার পর শ্রীক্ষেত্রে চলিয়া যান।

একবার সনাতন-গোস্বামী নীলাচলে গিয়া কয়েক মাস অতিবাহিত করেন। সেই সময় সনাতনের অনুযোগ সত্ত্বেও মহাপ্রভু তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করিলে সনাতনের গাত্রকণ্ডুরসা মহাপ্রভুর গায়ে লাগায় সনাতন অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইলেন, এবং একদিন তিনি জগদানন্দের নিকট সকল কথা ব্যক্ত করিয়া তাঁহার উপদেশ প্রার্থনা করিলেন। জগদানন্দ তখন তাঁহাকে বৃন্দাবনে গিয়া বাস করিবার পরামর্শ দিলে মহাপ্রভু তাহা শুনিয়া

(৫) ঐ—২।৭, পৃ. ১১৯ (৬) দ্র.—গোপীনাথ-আচার্য (৭) চৈ. ভা.—৩।৩১-৩২ (৮) চৈ. কৌ.—পৃ. ২৭৩

জগদানন্দকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করিলেন। জগদানন্দ একান্ত আপনার জন বলিয়া যে মহাপ্রভু তাঁহার প্রতি এইরূপ তিরস্কার বাক্য উচ্চারণ করিলেন, তাহা বুঝিয়া সনাতন বলিয়াছিলেন :

জগতে নাহি জগদানন্দ সম ভাগ্যবান ॥
জগদানন্দে পিয়াও আত্মতা সুধারস।
মোরে পিয়াও গৌরব স্তুতি নিম্বনিসিন্দারস ॥

প্রকৃতপক্ষে সনাতনের এই প্রকার উক্তি মহাপ্রভুর হৃদয়ে জগদানন্দের স্থান সম্বন্ধে সঠিক পরিচয় প্রদান করে।

জগদানন্দ মধ্যে মধ্যে মহাপ্রভুকে 'ঘরভাতে নিমন্ত্রণ' করিতেন। তিনি নিজে যেমন রন্ধনপটু ছিলেন, তেমনি পরিবেশন-কার্যেও তাঁহার পটুত্ব ছিল। তাই তাঁহাকে বহু স্থলেই স্বরূপ-কাশীশ্বর ও শংকরাদির সহিত পরিবেশন করিতে দেখা যায়। জগদানন্দ ঘুরিয়া ফিরিয়া পরিবেশন করিতেন এবং মহাপ্রভুর নিকটে আসিয়া 'প্রভুর পাতে ভাল দ্রব্য দেন আচম্বিতে।' মহাপ্রভু বাহ্যত রুষ্ট হইলেও তাঁহার ইচ্ছাপূরণ করা ছাড়া গত্যন্তর ছিলনা। জগদানন্দ ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিতেন মহাপ্রভু তৎপ্রদত্ত-দ্রব্য ভক্ষণ করিলেন কিনা। তিনি তাহা না ভোজন করিলে জগদানন্দ অভিমানভরে উপবাস আরম্ভ করিয়া দিতেন। একবার রামচন্দ্র-পুরী আসিলে জগদানন্দ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ভোজনের পর রামচন্দ্র পুনঃ পুনঃ সাগ্রহ অনুরোধ জানাইয়া জগদানন্দকে স্বীয় প্রসাদ-শেষ ভোজন করাইয়া শেষে 'বহুত ভক্ষণে'র নিমিত্ত তাঁহার উপর এবং তাঁহাকে উপলক্ষ করিয়া চৈতন্যভক্ত-সম্প্রদায়ের উপর নানাভাবে দুর্বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন। তদবধি জগদানন্দ প্রভৃতিকে তাঁহাদের নিমন্ত্রণ-বিধির পরিবর্তন করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাই বলিয়া মহাপ্রভুর প্রতি জগদানন্দের ব্যবহারের বিন্দুমাত্র পরিবর্তন ঘটে নাই। সন্ন্যাসীর ভক্ষ্যদ্রব্যাদি সম্বন্ধে মাধবেন্দ্র-শিষ্য রামচন্দ্র-পুরী যাহাই বলিয়া যাউন না কেন, মহাপ্রভুকে দিয়া সেই কঠোর-কর্তব্য পালন ও কৃচ্ছ্রতা-সাধন করাইবার কোনও ইচ্ছা তাঁহার ছিলনা। চৈতন্যের বিন্দুমাত্র কষ্টও পণ্ডিতের পক্ষে অসহ্য ছিল। অনুরোধে-অভিমানে কলহে-অনশনে যেমন করিয়া হউক, তিনি তাঁহাকে স্ব-ইচ্ছায় প্রবৃত্ত করাইতেন। কোন কিছুতেই তাঁহার প্রেম বাধা মানিত না।[১]

এই লৌকিকরূপের মধ্যেই জগদানন্দের প্রেম আপনার প্রকাশ পথের সন্ধান পাইয়াছিল। একবার তিনি শচীদেবীর পাদপদ্ম দর্শন করিবার জন্য জগন্নাথের বস্ত্রপ্রসাদাদি লইয়া নদীয়ায় আসেন। সেইবার তিনি কিছুকাল শচীদেবীর পাদসেবা এবং আচার্যাদি ভক্তের

(১) চৈ. চ.—৩।৭, পৃ. ৩২৬

আনন্দ বিধান করিয়া প্রত্যাবর্তনকালে শিবানন্দ-সেনের গৃহ হইতে মহাপ্রভুর জন্য এক কলসি সুগন্ধি তৈল সংগ্রহ করিয়াছিলেন। অতি যত্নে ও সন্তর্পণে তিনি সেই তৈল-কলস মস্তকে বহন করিয়া শত শত মাইল অতিক্রম করিলেন এবং নীলাচলে পৌছাইয়া তিনি তাহা গোবিন্দের নিকট রাখিয়া বলিয়া গেলেন যে মহাপ্রভু যেন প্রতি দিন অল্প-পরিমাণে সেই তৈল মস্তকে মর্দন করিতে থাকেন, তাহা হইলে তাহাতে পিত্ত-বায়ু প্রকোপ শান্ত হইবে। জগদানন্দ চলিয়া গেলে মহাপ্রভু গোবিন্দকে জানাইলেন যে সন্ন্যাসীর তৈলে অধিকার নাই, বিশেষ করিয়া সুগন্ধি তৈলে; সুতরাং জগদানন্দ-বাহিত তৈল জগন্নাথের প্রদীপে ঢালিয়া দিলে তাঁহার পরিশ্রম সার্থক হইবে। গোবিন্দ মৌন রহিলেন, কিন্তু কয়েকদিন পরে তিনি আর একবার জগদানন্দের অভিলাষ ব্যক্ত করিলে মহাপ্রভু সক্রোধে জানাইলেন যে তাহা হইলে সন্ন্যাসীর তৈল-মর্দনের জন্য তো একজন মর্দনিয়া নিযুক্ত করিবার প্রয়োজন হয়, এত সুখের জন্যই কি তিনি সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়াছিলেন! জগদানন্দ বা গোবিন্দের এইরূপ আচরণকে তিনি তাঁহার প্রতি পরিহাস মনে করিলেন। প্রাতঃকালে জগদানন্দ আসিলে মহাপ্রভু তাঁহাকে সেই তৈল জগন্নাথের প্রদীপে ঢালিয়া দিবার উপদেশ দান করিলে জগদানন্দ তৎক্ষণাৎ সেই তৈল-কলস আনিয়া মহাপ্রভুর সম্মুখেই তাহা ভাঙিয়া ফেলিলেন এবং সরাসরি বাসায় ফিরিয়া রুদ্ধদ্বার-গৃহমধ্যে শুইয়া রহিলেন।

জগদানন্দের এই প্রেমরূপ যতই লৌকিক হউক না কেন, তাঁহার প্রচণ্ড-অভিমান-ক্ষুব্ধ তরঙ্গাভিঘাতে অবিচলচিত্ত মহাপ্রভুর হৃদয়ও টলিয়া উঠিয়াছিল। স্বরূপ বা রামানন্দের মত জগদানন্দ প্রেমের নিগূঢ় তত্ত্বের কোনও সন্ধান রাখিতেন না সত্য, রূপ-সনাতনাদির মত তিনি চৈতন্য-পরিকল্পিত মহান আদর্শকে কর্মের মধ্য দিয়া রূপায়িত করিতে পারেন নাই সত্য, কিন্তু ভক্তের হৃদয়ভরা আকুতি, ঐকান্তিক কামনা ও দুর্জয় অভিমানে চৈতন্যমহাপ্রভুকে তাঁহার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইতে হইল। উক্ত ঘটনার পরবর্তী তৃতীয় দিবসে তিনি স্বয়ং অনাহূতভাবে জগদানন্দের বাসায় আসিয়া ভিক্ষা-নির্বাহের অভিপ্রায় জানাইলেন। জগদানন্দও আর স্থির থাকিতে পারিলেননা, চিরারাধ্য চৈতন্যই যে স্বয়ং আসিয়া তাঁহার স্বহস্ত-রন্ধন আকাঙ্ক্ষা করিয়া গেলেন! পণ্ডিত তাঁহার অভিমান-শয্যা ত্যাগ করিয়া যথাযোগ্য আয়োজনে তৎপর হইলেন। মধ্যাহ্নে মহাপ্রভু আসিলে তিনি সঘৃত অন্ন-ব্যঞ্জনের উপর তুলসী-মঞ্জরী দিয়া আসন-সম্মুখে তাহা পরিবেশন করিলেন এবং চতুর্দিকে নানাবিধ ব্যঞ্জন সাজাইয়া ভোজন করিবার জন্য মহাপ্রভুর নিকট প্রার্থনা জানাইলেন। মহাপ্রভু দ্বিতীয় পাতায় জগদানন্দের জন্য অন্ন-ব্যঞ্জনাদি আনিতে আদেশ দিলেন; আজ একত্রে দুইজনে ভক্ষণ করিবেন—ইহাই তাঁহার একান্ত ইচ্ছা। কিন্তু জগদানন্দ প্রসাদ লাভের ইচ্ছা জানাইলে তিনি ভোজনে প্রবৃত্ত

হইলেন। ভোজন করিতে করিতে পরিহাসকুশল মহাপ্রভু যখন জানাইলেন যে ক্রোধা-বেশেই বোধকরি অন্ন-ব্যঞ্জনের সেইরূপ অমৃতসম আস্বাদ হইয়াছে, জগদানন্দ তখন আনন্দে ও লজ্জায় যেন অভিভূত হইয়া পড়িলেন। মহাপ্রভুর এই প্রকার তৃপ্তি দেখিয়া তিনি পুনঃ পুনঃ অন্ন-ব্যঞ্জন পরিবেশন করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র-পুরীর আদেশ কোথায় ভাসিয়া গেল। মহাপ্রভু কিছু বলিতে পারিলেন না। সভয়ে যথাসাধ্য ভক্ষণ করিয়া জগদানন্দকে সন্তুষ্ট করিলেন। কিন্তু আপনার ভক্ষণের পর তিনি জগদানন্দের ভোজনের জন্য উৎসুক হইলেন। গোবিন্দের মুখে পণ্ডিতের ভোজনের কথা শুনিয়া তবে তিনি নিশ্চিন্তমনে নিদ্রা গেলেন। সত্যভামা-কৃষ্ণের মত জগদানন্দ-মহাপ্রভুর এই প্রেম-বিনিময় নীলাচলস্থ বৈষ্ণবভক্তবৃন্দের নিকট এক মধুর সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছিল।

শুধু অশনের নহে, মহাপ্রভুর বসন-শয়নের দিকেও জগদানন্দের সবিশেষ লক্ষ্য ছিল। মহাপ্রভু কলার শরলাতে শয়ন করিতেন। তাহাতে 'শরলাতে হাড় লাগে ব্যথা লাগে গায়।' কিন্তু তিনি শেষ বয়সে সর্বদা একপ্রকার ভাবাবেশের মধ্যে থাকিতেন। ভোজন-শয়নাদির দিকে তাঁহার কোনও লক্ষ্য থাকিতনা। এই অবস্থা দেখিয়া জগদানন্দ কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি গেরি দিয়া একটি সূক্ষ্মবস্ত্র রাঙাইয়া তাহাতে শিমুল তুলা পুরিলেন এবং তাহার উপর মহাপ্রভুকে শয়ন করাইবার জন্য তাহা গোবিন্দের নিকট রাখিলেন। কিন্তু পাছে গোবিন্দের উপরোধ উপেক্ষিত হয়, তজ্জন্য তিনি স্বরূপদামোদরকেও বলিয়া রাখিলেন, যাহাতে তিনি স্বয়ং গিয়া মহাপ্রভুকে শয়ন করাইয়া আসেন। তুলি-বালিশ দেখিয়া মহাপ্রভু ক্রোধাবিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও জগদানন্দের নামে সংকুচিত হইলেন। কিন্তু তিনি গোবিন্দকে দিয়া সেই তুলি দূর করাইয়া শরলাতেই শয়ন করিলেন। স্বরূপ জানাইলেন যে সেই শয্যা উপেক্ষা করিলে জগদানন্দ অত্যন্ত আহত হইবেন। চৈতন্য উত্তর দিলেন, তাহা হইলে তো তাঁহার জন্য একটি খাটেরও প্রয়োজন হয়। স্বরূপ-গোসাঁই তখন শুষ্ক কদলীপত্র চিরিয়া তাহাই বহির্বাসের মধ্যে পুরিয়া মহাপ্রভুকে গ্রহণ করিতে কোনরকমে রাজি করাইলেন। কিন্তু জগদানন্দ সত্যই আহত হইলেন। এক অন্তর-রুদ্ধ বেদনায় তাঁহার হৃদয় হাহাকার করিয়া উঠিল। প্রাণপতি চৈতন্যের সামান্যতম বেদনাও তাঁহার হৃদয়ে মোচড় দিতে থাকিত। অভিমানক্ষুব্ধ অন্তঃকরণে তিনি বৃন্দাবনে চলিয়া যাইবার জন্য আজ্ঞা প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু মহাপ্রভু রাজি হইলেননা। বারবার প্রার্থনা জানাইয়াও যখন কিছুই হইলনা, তখন জগদানন্দ স্বরূপের মারফত জানাইলেন যে বহুপূর্ব হইতেই তাঁহার বৃন্দাবন-দর্শনের সাধ ছিল, ইহার মধ্যে কোনও কপটতা নাই। স্বরূপের মধ্যস্থতায় শেষে আজ্ঞা মিলিল। কিন্তু যাত্রা আরম্ভের পূর্বে চৈতন্য জগদানন্দকে নিকটে ডাকাইয়া বারাণসী- ও মথুরা-পথের সমূহ বৃত্তান্ত বুঝাইয়া দিলেন এবং মথুরার ভক্তবৃন্দের সহিত কিরূপ

আচরণ করিতে হইবে তাহা সমস্তই শিখাইয়া পড়াইয়া দিলেন। সনাতন-গোস্বামীর সহিত মথুরা-বৃন্দাবনের সমগ্র বনপ্রদেশ পরিভ্রমণ করিবার জন্য, এবং কদাচ তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ না করিবার জন্য তিনি জগদানন্দকে পুনঃপুনঃ উপদেশ প্রদান করিলেন; গোবর্ধনে গিয়া গোপাল-দর্শন করিবার কথা বলিতেও ভুলিয়া গেলেন না। শেষে তিনি জগদানন্দের মারফত্ সনাতনের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন যে অচিরে তিনিও স্বয়ং বৃন্দাবনে গিয়া উপস্থিত হইবেন, সনাতন যেন তাঁহার জন্য একটি স্থান নির্দিষ্ট করিয়া রাখেন।

জগদানন্দ বনপথে বারাণসীতে পৌঁছাইয়া তপন-মিশ্র ও চন্দ্রশেখর-বৈদ্যের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তারপর তিনি ক্রমে মথুরায় গিয়া সনাতনের সহিত মিলিত হন। সনাতন তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া দ্বাদশাদি-বন পরিভ্রমণ করিলেন এবং দুইজনে গোকুলে রহিয়া মহাবন পরিদর্শন করিলেন। উভয়ে একত্রে বাস করিতে থাকেন। পণ্ডিত দেবালয়ে গিয়া পাক করেন এবং সনাতন বিভিন্ন স্থান হইতে ভিক্ষা করিয়া আনেন। একদিন সনাতন মুকুন্দ-সরস্বতী নামক জনৈক সন্ন্যাসী-প্রদত্ত এক রাতুল-বহির্বাস মস্তকে জড়াইয়া জগদানন্দের সম্মুখে হাজির হইলে পণ্ডিত সেই রক্তবর্ণ দেখিয়া প্রেমাবিষ্ট হইলেন। কিন্তু যখন তিনি শুনিলেন যে উহা সনাতনের নহে, মুকুন্দ-সরস্বতীর, তখন তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া ভাতের হাঁড়ি হাতে লইয়া সনাতনকে মারিতে উদ্যত হইলেন। সনাতন কিন্তু জগদানন্দের মধ্যে অপূর্ব প্রেম-প্রভাব প্রত্যক্ষ করিয়া চমৎকৃত হইলেন।

এইভাবে মাস দুই বৃন্দাবনে থাকিয়া একদিন জগদানন্দ সনাতনের নিকট মহাপ্রভুর অভিপ্রায়ের কথা ব্যক্ত করিলেন। সনাতন মহাপ্রভুর জন্য কিছু 'ভেটবস্তু' পাঠাইয়াছিলেন। পণ্ডিতও তাঁহার নিকট হইতে 'রাসস্থলীর বালু' 'গোবর্ধনের শিলা' 'শুষ্কপক্ক পীলুফল আর গুঞ্জমালা' সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই সমস্ত বস্তু সঙ্গে লইয়া তিনি পুনরায় সেই সুদীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া নীলাচলে হাজির হইলেন।[১০]

কিন্তু জগদানন্দকে প্রায় প্রতি বৎসর নদীয়া-গমন করিতে হইত। 'বিচ্ছেদ-দুঃখিতা' জননীকে আশ্বাস-দান করিবার জন্য চৈতন্য তাঁহার প্রিয় জগদানন্দের মারফত্ মাতৃসমীপে নানাবিধ সংবাদ ও গোপন-বার্তা প্রেরণ করিতেন। এইবারও তিনি বলিয়া পাঠাইলেন[১১]:

---

(১০) নিত্যানন্দদাস (প্রে. বি.—১ম. বি., পৃ. ৭) ও নরহরি-চক্রবর্তী (ভ.র.—৬।৩৩২) বলেন যে জগদানন্দ গৌড় হইয়া নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করেন। শ্রীনিবাসের জন্মকথা নামক একটি পুঁথিতে (পৃ.৫) ইহাই বলা হইয়াছে। কিন্তু চৈ. চ.-মতে তিনি নীলাচলে ফিরিয়া পুনরায় গৌড় যাত্রা করেন। অ. প্র.-এও (১১শ. অ.) তাঁহার নীলাচল হইতে গৌড়-যাত্রার কথা লিখিত হইয়াছে। (১১) অ.প্র.—২১শ. অ.

পুত্র হঞা পুত্রধর্ম পালিতে নারিনু।
ইথে তান পদে মহা অপরাধী হইনু।
কোটি যুগে তান ঋণ নারিনু শোধিতে।
অপরাধ ক্ষমে যদি নিজ দয়ামৃতে ॥

জগদানন্দ পূর্ববৎ যথাবিধি সকল কর্তব্য পালন করিলেন। কিন্তু তাঁহার বাংলাদেশ হইতে প্রত্যাবর্তন কালে অদ্বৈতপ্রভু চৈতন্যের প্রেমোন্মাদ অবস্থার কথা শুনিয়া বিচলিত হইলেন এবং মহাপ্রভুর নিকট নিবেদন করিবার জন্য একটি তরজা কহিয়া পাঠাইলেন। জগদানন্দ সেই তরজাটিকে স্মরণে রাখিয়া যাত্রা আরম্ভ করিলেন, কিন্তু তখন তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে অদ্বৈত-প্রেরিত সেই 'তরজা-প্রহেলী'র মধ্যেই তাঁহার প্রাণপ্রিয় চৈতন্যের মৃত্যুবাণীও লুক্কায়িত রহিয়াছে। নীলাচলে পৌঁছাইয়া তিনি যথাস্থানে সেই তর্জাটি নিবেদন করিলেন।[১২] কিন্তু তাহার পর হইতেই মহাপ্রভুর কৃষ্ণ-বিরহদশা ক্রমাগত বাড়িয়া চলিল। তাঁহার লীলা সাঙ্গ করিবার সময় ঘনাইয়া আসিল।

চৈতন্য-তিরোভাবের পর আর জগদানন্দ সম্বন্ধে কিছু জানা যায়না। সম্ভবত শ্রীনিবাস-আচার্যের নীলাচলে পৌঁছাইবার পূর্বেই তিনি সেই স্থান পরিত্যাগ করেন। জগন্নাথ-বিগ্রহের সহিত তাঁহার বিশেষ কোন সম্পর্ক ছিলনা। স্বয়ং চৈতন্যের প্রস্তাবানুযায়ী জগন্নাথদেবের প্রদীপে গৌড় হইতে আনীত তৈল ঢালিয়া দেওয়ার সার্থকতা তিনি বিন্দুমাত্র উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। মূক-বিগ্রহ চিরকালই ভক্তবৃন্দের নিকট মূক থাকিয়া গিয়াছে। কিন্তু মুখর মানুষটি মূক হইয়া গিয়া ভক্তবৃন্দের প্রেম-প্রদীপকে একেবারে শুকাইয়া দিয়া গিয়াছেন।

(১২) চৈ. চ. —৩।১৯, পৃ. ৩৬৯ ; তু.—অ. প্র.—২১শ. অ., পৃ. ৯৪ ; দ্র.—নিত্যানন্দ

বলভদ্র-ভট্টাচার্য

বলভদ্র-ভট্টাচার্য ছিলেন মহাপ্রভুর বৃন্দাবন-যাত্রার সঙ্গী।[১] মহাপ্রভু যখন কানাইর-নাটশালা হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করেন, সেই সময় 'বলভদ্রাচার্য আর পণ্ডিত দামোদর। দুইজন সঙ্গে প্রভু আইলা নীলাচল॥'[২] কিছুদিন পরে মহাপ্রভু একাকী মথুরা-যাত্রা করিতে চাহিলে স্বরূপ ও রামানন্দ-রায় একান্তভাবে অনুরোধ জানাইয়া এই বলভদ্রকে তাঁহার সহিত পাঠাইবার অনুমতি লাভ করেন। সম্ভবত বলভদ্রের একজন ভৃত্যও তাঁহার সহিত কিছুদূর পর্যন্ত গিয়াছিল।[৩]

মহাপ্রভু ঝারিখণ্ডপথে চলিলেন। বলভদ্র-ভট্টাচার্য তাঁহার ব্রহ্মচারী[৪]-হিসাবে সঙ্গে চলিয়াছেন। জনমানবহীন নির্জন বনমধ্যে পথ চলিতে চলিতে ভট্টাচার্য শাক, ফল, মূল, যেখানে যাহা পান সংগ্রহ করিয়া রাখেন। দুই চারিদিনের অন্নও সংগ্রহ করিয়া লন; কি জানি যদি সম্মুখস্থ প্রদেশ একেবারে জনশূন্য হয়, তাহাহইলে তো প্রভুর আর কষ্টের সীমা থাকিবেনা! মধ্যে মধ্যে অবশ্য গ্রাম-ভূমি দেখা যায়। কিন্তু সকল গ্রামে ব্রাহ্মণের বাস থাকেনা। যেখানে ব্রাহ্মণ-বাসিন্দা থাকেন, সেখানে তাঁহারা মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলে তাঁহার ভিক্ষা-নির্বাহ হয়। আর যেখানে ব্রাহ্মণের সম্ভাব নাই, সেখানে শূদ্র মহাজনেরা নিমন্ত্রণ করিলে বলভদ্র গিয়া পাক করেন। মহাপ্রভু বলভদ্রের সেবা ও পরিচর্যায় সন্তোষ-লাভ করিয়া পঞ্চমুখে তাঁহার প্রশংসা করেন এবং বার বার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে থাকেন। এইভাবে তাঁহারা কাশীতে পৌছাইলে তপন-মিশ্র তাঁহাদিগকে স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন। সেইস্থানেও ভট্টাচার্য পাক করিয়া মহাপ্রভুর ভিক্ষানির্বাহ করাইলেন।

কাশী, প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন। বৃন্দাবনে পৌছাইয়া চৈতন্য ভাববিহ্বল হইলেন এবং

---

(১) চৈ. না.—৯।৪২; চৈ. চ.—১।১০, পৃ. ৫৪ (২) চৈ.চ.—১।১, পৃ. ৮৮; বৈষ্ণবাচারদর্পণ(পৃ. ৬৪৫)-মতে বলভদ্র-ভট্টাচার্যের বাস ছিল নবদ্বীপে। (৩) চৈ. না.—৯।৪২; মুরারি-গুপ্ত লিখিয়াছেন বৃন্দাবন-পরিভ্রমণের পর মহাপ্রভু "জগামাথং সংবৃতো যথৌ ব্রাহ্মণসংবৃতঃ॥"—৪।১৩।৪ (৪) চৈ. চ.—১।১০, পৃ. ৫৪; 'চৈতন্যচরিতামৃতে' (২।১৭, পৃ. ১৯৩-৯৪) দেখা যায় যে আরও একজন ভৃত্য সঙ্গে গিয়াছিল। ঝারিখণ্ডপথে চলিবার সময়ও তাহার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। কিন্তু তাহারপর কোথাও আর তাহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়না।

ভট্টাচার্য চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। মথুরাতে এক বিপ্র[৫] কৃষ্ণনাম ও কীর্তনাদির দ্বারা তাঁহাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। সেই বিপ্র জাতিতে ছিলেন সানোড়িয়া-ব্রাহ্মণ। মাধবেন্দ্র পুরী মথুরা-পর্যটনে আসিয়া তাঁহারই গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তাঁহাকে শিষ্য করিয়া তাঁহার গৃহে ভিক্ষানির্বাহ করিয়াছিলেন। সনোড়িয়া-গৃহে সন্ন্যাসীর ভিক্ষা-গ্রহণ অবিধেয়[৬] হইলেও মাধবেন্দ্র তাঁহার বৈষ্ণবব্যবহার দেখিয়া অতিশয় প্রীত হইয়াই ঐরূপ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিলেন এবং তাঁহার গৃহে নিজেও ভিক্ষানির্বাহ করিলেন। তাঁহারই গৃহে থাকিয়া তিনি মথুরার বিভিন্ন স্থান পর্যটন করিয়া আসিলেন এবং বিপ্রও সঙ্গে সঙ্গে গিয়া তাঁহাকে দানলীলা-প্রসঙ্গাদি সম্বন্ধে নানাকথা শুনাইতে শুনাইতে সকল স্থান পরিদর্শন করাইলেন। তারপর মথুরার ব্রাহ্মণ-সজ্জন একে একে মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ জানাইলে তিনি তাঁহাকে সকলের গৃহে লইয়া গেলেন। ভাবের ঘোরে মহাপ্রভু সংজ্ঞা হারাইয়া ফেলিতেন। তখন বলভদ্র-ভট্টাচার্য চৈতন্যের কর্ণে কৃষ্ণনাম শুনাইতেন এবং তাঁহার চেতনা ফিরিয়া আসিলে সনোড়িয়া-বিপ্রের সহিত নাম-সংকীর্তনাদির দ্বারা তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিতেন। একদিন মহাপ্রভু আরিট গ্রামে গিয়া রাধাকুণ্ড আবিষ্কার করিলে তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী ভট্টাচার্য সেই স্থানের কিছু মৃত্তিকা সংগ্রহ করিয়া রাখিলেন। চৈতন্য তখন অক্রূরে থাকিয়া বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করিয়া আসিতেছিলেন। একদিন বাসার সম্মুখে মহা-জনকোলাহল উত্থিত হইল। সংবাদ লইয়া জানা গেল যে কালীদহ জলে স্বয়ং কৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়া কালী-শিরে নৃত্য করিতেছেন; সর্পের ফণীতে অসংখ্য রত্ন জ্বলিতেছে এবং তাহাই এত লোক সমাগমের কারণ। ভট্টাচার্য মহাপ্রভুর নিকট নিবেদন করিলেন, তিনিও কৃষ্ণ-দর্শনে যাইবেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে চাপড় মারিয়া বলিলেন যে মূর্খ-জনসাধারণের কথায় উতলা হওয়া উচিত নহে; কলিকালে কৃষ্ণ দরশন দিতে আসিবেন না, যদি নেহাৎ যাইতেই হয়, পরদিন রাত্রিতে গিয়া দেখিয়া আসিলেও চলিবে। কিন্তু পরদিন প্রভাতে সংবাদ পাওয়া গেল যে কালীদহে জেলেরা দেউটি জ্বালিয়া মৎস্য ধরিতেছিল। সেই দেউটিই ফণী-মণিতে পরিণত হইয়াছিল।

---

(৫) ইনি সম্ভবত 'ভক্তমালে'-বর্ণিত (পৃ. ২৭৮-৮০) কৃষ্ণদাস-ব্রজবাসী নহেন। কারণ, 'ভক্তমালে' তাঁহাকে মাধবেন্দ্র-পুরীর অনুশিষ্য বলা হইয়াছে। অথচ কবিরাজ-গোস্বামী বলেন যে সনোড়িয়া-বিপ্র মাধবেন্দ্রের শিষ্য ছিলেন। অবশ্য লোচনদাস বলেন (শে. খ.—পৃ. ১৮৯-২০২) যে মহাপ্রভুকে যিনি মথুরামণ্ডল পরিদর্শন করান তাঁহার নামও ছিল কৃষ্ণদাস। কিন্তু 'চৈতন্যচরিতামৃত'-মতে কৃষ্ণদাস নামক রাজপুত-বিপ্র মহাপ্রভুকে বৃন্দাবন পরিদর্শন করান। ইহা মুরারি-গুপ্তের বর্ণনারও সমর্থন করে। —দ্র.—প্রেমী-কৃষ্ণদাস (৬) চৈ. চ.—২।১৭, পৃ. ১৯৮

আর একদিন মহাপ্রভু অক্রুর-ঘাটে উপবিষ্ট ছিলেন। সহসা সেই স্থানকে বৈকুণ্ঠ-ভ্রমে তিনি ভাবাবেশে জলে ঝাঁপ দিলেন। কৃষ্ণদাস নামক এক রাজপুতের সহিত অক্রূরে আলাপ হইয়াছিল। তিনি তো কাঁদিয়াই অস্থির। বলভদ্র তৎক্ষণাৎ নদীতে ঝাঁপ দিয়া মহাপ্রভুকে তুলিয়া কোন প্রকারে তাঁহার প্রাণ বাঁচাইলেন। কিন্তু এবার তিনি বাস্তবিক উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। তিনি কৃষ্ণদাসকে নিভৃতে ডাকিয়া যুক্তি করিলেন—"লোকের সংঘট্ট নিমন্ত্রণের জঞ্জাল। নিরন্তর আবেশ প্রভুর না দেখিয়ে ভাল॥" সুতরাং বৃন্দাবন-বাস আর চলিবে না। এইরূপ যুক্তি করিয়া তিনি মহাপ্রভুর নিকট আসিয়া বলিলেন, এত লোকের 'গড়বড়ি' ও 'নিমন্ত্রণের হুড়াহুড়ি' সহ্য করা তাঁহার মত একজন নগণ্য ব্যক্তির পক্ষে আর সম্ভব হইতেছে না। বিশেষ করিয়া প্রাতঃকালে লোকজন আসিয়া মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ না পাইলে তাঁহাকেই পাইয়া বসেন। ইচ্ছা না থাকিলেও ভক্ত-বলভদ্রের ইচ্ছা মহাপ্রভুকে পূরণ করিতেই হইল। বলভদ্র তাঁহাকে বৃন্দাবন-দর্শন করাইছেন, সুতরাং তাঁহার ঋণ অশোধ্য। স্থির হইল যে গঙ্গাতীর-পথেই মহাপ্রভুকে লইয়া যাওয়া হইবে। সনৌড়িয়া-বিপ্র ও অক্রূরে-পরিচিত প্রেমী-কৃষ্ণদাস 'গঙ্গাপথে যাইবার বিজ্ঞ দুইজন' বলিয়া তাঁহারাও সঙ্গে চলিলেন। সোরোক্ষেত্রে গঙ্গাস্নানের পর মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে বিদায় দিতে চাহিলে তাঁহারা দুইজনে জোড়হস্তে অনুনয় জানাইয়া প্রয়াগ পর্যন্ত যাইবার সম্মতি গ্রহণ করিলেন।

প্রয়াগে আসিয়া রূপ ও অনুপমের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিলে বলভদ্র-ভট্টাচার্য দুইভ্রাতাকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইলেন। তারপর আউলি-গ্রামে বল্লভ-ভট্টের গৃহে নিমন্ত্রিত হইলে বলভদ্রাচার্য সেই স্থলেও চৈতন্যের সহিত রূপ,অনুপম এবং সনৌড়িয়া-বিপ্র ও রাজপুত-কৃষ্ণদাস প্রভৃতি সকলকেই স্বীয় রন্ধিত সামগ্রী পরিবেষণ করিয়া তাঁহাদিগের তৃপ্তি-সাধন করিলেন।

প্রয়াগ হইতে বলভদ্রাচার্য চৈতন্যের সহিত পুনরায় কাশী হইয়া নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করিলেন। আঠারনালাতে আসিয়া মহাপ্রভু ভক্তবৃন্দকে সংবাদ দেওয়ার জন্য তাঁহাকে আগেভাগে পাঠাইয়া দিলে তিনি ভক্তবৃন্দকে আনন্দ সংবাদ দান করেন। ইহারপর আর আমরা বলভদ্রের বিশেষ কোন সংবাদ পাইনা। কেবল কবিরাজ-গোস্বামী বলিতেছেন যে সনাতনগোস্বামীর নীলাচল হইতে প্রত্যাবর্তনকালে বলভদ্রাচার্য তাঁহাকে গমনপথের সমূহ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন।[৭]

(৭) চৈ. চ.—৩।৪, পৃ. ৩০৯

ভগবান-আচার্য

'চৈতন্যচরিতামৃতে'র মূলস্কন্ধশাখা-বর্ণন পরিচ্ছেদে ভগবান-পণ্ডিত সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে তিনি 'প্রভুর অতি প্রিয় দাস' ছিলেন এবং তাঁহার 'দেহে কৃষ্ণ পূর্বে হৈল অধিষ্ঠিত'। 'চৈতন্যভাগবত'-কার ঠিক এই ভগবান-পণ্ডিতকেই 'লেখকপণ্ডিত ভগবান' বলিয়াছেন।[১] 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র উক্ত পরিচ্ছেদে কিন্তু মহাপ্রভুর নীলাচলস্থ সঙ্গীদিগের বর্ণনায় একজন ভগবান-আচার্যের নাম উল্লেখিত হওয়ায় তাঁহাকে পৃথক ব্যক্তি বলিয়া ধারণা জন্মে। অবশ্য ঐ একই পরিচ্ছেদে মহাপ্রভুর নীলাচলস্থ পূর্বসঙ্গীদিগের বর্ণনায় যে সমস্ত ভক্তকে পাওয়া যায় তাঁহাদিগের নাম দুই তিন বার করিয়া উল্লেখিত হইয়াছে। কিন্তু 'চৈতন্যভাগবতে'র উক্ত পরিচ্ছেদ-মধ্যে দেখা যায় যে যাঁহার গৃহে কৃষ্ণের অধিষ্ঠান হইয়াছিল, সেই লেখক-পণ্ডিত ভগবান ও অন্যান্য ভক্ত নীলাচলে আসিলে 'কাশীশ্বর পণ্ডিত আচার্য ভগবান' প্রভৃতি তাঁহাদিগকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। ইহাতেও দুইজন ভগবানের অস্তিত্বই সমর্থিত হইতেছে। কিন্তু ভগবান-পণ্ডিত সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তদতিরিক্ত আর কোন বিবরণই কোথাও পাওয়া যায়না। কেবল এইটুকুই বলা যায় যে তিনি মধ্যে মধ্যে নীলাচলে গিয়া মহাপ্রভুর দর্শন লাভ করিয়া আসিতেন।[২] 'কাশীশ্বর গোসাঁইর সূচক'-নামক পুথিতে পলাশি-নিবাসী এক ভগবান-পণ্ডিতকে কাশীশ্বরের শিক্ষা-শাখাভুক্ত করা হইয়াছে।[৩] তিনি কাশীশ্বরের সেবকরূপে দেশ-পর্যটন করিয়াছিলেন এবং চৈতন্যের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। অন্যত্রও মধ্যে মধ্যে কাশীশ্বরের সহিত সম্ভবত এই ভগবানকেই দেখিতে পাওয়া যায়।[৪] সুতরাং ইঁহার পক্ষেও কাশীশ্বরের সহিত যুক্ত হইয়া গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা অসম্ভব না হইতে পারে। আবার উল্লেখিত দুই ভগবান-পণ্ডিতের পক্ষে এক ব্যক্তি হওয়াও আশ্চর্যজনক নহে। সম্ভবত বৃন্দাবনদাসের অনবধানতা বশতই এই স্থলে বিষয়টি জটিল হইয়াছে। তবে খ্যাতির দিক দিয়া বিচার করিলে একমাত্র ভগবান-আচার্যই যে সমধিক খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের পর ভগবান-আচার্য ও রামভদ্রাচার্য আসিয়া নীলাচলে তাঁহার নিকট বাস করিতে থাকেন। তাঁহারা উভয়েই মহাপ্রভুর নিষ্ঠাবান ভক্তরূপে

(১) ৩।৯, পৃ. ৩২৭ (২) চৈ. ভা.—৩।৯, পৃ. ৩২৭; চৈ. চ.—৩।১০, পৃ. ৩৩৪ (?) (৩) পৃ. ৫
(৪) চৈ. চ.—২।১, পৃ. ৮৮; শ্রীচৈ. চ.—৪।১৭।১৯

পরিগণিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে 'ঘরভাতে নিমন্ত্রণ' করিয়া খাওয়াইতেন।[৫] মহাপ্রভুর হৃদয়ে ভগবান-আচার্যের স্থান ছিল অতি উচ্চে। অন্যত্র নিমন্ত্রণের দিনেও যদি ভগবান, গদাধর, সার্বভৌম তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিতেন তাহাহইলে তিনি তাঁহাদের মনে আঘাত করিয়া অন্যত্র ভিক্ষা-নির্বাহ করিতেন পারিতেন না।[৬]

ভগবানের পিতা শতানন্দ-খান ঘোর বিষয়ী ছিলেন। কিন্তু ন্যায়াচার্য[৭] ভগবান ছিলেন রঘুনাথদাসের মতই সমস্ত বিষয়ের মালিক হইয়াও একেবারে নির্বিষয়ী[৮]। সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করিয়া তিনি চৈতন্যচরণ আশ্রয় করিয়াছিলেন। তাঁহার ভক্তি ছিল 'সখ্য ভাবাক্রান্ত' এবং তিনি নিজে সুপণ্ডিত ছিলেন। স্বরূপদামোদরের সহিত তাঁহার বিশেষ সখ্য জন্মাইয়াছিল। একবার তাঁহার ভ্রাতা গোপাল-ভট্টাচার্য কাশী হইতে বেদান্ত শিক্ষা করিয়া আসিলে তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া ভগবান মহাপ্রভুর নিকট লইয়া যান। চৈতন্যের নিকট বৈদান্তিকের সঙ্গ কোনদিনই অভিপ্রেত ছিলনা। তৎসত্ত্বেও তিনি 'আচার্য সম্বন্ধে বাহ্যে করে প্রতিভাষ'। কিন্তু 'কৃষ্ণভক্তি বিনা প্রভুর না হয় উল্লাস'। ভগবান সম্ভবত তাহা বুঝিতে পারিয়া স্বীয় ভ্রাতাকে স্বরূপদামোদরের নিকট আনিলেন। স্বরূপও গোপালের ভাষ্য শুনিতে রাজি না হওয়ায় ভগবান তাঁহাকে সরল অন্তঃকরণে দেশে পাঠাইয়া দেন। এজন্য তাঁহার মনে বিন্দুমাত্র ক্ষোভের উদয় হয় নাই। কিন্তু কিছুদিন পরে তাঁহার পরিচিত অন্য একজন বঙ্গদেশী-বিপ্র মহাপ্রভুর জীবন-সম্বন্ধীয় একটি নাটক রচনা করিয়া নীলাচলে শুনাইতে আসিলে পুনরায় আচার্য তাঁহাকে স্বরূপের নিকট হাজির করেন। কিন্তু স্বরূপ বলিলেন, "তুমি গোপ পরম উদার। যে সে শাস্ত্র শুনিতে ইচ্ছা উপজে তোমার॥" তিনি এসম্বন্ধে আরও নানা কথা বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত ভগবানের সনির্বন্ধ অনুরোধ এড়াইয়া যাওয়া তাঁহার পক্ষে মুস্কিল হইয়াছিল।

মহাপ্রভুকে একাকী ডাকিয়া খাওয়ান ভগবানের একটি সাধের বিষয় ছিল। একবার ছোট-হরিদাসকে দিয়া তিনি শিখি-মাহিতীর ভাগিনীর নিকট হইতে উত্তম-চাউল আনাইয়া মহাপ্রভুর জন্য অন্ন-ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়াছিলেন এবং স্নেহবশত মহাপ্রভুর প্রিয় ব্যঞ্জন রন্ধন করিয়া 'দেউল প্রসাদ আদা চাকি লেবু সলবন' পরিবেষণ করিয়া তাঁহাকে খাওয়াইতে বসিলে মহাপ্রভু সেই 'শাল্যন্ন' দেখিয়া পরমপ্রীত হইয়াছিলেন।

ভগবান-আচার্য খঞ্জ ছিলেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও মহাপ্রভুর বিরহোন্মাদ অবস্থাতে তিনি তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার সেবা করিয়া গিয়াছেন।[৯] মহাপ্রভুর তিরোভাবের

(৫) চৈ. চ.—৩।১০, পৃ. ৩৩৮ (৬) চৈ. চ.—৩।৮, পৃ.৩৩০ (৭) চৈ. না.—৯।৫ (৮) চৈ. ভা.—৩।৩, পৃ. ২৭৩; চৈ. চ.—৩।২, পৃ. ২৯৩ (৯) চ. চ.—৩।১৪ পৃ. ৩৫১

পর আর তাঁহার কোনও সংবাদ পাওয়া যায়না।[১০] তাঁহার পুত্র রঘুনাথ-আচার্য সম্ভবত জগদীশ-পণ্ডিতের দ্বারা পালিত হইয়া জগদীশেরই শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন[১১] এবং পরবর্তিকালে বৈষ্ণব-সমাজে সুপ্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। জাহ্নবাদেবীর খেতরি-গমন-পথে তিনি হালিসহর-গ্রামস্থ নয়ন-ভাস্কর[১২] সহ পথিমধ্যে ভাগ্যবন্ত বণিকের গৃহে (সপ্তগ্রাম ?) জাহ্নবা-ঈশ্বরীর সহিত মিলিত হইয়া খেতরি-উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

(১০) অমিয় নিমাই চরিত-গ্রন্থে (৫ম. খণ্ড, পৃ. ২২) বলা হইয়াছে যে মহাপ্রভু কানাইর-নাটশালা হইতে ফিরিয়া চন্দ্রশেখর-আচার্যরত্নের গৃহে আসিলে 'একটি অবগুণ্ঠনবতী যুবতী স্ত্রী আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, প্রভু আশীর্বাদ করিলেন—তুমি পুত্রবতী হও। এই কথা শুনিয়া সেই যুবতী ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন।......সেই যুবতী শ্রীখণ্ড ভগবান-আচার্যের স্ত্রী। শ্রীভগবান আচার্য...বিবাহ করিয়া স্ত্রীকে শ্রীবাসের বাড়ী ফেলিয়া নীলাচলে প্রভুর নিকট বাস করেন। তাহার পর ভগবানের স্ত্রী চন্দ্রশেখরের আশ্রয় গ্রহণ করেন। প্রভু এই সমুদয় কথা শুনিয়া হাস্য করিলেন। পরে বলিলেন,—আমার আশীর্বাদ ব্যর্থ হইবার নয়। তুমি সত্যই পুত্রবতী হইবে।'—এইরূপ বিবরণ কোথা হইতে সংগৃহীত হইল বলা যায় না। (১১) অ. চ.—পৃ. ৪৩ ; এই প্রসঙ্গে মহেশ-পণ্ডিতের জীবনী দ্রষ্টব্য। (১২) প্রে. বি.—১৯ শ. বি., পৃ. ৩০৯ ; ভ. র.—১০।৩৮১

হরিদাস (ছোট)

মহাপ্রভুর নীলাচল-বাসকালে 'বড় হরিদাস আর ছোট হরিদাস।[১] দুই কীর্তনীয়া রহে মহাপ্রভুর পাশে ॥'[২] ছোট, বড় এই দুইজন হরিদাস রামাই-নন্দাইর মত গোবিন্দের সঙ্গে থাকিয়া মহাপ্রভুর সেবা করিতেন।[৩] রথযাত্রাদি উপলক্ষে মহাপ্রভু যে বেড়াকীর্তনের প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তাঁহারা তাহাতে বিশেষ অংশ গ্রহণ করিতেন।[৪] প্রকৃত ভক্ত-হিসাবে তাঁহারা ভাবপ্রধান কীর্তনগানে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সংকীর্তনে মুগ্ধ হইয়া চৈতন্যপ্রভু আনন্দলোকের উচ্চমার্গে আরোহণ করিতেন।

একদিন ভগবান-আচার্য মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া ছোট-হরিদাসকে উৎকৃষ্ট চাউল সংগ্রহ করিবার জন্য শিখি-মহিতীর ভগিনী মাধুরী (বা মাধবী)-দেবীর নিকট পাঠাইয়া দেন। ছোট-হরিদাস তদনুযায়ী 'বৃদ্ধা তপস্বিনী আর পরমা বৈষ্ণবী' মাধুরীদেবীর নিকট হইতে আচার্যের নাম করিয়া তণ্ডুল চাহিয়া আনিলেন।[৫] ভগবান তাহার দ্বারা উত্তম অন্ন প্রস্তুত করিয়া মহাপ্রভুকে খাওয়াইলেন। মহাপ্রভু সেই শাল্যন্ন দেখিয়া অনুসন্ধানে জানিলেন যে ছোট-হরিদাস তাহা মাধুরীদেবীর নিকট চাহিয়া আনিয়াছেন। আহারান্তে মহাপ্রভু বাসায় ফিরিয়া গোবিন্দকে জানাইয়া দিলেন যে ছোট-হরিদাস যাহাতে আর সেই স্থানে না আসেন, সে বিষয়ে তাঁহাকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

হরিদাসের এইরূপ শাস্তির কারণ সম্বন্ধে কেহ কিছু বলিতে পারিলেন না। মহাপ্রভুর নিকট না যাইতে পাওয়ায় তাঁহার আহার নিদ্রা বন্ধ হইল। তিন-দিন যাবৎ তিনি একটি তণ্ডুলকণাও মুখে দিতে পারিলেন না। স্বরূপাদি ভক্তবৃন্দ তাঁহার এই অসহায় দুর্দশা দেখিয়া সেইদিকে মহাপ্রভুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে তিনি জানাইলেন যে হরিদাস বৈরাগী হইয়াও প্রকৃতি-সম্ভাষণ করিয়াছেন এবং

> দুর্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
> দারু-প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন ॥
> ক্ষুদ্র জীব সব মর্কট বৈরাগ্য করিয়া।
> ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া ॥

এই বলিয়া মহাপ্রভু অভ্যন্তরে চলিয়া গেলে ভক্তবৃন্দ বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া গেলেন।

(১) বৈ. ব.-মতে (পৃ. ৩৪৬) ছোট-হরিদাসের বাস ছিল বাখরগঞ্জে। (২) চৈ. চ.—১।১০, পৃ. ৫৪ (৩) ঐ—২।১০, পৃ. ১৪৯ (৪) ঐ—২।১৩, পৃ. ১৬৪-৬৫ (৫) প্র. প্র.—১১শ. অ., পৃ. ৮৩; চৈ. চ.—৩।২, পৃ. ২১৪-১৫

কিন্তু তাঁহাদের পক্ষে চুপ করিয়া থাকাও সম্ভব ছিলনা। হরিদাসের নিরন্তর যাতনা তাঁহাদের বক্ষে শেলসম বিঁধিতে লাগিল। আর একদিন তাঁহারা আসিয়া মিনতি জানাইলেন—"অল্প অপরাধ প্রভু করহ প্রসাদ। এবে শিক্ষা হইল না করিব অপরাধ ॥" মহাপ্রভু দৃঢ়ভাবে জানাইলেন যে 'প্রকৃতি-সম্ভাষী বৈরাগী'র জন্য তাঁহারা পুনর্বার অনুরোধ জ্ঞাপন করিলে তিনি নীলাচল ত্যাগ করিবেন। ভক্তবৃন্দ কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া এবারেও ফিরিয়া আসিলেন।

এইবার স্বয়ং পরমানন্দ-পুরী গিয়া অত্যন্ত সন্তর্পণে ও সুকৌশলে হরিদাসের জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। মহাপ্রভু কেবলমাত্র গোবিন্দকে সঙ্গে লইয়া আলালনাথে গিয়া থাকিবেন বলিয়া পুরী-গোস্বামীকে প্রণাম করিয়া উঠিলে তিনি বিশেষ অনুনয় করিয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিলেন। প্রসঙ্গ আপাতত এইখানেই থামিয়া গেল। স্বরূপ-দামোদর অনেক যত্ন করিয়া হরিদাসের অনশন ভঙ্গ করিলেন। হরিদাস অনাহার করিলেই মহাপ্রভুর রাগ পড়িয়া যাইবে বলায় হরিদাস মহাপ্রভুর সঙ্গে আর অধিক 'হঠ' না করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার মানসে অন্নজল গ্রহণ করিলেন।

ভক্তমাত্রেই 'স্বপ্নেও ছাড়িল সবে স্ত্রী সম্ভাষণ।' কিন্তু হরিদাসের প্রতি মহাপ্রভু আর প্রসন্ন হইলেন না। বিড়ম্বিত হরিদাস নীরবে ঘুরিয়া বেড়ান এবং সকলের চক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া দূর হইতে তাঁহার জীবনের একমাত্র আরাধ্য দেবতা চৈতন্যের দর্শন-লাভ করিয়া আশ্বস্ত হন। কিন্তু কতকাল আর এইভাবে কাটিবে! বৎসরান্তে একদিন রাত্রিশেষে হরিদাস দূর হইতে মহাপ্রভুকে শেষ-প্রণতি জানাইয়া অগ্রসর হইলেন। কেহই কিছু জানিতে পারিলেন না। নিঃশব্দ পদসঞ্চারে চির-জনমের মত নীলাচল হইতে বহির্গত হইয়া ভক্ত হরিদাস ক্রমে প্রয়াগে উপস্থিত হইয়া ত্রিবেণী-বক্ষে[৬] ঝাঁপ দিলেন।

একদিন মহাপ্রভু ভক্তবৃন্দকে হরিদাসের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেনঃ "হরিদাস কাঁহা তাঁরে আনহ এখানে।" কিন্তু ভক্তবৃন্দ জানাইলেন যে হরিদাস 'বর্ষপূর্ণদিনে' রাত্রিতে উঠিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন, কেহই তাহা বলিতে পারেন না। মহাপ্রভু সহাস্যে স্থির হইয়া রহিলেন। কিন্তু আর একদিন নাকি মহাপ্রভুর সহিত ভক্তবৃন্দ সমুদ্রোপকূলে বেড়াইতে আসিয়া গন্ধর্বসম সমুধর কণ্ঠের সংগীত শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। দূর হইতে সেই অপার্থিব গীতধ্বনি ভাসিয়া আসিয়াছিল, কোনও মানুষকে দেখা যায় নাই। কিছুদিন পরে গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দ নীলাচলে আসিলে শ্রীবাস আচার্য মহাপ্রভুকে হরিদাসের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাপ্রভু কেবল জানাইয়াছিলেন, "স্বকর্মফলভাক্ পুমান্।"

(৬) 'যমুনা ঝাঁপ দিলা'—প্যা. প্র., পৃ. ১৬

শ্রীবাসাদি গৌড়ীয় ভক্ত ইতিপূর্বেই প্রয়াগাগত কোন বৈষ্ণবের নিকট হইতে হরিদাসের সমূহ বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিলেন।

কোনও গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,[৭] "মহাপ্রভুর নীলাচললীলার 'হরিদাস বর্জন' এক পুণ্য কাহিনী।" প্রকৃতপক্ষে, মহাপ্রভুচৈতন্য-বিহিত ঘটনাটি হয়ত বিপুল 'মর্যাদা'-বহনে ও লোকশিক্ষায় পরিপূর্ণ সার্থকতালাভ করিয়াছিল, কিন্তু ইহা যে নিষ্কলঙ্ক শশাঙ্কের অঙ্ক হইতে চিরন্তন কলঙ্কের মত উঁকি দিতেছেনা, তাহাও কি নিঃসন্দেহে বলা যায়!

(৭) নীলাচলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—পৃ ৭০

বাসুদেব-সার্বভৌম

পঞ্চদশ শতাব্দীতে নদীয়া বা নবদ্বীপ বাংলাদেশের একটি প্রসিদ্ধ শিক্ষা- ও সংস্কৃতি-কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। সেই স্থানের বিখ্যাত পণ্ডিতদিগের মধ্যে বিশারদ-ভট্টাচার্যের নাম সুদূর মিথিলা পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। গৌরাঙ্গের মাতামহ নীলাম্বর-চক্রবর্তী তাঁহার সতীর্থ ছিলেন। গৌরাঙ্গের পিতা পুরন্দর-মিশ্রের সহিতও তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। বিশারদ সম্ভবত অবস্থাপন্ন ছিলেন। তাঁহার একটি জাঙ্গাল 'বিশারদের জাঙ্গাল' নামে সর্বজন পরিচিত ছিল। জয়ানন্দ জানাইতেছেন যে বিশারদ বারাণসী-নিবাসী হইয়াছিলেন।[১]

এই বিশারদ-ভট্টাচার্যই ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ বাসুদেব-সার্বভৌমের জনক। একমাত্র 'চৈতন্যভাগবত'-গ্রন্থে তাঁহাকে বারেকের জন্য মহেশ্বর-বিশারদ বলা হইয়াছে। কিন্তু দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁহার 'বাঙালীর সারস্বত অবদান' নামক গ্রন্থে প্রমাণাদি প্রয়োগে জানাইয়াছেন যে তাঁহার নাম ছিল নরহরি-বিশারদ।[২]

(১) ন. খ., পৃ. ১২ (২) দীনেশবাবু এতৎ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত তথ্যগুলিও প্রদান করিতেছেন: নরহরি ছিলেন ১৫শ. শতকে গৌড়বঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষী। মিথিলার পক্ষধরমিশ্র-বাচস্পতি-মিশ্র ও শংকর-মিশ্র তাহার পরবর্তী কালের ব্যক্তি। এমনকি তিনি বজ্রপত্যুপাধ্যায়েরও কিঞ্চিৎ পূর্ববর্তী। (জয়ানন্দের গ্রন্থপাঠ করিয়া তিনি জানাইতেছেন যে গৌরাঙ্গ-জন্মের পূর্বেই নরহরি কাশীবাসী হন।) নরহরির চারিপুত্র—সার্বভৌম, বিদ্যাবাচস্পতি, কৃষ্ণানন্দ ও চণ্ডীদাস। মহাপণ্ডিত বিদ্যাবাচস্পতি সার্বভৌমের অগ্রজ হইলেও সার্বভৌমই ছিলেন অধিকতর খ্যাতিসম্পন্ন, তৎকালে সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষী। স্বয়ং নরহরিই তাঁহার গুরু ছিলেন এবং তিনি নিজে ছিলেন বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চার প্রথম সুপ্রসিদ্ধ প্রবর্তক। তাঁহার এযাবৎ-আবিষ্কৃত দুইখানি গ্রন্থই—'তত্ত্বচিন্তামণির অনুমান খণ্ডের টীকা' (আদ্যন্ত খণ্ডিত) এবং 'বেদান্ত প্রকরণ অদ্বৈতমকরন্দের টীকা'—তাঁহার অমর কীর্তি। নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি তাঁহারই শিষ্য। জলেশ্বর-বাহিনীপতি-মহাপাত্র-ভট্টাচার্য এবং চন্দনেশ্বর নামক তাঁহার পুত্রদ্বয়ের মধ্যে জলেশ্বর, এবং তৎপুত্র স্বপ্নেশ্বরাচার্য উভয়েরই পাণ্ডিত্যপূর্ণ অবদান আছে। বিদ্যাবাচস্পতিও মহাপণ্ডিত ছিলেন এবং তিনিও 'তত্ত্বচিন্তামণির টীকা' রচনা করিয়াছিলেন। পরবর্তিকালে তিনি রত্নাকর-বিদ্যাবাচস্পতি নামে খ্যাত হইলেও তাঁহার 'রত্নাকর'-নাম সম্পূর্ণতই কল্পিত। তাঁহার প্রকৃত নাম ছিল বিষ্ণুদাস বিদ্যাবাচস্পতি।

শ্রীযুক্ত গিরিজাশংকর রায়চৌধুরীর 'বাংলা চরিত গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য'-নামক গ্রন্থের প্রথম বক্তৃতামধ্যে বলা হইয়াছে যে 'নিমাই ভূমিষ্ঠ হইবার কয়েকমাস পূর্বেই' বিশারদ 'নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিলেন।' (কিন্তু লেখক এই তথ্য কোথায় পাইয়াছেন বলেন নাই।)

'উৎকলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে'র লেখক সারদাচরণ মিত্র লিখিয়াছেন (পৃ. ১১২) যে সার্বভৌম 'মিথিলা হইতে প্রত্যাবর্তন করত নব্যন্যায়ের বংগদেশে প্রতিষ্ঠা করেন।' এবং তিনিই ছিলেন 'প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণির অধ্যাপক।'

'শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান' গ্রন্থে (পৃ. ৬১৩) সার্বভৌমের 'সারাবলী,' 'সমাসবাদ' ইত্যাদি ন্যায়ের গ্রন্থের কথা উল্লেখিত হইয়াছে।

যাহাহউক, বাসুদেব-সার্বভৌম-ভট্টাচার্য এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতি,[৩] উভয়েরই খ্যাতি সুদূর-বিস্তৃত ছিল। হোসেন-শাহের 'সাকর-মল্লিক' স্বয়ং সনাতনও এক সময়ে তাঁহাদের নিকট বিদ্যাশিক্ষা করেন। 'ভক্তিরত্নাকরে' বলা হইয়াছে যে 'শ্রীসনাতনের গুরু বিদ্যাবাচস্পতি'[৪] মধ্যে মধ্যে সনাতনের অবস্থানক্ষেত্র রামকেলিতে গিয়াও বাস করিতেন। পরবর্তিকালে সনাতন তাঁহার সুবিখ্যাত 'দশম টিপ্পনী'-গ্রন্থ প্রণয়নকালে মঙ্গলনিমিত্ত তাঁহাদের নাম স্মরণ করিয়া গুরুবন্দনা গাহিয়াছিলেন। গৌরাঙ্গের বাল্য- ও কৈশোর-লীলায় যাঁহারা বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন তাঁহাদের মধ্যে শ্রীবাস হরিদাসাদি বয়োজ্যেষ্ঠদের অনেকের সহিতই সার্বভৌমের পরিচয় ছিল। কিন্তু গৌরাঙ্গের নাম ও খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িবার বহুপূর্বে কিংবা হয়ত তাঁহার আবির্ভাবেরও পূর্ববর্তিকালে সম্ভবত নবদ্বীপে রাজভয় উপস্থিত হইলে[৫] তিনি জগন্নাথ-ধামে চলিয়া যান। সেখানে তাঁহার ভগিনীপতি গোপীনাথ-আচার্য বাস করিতে থাকেন, তাঁহার মাতৃষ্বসাও নীলাচল-বাসী ছিলেন।

নীলাচলে গিয়া সার্বভৌম শাস্ত্রচর্চা ও অধ্যাপনা-কার্যে বিরত হন নাই। তৎকালে সারা-ভারতে তাঁহার মত বৈদান্তিক-পণ্ডিত অতি অল্পই ছিলেন। ফলে তিনি উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের বিশেষ সম্মানের পাত্র হইয়াছিলেন। কাশীর সুবিখ্যাত পণ্ডিত প্রকাশানন্দ, বিদ্যানগরের রামানন্দ, এমনকি সুদূর কর্ণাটরাজসভার মহাপণ্ডিত মল্লভট্ট[৬]— ইঁহারা সকলেই সার্বভৌমের সহিত বা তাঁহার নামের সহিত সুপরিচিত ছিলেন।

মহাপ্রভু প্রথমবার নীলাচলে পৌঁছাইয়া যখন বিগ্রহ-দর্শনে অচেতন হইয়া পড়েন, তখন সার্বভৌম-ভট্টাচার্য সেইস্থলে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার হস্তক্ষেপের ফলে চৈতন্যের প্রতি রুষ্ট পড়িছাবৃন্দ নিজদিগকে সংযত করেন। সার্বভৌম চৈতন্যের মধ্যে এক ঐশ্বরিক শক্তি প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহাকে স্বগৃহে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মুকুন্দাদি ভক্তবৃন্দও গোপীনাথ-আচার্যের সহিত আসিয়া পৌঁছাইলে সার্বভৌমের অনুরোধে তাঁহার গৃহেই সকলের ভিক্ষানির্বাহ হয়। এই বিষয়ে বৃন্দাবনদাস, কবিকর্ণপূর ও কৃষ্ণদাস-কবিরাজ প্রভৃতির ঘটনাগত বর্ণনা প্রায় একপ্রকার। কেবল লোচনদাস বলিয়াছেন যে

---

(৩) 'ভক্তমালে'র লেখক (পৃ. ৩০) একজন 'বিদ্যাবাচস্পতি ওড্রদেশীয়ে'র উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে তিনি 'গৌরাঙ্গের প্রিয়' ছিলেন। সম্ভবত গ্রন্থকার আলোচ্যমান বিদ্যাবাচস্পতিকেই ভুলবশত 'ওড্রদেশীয়' বলিয়াছেন। অবশ্য সার্বভৌম-ভ্রাতাও নীলাচলে গিয়া মহাপ্রভুর প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৪) ১।৫৯৮ ; বৈ. দি.—পৃ. ১৭ (৫) চৈ. ম. (ম.)—স. ৫, পৃ. ১১ (৬) চৈ. কৌ.—পৃ. ২১৩

মহাপ্রভু প্রথমে জগন্নাথ-মন্দিরে না গিয়া একেবারে সার্বভৌম-গৃহে গিয়া উঠিয়াছিলেন।[৭] মুরারি-গুপ্ত জানাইয়াছেন যে মহাপ্রভু প্রথমে পাঠরত সার্বভৌমকে জগন্নাথ-দর্শন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে সার্বভৌম তাঁহার রূপ দেখিয়া অভিভূত হন এবং স্বীয় পুত্রের সাহায্যে মহাপ্রভুর জগন্নাথ-দর্শনের ব্যবস্থা করেন।[৮] 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক'(৬ষ্ঠ. অঙ্ক)-অনুযায়ী কিন্তু সার্বভৌমের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিবার পূর্বেই মুকুন্দাদির সহিত গোপীনাথ-আচার্যের সাক্ষাৎ ঘটে ; গোপীনাথের চেষ্টার ফলেই সার্বভৌমের সাহায্য পাওয়া যায়। কিন্তু এতৎসংক্রান্ত বিষয়গুলির বর্ণনায় 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে'র সহিত 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কিত কালের কিছু অসংগতি বা বিভিন্নতা দৃষ্ট হইলেও উভয়ের বিবরণ প্রায় একই প্রকার। ঘটনাকালের উপর জোর না দিলে যে কোন একটি বর্ণনাই গ্রহণ করা যায়। কবিকর্ণপূর ঘটনাগুলিকে নাটকাকারে গ্রথিত করিয়াছিলেন বলিয়া হয়ত এই বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব নাও দিতে পারেন। পূর্বেই সার্বভৌম নীলাচলের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি হইয়া উঠিয়াছিলেন। পণ্ডিত, অধ্যাপক ও রাজবন্দিত[৯] ব্যক্তি বলিয়া জগন্নাথমন্দিরে তাঁহার বিশেষ প্রতিষ্ঠা ছিল। সকলেই তাঁহাকে ভয় ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন এবং মন্দির, বিগ্রহ ও তৎসংক্রান্ত কার্যাদিতে সম্ভবত তাঁহার বিশেষ হস্তও ছিল। তাই তিনি পুত্র ও রাজমহাপাত্র[১০] চন্দনেশ্বরকে দিয়া বৈষ্ণব-ভক্তদিগের মন্দির-ও বিগ্রহ-দর্শনের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তারপর বিগ্রহ-দর্শনে মহাপ্রভুর উক্তরূপ অবস্থান্তর ঘটায় তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী যাহাতে তিনি দূরাবস্থিত গরুড়-মূর্তির পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া নির্বিঘ্নে জগন্নাথ-দর্শন করিতে পারেন, তিনি তাহার ব্যবস্থাও করিয়া দিলেন। মহাপ্রভুর নির্জন-বাসের জন্যও তিনি স্বীয় মাতৃস্বসার গৃহে তাঁহার বাসস্থান স্থির করিয়া দিলেন।

কিন্তু চৈতন্য নীলাচলে পৌঁছাইবার পর হইতেই বৈদান্তিক-পণ্ডিতের মনে আলোড়ন আরম্ভ হইল। মহাপ্রভু পূর্ব হইতেই সার্বভৌমের নামের সহিত পরিচিত ছিলেন।[১১] যখন তিনি চৈতন্যকে 'নমো নারায়ণ' বলি নমস্কার কৈল' তখন চৈতন্য তাঁহাকে 'কৃষ্ণে মতিরস্তু' বলিয়া প্রত্যভিবাদন করিলেন।[১২] সার্বভৌম বুঝিলেন যে চৈতন্য বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী। তিনি গোপীনাথ-আচার্যের নিকট আরও জানিলেন যে চৈতন্যের মাতামহ সার্বভৌমেরই পিতৃদেবের সহাধ্যায়ী ছিলেন এবং চৈতন্যের পিতাও তাঁহার পিতার প্রীতি ও শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন, তদনুযায়ী চৈতন্যের সহিত তাঁহারও একটি বিশেষ স্নেহ-সম্বন্ধ থাকিবার

(৭) চৈ. ম.—ম. খ., পৃ. ১৭৬ (৮) শ্রীচৈ. চ.—৩।১১।১৩ (৯) ভক্তমাল-মতে (পৃ. ২০৩) সার্বভৌম ছিলেন 'সভাসদ প্রধান শ্রীপ্রতাপরুদ্রের'। (১০) চৈ. কৌ.—পৃ. ২২৭ (১১) শ্রীচৈ. চ.—৩।৪।২৫ (১২) এই উক্তি-প্রত্যুক্তি সম্বন্ধে সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থই প্রায় একমত।

কথা। সুতরাং সেই সম্বন্ধের কথা স্মরণ করিয়া, চৈতন্যের মধ্যে তিনি যে বেদান্তবিরোধী ধর্মভাবকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, স্নেহের দাবিতেই যেন তাহাকে সমূলে উৎপাটিত করিবার জন্য তিনি বদ্ধপরিকর হইলেন। গোপীনাথ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে কেশব-ভারতী চৈতন্যের দীক্ষা-গুরু। অথচ সম্প্রদায়-হিসাবে ভারতী-সম্প্রদায় শ্রেষ্ঠ নহে। তিনি গোপীনাথের নিকট আরও শুনিলেন যে চৈতন্যের 'বাহ্যাপেক্ষা' অর্থাৎ বড় সম্প্রদায়ের প্রাধান্য স্বীকার করিবার প্রয়োজন ছিল না। তৎসত্ত্বেও তিনি তাঁহাকে নিরন্তর বেদান্ত-অধ্যাপনার দ্বারা অদ্বৈত-মার্গে প্রবেশ করাইয়া পুনরপি যোগপট্ট দিয়া উত্তম সম্প্রদায়ে দীক্ষিত করিতে মনস্থ করিলেন। চৈতন্যই যে স্বয়ং-ভগবান্, গোপীনাথের এই দৃঢ় প্রত্যয়কে তিনি একপ্রকার উড়াইয়া দিলেন এবং একদিন সত্য সত্যই তাঁহাকে আপনার গৃহে আনাইয়া বেদান্ত-অধ্যাপনা আরম্ভ করিলেন।[১৩]

মহাপণ্ডিত সার্বভৌম-ভট্টাচার্য অধ্যাপনা করিতেছেন। প্রবুদ্ধাত্মা চৈতন্য সবিনয়ে তাহা শ্রবণ করিতেছেন। একদিন নয়, দুইদিন নয়, দিনের পর দিন অতিবাহিত হইল। মুখর-অধ্যাপক নির্বাক্-শ্রোতাকে ক্রমাগত আপনারই পথে আকর্ষণ করিয়া আনিতেছেন মনে করিয়া দ্বিগুণিত উৎসাহে পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া চলিতে লাগিলেন। কিন্তু একদিন সত্যসত্যই[১৪] তাঁহার ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল। চৈতন্যের অবিচ্ছিন্ন নীরবতা তাঁহার নিকট অসহ্য হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এমন নির্বাক্ থাকিলে তাঁহার অধ্যাপনা কার্যকরী হইতেছে কিনা তাহাতো বুঝা যায় না; সত্যই কি চৈতন্য কিছু বুঝিতেছেন, না, তাঁহার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। মহাপ্রভু উত্তর দিলেন:

তোমার আজ্ঞাতে মাত্র করিয়ে শ্রবণ॥
সন্ন্যাসীর ধর্মলাগি শ্রবণমাত্র করি।
তুমি যে করহ অর্থ বুঝিতে না পারি॥

তারপর উক্তি-প্রত্যুক্তি চলিল। নিজমত স্থাপন করিবার জন্য সার্বভৌম নানাবিধ প্রসঙ্গের অবতারণা করিলেন এবং ক্রমাগত বিতর্ক-জাল পাতিয়া চলিলেন। কিন্তু মহাপ্রভু তাঁহার সমস্ত যুক্তিকেই সহজে খণ্ডন করিয়া নিজমত স্থাপন করিলেন। অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী বুঝিলেন যে ভগবান সচ্চিদানন্দময় এবং 'ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য প্রভুর বিচ্ছক্তিবিলাস'; তিনি মায়াধীশ

---

(১৩) 'চৈতন্যভাগবতে' এই বেদান্ত-শিক্ষাবিষয়ক ঘটনা বর্ণনায় কিছু পার্থক্য দৃষ্ট হয়।—(চৈ. ভা.—৩।৩)—কিন্তু ঘটনা-সংস্থাপন-রীতি দেখিয়া তাহা ভ্রমাত্মক বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। আবার 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে' ভিন্ন-বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। 'চৈতন্যমঙ্গলে'ও অন্য এক প্রকার। কিন্তু সমস্ত বর্ণনার মূল বিষয় একই রহিয়াছে। ঘটনাগত সত্যতা নির্দেশের বিষয়ে 'চৈতন্যচরিতামৃত' এই সূত্রে সর্বাপেক্ষা নির্ভর যোগ্য গ্রন্থ। (১৪) সাতদিন পরে—চৈ. চ.—২।৬, পৃ, ১১৩; ভ. মা.—পৃ, ২৩৫

এবং জীবমাত্রই মায়াবশ— ঈশ্বরের সহিত জীবের এতটা পার্থক্য! এতবড় একটা দ্বৈত-ভাবকে যে কোনমতেই উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে না, তাহা উপলব্ধি করায় সার্বভৌমের অন্তরে আপনা আপনিই এক নির্মল ভক্তিভাবে উপচিত হইল। তিনি মহাপ্রভুর মধ্যে এক বিরাট শক্তিকে উপলব্ধি করিলেন এবং চৈতন্যের প্রতি ভক্তি-অর্ঘ্যস্বরূপ তাঁহার মুখ হইতে একশতটি শ্লোক উৎসারিত হইল। ইহাই পরে 'সার্বভৌম-শতক' নামে অভিহিত হয়[১৫]; এবং এইজন্যই বলা যায় যে সার্বভৌমই চৈতন্য-বন্দনাগীতির প্রথম কবি।[১৬] তাঁহার কয়েকটি শ্লোক 'পদ্যাবলীতে'ও উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু যাহাহউক, চৈতন্য সম্বন্ধে গোপীনাথের প্রত্যয়কে তিনি এক সময় হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন; আজ তাঁহার অলৌকিক শক্তিকে প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহাকে স্বয়ং-ভগবান বলিয়া তাঁহারও প্রত্যয় জন্মাইল।[১৭] সকল শাস্ত্রের সকল মূলতত্ত্বই যে ভক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা উপলব্ধি করায় তাঁহার সকল দ্বন্দ্বের নিরসন হইয়া গেল। মুক্তিকামী কঠোর অদ্বৈতবাদী ভক্তিকামী দ্বৈতবাদীতে পরিণত হইলেন।

সার্বভৌমের মহাপ্রভুকে শিক্ষা-দেওয়ার বাসনা চিরতরে ঘুচিয়া গেল। মন্ত্রমুগ্ধ-শিষ্যবৎ তিনি তখন হইতেই মহাপ্রভুর পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে লাগিলেন এবং প্রত্যহ জগন্নাথ-মন্দিরে না গিয়া চৈতন্যের নিকট হাজির হইতে লাগিলেন। একদিন তিনি জগদানন্দের হাতে দুইটি শ্লোক লিখিয়া মহাপ্রভুর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তাহাতে তিনি তাঁহাকে ভক্তিযোগ-আচরণ ও- প্রচারার্থ আবির্ভূত অদ্বিতীয় পুরাণ-পুরুষ বলিয়া বন্দনা করিলেন। এই সময় আর একদিন মহাপ্রভু অতি প্রত্যূষে জগন্নাথের শয্যোত্থান দেখিতে গেলে পূজারী তাঁহাকে মালা ও প্রসাদান্ন আনিয়া দেন এবং তাহা লইয়া তিনি ভট্টাচার্যের গৃহে উপস্থিত হন। সার্বভৌম তখন শয্যাত্যাগ করিয়া কৃষ্ণনাম লইতে লইতে বাহিরে আসিয়া মহাপ্রভুর সাক্ষাৎপ্রাপ্ত হইলে তিনি তাঁহাকে সেই মহাপ্রসাদ অর্পণ করিলেন। সার্বভৌম তৎক্ষণাৎ তাহা সাদরে গ্রহণ করিয়া দন্ত-মুখাদি প্রক্ষালন না করিয়াই ভক্ষণ করিলে মহাপ্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন দান করিলেন[১৮] এবং শতমুখে তাঁহার প্রশংসা করিয়া যেন আপনারই

---

(১৫) চৈ. ভা.—৩।৩, পৃ. ২৭২ (১৬) চৈ. গ.—পৃ. ৪ (১৭) চৈতন্যভাগবত-কার (৩।৩, পৃ, ২৭০) বলেন যে সার্বভৌম এই সময়ে ষড়্‌ভুজরূপ দর্শন করেন। 'চৈতন্যচরিতামৃত' (২।৬)-মতে কিন্তু প্রথমে সার্বভৌমের চতুর্ভুজরূপ দর্শন ঘটে, তাহার পর তিনি কৃষ্ণের 'স্বকীয় স্বরূপ' দেখিতে পান। 'চৈতন্য মঙ্গলে' (লো.—মধ্য, পৃ. ১৮০) কেবল ষড়্‌ভুজ-দর্শনের কথা আছে। 'ভ্রমনির্ণয়'-নামক একটি গ্রন্থে আছে যে (পৃ. ৩৯-৪০) সার্বভৌম দ্বিভুজ-গৌরহরি মূর্তি দেখিয়াছিলেন; তাঁহার অনুরোধ রক্ষার্থই চৈতন্য গৌরহরি নাম ধারণ করেন এবং সার্বভৌমের নিকট ইহা শুনিয়া প্রতাপরুদ্র সার্বভৌমকে বৃহস্পতি আখ্যা দান করেন। (১৮) চৈ. না.—৬।৬০; চৈ.চ.—২।৬, পৃ.১১৬; চৈ. চ. ম.—১২।৬১-৭০

সৌভাগ্য-স্মরণে আনন্দ-তন্ময় হইলেন। সার্বভৌমও যেন পূর্ব-পরিচিত বেদান্ত-তত্ত্বকে অস্বীকার করিয়াই মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করিলেন।

মহাপ্রভু চলিয়া গেলে সার্বভৌমও স্নানাহ্নিক শেষ করিয়া সেই পথ ধরিলেন এবং

জগন্নাথ না দেখিয়া সিংহদ্বার ছাড়ি।
প্রভুর বাসার কাছে যান তাড়াতাড়ি॥

মন্দিরের নিকট গেলে ভৃত্য তাঁহার ভুল হইয়াছে মনে করিয়া মন্দিরের পথ দেখাইয়া দিলেও তিনি সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। একেবারে মহাপ্রভুর নিকট গিয়া তিনি দণ্ডবৎ হইয়া তাঁহার স্তবস্তুতি আরম্ভ করিয়া দিলেন। মহাপ্রভু কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া বলিলেন,—আমি তোমার বালকমাত্র; বাৎসল্য না দেখাইয়া তুমি এ কী করিতেছ! তুমি সর্বশাস্ত্রজ্ঞ, শাস্ত্রের সারোদ্ধার করিয়া তাহার প্রতিপাদ্য বিষয় আমাকে শুনাও। সার্বভৌম শাস্ত্রালোচনা আরম্ভ করিলেন এবং তাঁহার বক্তব্য শেষ হইলে মহাপ্রভু 'সাধু সাধু' বলিয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলেন। অতঃপর সার্বভৌম দামোদর এবং জগদানন্দকে সঙ্গে লইয়া গিয়া তাঁহাদিগের দ্বারা দুইটি শ্লোক লিখিয়া পাঠাইলেন। সঙ্গে প্রসাদান্নও পাঠাইয়া দিলেন। মহাপ্রভু শ্লোক দুইটি দেখিয়া তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। সৌভাগ্যক্রমে, মুকুন্দ ইতিপূর্বে তাহা প্রাচীর-গাত্রে লিখিয়া লইয়াছিলেন।

কিছুদিন পরে মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের সম্মতি চাহিলে সার্বভৌম বিচ্ছেদ-ব্যথা সত্ত্বেও রাজি হইলেন। মহাপ্রভুর সহিত মিলনের পর তিনি গোদাবরী-তীরস্থ রামানন্দ-রায়ের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাই তিনি রামানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য মহাপ্রভুর নিকট নিবেদন জানাইলেন। যাত্রা আরম্ভ হইল।

ইহার পর উড়িষ্যা-রাজ প্রতাপরুদ্র নীলাচলে পৌঁছান এবং সার্বভৌম তাঁহাকে চৈতন্য সম্বন্ধে সকল তত্ত্ব ও তথ্য অবগত করাইয়া তাঁহার সহিত পরামর্শপূর্বক মহাপ্রভুর নির্জন-বাসের জন্য কাশীমিশ্রের গৃহে বাসা নির্ধারিত করিয়া রাখিলেন। আলোচনাকালে তিনি বুঝিয়া লইলেন যে মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইতে পারিলে রাজা নিজেকে ধন্য মনে করিবেন।

দীর্ঘকাল পরে মহাপ্রভু ফিরিলেন। সার্বভৌম তাঁহাকে প্রত্যুদ্গমন করিয়া আনিলেন এবং সেই রাত্রিতে নিজগৃহেই তাঁহাকে ভিক্ষানির্বাহ করাইলেন। মহাপ্রভু জানাইলেন যে তিনি তাঁহার সারা ভ্রমণ-পথে রামানন্দ ছাড়া সার্বভৌমতুল্য আর একজন বৈষ্ণবেরও সাক্ষাৎ পান নাই। সার্বভৌমের কুণ্ঠার অবধি রহিল না।

এখন হইতে মহাপ্রভু সার্বভৌম-প্রেমে বিভোর হইলেন। তাঁহাকে লইয়া তিনি মন্দিরে গমন করেন, তাঁহার সহিত তত্ত্বালোচনা করেন, সর্বদাই তাঁহাকে কাছে কাছে রাখেন। ভট্টাচার্য কিন্তু প্রতাপরুদ্রের কথা ভুলিয়া যান নাই। একদিন সুযোগ বুঝিয়া

তিনি ভক্ত-নৃপতির চৈতন্যসঙ্গ-লিপ্সার কথা নিবেদন করিলেন[১৯] কিন্তু মহাপ্রভু কঠোর-ভাবে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলে তিনি পত্রোত্তরে রাজাকে সকল কথা জানাইলেন। এক মর্মস্পর্শী প্রত্যুত্তর আসিল। নিত্যানন্দাদি ভক্তের সহিত মিলিত হইয়া তিনি পুনরায় মহাপ্রভুকে পত্রের মর্ম অবগত করাইলেন এবং নিত্যানন্দের সাহায্যে মহাপ্রভুর একটি বহির্বাস সংগ্রহ করিয়া রাজার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। এই সময় রামানন্দ-রায় নীলাচলে আসিলে তিনি তাঁহার সাহায্যে মহাপ্রভুর মনকে আরও একটু আর্দ্র করিয়া ফেলিলেন। রাজার সহিত না হইলেও, রাজপুত্রের সহিত মহাপ্রভু মিলিত হইলেন।

এদিকে রাজা-প্রতাপরুদ্র শ্রীক্ষেত্রে আসিয়া পৌঁছাইলে সার্বভৌম একটি পরিকল্পনা স্থির করিয়া তাঁহাকে জানাইলেন যে রথযাত্রার দিনে মহাপ্রভু রথাগ্রে কীর্তনের পর আবিষ্ট ও ক্লান্তদেহে পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিলে রাজবেশ পরিত্যাগকরত যদি তিনি ভাগবতের কৃষ্ণরাস-পঞ্চাধ্যায়ী শ্লোক পাঠ করিয়া তাঁহার চরণ-প্রান্তে পতিত হন[২০] তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই রাজাকে অনুগ্রহ করিবেন। তারপর রথযাত্রার প্রাক্কালে গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দ পুরুষোত্তমে পৌঁছাইলে সার্বভৌম রাজ-অট্টালিকার বলভীতে গিয়া গোপীনাথ-আচার্যের সহায়তায় ভক্তবৃন্দকে প্রদর্শন করিয়া রাজার নিকট তাঁহাদের পরিচয় প্রদান করিলেন। ইহার পর ঠিক রথযাত্রার পূর্বে মহাপ্রভু একদিন সার্বভৌমের আজ্ঞা লইয়া গণসহ গুণ্ডিচা-মার্জন করিলেন এবং রথযাত্রার দিন তিনি সম্প্রদায়-নৃত্যের মধ্যে আসিয়া নৃত্য করিতে থাকিলে সার্বভৌম প্রতাপরুদ্রকে সেই অপরূপ দৃশ্য দেখাইয়া মুগ্ধ করিলেন। শেষে মহাপ্রভু উদ্যানে প্রবেশ করিলে সার্বভৌম রাজার প্রতি ইঙ্গিত করিলেন। তাঁহার বিশেষ চেষ্টার ফলেই পূর্ব-নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন করিয়া প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইলেন।

এই সময় সার্বভৌম-ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতিও মহাপ্রভু-সন্দর্শনে নীলাচলে গমন করিয়াছিলেন। একদিন মহাপ্রভু সার্বভৌমকে মন্দিরস্থ দারুব্রহ্মরূপী পুরুষোত্তমের, এবং বাচস্পতিকে গৌড়স্থ জলব্রহ্মরূপী ভাগীরথীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিবার জন্য আদেশ দান করিলেন।[২১] কিন্তু চৈতন্যের জীবনদ্দশায় তাঁহার শত উপদেশ সত্ত্বেও ভক্তগণ একমাত্র তাঁহাকেই কৃষ্ণাবতার মনে করিয়া পূজা করিতেন। সার্বভৌম তাঁহারই সেবায় বিভোর হইলেন।

(১৯) প্রতাপরুদ্রের জীবনীতে এই সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। (২০) চৈ. চ.—৩।১১, পৃ. ১৫২ ; 'চৈতন্যচরিতামৃতমহাকাব্য' (১৩।৭৮-৮২) এবং 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে'ও (৮।৩৬) লিখিত আছে যে উপবনে মহাপ্রভু-প্রতাপরুদ্রের মিলন-সংঘটনের পরিকল্পনাটি ছিল সার্বভৌমেরই। কিন্তু 'ভক্তমাল'-মতে (পৃ. ২৩৬) রাসপঞ্চাধ্যায়ের শ্লোক পাঠ করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছিলেন রামানন্দ-রায়।
(২১) চৈ. চ.—২।১৫, পৃ. ১৮০

রথযাত্রার কয়েক মাস পরে গৌড়ীয় ভক্তগণ দেশে ফিরিয়া গেলে সার্বভৌম মহাপ্রভুর নিকট আবেদন জানাইয়া আপনার গৃহেই নীলাচলবাসী স্থায়ী ভক্তবৃন্দের ভিক্ষা-নির্বাহ করিবার একটি আংশিক ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ইচ্ছা ছিল যে মহাপ্রভুকে অন্তত মাসে কুড়িটি দিন তাঁহার গৃহে ভিক্ষা-নির্বাহ করিতে রাজি করাইবেন। কিন্তু সন্ন্যাসীর পক্ষে এতকাল একস্থানে ভিক্ষা-গ্রহণ অসমীচীন। তাই অনেক অনুনয়ের পর শেষ পর্যন্ত স্থির হইল যে মাসে অন্তত পাঁচটি দিনও মহাপ্রভুকে সার্বভৌমের গৃহে অন্ন-গ্রহণ করিতে হইবে। স্বরূপদামোদর তাঁহার বান্ধব[২২]; স্থির হইল যে তিনিও ইচ্ছানুযায়ী একাকী বা মহাপ্রভুর সহিত গিয়া তাঁহার গৃহে ভিক্ষা-নির্বাহ করিবেন।

একদিন মহাপ্রভু সার্বভৌম-গৃহে নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। ভট্টাচার্য-গৃহিণী ষাঠীর[২৩]-মাতা নিষ্ঠা সহকারে পরিপাটি করিয়া রন্ধন করিয়াছেন। মহাপ্রভু ভোজনে বসিলে ভট্টাচার্য-জামাতা ষাঠী-ভর্তা অমোঘ[২৪] আসিয়া উপস্থিত হইল। সে ছিল একটি কাণ্ডজ্ঞানহীন অপরিণামদর্শী লোভী যুবক। সার্বভৌম স্বয়ং পরিবেষণ করিতেছিলেন। তিনি একবার রন্ধন-গৃহে গমন করিলে সেই অবসরে অমোঘ মহাপ্রভুর অন্ন-ব্যঞ্জনাদি দেখিয়া নিন্দা করিতে লাগিল। একটি মাত্র সন্ন্যাসী দশবারজনের অন্ন-ভক্ষণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এইরূপ ইঙ্গিত করিয়া সে নানাবিধ কটুবাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিল। ভট্টাচার্য তাহা শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। তিনি লাঠি লইয়া তাড়াইয়া গেলেন, ষাঠীর-মাতাও স্বীয় কন্যার বৈধব্য কামনা করিলেন; কিন্তু অমোঘ পলাইয়া গেল। ভট্টাচার্য মহাপ্রভুর পায়ে ধরিয়া নানাপ্রকার আত্মনিন্দা করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া চলিয়া গেলে ভট্টাচার্য গৃহিণীর সহিত আলোচনা করিয়া স্থির করিলেন যে অমোঘ যদি বাঁচিয়াই থাকে তাহাহইলে ষাঠী যেন সেই অধঃপতিত-ভর্তাকে পরিত্যাগ করে। কিন্তু তাহার আর প্রয়োজন হয় নাই। পরে চৈতন্যের ক্ষমা লাভ করিয়া বিসূচিকা-রোগে হঠাদাক্রান্ত অমোঘের দেহ-মনের আমূল রূপান্তর সাধিত হয় এবং তাহারপর সেও এক নিষ্ঠাবান-ভক্তে পরিণত হয়। সার্বভৌমের ভক্তিপ্রভাবেই ইহা সম্ভব হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে মহাপ্রভু বলিয়াছেন যে অমোঘ তো দূরের কথা,

> সার্বভৌম গৃহে যে দাসদাসী যে কুক্কুর।
> সেহো মোর প্রিয় অন্যজন বহু দূর॥

পর বৎসর সার্বভৌম কাশীর পথে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে রথযাত্রা-দর্শনার্থী শিবানন্দ, গোবিন্দ-ঘোষ ও শ্রীবাসাদি গৌড়ীয়-ভক্তবৃন্দের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটে।

(২২) চৈ. চ.—২।১৫, পৃ. ১৮২ (২৩) সার্বভৌম-কন্যার নাম ছিল ষাঠী বা ষষ্ঠী। একটি চৈতন্য-কারিকা-গ্রন্থে (চৈ. কা.—পৃ. ৫) ইঁহাকে গৌরাঙ্গ-প্রেমের রাধা-স্বরূপিণী বলা হইয়াছে। (২৪) চৈ. চ.-এর গদাধর-শাখা মধ্যে একজন অমোঘের নাম আছে। তিনি এই অমোঘ কিনা বলা যায় না।

সেই সময়ে বারাণসীতে যে সকল সাধু-সন্ন্যাসী বাস করিতেছিলেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেই ছিলেন বৈদান্তিক মায়াবাদী পণ্ডিত। চৈতন্য-প্রবর্তিত ভক্তিধর্মের কাহিনী শুনিয়া তাঁহারা সেই অতুলনীয় ধর্মমতের উপর আক্রমণ চালাইতে থাকিলে সার্বভৌম তাহা সহ্য করিতে পারেন নাই, মহাপ্রভুর আজ্ঞা-গ্রহণ করিয়া বারাণসীর পথে যাত্রা করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি আর মহাপ্রভুর সঙ্গ ত্যাগ করেন নাই; কেবল মহাপ্রভুর গৌড়-গমনকালে অন্যান্য ভক্তবৃন্দের সহিত কটক পর্যন্ত গিয়া কিছুদিনের জন্য তাঁহাকে বিদায় দিয়া আসিতে হইয়াছিল।

মহাপ্রভু গৌড়ে আসিয়া বাসুদেব-দত্তের গৃহ হইতে বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে গিয়া উপস্থিত হন। জয়ানন্দ বলেন যে 'বায়ড়া গ্রামে বিদ্যাবাচস্পতি-ভট্টাচার্যে'র গৃহে এক রাত্রি অবস্থান করিবার পর তিনি কুলিয়ায় চলিয়া যান। অন্যান্য গ্রন্থেও একই বর্ণনা দৃষ্ট হয়।[২৫] কিন্তু কোথাও বায়ড়া-গ্রামের উল্লেখ নাই।[২৬] বৃন্দাবনদাস বাচস্পতি-মহাপ্রভু প্রসঙ্গটি বিশেষভাবে উত্থাপন করিয়া ভক্ত-বাচস্পতির চৈতন্যানুরাগ সম্বন্ধে সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। চৈতন্য-দর্শনের পর বাচস্পতি অভিভূত হইয়া পড়িলে মহাপ্রভু তাঁহাকে নানাভাবে কৃপা প্রদর্শন করেন। কিন্তু অসংখ্য লোকের ভিড় জমিয়া উঠায় মহাপ্রভু গোপনে কুলিয়ায় চলিয়া যান। এদিকে জনসাধারণ আসিয়া বিশারদকে ঘিরিয়া ধরিলে তিনি অপ্রতিভ হইয়া পড়েন। শেষে এক ব্রাহ্মণের নিকট মহাপ্রভুর সংবাদ অবগত হইয়া তিনি দর্শকবৃন্দকে নিরস্ত করেন এবং স্বয়ং কুলিয়ায় গিয়া প্রভু সমীপে বারবার প্রণতি জ্ঞাপনপূর্বক জানাইলেন যে মহাপ্রভুর এইরূপ গোপনভাবে চলিয়া আসার ফলে দর্শকবৃন্দের নিকট আজ তাঁহাকে যথেষ্ট অপ্রতিভ ও দোষাভিযুক্ত হইতে হইয়াছে। বাচস্পতির বাক্যে মহাপ্রভুর হৃদয় দ্রবীভূত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ বাহিরে আসিয়া দর্শনার্থী ভক্তবৃন্দকে দর্শন দান করিলে চতুর্দিকে আনন্দের ধ্বনি উত্থিত হইল।

ইহার পর আর আমরা কোথাও বিদ্যাবাচস্পতির সাক্ষাৎ পাইনা। কিন্তু মহাপ্রভু ইহার পর কানাইর-নাটশালা পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া প্রত্যাবর্তন করেন এবং নীলাচলে চলিয়া যান। নীলাচল হইতেই তিনি কিছুকাল পরে বৃন্দাবন-যাত্রা করেন। সেই সময়ে সার্বভৌমকে কিছুকালের জন্য তাঁহার বিচ্ছেদ-বেদনা সহ্য করিতে হয়। কিন্তু তাহার পর হইতে মহাপ্রভুর তিরোভাব পর্যন্ত তিনি সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার সেবা করিতে পারিয়াছিলেন।

(২৫) চৈ. ম. (জ.)—বি. খ. পৃ. ১৪০; শ্রীচৈ. চ.—৩।১৭।৫; ৪।২৫।২৮; চৈ. ভা.—১।১, পৃ. ৮; ২।৩, পৃ. ২৭৬-৭৯; চৈ. চ.—২।১, পৃ. ৮৫; ২।১৬, পৃ. ১৯০ (২৬) কেবলমাত্র আধুনিক বৈ. দি.-গ্রন্থে (পৃ. ৫৮) বায়ড়ার পরিবর্তে বিদ্যানগর গ্রামের উল্লেখ আছে এবং বৈ.দ.-গ্রন্থে (পৃ. ৩৪৫) বলা হইয়াছে যে চৈতন্যশাখাভুক্ত বিদ্যাবাচস্পতির নিবাস ছিল কাঁচড়াপাড়ায়।

চৈতন্য-প্রদর্শিত ভক্তি-ধর্মকে ধারণ করিয়া রাখিবার একটি দৃঢ় স্তম্ভ ছিলেন সার্বভৌম-ভট্টাচার্য। রামানন্দ এবং স্বরূপদামোদরের সহিত সর্বদাই মহাপ্রভু তাঁহাকে কীর্তিত করিয়াছেন এবং জানাইয়াছেন যে 'ষড়্দর্শনবেত্তা', 'ষড়্দর্শনে জগদ্গুরু ভাগবতোত্তম' সার্বভৌম-ভট্টাচার্যই তাঁহাকে 'ভক্তিযোগপার' প্রদর্শন করাইয়াছেন। তত্ত্বের দিক হইতে 'ভক্তিযোগ' কথাটির অর্থ না করিয়াও আমরা বুঝিতে পারি যে সার্বভৌম তাঁহার স্বীয় জীবনের মধ্যেই ভক্তিযোগকে যেভাবে কার্যকরী করিতে পারিয়াছিলেন তাহাতে মহাপ্রভু-প্রদর্শিত ধর্ম যেন পূর্ণ সার্থকতা লাভ করিয়াছিল।[২৭]

স্বয়ং মহাপ্রভুর বিদ্যমানতার জন্যই নীলাচলের ভক্ত-গোষ্ঠীর শক্তি-সামর্থ্য ঠিক ঠিক ধরা পড়ে নাই। রবিরশ্মিতে যেন তারকামণ্ডলী আচ্ছন্ন হইয়াছিল। কিন্তু বৃন্দাবনস্থ রূপ-গোস্বামীর মত সার্বভৌমও নীলাচলে এক প্রচণ্ড শক্তিরূপে বিদ্যমান ছিলেন। ভক্তবৃন্দের ভিক্ষা-ব্যবস্থা, বাস-ব্যবস্থা, বিগ্রহ-দর্শনের বন্দোবস্ত, রথযাত্রার পূর্বে তৎসংক্রান্ত সমূহ বিষয়ের তদারকী কার্য, স্বয়ং রাজা-প্রতাপরুদ্রকে বিভিন্ন কর্মে প্রবৃত্ত করা, শাস্ত্রালোচনাদির দ্বারা মহাপ্রভুকে আনন্দদান—সকল কর্মই তিনি সুচারুরূপে নির্বাহ করিতেন, মহাপ্রভুর তিরোভাবের পরেও তিনি কিছুকাল জীবন-ধারণ করিয়াছিলেন। 'ভক্তিরত্নাকর'-প্রণেতা জানাইতেছেন যে মহাপ্রভুর তিরোভাবের পরে শ্রীনিবাস-আচার্য নীলাচলে আসিয়া তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারিয়াছিলেন।[২৮]

দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় 'বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান'-গ্রন্থে জানাইয়াছেন যে সার্বভৌম ১৫৩২ খ্রী.-এ কাশীতে গিয়া কাশীবাসী হইয়া যান। কবিরাজ-গোস্বামী-বর্ণিত সার্বভৌমের কাশী-গমনকালটিকে ভুল মনে করিয়া তিনি 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকো'ক্ত উক্ত কাশীগমন-বৃত্তান্তটিকে গ্রন্থের শেষাংশে বর্ণিত দেখিয়া উহার কালকে পরবর্তী বলিয়া ধরিবার প্রয়োজনীয়তাকে পুষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু শেষাঙ্কে বর্ণিত হইলেও উক্ত অঙ্কের অন্যান্য বিষয়গুলির ঘটনাকাল যথেষ্ট পূর্ববর্তী। শ্রীবাস-হরিচন্দন-প্রতাপরুদ্র ঘটনাটি 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে'র শেষাংশে বর্ণিত হইলেও 'চৈতন্যচরিতামৃত'-কার কিন্তু স্পষ্টই

(২৭) ভ. নি.-মতে (পৃ. ১১৯) একবার উৎকলবাসী ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগের মনে চৈতন্যানুমোদিত মতবাদ সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হইলে মহাপ্রভু সার্বভৌমের উপরই তাঁহাদের সন্দেহ নিরসনের ভারার্পণ করেন এবং সার্বভৌম কুণ্ঠা প্রকাশ করিলে তিনি বলিয়াছিলেন—আজি হইতে মোর ধর্ম ভক্তিভাবরসে। ব্যবস্থা পণ্ডিত তুমি শুনহ মানসে। (২৮) বৈ.ব.-মতে (পৃ. ৩৫০) সার্বভৌম শেষে নবদ্বীপে বাস করিয়াছিলেন। নি. ব. (পৃ. ২৮) ও নি. বি.(পৃ. ৩২)-মতে বীরচন্দ্রের নীলাচলগমন-কালেও সার্বভৌম জীবিত ছিলেন; মু. বি.-মতে জাহ্নবার দত্তকপুত্র রামচন্দ্রও নীলাচলে গিয়া তাঁহার সাক্ষাৎ পান।

জানাইয়াছেন যে উহা বহুপূর্ববর্তী ঘটনা।[২৯] তাছাড়া, উপরোক্ত স্থলে বর্ণিত হইয়াছে যে মহাপ্রভুর বিনানুমতিতেই সার্বভৌম কাশীর বিদ্বৎসমাজে চৈতন্য-মত প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই তথায় গিয়াছিলেন। কিন্তু সেই কার্য স্বয়ং-মহাপ্রভুর দ্বারাই পূর্বে সংসাধিত হইয়াছিল। মহাপ্রভুকর্তৃক প্রকাশানন্দ-জয়ের পর একই কারণে সার্বভৌমের কাশী-গমনের প্রয়োজন থাকে না। ঘটনার যাথার্থ্য- বা কাল-নির্ণয় ব্যাপারে 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র সহিত 'চৈতন্যভাগবত' বা 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে'র অমিল দেখা গেলে 'চরিতামৃতে'র বর্ণনাকে প্রামাণিক ধরা যায়। বর্ণনা-সামঞ্জস্য থাকিলে কিন্তু তাঁহাদের অভিমত বিবেচনা-সাপেক্ষ[৩০] হইয়া উঠে। কবিকর্ণপূরের বিংশ-সর্গ-সমন্বিত 'চৈতন্যচরিতামৃতমহাকাব্যে' কিন্তু উক্ত ঘটনাটি চতুর্দশ-সর্গের প্রথমাংশেই নিবদ্ধ হইয়াছে। তাহার পরে প্রায় সাতটি সর্গ বর্ণনার পর মহাপ্রভুর তিরোভাব-বার্তা বর্ণিত হইয়াছে। এই সর্গগুলির মধ্যে মহাপ্রভুর নীলাচল-লীলার প্রথম দিকের ঘটনাগুলি দিয়াই বিবরণ আরম্ভ করা হইয়াছে।

---

(২৯) ১৫১২ খ্রী.-এর ঘটনা (৩০) দ্র.—দ্বারপাল-গোবিন্দ

রামানন্দ-রায়

দাক্ষিণাত্যে গোদাবরী-তীরে বিদ্যানগর।[১] বিদ্যানগরের অধিকারী রামানন্দ-রায়। তাঁহার পিতা ভবানন্দ-রায়। ভবানন্দের পাঁচপুত্র—রামানন্দ, গোপীনাথ, কলানিধি, সুধানিধি, বাণীনাথ। তাঁহাদের পদবী ছিল পট্টনায়ক। কিন্তু তাঁহারা বিত্তবান ছিলেন এবং রাজ-সম্মান প্রাপ্ত হইতেন বলিয়া সম্ভবত তাঁহাদের 'রায়'-খ্যাতি হইয়াছিল। ভবানন্দ ও রামানন্দ যথাক্রমে ভবানন্দ-রায় ও রামানন্দ-রায় নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহারা উড়িষ্যা-রাজ প্রতাপরুদ্রের অধীনস্থ রাজা বা প্রদেশ-শাসক ছিলেন। হরেকৃষ্ণ মহতাব তাঁহার Radha Kumud Mukharji Endowment Lectures-এর মধ্যে বলিতেছেন (History of Orissa—p.91), "Ramananda Ray and Gopinath Badajena were respectively the governors of Rajmahendri in the south and of Midnapur in the north." প্রাচীন গ্রন্থগুলির বিবরণ-অনুযায়ী জানা যায় যে জাতিতে তাঁহারা ছিলেন শূদ্র।[২]

মহাপ্রভু দক্ষিণ-ভ্রমণে বহির্গত হইয়া সার্বভৌমের অনুরোধে গোদাবরী-তীরে রামানন্দের সহিত মিলিত হন।[৩] সম্ভবত প্রতাপরুদ্রের সম্পর্কেই সার্বভৌম রামানন্দের সহিত পরিচিত হইয়া বৈষ্ণব-ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার প্রগাঢ়-পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়াছিলেন। রামানুজ মধ্বাচার্য প্রভৃতির জন্মস্থানরূপে বহু পূর্ব হইতেই দাক্ষিণাত্য-প্রদেশ বৈষ্ণব ধর্মের পীঠ-ভূমিতে পরিণত হইয়াছিল। রামানন্দের পক্ষে তাই মহাপ্রভুর দক্ষিণ-গমনের পূর্বেই বৈষ্ণব-তত্ত্ব ও সিদ্ধান্তের সহিত সম্যক্ পরিচিত হওয়া সম্ভবপর হইয়াছিল। এক্ষণে চৈতন্যের মধ্যে তিনি তাঁহার সেই পূর্বজ্ঞাত তত্ত্বের পূর্ণ প্রকাশ প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্মিত

---

(১) 'অধুনা রাজমহেন্দ্রী নামে পরিচিত'—পদাবলী পরিচয়, পৃ. ১১ ; দাক্ষিণাত্যে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য—পৃ. ৩১,৮৭ (২) রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ রামানন্দ-রায়কে 'কায়স্থ' বলিয়াছেন (রায়-রামানন্দ—পৃ. ১৭) এবং ভজননির্ণয়-গ্রন্থে (পৃ. ১৩৬) রামানন্দ মাধবেন্দ্র-পুরীর অনুশিষ্য ও রাঘবেন্দ্র-পুরীর শিষ্য ছিলেন।—এই সকল বিবরণের কোন সমর্থন দেখা যায় না। (৩) মহাপ্রভু রামানন্দের গৃহে গিয়া পৌঁছাইলে রামানন্দ 'কৃষ্ণপূজাবসানে' তাঁহাকে দেখিতে পান ; শ্রীচৈ. চ.—৩।১৫।২ ; গোদাবরী-পারে মহাপ্রভুর নামসংকীর্তনকালে রামানন্দ দোলায় চড়িয়া স্নানার্থ আসিলে উভয়ের সাক্ষাৎ ঘটে।—চৈ. চ., ২।৮, পৃ. ১২৩ ; মহাপ্রভু গোদাবরী-তীরে আসিলে রামানন্দ রায় 'মন্ত্রাকৃষ্ট' ও 'গ্রহগ্রহীতে'র ন্যায় তাঁহার নিকটে আসেন।—চৈ. না., ৭।১১ ; মহাপ্রভু গোদাবরী-তীরে আসিলে রামানন্দ আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন।—গৌ. ক., পৃ. ২১ ; মহাপ্রভু রামানন্দের গৃহে গিয়াই তাঁহার সহিত মিলিত হন।—চৈ. ম. (জো.), শে. খ., পৃ. ১৮৫,

হইলেন। শূদ্র ও রাজসেবী বলিয়া তাঁহার কুণ্ঠার অবধি ছিল না। কিন্তু মহাপ্রভু দর্শনমাত্রেই চিনিলেন যে রামানন্দ প্রকৃতই মহাভাগবত। পরস্পর পরস্পরের মুখে কৃষ্ণকথা শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইলেন। কিন্তু বেলা অধিক হইয়া যাওয়ায় মহাপ্রভুকে বিপ্রগৃহে ভিক্ষা-নির্বাহার্থ গমন করিতে হইল। রামানন্দও তখনকারমত স্বগৃহে চলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে রামানন্দ আসিয়া মহাপ্রভুর চরণে অবনত হইলেন। উভয়ের মধ্যে সাধ্যসাধন-তত্ত্বের আলোচনা সুরু হইল। মহাপ্রভু প্রশ্ন করিয়া যান। রামানন্দ উত্তর দিতে থাকেন। অভিপ্রেত উত্তর পাইয়া আনন্দ-রোমাঞ্চ-চিত্তে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতে করিতে মহাপ্রভু রামানন্দকে ভক্তি-জগতের বিচিত্র অলি-গলি ঘুরাইয়া ক্রমাগত উচ্চ হইতে উচ্চতর মার্গে টানিয়া আনেন। ক্রমে রামানন্দের সমস্ত বিদ্যা-বুদ্ধি শেষ হইয়া যায়। কিন্তু মহাপ্রভুর প্রশ্নের আর বিরাম নাই। শেষে রামানন্দ 'পহিলহি রাগ'-নামক তাঁহার স্বরচিত ব্রজবুলি-পদটি[৪] আবৃত্তি করিয়া গেলে মহাপ্রভু প্রেমাবেশে অস্থির হইয়া স্বহস্তে তাঁহার মুখ চাপিয়া ধরিলেন। কিন্তু মন্ত্রমুগ্ধের মত রামানন্দ যেন এক অননুভূতপূর্ব পুলক ও শক্তি লাভ করিয়া আপনার অজ্ঞাতে প্রশ্নোত্তরাদি দান করিতে করিতে প্রেমলোকের উচ্চতম শৃঙ্গে উঠিয়া গিয়াছিলেন। সেই ভাবজগৎ হইতে বিপুল-বিস্ময়ে তাকাইয়া তিনি সম্মুখোপবিষ্ট মহাপুরুষকে 'কখনো বা ভাবময় কখনো মূরতি'-রূপে প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্ময়-বিহ্বল হইলেন।[৫] তিনি বুঝিয়াছিলেন যে 'রাধিকার ভাবকান্তি করি অঙ্গীকার, নিজ রস আস্বাদিতে' স্বয়ং কৃষ্ণই চৈতন্যরূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

বিপ্রগৃহে বসিয়া ভক্তিতত্ত্ব আলোচনা ও কৃষ্ণপ্রেমগান করিতে করিতে রজনীর পর রজনী অতিক্রান্ত হইল।[৬] শেষে বিদায়কালে মহাপ্রভু রামানন্দকে বিষয় ত্যাগ করিয়া নীলাচলে গমন করিবার জন্য আদেশ দান করিলেন। তিনি রামানন্দের সহিত কৃষ্ণ-প্রেমামৃত-রস পান করিতে করিতে সুখে জীবন অতিবাহিত করিবেন, ইহাই তাঁহার বাসনা। এইরূপ সৌভাগ্য রামানন্দ ছাড়া আর কাহারও হয় নাই। তপন-মিশ্র, লোকনাথ-চক্রবর্তী, রঘুনাথদাস প্রভৃতির সহিত ইতিপূর্বেই মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ ঘটিয়া গিয়াছে। পরবর্তিকালে গোপাল-ভট্ট, রঘুনাথ-ভট্ট, এবং সনাতন-রূপের সহিতও তাঁহার

---

(৪) আসামের যশোরাজ-খানের একটি পদকে বাদ দিলে ইহাকেই ব্রজবুলি ভাষায় রচিত প্রথম পদ বলিয়া ধরা হয়। (৫) চৈতন্যচরিতামৃত-মতে (২।৮, পৃ. ১৩৩-৩৪) রামানন্দ প্রথমে কৃষ্ণের 'শ্যাম-গোপরূপ' দেখিয়াছিলেন। কিন্তু পরে তাঁহার দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া মহাপ্রভু তাঁহাকে 'রসরাজ মহাভাব দুই একরূপে' কৃষ্ণের যুগলমূর্তি প্রদর্শন করেন। চৈ. ম.-এও (লো.)—শে. খ., পৃ. ১৮৫-৮৬) এই ভাবে রূপ-পরিবর্তনের কথা আছে। (৬) দশরাত্রি—চৈ. চ., ২।৮, পৃ. ১৩৪

সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল। কিন্তু তাঁহাদিগকে তিনি যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার সহিত এই রামানন্দসঙ্গ-লিপ্সার কতইনা পার্থক্য! চৈতন্য-পরিমণ্ডলের মধ্যে যাঁহারা আসিতে পারিয়াছিলেন, মহাপ্রভু তাঁহাদের প্রত্যেকের জীবনকেই সর্বতোভাবে সার্থক করিয়াছিলেন। কিন্তু নিরন্তর চৈতন্যসঙ্গ-প্রাপ্তির মধ্য দিয়া ব্যক্তিগত লাভালাভের বিচারে যাঁহারা অধিক সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যেও আবার স্বরূপদামোদর ও রামানন্দ-রায়ই ছিলেন সর্বাপেক্ষা সৌভাগ্যশালী।

মহাপ্রভু চলিয়া গেলে রামানন্দ রাজা-প্রতাপরুদ্রের অনুমতি আনাইয়া নীলাচল-যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন। এদিকে মহাপ্রভুও প্রত্যাবর্তন-পথে আবার বিদ্যানগরে পৌঁছাইয়া রামানন্দের সহিত মিলিত হইলেন। তিনি দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণপথে পয়স্বিনী-তীরস্থ আদিকেশব-মন্দির হইতে 'ব্রহ্মসংহিতা' এবং কৃষ্ণবেনওা-নদীতীরস্থ কোন দেব-মন্দির হইতে 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' নামক ভক্তিধর্ম বিষয়ক দুইখানি গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। সেই অমূল্য গ্রন্থ দুইখানি সর্বপ্রথম রামানন্দের হস্তেই প্রদান করিয়া তিনি নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করিলেন। হাতি-ঘোড়া-সৈন্যাদির সাজ-সজ্জাদি করিবার জন্য রামানন্দের কয়েকদিন বিলম্ব হইল।

মহাপ্রভুর নীলাচলে আসিবার অল্পকাল পরে প্রতাপরুদ্র নীলাচলে পৌঁছান। ঠিক একই সময়ে রামানন্দ তথায় আসিয়া পৌঁছাইলে পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ ঘটে। তারপর রামানন্দ মহাপ্রভুর দর্শনলাভ করিতে গেলে তিনি তাঁহাকে প্রেমাবেশে আলিঙ্গন দান করিলেন। 'ব্যবহার নিপুণ' 'রাজমন্ত্রী' রামানন্দ তখন মহাপ্রভুর নিকট প্রতাপরুদ্রের উদার চরিত্র ও মহত্ত্বের পরিচয় প্রদান করিয়া জানাইলেন যে রামানন্দের চৈতন্য-চরণাশ্রয়-লিপ্সার কথা শুনিয়া প্রতাপরুদ্র সানন্দে তাঁহাকে চৈতন্য-চরণ ভজনের আজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। তাছাড়া, চৈতন্যচরণ-দর্শনের সৌভাগ্য অর্জন করিতে না পারায় রাজা নিজেই যেন মরমে মরিয়া আছেন। এইভাবে রামানন্দ মহাপ্রভুর রাজ-বিরাগী মনকে সম্ভবত কিঞ্চিৎ পরিমাণে দ্রবীভূত করিয়া বিশিষ্ট ভক্তবৃন্দের চরণ বন্দনা করিলেন এবং তাহার পর জগন্নাথ-দর্শন-মানসে গাত্রোত্থান করিলেন। মহাপ্রভু দেখিয়া আশ্চর্য হইলেন যে রামানন্দ ক্ষেত্রপতি-জগন্নাথের দর্শন-লাভ না করিয়াই সর্বপ্রথম তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। রামানন্দ কিন্তু অকুণ্ঠিত চিত্তে জানাইলেন যে তাঁহার বিচার করিবার অবসর বা প্রয়োজন ছিলনা, তাঁহার মনই তাঁহাকে সর্বপ্রথম চৈতন্যপদপ্রান্তে টানিয়া আনিয়াছে।

প্রকৃতপক্ষে, ইহাই ছিল চৈতন্যযুগীয় বৈষ্ণবদিগের মূল প্রেরণার কথা। ভগবানকে মানুষী-রূপ দান করিয়া তাঁহার প্রতি ভক্তি-প্রেমার্ঘ্য অর্পণ করাই ছিল চৈতন্যের জীবনাদর্শ।

কিন্তু যাঁহাদিগের সম্মুখে তিনি আজীবন এতবড় একটি আদর্শ তুলিয়া ধরিয়া অন্তর্মুখী হইবার জন্য নির্দেশ দান করিয়াছিলেন, তাঁহারা বাহিরে যাহাই করুন না কেন, তাঁহাদের অন্তর-জগতে যিনি 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' হইয়া রহিয়াছিলেন, তিনি কিন্তু কোনও অচিন্ত্য-শক্তি দেবতা নহেন, তিনি এই জগতেরই পার্থিব মানুষ, নদীয়ার দুলাল নিমাই বা চৈতন্য। রামানন্দ ছিলেন উক্ত বৈষ্ণবদিগেরই অগ্রগণ্য। এত বড় পাণ্ডিত্যের অধিকারী হইয়াও তাই তিনি চৈতন্যের মধ্যেই সকল তত্ত্বের সমাধান পাইয়াছিলেন। তাই জগন্নাথ-বিগ্রহ-দর্শনও তাঁহার কাছে বড় কথা ছিলনা।

এখন হইতে রামানন্দ চৈতন্যচরণ-সেবা আরম্ভ করিলেন। তাঁহারই প্রচেষ্টাতে মহাপ্রভু প্রথমে রাজপুত্রের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন এবং পরে তাঁহার প্রভাবে ও সার্বভৌমের পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতাপরুদ্রের পক্ষে চৈতন্য-চরণপ্রাপ্তিও সম্ভব হইয়াছিল। কিন্তু সার্বভৌমকে যেইরূপ মধ্যে মধ্যে পার্থিব-বিষয়-বিশেষে নিরত থাকিতে হইত, রামানন্দকে সেইরূপ ভাবে লিপ্ত হইতে হইতনা। তাহার ফলে তিনি তাঁহার সেবা-ভক্তি বিষয়ে একেবারে অনন্যমনা হইতে পারিয়াছিলেন। মহাপ্রভু সেইজন্য তাঁহার মনে কোনদিন কোনপ্রকার কষ্ট দিতে পারেন নাই। সনাতন-রূপাদিকে তিনি পরীক্ষার মধ্য দিয়া উত্তীর্ণ করিয়াছেন এবং উচিত শিক্ষা দিয়া সার্বভৌমেরও অহংকার চূর্ণ করিয়াছিলেন। কিন্তু রামানন্দ ও স্বরূপদামোদরের সম্পর্কে তাঁহার এই প্রকার মনোভাব কখনও জাগে নাই। তিনি যেন প্রথম হইতেই তাঁহাদিগকে স্বীয় সাধন-সঙ্গী বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন।

মহাপ্রভু তাঁহার বৃন্দাবন-গমনের বহুপোষিত বাসনার কথা জ্ঞাপন করিলে সার্বভৌম ও রামানন্দ 'আজ'-'কাল' করিয়া তাঁহার যাত্রাকালকে দুইবৎসর পিছাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহাদের সম্মতিক্রমে শেষে একদিন তিনি যাত্রা আরম্ভ করিলে রামানন্দও ভক্তবৃন্দের পশ্চাতে দোলায় চড়িয়া গমন করিলেন। মহাপ্রভু ভুবনেশ্বর হইয়া কটকে পৌছাইয়া স্বপ্নেশ্বর-বিপ্রের গৃহে ভিক্ষা-নির্বাহ করিলেন এবং রামানন্দ ভক্তবৃন্দের ভিক্ষা-ব্যবস্থা করিয়া প্রতাপরুদ্রের নিকট মহাপ্রভুর আগমন-সংবাদ দান করিলেন। তারপর প্রতাপরুদ্র কর্তৃক গমনের সুব্যবস্থা হইলে তিনি পুনরায় মহাপ্রভুর সহিত চলিলেন এবং যাহাতে পথিমধ্যে তাঁহার অসুবিধা না হয় তজ্জন্য পূর্ব হইতেই বিভিন্ন-স্থানে লোক পাঠাইয়া তাহার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। এইভাবে যাজপুর হইয়া তাঁহারা রেমুণায়[৭] পৌছাইলে মহাপ্রভু রামানন্দকে বিদায় দিলেন। রামানন্দ অচেতন হইয়া পড়িলে মহাপ্রভু তাঁহাকে সান্ত্বনা দান করিয়া পুনরায় যাত্রা সুরু করিলেন।

(৭) চৈ. চ.—২।১৬; কবিকর্ণপুর তাঁহার দুইটি গ্রন্থেই (চৈ. চ. ম.—২০।৯; চৈ. না.—৯।১১, ২৩) জানাইয়াছেন যে রামানন্দ কটক পর্যন্ত গিয়াছিলেন।

সেইবার মহাপ্রভুর বৃন্দাবন যাওয়া হয় নাই। গৌড় হইতে নীলাচলে ফিরিয়া পুনরায় একাকী বৃন্দাবন-গমনের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে রামানন্দ ও স্বরূপদামোদর অনেক অনুরোধ করিয়া তাঁহার সহিত একজন ব্রাহ্মণ-ভৃত্যকে পাঠাইয়া দেন। বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসিলে রামানন্দ তাঁহাকে আজীবন সেবা করিবার সুযোগ লাভ করিলেন।

অল্পকাল পরে রূপ-গোস্বামী নীলাচলে পৌছান। তখন তিনি তাঁহার কৃষ্ণলীলানাটকখানি লিখিতেছিলেন। সেই সময় একদিন ভক্তবৃন্দ সহ হরিদাস-আশ্রমে আসিয়া চৈতন্যপ্রভু তাঁহাকে উক্ত নাটকখানি পাঠ করিবার জন্য নির্দেশদান করেন। বৈষ্ণব-ভক্তিশাস্ত্র-রচন ও -প্রণয়নের যোগ্য অধিকারী ও ব্রজের রসপ্রেম-লীলার প্রবর্তক রূপ-গোস্বামীরও প্রেমলীলা-বিষয়ক নাট্যরচনাকে পরীক্ষা করিবার যোগ্যতম ব্যক্তি ছিলেন বলিয়া বোধকরি রামানন্দের উপর ঐ নাটকখানি পরীক্ষা ও বিচারের ভার পড়িয়াছিল। নাটক পাঠ হইয়া গেলে তিনি রায় দিয়াছিলেন। কিন্তু রূপের 'চৈতন্য-স্তুতিবাদ' সম্বন্ধে মহাপ্রভু বিশেষ আপত্তি উঠাইলেও শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে রামানন্দের সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

শুধু তাহাই নহে। রামানন্দের আধ্যাত্মিক শক্তি সম্বন্ধেও মহাপ্রভু একেবারে নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে প্রদ্যুম্ন-মিশ্র নামক একজন গৃহস্থ ভক্ত নীলাচলে আসিয়া চৈতন্যের আজীবন সঙ্গী হইয়াছিল। তাঁহার জন্মস্থান ও নিবাসভূমি ছিল উৎকল প্রদেশেই[৮]। তিনি একান্তভাবেই চৈতন্যানুরাগী ছিলেন। বৃন্দাবন-দাস লিখিয়াছেন[৯]:

শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্র কৃষ্ণসুখের সাগর।
আত্মপদ যারে দিলা শ্রীগৌরসুন্দর ॥

একদিন সেই প্রদ্যুম্ন-মিশ্র কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিতে চাহিলে মহাপ্রভু তাঁহাকে রামানন্দের নিকট পাঠাইয়া দেন। কিন্তু রামানন্দের সেবক তাঁহাকে সংবাদ দিলেন যে রামানন্দ তখন দুইটি অপূর্ব সুন্দরী কিশোরীকে এক নিভৃত উদ্যানে লইয়া গিয়া নৃত্যগীত শিক্ষা দিতেছেন। প্রদ্যুম্ন শুনিলেন যে রামানন্দ গীতার গূঢ়ার্থ ও স্বীয়-রচিত 'জগন্নাথবল্লভ-নাটকে'র গীত-নৃত্য শিক্ষা দিবার জন্য প্রত্যহ স্বহস্তে সেই দুইটি কিশোরীর সর্বাঙ্গ মর্দন-মার্জন করিয়া তাঁহাদিগকে স্নান করাইয়া দেন এবং তারপর তাঁহাদিগের দ্বারা গূঢ়-অর্থ অভিনয় করাইয়া তাঁহাদিগকে সঞ্চারী-সাত্ত্বিক-স্থায়িভাবের লক্ষণ, ও ভাব-প্রকটার্থ লাস্যাদি শিক্ষাদানে উপযুক্ত করিয়া তুলিলে তাঁহারা জগন্নাথের সম্মুখে গিয়া সংগীত-নৃত্যাভিনয় করিতে থাকেন। এই সমস্ত গুহ্য-ক্রিয়া সম্পাদন সত্ত্বেও রামানন্দ যে নির্বিকার থাকেন তাহা

(৮) চৈ. ভা.—১।৬. পৃ. ২৭৩; ৩।৫, পৃ. ৩০৪; বৈ. দ.-মতে (পৃ. ৩৫১) প্রদ্যুম্ন-মিশ্র ব্রহ্মচারীর নিবাস ছিল বৈদ্যবাটি। (৯) চৈ. ভা.—৩।৫, পৃ. ৪০৪

শুনিয়া প্রদ্যুম্ন-মিশ্র বিস্মিত হইলেন। কিছুক্ষণ পরে রামানন্দ আসিয়া তাঁহার আগমনহেতু জিজ্ঞাসা করিলে মিশ্র জানাইলেন যে তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আসিয়াছেন। অসময় হইয়া যাওয়ায় তিনি আসল উদ্দেশ্যের কথা বলিতে পারিলেন না, সেদিনের মত বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন। অন্যদিন মাহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি প্রদ্যুম্নকে রামানন্দ সকাশে কৃষ্ণকথা শ্রবণের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রদ্যুম্ন-মিশ্র আনুপূর্বিক সমূহ বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে মহাপ্রভু জানাইলেন যে নির্বিকার ও নিস্পৃহচিত্তে বিধি-বহির্ভূত ও ধর্ম-বিগর্হিত এতবড় বিপদ্‌জনক ও দুরূহ কর্ম করিবার অধিকার একমাত্র রামানন্দের মত লোকেরই রহিয়াছে[১০]। মহাপ্রভু বিষয়-ভোগী রাজা ও নারীকে পরিহার করিয়া চলিতেন। তাঁহারই মুখে রাজতুল্য রামানন্দের এই প্রকার নারী-সঙ্গ-লাভের সম্বন্ধে এইকথা শুনিয়া প্রদ্যুম্ন-মিশ্র বুঝিলেন যে অপ্রাকৃতদেহ রামানন্দের মনোভাব বুঝিতে পারার মত ব্যক্তি এক মহাপ্রভু ব্যতিরেকে দ্বিতীয় আর নাই। মহাপ্রভুর নিকট তিনি শুনিলেন যে রামানন্দের ভজন রাগানুগা-মার্গী, এবং স্বয়ং চৈতন্যকেও কৃষ্ণকথা শুনাইবার শক্তি তাঁহার আছে। চৈতন্য-আদেশে প্রদ্যুম্ন-মিশ্র পুনর্বার রামানন্দের নিকট আসিয়া কৃষ্ণকথা-শ্রবণে বিমুগ্ধচিত্ত হন। যে রামানন্দ গৃহস্থ হইয়াও 'ষড়্‌বর্গ' বশীভূত করিয়া 'কন্দর্পের দর্প নাশ' করিয়াছিলেন এবং বিষয়ী হইয়াও সন্ন্যাসিপ্রবরকে উপদেশ দান করিবার শক্তি অর্জন করিয়াছিলেন, মহাপ্রভু সেই অস্পৃশ্য শূদ্র রামানন্দকে বক্তার আসনে বসাইয়া ব্রাহ্মণ শ্রোতার নিকট ভক্তিতত্ত্ব ও প্রেমের সারকথা প্রকাশ করিয়া দিলেন।[১১]

জীবন-সায়াহ্নে মহাপ্রভু রামানন্দের কৃষ্ণকথা ও স্বরূপের গান শুনিয়াই কোনরকমে প্রাণধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সহিত তিনি জয়দেব চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির গীত শ্রবণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন এবং অধিক রাত্রিতে তিনি তাঁহাদের নিকট অন্তরের গূঢ়-ভাবগুলির মর্ম উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিতেন। তারপর রাত্রির শেষভাগে রামানন্দ নিজগৃহে শয়ন করিতে যাইতেন। কখনও কখনও রায়ের নাটকও গীত হইত এবং 'কৃষ্ণ-কথামৃত' পঠিত হইত। বিভিন্ন সময়ে মহাপ্রভু বিভিন্নভাবে ভাবিত থাকিতেন। তাঁহার অঙ্গে তখন বিভিন্ন সাত্ত্বিক-লক্ষণ প্রকাশ পাইলে রামানন্দ এবং স্বরূপ তদনুযায়ী শ্লোকাদি উচ্চারণ

---

(১০) ১৩৩০ সালের 'গৌরাঙ্গপ্রিয়া'-পত্রিকার পৌষ-সংখ্যায় ভোলানাথ ঘোষবর্মা মহাশয় লিখিয়াছেন, "মহাপ্রভু বলিলেন—রাম রায়ের এইপ্রকার দেবদাসী সঙ্গকে কেহ যেন যোষিৎসঙ্গ বলিয়া বুঝিওনা।"

(১১) পণ্ডিত প্রবর ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার 'বাংলার সাধনা'-নামক গ্রন্থে (পৃ. ৬৪-৬৫) লিখিয়াছেন, "অথচ এই মহাপ্রভুই প্রকৃতি সম্ভাষণ অপরাধে ছোট হরিদাসকে চিরকালের জন্য বিসর্জন দিয়েছেন। তাতেই বোঝা যায় কলা ও সৌন্দর্যের পথে সাধনা করতে গেলে কে যোগ্যপাত্র এবং কে যোগ্য নয় তা তিনি জানতেন এবং কতটুকু কার যোগ্যতা তাও মহাপ্রভু বুঝতেন।"

করিয়া তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিতেন[১২] এই দুইটি ভক্ত ছাড়া তখন তাঁহার যেন কোন গতিই ছিল না।[১৩]

মহাপ্রভুর তিরোভাবের পর শ্রীনিবাস-আচার্য নীলাচলে উপস্থিত হইলে রামানন্দের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল। তাহারপর তাঁহার সম্বন্ধে কোন প্রামাণিক গ্রন্থে আর কোন বিবরণ রক্ষিত হয় নাই।[১৪]

রামানন্দ-রায়ের সুপ্রসিদ্ধ 'জগন্নাথবল্লভ'-নাটকটিতে চৈতন্য-বন্দনা না থাকায় রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন ('রায় রামানন্দ'—পৃ. ৫০৫) "মহাপ্রভুর ভক্তমাত্রেই গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে মহাপ্রভুর বন্দনা করিয়াছেন। শ্রীজগন্নাথবল্লভনাটকে শ্রীচৈতন্যদেবের বন্দনা নাই। ইহাতে অনুমিত হয় ১৪৩২ শকের পূর্বে কোনও সময়ে তিনি এই নাট্য-গীতিকা রচনা করিয়াছিলেন।" এই অনুমান অসত্য না হইতেও পারে। ডা. সুকুমার সেন মনে করেন যে রামানন্দ তাঁহার বিখ্যাত 'জগন্নাথবল্লভনাটক' বা 'রামানন্দ সংগীত নাটক' ছাড়াও সম্ভবত কিছু কিছু পদরচনা করিয়া থাকিতে পারেন।[১৫] দীন কানু দাস একটি পদে জানাইতেছেন :

রসে ভাসি রাম রায় রসের সংগীত গায়
বিরচিল রসপদ বহু।

সম্ভবত লেখক এইস্থলে রামানন্দের নাটক-ধৃত সংস্কৃত-সংগীতগুলির কথা বলিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু ডা. মনোমোহন ঘোষ তাঁহার 'বাংলা সাহিত্য' নামক গ্রন্থের পঞ্চদশ অধ্যায়ের মধ্যে জানাইতেছেন, "কিন্তু বাংলাভাষায় রচিত রামানন্দরায়ের কতকগুলি পদ সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন, উড়িষ্যায় প্রাপ্ত এবং উড়িয়া অক্ষরে লিখিত এক পুথি হইতে উক্ত পদগুলির সংস্কার ও প্রকাশ করিয়াছেন। এই পুস্তকের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকায় তিনি নানা বিরোধী যুক্তি-তর্কের খণ্ডন করিয়া দেখাইয়াছেন যে, রামানন্দের ভণিতাযুক্ত নবাবিষ্কৃত পদগুলি সুপ্রসিদ্ধ রামানন্দ রায়েরই রচিত বটে।"

---

(১২) শ্রীচৈ. চ.—৩।২৪।৮-৯ (১৩) মহাপ্রভুর ঐ সময়কার অবস্থা সম্বন্ধে স্বরূপ-দামোদর দ্রষ্টব্য। (১৪) ম. বি.-মতে জাহ্নবার দত্তক-পুত্র রামচন্দ্র নীলাচলে গিয়া তাঁহার কৃপা প্রাপ্ত হন। (15) HBL—pp. 25, 26, 27, 28. (১৬) গৌ. ৩,—পৃ. ৩০২

স্বরূপদামোদর

স্বরূপদামোদরের পূর্ব-নাম ছিল পুরুষোত্তম-আচার্য।[১] গৌরাঙ্গের নবদ্বীপ-লীলাকালেই তিনি তাঁহার চরণে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তৎকালে গৌরাঙ্গের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ কিরূপ ছিল তাহার বিবরণ কোন প্রাচীন-গ্রন্থে দৃষ্ট হয়না। কিন্তু 'মুরারি গুপ্তের কড়চা', ও জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল'[২] ইত্যাদি গ্রন্থ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে বৈষ্ণব-জগতে পুরুষোত্তমের স্থান তখন খুব নিম্নেও ছিলনা। 'চৈতন্যভাগবত' ও 'চৈতন্যচরিতামৃত' হইতে জানা যায় যে স্বরূপের সহিত পুণ্ডরীক-বিদ্যানিধির যথেষ্ট সৌহার্দ্য ও সখ্য ছিল। গদাধর-গুরু পুণ্ডরীকের সহিত প্রীতির সম্বন্ধ থাকায় তাঁহার উচ্চাবস্থানই সূচিত হয়। গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দ সর্বপ্রথম নীলাচলে গিয়া পৌছাইলে অদ্বৈতপ্রভু স্বরূপকে ভৃত্য-গোবিন্দের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তাহা হইতেও বুঝিতে পারা যায় যে তাঁহার সহিত অদ্বৈতাচার্যেরও পূর্ব-পরিচয় ছিল, এবং 'পাটপর্যটনে'ও স্বরূপকে নবদ্বীপবাসী বলা হইয়াছে।[৩] এইসমস্ত হইতে মনে হয় যে খুবসম্ভবত নবদ্বীপেই গৌরাঙ্গের সহিত তাঁহার প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটিয়াছিল। 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে' দেখা যায় যে নীলাচলে গিয়া মহাপ্রভুর সহিত প্রথম সাক্ষাৎকালে তিনি মহাপ্রভুর দ্বারা বিশেষভাবে সংবর্ধিত হন। 'চৈতন্যচরিতামৃতে'ও নীলাচলবাসীদিগের মধ্যে যাঁহারা মহাপ্রভুর 'পূর্বসঙ্গী' ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে স্বরূপদামোদরের নাম উল্লেখিত হইয়াছে[৪] এবং একই গ্রন্থের বর্ণনায়[৫] দেখা যায় যে সার্বভৌম-ভট্টাচার্যও স্বরূপকে স্বীয় 'বান্ধব' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইহা হইতেও উপরোক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থিত হইতে পারে। আবার মহাপ্রভুর উক্তি হইতেও তাঁহাকে গৌড়বাসী বলিয়া ধারণা জন্মে। নীলাচলে মহাপ্রভুর গুণ্ডিচা-মার্জনকালে এক সরল গৌড়বাসী ঘটোদকে তাঁহার পাদ-প্রক্ষালন করিয়া সেই জল পান করিলে মহাপ্রভু স্বরূপদামোদরকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন :

> এই দেখ তোমার গৌড়ীয়ার ব্যবহারে।
> তোমার গৌড়ীয়া করে এতেক কৈতব।[৬]

১. স্বরূপদামোদরের বংশপরিচয়াদি সম্বন্ধে 'প্রেমবিলাসে'র চতুর্বিংশ বিলাসে[৭] লিখিত হইয়াছে যে ব্রহ্মপুত্র-তীরবর্তী ভিটোদিয়া-গ্রামবাসী পণ্ডিত-পদ্মগর্ভাচার্যের নবদ্বীপে অধ্যয়নকালে নবদ্বীপবাসী জয়রাম-চক্রবর্তী স্বীয় কন্যার সহিত কুলীন সন্তানের বিবাহ দিয়া

---

(১) চৈ.চ.ম.—১৩।১৩৭-৪৪ ; চৈ.ভা.—৩।১১, পৃ. ৩৪৩ (২) এবং ভ. নি.—পৃ. ৩০৭ (৩) পা. প.—১০৯ (৪) ১।১০, পৃ. ৫৪ ২।১৫, পৃ. ১৮২ (৫) চৈ. চ.—২।১২, পৃ. ১৮০ (৬) পৃ. ২৪৪-৪৫ (৭) নরোত্তম-জীবনীতে লক্ষ্মীনারায়ণ সম্বন্ধে সংগৃহীত তথ্যাদি প্রদত্ত হইয়াছে।

তাঁহাকে নিজগৃহে রাখেন। ক্রমে পদ্মগর্ভাচার্যের ঔরসে পুরুষোত্তম জন্মগ্রহণ করিলে তিনি পত্নী ও পুত্রকে নবদ্বীপে শ্বশুরালয়ে রাখিয়া মিথিলায় ন্যায়াদি শাস্ত্র ও কাশীতে সাংখ্য-মীমাংসা-বেদান্তাদি অধ্যয়ন করিয়া সেইস্থানে মাধবেন্দ্র-গুরু লক্ষ্মীপতির নিকট গোপাল-মন্ত্রে দীক্ষিত হন এবং 'ক্রমদীপিকার টীকা' 'পৈঙ্গী রহস্য ব্রাহ্মণের ভাষ্য' ও 'উপনিষদের দ্বৈতভাষ্য' রচনা করেন। অধ্যয়ন-শেষে তিনি জন্মস্থান ভিটোদিয়ায় ফিরিয়া পুনরায় দুইটি বিবাহ করেন এবং কয়েকটি পুত্রসন্তান লাভ করেন। তাঁহাদের মধ্যে লক্ষ্মীনাথ-লাহিড়ী অন্যতম। রূপনারায়ণ-লাহিড়ী এই লক্ষ্মীনাথেরই পুত্র।[৮] এদিকে মাতামহ পুরুষোত্তম নবদ্বীপবাসী হইয়া 'আচার্য'-উপাধিতে খ্যাতিলাভ করিলেন এবং চৈতন্যের সন্ন্যাস-গ্রহণ দেখিয়া তিনিও প্রায় অর্ধোন্মাদ হইয়া পড়িলেন।

প্রামাণিক গ্রন্থগুলি হইতে জানা যায় যে মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের পর পুরুষোত্তম বারাণসীতে গিয়া চৈতন্যানন্দ[৯] নামক কোন সন্ন্যাসীকে গুরুর পদে বরণ করিয়া চৈতন্য-বিরহ-বেদনা হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে চাহিলে তিনি তাঁহাকে বেদান্ত-পাঠের এবং বেদান্ত-অধ্যাপনার জন্য উপদেশ প্রদান করেন। কিন্তু পুরুষোত্তম কৃষ্ণভজনার জন্যই সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস লইয়াছেন, এবং শিখা-সূত্র ত্যাগ করিয়াও যোগপট্ট গ্রহণ করেন নাই। সুতরাং গুরুর নিকট আজ্ঞা লইয়া তিনি একেবারে নীলাচলে আসিয়া হাজির হইলেন। মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণান্তে নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের কিছুকাল পরে পুরুষোত্তম তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। সন্ন্যাস-গ্রহণের পরে তখন পুরুষোত্তমের নাম হইয়াছে স্বরূপদামোদর। কবিরাজ-গোস্বামী জানাইতেছেন যে স্বরূপ নীলাচলে পৌঁছাইলে মহাপ্রভু ভাবাবেশে বলিয়াছিলেন :

> তুমি যে আসিবে তাহা স্বপ্নেতে দেখিল।
> ভাল হৈল অন্ধ যেন দুই নেত্র পাইল॥

তিনি তাঁহার জন্য একটি পৃথক বাসাঘর ও একজন পরিচারকের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

নীলাচলবাসী সমস্ত ভক্তের মধ্যমণি ছিলেন স্বরূপদামোদর। মহাপ্রভুর একদিকে ছিলেন গোবিন্দ-কাশীশ্বরাদি বৈষ্ণববৃন্দ, যাঁহারা দাসরূপে তাঁহার সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। আর একদিকে ছিলেন রামানন্দ-সার্বভৌমাদি ভক্তের দল, যাঁহারা হইয়াছিলেন তাঁহার

(৮) নরোত্তম জীবনীতে লক্ষ্মীনারায়ণ এবং রূপনারায়ণ সম্বন্ধে সংগৃহীত তথ্যাদি প্রদত্ত হইয়াছে।
(৯) চৈ. ভা.—৮।১৫ ; চৈ. চ.—২।১০, পৃ. ১৪৮

সাধন-ভজনের সঙ্গী। স্বরূপ ছিলেন এই দুই দলের মধ্যবর্তী। একদিকে ভৃত্য বা দাস, অন্যদিকে সাধ্যসাধন-সঙ্গী। বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন:

সন্ন্যাসী-পার্ষদ্ যত ঈশ্বরের হয়।
দামোদর স্বরূপ সমান কেহো নয়॥

'চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবনদাসে'র এই উক্তি সর্বৈব সত্য।[১০]

মহাপ্রভুর সহিত স্বরূপের সাক্ষাৎ ও মিলনের অল্পকাল পরেই গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দ নীলাচলে পৌছাইলে মহাপ্রভুর ইচ্ছানুযায়ী স্বরূপ এবং গোবিন্দ দুইটি মাল্য লইয়া ভক্তবৃন্দসহ অদ্বৈতপ্রভুকে সংবর্ধনা জানাইয়াছিলেন। সেই হইতে প্রতি বৎসর এই মাল্যদানের ভার তাঁহাদের উপরেই পড়িত। আবার উৎসবাদি ব্যাপারে পরিবেশনের ভারও স্বরূপের উপর পড়িত। কাহাকেও অভিপ্রেত দ্রব্য ভোজন করাইতে হইলে মহাপ্রভু বিশেষ করিয়া স্বরূপকেই তদনুরূপ নির্দেশ দান করিতেন। মহাপ্রভু যখন মন্দির-দর্শনে বাহির হইতেন তখনও স্বরূপকে তাঁহার সঙ্গে থাকিতে হইত। নবদ্বীপে নরহরি ও নিত্যানন্দপ্রভুর যে বিশেষ দায়িত্ব ছিল নীলাচলে অসংখ্য কর্তব্যের সহিত স্বরূপদামোদরকে সেই গুরু দায়িত্বটিকেও পালন করিয়া চলিতে হইত। ভাবের ঘোরে মহাপ্রভু পাছে কোথাও পড়িয়া গিয়া আঘাতপ্রাপ্ত বা ক্ষতবিক্ষত হন, তজ্জন্য তাঁহাকে প্রায় সর্বদাই মহাপ্রভুর সঙ্গে থাকিতে বা গমন করিতে হইত। আবার রথযাত্রাদিকালে তাঁহাকে সন্নিকটে থাকিয়া নৃত্য-সংকীর্তন করিতে হইত, কখনও মৃদঙ্গাদি বাজাইতে হইত, কখনও বা প্রয়োজনানুসারে যথোপযুক্ত সংগীত গাহিয়া, বা চৈতন্যাভিপ্রেত শাস্ত্র-শ্লোকাদি উদ্ধৃত করিয়া তাঁহাকে তাঁহার মানসলোকের দরজাগুলিও মুক্ত বা বন্ধ করিয়া দিতে হইত।

প্রকৃতপক্ষে সংগীত ও মৃদঙ্গবাদ্যে (পাখোয়াজ ও খোল[১১]) স্বরূপ ছিলেন অদ্বিতীয়। মহাপ্রভুর পূর্বে ও তাঁহার সময়ে প্রচলিত কীর্তন 'প্রবন্ধগানের অন্তর্ভুক্ত' হইলেও তিনি 'শাস্ত্রীয় রাগ ও তালকে অবলম্বন ক'রে নাম-কীর্তনের প্রবর্তন' করেন।[১২] সুতরাং 'প্রণালীবদ্ধ'[১৩] কীর্তন-সংগীতের স্রষ্টা স্বয়ং চৈতন্যই যখন তাঁহার ভাবোন্মাদনার দিনগুলিতে এই স্বরূপের সংগীতসুধা শ্রবণে 'কর্ণপিপাসা' মিটাইয়া পরিতৃপ্ত হইতেন, তখন তাঁহার সংগীত-নৈপুণ্যের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে পারা যায়।[১৪] তাই দেখা যায় যে গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দের নীলাচল-গমনের প্রথম বৎসরে রথযাত্রা উপলক্ষে চৈতন্য-প্রবর্তিত

(১০) শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বলেন যে ('নাম সংকীর্তন'—শারদীয়া যুগান্তর, ১৩৬৪) মহাপ্রভু রঘুগোস্বামীর সহিত রামানন্দ-রায় এবং স্বরূপদামোদরকে 'ঋষি'র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। (১১) স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ—পদাবলী কীর্তনের পরিচয় (বলরামদাসের পদাবলী, পৃ. ২৩-২৮) (১২) ঐ (১৩) ঐ (১৪) মুরারিলাল অধিকারী বলেন (বৈ. দি.—পৃ. ৫৪) "এখনকার কীর্তনের উৎপত্তিও প্রণালী স্বরূপের দ্বারাই প্রবর্তিত হইয়াছিল।"

বেড়াকীর্তনের মধ্যে স্বরূপদামোদরকে একটি দলের নেতৃত্ব করিতে হইয়াছিল। তাহার পর স্বীয় উদ্দণ্ড নৃত্যকালেও মহাপ্রভু সাতটি দল হইতে আবার প্রধান নয়জনকে বাছিয়া লইয়া স্বরূপদামোদরের উপর তাঁহাদেরও নেতৃত্বের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। ইহাতে মনে হয় যে স্বরূপ কেবল সুগায়ক নহেন, নৃত্য-সংগীত বিদ্যাবিশারদও ছিলেন। তাণ্ডব-নৃত্য ছাড়িয়া যখন মহাপ্রভুর আদেশানুযায়ী তিনি তাঁহার হৃদয়াভিলাষানুযায়ী সংগীত গাহিতে লাগিলেন তখন মহাপ্রভুর 'ভাবান্তর' ঘটিয়াছিল। ইহার কারণ, বাস্তবিকই যেন

স্বরূপের ইন্দ্রিয়ে প্রভুর নিজেন্দ্রিয়গণ।
আবিষ্ট করিয়া করে গান আস্বাদন॥

স্বরূপ এবং রামানন্দ এই দুইজনের সহিত মহাপ্রভু রাত্রিদিন ধরিয়া 'চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক-গীতি, কর্ণামৃত, শ্রীগীতগোবিন্দ' পাঠ ও শ্রবণ করিতেন এবং 'রামানন্দের কৃষ্ণকথা স্বরূপের গান' শুনিয়া তিনি শেষজীবনে কোন প্রকারে প্রাণধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু যেখানে 'শুদ্ধ সখ্য'-ভাবেই ছিল রামানন্দের ভক্তিনিবেদন, সেখানে গদাধর জগদানন্দের মত 'মুখ্য রসানন্দ'ই[১৫] শেষে স্বরূপদামোদরকে ভক্তিমার্গের সর্বোচ্চ ভূমিতে টানিয়া আনিয়াছিল। এখানে রসানন্দ বলিতে মাধুর্য-রসের কথাই দ্যোতিত হইয়াছে। এইজন্যই তাঁহার পক্ষে মহাপ্রভুর আনন্দ-লোকের এমন খোরাক যোগাড় করিয়া দেওয়া সম্ভব হইয়াছিল। সংগীতের ছন্দে, নৃত্যের দোলায়, ভাগবতাদি বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থ হইতে গল্প-কথনে, সংস্কৃত-বাংলা-উড়িয়া পদের পাঠ-মাধুর্যে তিনি যেন মহাপ্রভুর জীবনকে ভরিয়া রাখিয়াছিলেন। বৈষ্ণবশাস্ত্রের রস-বিচারে মধুর-রসের স্থান সর্বোচ্চে এবং দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুর রসপর্যায়ে 'পূর্ব পূর্ব রসের গুণ পরে পরে বৈসে।' কিন্তু স্বরূপদামোদর মুখ্যভাবে রসানন্দে বিভোর থাকিলেও ভক্তিসাধনের পথে দাস্যভাব হইতেই তাঁহার যাত্রারম্ভ। রামানন্দের সহিত তিনি নিজেকে সময় বিশেষে সখ্যভাবেও ভাবিত করিতেন। গদাধর-গুরু পুণ্ডরীক-বিদ্যানিধির সহিত তাঁহার বিশেষ সখ্য ছিল, এবং তিনি অদ্বৈত-নিত্যানন্দ-শ্রীবাসাদির 'প্রিয়তম' ও 'প্রাণসম' ছিলেন। সুতরাং তিনি চৈতন্যাপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ থাকায় তাঁহার মধ্যে বাৎসল্য-রসের সদ্ভাব থাকাও স্বাভাবিক। কিন্তু কেবল মধুর-রসের পথিক বলিয়াই যে তাঁহার পক্ষে অন্য রস-গুলির আস্বাদন সম্ভব হইয়াছিল, তাহা নহে। তিনি যেন প্রতিটি পর্যায়ের সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয়ের মধ্য দিয়াই ভক্তি-জগতের সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হইয়াছিলেন। চৈতন্য-পার্ষদমণ্ডলীর মধ্যে এতবড় সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছিলেন একক এই স্বরূপদামোদরই। স্বরূপদামোদরের মধ্যে তাই চৈতন্য-প্রবর্তিত ভক্তি-ধর্মের চরম বিকাশ সাধিত হইয়াছিল। এইজন্য এই স্বরূপদামোদরই ছিলেন চৈতন্য-জীবনতত্ত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কারক।

(১৫) চৈ. চ.—২।২; পৃ. ৯৩

ইহার সহিত অন্য একটি দিক আছে, তাহা তাঁহার বিদ্যাবত্তার দিক। এইদিক দিয়া তাঁহার স্থান কোনো অংশেই রামানন্দ বা সার্বভৌম অপেক্ষা নিম্নস্থ ছিল না এবং এইজন্যই তিনি ছিলেন মহাপ্রভুর কৃষ্ণ-তত্ত্বালোচনার শ্রেষ্ঠ-সঙ্গী। মহাপ্রভু কর্তৃক আনীত 'ব্রহ্মসংহিতা' ও 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' নামক ভক্তি-ধর্মের আকর-সদৃশ দুইখানি গ্রন্থ তাঁহার নিকটেই থাকিত। পূর্বোক্ত উদ্দণ্ড নৃত্যের দিন মহাপ্রভু যখন কাব্যপ্রকাশের 'যঃ কৌমার-হরঃ'—প্রভৃতি শ্লোকটি উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার গূঢ়ার্থ স্বরূপ এবং রূপ-গোস্বামী ছাড়া আর কেহই বুঝিতে পারেন নাই। রূপ-গোস্বামীর এই জ্ঞান সম্বন্ধে মহাপ্রভু সম্ভবত বিশেষ কিছু জানিতেন না। কিন্তু স্বরূপের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে তিনি নিঃসন্দেহে ছিলেন বলিয়া রূপ-গোস্বামীকৃত ঠিক তদনুরূপ আর একটি শ্লোক যখন মহাপ্রভুর হস্তগত হইল, তখন তিনি একমাত্র স্বরূপকে ডাকিয়াই তৎসম্বন্ধীয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

যদি কোন ভক্ত কোনও গ্রন্থ বা পদ রচনা করিয়া মহাপ্রভুকে শুনাইতে আসিত, তাহা হইলে তাহা পূর্বাহ্নে স্বরূপকে দেখাইয়া লইতে হইত। ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ কথার আভাসমাত্র থাকিলে বা কোথাও বিন্দুমাত্র রসাভাস দোষ ঘটিলে, তাহা পাছে মহাপ্রভুর রসানুভূতির বিঘ্ন উৎপাদন করে, সেইজন্য শাস্ত্র-পারদর্শী ও রসবেত্তা স্বরূপ তাহা পূর্বে সংশোধন করিয়া দিলে তবেই তাহা মহাপ্রভুর পাঠযোগ্য হইত। স্বরূপের প্রতি স্বয়ং চৈতন্যের এই শ্রদ্ধা ও নির্ভরতার[১৫] জন্যই সকলকে প্রথমে তাঁহার নিকট পরীক্ষা দান করিয়া তবে মহাপ্রভুর নিকট যাইবার অধিকার লাভ করিতে হইত। ভগবান-আচার্যের ভ্রাতা গোপাল-ভট্টাচার্য বারাণসী হইতে বেদান্ত অধ্যয়ন শেষ করিয়া যখন নীলাচলে আসিয়াছিলেন, তখন ভগবান সেই গোপালের বেদান্তভাষ্য শ্রবণেচ্ছু হইয়া স্বরূপের আজ্ঞা

(১৫) ভ.নি.-মতে (পৃ. ১০০, ১২৮) মহাপ্রভু স্বয়ং বিষ্ণুপুরী রচিত 'ভাবার্থপ্রদীপ' নামক ভক্তি-বিষয়ক গ্রন্থখানি স্বরূপের হস্তেই প্রদান করিলে মহাপ্রভুর ইচ্ছানুযায়ী স্বরূপের হস্তক্ষেপের ফলেই তাহা অপূর্ব শোভায় মণ্ডিত হয়। গ্রন্থকার স্বরূপের প্রতি চৈতন্যের শ্রদ্ধা-বিষয়ক আর একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন (পৃ. ৯৮-৯৯)। একবার প্রতাপরুদ্র আসিয়া মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন: রাধার বিচ্ছেদে কৃষ্ণ 'রাধা রাধা' বলে। কৃষ্ণের বিরহে রাধা 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে॥ রাধাকৃষ্ণ যদি জানি একরূপ ধরে। 'রাধাকৃষ্ণ' বলে কেবা বিরহ অন্তরে॥—মহাপ্রভু বলিলেন, স্বরূপ ছাড়া আর কেহ ইহার উত্তর দিতে পারিবে না। রাজানুরোধে স্বরূপ উত্তর-দানের প্রতিশ্রুতি দিয়া নিভৃতে বসিয়া ভাগবত-মতে 'রসার্থকৌমুদী'-গ্রন্থ রচনা করিয়া দিলেন। রাজা সেই গ্রন্থপাঠে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলে স্বরূপের 'দ্বিতীয় গৌরাঙ্গ'-আখ্যা সার্থক হইয়াছিল এবং তিনি শাস্ত্রের অপেক্ষা না করিয়াও রাধাকৃষ্ণ ও ভজনতত্ত্ব সম্বন্ধে যে মতবাদ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, উৎকলের সমস্ত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের মিলিত বিরোধিতা সত্ত্বেও মহাপ্রভু তাহাই অনুমোদন করিয়াছিলেন (পৃ. ১১৪-১৯)।

প্রার্থনা করেন। কিন্তু স্বরূপ যখন দৃঢ়ভাবেই মায়াবাদ-শ্রবণের ব্যর্থতা ও বেদনার সম্বন্ধে জানাইয়া দেন, তখন 'লজ্জা ভয় পাইয়া আচার্য মৌন' হইয়া রহিলেন। পরে তিনি ভ্রাতাকে দেশে পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

আর একবার এক বংগদেশীয় বিপ্র মহাপ্রভুর জীবনীকে নাটকাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া নীলাচলে উপস্থিত হন, ইঁহার সহিতও ভগবান-আচার্যের পরিচয় ছিল। ভগবান নাটকটি লইয়া স্বরূপের নিকট আসিলেন। শেষপর্যন্ত স্বরূপকে নাটকটি শুনিতে হইল। তাঁহার আদেশে সর্বপ্রথম নান্দীশ্লোকটি পঠিত হইলে শ্রোতৃবৃন্দ লেখকের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু স্বরূপের নির্দেশে গ্রন্থকার ঐ শ্লোকটির ব্যাখ্যা করিলে, তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন।

নান্দী-শ্লোকটি ছিল এইরূপ[১৬] :

বিকচ কমলনেত্রে শ্রীজগন্নাথসংজ্ঞে,
কনকরুচিরিহাত্মন্যাত্মতাং যঃ প্রপন্ন।
প্রকৃতি জড়মশেষং চেতয়ন্নাবিরাসীৎ,
স দিশতু তব ভব্যং কৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ।

[যিনি স্বর্ণবর্ণ ধারণপূর্বক এই নীলাচলে পদ্মপলাশলোচন জগন্নাথদেবের সহিত অভেদাত্মা হইয়া অসংখ্য জড়প্রকৃতি লোকের চৈতন্যসম্পাদন করিয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেব তোমার মঙ্গলবিধান করুন।]

কবি কহে জগন্নাথ সুন্দর শরীর।
চৈতন্য গোসাঞি তাহে শরীরী মহাধীর॥
সহজ জড় জগতের চেতন করাইতে।
নীলাচলে মহাপ্রভু হৈলা আবির্ভূতে॥…

এইরূপ ব্যাখ্যা শুনিয়া স্বরূপদামোদর সক্রোধে বলিলেন :

পূর্ণানন্দ চিৎস্বরূপ জগন্নাথ রায়।
তাঁরে কৈলি জড় নশ্বর প্রাকৃত কায়॥
পূর্ণানন্দ ষড়ৈশ্বর্য চৈতন্য স্বয়ং ভগবান।
তাঁরে কৈলি ক্ষুদ্রজীব স্ফুলিঙ্গ সমান॥
দুই ঠাঁই অপরাধে পাইবি দুর্গতি।
অতত্ত্বজ্ঞ তত্ত্ববর্ণে তার এই রীতি॥

কিন্তু চৈতন্য বা জগন্নাথ-বিগ্রহ সম্পর্কে স্বরূপদামোদর যে ব্যাখ্যাই প্রদান করুন না কেন, উহা 'তত্ত্ব'-কথামাত্র। চৈতন্যের পক্ষে যাহা প্রত্যক্ষ সত্য ছিল, অন্য সকলের কাছে তাহা ছিল তত্ত্ব-মাত্র। কিন্তু উক্ত অজ্ঞাতনামা বিপ্রটি যে অভিপ্রায় লইয়া শ্লোকগুলি রচনা

(১৬) চৈ.চ.—৩।৫, পৃ. ৩১২-১৩

করিয়াছিলেন, সম্ভবত তাহাই ছিল তৎকালীন ভক্ত দেশবাসী-বৃন্দের 'মনের মরম কথা'। স্বরূপদামোদরাদি বৈষ্ণববৃন্দ যে যথার্থ ভক্ত ছিলেন তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু তত্ত্বের চাপে হয়ত তাঁহাদের অনেকটা অংশই পিষ্ট হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে, তাঁহাদের ভক্তিভাবের সকল উৎসই ছিলেন ওই শরীরী মানুষটি। জগন্নাথ-বিগ্রহ তাঁহাদের কাছেও চিরকালই জড় থাকিয়া গিয়াছে, ঐ শ্রদ্ধাবান্ 'অতত্ত্বজ্ঞ' 'মূর্খ' বংগদেশীয় বিপ্রটি কিন্তু যোড়শ শতাব্দের ভক্ত দেশবাসীর প্রতিভূরূপে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রথমনাথ তর্কভূষণ গৌরাঙ্গ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,[১৭] "তাঁহার অলোকসামান্য সমুন্নত আকৃতি ও অসাধারণ সৌন্দর্য......তাঁহার প্রকৃতির দুর্দমনীয়তা,...... তাঁহার যে মধুর মূর্তি ও অনিয়ত মধুর ব্যবহার, তাহা নদীয়ার সকল শ্রেণীর নরনারীর হৃদয়ের মধ্যে তাঁহাকে যে বিশিষ্ট স্থান দিয়াছিল, তাহা অতুলনীয় বলিলে অত্যুক্তি হয়না।" তিনি আরও জানাইয়াছেন, "তিনি শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণাবতার বা অংশাবতার অথবা অবতারই নহেন এ বিষয় লইয়া বাদ-বিবাদ করিবার কোন আবশ্যকতা এস্থলে আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। কিন্তু তাঁহার সেই রাধাভাবদ্যুতিশবলিত সুবিশাল সমুন্নত ও সুগঠিত কনককান্তি গৌরদেহে যে অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, তাহা দীন দুর্গত, অজ্ঞ অসহায় লক্ষ লক্ষ নরনারীর ব্যথিত হৃদয়ের সাংসারিক সকল জ্বালা মিটাইয়া দিবার জন্যই যে অলোকসামান্যভাবে ফুটিয়া উঠিয়া উঠিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ করিবার হেতু নাই।" বাস্তবিকপক্ষে, 'দীন দুর্গত, অজ্ঞ অসহায় লক্ষ লক্ষ নরনারী'র প্রেম-ব্যাকুলতাই প্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে 'সেই রাধাভাবদ্যুতিশবলিত সুবিশাল সমুন্নত ও সুগঠিত কনককান্তি গৌরদেহ'-খানিই নীলাচল-তীর্থমধ্যে 'সহজ জড় জগতের চেতন করাই'য়া দিতে সমর্থ হইয়াছিল।

যাহাহউক, ক্রুদ্ধ দামোদর উক্ত বিপ্রটিকে তিরস্কার করিতে থাকিলে উপস্থিত ভক্তবৃন্দ সকলেই স্বরূপের ক্রোধের কারণ এবং তাঁহার যুক্তির সারবত্তা দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। কবি তখন লজ্জা ভয় ও বিস্ময়ে হংস-মধ্যে বক-সদৃশ নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিলেন। স্বরূপ তাঁহাকে বৈষ্ণবের নিকট ভাগবত-পাঠের নির্দেশ দান করিলেন। কিন্তু গ্রন্থকারের বিনয় ও শ্রদ্ধার ভাব লক্ষ্য করিয়া প্রেমোদ্দীপ্তচিত্ত স্বরূপদামোদর অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। নিজে এতবড় তত্ত্বজ্ঞ হইয়াও সহজেই বুঝিলেন যে সকল বিদ্যার মূলরূপে এই ব্যথা-বেদনা ও শ্রদ্ধা-বিনয়ের বীজ যখন বিপ্রের মনে একবার উপ্ত হইয়া গিয়াছে, তখন আর ভয়ের কারণ নাই। তিনি পুনরায় সেই শ্লোকের মধ্য হইতে গূঢ়ার্থ বাহির করিয়া দেখাইলেন যে গ্রন্থকার মূর্খ এবং নির্বোধ হইলেও তিনি আপনার অজ্ঞাতে নিন্দাস্থলেই কৃষ্ণস্তুতি গাহিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার রচনা ব্যর্থ হয় নাই। শেষে তাঁহারই হস্তক্ষেপে চৈতন্যের

(১৭) বাঙ্গলায় বৈষ্ণবধর্ম—পৃ.৫৬-৫৭

সহিত ঐ বিপ্রের মিলন ঘটিল এবং তখন হইতে তিনি চৈতন্য-চরণ শরণ করিয়া সর্বত্যাগী হইয়া নীলাচলে বাস করিতে লাগিলেন। সার্বভৌম-ভট্টাচার্যকে 'বৃহস্পতি'-আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু স্বরূপ সম্বন্ধেও কবিরাজ-গোস্বামী বলিয়াছেন যে তিনি ছিলেন 'সংগীতে গন্ধর্বসম শাস্ত্রে বৃহস্পতি।' এইজন্যই তাঁহার পক্ষে মহাপ্রভুর চিৎ- ও আনন্দ-লোকের সঙ্গী হওয়া অনেকাংশে সম্ভবপর হইয়াছিল এবং এইজন্যই বোধকরি মহাপ্রভুও যখন শেষ-জীবনের সঙ্গী স্বরূপ-রামানন্দের নিকট এবং বিশেষ করিয়া স্বরূপের নিকট তাঁহার আপনার অস্ফুট ভাবনা-কামনাকে আভাসে-ইঙ্গিতে ও প্রলাপোক্তিতে প্রকাশ করিতে থাকিতেন, তখন এই স্বরূপের পক্ষে যথার্থ-জ্ঞানের বাতায়নতলে আসিয়া আবেগানুভূতির মুক্তদ্বারপথে মহাপ্রভুর হৃদ্‌রাজ্যের সন্ধান পাওয়া কিছুটা সম্ভবপর হইয়াছিল। তাই তিনি হইতে পারিয়াছিলেন মহাপ্রভুর অন্তর্জীবনের প্রথম ও প্রধান ভাষ্যকার। মহাপ্রভুর শেষজীবনের সঙ্গী-হিসাবে স্বরূপরচিত যে-কড়চা সম্বন্ধে 'চৈতন্যচরিতামৃত'-কার জানাইতেছেন 'স্বরূপ সূত্রকর্তা রঘুনাথ বৃত্তিকার', সেই কড়চামধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম জানাইলেন[১৮]—

রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনী শক্তিরস্মা—
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং,
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্‌।

তাই মহাপ্রভুর আবাল্য-সঙ্গী ও তাঁহার জীবনের প্রথম চরিতকার মুরারি-গুপ্তও জানাইয়াছেন[১৯]:

ততঃ শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র স্বরূপাখ্যৈঃ সমন্বিতঃ।
শ্রীরাধাভাবমাধুর্যৈঃ পূর্ণো ন বেদ কঞ্চন।

ইহার পর হইতেই সমগ্র বৈষ্ণব-সমাজ চৈতন্য-জীবনতত্ত্বের আসল পরিচয় পাইয়া যে-ভাবনির্ঝরিণীর স্রোতোবেগে সমগ্র দেশকে প্লাবিত করিয়া দিয়াছিল, তাহাকে এইভাবে স্বরূপদামোদরই চৈতন্যচিত্ত-হিমালয়ের উৎসমুখ হইতে মুক্ত করিয়া দিলেন। 'স্বরূপ-দামোদরের কড়চা'র সহিত আধুনিক বংগবাসীর পরিচয় নাই বটে, কিন্তু চৈতন্য-জীবন-চরিতের শ্রেষ্ঠ লেখক কৃষ্ণদাস-কবিরাজ-গোস্বামী উক্ত কড়চা হইতে উদ্ধৃতি দিয়া বার বার তাঁহার ঋণ স্বীকার করিয়া জানাইয়াছেন যে মহাপ্রভুর মধ্য- ও শেষ-জীবনকে অবলম্বন করিয়া স্বরূপদামোদর তাঁহার কড়চার মধ্যে যে সূত্রগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার 'চৈতন্যচরিতামৃত'-গ্রন্থ রচনার অমূল্য উপাদানগুলি যোগাইয়া দিয়াছে।

অথচ স্বরূপ ছিলেন যেন একেবারে সহজ সাধারণ মানুষটি। উড়িষ্যা-প্রদেশে সার্বভৌম

(১৮) ১।৪, পৃ. ১-২, ১৯ (১৯) শ্রীচৈ. চ.—৪।২৪।১

বা রামানন্দ পূর্ব হইতেই পরিচিত ছিলেন এবং মহাপ্রভুর নীলাচল-গমনের পূর্বেই তাঁহাদের একটি প্রতিষ্ঠা ছিল। পরে মহাপ্রভুর আলোকচ্ছটায় তাঁহাদের অন্তর্জগতের বিপুল পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু মহাপ্রভু স্বয়ং তাঁহাদিগকে তাঁহাদের পূর্ব-প্রতিষ্ঠাভূমি হইতে নামাইয়া আনিতে চাহেন নাই। কিন্তু বিদ্যাবুদ্ধি বা প্রতিষ্ঠার কোন বেড়াজাল আসিয়া মহাপ্রভুর সহিত স্বরূপের সম্বন্ধের মধ্যে তুচ্ছতম ব্যবধানও সৃষ্টি করিতে পারে নাই। মহাপ্রভুর দীন-সেবকরূপে স্বরূপ তাঁহার ভক্ত-জীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন। সুতরাং সেইসব প্রশ্ন উঠিতেই পারেনা। তাহা ছাড়া, মহাপ্রভু তাঁহার দৃষ্টিকে প্রেমলোকের যতই ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরুন না কেন, স্বরূপ কিন্তু তাঁহার সেবাভূমি হইতে স্বীয় পদদ্বয়কে কখনও শূন্যে উঠাইয়া লইবার চেষ্টা করেন নাই। তাই একদিকে তিনি যেমন চিরদিনই মহাপ্রভুর সেবক-ভৃত্য থাকিয়া গিয়াছেন, অন্যদিকে তেমনি তিনি সকলের যথেষ্ট শ্রদ্ধা অর্জন করা সত্ত্বেও সকলেরই অধিগম্য থাকিতে পারিয়াছিলেন। তাই একদিকে যেমন মহাপ্রভু তাঁহার একান্ত স্নেহপাত্র শংকর-পণ্ডিতের ভার স্বরূপের উপরই অর্পণ করিয়াছিলেন[২০], তেমনি অন্য দিকে সম্ভবত গদাধর-পণ্ডিত-গোসাঁইও তাঁহার শিষ্যবর্গের শিক্ষার ভার[২১] তাঁহাকে দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিয়াছিলেন। বস্তুত, সকলের জন্যই তাঁহার দরদ ছিল প্রগাঢ়। মহাপ্রভুর গৌড়-গমনকালে তিনি যে তাঁহাকে ভদ্রক পর্যন্ত[২২] আগাইয়া দিবেন, কিংবা তাঁহার বৃন্দাবন-যাত্রাকালে বলভদ্র-ভট্টাচার্যকে তাঁহার সহিত পাঠাইয়া দিবেন, তাহা এমন বড় কথা নহে। কিন্তু মহাপ্রভুর প্রেমের সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত দীনাতিদীন ভক্ত ছোট-হরিদাসের হইয়া তিনি যে মহাপ্রভুর নিকট প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন এবং হরিদাসের তিন-দিবস অনাহারের পর তাঁহাকে অন্নজল স্পর্শ করাইয়াছিলেন, তাহা যে তাঁহার একান্ত দরদী-চিত্তের পরিচায়ক, সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে না। রঘুনাথদাস নীলাচলে পৌঁছাইলে মহাপ্রভু তাঁহাকে স্বরূপের হস্তে প্রদান করেন এবং পরে তিনি রঘুনাথকে স্বরূপের নিকট সাধ্যসাধনতত্ত্ব শিক্ষা করিতে উপদেশ দেন। স্বরূপ তাঁহার প্রভুদত্ত এই সকল কর্তব্যভার শিরোধার্য করিয়া লন এবং আরও পরে মহাপ্রভু রঘুনাথকে শালগ্রাম দান করিলে তিনি স্বয়ং এই শিলাপূজার সমূহ আয়োজন করিয়া যথাবিধি পূজা-অর্চনা সম্পন্ন করাইয়া দেন। তারপর রঘুনাথ যখন গরুরও পরিত্যক্ত পচা ভাত খাইতে থাকেন, তখন তিনি একদিন সেই অন্ন চাহিয়া তাহাকে 'অমৃতান্ন' আখ্যা দিয়া সানন্দে তাহা ভোজন করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, মহাপ্রভুর মনোরাজ্যে স্বরূপের অবস্থান যেখানেই থাকুক না কেন, বাস্তব জগতে কিন্তু তাঁহার স্থান ছিল সেইখানেই—যেখানে রঘুনাথদাস লুকাইয়া পচা ও দুর্গন্ধ অন্ন ভক্ষণ করিতেন। স্বরূপের এই মমত্ববোধ এবং

(২০) চৈ. কৌ.—পৃ. ২৫৮ (২১) ভ. নি.—পৃ.১১৬ (২২) চৈ. না.—৯।২০

নিরহংকার সারল্যই সম্ভবত মহাপ্রভুর নিকট তাঁহার গমনাধিকারকে সর্বদা বাধাহীন করিয়া রাখিত। তাই মহাপ্রভুর নিকট কাহারও কিছু আবেদন থাকিলে অনেক সময় স্বরূপকেই তাহা পেশ করিয়া দিতে হইত। জগদানন্দের বৃন্দাবন-গমনের বাসনা জন্মিলে স্বরূপই প্রভুর নিকট হইতে সম্মতি আনিয়া দিয়াছিলেন। আবার মহাপ্রভুর অঙ্গবেদনায় অধীর হইয়া জগদানন্দ যেদিন তাঁহাকে 'তুলি-বালিশ' গ্রহণ করাইতে অসমর্থ হন, সেদিন এই স্বরূপ-দামোদরের সাহায্য গ্রহণ ছাড়া তাঁহার গত্যন্তর ছিল না। কারণ মহাপ্রভুর নিকট সম্ভাব্য সকল প্রকার প্রস্তাব উত্থাপনের শক্তি একমাত্র স্বরূপেরই ছিল। সাধ্যসাধন-তত্ত্ব-জ্ঞান, সন্ন্যাসীর কঠোর কর্তব্যকর্ম সম্পাদন, অপরের প্রতি প্রাণভরা মমত্ববোধ, স্বীয় জীবনের মধ্যে ভক্তি-সাধনার সার্থক রূপায়ণ, গুরুর প্রতি অতুলনীয় সেবাযত্ন এবং অভিমান বা গর্বলেশহীন একান্ত সহজ সরল জীবন-যাপন ইত্যাদির মধ্য দিয়াই তিনি এই শক্তি অর্জন করিয়াছিলেন। তাই তিনি সেই তুলির বালিশ লইয়া মহাপ্রভুর নিকট যাইতে পারিলেন। মহাপ্রভু অবশ্য তাঁহাদের এই সমস্ত ব্যাপারে আহত হইয়াছিলেন এবং কিছুতেই সেই তুলি-বালিশ গ্রহণ করিতে রাজি হন নাই। কিন্তু মহাপ্রভুর অঙ্গ-বেদনা ও জগদানন্দের মনোবেদনা দরদী স্বরূপকে অত্যন্ত ব্যথিত করিয়াছিল। এদিকে আবার মরমী-স্বরূপ মহাপ্রভুর মর্মবাণীও বুঝিয়া বিচলিত হইলেন। সাধক-সেবক স্বরূপ তখন শুষ্ক কদলী-পত্র সংগ্রহ করিয়া কত কষ্টে সেই গুলিকে নখে চিরিয়া চিরিয়া সূক্ষ্ম করিলেন এবং মহাপ্রভুর এক বহির্বাসে সেইগুলি ভরিয়া দিয়া 'এইমত দুই কৈল ওড়ন পাড়নে। অঙ্গীকার কৈল প্রভু অনেক যতনে॥' ইহাই ছিল দরদী-স্বরূপের মরমী-মনের পরিচয়।

স্বরূপ ছিলেন যেন মহাপ্রভুর শেষ-জীবনের অন্ধের-যষ্টি। বহির্জীবনের সঙ্গী গোবিন্দ ও স্বরূপ, অন্তর্জীবনে স্বরূপ ও রামানন্দ। কোনরাজ্যেই মহাপ্রভুর স্বরূপ ছাড়া এক পাও চলিবার উপায় ছিলনা। আহারে, বিহারে, শয়নে, তিনি সর্বদাই মহাপ্রভুর সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। মহাপ্রভু গম্ভীরার মধ্যে শয়ন করিলে তিনি গোবিন্দের সহিত বহির্দ্বারে শুইয়া থাকিতেন। একদিন গভীর রাত্রিতে কৃষ্ণনাম ও সংকীর্তন-শব্দ শুনিতে না পাইয়া তিনি উঠিয়া দেখিলেন গৃহ শূন্য। গোবিন্দকে সঙ্গে লইয়া খুঁজিতে খুঁজিতে শেষে সিংহদ্বারের উত্তরদিকে একস্থানে গিয়া মহাপ্রভুর চেতনাহীন দেহটির সন্ধান পাওয়া গেল। তৎক্ষণাৎ স্বরূপ-গোসাঁই তাঁহার কানের কাছে কৃষ্ণনাম কীর্তন করিয়া ক্রমে ক্রমে তাঁহাকে ভাবলোক হইতে চেতনা-লোকে ফিরাইয়া আনিলেন। তারপর মহাপ্রভু স্বীয় অবস্থা-দৃষ্টে সপ্রতিভ হইয়া পড়িলে স্বরূপ তাঁহাকে নানারূপ মৃদুবাক্য কহিয়া গম্ভীরায় আনিলেন। যেদিন মহাপ্রভু গোবর্ধন-ভ্রমে চটক-পর্বতের দিকে ছুটিয়া গিয়া পথিমধ্যে মূর্ছিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার শরীরে অষ্ট-সাত্ত্বিক বিকার দেখা দিয়াছিল, সেদিনও স্বরূপ-গোসাঁই অন্যান্য ভক্তের সহিত তাঁহার পশ্চাৎ ছুটিয়া গিয়া কৃষ্ণনাম-কীর্তন দ্বারা তাঁহার চেতনা ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন। আবার

যেদিন চৈতন্য সমুদ্র-পথে যাইতে যাইতে পথিমধ্যে উদ্যান দেখিয়া বৃন্দাবন-ভ্রমে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া মূর্ছিত হন, সেদিনও স্বরূপকে এইভাবে ভক্তবৃন্দের সহিত ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে সচেতন করিয়া তুলিতে হইয়াছিল। আরও একদিন গভীর রাত্রিতে মহাপ্রভুর শব্দ না পাইয়া গোবিন্দ কপাট খুলিয়া স্বরূপকে ডাক দিলে স্বরূপ-গোসাঁই অন্যান্য ভক্তকে লইয়া 'দেউটি জ্বালিয়া করে প্রভু অন্বেষণ।' শেষে সিংহদ্বারের 'তৈলঙ্গা গাভীগণে'র মধ্যে তাঁহার সন্ধান মিলিল। পূর্বোক্ত প্রকারে তাঁহার সম্বিৎ ফিরাইয়া আনা হইলে, মহাপ্রভু যখন স্বরূপকে তাঁহার ভাবলোক-দৃষ্ট সকল সংবাদ প্রদান করিয়া জানাইলেন, "কর্ণতৃষ্ণায় মরি পড় রসামৃত শুনি," তখন স্বরূপ চৈতন্যাভিপ্রেত ভাগবত-শ্লোক পাঠ করিয়া তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিয়াছিলেন।

আর একটি দিনের কথা বিশেষভাবেই স্মরণযোগ্য। শরৎকালের এক শুক্লপক্ষের রাত্রি। মহাপ্রভু ভক্তবৃন্দকে লইয়া উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছেন। রাসলীলার শ্লোকাদি গীতও পঠিত হইতেছে। মহাপ্রভু সেইসব শ্লোকের অর্থ করিয়া দিতেছেন। ভক্তবৃন্দ সকলেই আনন্দ-সাগরে নিমজ্জিত হইয়াছেন। এইভাবে রাসের শ্লোকসমূহ পঠিত হইবার পর যখন জলকেলির শ্লোক আরম্ভ হইল, তখন মহাপ্রভু আচম্বিতে আইটোটা হইতে চন্দ্রালোক-ঝলসিত সমুদ্রতরঙ্গ দেখিয়া আকুল হইলেন। যমুনা-ভ্রমে তিনি সেইদিকে প্রবলবেগে ধাবিত হইয়া সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন। সিন্ধুর উন্মাদ তরঙ্গমালা তাঁহার সংজ্ঞাহীন দেহখানিকে শুষ্ককাষ্ঠবৎ দোল দিতে দিতে পূর্বমুখে ভাসাইয়া লইয়া চলিল।

এদিকে স্বরূপাদি ভক্তগণ যখন জানিতে পারিলেন যে মহাপ্রভু তাঁহাদের নিকট হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন, তখন তাঁহারা উন্মাদের মত চতুর্দিকে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কেহ কেহ দেবালয়ের দিকে, কেহ বা গুণ্ডিচা-মন্দিরের দিকে, আবার কেহ বা নরেন্দ্র-সরোবরের দিকে ধাবিত হইলেন। কিন্তু কোথায় তিনি! স্বরূপদামোদর কয়েকজন ভক্তকে লইয়া সমুদ্র-সৈকত ধরিয়া পূর্বদিকে ছুটিলেন। কিছুদূর গিয়া দেখা গেল যে একজন জেলে কাঁধে জাল ফেলিয়া একপ্রকার অদ্ভুত অঙ্গ-ভঙ্গি করিতে করিতে পূর্বদিক হইতে আসিতেছে। স্বরূপ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিলেন যে তাহার জালে এক মৃতদেহ উঠিয়া আসায় সে ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া ঐরূপ করিতেছে। তিনি তাহার নিকট অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ করিয়া বুঝিলেন যে উক্ত মৃতদেহ নিশ্চয়ই মহাপ্রভুর। স্বরূপ সুকৌশলে সেই জেলেকে প্রকৃতিস্থ করিয়া তাহার সাহায্যে মহাপ্রভুর দেহপিণ্ডটি খুঁজিয়া বাহির করিলেন। তারপর স্বরূপজ্ঞানী স্বরূপের স্বরূপানুসন্ধান আরম্ভ হইল। তিনি মহাপ্রভুর কানের কাছে উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণগান করিতে লাগিলেন। ধীরে ধীরে মহাপ্রভুর বাক্‌শক্তি ফিরিয়া আসিল। কিন্তু তখনও তিনি ভাবের ঘোরে আচ্ছন্ন রহিয়াছেন। অস্পষ্ট প্রলাপোক্তিতে তিনি

কালিন্দী-কেলির বিবরণ বিবৃত করিয়া গেলেন। তারপর স্বরূপের প্রচেষ্টায় ধীরে ধীরে তাঁহার সংজ্ঞা-প্রাপ্তি ঘটিল।

এদিকে মহাপ্রভুর লীলার দিনও ফুরাইয়া আসিল। একদিন অদ্বৈত-আচার্যপ্রভু তাঁহার নিকট একটি তর্জা প্রেরণ করিলে মহাপ্রভু মৌন হইয়া রহিলেন। স্বরূপদামোদর প্রহেলিকার অর্থ বুঝিলেন। তবুও তিনি সাহস করিয়া মহাপ্রভুকে প্রকৃত অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাপ্রভুও কতকটা হেঁয়ালির আকারে উত্তর দিলেন। শুনিয়া সকলেই নীরব হইলেন। স্বরূপ বিমনা হইয়া রহিলেন। তিনি স্পষ্টই দেখিলেন যে তাঁহার সম্মুখস্থ দীপ নিভু-নিভু করিতেছে।

মহাপ্রভুর বিরহ-দশা প্রবলবেগে বাড়িয়া চলিল। তিনি উন্মাদ হইয়া পড়িলেন। স্বরূপ একদিন গভীর রাত্রিতে বিকট গোঁ-গোঁ শব্দ শুনিতে পাইয়া দীপ জ্বালিয়া দেখিলেন যে নিষ্ক্রমণ-পথ না পাওয়ায় রুদ্ধদ্বার-গম্ভীরার ভিত্তি-গাত্রে মুখ ঘষিতে ঘষিতে মহাপ্রভুর মুখমণ্ডল ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া দর-দর ধারায় রক্ত প্রবাহিত হইতেছে। ব্যথা-দীর্ণ চিত্ত লইয়া স্বরূপ তখনকার মত যথাবিধি সেবা-শুশ্রূষার দ্বারা যন্ত্রণার উপশম করিলেন; কিন্তু প্রত্যূষেই সকলের সহিত যুক্তিপূর্বক পরদিন হইতে মহাপ্রভুর নিকট শংকর-পণ্ডিতের শয়নের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

কিন্তু মরণ-জোয়ারের জল ক্রমাগতই উজাইয়া আসিতে লাগিল। কালের এক নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্রের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর তিরোভাব ঘটিল।

শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় লিখিয়াছেন,[২৩] "স্বরূপ বৃন্দাবনে বাস করিলে সপ্তম গোস্বামী হইতেন। পুরীধামে স্বরূপই ছিলেন গোস্বামীদিগের প্রতিনিধি।" এই উক্তি অত্যুক্তি নহে; তিনি বৃন্দাবনে বাস করিলে সপ্ত-গোস্বামীর প্রথম গোস্বামীই হইতেন। তিনি ছিলেন যেন স্বয়ং মহাপ্রভুরই দ্বিতীয় স্বরূপ।[২৪] মহাপ্রভুর মহাপ্রয়াণের পর তাই তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের আর কোনও অর্থই রহিল না। সম্ভবত সেই বৎসরই তিনিও পরলোকের পথে পাড়ি দিলেন।[২৫] শ্রীনিবাস-আচার্য নীলাচলে আসিয়া তাঁহার দর্শনলাভ করিতে পারেন নাই।

(২৩) প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য (৫ম. ও ৬ষ্ঠ. খণ্ড)—পৃ.১৭৮ (২৪) তু.—ভ. নি., পৃ. ৯৮-৯৯ (২৫) পী. চ.-মতে (পৃ. ১০-১১) মহাপ্রভুর তিরোভাবের পর তিনি সেই সংবাদ নবদ্বীপে শচীদেবী ও শান্তিপুরে অদ্বৈতপ্রভুর নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই সংবাদ সম্ভবত ভিত্তিহীন। বৈ. দ.-মতে (পৃ. ৭৭), "গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অপ্রকটের সঙ্গে সঙ্গেই……স্বরূপদামোদর অচেতন হইলেন……হৃৎপিণ্ড ফাটিয়া প্রাণ বাহির হইল।" এই সংবাদও সম্ভবত ভিত্তিহীন। রঘুনাথদাস-গোস্বামীর 'মুক্তাচরিতে'র ৪র্থ. শ্লোক দেখিয়া ডা. সুশীল কুমার দে অনুমান করেন যে স্বরূপের শেষের দিনগুলি সম্ভবত বৃন্দাবনেই অতিবাহিত হয়। কিন্তু এই সম্বন্ধে অন্য কোথাও কোন প্রকার স্পষ্ট প্রমাণ নাই।

গোবিন্দ (দ্বারপাল)

'শ্রীকাশীশ্বর-গোবিন্দৌ তৌ জাতৌ প্রভুসেবকৌ'[১]— কাশীশ্বর এবং গোবিন্দ সেই দুইজন প্রভুর সেবকরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কাশীশ্বর এবং গোবিন্দ সম্বন্ধে এই উক্তি সর্বতোভাবেই সত্য বলা চলে। অবশ্য এই উক্তি হইতে মনে আসিতে পারে যে গৌরাঙ্গের বাল্যলীলাতেও কাশীশ্বরের মত গোবিন্দ হয়ত অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। বৃন্দাবনদাস এবং লোচনদাস গৌরাঙ্গের বাল্যলীলা বর্ণনা করিয়াছেন। সেই বর্ণনায় এই গোবিন্দকে পাওয়া যায় না। এই প্রসঙ্গে 'চৈতন্যভাগবত'-গ্রন্থখানিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেই গ্রন্থে গৌরাঙ্গের বাল্যলীলায় তিনজন গোবিন্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয়—গোবিন্দ-ঘোষ, গোবিন্দানন্দ, গোবিন্দ-দত্ত। 'চৈতন্যচরিতামৃতে' এই তিনজনের নাম একত্রে বর্ণিত হইয়াছে[২], পৃথকভাবেও উল্লেখিত আছে। কবিকর্ণপূরের 'চৈতন্যচরিতামৃতমহাকাব্যে' এই তিনজনের কাহারও নাম উল্লেখিত না থাকিলেও তাঁহার 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'তে সম্ভবত তিনজনেরই নমে উক্ত হইয়াছে।[৩] 'ভক্তমালে' গোবিন্দ-দত্তের নাম নাই। 'ভক্তিরত্নাকরে' গোবিন্দানন্দের উল্লেখ নাই। 'মুরারি-গুপ্তের কড়চা'য়, লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গলে' ও কবিকর্ণপূরের 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে' আবার কেবলমাত্র গোবিন্দ-ঘোষেরই নাম দৃষ্ট হয়। তাহাহইলে দেখা যাইতেছে যে গোবিন্দ-ঘোষকে সকলেই জানিতেন। 'ভক্তমালে'র লেখক গোবিন্দ-দত্তকে জানিতেন না। নরহরি-চক্রবর্তী গেবিন্দানন্দকে এবং লোচনদাস গোবিন্দ-দত্ত বা গোবিন্দানন্দ কাহাকেও জানিতেন না। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় এই যে গৌরাঙ্গপ্রভুর বাল্যলীলা-সঙ্গী মুরারি-গুপ্তও এই দুইজনের কাহারও নাম উল্লেখ করেন নাই। প্রকৃতপক্ষে, এই গোবিন্দ-দত্ত ও গোবিন্দানন্দের নাম মাত্র অল্প কয়েকটি স্থলেই উল্লেখ করা হইয়াছে। মূলস্কন্ধ-শাখা ভিন্ন 'চৈতন্যচরিতামৃতে' ইঁহাদের নাম মাত্র একটি ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া দুইবার এবং 'চৈতন্যভাগবতে' মাত্র একবার উল্লেখিত হইয়াছে। 'ভক্তিরত্নাকরে' গোবিন্দানন্দের নাম নাই। কিন্তু গোবিন্দ-দত্তের মাত্র একবার উল্লেখ আছে। তাহাতে লিখিত হইয়াছে যে একদিন শ্রীবাসগৃহে গৌরাঙ্গের সংকীর্তনারম্ভকালে শ্রীবাস, মুকুন্দ আর গোবিন্দ-দত্ত উপস্থিত ছিলেন।[৪] 'ভক্তিরত্নাকরে'র মাত্র এই একবার উল্লেখে গোবিন্দ-দত্তকে মহাপ্রভুর বাল্যলীলার সংকীর্তন-সঙ্গী বলিয়া জোর করিয়া বলা চলেনা। 'ভক্তিরত্না-

(১) গৌ. দী.—১৩৭ (২) ২।১৩, পৃ. ১৬৫ (৩) ১৩৭ (৪) ১২।২৫৫২

করে' উপাধিবিহীন গোবিন্দের তিনবার উল্লেখ আছে।[৫] সেই গোবিন্দ অবশ্য একই ব্যক্তি এবং তিনি মহাপ্রভুর বাল্যলীলা-সঙ্গী। কিন্তু সেই গোবিন্দ যে সুপ্রসিদ্ধ বাসু-ঘোষের ভ্রাতা গোবিন্দ-ঘোষ তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ প্রতি ক্ষেত্রেই তাঁহাকে বাসু-ঘোষের সহিত যুক্ত করা হইয়াছে এবং বাসু মাধব-ও গোবিন্দ-ঘোষ—এই তিন ভ্রাতার সংযুক্তভাবে গান সুবিখ্যাত ছিল। সুতরাং 'ভক্তিরত্নাকরে'র ঐ একটিমাত্র উল্লেখের কথা বাদ দিলে গোবিন্দ-দত্ত ও গোবিন্দানন্দের যে পরিচয় অন্যত্র পাওয়া যায়, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে গৌরাঙ্গাভিষেক-কালে উভয়েই খোল বাজাইয়াছিলেন[৬] এবং তাঁহার নগর-সংকীর্তনকালেও ইহারা উভয়েই উপস্থিত ছিলেন[৭]। আবার ইঁহারা উভয়েই মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য গৌড় হইতে নীলাচলে গমন করিয়াছিলেন[৮] এবং প্রথমবারেই রথযাত্রা-উপলক্ষে ভক্তবৃন্দের সম্প্রদায়-বিভাগে বিভক্ত হইয়া রথাগ্রে মণ্ডলী-নৃত্যকালে গোবিন্দ ও গোবিন্দানন্দ এই উভয় ভক্তই তথায় উপস্থিত ছিলেন।[৯] মহাপ্রভুর উদ্দণ্ড নৃত্য-কালেও ইঁহারা দুইজনে তাঁহার সহিত যুক্ত হইয়াছিলেন।[১০] গোবিন্দ-দত্ত সম্বন্ধে ইহা অপেক্ষা আর বেশী কিছু জানা যায় না। কিন্তু গোবিন্দানন্দ সম্বন্ধে আর একটু জানা যায় যে তিনি শ্রীবাস-গৃহে কীর্তনের কালে,[১১] কাজীদলনের অব্যবহিত পরে শ্রীধরের গৃহে[১২] সমাগত ভক্তবৃন্দের উপস্থিতকালে এবং জগাই-মাধাই উদ্ধারের পর ভাগীরথীতে জলকেলিকালেও[১৩] উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখযোগ্য যে এই তিনটি স্থলে কিন্তু উপাধিবিহীন এক গোবিন্দকে দেখা যায়। পূর্বেই দেখা গিয়াছে যে 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র সর্বত্র এবং 'চৈতন্যভাগবতে'র স্থান-বিশেষে গোবিন্দ-দত্ত ও গোবিন্দানন্দের নাম একত্রে উক্ত হইয়াছে। সুতরাং উপাধিবিহীন এই গোবিন্দকে গোবিন্দ-দত্ত বলিয়া সহজেই ধরিতে পারা যায়। তাহাহইলে 'ভক্তিরত্নাকরে'র উল্লেখানুযায়ী গোবিন্দ-দত্ত যে মহাপ্রভুর বাল্যলীলার বা তৎকালীন সংকীর্তনের সঙ্গী ছিলেন তাহা অবধারিত হইয়া উঠে। সুতরাং মহাপ্রভুর নদীয়া ও নীলাচল উভয় লীলাতেই 'প্রভুপ্রিয়' 'মহাভাগবত'[১৪] গোবিন্দানন্দ ও প্রভুর কীর্তনীয়া গোবিন্দ-দত্ত[১৫] উভয়েই যে স্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা সত্য বলা যাইতে পারে। বৃন্দাবনদাসের নামে প্রচলিত 'বৈষ্ণববন্দনা' ও 'চৈতন্য-

---

(৫) ১২।১১২৩, ২০৬৫, ৩৮৬০-৬১ (৬) গৌ. ত.—পৃ. ১৫১ (৭) চৈ. ভা.—২।২৩, পৃ. ২১৭-১৮ (৮) চৈ. ভা.—৩।৯, পৃ. ৩২৬ ; ৪০৬ গৌরাব্দের 'বিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ' পত্রিকার ফাল্গুন-বৈশাখ সংখ্যায় অচ্যুতচরণ চৌধুরী জানান যে ইঁহারা প্রথমবারেই নীলাচলে যান। মৃণালকান্তি ঘোষ ইহার প্রতিবাদ করিলে উক্ত পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যায় অচ্যুত বাবু পুনরায় স্বীয় বক্তব্য প্রমাণ করেন।—অচ্যুতবাবুর অভিমতকে অস্বীকার করিবার কোনও কারণ দেখা যায় না। (৯) চৈ. চ.—২।১৩, পৃ. ১৭৪ (১০) ঐ ২।১৩, পৃ. ১৮৫ (১১) চৈ. ভা.—২।৮, পৃ. ১৩৯ (১২) ঐ—২।১৩, পৃ.১২৫ (১৩) ঐ—২।১৩, পৃ.১৭৪. (১৪) চৈ. চ.—১।১০, পৃ. ৫২. (১৫) ঐ

গণোদ্দেশ' নামক দুইখানি পুথি হইতে জানা যায় যে গোবিন্দানন্দ-ঠাকুর ও ঠাকুর-গোবিন্দ নামে দুইজন পৃথক ব্যক্তি ছিলেন। সম্ভবত ইঁহারাই ছিলেন যথাক্রমে উপরোক্ত গোবিন্দানন্দ ও গোবিন্দ-দত্ত। 'চৈতন্যগণোদ্দেশে' গোবিন্দ-দত্তকে 'মহাপ্রভুর বায়ন বলা হইয়াছে। 'শাখানির্ণয়' গ্রন্থে দেখা যায় যে গোবিন্দানন্দের আবাস ছিল 'কোত্তরহট্ট' বা কুমারহট্টে[১৬]। 'অদ্বৈতমঙ্গলে' অদ্বৈত-সম্পর্কিত এক গোবিন্দ-বৈদ্যকে মধ্যে মধ্যে শান্তিপুরে দেখিতে পাওয়া যায়।[১৭] ইনি বৈদ্য হওয়ায় ইঁহাকে গোবিন্দ-দত্ত বলিয়া ধারণা জন্মাইতে পারে। 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'য়[১৮] একজন 'গীতপদ্যাদিকারক' গোবিন্দ-আচার্যের নাম আছে। দেবকীনন্দন এবং মাধবদাসও তাঁহাদের 'বৈষ্ণববন্দনা'গুলিতে তাঁহার কবিত্বের উল্লেখ করিয়াছেন।

গোবিন্দ-ঘোষ সম্বন্ধে কিন্তু অধিকতর নির্ভরযোগ্য বর্ণনা দৃষ্ট হয়। গ্রন্থ- ও পদ-কর্তৃগণ সকলেই প্রায় সেই গোবিন্দ-ঘোষকে তাঁহার ভ্রাতা বাসু-ঘোষ ও মাধব-ঘোষের সহিত একত্রে যুক্ত করিয়াছেন এবং স্বয়ং বাসু-ঘোষও তাঁহার পদে আপনার নাম বাদ দিয়া গোবিন্দ ও মাধবের নাম একত্রে উল্লেখ করিয়াছেন,[১৯] কোথাও বা নিজেকে দুই ভ্রাতার সহিত যুক্ত করিয়াছেন।[২০] গোবিন্দ-ঘোষ গৌরাঙ্গের সংকীর্তনকালে শ্রীবাস-গৃহে উপস্থিত থাকিতেন[২১] এবং তখনই সেখানে তাঁহার একটি প্রতিষ্ঠা হইয়া গিয়াছিল। জগাই-মাধাই উদ্ধারের সময়েও তিনি উপস্থিত ছিলেন।[২২] আবার মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের অব্যবহিত পূর্বেও তাঁহাকে নদীয়াতে মুকুন্দ-গদাধরাদির সহিত আসন্ন বিয়োগ-ব্যথায় অভিভূত হইতে দেখা যায়।[২৩] তারপর মহাপ্রভুর দক্ষিণ ভ্রমণান্তে গোবিন্দ-ঘোষ অন্যান্য গৌড়ীয় ভক্তের সহিত নীলাচলে গিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হন।

সেই বৎসরই রথযাত্রাকালে সাতটি সম্প্রদায়ে যে সাতজন বিশিষ্ট গায়ক মূল-গায়নের কাজ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে গোবিন্দ-ঘোষও একজন ছিলেন। শুধু তাহাই নহে। মহাপ্রভুর সহিত উদ্দণ্ড-নৃত্যে যোগদানকারী গায়কবৃন্দের মধ্যেও তিনি ছিলেন অন্যতম। গায়ক-হিসাবে তখন তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এবং এই সংকীর্তন-গানের মধ্য দিয়াই তিনি মহাপ্রভুর প্রদর্শিত-পথে যাত্রা করিয়া শ্রেষ্ঠ-ভক্তরূপে পরিগণিত

---

(১৬) পা: প.—ব. সা. প. প. (১৮), পৃ. ১০৯; আধুনিক বৈ. দ.-মতে (পৃ. ৩৪০) চৈতন্যশাখাভুক্ত গোবিন্দানন্দের নিবাস ছিল নবদ্বীপে, এবং গোবিন্দ-দত্তের বাস ছিল সুখচরে (পৃ. ৩৪৮) (১৭) পৃ. ৮-৯, ৩৮ (১৮) ৪১ (১৯) গৌ. ত.—পৃ. ২৭৯; দ্র.—বাসু-ঘোষ (২০) বা. প.—পৃ. ৮ (২১) চৈ. ভা.—২।৭, পৃ. ১৪০; ভ. র.—১২।৩৮৮১, ২০৮৫ (২২) ভ. র.—১২।১৯২৩ (২৩) গৌ. ত.—পৃ. ২৩৬

হইয়াছিলেন। সেইজন্য তিনি নিত্যানন্দপ্রভুরও যথেষ্ট স্নেহপাত্র হইয়াছিলেন, এবং সেই বৎসর গৌড়ে ফিরিয়া আসিলে পানিহাটীতে নিত্যানন্দের অভিষেক-অনুষ্ঠানে তিনি একটি বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।[২৪] আবার সেই একই কারণে পর বৎসর তিনি নীলাচলে পৌঁছাইলে মহাপ্রভু তাঁহাকে আপনার নিকট রাখিয়া দেন এবং তাঁহার দুই ভ্রাতা মাধব ও বাসুদেব নিত্যানন্দের সহিত গৌড়ে ফিরিয়া যান।[২৫] 'চৈতন্যচরিতামৃতে' কিন্তু উক্ত হইয়াছে যে সেই বৎসর নীলাচলে যে-সমূহ গৌড়ীয় ভক্ত গিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন 'বাসুদেব মুরারি গোবিন্দ তিন ভাই।'[২৬] কিন্তু সম্ভবত এই স্থলে মুরারির পরিবর্তে মাধব হইবে। মধ্যখণ্ডের একাদশ পরিচ্ছেদেও আছে—

গোবিন্দ রাঘব আর বাসুদেব ঘোষ।
তিন ভাই কীর্তন করে প্রভুর সন্তোষ॥

এখানেও রাঘবের স্থলে মাধব হইবে। কারণ রাঘবের কথা একটু পরেই আবার উল্লেখিত হইয়াছে। এই দুই স্থলে মুদ্রাকর-, বা লিপিকর-প্রমাদ ঘটাও বিচিত্র নহে। যাহাহউক, 'চৈতন্যচরিতামৃতের' উপরোক্ত বিবরণ সম্ভবত 'চৈতন্যভাগবতে'র বিবরণ হইতেও সমর্থিত হইতে পারে। কারণ তাহারও পরে যেই বৎসর সনাতন বা রূপ নীলাচলে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই বৎসর নীলাচলগামী ভক্তবৃন্দের মধ্যে গোবিন্দানন্দ ও গোবিন্দ-দত্তের নাম পাওয়া যায় বটে, কিন্তু গোবিন্দ-ঘোষকে আর দেখা যায়না।

আধুনিক 'বৈষ্ণবদিগ্দর্শনী'-প্রদত্ত বিবরণগুলি [২৭] ছাড়া ইহার পর আর আমরা

---

(২৪) চৈ. ভা.—৩।৫, পৃ. ৩০৪ (২৫) চৈ. চ.—১।১০, পৃ. ৫৩; সম্ভবত এই বৎসরই নীলাচল-পথে বারাণসী-অভিমুখী সার্বভৌমের সহিত গোবিন্দ-ঘোষাদির সাক্ষাৎ ঘটে।—চৈ. না.—১০।১৩; চৈ. চ.—২।১, পৃ. ৮৫; ২।১৬, পৃ. ১৮৬ (২৬) চৈ. চ.—২।১৬, পৃ. ১৮৬ (২৭) বৈ দি.-র বিবরণ (পৃ. ৫৯–৬১) নিম্নোক্ত রূপ:

কাটোয়ার পাঁচক্রোশ উত্তর-পূর্বে অজয়নদীর-তীরে কুলাই-গ্রামে উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থবংশে গোবিন্দ-ঘোষের জন্ম। পিতা বল্লভ-ঘোষ পূর্বে মুর্শিদাবাদের কান্দির সন্নিকটে রসোড়া-গ্রামে বাস করিতেন। তাঁহার নয় জন পুত্রের মধ্যে (সকলেই চৈতন্য-ভক্ত) বাসুদেব, গোবিন্দ ও মাধব সহোদর ছিলেন। কাশীপুর বিষ্ণুতলায় গোবিন্দের বিবাহ হয়। নিঃসন্তানা পত্নীর মৃত্যুতে তিনি গৌরাঙ্গ-চরণে আশ্রয় গ্রহণ করেন।......শান্তিপুর হইতে বৃন্দাবনোদ্দেশ্যে গমনকালে মহাপ্রভু একদিন অগ্রদ্বীপে ভিক্ষা-গ্রহণান্তে মুখশুদ্ধি ইচ্ছা করিলে গোবিন্দ-ঘোষ পূর্ব দিনের সঞ্চিত একটি অর্ধ-হরিতকী বস্ত্রাঞ্চল হইতে খুলিয়া দেন। কিন্তু তাঁহার সঞ্চয়-বাসনা ক্ষয় হয় নাই বলিয়া মহাপ্রভু তাঁহাকে অগ্রদ্বীপে পরিত্যাগ করিয়া যান। তারপর মহাপ্রভুর প্রত্যাগমন-প্রতীক্ষায় গোবিন্দ একদিন গঙ্গাস্নানকালে একটি কাষ্ঠখণ্ড স্পর্শ করিয়া তাহা তীরে উঠাইয়া রাখেন এবং মহাপ্রভুর দ্বারা স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া পরদিন তাহা গৃহে আনিয়া দেখেন যে তাহা একখানি উজ্জ্বল প্রস্তর-বিশেষ। তিনি তাহাতে বঙ্কিম শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ প্রস্তুত করাইলেন। অতঃপর মহাপ্রভু আসিয়া স্বয়ং সেই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং গোবিন্দ তাহার সেবাইত-রূপে অগ্রদ্বীপে

গোবিন্দ-ঘোষের বড় একটা সাক্ষাৎ পাই না। কেবল নরহরি-চক্রবর্তী জানাইতেছেন যে শ্রীনিবাস-আচার্যপ্রভুর বাল্যকালে—

চাখন্দি নিকট যে যে ভক্তের আলয়।
তথা শ্রীনিবাসের গমন সদা হয়॥
শ্রীগোবিন্দ ঘোষ আদি অধৈর্য অন্তরে।
শ্রীগৌরচন্দ্রের লীলামৃতে সিক্ত করে॥

'বৈষ্ণব দিগ্দর্শনী'-প্রদত্ত বিবরণের মধ্যে কতটুকু সত্য লুক্কায়িত আছে বলিতে পারা যায় না। তবে অপেক্ষাকৃত নির্ভরযোগ্য সূত্রগুলি হইতে গোবিন্দ-ঘোষ সম্বন্ধে কেবল এইটুকু বলা চলে যে তিনি হয়ত অগ্রদ্বীপে বাস করিতেন।[২৮] 'পদকল্পতরু'তে গোবিন্দ-ঘোষের ছয়টি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে।

কিন্তু বৃন্দাবনদাস গৌরাঙ্গের বাল্যলীলা-প্রসঙ্গে পূর্বোক্ত গোবিন্দানন্দ, গোবিন্দ-দত্ত ও গোবিন্দ-ঘোষ ছাড়া আরও এক (বা একাধিক) গোবিন্দের কয়েকবার উল্লেখ করিয়াছেন। সেই উল্লেখগুলি নিম্নোক্তরূপ :—

(১) নিমাই বাল্যকালে বন্ধু এবং পড়ুয়াকে কৃষ্ণব্যাখ্যা এবং ফাঁকি জিজ্ঞাসা করিয়া জব্দ করিতেন। শেষে তাঁহারা ভীত হইয়া তাঁহাকে এড়াইয়া চলিতে আরম্ভ করেন একদিন মুকুন্দ-দত্ত গঙ্গাস্নানের পথে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া দূরে সরিয়া পড়িলে—

দেখি জিজ্ঞাসয়ে প্রভু গোবিন্দের স্থানে।
এ বেটা আমারে দেখি পলাইল কেনে॥
গোবিন্দ বলেন আমি না জানি পণ্ডিত।
আর কোন কার্যে বা চলিলা কোন ভিত॥

(২) কাটোয়ায় সন্ন্যাস-গ্রহণকালে গৌরাঙ্গের নির্দেশে যাঁহারা কণ্টকনগরে গিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, চন্দ্রশেখর-আচার্য ও ব্রহ্মানন্দ এবং সন্ন্যাস-গ্রহণের পরে মহাপ্রভুর রাঢ়-অভিমুখে গমনের সময় ছিলেন

রহিয়া গেলেন ও প্রভুর আদেশে দার পরিগ্রহ করিলেন। একটি পুত্র-সন্তান জন্মাইবার কিছুকাল পরে তাঁহার পত্নী-বিয়োগ ঘটিল। তখন তিনি শিশুপুত্র ও গোপীনাথকে সমস্নেহে পালন করিতে লাগিলেন। কিন্তু পুত্রটিও মারা যায়। গোবিন্দ দুঃখে ও অভিমানে বিগ্রহকে উপবাসী রাখিয়া পড়িয়া রহিলে গোপীনাথ নিজে সান্ত্বনা দিলেন যে তিনিই তাঁহার পুত্রের কার্য করিবেন। কিছুকাল পরে গোবিন্দের দেহত্যাগ ঘটিলে মন্দির প্রাঙ্গণে তাঁহার দেহ সমাহিত করা হইল। গোপীনাথ যথারীতি অশৌচ-পালন করিলেন এবং মাসান্তে সর্বসমক্ষে গোবিন্দের শ্রাদ্ধ করিয়া পিণ্ডদান করিলেন। তদবধি প্রতি বৎসর চৈত্র মাসের কৃষ্ণা-একাদশী তিথিতে গোপীনাথ অগ্রদ্বীপে গোবিন্দের শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান করিয়া থাকেন। এই গল্পটি 'বৈষ্ণবদিগ্দর্শনী' লিখিত হইবার বহু পূর্বে ১২৯৮ সালের 'জন্মভূমি' পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যায় অঘোর নাথ দত্ত কর্তৃক রহস্যাবৃত আকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। (২৮) পা. মি.—পৃ. ১; পা. দ.—পৃ. ১০৩; বৈ.দ.—পৃ. ৩৩২

নিত্যানন্দ গদাধর মুকুন্দ সংহতি।
গোবিন্দ পশ্চাতে আগে কেশবভারতী॥

(৩) সন্ন্যাস-গ্রহণের পর মহাপ্রভুর নীলাচল-গমনের সঙ্গী হইয়াছিলেন—

নিত্যানন্দ গদাধর মুকুন্দ গোবিন্দ।
সংহতি জগদানন্দ আর ব্রহ্মানন্দ॥

উল্লিখিত গোবিন্দ, গোবিন্দ-দত্ত বা গোবিন্দ-ঘোষের একজন হইতে পারেন, কিংবা দুইজনই হইতে পারেন; আবার 'গোবিন্দদাসের কড়চা'র কথা ধরিলে তিনি মহাপ্রভুর নীলাচল-ভৃত্য গোবিন্দ কিনা তাহাও বিবেচ্য হইয়া পড়ে। 'কড়চা'র কথা বাদ দিলে অবশ্য কেবল বৃন্দাবনদাসের এই উল্লেখ হইতে নীলাচল-ভৃত্য গোবিন্দের কল্পনা একরকম নিরর্থক হয়। কারণ, মহাপ্রভুর নীলাচল-লীলার মধ্যে বৃন্দাবন যেখানে সেই ভৃত্য-গোবিন্দের উল্লেখ করিয়াছেন, সেখানে তিনি তাঁহাকে 'সুকৃতি গোবিন্দ', এই আখ্যা দিয়াছেন। তিনি তাঁহার গ্রন্থে 'সুকৃতি কৃষ্ণদাস', 'সুকৃতি শ্রীগদাধর দাস', এবং 'সুকৃতি মাধব ঘোষ', 'সুকৃতি প্রতাপরুদ্র' প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু কোথাও 'সুকৃতি গোবিন্দ ঘোষ' বা 'সুকৃতি গোবিন্দ দত্ত' বলেন নাই। অথচ চৈতন্যের নীলাচল-ভৃত্য সম্বন্ধে যে দুইবার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে, সেই দুইবারই তিনি তাঁহাকে 'সুকৃতি গোবিন্দ' বলিয়াছেন। তাছাড়া তিনি তাঁহাকে চৈতন্যের দ্বারপাল বলিয়াও অভিহিত করিয়াছেন। গৌরাঙ্গ-সঙ্গী স্বয়ং মুরারি-গুপ্তও রামানন্দ-রায় প্রভৃতির সহিত যুক্ত করিয়া মহাপ্রভুর এই নীলাচল-ভৃত্যকে 'গোবিন্দোদ্বারপালকঃ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। 'ভক্তমালের' লেখকও সম্ভবত এই গোবিন্দকেই বৈকুণ্ঠ-দ্বারপালের অবতার আখ্যা দিয়াছেন।[২৯] সুতরাং বৃন্দাবনের পূর্বোক্ত গোবিন্দের উল্লেখগুলিতে তৎপ্রশংসিত এই দ্বারপাল-গোবিন্দের কল্পনার প্রয়োজনীয়তা থাকে না। তথাকথিত গোবিন্দদাসের 'কড়চা'র বিবরণকে সত্য ধরিলে অবশ্য এইরূপ অনুমান অপরিহার্য হয়। 'কড়চা'য়[৩০] লিখিত হইয়াছে যে বর্ধমানের কাঞ্চননগরবাসী শ্যামদাস ও মাধবীর পুত্র গোবিন্দ বা গোবিন্দ-কর্মকার ১৪৩০ শক অর্থাৎ ১৫০৮ খ্রীষ্টাব্দে আসিয়া গৌরাঙ্গের গৃহে ভৃত্যরূপে নিযুক্ত হন[৩১]। কিন্তু গৌরাঙ্গপ্রভুর পরিবারবর্গ বলিতে তখন শচী, বিষ্ণুপ্রিয়া, গৌরাঙ্গ এবং ঈশান নামক একজন অনুগত ভৃত্য। বৃন্দাবনদাস মিশ্র-পরিবারকে 'সুদরিদ্র' ইত্যাদি বলিয়াছেন। তাঁহাদের অবস্থা যে অসচ্ছল ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। 'গৌরাঙ্গ-পরিজন'-পরিচ্ছেদে এইসম্বন্ধে বিশেষভাবেই আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং সেই ক্ষুদ্র দরিদ্র পরিবারে[৩২] গোবিন্দ-কর্মকারকে দ্বিতীয়-ভৃত্যরূপে নিয়োজিত করিবার কোনও প্রয়োজন থাকেনা।

(২৯) পৃ. ২৮ (৩০) পৃ. ১ (৩১) ঐ—পৃ. ১-৪ (৩২) দ্র.—কাশীশ্বর

ঘটনার সময়ানুক্রম-নির্ণয়ে বৃন্দাবনদাসের বর্ণনা আমাদিগকে বড় একটা সাহায্য করেনা। কিন্তু তদ্বর্ণিত প্রথমোল্লেখিত ঘটনা ও সংলগ্ন প্রাসঙ্গিক অংশ পাঠ করিলে ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায় যে উক্ত ঘটনা ঘটিয়াছিল ঈশ্বর-পুরীর নবদ্বীপ আগমনের পূর্বে। 'চৈতন্য-চরিতামৃত' পাঠেও এই ধারণা সমর্থিত হয়। ঈশ্বর-পুরীর নদীয়াগমন ঘটে ১৪৯৭-৯৮ খ্রীষ্টাব্দের দিকে।[৩৩] উক্ত ঘটনা ঈশ্বর-পুরীর আগমনের কিছুপরে ঘটিয়া থাকিলেও তাহা দশ বৎসর পরে কিছুতেই ঘটিতে পারেনা। বিশেষ করিয়া ১৫০৮ খ্রী.-এ ২২ বৎসর বয়সে গৌরাঙ্গ যে পড়ুয়াগণকে ফাঁকি জিজ্ঞাসা করিতে প্রবৃত্ত হন নাই, তাহা ধরিয়া লইতে পারা যায়। সুতরাং প্রথমোল্লেখিত গোবিন্দ যে 'দ্বারপাল'-গোবিন্দ হইতেই পারেন না, তাহাও ধরিয়া লইবার বাধা থাকেনা। কিন্তু তিনি গোবিন্দ-ঘোষ বা গোবিন্দ-দত্ত যে কেহই হউন না কেন, তাহাতে বিশেষ যায় আসেনা। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে এই দুইজন ভক্তই গৌরাঙ্গের বাল্যলীলায় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শেষোক্ত উল্লেখ দুইটির দুই গোবিন্দ যে একই ব্যক্তি তাহা প্রাসঙ্গিক ঘটনাদ্বয়ের সম্পর্ক হইতেই স্পষ্ট হইয়া উঠে। মুরারি-গুপ্ত, বৃন্দাবনদাস, লোচনদাস ও জয়ানন্দ, ইঁহাদের সকলের গ্রন্থ হইতেই বুঝা যায় যে গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস-গ্রহণের বাসনার কথা ভক্তগণ পূর্বাহ্নেই জানিয়াছিলেন। কিন্তু কোন্‌দিন তিনি সন্ন্যাস লইবেন, তাহা কেহ জানিতে পারেন নাই। জয়ানন্দ লিখিয়াছেন যে তিনি সন্ন্যাসের পূর্বে সকলের সহিত যুক্তি করিয়াছিলেন, শচী-বিষ্ণুপ্রিয়াও সমস্ত জানিতেন[৩৪]। চৈতন্যভাগবত'-কার বলেন যে কাটোয়া গমনের ঠিক পূর্বে গৌরাঙ্গ কেবল নিত্যানন্দকেই সেই কথা বলিয়াছিলেন এবং শচীদেবী, গদাধর, ব্রহ্মানন্দ, চন্দ্রশেখর ও মুকুন্দকেও তাহা জানাইবার নির্দেশ দিয়াছিলেন। তদনুযায়ী শচীদেবী ছাড়া ইঁহারা সকলেই কাটোয়ায় গিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। কিন্তু নিত্যানন্দকে গৌরাঙ্গপ্রভু সেইরূপ কোন নির্দেশ দিয়া গিয়াছিলেন কিনা সে সম্বন্ধে লোচনদাস কিছুই লেখেন নাই। তিনি কেবল জানাইতেছেন যে গৌরাঙ্গের গৃহত্যাগের দিন নিত্যানন্দ আপনা হইতেই চন্দ্রশেখর, দামোদর-পণ্ডিত এবং বক্রেশ্বর প্রভৃতি কয়েকজন মুখ্য ও ধীর ভক্তকে সঙ্গে লইয়া কাটোয়ায় হাজির হন। পরে কিন্তু গ্রন্থকার গদাধর, নরহরি প্রভৃতিকেও পর্যন্ত আনিয়াছেন। এস্থলে বৃন্দাবনের উক্তিই অধিকতর নির্ভরযোগ্য বলিয়া মনে হয় এবং মহাপ্রভু হয়ত নিত্যানন্দকে এইরূপ নির্দেশ দিয়া গিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি সঙ্গীদিগকে লইয়া যাত্রা করিয়াছিলেন। আবার বাসু-ঘোষের পদাবলী হইতে জানা যায় যে কাটোয়া-

(৩৩) ঐ (৩৪) চৈ.স.-মতে গৃহত্যাগের পূর্বমুহূর্তে গৌরাঙ্গ ও শচীদেবীর মধ্যে কথোপকথন হইয়াছিল। কিন্তু গৌ:স.-মতে শচী-বিষ্ণুপ্রিয়া সমস্ত জানিলেও গৌরাঙ্গের গৃহ-ত্যাগের ঠিক পূর্ব-মুহূর্তে কিন্তু তাঁহারা নিদ্রাচ্ছন্ন ছিলেন।—এই উভয় গ্রন্থই অপ্রামাণিক।

যাত্রাকালে বিশ্বম্ভরের সঙ্গে কেহই ছিলেন না। সুতরাং কোন্ কোন্ ভক্ত যে নিত্যানন্দের সহিত গমন করিয়াছিলেন তাহা ঠিক বুঝা যায় না। 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে' বা তাহার অনুবাদ 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়কৌমুদী'তে দেখা যায় যে নিত্যানন্দের সহিত চন্দ্রশেখর গিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু মুকুন্দ-দত্ত তখন নদীয়াতেই উপস্থিত ছিলেন। এশিয়াটিক-সোসাইটিতে রক্ষিত বাসুদেব-ঘোষের নামে লিখিত একটি পুথিতেও[৩৫] ইহারই সমর্থন পাই। সুতরাং সমস্যা আরও জটিল হইয়া উঠে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় এই যে বৃন্দাবনদাসোক্ত উক্ত 'পঞ্চজনা'র মধ্যে গোবিন্দের উল্লেখমাত্র না থাকিলেও, মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের পরে তাঁহার রাঢ়-ভ্রমণ পথে কিন্তু তিনি গোবিন্দের উল্লেখ করিয়াছেন :

নিত্যানন্দ গদাধর মুকুন্দ সংহতি।
গোবিন্দ পশ্চাতে আগে কেশবভারতী॥

কড়চা-লেখক গোবিন্দ কিন্তু জানাইতেছেন যে মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণার্থ যাত্রাকালে একমাত্র তিনিই[৩৬] তাঁহার সঙ্গে কাটোয়ায় যান। পরে সন্ধ্যার দিকে 'মুকুন্দ, শেখর। অবধৌত ব্রহ্মানন্দ আর গদাধর॥ গুরুদেব গঙ্গাদাস, গাথক শিবাই। একে একে দেখা দিতে লাগিল সবাই॥'[৩৭] বহুদিনের অনুগত-ভৃত্য ঈশানের পরিবর্তে গৌরাঙ্গ যে কেন এই নবাগত গোবিন্দ-কর্মকারকেই সঙ্গে লইবেন তাহা বুঝা যায়না। সুতরাং কাঁহারা যে কাটোয়াতে উপস্থিত ছিলেন তাহা স্থির করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। কৃষ্ণদাস-কবিরাজ বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গলের' (অর্থাৎ 'চৈতন্যভাগবতে'র) সহিত বিশেষভাবেই পরিচিত ছিলেন। চৈতন্যের লীলা-সংবলিত এই একটিমাত্র গ্রন্থই তৎকালীন বৃন্দাবনে সমূহ-ভক্ত কর্তৃক সমাদৃত ও অধীত হইত। সুতরাং কবিরাজ-গোস্বামীর মত লোকের পক্ষে উহাতে বর্ণিত প্রত্যেকটি ঘটনার সহিত পরিচিত হইবার সম্ভাবনা ছিল। তিনি বৃন্দাবনকে 'চৈতন্যলীলার ব্যাস' বলিয়াছেন এবং স্বীয় গ্রন্থে বৃন্দাবন-বর্ণিত ঘটনাগুলিকে সযত্নে এড়াইয়া চলিয়াছেন। তাঁহার বৃন্দাবন-স্তুতি প্রসিদ্ধ। গৌরাঙ্গের বাল্য- ও কৈশোরলীলা বর্ণনায় বাহুল্য ভয়ে বৃন্দাবন যে-ঘটনার বর্ণনা দেন নাই, কৃষ্ণদাস তাহারই বিস্তৃত বর্ণনা দিয়াছেন। কিংবা, বৃন্দাবন যে ঘটনাকে স্ফুট করেন নাই, তাঁহাকে প্রণাম জানাইয়া কৃষ্ণদাস সেই সমূহ বর্ণনাকে স্ফুটতর করিয়াছেন। এক্ষেত্রে অন্যের নিকট শ্রুত ঘটনার সম্বন্ধে উভয়ের গ্রন্থে বর্ণনা-সাদৃশ্য থাকিলে তাহা বিশ্বাসযোগ্য যদিও বা না হয়, কিন্তু যেখানে বর্ণনার অমিল দৃষ্ট হয় সেখানে কবিরাজ-গোস্বামীর বর্ণনা যে অধিকাংশস্থলেই নির্ভরযোগ্য সে বিষয়ে প্রায় সন্দেহ থাকে না। 'চৈতন্যচরিতামৃতো'ক্ত ঘটনার সহিত বিচারে কেবল 'চৈতন্যভাগবতে'র নহে, কৃষ্ণদাস আর যাঁহার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন

(৩৫) গৌ.ব.—পৃ. ১৩ (৩৬) পৃ. ৮ (৩৭) চৈ. চ.—২।৩, পৃ. ৯৫

এবং যাঁহার রচনার প্রত্যেকটি ঘটনার সম্বন্ধেই অত্যন্ত সচেতন ছিলেন, সেই কবিকর্ণপূরের 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক'-বর্ণিত ঘটনাগুলি সম্বন্ধেও এই কথা আংশিকভাবে প্রযোজ্য হইতে পারে। ঘটনার যথাযথতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে না পারিলে বাস্তব-সত্যের প্রতি অধিকতর-অনুরাগী কৃষ্ণদাস কখনও পূর্বসূরী-বর্ণিত ঘটনার উপর হস্তক্ষেপ করিতেন না। বর্তমান আলোচ্যমান বিষয় সম্বন্ধে সেই কৃষ্ণদাস-কবিরাজ জানাইতেছেন যে মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণকালে তাঁহার সঙ্গী হইয়াছিলেন নিত্যানন্দ, চন্দ্রশেখর-আচার্য ও মুকুন্দ। উল্লেখের মধ্যে কোনও সন্দেহের ভাব নাই। বরং তিনি বৃন্দাবনদাসের বর্ণনার সহিত সবিশেষ পরিচিত ছিলেন বলিয়াই একেবারে সংখ্যানির্দেশ করিয়া জানাইয়াছেন, 'এই তিন কৈল সবকার্য।' এবং সন্ন্যাস-গ্রহণের পর মহাপ্রভুর রাঢ়দেশ-পরিভ্রমণকালে

নিত্যানন্দ আচার্যরত্ন মুকুন্দ তিনজন।
প্রভু পাছে পাছে তিনে করেন গমন॥

জয়ানন্দও তিনজনের নাম করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার গ্রন্থে চন্দ্রশেখরের পরিবর্তে গোবিন্দানন্দের নাম আছে। মুরারি-গুপ্তের গ্রন্থে কিন্তু চন্দ্রশেখরেরই নাম রহিয়াছে। জয়ানন্দও পরে চন্দ্রশেখরের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু 'চৈতন্যমঙ্গল'-গ্রন্থে তিনি গোবিন্দ-দত্ত বা গোবিন্দ-ঘোষের নাম কোথাও উল্লেখ করেন নাই। গ্রন্থ-মধ্যে তিনি বহুবারই গোবিন্দ-নামের উল্লেখ করিয়াছেন, অন্ততপক্ষে পনর বার। কিন্তু কোথাও সোপাধি-গোবিন্দের নাম নাই। গোবিন্দ-প্রসঙ্গে উপাধি ব্যবহার করা সম্ভবত তাঁহার রীতিবহির্ভূত ছিল। তিনি কয়েকটি স্থলে গোবিন্দ এবং কয়েকটি স্থলে গোবিন্দানন্দ নাম ব্যবহার করিয়াছেন। মাত্র একটি স্থলে 'গোবিন্দাই' নাম পাওয়া যায়—'বাসুদেব মুকুন্দদত্ত আর গোবিন্দাই।'[৩৮] অন্য দুইটি স্থলে আছে 'মুকুন্দ বাসুদেব গোবিন্দ তিনজন'[৩৯] এবং 'গোবিন্দ মুকুন্দানন্দ বাসুদেব দত্ত।'[৪০] এই তিনটি স্থলেই মুকুন্দ-দত্ত ও বিশেষ করিয়া বাসুদেব-দত্তের সহিত যুক্ত হওয়ায় উক্ত গোবিন্দাই বা গোবিন্দকে গোবিন্দ-দত্ত বলিয়া চিনিতে ভুল হয় না। কেবল একটিমাত্র স্থলে গোবিন্দের নাম পৃথকভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে[৪১]—'শ্রীগর্ভপণ্ডিত মুরারি গোবিন্দ শ্রীধর।' গৌরাঙ্গের বাল্যলীলা-সঙ্গীদিগের বর্ণনা প্রসঙ্গে এইরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে। 'চৈতন্যভাগবত' ও 'চৈতন্যচরিতামৃত' হইতে জানা যায় যে মহাপ্রভুর বাল্যলীলা-সঙ্গী ছিলেন গোবিন্দ-ঘোষ, গোবিন্দ-দত্ত ও গোবিন্দানন্দ। সুতরাং উক্ত গোবিন্দ যে এই তিনজনের একজন হইবেন তাহাতে সংশয় নাই। শ্রীগর্ভ, মুরারি ও শ্রীধরের সহিত উল্লেখে তাহাই সমর্থিত হয়। তবে ইনি উঁহাদের কোন্ গোবিন্দ তাহা

(৩৮) পৃ. ২৭ (৩৯) পৃ. ১ (৪০) পৃ. ১৪ (৪১) পৃ. ২৪

অবশ্য ঠিক-ঠিক বুঝা যায়না। না গেলেও ক্ষতি নাই। তাছাড়া, ঘটনার পারম্পর্য ও যথাযথতা সম্বন্ধে জয়ানন্দের গ্রন্থ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাঠককে বিভ্রান্ত করে। গৌরাঙ্গের গয়া-গমন-সঙ্গীদের মধ্যেও জগদানন্দ এবং আচার্যরত্নের সহিত যে পৃথক গোবিন্দকে দেখা যায় তাঁহার সম্বন্ধেও উপরোক্ত যুক্তি প্রযোজ্য। গ্রন্থের আর একটি স্থলেও[৪২] একজন গোবিন্দের নাম উল্লেখ করিবার একটু পরেই আর একজন গোবিন্দের উল্লেখ করা হইয়াছে। ইঁহাদের মধ্যেও যে একজন ছিলেন গোবিন্দ-দত্ত, এবং অন্যজন গোবিন্দ-ঘোষ তাহাতে সংশয় নাই। কারণ, এই বর্ণনা গৌরাঙ্গের বংগ-গমনের পূর্ববর্তিকাল-বিষয়ক বলিয়া পরবর্তিকালের কোন গোবিন্দের কল্পনা এস্থলে নিরর্থক। ইহা ছাড়াও গৌরাঙ্গের সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্বে, তাঁহার রামকেলি হইতে অদ্বৈতগৃহে প্রত্যাবর্তনের পর মাধবেন্দ্র-পুরীর আরাধনা-দিবসে ও শ্রীবাস-গৃহে গৌরাঙ্গের অভিষেককালে গোবিন্দ ও গোবিন্দানন্দের নাম একত্রে উল্লেখিত দেখা যায়।[৪৩] পৃথকভাবে গোবিন্দানন্দের নামও চারবার উল্লেখিত হইয়াছে। জয়ানন্দ গোবিন্দ-দত্তকে কেবলমাত্র গোবিন্দই বলিয়াছেন। সুতরাং গোবিন্দ ও গোবিন্দানন্দ যে তিনটি স্থলে একত্র-যুক্ত হইয়াছেন, সেই স্থলগুলির গোবিন্দও যে গোবিন্দ-দত্ত তাহা ধরিয়া লইলে তদ্বর্ণিত গোবিন্দানন্দকেই গোবিন্দ ঘোষ ধরিতে হয়। ঘটনার গুরুত্ব-বিচারে এই তিনটি স্থলেই গোবিন্দানন্দের প্রয়োজন অনধিক। কিন্তু পৃথকভাবে উল্লেখিত চারিটি স্থলের মধ্যে তিনটি স্থলের আলোচনা অপরিহার্য।

কৃষ্ণদাস-কবিরাজ জানাইয়াছেন যে মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণকালে তিনজন ভক্ত 'সর্বকার্য' সম্পন্ন করিয়াছিলেন। সমস্ত কর্ম করিবার জন্য কাঁহারও না কাঁহারও প্রয়োজন হইয়াছিল। কিংবা একাধিক ব্যক্তিও হয়ত কর্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন। জয়ানন্দও জানাইয়াছেন :

গঙ্গাপার হৈআ আগে রইলা নিত্যানন্দ ॥
মুকুন্দ দত্ত বৈদ্য গোবিন্দ কর্মকার।
মোর সঙ্গে আইস কাটোআ গঙ্গাপার ॥

আশ্চর্যের বিষয়, এই উক্তিকে অবলম্বন করিয়া ১৮৯৮ খ্রী.-এর জানুয়ারী মাসে 'ক্যালকাটা রিভিউ'-পত্রিকায়' লিখিত হইয়াছিল, "**Jayananda, mentions Govinda Karmakar, the writer of the Diary by name.**" কিন্তু উপরোক্ত পঙ্‌ক্তিগুলি পাঠ করিবার কালে 'চৈতন্যচরিতামৃতো'ক্ত 'সর্বকার্য'-এর কথা মনে রাখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে নিত্যানন্দ, মুকুন্দ-দত্ত ও গোবিন্দ কিংবা কেবল গোবিন্দই কর্মকর্তা ছিলেন ;

(৪২) ঐ—পৃ. ৪৭ (৪৩) ঐ—পৃ. ৭২, ১৪২, ১৫১

কিংবা 'কর্মকার'-হিসাবে গোবিন্দই হয়ত বিশেষভাবে সক্রিয় হইয়াছিলেন। পূর্বেই বলিয়াছি জয়ানন্দ তাঁহার সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে কোথাও কোনও গোবিন্দের পদবী প্রয়োগ করেন নাই। এই স্থলটিও তাহার ব্যতিক্রম নহে। সুতরাং উপাধিবিহীন এই গোবিন্দকে পূর্বের মতই গোবিন্দ-দত্ত বলিয়া ধরা যাইতে পারে। কিন্তু ইনি যে গোবিন্দ না হইয়া গোবিন্দানন্দই, পরবর্তী পঙ্‌ক্তিতে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে।[৪৪]

মুকুন্দ গোবিন্দানন্দ সঙ্গী নিত্যানন্দ।
ইন্দ্রেশ্বর ঘাটে পার হৈলা গৌরচন্দ্র ॥

এবং গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস-গ্রহণের পরেই

শান্তিপুর গেলা গোবিন্দানন্দ আনন্দিত হৈঞা।
নবদ্বীপে মুকুন্দেরে দিল পাঠাইঞা ॥ ৪৫

সুতরাং এই গোবিন্দানন্দ যে গোবিন্দ-দত্ত নহেন এবং সেইজন্যই গোবিন্দ-ঘোষ কিংবা গোবিন্দানন্দ নামধেয় পৃথক ব্যক্তি তাহাতে সন্দেহ নাই, এবং কড়চা-লেখক তথাকথিত গোবিন্দ-কর্মকারও যে মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণকালীন ভৃত্য হইতেই পারেন না তাহাতেও সংশয় থাকে না।

'চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে'র মূল-বিষয়কে অতিক্রম করিয়া গ্রন্থের অনুবাদক প্রেমদাস শ্রীখণ্ডে নরহরি-সকাশে আগত উত্তররাঢ়স্থ যে-একজন গোবিন্দদাসের সংবাদ দিতেছেন, তাঁহাকে

নরহরি বলে বড় ভাগ্য সে তোমার।
নীলাচলে দেখিবারে চৈতন্যাবতার ॥

নরহরির এই উক্তি এবং গন্ধর্বের সহিত গোবিন্দের কথাবার্তা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে এই তথাকথিত গোবিন্দ তৎকালে প্রথমবারের জন্য ভক্তবৃন্দের সংস্পর্শে আসিলেন এবং প্রথমবারের জন্যই তিনি নীলাচলে যাইতেছেন। অথচ ইহা চৈতন্যের দাক্ষিণাত্য-গমনের অনেক পরবর্তী ঘটনা। সুতরাং এই গোবিন্দ সম্বন্ধে 'গোবিন্দ-কর্মকার'-কল্পনা নিরর্থক হয়। আবার ইনি যে দ্বারপাল-গোবিন্দ নহেন তাহাও নিশ্চয় করিয়া বলা চলে। কারণ, গ্রন্থকার স্বয়ং প্রেমদাসই একটু পরে জানাইতেছেন[৪৬] যে উক্ত সময়ে নীলাচল-ভৃত্য গোবিন্দ নীলাচলেই উপস্থিত ছিলেন। অনুবাদক এবিষয়ে 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে'রই অনুসরণ করিয়াছেন।[৪৭] মূল-নাটকে অবশ্য একজন উত্তর-রাঢ়াগত বৈদেশিকের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।—তিনি নরহরিদাস কর্তৃক প্রেরিত হইয়া শিবানন্দের নিকট নীলাচলে গমন করিবার সময় সম্বন্ধে জানিতে আসিলে একই কারণে

(৪৪) ঐ—পৃ. ৮৩ (৪৫) ঐ—পৃ. ৯০ (৪৬) পৃ. ৩৪৩ (৪৭) চৈ. না.—১০।১৫

অদ্বৈত কর্তৃক প্রেরিত গন্ধর্ব-নামক একজন দূতের সহিত পথিমধ্যে তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটে এবং উভয়ের মধ্যে অন্যান্য তথ্য-প্রকাশক কিছু আলাপ-আলোচনাও চলে। বিভিন্ন তথ্য বা ঘটনা প্রকাশ করিবার জন্য কবিকর্ণপূর অন্যান্য নাট্যকারদের মত এইভাবে এমন অনেক ব্যক্তির অবতারণা করিয়াছেন, যাহারা নাটকীয় কাল্পনিক ব্যক্তি ছাড়া অন্য কিছু নহে। এইস্থলে সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক গন্ধর্বের মত উক্ত বৈদেশিকটিও যে একটি কাল্পনিক চরিত্র, শিবানন্দ-চরিত্রাদি অন্যান্য বিষয়কে পরিস্ফুট করিবার জন্যই নাটকের প্রয়োজনে সৃষ্ট হইয়া থাকিবে, তাহাই সংগত মনে হয়। অথচ প্রায় দেড়শত বৎসর পরে তিনি যে প্রেমদাসের গ্রন্থে কি করিয়া গোবিন্দে পরিণত হইলেন এবং আরও কিছু নূতন তথ্য প্রকাশ করিলেন তাহা বুঝিতে পারা যায়না। তবে প্রেমদাসের বর্ণনার মধ্যেই স্ববিরোধ থাকায় কর্ণপূরের বৈদেশিককে মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য-সঙ্গী গোবিন্দ-কর্মকার বলিয়া ধরিয়া লওয়ার কথাই উঠিতে পারেনা। অবশ্য দেবকীনন্দন তাঁহার 'বৈষ্ণববন্দনা' গ্রন্থে[৪৮] জানাইয়াছেন :

সুগ্রীব মিশ্রি বন্দো শ্রীগোবিন্দানন্দ।
প্রভু লাগি মানসিক জার সেতুবন্দ ॥

এইরূপ উক্তির অর্থ সুস্পষ্ট নহে। কিন্তু কবিকর্ণপূর জানাইতেছেন[৪৯] যে মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণকালে প্রথমে তাঁহার সহিত যে কয়েকজন শিষ্য কিয়দ্দূর গমন করেন, তাঁহারা ছিলেন বিপ্র। কোন কর্মকারের কথা সেখানে নাই। আবার 'পাট-পর্যটন'-গ্রন্থে[৫০] গোবিন্দানন্দের বাস 'কোঙরহট্টে' বলা হইয়াছে। 'কাঞ্চননগরে'র কোনও উল্লেখ সেখানে পাওয়া যায়না। আশ্চর্যের বিষয়, 'গৌরপদতরঙ্গিণী-'ধৃত বলরামদাস-ভনিতার একটি পদেও লিখিত হইয়াছে[৫১] যে মহাপ্রভু গোবিন্দ নামক কোনও ভক্তকে লইয়া দক্ষিণদেশ-ভ্রমণের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন :

নীলাচল উদ্ধারিয়া গোবিন্দেরে সঙ্গে লৈয়া
দক্ষিণ দেশেতে যাব আমি।
শ্রীগৌড়মণ্ডল ভার করিতে নাম প্রচার
ত্বরা নিতাই যাও তথা তুমি ॥

'চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক' হইতে জানা যায় যে মহাপ্রভু দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইলে নিত্যানন্দপ্রভুও উত্তরাভিমুখী হন। আবার 'চৈতন্যভাগবতে'র দৃষ্টান্তে অন্যান্য চরিতগ্রন্থগুলিতেও জানান হইয়াছে যে মহাপ্রভু নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের পর নিত্যানন্দকে 'মুনিধর্ম' ত্যাগ করিয়া গৌড়-উদ্ধার করিবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। সুতরাং বলরামের পদে সম্ভবত দেবকীনন্দনের গোবিন্দানন্দকে (সংক্ষেপে গোবিন্দকে)

(৪৮) পৃ.৩ (৪৯) চৈ. না.—৭।৪ (৫০) পা. প.—ব. সা. প. প. (১৮) (৫১) পৃ. ২৬৩

তাঁহাদের মধ্যে নিত্যানন্দ, মুকুন্দ ও জগদানন্দকেই সক্রিয় দেখা যায়। এতখানি পথের মধ্যে গদাধর বা গোবিন্দ বা ব্রহ্মানন্দও যে তাঁহাদের সঙ্গে চলিতেছেন, তাহার যেন কোন চিহ্নই পাওয়া যায় না। এই ব্রহ্মানন্দকে 'চৈতন্যভাগবতো'ক্ত শ্রীবাস-গৃহে সান্ধ্য-কীর্তন ও গৌরাঙ্গের গোপিকা-নৃত্য-আসরে উপস্থিত দেখা গেলেও তাঁহার সম্বন্ধে আর কোন বিষয়ই জানিতে পারা যায় না। কিন্তু এইস্থলে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে গদাধর সম্বন্ধে বৃন্দাবন-দাস খুব সম্ভবত কবিকর্ণপূরের 'চৈতন্যচরিতামৃতমহাকাব্যে'র দ্বারা প্রভাবিত হইয়া থাকিবেন। এই গ্রন্থ অনুযায়ী নিত্যানন্দ গদাধর প্রভৃতি ব্রাহ্মণ এবং মুকুন্দাদি ভক্ত মহাপ্রভুর নীলাচল-যাত্রাপথে সঙ্গী-হিসাবে গমন করিয়াছিলেন। এইস্থলে গ্রন্থোক্ত 'প্রভৃতি' এবং 'আদি' শব্দের উল্লেখে মনে হয় যে বেশ কিছু সংখ্যক ভক্ত মহাপ্রভুর সঙ্গী হইয়াছিলেন। কিন্তু 'গোবিন্দদাসের-কড়চা' ব্যতিরেকে অন্য কোনও প্রামাণিক গ্রন্থে এইরূপ তথ্য পরিবেশন করা হয় নাই। কিংবা এই সমস্ত শব্দ প্রয়োগ-দৃষ্টে আরও মনে হইতে পারে যে মহাকাব্য-রচনার সময় কবিকর্ণপূর এসম্বন্ধে খুব নিশ্চিত ছিলেন না। গ্রন্থখানি ১৫৪২ খ্রী.-এ রচিত হইয়াছিল। তখন কবির যে বয়স ছিল, তাহাতে তথ্য পরিবেশন সম্বন্ধে ঐতিহাসিক মর্যাদা রক্ষা করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব না হইতে পারে। গ্রন্থখানির অন্যান্য বহুবিধ অবিশ্বাস্য তথ্য-পরিবেশনের দ্বারা তাহারই প্রমাণ পাওয়া যায়। কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে।--গ্রন্থকার বলেন (১।২৪) যে গৌরাঙ্গ-জন্মের পূর্বে শচীদেবী ত্রয়োদশ-মাস গর্ভবতী ছিলেন। শচীদেবীকে প্রেমদান ব্যাপারে (৫ম. সর্গ) বর্ণিত হইয়াছে যে শচীদেবীই প্রথমে পুত্রের নিকট প্রেম-প্রার্থনা করিলে গৌরাঙ্গ ব্রাহ্মণ-দিগের নিকট প্রার্থনা জানাইয়া তাঁহাকে প্রেমধন দেওয়াইয়াছিলেন। গৌরাঙ্গের গঙ্গাবক্ষে ঝাঁপ দেওয়ার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে (৭ম. সর্গ) যে একদিন নৃত্যকালে এক ব্রাহ্মণী তাঁহার সম্মুখে প্রণতা হইলে তিনি ব্রাহ্মণীর দুঃখভার গ্রহণপূর্বক গঙ্গাজলে নিপতিত হন এবং পরে নিত্যানন্দ তাঁহাকে উদ্ধার করেন। আশ্চর্যের বিষয়, গ্রন্থমধ্যে লিখিত হইয়াছে (১১শ. সর্গ) যে সন্ন্যাস-গ্রহণের পর ভাব-বিহ্বল-চিত্তে রাঢ়দেশে বিচরণ করিবার কালে মহাপ্রভুই স্বয়ং প্রথমে অদ্বৈত-গৃহে গমনেচ্ছু হইয়া নিত্যানন্দকে নবদ্বীপস্থ ভক্তবৃন্দসহ শান্তিপুরে যাইবার জন্য আজ্ঞা প্রদান করেন। আরও একটি অদ্ভুত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে (১২শ. সর্গ) যে ভক্তবৃন্দের নিকট বিদায় লইয়া মহাপ্রভুর নীলাচল হইতে দক্ষিণাভিমুখে গমন করিবার পর পথিমধ্যে গোপীনাথ নামক ব্রাহ্মণ গিয়া তাঁহাকে সার্বভৌম-রচিত একটি শ্লোক প্রদান করিলে তিনি সেই শ্লোক মধ্যে 'কৃষ্ণপদ' দেখিতে পাইয়াসার্বভৌমের প্রতি পূর্বকৃত স্বীয় অসদাচরণের জন্য হা-হুতাশ করিতে থাকেন এবং সার্বভৌম-সেবায় তৎপর না হইয়া শ্রীক্ষেত্র-ত্যাগকে স্বীয় চরম অপরাধ বিবেচনা করিয়া নীলাচলে প্রত্যাবর্তন পূর্বক সার্বভৌম-সেবায় ব্রতী হইয়া-ছিলেন। আরও অদ্ভুত ব্যাপার যে, পরে তিনি যখন দক্ষিণ-যাত্রা আরম্ভ করিলেন, তখন

তিনি গোদাবরী-তীরে গিয়াও রামানন্দ-রায়ের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়াই চলিয়া গেলেন এবং প্রত্যাবর্তনের সময় (১৩শ. সর্গ) ঐস্থানে আসিয়া রামানন্দ সহ মিলিত হইলেন। কিন্তু তাহাতে সন্তুষ্ট না হওয়ায় সেখান হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের পরেও একদিন তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া একাকী হঠাৎ গোদাবরী-তীরে গমন করিয়া রামানন্দ-রায়ের সহিত চারি-মাস অতিবাহিত করিয়া ফিরিলেন। গ্রন্থ-মধ্যে (১৭শ. সর্গ) এমন বিবরণও লিপিবদ্ধ হইয়াছে যে সনাতন-রূপ এবং অনুপমও একত্রে নীলাচলে গিয়া মহাপ্রভুর পাদপদ্ম দর্শন করিয়াছিলেন এবং মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাত্রা করিলে রামানন্দ-রায় চৈতন্য-বিয়োগে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন (২০।৩৬)।

এই সমস্ত বিবরণ দেখিয়া কবিকর্ণপূরের 'চৈতন্যচরিতামৃতমহাকাব্যে'র পরিবেশিত তথ্য সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ থাকিয়া যায়। মহাপ্রভুর নীলাচল-যাত্রার সঙ্গী-বৃন্দের বর্ণনাকেও এই সিদ্ধান্তের আলোকে বিচার করিতে হইবে। আশ্চর্যের বিষয়, যে-গদাধরকে তিনি উক্ত সঙ্গী-বৃন্দের অন্তর্গত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহার ঐ গ্রন্থে সেই গদাধরকেই পরে আবার মহাপ্রভু-দর্শনাকাঙ্ক্ষী ভক্তবৃন্দের সহিত নীলাচলে গমন করিতেও দেখা যায় (১৩শ. সর্গ) সুতরাং আলোচ্য-ক্ষেত্রে অন্তত গদাধর সম্বন্ধে তৎপ্রদত্ত বিবরণের উপর নির্ভর করা চলে না। অবশ্য কবিকর্ণপূর তাঁহার পরিণত-বয়সের রচিত 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে'র মধ্যে যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন তাহা নিশ্চয়ই বিচার্য হইতে পারে। সে সম্বন্ধে অনতিবিলম্বে আলোচনা হইবে। কিন্তু জানিয়া রাখিতে হইবে যে মহাকাব্যের বিবরণ তাহা হইতে ভিন্ন।

কৃষ্ণদাস-কবিরাজ কিন্তু মুরারি-গুপ্ত[৫৭] ও বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থদ্বয়ের সম্বন্ধে (সম্ভবত কর্ণপূরের মহাকাব্যের সম্বন্ধেও) বিশেষভাবে সচেতন থাকিয়াও জানাইয়াছেন যে নীলাচল-পথে মহাপ্রভুর সঙ্গী ছিলেন নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, মুকুন্দ-দত্ত ও দামোদর-পণ্ডিত। তাঁহার পথ-বৃত্তান্ত বর্ণনায়ও নিত্যানন্দকে কয়েকবার দেখিতে পাওয়া যায়। মুকুন্দকেও দেখা যায় একেবারে শেষের দিকে। কিন্তু জগদানন্দ বা দামোদরকে কোথাও দেখা যায়না। কৃষ্ণদাসের পক্ষে অবশ্য খুঁটিনাটি বিষয়ের উল্লেখ করা সম্ভব নাও হইতে পারে। কারণ বৃন্দাবনদাস-সম্পর্কে তাঁহার সংকোচ বা দৌর্বল্য তখনও যে দূরীভূত হয় নাই তাহা তিনি নীলাচল-যাত্রা-সম্বন্ধীয় পরিচ্ছেদ আরম্ভ করিবার পূর্বে নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে নীলাচল-পথের সঙ্গীদিগের নামোল্লেখের সময় তিনি মুরারি-গুপ্ত ও বৃন্দাবনোক্ত নামগুলির সহিত বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন বলিয়াই এক্ষেত্রেও সংখ্যা-নির্দেশক বিশেষণ-পদ ব্যবহার করিয়া বলিয়াছেন, "এই চারিজনে আচার্য্য দিল প্রভুসনে" ৮

(৫৭) চৈ. চ.—১।১৩৭, পৃ. ৬০

চারজন সম্পর্কে পাঠককে নিশ্চিন্ত করিবার জন্য কিছুপরে তিনি পুনরায় তাহার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন :

গঙ্গাতীরে গেলা প্রভু চারিজন সাথে।

এবং চৈতন্যমঙ্গলে প্রভুর নীলাদ্রিগমন।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন।।

এইখানে তিনি পরিচ্ছেদ সমাপ্ত করিয়াছেন। কিন্তু এই স্থলে তিনি যে ভিন্ন-বর্ণনা দিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার সংকোচের সীমা ছিলনা। নূতন পরিচ্ছেদ আরম্ভ করিয়াই তিনি আবার দৈন্যপ্রকাশ করিয়া বলিতেছেন :

এইসব লীলা শ্রীদাস বৃন্দাবন।
বিস্তারিয়া করিয়াছেন উত্তম বর্ণন।।
সহজে চরিত্র মধুর চৈতন্য-বিহার।
বৃন্দাবনদাস মুখে অমৃতের ধার।।
অতএব তাহা বর্ণিলে হয় পুনরুক্তি।
দম্ভ করি বর্ণি যদি তৈছে নাহি শক্তি।।
চৈতন্যমঙ্গলে যাহা করিল বর্ণন।
সূত্ররূপে সেইলীলা করিয়ে সূচন।।
তাঁর সূত্র আছে তিঁহো না কৈল বর্ণন।
যথা কথঞ্চিৎ করি সে লীলা কথন।।
অতএব তাঁর পায়ে করি নমস্কার।
তাঁর পায়ে অপরাধ না হউক আমার।।

এবং পুনরায়, এইমত মহাপ্রভু চলিলা নীলাচলে।
চারিভক্ত সঙ্গে কৃষ্ণ সংকীর্তন কুতূহলে।।

এই 'চারিভক্ত' সম্পর্কে যদি কবিরাজ-গোস্বামী নিঃসন্দেহ না হইতে পারিতেন, তাহা হইলে তিনি এতটা সচেতন থাকা সত্ত্বেও কখনও বৃন্দাবনের 'পায়ে নমস্কার' করিয়াই পরক্ষণে আবার 'তাঁর পায়ে অপরাধ' করিয়া বসিতেন না।

বৃন্দাবনের বর্ণনায় মহাপ্রভুর নীলাচল-গমনের পরেও তদ্বর্ণিত গদাধর, গোবিন্দ বা ব্রহ্মানন্দকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু কৃষ্ণদাসের বর্ণনায় এইরূপ অসংগতি দৃষ্ট হয় না। মহাপ্রভুর নীলাচলাগমনের পর বিভিন্ন ঘটনা প্রসঙ্গে এবং তাঁহার দক্ষিণ-যাত্রার প্রাক্কালেও আমরা কবিরাজ কর্তৃক পূর্বলিখিত চারিভক্তেরই সাক্ষাৎলাভ করিয়া থাকি। দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ শেষ করিয়া মহাপ্রভু যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখনও প্রত্যুদ্গমনের জন্য উল্লেখিত নিত্যানন্দ,জগদানন্দ,দামোদর এবং মুকুন্দ চারিজনেই আলালনাথের পথে অগ্রসর

হইয়াছিলেন।[৫৮] তাহার পরেও দেখা যায় যে দাক্ষিণাত্য-সঙ্গী কৃষ্ণদাসকে গৌড়ে পাঠাইবার জন্য:

নিত্যানন্দ-জগদানন্দ-মুকুন্দ দামোদর।
চারিজনে যুক্তি তবে করিল অন্তর॥

এখানেও 'চারি' কথার উল্লেখ।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস-গ্রহণ এবং নীলাচল-গমন-কালীন সঙ্গীদিগের পরিচয় সম্পর্কে কৃষ্ণদাস-কবিরাজের বর্ণনাই নির্ভরযোগ্য বর্ণনা। নীলাচল-পথে নিত্যানন্দ, জগদানন্দ ও মুকুন্দের যাত্রা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না। 'চৈতন্যচরিতামৃতে'ও ইঁহাদের নাম স্বীকৃত হইয়াছে। দামোদর সম্বন্ধেও সন্দেহ চলেনা। কারণ এই প্রসঙ্গে কবিকর্ণপূরও তাঁহার 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে'র মধ্যে জানাইয়াছেন যে সকলে পরামর্শ করিয়া নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর ও মুকুন্দকে প্রভুর সঙ্গে দিলেন।[৫৯] কবিকর্ণপূরের এই উল্লেখের সহিত কিন্তু পরবর্তী কোন বর্ণনার অসামঞ্জস্য নাই। লোচনদাসও তাঁহার 'চৈতন্যমঙ্গলে' দামোদরকে মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণ দিনের ও নীলাচল-পথের সঙ্গী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।[৬০] সুতরাং অন্যান্য আভ্যন্তরীণ প্রমাণের বলে, ও কবিকর্ণপূরের 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক' এবং কৃষ্ণদাস-কবিরাজ-গোস্বামীর 'চৈতন্যচরিতামৃত'—এই দুইটি প্রাচীন ও প্রামাণিক গ্রন্থের বর্ণনা হুবহু মিলিয়া যাওয়ায় মহাপ্রভুর নীলাচল-পথের সঙ্গী-হিসাবে উপরোক্ত চারিজনকে গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকেনা। কবি-কর্ণপুর-বর্ণিত বহু ঘটনাকে একরকম নির্বিচারে গ্রহণ করিলেও কেবলমাত্র 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে'র দ্বারা প্রভাবিত হইয়াই যে কবিরাজ-গোস্বামী বৃন্দাবনদাসের মতকে অস্বীকার করিয়া এতদূর যাইবেন, তাহা সম্পূর্ণতই অসম্ভব। 'অদ্বৈতপ্রকাশ'-কারও চৈতন্যের পুরুষোত্তম গমন প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন[৬১]:

সঙ্গে চলে নিত্যানন্দ আর শ্রীমুকুন্দ।
দামোদর পণ্ডিত আর শ্রীজগদানন্দ॥

(৫৮) চৈ. মা.-এও (৭।৩) দেখা যায় যে মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য-পথে চলিয়া গেলে তাঁহার কয়েকজন সঙ্গী নীলাচলে তাঁহার পুনরাগমন পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়াছিলেন। অবশ্য নিত্যানন্দ গৌড়ে গমন করিলেও সম্ভবত মহাপ্রভুর প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই ফিরিয়া আসেন।—দ্র.—নিত্যানন্দ (৫৯) ৬।১৩; চৈ. কৌ.-তেও এই মত গৃহীত। (৬০) মধ্য., পৃ. ১৭৪. (৬১) অ. প্র.—১৫শ. অ., পৃ.৬৪; চৈ.চ.-গ্রন্থে ঈশান-নাগর বা তাঁহার গ্রন্থের উল্লেখ নাই। কিন্তু বেনাপোলে হরিদাস-সম্বন্ধীয় ঘটনাগুলি চৈ. ভা.-এ বর্ণিত নাই বলিয়া কৃষ্ণদাস-কবিরাজ বৃন্দাবনদাসের নামোল্লেখ করিয়া সেই বিষয়ের বর্ণনা দিয়াছেন (৩।৩, পৃ. ২৯৮-৯৯)। অথচ বেনাপোলে হরিদাস বৃত্তান্তটি অ.প্র.-গ্রন্থে আরও বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থের সহিত পরিচয় থাকিলে কৃষ্ণদাস এইস্থলে নিশ্চয়ই ঈশানের নাম করিতেন। বেঙ্কাবারী

সুতরাং 'চৈতন্যভাগবত'-বর্ণিত গদাধর এবং ব্রহ্মানন্দের কথা না ধরিয়া গোবিন্দ সম্বন্ধে এইটুকু বলা চলে যে বৃন্দাবনদাস যথেষ্টরূপে অবহিত হইবার প্রয়োজন উপলব্ধি করেন নাই বলিয়া গৌরাঙ্গের সন্ন্যাসগ্রহণ-কালীন সঙ্গীদিগের প্রত্যেককেই তিনি সন্ন্যাসী চৈতন্যের স্বদেশ-ত্যাগের প্রথম-দিনেও বিশেষভাবে যুক্ত করিয়া দিয়াছেন। ইতিপূর্বে কয়েকটি স্থলেই তিনি মুকুন্দের সহিত গোবিন্দ-ঘোষের নাম একত্রে যুক্ত করিয়াছেন। পূর্ববর্তী কয়েকবারের মত, বিশেষ করিয়া মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের দিনের মত এক্ষেত্রেও যে তিনি মুকুন্দের সহিত মহাপ্রভুর বাল্যকালের ঘনিষ্ঠ সঙ্গী-হিসাবে গোবিন্দ-ঘোষের নাম যুক্ত করিয়া থাকিবেন, তাহাই সম্ভব হইয়া উঠে। গোবিন্দ-ঘোষ তাঁহার স্বরচিত একটি পদে[৬২] গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস-গ্রহণের পূর্বেই তৎসম্বন্ধীয় বিষয় অবগত হইয়া মুকুন্দ-গদাধর-সহ একান্ত ভাবে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সন্ন্যাস-গ্রহণের সঙ্গী হইয়া থাকিলে তিনি যে সেই সম্বন্ধীয় স্বরচিত-পদের মধ্যেও স্বীয় নিদারুণ অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করিতেন, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। আর বৃন্দাবনোল্লেখিত গোবিন্দ যদি গোবিন্দ-ঘোষ নাও হন, তাহা হইলেও একথা বলা চলে যে মহাপ্রভুর নীলাচল-ভৃত্য 'দ্বারপাল'-গোবিন্দের পক্ষে গৌরাঙ্গের বাল্যকালেই তাঁহার নাম-শ্রবণ বা তাঁহার দর্শন-লাভ যদি বা কোনপ্রকারে সম্ভব হইয়া থাকে,[৬৩] কিন্তু তাঁহার বাল্য-লীলায় অংশ-গ্রহণ করিবার সৌভাগ্য তাঁহার হয় নাই। তিনি ছিলেন ঈশ্বর-পুরীর সঙ্গী ও পরিচারক। সুতরাং গৌরাঙ্গের বাল্য-লীলায় যোগদান করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাছাড়া, মহাপ্রভু দক্ষিণ-ভ্রমণের পর নীলাচলে ফিরিয়া আসিলে অদ্বৈত-আচার্যপ্রভু গৌড়-ভক্তবৃন্দের সহিত নীলাচলে গমন করিয়া যখন সর্বপ্রথম এই গোবিন্দকে দেখিলেন, তখন

তারে না চিনেন আচার্য পুছিলা দামোদরে ॥

এবং দামোদর কহেন ইঁহার গোবিন্দ নাম।[৬৪]

এই গোবিন্দ গৌরাঙ্গের বাল্যলীলা-সঙ্গী হইলে বিশেষ করিয়া তাঁহার সন্ন্যাস-গ্রহণ কিংবা নীলাচল গমন-দিনের সঙ্গী হইলে, অদ্বৈতপ্রভু তাঁহাকে নিশ্চয়ই জানিতেন বা চিনিতেন।

যে হরিদাসকে বিভ্রান্ত করিতে চাহিয়াছিল তাহাও চৈ. চ. এবং অ. প্র. উভয় গ্রন্থেই বর্ণিত হইয়াছে। হুবহু বর্ণনা সামঞ্জস্য নাই। কিন্তু প্রতিপাদ্য বিষয় এক। ঈশানের গ্রন্থ পাঠ করিলে কৃষ্ণদাস এস্থলেও তাহার উল্লেখ করিতে পারিতেন। যাহাহউক, আধুনিক গ্রন্থকর্তৃগণের অনেকেই মহাপ্রভুর প্রথমবার নীলাচলের যাত্রাসঙ্গী হিসাবে উক্ত চারিজনের হিসাবই গ্রহণ করিয়াছেন।—প্রমথনাথ মজুমদার (নীলাচলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, পৃ. ৪), সারদাচরণ মিত্র (উৎকলে শ্রীচৈতন্য, পৃ. ৬), রেবতী মোহন সেন (দাক্ষিণাত্যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, পৃ. ১৬-১৮)। (৬২) গৌ. ত.—পৃ. ২৭৬ (৬৩) শ্রীচৈতন্য-ঈশ্বরপুরী-কাশীশ্বর-গোবিন্দ সম্পর্ক স্মরণীয় (৬৪) চৈ. চ. ২।১১, পৃ. ১৩৫

গোপীনাথ-আচার্যকে চিনিবার সময় তিনি স্মৃতিভ্রষ্ট হন নাই। কিন্তু কবিরাজ-গোস্বামী অদ্বৈত ও দ্বারপাল-গোবিন্দের সাক্ষাৎকার-বর্ণনা এমনভাবে দিয়াছেন যে তাহাতে উক্ত-প্রকার সিদ্ধান্ত অপরিহার্য হইয়া পড়ে। বিশেষ করিয়া কবিকর্ণপূরও তাঁহার 'চৈতন্য-চন্দ্রোদয়নাটকে'[৬৫] যখন জানাইতেছেন যে গোবিন্দ কর্তৃক মাল্য আনয়নকালে অদ্বৈতপ্রভু গোবিন্দের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তখন আর এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না।

গোবিন্দের প্রথম পরিচয় এই যে তিনি ছিলেন ঈশ্বর-পুরীর 'পরিচারক', 'কৃষ্ণভক্ত, সকল বিষয়ে বৈরাগ্যবশতঃ বিশুদ্ধ হৃদয়।' তিনি ছিলেন অব্রাহ্মণ এবং শূদ্র।[৬৬] কাশীশ্বর-গোস্বামীও ঈশ্বর-পুরীর শিষ্য ছিলেন। সম্ভবত সেই সূত্রেই কাশীশ্বর ও গোবিন্দের মধ্যে একটি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক গড়িয়া উঠে। সিদ্ধি-প্রাপ্তিকালে ঈশ্বর-পুরী যে আজ্ঞাপ্রদান করেন, তদনুসারে তাঁহার মৃত্যুর পর গোবিন্দ আসিয়া নীলাচলে চৈতন্যের সহিত মিলিত হন। পুরীশ্বরের বাৎসল্য দেখিয়া চৈতন্য এই 'শূদ্র-সেবক'[৬৭] গোবিন্দকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। 'গুরুর কিংকর' বলিয়া সেই মান্যে তিনি প্রথমে তাঁহাকে স্বীয় সেবাকার্যে নিয়োজিত করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন। কিন্তু শেষে গুরুর আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া 'অঙ্গসেবা গোবিন্দেরে দিলেন ঈশ্বর।' গোবিন্দও 'শুদ্ধদাস্য'ভাবে ভাবিত হইয়া চৈতন্য-পরিচর্যায় আত্মনিয়োগ করিলেন।

গোবিন্দ জ্ঞানী ও গুণী ছিলেন কিনা জানা যায় নাই। কিন্তু তিনি ছিলেন প্রকৃত ভক্ত। দাস-হিসাবে তিনি নিয়ত মহাপ্রভুর পার্শ্বে থাকিয়া তাঁহাকে সেবা করিবার যে সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন, সে সৌভাগ্য আর কাহারও ভাগ্যে হয় নাই। তিনি এমন কোনও মহৎ-কর্ম সম্পাদন করিয়া যান নাই, যাহাতে তিনি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিতে পারেন। কিন্তু নীলাচলস্থ চৈতন্য-পরিমণ্ডলের মধ্যে তাঁহার অপেক্ষা অধিকতর কর্ম আর কেহও করিতে পারেন নাই। অসংখ্য ভক্তকে লইয়া যাঁহার কারবার, তাঁহার জীবনের ছোটখাট কাজও অসংখ্য। মহাপ্রভুর এই সকল কাজের ভার পড়িয়াছিল গোবিন্দের উপর। কোন ভক্ত দূরদেশ হইতে পরিশ্রান্ত হইয়া আসিয়া পড়িলে তাহার ভোজন-বাসস্থানের ব্যবস্থা তাঁহাকেই করিয়া দিতে হইবে এবং তাঁহাকে জগন্নাথ-দর্শন করাইয়া আনিতে হইবে,[৬৮] দীন-হীন দুঃখী কাঙালকে ডাকিয়া ভোজন করাইতে হইবে। গৌড় হইতে রাঘবাদি ভক্তবৃন্দ কর্তৃক আনীত বস্তুসম্ভার লইয়া গুছাইয়া রাখিতে হইবে এবং মহাপ্রভুর আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী সেইগুলিকে আবার যথাস্থানে বিতরণ করিতে হইবে।

---

(৬৫) ৮।৫১ (৬৬) চৈ. না.—৮।১৩-১৮ ; চৈ. চ.—২।১০, পৃ. ১৪৯ (৬৭) বৈ. দি.(পৃ. ৫৫)-মতে গোবিন্দ ছিলেন কায়স্থ। (৬৮) ভ. র.—২।১০৭

প্রয়োজন ও কালানুসারে ভক্তবৃন্দকে মহাপ্রভুর প্রসাদ-শেষ দিয়া তৃপ্ত করিতে হইবে। আবার সিদ্ধবকুল-তলাতে গিয়া হরিদাস-ঠাকুর এবং রূপ বা সনাতনের নিকট প্রসাদান্ন পৌছাইয়া দিতে হইবে। রথ-যাত্রার পূর্বে ভক্তবৃন্দ আসিয়া পৌছাইলে অদ্বৈত-নিত্যানন্দকে সংবর্ধনা জানাইবার জন্য তাঁহাকেই মহাপ্রভু-প্রদত্ত মাল্য লইয়া যাইতে হইবে। এককথায় জুতা সেলাই হইতে চণ্ডীপাঠ ইস্তক সমূহ কার্যই গোবিন্দকে করিতে হইত। ইহাছাড়া মহাপ্রভুর ব্যক্তিগত সেবা ও কাজকর্ম তো ছিলই। মহাপ্রভু জগন্নাথ-দর্শনে চলিলে তাঁহার সহিত 'জলকরঙ্ক' লইয়া যাওয়া, ভক্তবৃন্দের তৃপ্তি-বিধানের জন্য তাঁহাদের দেওয়া খাদ্যদ্রব্য মহাপ্রভুকে খাওয়ান, গম্ভীরার দ্বারে আসিয়া মহাপ্রভু শয়ন করিলে তাঁহার নিকটে থাকিয়া তাঁহার পাদ-সংবাহন করা,—এ সমস্ত তাঁহার অবশ্য-কর্তব্য ছিল। আর আর যে-সমস্ত সেবক ও কীর্তনীয়া মহাপ্রভুর নিকট অবস্থান করিতেন, সেই সকল বৈষ্ণবদের দেখাশুনা ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থাও তাঁহাকেই করিতে হইত। মহাপ্রভুও গোবিন্দের দায়িত্ব-বহন-শক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহার অধিকারকে সুপ্রশস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। শংকর-পণ্ডিতকে নীলাচলে আপনার নিকট রাখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া মহাপ্রভু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন[৬৯] :

শংকরের আনুকূল্য করিবে নির্ভর।
যাতে দুঃখ নাহি পান আমার শংকর ॥

আবার মুরারি-গুপ্ত[৭০] ও বৃন্দাবনদাস তাঁহাকে যে চৈতন্যের 'দ্বারপাল' রূপে আখ্যাত করিয়াছেন তাহা সর্বৈব সত্যকথা। ইহার একদিক আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। অন্যদিকেও দেখি যে মহাপ্রভু যখন কাহারও প্রতি ক্রুদ্ধ হইতেন তখন দ্বার-রক্ষার ভার গোবিন্দের উপরই পড়িত। বাউলিয়া-কমলাকান্ত-বিশ্বাসের উপর বিরক্ত হইয়া মহাপ্রভু তাঁহার প্রবেশাধিকার বন্ধ করিয়া দিবার ভার গোবিন্দকেই দিয়াছিলেন। ছোট-হরিদাসের উপর রুষ্ট হইয়াও তিনি গোবিন্দকে অনুরূপ-ভার প্রদান করিয়াছিলেন। এমন কি, তারপর যখন তিনি এই ব্যাপার লইয়া স্বয়ং পরমানন্দ-পুরীরও অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া শ্রীক্ষেত্র পরিত্যাগপূর্বক আলালনাথে গিয়া একাকী বাস করিতে চাহিলেন তখন কিন্তু সকলকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে চাহিলেও তিনি গোবিন্দকে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই।

গোবিন্দ ছিলেন যেন মহাপ্রভুর ছায়া-সদৃশ। মহাপ্রভুর সহিত ছায়ার মত থাকিতে থাকিতে তিনি তাঁহার দৈনন্দিন-জীবনের সকল বাসনা-কামনার সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। মহাপ্রভু যাহা না বলিতেন, তাহাও তিনি সুসম্পন্ন করিতেন। স্বরূপদামোদর মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ-সাধনের সঙ্গী। তাঁহার আদেশও তিনি শিরোধার্য করিয়া লইতেন।

(৬৯) চৈ. কৌ.—পৃ. ২৫৮ (৭০) শ্রীচৈ. চ.—৪।১৭।২০

আবার রঘুনাথদাসকে মহাপ্রভু যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। সুতরাং রঘুনাথের দিকে দৃষ্টি রাখা যেন তাঁহারও ব্যক্তিগত কর্ম ছিল। প্রকৃতপক্ষে, নীলাচলে মহাপ্রভুর বহির্জীবনের সহিত এই গোবিন্দের জীবন যেন মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছিল। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী-চৈতন্যও গোবিন্দ ও কাশীশ্বরকে লইয়া যেন একটি ক্ষুদ্র পরিবার গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। যেখানেই মহাপ্রভু ভিক্ষা-নির্বাহ করুন না কেন 'প্রভু কাশীশ্বর গোবিন্দ খান তিনজন'। রামচন্দ্র-পুরীর রূঢ় আচরণে মহাপ্রভু যেদিন অর্ধেক ভোজন করিয়া রামচন্দ্রের বাক্য-পালনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেদিন গোবিন্দকেও তাঁহার পার্শ্বে থাকিয়া অর্ধাশনে দিনতিপাত করিতে হইয়াছিল।

মহাপ্রভু গৌড়াভিমুখে গমন করিলে গোবিন্দও অন্যান্য ভক্ত সহ তাঁহার সহিত গৌড়াভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন।[৭১] কিন্তু মহাপ্রভুর বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমনের পর তাঁহার তিরোভাব দিবস পর্যন্ত তিনি আর একটি দিনের জন্যও তাঁহার নিকট হইতে দূরে থাকেন নাই।

মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলায় গোবিন্দের দায়িত্ব অনেকাংশে বাড়িয়া গিয়াছিল। সদাসর্বদা তাঁহাকে মহাপ্রভুর উপর অতন্দ্র দৃষ্টি রাখিতে হইত। মহাপ্রভু ভাববিহ্বল হইয়া পথ চলিতেন। গোবিন্দ সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। একদিন যমেশ্বর-টোটায় যাইতে যাইতে মহাপ্রভু এক দেবদাসীর সংগীত শুনিয়া মুগ্ধ হইলেন। দেবদাসী গীতগোবিন্দ-পদ গাহিতেছিল। মহাপ্রভু তাহাকে ধরিবার জন্য তন্ময় হইয়া ছুটিলেন। তাঁহার স্ত্রী-পুরুষ-ভেদজ্ঞান রহিত হইল। ছুটিতে ছুটিতে পদদ্বয় ক্ষতবিক্ষত ও অঙ্গ কণ্টকবিদ্ধ হইল। তবুও সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। একটু হইলেই তিনি গিয়া স্ত্রী-অঙ্গ স্পর্শ করিয়া বিড়ম্বিত হন! গোবিন্দ ছায়ার মত সঙ্গে ছুটিয়াছিলেন। একটু বাকি আছে, এমন সময় তিনি চিৎকার করিয়া মহাপ্রভুকে শুনাইলেন যে তিনি স্ত্রী-অঙ্গ স্পর্শ করিতে যাইতেছেন। স্ত্রী-নাম শুনিয়া মহাপ্রভুর সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল। গোবিন্দের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া তিনি জানাইলেন যে গোবিন্দই তাঁহাকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছেন, তিনি তাঁহার ঋণ কখনও পরিশোধ করিতে পারিবেন না। এইভাবে আর একদিনও অত্যন্ত ভিড়ের মধ্যে জগন্নাথ-দর্শনকালে দর্শনাভিলাষী এক উড়িয়া মহিলা নিরুপায়ভাবে মহাপ্রভুর স্কন্ধে পদ-স্থাপন ও গরুড়-স্তম্ভে আরোহণ করিয়া জগন্নাথ দর্শন করিতে থাকিলে গোবিন্দ তৎক্ষণাৎ সেইদিকে মহাপ্রভুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

শেষের দিকে, মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ-অবস্থায় ক্ষণিকের জন্যও তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগ করা চলিত না। একদিন তিনি চটক-পর্বত দেখিয়া গোবর্ধন-ভ্রমে উন্মত্তের মত ছুটিয়া গিয়া আছাড় খাইলেন। সকলেই পিছনে ছুটিয়াছেন। গোবিন্দের দায়িত্ব ছিল যেন

(৭১) দ্র.—গোপীনাথ, আলোচনাংশ

সর্বাধিক। তিনি সর্বাগ্রে ছুটিয়া গিয়া 'করঙ্গের জলে' তাঁহার সর্বাঙ্গ সিঞ্চিত করিলেন। তখন মহাপ্রভুর অঙ্গে অষ্ট-সাত্ত্বিক বিকার দেখিয়া সকলে মিলিয়া হরি-সংকীর্তন করিতে থাকিলে তাঁহার সংজ্ঞাপ্রাপ্তি ঘটিল। রাত্রিকালেও মহাপ্রভুর এইরূপ দশা ঘটিত। তজ্জন্য তাঁহাকে প্রকোষ্ঠের মধ্যে শয়ন করাইয়া গোবিন্দ স্বয়ং দরজার নিকট শুইয়া থাকিতেন। সর্বদা সচেতন থাকিতে হইত এবং কৃষ্ণগুণগান বন্ধ হইলেই উঠিয়া দেখিতে হইত। মাঝে মাঝে দেখা যাইত যে তিনদিকে দরজা বন্ধ রহিয়াছে, অথচ গৃহ শূন্য। স্বরূপাদি ভক্তবৃন্দের সাহায্যে তখন তাঁহার অন্বেষণে বাহির হইয়া মন্দির-সন্নিধান হইতে বা অন্য কোন স্থান হইতে তাঁহার চেতনা-বিহীন জড়পিণ্ডবৎ দেহটিকে তুলিয়া আনিতে হইত।

নৈশ-আহার সম্পন্ন করিয়া চৈতন্য যখন গম্ভীরার দ্বারে শয়ন করিতেন তখন গোবিন্দ তাঁহার পাদ-সংবাহন করিতেন এবং তিনি নিদ্রিত হইয়া পড়িলে গোবিন্দও তাঁহার ভুক্তাবশেষ ভোজন করিয়া নৈশাহার সম্পন্ন করিতেন। ইহাই ছিল গোবিন্দের স্বেচ্ছাকৃত নিয়ম, কোনও দিন ইহার ব্যত্যয় ঘটিত না। একদিন মহাপ্রভু ক্লান্ত হইয়া গম্ভীরার দরজা জুড়িয়া শুইয়া আছেন, গোবিন্দ তাঁহার পাদ-সংবাহনার্থ ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিতেছেন না। মহাপ্রভুর নিকট অনুরোধ জানাইলে তিনি স্বীয় ক্লান্তির কথা জানাইয়া গোবিন্দকে যদৃচ্ছ কর্ম করিতে বলিলেন। গোবিন্দ সাতপাঁচ ভাবিয়া মহাপ্রভুর দেহের উপর একটি বস্ত্রাবরণ দিয়া তাঁহাকে লঙ্ঘন করিলেন এবং অভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্বক পদ-সেবা করিয়া তাঁহার নিত্য-কর্ম সম্পন্ন করিলেন। এদিকে মহাপ্রভু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। অধিক রাত্রিতে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইলে তিনি দেখিলেন যে গোবিন্দ তখনও অভুক্ত অবস্থায় বসিয়া রহিয়াছেন। গোবিন্দের কুণ্ঠা দেখিয়া তিনি বলিলেন যে যেভাবে তিনি অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছেন, সেইভাবেই তাঁহার বহির্গত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু চৈতন্যের পদ-সেবার জন্য নির্বন্ধ-চিত্তে গোবিন্দ যে দুরূহ ও দুঃসাহসিক কর্ম করিতে পারিয়াছিলেন, আপনার সহস্র প্রয়োজন সত্ত্বেও তাহার সহস্রাংশ সাধন করিবার কল্পনাও তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। তিনি নীরবে মহাপ্রভুর ভর্ৎসনা মাথায় পাতিয়া লইলেন।

ইহাই ছিল গোবিন্দের সাধনা। নিষ্কাম কর্মের মধ্য দিয়াই এই অতন্দ্র-সাধনা। ভক্তি সেই কর্মকে উদ্বোধিত করিয়াছিল। কিন্তু মহাপ্রভুর তিরোভাবের পর গোবিন্দেরও নীলাচলের কর্ম ফুরাইয়া গিয়াছিল। যে-নীলাচল বিংশতি বর্ষাধিক দীর্ঘকাল যাবৎ চৈতন্যময় হইয়া রহিয়াছিল, মহাপ্রভুর মহাপ্রয়াণে তাহা তাঁহার নিকট চৈতন্য-বিহীন হইয়া পড়িল। মন্দির, বিগ্রহ—ইহারা ছিল অর্থহীন। যাঁহার নিকট ইহাদের অর্থ ছিল, সেই পার্থিব মানুষটির প্রেমেই ভক্ত-হৃদয় উন্মত্ত হইয়াছিল। তাঁহার তিরোভাবে এ সমস্তই যেন অর্থহীনভাবে আদর্শ-জগতে প্রয়াণ করিল।

'ভক্তিরত্নাকরে' লিখিত হইয়াছে[৭২] যে শ্রীনিবাস-আচার্য নীলাচলে গিয়া গোবিন্দ এবং শংকরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। যতদূর মনে হয়, তাহার পর তিনি বৃন্দাবনে গিয়া পূর্ব-গুরু কাশীশ্বর এবং পূর্ব-সঙ্গী যাদবাচার্য-গোঁসাইর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন।[৭৩] রূপ-গোস্বামীর সহিত তাঁহার বিশেষ সদ্ভাব ছিল এবং বৃন্দাবনে সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। হরিদাস-পণ্ডিতের সহিত যে ভক্তবৃন্দ কৃষ্ণদাস-কবিরাজকে চৈতন্যের অন্ত্যলীলা রচনা করিবার আজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন, কবিরাজ-গোস্বামী তন্মধ্যে গোবিন্দ-গোঁসাইর কথা সর্বাগ্রে উল্লেখ করিয়াছেন। এই গোবিন্দ-গোঁসাই ও দ্বারপাল-গোবিন্দ যে এক ও অভিন্ন ব্যক্তি, তাহা মনে করিবার কারণ আছে।[৭৪] ইহা সত্য হইলে, 'ভক্তিরত্নাকরে'র বর্ণনা-অনুযায়ী বলিতে হয় যে শ্রীনিবাসাদি প্রথমবার বৃন্দাবনে গিয়া তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং তিনি দীর্ঘ-জীবন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বীরচন্দ্রপ্রভুও বৃন্দাবনে গিয়া তাঁহার সাক্ষাৎলাভ করিতে পারিয়াছিলেন।

---

(৭২) ৩।১৮৮-৯৩ (৭৩) প্রে. বি.—১৮ শ. বি., পৃ. ২৭০ (৭৪) কাশীনাথ-পণ্ডিতের জীবনীর বাগে এই সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

গোপীনাথ-আচার্য

'চৈতন্যভাগবত'-গ্রন্থে দুই কি ততোধিক গোপীনাথের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। গোপীনাথ, গোপীনাথ পণ্ডিত, গোপীনাথ-সিংহ, গোপীনাথ-আচার্য। প্রথমোক্ত গোপীনাথ দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থের একজন হইতে পারেন, অথবা অন্য কোনও এক বা একাধিক ব্যক্তি হইতে পারেন। আবার যাঁহাকে পণ্ডিত বলা হইয়াছে তিনিও সিংহ- বা আচার্য-উপাধিধারী গোপীনাথদের একজন হইতে পারেন। কিন্তু জানা যায় যে তিনি গোপীনাথ-সিংহ নহেন। কারণ, নীলাচলাগত গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দের বর্ণনাকালে মুরারি-গুপ্ত এবং বৃন্দাবনদাস উভয়েই গোপীনাথ-পণ্ডিত ও গোপীনাথ-সিংহ উভয়েরই কথা পৃথক পৃথকভাবে বলিয়াছেন। এই গোপীনাথ-সিংহ সম্বন্ধে কবিকর্ণপূর বলিতেছেন—পুরা যোঽক্রূরনামাসীৎ স গোপীনাথ সিংহকঃ[১]; 'চৈতন্যচরিতামৃত'-কার মহাপ্রভুর মূলস্কন্ধ-বর্ণনা পরিচ্ছেদে লিখিয়াছেন, "গোপীনাথ সিংহ এক চৈতন্যের দাস। অক্রূর বলি তারে প্রভু করে পরিহাস॥" 'চৈতন্যভাগবতে'ও একই কথা বলা হইয়াছে, "চলিলেন গোপীনাথ ,সিংহ মহাশয়। অক্রূর করিয়া যাঁরে গৌরচন্দ্র কয়॥" এবং ভক্তমালে লিখিত হইয়াছে,[২] "অক্রূর হয়েন যেঁহ গোপীনাথ সিংহ।" অপ্রামাণিক 'অদ্বৈতবিলাসে' লিখিত হইয়াছে, "অক্রূর বলিয়া যাঁরে করে পরিহাস।" এই পাঁচটি গ্রন্থের পাঁচবার ছাড়া ইঁহার উল্লেখ আর কোথাও তেমন দৃষ্ট হয় না। কিন্তু মাত্র একবার করিয়া উল্লেখিত হইলেও বর্ণনাদৃষ্টে মনে হয় যে গোপীনাথ-সিংহ নামে মহাপ্রভুর একজন বিশেষ সরল ভক্ত বিদ্যমান ছিলেন।

এদিকে আবার দুইটিমাত্র গ্রন্থের দুইটিমাত্র উল্লেখ হইতে একজন পৃথক গোপীনাথ-পণ্ডিতের সিদ্ধান্ত অসংগত হইয়া পড়ে। অবশ্য উপাধি-বিহীন গোপীনাথগুলি যদি গোপীনাথ-পণ্ডিত হইয়া থাকেন তবে তাহা স্বতন্ত্র কথা। এই গোপীনাথকে এক ব্যক্তি ধরিয়া লইলে দেখা যায় যে ইনি গৌরাঙ্গ-আবির্ভাবের পূর্বেই জন্মলাভ করিয়া[৩] পরে তাঁহার বাল্যলীলার সঙ্গে বিশেষভাবেই যুক্ত হইয়াছিলেন। গৌরাঙ্গের গয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁহার চরিত্রের পরিবর্তন সম্বন্ধে পুষ্পচয়নরত ভক্তবৃন্দের মধ্যে আলোচনাকালে, শ্রীবাস বা চন্দ্রশেখরের গৃহে সংকীর্তনারম্ভকালে, জগাই-মাধাই উদ্ধারের পর গঙ্গাতীরাগত ভক্তবৃন্দের মধ্যে, চন্দ্রশেখর-আচার্যের গৃহে 'অঙ্কের বিধানে' নৃত্যকালে, কাজী-দলন বা নগরসংকীর্তনারম্ভকালে ও তাহার অব্যবহিত পরে

(১) গৌ. দী.—১১৭ (২) পৃ. ২৮ (৩) চৈ. ভা.—১।২, পৃ. ১২

শ্রীধর-গৃহে আগত ভক্তবৃন্দের মধ্যে, রামকেলি হইতে প্রত্যাবর্তনের পর মহাপ্রভুর অদ্বৈত-গৃহে বাসকালে এবং গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দের নীলাচল-গমনকালে ইনি উপস্থিত ছিলেন। এই তালিকার প্রথম এবং চতুর্থ ক্ষেত্র ছাড়া অন্য সমস্ত ক্ষেত্রেই আমরা শ্রীগর্ভ নামক এক ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাই; অথচ 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'র তালিকা ছাড়া তাঁহার নাম অন্য কোনও গ্রন্থে বড় একটা পাওয়া যায় না। মুরারি-গুপ্তের গ্রন্থে একবার এবং জয়ানন্দের গ্রন্থে কয়েকটি বার এই শ্রীগর্ভ-পণ্ডিতের নাম উল্লেখিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাও নামমাত্র। 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং'ও 'চৈতন্য-ভাগবতে'র উক্ত গোপীনাথ, উল্লেখিত শ্রীগর্ভের মত একজনের নামমাত্র হইতেও পারেন। বাস্তবিক যদি গোপীনাথ-পণ্ডিত নামক একজন বিশেষ ভক্ত থাকিতেন, তাহা হইলে গৌরাঙ্গের বাল্য-লীলার সহিত যখন তিনি এমনভাবেই জড়িত ছিলেন, তখন তাঁহার পরবর্তী-লীলাতেও তাঁহার দর্শন পাওয়া যাইত; কিংবা গৌরাঙ্গের বাল্যলীলা প্রসঙ্গেও অন্য গ্রন্থকার-গণ তাঁহার উল্লেখ করিতে পারিতেন। 'ভক্তিরত্নাকর'-প্রণেতা অবশ্য গৌরাঙ্গের গয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনারত ভক্তদের মধ্যে একবার গোপীনাথের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা স্পষ্টতই 'চৈতন্যভাগবতে'র প্রভাবে পড়িয়া। উক্ত আলোচনারত ভক্তবৃন্দ সম্বন্ধে বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন,—গদাধর, গোপীনাথ, রামাঞি, শ্রীবাস; আর নরহরি কেবল ক্রম উল্টাইয়া লিখিয়াছেন—শ্রীবাস, রামাই, গোপীনাথ, গদাধর। এক্ষেত্রে বৃন্দাবনোক্ত উপাধি-বিহীন গোপীনাথ-গুলিকে অকিঞ্চিৎকর শ্রীগর্ভের মতই বাদ দিতে হয়, অথবা তাঁহাদিগকে গোপীনাথ-সিংহ বা গোপীনাথ-আচার্য বলিয়া ধরিতে হয়। গোপীনাথ-সিংহ সম্বন্ধেও 'চৈতন্যচরিতামৃত' বা 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকা'দিতে মাত্র একবার করিয়া উল্লেখ দেখিয়া সংশয় জন্মে। প্রকৃতপক্ষে, যিনি পরবর্তিকালে মহাপ্রভুর জীবনের সহিত জড়িত হইয়াছিলেন, তিনি হইতেছেন গোপীনাথ-আচার্য। কিন্তু 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক' হইতে তাঁহার সম্বন্ধে যাহা জানা যায়, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে মহাপ্রভুর সহিত তাঁহার পূর্ব-পরিচয় থাকিতে পারে, কিন্তু তিনি তাঁহার নবদ্বীপ-লীলাতে উক্তরূপে ব্যাপকভাবে অংশ-গ্রহণ করেন নাই বা নবদ্বীপ-লীলার শেষদিকে তিনি নবদ্বীপে উপস্থিত ছিলেন না। গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দের সহিত তাঁহার নীলাচল-গমন তো দূরের কথা, বরং তিনি যে ভক্তবৃন্দের আগমন-কালে নীলাচলে থাকিয়া রাজা-প্রতাপরুদ্রকে তাঁহাদের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, 'চৈতন্য-চরিতামৃতে' তাহার সাক্ষ্য প্রদান করা হইয়াছে। 'ভক্তমালে',[৪] এবং 'চৈতন্য-ভাগবতে'র দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত 'ভক্তিরত্নাকরে'ও[৫] ইহারই সমর্থন

(৪) পৃ. ২৬৩ (৫) ১২।২৯৮৩

জানান হইয়াছে। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য এই যে, সার্বভৌমের সহিত মহাপ্রভুর পরিচয়, উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন এবং সার্বভৌমের জীবনের বিরাট পরিবর্তন-সাধন ব্যাপারে তাঁহার ভগিনীপতি যে-গোপীনাথ-আচার্যকে এক বিশেষ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে দেখা যায়, সেই গোপীনাথ-আচার্য সম্বন্ধে বৃন্দাবনদাস সচেতন থাকিয়াও সার্বভৌম-মহাপ্রভু-বিবরণের মধ্যে তাঁহার কোনও উল্লেখই করেন নাই। সম্ভবত এই গোপীনাথ-আচার্যকে তিনি মহাপ্রভুর বাল্যলীলার মধ্যে বিশেষভাবে জড়াইয়া দিয়া তাঁহার সন্ন্যাস-গ্রহণ পর্যন্ত তাঁহাকে টানিয়া আনিয়াছেন।[৬]

গোপীনাথ-আচার্যের বাল্যকাল সম্বন্ধে বা তাঁহার নবদ্বীপ-লীলায় অংশ-গ্রহণ সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছু জানিতে পারি না। 'ভক্তিরত্নাকর'-মতে "গোপীনাথ প্রভু লীলা দেখে নদীয়ায়। নীলাচলে গেলা অগ্রে প্রভুর ইচ্ছায়॥"[৭] কিন্তু প্রশ্ন উঠিতে পারে গোপীনাথ কতদিন নদীয়াতে ছিলেন এবং কবেই বা নীলাচলে গমন করিলেন? 'ভক্তিরত্নাকরে'ই লিখিত আছে, ঈশ্বরপুরী নদীয়া-বাসকালে গোপীনাথ-আচার্যের গৃহে থাকিতেন।[৮] নরহরি এখানে বৃন্দাবনদাসকেই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। বৃন্দাবন বলিতেছেন, "মাস-কথো গোপীনাথ আচার্যের ঘরে। রহিলা ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপপুরে॥" সুতরাং ঈশ্বর-পুরীর নদীয়া-আগমনকালে গোপীনাথ নদীয়ায় উপস্থিত ছিলেন ধরা যায়। কারণ, ঈশ্বর-পুরীর আগমনকালে নিমাই সবেমাত্র 'পণ্ডিত' হইয়াছেন। অন্তত গৌরাঙ্গের এই বয়স পর্যন্ত গোপীনাথ নবদ্বীপে বর্তমান না থাকিলে তাঁহার বাল্য-লীলা সম্বন্ধে তাঁহার সম্যক্ পরিচয় সম্ভবপর হয় না। কবিকর্ণপূর গোপীনাথকে মুকুন্দের মুখে 'নবদ্বীপ-বিলাসবিশেষজ্ঞঃ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।[৯] 'চৈতন্যচরিতামৃতে'ও ইহার বিশেষ

(৬) প্রে. বি.-এর ২৩শ. বিলাসে (পৃ. ২৩৭) বলা হইয়াছে :

সেই প্রহ্লাদ ব্রহ্ম হরিদাসেতে মিলিল।
প্রকাশান্তরে বিধি গোপীনাথ আচার্য হৈল॥
অদ্বৈতশিষ্য গোপীনাথ চৈতন্যের শাখা।
সংক্ষেপে হরিদাসতত্ত্ব করিলাও লেখা॥

গোপীনাথ-আচার্যের এইরূপ উল্লেখ অকিঞ্চিৎকর। তাহা ছাড়া অদ্বৈত-শাখার মধ্যেও কোন গোপীনাথকে পাওয়া যায় না। সম্ভবত উপরোক্ত গোপীনাথ-আচার্যের স্থলে যদুনন্দন-আচার্য হইবে। ইনি অদ্বৈত-শাখাভুক্ত এবং চৈতন্য-শাখাতেও একজন যদুনন্দনকে দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে, হরিদাসের সহিত সম্পর্কিত কোনও গোপীনাথকে পাওয়া যায় না, অথচ হরিদাসের সহিত যদুনন্দনেরই একবার ব্রহ্ম-সম্বন্ধীয় আলোচনা ঘটিয়াছিল। (৭) ১২।২৯৮৩ (৮) ১২।২২০৬ ; চৈ.ভা.—১।৭ পৃ. ৫৩ (৯) চৈ. না.—৬।২৯

সমর্থন আছে।[১০] মুকুন্দের সঙ্গে যে তাঁহার বিশেষ পরিচয় ছিল একথা উভয় গ্রন্থেই বলা হইয়াছে। আবার অদ্বৈতপ্রভুও নীলাচলে আসিয়া গোপীনাথকে বলিয়াছিলেন, "জানামি ভবন্তং বিশারদস্ত জামাতরং"[১১] এবং গোপীনাথই প্রতাপরুদ্রের নিকট গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন।

আবার অন্যদিকে দেখা যাইতেছে যে মহাপ্রভুর নীলাচল-গমনের সঙ্গী-বৃন্দের মধ্যে একমাত্র মুকুন্দই সর্বপ্রথম তাঁহার সঙ্গীদিগের নিকট গোপীনাথের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন।[১২] সেই বর্ণনায় 'চৈতন্যচরিতামৃতে'ও বলা হইয়াছে যে গোপীনাথের "মুকুন্দ সহিত পূর্বে আছে পরিচয়॥"[১৩] একমাত্র মুকুন্দের সম্বন্ধেই এইরূপ উল্লেখ থাকায় বুঝিতে পারা যায় যে নবাগতদের মধ্যে আর কাঁহারও সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল না। পরেও দেখা যায় যে কেবলমাত্র মুকুন্দকে লইয়াই গোপীনাথ বিশেষভাবে কথাবার্তা চালাইয়াছিলেন। মহাপ্রভুর নীলাচল-গমনের সঙ্গীদিগের মধ্যে আর ছিলেন নিত্যানন্দ, জগদানন্দ ও দামোদর-পণ্ডিত। 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক' এবং 'চৈতন্যচরিতামৃত'-গ্রন্থে মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণকাল ছাড়া তৎপূর্বে দামোদরের কোনও উল্লেখই পাওয়া যায় না 'চৈতন্যভাগবত' সম্বন্ধেও প্রায় একই কথা বলা চলে। দামোদর সম্বন্ধে পরবর্তিকালে লিখিত 'ভক্তিরত্নাকরে' নগর-সংকীর্তন-কালীন একটি উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু তাহা একেবারেই নির্ভরযোগ্য নহে। তাহা ছাড়া, নগর-সংকীর্তনও খুব আগের ঘটনা নহে। লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গলে'ও দুইবার দামোদরের উল্লেখ আছে; কিন্তু তাহা কেবল স্তুতিচ্ছলে বিরাট তালিকার মধ্যে, এবং সে সম্বন্ধে লেখক নিজেই নিঃসংশয় নহেন। ঐ গ্রন্থে আরও দেখা যায় যে দামোদর নিজেই জিজ্ঞাসাবাদের দ্বারা মুরারি-গুপ্তের নিকট বিশ্বরূপের সন্ন্যাস, গৌরাঙ্গের বাল্যলীলা-তত্ত্ব ও তাঁহার বালক-কালের ঘটনাগুলি[১৪] সম্বন্ধে সমূহ বৃত্তান্ত জানিয়া লইতেছেন। মুরারি-গুপ্তের কড়চার মধ্যেও[১৫] দেখা যায় যে দামোদর তাঁহাকে বলিতেছেন:

> তৎ কথ্যতাং কথমসৌ ভগবাংশ্চকার
> ত্যাসং বিদেশগমনং পুরুষোত্তমঃ॥

মুরারিকে অবশ্য মহাপ্রভুর জীবনের অনেক কথাই বলিতে হইয়াছিল; এবং কেবল দামোদর নহেন, স্বয়ং অদ্বৈত শ্রীবাসাদি ভক্তও তদ্বর্ণিত চৈতন্য-চরিত শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু পুনঃ পুনঃ দামোদরের উক্তরূপ প্রশ্ন হইতে বুঝিতে পারা যায় যে মহাপ্রভুর জীবন সম্বন্ধে তিনিই সর্বাপেক্ষা আগ্রহান্বিত ছিলেন। সম্ভবত মহাপ্রভুর বাল্য-

---

(১০) ২।৬, পৃ. ১১০ (১১) চৈ. না.—৮।৫৬ (১২) ঐ—৬।২৯ (১৩) ২।৬ পৃ. ১১৭ (১৪) আদি—পৃ. ৫৪, ৫৬, ৬২; সূত্র.—পৃ. ৪,৭ (১৫) ৩।১।১

লীলা প্রত্যক্ষ করিতে পারেন নাই বলিয়াই তাঁহার এই-প্রকার আগ্রহ। সুতরাং দামোদর যে গৌরাঙ্গের নবদ্বীপ-লীলায়[১৬] পরবর্তিকালে যোগ দিয়াছিলেন, তাহাই সম্ভব হইয়া উঠে।

আবার জগদানন্দ সম্বন্ধে এই 'চৈতন্যমঙ্গলে' বলা হইয়াছে যে নিত্যানন্দ যখন গঙ্গাবক্ষ হইতে গৌরাঙ্গপ্রভুকে উত্তোলন করেন, সেই সময় অন্যান্য ভক্তের সহিত ইনিও উপস্থিত ছিলেন। 'চৈতন্যচরিতামৃতে'ও ইঁহাকে মহাপ্রভুর পূর্ব-সঙ্গী বলা হইয়াছে[১৭] বটে, কিন্তু গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস-গ্রহণের কালছাড়া ইঁহার সম্বন্ধে কোনও উল্লেখই এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয় নাই; 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে'ও ঐরূপ কোনও উল্লেখ নাই। 'মুরারি-গুপ্তের কড়চা'র মধ্যে জগদানন্দের সাক্ষাৎ মেলে একেবারে মহাপ্রভুর নীলাচল-গমনেরও পরে।[১৮] সুতরাং অধিকাংশ প্রাচীন গ্রন্থের প্রমাণে জগদানন্দকে গৌরাঙ্গের আশৈশব সঙ্গী বলিয়া স্বীকার করা চলে না। জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে' গৌরাঙ্গের বাল্যলীলার গোড়ার দিকে জগদানন্দের উল্লেখ থাকিলেও, ঘটনার পারম্পর্য-নির্ণয়ে উহা মোটেই নির্ভর-যোগ্য গ্রন্থ নহে। 'চৈতন্যভাগবতে'র বর্ণনায় জগদানন্দকে নবদ্বীপ-লীলার কয়েকটি ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীবাসাঙ্গনে প্রাত্যহিক-সংকীর্তন আরম্ভকালে, মদ্যপদ্বয়ের উদ্ধারের পর ভক্তগণসহ মহাপ্রভুর ভাগীরথীতে জলকেলি-কালে এবং নগর-সংকীর্তনারম্ভ-কালে ইনি উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং 'চৈতন্যভাগবতে'র প্রমাণে ইঁহাকে নবদ্বীপ-লীলার বিশেষ সঙ্গী বলিয়া ধরিয়া লওয়া চলে। তবে শ্রীবাস বা চন্দ্রশেখর-আচার্যের গৃহে প্রাত্যহিক সংকীর্তনারম্ভ-কালকেই মহাপ্রভুর সহিত ইঁহার সম্পর্কের আরম্ভকাল বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়। কিন্তু নিত্যানন্দের সহিত মহাপ্রভুর সংযোগ ইহারও পূর্বের ঘটনা, সুতরাং মহাপ্রভুর এই সঙ্গী-ত্রয়ের মধ্যে সম্ভবত নিত্যানন্দই ছিলেন সর্বপ্রাচীন সঙ্গী। ইঁহার সঙ্গেও যখন গোপীনাথের পরিচয় ঘটিয়া উঠে নাই তখন নিঃসন্দেহে ধরা যায় যে নিত্যানন্দের নদীয়া-আগমনের পূর্বেই তিনি নদীয়া ত্যাগ করিয়াছিলেন। আর যদি নিত্যানন্দের পূর্বেও গৌরাঙ্গের সহিত জগদানন্দের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ঘটিয়া থাকে তাহা হইলে গোপীনাথ হয়ত আরও কিছুকাল পূর্বে নদীয়া ত্যাগ করেন। কিংবা তখনও পর্যন্ত গৌরাঙ্গলীলার মধ্যে জগদানন্দের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ না থাকায় হয়ত গোপীনাথের পক্ষে তাঁহাকে চিনিতে পারা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু যাহাই হউক না কেন, নিত্যানন্দের নবদ্বীপ-আগমনের পূর্বেই যে গোপীনাথ নীলাচলে চলিয়া যান, তাহাতে সন্দেহ থাকে না। অদ্বৈতপ্রভু ও মুকুন্দ-দত্ত মহাপ্রভুর আশৈশব-সঙ্গী বলিয়া তাঁহাদের সহিত গোপীনাথের বিশেষ পরিচয় ছিল।

---

(১৬) চৈ. ম.—মধ্য, পৃ. ১৭৪ (১৭) ১।১০, পৃ. ৫৪ (১৮) ৪।১৭

উপরোক্ত আলোচনা হইতে তাহা হইলে গোপীনাথ-আচার্য সম্বন্ধে এই কথা বলা যায় যে তিনি ছিলেন বিশারদের জামাতা এবং বিশেষ গণ্যমান্য ব্যক্তি। গৌরাঙ্গের বাল্য-লীলা সম্বন্ধে তাঁহার প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল। ঈশ্বর-পুরী নদীয়ায় গিয়া তাঁহার গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন। ঈশ্বর-পুরীর নদীয়া-ত্যাগ এবং নিত্যানন্দের নদীয়া-আগমনের মধ্যবর্তী কোনও সময়ে তিনি নবদ্বীপ হইতে গিয়া নীলাচলে বসবাস করিতে থাকেন।

গোপীনাথের আগমনের পূর্ব হইতেই তাঁহার শ্যালক সার্বভৌম-ভট্টাচার্য নীলাচলবাসী হইয়াছিলেন। সুতরাং গৌরাঙ্গের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল না। গোপীনাথও যখন নদীয়া ত্যাগ করেন, তখন গৌরাঙ্গের অসাধারণ প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়া উঠে নাই। সেইজন্যই নীলাচলে তাঁহার পক্ষে সার্বভৌমের নিকট গৌরাঙ্গের পরিচয় প্রদান করার প্রয়োজন উপলব্ধ হয় নাই। মহাপ্রভুর নীলাচলে পৌঁছাইবার পরই তিনি সর্বপ্রথম তাঁহার দিব্যশক্তি প্রত্যক্ষ করিয়া এবং পূর্ব-পরিচিত মুকুন্দের নিকট তৎসম্বন্ধে সকল বিষয় অবগত হইয়া তাঁহার প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হইলেন। এক্ষণে তিনিই সার্বভৌম এবং চৈতন্যের মধ্যে প্রধান যোগস্থাপনকারী হইয়া দাঁড়াইলেন। তিনি সুশিক্ষিত ছিলেন এবং নানাবিধ শাস্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই শাস্ত্রাদি পাঠ তাঁহার নিকট শিল্পচর্চার মত ছিল।[১৯] ইতিপূর্বে তাঁহার মনে ভক্তির বীজ উপ্ত হইয়াছিল। চৈতন্যের ভাবমেঘ-বারি-স্পর্শে এখন তাহা সঞ্জীবিত ও পল্লবিত হইয়া উঠিল এবং বৈদান্তিক পণ্ডিতের ঊষর মনোমরুতেও যাহাতে মহাপ্রভুর করুণাবারি অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সেখানে ভক্তির শ্যামল কানন সৃষ্টি করিয়া তুলিতে পারে তজ্জন্য তিনি যত্নবান হইলেন। সার্বভৌম-[২০]জয়ের মধ্য দিয়াই মহাপ্রভুর রামানন্দ-প্রতাপরুদ্রাদি-জয় তথা উড়িষ্যা-বিজয়ের পথ উন্মুক্ত হইয়াছিল। সেইদিক হইতে বিচার করিলে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম-ভাগে দূর নীলাচলে যে বাঙালী-উপনিবেশ গড়িয়া উঠা সম্ভব হইয়াছিল, গোপীনাথই ছিলেন সেই সুরম্য উপনিবেশ-সৌধের প্রথম ভিত্তিপ্রস্তরবাহী।

মহাপ্রভু পৌঁছাইতে না পৌঁছাইতে গোপীনাথের কার্য আরম্ভ হইয়া গেল। সার্বভৌমের মত লইয়া মহাপ্রভুকে রাখিবার ব্যবস্থা, তাঁহার খাওয়ার বন্দোবস্ত, ভক্তবৃন্দের রক্ষণাবেক্ষণ-ব্যবস্থা প্রভৃতি বহু কার্যের ভারই গোপীনাথ শিরোধার্য করিয়া লইলেন। তাহার পর এই সমস্ত সম্পন্ন হইয়া গেলে তিনি সার্বভৌমকে লইয়া পড়িলেন। চৈতন্যের নাম ধাম আত্মীয়-স্বজন, এমন কি তাঁহার পূর্বাশ্রম ও সন্ন্যাসাশ্রমের সকল প্রাসঙ্গিক পরিচয় প্রদান করিয়া

(১৯) চৈ. ম.—৮।৪০ (২০) দ্র.—ভ. নি., পৃ. ১১৯-২০

বৈদান্তিক-পণ্ডিতের কাছে তাঁহাকে একেবারে 'সাক্ষাৎ-ভগবান' আখ্যা দিয়া বসিলেন। বুদ্ধিমান-পণ্ডিত সমস্তই শুনিলেন, কিন্তু তাঁহার শেষের প্রত্যয়টিকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তাঁহার শিষ্যগণও গোপীনাথকে উপহাস করিল। কিন্তু গোপীনাথও একেবারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। মহাপ্রভুর নিকট গিয়া তিনি মিনতি জানাইলে অসাধারণ-শক্তিসম্পন্ন চৈতন্ত-মহাপ্রভু এক গুরুভার বিদ্যুৎ-সম্পাতে সার্বভৌমের চিত্ত-শিলাকে বিদীর্ণ করিয়া তাহার অন্তর-তল হইতে এক বিপুল জলোচ্ছাস সৃষ্টি করিয়া তুলিলেন। গোপীনাথ একদিন সার্বভৌমের সম্মুখে আসিয়া সেই সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করিলে 'ভট্টাচার্য কহে তাঁরে করি নমস্কারে। তোমার সম্বন্ধে প্রভু কৃপা কৈল মোরে॥' আর একদিন গোপীনাথ সার্বভৌমের এই পরিবর্তনের সম্বন্ধে কথা তুলিলে 'প্রভু কহে তুমি ভক্ত তোমার সঙ্গ হইতে। জগন্নাথ ইঁহারে কৃপা কৈল ভালমতে॥'

মুকুন্দাদি চারিজন ভক্ত তখন নীলাচলে সম্পূর্ণতই বিদেশী, তাঁহাদের সহিত যোগদান করিয়া গোপীনাথ তাঁহাদের সেবাকে সার্থক করিয়া তুলিলেন। অল্পকাল পরে মহাপ্রভু দক্ষিণ-ভ্রমণে বহির্গত হইলে অন্যান্য ভক্তের সহিত গোপীনাথ তাঁহার যাত্রার দীন আয়োজন সম্পন্ন করিয়া আলালনাথ পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন এবং সেখানে মহাপ্রভুকে আপনার নিকট ভিক্ষা-গ্রহণ করাইয়া বিদায় দান করিলেন।

রাজ-দরবারে গোপীনাথের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল এবং জগন্নাথ-মন্দিরেও তাঁহার প্রভাব ছিল। মহাপ্রভুর প্রত্যাবর্তনের পর গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দ নীলাচলে আসিলে একদিকে তাঁহাকে যেমন রাজার নিকট ভক্তবৃন্দের পরিচয় প্রদান করিতে হইয়াছে, অন্যদিকে তেমনি আবার ভক্তবৃন্দকে মন্দির-প্রদর্শন ও তাঁহাদিগের জন্য বাসাদি-ব্যবস্থা করিয়া দিবার অনেকটা ভারই তাঁহাকে মাথায় তুলিয়া লইতে হইয়াছে। মহাপ্রভুও তদবধি ভক্তবৃন্দের জন্য বাসা-ব্যবস্থা এবং প্রসাদ-বণ্টন বা ভোজন-কালে পরিবেশন করা ইত্যাদি ব্যাপারে গোপীনাথ ও বাণীনাথের উপরই বিশেষ নির্ভর করিতেন।

এদিকে গোপীনাথের মন ছিল মায়া-মমতায় ভরা। একবার সার্বভৌম-জামাতা অমোঘ মহাপ্রভুর ভোজন লইয়া পরিহাস করায় সার্বভৌম ও তৎপত্নী কর্তৃক বিতাড়িত হইয়াছিল। কিন্তু পরে গোপীনাথের মধ্যস্থতায় সেই স্বজন-বিড়ম্বিত অমোঘও মহাপ্রভুর করুণা-প্রাপ্ত হইয়াছিল। গোপীনাথের হস্তক্ষেপ না ঘটিলে তাহার প্রাণ-সংশয় ঘটিত।

এই ঘটনার কিছুকাল পরেই মহাপ্রভু গৌড়াভিমুখে যাত্রা করিলে অন্যান্য ভক্তসহ গোপীনাথও তাঁহার সহিত অগ্রসর হইয়াছিলেন। 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক' হইতে জানা যায় যে রামানন্দ-রায় ভদ্রক পর্যন্ত মহাপ্রভুকে আগাইয়া দিয়া তথা হইতে প্রত্যাবর্তনের সময়ে তাঁহার সহিত পথ-পরিচয়ে বিজ্ঞ পরমানন্দ-পুরী, দামোদর, জগদানন্দ, গোপীনাথ ও

গোবিন্দ প্রভৃতি পাঁচ ছয় জন সঙ্গীকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।[২১] কিছু পরের উল্লেখ হইতেও প্রতীয়মান হয় যে গোপীনাথ মহাপ্রভুর সহিত পানিহাটী পর্যন্ত গমন করিয়াছিলেন।[২২] 'ভক্তিরত্নাকরের' বর্ণনায় দেখা যাইতেছে[২৩] যে মহাপ্রভুর তিরোভাবের পর নরোত্তমের নীলাচলে পৌঁছাইবার দিন গোপীনাথ-আচার্য ভক্তবৃন্দের সহিত নরোত্তমের বিষয় বর্ণনা প্রসঙ্গে মহাপ্রভুর রামকেলি-গমনকালীন ঘটনা আলোচনা করিতেছেন। সেই আলোচনা প্রত্যক্ষদর্শীর আলোচনা সদৃশ। ইহাতে ধরা যায় যে গোপীনাথ মহাপ্রভুর রামকেলি-গমনের সঙ্গী হইতে পারেন, এইরূপ একটি ধারণা সম্ভবত নরহরির ছিল। আবার 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র উল্লেখ হইতে জানা যায় যে রেমুণাতে রামানন্দকে বিদায় দেওয়ার পরেও মুকুন্দ-দত্ত মহাপ্রভুর সঙ্গী-হিসাবে অগ্রসর হইতেছেন[২৪] এবং 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে'ও দেখা যায় যে চৈতন্য গৌড়-মণ্ডলে পৌঁছাইয়া কুমারহট্টে শ্রীবাস-গৃহে গমন করিলে জগদানন্দও সেইস্থানে গমন করিয়াছিলেন।[২৫] মুকুন্দ, গোপীনাথ, জগদানন্দ প্রভৃতি ভক্ত গৌড়পথ চিনিতেন। সুতরাং মহাপ্রভুর সহিত সঙ্গী-হিসাবে এই সকল ভক্তের গমন করা অসম্ভব নহে। 'চৈতন্যচরিতামৃত'-মতে ঐ কয়েকজন সহ আরো কয়েকজন ভক্ত কটক অতিক্রম করিয়া চলিতেছিলেন। তাহার পরেও দেখা যায় যে মহাপ্রভু গদাধর ও রামানন্দকে বিদায় দিয়া অগ্রসর হইলে উড়িষ্যা-সীমা অতিক্রম করার সময়ও 'অনেক সিদ্ধপুরুষ লোক হয় তার সাথে।'[২৬] তাহার পর আর তাঁহাদের উল্লেখ নাই। কিন্তু তিনি পথে তাঁহাদিগকে বিদায় দিয়া গেলে নিশ্চয়ই সেই বর্ণনা থাকিত। রামানন্দ- ও গদাধর-বিদায়ের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। গদাধরকে লইয়া যাইতে পারেন নাই বলিয়া পরেও মহাপ্রভু দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন এবং বহু-ভক্তসহ তাঁহার আড়ম্বরপূর্ণ যাত্রার বিপদ আশংকা করিয়া তিনি বৃন্দাবনের পথে প্রায় একাকী নীরবে যাত্রা করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার সঙ্গী-সাবে বহু ভক্তই যে গৌড় পর্যন্ত গমন করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ থাকে না। 'চৈতন্য-চরিতামৃতে' মহাপ্রভুর গৌড়গমন-বৃত্তান্ত সংক্ষিপ্ত বলিয়া তাঁহার গৌড়-গমন সঙ্গীদিগের নামোল্লেখ আর দরকার হয় নাই। তৎসত্ত্বেও একবার দেখা যায় যে মহাপ্রভু যখন গৌড়ের নিকটবর্তী রামকেলিতে গিয়া রূপ-সনাতনকে আশীর্বাদ করিতেছেন তখন নিত্যা-নন্দাদি ভক্তসহ মুকুন্দ জগদানন্দ প্রভৃতি 'সবার চরণ ধরি পড়ে দুই ভাই।'[২৭]—সুতরাং এই সকল হইতে ধরিতে পারা যায় যে মহাপ্রভুর গৌড়পথ-সঙ্গী-বৃন্দের সহিত গোপীনাথ আচার্যও গৌড়-গমন করিয়াছিলেন, মহাপ্রভু তাঁহাকে পথিমধ্যে বিদায় দিয়া ফিরাইয়া দেন নাই।

(২১) ৯।২০, ২৫ (২২) ৯।২৮ (২৩) ৮।২৩৮-৪০ (২৪) ২।১১, পৃ. ১৫৬; ৩।১০, পৃ. ৩৩৮ (২৫) ৯।৩১-৩২ (২৬) ২।১৬, পৃ. ১৮৯ (২৭) ২।১, পৃ. ৮৭; ম. বি.—১ম. বি., পৃ. ১০

নিজে পুরুষোত্তমের অধিবাসী বলিয়া নীলাচলাগত বৈষ্ণব-ভক্তবৃন্দের প্রতি সর্বদাই গোপীনাথের একটি সতর্ক দৃষ্টি থাকিত। সেই সমস্ত ভক্ত-সন্ন্যাসীকে তিনি মধ্যে মধ্যে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতেন[২৮] এবং তাঁহার সেবাবিধির এই নানাবিধ কর্তব্য হইতে তিনি কোনদিনই বিচ্যুত হন নাই। মহাপ্রভুর তিরোভাবের পর তিনি অনেকদিন বাঁচিয়াছিলেন। শ্রীনিবাস-আচার্য ও নরোত্তম নীলাচলে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।[২৯] নরোত্তম তাঁহার গৃহেই বাস করিয়াছিলেন এবং তিনিই নরোত্তমের মন্দিরাদি-দর্শন ও অন্যান্য ভক্তের সহিত মিলনাদি ঘটাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তখন গোপীনাথ বৃদ্ধ ও জরাজীর্ণ হইয়াছেন।[৩০] তাহার পর সম্ভবত আর বেশী দিন তিনি বাঁচিয়া থাকেন নাই।

(২৮) চৈ. চ.—২।১১, পৃ. ১৫৬ ; ৩।১০, পৃ. ৩৩৮ (২৯) ভ. র.—৩।১৯৪ (৩০) ন. বি—২য় বি., পৃ. ৪৬-৫৪ ; ভ. র.—৮।২২৮-৬৩

প্রতাপরুদ্র

রাজা প্রতাপরুদ্র ছিলেন উড়িষ্যার অধিপতি। A History of Orissa-নামক গ্রন্থে হাণ্টার সাহেব প্রতাপরুদ্রের মৃত্যু সনকে ১৫৩২ খ্রী. ধরিয়া তাঁহাকে গঙ্গাবংশীয় শেষ নৃপতিরূপে আখ্যাত করিয়াছেন। কিন্তু এই গ্রন্থের সম্পাদক ডা. সাহু (পৃ.১৪৭, পাদটীকা) এবং আর. সুব্রহ্মনিয়ম মহাশয় (Proceedings of the Indian History Congress, 1945) অনন্তভরম্-অনুশাসন অনুযায়ী প্রতাপরুদ্রের পিতামহ যে-কপিলেশ্বরদেবের উল্লেখ করিয়াছেন, কোণ্ডাভীডু অনুশাসনের অনুবাদ করিতে গিয়া ডা. হুল্ট্‌জ্ (Indian Antiquary, 20) বলিতেছেন যে তিনি ছিলেন সূর্যবংশীয়। আবার প্রতাপরুদ্রের রাজত্বকাল সম্বন্ধেও হাণ্টার-প্রদত্ত তারিখটি (১৫০৪-৩২) গৃহীত হয় না। তারিণীচরণ রথ মহাশয় (J. B. O. R. S, 1929) প্রতাপরুদ্রের রাজ্যারম্ভ-কালকে ১৫০৪-৫ কিংবা ১৪৯৬-৯৭ ধরিবার সম্বন্ধে বলিয়াছেন, এবং রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় (History of Orissa) ও শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মহাতাব মহাশয় (Radhakumud Mukherjee Endowment Lectures, 1947) প্রতাপরুদ্রের মৃত্যু-সনকে ১৫৪০ খ্রী. ধরিয়াছেন। মজুমদার-রায়চৌধুরী-দত্ত প্রণীত An Advanced History of India-গ্রন্থেও উক্ত রাজত্বকালকে ১৪৯৭-১৫৪০ খ্রী. ধরা হইয়াছে। বৈষ্ণব-গ্রন্থ হইতে অবশ্য প্রতাপরুদ্রের রাজত্বকাল সম্বন্ধে সঠিকভাবে কিছুই জানিতে পারা যায়না। তাঁহার পিতা পুরুষোত্তমদেব সম্বন্ধে যাহা জানা যায়, তাহাও অতি অল্পই।

‘চৈতন্যচরিতামৃত’ হইতে জানা যায় যে বিদ্যানগরে সাক্ষীগোপাল-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।[১] ‘চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক’-মতে মহেন্দ্র-দেশে উহা হইয়াছিল।[২] সম্ভবত তৎকালে উক্ত প্রদেশ মহেন্দ্র-দেশের অন্তর্গত ছিল। মার্কণ্ডেয়পুরাণ-গ্রন্থের সম্পাদক পার্জিটার সাহেব মহেন্দ্র পর্বতের অবস্থান নির্দেশ করিতে গিয়া জানাইয়াছেন (Markandeya Sl. no. 11, Fin.—1) "The range then appears to be the portion of the Eastern Ghats between the Godavari and the Mahanadi and the hills in the south of Berar." ডা. হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী তাঁহার Studies in Indian Antiquities-নামক গ্রন্থে রামায়ণের প্রমাণবলে মহেন্দ্র-শৈলমালাকে সম্ভবত দক্ষিণ-ভারতের দক্ষিণ প্রান্তস্থিত তিন্নেভ্যালি পর্যন্ত বিস্তৃত বলিয়া মনে করিলেও অন্যান্য প্রমাণবলে তিনি মহেন্দ্রকে কলিঙ্গ-দেশের সহিতও বিশেষভাবে যুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু

(১) ২।৫, পৃ. ১৬৮ (২) ৬।২২

'চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে' গোদাবরী-তীরস্থ বিদ্যানগরকে পৃথকভাবে মহেন্দ্র-দেশভুক্ত করায় বুঝিতে পারা যায় যে ষোড়শ শতাব্দীর ধারণা-অনুযায়ী বর্তমান উড়িষ্যা-প্রদেশ কিংবা অন্তত তাহার উত্তরাংশ তখন মহেন্দ্রদেশ-বহির্ভূত হইয়াছে। সেই সময়ে উৎকলের রাজা পুরুষোত্তম যুদ্ধ করিয়া উক্ত বিদ্যানগর-অঞ্চলটিকে উৎকলভুক্ত করিয়া লইলে সাক্ষী-গোপাল বিগ্রহ তাঁহার অধিকারে আসে। ভক্তিমান রাজা পুরুষোত্তম তখন সাক্ষী-গোপালকে কটকে আনিয়া স্থাপন করেন এবং বিগ্রহের রত্ন-সিংহাসনটি জগন্নাথের মন্দিরে আনিয়া দেন। তাহার পর রাজ-মহিষী নানাবিধ রত্নালংকারে সাক্ষীগোপাল-বিগ্রহটিকে ভূষিত করেন এবং তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী উক্ত বিগ্রহের নাসিকাতে সুদৃশ্য মুক্তার অলংকারও পরাইয়া দেওয়া হয়। 'ভক্তমাল-'গ্রন্থে সম্ভবত এই পুরুষোত্তম-সম্বন্ধেই একটি অদ্ভুত গল্প বলা হইয়াছে।[৩]

বৈষ্ণবগ্রন্থগুলি হইতে প্রতাপরুদ্র-সম্বন্ধে জানা যায় যে ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রতাপরুদ্রের রাজ্য-সীমানা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। উড়িষ্যার উত্তরে গৌড়-রাজ্য। 'চৈতন্যচরিতামৃত-'অনুযায়ী ১৫১৪ খ্রী.-এর দিকে উড়িষ্যার এক রাজ-অধিকারীর রাজ্য মন্ত্রেশ্বর নদী হইতে পিচ্ছলদা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।[৪] সুতরাং এই পিচ্ছলদার দক্ষিণে প্রবাহিত মন্ত্রেশ্বর নদীকেই[৫] রাজা প্রতাপরুদ্রের রাজ্যের তৎকালীন উত্তর-সীমানা বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে মহাপ্রভুর প্রথমবার নীলাচল-গমনকালে (১৫১০-এ) রাজা প্রতাপরুদ্র যুদ্ধার্থে 'বিজয়ানগরে' গিয়াছিলেন।[৬] সুতরাং ঐ সময়ে তাঁহাকে দক্ষিণ-দেশে যুদ্ধরত অবস্থায় দেখা যায়। 'বাংলার ইতিহাসে' (২য়. ভাগ, পৃ. ২৪৬) রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় জানাইয়াছেন, "উড়িষ্যার ঐতিহাসিক বিবরণ অনুসারে ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যা গৌড়ীয় মুসলমান সেনাকর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল।" সুতরাং ১৫১০ খ্রী.-এর দিকে তাঁহার দক্ষিণাভিযানে কোনও বাধা থাকেনা। 'চৈতন্য-ভাগবত' এবং 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে'ও বর্ণিত আছে যে ঠিক ঐ একই সময়ে গৌড়া-ধিপতি যবন-রাজার সঙ্গে প্রতাপরুদ্রের বিরোধ থাকায় উভয় প্রদেশের মধ্যে সহজ গমনাগমনের পথ রুদ্ধ ছিল। সুতরাং ১৫১০ খ্রী.-এর দিকে গজপতি-প্রতাপরুদ্রের রাজ-সিংহাসন যে নিষ্কণ্টক ছিলনা তাহাই অনুমিত হয়। কিন্তু সম্ভবত তিনি বাহুবলেই তাঁহার রাজ্যকে নিষ্কণ্টক রাখিয়াছিলেন। কারণ 'চৈতন্যচরিতামৃতে' বা 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে'[৭] যদিও বলা হইয়াছে যে মদ্যপ যবন-রাজের ভয়ে তখনও কেহ নদী পার হইতে

---

(৩) পৃ. ১৫০ (৪) ২।১৬, পৃ. ১৮৯ (৫) চৈ. না.—৯।২৮ (৬) চৈ. কৌ.-তেও (পৃ. ৩৩৫) গজপতির দক্ষিণদেশে যাওয়ার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। (৭) ২।২৬

পারিতেছেন না, তথাপি কবিকর্ণপুর কিন্তু অন্যত্র বলিতেছেন যে উহার কিছু পরেই অর্থাৎ ১৫১২ খ্রী.-এর দিকে প্রতাপরুদ্র ও গৌড়-রাজের মধ্যে আর রাজ্য লইয়া বিরোধ নাই, পথও সুগম হইয়াছে।[৮] সুতরাং এই ১৫১০ খ্রী. হইতে ১৫১২ খ্রী.-এর মধ্যেই যে প্রতাপরুদ্র বিজয়নগর হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া বাংলাদেশের হুগলী জেলাস্থ মান্দারণ দুর্গ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং তাহার পর তাঁহার প্রধান কর্মচারী বিদ্যাধর-ভইর বিশ্বাসঘাতকতায় তাঁহাকে অধিকৃত রাজ্যের কিয়দংশ (মন্ত্রেশ্বর নদী পর্যন্ত ?) ত্যাগ করিতে হইয়াছিল তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। আঞ্চলিক রাজাধিকারী মন্তপ যবন-রাজের কিছুটা প্রতাপ ইহার পরে কিছুকাল যাবৎ অব্যাহত থাকিলেও গৌড়রাজ বা উড়িষ্যা-রাজের মধ্যে তখন কিন্তু আর কোন বিবাদ ছিলনা।

নৃপতি-হিসাবে প্রতাপরুদ্র ছিলেন পরাক্রমশালী। কিন্তু তিনি ছিলেন প্রকৃত গুণগ্রাহী। সার্বভৌম তৎকর্তৃক বিশেষ সম্মানপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন[৯] এবং রামানন্দ-রায়ও তাঁহার দ্বারা বিশেষভাবে অনুগৃহীত হন। আবার এই রামানন্দ-রায় চৈতন্যাদেশে রাজ্যপাট পরিত্যাগ করিয়া নীলাচল-বাসী হইতে চাহিলে তিনি তাঁহার বাঞ্ছাপূরণ করিয়া দেন। শুধু তাহাই নহে। বাংলার দুলাল চৈতন্য যখন উড়িষ্যার সমুদ্রবেলায় গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন তিনি সাম্রাজ্যের বেড়াজাল ঘুচাইয়া তাঁহাকে সাদরে বরণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন।[১০]

মহাপ্রভু যখন দক্ষিণভ্রমণে বহির্গত হন তখন প্রতাপরুদ্র নীলাচলে অনুপস্থিত ছিলেন। সম্ভবত তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর চৈতন্য-সম্বন্ধীয় সকল কথা শুনিয়া তাঁহার দর্শনাভিলাষী হন। কিন্তু তিনি সার্বভৌম-ভট্টাচার্যকে ডাকাইয়া তাঁহার নিকট মহাপ্রভুর দক্ষিণ-গমনের সংবাদ শুনিয়া বিষণ্ণ হইলেন। সার্বভৌম যখন জানাইলেন যে চৈতন্য স্বতন্ত্র ঈশ্বর ও সাক্ষাৎ কৃষ্ণস্বরূপ তখন মরমী রাজা ভট্টাচার্যের এই প্রত্যয়ের মর্যাদা দান করিয়া মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইবার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করিলেন। সার্বভৌম তাঁহাকে কিছুকাল ধৈর্য-ধারণের উপদেশ দিয়া মহাপ্রভুর জন্য একটি নির্জন বাসস্থানের বন্দোবস্ত করিয়া রাখিতে বলায় শীঘ্রই কাশী-মিশ্রের গৃহে মহাপ্রভুর নির্জন-বাসের সমুচিত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইল।

(৮) চৈ. না.—৮।২৯ ; চৈ. কৌ.—পৃ. ২৪২ (৯) ভ. মা.—পৃ. ২৩৩ ; বৈ. দি.-মতে (পৃ. ৫০) "প্রতাপরুদ্র তাঁহাকে বহু অর্থব্যয়ে পুরীতে স্থাপন করিয়াছিলেন।" (১০) ভ. নি.-মতে (পৃ. ৬০) প্রতাপরুদ্র উড়িষ্যায় সংকীর্তন গানের বহুল প্রচারের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেন এবং 'উৎকলবাসী পণ্ডিত ব্রাহ্মণ'গণ চৈতন্যমতকে অশাস্ত্রীয় বলিয়া তাঁহার নিকট অনুযোগ উত্থাপন করিলে তিনি ধীরচিত্তে সার্বভৌমের সাহায্যে প্রকৃত বিষয় অনুধাবনার্থ যথেষ্ট ঔদার্য প্রদর্শন করেন। (পৃ.১১৮-৩৮)

মহাপ্রভু প্রত্যাবর্তন করিলে প্রতাপরুদ্র কটক হইতে সার্বভৌমের নিকট পত্রী পাঠাইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইতে চাহিলেন। কিন্তু চৈতন্য রাজ-দর্শনকে স্ত্রী-দর্শনের মত বিষবৎ পরিহার করিতেন। সুতরাং সার্বভৌমের অনুরোধে কিছুই হইল না। রাজার নিকট সার্বভৌম এই সংবাদ প্রেরণ করিলে তিনি পুনর্বার পত্র মারফত জানাইলেন যে মহাপ্রভুর চরণ-দর্শন না ঘটিলে 'রাজ্য ছাড়ি প্রাণ দিব হইব ভিখারী।' পত্র পাইয়া সার্বভৌম রাজোপদেশ অনুযায়ী অন্য সকল ভক্ত সহ মহাপ্রভুর নিকট ঐ পত্রের মর্ম ব্যক্ত করিয়া পুনরায় পূর্ব-প্রার্থনা নিবেদন করিলেন। শেষে নিত্যানন্দের বিশেষ অনুরোধে মহাপ্রভু প্রতাপরুদ্রকে একখানি বহির্বাস প্রদান করিতে সম্মত হন। সার্বভৌম সেই বস্ত্রখানি রাজার নিকট পাঠাইয়া দিলে 'বস্ত্র পাইয়া রাজার আনন্দিত হইল মন। প্রভুরূপ করি করে বস্ত্রের পূজন॥' কিন্তু তাঁহার মনোবাসনা অপূর্ণ থাকিয়া গেল।

কয়েকদিন পরেই রামানন্দ-রায় নীলাচলে উপস্থিত হইলে প্রতাপরুদ্রের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটিল। ইতিপূর্বে রামানন্দ প্রতাপরুদ্রের নিকট নীলাচল-বাসের আজ্ঞা প্রার্থনা করিলে রাজা রামানন্দের প্রতি মহাপ্রভুর অসীম-কৃপা সম্বন্ধে অবগত হইয়াছিলেন। তাই এখন তিনি রামান্দের নিকটও স্বীয় অভিলাষ ব্যক্ত করিয়া রাজ্য-পরিত্যাগের সংকল্প জ্ঞাপন করিলেন। রামানন্দ এই সকল কথা বলিয়া প্রথমে ব্যর্থ হইলেও শেষ পর্যন্ত চৈতন্য-হৃদয়কে কিছুটা আর্দ্র করিয়া ফেলেন এবং মহাপ্রভু প্রতাপরুদ্রের পুত্রের সহিত মিলিত হইবার সম্মতি প্রদান করিলে রাজাপুত্রকে আনা হয় এবং তিনি তাঁহাকে আলিঙ্গন দান করেন। তারপর প্রতাপরুদ্র স্বীয় পুত্রের সহিত মিলিত হইয়া যেন পুত্রের মাধ্যমে মহাপ্রভুর স্পর্শলাভ করিয়া কিছুটা প্রকৃতিস্থ হইলেন।

কিন্তু অল্পকাল পরেই রাজার নিজের প্রতি ধিক্কার জন্মাইল। সার্বভৌমকে ডাকাইয়া জানিতে চাহিলেন যে তিনি কি জগাই-মাধাই অপেক্ষাও এতই নীচ এবং পাপাশয় যে মহাপ্রভু তাঁহাকে দর্শন দিবেন না এবং একমাত্র তাঁহাকেই বাদ দিয়া তিনি আর সারা-জগতেরই উদ্ধার সাধন করিবেন! তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন যে চৈতন্য-চরণ-ধূলি প্রাপ্ত হইতে না পারিলে ছার-জীবন পরিত্যাগ করিয়া সকল বাসনার নিরসন করিবেন। সার্বভৌম বিচলিত হইলেন। এইরূপ ঐকান্তিক ভক্তি কামনা কখনও বিফল হইতে পারেনা বুঝিয়া তিনি পরামর্শ দিলেন যে রথযাত্রাদিনে প্রেমাবিষ্ট মহাপ্রভু পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিলে দীনাতিদীন বেশে রাজা যদি 'কৃষ্ণরাস পঞ্চাধ্যায়ী'র শ্লোক পাঠ করিতে করিতে মহাপ্রভুর চরণে পতিত হন, তাহা হইলে নিশ্চয় তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। রাজা যেন অকূল সমুদ্রের মধ্যেও তটচিহ্ন-রেখা দেখিতে পাইয়া আশ্বস্ত হইলেন। স্নান-যাত্রার তো আর তিনটি দিন মাত্র বাকি। তিনি

সার্বভৌমকে জানাইয়া রাখিলেন যে সেই গোপন মন্ত্রণার কথা যেন আর কেহই না জানিতে পারেন। সার্বভৌম রাজাকে নিশ্চিন্ত করিলেন।[১১]

এদিকে রথযাত্রা সমাগতপ্রায়। গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দ নীলাচলে পদার্পণ করিলে প্রতাপ-রুদ্র প্রাসাদ-বলভীতে[১২] গিয়া সার্বভৌম ও গোপীনাথ-আচার্যের সহিত দণ্ডায়মান হইলেন। গোপীনাথ গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দের পরিচয় প্রদান করিলে অদ্বৈত শ্রীবাসাদি সকল ভক্তের দর্শন-লাভ করিয়া রাজা সন্তোষ-লাভ করিলেন।

রথ-যাত্রার দিন প্রতাপরুদ্র স্বয়ং 'মহাপ্রভুর গণে করায় বিজয় দর্শন।' তারপর যখন বাদ্য-কোলাহল উত্থিত হইল, তখন তিনি স্বহস্তে সম্মার্জনী ধারণ করিয়া পথ-মার্জন করিতে লাগিলেন এবং চন্দন-জল সিঞ্চনে পথ পবিত্র করিয়া যথারীতি সেবাবিধির দ্বারা মহাপ্রভুর মনকে আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হইলেন। ক্রমে তিনি রথাগ্রে মহাপ্রভুর কীর্তন ও নর্তন দেখিয়া বিমুগ্ধ হইলেন। যাহাতে মহাপ্রভুর উদ্দণ্ড-নৃত্যের কোনও ব্যাঘাত না ঘটে তজ্জন্য তিনি নিজেই সচেষ্ট হইলেন এবং বাহিরে পাত্রগণকে লইয়া মণ্ডলীবদ্ধভাবে জনতাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন; সঙ্গে সঙ্গে মহাপাত্র-হরিচন্দনের স্কন্ধের উপর ভর দিয়া মহা-প্রভুর নর্তন দেখিতে দেখিতেও চলিলেন। এই সময়ে রাজ-সম্মুখে আগত ভাবাবিষ্ট শ্রীবাস-আচার্যকে সরিয়া যাইবার জন্য হরিচন্দন অনুরোধ জানাইলে শ্রীবাস তাঁহাকে চপেটাঘাত করায় রাজা ক্রুদ্ধ হরিচন্দনকে শ্রীবাসের ঐরূপ আচরণ স্বীয় সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া মনে করিতে বলিলেন। তারপর নর্তনপর মহাপ্রভু যখন ভাবাবেশে প্রতাপরুদ্রের সম্মুখে পতনোন্মুখ হইলেন, তখন রাজা তাঁহাকে সম্ভ্রমে সাধ্বসে ধরিয়া ফেলিলেন। কিন্তু মহাপ্রভুর বাহ্যজ্ঞান আসিয়া পড়ায় তিনি ধিক্কারে সরিয়া গেলেন। রাজান্তঃকরণ বেদনায় দীর্ণ হইয়া গেল।

কিন্তু প্রতাপরুদ্র হতাশ হইয়া পড়িলেন না। তাঁহার সর্বশেষ প্রচেষ্টার সময় তখনও সমাগত হয় নাই। ক্রমে নর্তন-ক্লান্ত মহাপ্রভু পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিলেন। তখন তিনি গলদঘর্ম হইয়া পড়িয়াছেন। সেই সময় প্রতাপরুদ্র রাজ-বেশ পরিত্যাগ করিয়া একান্ত দীন-হীন বৈষ্ণব-বেশে সকলের সম্মতি লইয়া আঁখিরুদ্ধ মহাপ্রভুর পদতলে পতিত হইয়া তাঁহার পাদ-সংবাহন করিতে লাগিলেন এবং মহাপ্রভুর হৃদয়ভাব অনুযায়ী

রাসলীলার শ্লোক পড়ি করয়ে স্তবন।
জয়তি তেঽধিকং অধ্যায় করয়ে পঠন॥
শুনিতে শুনিতে প্রভুর সন্তোষ অপার।
বোল বোল বলি উচ্চ বলে বার বার॥

(১১) চৈ. চ.—৮।৩৭ (১২) ঐ—৮।৩৯

'তব কথামৃতং' শ্লোক রাজা যে পড়িল।
উঠি প্রেমাবেশে প্রভু আলিঙ্গন দিল॥
তুমি মোরে বহু দিলে অমূল্য রতন।
মোর কিছু দিতে নাহি দিনু আলিঙ্গন॥

তারপর মহাপ্রভু যখন আত্মস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

কে তুমি করিলে মোর হিত।
আচম্বিতে আসি পিয়াও কৃষ্ণলীলামৃত॥
রাজা কহে আমি তোমার দাসের অনুদাস।
ভৃত্যের ভৃত্য কর মোরে এই মোর আশ॥

মহাপ্রভু প্রতাপরুদ্রকে প্রেম-মহাসমুদ্রে ডুবাইয়া দিলেন। মানুষের মধ্যে সেই অমানুষী প্রেমকে প্রত্যক্ষ করিয়া[১৩] প্রতাপরুদ্র ভাব-বিমোহিত চিত্তে সম্মুখস্থ মহামানবের মধ্যে যেন বিপুল ঐশ্বর্যের পরিপূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাইয়া কৃতার্থ হইলেন।

প্রতাপরুদ্রের আজ্ঞায় নীলাচলে মহাপ্রভুর সকল কর্মই সুসম্পন্ন হইত। এই বিষয়ে সার্বভৌম ও কাশী-মিশ্র ছিলেন তাঁহার যোগ্য সহায়ক।[১৪] ইহা ছাড়া হরিচন্দন, মঙ্গরাজ ও তুলসী-মহাপাত্র প্রভৃতি সেবকবৃন্দ তো ছিলেনই। তাঁহাদের সাহায্যে তিনি মহাপ্রভুর সকল আনন্দ-উৎসবকে সুসাধ্য ও সার্থক করিয়াছিলেন। গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দের প্রথমবার নীলাচলে পদার্পণের পর তিনি রাজবলভী হইতে নামিয়া কাশী-মিশ্র ও পড়িছা-পাত্রকে ডাকিয়া যাহাতে ভক্তগণের স্বচ্ছন্দ-বাসা, স্বচ্ছন্দ-প্রসাদ ও স্বচ্ছন্দ-দর্শনের কোন ব্যাঘাত না হয় তজ্জন্য নির্দেশ-দান করিয়াছিলেন এবং মহাপ্রভু সম্বন্ধে বলিয়া দিয়াছিলেন যে সমস্ত আজ্ঞাই সাবধানে পালন করিতে হইবে। এমন কি, "আজ্ঞা নহে, তবু করিহ ইঙ্গিত বুঝিয়া।"[১৫] মহাপ্রভুর সহিত মিলনের পরে তিনি কাশী-মিশ্রের সাহায্যে সেই বৎসরকার হোরাপঞ্চমী-তিথিটিকে স্বনুষ্ঠিত করিয়া মহাপ্রভুকে বিশেষভাবে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন।

কয়েক মাস পরে মহাপ্রভু গৌড়পথে বৃন্দাবন-গমনের অভিলাষ ব্যক্ত করিলে প্রতাপরুদ্র সার্বভৌম ও রামানন্দের সাহায্যে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করাইয়া গমন কাল পিছাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু দুই বৎসর পরে তিনি যাত্রা আরম্ভ করিয়া কটক পর্যন্ত পৌঁছাইলে, প্রতাপরুদ্র রামানন্দের নিকট তাহা শুনিয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া

---

(১৩) চৈ. চন্দ্র-মতে (২য়. দর্শন, পৃ. ১২৩) মহাপ্রভু প্রতাপরুদ্রকে ষড়্‌ভুজ-আকৃতি প্রদর্শন করেন। চৈ. ভা.-এ (চৈ. চন্দ্র-এর পরে লিখিত বলিয়া কথিত—চৈ. চন্দ্র.—২য়. দর্শন, পৃ. ১০৪) কিন্তু এই ষড়্‌ভুজ-দর্শনের কোনও উল্লেখ নাই। চৈ. চ-এ (২।১৪, পৃ. ১৭০) কেবল লিখিত আছে—তবে মহাপ্রভু তারে ঐশ্বর্য দেখাইল। (১৪) চৈ. না.—৮।৪৮-৪৯ (১৫) চৈ. চ.—২।১১, পৃ. ১৫৪

ভূমিষ্ঠ হইলেন। তারপর মহাপ্রভু আশীর্বাদ জানাইলে তিনি তাঁহার নির্বিঘ্ন-গমনের সমূহ-ব্যবস্থা সুসম্পন্ন করিয়া দিলেন, স্বয়ং আজ্ঞাপত্র লেখাইয়া রাজ্যান্তর্গত বিষয়ী লোকদিগের নিকট তাহা পাঠাইয়া দিলেন। মহাপ্রভুকে সাদরে গ্রহণ করিবার জন্য তিনি গ্রামে-গ্রামে নূতন আবাস-নির্মাণের আদেশদান করিলেন এবং সতর্কভাবে তাঁহার সেবার জন্য বিশেষ নির্দেশও প্রেরণ করিলেন। হরিচন্দন এবং মঙ্গরাজ নামক দুইজন মহাপাত্রকে নৌকাদির ব্যবস্থা ও অন্যান্য কর্ম সুষ্ঠুভাবে নির্বাহ করিবার জন্য নিযুক্ত করা হইল। তাঁহারা এ বিষয়ে যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন এবং মঙ্গরাজ দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া নরোত্তমপ্রভু নীলাচলে আসিলে তাঁহার সাক্ষাৎ-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন[১৬] মহাপ্রভুর গমনের সমূহ ব্যবস্থা হইয়া গেলে প্রতাপরুদ্র স্বীয় রাজান্তঃপুরস্থ মহিলাবৃন্দকে হস্তীপৃষ্ঠে আনিয়া দূর হইতে মহাপ্রভুর দর্শন-লাভ করাইয়া নিজেকে সপরিবারে কৃতার্থ মনে করিলেন।

মহাপ্রভুর গৌড় এবং বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার পর প্রতাপরুদ্র প্রতি বৎসর নীলাচলে আসিয়া রথযাত্রা-অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করিতেন। গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দের প্রতি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি থাকিত। একবার তাঁহাদের স্নান-যাত্রা-দর্শনের সুবিধার জন্য তিনি চক্রবেষ্টের উপরেই তাঁহাদের দণ্ডায়মানের স্থান নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন। সেই স্থানটি রাজান্তঃপুর-নারীদের স্নানাদি-দর্শনের জন্যই নির্দিষ্ট থাকিত। সে-বৎসর আর পুরনারীদিগের স্নান-যাত্রা দর্শন হয় নাই।[১৭] রাজা মহিষীকে[১৮] লইয়া অন্য স্থান হইতে চৈতন্য-দর্শন করিয়াছিলেন।

এই স্থলে একটি বিষয় উল্লেখিত হইতে পারে যে প্রতাপরুদ্র চৈতন্যভক্তবৃন্দের মধ্যে অদ্বৈতপ্রভুকেও ঈশ্বরত্বে স্থাপন করিয়াছিলেন।[১৯] একবার তিনি অদ্বৈতপ্রভুকে স্বীয় যানে আরোহণ করাইয়া কটক পর্যন্ত আনিয়া বিপুল সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

প্রতাপরুদ্রকে রাজত্ব পরিত্যাগ করিতে হয় নাই। কিন্তু রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিলেও তিনি মহাপ্রভুর পাদপদ্মে তনুমন সমর্পণ করিয়াছিলেন। একবার রাজকোষে রামানন্দ-রায়ের ভ্রাতা গোপানাথের দুই লক্ষ কাহন কৌড়ি বাকি পড়ায় রাজপুত্র তাঁহাকে চাঙ্গে চড়াইয়া প্রাণ-হরণ করিতে গেলে ভক্তগণের বেদনায় ব্যথিত হইয়া মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে জগন্নাথ-চরণে প্রার্থনা জানাইতে বলিলেন। কিন্তু সেইসময় হরিচন্দন-পাত্র ছুটিয়া গিয়া প্রতাপরুদ্রকে সেই কথা নিবেদন করিয়া নিজেও গোপীনাথের জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইলে তিনি তৎক্ষণাৎ গোপীনাথের প্রাণদণ্ড রহিত করিয়া দিলেন এবং হরিচন্দনের ক্ষিপ্রকারিতায় গোপীনাথ মুক্ত হইলেন। কিন্তু এইখানেই শেষ হইল না। বিষয়-সম্পর্কে

(১৬) ন. বি.—৪র্থ.বি., পৃ.৪৭ (১৭) চৈ.না—১০।২৪ (১৮) প্রতাপরুদ্রের প্রধানা মহিষী সম্বন্ধে কেবল জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল (উ. খ., পৃ. ১০৩) হইতে জানা যায়ঃ চন্দ্রকলা পাটরানী শিখরের কন্যা।
(১৯) দ্র.—অদ্বৈত-জীবনী

গোপীনাথের নিজের এবং তাঁহার প্রতি রাজপুত্রের এইরূপ আচরণ মহাপ্রভুকে ক্ষুব্ধ করিয়া রাখিল। তিনি কাশী-মিশ্রের নিকট আলালনাথে চলিয়া যাইবার অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন।

প্রতাপরুদ্রের একটি নিয়ম ছিল যে ক্ষেত্রে বাসকালে তিনি প্রত্যহ কাশী-মিশ্রের নিকট গিয়া তাঁহার পাদ-সংবাহন করিতেন এবং তৎকালে 'জগন্নাথ সেবার ভিয়ান শ্রবণ' করিতেন। একদিন তিনি ঐরূপ করিতে থাকিলে কাশী-মিশ্র মহাপ্রভুর ইচ্ছার কথা জানাইলেন। প্রতাপরুদ্রের মাথায় যেন আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। দুই লক্ষ কাহন কৌড়ি তো তুচ্ছ কথা, তিনি মহাপ্রভুর জন্য তাঁহার রাজ্য, এমন কি প্রাণ পর্যন্তও বিসর্জন দিতে পারেন। কিন্তু কৌড়ি ছাড়িয়া দেওয়াও মহাপ্রভুর কাম্য ছিল না শুনিয়া তিনি অবিলম্বে জানাইলেন যে মহাপ্রভুর কথা শুনিয়া নহে, ভবানন্দ-রায় তাঁহার অতিশয় মান্য ও পূজ্য বলিয়া গোপীনাথ প্রভৃতি তাঁহার সকল পুত্রের সহিতই তাঁহার বিশেষ প্রীতির সম্বন্ধ রহিয়াছে। সেই সম্বন্ধের মর্যাদা-রক্ষা করা, তাঁহার পক্ষে কৃত্রিম হইতেই পারে না। তিনি অম্লান-বদনে গোপীনাথকে ঋণ-মুক্ত করিয়া দিলেন।

ইহাই ছিল প্রতাপরুদ্রের চরিত্র। রাজা হইয়াও তিনি যেন অকলঙ্ক ও শান্ত-সমাহিত ছিলেন। কবিকর্ণপূর তাঁহাকে স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। তিনি বলিতেছেন যে রাজা যেন ছিলেন 'ভগবদ্ভাবস্বভাবঃ স্বয়মাবির্ভূত শান্তিরসাবগাহনির্ধূতরজস্তমঃ।' তাই রাজত্বের মধ্যে তাঁহার পূর্ণ পরিচয় ছিল না। রাজা হইয়াও যেখানে তিনি প্রেমভক্তি-স্রোতে রাজ-ঐশ্বর্যকে তুচ্ছ-জ্ঞান করিতে পরিয়াছিলেন, সেইখানেই তাঁহার সার্থক পরিচয়। চৈতন্য সেই পরিচয় লাভ করিয়াই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। বৃন্দাবনদাস যে বলিয়াছেন,[২০] প্রতাপরুদ্র, সার্বভৌম এবং রামানন্দের জন্যই মহাপ্রভু নীলাচলে আসিয়াছিলেন, সেকথা অযথার্থ নহে।

মহাপ্রভুর জীবিতাবস্থাতে প্রতাপরুদ্র যথারীতি মঙ্গল বিধানে পুত্রের উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া ভারমুক্ত হইয়াছিলেন এবং তখন হইতে তিনি সার্বভৌম ও রামানন্দের সহিত চৈতন্যচরিত্র-কীর্তন ও কৃষ্ণ-গুণগান ইত্যাদির মধ্য দিয়া প্রকৃত ভক্তের মত দিন-যাপন করিতেছিলেন।[২১] কিন্তু মহাপ্রভুর তিরোভাবে শ্রীক্ষেত্রের সমস্ত সৌন্দর্য বা আকর্ষণ যেন কোথায় অপসারিত হইয়া গেল। যে-মহাপুরুষের আবির্ভাবে জড় বিগ্রহও প্রাণবন্ত হইয়াছিল তাঁহার মহাপ্রয়াণে তাহা পূর্বরূপ প্রাপ্ত হইল। প্রতাপরুদ্র শ্রীক্ষেত্র হইতে দূরে চলিয়া গেলেন।

সেবা-অধিকার ছিল বলিয়া রথযাত্রার সময় অবশ্য একপ্রকার করিয়া প্রতাপরুদ্রকে নীলাচলে আসিতে হইত। সম্ভবত এইরূপ কোনও সময়ে তিনি কবিকর্ণপূরকে মহাপ্রভুর জীবন-সম্বন্ধীয় নাটক রচনার আদেশ-দান করিয়াছিলেন।[২২]

(২০) চৈ. ভা.—৩।৫, পৃ. ৩০২ (২১) ভ. র.—৩।২১৯ (২২) চৈ. না.—১।৪ ; চৈ. কৌ.—পৃ. ৪০১ ; নি. ব.-মতে(পৃ. ২৮) বীরচন্দ্রের নীলাচলাগমনকালেও তিনি জীবিত ছিলেন।

কাশী-মিশ্র

মহাপ্রভুর নীলাচলাগমনকালে উৎকলবাসী[১] কাশী-মিশ্র ছিলেন সেই স্থানের সর্বাপেক্ষা শ্রদ্ধেয় ও সম্মাননীয় ব্যক্তি। সম্ভবত তিনি রাজা-প্রতাপরুদ্রের গুরু ছিলেন। প্রতাপরুদ্র শ্রীক্ষেত্রে বাসকালে প্রত্যহ নিয়মিতভাবেই কাশী-মিশ্রের পাদ-সংবাহন করিতেন এবং তাঁহার নিকট 'জগন্নাথ-সেবার বিয়ান শ্রবণ' করিতেন।[২] মহাপ্রভু প্রথমে শ্রীক্ষেত্রে আসিলে কাশী-মিশ্র তাঁহার চরণ শরণ করেন। তারপর মহাপ্রভু দক্ষিণ-ভ্রমণান্তে প্রত্যাবর্তন করিয়া কাশী-মিশ্রের গৃহেই[৩] স্থায়িভাবে বাস করিতে থাকেন। ফলে কাশী-মিশ্র শীঘ্রই মহাপ্রভুর একজন অত্যন্ত অনুরাগী ভক্ত হইয়া পড়েন।

জগন্নাথ-মন্দিরের কার্যাধ্যক্ষ হিসাবে কাশী-মিশ্র সমস্ত ব্যবহারিক কার্যেই বিশেষ নিপুণ ছিলেন।[৪] মন্দিরের পড়িছাবৃন্দের সাহায্যে তিনি স্বীয় কর্তব্য সুসম্পন্ন করিতেন। এই পড়িছাগণকে যেমন মন্দিরের আভ্যন্তরীণ কৃত্য সম্পাদন ও ভক্তবৃন্দকে মাল্যচন্দনাদি দান এবং তাঁহাদের মন্দির ও বিগ্রহ-দর্শনের ব্যবস্থা করিতে হইত, তেমনি আবার তাঁহাদিগকে যাত্রীদিগের জন্য বাসাগৃহ ও প্রসাদাদি দানের বন্দোবস্তও করিয়া দিতে হইত। জগন্নাথ-সেবক এই পড়িছাবৃন্দের মধ্যে সর্বোচ্চ-স্থানাধিকারীকে সম্ভবত 'পাত্র' বা 'মহাপাত্র' বলা হইত। তৎকালে তুলসী-মিশ্র[৫] নামক এক ব্যক্তি সেই স্থান অধিকার করায় তাঁহাকে তুলসী-মহাপাত্র, তুলসী-পাত্র, পড়িছা-মহাপাত্র (=পরীক্ষা-মহাপাত্র ?) বা পড়িছা-পাত্র (=পরীক্ষা-পাত্র ?) বলা হইত। এই তুলসী-মহাপাত্র এবং অন্যান্য পড়িছার সাহায্যে কাশী-মিশ্র মহাপ্রভুর সেবায় যত্নবান থাকিতেন। স্বয়ং প্রতাপরুদ্রই একবার রথযাত্রা উপলক্ষে পড়িছা (=পরীক্ষা ?)-মহাপাত্রকে নির্দেশ-দান করিয়াছিলেন[৬], "কাশীমিশ্রেণ যদ্‌যদাদিশ্যতে তদেব মদাদেশ ইতি জ্ঞাত্বা ব্যবহর্তব্যং।"

মহাপ্রভুও মিশ্রের আতিথেয়তায় এতই সন্তুষ্ট ছিলেন যে বিনা-দ্বিধায় তাঁহার কাছে তিনি যাচ্ঞা পেশ করিতে পারিতেন। পরমানন্দ-পুরী নীলাচলে আসিলে তিনি কাশী-মিশ্রের আবাসেই তাঁহার জন্য একটি পৃথক ঘর ও সেবকের ব্যবস্থা করিয়া দেন। আবার হরিদাস-ঠাকুর গৌড় হইতে আসিয়া পৌছাইলে মহাপ্রভু তাঁহারও স্থায়িবাসের জন্য কাশী-মিশ্রের নিকট উদ্যানস্থ আর একটি কুটির চাহিয়া লইবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলে

(১) বৈ. ব. (বৃ)—পৃ. ৩ (২) চৈ. চ.—৩।৯, পৃ. ৩৩২ (৩) চৈ. না.—৮।২; চৈ. চ.—২।১০, পৃ. ১৪৮; বৈ.ব.(বৃ.)—পৃ. ৩ (৪) চৈ. না.—৮।৩ (৫) বৈ. ব. (দে).—৪৲ (৬) চৈ. না.—৮।৪৮

মিশ্র কহে সব তোমার মাগ কি কারণ।
আপন ইচ্ছায় লহ—চাহ যেই স্থান ॥৭

প্রথমবার রথযাত্রার কয়েকদিন পূর্বে মহাপ্রভু কাশী-মিশ্র পড়িছা-পাত্র ও সার্বভৌমকে ডাকাইয়া গুণ্ডিচা-মন্দির মার্জনের অনুমতি চাহিলে পড়িছা-পাত্রও রাজ-আজ্ঞার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন[৮] :

আমি সব সেবক তোমার।
যেই তোমার ইচ্ছা সেই কর্তব্য আমার ॥
তোমার যোগ্য সেবা নহে মন্দির মার্জন।

কিন্তু ইহাকে মহাপ্রভুর লীলামাত্র মনে করিয়া তিনি তাঁহার আজ্ঞা লইয়া ভক্তবৃন্দের জন্য একশত ঘট ও শত সম্মার্জনী সংগ্রহপূর্বক গুণ্ডিচা-মার্জন সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন এবং তাহার পর কাশী ও তুলসী উভয়ে মিলিয়া বাণীনাথের সাহায্যে পঞ্চশত ভক্তকে প্রসাদ বিতরণ করিয়া তাঁহাদের তৃপ্তি-বিধান করিয়াছিলেন।

ইহার পর রথযাত্রার দিন সমাগত হইলে কাশী-মিশ্রের উপরই সকল কাজের ভার আসিয়া পড়িল। এই সময়টিতে তাঁহার যেন আহার-নিদ্রারও সময় থাকিত না। একদিকে রাজা প্রতাপরুদ্র এবং অন্যদিকে মহাপ্রভু ও তাঁহার ভক্তবৃন্দ। তাঁহাদের মধ্যে তাঁহাকে সহস্রবার দৌড়াইয়া রাজা ও সন্ন্যাসীর সকল অভিলাষ পূর্ণ করিতে হইল। কাশী-মিশ্রের দায়িত্ব-পালনের প্রভূত শক্তি, কঠোর পরিশ্রম ও সুযোগ্য ব্যবস্থাপনার ফলে অন্য সকল শ্রেণীর দর্শকবৃন্দেরও মনোভিলাষ পূর্ণ হইল।[৯] রথযাত্রার পর হোরাপঞ্চমী-তিথি। কাশী-মিশ্র এই অনুষ্ঠানটিকেও রথযাত্রা অপেক্ষা অধিক জাঁকজমকের সহিত সম্পন্ন করিয়া মহাপ্রভুকে পরম আনন্দ দান করিলেন। মহাপ্রভু ছিলেন নীলাচলের মহামান্য অতিথি এবং নীলাচলের নৃপতি প্রতাপরুদ্র যে যথাযোগ্য আতিথেয়তার দ্বারা সেই মহাপুরুষের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে পারিয়াছিলেন, তাহার কৃতিত্বের মূলে ছিল কিন্তু কাশী-মিশ্র সার্বভৌম-ভট্টাচার্য ও তুলসী-মহাপাত্রের সবিনয় ও নিরলস সেবা-মাধুর্য। মহাপ্রভুও তাহা বিশেষভাবে অবগত ছিলেন। তাই

আপনে প্রতাপরুদ্র আর মিশ্র কাশী।
সার্বভৌম আর পড়িছাপাত্র তুলসী ॥
ইঁহা লৈয়া প্রভু করে নিত্য-রঙ্গ।
দধি দুগ্ধ হরিদ্রা জলে ভরে সবার অঙ্গ ॥১০

কাশী-মিশ্রের রাজানুগত্য প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাকে তিনি চৈতন্যানুরাগের ভিত্তি-প্রস্তররূপেই স্থাপিত করিয়া ভক্তি-সৌধ নির্মাণ করিয়াছিলেন। প্রয়োজন

(৭) চৈ. চ.—২।১১, পৃ. ১৫৩ (৮) ঐ—২।১২, পৃ. ১৫৯ (৯) চৈ. না. (১০) চৈ. চ.—২।১৫, পৃ. ১৭৮

হইলে তিনি রাজার চক্ষুও উন্মীলন করিয়া দিতে সচেষ্ট হইতেন। রাজপুত্র (?) পুরুষোত্তম বড়জানা ও রামানন্দ-ভ্রাতা বাণীনাথের মধ্যে অর্থ-সম্পর্কিত বিরোধ উপস্থিত হইলে তিনি প্রতাপরুদ্রকে তাহার পরিণাম সম্বন্ধে অবহিত করিয়া তাঁহাকে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন।[১১] সেই সময় মহাপ্রভু বিক্ষুব্ধচিত্তে আলালনাথে চলিয়া যাইতে চাহিলে কাশী-মিশ্র তাঁহাকে নানাভাবে প্রবোধিত করার চেষ্টা করেন। তাঁহার তৎকালীন কথাগুলি কী অকৃত্তিতে ভরা![১২]

> তুমি কেন এই বাতে ক্ষোভ কর মনে ॥
> সন্ন্যাসী বিরক্ত তোমার কার সনে সম্বন্ধ।......
> তোমা লাগি রামানন্দ রাজ্য ত্যাগ কৈল।
> তোমা লাগি সনাতন বিষয় ছাড়িল॥
> তোমা লাগি রঘুনাথ সকল ছাড়িল।
> হেথায় তাহার পিতা বিষয় পাঠাইল॥
> তোমার চরণকৃপা হঞাছে তাহারে।
> ছত্রে মাগি খায় বিষয় স্পর্শ নাহি করে॥
> তুমি বসি রহ কেনে যাবে আলালনাথ।
> কেহ তোমা না শুনাবে বিষয়ীর বাত॥

যাহা হউক, এই ব্যাপারে কাশী-মিশ্র রাজার হস্তক্ষেপ ঘটাইয়া মহাপ্রভুই সন্তোষবিধান কারিয়াছিলেন। বস্তুত, চৈতন্য-সেবাই তাঁহার প্রধান কর্তব্য ছিল। তিনি মধ্যে মধ্যে মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভিক্ষা-নির্বাহ করাইতেন। পরমানন্দ-পুরী এবং ব্রহ্মানন্দ-ভারতী প্রভৃতিও বাদ পড়িতেন না।[১৩]

মহাপ্রভুর তিরোভাব-কালে কাশী-মিশ্র বর্তমান ছিলেন।[১৪] শ্রীনিবাস-আচার্যের নীলাচল-আগমনকালে আর তাঁহাকে দেখা যায় নাই।[১৫] নরোত্তম আসিয়া তাঁহার গৃহে গোপীনাথ-আচার্য[১৬] ও গোপালগুরু[১৭] প্রভৃতি ভক্তবৃন্দের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন।

(১১) দ্র.—প্রতাপরুদ্র ও পুরুষোত্তম-বড়জানা (১২) চৈ. চ.— ৩।৯, পৃ. ৩৩২ (১৩) ঐ—৩।১১, পৃ. ৩৪০ (১৪) চৈ. ম. (লো.)—শে. খ., পৃ. ২১১ (১৫) ভ. র.—২।১১৫; প্রে. বি.—১ম. বি পৃ., ৭; মু. বি.-মতে (পৃ. ১৮৭-৯২) বংশীবদনের পৌত্র রামচন্দ্র নীলাচলে আসিয়া তাঁহার সাহায্যে মন্দিরাদি পরিদর্শন করেন। (১৬) ন. বি.—৪র্থ. বি., পৃ, ৪৬ (১৭) ভ. র.—৮।৩৮২

পরমানন্দ-পুরী

কৃষ্ণদাস-কবিরাজ ভক্তিকল্পতরু-বর্ণনা প্রসঙ্গে মাধবেন্দ্র-পুরী এবং ঈশ্বর-পুরীকে ভক্তি-কল্পতরুর অঙ্কুর আখ্যা-দানের পরে বলিয়াছেন :

> পরমানন্দপুরী আর কেশবভারতী।
> ব্রহ্মানন্দ-পুরী আর ব্রহ্মানন্দ-ভারতী॥
> বিষ্ণুপুরী কেশবপুরী পুরী কৃষ্ণানন্দ।
> নৃসিংহানন্দতীর্থ আর পুরী সুখানন্দ॥
> এই নবমূল নিকসিল বৃক্ষমূলে।

এই নয় জনের মধ্যে কেশব-ভারতী ছিলেন মহাপ্রভুর দীক্ষাগুরু। তাঁহার জীবনী পৃথকভাবে লিখিত হইয়াছে। 'ভক্তমালের' লেখক জানাইয়াছেন যে পরম ভক্তিমান বিষ্ণু-পুরী কাশীতে বাস করিতেন এবং পুরুষোত্তমের জগন্নাথ-প্রভুর জন্য তিনি 'বিষ্ণুভক্তি-রত্নাবলী' বা 'ভক্তিরত্নাবলী' বা 'রত্নাবলী' নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।[১] দেবকী-নন্দনও তাঁহার 'বিষ্ণুভক্তিরত্নাবলী'-গ্রন্থ রচনার কথা উল্লেখ করিয়াছেন।[২] উপরোক্ত সন্ন্যাসী-শিষ্যবৃন্দের বাকি সাত জনের মধ্যে পরমানন্দ-পুরী এবং ব্রহ্মানন্দ-ভারতী সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং পরমানন্দ-পুরীকে আবার কৃষ্ণদাস-কবিরাজ 'মধ্যমূল'রূপে আখ্যাত করিয়াছেন। তাঁহারা উভয়েই নীলাচলে মহাপ্রভুর নিকট অবস্থান করিতেন।

পরমানন্দ-পুরীর জন্মস্থান ছিল তিরোতে[৩] (=ত্রিহুতে)। তিনি ছিলেন মাধবেন্দ্র-পুরীর শিষ্য।[৪] মহাপ্রভু যখন তাঁহার দক্ষিণ-ভ্রমণকালে শ্রীরঙ্গ-ক্ষেত্র হইতে ঋষভ পর্বতে গিয়া উপস্থিত হন, তখন 'পরমানন্দ-পুরী তাঁহা রহে চাতুর্মাস।'[৫] মহাপ্রভু সেই কথা শুনিয়া তাঁহার

---

(১) পৃ. ১৪৬ ; ভজন-নির্ণয়কার বলিতেছেন যে মহাপ্রভু পরম বিজ্ঞ বিষ্ণুপুরীকে আজ্ঞাদান করিলে তিনি ভক্তিরত্ন (ভক্তিরত্নাবলী) এবং ভাবার্থপ্রদীপ বা ভাবপ্রদীপ নামে দুইখানি অমূল্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। (২) বৈ. ব.—পৃ.২ ; (৩) চৈ. ভা.—১।২, পৃ.৬২ ; বৈ.দ-মতে (পৃ.৩৫১) 'টোটাগ্রামে' (৪) চৈ. না.—৮।৯ ; চৈ. ভা—৩।৩, পৃ. ২৭২-৭৩ (৫) চৈ. চ.—২।৯, পৃ. ১৪০ ; তু.—চৈ. চ. ম. —১৩।১৪-১৬ ; জয়ানন্দ লিখিয়াছেন যে পরমানন্দের সঙ্গে মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ হয় সেতুবন্ধে (চৈ. ম. —পৃ. ১০০,১০৪)। কিন্তু ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। মুরারি-গুপ্তের 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং'-গ্রন্থে দেখা যায় মহাপ্রভু

> উষিত্বৈবং রঙ্গক্ষেত্রাদ্গচ্ছন্ পথি দদর্শ সঃ।
> শ্রীমাধবপুরীশিষ্যং পরমানন্দনামকম্॥—৩।১৫।১৯

কৃষ্ণদাস ও মুরারি-গুপ্তের গ্রন্থে বর্ণনা-সাদৃশ্য রহিয়াছে। রসময়দাস-রচিত সনাতন গোস্বাঁইর সূচকে (পৃ.৭) লিখিত হইয়াছে যে মহাপ্রভু যখন চটক-পর্বতে পৌঁছান, তখন পরমানন্দ-পুরী সেই স্থলে চাতুর্মাস্য অতিবাহিত করিতেছিলেন।

নিকট গিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। বিপ্র-গৃহে উভয়েই কৃষ্ণ-কথা কহিয়া কয়েকদিন অতিবাহিত করিলেন। পরমানন্দ-পুরী ছিলেন যথার্থ ভক্ত। তাই তিনি গুরুত্বের সকল অভিমান পরিত্যাগ করিয়া চৈতন্য-সমীপে আপনাকে বিলাইয়া দিয়া মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন। বিদায়ের দিন তিনি জানাইলেন যে তিনি নীলাচল হইয়া গঙ্গা-স্নানার্থে যাত্রা করিতেছেন। মহাপ্রভু তখন তাঁহাকে পুনরায় নীলাচলে ফিরিয়া তাঁহার সহিত স্থায়িভাবে বাস করিবার জন্য অনুরোধ জানাইলে তিনি সানন্দে সম্মতি-দান করিয়া নীলাচলাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

নীলাচল হইয়া সম্ভবত বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণের পর নদীতীর-পথে নদীয়ায় পৌঁছাইলে পুরী-গোসাঁই সংবাদ পাইলেন যে গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দ চৈতন্যের নীলাচল-প্রত্যাবর্তন-বার্তা পাইয়া অচিরে শ্রীক্ষেত্রে যাইতেছেন। তিনি শচীমাতা ও চন্দ্রশেখর-আচার্যরত্নের[৬] নিকট ভিক্ষা-নির্বাহ করিয়া কয়েক দিবস নদীয়াতে অতিবাহিত করিলেন এবং গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দের পূর্বেই নীলাচলে চলিয়া যাইতে ইচ্ছুক হইলেন। কমলাকান্ত বা কমলানন্দ[৭] নামে মহাপ্রভুর একজন বাল্য-সঙ্গী ছিলেন। গৌরাঙ্গ তাঁহাকে মুরারি প্রভৃতির ন্যায় ফাঁকি জিজ্ঞাসা করিয়া জব্দ করিতেন।[৮] সম্ভবত তিনি অদ্বৈতপ্রভুর একজন ভক্ত ছিলেন[৯] এবং 'অদ্বৈতমঙ্গল'-গ্রন্থে সম্ভবত তাঁহাকেই ব্রহ্মচারী বলা হইয়াছে।[১০] তবে 'ভক্তিরত্নাকর'-বর্ণিত যে কমলাকান্ত গদাধরদাসপ্রভুর তিরোধান-তিথিতে যোগদান করিয়াছিলেন,[১১] তিনি ঠিক এই কমলাকান্ত কিনা বলা কঠিন।

যাহা হউক, এই দ্বিজ-কমলাকান্তকে সঙ্গে লইয়া পরমানন্দপুরী নীলাচলে আসিয়া মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইলেন।[১২] ক্রমে ব্রহ্মানন্দ-ভারতীও পৌঁছাইলেন। ব্রহ্মানন্দের চিত্ত কিন্তু তখনও অহংকার-শূন্য হয় নাই। সন্ন্যাসের অহংকারেই তিনি তখনও মৃগচর্ম পরিধান করিতেন। মুকুন্দ-দত্ত তাঁহাকে মহাপ্রভুর সম্মুখে আনিলে তিনি ব্রহ্মানন্দকে যেন চিনিয়াও চিনিতে পারিলেন না; মুকুন্দকে বলিলেন যে ঐ ব্যক্তি তো ব্রহ্মানন্দ-ভারতী হইতেই পারেন না; কারণ, 'ভারতী গোসাঞি কেনে পরিবেন চাম,' সে সব বাহ্যবেশ তো প্রকৃত সন্ন্যাসীর জন্য নহে। ব্রহ্মানন্দ স্বীয় দম্ভজনিত ত্রুটির কথা

(৬) চৈ. চ. ম.—১৩।১১৯ (৭) চৈ. চ.—১।১০, পৃ. ৫৪; তু.—চৈ. চ. ম.—১৩।১২৩-২৪ (৮) চৈ. ভা.—১।৬, পৃ. ৩৬; দ্র.—কবিচন্দ্র (৯) শী. চ. (পৃ. ১৮)- ও শী. ক. (পৃ. ৯২)- মতে তিনি অদ্বৈতের চিরানুরাগী ছিলেন। (১০) পৃ. ৫৭ (১১) ৯।৩৯৫ (১২) চৈ. চ.—২।১০, পৃ. ১৪৮; কবিকর্ণপূরের মতে কিন্তু ইহাই মহাপ্রভুর সহিত পরমানন্দ-পুরীর প্রথম মিলন এবং 'পুরীশ্বর' বারাণসী হইতে নীলাচলে আগমন করেন।—চৈ. না.—৮।৯-১২

উপলব্ধি করিয়া চর্মাম্বর ত্যাগ করিলেন। তদবধি ভারতী-গোসাঁই পুরী-গোসাঁইর সহিত নীলাচলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। জীবন একসূত্রে গ্রথিত হইল।

পরমানন্দ এবং ব্রহ্মানন্দ মহাপ্রভুর বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। উৎসবে অনুষ্ঠানে তিনি সর্বদা তাঁহাদের জন্য একটি বিশেষ স্থান নির্দিষ্ট করিয়া রাখিতেন। বিশেষ করিয়া পরমানন্দ-পুরী তাঁহার জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। চৈতন্যের গৌড়-গমনকালে তিনিও সঙ্গী-রূপে গমন করিয়াছিলেন।[১৩] ভক্তবৃন্দ তাঁহার প্রতি মহাপ্রভুর অপরিসীম শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের কথা জানিতেন এবং মহাপ্রভু কখনও কোনও ব্যাপারে অসন্তুষ্ট হইলে তাঁহারা সকলে তাঁহারই শরণাপন্ন হইতেন। মহাপ্রভু ছোট-হরিদাসের প্রতি রুষ্ট হইলে ভক্তগণ তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার জন্য এই পরমানন্দ-পুরীর নিকট আবেদন জানাইয়াছিলেন।

একবার রামচন্দ্র-পুরী নীলাচলে আসিয়াছিলেন। তিনি মাধবেন্দ্র-পুরীর শিষ্য হইয়াও অত্যন্ত রুক্ষ-স্বভাব ছিলেন। তিরোভাব-কালে মাধবেন্দ্র-পুরী যখন মথুরা- ও কৃষ্ণ-প্রাপ্তি না ঘটিবার ব্যথায় ক্রন্দন করিতেছিলেন, তখন রামচন্দ্র গুরুকে পূর্ণব্রহ্মের কথা চিন্তা করিতে উপদেশ দিয়া বিশেষভাবে ভৎসিত হইয়াছিলেন। তদবধি কেবল নিন্দা করিয়া বেড়ানই তাঁহার স্বভাব হইয়াছিল। কিন্তু তিনি শ্রীক্ষেত্রে আসিলে উদার-হৃদয় পরমানন্দ-পুরী তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানান এবং মহাপ্রভুও তাঁহার চরণ-বন্দনা করেন। সেইদিন জগদানন্দ-পণ্ডিতের নিকট ভিক্ষা-নির্বাহ করিয়া রামচন্দ্র জগদানন্দকে প্রসাদ-শেষ দিলেন এবং নিজেই তাঁহাকে আগ্রহ-সহকারে পুনঃ-পুনঃ অনুরোধ করিয়া খাওয়াইলেন। কিন্তু জগদানন্দের আহার শেষ হইলে পরে তিনি জগদানন্দের নজিরে অধিক-ভক্ষণের জন্য সমস্ত চৈতন্য-ভক্তেরই নিন্দা করিতে লাগিলেন। যতদিন এই পরছিদ্রান্বেষী রামচন্দ্র শ্রীক্ষেত্রে অবস্থান করিয়াছিলেন, ততদিন তিনি অনিমন্ত্রণে যত্র তত্র ভোজন করিয়া সকলের নিন্দা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। মহাপ্রভু কিন্তু গুরু বলিয়া কখনও তাঁহার অসম্মান করেন নাই। কিন্তু একদিন চৈতন্যের গৃহে পিপীলিকা দেখিয়া রামচন্দ্র-পুরী সত্যসত্যই তাঁহাকে মিষ্টান্ন-ভক্ষণের অপরাধে ইন্দ্রিয়-ভোগী বলিয়া অভিযুক্ত করিয়া বসিলে মহাপ্রভু ক্ষোভে ও বেদনায় নাম-মাত্র আহারের ব্যবস্থা রাখিয়া একরকম আহার ছাড়িয়াই দিলেন। এইভাবে কয়েকদিন অতিবাহিত হইলে রামচন্দ্র-পুরী আর একদিন আসিয়া মহাপ্রভুকে জানাইলেন যে অর্ধাশনে থাকিয়া শুষ্ক-বৈরাগ্য প্রদর্শন সন্ন্যাসের ধর্ম নহে, বিষয়-ভোগ না করিয়া যথাযোগ্য উদর পূর্ণ করিতে হইবে।

এই ঘটনার পর পরমানন্দ-পুরী কিন্তু স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি মহাপ্রভুর নিকট আসিয়া তাঁহাকে রামচন্দ্রের নিন্দুক-স্বভাবের কথা বলিয়া পূর্ববৎ নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ সনির্বন্ধ

(১৩) চৈ. চ. ম.—১৷১৬; চৈ. না.—৯৷২০; চৈ. চ.—২৷১৬, পৃ. ১৮৮

অনুরোধ জানাইলেন। শেষে রামচন্দ্র-পুরী নীলাচল হইতে চলিয়া গেলে ভক্তবৃন্দও হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

কৃষ্ণদাস-কবিরাজ বলিয়াছেন[১৪] :

নীলাচলে প্রভুর সঙ্গে সব ভক্তগণ।
সবার অধ্যক্ষ প্রভুর মর্ম দুইজন॥
পরমানন্দপুরী আর স্বরূপ দামোদর।

বৃন্দাবনদাসও বলিয়াছেন [১৫] :

দমোদর স্বরূপ পরমানন্দপুরী।
শেষ খণ্ডে এই দুই সঙ্গে অধিকারী॥

নীলাচলে পরমানন্দ-পুরীর এত উচ্চস্থান ছিল। মহাপ্রভু তাঁহাকে একান্ত আপনার জন বলিয়াই মনে করিতেন। লোক-শিক্ষার্থ দৃঢ়ভাব প্রদর্শন করিতে গিয়া তিনি হয়ত অনেক সময়ে তাঁহার উপরোধকে রক্ষা করিতে পারেন নাই; কিন্তু তাই বলিয়া পুরী-গোসাঁই কোনদিন গুরু-জনিত অভিমান করিয়া বসেন নাই। মহাপ্রভুর জীবনের শেষদিনটি পর্যন্ত[১৬] তনি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার জীবনকে স্নেহাভিষিক্ত করিয়াছেন।

চৈতন্য-তিরোভাবের পরে শ্রীনিবাস-আচার্য নীলাচলে আসিয়া পরমানন্দ-পুরীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিয়াছিলেন।

জয়ানন্দ পরমানন্দ-পুরীর লিখিত একটি গ্রন্থের উল্লেখ করিয়া জানাইয়াছেন—"সংক্ষেপে করিলেন তিঁহ গোবিন্দ বিজয়।"[১৭]

(১৪) চৈ. চ.—১।১০, পৃ. ৫৪ (১৫) চৈ. ভা.—৩।৩, পৃ. ২৭৩; দ্র.—চৈ. ভা.—৩।১১, পৃ.৩৪৩ (১৬) প্রে. বি.-মতে (২৪শ. বি., পৃ. ২৪১) বিষ্ণুপ্রিয়া-মাতার খুল্লতাতপুত্র মাধব-আচার্য বৃন্দাবনে গিয়া পরমানন্দ-পুরীর নিকট দীক্ষা-গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাতে মনে হয় পরমানন্দ-পুরী কোনও সময়ে বৃন্দাবনে গমন করিয়াছিলেন। অবশ্য ইহার অন্য প্রমাণ নাই। (১৭) পৃ. ৩

ভবানন্দ-রায়

ভবানন্দ-রায় ছিলেন স্বনামধন্য ভক্তোত্তম রামানন্দ-রায়ের পিতা। তাঁহারা ছিলেন গোদাবরী-তীরস্থ বিদ্যানগরের অধিকারী, উৎকলাধিপতি প্রতাপরুদ্রের অধীনস্থ অধীশ্বর বা প্রদেশপাল।[১] কবিরাজ-গোস্বামী লিখিয়াছেন, "ভবানন্দ রায়ের গোষ্ঠী করে রাজ-বিষয়। নানাপ্রকারে করে তারা রাজদ্রব্য ব্যয়॥" মহাপ্রভু একবার ভবানন্দ-পুত্র গোপীনাথ-পট্টনায়কের আচরণে অসন্তুষ্ট হইয়াই ঐরূপ উক্তি করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে প্রতাপরুদ্রের সহিত তাঁহাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। প্রতাপরুদ্র তো ভবানন্দকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন এবং সেই জন্য একবার রাজপুত্র (?) পুরুষোত্তম গোপীনাথের প্রাণদণ্ডাদেশ দিলে তিনি তাহা রহিত করিয়া দেন। রাজ-সম্মানে ভবানন্দ ও রামানন্দ, 'রায়'-খ্যাতি প্রাপ্ত হন। কিন্তু ভবানন্দের আর চারিটি পুত্র গোপীনাথ, বাণীনাথ, কলানিধি, সুধানিধি[২] —তাঁহারা 'পট্টনায়ক' পদবীতেই অভিহিত হইতেন। 'চৈতন্য'- বা 'গৌর-গণোদ্দেশ'-পুথিগুলিতে দেখা যায় যে পঞ্চভ্রাতার মধ্যে বাণীনাথই ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ এবং রামানন্দ ছিলেন তাঁহাদের মধ্যম ভ্রাতা। কলানিধি, সুধনিধি[২] ও গোপীনাথ ছিলেন যথাক্রমে ভবানন্দ-রায়ের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পুত্র। জাতিতে শূদ্র ছিলেন বটে, কিন্তু মহাপ্রভুর নিকট তাঁহারা পরম-সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নরহরি-চক্রবর্তী একজন ভবানন্দের সংবাদ দিয়াছেন।[৩] তিনি ছিলেন বৃন্দাবনস্থ মধু-পণ্ডিতের সতীর্থ। বীরচন্দ্র-প্রভুর বৃন্দাবন-গমন কালে তিনি তথায় গোপীনাথের একজন সেবক হিসাবে বাস করিতে-ছিলেন। তাহা অনেক পরবর্তিকালের ঘটনা। রামানন্দ-পিতা ভবানন্দ-রায়ের পক্ষে ততদিন বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব ছিল।

---

(১) বৈষ্ণবরস-সাহিত্য-গ্রন্থে খগেন্দ্র নাথ মিত্র মহাশয় লিখিতেছেন "সতীশচন্দ্র রায় লিখিয়াছেন যে ভবানন্দ রায় বিদ্যানগরের অধীশ্বর ছিলেন। মৃণালকান্তি ঘোষ তাঁহার গৌরপদতরঙ্গিণীর ভূমিকায় এই মতের প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন যে রায়-ভবানন্দ যে রাজা ছিলেন তাহার প্রমাণাভাব। মৃণালবাবু সম্ভবত জগন্নাথ বল্লভ নাটকের 'পৃথ্বীরস্ত শ্রীভবানন্দরায়স্ত' লক্ষ্য করেন নাই। কিন্তু ভবানন্দ যে বিদ্যানগরের রাজা ছিলেন, তাহাও প্রমাণিত হয় না।" আবার ভবানন্দ যে বিদ্যানগরের অধীশ্বর ছিলেন, তাহাও অপ্রমাণিত হয় না। অবশ্য তিনি স্বাধীন নৃপতি ছিলেন না। (২) রাধামোহন একটি পদে সম্ভবত আর একজন সুধানিধির উল্লেখ করিয়াছেন :

রাঢ়দেশে সুধানিধি মঙ্গলঠাকুর খ্যাতি
প্রভুপদে সুদৃঢ় বিশ্বাস॥

(৩) ভ. র.—১৩৩২০

মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের পর ভবানন্দ-রায় রামানন্দ ছাড়া আর চারিপুত্রকে সঙ্গে লইয়া নীলাচলে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি ভবানন্দকে 'পাণ্ডু' এবং তাঁহার পত্নীকে 'কুন্তী' ও তাঁহার পাঁচটি পুত্রকে 'পঞ্চপাণ্ডব' আখ্যা প্রদান করেন। ভবানন্দ মহাপ্রভুর চরণে আত্ম-সমর্পণ করিয়া বাণীনাথকে তাঁহার সেবকরূপে গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ জানাইলে তিনি ভবানন্দের ইচ্ছা পূর্ণ করিলেন। তদবধি ভবানন্দ নীলাচলে বাস করিতে থাকেন[৪] এবং বাণীনাথও মহাপ্রভুর সেবায় আত্ম-নিয়োগ করেন। গোবিন্দ কাশীশ্বরাদি সেবক মহাপ্রভুর পার্শ্বচর হিসাবে অবস্থিত থাকায় বাণীনাথের উপর অন্য কাজের ভার পড়িয়াছিল। ভক্তবৃন্দ আসিয়া পৌঁছাইলে গোপীনাথ-আচার্যের সহিত তাঁহাকে তাঁহাদের বাসাদির ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইত।[৫] বিশেষ করিয়া যাহাতে সকলেই যথাসময়ে মহাপ্রসাদ পাইতে পারেন, তাহার প্রতি সর্বদাই তাঁহার সতর্ক দৃষ্টি থাকিত[৬] এবং কখনও তিনি এ বিষয়ে ভুল করিতেন না দেখিয়া মহাপ্রভুও তাঁহার উপর এ বিষয়ে বিশেষভাবেই নির্ভর করিতেন। বস্তুত তিনিই ছিলেন পরিবেশন[৭] ও মহাপ্রসাদ-বিতরণের যোগ্য অধিকারী। স্বয়ং প্রতাপরুদ্রও এ বিষয়ে বাণীনাথের উপর ভারার্পণ করিতেন। মহাপ্রভু গৌড়াভিমুখে যাত্রা আরম্ভ করিলে অন্যান্য ভক্তের দল যখন মহাপ্রভুর জন্য শোকে মুহ্যমান হইয়াছিলেন, তখন এই দীন সেবকটি নিদারুণ মর্মবেদনা সত্ত্বেও তাঁহার কর্তব্য ভুলিয়া যান নাই। মহাপ্রভু মহাপ্রসাদের দ্বারা যতটা পরিতৃপ্ত হইতেন, অন্য কিছুতে ততটা নহেন বলিয়া তিনি তাঁহার সহিত যথেষ্ট মহাপ্রসাদ বাঁধিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

এইরূপ সেবাই বাণীনাথকে একজন শ্রেষ্ঠ-ভক্তে পরিণত করিয়াছিল। মহাপ্রভু তাহা বিশেষভাবে জানিতেন। তাই গোপীনাথকে যখন পুরুষোত্তম-জানা চাঙ্গে উঠাইয়াছিলেন, তখন বাণীনাথ কি করিতেছিলেন, সেই কথাই মহাপ্রভু বিশেষভাবে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু শুনিলেন যে তিনি তখন যথার্থ-ভক্তের ন্যায় নির্ভীক-চিত্তে কৃষ্ণনাম জপ করিতেছিলেন। ইহা শুনিয়া মহাপ্রভু পরম আনন্দিত হইয়াছিলেন। উক্ত ঘটনার অব্যবহিত পরে ভবানন্দ-রায় পঞ্চ-পুত্রকে সঙ্গে লইয়া মহাপ্রভুর চরণে আসিয়া আশ্রয় ভিক্ষা করিলে মহাপ্রভু যখন 'পঞ্চপাণ্ডব'কে আশ্রয় দান করিলেন, তখন গোপীনাথ-পট্টনায়ক প্রার্থনা জানাইলেন[৮]:

রাম রায়ে বাণীনাথে কৈল নির্বিষয়।
সে কৃপা আমাতে নাহি যাতে ঐছে হয়।

(৪) চৈ. চ. ম.—১৩।১২৮-৩২ চৈ. চ.—২।১ পৃ. ৮৮ (৫) চৈ. ম।.—৮।৫৬; চৈ. চ.—২।১১ (৬) চৈ. ম।.—১০।৭২ (৭) চৈ. চ.—২।১২, পৃ. ১৬১ (৮) চৈ. চ.—৩।৯, পৃ. ৩৩৩

বাণীনাথ মহাপ্রভুর হৃদয়ের এক উচ্চস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছিলেন[৯] বলিয়াই তিনি তাঁহাকেও 'নির্বিষয়' করিয়াছিলেন।

নরহরি-চক্রবর্তী জানাইয়াছেন যে মহাপ্রভুর তিরোভাবের পর শ্রীনিবাস[১০] ও নরোত্তম[১১] উভয়েই নীলাচলে আসিয়া বাণীনাথের সাক্ষাৎলাভ করিয়াছিলেন। বাণীনাথের প্রপৌত্র মনোহর তাঁহার 'দিনমণিচন্দ্রোদয়'-[১২]গ্রন্থে সংবাদ দিতেছেন যে গোকুলানন্দ এবং হরিহর নামে বাণীনাথের দুইজন পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

---

(৯) চৈ. ম. (জ.)—পৃ. ১২৬ (১০) ভ. র.—৩।১৮৬ (১১) ন. বি.—৪র্থ. বি., পৃ. ৪৭ (১২) গৌ. জী.—পৃ. ১৮৭-১৮; উক্ত গ্রন্থে আরও সংবাদ আছে যে বাণীনাথের উক্ত পুত্রদ্বয়ের একজনের (সম্ভবত গোকুলানন্দের) পুত্র ছিলেন গোবিন্দানন্দ। ইনিই মনোহরের জনক। ইনি নিজগ্রাম ছাড়িয়া 'কটকে করিলা তিঁহো এক রাজধানী।' কিন্তু উড়িয়া-রাজা ইঁহার জন্য মাত্র সাতখানি গ্রাম রাখিয়া আর সমস্ত কাড়িয়া লইলে ইঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র নিত্যানন্দ-রায় বর্ধমানে চলিয়া আসেন। তখন গোবিন্দানন্দ পরলোকে। কিছুদিন পরে নিত্যানন্দ তাঁহার পরিজনবর্গকে বিদ্যানগরে পাঠাইয়া কনিষ্ঠ মনোহরকেও সঙ্গে লইয়া যাজপুরের রামাই-আনন্দকোল গ্রাম হইতে পারিবারিক বাসস্থান ত্যাগ করিয়া বর্ধমানে আসিয়া স্থায়িভাবে বাস করেন। অল্পকালের মধ্যেই তাঁহারা তাঁহাদের মাতার মৃত্যু-সংবাদ প্রাপ্ত হন। অবশ্য এই সকল বিবরণ অন্য কোনও প্রাচীন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয় নাই। রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও তাঁহার 'রায় রামানন্দ' নামক গ্রন্থে (পৃ. ১৯) এই সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "এই সকল বিবরণ যথার্থ বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে, আমি এমত বলিতে সাহসী নহি। মহদ্বংশ হইতে জাত বলিয়া নিজেকে পরিচিত করিতে প্রয়াস পাওয়া মানুষের পক্ষে অস্বাভাবিক নহে।"

শিখি-মাহিতী

জগন্নাথ মন্দিরের লিখনাধিকারী শিখি-মাহিতী একজন পরম ভক্ত ছিলেন। প্রায় সমস্ত বৈষ্ণব-জীবনী-গ্রন্থে শিখির নাম দৃষ্ট হয়। তাঁহার ভ্রাতা মুরারি-মাহিতীও মহাপ্রভুর একজন ভক্তিমান সেবক ছিলেন।[১] তাঁহাদের ভগিনী 'বৃদ্ধা তপস্বিনী' মাধবী বা মাধুরীদেবী এক মহা 'সাধ্বী ধর্মরতা' বৈষ্ণব-রমণী ছিলেন। ছোট-হরিদাস তাঁহারই নিকট হইতে তণ্ডুল লইয়া গিয়া মহাপ্রভুর নিকট চরম শাস্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর নীলাচল-লীলার সার্ধ তিনজন পাত্রের মধ্যে শিখি-মাহিতী একজন এবং মাধবী অর্ধজন ছিলেন।[২] 'চৈতন্য-চরিতামৃতমহাকাব্য' হইতে জানা যায়[৩] যে শিখি, মাধবী ও মুরারি নীলাচলে তিনভ্রাতা বলিয়া কথিত ছিলেন। প্রথমে মুরারি ও মাধবী তাঁহাদিগের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শিখি-মাহিতীকে চৈতন্য-ভজনে নিয়োজিত করিতে পারেন নাই। কিন্তু একদিন তিনি স্বপ্ন-দর্শনের পর চৈতন্য ও জগন্নাথকে একদেহ বুঝিতে পারিয়া অনুজদ্বয়ের সহিত জগন্নাথ-মন্দিরে গিয়া উপস্থিত হইলে চৈতন্য তাঁহাকে তাঁহার প্রিয়-ভক্ত মুরারির ভ্রাতা বলিয়া চিনিলেন এবং তাঁহাকে আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ করিয়া চিরানুরাগী করিয়া লইলেন।

শিখি-মুরারি-মাধবী সম্বন্ধে[৪] আর বিশেষ কিছু জানিতে পারা যায় না। মহাপ্রভুর তিরোভাবের পর শ্রীনিবাস-আচার্য শ্রীক্ষেত্রে আসিয়া শিখি-মাহিতী ও মাধবীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। নরোত্তম যখন নীলাচলে আসিয়াছিলেন, তখনও শিখি-মাহিতী জীবিত ছিলেন।

(১) বৈ. দ.-মতে (পৃ. ৩৩৮, ৩৪৬) তাঁহাদের বাস ছিল বংশীটোটায় (২) চৈ. চ.—৩।২, পৃ. ২৯৪ (৩) ১৩।৮৯-১০৮ ; বৈ. দি. (পৃ.৫৬), গৌ. জী. এবং বিষ্ণু সরস্বতী প্রণীত 'লীলাসঙ্গী' কাব্যগ্রন্থের কুক্ষিকায় এই বিবরণটি সম্ভবত একটু পল্লবিত হইয়াছে। (৪) ৪০৪ চৈতন্যাব্দের 'গৌরাঙ্গপ্রিয়া'-পত্রিকায় লিখিত হইয়াছে, "মাধবী তপস্বিনী এবং কবিতাকামিনী ও সুপণ্ডিতা ও পদরচনাকর্ত্রী ছিলেন।...মহাপ্রভু...ভক্তবৃন্দকে লইয়া যখন যে কিছু লীলা করিয়াছিলেন, শ্রীমাধবী তাহা চাক্ষুষে দর্শন করিয়া উড়িয়া ও বঙ্গ ভাষায় পদ রচনা করিয়াছেন।" কিন্তু এই সমস্ত তথ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। চৈ. চ.-গ্রন্থে (১।১০, পৃ. ৫৪) মাধবীকে শ্রীরাধার দাসী মধ্যে গণনা করা হইয়াছে।

অনধিক-খ্যাতিসম্পন্ন ভক্তবৃন্দ

কানাই-খুটিয়া, হরিভট্ট, শুভানন্দ, জগন্নাথ-মাহিতী, রামাই, নন্দাই, জনার্দন, চন্দনেশ্বর মুরারি, ওঢ্র-সিংহেশ্বর (হংসেশ্বর ?), জগন্নাথ-মহাসোয়ার, প্রহররাজ-মহাপাত্র, পরমানন্দ-মহাপাত্র, শিবানন্দ, ওঢ্র-কৃষ্ণানন্দ, ওঢ্র-শিবানন্দ প্রভৃতি ভক্ত নীলাচলে মহাপ্রভুর নিকট থাকিতেন। ইঁহারা প্রায় সকলেই দাস্যভাবে মহাপ্রভুর সেবাকার্যে নিযুক্ত হইয়া দিন-যাপন করিতেন। ইঁহাদের কেহ কেহ আবার রাজকর্মচারী ছিলেন এবং জগন্নাথ-মন্দিরে বা অন্যত্র রাজকার্য করিতেন। সম্ভবত ইঁহারা সকলেই নীলাচলবাসী ছিলেন।

কানাই-খুটিয়া, জগন্নাথ-মাহিতী : 'চৈতন্যচরিতামৃতে' বর্ণিত শ্রীক্ষেত্রে প্রথম বৎসরে কৃষ্ণজন্ম যাত্রা-দিনে নন্দমহোৎসব-কালে কৃষ্ণদাস-[১] বা কানাই-খুটিয়া ও জগন্নাথ-মাহিতী যথাক্রমে নন্দ এবং ব্রজেশ্বরীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। জগন্নাথ ও বলরাম নামে কানাইর দুইজন পুত্র ছিলেন।[২] মহাপ্রভুর তিরোভাবের পর শ্রীনিবাস, এবং তাহারও পরে নরোত্তম নীলাচলে গিয়া কানাইর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। কানাই-খুটিয়া নরোত্তমকে জগন্নাথ-মন্দির দর্শন করাইয়াছিলেন। ডা. বিমান বিহারী মজুমদার কানাই-খুটিয়া রচিত 'মহাভাব প্রকাশ' নামক একটি গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন।[৩]

হরিভট্ট, শুভানন্দ : উভয়েই চৈতন্যের নীলাচল-ভক্ত ছিলেন।[৪] শুভানন্দ প্রথম বৎসর মহাপ্রভু-প্রবর্তিত সম্প্রদায়-কীর্তনে যোগদান করিয়াছিলেন। একবার রথযাত্রাকালে নৃত্যকীর্তনরত চৈতন্যের মুখ হইতে ফেন-লালা নির্গত হইতে থাকিলে ইনি তাহা সানন্দে পান করিয়াছিলেন। 'নামামৃতসমুদ্রে' শুভানন্দকে 'বিপ্র' বলা হইয়াছে।

জনার্দন : জগন্নাথ-সেবক জনার্দন 'অনবসরে করে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ সেবন'।

মুরারি, হংসেশ্বর : এই ব্রাহ্মণদ্বয় রাজ-মহাপাত্র ছিলেন।

জগন্নাথ-মহাসোয়ার : দাস-মহাসোয়ার নামে পরিচিত জগন্নাথ-মহাসোয়ার জগন্নাথের মহাসূপকার বা 'রন্ধনশালার অধিকারী' অর্থাৎ পাকশালাধ্যক্ষ ছিলেন।

প্রহররাজ-মহাপাত্র, পরমানন্দ-মহাপাত্র : প্রহররাজ ও তাঁহার সঙ্গী পরমানন্দ প্রভৃতি 'এইসব বৈষ্ণব এই ক্ষেত্রের ভূষণ।'

ওঢ্র শিবানন্দ, ওঢ্র কৃষ্ণানন্দ : শিবানন্দ সম্ভবত দ্বিজ[৫] ছিলেন।

(১) চৈ. ম. (জ.)—পৃ. ১২৬ ; বৈ. ব. (বৃ.)—পৃ. ৫ (২) বৈ. ব. (দে.)—পৃ. ৪ (৩) চৈ. উ.—পৃ. ৬১২ (৪) চৈ. না.—৮।৪৪ ; চৈ. চ.—২।১০, পৃ. ১৫৩, ১৫৫ ; চৈ. চ.—১।১০, পৃ. ৫৩ ; ২।১৩, পৃ. ১৬৪ ; চৈ. না.—১০।৪৪ (৫) ভ. নি.—পৃ. ৬১

রামাই, নন্দাই, শিবাই ঃ—কবিরাজ-গোস্বামী নিত্যানন্দ-শাখা-বর্ণনায় পৃথকভাবে একজন নন্দাই ও একজন শিবাইর উল্লেখ করিয়াছেন। ইঁহারা সম্ভবত নীলাচলের নন্দাই বা শিবানন্দ নহেন। রামাই ও নন্দাই প্রথমে নদীয়াবাসী ছিলেন।[৬] মহাপ্রভু নীলাচলে গেলে তাঁহারাও সেখানে চলিয়া যান এবং সেখানে উভয়েই সর্বদা মহাপ্রভুর পার্শ্বচর গোবিন্দের সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার সেবাযত্ন করিতেন। জ্যেষ্ঠ রামাই খুব বলবান ছিলেন। তাঁহাকে প্রত্যহ বাইশ ঘড়া জল ভরিয়া দিতে হইত। মহাপ্রভুর গৌড়ে আসিবার সময় তাঁহারাও সম্ভবত অন্য ভক্তবৃন্দের সহিত তাঁহার সঙ্গী হইয়াছিলেন।

(৬) ব. শি.—পৃ. ১৮৫, ২২৩ ; তু.—গৌ. ত.—পৃ. ১৬২-৬৩

বাসুদেব-দত্ত

গৌরাঙ্গ-আবির্ভাবের বহু পূর্বেই বাসুদেব-দত্ত চট্টগ্রামে[১] জন্মগ্রহণ করেন। কারণ, বাসুদেব ও মুকুন্দ, এই দত্ত-ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে কনিষ্ঠ মুকুন্দই ছিলেন গৌরাঙ্গ অপেক্ষা বয়সে বড়।[২] তা'ছাড়া গৌরাঙ্গ যাঁহাকে পিতৃ-সম্বোধন করিতেন, সেই পুণ্ডরীক-বিদ্যানিধির সহিত 'এক সঙ্গে মুকুন্দেরও জন্ম চট্টগ্রামে' এবং বাসুদেব ও মুকুন্দ উভয়েই পুণ্ডরীকের তত্ত্ব বিশেষভাবে অবগত হইয়া নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন।[৩]

'চৈতন্যচরিতামৃত'-কার জানান যে ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে মুকুন্দই প্রথমে গৌরাঙ্গ-সঙ্গ লাভ করেন।[৪] ইহাতেও মনে হয় যে বাসুদেবের সহিত শিশু-গৌরাঙ্গের বয়সের বিশেষ পার্থক্য থাকায় উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল পরবর্তিকালে। অবশ্য মুকুন্দের নবদ্বীপ আগমনের পরেও বাসুদেবের নবদ্বীপ আসা বিচিত্র নহে। কিন্তু খুব সম্ভবত গৌরাঙ্গ-আবির্ভাবের বহু পূর্বেই অম্বষ্ঠকুলজাত[৫] এই বাসুদেব-দত্ত নবদ্বীপে আসিয়া অদ্বৈতাচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন[৬] এবং সেই সূত্রেই যে অদ্বৈতের প্রাচীন শিষ্য যদুনন্দন-আচার্যের সহিত বাসুদেবের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়,[৭] তাহাই সম্ভব বলিয়া মনে হয়। 'প্রেমবিলাসে'র দ্বাবিংশ-বিলাস-মতে,[৮] বৃন্দাবনদাসের মাতামহ কর্তৃক তাঁহার 'ভরণ পোষণ' নির্বাহ হইত। সুতরাং বর্ণনা সত্য হইলে ইহাও ধরিতে হয় যে বৃন্দাবনের মাতামহের জীবদ্দশাতে অনুগ্রহপ্রাপ্ত বাসুদেব বেশ কিছুকাল পূর্বেই নবদ্বীপ-সন্নিধানে বাস আরম্ভ করেন এবং সম্ভবত সেই সূত্রেই শ্রীবাসের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা ঘটায় তিনি অদ্বৈত-আচার্যের সহিত যুক্ত হইতে পারিয়াছিলেন। তবে বাসুদেব বোধকরি বিদ্যানিধি প্রভৃতির মত তখনও চট্টগ্রামে যাতায়াত করিতেন। কারণ, তিনি সংসারী ও গৃহস্থ ছিলেন এবং তাঁহাকে সঞ্চয় করিয়া 'কুটুম্বভরণ' করিতেও

---

(১) চৈ. ভা.—১।২, পৃ. ১০ ; প্রে. বি.-এর ২২শ. বি.-অনুযায়ী চট্টগ্রামের চক্রাশালা-গ্রামে সম্ভ্রান্ত অম্বষ্ঠ কুলে বাসুদেবের জন্ম হয়। (২) দ্র.—মুকুন্দ-দত্ত ; চৈ. না. (১০।১১) এবং চৈ. চ. (৩।৬, পৃ. ৩১৮, ৩২০)- মতে রঘুনাথদাসের গুরু যদুনন্দন-আচার্যও বাসুদেবের অনুগৃহীত ছিলেন এবং ভ. নি.-মতে (পৃ. ২৬) বাসুদেব বাৎসল্যভাবেই গৌরাঙ্গ সেবা করিতেন। (৩) চৈ. ভা.—২।৭, পৃ. ১৩২-৩৩ (৪) ২।১১, পৃ. ১৫৫ ; প্রে. বি.-মতে (২২শ. বি.) সম্ভবত একসঙ্গেই দুই ভ্রাতা নবদ্বীপবাসী হন। (৫) বৈ. ব. (দে.)—পৃ. ১ (৬) চৈ. চ.- এবং অ. প্র.-মতে (১০ম. অ., পৃ. ৪০) বাসুদেব অদ্বৈত শাখাভুক্ত। (৭) চৈ. না.—১০।১১ ; চৈ. চ.—৩।৬, পৃ. ৩১৮, ৩২০ (৮) পৃ. ২২২

হইত।[৯] সম্ভবত এই সকল কারণেও গৌরাঙ্গের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংযোগ ঘটে পরবর্তিকালে। 'চৈতন্যভাগবতে' গৌরাঙ্গের বাল্যলীলা বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু সেখানে বাসুদেবের সাক্ষাৎ বড় একটা পাওয়া যায় না। শ্রীবাস-গৃহে কীর্তনারম্ভ-কালে এবং নগর-সংকীর্তনকালে অনেক নামের মধ্যে উপাধি-বিহীন এক বাসুদেবের উল্লেখমাত্র আছে। কিন্তু তিনি বাসুদেব-দত্ত কিনা বুঝিবার উপায় নাই। নরহরি-ভণিতার একটি পদে শ্রীবাস-গৃহে কীর্তনকালে ভক্তবৃন্দের মধ্যে এই কয়েকজনের নাম পাওয়া যায়[১০]—'বাসুদেব শ্রীবাসনন্দন বিজয় বক্রেশ্বর নারায়ণ।' এখানে পাঁচজন পৃথক ব্যক্তির নাম করা হইয়াছে কিনা, কিংবা বিজয় বা বাসুদেব ইঁহাদের একজন শ্রীবাসনন্দন হইবেন কিনা, তাহা সঠিক বলা যায় না। 'চৈতন্যভাগবতে' বাসুদেব-দত্তের স্পষ্ট উল্লেখ পাই গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস-গ্রহণেরও অনেক পরে। 'চৈতন্যচরিতামৃতে'ও ঠিক তাহাই। তবে নবদ্বীপ-লীলাকালেই যে গৌরাঙ্গে তাঁহার বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হন, তাহার উল্লেখও 'চৈতন্যচরিতামৃতে' আছে।[১১] লোচনের 'চৈতন্যমঙ্গলেও' নবদ্বীপ-লীলায় এক উপাধি-বিহীন বাসুদেবের উল্লেখ আছে[১২] বটে, কিন্তু বাসুদেব-দত্তের স্পষ্ট উল্লেখ পাই একেবারে নবদ্বীপ-লীলার শেষভাগে। জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল'[১৩] সম্বন্ধেও মোটামুটি একই কথা বলা চলে।

নবদ্বীপ-লীলার শেষ দিকের একটি ঘটনা চন্দ্রশেখর-আচার্যরত্নের গৃহে নাট্যাভিনয়। 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে' এই অভিনয় বর্ণনায় দেখা যায় :

হরিদাসঃ সূত্রধারো মুকুন্দঃ পারিপার্শ্বিকঃ।
বাসুদেবাচার্যনামা নেপথ্যরচনাকরঃ॥

'গৌরপদতরঙ্গিণী'র উপক্রমণিকায় এবং 'গৌড়ীয় বৈষ্ণবজীবন'-গ্রন্থে বাসুদেব-আচার্য নামক কোনও ব্যক্তির নাম নাই কিংবা গ্রন্থ মধ্যে বাসুদেব-দত্তের জীবনীতেও উক্ত ঘটনার উল্লেখ নাই। পরবর্তী গ্রন্থে একজন বাসুদেব-ভট্টাচার্যের নাম আছে; তিনি কাশীনাথ-পণ্ডিতের বা কাশীশ্বরের জনক। তাঁহার পক্ষে উক্ত অভিনয়ের বেশকারী হওয়া সম্ভব নহে। আবার 'অদ্বৈতমঙ্গল'-গ্রন্থে[১৪] যে বসুদেব-আচার্যের নাম আছে তাহা সম্ভবত অদ্বৈত-জনক কুবেরের পূর্বাবতারের নামমাত্র। সুতরাং উপরোক্ত শ্লোকে মুকুন্দ-দত্তের অব্যবহিত পরে উল্লেখিত বাসুদেবাচার্য বাসুদেব-দত্ত কিনা সেই প্রশ্ন আসিয়া পড়ে। একমাত্র জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে' একজন বাসুদেব-আচার্যের নাম পাওয়া যায়।[১৫] তিনি যে জয়ানন্দ-বর্ণিত শ্রীহট্টবাসী 'বাসুদেব চক্রবর্তী' নহেন, বর্ণনাপাঠে তাহা স্পষ্টই বুঝিতে

(৯) চৈ. চ.—২।১৫, পৃ. ১৭৯ (১০) গৌ. ত.—পৃ. ২৩২ (১১) ২।১৫, পৃ. ১৭৯ (১২) ম. খ., পৃ. ১২৭
(১৩) ন. খ., পৃ, ২৪, ৪৬ (?), ৫৫ (?) (১৪) পৃ. ৯ (১৫) ন. খ., পৃ. ৩৮, ৪৭, ৭২

পারা যায়।[১৬] উপরোক্ত গ্রন্থ দুইটিতে ইঁহার উল্লেখও দৃষ্ট হয় না। 'চৈতন্যমঙ্গল'-অনুযায়ী গৌরাঙ্গের গয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পর যাঁহারা তাঁহার মহানৃত্য প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন বাসুদেব-আচার্য, নন্দন-আচার্য, বনমালী-আচার্য প্রভৃতি। আবার গৌরাঙ্গের বংগদেশ-গমনকালে তাঁহার অসংখ্য সঙ্গীদিগের মধ্যে বাসুদেব-দত্ত, মুকুন্দ-দত্ত, আচার্যরত্ন, বিদ্যানিধি, গঙ্গাদাস, ভগাই, বাসুদেব-আচার্য, চন্দ্রশেখর, গরুড়াই প্রভৃতির নাম আছে। আচার্যরত্নের উল্লেখের কিছুপরে পুনরায় চন্দ্রশেখরের উল্লেখ দেখিয়া বাসুদেব-দত্তের পর বাসুদেব-আচার্যের উল্লেখ সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া যায় না। গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস-গ্রহণের পূর্বে যাঁহাদের সহিত সেই সম্বন্ধে কথা বলিয়াছিলেন, সেই অসংখ্য ভক্তের মধ্যেও নন্দন-আচার্য প্রভৃতির সহিত বাসুদেব-আচার্যের নাম উল্লেখিত হইয়াছে। জয়ানন্দ-প্রদত্ত বিরাট বিরাট তালিকাগুলিও পাঠকদিগকে প্রায়ই বিভ্রান্ত করে। 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে'র বংগানুবাদ 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়-কৌমুদী'-গ্রন্থে চন্দ্রশেখর-গৃহে নাট্যাভিনয়ের বর্ণনায় বাসুদেবাচার্যকে বেশকারী বলা হইয়াছে। কিন্তু উক্ত গ্রন্থের লেখক অন্যস্থলেও[১৭] নবদ্বীপবাসী গৌরাঙ্গ-সুহৃদবৃন্দের মধ্যে বাসুদেব-আচার্যের নাম করিয়াছেন। সেই উল্লেখ এইরূপ :

বিদ্যানিধি বাসুদেবআচার্য মুকুন্দ।
বক্রেশ্বর দামোদর শ্রীজগদানন্দ॥

বাসুদেব-আচার্যের অব্যবহিত পূর্বে বিদ্যানিধির, এবং ঠিক পরেই মুকুন্দের নামোল্লেখ থাকায় ইনি যে স্বয়ং বাসুদেব-দত্ত এ সম্বন্ধে সংশয় থাকেনা। সুতরাং একই গ্রন্থোক্ত মুকুন্দের সহিত উল্লেখিত বেশকারী-বাসুদেবাচার্যও যে মুকুন্দ-ভ্রাতা বাসুদেব তাহাই ধরিতে হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর কবির নিকট তাহা ধরিয়া লইতে বাধা ছিল না। প্রাচীন বৈষ্ণবগ্রন্থে[১৮] অব্রাহ্মণের উপাধি হিসাবে 'আচার্যে'র প্রয়োগও দেখিতে পাওয়া যায়।

'চৈতন্যচরিতামৃতে'র বর্ণনায় সন্ন্যাস-গ্রহণের পর মহাপ্রভু শান্তিপুরে উপস্থিত হইলে একজন বাসুদেব নবদ্বীপ হইতে ভক্তবৃন্দের সহিত আসিয়া মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হন এবং সেখান হইতে মহাপ্রভু নীলাচলে চলিয়া গেলে বিদ্যানিধি, বাসুদেব প্রভৃতি ভক্ত প্রতি বৎসর নীলাচলে গিয়া চারি-মাস করিয়া কাটাইয়া আসিতেন।[১৯] এই দুইটি উল্লেখের মধ্যে প্রথমোল্লেখিত বাসুদেব যে বাসুদেব-দত্ত তাহা জয়ানন্দের গ্রন্থ হইতে জানা যায় পরবর্তী উল্লেখের বাসুদেব, বিদ্যানিধির সহিত যুক্ত থাকায় তাঁহাকেও বাসুদেব-দত্ত বলিয়াই মনে হয়। চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক' এবং 'চৈতন্যচরিতামৃত' এই উভয় গ্রন্থেই গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দের প্রথমবার নীলাচল-গমনকালে মুকুন্দ-দত্তের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এই বাসুদেব-

(১৬) পৃ. ৮ (১৭) পৃ. ১৩ (১৮) দ্র.—কাশীনাথ-পণ্ডিত (১৯) ২।৩, পৃ. ৮৮

দত্তের স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। 'চৈতন্যচরিতামৃতমহাকাব্য' হইতে জানা যায়[২০] যে বাসুদেব ও শিবানন্দ-সেন উভয়েই মহাপ্রভুর জন্য দুই কলসী গঙ্গাজল বহিয়া লইয়া গেলে প্রথমে মহাপ্রভু এক ভাণ্ড জগন্নাথের স্নান-যাত্রার্থ রাখিয়া আর এক ভাণ্ড আপনার জন্য ব্যবহার করিতে রাজী হইয়াছিলেন; কিন্তু পাছে একজন আঘাত-প্রাপ্ত হন, তজ্জন্য তিনি দুইটি ভাণ্ড হইতেই অর্ধেক পরিমাণে গঙ্গাজল গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মুকুন্দের মত বাসুদেবও[২১] চৈতন্যের সংকীর্তন-সঙ্গী ছিলেন এবং তিনি একজন শ্রেষ্ঠ গায়ক হিসাবে বিখ্যাত ও মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দের প্রথমবার নীলাচলে অবস্থানকালেই তিনি একদিন বাসুদেবকে বলিলেন,[২২] 'বাসুদেব যদ্যপি মুকুন্দো মে প্রাক্ সহচরস্তথাপি ত্বমদ্য দৃষ্টোঽপি অতিপ্রাক্ প্রিয়তমোঽসি'। ভক্তিমান বাসুদেবও স্বীয় ভদ্র স্বভাবের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন।[২৩]

বাসুদেব কহে মুকুন্দ আদৌ পাইল তোমার সঙ্গ।
তোমার চরণপ্রাপ্তি সেই পুনর্জন্ম॥
ছোট হৈঞা মুকুন্দ এবে হৈলা মোর জ্যেষ্ঠ।

মহাপ্রভু পূর্ব হইতেই বিদগ্ধ বাসুদেবের প্রেমে তন্ময় হইয়াছিলেন। তাই তাঁহার জন্যই যে তিনি দাক্ষিণাত্য হইতে 'ব্রহ্মসংহিতা' ও 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' নামক দুইটি অমূল্য গ্রন্থ আনয়ন করিয়াছেন,[২৪] তাহার কথা উল্লেখ করিয়া তিনি সর্বসমক্ষে রসবোদ্ধা বাসুদেবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করিয়াছিলেন।

বাসুদেব সম্ভবত সম্প্রদায়-কীর্তনে যোগদান করিয়াছিলেন[২৫] এবং রথযাত্রা উপলক্ষে মহাপ্রভু ভাবাবিষ্ট-চিত্তে তাঁহার অন্তরঙ্গ-সুহৃদ্রূপে একমাত্র এই বাসুদেবকে সঙ্গে লইয়াই এক একটি বৃক্ষতলে উন্মাদের মত নাচিয়া গাহিয়া ছুটিতেছিলেন।[২৬] প্রকৃতপক্ষে, বাসুদেব ছিলেন যেন মহাপ্রভুর এক মহামূল্য সম্পদ। সেই সম্পদকে সযত্নে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার কি আকুলতা! প্রবাদ আছে, অর্ধ-হরিতকী সঞ্চয়ের জন্য মহাপ্রভু সম্ভবত একবার গোবিন্দ-ঘোষকে তিরস্কৃত করিয়াছিলেন। কিন্তু যে ব্যক্তি দিনের আয় দিনান্তে নিঃশেষিত করিয়া ফেলেন, এবং যাহা-কিছু সংগ্রহ করিয়া আনেন, তাহাই পরার্থে বা 'কুটুম্ব ভরণা'র্থে ব্যয়িত করেন, তাঁহার সঞ্চয়-বিধি কোথায়, যে তাঁহার উপর নিষেধের প্রাচীর তুলিতে হইবে! বরং এইরূপ একজন পরহিতব্রতী গৃহীর জন্য সঞ্চয়ের ব্যবস্থাই বিধেয় বুঝিয়া মহাপ্রভু ভক্তবৃন্দের বিদায়ের প্রাক্কালে শিবানন্দ-সেনের উপর বাসুদেবের আয়-ব্যয়ের ভার অর্পণ

(২০) ১৪।৯৮-১০২ (২১) গৌ. গ.—১৪০; তু.—বৈ. ব. (বৃ.) (২২) চৈ. না.—৮।৫৬; দ্র.—চৈ. কৌ.—পৃ. ২৫৬-৫৭ (২৩) চৈ. চ.—২।১১, পৃ. ১৫৫ (২৪) ঐ—২।১১, পৃ. ১৫৫ (২৫) চৈ. চ.—২।১৩, পৃ. ১৬৪ (২৬) ঐ—২।১৪, পৃ. ১৭২

করিয়া তাঁহাকেই তাঁহার 'সরখেল'রূপে নিযুক্ত করিয়া দিলেন[২৭] কিন্তু বাসুদেব তখন যাহা বলিয়াছিলেন তাহাও অপূর্ব। তিনি প্রার্থনা জানাইলেন[২৮] :

জগত তারিতে প্রভু তোমার অবতার।
মোর নিবেদন এক কর অঙ্গীকার॥
করিতে সমর্থ তুমি মহাদয়াময়।
তুমি মনে কর তবে অনায়াসে হয়॥
জীবের দুঃখ দেখি মোর হৃদয় বিদরে।
সব জীবের পাপ প্রভু দেহ মোর শিরে॥

শুনিয়া মহাপ্রভুর 'অশ্রুকম্প স্বরভঙ্গ' হইল। বাসুদেব ভক্তি-মহাসমুদ্রেরই অমৃত-ফলস্বরূপে সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন।

'প্রেমবিলাসের' ত্রয়োবিংশবিলাস-মতে বাসুদেব নবদ্বীপে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, নবদ্বীপ-সন্নিকটে মামগাছিতে তাঁহার একটি ঠাকুর-বাড়ীও ছিল এবং বৃন্দাবনদাস একদা এই ঠাকুর-বাড়ীতে আশ্রয়-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।[২৯] কিন্তু খুব সম্ভবত মহাপ্রভুর নির্দেশানুসারেই বাসুদেব কুমারহট্টে শিবানন্দ-সেনের গৃহ-সন্নিকটে বাস স্থাপন করিয়া তাঁহারই তত্ত্বাবধানে বাস করিতে থাকেন।

মহাপ্রভু বাংলাদেশে আসিয়া কুমারহট্টে শ্রীবাসের গৃহ হইতে শিবানন্দ-ভবনে গমন করিয়াছিলেন। পথিমধ্যে বামপার্শ্বে বাসুদেবের গৃহে যাইবার পথ। মহাপ্রভু দুইটি পথের সংযোগ-স্থলে আসিয়া দাঁড়াইতেই বাসুদেব তাঁহার দ্বিধার ভাব দেখিয়া তাঁহাকে অগ্রে শিবানন্দে-ভবনে পদার্পণ করিবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিলে মহাপ্রভু শিবানন্দ-ভবনে যাত্রা করেন। কিন্তু প্রত্যাবর্তন কালে তিনি বাসুদেবের গৃহে আসিয়া[৩০] 'গুণগ্রাহী অদোষদরশী' বাসুদেবকে চরম সম্মান প্রদর্শন করিয়া জানাইলেন[৩১] :

এ শরীর বাসুদেব দত্তের আমার॥
দত্ত আমা যথা বেচে তথাই বিকাই।
সত্য সত্য ইহাতে অন্যথা কিছু নাই॥
বাসুদেব দত্তের বাতাস যার গায়।
লাগিয়াছে, তারে কৃষ্ণ রক্ষিব সদায়॥
সত্য আমি কহি শুন বৈষ্ণবমণ্ডল।
এ দেহ আমার বাসুদেবের কেবল॥

(২৭) ঐ—২।১৫, পৃ. ১৭৯ (২৮) ঐ—২।১৫, পৃ. ১৮১ ; ১।১০, পৃ. ৫২ ; তু.—চৈ. ভা.—৩।৫, পৃ.২৯৪ (২৯) পৃ. ২২২ (৩০) চৈ. চ.—২।১৬, পৃ. ১৯০ ; চৈ. না.—৯।৩২ (৩১) চৈ. ভা.—৩।৫, পৃ. ২৯৭ ; চৈ. ম. (জ)—বি. খ., পৃ. ১৪২

বাসুদেবের এই সৌভাগ্য ছিল অনন্যলভ্য। 'অদ্বৈতমঙ্গলে'[৩২] 'বাসুদেব দত্ত আর শ্রীযদু-নন্দন'কে মহাপ্রভুর দুই সেনাপতিরূপে বর্ণিত করা হইয়াছে। বাসুদেব প্রতি বৎসর ভক্তবৃন্দের সহিত নীলাচলে গিয়া মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিতেন।[৩৩] তাঁহার একজন পুত্রও নীলাচলে মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাতের সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলেন[৩৪] লোচনদাসের 'চৈতন্য-মঙ্গল' হইতে জানা যায় যে মহাপ্রভুর তিরোভাবকালেও বাসুদেব নীলাচলে উপস্থিত ছিলেন।

বাসুদেব-দত্তের রচিত একটি ব্রজবুলি পদ পাওয়া যায়।[৩৫]

(৩২) পৃ. ৩৮ (৩৩) চৈ. চ.—২।১ পৃ. ৮৮; ৩।১০, পৃ. ৩৩৪ (৩৪) চৈ. না.— ১০।১৮; চৈ. কৌ.—পৃ. ৩৪৫ (৩৫) HBL—p. 465

রামানন্দ-বসু

'চৈতন্যচরিতামৃতে'র কয়েকটি স্থলে সত্যরাজ এবং রামানন্দের নাম একত্রে ব্যবহৃত হইয়াছে। দুইটি স্থলে[১] 'সত্যরাজ রামানন্দ,' অন্য দুইটি স্থলে[২] 'রামানন্দ সত্যরাজ' এবং একটি স্থলে[৩] 'সত্যরাজ বসু রামানন্দ,' এই প্রকার উল্লেখ থাকায় ইঁহাদিগকে এক ব্যক্তি বলিয়াই ধারণা জন্মে। কুলীন গ্রামস্থ কবি মালাধর-বসু তাঁহার 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-কাব্যে স্বীয় রাজদত্ত উপাধি 'গুণরাজ খানে'র কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করায় তদ্বংশীয় রামানন্দ-বসু যে 'সত্যরাজ' উপাধি লাভ করিতে পারেন, ইহারও সম্ভাব্যতা থাকিয়া যায়। কিন্তু 'চৈতন্যচরিতামৃতে'ই লিখিত হইয়াছে[৪] :

কুলীন গ্রামবাসী এই সত্যরাজখান।
রামানন্দ আদি এই দেখ বিদ্যমান ॥

অন্যত্র : তবে রামানন্দ আর সত্যরাজখান।

ইহাছাড়াও, একস্থানে[৫] কেবল 'রামানন্দ বসু'র এবং অন্যত্র[৬] কেবল 'সত্যরাজ' ও 'সত্য-রাজখানে'র নাম উল্লেখিত হইয়াছে। ইহা হইতে ইঁহাদিগের ভিন্নত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। কবিকর্ণপূরও 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'তে এই দুই জনকে দুই ব্যক্তি বলায়[৭] এ সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায়। 'ভক্তমালে'র লেখকও কবিকর্ণপূরকে সমর্থন করিয়াছেন।

'চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে' উক্ত হইয়াছে[৮] যে মহাপ্রভুর দর্শন-প্রার্থী নীলাচল-গামী রামানন্দ ছিলেন কুলীন-গ্রামের গুণরাজ-বংশোদ্ভব। 'চৈতন্যচরিতামৃতে'ও বলা হইয়াছে[৯] যে রামানন্দ আর সত্যরাজখান কুলীন-গ্রামস্থ 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-রচয়িতার বংশোদ্ভূত। ইহা হইতে স্বভাবতঃ প্রশ্ন আসে যে তাহা হইলে গুণরাজখান বা মালাধর-বসুর সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ কিরূপ ছিল। কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ সম্পাদিত (৪০১ চৈতন্যাব্দ) 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' হইতে জানা যায়[১০] যে বর্ধমান জেলার কুলীন-গ্রামবাসী মালধর-বসুর পিতার নাম ছিল ভগীরথ ও মাতার নাম ছিল ইন্দুমতী। মালাধর ১৩৯৫ শকে

(১) ১।১০, পৃ. ৫৩ ; ২।১০, পৃ. ১৪৭ (২) ২।১৩, পৃ. ১৬৪ ; ২।১৪, পৃ. ১৭৭ (৩) ২।১৪, পৃ. ১৭৭ (৪) ২।১১, পৃ. ১৫৩ (৫) ১।১১, পৃ. ৫৬ (৬) ১।১০, পৃ. ৫২, ৩।১০, পৃ. ৩৩৫ (৭) ১৭৩ (৮) ৯।৫ (৯) ২।১৫, পৃ. ১৭৯ (১০) বা. সা. ই. (১ম. সং.)—পৃ. ৮৯-৯০

'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্য আরম্ভ করিয়া ১৪০২ শকে তাহা সমাপ্ত করেন। কবি তাঁহার কাব্যে বলিতেছেন :

গৌড়েশ্বর দিলা নাম গুণরাজখান।
সত্যরাজখান হয় হৃদয় নন্দন।
তারে আশীর্বাদ কর যত সাধুজন।

খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ও তৎসম্পাদিত 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে'র ভূমিকায় জানাইয়াছেন যে কুলজীর প্রমাণ-'অনুসারে মালাধরের বহু পুত্রের মধ্যে সত্যরাজখান অন্যতম।' তৎসম্পাদিত 'পদামৃতমাধুরী'র চতুর্থ খণ্ডের ভূমিকাতেও তিনি জানাইতেছেন, "মহাপ্রভুর প্রায় সমসাময়িক পদকর্তা রামানন্দ বসু কুলীনগ্রামের প্রসিদ্ধ মালাধর বসুর (গুণরাজখানের) পৌত্র এবং সত্যরাজখানের পুত্র।" এই সমস্ত মতানুযায়ী সত্যরাজ যে মালাধরের পুত্র ছিলেন, তাহাই ধরিয়া লইতে হয়। 'চৈতন্যচরিতামৃতে'ও সত্যরাজের প্রাধান্য সূচিত হইয়াছে।[১১] কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় কবিকর্ণপূর সত্যরাজের নামের সহিত পরিচিত থাকিয়াও 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে' তাঁহার নাম উল্লেখ করেন নাই। জয়ানন্দের গ্রন্থেও সত্যরাজকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অন্য বৈষ্ণব-গ্রন্থগুলিতেও রামানন্দ ও সত্যরাজের নাম প্রায় সর্বত্র একত্রে ব্যবহৃত হইলেও রামানন্দের উল্লেখ যেন অধিকতর বলিয়া মনে হয়। কবি গুণরাজখানের যে দুইটি বংশ-লতিকা দেখা যায় তন্মধ্যে কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের মুদ্রিত 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে' প্রদত্ত তালিকাটির মধ্যে রামানন্দকে সত্যরাজখান-উপাধিধারী লক্ষ্মীনারায়ণ বসুর পুত্র বলা হইয়াছে।[১২] সম্ভবত একই কারণে কুলীন-গ্রামের এই বসু-বংশীয় হরিদাস বসু মহাশয়ও তাঁহার 'সদ্‌গুরুলীলা'-গ্রন্থে রামানন্দ-বসুকে সত্যরাজ-খানের পুত্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।[১৩] কিন্তু জয়ানন্দের গ্রন্থে যেই স্থলে কুলীনগ্রামস্থ গুণরাজ-'তনয়ে'র সম্পর্কেই রামানন্দের নাম উল্লেখিত হইয়াছে[১৪] সেই স্থলে সত্যরাজের নামমাত্রও নাই। ইহা হইতে রামানন্দকেও গুণরাজের পুত্র বলিয়া প্রতীতি জন্মে। 'চৈতন্যগণোদ্দেশ' এবং 'গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা' নামক দুইটি পুথিতেও লিখিত হইয়াছে,[১৫]

রামানন্দ সত্যরাজ এই দুই ভ্রাতা

ডাঃ সুকুমার সেন রামগোপাল-দাসের 'চৈতন্যতত্ত্বসার' নিবন্ধ হইতেও ইহার 'সুনিশ্চিত প্রমাণ' দিতেছেন[১৬] :

রামানন্দ সত্যরাজ হএন ভ্রাতা।

রামানন্দ এবং সত্যরাজ উভয়েই চৈতন্য-ভক্ত ছিলেন। বলরামদাসের একটি পদ হইতে

---

(১১) ২।১৫, পৃ. ১৮০ (১২) শ্রীকৃষ্ণ বিজয় (খগেন্দ্র নাথ মিত্র সম্পাদিত)—পৃ. ১/০ (১৩) পৃ. ২০৯ (১৪) উ. খ., পৃ. ৯৫ (১৫) চৈ. গ. (বৃ.)—পৃ. ১২ ; গৌ. দী. (বৃ.)—পৃ. ১৬ (১৬) বা. সা. ই. (অ. সং.)—পৃ. ৪০২

বুঝিতে পারা যায় যে রামানন্দ সম্ভবত গৌরাঙ্গের নবদ্বীপ-লীলায় যুক্ত হইয়াছিলেন।[১৭] 'গৌরপদতরঙ্গিণী'র একটি ভণিতা-বিহীন পদেও বলা হইয়াছে[১৮] যে 'নদীয়ার লোকসব' রামানন্দ-বসু ও শ্রীবাসাদি-বেষ্টিত 'গোরাচাঁদকে' দেখিবার জন্য ছুটিয়া যাইতেছেন। এই গ্রন্থমধ্যে রামানন্দ-ভণিতার আর একটি পদ হইতেও জানা যায়[১৯] যে মহাপ্রভু সন্ন্যাস-গ্রহণ করিলে কবি শোকাকুল হইয়া ক্ষীণতনু হন। এই পদের কবি রামানন্দ-বসু হইতেও পারেন। আবার 'ভক্তিরত্নাকরে' উদ্ধৃত স্বয়ং রামনন্দ-বসু-ভণিতার একটি পদেও দেখা যায় যে নদীয়ায় গৌরাঙ্গ-লীলাকালে কবি 'লুবধ চকোর' হইয়াছিলেন।[২০] 'নবদ্বীপে গৌরাঙ্গের অদ্ভুত বিহার' বর্ণনা প্রসঙ্গে 'ভক্তিরত্নাকর'-প্রণেতা গোবিন্দ-ঘোষের যে একটি পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতেও নরহরি বাসু-ঘোষাদির সহিত রামানন্দকে দেখিতে পাওয়া যায়।[২১] এই সকল কারণে রামানন্দকে মহাপ্রভুর নবদ্বীপলীলা-সঙ্গী বলিয়া ধরিয়া লইতে কোনও বাধা থাকেনা। আবার 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে'ও বলা হইয়াছে যে গৌরাঙ্গ গয়া হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া নবদ্বীপে শ্রীবাস রামানন্দ প্রভৃতি পরিকর-দ্বারা বেষ্টিত হইয়াছিলেন।[২২] সুতরাং অন্তত গৌরাঙ্গের গয়া-গমনকালের কিছু পূর্বেও যে রামানন্দ তাঁহার সঙ্গ-লাভ করিয়াছিলেন তাহা বলা যাইতে পারে। উক্ত গ্রন্থের অন্যত্র রামানন্দ প্রভৃতিকে প্রকারান্তরে চৈতন্যের পূর্ব-পার্ষদ্ বলিয়াও অভিহিত করা হইয়াছে।[২৩] কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, উপরোক্ত উক্তিগুলির কোথাও সত্যরাজের নাম উল্লেখিত হয় নাই। পূর্বোক্ত কুলজী-অনুযায়ী মালাধরের চৌদ্দটি পুত্র, তন্মধ্যে দ্বিতীয় লক্ষ্মীনাথ বসু—উপাধি সত্যরাজখান। যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে বলিতে হয় যে ১৫০২ শক বা ১৫৮০ খ্রী.-এ বসু-কবির গ্রন্থ-সমাপনের পূর্বেই যখন লক্ষ্মীনাথ 'সত্যরাজখান' উপাধিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন তখন ঐ সময় নাগাৎ তাঁহার বয়সও যথেষ্ট হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহারও অন্তত ২৫ বৎসর পরে সত্যরাজ সম্ভবত বৃদ্ধ হইয়া পড়ায় কনিষ্ঠ রামানন্দই তদপেক্ষা অধিকতর সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া হয়ত রামানন্দের কথাই বিশেষভাবে উল্লেখিত হইয়াছে। কিন্তু উল্লেখ না থাকিলেও সত্যরাজ যে নবদ্বীপ-লীলার সহিত কোনও না কোনও ভাবে যুক্ত ছিলেন, তাহাই সম্ভব মনে হয়। কারণ জয়ানন্দের পূর্বোক্ত উল্লেখস্থলে দেখা যায় যে মহাপ্রভু স্বয়ং একবার কুলীন-গ্রামে বসু-গৃহে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাহা ছাড়া, গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দের প্রথমবার নীলাচল-যাত্রাকালেও রামানন্দ এবং সত্যরাজ উভয়কেই নীলাচলে গমন করিতে দেখা যায়।[২৪]

(১৭) গৌ. ত.—পৃ. ১৭৬ (১৮) পৃ. ১৫৯ (১৯) পৃ. ২৫৪ (২০) ১২।৩৪২৯ (৩৪১৭-এর সহিত মিলাইয়া)।
(২১) ১২।২৯৮৫, ২৯৯৮ (২২) ১।৪৫ (২৩) ১০।১৩ (২৪) চৈ.চ.—২।১০, পৃ. ১৪৭; ২।১১, পৃ. ১৫৩

প্রথমবার নীলাচলে গমন করিয়া উভয়েই চৈতন্যের নীলাচল-লীলায় যুক্ত হন। শ্রীখণ্ড ইত্যাদির মত কুলীন-গ্রামও পূর্ব হইতেই বৈষ্ণব-সংস্কৃতির একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিলেন। সেইস্থানের

যদুনাথ, পুরুষোত্তম, শংকর, বিত্তানন্দ ॥
বাণীনাথ বসু আদি যত গ্রামীজন।
সবে শ্রীচৈতন্যভৃত্য চৈতন্য প্রাণধন ॥[২৫]

কবিরাজ-গোস্বামী আরও বলিতেছেন:

কুলীন গ্রামীর ভাগ্য কহনে না যায়।
শূকর চরায় ডোম সেহ কৃষ্ণ গায় ॥

কুলীন-গ্রামের এই সমস্ত ভক্ত মিলিয়া 'কীর্তনীয়া সমাজ'ও গঠন করিয়াছিলেন। রথযাত্রা-কালে কুলীন-গ্রামীদিগের সেই সমাজ লইয়াই রামানন্দ সত্যরাজ প্রভৃতি জগন্নাথ-বিগ্রহ সন্নিকটে সম্প্রদায়-নৃত্যে যোগদান করিয়াছিলেন।[২৬] তারপর, জগন্নাথের পাণ্ডু-বিজয়কালে জগন্নাথের রথের তুলা বাঁধিবার যে পট্টডোরী ছিল তাহা ছিঁড়িয়া যাওয়ায় মহাপ্রভু রামানন্দ সত্যরাজকেই সম্মান দান করিয়া তাঁহাদিগকে সেই পট্টডোরীর[২৭] যজমান করিয়া দিলেন। মহাপ্রভু কর্তৃক আদিষ্ট হওয়ায় ভক্ত-ভ্রাতৃদ্বয় প্রতি বর্ষ গৌড় হইতে নূতন পট্টডোরী প্রস্তুত করিয়া আনিবার ভার সানন্দে মাথায় পাতিয়া মহাপ্রভু-প্রদত্ত ছিন্ন-পট্টডোরী সংগ্রহ করিয়া রাখিলেন।[২৮] তারপর ভক্তবৃন্দের বিদায়কালে চৈতন্য উভয়কে পুনরায় বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন:

প্রত্যব্দ আসিবে যাত্রায় পট্টডোরী লইয়া।
গুণরাজখান কৈল শ্রীকৃষ্ণবিজয়।
তাঁহা এক বাক্য তাঁর আছে প্রেমময় ॥
নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।
এই বাক্যে বিকাইনু তাঁর বংশে হাত ॥
তোমার কা কথা তোমার গ্রামের কুক্কুর।
সেই মোর প্রিয় অন্যজন বহুদূর ॥

রামানন্দ ও সত্যরাজ নিবেদন করিলেন, তাঁহারা গৃহস্থ ও বিষয়ী, তাঁহাদের সাধন-পন্থা কি।

(২৫) ঐ— ১।১০, পৃ. ৫৩ (২৬) ঐ—২।১৩, পৃ. ১৬৪ (২৭) এই পট্টোডোরী সম্বন্ধে আধুনিক কালের যজমান বসুবংশ-সম্ভূত হরিদাস বসু মহাশয় তাঁহার সদগুরুলীলা গ্রন্থে (পৃ. ২১০--১১) লিখিতেছেন, "রথস্থ হইলে পাছে রথ হইতে পড়িয়া যান, এই আশঙ্কায় রথোপরি থাম্বার সহিত এই পট্টডোরীর দ্বারা ঠাকুরকে বন্ধন করিয়া রাখা হয়।......সময় সময় এই পট্টডোরীর দ্বারা ৺ জগন্নাথ দেবকে সাজাইয়া দেওয়া হয়। তিনি ইহা মালাস্বরূপ আপন অঙ্গে ধারণ করেন; দেখিতে বেশ শোভা হয়।" (২৮) চৈ. চ.—২।১৪, পৃ. ১৭৭

মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে এতৎসম্পর্কে নানাবিধ উপদেশ প্রদান করিলে তাঁহারা বিদায় গ্রহণ করিলেন।

রামানন্দ ও সত্যরাজ কিন্তু প্রতি বৎসর পট্টডোরী প্রস্তুত করিয়া নীলাচলে যাইতেন এবং মহাপ্রভুর লীলায় যোগদান করিতেন।[২৯] 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক' হইতে জানা যায় যে একবার রামানন্দ-বসুর পুত্রও নীলাচলে গিয়াছিলেন।[৩০] মহাপ্রভুর তিরোভাবের পরে কিন্তু আর তাঁহাদের কাঁহারও সাক্ষাৎ[৩১] পাওয়া যায়না। 'চৈতন্যচরিতামৃতে' রামানন্দ-বসুকে নিত্যানন্দ-শাখাভুক্ত দেখিয়া মনে হয় যে রামানন্দ সম্ভবত পরবর্তিকালে নিত্যানন্দের ভক্ত হইয়াছিলেন।

রামানন্দ একজন পদকর্তা ছিলেন এবং তিনি ব্রজবুলিতেও পদ রচনা করিয়াছিলেন।[৩২] 'ভক্তিরত্নাকর' হইতে জানা যায় যে দাস-গদাধরপ্রভুর তিরোধান-তিথি-মহামহোৎসব উপলক্ষে বিদ্যানন্দ প্রভৃতি বৈষ্ণবের সহিত বাণানাথ-বসুও কাটোয়ায় গিয়াছিলেন।[৩৩] বিদ্যানন্দ বাণীনাথ-বসু প্রভৃতির নাম একত্রে উল্লেখিত হওয়ায় তাঁহারা কুলীন-গ্রামী বলিয়া অনুমিত হন।

---

(২৯) ঐ—৩।১০, পৃ. ৩৩৫; গৌ. ত.—পৃ. ৩৪; চৈ.না.—৯।৫; ১০।১৩ (৩০) ১০।১৯ (৩১) সী. ক. (পৃ. ১০৪-৫)-মতে গ্রন্থকর্তা অদ্বৈত-পত্নী সীতাদেবীর আদেশে কুলীনগ্রামবাসী রামানন্দের সহিত বাস করিয়াছিলেন। (৩২) HBL—pp.39,40 (৩৩) ৯।৩৯৩

গদাধরদাস

দীন-রামাই-বিরচিত 'চৈতন্যগণোদ্দেশদীপিকা' নামক একটি পুথিতে বলা হইয়াছে[১] যে গদাধরদাস-ঠাকুর আড়্যাদহের শঙ্খবণিক-কুলে জন্মগ্রহণ করেন। অন্যত্র তাঁহার এই কুল-পরিচয়ের বিবরণ না থাকিলেও তিনি যে খড়দহ-সন্নিকটস্থ আড়িয়াদহ-গ্রামে বাস করিতেন, তাহার কথা 'পাটপর্যটন' বা 'পাটনির্ণয়ে' বর্ণিত হইয়াছে। অন্যান্য প্রামাণিক গ্রন্থ হইতেও বুঝিতে পারা যায় যে তিনি পরবর্তিকালে এই স্থানে বাস করিতেন। 'চৈতন্যচরিতামৃতে' তাঁহাকে মহাপ্রভুর এক বিশেষ ভক্তরূপে বর্ণিত করা হইয়াছে। কিন্তু তিনি যে গৌরাঙ্গের বাল্যলীলা-সহচর ছিলেন তাহার কোন উল্লেখই এই গ্রন্থ বা 'চৈতন্যভাগবত' হইতে পাওয়া যায় না। পরবর্তিকালে লিখিত 'কেবল ভক্তিরত্নাকর' ও 'গৌরাঙ্গলীলামৃত'-গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে[২] যে তিনি নবদ্বীপ-লীলায় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। জয়ানন্দের 'চৈতন্য মঙ্গলে'ও গৌরাঙ্গের গয়া-গমন সঙ্গীদিগের একটি বিরাট তালিকা-মধ্যে তাঁহার নাম পাওয়া যায়। কিন্তু ইহা নাম মাত্র। কেবল নরহরি-চক্রবর্তী জানাইয়াছেন যে 'দাস-গদাধর প্রভুপ্রিয় নরহরি'র সহিত গৌরাঙ্গের 'বেশের সামগ্রী সব সজ্জ করি'য়া দিলে তিনি ভুবন-মোহন বেশ ধারণ করিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন। আর লোচনদাস বলিতেছেন যে সন্ন্যাস-গ্রহণান্তে চৈতন্য শান্তিপুরে আসিয়া নৃত্য-কীর্তন আরম্ভ করিলে গদাধরও তৎকালে তাঁহার সহিত যুক্ত হইয়াছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে নরহরি-সরকার এবং গদাধর-পণ্ডিতের সহিতও যে তাঁহার একটি বিশেষ প্রীতির সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিয়াছিল, বিভিন্ন স্থলে তাঁহাদের নামের একত্র-সন্নিবেশ হইতে তাহা অনুমান করা যাইতে পারে।

বৃন্দাবনদাস ও কবিকর্ণপুর গদাধরদাসকে রাধিকা-স্বভাব-প্রাপ্ত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।[৩] কৃষ্ণদাস-কবিরাজ বলেন, "গদাধর দাস গোপীভাবে পূর্ণানন্দ।" এই সকল গ্রন্থকারের সশ্রদ্ধ উল্লেখ হইতে ধারণা জন্মায় যে মহাপ্রভুর সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ছিল নিবিড়। প্রথমবারে গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দ নীলাচলে গমন করিলে তিনিও তৎসহ গিয়া মহাপ্রভুর দর্শনলাভ করেন। চাতুর্মাস্যান্তে মহাপ্রভু রামদাস, গদাধর প্রভৃতিকে নিত্যানন্দের সহিত গিয়া গৌড়ে থাকিবার নির্দেশ দান করিলে গদাধর তাঁহাদের সহিত গৌড়ে চলিয়া আসেন।[৪]

---

(১) পৃ. ৫ (২) ভ. র.—১২।২০১৩, ২০২৫, ২০৬৪, ২৮১৭ ; গৌ. লী.—পৃ. ৪৪ ; তু.—গৌ. ভ. পৃ.২১৭ (৩) চৈ. ভা.—৩।৫, পৃ. ৩০৩ ; গৌ. দী.—১৫৪ (৪) চৈ. চ.—২।১৫, পৃ. ১৭৮ ; ১।১১, পৃ. ৫৫ ; প্রে. বি.—১ম. বি. পৃ. ১২ ; শ্রীচৈ. চ.—৪।২২।১৩ ; তু.—মু. বি.—পৃ. ৪৬

যে-গদাধরদাসকে 'রাধিকা' বা 'রাধাবিভূতিরূপা' এবং 'গোপাভাবে পূর্ণানন্দ'ময় বলা হইয়াছে, তাঁহার পক্ষে তৎকালীন চৈতন্য-লীলাক্ষেত্র নীলাচল-ভূমি পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র থাকা কি প্রকারে সম্ভব হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। কিন্তু কোনরূপ অনুযোগ উত্থাপন না করিয়াও তিনি যে মহাপ্রভুর আদেশ শিরোধার্য করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার সহিষ্ণুতা ও বিপুল ঔদার্যের পরিচয় পাওয়া যায়। বস্তুত, এইরূপ ত্যাগ কেবল গোপীদিগের দ্বারাই সম্ভব। সম্ভবত গদাধর ছিলেন স্বল্পভাষী এবং একরকম সকলের অলক্ষ্যে থাকিয়াই তিনি তাঁহার অভীষ্ট যাত্রাপথ অতিক্রম করিয়া চলিতেন। বৃন্দাবনদাস এবং তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া জয়ানন্দও জানাইতেছেন যে নিত্যানন্দপ্রভুর সহিত গৌড়-গমনকালে পথিমধ্যে গদাধরদাস দধির পসরা মাথায় লইয়া রাধাভাবে নৃত্য করিতে করিতে পথ চলিতেছিলেন। কিন্তু মহাপ্রভুর আদেশ মস্তকে বহন করিয়া তিনি গৌড়ে আসিয়া যে যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা ছিল একান্তই নীরব। নিত্যানন্দপ্রভুর সরব-যাত্রা-সমারোহের মধ্যে তাঁহাকে বড় একটা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

'চৈতন্যভাগবত' হইতে জানা যায়[৫] যে গৌড়ে আসিয়া একদিন নিত্যানন্দপ্রভু পাণিহাটী হইতে গদাধরদাসের গৃহে গিয়া উপস্থিত হন। গদাধরের দেবালয়ে বাল-গোপাল মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। গদাধর তখন বিগ্রহ সম্মুখে গোপীভাবে মগ্ন থাকিতেন এবং মাথায় গঙ্গাজলের কলস লইয়া নিরবধি ডাকিতে থাকিতেন, "কে কিনিবে গো রস।" সেই সময় 'নিত্যানন্দ মল্লরায়' সগণে আসিয়া তাঁহাকে লইয়া 'দানলীলা' আরম্ভ করিলে তখন 'বাহ্য নাহি গদাধর দাসের শরীরে।' রাত্রিতে তিনি ভাবাবেশে গ্রামস্থ মহাদুর্জন কাজীর গৃহে গিয়া তাঁহার হরি-নামোচ্চারণের জন্য জিদ ধরিলে কাজী বলিলেন :

কালিকা বলিবাঙ 'হরি' আজি যাহ ঘর।

কাজীর মুখে হরি-নামোচ্চারণ শুনিয়া গদাধর আনন্দে অধীর হইয়া হাতে তালি দিতে লাগিলেন। দুর্বৃত্ত-কাজী হরিনাম উচ্চারণ করায় শুদ্ধ ও সৎ হইয়া উঠিবেন, ইহাই ছিল গদাধরের একান্ত বিশ্বাস।

এই ঘটনার পর বহুকাল যাবৎ আর গদাধরের কর্মপদ্ধতির কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না, তবে তিনি নীলাচলে গিয়া মহাপ্রভুর দর্শন-লাভ করিতেন এবং প্রিয়বন্ধু গদাধর-পণ্ডিতের সঙ্গলাভ করিয়া আসিতেন।[৬] মহাপ্রভু নীলাচল হইতে গৌড়ে আসিলে গদাধর পাণিহাটীতে রাঘব-ভবনে গিয়া তাঁহার চরণ দর্শন করিয়াছিলেন।[৭] পাণিহাটীর গঙ্গাতীরে রঘুনাথদাসের চিড়াদধি ভোজদান কালেও তিনি তথায় উপস্থিত ছিলেন।

---

(৫) ৩।৫, পৃ. ৩০৭-৮ ; চৈতন্যচরিতামৃত-কার এই ঘটনার সমর্থন করেন।—১।১০, পৃ. ৫২ ; ১।১১, পৃ. ৫৭ ; তু.—অ. বি.—পৃ. ১ (৬) চৈ. ভা.—৩।৯.পৃ. ৩২৯ ; চৈ. কৌ.—পৃ. ৩৪২, ভ..র.—৮।২৮৫ ; ৩।২৮১ (৭) চৈ. ভা.—৩।৫, পৃ. ২৯৯, চৈ. ম. (জ.)—বি. খ., পৃ. ১৪৩

মহাপ্রভুর তিরোভাবের পর কিন্তু আমরা আবার গদাধরের সাক্ষাৎ পাই নবদ্বীপে। সেই সময় প্রাচীন বৈষ্ণবদিগের কেহ কেহ বিষ্ণুপ্রিয়া মাতার রক্ষণাবেক্ষণ ও তাঁহাকে সান্ত্বনা-দানের নিমিত্ত এবং নিজেরাও সান্ত্বনা-লাভার্থী হইয়া নবদ্বীপে বাস করিতেছিলেন। গদাধরও সম্ভবত একই কারণে নবদ্বীপে আসিয়া শ্রীবাস-দামোদরাদির সহিত একত্রবাস আরম্ভ করিয়াছিলেন।[৮] সেই সময় শ্রীনিবাস-আচার্য প্রথমবার নবদ্বীপে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন।[৯] 'অনুরাগবল্লী'তে লিখিত হইয়াছে[১০] যে গদাধরদাসের উদ্দেশ্যে গদাধর-পণ্ডিতের প্রেরিত একটি বার্তা যথাসময়ে জ্ঞাপন করিতে ভুলিয়া যাওয়ায় গদাধরদাস স্বীয় বন্ধু গদাধর-পণ্ডিতের সহিত শেষ সাক্ষাতের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হন এবং তাহার ফলে শ্রীনিবাস গদাধর কর্তৃক ভৎ‍‍র্সিত ও পরিত্যক্ত হইলে পরে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর হস্তক্ষেপে গদাধর শ্রীনিবাসকে ক্রোড়ে তুলিয়া লন।

তৎকালে চৈতন্য-গদাধর বিরহে গদাধরদাসের হৃদয় যেন তুষানলে দগ্ধ হইতেছিল এবং তাঁহার দেহ-মনের উপর এমনি এক উন্মাদনার স্রোত বহিয়া যাইত যে তাঁহার অশ্রু-কম্প-মূর্ছা-বিলাপাদি প্রত্যক্ষ করিয়া প্রত্যেকেই বিস্মিত হইতেন।[১১] কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়া-মাতার জীবৎকালে তিনি নবদ্বীপ ছাড়িয়া আর কোথাও যান নাই। তবে মাতার তিরোভাবে আর তাঁহার পক্ষে নবদ্বীপ-বাসও সম্ভব হয় নাই। তিনি কণ্টকনগরে গিয়া এক গৌরাঙ্গ-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার করেন[১২] এবং তাহাকে অবলম্বন করিয়াই মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতে থাকেন। শ্রীনিবাস-আচার্য যখন প্রথমবারে বৃন্দাবন হইতে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন, তখন তিনি অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় কোনরকম বাঁচিয়াছিলেন মাত্র।[১৩] কিন্তু ইহার কিছু পরে নীলাচলাগত নরোত্তম যখন কণ্টকনগরে আসিয়া পৌছান, তখন তিনি মরণোন্মুখ।[১৪] শিষ্য যদুনন্দন-চক্রবর্তী তখন তাঁহার কর্মভার মস্তকে লইয়াছেন। শ্রীনিবাসের বিবাহকালেও তিনি জীবিত ছিলেন।[১৫] কিন্তু তখন আড়িয়াদহ, নবদ্বীপ, কণ্টকনগর, কোন স্থানই আর তাঁহার পক্ষে সান্ত্বনাদায়ক ছিলনা। অল্পকালের মধ্যেই তিনি ইহধাম ত্যাগ করিলেন।[১৬]

বৎসরান্তে গদাধর-শিষ্য যদুনন্দন-চক্রবর্তী স্বীয় গুরুর তিরোভাব-তিথি উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন। যদুনন্দন ছিলেন 'বিজ্ঞ' ও 'শাস্ত্রে বিচক্ষণ', তিনি উৎসবানুষ্ঠানে কোথাও কোন আয়োজনের ত্রুটি রাখেন নাই। ইতিমধ্যে শ্রীনিবাস-আচার্য বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া

---

(৮) তু.—অ. প্র.—২২শ. অ., পৃ. ১০২ (৯) ভ. র.—৪।৫৮ ; ন. বি.—২য়. বি., পৃ, ১৯ (১০) ২য়. ম., পৃ. ১০-১৩ (১১) ঐ—৩য়. ম, পৃ. ১৪ (১২) ভ. র.—১০।৪২১ ; ন. বি.—৪র্থ. বি., পৃ. ৬৪ ; ৬ষ্ঠ. বি., পৃ. ৮৪ (১৩) ভ. র.—৭।৫২৬-৩২, ৫৯৭ (১৪) ঐ—৮।৪৪৬, ন. বি.—৪র্থ. বি., পৃ. ৬৪-৬৫ (১৫) ভ. র.—৮।৫০৫(১৬) ঐ—৯।৫৪, ৩৭১ ; ন. বি.,—৬ষ্ঠ. বি., পৃ. ৭৩

আসিলে যদুনন্দন তাঁহাকে সমস্ত বিষয় জানাইলেন।[১৭] তৎপূর্বে তিনি এই অনুষ্ঠান-উপলক্ষে সমস্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণবকে নিমন্ত্রণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহারা আসিয়া পৌছাইলে সকলের উপস্থিতিতে তিরোধান-তিথি-মহামহোৎসব সুসম্পন্ন হইল। তাঁহার চেষ্টায় মহাপ্রভুর তিরোভাবের পর এই যে প্রথমবার ভক্ত-মহাসম্মেলন[১৮] ঘটিল, তাহার মধ্য দিয়াই শ্রীনিবাস-নরোত্তম-শ্যামানন্দ কর্তৃক পুনরায় বৈষ্ণব-ধর্মের নব-জাগরণের যে তরঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছিল, তাহারই সুত্রপাত হইয়া গেল।

যদুনন্দনের যোগ্যতা দেখিয়া রঘুনন্দন-ঠাকুর তাঁহার উপর সরকার-ঠাকুরেরও তিরোধান-তিথি-উৎসবের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন।[১৯] তদনুযায়ী যদুনন্দন শ্রীখণ্ডে আসিয়া প্রাথমিক 'সর্বকার্য' সমাধা করিলে মহামহোৎসব সুসম্পন্ন হয়। উৎসবে নরহরি-শিষ্য লোচনদাসের সহিত যদুনন্দন বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন[২০] এবং উৎসব শেষ হইয়া গেলে তিনি কাটোয়ায় প্রত্যাবর্তন করিয়া[২১] পুনরায় ইষ্টদেবের আরব্ধ কার্যে অনন্যমনা হন।

কিছুকাল পরেই খেতুরির মহামহোৎসব উপলক্ষে জাহ্নবাদেবী ভক্তবৃন্দসহ কণ্টকনগরে আসিলে যদুনন্দন তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করেন এবং গৌরাঙ্গের ভোগ লাগাইয়া যথাবিধি অতিথি-সৎকারের পর জাহ্নবাদেবীর প্রসাদপ্রাপ্ত হন।[২২] তাহার পর তিনিও ভক্তবৃন্দের সহিত খেতুরি পৌছাইয়া উৎসবে যোগদান করেন[২৩] এবং উৎসবান্তে বৃন্দাবন-গমনোদ্যতা জাহ্নবা-ঈশ্বরীকে বিদায় দিয়া[২৪] কণ্টকনগরে অবস্থান করিতে থাকেন। জাহ্নবাদেবী বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া কণ্টকনগরে পৌছাইলে তিনি পুনরায় তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন এবং যাজিগ্রাম হইতে শ্রীনিবাসচার্যকে আনয়ন করিয়াছিলেন।[২৫] তারপর সকলেই তাঁহার সংবর্ধনা ও আতিথ্য-গ্রহণ করিয়া কণ্টকনগর হইতে বিদায় গ্রহণ করিলে যদুনন্দন স্বীয় গুরুর মতই নীরবে তাঁহার আদর্শানুসরণে নিবিষ্টচিত্ত হন। কিছুকাল পরে জাহ্নবাদেবী যখন রাধিকা-বিগ্রহ নির্মাণ করাইয়া বৃন্দাবনে প্রেরণ করেন, তখনও বিগ্রহ-বাহী ভক্তবৃন্দ কণ্টকনগরে আসিয়া যদুনন্দন কর্তৃক অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন।[২৬] 'ভক্তিরত্নাকর' হইতে জানা যায়[২৭] যে

(১৭) ভ. র.—৯।৩৫৯-৬৩ (১৮) 'অদ্বৈতপ্রকাশ' (২২শ. অ.—পৃ. ১০০)-মতে নিত্যানন্দ-তিরোধানের পরেও বীরভদ্র 'মহামহোৎসবের উদ্যোগ করাইয়া'ছিলেন। কিন্তু তদুপলক্ষে 'ঘনঘটা' হইয়াছিল কিনা তাহা বর্ণিত হয় নাই। (১৯) ভ.র.—৯।৪৬২, ৪৬৪ (২০) ঐ ৯।৫৯১-৯২ (২১) ঐ—৯।৭৪৬ (২২) ঐ—১০।৪০৯-১০, ন.বি.—৬ষ্ঠ. বি.,পৃ. ৮৪-৮৫ (২৩) ভ.র.—১০।৪২৭; ন. বি.—৬ষ্ঠ. বি., পৃ. ৮৭; ৮ম. বি., পৃ. ১০৮; প্রে. বি.—১৯শ. বি., পৃ. ৩০৯, ৩৩৭ (২৪) ন. বি.—৮ম. বি.—পৃ. ১১২ (২৫) ভ. র.—১১।৬৭৪; ন. বি.—৯ম. বি., পৃ. ১৩৯, ১৪১ (২৬) ভ. র.—১৩।১০৯ (২৭) ১৪।১০০, ১৩৪

বোরাকুলি-গ্রামে গোবিন্দ-চক্রবর্তীর গৃহে রাধাবিনোদ-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠাকালেও যদুনন্দন সেইস্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু এই ঘটনার পর আর কোথাও তাঁহার উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। যদুনন্দন সম্বন্ধে 'ভক্তিরত্নাকরে' যে বর্ণনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা হইতে তাঁহার মহৎ চরিত্রের প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।[২৮]

যদুনন্দনের চেষ্টা পরম আশ্চর্য ॥
দীনপ্রতি দয়া যৈছে কহিল না হয়।
বৈষ্ণবমণ্ডলে যাঁর প্রশংসাতিশয় ॥
যে রচিল গৌরাঙ্গের অদ্ভুত চরিত।
দ্রবে দারু পাষাণাদি শুনি যাঁর গীত ॥

যদুনন্দন-চক্রবর্তী পৃথকভাবে গৌরাঙ্গ-চরিত রচনা করিয়াছিলেন কিনা জানা যায় নাই; কিন্তু তাঁহার সুললিত গীতাবলী বাস্তবিকই মনোমুগ্ধকর। 'ভক্তিরত্নাকরে'র দ্বাদশ তরঙ্গের পদসংগ্রহের মধ্যে তাঁহার যে দ্বাদশটি পদ গৃহীত হইয়াছে[২৯] তন্মধ্যে প্রথম দুইটি ব্রজবুলি ভাষায় রচিত। এই দ্বাদশটি পদের মধ্যে 'যদুনন্দন'- 'যদু'- ও 'যদুনাথদাস'-ভণিতার পদ-দৃষ্টে প্রমাণিত হয় যে তিনি স্থানবিশেষে এই সমস্ত ভণিতাই ব্যবহার করিতেন।

(২৮) ৯।৪৬৪-৬৮ (২৯) ২৮০৩-৩৪৯৭

শিবানন্দ-সেন

কবিকর্ণপূর তাঁহার পিতা শিবানন্দ-সেনকে চৈতন্য-পার্ষদ্ বলিয়া আখ্যাত করিলেও[১] তিনি গৌরাঙ্গের নবদ্বীপলীলা-সঙ্গী ছিলেন কিনা উল্লেখ করেন নাই। কবিরাজ-গোস্বামী নিত্যানন্দ-শাখার মধ্যে যে শিবাই-এর নাম করিয়াছেন, তিনি যদি শিবানন্দ-সেন হইয়া থাকেন, তাহা হইলেও তিনি গৌরাঙ্গের নবদ্বীপলীলা-সঙ্গী ছিলেন কিনা বুঝা যায় না। অন্য কোন প্রাচীন গ্রন্থকারও ঐরূপ কোন বিবরণ রাখিয়া যান নাই। একমাত্র জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে'[২] নবদ্বীপলীলা-বর্ণনা প্রসঙ্গে দুইটি মাত্র স্থলে অসংখ্য নামের সহিত এক বা একাধিক শিবানন্দের নাম দৃষ্ট হয়। কিন্তু তাঁহারা যে শিবানন্দ-সেন তাহার প্রমাণ নাই। অবশ্য শিবানন্দ-ভণিতার একটি পদে লিখিত হইয়াছে[৩] :

গেলা নাথ নীলাচলে এ দাসেরে একা ফেলে
না ঘুচিল মোর ভববন্ধ

পদ-রচয়িতা যদি শিবানন্দ-সেন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের পূর্বে উভয়ের মধ্যে পরিচয় ঘটিয়া থাকিতেও পারে। কিন্তু মহাপ্রভু নীলাচল হইতে গৌড়ে আসিয়া শিবানন্দাদির সহিত মিলিত হইবার পর পুনরায় নীলচলে প্রত্যাবর্তন করিলে শিবানন্দ যে ঐরূপ কবিতা রচনা করিয়া থাকিবেন, তাহারও সম্ভাব্যতা থাকিয়া যায়। 'চৈতন্যভাগবত', 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক' এবং 'চৈতন্যচরিতামৃত' প্রভৃতির প্রত্যেকটি গ্রন্থেই তাঁহার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণেরও পরবর্তিকালে। পরবর্তী আলোচনায় বুঝিতে পারা যাইবে যে যতদূর সম্ভব নীলাচলেই উভয়ের পরিচয় ঘটে। আর মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের পূর্বেও যদি উভয়ের মধ্যে সংযোগ ঘটিয়া থাকে তাহা হইলেও বলা চলে যে সেই সংযোগ তখন এমন ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে নাই যাহাতে শিবানন্দ-সেন গৌরাঙ্গের তৎকালীন পার্ষদরূপে বিশেষভাবে পরিগণিত হইতে পারেন।

'পাটনির্ণয়'-গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে শিবানন্দের নিবাস[৪] ছিল কাঁচড়াপাড়া নিকটবর্তী কুমারহট্ট-গ্রামে। বস্তুত কাঁচড়াপাড়া ও কুমারহট্ট, ইহারা যেন একই বৃহৎ গ্রামের দুইটি অংশ ছিল। প্রাচীন পুথিগুলিতেও উভয়ের নাম একত্রে উল্লেখিত হইয়াছে। কুমারহট্টে

---

(১) চৈ. না.—১।৭, ৮।৪৪ (২) ন. খ., পৃ. ২৯ ; বৈ. খ., পৃ. ৭২ (৩) গৌ. ত.—পৃ. ২৪৮–৪৯ (৪) রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন (বাংলার ইতিহাস—২য়. ভাগ, পৃ. ৩১১) শিবানন্দ 'কুলীন-গ্রামবাসী'; অমূল্যধন রায়ভট্ট বলেন (শ্রীল শিবানন্দ সেনের বংশলতিকা—গৌরাঙ্গ সেবক পত্রিকা, শ্রাবণ, ১৩৩৪), শিবানন্দ কুলীনগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং কাঁচড়াপাড়ায় বিবাহ করিয়া ঐ স্থানে পাট স্থাপন করেন।—এই সকল বিবরণের উৎস সম্বন্ধ কিন্তু কেহ কিছু উল্লেখ করেন নাই।

শিবানন্দের এবং কাঁচড়াপাড়াতে[৫] তাঁহার ভাগিনেয় শ্রীকান্ত-সেনের পাট অবস্থিত হইলেও কোথাও কোথাও শিবানন্দ বা শ্রীকান্তকে কাঁচড়াপাড়া-কুমারহট্ট-নিবাসী বলা হইয়াছে।[৬] কোথাও বা আবার শিবানন্দকেই কাঞ্চনপাড়ার অধিবাসী বলা হইয়াছে।[৭]

শিবানন্দের তিন পুত্র ছিলেন—চৈতন্যদাস, রামাদাস ও পুরীদাস বা কর্ণপূর।[৮] ইঁহারা তিনজনেই মহাপ্রভুর দ্বারা শিক্ষাপ্রাপ্ত[৯] হন। বল্লভ-সেন এবং শ্রীকান্ত-সেনও শিবানন্দের সম্বন্ধে মহাপ্রভুর অনুরাগী ভক্তরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন।[১০] কিন্তু মহাপ্রভুর সহিত তাঁহাদের সকলেরই প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে তাঁহার নীলাচল-গমনের পরে। দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণান্তে মহাপ্রভু নীলাচলে পৌঁছাইলে সেই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া গৌড়-ভক্তবৃন্দ যখন নীলাচল-গমনের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন তখন হইতেই আমরা শিবানন্দের সাক্ষাৎলাভ করি। ভক্তবৃন্দের সহিত শিবানন্দ, বল্লভ এবং শ্রীকান্তও নীলাচলে গিয়া পৌঁছান।[১১] 'চৈতন্যচরিতামৃতে' লিখিত হইয়াছে যে শিবানন্দের সহিত প্রথম দর্শন ঘটিলে

> শিবানন্দে কহে প্রভু তোমার আমাতে।
> গাঢ় অনুরাগ হয় জানি আগে হৈতে॥
> শুনি শিবানন্দ সেন প্রেমাবিষ্ট হৈঞা।
> দণ্ডবৎ হৈঞা পড়ে শ্লোক পড়িয়া॥

তথাহি 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে' [অষ্টমাঙ্ক, ৮০-তম শ্লোক]

> নিমজ্জিতোঽনন্ত! ভবার্ণবান্ত
> শ্চিরায় যে কূলমিবাসি লব্ধঃ।
> ত্বয়াপি লব্ধং ভগবন্নিদানী
> মনুত্তমং পাত্রমিদং দয়ায়াঃ॥

মুদ্রিত গ্রন্থের অষ্টমাঙ্কটি ত্রিসপ্ততি শ্লোকে সমাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে মনে হয় যে কবিকর্ণপূর-কৃত মূল 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে'র অন্তত কিছু অংশ লুপ্ত হইয়াছে। যাহা হউক, উক্ত শ্লোক হইতেও ধারণা জন্মে যে পূর্ব হইতেই মহাপ্রভুর প্রতি শিবানন্দের প্রগাঢ় অনুরক্তি থাকিলেও উভয়ের মিলন ঘটিল এই প্রথম; এবং মহাপ্রভুকে স্পর্শ করিয়াই ভবার্ণবে মজ্জমান শিবানন্দ প্রথম কূলপ্রাপ্ত হইলেন। সম্ভবত এই সময় কিংবা ইহার কিছু পূর্বে শিবানন্দ চতুরক্ষর গৌর-গোপাল মন্ত্রে[১২] দীক্ষালাভ করেন।

ভক্তবৃন্দের চারিমাস যাবৎ নীলাচলে অবস্থানকালে শিবানন্দ-সম্পর্কিত বল্লভ, শ্রীকান্ত

---

(৫) পা. নি. (৬) পা. প. (৭) চৈ. কৌ.—পৃ. ২৭২ (৮) গৌ. দী.—পৃ. ১৪৫ ; গৌ. গ.—পৃ. ৫ ; চৈ. চ.—১।১০, পৃ. ৫২ (৯) চৈ.গ.—পৃ. ৪ (১০) চৈ.চ.—১।১০, পৃ ৫২ (১১) চৈ. না.—৮।৪৪ ; চৈ. চ.—২।১০, পৃ. ১৪৭ ; ২।১১, পৃ. ১৫৩-৫৫ (১২) চৈ. না.—৯।৮

প্রভৃতি ভক্ত চৈতন্য-প্রবর্তিত সম্প্রদায়-নৃত্যে অংশ গ্রহণ করিলেও এই সময়ের মধ্যে শিবানন্দ সম্বন্ধে আর কোনও উল্লেখযোগ্য সংবাদ পাওয়া যায় না। কিন্তু চারি-মাস পরে বিদায়কালে মহাপ্রভু বাসুদেব-দত্তের আয়-ব্যয়ের দেখা-শুনার জন্য শিবানন্দকেই তাঁহার 'সরখেল' নিযুক্ত করিয়া দেন এবং গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দকে প্রতি বৎসর নীলাচলে আনয়ন করিবার গুরুভারও তাঁহার উপর অর্পণ করেন।[১৩] একবার এই শিবানন্দ-সেন ও বাসুদেব-দত্ত মহাপ্রভুর জন্য বাংলাদেশ হইতে দুই কলসী গঙ্গাজল বহিয়া লইয়া গেলে মহাপ্রভু এক কলসী জল জগন্নাথ-বিগ্রহের সেবার্থ সংরক্ষিত রাখিতে বলিয়া উভয়পাত্র হইতেই অর্ধ-পরিমাণ জল গ্রহণ করিয়া উভয়কেই আনন্দদান করিয়াছিলেন।[১৪]

কিন্তু ভক্তির পথে নামিয়াও শিবানন্দ প্রথমে নিঃসংশয় হইতে পারেন নাই। একদিন তিনি 'অম্বুগ্রাম' বা 'অম্বুয়া মুলুকের' নকুল-ব্রহ্মচারী নামক এক কৃষ্ণভক্ত ব্রাহ্মণের[১৫] হৃদয়ে মহাপ্রভুর আবেশের কথা শুনিয়া সন্দেহগ্রস্ত হন এবং তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য তৎসন্নিকটে উপস্থিত হন। কিন্তু তিনি আসামাত্রেই নকুল-ব্রহ্মচারী জানাইলেন যে শিবানন্দ চতুরক্ষর গৌর-গোপাল মন্ত্রগ্রহণ করিয়াছেন।[১৬] ব্রহ্মচারী কি করিয়া সেই সংবাদ জানিলেন তাহা ভাবিয়া শিবানন্দ বিস্মিত হইলেন এবং মহাপ্রভুর শক্তি ও প্রভাব সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় হইলেন।

পরবৎসর যথাকালে শিবানন্দ ভক্তবৃন্দকে লইয়া নীলাচলে যাত্রা আরম্ভ করিলেন।

শিবানন্দ সেন করে ঘাটি-সমাধান॥
সবাকে পালন করি সুখে লঞা যান।
সবার সর্বকার্য করেন দেন বাসস্থান।
শিবানন্দ জানে উড়িয়া পথের সন্ধান॥

'চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক' হইতে জানা যায়[১৭] যে ঐ বৎসর নীলাচল-গমন-পথে এক নিদারুণ বিপত্তি উপস্থিত হইলে শিবানন্দকে এক উড়িয়া অমাত্যের হস্তে বন্দী হইয়া কারারুদ্ধ হইতে হয়। কিন্তু ভাগ্যক্রমে তিনি মুক্তিলাভ করেন। সেই বৎসর বিশিষ্ট ভক্তবৃন্দের পত্নীগণও চৈতন্য-দর্শনে গমন করিয়াছিলেন। শিবানন্দের পত্নীও[১৮] ছিলেন। আর ছিলেন শিবানন্দের জ্যেষ্ঠপুত্র চৈতন্যদাস। তিনি তখন বালকমাত্র। শিবানন্দের কনিষ্ঠ-পুত্র তখনও ভূমিষ্ঠ হন নাই। বালকের নাম চৈতন্যদাস শুনিয়া মহাপ্রভু পরিহাস করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি বালকের সেবায় যথেষ্ট প্রীতিলাভ করিলেন। শিবানন্দ মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভিক্ষা-নির্বাহ করাইতেন। পিতার ইচ্ছা ও দৃষ্টান্তে পুত্র চৈতন্যদাস

---

(১৩) চৈ.চ.—২।১৬, পৃ. ১৭৯ (১৪) চৈ.চ.ম.—১৪।৯৮-১০২ (১৫) চৈ. কৌ.—পৃ. ২৭১ (১৬) চৈ.ম্য়া.—৯।৮; চৈ.চ.—৩।২, পৃ. ২৯২ (১৭) ১০।৫ (১৮) বৈ. দ. (পৃ. ৩৫০)-মতে ইঁহার নাম মালতী।

আয়োজনাদি করিয়া চৈতন্যকে বাসায় আনিলেন এবং 'প্রভু-অভীষ্ট বুঝি আনিল ব্যঞ্জন'।[১৯] মহাপ্রভু তখন বালকের ভক্তিভাব দেখিয়া বিশেষভাবেই সন্তুষ্ট হন এবং বালক চৈতন্যদাস মহাপ্রভুর প্রসাদ প্রাপ্ত হন। এইভাবে সবংশে মহাপ্রভুর সেবা করিয়া শিবানন্দ চাতুর্মাস্যান্তে পুনরায় ভক্তবৃন্দকে লইয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন।

শিবানন্দের ভাগিনেয় শ্রীকান্ত-সেন একবার মহাপ্রভুকে দেখিবার জন্য ভক্তবৃন্দের যাত্রাকালের অপেক্ষা না করিয়াই নীলাচলে গিয়া হাজির হন। মহাপ্রভু এই সরল-স্বভাব যুবকটিকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। তিনি তাঁহাকে দুইমাস নিজের কাছে রাখিয়া বিদায় দেওয়ার সময় বলিয়া দিলেন যে সেই বৎসর আর ভক্তবৃন্দের নীলাচলে যাইবার দরকার নাই, তিনি নিজেই পৌষমাস নাগাৎ গৌড়ে গিয়া অদ্বৈত, শিবানন্দ, জগদানন্দ প্রভৃতির নিকট ভিক্ষা-গ্রহণ করিবেন।[২০] শ্রীকান্ত আসিয়া এই সংবাদ দিলে শিবানন্দ প্রভৃতি ভক্ত মহাপ্রভুর প্রিয় বাস্তক শাক, মোচা প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহাপ্রভুর পক্ষে সেই বৎসর যাত্রারম্ভ করা সম্ভব হয় নাই।[২১]

এদিকে সময় অতিবাহিত হইতে চলিল দেখিয়া শিবানন্দ অস্থির হইলেন। নিকটেই প্রদ্যুম্ন-ব্রহ্মচারী বাস করিতেন। তিনি ছিলেন নৃসিংহ-উপাসক। তাঁহার নৃসিংহ-সেবার একনিষ্ঠতা দেখিয়া সম্ভবত মহাপ্রভুই তাঁহাকে নৃসিংহ-মন্ত্রে দীক্ষা-প্রদান (?) করিয়া তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন নৃসিংহানন্দ।[২২] কিন্তু নৃসিংহ-সেবক হইলেও তিনি চৈতন্য প্রভাবিত হইয়া মধ্যে মধ্যে নীলাচলে গিয়া মহাপ্রভুর দর্শন-লাভ করিতেন।[২৩] শিবানন্দ তৎসমীপে সকল কথা জানাইলে মহাযোগী নৃসিংহানন্দ বলিলেন যে ভক্তের আকৃতিতে ভগবানকে আসিতেই হয়, তিনিই ধ্যান ও আরাধনা করিয়া চৈতন্যকে গৌড়ে আনয়ন করিবেন,[২৪] শিবানন্দ যেন মহাপ্রভুর ভিক্ষা-নির্বাহার্থ প্রস্তুত থাকেন। দুই দিন পরে নৃসিংহানন্দ শিবানন্দের সংগৃহীত দ্রব্যাদি লইয়া জগন্নাথ, নৃসিংহ ও চৈতন্যের উদ্দেশ্যে ভোগ নিবেদন করিয়া জানাইলেন যে চৈতন্য সেই নিবেদিত অন্ন গ্রহণ করিয়াছেন।[২৫] কিন্তু শিবানন্দের মনে খটকা রহিয়া গেল। পরে নীলাচলে গমন করিলে মহাপ্রভু যখন নিজেই নৃসিংহানন্দের অশেষ গুণের কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহার মিষ্টান্ন ও রন্ধনাদির সম্বন্ধে প্রশংসা করিতে লাগিলেন, তখন আর শিবানন্দের মনে কোনও সন্দেহ রহিল না।

বিজয়ার পর মহাপ্রভু গৌড়মণ্ডলে পৌঁছাইলে শিবানন্দ ও জগদানন্দ দিনের বেলায়

(১৯) চৈ. চ.—৩।১০, পৃ. ৩৩৭ (২০) চৈ. চ.—৩।২, পৃ. ২৯২ ; চৈ. না.—৯।৯ (২১) চৈ. না.—৯।১০ (২২) ঐ ; চৈ. চ.—১।১০, পৃ. ৫১ (২৩) চৈ. না.—৮।৪৩ ; চৈ.ভা.—৩।৩, পৃ. ২৭৩, ৩।৯, পৃ. ৩২৬ ; চৈ. চ.—২।১১, পৃ, ১৫৩ ; শ্রীচৈ. চ.—৪।১৭।৬ (২৪) চৈ. না.—৯।১১ (২৫) চৈ. কৌ.—২৮৬

লোকভিড় ভয়ে মহাপ্রভুর মত গ্রহণপূর্বক শেষ রাত্রিতে উঠিয়া তাঁহাকে নৌকাযোগে কাঞ্চনপাড়া ঘাটে আনয়ন করিলেন। তারপর কুমারহট্টে শ্রীবাসের গৃহ হইতে একদিন মহাপ্রভু শিবানন্দের গৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করিলেন। জগদানন্দ সহ শিবানন্দ সেই সময় কদলীস্তম্ভ, পূর্ণকুম্ভ, নবপল্লব আর আলোকসজ্জায় সমগ্র পথ সুশোভিত করিয়া তুলিলেন।[২৬] ভক্ত নৃসিংহানন্দও নগর হইতে পথ সাজাইতে লাগিলেন এবং গ্রাম্য-পথের উপর 'নির্বৃন্তপুষ্পের শয্যা' রচনা করিয়া দিলেন।[২৭] পথের দুই দিকে নানাবিধ মূল্যবান দ্রব্য-সামগ্রী সজ্জিত করিয়া তিনি এইভাবে কানাইর-নাটশালা পর্যন্ত সমগ্র পথই কঠোর পরিশ্রম সহকারে যেন এক স্বর্গীয় শোভায় মণ্ডিত করিলেন। তাঁহার বাসনা ছিল তিনি মথুরা পর্যন্ত সমগ্র পথই এইভাবে সুসজ্জিত করিবেন।[২৮] কিন্তু লোচনদাস জানাইতেছেন যে কানাইর-নাটশালা পর্যন্ত আসিয়া 'সন্ন্যাসীর বৈকুণ্ঠ হৈল লাভ।'[২৯] কৃষ্ণদাস-কবিরাজ মৃত্যুর কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন নাই বটে, কিন্তু ইহার পর তাঁহার গ্রন্থে আর কোথাও নৃসিংহানন্দের উল্লেখ নাই, অন্য কোন গ্রন্থেও নাই। আশ্চর্যের বিষয়, এই পর্যন্ত আসিয়া মহাপ্রভুকেও প্রত্যাবর্তন করিতে হইয়াছিল।

মহাপ্রভু পরে বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে শিবানন্দ পূর্ববৎ ঘাঁটি-সমাধান করিয়া ও কণ্টকতুল্য ঘট্টপালদিগের কর-গ্রহণাদিরূপ বাধাবিঘ্ন দূর করিয়া ভক্তবৃন্দকে নীলাচলে লইয়া চলিলেন। সেই বৎসর[৩০] নাকি একটি কুকুরও তাঁহাদিগের সঙ্গ লইলে শিবানন্দ তাহাকে অনুচ্ছিষ্ট অন্ন ও বাসস্থান প্রভৃতি দিয়া সাদরে সঙ্গে লইয়া চলিলেন। নৌকা পার হইবার সময় উড়িয়া-নাবিক আপত্তি জানাইলে তিনি 'দশপণ কড়ি দিয়া কুকুর পার কৈলা।' কিন্তু শিবানন্দের অনুপস্থিতিতে সেবক একদিন ভাত দিতে ভুলিয়া যাওয়ায় কুকুরটি তাঁহাদের সঙ্গ ত্যাগ করিলে উদ্বিগ্ন শিবানন্দ লোক পাঠাইয়া চতুর্দিকে অনুসন্ধান করিয়াও কুকুরের সাক্ষাৎ পাইলেন না। তিনি দুঃখিত চিত্তে সেইদিন উপবাস করিয়া রহিলেন। কিন্তু যথাকালে সকলে নীলাচলে পৌঁছাইলে দেখা গেল যে কুকুরটি পূর্বেই সেই স্থানে আসিয়া স্বয়ং মহাপ্রভুর সহিত ভাব জমাইয়া তাঁহার নিকট হইতে খাদ্য-সামগ্রী আদায় করিয়া লইতেছে। শিবানন্দ আশ্চর্য হইয়া দূর হইতে কুকুরটিকে দণ্ডবৎ জানাইলেন। কয়েক দিন পরেই কুকুরটি অন্তর্হিত হইল।

(২৬) চৈ. না.—৯।৩২ (২৭) চৈ. চ.—২।১, পৃ. ৮৫ (২৮). শ্রীচৈ. চ.—৩।১৭।৬ ; ৪।২৫।২৯ ; চৈ. ম. (লো.)—পৃ. ১৮৮ (২৯) চৈ.ম.—পৃ. ৮৮ (৩০) চৈ. চ.—৩।১, পৃ. ২৮০ ; চৈ. না. (১০।৩)-মতে কিন্তু এই ঘটনা ঘটে চৈতন্যের মথুরা-গমনেরও পূর্বে। কিন্তু কবিকর্ণপুর-বর্ণিত ঘটনার কাল অনেকস্থলেই নির্ভরযোগ্য নহে। তু.—অ. প্র., ১৯শ. অ., পৃ. ৮২

প্রতি-বৎসর ভক্তবৃন্দের অভিভাবক রূপে তাঁহাদিগকে চৈতন্য-দর্শন করাইয়া আনা যে শিবানন্দের অবশ্য-কর্তব্য ছিল তাহা তখন সর্বজনবিদিত হইয়াছিল। তাই রঘুনাথ-দাস গৃহত্যাগ করিলে তাঁহার পিতা গোবর্ধন রঘুনাথকে নিশ্চয়ই নীলাচলগামী শিবানন্দের সঙ্গ গ্রহণ করিতে হইবে বুঝিয়া শিবানন্দের নিকট পত্র পাঠাইয়া পুত্রের খোঁজ লইয়াছিলেন।[৩১] কিন্তু রঘুনাথ তৎপূর্বেই নীলাচলে চলিয়া যান। পর বৎসর এই গোবর্ধন শিবানন্দের নিকট পলাতক পুত্রের সংবাদ আনাইয়া নীলাচলে লোক পাঠাইতে চাহিলে শিবানন্দ গোবর্ধনের লোকজনকে সঙ্গে লইয়া গিয়া তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়াছিলেন।[৩২]

একবার শিবানন্দ সম্ভবত সপরিবারে পুরীধামে আসিলে মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন যে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া যে পুত্রলাভ করিবেন, তাহার নাম যেন পুরীদাস রাখা হয়। শিবানন্দ তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম চৈতন্যদাস রাখিয়াছিলেন বলিয়া মহাপ্রভু তাহা লইয়া পরিহাস করিয়াছিলেন। সম্ভবত সেই সূত্রেই তিনি পুরীশ্বরকে উপলক্ষ করিয়া শিবানন্দের কনিষ্ঠ পুত্রের নামকরণ করিয়াছিলেন পুরীদাস। কিংবা, শিবানন্দের কনিষ্ঠ পুত্রপ্রাপ্তি ব্যাপারে সম্ভবত পুরীশ্বর অর্থাৎ পরমানন্দ-পুরীর আশীর্বাদ ছিল বলিয়াই তিনি এইরূপ আজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন[৩৩] এবং তদনুযায়ী শিবানন্দও তৃতীয় পুত্রের নাম রাখিয়াছিলেন 'পরমানন্দদাস'। যাহা হউক, পুরীদাস বা পরমানন্দদাস একটু বড়[৩৪] হইয়া উঠিলে শিবানন্দ জ্যেষ্ঠ-পুত্রের মত তাঁহাকেও একবার নীলাচলে আনিয়া চৈতন্য-চরণে স্থাপন করেন।

সেবারেও শিবানন্দ সপরিবারে নীলাচলে যান। চৈতন্যদাস, রামদাস, পরমানন্দদাস তিনজনেই সঙ্গে ছিলেন।[৩৫] শিশু-পুরীদাসকে কোলে করিয়া বহন করা হইয়াছিল।[৩৬] ভাগিনেয় শ্রীকান্তও ভক্তবৃন্দের সহিত যাইতেছিলেন। তাঁহাদের সহিত আর একজন নূতন সঙ্গী ছিলেন—শ্রীনাথ। সেই মধুর-মূর্তি পরম-ভক্তিমান ব্রাহ্মণটিকে স্বয়ং অদ্বৈতপ্রভুই নির্জন-স্থানে চৈতন্য-দর্শন করাইয়া দেওয়ার কথা দিয়া সঙ্গে আনিয়াছিলেন[৩৭] এবং তিনিই ভবিষ্যতে পুরীদাসের গুরু-পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তাঁহার শিষ্যের গ্রন্থদ্বয়ে ('চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক' ও 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'তে) তাঁহাকে কেবল শ্রীনাথ

---

(৩১) চৈ.চ.—৩।৬, পৃ. ৩১৮ (৩২) ঐ ; চৈ.না.—১০।১০ (৩৩) তু.—চৈ. না., ১০।১৯ ; চৈ. কৌ.—পৃ. ৩৪৫ ; চৈ.চ.—৩।১২, পৃ. ৩৪২ (৩৪) বংগদর্শন পত্রিকায় (পৌষ, ১২৮০) 'শ্রীরা' জানাইতেছেন যে কবিকর্ণপুর '১৫২৪ খ্রী.-এ…কাঞ্চনপল্লী নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।'—প্রবন্ধকার বিবরণের উৎস সম্বন্ধে কিছু জানান নাই। (৩৫) চৈ. না.—১০।১৮ ; চৈ. চ. ৩।১২, পৃ. ৩৪১ (৩৬) চৈ. কৌ.—পৃ. ৪০০ (৩৭) চৈ. না., —১০।১৮

বলা হইয়াছে। কবিরাজ-গোস্বামী-বর্ণিত মূলস্কন্ধ-শাখাতে শ্রীনাথ-পণ্ডিত এবং শ্রীনাথ-মিশ্র নামক আরও দুই ব্যক্তির নাম পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে শ্রীনাথ-পণ্ডিত যে কাশীনাথ-পণ্ডিতের সহিত সম্পর্কযুক্ত তাহা কাশীনাথের জীবনী আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়। তবে শ্রীনাথ-মিশ্রের পক্ষে উপরোক্ত শ্রীনাথ হওয়া সম্ভবপর হইতেও পারে। শ্রীনাথ-চক্রবর্তী নামধেয় এক ব্যক্তি তথায় গদাধর-শাখাভুক্তরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। 'চৈতন্যচরিতামৃতে' একই ব্যক্তির বিভিন্ন শাখার মধ্যে উল্লেখিত হইবার দৃষ্টান্ত আছে।[৩৮] অদ্বৈত-গদাধরের মধ্যে এইরূপ ঘটনা স্বাভাবিকও ছিল। এদিকে কর্ণপূরের গুরু শ্রীনাথের সহিত মহাপ্রভুর সংযোগও ঘনিষ্ঠ হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহার পক্ষে মিশ্র ও চক্রবর্তী উভয় উপাধিতেই ভূষিত হওয়া অসম্ভব নাও হইতে পারে। 'প্রেমবিলাসে'র চতুর্বিংশ-বিলাস মতে কর্ণপূর-গুরু শ্রীনাথ-আচার্য বা শ্রীনাথ-চক্রবর্তী অদ্বৈতপ্রভুর নিকট ভাগবত পাঠান্তে তাঁহার মন্ত্রশিষ্য হন এবং সেই শ্রীনাথ-আচার্যই 'শ্রীচৈতন্যশাখা'ভুক্ত ছিলেন।[৩৯] এই বর্ণনাও আপাত-দৃষ্টিতে উপরোক্ত বিবরণকে সমর্থন করিতেছে। 'অদ্বৈতমঙ্গল'-মতে শ্রীনাথ-আচার্য নামক এক দাক্ষিণাত্যবাসী ব্রাহ্মণ সম্ভবত সনাতন-গোস্বামীর পিতা কুমার দেবের সময় হইতেই তাঁহাদের পুরোহিত ছিলেন এবং তিনিও অদ্বৈত-শিষ্য হইয়াছিলেন। বিবরণের মধ্যে ঐতিহাসিক সত্য থাকিতেও পারে। কিন্তু থাকিলেও সেই শ্রীনাথ যে আলোচ্যমান শ্রীনাথ-আচার্য বা শ্রীনাথ-চক্রবর্তী হইতে ভিন্ন ব্যক্তি তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে উপরোক্ত চতুর্বিংশবিলাস-কার সম্ভবত 'অদ্বৈতমঙ্গল'-কারের বর্ণনাকে ঠিক মত অনুধাবন করিতে না পারিয়া বিষয়টিকে জটিল করিয়া তুলিয়াছেন। 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র অদ্বৈত-শাখা-বর্ণন পরিচ্ছেদে কিন্তু কোথাও শ্রীনাথের নাম উল্লেখিত হয় নাই।

যাহাই হউক, একদিন শিবানন্দ ভক্তবৃন্দকে ঘাঁটিতে রাখিয়া কার্যব্যপদেশে একাকী দূরে গমন করিলে সকলে গ্রামের মধ্যে বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিতেছিলেন। কারণ, 'শিবানন্দ বিনা বাসস্থান নাহি মিলে'। এদিকে নিত্যানন্দ 'ভোকে ব্যাকুল হইয়া' শিবানন্দের তিন পুত্রের নামে অভিশাপ দিতে থাকিলে শিবানন্দ-গৃহিণী ক্রন্দন করিতে থাকেন। শিবানন্দ ফিরিয়া আসিয়া সমস্ত শুনিলেন। কিন্তু তিনি ইতিপূর্বে নিত্যানন্দকে গৌরাঙ্গের অগ্রজ বিশ্বরূপের শক্তি-রূপে কল্পনা করিয়া তাঁহার ভক্ত হইয়াছিলেন,[৪০] এবং তাঁহাকে গৌড়ে চৈতন্য-প্রেরিত মঙ্গলদূত বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন। তাই পত্নীকে উদ্দেশ করিয়া

তিঁহো কহে বাউলী কেন মরিস কান্দিয়া।
মরুক আমার তিন পুত্র তাঁর বালাই লইয়া॥

(৩৮) উদাহরণ স্বরূপ, রামদাস গদাধরদাস, মাধব-ঘোষ, বাসু-ঘোষ—চৈ. চ.—১।১১, পৃ. ৫৫
(৩৯) পৃ. ২৩৩ (৪০) গৌ. দী.—৬২-৬৩; ভ. মা.—পৃ. ২৬

এই বলিয়া তিনি নিত্যানন্দের নিকট গমন করিলে নিত্যানন্দ তাঁহাকে পদাঘাত করিলেন। কিন্তু শিবানন্দ উক্ত আচরণকে 'শাস্তি ছলে কৃপা' মনে করিয়া কৃতার্থ বোধ করিলেন এবং সেই মুহূর্তে নিত্যানন্দের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিলে তৎকর্তৃক আলিঙ্গন-বদ্ধ হইলেন।

'চৈতন্যের পারিষদ' শিবানন্দের প্রতি নিত্যানন্দের এই প্রকার ব্যবহারে শিবানন্দের ভাগিনা শ্রীকান্ত অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া একাকী সর্বাগ্রে নীলাচলে চলিয়া যান এবং তথায় মহাপ্রভুর সম্মুখে গিয়া একেবারে 'পেটাঙ্গি গায় করে দণ্ডবৎ নমস্কার'। ভৃত্য গোবিন্দ শ্রীকান্তকে 'পেটাঙ্গি' খুলিয়া প্রণাম করার নির্দেশ দিলে মহাপ্রভু বলিলেন :

শ্রীকান্ত আসিয়াছে পাঞা মনোদুঃখ।
কিছু না বলিহ করুক যাতে ইহার সুখ॥

মহাপ্রভুর এইরূপ অমৃত-নিস্যন্দী বাক্যে শ্রীকান্তের সমস্ত অভিমান কোথায় ভাসিয়া গেল তিনি মহাপ্রভুর নিকট বৈষ্ণবদের নানাবিধ সমাচার জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীনাথ যে শিবানন্দের সহিত না আসিয়া অদ্বৈতপ্রভুর সঙ্গ লইয়াছেন, তাহাও বলিলেন; কিন্তু উপরোক্ত ঘটনাটির উল্লেখমাত্র করিলেন না। এদিকে শিবানন্দ নীলাচলে পৌছাইয়া তাঁহার তিনটি পুত্রকেই মহাপ্রভুর নিকট লইয়া গেলেন। মহাপ্রভু পূর্বেই দুইজনকে দেখিয়াছিলেন, কিন্তু কনিষ্ঠটিকে এই সর্বপ্রথম দেখিয়া তাঁহার সম্বন্ধে কৌতূহলী হইলেন এবং কৌতুক করিয়া পুরীশ্বরকে বলিলেন "স্বামিন্ তব দাসঃ।"[৪১] এই সময়ে শিশু-পুরীদাস মহাপ্রভুর চরণাঙ্গুষ্ঠ মুখে পুরিয়া তাঁহার প্রতি আজন্ম-অনুরাগের পরিচয় প্রদান করেন।[৪২] পরে মহাপ্রভু গোবিন্দকে বলিয়া দিলেন :

শিবানন্দের প্রকৃতি পুত্র যাবৎ হেথায়।
আমার অবশেষ পাত্র তারা যেন পায়॥

এইবারে শ্রীনাথের সহিতও মহাপ্রভুর ঘনিষ্ঠ সংযোগ সাধিত হয়।[৪৩] অদ্বৈতপ্রভু শ্রীনাথকে দিয়াই চৈতন্য-পূজার উপকরণ বহাইয়া লইয়া গেলে :

শ্রীনাথঃ স তদা প্রভোর্গুণনিধেঃ সন্দর্শন-স্পর্শন-
প্রেমালাপকৃপাকটাক্ষকলয়া পূর্ণান্তরোঽজায়ত॥

এবং মহাপ্রভুর নিকট হইতে শ্রীনাথের এই কৃপালাভই সম্ভবত মহাপ্রভুর অশেষ কৃপা প্রাপ্ত শিশু-পুরীদাসের গুরুত্ব-পদের ভূমিকা-স্বরূপ হইয়া গেল।

আরও একবার শিবানন্দ তাঁহার পত্নীকে সঙ্গে লইয়া-চৈতন্য-দর্শনে গিয়াছিলেন, সঙ্গে

---

(৪১) চৈ. না.—১০।১৮-১৯ (৪২) চৈ. চ.—৩।১২, পৃ. ৩৪২ ; চৈ. কৌ.—পৃ. ৪০০ ; গৌ. ত.—পৃ. ৩১৪ (৪৩) চৈ. না.—১০।১৮, ৪৫

পুরীদাসও ছিলেন। তখন তিনি সপ্তবর্ষবয়স্ক।[৪৪] শিবানন্দ পুত্রকে দিয়া মহাপ্রভুর চরণ-বন্দনা করাইলে মহাপ্রভু তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে বলিলেও বালক নীরব থাকিলেন। কিন্তু আর একদিন মহাপ্রভু পুরীদাসকে পড়িতে বলিলে সপ্তবর্ষবয়স্ক বালক কৃষ্ণস্তুতিযুক্ত এক অপূর্ব শ্লোক গ্রথিত করিয়া সকলকে স্তম্ভিত করিয়া দেন।[৪৫]

সম্ভবত ইতিমধ্যে শ্রীনাথের নিকট পুরীদাসের পাঠ আরম্ভ হইয়াছিল। শ্রীনাথ ছিলেন পণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি ভাগবত-সংহিতার ব্যাখ্যা[৪৬] রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহারই অধ্যাপনায় পুরীদাস সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন। পুরীদাসের পক্ষে শ্রীনাথের সাহচর্য-লাভেও কিছু অসুবিধা ছিল না। কারণ, শ্রীনাথ কুমারহট্টেই বাস করিতেন এবং সেইস্থানে তিনি কৃষ্ণদেব-বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন।[৪৭] পরে সম্ভবত সেই বিগ্রহই কৃষ্ণরায় নাম প্রাপ্ত হইয়া কবিকর্ণপূর কর্তৃক সেবিত হইতে থাকে।[৪৮]

শিবানন্দের শেষ-জীবনের সংবাদ কোথাও বড় একটা পাওয়া যায় না। 'ভক্তিরত্নাকর'[৪৯] ও 'গৌরপদতরঙ্গিণী'র কয়েকটি পদে 'শিবানন্দদাস-', 'শিবানন্দ'- বা 'শিবাই'-ভনিতা দেখিতে পাওয়া যায়। পদগুলি যে কোন্ শিবানন্দের তাহা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। তবে 'গৌরপদতরঙ্গিণী'-ধৃত পূর্বোক্ত পদটি[৫০] যে শিবানন্দ-সেনের তাহা একরকম ধরিয়া লইতে পারা যায়।

কিন্তু শিবানন্দের পুত্র কবিকর্ণপূরের কবি-কৃতি ছিল সুপ্রসিদ্ধ। বাংলা ও ব্রজবুলি উভয় ভাষাতেই তিনি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন।[৫১] উদ্ধবদাস একটি পদে[৫২] জানাইতেছেন যে কবিকর্ণপূর 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় স্তবাবলী গ্রন্থচয়' রচনা করিয়াছিলেন। আবার চৈতন্য-তিরোভাবের পরে কবিকর্ণপূর উড়িষ্যাধিপতি প্রতাপরুদ্রের আজ্ঞাতেই তাঁহার সুবিখ্যাত 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক' রচনা করেন।[৫৩] গ্রন্থের সমাপ্তি-সূচক শ্লোকটি

---

(৪৫) চৈ. চ.—৩।১৬, পৃ. ৩৫৯ ; গৌ. ত.—পৃ. ৩১৪ ; চৈ. কৌ.—পৃ. ৪০১ (৪৫) চৈ. চ.—৩।১৬, পৃ. ৩৫৮-৫৯ ; গৌ.ত.—পৃ. ৩১৪ ; অ.প্র.-মতে (১৯শ. অ., পৃ. ৮২)

অতিবাল্যে সর্ব শাস্ত্রে হইল স্ফুরণে ॥
কবিকর্ণপূর নামে হৈলা তিঁহো খ্যাতি।

(৪৬) গৌ. দী.—২১১ ; প্রে. বি.-মতে (২৪শ.বি., ২৩৩) : চৈতন্য-মত-মঞ্জুষা ভাগবতের টীকা কৈল সেহ। (৪৭) গৌ. দী.—২১১ ; প্রে. বি.—২৪শ. বি., পৃ. ২৩৩ ; বৈ. দ.-মতে (পৃ. ৩৪৮-৪৯) তিনি কৃষ্ণরায়-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া শিবানন্দকে সমর্পণ করিয়াছিলেন। (৪৮) চৈ. কৌ. পৃ. ২৭২ (৪৯) ১২।৩৩৪৯ (৫০) পৃ. ২৪৯ (৫১) প. ক. (প.)—পৃ. ১৪৭ (৫২) গৌ. ত.—পৃ. ৩১৪(৫৩) চৈ. না.—১০।৪,৭

হইতে জানা যায় যে ১৪৯৪ শকে বা ১৫৭২ খ্রী.-এ এই নাটকের রচনা সমাপ্ত হয়।[৫৪] ১৩২৮ সালের 'বংগবাণী'-পত্রিকার চৈত্র-সংখ্যায় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছিলেন, "কবিকর্ণপূর ১৫৭২ খ্রী.-এ সংস্কৃত ভাষায় 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক' ও 'চৈতন্যচরিতামৃত-মহাকাব্য' এই দুই পুস্তকই সমাধা করেন; এই দুই পুস্তক প্রকাশের এক বৎসর পর কৃষ্ণদাস-কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' প্রকাশিত হয়।" এই শেষোক্ত তথ্য দুইটি কিন্তু সত্য-সম্বন্ধহীন। কিন্তু ১৩৪২ সালের 'বংগীয় সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা'য় 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকের রচনাকাল' নামক প্রবন্ধে ডা. বিমানবিহারী মজুমদার প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে ১৫৪০ খ্রী.-এর পূর্বেই নাটকটি রচিত হইয়াছিল। আবার বিমানবাবুর আভ্যন্তরীণ প্রমাণাবলীর উল্লেখ করিয়াও ডা. সুশীলকুমার দে মহাশয় জানাইতেছেন,[৫৫] "There is nothing to throw doubt on the genuineness of this colophon verse."

এই গ্রন্থ রচনার পর কবিকর্ণপূর কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির বারংবার অনুরোধক্রমে 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা' রচনা করেন।[৫৬] ১৪৯৮ শক বা ১৫৭৬ খ্রী.-এ এই গ্রন্থ সমাপ্ত হয়।[৫৭] কোন কোন পুথি অনুযায়ী ইহার রচনাকাল ১৫৪৫ খ্রী.। ডা. সুকুমার সেন এই তারিখটিকেই 'সঙ্গত' মনে করেন।[৫৮] ইহা ছাড়াও কর্ণপূর 'আর্যাশতক'[৫৯] 'আনন্দ-বৃন্দাবনচম্পূ' 'অলংকার কৌস্তুভ'[৬০] 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতমহাকাব্য' 'কৃষ্ণাহ্নিককৌমুদী' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।[৬১] 'চৈতন্যচরিতামৃতমহাকাব্য'টির সমাপ্তি-সূচক শ্লোক হইতে জানা যায় যে গ্রন্থটি ১৫৪২ খ্রী.-এ সমাপ্ত হইয়াছিল। ডা. বিমানবিহারী মজুমদার ও ডা. সুকুমার সেন বলেন, "এই তারিখ সন্দেহ করিবার কারণ নাই।" একই কালে বৃন্দাবনে রূপ-সনাতনাদির মতই গৌড়-বংগে কবিকর্ণপূরের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাদি রচনায় অসাধারণ কৃতিত্বের কথা স্মরণ করিয়া ডা. মজুমদার তৎকালীন বৈষ্ণবসমাজে কর্ণপূরের স্থান সম্বন্ধে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া অনুমান করিতেছেন[৬২] যে সম্ভবত তৎকালীন 'সর্ববাদিসম্মত' শ্রীকৃষ্ণকে পুরোভাগে না ধরিয়া 'খাঁটি গৌড়বাসীরা নিখিল ভারতের অপেক্ষা না রাখিয়া চৈতন্যের উপাসনা প্রবর্তন করেন' বলিয়াই 'কবিকর্ণপূর ছয় গোস্বামী বা সাত গোস্বামীর মধ্যে স্থান পায়েন নাই'।

শিবানন্দের মত কবিকর্ণপূরের শেষ জীবন সম্বন্ধেও বিশেষ কিছুই জানিতে পারা যায়

(৫৪) ঐ—১০ম. অ., পৃ. ৬৮৫; চৈ. কৌ.—পৃ. ৪০২ (৫৫) VFM—p. 34 (fin.) (৫৬) ৫ (৫৭) গৌ. দী.—২১৫ (৫৮) বা. ই. (২য়. সং.)—পৃ. ২৩৯ (৫৯) চৈ. চ.—৩।১৬, পৃ. ৩৫৮ (৬০) চৈ. কৌ.—পৃ. ৪০১ (৬১) গৌ. জী.—পৃ. ১৩ (৬২) চৈ. উ.—পৃ. ১০৪

না।[৬৩] 'ভক্তিরত্নাকর' হইতে জানা যায় যে গদাধরদাস প্রভুর তিরোধান-তিথি মহামহোৎসবকালে তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা চৈতন্যদাসের সহিত কাটোয়াতে গিয়াছিলেন।[৬৪] সম্ভবত তাঁহার মধ্যম-ভ্রাতাও এই উপলক্ষে উপস্থিত হইয়াছিলেন।[৬৫] 'প্রেমবিলাস'-কার বলেন যে 'কর্ণপূর' খেতুরী-উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।[৬৬]

(৬৩) অ. প্র.-মতে অদ্বৈত-তিরোভাবকালে তিনি শান্তিপুরে আগমন করিয়াছিলেন। স. সূ.-মতে (পৃ.১০) তিনি একবার বৃন্দাবনেও যান। (৬৪) ৯।৩৯৬ (৬৫) ঐ— ৯।৪০১ (৬৬) ১৯শ. বি., পৃ.৩০৮;

রাঘব-পণ্ডিত

রাঘব-পণ্ডিতের নিবাস ছিল পাণিহাটিতে। 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র মূলস্কন্ধ-শাখায় তাঁহাকে চৈতন্যের 'আদ্য অনুচর' বলা হইলেও গৌরাঙ্গের নবদ্বীপ-লীলার মধ্যে তাঁহার নাম দৃষ্ট হয় না। একমাত্র জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে'র একটি সন্দেহজনক বিরাট তালিকার মধ্যে তাঁহার নাম পাওয়া যায়।[১] তাহাও আবার চৈতন্যের সন্ন্যাস-গ্রহণকালে। তৎপূর্বে তিনি মহাপ্রভুর সহিত কোনও প্রকারে সম্পর্কিত হইলেও তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে। রাঘবের ভগিনী দময়ন্তী দেবীও একজন ভক্তিমতী মহিলা ছিলেন।

দেশ-দেশান্তর হইতে রাঘব বহু অর্থ-ব্যয়ে দিব্য-সামগ্রী আনিয়া কৃষ্ণ-পূজার আয়োজন করিতেন।[২] বাড়ীতে নারিকেল আদি ফলকর বৃক্ষের অভাব ছিল না। কিন্তু বহুগুণ মূল্য দিয়া দশ ক্রোশ দূর হইতেও তিনি নারিকেল প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া আনিয়া তাঁহার কৃষ্ণপূজার উপচারকে শ্রম-মাহাত্ম্যে মধুর করিয়া তুলিতেন। পূজার মধ্যে বিন্দুমাত্র ফাঁক থাকিলেও চলিত না। একদিন পূজা-গৃহের দরজায় অপেক্ষমান ফলপাত্রহস্ত-সেবক 'দ্বারের উপরে ভিত্তে' হাত লাগাইয়া পুনরায় সেই হস্তে ফল স্পর্শ করিলে রাঘব সেই সমস্ত ফলকে প্রাচীর-পারে নিক্ষেপ করিয়া পুনরায় 'পরম পবিত্র ভোগে'র ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই রকম নিষ্ঠাসহকারেই তাঁহার সেবা-পূজা চলিত। 'কলা, আম্র, নারঙ্গ, কাঁঠাল' প্রভৃতি ফল, শাকাদি নানাবিধ ব্যঞ্জন, 'চিড়া, হুড়ুম, সন্দেশ,' 'পিঠা, পানা ক্ষীর,' 'কাসন্দাদি আচার,' 'গন্ধদ্রব্য অলংকার' সমস্ত কিছুই নিবেদন করিয়া তিনি পূজা-বিধি পালন করিতেন।

রাঘব-ভগিনী দময়ন্তী দেবীও মহা'প্রভুর প্রিয়দাসী' ছিলেন এবং তাঁহারও নিষ্ঠা ছিল অপূর্ব। বারমাস যাবৎ তিনি চৈতন্য-সেবার আয়োজন করিবার জন্য ব্যস্ত থাকিতেন।[৩] আম্র ঝাল প্রভৃতির কাসন্দী, লেবু, আদা ও আম্রের বহুবিধ আচার, মহাপ্রভুর আমাশয়ের জন্য নানাবিধ সুক্তা, ধনিয়া মৌরী প্রভৃতি দিয়া বিভিন্ন সময়ের জন্য বিভিন্ন প্রকারের আহার্য, নানা-রকমের নাড়ু ও মিষ্টান্ন, কর্পূর-মরিচ-লবঙ্গ-এলাচযুক্ত বহুবিধ খাদ্য-সামগ্রী, শালিধান্যের খই-এর ঘৃতপক্ক কর্পূরযুক্ত উখড়া,—কোন কিছুই বাদ যাইত না। যাহাতে মহাপ্রভু সংবৎসর যাবৎ বিন্দুমাত্র অসুবিধায় না পড়েন, তজ্জন্য তাঁহার উৎকণ্ঠার সীমা থাকিত না। এমন কি গঙ্গাজল ও বস্ত্রে-ছাঁকা গঙ্গামৃত্তিকা প্রভৃতি মহাপ্রভুর নিত্য-

---

(১) বৈ. খ., পৃ. ৭২ (২) চৈ. চ.—২।১৫, পৃ. ১৭৯ (৩) ঐ—১।১০, পৃ. ৫১ ; ৩।১০, পৃ. ৩৩৪-৩৫

ব্যবহার্য খুঁটিনাটি প্রয়োজনীয় সামগ্রীর সকল কিছুই সংগ্রহ করা হইত। এই সকল দ্রব্য পরিপাটি সহকারে গুছাইয়া সাজাইয়া ঝালি ভর্তি করিয়া নীলাচলাভিমুখী স্বীয় ভ্রাতার সহিত পাঠাইয়া দিয়া তবে তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন। কিন্তু ঐগুলি গিয়া পৌছাইতে না পৌছাইতেই আবার তাঁহার কার্য আরম্ভ হইয়া যাইত। এইরূপ আরাধনা ও তন্ময়তার মধ্য দিয়া তাঁহার জীবন অতিবাহিত হইত। ভক্তি ও সেবা-মাধুর্যের এমন অনির্বচনীয় প্রকাশ জগতে বিরল। আজিও 'রাঘবের ঝালি'র নাম নীলাচলে অবিস্মরণীয় হইয়া আছে।

মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের পর নীলাচলাগত ভক্তবৃন্দের মধ্যে রাঘবের প্রথম সাক্ষাৎ পাওয়া যায়[৪] এবং তথায় তাঁহাকে মহাপ্রভু-প্রবর্তিত সম্প্রদায়-কীর্তন, জলকেলি প্রভৃতি বিশিষ্ট অনুষ্ঠানগুলিতেও অংশ-গ্রহণ করিতে দেখা যায়।[৫] তারপর ভক্তবিদায়কালে মহাপ্রভু পঞ্চমুখে রাঘবের প্রশংসা করিয়া সর্বসমক্ষে তাঁহার কৃষ্ণভক্তি ও সেবাবিধির কথা ঘোষণা করিয়া তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গন দান করেন।

রাঘব নীলাচল হইতে পাণিহাটীতে ফিরিলে নিত্যানন্দপ্রভুও স্বীয় ভক্তবৃন্দসহ 'সর্বাগ্যে তাঁহার গৃহে আসিয়া উঠিয়াছিলেন। তৎকালে মকরধ্বজ-করও[৬] তথায় উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্য ভক্তের মত রাঘব নিত্যানন্দকে চৈতন্য-প্রেরিত মঙ্গলদূত বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছিলেন। তাই তিনি নিত্যানন্দের আজ্ঞাক্রমে স্বভাবজ কুশলতার সহিত সমস্ত উপকরণ যোগাড় করিয়া দিলে নিত্যানন্দের অভিষেক সম্পন্ন হইয়াছিল।[৭] এই অনুষ্ঠানে স্বয়ং রাঘবই ছত্র-ধারণ করিয়া নিত্যানন্দর পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন এবং রাঘবের পরম আতিথেয়তার মধ্যেই নিত্যানন্দের লীলা আরম্ভ হয়। দীর্ঘ তিন-মাস যাবৎ নিত্যানন্দ রাঘব-গৃহে অবস্থান করিবার পর অন্যত্র গমন করেন।

পর-বৎসরেও রাঘব নীলাচলে গমন করিয়াছিলেন[৮] এবং তাহার পর মহাপ্রভুও গৌড়ে আসিয়া প্রথমে রাঘবের গৃহে ভিক্ষা-গ্রহণ করেন।[৯] রামকেলি হইতে প্রত্যাবর্তন-পথে তিনি পুনরায় রাঘবের গৃহে[১০] একদিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। পাণিহাটীর গঙ্গাতীরে অতি মনোরম পরিবেশের মধ্যে রাঘবের বসত-বাটি। রাঘবালয়ে উপস্থিত হইবামাত্র মহাপ্রভুর প্রাণমন জুড়াইয়া গেল। রাঘবদাস-ঠাকুর[১১] সেই সময় মহাপ্রভুর

(৪) চৈ. না. ; চৈ. চ. (৫) চৈ. চ.—২।১৩, পৃ. ১৬৪ ; ২।১৪, পৃ. ১৭১ (৬) বৃন্দাবনদাসের (?) 'চৈতন্যগণোদ্দেশ' নামক একটি পুথিতে মকরধ্বজ-করের সহিত একজন মকরধ্বজ-সেনেরও উল্লেখ আছে। (৭) চৈ. ভা.—৩।৫, পৃ. ৩০৪ ; শ্রীচৈ.চ.—৪।২২ (৮) চৈ. চ.—২।১৬, পৃ. ১৮৬ (৯) ঐ—২।১৬, পৃ. ১৯০ ; চৈ. না.—৯।২৯-৩০ (১০) চৈ. ভা.—৩।৫, পৃ. ২৯৯ ; চৈ. ম. (জ.)—পৃ. ১৪২-১৪৩ (১১) পা. নি.—পৃ. ২ ; তু.—'ঠাকুর পণ্ডিত'—গৌ. ত., পৃ. ২৭২

অভিরুচি-অনুযায়ী নানাবিধ শাকাদি রন্ধন করিয়া তাঁহাকে খাওয়াইলে মহাপ্রভু তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তারপর গদাধরদাস, পুরন্দর-পণ্ডিত, পরমেশ্বরদাস, রঘুনাথ-বৈদ্য প্রভৃতি ভক্তের আগমনে রাঘব-ভবন আনন্দময় হইয়া উঠে। মকরধ্বজ-করও আসিয়া উপস্থিত হন।[১২] মহাপ্রভু মকরধ্বজকে 'রাঘবপদদ্বন্দ্ব'-সেবার নির্দেশ দান করিয়া বরাহনগর-পথে চির-জীবনের মত স্বীয় জন্মভূমি পরিত্যাগ করেন। কিন্তু রাঘবাদি ভক্তের গৃহে তাঁহার মানস-যাত্রা কোনও দিন বন্ধ হইয়া যায় নাই।

রাঘব-পণ্ডিতের জাতি সম্বন্ধে কোথাও কোনও উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। কিন্তু ১৩২২ সালের 'বংগীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'য় 'শ্রীমৎ রাঘব পণ্ডিত ও শ্রীপাট পাণিহাটী মাহাত্ম্য' নামক একটি প্রবন্ধে পাণিহাটী-নিবাসী বৈষ্ণব-পণ্ডিত অমূল্যধন রায়ভট্ট মহাশয় লিখিয়াছেন, "রাঘব ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব ছিলেন, কেন না, শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন জাতি ভিক্ষা বা অন্ন-গ্রহণ করাইতে সাহস করিতেন না। তিনিও তাহা কখনও অঙ্গীকার করিতেন না। পণ্ডিত উপাধি, শ্রীবিগ্রহসেবা এবং প্রভুর ইঁহার হস্তে ভোজন দ্বারা উক্ত প্রমাণ দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে।" রায়ভট্ট মহাশয়ের সিদ্ধান্ত যে ভ্রান্ত নহে 'চৈতন্যভাগবত' [১৩] পাঠেও তাহা উপলব্ধ হয়।

নিত্যানন্দপ্রভু মধ্যে মধ্যে পাণিহাটীতে আসিয়া রাঘবের আতিথ্য-গ্রহণ করিতেন। মহাপ্রভু বৃন্দাবন হইতে ফিরিলে রঘুনাথদাস একদিন চৈতন্যচরণ-প্রাপ্তির আশায় পাণিহাটীতে নিত্যানন্দ সমীপে উপস্থিত হন। নিত্যানন্দ রঘুনাথকে চিড়া-দধি-ভক্ষণ করাইবার কথা বলিলে পুলিন-ভোজনের ব্যবস্থা হইল। এদিকে রাঘব গৃহে যাবতীয় অন্ন-ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া গঙ্গাতীরে আসিয়া এই ব্যাপার দেখিলেন এবং ভোজন-শেষে সমবেত ভক্তবৃন্দকে স্বগৃহে লইয়া গিয়া জাঁকজমকের সহিত নৃত্য-কীর্তন আরম্ভ করিলেন। রাঘবের অনুরোধে সকলকেই তাঁহার গৃহে ভোজন করিতে হইল। চৈতন্যসঙ্গ-লাভেচ্ছার জন্য রঘুনাথের মন তখন উৎকণ্ঠায় পূর্ণ হইয়াছিল। মরমী রাঘব তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং তাঁহার ব্যবস্থাতেই রঘুনাথ চৈতন্য-নিত্যানন্দার্থ নিবেদিত প্রসাদান্ন প্রাপ্ত হইয়া পরিতৃপ্ত হইলেন। শেষে তাঁহারই মধ্যস্থতায় নিত্যানন্দ রঘুনাথের মনোবাসনার কথা জ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে অভীষ্ট সিদ্ধির সম্বন্ধে নির্দেশ দান করেন।

ভক্তবৃন্দের নীলাচলে গমনকালে রাঘবের ঝালি-বহন তাঁহাদের শুভ-যাত্রার একটি অপরিহার্য অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। রাঘব প্রতি-বৎসরই নীলাচলে গিয়া মহাপ্রভুর

(১২) চৈ. ভা.—৩।৫, পৃ. ৩০০ ; চৈ. ম. (জ.)—পৃ. ১৪৩ ; বৈষ্ণবাচারদর্পণ (পৃ. ৩৪৫)-মতে মকরধ্বজের নিবাস ছিল বড়গাছি গ্রামে (১৩) ৩।৫, পৃ. ২৯৯

অনুষ্ঠিত বিভিন্ন কর্মে অংশ গ্রহণ করিতেন।[১৪] কোন কোন বৎসর মকরধ্বজ-করও সঙ্গে চলিতেন।[১৫] তিনি রাঘবের নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন[১৬] এবং নিত্যানন্দের অনুরক্ত ভক্ত হইয়াছিলেন ; একবার নিত্যানন্দ তাঁহার গৃহে গিয়া কিছুদিন অবস্থানও করিয়াছিলেন।[১৭] নীলাচল-যাত্রাকালে মকরধ্বজ রাঘব-দময়ন্তীর স্নেহমিশ্রিত বিপুল দ্রব্য-সম্ভার সঙ্গে লইয়া চলিতেন।[১৮] মহাপ্রভুকে কৃষ্ণ-গুণ-গান শুনাইয়া তাঁহার 'গায়ন'-খ্যাতিও হইয়া গিয়াছিল।[১৯]

মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলার শেষ দিকেও রাঘবকে ঝালি-বহন করিয়া নীলাচলে যাইতে দেখা যায়।[২০] কিন্তু তারপর আর কোথাও তাঁহার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না।

(১৪) চৈ.চ.—৩।৭, পৃ. ৩২৪ (১৫) চৈ. না.—১০।১৩ (১৬) চৈ.চ.—১।১০, পৃ. ৫১ ; চৈ. ভা.—৩।৫, পৃ. ৩০০ (১৭) চৈ. ম. (জ.)—বি. খ., পৃ. ১৪৫ (১৮) চৈ.চ.—৩।১০, পৃ. ৩৩৫, বৈ. ব. (দে.)—পৃ. ৪ (১৯) চৈ. গ.—পৃ. ১০ ; চৈ. দী.—পৃ. ১০ ; তু.—গৌ. দী.—১৪১ (২০) চৈ.চ.—৩।১২, পৃ. ৩৪১

পুরন্দর-পণ্ডিত

'চৈতন্যচরিতামৃতে'র মূলস্কন্ধশাখা-বর্ণনায় পুরন্দর-আচার্যের এবং নিত্যানন্দ-শাখা-বর্ণনায় পুরন্দর-পণ্ডিতের নাম দৃষ্ট হয়। কিন্তু 'চৈতন্যভাগবতে'র শেষ-খণ্ডের পঞ্চম অধ্যায় হইতে বুঝিতে পারা যায় যে তাঁহারা এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। পুরন্দর-আচার্য গৌরাঙ্গ-পার্ষদ্ হইলেও তাঁহাকে নবদ্বীপ-লীলাতে অংশ-গ্রহণ করিতে দেখা যায় না। একমাত্র জয়ানন্দের গ্রন্থেই[১] তাঁহাকে শিবানন্দ-রাঘবাদির মত নবদ্বীপ-লীলার শেষভাগে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু জয়ানন্দের বিরাট তালিকাগুলি সর্বদা নির্ভরযোগ্য নহে। জয়ানন্দের গ্রন্থের অন্য একস্থলে লিখিত হইয়াছে[২] :

পূর্বে মিশ্র পুরন্দর আচার্য পুরন্দরে।
কৃতকৃত্য হইয়াছে সম্বন্ধ করিবারে॥

গৌরাঙ্গ-পত্নী লক্ষ্মীদেবীর পিতার নাম যে পুরন্দর-আচার্য ছিল, তাহাও অন্য কোনও গ্রন্থের দ্বারা সমর্থিত হয় না।

পুরন্দরের নিবাস ছিল সম্ভবত খড়দহে।[৩] এই অঞ্চলের ভক্তবৃন্দের সহিত গৌরাঙ্গের যোগসম্বন্ধ কোন্ সূত্রে স্থাপিত হইয়াছিল, বলা কঠিন। সম্ভবত গদাধরদাসের সহিত পরিচয়-সূত্রে ঘটিয়া উঠিতে পারে। কিন্তু স্বয়ং গদাধরই যে গৌরাঙ্গের নবদ্বীপলীলা-সঙ্গী ছিলেন, এইরূপ কথা প্রাচীনতম গ্রন্থগুলির দ্বারা সমর্থিত হয়না। তবে গৌরাঙ্গ যে পুরন্দরকে পিতৃ-সম্বোধন করিতেন, তাহা কিন্তু প্রাচীন গ্রন্থগুলি হইতে জানিতে পারা যায়।[৪] তাহাতে মনে হয় যে পুরন্দর গৌরাঙ্গ অপেক্ষা বয়সে যথেষ্ট বড় ছিলেন এবং তিনি ছিলেন বাৎসল্য-ভাবেরই ভাবুক, একজন বিশেষ শ্রদ্ধার্হ ব্যক্তি।

পুরন্দর প্রথমবারে ভক্তবৃন্দের সহিত নীলাচলে গিয়া মহাপ্রভুর সাক্ষাৎলাভ করিয়াছিলেন।[৫] তারপর চাতুর্মাস্যান্তে মহাপ্রভুর আজ্ঞায় নিত্যানন্দসহ বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনকালে তিনি পথিমধ্যে ভাবাবেশে অঙ্গদ-স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া তদ্বৎ আচরণ করিতে থাকেন।[৬] নিত্যানন্দ বাংলাদেশে ফিরিবার কয়েক মাস পরে খড়দহে 'পুরন্দর পণ্ডিতের দেবালয় স্থানে' নৃত্য-কীর্তন করিয়াছিলেন।[৭] পরে মহাপ্রভু রামকেলি হইতে ফিরিলে

(১) বৈ. খ., পৃ. ৭২ ; স. খ., পৃ. ৮৮ ; এই প্রসঙ্গে পুরন্দর-পণ্ডিত ও রাঘব-পণ্ডিতের জীবনী দ্রষ্টব্য। (২) ন. খ., পৃ. ৪১ (৩) পা. নি. ; বৈ. দি—পৃ. ৩৩৯ (৪) চৈ. চ.—১।১০, পৃ ৫১ ; চৈ. ভা.—৩।৯, পৃ. ৩২৭ ; অ. বি.—পৃ. ১ (৫) চৈ. চ.—২।১১, পৃ. ১৫৩, ১৫৫ ; চৈ. কৌ.—পৃ. ২৫০ (৬) চৈ. ভা.—৩।৫, পৃ. ৩০৩ ; চৈ. ম. (জ.)—উ.খ., পৃ. ১৪৮ (৭) চৈ. ভা.—৩।৫, পৃ. ৩০৮ ; শ্রীচৈ. চ.—৪।২২।১৬

পুরন্দর-পণ্ডিত কুমারহট্টে গিয়া শ্রীবাসালয়ে এবং পাণিহাটীতে গিয়া রাঘব-মন্দিরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন।[৮] তাহার পর পুরন্দর সম্বন্ধে আর কিছুই জানা যায় না। তবে খুব সম্ভবত তিনি মধ্যে মধ্যে নীলাচলে গিয়া মহাপ্রভুর দর্শনলাভ করিতেন।[৯] কেবল 'ভক্তিরত্নাকর'-মতে[১০] তিনি গদাধরদাসের তিরোধান-তিথি-উৎসব উপলক্ষে কাটোয়ায় যাত্রা করিয়াছিলেন। কিন্তু পুরন্দর-আচর্যের পক্ষে ততকাল বাঁচিয়া থাকা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। তবে উক্ত গ্রন্থমতে বিষ্ণুদাস নন্দন প্রভৃতিও একত্রে গিয়াছিলেন। এই নন্দন যদি গৌরাঙ্গ-লীলাসঙ্গী নন্দন-আচার্য হন, তাহা হইলে অবশ্য 'ভক্তিরত্নাকরে'র বিবরণ প্রণিধান যোগ্য হইয়া উঠে।

পুরন্দর গৌরাঙ্গ-বিগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন।[১১]

(৮) চৈ. ভা.—৩।৪, পৃ. ২৯৭, ২৯৯ ; চৈ. ম. (জ.)—বি. খ., পৃ. ১৪২-৪৩ (৯) তু.—চৈ. ভা.—৩।৯, পৃ. ৩২৭ ; শ্রীচৈ. চ.—৪।১৭।১১ (১০) ৯।৩৯৫ (১১) চৈ. ভা.—৩।৪, পৃ. ২৯৯ ; বৈ. দ. (পৃ. ৩৩৯-৪০)-মতে পুরন্দরের জন্মভূমি খড়দহে, কিন্তু তিনি গৌরাজ্ঞায় জাহ্নবীর পশ্চিম কূলে পাহাড়পুরে নিতাই-গৌর বিগ্রহ স্থাপন করেন এবং জাহ্নবীর পূর্বতীরস্থ নিতাই-জাহ্নবা-বসুধা ও গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া-লক্ষ্মীর বিগ্রহগুলির সেবার ভার অন্তের উপর অর্পণ করেন।

পুরুষোত্তম-পণ্ডিত

বৃন্দাবনদাসের 'বৈষ্ণববন্দনা'য় যে পুরুষোত্তম-ব্রহ্মচারীর নাম দৃষ্ট হয়,[১] তিনি অজ্ঞাত-কুলশীল। কিন্তু 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র অদ্বৈত-শাখা বর্ণনায় দেখা যায়ঃ

পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী আর কৃষ্ণদাস।
পুরুষোত্তম পণ্ডিত আর রঘুনাথ।

উক্ত পুরুষোত্তম-ব্রহ্মচারীর উল্লেখ অন্যত্র নাই।[২] কিন্তু জয়ানন্দ এক অদ্বৈতপার্ষদ্-পুরুষোত্তমের কথা বলিয়াছেন।[৩] তিনি খুবসম্ভবত পুরুষোত্তম-পণ্ডিতই। কারণ, অদ্বৈত-শিষ্য হিসাবে পুরুষোত্তম-পণ্ডিতই খ্যাতিমান হইয়াছিলেন। দেবকীনন্দন তাঁহার 'বৈষ্ণব-বন্দনা'য় জানাইয়াছেন[৪]ঃ

শ্রীপুরুষোত্তম পণ্ডিত বন্দো বিলাসি সুজান।
প্রভু যারে দিলা আচার্য গোসাঞির স্থান।

আবার 'অদ্বৈতমঙ্গলে'র বর্ণনাতেও[৫] পুরুষোত্তম-পণ্ডিত অদ্বৈতপ্রভুর বড়শাখা ছিলেন এবং কামদেব ছিলেন দ্বিতীয় শাখা। গ্রন্থকার লিখিয়াছেনঃ

এই দুই শিষ্য প্রভুর নীলাচলে।
দুই বাহু দুইজন প্রভু তারে বলে।

এবং মহাপ্রভু নীলাচলে তাঁহাদিগকে শিক্ষাদান করিয়াছিলেন। তাহার পর তাঁহারা চৈতন্য-আজ্ঞায় গৌড়-বংগে পৌঁছাইলে অদ্বৈতপ্রভু তাঁহাদিগকে তাঁহার দুইটি হস্ত স্বরূপে গ্রহণ করিয়া লন। এইস্থলে[৬] গ্রন্থকার পুরুষোত্তমের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বলিয়াছেনঃ

পুরুষোত্তম পণ্ডিত বন্দ সথা প্রবীণ।
শ্রীঅদ্বৈত চৈতন্য এক করিল যে জন।

মহাপ্রভু-প্রেরিত কামদেব[৭] ও পুরুষোত্তমের মধ্যে কামদেব পরে ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন; কিন্তু পুরুষোত্তম-পণ্ডিত সম্ভবত তাঁহার জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অদ্বৈতপ্রভুর প্রকৃত অনুরাগী ভক্ত-হিসাবে স্বীয় যোগ্যতা ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।[৮] 'প্রেমবিলাস'-মতে অন্যান্য অদ্বৈত-শিষ্য সহ পুরুষোত্তম খেতুরির মহামহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।[৯]

---

(১) বৈ. ব. (বৃ.)—পৃ. ৫ (২) একমাত্র আধুনিক বৈষ্ণবাচারদর্পণে (পৃ. ৩৪৯) তাঁহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, "অদ্বৈতের শাখা জয়নগর যাঁর পুরী।" (৩) চৈ. ম. (জ.)—পৃ. ২ (৪) বৈ. ব.—(দে.) পৃ. ৪ (৫) পৃ. ৩৮ (৬) ঐ—পৃ. ৫৩-৫৪ (৭) দ্র.—সীতাদেবী (৮) সী. চ. (পৃ. ৬) ও সী. ক. (পৃ. ৩৯) গ্রন্থদ্বয়ে বারেকের জন্য একজন পুরুষোত্তমকে অচ্যুতানন্দের বাল্যকালেও অদ্বৈত-গৃহে বাস করিতে দেখা যায়; মহাপ্রভুর নীলাচল-গমনের পূর্বে যে পুরুষোত্তম অদ্বৈতের সহিত যুক্ত হন নাই, তাহা জোর করিয়া বলা যায় না। গ্রন্থদ্বয়ের বর্ণনায় (সী. চ.—পৃ. ১৮; সী. ক.—পৃ. ৯২, ৯৫-৯৬; দ্র.—সীতাদেবী) আরও দেখা যায় যে সীতাদেবীর দুর্দশা-জর্জরিত জীবন-সায়াহ্নেও পুরুষোত্তম অনুগত ভৃত্যের ন্যায় তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন। সম্ভবত, অদ্বৈত-সীতা ও অচ্যুতানন্দের জীবনের তিনিই ছিলেন দীর্ঘতমকালের নিষ্ঠাবান সঙ্গী বা ভৃত্য। (৯) ১৯শ. বি.—পৃ ৩০১

ভাগবত-আচার্য

'চৈতন্যচরিতামৃতে'র মূল-স্কন্ধ-শাখা এবং অদ্বৈত-[১] ও গদাধর-শাখায় একজন করিয়া মোট তিনজন ভাগবতাচার্যের নাম পাওয়া যায়। তন্মধ্যে মূল-শাখার ভাগবতাচার্য সম্বন্ধে 'চৈতন্যভাগবতে' বর্ণিত হইয়াছে[২] যে মহাপ্রভু গৌড়মণ্ডল হইতে দ্বিতীয়বার নীলাচল-গমন-পথে বরাহনগরে 'মহাভাগ্যবন্ত এক ব্রাহ্মণের ঘরে' গিয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি ভাগবত-পাঠে 'সুশিক্ষিত' ছিলেন এবং তাঁহার ভাগবত-পাঠে মহাপ্রভু এতই মুগ্ধ হন যে তাঁহার পাঠকালে তিনি ভাবাবেশে 'বাহ্য পাশরিয়া' নৃত্য আরম্ভ করেন এবং

> প্রভু বোলে ভাগবত এমত পড়িতে।
> কভু নাহি শুনি আর কাহার মুখেতে॥
> এতেকে তোমার নাম ভাগবতাচার্য।
> ইহা বই আর কোন না করিহ কার্য॥

জয়ানন্দও এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন।[৩] কয়েকটি পুথিতে[৪] ভাগবত-আচার্য এবং তৎপত্নী উভয়কেই এই সময়ে মহাপ্রভুর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করা হইয়াছে। 'পাটপর্যটন-' পাটনির্ণয়-' এবং বৃন্দাবনের 'বৈষ্ণববন্দনা'-মধ্যে বরাহনগরেই ভাগবতাচার্যের পাট লিখিত হইয়াছে। কবিকর্ণপূর জানাইয়াছেন[৫] যে 'শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য' 'কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী' নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ডা. সুকুমার সেন দেখাইয়াছেন যে গ্রন্থটির মধ্যে একটি মিশ্র-ব্রজবুলি ভাষার পদ রহিয়াছে।[৬]

'কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী'-গ্রন্থখানি কোন ভাগবতাচার্যের রচিত সে লইয়া মতবিরোধ আছে। ১৩৪৪ সালে হরিদাস ঘোষাল মহাশয় তাঁহার 'শ্রীভাগবত আচার্যের লীলা প্রসঙ্গ' নামক প্রবন্ধগুলিতে জানাইয়াছেন যে গ্রন্থখানি বরাহনগরের রঘুনাথ-আচার্য কর্তৃকই রচিত হইয়াছিল। পাটবাড়ী-গ্রন্থাগারে প্রবন্ধগুলি রক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু হরিদাসবাবু তাঁহার উপরোক্ত সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কোনও কারণ প্রদর্শন করেন নাই। অপর পক্ষে, রাধেশচন্দ্র শেঠ মহাশয় 'ভাগবতাচার্য-প্রণীত বাঙ্গালা শ্রীমদ্ভাগবতের হস্তলিখিত পুথি' একখানি প্রাপ্ত হইয়া ১৩০৬ সালের 'সাহিত্য'-পত্রিকার আষাঢ়-সংখ্যায় নানারূপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া জানাইয়া-

(১) গৌ. ক. (পৃ. ৯১)—গ্রন্থে অদ্বৈত-শিষ্য ভাগবতাচার্য ও চৈ. চ.-এর অদ্বৈতশাখাভুক্ত চক্রপাণি-আচার্যাদির নামও উল্লেখিত হইয়াছে। (২) ৩।৫, পৃ. ৩০০ (৩) বি. খ., পৃ. ১৪৩ (৪) চৈ. গ. (বৃ.)—পৃ. ১২; গৌ. গ. দী. (বলরাম)—পৃ. ১৬; চৈ. দী. (রামাই)—পৃ. ১৫; গৌ. ক. (৫) গৌ. দী.—২০৩ (৬) HBL.—p.467

ছিলেন যে 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র চৈতন্য-শাখাভুক্ত ভাগবতাচার্য 'প্রেমভক্তিতরঙ্গিণী'র রচয়িতা নহেন, উক্ত গ্রন্থের গদাধর-শাখাভুক্ত ভাগবতাচার্যই আলোচ্যমান গ্রন্থের রচয়িতা। প্রবন্ধকার যে-সকল উদ্ধৃতি দিয়াছেন, তাহাতে অবশ্য গদাধরকেই নিঃসন্দেহে গ্রন্থকারের গুরু বলিয়া ধরিয়া লইতে পারা যায়। কিন্তু সেক্ষেত্রে 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'-গ্রন্থে চৈতন্য-শাখাভুক্ত বরাহনগরবাসী সুপ্রসিদ্ধ ভাগবত-পাঠকের নামের অনুল্লেখের কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তবে বরাহনগরবাসী ভাগবতাচার্যের পক্ষে যে গদাধর-শিষ্য হওয়া সম্ভব নয়, তাহাও জোর করিয়া বলা যায় না। 'চৈতন্যচরিতামৃত'-গ্রন্থে এক ব্যক্তিকে দুইটি শাখার অন্তর্ভুক্ত-হিসাবে বিবৃত করিবার আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত আছে। গদাধর-শাখার মধ্যে যে-ভাগবতাচার্যের নাম পাওয়া যায়, তিনি গদাধরদাসের তিরোধান-তিথি-মহামহোৎসব এবং খেতুরির মহামহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।[৭] গদাধর-শিষ্যবৃন্দের সহিত তাঁহার উল্লেখ হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যায়।

(৭) ভ. র.—৯।৪০৬ ; ১০।৪১৫ ; ন. বি —৬ষ্ঠ. বি., পৃ. ৮৪ ; ৮ম. বি., পৃ. ১০৭

পর্যায়

বৃন্দাবন

সনাতন-গোস্বামী

একদা কর্ণাট দেশে এক সর্বগুণসম্পন্ন নৃপতি বাস করিতেন।[১] তাঁহার নাম ছিল শ্রীসর্বজ্ঞ। রাজা ছিলেন যজুর্বেদী ভরদ্বাজ-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ।[২] তাঁহার পুত্র অনিরুদ্ধদেব[৩] দুই পত্নীর গর্ভে দুইটি পুত্র লাভ করেন। তন্মধ্যে কনিষ্ঠ হরিহর শস্ত্র-বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া, বিদ্যানুরাগী ও শাস্ত্রজ্ঞ জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা রূপেশ্বরকে তদীয় রাজ্যাধিকার হইতে বঞ্চিত করিলে তিনি সস্ত্রীক পৌরস্ত্যদেশে আগমন করিয়া সখা শিখরেশ্বরের[৪] সহিত সুখে কালযাপন করিতে থাকেন। তাঁহার এক পুত্র-সন্তান জন্মে; তাঁহার নাম রাখা হয় পদ্মনাভ। তিনি দনুজমর্দনদেবের জীবদ্দশাতেই সুরধুনীতট-বাসাভিলাষী হইয়া শিখর-ভূমি পরিত্যাগ পূর্বক নবহট্টে (নৈহাটী) আসিয়া বাস স্থাপন করেন এবং যাগযজ্ঞ ও উৎসবাদি সহকারে পুরুষোত্তম-বিগ্রহের পূজা অর্চনা করিতে থাকেন। তাঁহার অষ্টাদশ কন্যা ও পঞ্চপুত্র জন্মে। উপাস্য দেবতার নামানুযায়ী তিনি পুত্রদিগের নাম রাখিয়াছিলেন—পুরুষোত্তম, জগন্নাথ, নারায়ণ, মুরারি ও মুকুন্দ। কনিষ্ঠ মুকুন্দদেবের পুত্র কুমার জ্ঞাতি-শত্রুদিগের দ্বারা ব্যতিব্যস্ত হইয়া বংগদেশস্থ আবাস-স্থানে চলিয়া যান[৫] এবং বাক্‌লা-চন্দ্রদ্বীপ গ্রামে বাস করিতে থাকেন। 'গতায়াত হেতু' যশোহরের ফতেয়াবাদ গ্রামেও

---

(১) সং. বৈ. তো.—৯১-তম অধ্যায়, পৃ. ৫৫৫-৫৬; ভ. র.—১।৫৩৯ (২) এই জীবনীর শেষভাগে সনাতনের জাতি সম্বন্ধে আলোচনা দ্রষ্টব্য। (৩) দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার Vaisnava Literature-গ্রন্থে (পৃ. ২৭) লিখিয়াছেন, "Gagatguru, a Maratha Brahmin, became the king of Karnata, in the Deccan in 1381 A. D. and reigned till 1414 A, D. Jagatguru's son was Aniruddha"—এই তথ্যগুলি কোথা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে লেখক তাহার উল্লেখ করেন নাই। (৪) অচ্যুতচরণ চৌধুরী বলেন ইঁহার নাম মহেন্দ্রসিংহ (শ্রীরূপ সনাতন—১ম. অধ্যায়) এবং 'পদ্মনাভ শিখরভূমির রাজপণ্ডিত যদুজীবন তর্কপঞ্চাননের কন্যার পানিগ্রহণ করেন।' তিনি শাশুড়ীর উত্তরাধিকারী হইয়া বাকলায় বাস করেন। তাঁহার ৫ম. পুত্র মুকুন্দদেবের পুত্র কুমার 'গৌড়নগরের অনতিদূরে মাধাইপুরে হরিনারায়ণ বিশারদের রেবতী নাম্নী কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া মোরগ্রাম মাধাইপুরে যাইয়া বাস করেন।' (৫) ভ.র.—১।৪৬৫-৬৭; অদ্বৈতমঙ্গল (পৃ. ৩৯-৪১) হইতেও জানা যায় যে সনাতন-জনক কুমার-দেবের পিতা মুকুন্দ-দেব দাক্ষিণাত্যবাসী ছিলেন; সনাতন-গোসাঞির সূচক নামক পুথিতে একই কথা বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু সেই স্থলে সনাতনকে কুমারদেবের মধ্যমপুত্র বলা হইয়াছে।

তিনি বাসস্থান নির্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বহু পুত্রের মধ্যে বিশেষ করিয়া তিনজনই বৈষ্ণবকুল ধন্য করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি হইতেছেন বৈষ্ণবকুলতিলক-শ্রীজীব-গোস্বামীর পিতা অনুপম-বল্লভ,[৬] এবং অন্য দুইজন হইলেন অবিস্মরণীয় যশোলাভাধিকারী বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ সনাতন ও রূপ-গোস্বামী।

'পাট নির্ণয়'[৭] পুথিতে লিখিত হইয়াছে যে বাক্‌লাতেই সনাতন ও রূপ ভূমিষ্ঠ হন। কিন্তু অন্য কোথাও ইহার সমর্থন নাই। সনাতন তাঁহার 'দশমটিপ্পনী'তে লিখিয়াছেন,

ভট্টাচার্যং সার্বভৌমং বিদ্যাবাচস্পতীন্ গুরূন্।
বন্দে বিদ্যাভূষণঞ্চ গৌড়দেশবিভূষণম্ ॥ ৬০১ ॥

সুতরাং বিদ্যাবাচস্পতি প্রভৃতির নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হওয়ায় তাঁহারা বিদ্যানুরাগী ও ভক্তিমান হইয়াছিলেন।[৮] এই সময় ১৪৯৩ খ্রী.-এ হোসেন-শাহ্ গৌড়-সিংহাসনে আরোহণ করেন। সনাতন ও রূপ সম্ভবত তখন গৌড় সন্নিকটে রামকেলিতেই বাস করিতেছিলেন এবং তাঁহারা গৌড়-রাজ কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া রাজ-দরবারে যথাক্রমে 'সাকরমল্লিক' ও 'দবীরখাস' পদ অলংকৃত[১০] করিয়া রাজকার্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাজমন্ত্রী হইবার পরেও শাস্ত্রাধ্যয়ন ও শাস্ত্রচর্চা তাঁহাদের অবশ্য-কর্তব্য কর্ম ছিল। সেইজন্য তাঁহাদের নামও চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। সুদূর কর্ণাট-দেশ হইতে ব্রাহ্মণগণ আসিয়া রূপ-সনাতন সকাশে উপস্থিত হইতেন এবং

সনাতন রূপ নিজ দেশস্থ ব্রাহ্মণে।
বাসস্থান দিলা সবে গঙ্গা-সন্নিধানে ॥

এইভাবে 'ভট্টগোষ্ঠী-বাসে ভট্টবাটী নামে গ্রাম' সৃষ্ট হইয়া যায়। নবদ্বীপ হইতেও বিখ্যাত বিখ্যাত পণ্ডিত ও অধ্যাপকগণ রামকেলি-গ্রামে আসিতে লাগিলেন।[১১] সনাতন-রূপের অনুকূলতায় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকেই রামকেলি বাংলা-দেশের এক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিণত হইল।

কিন্তু ভ্রাতৃদ্বয়ের অন্তরে শান্তি ছিল না। তাঁহারা লোকমুখে নদীয়ার গৌরাঙ্গ সম্বন্ধে শুনিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য অস্থির হইলেন। কিন্তু যবনরাজের মন্ত্রী

(৬) সনাতন গোসাঞির সূচক নামক পুথিতে জীবের পিতাকে 'ব্রজবল্লভ' বলা হইয়াছে। (৭) পা. নি.—পৃ. ২; পাটপর্যটনে বলা হইয়াছে (পৃ. ১১১), "নৈহাটাতে রূপ সনাতন আছিলা নির্ধাস।" (৮) 'বাংলার বৈষ্ণব ধর্ম'-গ্রন্থের লেখক জানাইতেছেন যে তাঁহারা 'বাল্যকালেই রীতিমত পারসী অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।' গ্রন্থকার কোন সূত্রে ইহা পাইয়াছেন, তাহা জানান নাই। তু.—রা. ক. সূ., পৃ. ১ (১০) চৈ. ভা.—৩।১০; ২।১ (পৃ. ৮৬); ভ. মা.—পৃ. ১১; গৌ. ভ.— উপক্রম.; ভারতবর্ষ (শ্রাবণ, ১৩৪১), রূপ সনাতনের জাতি—বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম. এ.। সনাতনকে আবার কোনও কোনও পুথিতে (রা. স. উ.—পৃ. ১; স. সূ.—পৃ. ১) বাদশাহের 'উজীর' বলা হইয়াছে। (১১) ভ. র—২।৩৩৪

হিসাবে সর্বদা যবনদিগের সহিত কাটাইয়া নিজদিগকে তাঁহাদের ম্লেচ্ছ-সম বা তদপেক্ষাও হীন মনে হইতে থাকে। কিন্তু একদিন সত্যসত্যই সুযোগ মিলিয়া গেল।

১৫১৪ খ্রী.-এর শেষদিকে নীলাচলাগত বৃন্দাবন-গমনাভিলাষী মহাপ্রভু অসংখ্য সঙ্গীসহ রামকেলিতে আসিয়া উপস্থিত হইলে হোসেন শাহ্ তাহা শুনিয়া স্বীয় অমাত্য কেশবকে[১২] সেই বিপুল জন-সমাগমের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কেশব ছিলেন প্রকৃত ভক্ত। রূপ-গোস্বামী তাঁহার 'পদ্যাবলী'-গ্রন্থে কেশব-ছত্রীর একটি শ্লোকও উদ্ধৃত করিয়াছেন। সেই কেশব সুকৌশলে জানাইলেন যে চৈতন্য একজন দেশান্তরী বৃক্ষতলবাসী ভিক্ষুক সন্ন্যাসী বই নয়। এই বলিয়া তিনি মহাপ্রভুর নিকট গোপনে এক দূত পাঠাইয়া তাঁহাকে সেই স্থান ত্যাগ করিতে অনুরোধ জানাইলেন। এদিকে রাজা কিন্তু রূপকে ডাকিয়া সঠিক খবর জিজ্ঞাসা করিলে তিনিও সুকৌশলে এড়াইয়া গেলেন এবং বাড়ীতে আসিয়া দুইভাই যুক্তিপূর্বক অর্ধরাত্রে উঠিয়া গিয়া চৈতন্যের সহিত মিলিত হইলেন। 'প্রেমবিলাস'-মতে গৌড়ের নিকটবর্তী চতুরপুর নামক স্থানে গিয়া[১৩] তাঁহারা চৈতন্য-দর্শন করেন। যাহাহউক, চৈতন্য সকাশে তাঁহারা গলবস্ত্র ও দন্তেতৃণ হইয়া স্বীয় বিষয়-নিষ্ঠা ও যবন-সঙ্গ জনিত দৈন্যের কথা অতিশয় কুণ্ঠার সহিত প্রকাশ করিলে মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত করিলেন যে পত্রীমধ্যে[১৪] তাঁহাদের মর্মবেদনার আভাস পাইয়া তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইবার জন্যই তিনি রামকেলিতে ছুটিয়া আসিয়াছেন। তিনি তখন তাঁহাদের নূতন করিয়া নামকরণ করিলে তাঁহারা তদবধি 'সনাতন' ও 'রূপ' নামে আখ্যাত হইলেন।[১৫] তারপর সনাতন চৈতন্যকে জানাইলেন যে হোসেন-শাহ্ তাঁহাকে ভক্তি করিলেও গৌড়রাজকে বিশ্বাস করা সমীচীন হইবেনা। তাহা ছাড়া 'তীর্থ যাত্রায় এত সংঘট্ট ভাল নহে রীতি।' চৈতন্য তখন আর কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর সনাতনের কথা বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া[১৬] নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

অল্পকাল পরেই রূপ রাজৈশ্বর্য পরিত্যাগ করিয়া পথে নামিয়া পড়িলেন এবং সনাতন নামেমাত্র রাজ-কর্মচারী থাকিয়া বিষয়-বিমুখ ও সর্বকর্মে উদাসীন হইলেন। হোসেন-শাহ্ শুনিলেন যে সনাতন রাজকার্য ছাড়িয়া শাস্ত্রালোচনায় ও ধর্মানুশীলনে দিনাতিপাত

---

(১২) কেশব ছত্রী—চৈ. চ., ২।১ পৃ. ৮৬ ; ভ. র.—১।৬৩৭ [নিত্যানন্দ বংশমালায় (নি. ব.—পৃ.৬৮) লিখিত হইয়াছে যে বীরচন্দ্রের পূর্ববংগ ও 'উত্তরবংগ-পরিভ্রমণকালে 'রামকেলি হইতে কেশব ছত্রীর নন্দন' দুল ভ-ছত্রী আসিয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান।] ; কেশব-খান—চৈ.ভা.—৩।৪, পৃ. ২৮৪ ; কেশব-বসু—চৈ.না.—৯ম., পৃ. ৫৬৯ ; কেশব সুবুদ্ধি-রায়ের ভ্রাতা ছিলেন (?) — সুবুদ্ধি-রায়। (১৩) ৮ম. বি., পৃ. ৮৯ (১৪) তু.—স্ম. ক. সূ.—পৃ.১ (১৫) চৈ. ভা.—১।১ ; চৈ.চ.—২।১, পৃ. ২৭ ; চৈ. ম. (জ.)—পৃ. ১৩৬ (১৬) শ্রীচৈ. চ.—৩।১৮।১৪-১৫

করিতেছেন। সনাতনের নিকট লোক পাঠাইলে তিনি জানাইলেন যে তিনি রোগগ্রস্ত হইয়াছেন ; হোসেন-শাহ্ রাজ-বৈদ্যের ব্যবস্থা করিলেন ; কিন্তু বৈদ্য আসিয়া বলিলেন সনাতন সম্পূর্ণরূপেই নীরোগ রহিয়াছেন। শেষে স্বয়ং রাজাই সনাতনের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে তাঁহার ছোট-ভাই ফকীর হইয়া চলিয়া গিয়াছেন, বড়-ভাই পশুপক্ষী মারিয়া চাক্‌লার সর্বনাশ করিতেছেন, এরূপ অবস্থায় স্বয়ং তিনিই বা কিরূপে অবহেলা বশত সমূহ রাজকার্যের ক্ষতি করিতে পারেন। সনাতন স্পষ্টই জানাইয়া দিলেন যে তাঁহার দ্বারা আর রাজকার্য পরিচালনা সম্ভবপর নহে, বাদশাহ্ যেন অন্য লোকের ব্যবস্থা করেন। বাদশাহ্ তাঁহাকে নজরবন্দী রাখিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন। সনাতন সম্ভবত ফতেপুর গ্রামবাসী 'শেক হবু'র 'হাওয়ালে' বন্দী রহিলেন।[১৭]

সনাতন রূপের নিকট হইতে পত্র পাইয়াছিলেন যে তিনি অনুপকে লইয়া বৃন্দাবনে যাইতেছেন, মুদির নিকট দশ সহস্র মুদ্রা রাখিয়া আসিয়াছেন ; সনাতন যেন সেই অর্থ সাহায্যে নিজেকে মুক্ত করিয়া চলিয়া আসেন।[১৮] বন্দী-শালায় এই পত্র পাইয়া সনাতন তাঁহাকে ছাড়িয়া দিবার জন্য 'যবনরক্ষকে'র নিকট মিনতি জানাইলেন। প্রচুর অর্থ দিয়া তিনি তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে রাজমন্ত্রী হিসাবে পূর্বে তিনি তাঁহার বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন, এখন তাঁহার বিপদের দিনে তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলে তাহার পুণ্যলাভ ও অর্থলাভ দুইই হইবে। কিন্তু তাহাতেও যবনের মন উঠিল না। বিচক্ষণ রাজমন্ত্রী শেষে 'পাঁচ সহস্র মুদ্রা' দিয়া[১৯] মুক্তিলাভ করিলেন।

গঙ্গা পার হইয়া এবং রাত্রিদিন অবিশ্রান্ত চলিয়া সনাতন পাত্‌ড়ায় পৌঁছাইলে সেই স্থানের ভূঁয়্যা বা 'ভূমিক' তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। কিন্তু আতিথ্যের আতিশয্যে সন্দেহগ্রস্ত হইয়া সনাতন স্বীয় ভৃত্য ঈশানকে জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিলেন যে সে কয়েকটি মোহর সঙ্গে আনিয়াছে। একটি মাত্র মোহর ঈশানের নিকট রাখিয়া সনাতন বাকি

---

(১৭) রূ. স. উ.'-পুথিতে হরু নাম থাকিলেও এই পুথির সহিত রক্ষিত ১১৬৯ সালের লিখিত পুথিতে রক্ষকের নাম 'সেক হবু' বলা হইয়াছে। এশিয়াটিক সোসাইটি প্রভৃতিতে রক্ষিত অন্যান্য কয়েকটি পুথি হইতেও 'হবু' নামই সমর্থিত হয়। (১৮) প্রেমবিলাসের ত্রয়োবিংশ বিলাস (পৃ. ২২৩)-মতে, শ্রীরূপ প্রথমে নিম্নোক্ত কয়েকটি কথা পত্রমধ্যে সনাতনকে লিখিয়াছিলেন : যরী, রলা, ইরং, নয়। সনাতন এইরূপে ইহার মর্মোদ্ধার করিলেন : "যদুপতেঃ ক্বগতা মথুরাপুরী, রঘুপতেঃ ক্বগতোত্তর কোশলা। ইতি বিচিন্ত্য মনং কুরু সুস্থিরং, নসদিদং জগদিত্যবধারয়॥" পত্র পাঠে সনাতনের বিষয়স্পৃহা দূরীভূত হইয়া যায় এবং তদবধি তিনি ভাগবদ্‌বিচারে দিন যাপন করিতে থাকিলে কারারুদ্ধ হন। তারপর তিনি সমস্ত কথা 'পত্রীদ্বারে' শ্রীরূপকে জানাইলে—'রূপ মুদ্রার উদ্দেশ বিজ্ঞাপিল।' (১৯) চৈ.চ.—২।১০., পৃ. ২১৬

সমস্তগুলি ভূঁয়্যার হস্তে সমর্পণ করিলেন। ভূঁয়্যা তাঁহাদিগকে হত্যা করিয়া উক্ত অর্থ সংগ্রহ করিবার সংকল্প করিয়াছিল। কিন্তু সনাতনের এই অত্যাশ্চর্য ব্যবহারে তাহার মনের পরিবর্তন ঘটিল। সঙ্গে চারিজন পাইক দিয়া সে সনাতনকে পাতড়া পর্বত পার করাইয়া দিল। সনাতন তাঁহার শেষ সঙ্গী ঈশানকেও বিদায় দিয়া মাত্র করোয়া-কাঁথা সম্বল করিয়া একাকী অগ্রসর হইলেন।

সন্ধ্যার দিকে সনাতন হাজিপুরে পৌঁছাইয়া এক উদ্যানে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সেই সময় তাঁহার ভগিনীপতি শ্রীকান্ত বাদশাহের অশ্ব-ক্রয়ার্থ হাজিপুরে অবস্থান করিতেছিলেন। সনাতনের মুখে নিরন্তর কৃষ্ণনাম শুনিয়া তিনি টুঙ্গীর উপর বসিয়া সনাতনকে দেখিতে পাইলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে গৃহে আনিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাহাতে ব্যর্থ হইয়া তিনি তাঁহার শীত নিবারণের জন্য একটি দামী শাল আনিয়া দিলেন। সনাতন তাহাও কিছুতেই গ্রহণ করিলেন না। তখন শ্রীকান্ত একটি বনাত আনিয়া দিলে সনাতন তাহাও প্রত্যাখ্যান করিলেন। শেষে একটি ভোট কম্বল আনিয়া দিলে সনাতন আর তাহা প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। শ্রীকান্ত তাঁহাকে গঙ্গাপার করিয়া দিলে তিনি কৃষ্ণনাম জপ করিতে করিতে পশ্চিমের পথে পুনরায় যাত্রা আরম্ভ করিলেন।

ক্রমে তিনি কাশীতে পৌঁছাইলেন। মহাপ্রভু তখন বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া কাশীতে চন্দ্রশেখর-বৈদ্যের গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। সনাতন সেই স্থানে উপস্থিত হইলে মহাপ্রভু সংবাদ পাইলেন যে বাহিরে একজন 'কাঙাল' (বা 'দরবেশ'[২০]) বসিয়া আছে। তাঁহার ইচ্ছায় সনাতনকে গৃহাভ্যন্তরে আনা হইল। কিন্তু তিনি সনাতনকে আলিঙ্গন করিতে চাহিলে সনাতন 'কদর্য বিষয় ভোগ' ও 'নীচ সঙ্গ' জনিত দৈন্যের কথা স্মরণ করিয়া নিজেকে ধিক্কৃত করিলেন।[২১] কিন্তু মহাপ্রভু ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন দান করিলেন।

ক্রমে সনাতন চন্দ্রশেখর-বৈদ্য ও তপন-মিশ্রের সহিত মিলিত হইলেন এবং মহাপ্রভুর নিকট শুনিলেন যে ইতিপূর্বে রূপ এবং অনুপম প্রয়াগ হইতে বৃন্দাবনের পথে যাত্রা করিয়াছেন। তারপর চন্দ্রশেখরের সাহায্যে তাঁহার ক্ষৌরকর্ম ও গঙ্গাস্নানাদি হইয়া গেলে চন্দ্রশেখর তাঁহাকে নূতন বস্ত্র পরিধান করিতে বলিলেন। কিন্তু সনাতন তাহা গ্রহণ করিলেন না। তপন-মিশ্রের গৃহে মহাপ্রভুর সহিত ভিক্ষা-নির্বাহ করিতে গেলে সেই

(২০) "সনাতনের এই ফকির বেশ পরবর্তীকালে আউল, সাঁই, নাড়া, দরবেশ, চরণপালী, দুলালচাদী ইত্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িকগণের দাড়ি, গোঁপ রাখার প্রমাণ স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে।"—ভক্তচরিতামৃত, পৃ. ৫০ (২১) গৌ. ত.—পৃ. ৩০৮

স্থানেও তিনি মিশ্র-প্রদত্ত নব-বস্ত্রখানি ফিরাইয়া দিয়া কেবল তাঁহার সম্মান-রক্ষার্থ একখানি পুরাতন বস্ত্র লইয়া তাহাকেই কৌপিন ও বহির্বাসে পরিণত করিলেন। তদবধি কাশীবাসকালে সনাতন মাধুকরী করিতেন ; এক মহারাষ্ট্রী-বিপ্র সেই কয়েক দিবস তাঁহাকে আপনার গৃহে ভিক্ষা-নির্বাহ করিবার জন্য অনুরোধ জানাইলে তিনি তাহাতেও সম্মত হইতে পারেন নাই। কতকগুলি পুথিতে বলা হইয়াছে[২২] যে এই সময় একদিন মহাপ্রভু তাঁহার ভোট-কম্বলের দিকে বার বার দৃষ্টিপাত করায় তিনি গঙ্গাতীরে গিয়া অন্য এক ব্যক্তির ছিন্ন কন্থার সহিত তাহা বিনিময় করিয়া লন। মহাপ্রভু এইভাবে সনাতনের বিষয়-রোগকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া তাঁহাকে আপনার মহৎ-কর্মের জন্য প্রস্তুত করিয়া তুলেন।

তারপর তত্ত্ব-কথা আরম্ভ হইল। দিনের পর দিন আলোচনা চলিল। সনাতন প্রশ্ন করিয়া যান, মহাপ্রভু উত্তর দেন ; রায়-রামানন্দের সহিত কথোপকথনে মহাপ্রভু ছিলেন প্রশ্নকর্তা এবং রামানন্দ উত্তর-দাতা। এক্ষেত্রে, মহাপ্রভুই উত্তর-দান করিয়া সনাতনের সকল সন্দেহের নিরসন করিলেন। বৃন্দাবন-নির্মিতিতে এই সনাতন (ও রূপ-গোস্বামী) যাহাতে মহাপ্রভুর সকল চিন্তা ও আদর্শের ধারক এবং বাহক হইয়া তাঁহার কল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করিতে পারেন তজ্জন্য তিনি তাঁহাকে ভক্তিতত্ত্ব ও সাধ্য-সাধনার সকল রহস্যের সন্ধান জানাইয়া সুশিক্ষিত করিয়া তুলিলেন এবং তাঁহাকে বৃন্দাবন-গমনের আদেশ দিয়া নীলাচলের দিকে ধাবিত হইলেন। মথুরা, বৃন্দাবন দর্শন করিবার পর একবার তাঁহাকে নীলাচলে যাইবার জন্যও নির্দেশ দিয়া গেলেন।[২৩]

প্রয়াগ হইয়া সনাতন 'রাজসরান' পথে মথুরায় হাজির হইলেন। সেখানে তিনি সুবুদ্ধি-রায়ের নিকট সংবাদ-প্রাপ্ত হইলেন যে রূপ ও অনুপম পুনরায় মহাপ্রভুর দর্শন-লালসায় বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া গঙ্গাতীর-পথে প্রয়াগাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। সনাতন তখন এক ভক্তের সাহায্যে[২৪] দ্বাদশ-কানন পরিক্রমা করিয়া বৃন্দাবনের বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বৃক্ষতলই তাঁহার শয্যা হইল। এবং তিনি

মথুরামাহাত্ম্যশাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া।
লুপ্ততীর্থ প্রকট কৈল বনেতে ভ্রমিয়া ॥

প্রায় বৎসর-কাল যাবৎ এইভাবে কাটাইয়া তিনি নীলাচলের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ঝারিখণ্ডের পথে চলিতে চলিতে জলের দোষ ও উপবাসবশত তাঁহার 'গাত্রকণ্ডু হৈল রসা খাজুয়া হৈতে'। অনেক যাতনা সহ্য করিয়া শেষে তিনি নীলাচলে পৌছাইলেন এবং হরিদাসের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এইখানেই মহাপ্রভুর সহিত তাঁহার পুনর্মিলন

(২২) তু.—ঐ ; সু. স্ত.—পৃ. ১ ; স. সূ.—পৃ. ১ ; সূ.—পৃ. ৩ (২৩) শ্রীচৈ.'চ.—৪।১৩।১৯(২৪) স. সূ. (পৃ. ১)-মতে মাধবেন্দ্র-পুরীর শিষ্য কৃষ্ণদাস·বিপ্রের সাহায্যে ; সূ.-মতে (পৃ.২) সুবুদ্ধির সাহায্যেই।

ঘটিল। বারাণসীর মত এখানেও তাঁহার নিজবংশ ও কুলকর্ম সম্বন্ধে ঐকান্তিক দৈন্যোক্তি এবং গাত্র-কণ্ডূজনিত সসংকোচ উক্তি সত্ত্বেও মহাপ্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গনদান করিলেন। মহাপ্রভুর জীবনে ভক্তি ও প্রেমকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিয়া সনাতনের জীবন সার্থক ও সর্বশক্তি-পরিপূরিত হইল। মহাপ্রভু আর একদিন আসিয়া বলিয়া গেলেন:

ভক্তি বিনা কৃষ্ণে কভু নহে প্রেমোদয়।
প্রেম বিনা কৃষ্ণপ্রাপ্তি অন্য হৈতে নয়॥

জ্ঞানের উন্নত-শিখরে আরোহণ করিলে মানুষের এক-এক সময় কর্মের প্রতি অনাস্থা আসে। তখন তাহার ব্যক্তিগত মোক্ষটাই বড় হইয়া উঠে, ইহ-জীবনের প্রতি তাহার আর তখন আকর্ষণ থাকে না। জ্ঞানের সন্ধান পাইয়া সনাতনের মনে এইরূপ একটি অনাশক্তির ভাব দেখা দিল। মহাপ্রভু বুঝিলেন যে জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয় সাধন করিতে না পারিলে জীবনের কোন সার্থকতাই থাকে না। সনাতনের জীবনে সেই সমন্বয় সাধিত না হইলে জীবনের যে মুখ্য উদ্দেশ্য বিশ্বকল্যাণ, তাহাই ব্যাহত হইয়া তাহার সকল আশা আকাঙ্ক্ষাকে ধূলিসাৎ করিয়া দিবে। কেবলমাত্র ভক্তি বা প্রেমই সেই সমন্বয় সাধনে সমর্থ। ভক্তিকে তত্ত্বরূপে গ্রহণ করিয়া সে সম্বন্ধে সকল কথাই তিনি সনাতনকে ইতিপূর্বে জানাইয়াছেন। এখন সনাতনের বাস্তব-জীবনে কার্যকারিতার মধ্যে তদনুভূতির একান্ত প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া তাঁহার নিজের প্রতিই সনাতনের প্রেম-ভক্তিকে উদ্বোধিত করিলেন। তিনি একদিন বলিয়া দিলেন যে চৈতন্যগত-প্রাণ সনাতনের দেহ আর সনাতনের নহে, চৈতন্যেরই; তদ্দ্বারা তিনি বহুবিধ কর্ম-সম্পাদনের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন।

ভক্তভক্তি কৃষ্ণপ্রেম তত্ত্বের নির্ধার।
বৈষ্ণবের কৃত্য আর বৈষ্ণব আচার॥
কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণপ্রেম সেবা প্রবর্তন।
লুপ্ত তীর্থ-উদ্ধার আর বৈরাগ্য শিক্ষণ॥

তিনি আজ্ঞা-প্রদান করিলেন:

তুমিহ করিহ ভক্তি শাস্ত্রের প্রচার।
মথুরা লুপ্ততীর্থের করিহ উদ্ধার॥

এবং তারপর তিনি—

শুষ্ক বৈরাগ্য জ্ঞান সব নিষেধিল॥২৫

সনাতন বুঝিলেন যে বৃন্দাবন-মথুরাতে প্রত্যাবর্তন করিয়া এ সমস্ত কর্মই তাঁহাকে করিতে হইবে। 'প্রেমপরিপ্লুতান্তর' সনাতনের দেহত্যাগ বাসনা ছুটিয়া গেল। তাঁহার প্রেম তাঁহার

(২৫) চৈ. চ.—পৃ. ২৫৩

ভবিষ্যৎ কর্মের মধ্যে জ্ঞান-রূপায়ণের যে সম্ভাবনাকে মন্ত্রিত করিয়া তুলিল, তিনি তৎসম্বন্ধে অবহিত হইলেন।

এতৎসত্ত্বেও মহাপ্রভু সনাতনকে নানাভাবে পরীক্ষা করিয়া লইলেন। জ্যৈষ্ঠমাসের এক মধ্যাহ্নে তিনি যমেশ্বর-টোটা হইতে সনাতনকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। হরিদাস-আশ্রম হইতে টোটা যাইবার মাত্র দুইটি পথ। হয় সমুদ্রপথে, নতুবা সিংহদ্বারের পাশ দিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু গৌড়-দরবারে সর্বদা যবনদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া নীচ-জাতির সেবা ও নীচ-জাতির সহিত ব্যবহার করিতে হইত বলিয়া সনাতনের কুণ্ঠার অবধি ছিল না। সিংহদ্বার পথে গমন করিলে পাছে সেই স্থানের কর্মব্যস্ত ব্রাহ্মণ-সেবকদিগের অঙ্গ-স্পর্শ করিয়া মহাপাতকে পতিত হন, তজ্জন্য তিনি সেই পথে না গিয়া সমুদ্র-পথ ধরিলেন। জ্যৈষ্ঠের প্রচণ্ড উত্তাপে জলন্ত অঙ্গার তুল্য বালুকণার উপর চলিতে চলিতে তাঁহার পায়ে ফোস্কা পড়িয়া গেল। তাঁহার সেই বিপুল 'মর্যাদা'-বোধ ও অসীম সহনশীলতা দেখিয়া মহাপ্রভু বিস্মিত হইলেন। এইভাবে তিনি সর্বপ্রকার কঠোর পরীক্ষার মধ্য দিয়া উত্তীর্ণ হইলে মহাপ্রভু তাঁহাকে যে সম্মান প্রদর্শন করিলেন তাহা একপ্রকার তুলনা-রহিত। কিন্তু মহাপ্রভু-প্রদত্ত এই সম্মান সনাতনকে আরও কুণ্ঠিত করিল। তাঁহার গাত্রকণ্ডু সত্ত্বেও মহাপ্রভু যে তাঁহাকে বারবার এইরূপ নিবিড়ভাবে আলিঙ্গনাবদ্ধ করেন, তাহা তাঁহাকে পীড়িত করিল। চৈতন্য-দর্শনে কৃতার্থ হইতে আসিয়া তাঁহার যেন হিতে বিপরীত হইল। একদিন তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া জগদানন্দ-পণ্ডিতকে এই সম্বন্ধে বলিলে তিনি মহাপ্রভুর পূর্ব-নির্দেশ অনুযায়ী সনাতনকে বৃন্দাবনে চলিয়া যাইবার কথা বলিলেন এবং সনাতনও বুঝিলেন যে তাহাই ভাল, বৃন্দাবনই তাঁহার 'প্রভুদত্ত'-দেশ। কিন্তু এই কথা কানে গেলে মহাপ্রভু জগদানন্দের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া জানাইলেন যে পারমার্থিক জ্ঞানে সনাতন জগদানন্দ হইতে বহু উর্ধ্বে অবস্থিত। এমন কি স্বয়ং মহাপ্রভুকেও উপদেশ বা নির্দেশ দিবার শক্তি সনাতনের আছে। সুতরাং জগদানন্দের উক্ত প্রকার উক্তি অত্যন্ত গর্হিত হইয়াছে। প্রায় এক বৎসরকাল সনাতনকে নীলাচলে রাখিয়া শেষে তিনি তাঁহাকে বিদায় দিলেন। মহাপ্রভু যে পথে বৃন্দাবন-গমন করিয়াছিলেন, সনাতনও সেই পথে যাত্রা করিলেন।

মহাপ্রভুর দ্বারা প্রেরিত হইয়া সর্বপ্রথম বৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন লোকনাথ, তাঁহার সঙ্গে ছিলেন ভূগর্ভ। তাহার পর আসেন সুবুদ্ধি-রায়। তারপর রূপ-সনাতনাদি একে একে আসিয়া পৌছান। সনাতনের নীলাচল হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁহার কুল-পুরোহিত ব্রাহ্মণও সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন।[২৬] 'ভক্তিরত্নাকর'-উল্লেখিত এই কুলপুরোহিতের প্রকৃত নাম জানিতে পারা যায় না; কিন্তু হরিচরণদাসের 'অদ্বৈত-

(২৬) ভ. র.—১।৬৮০

মঙ্গলে'র বর্ণনা অনুযায়ী[২৭] শ্রীনাথ-আচার্য নামে এক দাক্ষিণাত্য-বাসী বিপ্র সনাতনের পিতার আমল হইতেই তাঁহাদের পুরোহিত ছিলেন, এবং সনাতন ও রূপের বাল্যকালে তিনি তাঁহাদিগকে নানাবিধ শাস্ত্র, অলংকার ও বেদান্ত-ভাগবতাদি শিক্ষা দিয়া গঙ্গাতীরে তাঁহাদিগকে কৃষ্ণমন্ত্র দান করেন। পরে তিনি অদ্বৈত-শাখাভুক্ত হন এবং অদ্বৈত-শিষ্য কৃষ্ণদাস-বিপ্রের নিকট অদ্বৈত-সম্বন্ধীয় নানা-বিবরণ-সংবলিত একখানি কড়চা-গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া হরিচরণদাসকে তাহা প্রদান করেন এবং নিজেও তাঁহাকে এতৎ-সম্বন্ধীয় নানাবিধ তথ্য বলিয়া শুনান। এই বিবরণ সত্য হইলেও উপরোক্ত কুল পুরোহিত যে অতিবৃদ্ধ শ্রীনাথ-আচার্য হইতে পারেন না, তাহা সহজেই অনুমিত হয়। তবে তিনি শ্রীনাথের পুত্র হইতেও পারেন। 'ভক্তিরত্নাকর' অনুযায়ী সনাতনের পুরোহিত-পুত্র গোপাল-মিশ্রও সনাতনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সনাতনের মৃত্যুর পরে তিনি নন্দীশ্বরে সনাতনের কুটীর-সন্নিধানেই বাস করিতে থাকেন এবং তাঁহাদের বংশ খাড়গ্রামে বাস করিতেছিল। শ্রীনিবাস, নরোত্তম, শ্যামানন্দ বৃন্দাবনে আসিলে নন্দীশ্বরে আসিয়া গোপালাদি ভক্তের সহিত একত্রে রাত্রি যাপন[২৮] করিয়া যান।

নীলাচল হইতে ফিরিয়া সনাতন চিরতরে বৃন্দাবনের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। অবশ্য বৃন্দাবন তখন জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। প্রথম প্রথম ভক্তবৃন্দকে বনে বনে ঘুরিয়া কাটাইতে হইয়াছে। রূপ-সনাতনেরও এইভাবে দিন কাটিত। প্রতিদিন এক একটি বৃক্ষতলে শয়ন এবং বিপ্র-গৃহে মাধুকরীর দ্বারা শুষ্ক-রুটি চানা চিবাইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে হয়।[২৯] ভোগের কোন সামগ্রীই তাঁহাদের ছিল না। 'করোয়া মাত্র হাতে কাঁথা ছিঁড়া বহির্বাস।' এই কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্য দিয়াই তাঁহাদের বিরাট কর্মের আরম্ভ হইয়া গেল। ইহার মধ্যেই তাঁহাদের কৃষ্ণ-কথা ও কৃষ্ণ-নাম চলিত এবং যে-'ভক্তিরসশাস্ত্র' প্রণয়ন ও প্রচারের মধ্যে তাঁহাদের আদর্শের মূল নিহিত ছিল, এই দুঃসময়ের মধ্যেও সেই শাস্ত্র সংগ্রহ ও সংরচনের সূত্রপাত হইয়া গেল। আবার মথুরা-মাহাত্ম্য-শাস্ত্র সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে লুপ্ত-তীর্থোদ্ধারের জন্য সনাতন বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। মহাপ্রভু তাঁহার 'কাঁথা করঙ্গিয়া কাঙাল ভক্তগণ'কে পালন করিবার জন্য তাঁহাকে নির্দেশ দিয়াছিলেন। সুতরাং ভক্তবৃন্দের অভ্যর্থনা এবং অবস্থানাদি-সম্পর্কেও সনাতন সতর্ক হইলেন। ক্রমে ক্রমে গৌড়-নীলাচল হইতে ভক্তবৃন্দ আসিয়া পৌঁছাইতে লাগিলেন। বাঙালী-ভক্তবৃন্দের চেষ্টায় বৃন্দাবনে যেন একটি উপনিবেশ গড়িয়া উঠিল।

মহাপ্রভু তাঁহার জীবদ্দশাতে গোস্বামিভ্রাতৃদ্বয়ের সমস্ত সংবাদ রাখিতেন। 'প্রেম-

(২৭) পৃ. ৩৯-৪১, ২৭ (২৮) ভ. র.—৫।১৩৩০-৩৫ (২৯) গৌ. ত.—পৃ. ৩০৮

'বিলাস'কার-জানাইয়াছেন[৩০] যে সনাতন নীলাচলে গোপাল-ভট্টের বৃন্দাবনা-গমন সংবাদ প্রেরণ করিলে মহাপ্রভু স্বহস্তে তাহার প্রত্যুত্তর লিখিয়া পাঠান এবং তিনি সনাতন ও রূপের হস্তে গোপালাদির সমূহভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। তাঁহাদের কর্তব্যনিষ্ঠা তাঁহার শ্রদ্ধা ও গৌরবের বিষয় ছিল। বস্তুত, নীলাচলে স্বরূপ-রামানন্দ এবং বৃন্দাবনে রূপ-সনাতন মহাপ্রভুর সকল তত্ত্ব, চিন্তা ও আদর্শের ধারক- এবং বাহক-রূপে অবস্থান করিতেন। তাঁহাদের সম্বন্ধে মহাপ্রভু সংশয়-রহিত ছিলেন।

মহাপ্রভু জগদানন্দ-পণ্ডিত মারফত বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, সনাতন যেন বৃন্দাবনে তাঁহার জন্য একটি স্থান নির্দেশ করিয়া রাখেন। জগদানন্দ চলিয়া গেলে সনাতন কালীয় হ্রদের পার্শ্বস্থিত দ্বাদশাদিত্য-শিলায় একটি মঠ পাইয়া তাহাকেই মহাপ্রভুর উপযুক্ত স্থান বিচার করিয়া তাহা সংস্কার করিয়া রাখিলেন এবং ব্রজবাসী-গণ সেই মঠের সম্মুখে একটি চালা নির্মাণ করিয়া দিলে তিনি সেইস্থানে বসতি স্থাপন করিলেন।[৩১] তাহার পর তিনি সম্ভবত মহাবনে,[৩২] কিংবা মথুরায় দামোদর-চৌবের নিকট[৩৩] মদনগোপাল-বিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া সেই যমুনা-পুলিনেই[৩৪] এক পর্ণ-কুটীর নির্মাণ করিয়া তাহার সেবা[৩৫] আরম্ভ করিলেন। কিন্তু সেবা-পূজার আয়োজনের দৈন্য তাঁহাকে পীড়া দিতে লাগিল। সৌভাগ্যবশত এই সময় এক ধনবান ব্যক্তির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটে। তাঁহার নিবাস মূলতান দেশে, নাম কৃষ্ণদাস-কপূর এবং তিনি ছিলেন জাতিতে ক্ষত্রিয়। যমুনার স্রোতে নৌকা বাহিয়া চলিতেছিলেন।[৩৬] উপকূলে সনাতন বসিয়াছিলেন, কৃষ্ণদাস নৌকা ভিড়াইয়া সনাতনের চরণে আত্মসমর্পণ করিলে তিনি কৃষ্ণদাসকে মদনমোহনের চরণে সমর্পণ করেন। তাহার

---

(৩০) ১ম. বি., পৃ. ১২ (৩১) চৈ. চ.—৩।১৩; ভ. র.—৫।২০২৪; মুরলীবিলাসেও (পৃ. ২৭৩) সনাতনের এই দ্বাদশাদিত্য-তীর্থবাসের উল্লেখ আছে (৩২) ভ. র.—২।৪৫৫-৬০ (৩৩) প্রে. বি.-এর ২৪শ. বি. (পৃ. ২৭৩)-মতে দামোদর চৌবে অদ্বৈত প্রভুর নিকট হইতে যে বিগ্রহ লইয়া যান, সনাতন তাহাই ভিক্ষা করিয়া আনেন। অ. প্র. (৪র্থ. অ., পৃ. ১৬)-মতে অদ্বৈত ঐ বিগ্রহটি 'চৌবে' নামক ব্যক্তিকে অর্পণ করিয়াছিলেন। বৈ. দি.-কার বলেন (পৃ.৭৮) সনাতন মহাবনবাসী পরশুরাম-চৌবে নামক ব্রাহ্মণের নিকট বিগ্রহ প্রাপ্ত হন। লেখক পরশুরামের নাম কোথায় পাইলেন জানা যায় নাই। মু. বি. (পৃ. ২৯৯)-মতে সনাতন ভিক্ষার্থে ভ্রমণকালে মথুরায় এক বিপ্রগৃহে গোপালের দর্শন পান। (৩৪) ভ. র—২।৪৫৬; যমুনাতীরে আদিত্য-টিলায়—বৈ. দি., পৃ. ৭৮ (৩৫) শ্রীকৃষ্ণদাস-ব্রহ্মচারী পুজারী নিযুক্ত হন।—ঐ। এই গ্রন্থমতে সনাতন নন্দগ্রামে চারিটি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া হরিদাস নামক ভক্তকে পুজারী নিযুক্ত করেন। (৩৬) ভ. র.—২।৪৬৪; প্রে. বি.-এ (১৩শ. বি.) লিখিত হইয়াছে যে মহাজনের নৌকা চড়ায় ঠেকিয়া গেলে তিনি সনাতনের নিকট প্রার্থনা জানান এবং নৌকা চলিয়া যায়। মহাজন পূর্ব-প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সেবারকার বাণিজ্যের সমস্ত অর্থ দান করেন। গোবিন্দ, গোপীনাথ, রাধাদামোদর, রাধাবিনোদ, রাধারমণ এবং শ্যামসুন্দরের মন্দির নির্মাণ ও সেবার ব্যবস্থা হয়।

পরেই মন্দিরের কার্য আরম্ভ হইয়া গেল, কৃষ্ণদাস-কপূর নানাবিধ বেশ-ভূষায় বিগ্রহকে সজ্জিত করিয়া সাড়ম্বর-সেবাপূজার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।[৩৭] সনাতন যখন বৃন্দাবন হইতে আসিয়া নন্দীশ্বরে পাবন-সরোবরে বাস করিতেছিলেন, তখনই ব্রজবাসী-গণ তাঁহার জন্য একটি কুটির নির্মাণ করিয়া দিলে তিনি তদবধি তাহাতেই বাস করিতে থাকেন। মধ্যে মধ্যে রূপ-গোস্বামী আসিয়া তাঁহার সহিত অবস্থান করিয়া যাইতেন।[৩৮] পরবর্ত্তিকালে অবশ্য সনাতন গোবর্ধনে গিয়া চক্রতীর্থে বাস-স্থাপন করেন। সেখান হইতে তিনি প্রত্যহ গোবর্ধন পরিক্রমা করিয়া আসিতেন। বার্ধক্য পর্যন্ত এইস্থানে থাকিয়াই তাঁহার জীবন অতিবাহিত হয়।[৩৯]

কিন্তু মহাপ্রভু-আকাঙ্ক্ষিত লুপ্ত-তীর্থের উদ্ধার ও বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তিশাস্ত্র প্রণয়নও চলিতে থাকে। জীব-গোস্বামী জানাইয়াছেন[৪০] যে প্রথমে সনাতন-গোস্বামী টীকাসহ 'শ্রীভাগবতামৃত' গ্রন্থটি (বৃহদ্‌ভাগবতামৃত—দুই খণ্ডে) প্রণয়ন করেন। তাহার পর 'শ্রীল সনাতন-গোস্বামী-প্রভুপাদকৃতা দিগ্‌দর্শনী টীকা'র[৪১] সহিত গোপাল-ভট্ট-গোস্বামীর 'হরিভক্তিবিলাস' প্রকাশিত হয়। 'প্রেমবিলাস'-কার[৪২] বলেন যে সনাতনের আদেশ ও নির্দেশানুযায়ী এই পুস্তকখানি গোপাল-ভট্টের সাহায্যে রচিত হইবার পর সংশোধনার্থ তৎ-কর্তৃক সনাতনের হস্তে প্রদত্ত হইলে তিনি তাহাকে নিজ পুস্তক বলিয়াই গ্রহণ করেন। কিন্তু সম্ভবত সনাতনের ইচ্ছানুযায়ী তাহা গোপাল-ভট্টের নামে প্রচলিত হয়।[৪৩] পরবর্তী গ্রন্থ সম্ভবত 'লীলাস্তব বা দশমচরিত।'[৪৪] তাহার পর একেবারে শেষে তিনি 'বৈষ্ণবতোষণী' (১৫৫৪ খৃ.)-গ্রন্থ রচনা করেন। ভাগবত (দশমস্কন্ধ)-পাঠ করিয়া তিনি যেরূপে তাহার রসস্বাদন করিয়াছিলেন, তদনুযায়ী এই গ্রন্থখানি লিখিত হয়।[৪৫] কিন্তু এই গ্রন্থখানি রচিত হইবার পর তিনি জীবের উপর তাহার সংশোধনের ভার-অর্পণ করেন। প্রথম রচনার ২৮ বৎসর পরে জীব ঐ গ্রন্থটিকে 'লঘুতোষণী' নাম দিয়া প্রকাশ করেন। সনাতন মূল পুথিখানি লিখিয়াছিলেন ১৪৭৬ শকাব্দে বা ১৫৫৪খৃ.-এ।[৪৬] ইহাই তদ্রচিত শেষ গ্রন্থ।[৪৭] ইহা ছাড়া 'পদ্যাবলী' নামক সংগ্রহ-গ্রন্থেও রূপ-গোস্বামী সনাতনের একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় মহাপণ্ডিত সনাতন সংস্কৃত ভাষায় লিখিত

---

(৩৭) ভ. র.—২।৪৭১ (৩৮) ঐ.—৫।১৩১১ (৩৯) ঐ.—৫।৭২৮ (৪০) ঐ—১।৮০০-৮০১ (৪১) হ. বি. (৪২) ১৮ শ..বি., পৃ. ২৭৪ (৪৩) হ. বি. (ভ. র.—১।১৫১) (৪৪) গ্রন্থখানি রূপ কিংবা সনাতন কাহার, সে বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই। দ্র.—চৈ. উ.—পৃ. ১৩৩-৩৫ (৪৫) ভ. র.—১।৫৩৫ (৪৬) সং. বৈ. তো.—সমাপ্তি-সূচক বাক্য (৪৭) জীব-গোস্বামী 'শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণং' বলিয়া একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। টীকাকার হরেকৃষ্ণ-আচার্য জানাইতেছেন যে জীব-গোস্বামী সনাতনের 'লঘুহরিনামামৃত ব্যাকরণ'টিকে বৃহদায়তন করিয়া ঐ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

চারিখানি গ্রন্থে তাঁহার রচনা শেষ করিলেও তাঁহার দ্বারা চৈতন্য-কল্পিত ভক্তিশাস্ত্র প্রবর্তনের যে সূত্রপাত হইয়া গেল, তাঁহার সুযোগ্য উত্তরাধিকারী রূপ-জীব প্রভৃতি গোস্বামী-বৃন্দের প্রচেষ্টায় তাহাই ক্রমে বৃন্দাবন-প্রদেশকে পরিপ্লাবিত করিয়া সমগ্র ভারতভূমিতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বৈষ্ণব ধর্ম, বৈষ্ণব দর্শন বা বৈষ্ণবসাধনার আচার প্রণালী সম্বন্ধে চৈতন্য স্বয়ং কোন শাস্ত্র রচনা করিয়া যান নাই। কিন্তু সনাতন-রূপ ও জীবগোস্বামী তন্নির্দেশিত যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন, তাহাই চিরকাল চৈতন্যলিখিত শাস্ত্রের স্থান পূরণ করিয়া আসিতেছে।

বৃন্দাবন-নির্মিতির প্রথম-পথিকৃৎ হিসাবে সেই বিরাট কর্মের সমূহ-দায়িত্ব যাঁহাদিগকে মাথায় পাতিয়া লইতে হইয়াছিল, সনাতন ছিলেন তাঁহাদেরও গুরু-স্থানীয়। স্নেহে, ভালবাসায় সকলের চিত্তই তাঁহাকে ভরিয়া দিতে হইয়াছিল। লোকনাথ-কাশীশ্বর-কৃষ্ণদাসকে তিনি যথেষ্ট ভালবাসিতেন এবং শ্রদ্ধাও করিতেন। ভূগর্ভ-গোপাল-রঘুনাথাদির প্রতি তাঁহার স্নেহ ছিল অপার। জগদানন্দের বৃন্দাবন-পরিক্রমায় তাঁহাকে সর্বক্ষণের সঙ্গী হইতে হইয়াছিল। বিগতস্পৃহ রঘুনাথদাস-গোস্বামীকে শ্বাপদ-সংকুল অরণ্যস্থ বৃক্ষতল-শয্যা হইতে আনয়ন করিয়া তাঁহাকেই কুটির-বাসী করিয়া দিতে হইয়াছিল। এদিকে মহাপ্রভুর সহিতও তিনি যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিতেন। গোপাল-ভট্ট বৃন্দাবনে আসিয়া পৌঁছাইলে তিনি অবিলম্বে মহাপ্রভুর নিকট সেই সংবাদ প্রেরণ করিতে ভুলিয়া যান নাই। এতটা কর্তব্য- ও দায়িত্ববোধ-সম্পন্ন এবং সর্বগুণের অধিকারী হইয়াও তিনি ছিলেন নিরভিমান। তিনি কিংবা তাঁহার অনুজ রূপ বিপুল জ্ঞানভাণ্ডারের অধিকারী হইয়াও যে এক পণ্ডিতম্মন্য ও অহংকারী ব্যক্তিকে[৪৮] বিনা শাস্ত্রবিচারেই জয়পত্র লিখিয়া দিতে পারিয়াছিলেন, ইহা তাঁহাদের বিপুল মহত্ত্ব ও নিরভিমান অন্তরেরই সম্যক্ পরিচয়।[৪৯] সনাতনের এই প্রেম ও কর্মকুশলতা তাঁহাকে সারা বৃন্দাবন ও সংলগ্ন অঞ্চলে জনপ্রিয় করিয়াছিল।[৫০] তাঁহার ব্রজ-পরিক্রমাকালে বৃন্দাবন-বাসীদিগের গৃহে গৃহে সাড়া পড়িয়া যাইত এবং তিনি যথাসাধ্য সকলেরই মনস্কামনা পূর্ণ করিয়া দিতেন। ক্ষুদ্র কানাই, কানাইর মাও তাঁহার স্নেহদৃষ্টি হইতে বঞ্চিত হন নাই। সনাতনের কৃপায় এই কানাই পরম বৈষ্ণব হইয়াছিলেন। শ্রীনিবাসাদি বৃন্দাবন হইতে বিদায়ের পূর্বে তাঁহার (কানাই-এর) আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সম্ভবত জাহ্নবা-ঠাকুরাণীর প্রথমবার বৃন্দাবন আগমনকালে সনাতন-গোস্বামী জীবিত ছিলেন।

---

(৪৮) দ্র.—জীব-গোস্বামী (৪৯) প্রে. বি.—১৯শ. বি., পৃ. ৩২৫-২৬ ; ভ. মা.—পৃ. ১৮ ; দ্র.—অ. লী.—পৃ. ১২৮ (৫০) প্রে. বি.—১৬শ. বি., পৃ. ২৩২ ; মু. বি.—পৃ. ২৭৩-৩৪০ ; নি. বি.—পৃ.৩৩ ; মুরলীবিলাস-মতে যেইবার জাহ্নবা-ঠাকুরাণী বৃন্দাবনে আসিয়া দেহ রক্ষা করেন, সেইবার তাঁহার দত্তকপুত্র রামাইও তাঁহার সহিত আসিয়া সনাতন ও রূপকর্তৃক অনুগৃহীত হইয়াছিলেন।

কিন্তু শ্রীনিবাসের বৃন্দাবনাগমনকালে সনাতন ইহজগৎ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার আবির্ভাব ও তিরোভাব কাল সম্বন্ধে আধুনিক গ্রন্থকর্তৃগণের অনেকেই নানাবিধ অনুমান করিয়াছেন।[৫১] কিন্তু সেই সমস্ত অনুমান মূলক উক্তি সনাতন-গোস্বামীর তিরোধান-কালের উপর কোনও আলোকপাত করিতে পারে নাই। ১২৯৯ সালের 'সাহিত্য'-পত্রিকার আশ্বিন-সংখ্যায় ক্ষীরোদ চন্দ্র রায় মহাশয় নানাভাবে অনুসন্ধান করিয়া বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দের আবির্ভাব- ও তিরোভাব-কাল সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহাতে তিনি সনাতন সম্বন্ধে কেবল এইটুকু বলিতে সক্ষম হইয়াছিলেন যে ১৫১৫ খ্রী.-এ সনাতনের বৃন্দাবন গমন ঘটে। প্রকৃতপক্ষে, তাঁহার সম্বন্ধে এতদতিরিক্ত কিছু বলাও প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। তবে এতৎসম্বন্ধে কেবল এইটুকু বলা যাইতে পারে যে ১৫৫৪ খ্রী.-এ যদি 'বৈষ্ণবতোষণী'-গ্রন্থখানি লিখিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি যে তদবধি বাঁচিয়া ছিলেন তাহাতে সন্দেহ থাকেনা। কিন্তু সম্ভবত তিনি আরও কিছুকাল বাঁচিয়াছিলেন। নাভাজী বলেন যে 'আকব্বর পাৎশা' সনাতনের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ১৫৫৬ খ্রী.-এ মাত্র ১২।১৩ বৎসর বয়সে আকবর বাদশাহ্ সিংহাসনের অধিকারী হইলেও, বৈরাম খাঁই তখন নাবালক-রাজার অভিভাবক হিসাবে রাজ্য-পরিচালনার সমূহ কার্য-নির্বাহ করিতেন। ঠিক-ঠিকভাবে আকবরের হস্তে রাজ্য অসিয়া পৌঁছে ১৫৬২ খ্রী.-এ. (**Advanced History of India p.p. 445, 448**)। তখন হইতেই তিনি প্রকৃত বাদশাহ্। সুতরাং নাভাজীর উক্তি সত্য হইলে ধরিয়া লওয়া যায় যে অন্তত ঐ সময় পর্যন্ত সনাতন জীবিত ছিলেন। 'প্রেমবিলাস'-অনুযায়ী শ্রীনিবাসের প্রথমবার বৃন্দাবন-গমনের চারি মাস পূর্বে সনাতনের দেহান্তর ঘটে।

(৫১) ১৪৮৮-১৫৫৮—কেদার নাথ দত্ত (সজ্জন তোষণী—১৮৮৫), রজনীকান্ত বসু ('C অগ্র.-পৌষ, ১৩০৮); প্রায় ১৫০০ শকাব্দ—অঘোর চট্টোপাধ্যায় (ভক্ত চরিতামৃত—পৃ. ১৪৪); ১৪৮৮-১৫৫৮—কালীকান্ত বিশ্বাস (বীরভূমি, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১), এতদনুযায়ী রূপ=১৪৬৯-১৫৭৩

সনাতনের ব্রাহ্মণত্ব

'চৈতন্যচরিতামৃতে' দেখা যায় যে সনাতন ও রূপ নিজদিগকে 'নীচ' ও 'ম্লেচ্ছ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বারাণসীতে মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইবার পূর্বে সনাতনকে দরবেশ বলা হইয়াছে।[৫২] 'প্রেমবিলাসে' এবং রাধামোহন দাসের একটি পদেও লিখিত আছে[৫৩] যে সনাতন 'দরবেশ-বেশে' চন্দ্রশেখর-গৃহে উপনীত হন। 'ভক্তমাল'-মতে সনাতন-রূপ বাদশাহের উজীর ছিলেন, তাঁহাদের খেতাব ছিল 'সাকরমল্লিক' ও 'দবীরখাস' এবং সনাতন নিজেই দরবেশ হইয়া যাইবার ইচ্ছা পোষণ করিতেছেন। 'চৈতন্যচরিতামৃত', 'চৈতন্যভাগবত', 'ভক্তমাল' প্রভৃতি গ্রন্থে একথাও বলা হইয়াছে যে 'রূপ' ও 'সনাতন' এই নাম দুইটিই তাঁহাদের আসল নাম নহে। এইগুলি মহাপ্রভু-প্রদত্ত নাম। কোথাও কোথাও দেখা যায় যে সনাতন ও রূপের পূর্বনাম ছিল যথাক্রমে অমর ও সন্তোষ। আবার 'চৈতন্যচরিতামৃতে' দেখা যায় যে নীলাচলে আসিয়া সনাতন যবন হরিদাসের নিকটেই আশ্রয়-গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং নিজেকে নীচ-বংশোদ্ভূত বলিয়া আখ্যাত করিয়াছিলেন। এমনকি, অধর্ম ও কুকর্মই যে তাঁহার কুলকর্ম, তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে মহাপ্রভু সেইরূপ বংশকেও ঘৃণা না করিয়া তাহার মঙ্গল সাধন করিয়াছেন। তাহা ছাড়া আরও দেখা যায়[৫৪] যে সনাতন জগন্নাথ-মন্দিরে, বা এমন কি সিংহদ্বারেও যাইতেন না। কারণ, সেখানে ঠাকুরের সেবকদল সর্বদাই ঘুরাফিরা করিতেছে, তাহাদিগকে স্পর্শ করিয়া ফেলিলে তাহার সর্বনাশ ঘটিবে। আবার রূপ-গোস্বামীর মুখে কোথাও কোথাও অনুরূপ দৈন্যোক্তি শ্রুত হয়। প্রয়াগে বল্লভ-ভট্ট যখন রূপ ও অনুপমকে আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর হন, তখন তাঁহারা নিজদিগকে 'অস্পৃশ্য' ও 'পামর' বলিয়া দূরে সরিয়া গিয়াছিলেন। ভট্ট তাহাতে অত্যন্ত বিস্মিত হওয়ায় মহাপ্রভু তাঁহাদের সকল বিবরণ জানাইয়া বলিলেন যে ভট্ট হইতেছেন 'বৈদিক যাজ্ঞিক' এবং 'কুলীন প্রবীণ'; সুতরাং তাঁহাদিগকে তাঁহার স্পর্শ করা উচিত নহে।[৫৫] এই সমস্ত প্রমাণের বলে রূপ-সনাতনকে যবন বা অ-হিন্দু বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। কিন্তু অন্তত দুইশত বৎসরের প্রাচীন 'রূপ-গোস্বামীর সূচক'-নামক একটি পুঁথিতে[৫৬] লিখিত আছে যে রূপ-সনাতনের পিতা কুমারদেব 'দ্বিজকুলে পুণ্যবান' ছিলেন, এবং রূপ-সনাতনও ব্রাহ্মণ ছিলেন। আবার জীব-গোস্বামীর 'লঘুতোষণী' গ্রন্থের প্রমাণ উপস্থাপিত করিয়া 'ভক্তিরত্নাকর'-প্রণেতা জানাই-

---

(৫২) ২।১ (৫৩) প্রে. বি., পৃ. ৫৪, ; গৌ. ত.—পৃ. ৩০৭ (৫৪) চৈ. চ.—৩।৪ (৫৫) অ. প্র.-গ্রন্থেও রূপ-সনাতনের অনুরূপ আচরণ দৃষ্ট হয়। (৫৬) পৃ. ১

তেছেন[৫৭] যে সনাতন-রূপাদি ব্রাহ্মণ-বংশোদ্ভূত ছিলেন; তাঁহাদের পিতা পিতামহ যবন দেখিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতেন, অথচ তাঁহাদিগকে সেই যবন-সঙ্গ গ্রহণ করিয়া নিয়তই যবনদিগের সহিত ব্যবহার করিতে হইতেছে বলিয়া 'এই হেতু নীচ জাত্যাদিক উক্তি তাঁর।' কথাগুলির মধ্যে বিন্দুমাত্র সত্য না থাকিলে স্বয়ং জীব-গোস্বামী বা নরহরি, কাঁহারও পক্ষে সচেতনভাবে সবিস্তারে এতবড় মিথ্যা বর্ণনা দেওয়া সম্ভবপর হইত না। 'চৈতন্য-চরিতামৃত' হইতেই জানা যায় যে মুরারি-গুপ্তও প্রথমবারে নীলাচলে গিয়া মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া বাহিরে পড়িয়াছিলেন। মহাপ্রভু মুরারিকে ডাকাইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইতে গেলে মুরারি সরিয়া গিয়া বলিলেন:

মোরে না ছুঁইহ মুঞি অধম পামর।
তোমার স্পর্শ যোগ্য নহে পাপ কলেবর॥

প্রকৃতপক্ষে, এই সমস্তই বৈষ্ণব-দৈন্যোক্তি। ডা. বিমানবিহারী মজুমদার দেখাইয়াছেন (চৈ. উ.—পৃ. ১২৪-২৫) যে সনাতন-গোস্বামীও তাঁহার 'বৃহৎভাগবতামৃতে' এবং রূপ-গোস্বামী তাঁহার 'সনাতনাষ্টকে' তাঁহাদের পূর্ব-পুরুষদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

জয়ানন্দ তাঁহার 'চৈতন্যমঙ্গলে' লিখিয়াছেন,[৫৮] "পূর্বে তারা ব্রহ্মার মানসপুত্র ছিল। শাপভ্রষ্ট দুই ভাই পৃথিবী-জন্মিল॥" এইরূপ উক্তি হইতে অবশ্য কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভবপর হয় না, কিন্তু উক্ত 'ভক্তমাল'-গ্রন্থে যাহাই থাকুক না কেন, সেই গ্রন্থের কোথাও সনাতনকে ম্লেচ্ছ প্রতিপন্ন করা হয় নাই। সনাতন নিজেই যে 'দরবেশ' হইয়া যাইতে চাহিয়াছেন, তাহার কারণ তিনি যবন-রক্ষকের রাজভীতিকে অমূলক প্রমাণ করিতে চাহেন, এবং তিনি যে সত্য সত্যই দরবেশের পোষাকে[৫৯] কাশী পর্যন্ত আসিয়াছিলেন, তাহা সম্ভবত কেবল 'পাৎশাহে'র দৃষ্টিকে এড়াইবার জন্যই। এইভাবেই যে তিনি বাদশাহের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে চাহেন, তাহা তিনি নিজেই বলিয়াছেন। 'ভক্তমাল'-গ্রন্থে দেখা যায় যে কাশীতে তিনি দরবেশের বেশে আসেন নাই; সেখানে তাঁহাকে কেবল 'কাঙাল' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। তাছাড়া 'ভক্তমালে' ইহাও দেখা যায় যে সনাতনের চিকিৎসার জন্য যাঁহাকে প্রেরণ করা হইয়াছিল, তিনি রাজবৈদ্য, কিন্তু হকিম নহেন।

সনাতন তাঁহার 'দশমটিপ্পনী'-গ্রন্থে বিদ্যাবাচস্পতি প্রভৃতিকে গুরু বলিয়া বন্দনা করিয়াছেন। তাঁহারা যবন হইলে তাঁহাদের বাল্যকালেই প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের নিকট শিক্ষা-গ্রহণ করিবার কোন কারণ থাকিত না। তাছাড়া, 'সনাতন', 'রূপ' বা 'অনুপম' এই নামগুলি মহাপ্রভু কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু বল্লভ ও জীবের নাম হইতে তাঁহাদের যবন-জাতিত্বের প্রমাণ হয় না। 'ভক্তিরত্নাকরে' জীবকে 'বিপ্রকুলপ্রদীপ' বলা

(৫৭) ১।৬।১৩ (৫৮) পৃ. ১৩৬ (৫৯) চৈ. চ.—২।২০

হইয়াছে।[৬০] আবার সনাতনের গৌড়-দরবার ত্যাগ করিবার সময় যে ভৃত্যটি সঙ্গে গিয়াছিল তাহার নামও ছিল ঈশান। ইহা হিন্দু নাম। সনাতন যবন হইলে সম্ভবত হিন্দুভৃত্য সঙ্গে লইতেন না। সনাতনের ভগিনীপতিরও নাম ছিল শ্রীকান্ত। তিনিও রাজ-দরবারে চাকরী করিতেন। সনাতন-রূপ-শ্রীকান্ত ছাড়াও অন্যান্য ব্রাহ্মণ এবং হিন্দু-কর্ম্মচারী যবন-রাজাধীনে নিযুক্ত ছিলেন। 'ভক্তিরত্নাকর' হইতে জানা যায়[৬১] যে নিত্যানন্দের শ্বশুর সূর্যদাস

গৌড়রাজ যবনের কার্যে সুসমর্থ।
সরখেল খ্যাতি উপার্জিল বহু অর্থ॥

অথচ আশ্চর্যের বিষয় তাঁহার ব্রাহ্মণত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ ত' দূরের কথা, তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বই সবিশেষ ঘোষিত হইয়াছে। রাজ-দরবারে ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যে সম্ভবত কায়স্থের প্রাধান্যই ছিল সর্বাধিক। 'চৈতন্যচরিতামৃত'-কার জানাইতেছেন[৬২] যে সনাতন রাজকার্য ছাড়িয়া দিলে সেই 'লোভী কায়স্থগণে রাজকার্য্য করে'। রাজকর্ম্মচারী-হিসাবে কেশব-বসুর নামও বিখ্যাত ছিল। তাছাড়া চিরঞ্জীব-সেন[৬৩] ও মুকুন্দ-সরকার প্রভৃতি বৈদ্যও যবনরাজ-দরবারে সম্মানিত কর্ম্মচারী-হিসাবে কায করিতেন।

সনাতন নীলাচলে নিজের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, কাশীতেও তদনুরূপ বলিয়াছেন। এই সকল তাঁহার দৈন্যোক্তি হইতেও পারে। আর কুল-কর্ম্মের কথা বলিবার সময় সম্ভবত নিজ জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতার কথাই তাঁহার বিশেষভাবে মনে পড়িয়াছিল। কারণ, 'চৈতন্যচরিতামৃতে' উল্লেখিত হইয়াছে যে সনাতনকে হোসেন-শাহ্ বলিয়াছিলেন, "তোমার বড় ভাই করে দস্যু ব্যবহার। জীব পশু মারি কৈল চাকলা সব নাশ॥" আর মহাপ্রভু যে সনাতনের বংশের মঙ্গল সাধন করিয়াছেন, সনাতন এইরূপ কথা বলিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহার প্রসঙ্গই ভিন্ন। সনাতন সেই স্থানে তাঁহার সহোদর বল্লভের বাল্যকালাবধি রঘুনাথ-ধ্যান ও তাহার পর তাহার কৃষ্ণানুরাগের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং বংশের মঙ্গল বলিতে জাতির উদ্ধার বলিয়া মনে হয় না। তিনি যে সিংহদ্বারে যাইতেন না, তাহাও তাঁহার নিজেকে এইরূপ নীচ বলিয়া মনে করারই ফল।

একটি বিষয় লক্ষ্য করিতে পারা যায় যে সনাতন যখন প্রথমবার কাশীতে আগমন করেন, তখন তিনি বৈদ্য-চন্দ্রশেখরের গৃহে অবস্থান করিলেও তাঁহার গৃহে অন্ন-গ্রহণ করেন নাই। তপন-মিশ্রের গৃহেই তাঁহার ভিক্ষা-নির্বাহ হইত। তাহার পরে তিনি মাধুকরী করিতে থাকেন। কিন্তু যে মহারাষ্ট্রীর গৃহে তিনি ভিক্ষা-নির্বাহের জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন, তিনিও ছিলেন জাতিতে ব্রাহ্মণ।[৬৪] রূপও যখন অনুপম সহ প্রয়াগে আসিয়া মহাপ্রভুর

(৬০) ১।৭০৪ (৬১) ১২।৩৮৭৫-৭৬ (৬২) ২।১৯ (৬৩) ভ. র.—১।২৭০ (৬৪) চৈ. চ.—২।২০

সহিত মিলিত হন, তখনও ভট্টাচার্য 'দুই ভাই কৈল নিমন্ত্রণ।' আর যে একদিন তাঁহাদের ভিক্ষা-গ্রহণের কথা উল্লেখিত হইয়াছে, তাহাও বল্লভ-ভট্টের গৃহে। আবার সনাতনের নীলাচল-বাসকালে তিনি হরিদাসের নিকট অবস্থান করিলেও মহাপ্রভু প্রত্যহ তাঁহার জন্য গোবিন্দের দ্বারা প্রসাদ পাঠাইয়া দিতেন। একদিন মহাপ্রভু যমেশ্বর-টোটায় গিয়াছিলেন। সেদিন প্রচণ্ড উত্তপ্ত বালুকার উপর দিয়া হাঁটিয়া গিয়া সনাতন সেখানেই মহাপ্রভুর প্রসাদ-গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, হরিদাস ও সনাতন একত্রে থাকিতেন মাত্র। কিন্তু মহাপ্রভু

গোবিন্দ দ্বারায় দোঁহে প্রসাদ পাঠাইলা।
এই মত সনাতন রহে প্রভুস্থানে।

এবং মহাপ্রভু দিব্যপ্রসাদ পাইয়া নিত্য জগন্নাথ মন্দিরে।
তাহা আনি নিত্য অবশ্য দেন দোঁহা করে॥

এবং এই মতে সনাতন রহে প্রভুস্থানে।
কৃষ্ণচৈতন্য গুণ কথা হরিদাস সনে॥

কিন্তু উক্ত গোবিন্দ জাতিতে শূদ্র হইলেও ঈশ্বর-পুরী বা মহাপ্রভুর দৃষ্টিতে তিনি শূদ্র ছিলেন না। মহাপ্রভু তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন[৬৫] :

মর্যাদা হইতে কোটি সুখ স্নেহ আচরণে।

ইহা চৈতন্যমহাপ্রভুর কথার-কথা মাত্র ছিল না। সনৌড়িয়া বিপ্রগৃহে সন্ন্যাসীর ভিক্ষা-গ্রহণ অবিধেয় হইলেও মথুরায় মহাপ্রভু যে সনৌড়িয়া-ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিতে গিয়াছিলেন এবং তাঁহার গৃহে ভিক্ষা-গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার একমাত্র কারণ এই যে ঐ বিপ্র ছিলেন মাধবেন্দ্র-পুরীর[৬৬] শিষ্য।

'চৈতন্যচরিতামৃতে'ই দেখা যায়[৬৭] যে সনাতন-রূপ বৃন্দাবনে গমন করিয়াও বিপ্রের গৃহেই ভিক্ষা-নির্বাহ করিতেন।

বিপ্রের গৃহে স্থূল ভিক্ষা কাঁহা মাধুকরী।
শুষ্ক রুটি চানা চিবায় ভোগ পরিহরি॥

'ভক্তিরত্নাকরে' লিখিত হইয়াছে যে বৃন্দাবনে রূপ-সনাতন মধ্যে মধ্যে যে কানাইর-মাতার গৃহে ভিক্ষা-নির্বাহ করিতেন, সেই ব্রজবাসী কানাইও জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। 'মুরলী-বিলাস'[৬৮] গ্রন্থেও বলা হইয়াছে যে সনাতন বৃন্দাবনে 'ব্রাহ্মণসদনে' বাস করিতেন।

যাহা হউক, সনাতন প্রভৃতি যে যবন বা ব্রাহ্মণেতর কোন জাতির গৃহে কখনও অন্ন-গ্রহণ করিয়াছিলেন, এরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। জগদানন্দ যখন মথুরায় আগমন করেন,

(৬৫) চৈ. চ.—২।১০ পৃ. ১৪৯ (৬৬) চৈ. চ.—২।১৭, পৃ. ১৯৮ (৬৭) ২।১৯ (৬৮) পৃ. ২৭৩

তখন তিনি মহাপ্রভুর নির্দেশ-অনুযায়ী সনাতনেরই নিকট সর্বক্ষণ অবস্থান করিয়া দেবালয়ে পাক করিয়া খাইতেন, এবং

সনাতন ভিক্ষা করে যাই মহাবনে।
কভু দেবালয়ে কভু ব্রাহ্মণ সদনে ।।৬৯

প্রয়াগে রূপ-অনুপমও ভট্টাচার্যের দ্বারাই নিমন্ত্রিত হইতেন এবং বৃন্দাবন হইতে কাশী ফিরিয়া তাঁহারা চন্দ্রশেখরের গৃহে বাস করিলেন বটে, কিন্তু সেইস্থানে তাঁহাদের ভিক্ষা-নির্বাহের ব্যবস্থা হয় নাই; মহাপ্রভুর অনুপস্থিতিতেও তাঁহাদের তপন-মিশ্রের গৃহেই ভিক্ষা-নির্বাহ করিতে হইয়াছিল। বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে প্রয়াগে বল্লভ-ভট্টের গৃহে মহাপ্রভুর আহারান্তে

ভট্টাচার্য শ্রীরূপে দেওয়াইলা অবশেষ।
তবে সেই প্রসাদ কৃষ্ণদাস পাইল শেষ ।।৭০

এই কৃষ্ণদাস ছিলেন জাতিতে রাজপুত।

'ভক্তিরত্নাকর'-রচয়িতা 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র উক্তিগুলি সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবেই সচেতন[৭১] ছিলেন। এমতাবস্থায় সনাতনাদির ব্রাহ্মণত্ব সম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহের অবকাশ থাকিলে তিনি সে সম্বন্ধে অধিকতর আলোচনার পথ উন্মুক্ত করিতেন। কিন্তু তিনি সে সম্বন্ধে নিঃসংশয়।

বৃন্দাবনদাস তাঁহার 'চৈতন্যভাগবতে' বলিয়াছেন[৭২] যে চৈতন্য রূপ-সনাতনকে 'জগন্নাথ শ্রীমুখ' দেখিয়া মথুরায় যাইতে বলিয়াছিলেন।

কথোদিন জগন্নাথ-শ্রীমুখ দেখিয়া।
তবে দুই ভাই মথুরায় থাক গিয়া।

উক্তিটির মধ্যে ঐতিহাসিক সত্য নাও থাকিতে পারে। কিংবা, বৃন্দাবনের পক্ষে খুঁটিনাটি তথ্যের যথাযথ বিবরণ নাও দেওয়া সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু ইহার মধ্যে একটি বিশেষ সত্য নিহিত আছে যে সনাতন বা রূপের পক্ষে মন্দিরে গিয়া জগন্নাথ-দর্শন যে অসমীচীন, এরূপ কথা বৃন্দাবনদাসের মনেই স্থান পায় নাই। তাঁহার গ্রন্থের অন্য কোথাও রূপ-সনাতনের অহিন্দুত্ব সম্বন্ধে কোনও উল্লেখই নাই।

প্রয়াগে বল্লভ-ভট্ট আলিঙ্গন করিতে গেলে রূপ-অনুপম যে দূরে সরিয়া গিয়াছিলেন, তাহাতে বল্লভ অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা অব্রাহ্মণ হইলে বল্লভেরও এইরূপ বিস্ময়ের ভাব জন্মাইত না। মহাপ্রভু রূপ-অনুপমের সকল 'বিবরণ' বিবৃত করিলে বল্লভের বিস্ময় কাটিয়া যায় বটে, কিন্তু সেই 'বিবরণ' যে কি তাহা 'চৈতন্যচরিতামৃত'-কার নিজে বিবৃত করেন নাই। তাঁহারা আদৌ যবন বা ধর্মান্তরিত-যবন হইলে তাহার কারণও

(৬৯) চৈ. চ.—৩।১৩ (৭০) চৈ. চ.—২।১৯ (৭১) ১।৬২৫ (৭২) ৩।১০

'চৈতন্যচরিতামৃতে' এই প্রসঙ্গে নিশ্চয়ই বর্ণিত হইত। সুতরাং সনাতন নিজেই যে ম্লেচ্ছ-সেবা, ম্লেচ্ছ-সঙ্গ, ম্লেচ্ছ-ব্যবহারকে তাঁহার এতাদৃশ আচরণের কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাই গ্রহীতব্য হইয়া উঠে। কবিরাজ-গোস্বামী নিজের কথা বলিতে গিয়া কোথাও কোথাও যেভাবে অস্বাভাবিক বিনয়ের ভাব প্রকাশ করিয়াছেন,[৭৩] তাহা দেখিয়া মনে হয়, বিনয়াবতার সনাতন বা রূপ-গোস্বামী যে একান্ত দৈন্য ও বিনয়বশত তাঁহাদের পূর্বোক্ত প্রকার দুর্ভাগ্যের জন্য এইরূপ সসংকোচ-উক্তি বা -আচরণ করিবেন তাহা অস্বাভাবিক বা অসংগত হইলেও অবিশ্বাস্য নহে। মহাপ্রভুর দৃষ্টিতে তাহাই সংগত ছিল। কারণ, সনাতন ব্রাহ্মণ হইলেও যবন-সঙ্গের ফলে লোকচক্ষুতে তিনি পতিত। এমতাবস্থায় লোকাচার বা লোক-মতকে মর্যাদা(সার্বভৌমের প্রশ্নোত্তরে ঈশ্বর-পুরীর মহিমা-বর্ণনা প্রসঙ্গে মহাপ্রভু 'মর্যাদা' শব্দের এইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন : দ্র.—চৈ. চ.—২।১০ ; প্রে. বি.—পৃ. ১১৫, ২৬৯, 'প্রেমবিলাসে'র সর্বত্রই এই মর্যাদার কীর্তন আছে)-দান করিবার জন্য স্বরূপত নির্দোষ থাকিয়াও উক্ত মতানুরূপ বাহ্য ব্যবহারের অনুধাবন করা যে একমাত্র সনাতনের মত মহাসত্ত্ব ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব, তাহারই উল্লেখ করিয়া মহাপ্রভু সনাতনকে বলিয়াছেন :

মর্যাদা লঙ্ঘনে লোক করে উপহাস।
ইহলোক পরলোক দুই হয় নাশ॥
মর্যাদা রাখিলে তুষ্ট হয় মোর মন।
তুমি না ঐছে করিলে করে কোন জন॥

অর্থাৎ সনাতন ইচ্ছা করিলে ঐরূপ আচরণ নাও করিতে পারিতেন ; কিন্তু উহাই ছিল মহাপ্রভুর যুক্তি, অভিমত বা নির্দেশ ; এবং সনাতন মন্দিরে যাইবার অধিকারী হইয়াও যে যাইতেছেন না (রূপ-হরিদাসও মন্দিরে যাইতেন না), তাহাতেই তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব সূচিত হইতেছে—ইহাই মহাপ্রভুর কথায় প্রতীয়মান হয়। সনাতন-রূপের এবম্প্রকার অদ্ভুত উক্তি ও আচরণ এবং তাহাতে মহাপ্রভুর সমর্থন—ইহা ছাড়া অন্য কাহারও কথায় বা আচরণে সনাতনের নীচ-জাতিত্ব প্রমাণিত হয় নাই। বরং বিরুদ্ধ-প্রমাণই সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। সনাতনের আচরণের কারণ সনাতন নিজেই বলিয়াছেন—'ম্লেচ্ছসেবা' ও 'ম্লেচ্ছসঙ্গাদি,' 'গো-ব্রাহ্মণদ্রোহী সঙ্গে আমার সঙ্গম'[৭৪] ; মহাপ্রভুর সমর্থনের কারণও মহাপ্রভু বলিয়াছেন—'মর্য্যাদা'-রক্ষা, এবং উভয়ের উক্তিই 'চৈতন্যচরিতামৃতে' বর্ণিত হইয়াছে।

'চৈতন্যচরিতামৃতে' মহাপ্রভুর আর একটি উক্তি সম্বন্ধেও বলা হইয়াছে।[৭৫] তাহা হইতেও নিঃসন্দেহ হইতে পারা যায়। মহাপ্রভু সনাতনকে বলিতেছেন :

উত্তম হঞা হীন করি মান আপনারে।
অচিরে করিবে কৃষ্ণ তুঁহারে উদ্ধারে॥

(৭৩) চৈ. চ.—পৃ. ৩৭ (৭৪) চৈ. চ.—২।১ (৭৫) ২।১৬

রূপ-গোস্বামী

চৈতন্য-পরিকল্পিত নববৃন্দাবন-নির্মিতির সর্বশ্রেষ্ঠ স্থপতি রূপ-গোস্বামী।[১] পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে ও ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে তিনি যখন গৌড়ের নবাব হোসেন-শাহের দবীরখাস-রূপে জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা সনাতনের সহিত অপূর্ব দক্ষতা ও বিচক্ষণতার সহিত রাজকার্য পরিচালনা করিতেছিলেন, সেই সময় একদিন চৈতন্যমহাপ্রভু রামকেলিতে পৌঁছাইয়া ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত মিলিত হন এবং উভয় ভ্রাতাকেই চিরতরে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া চলিয়া যান।

ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে সনাতন ছিলেন যেন কিছুটা বাস্তব-বিমুখ এবং উদাসী প্রকৃতির। কিন্তু রূপ ছিলেন অধিকতর তৎপর ও কর্মকুশল। তিনি অচিরাৎ প্রভূত ধনসম্পদসহ নৌকাযোগে গৃহে পৌঁছাইলেন এবং অর্ধেক সম্পদ ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবদিগকে বিতরণ করিয়া এক চতুর্থাংশ কুটুম্ব-বন্ধু-বান্ধবের হিতার্থে ব্যয় করিলেন।[২] অবশিষ্ট অর্থের অংশবিশেষ লইয়া তিনি 'দণ্ডবন্ধলাগি' উত্তম বিপ্রদিগের হস্তে অর্পণ করিয়া সনাতনের ব্যয়-নির্বাহার্থ দশ-সহস্র-মুদ্রা গৌড়ে মুদি-ঘরে গচ্ছিত রাখিলেন এবং এইভাবে অর্থ-ব্যবস্থা হইয়া গেলে তিনি নীলাচলে লোক পাঠাইয়া মহাপ্রভুর বৃন্দাবন-যাত্রার সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া মাত্রেই কনিষ্ঠ-ভ্রাতা অনুপমকে সঙ্গে লইয়া ভবিষ্যতের অজ্ঞেয় পথে নামিয়া পড়িলেন[৩]; সনাতনের নিকট গুপ্তচর পাঠাইয়া পূর্বোক্ত গচ্ছিত মুদ্রার সাহায্যে নিজেকে মুক্ত করিয়া বৃন্দাবন-পথে অগ্রসর হইবার জন্য তাঁহাকে নির্দেশ দিতেও ভুলিয়া গেলেন না। অনুপমের পুত্র জীব গৌড়েই[৪] রহিয়া গেলেন।

প্রয়াগে পৌঁছাইলেই বৃন্দাবন-প্রত্যাগত মহাপ্রভুর সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ ও মিলন ঘটে।[৫] মহাপ্রভু তখন প্রয়াগে তাঁহার পরিচিত এক দাক্ষিণাত্য-বিপ্রের গৃহে বাস

(১) রূপ-গোস্বামীর জীবনী সম্বন্ধে সনাতন-গোস্বামীর জীবনীও দ্রষ্টব্য, বিশেষ করিয়া প্রথমাংশ।

(২) বৈষ্ণবদিগ্‌দর্শনী-মতে (পৃ.৬৩) 'উপার্জিত ধনসম্পত্তি ফতেয়াবাদ ও চন্দ্রদ্বীপের পরিবারবর্গের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিয়া…শ্রীরূপ…বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন।' (৩) রূপের সত্বর বিষয়-বাসনা-ত্যাগ সম্বন্ধে 'প্রেমবিলাসে'র চতুর্বিংশ বিলাসে (পৃ. ২২৩) লিখিত হইয়াছে :—একদিন রাত্রিকালে রূপ বিষাক্ত কীটদষ্ট হইয়া চীৎকারপূর্বক পত্নীকে দীপ জ্বালাইতে বলিলে পতিব্রতা পত্নী হঠাৎ আলো জ্বালাইবার সামগ্রী না পাইয়া বহুমূল্যের এক পোষাক ছিঁড়িয়া তাহাই প্রজ্বলিত করিলেন। রূপ পোষাকের জন্য দুঃখিত হইলে তাঁহার স্ত্রী বলিলেন : পতিসেবা পতিপূজা স্ত্রীলোকের সার। তার কাছে ধনসম্পদ হীরা মুক্তা ছার॥ রূপ কহে প্রিয়ে তোমার কর্তব্য করিল। আমার কর্তব্য কেন আমি না দেখিল॥—এই বলিয়া রূপ সংসার ত্যাগ পূর্বক চৈতন্য-চরণাশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইলেন। (৪) ভ. র.—১।৭৩৯-৪১ (৫) শ্রীচৈ. চ.—৪।১৩।৬

করিতেছিলেন। রূপ এবং অনুপমের জন্য ত্রিবেণীর উপর বাসাঘর স্থির হইল, এবং ভট্টাচার্যের দ্বারা তাঁহারা নিমন্ত্রিত হইলেন। তাহারপর আউলি-গ্রাম হইতে বল্লভ-ভট্ট আসিয়া মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ জানাইলে তাঁহারা সকলেই একদিন নৌকাযোগে ভট্টগৃহে গিয়া ভিক্ষানির্বাহ করিয়া আসিলেন। তারপর রূপকে লইয়া নির্জনে মহাপ্রভুর ভক্তিশিক্ষাদান চলিতে লাগিল। রায়-রামানন্দের নিকট তিনি রসতত্ত্বের যে সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন তাহার সকলই তিনি রূপকে জানাইয়া দিলেন এবং 'দিনদশ' প্রয়াগে অবস্থান করিয়া আকাঙ্ক্ষিত সকল তত্ত্ব শিক্ষা দিয়াই তিনি রূপকে তাঁহার ভবিষ্যৎ কর্মের জন্য যোগ্য ও সুশিক্ষিত করিয়া তুলিলেন। তারপর বারাণসী-যাত্রার প্রাক্কালে মহাপ্রভু তাঁহাকে বৃন্দাবন-দর্শনান্তে গৌড়দেশ হইয়া নীলাচলে যাইবার জন্য আদেশ দান করিয়া গেলে রূপ এবং অনুপম দুই-ভাই বৃন্দাবনের পথে ধাবিত হইলেন।

মথুরায় পৌছাইলে সুবুদ্ধি-রায় তাঁহাদিগকে লইয়া দ্বাদশবন পরিভ্রমণ করিলেন। কিন্তু 'মাসমাত্র' বৃন্দাবন-পরিক্রমার পর তাঁহারা মহাপ্রভুর প্রত্যাবর্তন-পথ ধরিয়া গঙ্গাতীর-পথে পুনরায় প্রয়াগ-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সনাতন তখন রাজপথ ধরিয়া বারাণসী হইতে বৃন্দাবনে আসিতেছিলেন। তাঁহার সহিত আর তাঁহাদের সাক্ষাৎ ঘটিল না। তাঁহারা বারাণসী আসিয়া মহারাষ্ট্রীয়-দ্বিজ, চন্দ্রশেখর-বৈদ্য এবং তপন-মিশ্রের সহিত মিলিত হইলেন। চন্দ্রশেখরের গৃহে বাসা এবং তপনের গৃহে তাঁহাদের ভিক্ষা-নির্বাহের ব্যবস্থা হইল। কয়েকদিন পরে মহাপ্রভুর পূর্বাদেশানুযায়ী আবার তাঁহারা গৌড়ের পথে যাত্রা করিলেন।

দুইটি ভক্ত পথ চলিয়াছেন। রূপ এবং অনুপম।[৬] অনুপম নাম মহাপ্রভু-প্রদত্ত। পূর্ব নাম ছিল বল্লভ। আবাল্য রঘুনাথ-ভক্ত ও রামায়ণপাঠ-পিয়াসী বল্লভ লক্ষ্মণের মতই সনাতন ও রূপের চিরানুগামী ছিলেন। একবার তাঁহারা তাঁহাকে কৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট করিলে তিনি তাঁহাদিগের নিকট দীক্ষা-মন্ত্র গ্রহণেচ্ছু হইয়াও রাত্রিকালে সবিশেষ চিন্তার পর প্রভাতে উঠিয়া কাঁদিতে থাকেন। রঘুনাথের পাদপদ্মে বিক্রীত হইয়া আছেন বলিয়া তাঁহা হইতে বিচ্ছেদের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল। এমনি ভক্ত-অনুপম ভক্ত-রূপের সহিত পথ অতিক্রম করিতেছেন। রূপ বৃন্দাবনেই যে 'কৃষ্ণলীলা-নাটকে'র সূত্রপাত করিয়া সেইখানেই তাহার মঙ্গলাচরণ ও নান্দী-শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন, এখন তিনি সেই নাটকোপযোগী ঘটনার কথা চিন্তা করিতে করিতে চলিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে কড়চার আকারে কিছু কিছু তথ্য বলিয়া যাইতেছেন; আর অনুজ অনুপম তাঁহার অভিপ্রায় অনুযায়ী তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেছেন। কিন্তু কে জানিত যে

(৬) 'অনুপম মল্লিক তাঁর নাম শ্রীবল্লভ।'—চৈ. চ., ২।১৯, পৃ. ২০৭

তাঁহাদের এই আনন্দ-যাত্রার পশ্চাতে মৃত্যুর বিভীষিকাও গোপনে গোপনে অনুসরণ করিয়া চলিতেছে! গৌড়ে আসিয়া অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটিল।

গৌড়ে রূপের কিছু বিলম্ব হইয়া গেল। কিন্তু তারপর একদিন তিনি নীলাচলের দিকে ধাবিত হইলেন। উড়িষ্যার সত্যভামাপুরে আসিয়া রাত্রিতে বিশ্রামকালে স্বপ্নদর্শনের পর তিনি স্থির করিলেন যে যে-ব্রজপুরলীলাকে তিনি একত্র গ্রথিত করিয়াছেন, তাহাকে দুইটি পৃথক বিভাগে বিভক্ত করিতে হইবে। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে একদিন তিনি নীলাচলে উপনীত হইলেন এবং ভক্ত-হরিদাসের বাসাগৃহে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ভক্তবৃন্দসহ মহাপ্রভু সেইস্থলে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন।

ভক্তবৃন্দ প্রত্যহ রূপ ও হরিদাসের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং মন্দির হইতে প্রসাদ আনিয়া দিয়া যান। মহাপ্রভুও প্রত্যহ আসিয়া তাঁহাদের সহিত কৃষ্ণকথা কহেন এবং ফিরিয়া গিয়া গোবিন্দের দ্বারা প্রসাদ পাঠাইয়া দেন। একদিন তিনি রূপকে বলিয়া গেলেন—

কৃষ্ণকে বাহির নাহি করিহ ব্রজ হইতে।
ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ কভু না যান কাঁহাতে॥

মধ্যাহ্নে গৃহে বসিয়া রূপ ভাবিলেন যে মহাপ্রভুর আদেশ তাঁহার পূর্বোক্ত স্বপ্নাদেশেরই ব্যাখ্যামাত্র। তিনি পৃথক পৃথক নান্দী-, প্রস্তাবনা- এবং ঘটনা- সংযোগে দুইটি পৃথক নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

রথযাত্রা অসিয়া পড়িল। রথযাত্রার দিন মহাপ্রভু রথাগ্রে নৃত্য ও কীর্তন করিতে করিতে একটি শ্লোক[৭] উচ্চারণ করিলেন। স্বরূপদামোদর ভিন্ন সেই শ্লোকের মর্ম সকলের নিকট অজ্ঞাত ছিল। রূপ কিন্তু তাহার প্রকৃত-মর্ম উপলব্ধি করিয়া মহাপ্রভুর অভিপ্রায়ানুযায়ী অর্থযুক্ত একটি শ্লোক[৮] রচনা করিয়া ফেলিলেন। পরে একদিন তাল-পত্রে সেই শ্লোকটি লিপিবদ্ধ করিয়া তাহা চালে গুঁজিয়া দিয়া তিনি সমুদ্র-স্নানে গিয়াছেন; দৈবাৎ মহাপ্রভু সেই সময় আসিয়া সেই শ্লোক-দৃষ্টে বিহ্বল হইলেন। রূপ ফিরিয়া আসিলে তিনি তাঁহাকে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিলেন এবং স্বরূপের নিকট সকল কথা ব্যক্ত করিয়া রূপ-সম্বন্ধে একপ্রকার নিশ্চিন্ত হইলেন।

আর একদিন মহাপ্রভু আসিয়া দেখিলেন যে রূপ তাঁহার নাটক-রচনায় ব্যস্ত। মুক্তার মত অক্ষর দিয়া তিনি পুঁথির পত্রগুলি ভরিয়া তুলিতেছেন। তিনি একটি পত্র তুলিয়া লইলেন এবং পাঠ করিয়া প্রেমাবিষ্ট হইলেন। তারপর অন্য একদিন তিনি ভক্তবৃন্দকে লইয়া হরিদাসের বাসায় হাজির হইলেন। রামানন্দ-স্বরূপ-সার্বভৌম, তিনজনেই ছিলেন—

(৭) ঐ—৩।১, পৃ. ২৮২ (৮) ঐ

চৈতন্য প্রবর্তিত ভক্তিধর্ম-ব্যাখ্যার তিনটি স্তম্ভ। অদূরে রূপ হরিদাসের সহিত পিঁড়ার উপর উপবিষ্ট আছেন। মহাপ্রভু রূপকে তাঁহার পূর্বকৃত শ্লোকটি পাঠ করিতে বলিলেন। রূপ লজ্জায় তাহা না পারায় স্বরূপ তাহা পাঠ করিলে সকলেই বিস্মিত হইলেন। তারপর মহাপ্রভু নাটকের শ্লোক পাঠ করিবার জন্য আদেশ দান করিলে, রূপকে বাধ্য হইয়াই আরম্ভ করিতে হইল। স্বরূপদামোদর জানাইয়া দিলেন যে ব্রজলীলা এবং মধুপুরলীলা একত্র গ্রথিত করিয়া রূপ কৃষ্ণলীলা-নাটক রচনা করিতেছিলেন, এক্ষণে মহাপ্রভুর আদেশে দুইটিকে পৃথক করিয়া 'বিদগ্ধমাধব' ও 'ললিতমাধব' নাম দিয়া দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক নাটক রচনা[৯] করিতেছেন। শেষে রূপ পাঠ আরম্ভ করিলেন এবং স্বয়ং রায়-রামানন্দ প্রশ্ন করিয়া যাইতে লাগিলেন। নানাভাবে পরীক্ষার পর রামানন্দ মন্তব্য করিলেন ঃ

কবিত্ব না হয় এই অমৃতের ধার।
নাটক লক্ষণ সব সিদ্ধান্তের সার ॥

চাতুর্মাস্যান্তে গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দ গৌড়ে প্রত্যাবর্তন করিলেও রূপ কিন্তু নীলাচলে থাকিয়া গেলেন। দোলযাত্রা শেষ হইবার পর, তবে মহাপ্রভু তাঁহাকে বৃন্দাবন-যাত্রার আদেশ দান করিলেন। বৃন্দাবনে গিয়া লুপ্ততীর্থ-উদ্ধার, কৃষ্ণসেবা, রসভক্তির নিরূপণ ও প্রচারের জন্য তাঁহাকে তিনি যথাবিধি উপদেশ দান করিয়া সুশিক্ষিত ও সুযোগ্য করিয়া তুলিলে রূপ গৌড়পথে বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন।

গৌড়ে আসিয়া তাঁহার প্রায় এক বৎসর বিলম্ব হইয়া গেল। বিষয়-বিমুখ হইলেও রূপ বাস্তব-বিমুখ ছিলেন না। গৌড়ের আত্মীয়-স্বজন এবং ধনসম্পদ সম্পর্কে তিনি আসক্ত না থাকিলেও তৎপ্রতি তিনি সম্পূর্ণরূপে উদাসীন ছিলেন না। তিনি 'কুটুম্বের স্থিতি' অর্থ বিভাগ করিয়া দেওয়ার[১০] পর, গৌড়ে যে অবশিষ্ট অর্থ ছিল তাহা আনাইয়া কুটুম্ব, ব্রাহ্মণ ও দেবালয়ের উদ্দেশ্যে সমস্তই বণ্টন করিয়া দিলেন। আর আর যাহা অভিলাষ ছিল তিনি সমস্তই নির্বাহ করিলেন এবং সকল-কিছু সুসম্পন্ন করিবার পর সকল-প্রকার বন্ধন হইতেই নিজেকে চিরমুক্ত করিয়া বৃন্দাবনে আসিয়া পৌছাইলেন। ইতিমধ্যে সনাতনও নীলাচল হইতে মহাপ্রভুর একজন যোগ্যতম প্রতিনিধিরূপে বৃন্দাবনে আসিয়া হাজির হইয়া গিয়াছেন।

সেই নির্বান্ধব পুরীতে সনাতন ও রূপ দুই ভ্রাতাকেই মহাপ্রভুর কল্পনা-সৌধের বনিয়াদ গাঁথিয়া তুলিতে হইল। সনাতনের মত রূপও অশন-বসন-উদাসীন হইয়া বনে বনে ঘুরিয়া বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ভক্তিশাস্ত্র-প্রণয়ন, লুপ্ততীর্থোদ্ধার এবং নাম-কীর্তনই তাঁহার

---

(৯) বিদগ্ধমাধব (১৫৩৩ খ্রী.), ললিতমাধব (১৫৩৭ খ্রী.)—VFM—p. 120 (১০) তু.—ভ্র. ক. সু.—পৃ. ২

তখনকার একমাত্র কার্য ছিল। এইভাবে তিনি একদিন বৃন্দাবনের গোমাটিলা যোগপীঠে গোবিন্দ-বিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া যথাবিধি অভিষেক সহকারে তাহার প্রতিষ্ঠা করেন এবং গোবিন্দ-প্রকটমাত্রেই নীলাচলে মহাপ্রভুর নিকট সেই সংবাদ প্রেরণ করেন। মহাপ্রভু তখন কাশীশ্বর-গোঁসাইকে বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিলে রূপ তাঁহাকে গোবিন্দের প্রথম অধিকারী-রূপে বরণ করিয়া লন। গোবিন্দের দ্বিতীয়-অধিকারী শ্রীকৃষ্ণ-পণ্ডিতও রূপ-গোস্বামী কর্তৃক নিযুক্ত হন। কেহ কেহ মনে করেন যে গোবিন্দজীর প্রাচীন-মন্দিরটিও[১১] রূপ-সনাতনের প্রভাবেই নির্মিত হইয়াছিল। ১৭৭১ শকাব্দের 'তত্ত্ববোধিনী'-পত্রিকার বৈশাখ-সংখ্যায় 'বৈষ্ণবসম্প্রদায়'-নামক প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছিল, "গোবিন্দদেবের মন্দিরে ১৫১২ শকের এক শিল্প-লিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে লিখিত আছে যে পৃথুরাও কুলোদ্ভব মানসিংহ তাহা স্থাপন করেন। রূপ-গোস্বামীকৃত 'বিদগ্ধমাধবে' লেখা আছে যে তিনি ১৪৪৭ শকে অর্থাৎ চৈতন্যের পরলোক-প্রাপ্তির আট বৎসর পরে ঐ গ্রন্থ প্রস্তুত করেন, অতএব গোবিন্দদেবের মন্দির স্বয়ং সনাতনের প্রতিষ্ঠিত না হইয়া মানসিংহেরই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। তবে সনাতন কোনপ্রকারে তাহার পরম্পরা কারণ হইতে পারেন।"[১২] বিবরণ অসত্য না হইলে সিদ্ধান্তটিও গ্রহণযোগ্য হইয়া উঠে। গোবিন্দ ছাড়াও রূপ-গোস্বামী ব্রহ্মকুণ্ড-তট হইতে বৃন্দাদেবীর বিগ্রহ প্রকট করিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তাঁহারই হস্তক্ষেপের ফলে গোপাল-ভট্ট কর্তৃক রাধারমণ-বিগ্রহ প্রকটিত হইয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। রাধাদামোদর-বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাও তাঁহারই কীর্তি। তিনি জীবকে এই বিগ্রহ সমর্পণ করিয়াছিলেন।

রূপ-সনাতন বৃন্দাবনে আসিবার পরে রঘুনাথ-ভট্ট, গোপাল-ভট্ট, রঘুনাথদাস-গোস্বামী প্রভৃতি ভক্ত ক্রমে ক্রমে আসিয়া তাঁহাদের সহিত যুক্ত হন। রঘুনাথদাস একবার রূপ-কৃত 'ললিতমাধব' নাটক পাঠ করিয়া আত্মহারা হইয়া পড়েন এবং গ্রন্থখানিকে বুকের উপর ধরিয়া দিবানিশি ক্রন্দন করিতে থাকেন। তাহা দেখিয়া রূপ অবিলম্বে তাঁহার 'দানকেলি-কৌমুদী'-গ্রন্থ রচনায়[১৩] প্রবৃত্ত হইলেন এবং গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়া গেলে তাহাই দাস-গোস্বামীর হস্তে অর্পণ করিয়া পূর্বোক্ত গ্রন্থটি সংশোধন করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট হইতে চাহিয়া লইয়া তাঁহাকে যাতনামুক্ত করিলেন।

(১১) জলধর সেন মহাশয় 'বৃন্দাবন' নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন ('নারায়ণ'-পত্রিকা—চৈত্র, ১৩২১, ১ম. খণ্ড, ৫ম. সংখ্যা), "এই মন্দির নাকি বৃন্দাবনের অন্য সকল মন্দির অপেক্ষা···এত উচ্চ ছিল যে সুদূর দিল্লী হইতেও এই মন্দিরের অগ্রভাগ দেখা যাইত।" (১২) অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার ভক্তচরিতামৃত-গ্রন্থে (পৃ. ১৩৩-৩৪) একেবারে একই কথার পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। (১৩) এই গ্রন্থটির রচনাকাল নির্ধারিত হয় নাই। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে রচনাকাল ১৫৪৯ খ্রী.; ডা. সুশীলকুমার দে বলেন ১৪৯৫ খ্রী.; ডা. বিমানবিহারী মজুমদার বলেন ১৫২৯ খ্রী.—দ্র.—VFM—p,119-20

রূপ ছিলেন প্রকৃত কর্মবীর। তাঁহার জীবনের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত যেন কেবল কর্ম দিয়াই ঠাসা ছিল। এই সমস্ত কর্মের ফাঁকে তাঁহার বহুবিধ গ্রন্থ প্রণয়নের কার্যও চলিত। পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থগুলি ছাড়াও 'হংসদূত', 'উদ্ধবসন্দেশ', 'বৃহৎ- ও লঘু-গণোদ্দেশ-দীপিকা'[১৪] 'স্তবমালা',[১৫] 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' (১৫৪১ খ্রী.),[১৬] 'উজ্জ্বলনীলমণি', 'প্রযুক্তাখ্য-চন্দ্রিকা', 'মথুরামহিমা', 'নাটকচন্দ্রিকা', 'লঘুভাগবতামৃত', 'অষ্টকাললীলা', 'গোবিন্দ-বিরুদাবলী', 'চৈতন্যাষ্টক' প্রভৃতি রচনা করিয়া তিনি আপনার নিরলস কর্মপ্রচেষ্টার দ্বারা মহাপ্রভুর মহৎ উদ্দেশ্যকে সফল করিয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই সমস্ত গ্রন্থের প্রত্যেকটিই সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। তিনি ছিলেন সংস্কৃত ভাষায় মহাপণ্ডিত।[১৭]

তাঁহার রচিত কবিতাগুলিও তাঁহার কবি-প্রতিভার ও সংস্কৃত-ভাষায় পাণ্ডিত্যের পরিচয় বহন করিতেছে। স্বরচিত এবং সমসাময়িক ও পূর্ববর্তী ভক্তবৃন্দের রচিত শ্লোকমালা সংগ্রহ করিয়া তিনি 'পদ্যাবলী' নামক যে একখানি কাব্যসংগ্রহ-গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহাও তাঁহার কৃতিত্বকে অমর করিয়া রাখিয়াছে।

এ সকল ছাড়াও তাঁহার আরও বহুবিধ কার্য ছিল। বিগ্রহাদি প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহাদের যথাযথ পূজা-ব্যবস্থা, ভক্তবৃন্দ আসিয়া পৌঁছাইলে তাঁহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণের বন্দোবস্ত এবং বৃন্দাবনস্থ ভক্তবৃন্দকে মহাপ্রভুর ইচ্ছানুযায়ী একই আদর্শের দিকে অভিমুখী করিয়া তুলা—এ সমস্ত দায়িত্বের গুরুভার তিনি মাথায় তুলিয়া লইয়াছিলেন। বৃন্দাবনস্থ এই সমস্ত কার্যের তিনিই তখন ছিলেন একমাত্র যোগ্যতম নির্বাহক। তাঁহার নির্দেশ সকলেই সসম্মানে শিরোধার্য করিয়া লইতেন। পরবর্তিকালেও তাঁহারই লিপিবদ্ধ বিধি-নিষেধাদি এবং ভক্তিতত্ত্বাদির ব্যাখ্যা বৈষ্ণব-সমাজকে চিরকালই পথ দেখাইয়া আসিয়াছে। খেতুরিতে ষড়্‌বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার সময়েও 'শ্রীরূপ গোস্বামীকৃত গ্রন্থাদি বিধানে' সমস্ত ক্রিয়াই নির্বাহিত হইয়াছিল।

কিন্তু তাই বলিয়া রূপ-গোস্বামী কখনও নিজেকে সর্বেসর্বা করিয়া তুলিতে চাহেন নাই। মহাপ্রভুর জীবদ্দশায় তিনি সর্বদাই তাঁহার সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিতেন এবং তাঁহার নির্দেশ গ্রহণ করিতেন। মহাপ্রভুর আজ্ঞাতেই অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি 'ভক্তি-

---

(১৪) বৃহৎ রাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা (১৫৫০) দ্র.—VFM—p 121 (১৫) ইহা জীব-গোস্বামী কর্তৃক আহৃত একটি সংগ্রহ-গ্রন্থ। ইহার মধ্যস্থিত 'ছন্দোঽষ্টাদশকম্', 'উৎকলিকাবল্লী' (১৫৪৯-৫০ খ্রী.), 'গোবিন্দবিরুদাবলী' ও 'প্রেমেন্দুসাগরাদি স্তব' শ্রীরূপ-গোস্বামী-রচিত। দ্র.—চৈ. উ.—পৃ. ১৩৯-৪০ (১৬) VFM—p 120 (১৭) ডা. সুশীল কুমার দে বলেন (History of Sans. Lit.—p.664)—Rupa Gosvami was a prolific writer in Sanskrit. He wrote no less than 32 works among which there are many stutras.

রসামৃতসিন্ধু' নামক বৈষ্ণব-সাধন-সম্বন্ধীয় যে-গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন, তাহা একটি প্রামাণিক গ্রন্থ হইলেও, প্রণয়নের অব্যবহিত পরেই তিনি তাহা মহাপ্রভুর নিকট পাঠাইয়া পত্র মারফতে তাঁহার মতামত আনয়ন করিয়াছিলেন।[১৮] মহাপ্রভু সনাতনকে যেমন স্বহস্তে পত্র লিখিতেন, রূপকেও সেইরূপ লিখিতেন। তখন সম্ভবত সনাতন-গোস্বামীই ছিলেন বৃন্দাবনের বয়োবৃদ্ধ তথা জ্ঞানবৃদ্ধ বৈষ্ণব-ভক্ত। রূপ-গোস্বামী যেমন একদিকে তাঁহার জীবনের চির-সঙ্গী ছিলেন, তেমনি অন্যদিকে বৃন্দাবনের অসংখ্য কর্মের প্রকৃত পরিচালক হইয়াও যেন তিনি সনাতনেরই অনুগত কর্মী হিসাবে কার্য সম্পন্ন করিতেন। মহাপ্রভুও রূপ-সনাতনের উপর বৃন্দাবন-সম্পর্কিত সমস্ত কিছুই নির্ভর করিয়া নিশ্চিত ছিলেন। তিনি তাঁহাদের কুশল-সংবাদ গ্রহণ করিতেন, এবং তাঁহাদের কর্ম-পদ্ধতির সহিত পরিচিত থাকিতেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভক্তকে বৃন্দাবনে যাইয়া রূপ-সনাতনের নিকট আশ্রয়-গ্রহণ করিবার জন্য উপদেশ দিয়া প্রেরণ করিতেন। প্রকৃতপক্ষে, এই গোস্বামী-ভ্রাতৃদ্বয়কেই তিনি যেন বৃন্দাবনের পুনরুজ্জীবিত সংস্কৃতির 'সর্বাধ্যক্ষ'-পদে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন।

রূপ-সনাতনও মহাপ্রভু-প্রেরিত ভক্তবৃন্দকে লইয়া একটি সমৃদ্ধিমান্ ভক্ত-গোষ্ঠী গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মহাপ্রভু রঘুনাথ-ভট্টকে বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিলে মহাপ্রভুর ইচ্ছানুযায়ী রূপ তাঁহাকে ভাগবত-পাঠে নিযুক্ত করিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। আবার রঘুনাথ-দাস-গোস্বামীকে তিনি স্বীয় 'অদ্বিতীয়দেহ' বলিয়াই মনে করিতেন। লোকনাথের সহিত তাঁহার প্রগাঢ় সখ্য ছিল এবং কাশীশ্বর-, ভূগর্ভ-, যাদবাচার্য-গোসাঁই প্রভৃতি সকলেই তাঁহার বিশেষ সঙ্গী ছিলেন। বিশেষ করিয়া তাঁহারই সাহচর্যে ভ্রাতুষ্পুত্র জীব-গোস্বামী বৈষ্ণব-ধর্মের একজন শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতৃরূপে পরিগণিত হইতে পারিয়াছিলেন।

মহাপ্রভু 'সনাতন দ্বারা ব্রজের ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিলাস', এবং 'শ্রীরূপের দ্বারা ব্রজের রসপ্রেমলীলা' প্রকাশ করিয়াছিলেন। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি কৃষ্ণদাস-কবিরাজ-গোস্বামী বলিয়াছেন:

সনাতন-কৃপায় পাইনু ভক্তির সিদ্ধান্ত।
শ্রীরূপ-কৃপায় পাইনু ভক্তিরসপ্রান্ত।

গুরুক্রম বর্ণনায় তিনি তাঁহার নিত্যসঙ্গী গুরু-রঘুনাথের পরেই রূপকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়াছেন।

বৃন্দাবন ও তৎসংলগ্ন প্রদেশের অধিবাসী-বৃন্দের মধ্যেও রূপের একটি বিশেষ স্থান ছিল। সনাতন সহ তিনিও তাঁহাদের সহিত প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হইয়া তাঁহাদিগকে আনন্দ দান করিতেন। 'ভক্তমাল'-মতে মীরাবাই রূপের সাক্ষাৎলাভ করিয়া তাঁহার সহিত

(১৮) প্রে. বি.—১১শ: বি.—পৃ. ১২৭-২৮

কৃষ্ণালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। জাহ্নবাদেবীর প্রথমবার বৃন্দাবনাগমন-কালে রূপ-গোস্বামী জীবিত ছিলেন।[১৯] কিন্তু শ্রীনিবাসাদির প্রথমবার বৃন্দাবনে আসিয়া পৌছাইবার পূর্বেই তিনি দেহরক্ষা করিয়াছেন। 'প্রেমবিলাস' ও 'ভক্তিরত্নাকর' হইতে জানা যায় যে সনাতনের তিরোভাবের অল্পকাল পরেই রূপ-গোস্বামী তিরোহিত হন[২০] রাধাদামোদরের নিকট তাঁহার সমাধি সংরক্ষিত হইয়াছিল।[২১]

(১৯) ঐ—১৬শ. বি., পৃ. ২২৫ ; নি. বি.—পৃ. ৩৩ (২০) ঐ.—সনাতন (২১) ভ. র.—৪।২৯৯,. ন. বি.—পৃ. ২৯

রঘুনাথ-দাস-গোস্বামী

ষড়্‌গোস্বামীর মধ্যে রঘুনাথ-দাস-গোস্বামীই সর্বপ্রথম মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হন। সেই সাক্ষাৎ ঘটে ১৫১০ খ্রী.-এর প্রথম দিকে।

হুগলী জেলার অন্তর্গত সপ্তগ্রাম-অঞ্চলের চন্দনপুর বা চান্দপুর গ্রামে[১] হিরণ্য দাস ও গোবর্ধন দাস নামে দুই ভ্রাতা বাস করিতেন। তাঁহারা কায়স্থ[২] ছিলেন। অদ্বৈতপ্রভুর ও গৌরাঙ্গ-জনক পুরন্দর-মিশ্রের সহিত তাঁহাদের যোগাযোগ ছিল বলিয়া মহাপ্রভুও তাঁহাদের জানিতেন। তাঁহাদের মধ্যে কনিষ্ঠ গোবর্ধনই হইতেছেন রঘুনাথ দাসের পিতা। রঘুনাথের একজন জ্ঞাতি-খুড়ার নাম কালিদাস। তিনি পরম-বৈষ্ণব ছিলেন। কেহ কেহ অনুমান করেন ১৪২০ শকের[৩] দিকে রঘুনাথের জন্ম হয়। কিন্তু এ সমস্তই অনুমানমাত্র।

সন্ন্যাস-গ্রহণের অব্যবহিত পরেই চৈতন্য শান্তিপুরে উপনীত হইলে রঘুনাথ আসিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে পতিত হন এবং অদ্বৈতপ্রভুর কৃপাতে চৈতন্যের প্রসাদশেষ প্রাপ্ত হন। কিন্তু রঘুনাথ বাল্যাবধি বিষয়-বিরাগী ছিলেন। মহাপ্রভু নীলাচলযাত্রা করিলে তাঁহাকে আর গৃহে ধরিয়া রাখা দুষ্কর হইল। ধনীর দুলালকে বাঁধিয়া রাখিবার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইল, চতুর্দিকে প্রহরীও নিযুক্ত হইল।

রঘুনাথের সহিত যখন মহাপ্রভুর প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে, তখন সম্ভবত রঘুনাথের বাল্যকাল অতিক্রান্ত হইয়াছে। তাহার বহু-পূর্বে হরিদাস-ঠাকুর আসিয়া একবার তাঁহাদের গৃহ-পুরোহিত বলরাম-আচার্যের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া বসবাস করিতে থাকেন। সেই সময় রঘুনাথ অধ্যয়ন করিতেন। একদিন তিনি হরিদাস-ঠাকুরকে দেখিতে যান। এই হরিদাস-দর্শন তাঁহার বালক-মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। হরিদাস তখন তাঁহার নামামৃত-বর্ষণে অনেকের উপর, বিশেষ করিয়া হিরণ্য-গোবর্ধনের উপর যেভাবে প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহাতে বালক রঘুনাথের মন সেইদিকে আকৃষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। ফলে তিনি হরিদাসের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া সাধনভজন-মার্গে বিচরণ করিবার প্রথম প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। এখন তাই মহাপ্রভুর সাক্ষাৎলাভের পর তিনি বাহিরের দিক হইতে বদ্ধ রহিলেন বটে, কিন্তু কোন বন্ধনই তাঁহার মনকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না। ফলে ইহার প্রায় পাঁচ বৎসর পরে মহাপ্রভু রামকেলি হইতে

---

(১) দ্র.—চৈ. চ.—৩।৩, পৃ. ৩০০ ; গৌ. ত.—পৃ. ৩১১ ; পা. নি. (২) চৈ. চ.—৩।৬, পৃ. ৩১৫
(৩) শ্রীমৎ রঘুনাথদাস গোস্বামীর জীবন চরিত—পৃ. ২ ; প্রাণকৃষ্ণ দত্ত মনে করেন (বৈরাগী রঘুনাথদাস পৃ. ৪), ১৪১৭ বা ১৮ শক।

শান্তিপুরে পৌঁছাইলে রঘুনাথ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্রতা প্রকাশ করায় গোবর্ধন তাঁহাকে শান্তিপুরে প্রেরণ করিতে বাধ্য হন। রঘুনাথ সেই সময়ে কয়েক-দিন ধরিয়াই নিজের নীলাচল-গমনের বাধা সম্বন্ধে অভিযোগ তুলিতে থাকায় শেষে মহাপ্রভুকেও দৃঢ়ভাবে বলিতে হইয়াছিল, "মর্কট বৈরাগ্য না করিহ লোক দেখাইয়া। যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হৈঞা।" কিন্তু শেষে তিনি তাঁহার প্রতি করুণা প্রকাশ করিয়া একথাও বলিয়া গেলেন যে নিশ্চয়ই কৃষ্ণ-কৃপায় রঘুনাথের পক্ষে নীলাচল-গমনের পথ সুগম হইবে। রঘুনাথ গৃহে ফিরিলেন এবং মহাপ্রভুর নির্দেশানুযায়ী সর্বপ্রকার বহি-র্বৈরাগ্য পরিত্যাগ করিয়া সংসার-কর্মে মনোনিবেশ করিলেন। এতদ্দৃষ্টে তাঁহার পিতা-মাতাও সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার বহির্বন্ধন শিথিল করিয়া দিলেন। কিন্তু নিপুণ শিক্ষকের যে-শিক্ষাপদ্ধতির ফলে ভবিষ্যতে গোপাল- রঘুনাথ-ভট্টও পিতৃমাতৃ-সেবাদির দ্বারা নিজদিগকে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন, সেই শিক্ষার দ্বারাই সর্বপ্রথম রঘুনাথ-দাস পিতৃমাতৃ-সেবা ও বিষয়ভোগের মধ্য দিয়া 'অনাসক্ত' হইয়া মহাপ্রভুর আরব্ধ-কর্মকে সফল করিয়া তুলিবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিতে লাগিলেন।

বৎসর ঘুরিয়া গেল। মহাপ্রভু মথুরা হইতে নীলাচলে ফিরিলেন। সংবাদ শুনিয়া রঘুনাথ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। কিন্তু ঠিক এই সময়ে মুলুকের এক ম্লেচ্ছ-অধিকারীর সহিত বিবাদের ফলে হিরণ্যকে গৃহ হইতে পলায়ন করিয়া গোপনে লুকাইয়া রহিতে হইল। রঘুনাথ বদ্ধ হইয়া আনীত হইলে তিনি তাঁহার সবিনয়-কথাবার্তার দ্বারা সেই শত্রুকেও আপন করিয়া লইলেন। দুই-পক্ষের মধ্যে মিটমাট হইয়া গেল। কিন্তু তাহারপর রঘুনাথ নিজেই পলাইয়া যাইবার জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

একদিন রাত্রিকালে উঠিয়া রঘুনাথ নীরবে যাত্রা আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাঁহার পিতা তাঁহাকে ধরিয়া আনিলেন। পুত্রকে বাতুল মনে করিয়া মাতা তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে চাহিলেন।[৪] কিন্তু পিতা বুঝিলেন 'ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য' ও 'অপ্সরাসম স্ত্রী' যাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না, অন্য কোনও বন্ধনে তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখা যাইবেনা। সেই সময়ে নিত্যানন্দ পণিহাটীতে অবস্থান করিতেছিলেন। একদিন রঘুনাথ গঙ্গাতীরে নিত্যানন্দ সমীপে উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে অবশ্য সেবকও আসিল।

নিত্যানন্দ দধিচিড়া-ভোজনের প্রস্তাব করায় রঘুনাথ তদ্দণ্ডে একটি বিরাট-ভোজের

---

(৪) ভক্তমাল-মতে তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখা হয়। পরে শিষ্ট লোকের উপদেশে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। —ভ. মা., পৃ. ১০

আয়োজন করিলেন। 'পুলিন-ভোজন' সমাপ্ত হইলে বিনীত রঘুনাথ রাঘব-পণ্ডিতের দ্বারায় নিত্যানন্দ সমীপে তাঁহার চৈতন্য-চরণ-প্রাপ্তির জন্য আবেদন জানাইলেন। নিত্যানন্দ আশীর্বাদ করিলেন যে চৈতন্য অবশ্যই তাঁহার প্রতি কৃপাবান হইবেন। তাহারপর তিনি নিত্যানন্দের জন্য নিভৃতে তাঁহার ভাণ্ডারীর হস্তে প্রচুর অর্থ প্রদান করিয়া রাঘব-পণ্ডিতের সহিত তাঁহার গৃহে আসিয়া ঠাকুর-দর্শন করিলেন এবং প্রভুর 'ভৃত্যাশ্রিত জন'কে যথা-যোগ্যভাবে পুরস্কৃত করিবার জন্য রাঘবের হস্তে প্রভূত অর্থ সমর্পণ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

গৃহে ফিরিয়া রঘুনাথ বাড়ীর বাহিরে দুর্গামণ্ডপে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। দেবী-মণ্ডপেই শয়ন করেন, রক্ষকগণ পাহারা দিতে থাকে। কিন্তু শেষে একদিন সুযোগ মিলিয়া গেল। যত্নন্দন-ভট্টাচার্য ছিলেন রঘুনাথের গুরু[৫] ও কুল-পুরোহিত। একদিন শেষরাত্রিতে উঠিয়া রঘুনাথ দেখিতে পাইলেন যে গুরু যত্নন্দন তাঁহাদের প্রাঙ্গণে হাজির হইয়াছেন। রঘুনাথ তাঁহাকে প্রণাম করায় তিনি জানাইলেন যে তাঁহার এক শিষ্য তাঁহার গৃহদেবতার সেবক নিযুক্ত ছিল। সে হঠাৎ সেবা-পূজা ছাড়িয়া দিয়াছে; রঘুনাথের হস্তক্ষেপে হয়ত তাহার মতের পরিবর্তন হইতে পারে। সুতরাং রঘুনাথকে তাঁহার সঙ্গে গিয়া সেই শিষ্যটিকে অনুরোধ জানাইতে হয়। রঘুনাথ বিনাদ্বিধায় গুরুদেবের সহিত বাহির হইলেন। রক্ষকগণ তখন নিদ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া রঘুনাথ জানাইলেন যে গুরুদেবের আর কষ্ট করিয়া গিয়া লাভ নাই; তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া যাইতে পারেন যে রঘুনাথ সেই ব্রাহ্মণ-পূজারীকে পাঠাইয়া দিবেন। যত্নন্দন চলিয়া গেলে রঘুনাথ এদিকে ওদিক দেখিয়া পূর্বমুখে অগ্রসর হইলেন। তারপর পূর্ব ছাড়িয়া দক্ষিণের উপপথ ধরিয়া ছুটিলেন। একদিনে তিনি পনর ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া এক গোপের বাথানে গিয়া রাত্রি-যাপন করিলেন। তারপর ছত্রভোগ ও কুগ্রাম দিয়া মাত্র ত্রিসন্ধ্যা অন্নগ্রহণ করিয়া[৬] বারদিনের মধ্যেই পুরুষোত্তমে উপস্থিত হইলেন।[৭] রঘুনাথের জীবনের দ্বিতীয় পর্যায় আরম্ভ হইল।

মহাপ্রভু এবার আর রঘুনাথকে তিরস্কৃত করিলেন না, বরং স্নেহালিঙ্গন দান করিয়া তাঁহার কৃষ্ণপ্রীতির জন্য তাঁহাকে পুরস্কৃত করিলেন। রঘুনাথ কিন্তু স্পষ্টই জানাইলেন যে তিনি কৃষ্ণপ্রীতির কথা কিছুই জানেন না, মহাপ্রভুর কৃপাই তাঁহাকে এতদূর আনিতে পারিয়াছে। মহাপ্রভু রঘুনাথকে স্বরূপদামোদরের হস্তে সমর্পণ করিয়া বলিলেন যে

---

(৫) চৈ. চ.—৩।৬, পৃ. ৩১৮; চৈ. না.—১০।১০; প্রে. বি.—১৮শ. বি., পৃ. ২৭০ (৬) সূ.—পৃ. ৬; সূ. (ব. সা. প.)—পৃ. ১০৬; গৌ. ত.—পৃ. ৩১০ (৭) দ্র.—হিরণ্য দাস (৮) চৈ. চ.—৩।৬, পৃ. ৩১৯; প্রে. বি.—১৮শ. বি., পৃ. ২৭১

সেখানকার তিন রঘুনাথের মধ্যে 'স্বরূপের রঘু আজি হৈতে ইহার নামে'।[৮] তারপর তিনি গোবিন্দকে অনাহারী-রঘুনাথের ভোজন-ব্যবস্থা করিয়া দিতে আদেশ দান করিলে রঘুনাথ সমুদ্রস্নান ও জগন্নাথ-দর্শনান্তে মহাপ্রভুর অবশিষ্ট-পাত্রে ভোজন করিলেন। পাঁচ-দিন ঐরূপ ভোজন করিবার পর তিনি সিংহদ্বারে দাঁড়াইয়া ভিক্ষালব্ধ অন্নের[৯] দ্বারা উদর-পূর্তি করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভুও এই বুঝিয়া সন্তুষ্ট হইলেন যে রঘুনাথ 'ভাল কৈল বৈরাগীর ধর্ম আচরিলা'।

রঘুনাথ মহাপ্রভুর সম্মুখীন হইয়া কোন কথা বলিতে পারেন না। তাই একদিন তিনি স্বরূপের মারফত মহাপ্রভুর নিকট জানিতে চাহিলেন, কেন তিনি তাঁহাকে এইরূপ ঘরছাড়া করিয়া আনিয়াছেন, তাঁহার উদ্দেশ্য কি! মহাপ্রভু তাঁহাকে স্বরূপের নিকটে সাধ্যসাধন-তত্ত্ব শিক্ষাগ্রহণ করিতে নির্দেশ দিয়া 'গ্রাম্য কথাবার্তা' না বলিতে, ভাল খাওয়া পরা না করিতে, 'অমানী মানদ কৃষ্ণনাম' লইতে ও ব্রজে 'রাধাকৃষ্ণ সেবা'র মানস করিতে উপদেশ প্রদান করিলেন। সেই হইতে স্বরূপের সহিত তাঁহার 'অন্তরঙ্গ-সেবা' আরম্ভ হইয়া গেল।

ইহার পর গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দ নীলাচলে পৌঁছাইলে রঘুনাথ শিবানন্দের নিকট তাঁহার পিতামাতার সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া[১০] রথযাত্রাদি দর্শন করিলেন। পর-বৎসর তাঁহার পিতা দুইজন লোক ও চারি শত মুদ্রা পাঠাইয়া দিলেন। রঘুনাথ তখন অনেক চেষ্টা করিয়া মহাপ্রভুকে তাঁহার বাসায় মাসে দুইদিন করিয়া ভিক্ষানির্বাহ করিবার মত করাইলেন। কিন্তু বিষয়ীর অন্নগ্রহণে মহাপ্রভু কখনও প্রসন্ন হইতে পারেন না বুঝিয়া দুই বৎসর পরে তিনি নিজেই সেই নিমন্ত্রণ বন্ধ করিয়া দিলেন। অনুসন্ধানে মহাপ্রভু সমস্ত বিষয় বুঝিতে পারিয়া রঘুনাথের প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন। তারপর 'নিষ্কিঞ্চন ভক্ত' রঘুনাথ সিংহদ্বারের ভিক্ষাও ছাড়িয়া দিলেন এবং 'ছত্রে যাই মাগি খাইতে আরম্ভ করিল'। 'বেশ্যার আচার'-তুল্য 'সিংহদ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি' ছাড়িয়া দেওয়ায় মহাপ্রভু ঐকান্তিক তৃপ্তিলাভ করিয়া রঘুনাথকে গোবর্ধনের শিলা ও গুঞ্জামালা উপহার দিলেন।[১১] এই শিলা ও গুঞ্জামালা শংকরানন্দ-সরস্বতী তাঁহাকে বৃন্দাবন হইতে আনিয়া দিয়াছিলেন এবং তদবধি এই তিন-বৎসর তিনি কৃষ্ণজ্ঞানে নিরন্তর ইহার ভজনা করিয়াছেন। মহাপ্রভুর স্বহস্ত-প্রদত্ত এইপ্রকার শিলা ও মালা লাভ করিয়া রঘুনাথ যেন আত্মহারা হইলেন এবং জল-তুলসী দিয়া ইহার সাত্ত্বিক পূজা আরম্ভ করিয়া দিলেন। সেই পূজাবিধি ছিল

(৯) এই প্রকার ভিক্ষালব্ধ অন্নগ্রহণের পদ্ধতি সম্বন্ধে 'রঘুনাথ দাস গোস্বামীর জীবন চরিত' দ্রষ্টব্য—পৃ. ১৬ (১০) দ্র.—হিরণ্য দাস (১১) চৈ. চ.; প্রে. বি.—১৮শ. বি., পৃ. ২৭১; গৌ. ভ.—পৃ. ৩১০

অত্যন্ত কঠোর। তাহার কোথাও এতটুকু ছিদ্র পর্যন্ত ছিলনা। 'রঘুনাথের নিয়ম যেন পাষাণের রেখা।'[১২]

কিন্তু রঘুনাথের তপস্যা কেবল পূজাবিধি পালনে নহে। মহাপ্রভুর নির্দেশ তিনি অক্ষরে-অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন। 'ছিণ্ডা কানি কাঁথা বিনা' তাঁহার আর কিছুই পরিধেয় ছিলনা। তারপর ছত্রে গিয়া যেরূপে অন্নগ্রহণ করিতেন তাহাও তিনি উঠাইয়া দিলেন। পসারিগণ অবিক্রীত প্রসাদান্ন দুই তিন দিন গৃহে রাখিবার পর ফেলিয়া দিলে গাভীগণও যখন তাহাতে দুর্গন্ধে মুখ দিতে পারিত না, তখন রঘুনাথ তাহা তুলিয়া আনিয়া ধুইয়া খাইতে লাগিলেন। এই কথা শুনিতে পাইয়া একদিন মহাপ্রভু স্বয়ং তাঁহার নিকট সেই অন্ন চাহিয়া খাইয়া তাঁহাকে সম্মানিত করিলেন।

জীবন-সায়াহ্নে যখন চৈতন্য-মহাপ্রভুর বিরহোন্মাদ-ভাব ক্রমাগত বাড়িয়া চলিতে থাকে, তখন তাঁহার সেই ভাব-বিবরণকে লিপিবদ্ধ করিবার মত কোন কড়চা-লেখক পাশে ছিলেন না। তাঁহার তখনকার নিত্যসঙ্গী স্বরূপ-রঘুনাথই এই কার্য করিয়াছিলেন। 'স্বরূপ সূত্রকর্তা রঘুনাথ বৃত্তিকার।' চৈতন্য যে একদিন রঘুনাথকে স্বরূপের সঙ্গ গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন, রঘুনাথ এইরূপে চৈতন্য ও স্বরূপ উভয়েরই সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া তাঁহার সেই আদেশকে বর্ণে বর্ণে পালন করিলেন।

চৈতন্যের আর একটি উপদেশ ছিল ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা। কিন্তু স্বয়ং তিনিই যে রঘুনাথের নিকট কৃষ্ণাপেক্ষা প্রিয় ছিলেন, ইহা স্মরণ করিয়াই বোধকরি তাঁহার জীবদ্দশাতে তিনি রঘুনাথকে বৃন্দাবনে যাইবার নির্দেশ দান করেন নাই। কিন্তু স্বরূপের সহিত ষোড়শ বর্ষ যাবৎ 'প্রভুর গুপ্ত সেবা' ও 'অন্তরঙ্গ সেবন' করিয়া শেষে ১৫৩৩-৩৪ খ্রী.-এর দিকে তিনি মহাপ্রভুর ও তাহার পর 'স্বরূপের অন্তর্ধানে আইলা বৃন্দাবন।'[১৩] 'ভক্তিরত্নাকর' মতে[১৪] শ্রীনিবাস-আচার্য নীলাচলে গিয়া তাঁহার সাক্ষাৎলাভ করিতে পারেন নাই। 'প্রেমবিলাস'-কার নিত্যানন্দদাস কিন্তু জানাইতেছেন[১৫] যে রূপনারায়ণ (রূপচন্দ্র লাহিড়ী) বৃন্দাবনস্থ রঘুনাথদাসাদি গোস্বামী-বৃন্দের আশীর্বাদ লইয়া নীলাচলে গিয়া মহাপ্রভুর অন্তর্ধান-বার্তা শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং তাহারপর স্বরূপদামোদরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। কিন্তু নিত্যানন্দদাস সম্ভবত ভুল করিয়াই এস্থলে বৃন্দাবনস্থ গোস্বামী-বৃন্দের মধ্যে রঘুনাথদাসের নাম উল্লেখ করিয়া থাকিবেন। 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র বিশেষ উল্লেখ এবং 'ভক্তিরত্নাকরে'র উল্লেখ হইতেও উক্তপ্রকার উক্তি সমর্থিত হয় না। যাহা হউক, বৃন্দাবনে আসিয়া রঘুনাথের জীবনের তৃতীয় পর্যায় আরম্ভ হইল।

---

(১২) প্রে. বি.—১৬শ. বি. ; পৃ. ২২৩ ; কর্ণ.—৪র্থ. নি., পৃ. ৭৭ (১৩) চৈ. চ.—১।১০, পৃ. ৫৩ ; ভ. র.—৩।২০৮ (১৪) ৩।২০৭ (১৫) প্রে. বি.—১৯শ. বি., পৃ. ৩২৯

বৃন্দাবনে রূপ-সনাতনের পাদপদ্ম-দর্শন ও গোবর্ধনে দেহরক্ষা করিবার সংকল্প লইয়া রঘুনাথ বৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন। কিন্তু সনাতন ও রূপ দুই ভাই তাঁহাকে তৃতীয় ভ্রাতা-রূপে বরণ করিলেন।[১৬] রঘুনাথ ও রূপ-সনাতনের সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির কথা বিখ্যাত হইয়া আছে। কবিরাজ-গোস্বামী 'স্বরূপ-রূপ-সনাতন-রঘুনাথের চরণ' একত্রে ধ্যান করিয়াছেন। 'হরিভক্তিবিলাসে'র দ্বিতীয় শ্লোকে গোপাল-ভট্ট-গোস্বামী 'রঘুনাথদাসং সন্তোষয়ন্ রূপ-সনাতনৌ চ' গ্রন্থ সংকলন করিয়াছেন।[১৭] এমন কি স্বয়ং জীব-গোস্বামীও তাঁহার 'লঘুতোষণী'-গ্রন্থে রূপ-সনাতনের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, "যন্মিত্রং রঘুনাথদাস ইতি বিখ্যাতঃ ক্ষিতৌ"[১৮] এবং সেই রঘুনাথ "অনয়োর্ভ্রাজতোস্তুল্যাস্তত্ত্বপদং মতস্ত্রিভুবনে সাশ্চর্যমার্যেস্তৈঃ॥"[১৯] এই রূপ-সনাতনের স্নেহে বিগলিত হইয়া রঘুনাথ মরণ-বরণের সংকল্প ত্যাগ করিয়া 'শ্রীরূপ-সনাতন আজ্ঞা লইয়া শিরে। বসতি করিলা যিঁহো রাধাকুণ্ডতীরে॥'[২০] গোবর্ধন সমীপে রাধাকুণ্ডে গিয়া পুনরায় তিনি তাঁহার সেই কঠোর নিয়ম আরম্ভ করিলেন। অন্নজল একপ্রকার বন্ধ হইল, বৃক্ষপত্রই বসনের অভাব দূর করিল। প্রত্যহ শত-শত বৈষ্ণবকে প্রণাম করিয়া ও লক্ষবার হরিনাম করিয়া তিনি 'রাত্রিদিন রাধাকৃষ্ণের মানসে সেবন' করিতে লাগিলেন। তাহাছাড়া, 'তিন সন্ধ্যা রাধাকুণ্ডে অপতিত স্নান', সাড়ে-সাত-প্রহর ভক্তি-সাধনা ও প্রায়ই বিনিদ্ররজনী-যাপন তাঁহার অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল।

রঘুনাথ প্রথমে সেই শ্বাপদসংকুল বনমধ্যে শ্যামকুণ্ডের এক পুরাতন বৃক্ষতলেই বাস আরম্ভ করেন। কিন্তু পরে সনাতন-গোস্বামীর হস্তক্ষেপে তিনি বৃক্ষতল ত্যাগ করিয়া কুটিরে বাস করিতে লাগিলেন।[২১] তখন রাধাকুণ্ড বলিয়াও কিছু ছিল না। সমস্তই লুপ্ত হইয়া ধান্য-ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। মহাপ্রভু তাঁহার বৃন্দাবন-ভ্রমণের সময় উক্ত ধান্যক্ষেত্রে কুণ্ডদ্বয়ের প্রাগবস্থান নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন। রঘুনাথ এক্ষণে কোন এক ধনী-মহাজনকে দিয়া সেই কুণ্ডদ্বয়ের পঙ্কোদ্ধার কার্য সম্পন্ন করিলেন।

রাধাকুণ্ডে রঘুনাথের সঙ্গী ছিলেন কৃষ্ণদাস-কবিরাজ।[২২] তিনি রঘুনাথের প্রতি স্বীয় আনুগত্যের উল্লেখ করিয়া তাঁহাকেই 'সারগুরু' বলিয়াছেন।[২৩] আবার জীব-গোস্বামীও রঘুনাথকে যথেষ্ট মান্য করিতেন। কিন্তু রঘুনাথ নিজেও বৃন্দাবন-নির্মিতিতে কম সাহায্য

(১৬) গৌ. ত.—পৃ. ৩১০ (১৭) হ. বি.—১।২ (১৮) ভ. র.—পৃ. ১০ (১৯) ঐ—পৃ. ৩৬ (২০) কর্ণ.—৪র্থ. নি., পৃ. ৭৭ (২১) ভ. র.—পৃ. ১৩০ (২২) রাঘব-পণ্ডিত (ভ. র.—৪।৩৯২) এবং লোকনাথ-গোস্বামীও (কর্ণ.—পৃ. ৮৮) রঘুনাথের সঙ্গী ছিলেন। (২৩) চৈ. চ.—৩।৪, পৃ. ৩০৯

করেন নাই। তাঁহার প্রচেষ্টাতেই কুণ্ডদ্বয়ের পঙ্কোদ্ধার[২৪] ও তাঁহারই পরামর্শে মাধবেন্দ্র-নিযুক্ত গৌড়ীয় বিপ্রদ্বয়ের মৃত্যুর পর গাঠুলীর গোপাল-সেবায় বিঠ্ঠলনাথকে নিযুক্ত করা হয়। ইহা ছাড়া 'স্তবমালা' বা 'স্তবাবলী'[২৫] (চৈতন্যাষ্টক, গৌরাঙ্গস্তবকল্পতরু, মনঃশিক্ষা, বিলাপকুসুমাঞ্জলি, রাধাকৃষ্ণোজ্জ্বলকুসুমকেলি, বিশাখানন্দস্তোত্র, ব্রজবিলাসস্তব),[২৬] 'শ্রীনাম-চরিত' ও 'মুক্তাচরিত' নামে তিনখানি গ্রন্থও তিনি রচনা করিয়াছিলেন।[২৭] রঘুনাথের আর একখানি গ্রন্থের নাম 'দানকেলিচিন্তামণি'। আবার পূর্বেই বলা হইয়াছে যে রঘুনাথ স্বরূপ-কৃত কড়চারও, 'বৃত্তিকার' ছিলেন।[২৮] এতদ্ব্যতীত তাঁহার দুই তিনটি পদ[২৯] পাওয়া যায়। পদগুলির মধ্যে একটি ব্রজভাখায় ও একটি ব্রজবুলি-ভাষায় রচিত।[৩০] পদ্যাবলীতেও রঘুনাথের তিনটি শ্লোক গৃহীত হইয়াছে।

শ্রীনিবাস-নরোত্তম-শ্যামানন্দ বৃন্দাবনে আসিলে রঘুনাথ তাঁহাদিগকে অনুগৃহীত করিয়াছিলেন। কিন্তু তখন তাঁহার শরীর ক্ষীণ ও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে, তবুও 'যদ্যপিহ শুষ্কদেহ বাতাসে হালয়। তথাপি নির্বন্ধ ক্রিয়া সব সমাধয়॥' শ্রীনিবাস-আচার্য দ্বিতীয়বার বৃন্দাবনে আসার পর রামচন্দ্র-কবিরাজও বৃন্দাবনে আসিয়া রঘুনাথের প্রসাদ-লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু জাহ্নবাদেবী যখন দ্বিতীয়বার বৃন্দাবনে আগমন করেন, তখন রঘুনাথ অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার আর চলিবার সাধ্য নাই।[৩১] তখন তিনি 'অতিশয় ক্ষীণতনু' এবং শিথিলেন্দ্রিয়প্রায়।[৩২] জাহ্নবাদেবী রাধাকুণ্ডে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন।[৩৩] বীরচন্দ্রপ্রভু আসিয়া আর তাঁহাকে দেখিতে পান নাই।[৩৪]

---

(২৪) 'সজ্জন তোষণী'-পত্রিকায় (চৈতন্যাব্দ ৪০০, ২য়. খণ্ড) লিখিত হইয়াছে যে পঙ্কোদ্ধারের পূর্বে বদরিকাশ্রম হইতে নারায়ণ-প্রেরিত একজন লোকের মারফত রঘুনাথ নারায়ণ-প্রদত্ত কতিপয় স্বর্ণমুদ্রাপ্রাপ্ত হওয়ায় তাঁহার পঙ্কোদ্ধার-মানস সিদ্ধ হয়। (২৫) "শ্রীমদ্রূপ গোস্বামীরও স্তবমালা নামে একখানি গ্রন্থ আছে; এইজন্য দাস-গোস্বামীর গ্রন্থ (স্তবমালা) 'স্তবাবলী' নামে আখ্যাত হইল।"—শ্রীমৎ রঘুনাথ দাস গোস্বামীর জীবনচরিত, অচ্যুতচরণ চৌধুরী, পৃ. ৫১ (২৬) VFM—p.91 (২৭) ভ. র.—১।৮৭৩; বৈষ্ণবদিগ্‌দর্শনী গ্রন্থ (পৃ. ৩৩)-মতে "রঘুনাথ বাল্যে যে রাধামোহন সেবা করিতেন, তাহা মুসলমানগণ নদীতে ফেলিয়া দিলে রঘুনাথ সংবাদ পাইয়া বৃন্দাবন হইতে কৃষ্ণকিশোর নামক তাঁহার জনৈক ব্রজবাসী শিষ্যকে ঐ বিগ্রহের উদ্ধার ও সেবা করিবার জন্য সপ্তগ্রামে প্রেরণ করেন। ইহার শিষ্যশাখা বর্তমান সেবক।" (২৮) চৈ. চ.—৩।১৪, পৃ. ৩৪৮ (২৯) 'পদকল্পতরু'-ধৃত রঘুনাথ-ভণিতার তিনটিপদ সম্বন্ধে ১৩৪২ সালের 'ভারতবর্ষ'-পত্রিকায় আষাঢ়-সংখ্যায় হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন, "অপর রঘুনাথ দুইজনা যে পদ রচনা করিয়াছিলেন তাহার কোন প্রমাণ নাই। পক্ষান্তরে বৈষ্ণবসমাজে.ঐ পদ তিনটি দাস-রঘুনাথের নামেই চলিয়া আসিতেছে।" (৩০) HBL—p. 42 (৩১) ভ. র.—১১।১৫০ (৩২) ঐ—১১।১৬৪-৬৭ (৩৩) প্রে. বি.—১৬শ. বি., পৃ. ২২৭ (৩৪) অচ্যুতচরণ চৌধুরী তাঁহার 'শ্রীমৎ রঘুনাথ দাসগোস্বামীর জীবনচরিত' নামক গ্রন্থে (পৃ. ৬১) বলিয়াছেন, "দাস গোস্বামী চতুর্নবতি বর্ষকাল এই ধরাধামে ছিলেন; তিনি ১৫১৪শকে আশ্বিনের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে দেহত্যাগ করেন।" কিন্তু ইহা তাঁহার অনুমান মাত্র।

গোপাল-ভট্ট-গোস্বামী

দাক্ষিণাত্যের তৈলঙ্গ-দেশে কাবেরী-নদীর তীরে শ্রীরঙ্গ-ক্ষেত্র। সেই তীর্থ-সন্নিধানে 'তৈলঙ্গ-বিপ্ররাজ' ত্রিমল্লভট্টের বাস ছিল। ত্রিমল্লের দুই ভাই—বেঙ্কট ও প্রবোধানন্দ। কেহ কেহ মনে করেন[১] যে বেঙ্কট-ভট্টের পুত্রই গোপাল-ভট্ট। কিন্তু খুব সম্ভবত গোপাল-ভট্ট ত্রিমল্ল-ভট্টেরই পুত্র ছিলেন।[২] ইঁহারা ছিলেন বৈদিক-ব্রাহ্মণ; কিন্তু বৈষ্ণবভাবাপন্ন। লক্ষ্মীনারায়ণ ইঁহাদের উপাস্য-দেবতা। মহাপ্রভুর প্রভাবে ইঁহারা রাধাকৃষ্ণের উপাসক হইয়া উঠেন।

দাক্ষিণাত্য-যাত্রাকালে মহাপ্রভু যখন ত্রিমল্ল-ভট্টের গৃহে উপস্থিত হন, তখন বর্ষা আরম্ভ হইয়াছে। ভট্ট পরিবার মহাপ্রভুকে সেইস্থানে চাতুর্মাস্য অতিবাহিত করিবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন। ইঁহাদিগের বৈষ্ণব-ভাবে মুগ্ধ হইয়া তিনিও তৎস্থানে থাকিয়া গেলেন। ত্রিমল্লের পুত্র (?) গোপালকে তাঁহার পরিচর্যা ও সেবায় নিযুক্ত করা হইল।[৩]

গোপাল-ভট্ট 'নিষ্কপট' হইয়া মহাপ্রভুর পরিচর্যা করেন, তাঁহার ভাবধারার সহিত পরিচিত হইতে থাকেন, এবং নিপুণ-সেবার দ্বারা তাঁহার মন পাইবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। পিতৃব্য প্রবোধানন্দের নিকট তিনি পূর্বেই শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং বাল্যকালে তিনি একবার নীলাচলে জগন্নাথ দর্শন করিয়াও আসিয়াছিলেন। এখন তাঁহার সেই দেবানুরাগী শিক্ষিত মন এবং পরিবারগত নিষ্ঠা লইয়া তিনি তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইলেন। মহাপ্রভুও ক্রমে তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে একান্তে ডাকিয়া নানাবিধ উপদেশ প্রদান করিলেন। 'কর্ণানন্দ'-গ্রন্থে[৪] বলা হইয়াছে যে বিদায়-গ্রহণকালে তিনি গোপালকে স্বীয় কৌপীন-বহির্বাস প্রদান করিয়া বলিয়া গেলেন যে যথাকালে তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। 'প্রেমবিলাস'-মতে[৫] গোপাল-ভট্ট নাকি সেই সময়ে ভাগবত-শিক্ষা করিতেছিলেন। মহাপ্রভু তাঁহার পিতৃব্য প্রবোধানন্দের উপর তাঁহার শিক্ষাভার অর্পণ করিয়া তাঁহাকে ব্রহ্মচর্য-পালনের উপদেশ দান করেন এবং বলিয়া যান যে সময় আসিলে তাঁহাকে বৃন্দাবনে যাইতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র প্রাচীন বৃন্দাবনকে যে একটি উন্নত শিক্ষা-সংস্কৃতি-

---

(১) The Vaisnava Literature of Mediaeval Bengal (২) দ্র.—ত্রিমল্ল-ভট্ট; গোপালের পিতৃব্য সম্বন্ধে প্রবোধানন্দ-সরস্বতীর জীবনী দ্রষ্টব্য। (৩) বৈষ্ণবদিগ্‌দর্শনী মতে (পৃ. ৫২) গোপাল তখন ৮। ৯ বৎসরের বালক।

কেন্দ্রে রূপান্তরিত করিয়া তথা হইতে সুযোগ্য ও ধীমান ভক্তবৃন্দ দ্বারা ভক্তি-ধর্মের প্রচার তাঁহার অভিপ্রেত, এইরূপ একটি আভাসও তিনি সম্ভবত গোপাল-ভট্টকে দিয়া গেলেন।

ত্রিমল্ল-ভট্টাদির মৃত্যু ঘটিলে গোপাল-ভট্ট বৃন্দাবন-ধামে গিয়া উপস্থিত হন। কিছুকাল সেইস্থানে বাস করিবার পর তিনি শালগ্রাম-শিলার স্থলে পূর্ণাবয়ব দেব-বিগ্রহের পূজাভিলাষী হইলে[৬] রূপ-গোস্বামীর হস্তক্ষেপে তদনুরূপ বিগ্রহের পূজা প্রচলিত হয় এবং গোপাল-ভট্টের ঐকান্তিক বাসনার ফলে এক বৈশাখী-পূর্ণিমা তিথিতে রাধারমণ-বিগ্রহ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর তাঁহারই প্রচেষ্টায় মন্দির নির্মিত হইলে যথাবিধি রাধারমণ-সেবাপূজা চলিতে থাকে এবং তিনি 'নিজ শিষ্য শ্রীলভক্তদাস পূজারী'র হস্তে পূজার ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হন।

গোপালের বৃন্দাবন-আগমনে রূপ-সনাতন আনন্দিত হইয়াছিলেন। 'প্রেমবিলাস' ও 'ভক্তিরত্নাকর' হইতে জানা যায় যে মহাপ্রভুকে তাঁহারা এই সংবাদ জানাইয়া পত্র লিখিলে তিনিও আসন এবং ডোর-কৌপীন-বহির্বাস[৭] সহ প্রত্যুত্তর পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু গোপাল প্রথমে মহাপ্রভুর আসনে কিছুতেই বসিতে চাহেন নাই। শেষে মহাপ্রভুর আদেশ-পালনার্থে এবং সনাতন ও রূপের হস্তক্ষেপের ফলে গলায় ডোর পরিয়া অত্যন্ত দ্বিধাসহকারে তিনি আসন গ্রহণ করেন।[৮] গোপালকে সঙ্গী-হিসাবে পাওয়ায় গোস্বামী-ভ্রাতৃবৃন্দও তাঁহাকে তাঁহাদের অভিন্নহৃদয় ভ্রাতা-রূপে গ্রহণ করিলেন এবং গোপালও গ্রন্থাদি রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। 'সনাতন প্রেম পরিপ্লুতান্তর' গোপাল-ভট্ট সম্ভবত সনাতন-গোস্বামীর আদেশে ও তত্ত্বাবধানে এবং তাঁহারই প্রত্যক্ষ সাহায্য গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণব-আচার ও বৈষ্ণব- ক্রিয়ামুদ্রা-নিয়মাদি সংবলিত 'হরিভক্তিবিলাস' নামক গ্রন্থখানি প্রস্তুত করেন। তাহার পর তিনি তাহা সংশোধনার্থ সনাতনের হস্তে প্রদান করিলে সনাতন তাহাকে নিজ পুস্তকরূপেই গ্রহণ করেন,[৯] কিন্তু সনাতনের ইচ্ছানুযায়ী তাহা গোপালের নামেই প্রচলিত হয়।[১০] ইহা ছাড়া, সম্ভবত লীলাশুকের 'কৃষ্ণকর্ণামৃতে'র টীকাখানিও গোপাল-ভট্টের নামে প্রচলিত হয়।[১১] কিন্তু ডা. সুশীলকুমার দে প্রমাণ

(৪) ৫ম. নি. (৫) ১৮শ. বি., পৃ. ২৭৩ (৬) "এক ধনবান বৃন্দাবনস্থ বিগ্রহগুলিকে বস্ত্রালংকারাদি দান করিতে চাহিলে উক্ত শালগ্রাম হস্তপদাদিবিহীন হওয়ায় গোপাল-ভট্ট শোকাচ্ছন্ন হইলেন, প্রভাতে দেখা গেল যে, শালগ্রাম চক্র ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিমা রূপ মুরলী বদন" হইয়াছেন—বৈ. দ., পৃ. ৮৭ (৭) ভ. র.—১।১৯৪ ; প্রে. বি.—১ম. বি., পৃ. ১২ (৮) প্রে. বি.—১ম. বি., পৃ. ১৩-১৪ (৯) ঐ ১৮শ. বি., পৃ. ২৭৪ ; হরিভক্তিবিলাসের প্রতিটি বিলাসই "ইতি শ্রীগোপাল-ভট্ট-বিলিখিতে শ্রীহরিভক্তি বিলাসে" ইত্যাদি রূপ বচনের দ্বারা সমাপ্ত হইয়াছে। (১০) ভ. র.—১।১৫০ (১১) অ. ব.—১ম. ম., পৃ. ৫ ; বৈ. দি.—পৃ. ৩৬

দিয়াছেন[১২] যে উহার প্রণেতা গোপাল-ভট্ট দ্রাবিড়-দেশীয় হরিবংশ-ভট্টের পুত্র ও নৃসিংহের পৌত্র। সুতরাং গোপাল-ভট্ট-গোস্বামীকে উহার রচনাকার বলিবার দৃঢ়ভিত্তি নাই। তবে জীব-গোস্বামী রচিত বিখ্যাত 'ভাগবতসন্দর্ভ' গ্রন্থখানির মালমশলা প্রথমে তাঁহার দ্বারাই সংগৃহীত হইয়া ক্রমভঙ্গে বিচ্ছিন্নভাবে পত্রধৃত হয়।[১৩]

রাধারমণ-বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা ও সেবা এবং গ্রন্থরচনা ছাড়াও গোপাল-ভট্ট-গোস্বামীর অন্য কাজ ছিল। সম্ভবত তাঁহার বৃন্দাবন-আগমনের কিছুকাল পরেই মহাপ্রভুর তিরোভাব ঘটে এবং তাহার পর কাশীশ্বর-গোস্বামী ও রঘুনাথ-ভট্ট পরলোকে প্রয়াণ করেন। তাহারও পরে রূপ-সনাতন লোকান্তরিত হন। রঘুনাথদাস-গোস্বামী তখন দূরে রাধাকুণ্ডে অবস্থান করিতেছিলেন এবং জীব-গোস্বামীও নববৃন্দাবন-নির্মাণ ও গ্রন্থাদি-রচনায় অত্যন্ত ব্যস্ত। সুতরাং বৈষ্ণবধর্ম-প্রচারার্থ দীক্ষাদি[১৪]-কর্ম-সম্পাদনের কিছুটা দায়িত্ব লোকনাথ ও গোপালাদির উপর আসিয়া পড়ে। পরবর্তিকালে শ্রীনিবাস-আচার্য তাঁহারই নিকট দীক্ষিত হইয়া চৈতন্যের ধর্মকে পূর্ব-ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া তুলিতে সমর্থ হন। প্রথমে জীব-গোস্বামী শ্রীনিবাস কর্তৃক নানাবিধ মহৎ-কর্ম সম্পাদনের সম্ভাবনা বুঝিয়া গোপাল-ভট্টের নিকট সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিলে ভট্ট-গোস্বামীও আপনার প্রতি মহাপ্রভুর ইঙ্গিতের কথা স্মরণ করিয়া সেই বিষয়ে আগ্রহান্বিত হন। তদনুযায়ী তিনি রাধারমণ-বিগ্রহ সম্মুখে মহাপ্রভু-দত্ত আসনে উপবিষ্ট হইয়া শ্রীনিবাসকে চৈতন্য-প্রেরিত কৌপীন ও বহির্বাস পরাইয়া[১৫] মন্ত্রদীক্ষা[১৬] দান করেন এবং জীব-গোস্বামীর উদ্যোগে একদিন তিনি গোবিন্দ-মন্দিরে গিয়া শ্রীনিবাসকে 'আচার্য'-উপাধি প্রদান করেন।[১৭] তারপর শ্রীনিবাস নরোত্তমাদি গৌড়ে প্রত্যাবর্তন করিলে তিনি তাঁহাদিগকে আশীর্বাদ করিয়া প্রিয়-শিষ্য শ্রীনিবাসকে আর একবার বৃন্দাবনে আসিবার জন্যও আজ্ঞা-প্রদান করিয়াছিলেন।

শ্রীনিবাস-আচার্য যখন দ্বিতীয়বার বৃন্দাবনে আগমন করেন, তখন গোপাল-ভট্ট তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। তাহারও পরে জাহ্নবাদেবীর দ্বিতীয়বার বৃন্দাবনাগমনকালেও গোপালভট্ট-গোস্বামী জীবিত ছিলেন। তাহার পর কোনও গ্রন্থে আর তাঁহার বিশেষ

(১২) VFM—pp 100, 101 (১৩) ব. স. (ত. স.)—৪, ৫ (১৪) বৈ. দ.-গ্রন্থ (পৃ. ৪৫, ৮১, ১১২)-মতে হিতহরিবংশ গোপালভট্টের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং তিনি "উত্তরপ্রদেশে দেববন নামক স্থানে 'গৌড় ব্রাহ্মণ' গোপীনাথকে দীক্ষাদান করেন। গোপীনাথ উত্তর-ভারতে ভক্তিধর্ম প্রচার করেন।" (১৫) কর্ণ.—৬ষ্ঠ. নি. (১৬) প্রে. বি.—৬ষ্ঠ. বি., পৃ. ৬৫-৬৬ ; অ. লী.—পৃ. ১৪৯ (১৭) অ. ব.—৫ম., পৃ. ৩২

উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবল 'প্রেমবিলাস'গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে যে বীরচন্দ্রপ্রভু বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া শ্রীনিবাসকে গোপালের সমাচার জানাইয়াছিলেন।

গোপাল-ভট্ট গোস্বামীর যথেষ্ট চারিত্রিক দৃঢ়তা ছিল। শ্রীনিবাসকে তিনি রাধারমণের অধিকারী করিয়াও যখন জানিলেন যে বিবাহ-সম্পর্কিত ব্যাপারে শ্রীনিবাস তাঁহার নিকট মিথ্যা কথা বলিয়াছেন, তখন তিনি তাঁহাকে অবিলম্বে সেই অধিকার হইতে বঞ্চিত করেন।[১৮] 'চৈতন্যচরিতামৃত'-গ্রন্থে কৃষ্ণদাস-কবিরাজ-গোস্বামী যে তাঁহাকে একটি 'সর্বোত্তম শাখা' বলিয়া নির্দিষ্ট করিবার পরেও তাঁহার অন্যান্য প্রসঙ্গ সম্বন্ধে নীরব রহিয়াছেন, নিশ্চয় তাহার কোন গূঢ় কারণ থাকিবে। নরহরি-চক্রবর্তী জানাইতেছেন[১৯] যে 'চৈতন্যচরিতামৃত'-রচনার আজ্ঞাদান-কালে গোপাল-ভট্ট-গোস্বামীই স্বয়ং উক্ত গ্রন্থে নিজ নামের উল্লেখ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন।[২০] ইহা সত্য হইলে তিনি যে কারণেই ঐরূপ নিষেধাজ্ঞা প্রদান করুন না কেন, তাহা যে তাঁহার নামলেশ-আকাঙ্ক্ষাহীন চিত্তবৃত্তির দৃঢ়তা ও ঔদার্যের পরিচায়ক তাহাতে সন্দেহ থাকে না।

'পদকল্পতরু'তে গোপাল-ভট্টের দুইটি পদ[২১] উদ্ধৃত হইয়াছে। দুইটিই 'ব্রজভাখা' বা ব্রজভাষায় লিখিত। আরও একটি পদ[২২] গোপালদাস-ভণিতায় লিখিত হইলেও একই ভাষায় রচিত হওয়ায় তাহা বাঙালী-পদকর্তার রচিত নহে বলিয়া ধারণা করা যাইতে পারে। এই কারণেই সতীশ চন্দ্র রায় ও ডা. সুকুমার সেন উভয়ে মনে করেন যে তাহাও গোপাল-ভট্ট-বিরচিত। 'পদ্যাবলীতে'ও গোপাল-ভট্টের একটি সংস্কৃত-শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

গোপাল-ভট্ট-গোস্বামীর তিরোভাবকাল সম্বন্ধে[২৩] সঠিক করিয়া কিছু বলা যায় না।

(১৮) প্র.—শ্রীনিবাস (১৯) ন. বি.—১ম. বি. (২০) ভ. র.—১।২২২ (২১) ১০৮৮, ২৮৩৩ (২২) ঐ—২৯৬৬ (২৩) শ্রীমদ্‌গোপালভট্ট গোস্বামীর জীবন চরিত নামক গ্রন্থে (পৃ. ৪৯) অচ্যুতচরণ চৌধুরী বলেন, "তাঁহার (গোপাল-ভট্ট-গোস্বামীর) অন্তর্ধান কাল ১৫০৯।১০ শকাব্দ অনুমান করিবার বিশেষ কারণ আছে। তাহা হইলে তদীয় জীবনকাল ৮৭।৮৮ বৎসর হয়।" কিন্তু অনুমান অনুমানমাত্র।

রঘুনাথ-ভট্ট-গোস্বামী

রঘুনাথ-ভট্ট ছিলেন ষড়্‌গোস্বামীর একজন অন্যতম গোস্বামী। তাঁহার পিতা তপন-মিশ্র চৈতন্যের একজন অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন। নিবাস ছিল পূর্ববংগে। কিন্তু তিনি গৌরাঙ্গ-নির্দেশে কাশীবাসী হন।[১]

মহাপ্রভু বৃন্দাবন-গমন পথে কাশীতে অবস্থান-কালে তপন-মিশ্রের গৃহেই ভিক্ষা-নিবাহ করিতেন। দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণে ত্রিমল্ল-ভট্টের গৃহে গোপাল-ভট্ট যেরূপ মহাপ্রভুর সেবায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন এখানেও তেমনি রঘুনাথ-ভট্ট মহাপ্রভুর সেবায় নিযুক্ত হন। তখন তিনি বালক মাত্র, কিন্তু মহাপ্রভুর 'উচ্ছিষ্ট মার্জন ও পাদ-সংবাহন' করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। তারপর মহাপ্রভু যখন বৃন্দাবন হইতে কাশীতে প্রত্যাবর্তন করিয়া পুনরায় নীলাচল-যাত্রার উদ্যোগ করেন, তখন রঘুনাথ তাঁহার সহিত নীলাচলে গমন করিবার জন্য অস্থির হইয়া পড়েন। কিন্তু তাঁহার যাওয়া হয় নাই। পরে তিনি 'বড় হইলে নীলাচলে গেলা প্রভু স্থানে।'

রঘুনাথ পথ চলিয়াছেন। সঙ্গে একজন সেবক ঝালি সাজাইয়া যাইতেছে। গৌড়-পথেই তাঁহাকে নীলাচল গমন করিতে হইবে। পথে রামদাস-বিশ্বাস আসিয়া মিলিত হইলেন। 'বিশ্বাস খানার কায়স্থ তেঁহো রাজবিশ্বাস', এবং সম্ভবত তিনি 'সর্বশাস্ত্রে প্রবীণ কাব্যপ্রকাশ-অধ্যাপক' ছিলেন।[২] শূদ্র হইলেও তিনি ছিলেন পরমবৈষ্ণব এবং রঘুনাথের উপাসক। তাই তিনি অষ্টপ্রহর রামনাম ও রঘুনাথের তারকমন্ত্র জপ করিতেন। কিন্তু রঘুনাথ-ভট্টের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিলে তিনি রঘুনাথের সেবা ও পাদ-সংবাহন করিতে লাগিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যের কথা স্মরণ করিয়া রঘুনাথ সংকুচিত হইলেন। কিন্তু তিনি কোন কথা না শুনিয়া ব্রাহ্মণের সেবায় তৎপর হইলেন এবং রঘুনাথের ঝালি মস্তকে বহন করিয়া চলিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহারা যথাসময়ে নীলাচলে উপস্থিত হইলেন। নীলাচলে পৌঁছাইয়া রামদাস 'পট্টনায়কের গোষ্ঠীকে পড়ায় কাব্যপ্রকাশ', কিন্তু তিনি 'অন্তরে মুমুক্ষু' ও 'বিদ্যাগর্ববান' হওয়ায় মহাপ্রভু তাঁহাকে বিশেষ কৃপা প্রদর্শন করেন নাই।

রঘুনাথ আটমাস নীলাচলে অবস্থান করিয়াছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি মহাপ্রভুর যথেষ্ট সান্নিধ্যলাভ করেন। তিনি রন্ধনপটু ছিলেন এবং নীলাচলবাস-কালে মধ্যে মধ্যে মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন। মহাপ্রভুও তাঁহার রন্ধনে অতিশয় প্রীত হইতেন

---

(১) দ্র.—তপন-মিশ্র (২) তু.—হ. (ব. সা. প.)—পৃ. ৯১

এবং রঘুনাথ তাঁহার অবশিষ্ট-পাত্র ভক্ষণ করিতেন। আটমাস পরে তাঁহার কাশী-যাত্রার প্রাক্কালে মহাপ্রভু তাঁহার গলায় স্বীয় কণ্ঠমালা পরাইয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন। রঘুনাথ কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই মহাপ্রভুর হৃদয়ের বেশ একটি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তাই তিনি রঘুনাথকে বিবাহ না করিবার এবং বৃদ্ধ পিতামাতার সেবা করিয়া বৈষ্ণবের নিকট ভাগবত-পাঠ করিবার আজ্ঞা প্রদান করেন। সম্ভবত রঘুনাথের দ্বারা তিনি মহত্তর কর্ম সম্পাদনের আশায় এইরূপে তাঁহাকে প্রস্তুত করিয়া লইতে চাহিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য আর একবার নীলাচলে আসিতেও নির্দেশ দিয়াছিলেন। রঘুনাথ তদনুযায়ী মহাপ্রভুর সমূহ উপদেশ পালনান্তে চারি বৎসর পরে তাঁহার পিতামাতার মৃত্যু ঘটিলে আবার নীলাচলে গিয়া হাজির হন। এবারেও তিনি পূর্ববৎ আটমাস কাল নীলাচলে অবস্থান করিয়াছিলেন এবং চৈতন্যের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আটমাস পরে মহাপ্রভু তাঁহাকে বৃন্দাবনে প্রেরণ করেন। তৎপূর্বে তিনি স্বয়ং মহোৎসবে যে 'চৌদ্দহাত জগন্নাথের তুলসীর মালা' ও 'ছুটা পানবিড়া' পাইয়াছিলেন, তাহাই রঘুনাথকে প্রদান করিয়া তাঁহার উপর রূপ-গোস্বামীর সভায় ভাগবত-পাঠের ভার অর্পণ করিলেন।[৩] তখন হইতেই বৃন্দাবনে আসিয়া রঘুনাথ ভাগবত-পাঠের ভার গ্রহণ করেন। তিনি সুকণ্ঠ ও ভাগবত-পাঠে একরকম অদ্বিতীয় ছিলেন। কৃষ্ণভজন ও স্বীয় ধর্মকর্ম ব্যতীত তিনি আর কিছুই জানিতেন না। এইভাবে ভজন-পূজনের মধ্যদিয়াই তিনি জীবন অতিবাহিত করেন। জীবনের শেষ সময়ে তিনি মহাপ্রভু-দত্ত মাল্যকে 'প্রসাদ কড়ারসহ' নিজের গলায় পরিয়া মৃত্যুবরণ করেন।

গোপাল-ভট্টের মত রঘুনাথ-ভট্টও রূপ-গোস্বামীর স্নেহ এবং আনুগত্য ও প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। নীলাচল হইতে আসিয়া তিনি রূপ-গোস্বামী-প্রতিষ্ঠিত 'গোবিন্দচরণে কৈল আত্মসমর্পণ' এবং আপনার কোন শিষ্যের[৪] দ্বারা গোবিন্দ-মন্দির নির্মাণ করাইয়া বিগ্রহকে বংশী-মকর-কুণ্ডলাদি ভূষণে ভূষিত করিয়া দেন।

---

(৩) গৌরগণোদ্দেশদীপিকা (পৃ. ১৮৫)-অনুযায়ী রঘুনাথ-ভট্ট রাধাকুণ্ডসমীপে বাস করিতেন। কিন্তু তাহা হইলে প্রত্যহ রূপ-গোস্বামীর সভায় (গোবিন্দমন্দিরে ?) ভাগবতপাঠ সম্ভব হয় না। কারণ, রাধাকুণ্ড বহুদূরেই অবস্থিত ছিল (৮ ক্রোশ, প্রে. বি.—১৬শ. বি., পৃ. ২২৮)। কিন্তু গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকাতে (পৃ. ১৮৬) ঠিক তাহার পরেই রঘুনাথ দাসের উল্লেখ থাকায় মনে হয় ভুলবশত ঐরূপ উল্লেখিত হইয়াছে। কারণ, প্রকৃতপক্ষে রঘুনাথদাসই রাধাকুণ্ড সমীপে বাস করিতেন।—(ভ. র.—৪।৩৯০, ইত্যাদি) (৪) "রঘুনাথভট্টের শিষ্য মানসিংহ বহুলক্ষ টাকা ব্যয়ে বৃন্দাবনে গোবিন্দদেবের মন্দির নির্মাণ করেন। জয়পুরের লালপাথর দিয়া নির্মিত হয়। আওরংজেবের অত্যাচারে সেই মন্দির ভগ্ন করা হয়।"—বৈ. দি.—পৃ. ১১৩

রূপ-গোস্বামী যখন বৃদ্ধ-বয়সে মথুরাতে একমাস থাকিয়া তথা হইতেই গোপাল-দর্শনের অভিলাষী হন, তখন রঘুনাথও অন্যান্য ভক্তের সহিত তাঁহার নিকট বর্তমান ছিলেন। কিন্তু শ্রীনিবাস-আচার্য যখন বৃন্দাবনে উপস্থিত হন, তখন রঘুনাথ-ভট্ট দেহরক্ষা করিয়াছেন।[৫] 'প্রেমবিলাসে'র বর্ণনা হইতে ধারণা[৬] জন্মায় যে সম্ভবত সনাতনের দেহরক্ষার অব্যবহিত পরে রূপ-গোস্বামীর জীবদ্দশাতেই রঘুনাথ লোকান্তরিত হন। 'ভক্তিরত্নাকর'-প্রণেতা বলিয়াছেন যে শ্রীনিবাস-আচার্য প্রথমবার বৃন্দাবনে আসিলে 'রঘুনাথভট্টের সমাধি নিরখিয়া। ভাসয়ে নেত্রের জলে বিদরয়ে হিয়া॥'

(৫) কর্ণানন্দে কিন্তু শ্রীনিবাসের বৃন্দাবনে অবস্থিতিকালে রঘুনাথ-ভট্টের উল্লেখ আছে। সম্ভবত উহা ভুলবশত হইয়াছে। পুস্তকের অন্যান্য স্থানের মত অন্য ভক্তদের সহিত এই নামের যে উল্লেখ, তাহা কেবল উল্লেখমাত্র। (৬) প্রে. বি.—৫ম. বি., পৃ. ৫৬-৫৭

লোকনাথ-চক্রবর্তী

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে যে সকল ভক্তবৈষ্ণব অদ্বৈতপ্রভুর কৃপালাভে সমর্থ হইয়াছিলেন, যশোহর-জেলার তালগড়ি-গ্রামবাসী[১] রাঢ়ীশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ পদ্মনাভ-চক্রবর্তী তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী সীতাদেবী পতিব্রতা বৈষ্ণব-রমণী ছিলেন। পদ্মনাভ মধ্যে মধ্যে অদ্বৈতপ্রভুর নিকট আসিতেন এবং অদ্বৈতও তাঁহাকে অনুগৃহীত করিতেন।[২] সম্ভবত অদ্বৈতপ্রভুর সূত্রেই তিনি আবার মধ্যে মধ্যে নদীয়ায় আসিয়া গৌরাঙ্গের বাল্যকালে তাঁহাকে দেখিয়া যাইতেন।[৩]

বৃদ্ধবয়সে[৪] পদ্মনাভ একটি পুত্র-সন্তান লাভ করেন। সেই পুত্রই লোকনাথ-চক্রবর্তী। অল্প-বয়সে লোকনাথ বিদ্যানুরাগী হন। সেই সময় গৌরাঙ্গ পূর্ববংগ-ভ্রমণ করিতে গিয়া সম্ভবত কয়েকদিন পদ্মনাভ-গৃহে অবস্থান করিতে থাকিলে লোকনাথের চিত্ত তাঁহার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট[৫] হয়। 'নরোত্তমবিলাস' হইতে জানা যায়[৬] যে বাল্যকালেই লোকনাথের পিতামাতার মৃত্যু ঘটিলে লোকনাথ সংসার ত্যাগ করেন। 'প্রেমবিলাস'-মতে[৭] পিতামাতার জীবদ্দশাতেই লোকনাথ গৃহত্যাগী হন। তবে লোকনাথ যে অতিশয় বাল্যকালেই সংসার ত্যাগ করেন, তাহা উভয় গ্রন্থের বর্ণনাতেই সুস্পষ্ট। কিন্তু পিতৃমাতৃ-বিয়োগ না ঘটিলে এইভাবে বাল্যকালে হয়ত তাঁহার পক্ষে গৃহত্যাগ করা সম্ভব হইত না। যাহা হউক, অদ্বৈতপ্রভুর সহিত পদ্মনাভের দীর্ঘকালের সম্পর্ক থাকায় সম্ভবত সেই কারণেই লোকনাথ প্রথমে শান্তিপুরে অদ্বৈতপ্রভুর নিকট আসিয়া হাজির হন এবং পদ্মনাভের (পূর্ব ?) ইচ্ছানুযায়ী হয়ত বা অদ্বৈত কর্তৃক লোকনাথের ভাগবত-পাঠের ব্যবস্থা হয়।[৮]

---

(১) পাটনির্ণয়ে লোকনাথের শ্রীপাট 'জসর,' 'জসোড়,' 'জাসোড়া' বলা হইয়াছে। আর একটি পুথিতে (স. সূ.—পৃ. ৮) বলা হইয়াছে যে মহাপ্রভু বৃন্দাবনের পথে কুমারহট্টে আসিয়া কুমারহট্ট-গ্রামবাসী লোকনাথকে বৃন্দাবনে যাইবার আজ্ঞাপ্রদান করিয়াছিলেন। এইসব বর্ণনা অবিশ্বাস্য। (২) ন. বি.—১ম. বি., পৃ. ৩ ; অ. প্র.—১২শ. অ., পৃ. ৫০ ; অদ্বৈত-পত্নী পদ্মনাভের স্ত্রীকে 'সই' সম্বোধন করিতেন।—সী. চ.—ভূমিকা (৩) ন. বি.—১ম. বি., পৃ. ৩ ; (৪) ভ. র.—১।২৯৮ ; 'ভক্তপ্রসঙ্গ'-গ্রন্থের লেখক জানাইতেছেন (পৃ. ২৬) যে লোকনাথের জ্যেষ্ঠভ্রাতৃদ্বয়ের বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু গ্রন্থকার এই তথ্য কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন তাহার উল্লেখ করেন নাই। (৫) অ. প্র.—১৩শ. অ., পৃ. ৫৩ (৬) ১ম. বি., পৃ. ৩ ; (৭) ৭ম. বি., পৃ. ৭১ (৮) অ. প্র.—১২ অ., পৃ. ৫০-৫১ ; সাহিত্য পরিষদের একটি পুথি (৯৮২, পৃ. ৯৮)-অনুযায়ী লোকনাথ অল্প বয়সে বিষয়-বাসনা পরিত্যাগ করিয়া নবদ্বীপে গৌরাঙ্গ চরণে শরণ-গ্রহণ করেন।

'অদ্বৈতপ্রকাশ' মতে গদাধর-পণ্ডিতও তখন অদ্বৈতপ্রভুর নিকট ভাগবতপাঠের শিক্ষা-গ্রহণ করিতেছিলেন এবং লোকনাথ তাঁহার সঙ্গী হইলেন। কিন্তু গৌরাঙ্গের পূর্ববংগ ভ্রমণের পরেও যে তাঁহার ঘনিষ্ঠ-সঙ্গী গদাধর অদ্বৈতপ্রভুর নিকটে ভাগবত-শিক্ষা গ্রহণ করিতেছিলেন তাহা মনে হয় না। উক্ত গ্রন্থ-মতে অদ্বৈত লোকনাথকে কৃষ্ণমন্ত্র দান করিয়া গৌরাঙ্গের হস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। এই উক্তিও অন্য কোনও গ্রন্থ কর্তৃক সমর্থিত হয় না 'প্রেমবিলাসে' কিংবা 'নরোত্তম-বিলাসে' ও অদ্বৈতপ্রভুর মধ্যস্থতায় লোকনাথের সহিত গৌরাঙ্গের মিলন-কাহিনী বর্ণিত হয় নাই। যাহাহউক, লোকনাথ গৌরাঙ্গের সহিত মিলিত হইবার পর হইতেই একান্তভাবে তাঁহার চরণে আত্মনিয়োগ করিলেন। কিন্তু গৌরাঙ্গের সেবা আর তাঁহাকে বেশিদিন করিতে হইল না। অল্পকালের মধ্যেই গৌরাঙ্গ তাঁহাকে নানাবিধ তত্ত্ব-শিক্ষা ও প্রয়োজনীয় সকল প্রকার উপদেশ দান করিয়া স্বীয় সন্ন্যাস-গ্রহণের কয়েকদিন[৯] পূর্বে তাঁহাকে বৃন্দাবনে গমন করিবার আদেশ দান করিলেন। একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহাকে বিদায় লইয়া যাইতে হইল।[১০] গদাধর-পণ্ডিতের শিষ্য ভূগর্ভও তাঁহার সঙ্গী হইলেন। কিন্তু মহাপ্রভুর নিকট এই বিদায়ই তাঁহাদের শেষ-বিদায় হইল। সুদূর বংগ-পল্লীর এক কিশোর-দুলালের স্বপ্ন-রূপায়ণ হিসাবে নববৃন্দাবন গঠনের যে শুভারম্ভ হইয়াছিল, এইভাবে তাহার প্রথম পথিকৃৎ হইলেন এই লোকনাথ ও ইঁহার সঙ্গী ভূগর্ভ।

লোকনাথ বৃন্দাবনে হাজির হইলেন। এদিকে নদীয়ার নিমাইও সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়া নীলাচলে এবং তাহার পর দক্ষিণাভিমুখে চলিলেন। ইহা শুনিয়া লোকনাথও[১১] দক্ষিণের পথ ধরিলেন। কিন্তু মহাপ্রভু দক্ষিণ হইতে ফিরিয়া নীলাচল, গৌড় এবং পুনর্বার নীলাচল হইয়া বৃন্দাবনে আসেন। লোকনাথও তাহা শুনিয়া বহুস্থান পর্যটনের পর বৃন্দাবনে ফিরিলেন। কিন্তু ততদিনে মহাপ্রভু প্রয়াগের পথে প্রয়াণ করিয়াছেন।

দুর্গম বৃন্দাবন প্রদেশে লোকনাথ কেবল ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকেন। ফলাদি ভক্ষণ করিয়া বৃক্ষতলেই দিন-যাপন করেন এবং সর্বদা কৃষ্ণনামে বিভোর থাকেন। একদিন অকস্মাৎ

---

(৯) 'দুই একদিন'—ভ. র., ১।৩০৩; সপ্তগোস্বামী-গ্রন্থের লেখক বলেন ''পাঁচ দিন'—পৃ.২৯; গ্রন্থকার কোন প্রাচীন গ্রন্থের উল্লেখ করেন নাই। (১০) "লোকনাথ বিবাহ করেন নাই।"—বৈ. দি., পৃ. ৪৭; দ্র.—সপ্তগোস্বামী, পৃ. ২৬—গ্রন্থকারগণ কোন প্রাচীন গ্রন্থের উল্লেখ করেন নাই। (১১) ভক্তদিগ্‌দর্শনী (পৃ. ৫১)-মতে লোকনাথ ও ভূগর্ভ দুইজনই।

সুবুদ্ধি রায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আরও কিছুকাল পরে রূপ-সনাতন নীলাচল হইতে ফিরিয়া বৃন্দাবনে স্থায়িভাবে বাসা বাঁধিলেন। সুবুদ্ধি-রায় গিয়া থাকিলেন মথুরাতে 'শ্রীকেশবদেবের মন্দির সন্নিধানে'। আর লোকনাথ থাকিলেন ছত্রবন-পার্শ্বে উমরাও-গ্রামের কিশোরী-কুণ্ডের নিকট। প্রবল-বর্ষা এবং প্রচণ্ড-শীতেও বৃক্ষতলেই পড়িয়া থাকেন। সঙ্গে কেবল একখানি জীর্ণ কাঁথা এবং একটি অতি-জীর্ণ বহির্বাস। তারপর সেইস্থানেই তিনি একদিন রাধাবিনোদ-বিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া কখনও তাহাকে বৃক্ষের কোটরে রক্ষা করিতেন, কখনও বা জীর্ণ ঝোলার মধ্যে লইয়া বক্ষে ধারণ করিতেন। গ্রামবাসী-গণ তাঁহার জন্য কুটীর নির্মাণ করাইয়া দিতে চাহিলে তিনি তাহাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া পূর্ববৎ বৃক্ষতলেই বাস করিতে থাকিলেন এবং শেষে 'কতদিন রহি কুণ্ডে আইলা বৃন্দাবন। রাখিলা গোস্বামী সবে করিয়া যতন ॥' বৃন্দাবনে রূপ-সনাতনের সহিত তাঁহার মিলন পরম আনন্দময় হইয়াছিল এবং গোপাল-ভূগর্ভাদির প্রতি তাঁহার স্নেহও ছিল প্রচুর।[১২] কিন্তু ক্রমে ক্রমে সুবুদ্ধি-রায়, রঘুনাথ-ভট্ট এবং সনাতন-ও রূপ-গোস্বামী একে একে দেহরক্ষা করিলেন। বিচ্ছেদাগ্নিতে লোকনাথের হৃদয় জ্বলিয়া গেল।

নরোত্তম বৃন্দাবনে আসিয়া লোকনাথের শিষ্য হইবার অভিলাষ ব্যক্ত করেন। কিন্তু লোকনাথ একান্তে ধ্যান, নাম ও অধ্যয়ন লইয়া থাকিতেন বলিয়া তিনি প্রথমে নরোত্তমের প্রস্তাবে সম্মত হইতে চাহেন নাই। কিন্তু শেষে নরোত্তমের বৎসর-কাল যাবৎ সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া তিনি তাঁহাকে দীক্ষামন্ত্র দান করেন। তখন হইতে তিনি নরোত্তমকে নানাবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইয়া পারদর্শী করিতে থাকেন। তারপর যখন শ্রীনিবাস-নরোত্তম-শ্যামানন্দকে গৌড়াদি দেশে মহাপ্রভু-প্রবর্তিত ধর্ম-প্রচারার্থ প্রেরণ করা সাব্যস্ত হয়, তখন লোকনাথ পুত্রসম প্রিয় শিষ্য নরোত্তমকে শ্রীনিবাসের হস্তে সমর্পণ করেন এবং শ্রীনিবাসকে বিশেষভাবে নরোত্তমের ভার-গ্রহণের উপদেশ দিয়া নিশ্চিন্ত হন। বিদায়কালে তিনি নরোত্তমকে প্রকৃত বৈষ্ণবের নিয়মাবলী পালন করিবার জন্য উপদেশ দান করিয়া ব্রহ্মচারিরূপে হবিষ্যান্ন আচরণ করিবার জন্যও নির্দেশ প্রদান করেন। কিছুকাল পরে রামচন্দ্র-কবিরাজের এবং তাহারও পরে জাহ্নবাদেবীর বৃন্দাবনাগমন কালে অতি বার্ধক্য সত্ত্বেও তিনি নরোত্তমের সংবাদ লইয়া তাঁহার জন্য নানাবিধ উপদেশ প্রেরণ করেন। কিন্তু বীরচন্দ্র-প্রভুর বৃন্দাবনাগমনকালে সম্ভবত তিনি আর জীবিত ছিলেন না।[১৩]

---

(১২) ভ. র.—১।৩১৫-১৭ (১৩) ঐ—১৩শ. ত. ; প্রে. বি. (১৯শ. বি., পৃ. ৩৪৪)-অনুযায়ী বীরচন্দ্র-প্রভুর আগমন-কালেও লোকনাথ জীবিত ছিলেন।

বৃন্দাবনে লোকনাথের স্থান যে খুব উচ্চে ছিল,[১৪] সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। তাঁহাকে 'রূপ-সনাতন মর্য্যাদা করে নিরন্তর'[১৫] আবার সনাতন ও জীব-গোস্বামী তাঁহাদের গ্রন্থে তাঁহাকে অতিশয় উচ্চস্থান দিয়া কাশীশ্বর ও কৃষ্ণদাসের সহিত তাঁহার নাম যুক্ত করিয়াছেন, এবং কৃষ্ণদাস-কবিরাজ ও নরহরি-চক্রবর্তী প্রভৃতি গ্রন্থকার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লোকনাথ এবং ভূগর্ভ-গোসাঁইর নাম একত্রে উল্লেখ করিয়াছেন। আবার রামচন্দ্র, নরোত্তম এবং গোবিন্দদাসও বংগদেশ হইতে জীব-গোস্বামীর নিকট[১৬] পত্র লিখিয়া লোকনাথকে শ্রদ্ধাপূর্ণ নমস্কার নিবেদন করিয়াছেন। নরহরি-চক্রবর্তী জানাইয়াছেন[১৭] যে লোকনাথ এবং গোপাল-ভট্ট উভয়েই কৃষ্ণদাস-কবিরাজকে তাঁহার 'চৈতন্যচরিতামৃত'-গ্রন্থে তাঁহাদের নামোল্লেখ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। ইহা লোকনাথের নামাকাঙ্ক্ষাহীন চিত্তের দৃঢ়তা ও সম্ভ্রম-বোধের বিশিষ্ট পরিচয় বহন করিতেছে।

লোকনাথ সম্ভবত 'ভাগবতের টীকা' নামক একটি গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন।[১৮] নাভাজী বলেন যে বংশীবদনের পার্শ্বে লোকনাথ-গোস্বামীর সমাজ বহুদিন বাস করিতেছিল।

(১৪) সতীশচন্দ্র মিত্র ষড়্‌গোস্বামীর সহিত লোকনাথের নাম যুক্ত করিয়া তাঁহার ভক্তপ্রসঙ্গ নামক গ্রন্থের ২য়. খণ্ডটিকে সপ্ত-গোস্বামী নাম দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন (সপ্ত-গোস্বামী, পৃ. ১-৫২)। গ্রন্থমধ্যে লোকনাথের জীবনী প্রথমেই সংকলিত হইয়াছে। (১৫) প্রে. বি., ১ম. বি., পৃ. ১৩; (১৬) ঐ—অর্ধবিলাস, পৃ. ৩০৬; ভক্তিরত্নাকরের ১৪শ. তরঙ্গে জীব-প্রেরিত পত্রগুলির উল্লেখ আছে। (১৭) ভ. র.—১।২২৫ (১৮) চৈ. উ.—পৃ. ৬১৩

ভূগর্ভ

ভূগর্ভ-গোঁসাই[১] গদাধর-পণ্ডিতের শিষ্য ছিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে গৌরাঙ্গ লোকনাথ চক্রবর্তীকে বৃন্দাবনে প্রেরণ করিলে ভূগর্ভও গৌর-গদাধরের আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া লোকনাথের সহিত বৃন্দাবনে আসিয়া উপস্থিত হন। আজন্ম-ব্রহ্মচারী দুইটি ব্রাহ্মণকুমার লোকবিরল ও জঙ্গলাকীর্ণ বৃন্দাবনের মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে সাধন-ভজন আরম্ভ করেন এবং বৃন্দাবনবাসীদিগের মধ্যে তাঁহাদের একটি বিশেষ স্থান হইয়া যায়। এইরূপে লোকনাথ-ভূগর্ভের দ্বারাই সর্বপ্রথম বৃন্দাবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়।

পরবর্তিকালে বৃন্দাবনাগত বৈষ্ণব-ভক্ত ও গোস্বামী-বৃন্দের মধ্যে ভূগর্ভের একটি বিশেষ স্থান হয়। তিনি রূপ-গোস্বামীর সঙ্গী ও জীব-গোস্বামীর প্রণম্য ছিলেন। কিন্তু তাঁহার সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠতা ছিল লোকনাথ-চক্রবর্তীর সহিত। শ্রীনিবাস-নরোত্তম-শ্যামানন্দ এবং তাহার পরে রামচন্দ্র-কবিরাজ এবং আরও পরে জাহ্নবা-ঠাকুরাণী দ্বিতীয়বার বৃন্দাবনে গেলে তাঁহারা সকলেই ভূগর্ভ কর্তৃক অভিনন্দিত হন। সম্ভবত বীরচন্দ্রও বৃন্দাবনে আসিয়া তাহার সাক্ষাৎলাভ করিতে পারিয়াছিলেন। তবে নরোত্তমপ্রভুর জীবদ্দশাতেই যে তিনি পরলোকগত হন, তাহা নরোত্তমের একটি পদ[২] হইতেই জানিতে পারা যায়। শ্রীনিবাস-আচার্যের নিকট লিখিত একটি পত্রে জীব-গোস্বামী ভূগর্ভ-গোস্বামীর মৃত্যুসংবাদ প্রেরণ করিয়াছিলেন।[৩]

'প্রেমবিলাসে' রামদাস নামক এক বৈষ্ণবকে 'ভূগর্ভ-শিষ্য' বলা হইয়াছে।[৪]

---

(১) ভূগর্ভ-ঠাকুর পূর্বে শ্রীপ্রেমমঞ্জরী। গৌরাঙ্গের শাখা বাস কাঞ্চননগরী॥—বৈ. দ., পৃ. ৩৪৫; বৈ. দি. (পৃ. ৫১)-মতে মহাপ্রভু সন্ন্যাস লইয়া নীলাচলে গেলে ভূগর্ভও লোকনাথের সহিত মহাপ্রভুর উদ্দেশ্যে নীলাচল-পথে যাত্রা করেন। (২) ন. বি.—১১শ. বি., পৃ. ১৭৯ (৩) প্রে. বি.—অর্ধবিলাস, পৃ. ৬০৩ (৪) ঐ—১৭শ. বি., পৃ. ২৪০-৪৬

সুবুদ্ধি-রায়

'চৈতন্যচরিতামৃত'-কার বলেন[1] যে 'সৈয়দ হুসেনখাঁ'র (=হোসেন-শাহের) পূর্বে সুবুদ্ধিরায়[2] গৌড়ের অধিকারী ছিলেন। ১৩০২ সালের 'সাহিত্য'-পত্রিকার অগ্রহায়ণ-সংখ্যায় উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় লিখিয়াছিলেন, "সুবুদ্ধি খাঁ বা সুবুদ্ধি রায়ের প্রকৃত নাম সুবুদ্ধি ভাতুড়ী। তাঁহার পিতার নাম শ্রীকৃষ্ণ ভাতুড়ী। ইনি তাহেরপুরের প্রসিদ্ধ রাজা কংসনারায়ণের ভগ্নীকে বিবাহ করেন। শ্রীকৃষ্ণের অপর দুই পুত্রের নাম জগদানন্দ ও কেশব, ইঁহারা যথাক্রমে রায় ও কেশব খাঁ নামে বিখ্যাত। সুবুদ্ধি-রায়ের পরিবারে আলিয়ারখানী নামে যবন-দোষ ঘটে।"—(গৌড়ে ব্রাহ্মণ—পৃ. ১৬৯, ১৭৯) আবার প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও তাঁহার 'বাংলার ইতিহাস' গ্রন্থে (২য়. ভাগ, পৃ. ২৪৩) তাঁহার বন্ধু গুরুদাস সরকার এম. এ. মহাশয়-প্রদত্ত মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রচলিত জনপ্রবাদ লিপিবদ্ধ করিয়া জানাইতেছেন, "হোসেন শাহ বাল্যকালে চাঁদপাড়া নিবাসী এক ব্রাহ্মণের গৃহে গো-রক্ষা কাযে নিযুক্ত ছিলেন। রাজ্যলাভ করিয়া হোসেন শাহ্ পুরাতন প্রভুকে এক আনা রাজস্বে চাঁদপাড়া-গ্রাম প্রদান করিয়াছিলেন। তদবধি এই গ্রাম এক আনা চাঁদপাড়া নামে প্রসিদ্ধ। কথিত আছে যে হোসেন্ শাহের বেগম, পতির পুরাতন প্রভুকে গোমাংস ভক্ষণ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন; সেইজন্য ব্রাহ্মণ পরে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলন।" বটব্যাল ও বন্দ্যোপাধায় মহশয়দ্বয়ের পরিবেশিত তথ্যের মধ্যে কিছু পরিমাণ সত্য থাকিলেও সুবুদ্ধি-রায়ের পক্ষে এককালে গৌড়াধিকারী থাকা অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না এবং তাহা হইলে কৃষ্ণদাস-কবিরাজ-প্রদত্ত পূর্বোক্ত এবং অন্যান্য বিবরণগুলির একটি ঐতিহাসিক ভিত্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কবিরাজ-গোস্বামী বলেন যে সুবুদ্ধি-রায় যখন গৌড়াধিকারী ছিলেন সেই সময়ে হোসেন-শাহ্ তাঁহার অধীনে চাকরী করিতেন। একদিন হোসেন-শাহের কোন দোষের জন্য[3] সুবুদ্ধি তাঁহাকে বেত্রাঘাত করিয়াছিলেন। পরে হুসেন-খাঁ গৌড়ের রাজা হইলে তাঁহার স্ত্রী স্বামীর পৃষ্ঠে বেত্রচিহ্ন দেখিয়া সমূহ অবগত হইলেন এবং সুবুদ্ধি-রায়কে প্রহার

(১) চৈ. চ.—২।২৫ (২) নরহরি-চক্রবর্তী সম্ভবত ভুলবশতই দুই একটি স্থলে (ন. বি.—পৃ. ৬, ১৬) ইঁহার সহিত সুবুদ্ধি-মিশ্রকে এক করিয়া ফেলিয়াছেন। সুবুদ্ধি-মিশ্র ছিলেন 'চৈতন্যমঙ্গল'-রচয়িতা জয়ানন্দের পিতা। কিন্তু পরবর্তী লেখকগণ অনেকেই নরহরির দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন। যথা:—স. সু.—পৃ. ৯; চৈ. দী.—পৃ. ৩; সু.—পৃ. ২ (৩) 'দীর্ঘিকাখনন কার্য্যে সৈয়দহুসেনের কোন অপরাধ' (ভক্তচরিতামৃত, পৃ. ৯৬); এইস্থানে গল্পটি পুরাপুরি বিবৃত হইয়াছে।

করিবার জন্য রাজাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। রাজা কিন্তু তাঁহার পূর্ব 'পোষ্টা'কে পিতৃসম জ্ঞান করিতেন। তাই তিনি রাণীর কথা রক্ষা করিতে পারিলেন না। কিন্তু শেষে রাণীর একান্ত ইচ্ছানুযায়ী সুবুদ্ধির মুখে 'কারোয়ার পানি' দিয়া তাঁহাকে জাতিচ্যুত করা হইল। সুবুদ্ধি-রায় তখন কাশীতে পলায়ন করিয়া পণ্ডিতদিগের নিকট প্রায়শ্চিত্তের বিধান চাহিলে সকলেই তাঁহাকে তপ্তঘৃত খাইয়া প্রাণত্যাগ করিবার নির্দেশ দিলেন। শেষে চৈতন্য কাশীতে পৌছাইলে তিনি তাঁহার নিকট আবেদন জানাইলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে বৃন্দাবনে গিয়া 'কৃষ্ণনামসংকীর্তনে'র উপদেশ প্রদান করিলে তিনি নিশ্চিন্ত মনে বৃন্দাবন-অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

প্রয়াগ-অযোধ্যা দিয়া সুবুদ্ধি নৈমিষারণ্যে গিয়া হাজির হন। সেইস্থানে কিছুদিন থাকিবার পর তিনি মথুরায় গিয়া শুনিলেন যে মহাপ্রভু ইতিমধ্যে বৃন্দাবন হইতে প্রয়াগের পথে চলিয়া গিয়াছেন। মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ না পাওয়ায় তিনি কাতর হইলেন। তাহার পর হইতে তিনি শুষ্ক কাষ্ঠ বিক্রয় করিয়া জীবিকা-নির্বাহ করিতে লাগিলেন। এক বোঝা কাষ্ঠ বিক্রয় করিয়া পাঁচ ছয় পয়সা পান। নিজে এক পয়সার 'চানা চাবানা' খাইয়া অবশিষ্ট অর্থ এক বাণিয়ার নিকট রাখিয়া দেন এবং তাহা দিয়া দুঃখী-বৈষ্ণবদিগকে ভোজন করান।[৪] গৌড়ের যাত্রীদিগের জন্য তিনি বিশেষ করিয়া দধি-ভাত ও তৈলাদি প্রদান করিতেন। এইভাবে সুবুদ্ধি সকল ধর্মের শ্রেষ্ঠ যে সেবা, সেই সেবাধর্মের পথ গ্রহণ করিয়া শ্রেষ্ঠ-ভক্তরূপে পরিগণিত হইলেন। তৎপূর্বে লোকনাথ ও ভূগর্ভ ছাড়া আর কোন বৈষ্ণবভক্ত বৃন্দাবনে পৌছান নাই। কিছুকাল পরে রূপ এবং তাহার পর সনাতন আসিলেন। মথুরাতে সনাতনের সহিত সুবুদ্ধি-মিশ্রের মিলন ঘটিল।

সনাতন- বা রূপ-গোস্বামী অপেক্ষা সুবুদ্ধি-রায় বয়সে বড় ছিলেন। সনাতনকে তিনি যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। পরবর্তিকালে রূপ-সনাতনাদির প্রচেষ্টায় বৃন্দাবনে আনন্দ-মেলা বসিয়া গিয়াছিল সত্য, কিন্তু যখন কেহই সেইস্থানে গিয়া পৌছান নাই, এমন কি মহাপ্রভুর প্রথম-প্রেরিত ভক্ত লোকনাথ-চক্রবর্তীও যখন কেবল বনে বনে ঘুরিয়া দিন অতিবাহিত করিতেছিলেন, তখন যে এই মহাভাগবত সুবুদ্ধি-রায়ই মথুরাতে 'কেশবদেবের মন্দির সন্নিধানে' বসিয়া তাঁহার কাষ্ঠ-বিক্রয় ও সেবা-ধর্মের মধ্যদিয়া মহাপ্রভুর আদর্শ-পুষ্ট সেই ভবিষ্যৎ-বৃন্দাবনের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপনের উদ্যোগ করিতেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

(৪) তু.—অ. বি. , পৃ. ২

কাশীশ্বর

বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবতে' যে কয়েকবার কাশীশ্বরের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় তাহার সবগুলিই প্রায় গৌরাঙ্গের নবদ্বীপলীলা-সম্পর্কিত।[১] গ্রন্থশেষে কেবল একবার মাত্র তাঁহাকে আমরা মহাপ্রভুর সহিত নীলাচলে দেখিতে পাই।[২] অন্যদিকে 'চৈতন্যচরিতামৃত'-গ্রন্থে আবার তাঁহাকে প্রথমে একেবারে মহাপ্রভুর নীলাচলসঙ্গী-রূপেই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে দুইজন কাশীশ্বরের অস্তিত্বের কথা মনে আসিতে পারে। কিন্তু মনোহরদাস তাঁহার 'অনুরাগবল্লী'র ৪র্থ. মঞ্জরীতে উল্লেখ করিয়াছেন যে রূপ-গোস্বামীর পত্র পাইয়া মহাপ্রভু বৃন্দাবনে লোক পাঠাইবার জন্য 'নীলাচলে গৌড়ীয়া আছিল যে যে জন। একে একে সবাকারে করিল চিন্তন॥' এবং শেষে কাশীশ্বরকে বৃন্দাবনে পাঠান হইল। 'সাধনদীপিকা'র প্রমাণ-বলে 'ভক্তিরত্নাকর'-প্রণেতাও একই কথার সমর্থন করিতেছেন।[৩] 'সাধনদীপিকা'য় বলা হইয়াছে, "একদা শ্রীশ্রীমহাপ্রভুঃ শ্রীকাশীশ্বরং কথিতবান্—ভবান্ শ্রীবৃন্দাবনং গত্বা শ্রীরূপসনাতনয়োরন্তিকং নিবসত্বিতি স তু তচ্ছ্রুত্বা হর্ষবিস্মিতোঽভূৎ।" সুতরাং বুঝিতে পারা যায় যে নীলাচল-লীলার, বা বৃন্দাবনের কাশীশ্বরই গৌড়বাসী এবং 'চৈতন্যভাগবতে'র নবদ্বীপলীলার কাশীশ্বর।

মহাপ্রভুর 'সতীর্থ'[৪] এই কাশীশ্বর ঈশ্বর-পুরীর সান্নিধ্য-প্রাপ্ত হন এবং নিমাইর বাল্যলীলার সঙ্গী হইবার সুযোগ লাভ করেন, আবার ইনি চৈতন্যের ক্ষেত্র-লীলার প্রত্যক্ষদ্রষ্টা হইতে পারিয়াছিলেন, এবং মহাপ্রভুর নিকট প্রভূত সম্মানলাভ করিয়া তাঁহার আজ্ঞাবাহী-রূপে বৃন্দাবন-নির্মিতির বৃহত্তর দায়িত্বে আত্মবিসর্জন দিতে পারিয়াছিলেন। তৎকালে একক মানুষের এতবড় সৌভাগ্য সম্ভবত কাশীশ্বর ভিন্ন আর কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই।

বৃন্দাবনদাসের বর্ণনানুযায়ী শ্রীবাস-মন্দিরে গৌরাঙ্গের কীর্তন-আসরে, গঙ্গায় তাঁহার জলকেলিকালে এবং নগর-সংকীর্তনান্তে শ্রীধরের গৃহে ভক্তবৃন্দসহ তাঁহার প্রেমভক্তি প্রকাশকালে আমরা কাশীশ্বরের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া থাকি। ইহাতে কেবল এইটুকু বুঝিতে পারা যায় যে কাশীশ্বর গৌরাঙ্গের নবদ্বীপস্থ পার্শ্বচরদিগের মধ্যে প্রায়ই উপস্থিত থাকিতেন। মহাপ্রভু নীলাচলে গমন করিলে তিনি সম্ভবত সঙ্গী গোবিন্দের সহিত ঈশ্বর-পুরীর নিকট গিয়া তাঁহার সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু ইহার কিছুকাল

(১) চৈ. ভা.—২।৮, পৃ. ১৩৯ ; ২।১৩, পৃ. ১৭৪ ; ২।২৩, পৃ. ২২৫ (২) ঐ—৩।৯, পৃ. ৩৩৭ (৩) ভ. র.—২।৪৪৪ (৪) ভ. মা.—পৃ. ২৩০

পরে ঈশ্বর-পুরী দেহরক্ষা করেন। তখন আকুমার-ব্রহ্মচারী কাশীশ্বর গোবিন্দকে নীলাচলে পাঠাইয়া নিজে তীর্থ-পর্যটনে বাহির হন এবং কিছুকাল দেশ-ভ্রমণের পর নিজেও নীলাচলে গিয়া চৈতন্যের সহিত মিলিত হন। ঈশ্বর-পুরীর আজ্ঞাক্রমে[৫] গিয়াছিলেন বলিয়া মহাপ্রভু তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করেন।

নীলাচলে পৌঁছাইবার পর কাশীশ্বর মহাপ্রভুর কাছে কাছেই থাকিতেন। তিনি বলিষ্ঠ-দেহ ছিলেন।[৬] তাই তাঁহার উপর তদনুরূপ কার্যের ভার পড়িয়াছিল। চৈতন্য যখন জগন্নাথ-দর্শনে চলিতেন তখন যাহাতে তিনি 'অপরশ' হইয়া গমন করিতে পারেন, তজ্জন্য কাশীশ্বর সমবেত-জনতার ভিড় ঠেলিয়া তাঁহার জন্য পথ করিয়া দিতেন। তাছাড়া ভক্তবৃন্দকে লইয়া মহাপ্রভু ভোজনে বসিলে পরিবেষণের ভার পড়িত কাশীশ্বরাদি বিশেষ কয়েকজন ভক্তের উপর। কিন্তু কাশীশ্বরের পরম সৌভাগ্য এই ছিল যে তিনি যেন সর্বত্যাগী-সন্ন্যাসীরও পরিবারভুক্ত হইয়া বাস করিতে পারিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষেই, নীলাচলে

প্রভুর নিমন্ত্রণে লাগে কৌড়ি চারিপণ।
প্রভু কাশীশ্বর গোবিন্দ খান তিনজন॥[৭]

বৃন্দাবনে রূপ-গোস্বামী গোবিন্দদেব-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার পর মহাপ্রভুর নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলে তিনি কাশীশ্বরকে[৮] বৃন্দাবনে গমন করিতে আজ্ঞাদান করিলেন। কিন্তু বাল্যসঙ্গী কাশীশ্বর মহাপ্রভুকে ছাড়িয়া যাইতে কষ্টবোধ করায় চৈতন্য তাঁহার 'নিজ স্বরূপ বিগ্রহ' হিসাবে তাঁহার হস্তে একটি বিগ্রহ প্রদান করিয়া উহাকে গৌরগোবিন্দ আখ্যা দান করেন এবং উহাকেই তাঁহার সহিত অভেদ-জ্ঞান করিতে নির্দেশ দেন।[৯] তদনুযায়ী কাশীশ্বর মহাপ্রভুর আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া বৃন্দাবনে গমন করেন এবং গোবিন্দের দক্ষিণে গৌরগোবিন্দের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইলে তাঁহাকেই গোবিন্দের সর্বপ্রথম অধিকারী হিসাবে বরণ করিয়া লওয়া হয়।[১০]

বৃন্দাবনে কাশীশ্বরের সহিত যাঁহাদের নাম বিশেষভাবে যুক্ত হইয়াছে তাঁহারা হইতেছেন কৃষ্ণদাস-কবিরাজ এবং লোকনাথ-গোস্বামী।[১১] তাঁহারা উভয়েই বৃন্দাবনের বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং স্বয়ং সনাতন- ও জীব-গোস্বামী তাঁহাদের সহিত একত্রে কাশীশ্বরের নাম কীর্তিত করায় সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে তিনিও বৃন্দাবনস্থ বৈষ্ণবগোস্বামী-বৃন্দের মধ্যে

---

(৫) চৈ. চ.—২।১০, পৃ. ১৫০, ১৪৯ ; চৈ. না.—৮।৪৪ ; কবিকর্ণপুর লিখিয়াছিলেন যে রথযাত্রা-উপলক্ষে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের সহিত ইনি নীলাচলে আসিয়া উপস্থিত হন। (৬) তু.—অ. বি., পৃ. ১ (৭) চৈ. চ.—৩।৪, পৃ. ৩২৮ (৮) অ. ব.—৪র্থ. ব., পৃ. ২৫ (৯) সা. দী.—(ভ. র.—২।৪৪৪) (১০) অ. ব.—৪র্থ. ম., পৃ. ২৬ (১১) হ. বি.—মঙ্গলাচরণ ; বৈ. তো.—(ভ. র.—১।৩২১-২২)

পরমানন্দ-ভট্টাচার্য

বৃন্দাবনস্থ গোস্বামী ও ভক্তবৃন্দের মধ্যে পরমানন্দ-ভট্টাচার্য এবং মধু-পণ্ডিতের[১] নাম বিশেষভাবেই স্মরণীয়। বৃন্দাবনে যতগুলি নূতন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল তন্মধ্যে গোবিন্দ, (মদন-) গোপাল এবং গোপীনাথের বিগ্রহই সবাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এই শেষোক্ত বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন পরমানন্দ এবং মধু-পণ্ডিত। ব্রজমণ্ডলে পরমানন্দের স্থান যে অতি উচ্চে ছিল তাহা স্বয়ং সনাতন-গোস্বামীর উক্তি হইতেই বুঝিতে পারা যায়। 'দশমটিপ্পণী'তে তিনি পূর্ব-গুরুদিগের উল্লেখের পর পরমানন্দের বন্দনা[২] গাহিয়াছেন। 'পরমানন্দদাস'-ভণিতার যে ব্রজবুলি পদগুলি পাওয়া যায় সেইগুলি বা তাহার কিছু সংখ্যকও যে ইঁহার রচিত নহে, তাহা জোর করিয়া বলা চলেনা।

বৃন্দাবনে মধু-পণ্ডিতেরও একটি বিশেষ স্থান ছিল। 'সাধনদীপিকা'- ও 'ভক্তমাল'-গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে যমুনার উপকূলে বংশীবট-তটে গোপীনাথ মধু-পণ্ডিত কর্তৃক প্রকটিত হয়।[৩] এই প্রকটের পর হইতেই মধু-পণ্ডিত গোপীনাথের সেবা-অধিকারী হইয়া বাস করিতেছিলেন। পরমানন্দ তাঁহা অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। তিনি মধুকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। মধুর একজন সতীর্থের নাম ছিল ভবানন্দ।

শ্রীনিবাস-আচার্যাদি এবং তাহার পরে রামচন্দ্র কবিরাজও যখন বৃন্দাবনে আসেন তখন পরমানন্দ ও মধু উভয়েই গোপীনাথের মন্দিরে বাস করিতেছিলেন। জীব-গোস্বামী পরমানন্দ প্রভৃতির সহিত যুক্তিপূর্বক রামচন্দ্রকে 'কবিরাজ'-আখ্যা প্রদান করেন। কিন্তু তাহার পরে জাহ্নবাদেবীর আগমন কালে মধুর সহিত আর পরমানন্দকে দেখা যায় নাই। বীরচন্দ্র প্রভু যখন বৃন্দাবনে আসিয়া পৌছান, তখনও অবশ্য মধু-পণ্ডিত গোপীনাথের অধিকারী হিসাবে বর্তমান ছিলেন।

(১) বৈ. দ.-এ (পৃ. ৩৪৯) বলা হইয়াছে যে মধু-রা চার সহোদর ছিলেন। (২) ভ. র.—১।৬০২
(৩) ভ. মা.—পৃ. ২০

দ্বিজ-হরিদাসাচার্য

দ্বিজ-হরিদাসাচার্য চৈতন্যপার্ষৎ ছিলেন। গৌরাঙ্গের নবদ্বীপ-লীলাকালেই তিনি কীর্তনীয়া হিসাবে সুপরিচিত হইয়াছিলেন।[১] কাঞ্চনগড়িয়াতে তাঁহার নিবাস ছিল। মহাপ্রভুর নীলাচল-বাসকালে সম্ভবত তিনি মধ্যে মধ্যে শ্রীক্ষেত্রে গিয়া মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিতেন।[২] তাঁহার দুই পুত্রের নাম গোকুলানন্দ ও শ্রীদাস। মহাপ্রভুর তিরোভাবের পর হরিদাসাচার্য গৃহত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে গমন করেন এবং ভজন-পূজনাদির মধ্য দিয়া তথায় দিনাতিপাত করিতে থাকেন। শ্রীনিবাসাদি যখন প্রথম বৃন্দাবনে আসেন তখন তিনি অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছেন। বৃন্দাবন-ত্যাগের পূর্বে শ্রীনিবাস ও নরোত্তম তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে তিনি তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করেন এবং গৌড়ে ফিরিয়া তাঁহার পুত্রদ্বয়কে দীক্ষাদান করিবার জন্য শ্রীনিবাসকে আজ্ঞা প্রদান করেন। এই পুত্রদ্বয়ের মধ্যে গোকুলানন্দ বয়োজ্যেষ্ঠ এবং শ্রীদাস কনিষ্ঠ ছিলেন।[৩] শ্রীনিবাস গৌড়ে প্রত্যাবর্তন করিলে গোকুলানন্দ ও শ্রীদাস আসিয়া যাজিগ্রামে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু শ্রীনিবাস সেইবার তাঁহাদিগকে দীক্ষা-মন্ত্র দান করেন নাই। তাঁহারা তখনও তাহার উপযুক্ত হন নাই বলিয়া তিনি তাঁহাদিগকে সুশিক্ষিত করিবার জন্য গ্রন্থাদি পাঠ করাইতে লাগিলেন। তাহার কিছুদিন পরে শ্রীনিবাস দ্বিতীয়বারের জন্য বৃন্দাবন যাত্রা করেন। তিনি মাঘ মাসে বৃন্দাবনে পৌছাইয়া শুনিলেন যে ঐ মাসের কৃষ্ণা-একাদশী তিথিতে দ্বিজ-হরিদাসাচার্য পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন। বৃন্দাবনের সকলেই তখন তাঁহার জন্য শোকাকুল। 'ভক্তমাল'-মতে[৪] কাশীশ্বর-গোস্বামীর দক্ষিণে যে মোক্ষ-হরিদাস-গোসাঁইর সমাধি স্থাপিত হইয়াছিল সম্ভবত তিনি এই হরিদাসাচার্য।

দ্বিজ-হরিদাস একজন পদকর্তা ছিলেন এবং 'পদকল্পতরু'তে তাঁহার চারিটি ব্রজবুলি পদও উদ্ধৃত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন তাঁহার 'নাম সংকীর্তন' (শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শত নাম) একটি অতি প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয় গ্রন্থ।[৫]

শ্রীনিবাস বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে পর-বৎসর কাঞ্চনগড়িয়াতে হরিদাসের তিরোভাব-তিথি উদ্‌যাপিত হয়। সেই উপলক্ষে শ্রীনিবাস-আচার্য গোকুলানন্দ ও

---

(১) গৌ. ত.—পৃ. ৩২৬, ২১৭; বৈ. দি. (পৃ. ১০৪)-মতে তিনি রাঢ়ী-শ্রেণীর ভরদ্বাজ-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন; বৈ. দ.-এ (পৃ. ৩৪৬) তাঁহাকে ব্রহ্মপুরবাসী বলা হইয়াছে। (২) শ্রীচৈ. চ.—৪।১৭।৬ (৩) প্রে. বি.—২০শ. বি., পৃ. ৩৪৭ (৪) ২৬শ. মা., পৃ. ৩২৬ (৫) HBL—p. 56. (৬) (গৌ. ত.—পৃ. ৩২৬

শ্রীদাসকে দীক্ষাদান করিয়া তাঁহাদের এবং তাঁহাদের স্বর্গত পিতৃদেবের অভিলাষ পূরণ করেন।[৬] তাহার পর গোকুলানন্দ ও শ্রীদাস শ্রীনিবাসের অনুগত শিষ্যরূপে তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী শাস্ত্রানুশালন-হেতু যাজিগ্রামে বাস করিতে থাকেন। মধ্যে মধ্যে তাঁহারা স্থানান্তরে যাইতেন এবং খেতুরি ও বোরাকুলির মহোৎসবে তাঁহারা উপস্থিত হইয়াছিলেন। বুধরি এবং কণ্টকনগরেও তাঁহাদিগকে মধ্যে মধ্যে দেখা যাইত। বীরচন্দ্রপ্রভু যাজিগ্রামে আসিলে তাঁহারা তাঁহাকে সংবর্ধিত করিয়াছিলেন। গোকুলানন্দ 'মস্তকে বহিয়া জল কৃষ্ণসেবা করি'তেন।[৭] 'ভক্তিরত্নাকরে' ইঁহাকে গোকুলানন্দ-চক্রবর্তীও বলা হইয়াছে।[৮] ইঁহার পক্ষে পদর্কতা হওয়াও বিচিত্র নহে।[৯]

গোকুলানন্দের পুত্র কৃষ্ণবল্লভও শ্রীনিবাসের শিষ্য হইয়াছিলেন এবং এই কৃষ্ণবল্লভ বা বল্লভ সম্ভবত পিতার সহিত খেতুরি-মহামহোৎসবে সংকীর্তন-গান গাহিয়াছিলেন। শ্রীদাসের তিন পুত্র—জয়কৃষ্ণ, জগদীশ, শ্যামবল্লভ; জ্যেষ্ঠপুত্রবধূ সত্যভামা এবং আর এক পুত্রবধূ (জগদীশের পত্নী?) চন্দ্রমুখী—ইঁহারা সকলে শ্রীনিবাসের প্রথমা-পত্নী দ্রৌপদীর শিষ্য ও শিষ্যা ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে সত্যভামার ও চন্দ্রমুখীর আবার অনেক শিষ্যোপ-শিষ্য ছিলেন।[১০] 'নরোত্তমবিলাসে'র নরোত্তম-শাখার মধ্যে কিন্তু একজন জয়কৃষ্ণ-আচার্য আছেন।[১১] সম্ভবত এই জয়কৃষ্ণদাসই একজন পদকর্তা ছিলেন এবং ইনি বাংলা ও ব্রজবুলি-ভাষাতে নানাবিধ পদরচনা করিয়াছিলেন; জয়কৃষ্ণদাস-ভণিতার বাংলাপদগুলি ইঁহারই রচিত হইতে পারে।[১২]

(৭) কর্ণ.—১ম. নি., পৃ. ৯ (৮) ভ. র.—১।৪৮৪ (৯) HBL—p. 187 (১০) প্রে. বি.—১৯শ. বি., পৃ. ৩১২ ; ২০ শ. বি., পৃ, ৩৪৭ ; কর্ণ.—১ম. নি.. পৃ. ৯ ; ২য়. নি., পৃ. ২৬, ২৭ ; অ. ব.—৭ম. ম., পৃ.৪৪-৪৫ ; ন. বি.—৬ষ্ঠ. বি., পৃ. ৯২ (১১) ন. বি.—১২ শ. বি., পৃ. ১৯২ (১২) HBL—pp. 195, 196, 197, 498

অনধিক খ্যাতিসম্পন্ন ভক্তবৃন্দ

পুণ্ডরীকাক্ষ-গোসাঁই, গোবিন্দ-ভকত (=ভট্ট?), ঈশান, বাণী-কৃষ্ণদাস, নারায়ণদাস, মাধব :—

ইঁহারা রূপ-গোস্বামীর বার্ধক্যে তাঁহার সহিত একমাসকাল যাবৎ মথুরায় থাকিয়া গোপাল-দর্শন করিয়াছিলেন।[১] শ্রীনিবাস-নরোত্তম-শ্যামানন্দের বৃন্দাবন-ত্যাগের সময়ও ইঁহারা গোবিন্দ-মন্দিরে উপস্থিত ছিলেন।[২] মাধব নন্দীশ্বরে সনাতনের কুটির-সন্নিধানে বাস করিতেন। ইনি সম্ভবত পদ-রচনা করিয়াছিলেন।[৩]

(১) চৈ. চ.—২।১৮ ; তু.—স. সু.—পৃ. ১০ ; মু. বি.—পৃ. ২৯১ (২) ভ. র.—৬।৫১৩-১৩ (৩) HBL—p. 377.

অভিরাম (রামদাস)

'চৈতন্যচরিতামৃতের'র মূলস্কন্ধশাখা-বর্ণনার মধ্যে দুইজন রামদাসের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। সেই উল্লেখগুলি নিম্নোক্ত রূপ ঃ

রামদাস কবিচন্দ্র শ্রীগোপাল দাস।
ভাগবতাচার্য ঠাকুর সারঙ্গদাস।

ইহার পরবর্তী দুইটি শ্লোকের পরেই

রামদাস অভিরাম সখ্য প্রেমরাশি।
ষোলসাঙ্গের কাষ্ঠ হাতে লৈয়া কৈল বাঁশি ।।
প্রভুর আজ্ঞায় নিত্যানন্দ গৌড়ে চলিলা।
তাঁর সঙ্গে তিনজন প্রভু আজ্ঞায় আইলা ।।
রামদাস মাধব আর বসুদেব ঘোষ।
প্রভু সঙ্গে রহে গোবিন্দ পাইয়া সন্তোষ ।।

শেষোক্ত উল্লেখের প্রথম ও পঞ্চম পঙ্ক্তির দুই রামদাসকে দুই পৃথক ব্যক্তি বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু উক্ত গ্রন্থের নিত্যানন্দশাখা-বর্ণনা এবং জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল'[১] হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে তাঁহারা অভিন্ন ব্যক্তি। তাই 'চৈতন্যভাগবতে' নিতানন্দপার্ষদ-বর্ণনায় কেবলমাত্র একজন রামদাসের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বিভিন্ন বৈষ্ণব-গ্রন্থে তাঁহাকে নিত্যানন্দ শিষ্যবৃন্দের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থানীয় বলা হইয়াছে। উল্লেখযোগ্য যে 'চৈতন্যমঙ্গলা'দি গ্রন্থে তিনি 'অভিরাম-গোসাঞি' নামে সুপ্রসিদ্ধ হইলেও তৎপূর্বে লিখিত 'চৈতন্যভাগবতে' তাঁহার এই অভিরাম নাম দৃষ্ট হয় না। 'চৈতন্যচরিতামৃতে'ও কেবল উক্ত একটি-মাত্র স্থলেই তাঁহাকে 'রামদাস-অভিরাম' বলিয়া বর্ণিত করা হইয়াছে।

'চৈতন্যচরিতামৃতো'ক্ত প্রথম রামদাস সম্বন্ধে কিন্তু নিঃসংশয় হওয়া যায় না। বৃন্দাবনদাসের নামে প্রচলিত 'বৈষ্ণববন্দনা'র মধ্যেও একত্রে রামদাস ও কবিচন্দ্রের নাম দুইবার উল্লেখিত হইয়াছে। কিন্তু সেইস্থলে সেই রামদাস সম্বন্ধে অন্য কোনও তথ্য প্রদত্ত হয় নাই। আবার লোচনের 'চৈতন্যমঙ্গলে' একজন রামসুন্দরকে পাওয়া যায়।[২]

শ্রীরামসুন্দর গৌরীদাস আদি যত।
নিত্যানন্দ সঙ্গী বন্দো যতেক ভকত ।।

(১) বি. খ., পৃ. ১৪৪ (২) সূ. খ., পৃ ৩ ; শ্রীচৈ.চ.—৪।২২।১১

ইহা সম্ভবত মুরারি-গুপ্তের

শ্রীরামসুন্দর গৌরীদাসাদ্যাঃ কীর্তনপ্রিয়াঃ।
বিহরন্তি সদা নিত্যানন্দ সঙ্গে মহত্তরাঃ॥

এই শ্লোকেরই অনুবাদ। কিন্তু এই উল্লেখের রামসুন্দর হইতেছেন রামদাস এবং সুন্দরানন্দ। কারণ অন্য কোথাও পৃথক রামসুন্দরকে পাওয়া যায় না। আবার 'অদ্বৈত-প্রকাশ' ও 'প্রেমবিলাসে'র চতুর্বিংশ বিলাসে বলা হইয়াছে[৩] যে হরিদাস ফুলিয়া গ্রামে আসিলে রামদাস নামে ধর্মপরায়ণ দ্বিজ তাঁহার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়া তাঁহার নিকট হরিনাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঘটনা সত্য হইলে, এই দ্বিজ-রামদাসই উপরোক্ত প্রথম উল্লেখের রামদাস বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু সম্ভবত তাহাও নহে। কারণ, খুব সম্ভবত এই ঘটনা গৌরাঙ্গ-আবির্ভাবের পূর্বের ঘটনা। কিংবা, অন্ততপক্ষে ইহা বলা যায় যে গৌরাঙ্গের লীলারম্ভের পূর্বেই রামদাস-দ্বিজ বৈষ্ণব হইয়াছিলেন। 'অদ্বৈতপ্রকাশ'-মতে হরিদাস তাঁহাকে ঈশ্বর ও শুদ্ধা-ভক্তির সম্বন্ধে নানা উপদেশ দিলে

শুনি দ্বিজ হঞা রোমাঞ্চিত কলেবর।
কহে মোরে দয়া করি করহ সংস্কার॥

তখন সানন্দে

হরিদাস দিলা দ্বিজে শক্তি সঞ্চারিয়া॥
মহাবস্তু পাঞা দ্বিজের ঝোরে দু'নয়ন।
হরিদাসে প্রণমিয়া করিলা স্তবন॥
ক্রমে সাধু সঙ্গে দ্বিজের বৈষ্ণবতা হৈল।
হৃদি ক্ষেত্রে ভক্তি-কল্পলতা উপজিল॥

এবং তিনি 'এক ঝুপরী বান্ধিয়া' দিলে ব্রহ্ম-হরিদাস আনন্দে সেইস্থানে বাস করিতে লাগিলেন। বিবরণ সত্য হইলে বুঝা যায় যে 'চৈতন্যচরিতামৃতো'ক্ত প্রথম রামদাস এই রামদাস-দ্বিজ নহেন।

শিবানন্দ-সেনের একজন পুত্রের নাম ছিল রামদাস। 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র একই পরিচ্ছেদের যথাস্থানে তাঁহার উল্লেখ থাকায় আলোচ্য রামদাসকে শিবানন্দ-পুত্র বলিয়াও ধরা চলে না।

কিন্তু 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র নিত্যানন্দ-শাখার শেষাংশে একজন মীনকেতন-রামদাসের উল্লেখ আছে। গ্রন্থের অন্যত্র[৪] তাঁহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে তিনি ছিলেন নিত্যানন্দের একজন শ্রেষ্ঠ ভক্ত। একবার কৃষ্ণদাস-কবিরাজের গৃহের সংকীর্তন-আসরে মীনকেতন-রামদাস আমন্ত্রিত হইয়া আসিলে মূর্তি-সেবক গুণার্ণব-মিশ্র ব্যতিরেকে সভাস্থ অন্য সকলেই

(৩) ৯ম. অ., পৃ. ৩৩ ; ২৪ শ. বি., পৃ. ২৩৪ (৪) ১।৫, পৃ. ৩৫

প্রত্যুদ্গমন করিয়া তাঁহাকে সংবর্ধিত করিয়াছিলেন। রামদাস কিন্তু বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে নিত্যানন্দপ্রভুর প্রতি অবজ্ঞাবশতই গুণার্ণব এইরূপ করিয়াছেন। তিনি প্রকাশ্যে সেই কথা ব্যক্ত করিয়া গুণার্ণবকে ভর্ৎসনা করিলেন। কিন্তু রামদাস ছিলেন ভাবুক-ভক্ত। কৃষ্ণকীর্তনাদির সময় তাঁহার অঙ্গে অশ্রু পুলক জাড্য কম্প প্রভৃতি সাত্ত্বিক-ভাবের লক্ষণ দেখা দিতে লাগিল এবং তাঁহার ভাবাবেশ দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইলেন। উৎসবান্তে তিনি সমবেত ভক্তবৃন্দকে অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া চলিয়া যাইবেন, এমন সময় স্বয়ং কৃষ্ণদাস-ভ্রাতার সহিত তাঁহার কিছু বাদ-প্রতিবাদ হইল। কৃষ্ণদাস-ভ্রাতার মধ্যেও নিত্যানন্দের প্রতি কিছু অনাস্থার ভাব লক্ষ্য করিয়া ক্ষুব্ধ চিত্তে 'ক্রুদ্ধ হৈয়া বংশী ভাঙ্গি চলে রামদাস।'

'প্রেমবিলাস', 'ভক্তিরত্নাকর' এবং 'নরোত্তমবিলাস' হইতে জানা যায়[৫] যে এই মীনকেতন-রামদাসই জাহ্নবাদেবীর সহিত খড়দহ হইতে আসিয়া খেতুরি-উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন এবং জাহ্নবাদেবী উৎসবান্তে বৃন্দাবন-অভিমুখে যাত্রা করিবার সময় মীনকেতন প্রভৃতি কয়েকজন ভক্তকে খড়দহে চলিয়া যাইতে আজ্ঞা প্রদান করেন। 'মুরলীবিলাস'-মতে[৬] জাহ্নবাদেবী স্বীয় দত্তক-পুত্র রামাই সহ বৃন্দাবনে গেলে কিছুকাল পরে জাহ্নবা-সেবক মীনকেতনও বৃন্দাবনে গিয়া কানাই ও বলাই নামক গোপীনাথের দুইটি বিগ্রহ আনিয়া বাঘ্নাপাড়াতে রামচন্দ্রের হস্তে অর্পণ করেন। উল্লেখযোগ্য যে বাঘ্নাপাড়া উৎসবে মীনকেতন-রামদাস ও রামদাস-অভিরাম উভয়েই উপস্থিত ছিলেন। রামাই-বিরচিত 'চৈতন্যগণোদ্দেশদীপিকা' নামক একখানি পুথিতে লিখিত হইয়াছে যে মীনকেতন বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন ভক্ত ছিলেন। তিনি 'জলের জলজন্তু নিস্তারিল প্রচুর।' আর কোথাও মীনকেতনের কোন সংবাদ নাই।

আশ্চর্যের বিষয় মুরারি-গুপ্ত, লোচনদাস, জয়ানন্দ এমন কি বৃন্দাবনদাস পর্যন্ত এই মীনকেতনকে চিনিতেন না। 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র অন্যত্রও তাঁহার কোনও উল্লেখ নাই। নিশ্চয় তিনি নবাগত। সুতরাং তিনি মূলস্কন্ধ-শাখায় বর্ণিত প্রথমোল্লেখিত রামদাস কিনা সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে ইহা বলা চলে যে উক্ত রামদাস সম্বন্ধে অন্য কোথাও কোনও বিবরণ না থাকায় উঁহাকে মীনকেতন-রামদাস মনে করার বিশেষ কোনও অন্তরায় নাই।

কিন্তু বৈষ্ণব-সমাজে দ্বাদশ-গোপাল নামে যে বারজন ভক্ত প্রসিদ্ধি-লাভ করিয়াছিলেন, রামদাস অভিরাম বা অভিরাম-গোসাঁই ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে সর্বপ্রধান। অবশ্য পরবর্তিকালের গ্রন্থগুলিতে তাঁহার যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহার সকল কিছুই

(৫) প্রে. বি.—১৯শ. বি., পৃ. ৩০৮; ভ. র.—১০।৩৭৪; ন. বি.—৬ষ্ঠ. বি., পৃ. ৮০; ৮ম. বি., পৃ. ১০৭, ১১২ (৬) পৃ. ৩৯৬-৯৭

বিশ্বাসযোগ্য নহে। বিশেষ করিয়া 'অভিরামলীলামৃতগ্রন্থ'টি পাঠ করিলে তাঁহাকে একজন রহস্যময় মানুষ ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। কিন্তু প্রাচীন চরিতকার-গণ তাঁহার যে চিত্র উপস্থাপিত করিয়াছেন, সম্ভবত তাহাতেই তাঁহার যথার্থ পরিচয় মিলিতে পারে। তদনুযায়ী আমরা বুঝিতে পারি যে গৌরাঙ্গের নবদ্বীপলীলায় তাঁহার যোগদান করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল।[৭] কিন্তু সেই ঘটনা ঘটে অপেক্ষাকৃত পরবর্তিকালে, নিত্যানন্দপ্রভুর নবদ্বীপে আসিয়া পৌঁছাইবারও পরে। গৌরাঙ্গলীলায় তখন রামদাসের কোন প্রাধান্য ছিল না। তবে তিনি একবার শ্রীখণ্ডে আসিয়া নরহরির ভ্রাতুষ্পুত্র বালক রঘুনন্দনের সহিত নৃত্য করিয়া যান এবং রঘুনন্দনের বিশেষ শক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে পুরস্কৃত করেন।[৮] কিন্তু অভিরাম নিজেই ছিলেন প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী। মুরারি-গুপ্ত বা বৃন্দাবনদাস, এই দুইজন প্রাচীন চরিতকারের গ্রন্থে অবশ্য তাঁহার সেই শক্তির কোনও উল্লেখ নাই। সম্ভবত সর্বপ্রথম সেই শক্তির ঘোষণা করেন কবিকর্ণপূর তাঁহার 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'-গ্রন্থে। তিনি বলিয়াছেন[৯] যে অভিরাম 'দ্বাত্রিংশতা জনৈরেব বাহ্যং কাষ্ঠমুবাহ।' তাঁহার পর কৃষ্ণদাস-কবিরাজও দুইটি স্থলে প্রায় ঠিক একই কথা বলিয়াছেন।[১০] 'ষোলসাঙ্গের কাষ্ঠ হাতে লৈয়া কৈল বাঁশী।' কর্ণপূর যেইস্থলে অভিরামকে বত্রিশ-জনের কাষ্ঠবহনকারী বলিয়াছেন, কৃষ্ণদাস সেই স্থলে বলিতেছেন যে তিনি ঐ বত্রিশ-জনের বহনযোগ্য কাষ্ঠকে বংশীতে পরিণত করিয়াছিলেন। শেষোক্ত লেখক সম্ভবত কিছুটা জনশ্রুতির সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন এবং সম্ভবত তাঁহার এই বর্ণনাই পরবর্তিকালের কল্পনাবিলাসী কবিদিগের জন্য প্রচুর পরিমানে রসদের যোগান দিয়াছে। কবিরাজ-গোস্বামী উক্ত শ্লোকের মধ্যেই বলিতেছেন[১১] 'রামদাস অভিরাম সখ্য প্রেমরাশি।' এবং 'চৈতন্যভাগবত' হইতেও জানা যায়[১২] যে অভিরামের দেহে তিন মাস ব্যাপী কৃষ্ণাবেশ বর্তমান ছিল এবং তিনি ছিলেন 'সভার অধিক ভাবগ্রস্ত' ব্যক্তি, নিরবধি ঈশ্বর- ভাবে কথা বলিতেন ; তাঁহার 'বাক্য কেহো ঝাট না পারে বুঝিতে।' বৃন্দবেনের এই মন্তব্যগুলিও কম রহস্যের সৃষ্টি করে নাই। আবার জয়ানন্দও বলিতেছেন[১৩] যে স্বয়ং গৌরাঙ্গপ্রভুই রামদাসের গৃহে গিয়া সেইস্থানে ছয়মাস অতিবাহিত করিয়াছিলেন। কবি জয়ানন্দের স্ব-গৃহেই মহাপ্রভুর উপস্থিতির উল্লেখের মত অভিরামের গৃহে মহাপ্রভুর এই সন্দেহজনক ষণ্মাস যাবৎ অবস্থানের উল্লেখও সম্ভবত কম জটিলতার সৃষ্টি করে নাই। পরবর্তিকালের কবিগণ এই সমস্ত প্রাচীন

---

(৭) বা. প.—পৃ. ১৬১ ; চৈ. ভা.—২।৮, পৃ. ১৩৯ ; ২।১৩. পৃ. ১৭৪ ; চৈ. ম. (জ.)—বি. খ., পৃ. ৭২ ; স. খ., পৃ. ৯০ (৮) তু.—চৈ. ম. (জ.)—সূ.খ., পৃ. ৩৪ ; দ্র.—নরহরি সরকার (৯) গৌ. দী.—১২৬. (১০) চৈ. চ.—১।১০, পৃ. ৫৩ ; ১।১১, পৃ. ৫৫ ; তু.—চৈ. ম. (জ.)—বি.খ.. পৃ. ১৪৪ (১১) তু.—চৈ. ম. (জ.)—বি. খ., পৃ. ১৪৪ (১২) চৈ. ভা.—৩।৬, পৃ. ৩১৬ (১৩) বি. খ., পৃ.১৪৪

গ্রন্থকারের উপ্ত বীজ হইতে অঙ্কুরিত আগাছাগুলিকেই প্রচুর স্নেহবারি-সিঞ্চনে পরিপুষ্ট করিয়াছেন।

যাহা হউক, চৈতন্য দাক্ষিণাত্য হইতে নীলাচলে ফিরিয়া সেইস্থানে অবস্থান করিতে থাকিলে রামদাস এবং গদাধরদাস দুইজনে গিয়া তাঁহার সহিত বাস করিতে থাকেন। কিন্তু মহাপ্রভু যখন নিত্যানন্দকে গৌড়ে গিয়া থাকিবার আজ্ঞা প্রদান করেন তখন তিনি যে কয়েকজন ভক্তকে তাঁহার সঙ্গী হিসাবে পাঠাইয়া দেন, অভিরামও তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন।[১৪] সেই সময় গৌড় পথে সর্বপ্রথম রামদাসের দেহে গোপাল-ভাব প্রকাশ পাইতে থাকে[১৫] এবং

মধ্য পথে রামদাস ত্রিভঙ্গ হইয়া।
আছিলা প্রহর তিন বাহ্য পাসরিয়া॥

তারপর তিনি পাণিহাটীতে পৌঁছাইয়া নিত্যানন্দের একজন প্রধান সঙ্গী-হিসাবে তাঁহার নৃত্য-কীর্তনে যোগদান করেন, এবং তাঁহার সহিত বিভিন্ন স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকেন।[১৬] রঘুনাথদাস যখন পাণিহাটীতে নিত্যানন্দ-ভক্তবৃন্দকে দধি-চিড়া ভক্ষণ করাইয়াছিলেন, তখন অভিবাম সেইস্থলে উপস্থিত ছিলেন।[১৭] জয়ানন্দ জানাইতেছেন যে তিনি (জয়ানন্দ) অভিরাম-গোসাঁইর অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।[১৮] সম্ভবত তাঁহাদের এই সংযোগ ঘটে অভিরামের নীলাচল হইতে প্রত্যাবর্তনের পরবর্তী কোন সময়ে।

ইহার পর অভিরাম সম্বন্ধে নূতন খবর পাইতেছি 'প্রেমবিলাসে'[১৯] আসিয়া। শ্রীনিবাস-আচার্যের বৃন্দাবন-গমনের পূর্বে বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁহাকে অভিরামের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। জাহ্নবা তাঁহাকে বলিয়া দিয়াছিলেন যে অভিরামের নিকট একটি 'সকল মঙ্গল সিদ্ধি চাবুক' আছে, তিনি শ্রীনিবাসকে তিনবার চাবুক মারিলে শ্রীনিবাস ভক্তি ও শক্তির অধিকারী হইবেন। তদনুযায়ী শ্রীনিবাস অভিরামের নিকট পৌঁছাইলে তিনি তাঁহাকে রন্ধন-সামগ্রী ক্রয়ের জন্য অষ্ট-কড়া কড়ি প্রদান করিয়া রন্ধন ও আহার করিতে বলিলেন এবং তাঁহার বৈরাগ্য-পরীক্ষার জন্য দুইজন বৈষ্ণবকে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু শ্রীনিবাস সেই স্বল্প-পরিমিত খাদ্য-সামগ্রী দিয়াও অতিথি-সৎকার করায় অভিরাম সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীনিবাসকে সজোরে তিনবার চাবুক মারিলেন। এমন সময় অভিরাম-পত্নী মালিনী আসিয়া পতি-হস্ত আকর্ষণ করিয়া তাঁহাকে নিবৃত্ত করিলেন।

(১৪) চৈ. ভা.—৩।৫, পৃ. ৩০৩ ; চৈ. চ.—১।১০, পৃ. ৫৩ ; ১।১১, পৃ. ৫৫ ; ২।১৫, পৃ. ১৭৮ (১৫) তু.—চৈ. ম. (জ.)—বি. খ., পৃ. ১৪৪ (১৬) শ্রীচৈ. চ.—৪।২২।১১ ; ৪।২৩।২২ ; তু.—চৈ. ম. (জ.)—উ. খ., পৃ. ১৪৮ (১৭) চৈ. চ.—৩।৬, পৃ. ৩১৬ (১৮) চৈ. ম. (জ.)—পৃ. ৩ ; বৈ. খ., পৃ. ৮৪ (১৯) প্রে. বি.—৪র্থ. বি., পৃ. ৪১ ; ৫ম. বি., পৃ. ৪৯-৫১

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে নূতন-ঘটনা পরিবেষণের সহিত লেখক আরও দুই একটি নূতন সংবাদ দিতেছেন। অভিরামের একজন পত্নীও ছিলেন। তাঁহার নাম মালিনী, এবং অভিরাম কৃষ্ণনগরে বাস করিতেন। তিনি এমনই শক্তিশালী ছিলেন যে তাঁহার প্রণামের শক্তি সহ্য করিতে না পারিয়া নিত্যানন্দের সাতজন পুত্রকেই জীবন-দান করিতে হয়। কেবলমাত্র শেষ-পুত্র বীরভদ্র সেই প্রণাম সহ্য করিয়া জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।[২০] 'প্রেমবিলাসে'র চতুর্বিংশ বিলাস হইতে আরও কিছু নূতন সংবাদ পাওয়া যায়।[২১] বীরভদ্র তাঁহার যৌবনে একবার অদ্বৈতপ্রভুর নিকট দীক্ষা-গ্রহণার্থ জলপথে শান্তিপুর-অভিমুখে ধাবিত হইলে জাহ্নবাদেবীর অনুরোধক্রমে অভিরাম গিয়া তাঁহার নিক্ষিপ্ত বংশীর আঘাতে বীরভদ্রের নৌকাটিকে অচল করিয়া দেন এবং তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করেন। 'নিত্যানন্দপ্রভুর বংশবিস্তার' নামক গ্রন্থখানি হইতেও এইরূপ ঘটনার সমর্থন মিলিতে পারে।

আরও পরবর্তী-কালের 'অনুরাগবল্লী'তে লিখিত হইয়াছে যে শ্রীনিবাস লোকমুখে অভিরামের কথা শুনিয়া কৃষ্ণনগরে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন এবং 'সিধা' গ্রহণ করিয়া তাঁহার গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন। অভিরামের গৃহের পূর্বদিকে 'রামকুণ্ড' নামে একটি পুষ্করিণী ছিল। খননকালে এই পুষ্করিণী হইতে একটি শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ অবিষ্কৃত হয় এবং তদবধি গোপীনাথ নামে সেই বিগ্রহ সেবিত হইয়া আসিতেছিল। শ্রীনিবাস তৎসমীপে থাকিয়া কৃষ্ণ-সংকীর্তনাদি শুনিতে থাকেন। একদিন অভিরাম তাঁহাকে সংবাদ দিলেন যে এক ধনী-ব্যক্তির গৃহে বিবাহোৎসব হইতেছে, শ্রীনিবাস সেইস্থানে গিয়া আহার ও দক্ষিণা গ্রহণ করিলে সেই দক্ষিণাতেই তাঁহার কিছুদিন চলিয়া যাইবে। শ্রীনিবাস কিন্তু মৌন থাকিয়া অসম্মতি জানাইলে অভিরাম কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিলেন যে তখনও তাঁহার নিকট পাঁচ-গণ্ডা কড়ি রহিয়াছে। শ্রীনিবাসের বৈরাগ্য অভিরামকে বিস্মিত করিল। তিনি তাহারপর গোপনে সংবাদ লইয়া জানিলেন যে শ্রীনিবাস ষোল-কড়ার তণ্ডুল, এক-কড়ার খোলা, দুই-কড়ার কাষ্ঠ এবং অবশিষ্ট-কড়ার লবণ ক্রয় করিয়া 'দারুকেশ্বর' নদীতীরে গিয়া ভোগ চড়াইয়াছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ দুইজন বৈষ্ণবকে পাঠাইয়া দিলে তাঁহারা শ্রীনিবাসের অতিথি হইলেন। কিন্তু দ্বিধাহীন-চিত্তে শ্রীনিবাস সেই অতিথিদিগকে প্রসাদান্ন ভোজন করাইলেন। তখন তাঁহারা আসিয়া সংবাদ দিলে অভিরাম আরও বিস্মিত হইলেন। প্রকৃতিস্থ হইলে তিনি 'জয়মঙ্গল' নামক তাঁহার ঘোড়ার-চাবুক দিয়া শ্রীনিবাসকে তিনবার বেত্রাঘাত করিয়াছেন, এমন সময় মালিনী

(২০) প্রে. বি.—১৯শ. বি., পৃ. ৩৪১ (২১) পৃ.—২৫১-৫২

আসিয়া হাত ধরিলেন এবং শ্রীনিবাসকে কৃপা করিতে বলিলেন। অভিরাম শ্রীনিবাসকে নানাবিধ উপদেশ দান করিয়া বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিলেন।

'অনুরাগবল্লী'র বর্ণনা যে অধিকতর বাস্তবানুগ তাহাতে সন্দেহ নাই ; কিন্তু লেখক মূলত 'প্রেমবিলাসে'র বর্ণনাকেই ভিত্তি করিয়াছেন। প্রাচীন গ্রন্থকার-গণের বর্ণনার চিহ্নমাত্র তাঁহার বর্ণনায় নাই। অধিকন্তু 'রামকুণ্ড', 'দারুকেশ্বর', 'ঘোড়ার চাবুক শ্রীজয়মঙ্গল' প্রভৃতি সম্বন্ধীয় নূতন তথ্যগুলি পাইতেছি। আবার আরও পরে 'ভক্তিরত্নাকরে' আসিলে আরও নূতন তথ্য পাওয়া যায়। 'ভক্তিরত্নাকরে'র বর্ণনা অনুযায়ী[২২] বসু-জাহ্নবীর আদেশক্রমে শ্রীনিবাস অভিরামের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য খানাকুলে পৌঁছাইলে এক প্রাচীন ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটে। তিনি তাঁহার নিকট শুনিলেন যে অভিরাম 'নৃত্য-গীত-বাদ্যে বিশারদ' ছিলেন এবং নিত্যানন্দের জীবৎকালে তাঁহার ইচ্ছাতেই তিনি 'করিল বিবাহ বিজ্ঞ বিপ্রের গৃহেতে' এবং 'শ্রীঠাকুর অভিরাম কৃষ্ণলীলা-কালের প্রসিদ্ধ শ্রীদাম' ছিলেন। শ্রীনিবাস শুনিলেন যে স্বয়ং গোপীনাথই 'স্বপ্নচ্ছলে' অভিরামকে স্বীয় স্থান নির্দেশ করিয়া দিলে তিনি যে-কুণ্ড খনন করিয়া বিগ্রহ প্রাপ্ত হন তাহার নাম 'রামকুণ্ড' রাখা হয়। ব্রাহ্মণ আরও বলিলেন যে অভিরাম এমনই শক্তিশালী ছিলেন যে একদিন তাঁহার বংশী হারাইয়া যাওয়ায় শতাধিক ব্যক্তিও যে পরিমাণ কাষ্ঠ নাড়াইতে পর্যন্ত পারেন না, তাহাকে তিনি অবলীলাক্রমে উত্তোলন করিয়া বংশীর মত করিয়া ধরিয়াছিলেন।

ইহার পর 'প্রেমবিলাসা'নুযায়ী অভিরামকর্তৃক শ্রীনিবাস পরীক্ষিত হন। তবে বর্ণনার পার্থক্য এই যে 'প্রেমবিলাস'-মতে যেখানে শ্রীনিবাস একজনের অন্ন রন্ধন করিয়া তিনজনের ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, 'ভক্তিরত্নাকর'-মতে তিনি সেইস্থলে একজনের অন্নের দ্বারা পাঁচজনের উদর-পূর্তির ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হন। 'ভক্তিরত্নাকরে' 'জয়মঙ্গল' 'দারুকেশ্বরে'র কথাও বলা হইয়াছে। কিন্তু সেই বর্ণনায় অভিরামের নৃত্যগীত-নৈপুণ্য ও মালিনীর বংশমর্যাদার কথা এবং রামকুণ্ডের ইতিবৃত্ত প্রভৃতি নূতন। কৃষ্ণনগর যে খানাকুল-কৃষ্ণনগর তাহাও এই গ্রন্থ হইতে জানা যাইতেছে। নরহরি আরও পরবর্তিকালের খবর দিয়া বলিতেছেন যে ঠাকুর নরোত্তম নীলাচল-গমনের পূর্বে খানা-কুল-কৃষ্ণনগরে গিয়া অভিরাম ও মালিনীর আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'মুরলীবিলাসে'র লেখক বলিতেছেন[২৩] যে অভিরাম বাঘ্নাপাড়াতে গোপীনাথ-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার সময়ও তথায় উপস্থিত ছিলেন।

এই সমস্ত বর্ণনা হইতে একটি বিষয় লক্ষ্য না করিয়া পারা যায় না যে, ঘটনা যতই অতীতের বিষয় হইয়া যাইতেছে, ততই তৎসম্বন্ধীয় নব নব তথ্য উদ্ভাবিত হইতেছে।

(২২) ৪।৯৩-১৪৮ (২৩) পৃ. ৩৯৮

ষোড়শ-শতকে লিখিত 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'-গ্রন্থে যেখানে অভিরামকে বত্রিশ-জনের বহনযোগ্য কাষ্ঠের বহনাধিকারী বলা হইয়াছে, বিংশ শতাব্দীর 'বৈষ্ণবাচারদর্পণ'-গ্রন্থে সেই স্থলে তাঁহাকে 'বত্রিশ বোঝা কাষ্ঠের বংশী'বাদক রূপে চিত্রিত করা হইয়াছে। 'মুরলীবিলাস', 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়', 'নিত্যানন্দের বংশবিস্তার' প্রভৃতি পরবর্তী-কালের অপ্রামাণিক গ্রন্থগুলিতে অভিরামের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহা আরও অদ্ভুত। অভিরামের আবির্ভাব ও মালিনী-কাহিনী সম্বন্ধে কোথাও বলা হইয়াছে[২৪] যে নিত্যানন্দ গিরি-গোবর্ধনে গিয়া 'শ্রীদাম' বলিয়া ডাক ছাড়িলে অভিরাম গোবর্ধন হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং নিতাই হাতে তালি দিয়া ছুটিতে থাকিলে অভিরাম তাঁহাকে ধরিবার জন্য তাঁহার পশ্চাতে ছুটিয়া একেবারে এক দৌড়ে বৃন্দাবন হইতে গৌড়ে আসিয়া হাজির হইলেন; তাহার পর তিনি খানাকুলে আসিয়া যবন-দুহিতা মালিনীকে বিবাহ করিলেন এবং ভক্তবৃন্দ ও চৈতন্যের সাহায্যে মালিনী জাতে উঠিয়া গেলেন। কোথাও বলা হইয়াছে[২৫] যে শ্রীদাম বা অভিরাম এক ব্যক্তির গৃহ হইতে মালিনীকে লইয়া পলায়ন করিলে মালিনীর পিতা পশ্চাদ্ধাবন করেন। তখন মালিনী বামহস্তে 'ষোল সাইঙ্গের কাষ্ঠ' তুলিয়া দিলে অভিরাম তাহার দ্বারা মুরলী বাজাইয়া সকলকে মোহিত করেন। আবার কোথাও বলা হইয়াছে[২৬] যে নিত্যানন্দ বৃন্দাবনে গিয়া কৃষ্ণের অদর্শনে 'শ্রীদাম' বলিয়া চিৎকার করিলে 'এক মহাশয়' ব্যক্তি 'সিঙ্গা বেণু রব' করিতে করিতে বাহির হইলেন এবং একটি দৌড়ের প্রতিযোগিতার দ্বারা নিত্যানন্দের শক্তি পরীক্ষিত হইলে নিত্যানন্দ হল-মুষল ধরিয়া স্বীয় স্বরূপ প্রদর্শন করিলেন। উক্ত শ্রীদামই অভিরাম রূপে পররর্তিকালে তাঁহার দণ্ডবৎ দ্বারা বিভিন্ন স্থানের বিগ্রহসমূহকে বিদীর্ণ করিতে করিতে ভ্রমণ করিতেছিলেন। আবার কোনও গ্রন্থকার বলিতেছেন[২৭] যে বৃক্ষের কোটরে জন্মলাভ করিয়া অভিরাম যবন-কাজীর কন্যাকে বিবাহ করেন এবং মালিনী স্বহস্ত-রন্ধিত খাদ্য সামগ্রীর দ্বারা খানাকুলে মহোৎসবের আয়োজন করিয়া চৈতন্যের ভক্তবৃন্দকে পরিতৃপ্ত করেন। তারপর তিনি মালিনীর প্রভাব প্রদর্শনের জন্য ষোল-সাঙ্গের কাষ্ঠ তুলিয়া সকলকে চমৎকৃত করেন এবং পরে দণ্ডবৎ দ্বারা বিগ্রহ ফাটাইতে থাকেন। 'অভিরাম গোস্বামীর বন্দনা' নামক একটি গ্রন্থে বলা হইয়াছে[২৮] যে অভিরাম খানাকুলে আসিলেন, 'মালিনী আছয়ে যথা যবনের গৃহে'। সেখান হইতে তিনি মালিনীকে লইয়া চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিলে যবনগণ তাঁহাকে ধরিলেন; কিন্তু মালিনীর মহাতেজে তাঁহারা সকলে পরাভূত হইলেন। তখন ব্রাহ্মণগণ যবনী-হরণের অপবাদ দিয়া নিন্দা করিতে থাকিলে অভিরাম মালিনীকে লইয়া দেশ-বিদেশ

---

(২৪) মু. বি.—পৃ. ২৩৪-৪১ (২৫) চৈ. চন্দ্র.—পৃ. ১৪৭-৪৯ (২৬) নি. বি.—পৃ. ১৪, ৪৫
(২৭) চৈ. দী. (রামাই)—পৃ. ৪ (২৮) পৃ. ৫-৯

ভ্রমণান্তে খানাকুলে আসিয়া মহোৎসব করিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণগণ মালিনীর রন্ধন ভক্ষণে অসম্মত হইলে অভিরাম সমস্ত খাদ্য-সামগ্রী একটি গর্তের মধ্যে ঢালিয়া দিয়া চলিয়া যান। তিনি পূর্বে না জানিয়া এক স্থানে এক বিধবা ব্রাহ্মণীকে পুত্রবতী হইবার আশীর্বাদ দিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই স্থানে গিয়া দেখিলেন যে ব্রাহ্মণী গর্ভবতী হইয়াছেন। গ্রামবাসী-গণ তো অভিরামের শক্তি দেখিয়া অবাক। কিন্তু গর্ভস্থ পুত্র যখন তাঁহাদিগকে নানাবিধ তত্ত্বালোচনা করিয়া শুনাইলেন, তখন তাঁহারা স্তম্ভিত হইলেন। খানাকুলে সেই সংবাদ পৌঁছাইলে অভিরাম গর্ত হইতে সেই অবিকৃত খাদ্য সামগ্রী তুলিয়া অনুতপ্ত ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইলেন।

বলা বাহুল্য, প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই অভিরামের বংশী-বাদন, দণ্ডবতের দ্বারা বিগ্রহ-বিদারণ, যবনী-কন্যাকে লইয়া গিয়া শেষে তাঁহার শক্তি প্রকাশ করিয়া ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব সকলকেই বশীভূত করণ, ইত্যাদি আখ্যান বিবৃত করা হইয়াছে। 'অভিরামলীলামৃত' নামক একটি গ্রন্থ আবার এই বিষয়ে অন্য সকলকে অতিক্রম করিয়াছে। গ্রন্থোক্ত বিবরণ সমূহ যেমনি অবাস্তব, তেমনি অশোভন ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রথমেই বলা হইয়াছে যে মালিনীকে বাক্সের মধ্যে পুরিয়া যমুনার জলে ভাসাইয়া দেওয়া হয়। তিনি বৃন্দাবন হইতে স্রোত-বাহিত হইয়া গৌড়ে আসিলে এক মালঞ্চের মালাকার-গণ বহুকাল পরে হঠাৎ সঞ্জীবিত বৃক্ষরাজির পরামর্শক্রমে তাঁহার উদ্ধার-সাধন করেন এবং তিনি যবন-গৃহে পালিতা হন। ইহার পর ক্রমাগত অসম্ভব ঘটনারাজির সমাবেশে সমস্ত গ্রন্থখানিই কণ্টকিত হইয়াছে। তাহার মধ্য হইতে সত্যকে উদ্‌ঘাটন করা একপ্রকার অসম্ভব বলা চলে। শেষোক্ত গ্রন্থগুলির সহিত এই গ্রন্থটির বর্ণনাকে আলোচনার বিষয়ীভূত করিয়া অভিরাম সম্বন্ধে কেবল এইটুকু বলা চলে যে তিনি একজন বিশেষ শক্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন এবং তিনি যবনী-কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া নানাস্থানে পরিভ্রমণ করেন ও স্বীয় শক্তি-প্রভাবে অনেকানেক ব্যক্তিকে বশীভূত করিয়া শিষ্যে পরিণত করেন। 'প্রেমবিলাস', 'অনুরাগবল্লী'ও 'ভক্তিরত্নাকরে'র বর্ণনার মধ্যেও যে ঘটনা-বিকৃতি ঘটিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সমস্ত গ্রন্থের (ও পরবর্তিকালের লিখিত গ্রন্থাদির) প্রভাবে পড়িয়া পদকর্তৃগণও নানাভাবে শ্রীদামের অবতার 'ভায়া' অভিরামের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়াছেন। 'পাটনির্ণয়'-গ্রন্থে পাণিহাটী এবং খানাকুল-কৃষ্ণনগর উভয় গ্রামেই অভিরামের শ্রীপাট নির্দেশিত হইয়াছে। 'পাটপর্যটন' এবং 'অভিরামলীলামৃত' গ্রন্থে অভিরামের শিষ্যবৃন্দের নাম-ধাম বর্ণিত হইয়াছে। সেই বর্ণনাগুলির কতটা যে প্রামাণিক, তাহা বলা শক্ত।

গৌরীদাস-পণ্ডিত

দ্বাদশ-গোপালের অন্যতমরূপে গণ্য গৌরীদাস-পণ্ডিত সম্বন্ধে 'চৈতন্যচরিতামৃত' কিংবা তৎপূর্ববর্তী প্রাচীন গ্রন্থগুলি হইতে যে তথ্য সংগৃহীত হইতে পারে তাহা পর্যাপ্ত নয়। গৌরীদাস অভিরামাদি যে সকল ভক্ত গৌরাঙ্গ-লীলায় যোগদান করিতে পারিয়াছিলেন, অথচ প্রাধান্যলাভ করিয়াছিলেন পরবর্তিকালে, কিংবা উদ্ধারণ-দত্ত প্রভৃতি যে সকল নবাগত ভক্ত নিত্যানন্দ-সঙ্গী হিসাবে পরবর্তিকালে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে আমাদিগকে বিশেষভাবে 'প্রেমবিলাস' এবং 'ভক্তিরত্নাকরে'র উপর নির্ভর করিতে হয়; 'অনুরাগবল্লী' 'নরোত্তমবিলাস' প্রভৃতি গ্রন্থ অবশ্য পরিপূরকের কার্য করিয়া থাকে। কিন্তু 'প্রেমবিলাসে'র প্রত্যেক ঘটনাকে আবার প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করা চলে না। সুতরাং এই 'প্রেমবিলাস' হইতে আরম্ভ করিয়া তৎপরবর্তিকালের গ্রন্থগুলিতে ষোড়শ শতাব্দীর যে সমূহ তথ্য বিবৃত হইয়াছে, তাহাদের সত্যতা সম্বন্ধেও নিঃসংশয় হওয়া যায় না। সেই জন্য মহাপ্রভুর অনুপস্থিতিতে বা অবর্তমানে উক্ত ভক্তবৃন্দের কর্মপদ্ধতি কিরূপ ছিল, সে সম্বন্ধে সঠিক বিবরণ সংগ্রহ দুষ্কর হইয়া পড়ে। সুতরাং তাহাদের সম্বন্ধে বৃন্দাবনদাসাদি প্রাচীন গ্রন্থকার-গণের বিবরণ যৎসামান্য হইলেও তাহাকেই ভূমিকা-স্বরূপ গ্রহণ করিয়া পরবর্তিকালের গ্রন্থকার-প্রদত্ত ঘটনাগুলির গ্রহণ-বর্জন করিয়া সামঞ্জস্য-বিধান করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে গৌরীদাস-পণ্ডিতকে গৌরাঙ্গের নবদ্বীপ-লীলার অংশ-বিশেষের সহিত যুক্ত থাকিতে দেখা গেলেও তাঁহার গতিবিধি ও কর্মকুশলতার বিস্তৃত পরিচয় মেলে পরবর্তিকালের গ্রন্থসমূহে; সুতরাং তাঁহার জীবনী-সম্বন্ধেও উপরোক্ত সিদ্ধান্ত প্রযোজ্য হইয়া উঠে।

'বাসুঘোষের পদাবলী,'[১] এবং 'পদকল্পতরু'[২] ও 'গৌরপদতরঙ্গিণী'তে[৩] উদ্ধৃত কয়েকটি পদ হইতে জানা যায় যে গৌরীদাস-পণ্ডিত গৌরাঙ্গের বাল্যলীলা-সঙ্গী ছিলেন। 'গৌরচরিত চিন্তামণি'[৪] এবং 'ভক্তিরত্নাকরে'ও[৫] ইহার সমর্থন পাওয়া যায়। কিন্তু ষোড়শ শতকে রচিত কোনও জীবনী-গ্রন্থ হইতে এইরূপ কোনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই। এমন কি স্বয়ং বৃন্দাবনদাসই তাঁহার সমগ্র গ্রন্থ মধ্যে কেবল নিত্যানন্দ-ভক্ত-বর্ণনা প্রসঙ্গে বারেকের জন্য তাঁহার নামোল্লেখ করিয়াছেন। পদকর্তৃগণ গৌরাঙ্গের বাল্যলীলা-প্রসঙ্গে নিত্যানন্দ প্রভৃতির নামও যুক্ত করিয়াছেন। অথচ নিত্যানন্দ অনেক পরে নবদ্বীপ-লীলায় যোগদান করিয়া-

(১) পৃ. ১৩ (২) ১২১৬ (৩) পৃ. ১৪৮, ১৫৪, ১৮৬-৮৭, ২১২, ২৭৭ (৪) পৃ. ৪৭ (৫) ১২।২১৩২, ৩১৫৬, ৩১৬৩, ৩১৮৭

ছিলেন। সুতরাং গৌরীদাস সম্বন্ধে উপরোক্ত উল্লেখগুলিকে অভ্রান্ত সত্য বলিয়া ধরা চলেনা। তবে তিনি যে গৌরাঙ্গের নবদ্বীপ-লীলার দ্বিতীয়ার্ধে তাঁহার সহিত যুক্ত হইয়াছিলেন, তাহা কোনও কোনও গ্রন্থে স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু ঠিক কোন সময়ে তিনি গৌরাঙ্গ-দর্শন লাভ করিয়া তৎকৃপালাভে সমর্থ হন, তাহার সঠিক বিবরণ কোথাও পাওয়া যায় না। কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত ১৬৮৮শকে অনুলিখিত গোপাল-ভট্ট-বিরচিত বলিয়া আখ্যাত 'শ্রীচৈতন্যজাহ্নবীতত্ত্বে'র একটি অনূদিত পুথি হইতে জানা যায় যে নিত্যানন্দ সর্বপ্রথম নবদ্বীপে আসিলে পথিমধ্যে শ্রীবাস এবং গৌরীদাসের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটে। এই উল্লেখের উপর জোর না দিয়াও বলা যাইতে পারে যে নিত্যানন্দাগমনের পূর্বেও গৌরীদাসের পক্ষে নবদ্বীপে আসা সম্ভবপর ছিল। কারণ গৌরীদাসের নিবাস ছিল শালিগ্রামে, উহা নবদ্বীপ হইতে বহু-দূরবর্তী নহে।

'সুবল মঙ্গলে' বলা হইয়াছে[৬] :

কংসারি মিশ্রের পত্নী নাম যে কমলা।
তাঁহার গর্ভেতে ছয় পুত্র উপজিলা ॥
দামোদর বড় জগন্নাথ তার ছোট।
সূর্যদাস ঠাকুর হয়েন তাঁহার কনিষ্ঠ ॥
তাঁহার কনিষ্ঠ হন পণ্ডিত গৌরীদাস।
অনুজ কৃষ্ণদাস যেঁহ পুরে মন আশ ॥
তাঁহার কনিষ্ঠ হয়েন নৃসিংহ চৈতন্য।
প্রেম বিতরণ করি বিশ্ব কৈল ধন্য ॥
এই ছয় ভ্রাতা মিলি নিত্যানন্দ সনে।
গৌরাঙ্গের আজ্ঞায় করেন প্রেমদানে ॥

কিন্তু সূর্যদাস-গৌরীদাসাদি সম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ অন্য-কোথাও দৃষ্ট হয়না। দামোদর জগন্নাথ ও নৃসিংহ-চৈতন্যদাসের নাম অন্যত্র পৃথকভাবে দৃষ্ট হইলেও তাঁহারা যে পরস্পর-সম্পর্কযুক্ত, কিংবা শালিগ্রাম-নিবাসী ছিলেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। অপরপক্ষে, 'গৌরগণোদ্দেশ' নামক একটি পুথিতে বলা হইয়াছে[৭] যে গৌরীদাস-পণ্ডিতেরা তিন ভাই ছিলেন এবং দেবকীনন্দনের 'বৈষ্ণববন্দনা', ও 'পাটনির্ণয়ে'[৮] লিখিত হইয়াছে, 'গৌরীদাস পণ্ডিতের অনুজ কৃষ্ণদাস'। সুতরাং কৃষ্ণদাসের ভ্রাতা হওয়ায় গৌরীদাসেরা যে অন্তত তিনভ্রাতা ছিলেন, তাহাতে অবশ্য সন্দেহ থাকেনা। 'প্রেমবিলাসে' বলা হইয়াছে[৯]

---

(৬) অচ্যুত চরণ চৌধুরী—'বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা', কার্তিক, ৪১১ গৌরাব্দ (৭) পৃ. ৪ (৮) বৈ. ব. (দে.)—পৃ. ৫ ; পা. নি.—পৃ. ১ (৯) ২০শ. বি., পৃ. ৩৫৭

সূর্যদাস সরখেল পণ্ডিত প্রবর।
তার ভাই গৌরীদাস সর্বগুণধর॥

এইস্থলে গৌরীদাসকেই সূর্যদাসানুজ ধারণা জন্মে। 'ভক্তিরত্নাকরেও'[১০] উক্ত হইয়াছে যে সূর্যদাসই জ্যেষ্ঠ ছিলেন। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে উক্ত তিন-ভ্রাতার মধ্যে গৌরীদাস মধ্যম ছিলেন। 'প্রেমবিলাস-'মতে গৌরীদাস নিত্যানন্দের আজ্ঞাক্রমেই শালিগ্রাম হইতে অম্বিকায় আসেন। 'পদকল্পতরু'র একটি পদেও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়।[১১] 'ভক্তিরত্নাকর' হইতে জানা যায় যে তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা সূর্যদাসের সম্মতি গ্রহণ করিয়া অম্বিকায় বাস করিতে থাকেন। এই অম্বিকার সহিতই গৌরীদাসের স্মৃতি বিশেষভাবে জড়িত। 'ভক্তিরত্নাকরে'[১২] বলা হইয়াছে যে একবার গৌরাঙ্গ শান্তিপুর হইতে প্রত্যাবর্তন-পথে হরিনদী-গ্রামে নৌকায় চড়িয়া গঙ্গাপারে অম্বিকায় গমন করেন। তিনি নৌকা হইতে একটি 'বৈঠা' সংগ্রহ করিয়া লইয়া যান এবং অম্বিকায় গৌরীদাস-পণ্ডিতের হস্তে তাহা অর্পণ করিয়া বলেন :

এই লহ বৈঠা—এবে দিলাম তোমায়॥
ভবনদী হৈতে পার করহ জীবেরে।

এই বলিয়া তিনি পণ্ডিতকে লইয়া নদীয়ায় গমন করেন এবং সেখানে গিয়া তিনি 'পণ্ডিতে দিলেন আপনার গীতামৃত'। গৌরীদাস 'প্রভুদত্ত' এবং 'প্রভুর শ্রীহস্তের অক্ষর গীতাখানি' লইয়া অম্বিকায় আসিয়া নির্জন নদীতীরে গৌরাঙ্গ-আরাধনায় তন্ময় হইলেন।

গৌরাঙ্গ-প্রদত্ত 'বৈঠা' ও গীতাখানি নাকি অদ্যাপি অম্বিকা-পাটে রক্ষিত আছে।[১৩] তাহাতেই উপরোক্ত ঘটনাকে সত্য বলিয়া ধারণা জন্মায়। ঘটনা সত্য হইলে নবদ্বীপ-লীলাকালে গৌরাঙ্গ-হৃদয়ে গৌরীদাসের উচ্চস্থান সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না এবং বাল্যকাল হইতেই যে গৌরীদাসের হৃদয়ে শুদ্ধা-ভক্তিভাবের উদয় হইয়াছিল সে বিষয়েও নিঃসংশয় হওয়া যায়। তবে গৌরাঙ্গের নবদ্বীপ লীলায় যে গৌরীদাস বিশেষ অংশ গ্রহণ করিতে পারেন নাই, প্রাচীন গ্রন্থকার-গণের বর্ণনার উপর নির্ভর করিয়া তাহাও একরকম নিশ্চয় করিয়া বলা চলে। তাঁহার নবদ্বীপ-প্রসঙ্গ সম্বন্ধে যাহা কিছু উল্লেখ, তাহার প্রায় সমস্তই 'প্রেমবিলাস' ও তৎপরবর্তী গ্রন্থমধ্যে নিবদ্ধ।

'অদ্বৈতপ্রকাশে' একটি ঘটনার বিশদ উল্লেখ দৃষ্ট হয়। তাহা হইতেছে গৌরীদাসের গৌর-নিতাই-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা-প্রসঙ্গ। বিবরণ সত্য হইলে বলিতে হয় যে গৌরীদাসই সর্বপ্রথম গৌরাঙ্গ-বিগ্রহের সেবাপূজার প্রবর্তন করেন। কিন্তু গৌরীদাস কর্তৃক গৌরাঙ্গ-

(১০) ৭।৩৩১ (১১) প. ক.—২৩৫৮ (১২) ৭।৩৩৩ (১৩) বৈ. দি.—পৃ. ১৯ ; ভ. র.—৭।৩৪১

বিগ্রহ সেবার কারণ সম্পর্কে গ্রন্থকার-গণ সকলে একমত নহেন। 'ভক্তিরত্নাকর'-মতে[১৪] গৌরীদাসের অভিলাষ জানিয়া মহাপ্রভু একবার তাঁহাকে বলিয়াছিলেন :

নবদ্বীপ হইতে নিম্ববৃক্ষ আনাইবে।
মোর ভ্রাতাসহ মোরে নির্মাণ করিবে॥

'পদকল্পতরু'র পূর্বোল্লেখিত পদটিতে এবং 'অদ্বৈতপ্রকাশ'-গ্রন্থে (এবং 'অভিরামলীলামৃত'-গ্রন্থে) গৌরাঙ্গের এইরূপ আজ্ঞাদানের[১৫] কথা আছে। কিন্তু এইরূপ বিবরণ অন্য কোথাও নাই। বরঞ্চ 'পদকল্পতরু'র অন্য একটি পদে[১৬] লিখিত হইয়াছে যে গৌরীদাস

একদিন রাত্রিশেষে দেখিলেন স্বপ্নাবেশে
মহাপ্রভু নিত্যানন্দ সনে।
কহে ওহে গৌরীদাস পুরিবে তোমার আশ
আমরা আসিব দুইজনে॥......
......দোঁহে রব তোমার মন্দিরে

ইহার পর স্বপ্নভঙ্গ হইলে গৌরীদাস ক্রমে বিগ্রহাভিষেকের আয়োজনে তৎপর হইলেন। 'প্রেমবিলাসে'ও বলা হইয়াছে[১৭] যে গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ উভয়েই গৌরীদাসকে ডাকিয়া বলিলেন :

শুনিলাম দুই মূর্তি করিয়াছ প্রকাশন।
সাক্ষাতে আনহ তারে করিব দর্শন॥

বৃন্দাবনদাসের নামে প্রচলিত 'বৈষ্ণববন্দনা'তে লিখিত হইয়াছে[১৮] :

প্রভু বিদ্যমানে মূর্তি করিলা প্রকাশ।

এইস্থলেও গৌরাঙ্গের আজ্ঞার কথা নাই। তবে গৌরাঙ্গ-বিদ্যমানেই যে এই বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল তাহা সত্য হইতেও পারে। সন্দিগ্ধ 'অদ্বৈতপ্রকাশে'র বর্ণনানুসারে অদ্বৈতপ্রভুর নির্দেশানুসারেই অচ্যুতানন্দ অম্বিকায় গিয়া মহাসমারোহে দুই মূর্তি স্থাপন করিয়াছিলেন এবং 'মুরলীবিলাসে' লিখিত হইয়াছে[১৯] :

(১৪) ৭।৩৪৬ (১৫) অ. প্র.-এ (২০ শ. অ., পৃ. ৮৯-৯০) আছে যে গৌরীদাসের আত্মতন্ময়ভাব লক্ষ্য করিয়া একবার তাঁহার বন্ধুবর্গ গৌরাঙ্গকে তাঁহার বিবাহ প্রস্তাব করিতে অনুরোধ করায় গৌরাঙ্গ গৌরীদাসকে বিবাহাজ্ঞা দান করেন। গৌরীদাস স্বীকৃত হইয়াও গৌরবিচ্ছেদ ভাবনায় ব্যথিত হইলে গৌরাঙ্গ তাঁহাকে গৌর ও নিতাইর বিগ্রহদ্বয় স্থাপন করিতে বলেন।

অ. লী.-মতে (পৃ. ১২৪) একদিন গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ সহ গৌরীদাস-গৃহে আসিলে গৌরীদাস উভয়কেই স্বীয়-ভবনে চিরকালের জন্য বিরাজমান থাকিবার প্রার্থনা জানান। কিন্তু তাহার অসম্ভাব্যতার কথা জানাইয়া গৌরাঙ্গ তাঁহাকে উভয়ের 'স্বরূপ প্রকাশ' করিবার নির্দেশ দিলে নিত্যানন্দই যুক্তি দেন যে গৌরীদাস তাঁহাদের দুইটি মূর্তি নির্মাণ করাইয়া রাখিতে পারেন। (১৬) ১৫৭৪ (১৭) ১২ শ. বি., পৃ. ১৪৯ (১৮) পৃ. ৫ (১৯) পৃ. ২২৯-৩২

যবহিঁ করিলা প্রভু সন্ন্যাসগ্রহণ।
পণ্ডিতের মনে মনে উৎকণ্ঠা বাড়িলা,
প্রেমভরে নিতাই চৈতন্ত নিরখিলা।......
শেষ লীলাকালে দোঁহে আইলা তার ঘরে

এবং তাঁহারা আসিলে গৌরীদাস বিশেষ অভ্যর্থনা করিয়া উভয়কেই বিগ্রহ-পার্শ্বে বসাইয়া ভোজন করাইয়াছিলেন। এই সকল বর্ণনার সমস্ত কিছুই একেবারে অসত্য বলিয়া মনে হয় না। কারণ 'প্রেমবিলাসে' বিগ্রহ-পার্শ্বে উভয়ের এইরূপ ভোজনের কথা রহিয়াছে[২০] এবং 'ভক্তিরত্নাকরে'ও গৌরীদাস-ভবনে দুই-প্রভুর ভোজন-লীলার কথা সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।[২১] তবে কোথাও ঘটনাকাল লিপিবদ্ধ হয় নাই। 'চৈতন্যসংগীতা' নামক পরবর্তী-কালের একটি গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে মহাপ্রভু নীলাচল হইতে গৌড়াগমন করিলেই ঐরূপ ঘটনা ঘটে।[২২] কিন্তু বর্ণনার অগ্রপশ্চাৎ অংশগুলি পাঠ করিলে তাহা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। নীলাচল হইতে গৌড়ে ফিরিয়া যে মহাপ্রভু অম্বিকায় গিয়াছিলেন 'মুরলী-বিলাসে'র অস্পষ্ট উল্লেখ ছাড়া তাহার কোনও সমর্থন কোথাও নাই। সুতরাং 'প্রেম-বিলাসা'দির[২৩] উল্লেখ দৃষ্টে দুই প্রভুর বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা এবং ভোজন-বৃত্তান্ত, এই উভয় ঘটনা যে সত্য তাহা হয়ত বলা যাইতে পারে। কিন্তু তাহারা উভয়েই যে ঐককালিক, কিংবা উভয়েই যে গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস-গ্রহণের পরবর্তী-কালে সংঘটিত এইরূপ বলা যায় না। বরঞ্চ সকল প্রাচীন গ্রন্থে মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের পরবর্তী-কালে অম্বিকা-গমনের অনুল্লেখ হইতে ধরিয়া লইতে হয় যে অন্তত ভোজন-বৃত্তান্তটি প্রাক্-সন্ন্যাস যুগীয়।

'ভক্তিরত্নাকরের' উল্লেখ হইতে জানা যায়[২৪] যে একদিন প্রভাতে গৌরীদাস-পণ্ডিত গদাধর পণ্ডিতের নিকট পৌঁছাইয়া গদাধর-শিষ্য হৃদয়ানন্দকে ভিক্ষা করিয়া লন। তাহার পর তিনি হৃদয়কে বাসায় আনিয়া বিদ্যাশিক্ষা দান করেন এবং কিছুদিন পরে তাঁহাকে মন্ত্রদীক্ষা দিয়া পুত্রবৎ পালন করিতে থাকেন। হৃদয়ানন্দও ক্রমে ক্রমে সুশিক্ষিত হইয়া গুরু-গৌরীদাস ও তৎপ্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ-সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। অবশ্য গৌরীদাস কর্তৃক গদাধরের নিকট এই হৃদয়ানন্দ-গ্রহণ ব্যাপারটি যে গদাধরের নীলাচল-গমনের পূর্ববর্তী, তাহাতে সন্দেহ নাই।

মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের পর গৌরীদাস মধ্যে মধ্যে নীলাচলে যাইতেন।[২৫] দেবকী-

(২০) ১২ শ. বি., পৃ. ১৫০ (২১) ৭।৩৬৭ (২২) পৃ. ৪১ ; মুরারি-গুপ্তের কড়চায় (৪।২৬।১০) অনেকটা এই ধরণের কথা বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা ভ্রমাত্মক।—দ্র.—গৌরাঙ্গ-পরিজন (২৩) দ্র.—চৈ. চন্দ্র.—পৃ. ১৬৩ (২৪) ৭।৩৯২ (২৫) শ্রীচৈ. চ.—৩।১।৪ ; চৈ. ম. (লো.)—শে. খ., পৃ. ২১১

নন্দন লিখিয়াছেন[২৬] যে গৌরীদাস-পণ্ডিত 'আচার্য গোসাঞিরে নিল উৎকল নগরী' এবং বৃন্দাবনদাসের 'বৈষ্ণববন্দনায়' গৌরীদাস সম্বন্ধে বলা হইয়াছে[২৭] একবার

প্রভুর আজ্ঞা শিরে ধরি গিয়া শান্তিপুর।
যে লইল উৎকলেতে আচার্য ঠাকুর॥

'অদ্বৈতমঙ্গলে' লিখিত হইয়াছে[২৮] যে অদ্বৈতপ্রভু ক্ষুণ্ণ-মনে শান্তিপুরে গিয়া বেদান্ত-অধ্যাপনায় নিযুক্ত হইলে গৌরাঙ্গ গৌরীদাসকেই পর পর দুইবার শান্তিপুরে পাঠাইয়া অদ্বৈতপ্রভুকে নবদ্বীপে আনিবার চেষ্টা করেন। 'চৈতন্যভাগবতে' এই অধ্যাপনা ও আনুষঙ্গিক বিষয় সবিস্তারে আনুপূর্বিক বর্ণিত হইলেও সেইস্থলে গৌরীদাসের নাম পর্যন্ত নাই। সম্ভবত মহাপ্রভুর নীলাচলাবস্থানকালে গৌরীদাসের দৌত্যকর্মই 'অদ্বৈতমঙ্গলে'র মধ্যে উক্ত প্রকার বর্ণনার রসদ যোগাইয়া থাকিবে[২৯]। যাহাই হউকনা কেন, অদ্বৈতপ্রভুর অভিমান ভঙ্গ করিবার জন্য গৌরীদাস একবার দৌত্যকার্য চালাইয়াছিলেন বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু পরবর্তিকালে মহাপ্রভুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ সংযোগ বা সম্পর্ক সম্বন্ধে আর কিছুই জানিতে পারা যায় না।

'চৈতন্যচরিতামৃত'-কার গৌরীদাসকে নিত্যানন্দ-শাখাভুক্ত করিয়া বলিতেছেন যে 'গৌরীদাস নিত্যানন্দে সমর্পিল জাতিকুল পাঁতি' এবং 'নিত্যানন্দ বংশবিস্তার'-গ্রন্থ অনুযায়ী,[৩০] গৌরীদাস তাঁহার ভ্রাতৃকন্যা বসুধাকে 'বর্ণত্যাগী' নিত্যানন্দের হস্তেই অর্পণ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই ঘটনা-প্রসঙ্গে এবং 'চৈতন্যচরিতামৃতে' রঘুনাথ দাস কর্তৃক দধি-চিড়া-ভোজ বর্ণনার মধ্যে নিত্যানন্দ-ভক্তবৃন্দের সহিত তাঁহার নামোল্লেখ ছাড়া নিত্যানন্দের সহিতও গৌরীদাসের বিশেষ কোন যোগাযোগের কথা কোথাও বর্ণিত হয় নাই। খুব সম্ভবত, তিনিও মহাপ্রভুর প্রাচীন ভক্তবৃন্দের মত একান্তে থাকিয়া নিষ্ঠাসহকারে চৈতন্য-আরাধনায় নিজেকে নিয়োজিত রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

অম্বিকাতেই গৌরীদাসের বিশেষ অধিষ্ঠান হইয়াছিল। শিষ্য-হৃদয়ানন্দও সেইস্থানে থাকিয়া গুরুসেবা ও বিগ্রহপূজা করিতেন। 'ভক্তিরত্নাকরে' বর্ণিত হইয়াছে[৩১] যে একবার 'প্রভুর জন্ম-উৎসব' সময় উপস্থিত হইলে গৌরীদাস হৃদয়ানন্দের উপর বিগ্রহ-সেবার সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া 'শিষ্যগৃহে সামগ্রী আয়োজনে'র জন্য চলিয়া যান। কিন্তু তাঁহার ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হওয়ায় হৃদয়ানন্দ সাতপাঁচ ভাবিয়া উৎসবের আয়োজন শেষ করিয়া মাত্র দুইদিন পূর্বে ভক্তবৃন্দের নিকট নিমন্ত্রণ-পত্রাদি প্রেরণ করেন। এদিকে উৎসবের ঠিক পূর্ব-দিনেই গৌরীদাস ফিরিয়া আসিয়া সমস্ত বিষয় অবগত হইলেন।

(২৬) বৈ.ব. (দে.)—পৃ.৪ (২৭) বৈ. ব. (বৃ.)—পৃ.৪ (২৮) পৃ. ৬০ (২৯) দ্র.—অদ্বৈত-আচার্য। (৩০) পৃ. ৫-৬ (৩১) ৭।৪১০

কিন্তু অন্তরে তুষ্ট হইলেও তিনি তাঁহার অবর্তমানে 'স্বতন্ত্রাচরণে'র জন্য হৃদয়ানন্দকে ভর্ৎসনা করিলেন। হৃদয়ানন্দ তখন মনের দুঃখে গঙ্গাতীরে গিয়া এক বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিলে গৌরীদাস নিজেই উৎসব আরম্ভ করেন।

বড়ু-গঙ্গাদাস নামে গৌরীদাসের আর এক শিষ্য ছিলেন। তিনি ছিলেন সূর্যদাস-পত্নী ভদ্রাবতীর জ্যেষ্ঠা-ভগিনীর পুত্র।[৩২] সেবার সময় উপস্থিত হইলে গৌরীদাসের আজ্ঞাক্রমে তিনি মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে বিগ্রহের সিংহাসন শূন্য রহিয়াছে। তিনি গৌরীদাসকে সেই সংবাদ দিলে গৌরীদাস বেত্রহস্তে গঙ্গাতীরে আসিয়া দেখিলেন যে হৃদয়ানন্দ বিগ্রহকে বক্ষে ধারণ করিয়া অশ্রু-বাষ্পাকুল নেত্রে নৃত্য করিতেছেন। তিনি তখন হৃদয়ানন্দকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং 'হৃদয়-হৃদেই' চৈতন্যের বিলাস জানিয়া তাঁহাকে 'হৃদয়-চৈতন্য' নামে আখ্যাত করিলেন। তারপর তিনি হৃদয়-চৈতন্যকে একেবারে বিগ্রহ-সেবার অধিকারী-পদেই বরণ করিয়া লইলেন।

'অদ্বৈতপ্রকাশ'-মতে[৩৩] অদ্বৈত-তিরোভাবকালে গৌরীদাস শান্তিপুরে তাঁহার নিকট উপস্থিত ছিলেন। এই উক্তি কতদূর সত্য বলা যায় না। তবে অদ্বৈত-তিরোধানকালে যে তিনি জীবিত ছিলেন, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কারণ শ্রীনিবাস-আচার্য তাঁহার প্রথমবার বৃন্দাবন-গমনের পূর্বে যখন শান্তিপুরে আসিয়াছিলেন, তখন অদ্বৈতপ্রভু দেহরক্ষা করিয়াছেন; কিন্তু সেই সময় শ্রীনিবাস খড়দহে আসিয়া গৌরীদাসের সাক্ষাৎপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।[৩৪] সম্ভবত ইহার অল্পকাল পরেই গৌরীদাসের পরলোক-প্রাপ্তি ঘটে। 'মুরলীবিলাসে' বলা হইয়াছে[৩৫] যে বাঘ্নাপাড়াতে বৃন্দাবন হইতে আনীত গোপীনাথ-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠাকালে গৌরীদাস-পণ্ডিত নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু গৌরীদাস যে তখন পরলোকগত হইয়াছেন, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। উক্ত গ্রন্থ-মতে ঐ ঘটনা ঘটিয়াছিল জাহ্নবাদেবীর তিরোধানেরও পরবর্তিকালে। কিন্তু 'ভক্তিরত্নাকর' হইতে জানা যায় যে জাহ্নবাদেবী খেতুরি-উৎসবান্তে বৃন্দাবনে যান এবং খেতুরি-উৎসব যে শ্রীনিবাস-নরোত্তম-শ্যামানন্দের বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনেরও পরে সংঘটিত হইয়াছিল সে বিষয়ে 'প্রেমবিলাস' ও 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থ প্রভৃতি একমত। আবার শ্যামানন্দ বা দুঃখী-কৃষ্ণদাস যে বৃন্দাবন-গমনের পূর্বেই অম্বিকায় হৃদয়-চৈতন্য-ঠাকুরের নিকট দীক্ষালাভ করিয়াছিলেন, সে বিষয়েও উক্ত গ্রন্থকার-গণ দ্বিমত নহেন। অথচ স্পষ্টই জানা যায় যে দুঃখী-কৃষ্ণদাস অম্বিকায় আসিয়া গৌরীদাসের সাক্ষাৎ পান নাই। অবশ্য 'প্রেমবিলাসের' বর্ণনা অনুযায়ী[৩৬] শ্যামানন্দ বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া অম্বিকায় আসিয়া

(৩২) ভ. র.—৭।৪৩৩; ১১।২৬২ (৩৩) ২২শ. অ., পৃ. ১০৩ (৩৪) ভ. র.—৪।৯১ (৩৫) পৃ. ৩৯৮
(৩৬) ১৯শ. বি., পৃ. ৩০১

গৌরীদাস হৃদয়চৈতন্য কৈলা সাষ্টাঙ্গ বন্দন ॥
বৃন্দাবন বিবরণ সব জানাইলা।
শুনি দোঁহার মনে বড় আনন্দ হইলা ॥

বর্ণনা হইতে ধারণা জন্মাইতে পারে যে শ্যামানন্দ বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া গৌরীদাস ও হৃদয়-চৈতন্য উভয়েরই সাক্ষাৎপ্রাপ্ত হন। কিন্তু এই বর্ণনা ভ্রমাত্মক। মুদ্রিত 'প্রেম-বিলাসে'র মধ্যে কখনও কখনও এইরূপ অদ্ভুত বর্ণনা দৃষ্ট হয়। এমন কি কবি কোথাও কোথাও বিগ্রহের মধ্যেও প্রাণ-সঞ্চার করিয়া তাহাদের দ্বারা মানুষের কার্য করাইয়া লইয়াছেন। উপরোক্ত স্থলে সম্ভবত এইরূপ কিছু গোলযোগ ঘটিয়া থাকিবে। কারণ, গ্রন্থের দ্বাদশ-বিলাসে দেখা যায় যে শ্যামানন্দের প্রথমবার অম্বিকা আগমনকালে গৌরীদাস উপস্থিত ছিলেন না। শ্যামানন্দ আসিয়া হৃদয়-চৈতন্যের দ্বারা দীক্ষিত হইয়াছিলেন এবং বেশ কিছুকাল তথায় থাকিয়া গুরুসেবা করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্বনাম ছিল দুঃখী। কিন্তু তাঁহার কৃষ্ণনাম-নিষ্ঠা ও বলবতী শ্রদ্ধা দেখিয়া হৃদয়-চৈতন্য তাঁহাকে দুঃখী- বা দুখিনী-কৃষ্ণদাস নামে অভিহিত করেন। 'প্রেমবিলাসে' এই বিবরণ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে এবং 'ভক্তিরত্নাকরে'ও ঠিক একই বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে।[৩৭] তৎকালে গৌরীদাস জীবিত থাকিলে শ্যামানন্দের দীর্ঘাবস্থানকালে তাঁহাকে নিশ্চয়ই অম্বিকায় দেখা যাইত এবং তাঁহার উপস্থিতিতে শ্যামানন্দকে দীক্ষাদানের ভার হৃদয়-চৈতন্যকে গ্রহণ করিতে হইত না। 'প্রেমবিলাস' হইতে আরও জানা যায় যে শ্যামানন্দ হৃদয়-চৈতন্যের নিকট আদেশ গ্রহণ করিয়া[৩৮] বৃন্দাবনে গমন করিবার পূর্বেই হৃদয়-চৈতন্য তাঁহাকে স্বীয় 'পরমগুরু গৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুর' কর্তৃক বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ও আপনাকে কৃপাদান প্রভৃতি তৎসম্বন্ধীয় উল্লেখযোগ্য বিষয় গল্প করিয়া শুনাইয়াছিলেন। ইহাতেই তৎকালে গৌরীদাসের অবর্তমানতার কথা বিশেষভাবে সমর্থিত হয়। আবার বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া শ্যামানন্দ অম্বিকায় হৃদয়-চৈতন্যের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। সেই ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়া 'ভক্তিরত্নাকর'-প্রণেতা প্রসঙ্গক্রমে গৌরীদাসের পূর্ব বৃত্তান্ত সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন; অথচ তৎকালে গৌরীদাসের বর্তমানতার কোনও নিদর্শন প্রদান করেন নাই। ইহাতেই পূর্ব-সিদ্ধান্ত দৃঢ় হইয়া উঠে।

ইহা ছাড়াও আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিতে পারা যায়। 'ভক্তিরত্নাকর' হইতে জানিতে পারা যায় যে উপরোক্ত ঘটনার কিছুকাল পরেই খেতুরি-উৎসব অনুষ্ঠিত হইলে জাহ্নবাদেবী বৃন্দাবনে গমন করেন। বৃন্দাবনে গিয়া কিন্তু তিনি 'ধীর সমীর' কুঞ্জে গৌরীদাস-পণ্ডিতের সমাধি দর্শন করিয়া অশ্রু সংবরণ করিতে পারেন নাই।[৩৯] বড়ু-

(৩৭) ১।৩৭৪ (৩৮) তু.—শ্যা. বি.—পৃ.১ (৩৯) ১১।২৫৯

গঙ্গাদাস তখন 'পণ্ডিতের অদর্শনে' গুরুর বিরহে উদাসীনভাবে যত্র-তত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন।[৪০] গৌরীদাসের সমাধি-ক্ষেত্রে তাঁহার সহিত জাহ্নবার সাক্ষাৎ ঘটিলে তিনি তাঁহাকে নানাভাবে প্রবোধিত করিলেন এবং এক ভক্ত শ্যামরায়-নামক একটি বিগ্রহ প্রদান করিলে তিনি গঙ্গাদাসকে তৎসেবাধিকারী নির্বাচিত করিয়া গৌড়-প্রত্যাবর্তনকালে তাঁহাকে 'সঙ্গে লৈয়া যাইবেন—তাহা জানাইলা'[৪১] এবং বড়ু-গঙ্গাদাসও তদনুযায়ী গৌড়ে চলিয়া আসেন।[৪২] তারপর জাহ্নবাদেবী গৌড়ে ফিরিয়া খেতুরি হইতে একচক্রা গমন-পথে বুধরিতে পৌছাইলে তিনি সেইস্থানে বংশীদাস-ভ্রাতা শ্যামদাস-চক্রবর্তীর কন্যা হেমলতা দেবীর সহিত পরম-বিরক্ত বড়ু-গঙ্গাদাসের বিবাহ দেন এবং বিবাহান্তে বড়ু-গঙ্গাদাসের হস্তে শ্যামরায়-বিগ্রহের সেবা-অধিকার প্রদান করেন।[৪৩] 'ভক্তিরত্নাকর' হইতে জানা যায় যে শ্রীনিবাস-আচার্য খেতুরি-মহামহোৎসবে যোগদান করিবার জন্য বুধরি পৌছাইলে বুধরির নিকটবর্তী বাহাদুরপুর-নিবাসী 'বিপ্রশ্রেষ্ঠ' শ্যামদাসের ভ্রাতা বংশীদাস-চক্রবর্তী বুধরিতে আসিয়া শ্রীনিবাস-প্রভাবে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার নিকট 'রাধাকৃষ্ণ মন্ত্রদীক্ষা' লাভ করেন এবং খেতুরি-উৎসবে যোগদানের জন্য গুরুর সহিত খেতুরিতে পৌছান। 'প্রেমবিলাসে'র বর্ণনাতেও বংশীদাস ও শ্যামদাসকে খেতুরি-উৎসবে যোগদান করিতে দেখা যায়।[৪৪]

> কর্ণপুর বংশীদাস আর শ্যামদাস।
> বুধইপাড়া হৈতে আইলা শ্রীগোপালদাস॥

'প্রেমবিলাসে'র[৪৫] শ্রীনিবাস-আচার্যের শাখার মধ্যেও দেখা যায়—

> কর্ণপুর কবিরাজ বংশীদাস ঠাকুর।
> আচার্যের শাখা বাড়ী বাহাদুরপুর॥
> বুধইপাড়াতে বাড়ী গোপালদাস ঠাকুর।

বংশীদাস উভয়ত্র কর্ণপূর এবং গোপালদাসের সহিত যুক্ত হওয়ায় তাঁহাকে শ্রীনিবাস-শিষ্য বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়। তাহা হইলে 'প্রেমবিলাসে'র প্রমাণ-বলেও বুঝা যায় যে তাঁহাদের নিবাস ছিল বাহাদুরপুরে।

উপরোক্ত তথ্যাদির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে কেবল জাহ্নবাদেবীর জীবৎকালেই নহে, শ্যামানন্দের অম্বিকা-আগমনের পূর্বেই কোন এক সময়ে ঠাকুর-গৌরাদাস-পণ্ডিত বৃন্দাবনে গিয়া পৌছাইলে সেইস্থানেই তাঁহার দেহান্তর ঘটে এবং বৃন্দাবনের ধীর-সমীর-কুঞ্জে তাঁহাকে সমাহিত করা হয়।

(৪) ন. বি.—৯ম. বি., পৃ. ১৩২ (৪১) ভ. র.—১১।২৭১ ; ন. বি.—৯ম. বি., পৃ. ১৩২ (৪২। ন. বি.—৯ম. বি., পৃ. ১৩৪ (৪৩) ১১।৩৭০-৩৯৬ ; ন. বি.—৯ম. বি., পৃ. ১৩৯ (৪৪) ১৯শ. বি., পৃ. ৩০৮ (৪৫) ২০শ. বি., পৃ. ৩৪৮

জয়ানন্দ 'গৌরীদাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুশ্রেণী' ও 'তাঁহার সঙ্গীত প্রবন্ধে'র কথা বলিয়াছেন।[৪৬] কিন্তু ডা. সুকুমার সেন বলেন, "গৌরীদাস পণ্ডিতের রচিত, একটিমাত্র নিত্যানন্দ বিষয়ক পদ পাওয়া গিয়াছে।"[৪৭] আধুনিক 'বৈষ্ণবদিগদর্শনী' গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে[৪৮] যে গৌরীদাস ধীর-সমীর-কুঞ্জে শ্যামরায়-বিগ্রহ স্থাপন করেন, এবং বড়ু-বলরাম ও রঘুনাথ নামে গৌরীদাস ও তৎপত্নী বিমলাদেবীর দুই-পুত্রের মধ্যে শেষোক্ত রঘুনাথেরও দুইজন পুত্র ছিলেন—মহেশ্বর-পণ্ডিত ও ঠাকুর-গোবিন্দ। গ্রন্থ-মতে 'গৌরীদাসের অপ্রকটে তাঁহার নাতিজামাতা এবং মন্ত্রশিষ্য হৃদয়চৈতন্যঠাকুর (পণ্ডিত গোস্বামী বংশীয়) শ্রীপাটের ভার পান'। এই সমস্ত তথ্য কোথা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে বলা যায় না। হৃদয়-চৈতন্য যে গৌরীদাসের নাতি-জামাতা ছিলেন তাহার উল্লেখ কোনও প্রাচীন-গ্রন্থে নাই। কিন্তু এই উল্লেখ প্রণিধানযোগ্য। অদ্বৈত-শাখা-বর্ণনায় 'চৈতন্যচরিতামৃত'-কার একজন হৃদয়ানন্দ-সেনের উল্লেখ করিয়াছেন এবং মূলস্কন্ধ-শাখা মধ্যেও একজন হৃদয়ানন্দকে পাওয়া যায়। ইঁহারা এক ব্যক্তি কিনা বিশেষভাবেই বিচার্য হইয়া উঠে। মূলস্কন্ধ-শাখার বর্ণনা এইরূপ :

শ্রীনাথ মিশ্র শুভানন্দ শ্রীরাম ঈশান।
শ্রীনিধি মিশ্র গোপীকান্ত মিশ্র ভগবান॥
সুবুদ্ধি মিশ্র হৃদয়ানন্দ কমল নয়ন।
মহেশ পণ্ডিত শ্রীকর শ্রীমধুসূদন॥

অদ্বৈত-শাখার বর্ণনা কিন্তু নিম্নোক্তরূপ :

জগনাথ কর আর কর ভবনাথ।
হৃদয়ানন্দ সেন আর দাস ভোলানাথ॥

'ভক্তিরত্নাকরে'ও একজন হৃদয়ানন্দ-সেনকে পাওয়া যায়। গদাধরদাসের তিরোধান-তিথি-উৎসবে যাঁহারা রঘুনন্দনপ্রভুর সহিত আসিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন—

শ্রীহৃদয়ানন্দ সেন গুণের আলয়॥
লোকনাথ পণ্ডিত শ্রীপণ্ডিত মুরারি।

আবার এই গ্রন্থে সপার্ষদ গৌরাঙ্গ-বর্ণনার মধ্যেও একজন হৃদয়ানন্দকে দেখা যায়[৪৯]—

জয় শ্রীসুবুদ্ধি মিশ্র, গোপীকান্ত ভগবান।
জয় শ্রীহৃদয়ানন্দ কমল নয়ন॥
জয় জগন্নাথ সেন শ্রীমধুসূদন।
জয় সেন চিরঞ্জীব শ্রীরঘুনন্দন॥

এই উল্লেখগুলি হইতে হৃদয়ানন্দ এবং অব্রাহ্মণ হৃদয়ানন্দ-সেন এক, কিংবা ভিন্ন ব্যক্তি,

(৪৬) পৃ. ৩ (৪৭) বা. সা. ই.—(১ম. সং.) (৪৮) পৃ. ৯১ (৪৯) ভ. র.—২।১৩-১৪

নিম্নোক্ত আলোচনায় তাহা স্পষ্টীকৃত হইবে। তবে প্রথম ও শেষোক্ত হৃদয়ানন্দ যে এক ব্যক্তি, তাহা সহজেই অনুমিত হয়। উল্লেখযোগ্য যে, উভয়ত্রই হৃদয়ানন্দের পূর্বে সুবুদ্ধি-মিশ্রের এবং পরে কমল-নয়নের নাম উল্লেখিত হইয়াছে। কমলাক্ষ-নামধারী ব্যক্তির অভাব না থাকিলেও একই ব্যক্তির কমল-নয়ন নাম কোথাও দেখা যায় না। সুতরাং উক্ত কমল-নয়ন যে কমল এবং নয়ন নামক দুই পৃথক ব্যক্তি তাহাতে সন্দেহ থাকে না। বৈষ্ণব-সাহিত্যেকমলানন্দ এবং নয়নানন্দ নামক দুই ব্যক্তিকে দেখা যায়। কমলানন্দ সম্বন্ধে 'চৈতন্য-চরিতামৃত'-কার নীলাচল-বাসী চৈতন্য-ভক্তবৃন্দের বর্ণনায় জানাইতেছেন[৫০] যে 'গৌড়ে পূর্ব ভৃত্য প্রভুর প্রিয় কমলানন্দ', এবং 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক' ও 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়-কৌমুদী'তেও[৫১] দেখা যায় যে গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দের সহিত কমলানন্দ প্রথমবারেই নীলাচলে গিয়াছিলেন। আর নয়নানন্দ সম্বন্ধে জানা যায় যে নয়নানন্দ-মিশ্র গদাধর-পণ্ডিতের ভ্রাতা বাণীনাথ-মিশ্রের পুত্র ছিলেন।[৫২] 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র গদাধর-শাখা-বর্ণনার মধ্যে তাঁহাকে নয়ন-মিশ্র বলা হইয়াছে। এই সকল বিবরণ এইতে একটি ধারণা প্রায় অনিবার্য হইয়া পড়ে যে শ্রীনাথ-মিশ্র, শ্রীনিধি-মিশ্র, গোপীকান্ত-মিশ্র ও সুবুদ্ধি-মিশ্রের নামোল্লেখের অব্যবহিত পরেই উল্লেখিত হৃদয়ানন্দ কমল-নয়ন নিশ্চয়ই যথাক্রমে হৃদয়ানন্দ-মিশ্র, কমলানন্দ-মিশ্র ও নয়ন-মিশ্র বা নয়নানন্দ-মিশ্র হইবেন। জয়ানন্দ জানাইয়াছেন[৫৩] যে তাঁহাব পিতার নাম সুবুদ্ধি-মিশ্র, তিনি বাণীনাথের সহিত সম্পর্কযুক্ত; এবং সেই বাণীনাথের পুত্রের নাম ছিল মহানন্দ ও ইন্দ্রিয়ানন্দ। আবার গদাধর-ভ্রাতা বাণীনাথের পুত্রের নামও নয়নানন্দ হওয়ায় ইঁহাদিগকেও পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত মনে হয়। 'চৈতন্যমঙ্গলে'র মধ্যে জয়ানন্দ বোধ করি গদাধর-পণ্ডিতের প্রতি সর্বাধিক আনুগত্য প্রদর্শন করিয়াছেন। এমন কি তিনি জানাইয়াছেন:

গদাধর পণ্ডিতের আজ্ঞা শিরে ধরি।
শ্রীচৈতন্য মঙ্গল কিছু গীত প্রচারি॥

সুতরাং জয়ানন্দকেও গদাধর-পণ্ডিতের সহিত সম্পর্কিত ধরিয়া লইতে হয়। হৃদয়ানন্দ, কমলানন্দ, নয়নানন্দ, মহানন্দ, ইন্দ্রিয়ানন্দ ও জয়ানন্দ—ইঁহারা যে একই পরিবারভুক্ত হইবেন এবং তাহা যে গৌরাঙ্গলীলা-সহচর গদাধর-মিশ্র (মাধব-মিশ্রের পুত্র), বাণীনাথ-মিশ্র ও সুবুদ্ধি-মিশ্রের পরিবার, তাহাই প্রতীয়মান হয়। এক্ষেত্রে, উপরোক্ত হৃদয়ানন্দ-মিশ্রই যে নয়নানন্দ-মিশ্রের মত প্রথমে গদাধরের অনুগামী হইয়াছিলেন, এবং পরে গৌরীদাস-পণ্ডিতের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া হৃদয়-চৈতন্য নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন,

(৫০) ১।১০, পৃ. ৫৪ (৫১) পৃ. ২৫০ (৫২) দ্র.—গদাধর-পণ্ডিত (৫৩) দ্র.—জয়ানন্দ

তাহাতে সন্দেহ থাকে না। 'নরোত্তমবিলাসে'র লেখক বলিতেছেন[৫৪] যে 'গৌরীদাস গদাধরের বান্ধব' ছিলেন। এই আত্মীয়তার সম্বন্ধে কোনও সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। যদি হৃদয়-চৈতন্যের সূত্রে তাহা ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে পণ্ডিত-গোস্বামী-বংশীয় হৃদয়-চৈতন্য-ঠাকুর যে গৌরীদাসের 'নাতি জামাতা' ছিলেন—'বৈষ্ণবদিগ্‌দর্শনী'-প্রদত্ত এই সংবাদকে সত্যসম্বন্ধযুক্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। সম্ভবত এই কারণেই (হয়ত হৃদয়ানন্দ পরে 'নাতি জামাতা' হন) গৌরীদাস-পণ্ডিতও গদাধরের সম্মতি গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে আনিয়া দীক্ষাদান করেন এবং তৎপ্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ-সেবার অধিকার হৃদয়-চৈতন্যের উপরই অর্পিত হয়।

এই সকল কারণে হৃদয়-চৈতন্য বৈষ্ণব-সমাজের মধ্যে বেশ সম্মানের আসন প্রাপ্ত হন এবং শ্যামানন্দের মত শিষ্য প্রাপ্ত হওয়ায় তাঁহার গৌরব অধিকতর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। 'শ্যামানন্দপ্রকাশ' কিংবা 'শ্যামানন্দবিলাস' নামক অকিঞ্চিৎকর গ্রন্থ মধ্যে লিখিত হইয়াছে যে দুঃখী-কৃষ্ণদাস বৃন্দাবনে গিয়া স্বীয় পরিচয় পরিবর্তন করায় এবং নূতনভাবে তিলক-চিহ্নাদি গ্রহণ করিয়া শ্যামানন্দ নাম গ্রহণ করায় হৃদয়ানন্দ তাঁহাকে জীব-গোস্বামীর নিকট পুনর্দীক্ষিত মনে করিয়া বিশিষ্ট গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দকে সঙ্গে লইয়া জীব-শ্যামানন্দের সহিত বোঝাপড়া করিবার জন্য বৃন্দাবনে হাজির হইয়াছিলেন এবং সেখানে শ্যামানন্দকে নানাভাবে নিগৃহীত করিবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ-মনোরথ হইলে শেষে পুনরায় তাঁহাদের মধ্যে মিলন ঘটে। গ্রন্থগুলিতে নানাবিধ অবিশ্বাস্য ঘটনার অবতারণা করিয়া এই সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। 'অভিরামলীলামৃত' গ্রন্থেও[৫৫] ইহার সমর্থন আছে; এমন কি এই ব্যাপারে স্বয়ং গৌরীদাসের উপস্থিতি ও হস্তক্ষেপের কথাও উল্লেখিত হইয়াছে। তৎকালে গৌরীদাসের উপস্থিতির অসম্ভাব্যতার কথা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। আবার 'প্রেমবিলাস', 'ভক্তিরত্নাকর' এবং 'নরোত্তমবিলাসে'র প্রমাণ-বলে শ্যামানন্দের গুরুদ্রোহ কিংবা হৃদয়-চৈতন্যের উক্ত-প্রকার আচরণও যে সম্পূর্ণ ভীত্তিহীন তাহাই বিবেচিত হয়।[৫৬]

শ্যামানন্দ বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে হৃদয়ানন্দ তাঁহাকে আশীর্বাদ করেন এবং শ্যামানন্দ গুরু-আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া উৎকলে চলিয়া যান। ইহার পরে নরোত্তমও নীলাচল-গমনকালে অম্বিকায় হৃদয়ানন্দের আশীর্বাদ গ্রহণ করেন এবং তিনি খেতুরিতে উৎসব আরম্ভ করিলে হৃদয়ানন্দ সেই মহোৎসবে বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন[৫৭] এবং উৎসবান্তে শ্যামানন্দকে শ্রীনিবাস-আচার্যের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন।[৫৮] সম্ভবত তখন

(৫৪) ১ম. বি., পৃ. ২ (৫৫) পৃ. ১২১-২৩ (৫৬) দ্র.—শ্যামানন্দ (৫৭) ভ. র.—১০।৩৮৭; প্রে. বি.—১৯শ. বি., পৃ. ৩০৯; ন. বি.—৬ষ্ঠ. বি., পৃ. ৮১, ৮৬; ৭ম. বি., পৃ. ৯৭; ৮ম. বি., পৃ. ১০৭ (৫৮) ন. বি.—৮ম. বি., পৃ. ১১৩

তিনি বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। 'প্রেমবিলাস' হইতে জানা যায় যে ইহার কিছুকাল পরে আরও একবার খেতুরি-মহোৎসব উপলক্ষে এক বৈষ্ণব 'মহাসভার' অধিবেশন হইয়াছিল। হৃদয়ানন্দ তাহাতেও উপস্থিত হইতে পারিয়াছিলেন।[৫৯] আবার 'রসিকমঙ্গল'-গ্রন্থ হইতে জানা যায়[৬০] যে শ্যামানন্দের আমন্ত্রণক্রমে তিনি দুইবার উড়িষ্যার ধারেন্দা-বাহাদুরপুরে গমন করেন এবং দ্বিতীয়বারে তিনি গিয়া মহারাস-যাত্রায় বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

'পাটনির্ণয়'-গ্রন্থে অম্বুয়া মুলুকেই হৃদয়-চৈতন্যদাসের পাট নির্ণীত হইয়াছে। 'ভক্তিরত্নাকর' হইতে জানা যায় যে তাঁহার এক শিষ্যের নাম ছিল গোপীরমণ। তিনি খেতুরির মহামহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন[৬১] এবং তাহার পরে খেতুরিতে যেইবার বীরচন্দ্র নৃত্য করিয়াছিলেন তিনি সেইবারও তথায় উপস্থিত ছিলেন।[৬২] বোরাকুলির মহামহোৎসবেও তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়।[৬৩] আবার নরোত্তম-শিষ্যবৃন্দের মধ্যে একজন গোপীরমণ-চক্রবর্তীর নাম দৃষ্ট হয়।[৬৪] তিনি সম্ভবত 'নৃত্যগীত প্রিয়' ছিলেন।[৬৫] শ্রীনিবাস-আচার্যের শিষ্য-বর্ণনার মধ্যেও একজন গোপীরমণ-কবিরাজ[৬৬] বা গোপীরমণদাস-বৈদ্যের[৬৭] নাম উল্লেখিত হইয়াছে। সম্ভবত ইতি খেতুরি-মহামহোৎসবে যোগদান করেন।[৬৮] ইঁহার নিবাস মির্জাপুর এবং ইঁহার শিষ্য শ্যামদাস ছিলেন খড়গ্রামবাসী।[৬৯]

---

(৫৯) প্রে. বি.—১৯শ. বি., পৃ. ৩৩৭ (৬০) পৃ. ৮৯, ১০৭ (৬১) ন. বি.—৬ষ্ঠ. বি., পৃ. ৮৭ ; ৮ম. বি., পৃ. ১১৮ (৬২) ন. বি.—১১শ. বি., পৃ. ১৭৭ (৬৩) ভ. র.—১৪।৯৭ (৬৪) ন. বি.—১২শ. বি., পৃ. ১৮৯ ; প্রে. বি.,—২০শ. বি., পৃ. ৩৫১ ; দ্র. নরোত্তম (৬৫) গৌ. ত.—পৃ. ৩২১ (৬৬) কর্ণ.—৬ষ্ঠ. নি., পৃ. ১১৯ ; অ. ব.—৭ম. ম., পৃ. ৪৫ (৬৭) কর্ণ.—১ম. নি., পৃ. ১৪ (৬৮) ন. বি.—৮ম. বি., পৃ. ১১৮ (৬৯) কর্ণ.—১ম. নি., পৃ. ১১

উদ্ধারণ-দত্ত

বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত' হইতে জানা যায়[১] যে মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে গৌড়ে প্রেরণ করিলে তিনি পাণিহাটী অঞ্চলে কয়েক মাস থাকিবার পর সপ্তগ্রামের উদ্ধারণ-দত্তের গৃহে কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। এই উদ্ধারণ সম্বন্ধে প্রাচীন ও প্রামাণিক গ্রন্থগুলিতে যে তথ্য প্রদত্ত হইয়াছে তাহা যৎসামান্য। অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের বৈষ্ণবগ্রন্থগুলিতে অবশ্য কিছু তথ্য আছে এবং আধুনিক গ্রন্থকার-গণও কিছু সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছেন। এইগুলি হইতে প্রকৃত সত্য বাহির করা দুঃসাধ্য। আধুনিক 'বৈষ্ণবদিগ্‌দর্শনী'-গ্রন্থে উদ্ধারণের পূর্বপুরুষদিগের সম্বন্ধে নানাবিধ সংবাদ আছে।[২] গ্রন্থ-মতে উদ্ধারণের "পিতা শ্রীকর দত্ত, মাতা ভদ্রাবতী, জাতি সুবর্ণবণিক।......নৈহাটির সন্নিকটে দত্ত ঠাকুরের বাসস্থান 'উদ্ধারণপুর' নামে পল্লী আছে।" বিবরণগুলি কোথা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে বলা হয় নাই। কিন্তু সপ্তগ্রামে বাসস্থান হইলেও সম্ভবত উদ্ধারণের জন্মস্থান ছিল শান্তিপুরে। ১৩১৬ সালের 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'য় শিবচন্দ্র শীল মহাশয় 'শ্রীচৈতন্য পরিষদ জন্মস্থান নিরূপণ' নামক যে প্রাচীন পুথিটির উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে লিখিত আছে ঃ

> শান্তিপুরে জনমিলা রায় মুকুন্দ।
> উদ্ধ (া) রণ দত্ত আর জন্ম কৃষ্ণানন্দ॥ •

আবার ১৩৩৪ সালের 'গৌরাঙ্গ সেবক'-পত্রিকার ফাল্গুন সংখ্যায় অমূল্যধন রায়ভট্ট মহাশয়ও জানাইয়াছেন, "পূর্বে নৈরাজা নামক জনৈক রাজা এস্থানে (নৈহাটী বা নৈটিতে) থাকিতেন, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রিয় ভক্ত ঠাকুর উদ্ধারণ-দত্ত ঐ রাজার দেওয়ান ছিলেন।" রায়ভট্ট মহাশয়ও এই সংবাদগুলির উৎস সম্বন্ধে কিছুই জানান নাই। তবে উদ্ধারণ সম্বন্ধে 'বংশী-শিক্ষা' গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে[৩] ঃ

> উদ্ধারণ দত্ত বন্দ বসুদাম খ্যাতি।
> রাজকোপে বঙ্গদেশী বৈশ্য বেণেগণ।
> অধম জাতির মধ্যে হইল গণন॥
> সেই বৈশ্য বেণেকুল উদ্ধার কারণ।
> সেই কুলে বসুদাম লয়েন জনম॥

(১) ৩।৫, পৃ. ৩০৮-৯ (২) বৈ. দি-মতে (পৃ. ২,১৬) উদ্ধারণের পূর্বপুরুষ ভবেশ-দত্ত অযোধ্যা হইতে বাণিজ্যার্থ বঙ্গদেশে ব্রহ্মপুত্র-তীরে সুবর্ণগ্রামে আসিয়া বাস করেন এবং তথায় কাম্পিলাল-ধরের ভগিনী ভাগ্যবতীকে বিবাহ করেন। কাম্পিলালের পুত্রই লক্ষণ-সেনের সভাপতি উমাপতি-ধর। (৩) পৃ. ৮০

কিন্তু নিত্যানন্দের সহিত উদ্ধারণের ইতিপূর্বে কোনও পরিচয় ঘটিয়াছিল কি না, সঠিকভাবে বলিতে পারা যায় না। 'নিত্যানন্দবংশবিস্তার', 'মুরলীবিলাস', দেবকীনন্দনের 'বৈষ্ণব বন্দনা' ও রামাই-রচিত 'চৈতন্যগণোদ্দেশদীপিকা'তে লিখিত হইয়াছে[৪] যে নিত্যানন্দের তীর্থ-পর্যটনকালে উদ্ধারণ-দত্ত তাঁহার সঙ্গী-হিসাবে সর্বতীর্থ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু নিত্যানন্দের তীর্থ-পরিভ্রমণ সম্ভবত নবদ্বীপে তাঁহার প্রথম আগমনেরও পূর্ববর্তী ঘটনা। সুতরাং উক্ত গ্রন্থগুলির বর্ণনা সত্য হইলে বলিতে হয় যে নিত্যানন্দের সহিত পূর্বেই তাঁহার পরিচয় ঘটিয়াছিল। আবার গ্রন্থ-ত্রয়ের প্রথমটিতে দেখা যায়[৫] যে সপ্তগ্রাম হইতে নিত্যানন্দের সূর্যদাস গৃহ-গমনের অব্যবহিত পরেই বিপ্রগণ তাঁহাকে 'স্বপাক' রন্ধন সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে

প্রভু কহে কখন বা আমি পাক করি।
না পারিলে উদ্ধারণ রাখয়ে উতারি॥

ইহা হইতেও উদ্ধারণের সহিত নিত্যানন্দের পূর্ব-সম্বন্ধের কথা সূচিত হইতে পারে। 'ভক্তি-রত্নাকর'-প্রণেতা অবশ্য নিত্যানন্দের তীর্থ-ভ্রমণের ব্যাখ্যা দিয়াছেন[৬] :

গৌড়ভূমে যত তীর্থ কে করু গণন।
প্রভু সঙ্গে সর্ব তীর্থ ভ্রমে উদ্ধারণ॥

কিন্তু 'মুরলীবিলাসে'র উল্লেখে দেখা যায় যে জাহ্নবাদেবী বৃন্দাবন গমন করিতে চাহিলে নিত্যানন্দের সহিত সর্বতীর্থ-ভ্রমণকারী উদ্ধারণের সাহায্য-গ্রহণের কথা উঠিয়াছিল। সুতরাং 'ভক্তিরত্নাকরে'র ব্যাখ্যা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না।

যাহা হউক, নিত্যানন্দ সপ্তগ্রামে আসিয়া উদ্ধারণকে আত্মসাৎ করিলেন এবং তাঁহার সাহায্যে সপ্তগ্রাম ত্রিবেণীর বণিক-কুল মধ্যে ধর্ম-প্রচার করিলেন। 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র নিত্যানন্দ-শাখা-বর্ণনায় উদ্ধারণের নাম পাওয়া যায়। সম্ভবত উপরোক্ত সময়েই তিনি নিত্যানন্দ কর্তৃক দীক্ষিত হইয়াছিলেন এবং কিছুদিন যাবৎ নিত্যানন্দকে স্বগৃহে রাখিয়া[৭] তাঁহার নৃত্য-সংকীর্তনাদির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। কিছুকাল পরে নিত্যানন্দ সপ্তগ্রাম হইতে সূর্যদাস-পণ্ডিতের গৃহে গিয়া পৌছান এবং সূর্যদাস-দুহিতার সহিত তাঁহার বিবাহ ঘটে। সেই সময়ে উদ্ধারণও নিত্যানন্দের ঘনিষ্ঠ সহচর হিসাবে তাঁহার সহিত গিয়া সেই বিবাহের একজন প্রধান উদ্যোক্তা-হিসাবে অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন।[৮]

উদ্ধারণ সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু জানা যায় না। কেবল 'চৈতন্যচরিতামৃত'-কার

(৪) নি. বি.—পৃ. ৪৫ ; মু. বি.—পৃ. ২৫৪ ; বৈ. ব. (দে.)—পৃ. ৪. ; চৈ. দী. (রামাই)—পৃ. ৫ (৫) পৃ. ৮(৬) ৮।১৮৬ (৭) শ্রীচৈ. চ.—৪।২২।২২ (৮) অ. প্র.-২০শ. অ., পৃ ৮৮-৯১ ; নি. বি.—পৃ. ৫, ৮ ; প্রে. বি.—২৪শ বি., পৃ. ২৪৯ ; অ, বি.—পৃ. ২

সংবাদ দিতেছেন যে রঘুনাথদাস কর্তৃক চিড়াদধি-মহোৎসব অনুষ্ঠানের সময় উদ্ধারণ নিত্যানন্দ সঙ্গী-বৃন্দের সহিত তথায় উপস্থিত ছিলেন। 'মুরলী বিলাস-মতে[৯] তাহারও বহুকাল পরে জাহ্নবাদেবীর বৃন্দাবন-গমনকালে উদ্ধারণ-দত্ত তাঁহার তত্ত্বাবধায়করূপে বৃন্দাবনে গমন করেন। কিন্তু এই ঘটনা কতদূর সত্য, তাহা বলা যায় না। কারণ, গ্রন্থকার বলেন যে সেইবার জাহ্নবা বৃন্দাবনে গিয়া দেহরক্ষা করিয়াছিলেন। অথচ 'ভক্তিরত্নাকরে' বলা হইয়াছে[১০] যে একবার জাহ্নবাদেবী বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া খড়দহ গমনের পথে উদ্ধারণ-দত্তের গৃহে আসিয়া পরলোকগত উদ্ধারণের জন্য অশ্রুবর্ষণ করিয়াছিলেন। এমন কি, গ্রন্থকার বলেন[১১] যে তাহারও পূর্বে নরোত্তম নীলাচল-গমনের প্রাক্কালে সপ্তগ্রামে আসিয়া তাঁহার সাক্ষাৎ পান নাই; তাহার কিছু পূর্বেই তিনি দেহত্যাগ করিয়াছিলেন।

'বৈষ্ণবদিগ্‌দর্শনীতে' বলা হইতেছে,[১২] "উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর ৪৮ বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করিয়া শ্রীনীলাচল যাত্রা করেন এবং তথায় ৬ বৎসর অবস্থান করিয়া শেষ জীবন শ্রীবৃন্দাবনে অতিবাহিত করেন।" এবং "৬ বৎসর বৃন্দাবনে বাস করিয়া উদ্ধারণ দত্ত বংশীবটের নিকট দেহরক্ষা করেন।" অথচ আর একটি আধুনিক গ্রন্থ 'বৈষ্ণবাচার দর্পণ" মতে[১৩] উদ্ধারণ দত্ত

অবশেষে প্রভুর আজ্ঞায় বাস কৈল।
গঙ্গা-পশ্চিম তীরে স্বনামে খ্যাত হৈল॥

প্রথমোক্ত গ্রন্থের উল্লেখগুলি সম্ভবত অকিঞ্চিৎকর।

উদ্ধারণ-দত্ত দ্বাদশ-গোপালের অন্যতম গোপাল বলিয়া বৈষ্ণব-সমাজে স্বীকৃতি-প্রাপ্ত হইয়াছেন। 'পাটপর্যটনে' উল্লেখিত আছে[১৪] যে তিনি হুগলীর নিকট কৃষ্ণপুরে বাস করিতেন।

---

(৯) পৃ. ২৫৪-৩১৯ (১০) —১১।৭৭০-৭৮ (১১) ঐ—৮।২০০-২০২ (১২) পৃ. ৭২, ৮৬ (১৩) পৃ. ৩৩৫ (১৪) পৃ, ১০৮

মহেশ-পণ্ডিত

বৈষ্ণব গ্রন্থগুলির বহু স্থলে ধনঞ্জয়-পণ্ডিত ও মহেশ-পণ্ডিতের নাম একত্রে উল্লেখিত হইলেও সম্ভবত তাঁহাদের মধ্যে কোনও বিশেষ সম্বন্ধ ছিল না। তবে 'চৈতন্যভাগবত', 'চৈতন্যচরিতামৃত' ও জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' হইতে জানা যায়[১] যে তাঁহারা উভয়েই নিত্যানন্দ-শিষ্য ছিলেন। আবার 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র মূলস্কন্ধ-শাখা মধ্যেও মহেশ-পণ্ডিতের নাম পাওয়া যায়, এবং 'প্রেমবিলাসে' বলা হইয়াছে[২] যে শ্রীনিবাস-আচার্যের বাল্যগুরু ছিলেন একজন ধনঞ্জয়। গ্রন্থকার তাঁহাকে ধনঞ্জয়-বিদ্যানিবাস বলিয়াছেন। 'ভক্তিরত্নাকর'-মতে তিনি ধনঞ্জয়-বিদ্যাবাচস্পতি। সুতরাং স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে তিনি আলোচ্য ধনঞ্জয় নহেন। আলোচ্য ধনঞ্জয়-পণ্ডিত শ্রীনিবাসের গুরু ছিলেন না; 'গৌরাঙ্গবিজয়ে'র বর্ণনা হইতে[৪] প্রতীতি জন্মায় যে তিনি ছিলেন গ্রন্থকার-চূড়ামণিরই গুরু বা মন্ত্রগুরু।

মহেশ-পণ্ডিত 'ঢক্কাবাদ্যে নৃত্য' করিতেন[৫] এবং 'ধনঞ্জয় মৃদঙ্গ বায়ন' ছিলেন।[৬] 'চৈতন্যগণোদ্দেশ' এবং বৃন্দাবনদাসের 'বৈষ্ণববন্দনা'য় লিখিত হইয়াছে[৭] যে ধনঞ্জয় 'সকল প্রভুরে দিয়া ভাণ্ড হাতে লই'য়া 'কৌপিন পরিয়া' পথে বাহির হইয়াছিলেন।

'চৈতন্যচরিতামৃত'কার বলেন যে নিত্যানন্দাজ্ঞায় রঘুনাথদাসের ' চিড়াদধি-ভোজ-দানকালে মহেশ ও ধনঞ্জয় উভয়েই উপস্থিত ছিলেন। নরহরি-চক্রবর্তী সংবাদ দিতেছেন[৮] যে প্রথমবার বৃন্দাবন-গমনের পূর্বে শ্রীনিবাস-আচার্যের খড়দহ আগমন-কালে এবং নীলাচল যাত্রার প্রাক্কালে নরোত্তম যখন খড়দহে পৌঁছান তখন মহেশ তথায় উপস্থিত ছিলেন।

পরবর্তীকালের গ্রন্থগুলিতে[৯] ছাঁচড়া-পাঁচড়া, বা সাঁচড়া-পাঁচড়া বা কাঁচড়াপাড়া এবং শীতল বা করঞ্জ-সিতল-গ্রামে ধনঞ্জয়ের, এবং সরডাঙ্গা বা সুরডাঙ্গা-সুলতানপুরে মহেশ-পণ্ডিতের পাট নির্ণীত হইয়াছে। কোথাও বা ধনঞ্জয়কে জাডগ্রামে এবং মহেশকে

(১) চৈ. ভা.—৩।৬, পৃ. ৩১৬-১৭ ; চৈ. চ.—১।১১, পৃ. ৫৫ ; চৈ. ম. (জ.)—বি. খ., পৃ. ১৪৪ (২) ৩য়. বি., পৃ. ২৫ (৩) ২।১৮৬ (৪) পৃ. ১২, ১৪৮ (৫) চৈ. চ.—১।১১, পৃ. ৫৫ (৬) গৌ. ত.—পৃ.২৮১ (৭) পৃ. ১১ ; পৃ. ৫ (৮) ভ. র.—৪।৯১, ৮।২২০ ; ন.বি. —৩য়. বি.,পৃ. ৪৩-৪৪ (৯) ব. শি.—পৃ. ৮১ ; চৈ. স.—পৃ. ১২ ; অ. লী.—পরিশিষ্ট ; পা. প.—পৃ, ১০৮ ; পা. নি. (পা. বা.)—পৃ. ২ ; পা. নি. (ক. বি.)—পৃ. ৩

বরাহনগরে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। কোন-কোন গ্রন্থে আবার মহেশ-পণ্ডিতের পাট পালপাড়ায় বলা হইয়াছে। গ্রন্থকার-গণ উভয়কেই দ্বাদশ-গোপালের তালিকাভুক্ত করিয়াছেন।

ধনঞ্জয় এবং মহেশ-পণ্ডিত সম্বন্ধে 'বৈষ্ণবদিগ্‌দর্শনী'-গ্রন্থে কিছু তথ্য প্রদত্ত হইয়াছে।[১০] কিন্তু গ্রন্থকার ঐ সকল বিবরণের উৎস কি তাহা বলেন নাই।

(১০) গ্রন্থ-মতে (পৃ. ১৮, ১৯, ২৫) ধনঞ্জয়ের জন্মস্থান চট্টগ্রামের জাডগ্রামে, পিতা শ্রীপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা কালিন্দী, স্ত্রী হরিপ্রিয়া। যৌবনে সংসার ত্যাগ ও মহাপ্রভুর চরণাশ্রয়। বর্ধমানের শীতল-গ্রামে ও সাঁচড়া পাঁচড়া গ্রামে থাকিয়া হরিনাম প্রচার, পরে বৃন্দাবন-যাত্রা ও প্রত্যাবর্তন করিয়া বোলপুর ষ্টেশনের ৪।৫ ক্রোশ পূর্বে জলন্দী গ্রামে বিগ্রহ-সেবা করিয়া পুনরায় শীতল গ্রামে গৌরাঙ্গ সেবা প্রকাশ। এই স্থানেই লীলাবসান, সমাধি আছে।

এই গ্রন্থে মহেশ-পণ্ডিত সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে তাঁহার জন্মস্থান ও পূর্বাস শ্রীহট্টে ; পিতা রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ (বন্দ্যোপাধ্যায়) কমলাক্ষ, মাতা ভাগ্যবতী, মহাপ্রভু সন্ন্যাস-গ্রহণের পর শান্তিপুরে অদ্বৈতালয় হইতে নিত্যানন্দসহ যশড়ায় জগদীশালয়ে আসিলে নিতাই জগদীশকে দীক্ষা দিয়া স্বীয় পার্ষদভুক্ত করেন। নিত্যানন্দের খড়দহ-পাট স্থাপনের পর মহেশ যশড়ার নিকট গঙ্গাতীরে মসিপুরে পাটস্থাপন করেন।

জগদীশ-পণ্ডিত

৪১১ গৌরাব্দের 'বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকার' আষাঢ় সংখ্যায় অচ্যুতচরণ দাসচৌধুরী মহাশয় 'জগদীশ চরিত্র বিজয়'-নামক গ্রন্থ হইতে কিছু বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই বিবরণের সহিত কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় সংরক্ষিত 'জগদীশ চরিত' নামক গ্রন্থোক্ত বিবরণের যৎসামান্য পার্থক্য থাকিলেও বিষয়বস্তু ও ঘটনাবলী প্রধানত একই প্রকার। শেষোক্ত গ্রন্থের আরম্ভে রচয়িতা আনন্দচন্দ্র দাস (পদকর্তা[১] ?) জানাইতেছেন যে তিনি তাঁহার গুরু ভাগবতানন্দ কর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া গ্রন্থ-রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ভাগবতানন্দের পূর্বনাম শ্রীকৃষ্ণ; শ্রীমূর্তি সম্মুখে তাঁহার ভাগবত-পাঠ শুনিয়া মুগ্ধ গৌর-ভক্তবৃন্দ তাঁহাকে 'ভাগবতানন্দ' উপাধি প্রদান করেন। ভাগবতানন্দ ছিলেন রঘুনাথ-আচার্যের শিষ্য এবং এই রঘুনাথও ছিলেন চৈতন্য-পার্ষৎ খঞ্জ-ভগবানাচার্যের পুত্র ও জগদীশ-পণ্ডিতের মন্ত্রশিষ্য। 'নরোত্তমবিলাস' হইতেও জানা যায় যে[২] খঞ্জ ভগবান-আচার্যের পুত্র রঘুনাথ-আচার্য জগদীশ-পণ্ডিতের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'জগদীশ পণ্ডিতের শাখা বর্ণন' নামক একটি পুথিতেও একই বর্ণনা দৃষ্ট হয়। এই সকল কারণে 'জগদীশ চরিতে'র জগদীশ-রঘুনাথ-ভাগবতানন্দ প্রসঙ্গটির সত্যতাও গ্রহণীয় হইয়া উঠে। ডা. সুকুমার সেন তাঁহার History of Brojabuli Literature-গ্রন্থে[৩] 'অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী' ও 'পদকল্পতরু' হইতে ভাগবতানন্দ-ভণিতার একটি ব্রজবুলি পদের উল্লেখ করিয়া সংযোজনী পরিচ্ছেদের মধ্যে লিখিতেছেন, "This Bhagabatananda was probably the grandson of Bhagaban Acharjya 'the lame' (Khanja) a follower of the Great Master." তাহা হইলে উক্ত ভাগবতানন্দের পদকর্তৃত্বও স্বীকৃত হইয়া উঠে।

'জগদীশচরিত' হইতে জগদীশ-পণ্ডিত সম্বন্ধে অন্য কতকগুলি তথ্য পাওয়া যাইতেছে। জগদীশের পিতার সম্বন্ধে গ্রন্থকার জানাইতেছেন :

পূর্ব দেশস্থিত দ্বিজ কমলাক্ষ নাম।
গয়ঘড় বন্দ্য ভট্ট নারায়ণ সন্তান ॥

কমলাক্ষের স্ত্রীর নাম ভাগ্যবতী। জগদীশ এই কমলাক্ষ-ভাগ্যবতীরই সন্তান। কমলাক্ষের বাসভূমির সমীপবর্তী কোনও স্থানে তপন নামক এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন।

(১) প. ক. (প.)—২৩২ ; HBL—p. 287 (২) ৬ষ্ঠ. বি., পৃ. ৮১ (৩) p.p. 321, 496

তাঁহার একমাত্র কন্যা দুখিনীর সহিত জগদীশের বিবাহ হয়। পিতামাতার মৃত্যুর পর জগদীশ গঙ্গাতীর-বাসাভিলাষী হইয়া স্বীয় পত্নী দুখিনী এবং 'নিজ ভ্রাতা' মহেশকে সঙ্গে লইয়া জগন্নাথ-মিশ্রের গৃহ-সন্নিধানে আসিয়া বাস করিতে থাকেন এবং মিশ্র-পরিবারের সহিত তাঁহাদের বিশেষ প্রীতিসম্বন্ধ গড়িয়া উঠে। হিরণ্য-ভাগবত নামক এক প্রতিবেশীর সহিতও জগদীশের সখ্য ও ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হয় এবং উভয়ে একত্রে সুখে দিন যাপন করিতে থাকেন। এই সময়ে গৌরাঙ্গ-আবির্ভাব ঘটে। কিছুকাল পরে বালক গৌরচন্দ্র একদিন একাদশীর উপবাসী জগদীশ-পণ্ডিত ও হিরণ্য-ভাগবতের বিষ্ণু-নৈবেদ্য ভক্ষণ করেন এবং ক্রমে ক্রমে জগদীশ-পণ্ডিত গৌরাঙ্গের নৈশ-কীর্তন ও কাজী-দলনাদি প্রসিদ্ধ ঘটনাগুলির সহিত যুক্ত হন। গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস-গ্রহণের পূর্বেই জগদীশ সেই সংবাদ শ্রবণ করিয়া বেদনার্ত হইলে সম্ভবত গৌরাঙ্গই তাঁহাকে নীলাচল-গমনের আজ্ঞা প্রদান করেন। তদনুসারে জগদীশ নীলাচলে গমন করেন এবং নীলাচলের বৈকুণ্ঠ নামক স্থান হইতে জগন্নাথ-মূর্তি আনয়ন করিয়া যশড়া নামক স্থানে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। যশড়াতে জগদীশ রাজানুকূল্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং ক্রমে তিনি দুখিনী ও মহেশকেও সেই স্থানে লইয়া যান। তাহারপর' তিনি মহেশের বিবাহ দিলে মহেশ শ্বশুরালয়ে গিয়া বাস করিতে থাকেন। গ্রন্থকার বলেন যে মহাপ্রভু সন্ন্যাস-গ্রহণান্তে শান্তিপুর হইতে যশড়ায় গমন করিয়াছিলেন এবং মাতা-দুখিনীর হস্ত-নির্মিত খাদ্যাদি যাজ্ঞা করিয়া তাঁহাকে তৃপ্তি দান করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু চলিয়া গেলে জগদীশ বাল-গৌর-বিগ্রহ নির্মাণ করাইয়া তাহারও প্রতিষ্ঠা করেন। নির্জন গৃহমধ্যে বালক গৌরাঙ্গ ক্রীড়াচ্ছলে যেমন-ভাবে কর্মরতা মাতা-দুখিনীর সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিতেন, এই মূর্তির ভঙ্গী ছিল সেইরূপ। পরে জগদীশ নীলাচলে গিয়া মহাপ্রভুর দর্শন-লাভ করেন এবং বিদায়কালে মহাপ্রভু রামদাস-গদাধরাদির মত তাঁহাকেও নিত্যানন্দের সঙ্গী হিসাবে গৌড়ে প্রেরণ করেন। সেই সময় খঞ্জ ভগবান-আচার্যও গৌড়ে ফিরিতেছিলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে বলিয়া দেন যে ভগবান বৎসর-মধ্যেই এক পুত্রসন্তান লাভ করিবেন এবং রঘুনাথ নামক সেই পুত্রকে ভগবান যেন জগদীশের হস্তেই অর্পণ করেন,—জগদীশ তাঁহাকে মন্ত্র-দীক্ষা দান করিবেন। ভগবান গৌড়ে প্রত্যাবর্তন করিয়া মহাপ্রভুর আদেশ পালন করিয়াছিলেন এবং রঘুনাথও তদনুযায়ী জগদীশ কর্তৃক পালিত হইয়া তাঁহার নিকট মন্ত্র-দীক্ষা গ্রহণ করেন। পরে জগদীশও একটি পুত্র এবং একটি কন্যাসন্তান লাভ করেন। সম্ভবত সেই পুত্রের নাম ছিল রামভদ্র এবং নিত্যানন্দ-কন্যা গঙ্গাদেবীর পুত্র বল্লভের সহিত জগদীশ তাঁহার কন্যার বিবাহ দেন।

এই বিবরণগুলির বিষয় অন্য কোনও প্রাচীন-গ্রন্থে উল্লেখিত না হইলেও ইহাদের বিরুদ্ধ বর্ণনাও কোথাও দৃষ্ট হয় না। বরং ইহাদের কতকগুলি ঘটনা 'চৈতন্যভাগবত'-

বর্ণিত কয়েকটি ঘটনার সহিত বিশেষভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এমতাবস্থায় গ্রন্থ বর্ণিত সকল ঘটনাকেই একেবারে উড়াইয়া দেওয়া চলে না। একমাত্র জয়ানন্দের একটি সন্দেহজনক তালিকার মধ্যে লিখিত হইয়াছে[৪] যে জগদীশ ও হিরণ্য দুই সহোদর ছিলেন। কিন্তু হিরণ্য যে জগদীশের ভ্রাতা ছিলেন, এরূপ প্রমাণ অন্যত্র নাই। খুব সম্ভবত তাঁহাদের ঘনিষ্ঠতা ও অন্তরঙ্গতার জন্যই জয়ানন্দের গ্রন্থে উক্ত-প্রকার উল্লেখ করা হইয়াছে।

হিরণ্য সম্বন্ধে 'চৈতন্যভাগবতে' বলা হইয়াছে[৫] যে নিত্যানন্দ তাঁহার ধর্মপ্রচারকালে একবার নবদ্বীপবাসী সুব্রাহ্মণ হিরণ্য-পণ্ডিতের গৃহে বিরলে বাস করিয়াছিলেন এবং জগদীশ-পণ্ডিত সম্বন্ধেও একই গ্রন্থের লেখক জানাইতেছেন[৬] যে গৌরাঙ্গ বাল্যকালে একদিন কোনও আহার্য গ্রহণ না করিয়া কাঁদিতে থাকিলে সকলেই তাঁহাকে নানাভাবে উপরোধ করিতে থাকায়

প্রভু বোলে যদি মোর প্রাণ রক্ষা চাহ।
তবে ঝাট দুই ব্রাহ্মণের ঘরে যাহ॥
জগদীশ পণ্ডিত, হিরণ্য ভাগবত।
এই দুই স্থানে আমার আছে অভিমত॥
একাদশী উপবাস আজি সে দোঁহার।
বিষ্ণু লাগি করিয়াছে যত উপহার॥
সে সব নৈবেদ্য যদি খাইবারে পাঙ।
তবে মুই সুস্থ হই হাঁটিয়া বেড়াঙ॥

গৌরাঙ্গের নির্দেশানুযায়ী সেই ব্যবস্থা হইল। জগদীশ-পণ্ডিত ও হিরণ্য-ভাগবত নিজদিগকে কৃতার্থ মনে করিলেন। গ্রন্থ-মধ্যে[৭] জগদীশ-পণ্ডিতকে নিত্যানন্দ-পার্ষৎ বলা হইয়াছে এবং জানান হইয়াছে যে একবার তিনি ও হিরণ্য-ভাগবত চৈতন্য-দর্শনার্থ নীলাচলে যাত্রা করিয়াছিলেন।

'চৈতন্যভাগবত'-কার আরও জানাইয়াছেন[৮] যে গৌরাঙ্গ-আবির্ভাবের পূর্বেই যে-সমস্ত ভক্তের আবির্ভাব ঘটে, তন্মধ্যে ছিলেন 'শ্রীচন্দ্রশেখর গোপীনাথ জগদীশ।' গ্রন্থ-মধ্যে[৯] গৌরাঙ্গের নবদ্বীপ-লীলার সমস্ত প্রসিদ্ধ ঘটনার সহিত গোপীনাথ ও জগদীশের নাম একত্রে উল্লেখিত থাকায় ঐ সমস্ত ক্ষেত্রে সম্ভবত একই জগদীশকে বুঝাইতেছে। নীলাচল হইতে মহাপ্রভুর গৌড়াগমনকালে মহাপ্রভুর দর্শনার্থী উক্ত জগদীশকেই অদ্বৈত-গৃহে উপস্থিত থাকিতে দেখা যায়। কিন্তু কোথাও তাঁহার উপাধির উল্লেখ না থাকায় তিনিই

---

(৪) বি. খ., পৃ. ১৪৫ (৫) ৩।৫, পৃ. ৩১১ (৬) চৈ. ভা.—১।৪. পৃ. ২৬-২৭ (৭) ৩।৬, পৃ. ৩১৬ ; ৩।৯, পৃ. ৩২৭ (৮) ১।২, পৃ. ১২ (৯) ২।৮, পৃ. ১৩৯ ; ২।১৩, পৃ. ১৭৪ ; ২।২৩, পৃ. ২১৭, ২২৫ ; ৩।৪, পৃ. ২৯০

জগদীশ-পণ্ডিত কিনা, সে বিষয়ে সংশয় আসিতেও পারে। 'গৌরপদতরঙ্গিণীতে' একজন সংগীতপটু জগদীশের নাম পাওয়া যায়[১০] এবং 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা' ও তদনুযায়ী 'ভক্তমাল'-গ্রন্থে 'নৃত্যবিনোদী জগদীশ-পণ্ডিতে'র উল্লেখ আছে। আবার গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে অন্যত্র একাদশীর-উপবাসী পূর্বোক্ত জগদীশের এবং হিরণ্যকের নামোল্লেখও করা হইয়াছে।[১১] কিন্তু এই স্থলে একটি জিনিস উল্লেখযোগ্য যে তাঁহাদের বর্ণনায় 'নৃত্যবিনোদী' জগদীশের উপাধিটিও পণ্ডিত। সুতরাং সন্দেহ উপস্থিত হইলে জগদীশ-পণ্ডিত নামক দুই ব্যক্তির বর্তমানতা সম্বন্ধেই সন্দেহ জন্মাইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, 'চৈতন্য-চরিতামৃতে'ও চৈতন্য এবং নিত্যানন্দ, এই দুই শাখাতেই জগদীশ-পণ্ডিতের নাম পাওয়া যায়। চৈতন্য-শাখার জগদীশ-পণ্ডিতের সহিত হিরণ্য-মহাশয়ের নাম এবং নিত্যানন্দ-শাখার জগদীশ-পণ্ডিতের সহিত মহেশ-পণ্ডিতের নাম উল্লেখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে রঘুনাথদাস কর্তৃক গঙ্গাতীরে দধিচিড়া ভোজ-দানকালে উপস্থিত ধনঞ্জয়ের সহিত যে-জগদীশকে পাওয়া যাইতেছে, তিনি যে নিত্যানন্দ-শাখায় বর্ণিত জগদীশ-পণ্ডিত তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যাহাই হউক না কেন, দুই শাখায় বর্ণিত দুইজন জগদীশ-পণ্ডিত যে পৃথক ব্যক্তি, তাহা মনে করিবার কারণ নাই। জগদীশ ছাড়া ধনঞ্জয়-পণ্ডিত প্রভৃতি আরও কয়েকজনের নাম দুইটি শাখাতেই পাওয়া যায়। আর যদি দুইজন জগদীশ-পণ্ডিতের অস্তিত্ব কল্পনা করিতে হয়, তাহা হইলে নবদ্বীপ-লীলার প্রধান ঘটনাগুলির বর্ণনায় বৃন্দাবনদাস গোপীনাথ-পণ্ডিতের সহিত যে উপাধি-বিহীন জগদীশের উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি কোন্ জগদীশ-পণ্ডিত তাহা বিবেচ্য হইয়া উঠে। কিন্তু মুরারি-গুপ্তের একটি বর্ণনা-মধ্যে[১২] গোপীনাথ-পণ্ডিতের প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই জগদীশ-পণ্ডিত এবং হিরণ্য-পণ্ডিতের নাম উল্লেখিত হওয়ায় তাঁহাকে চৈতন্য-শাখার জগদীশ-পণ্ডিত বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। ইহা সত্য হইলে নিত্যানন্দ-শাখার জগদীশ-পণ্ডিতকে এক গঙ্গাতীরস্থ ভোজনকাল ছাড়া অন্য কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু কেবল এই একটিমাত্র ঘটনায় উপস্থিত থাকিবার জন্যই যে একজন ব্যক্তি এমন প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন তাহা অবিশ্বাস্য। সুতরাং একজন জগদীশ-পণ্ডিতের অস্তিত্বই স্বীকার্য হইয়া পড়ে।

(১০) পৃ. ১৫১, ১৬৩ (১১) গৌ. দী.—১৪৩, ১৯২ ; ভ. মা.—পৃ. ২৯, ৩১ (১২) শ্রীচৈ. চ.—৩।১৭।৯-১০

সদাশিব-কবিরাজ

'চৈতন্যভাগবত'কার সংবাদ দিয়াছেন[১] যে গৌরাঙ্গের গয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পর শ্রীমান-পণ্ডিতাদি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে তিনি শ্রীমানকে বলিয়াছিলেন :

কালি সভে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী ঘরে।
তুমি আর সদাশিব চলিবে সত্বরে ॥

শ্রীমান তখন অন্যান্য ভক্তের নিকট আসিয়া জানাইলেন :

শুক্লাম্বর গৃহে কালি মিলিবা সকলে ॥
তুমি আর সদাশিব পণ্ডিত মুরারি।

এই স্থলে সদাশিবের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। পরবর্তী উদ্ধৃতির 'পণ্ডিত'-উপাধিটি কাঁহার সহিত যুক্ত হইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে। পণ্ডিতোপাধিক মুরারির প্রসিদ্ধি থাকায় এবং পণ্ডিত-উপাধিধারী সদাশিবকে মাত্র দুই তিনটি স্থল ছাড়া আর কোথাও না পাওয়ায় উক্ত-স্থলের 'পণ্ডিত'কে মুরারির সহিত যুক্ত ধরিতে হয়। তাছাড়া প্রথম উদ্ধৃতির মধ্যে যখন সদাশিবের কোনও উপাধি লিখিত নাই, তখন পরবর্তী স্থলেও সদাশিবকে উপাধি-বিহীন ধরিয়া লইতে হয়।

কিন্তু এই বিষয়ে আলোচনার পূর্বে সদাশিবের গতিবিধি ও কার্যাদি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা যাইতে পারে। উপরোক্ত ঘটনার পর উক্ত গ্রন্থ-মধ্যে আমরা সদাশিবকে পাইতেছি[২] গৌরাঙ্গের সান্ধ্য-কীর্তন-আসরে এবং জগাই-মাধাই-উদ্ধার ঘটনায়। তাহার পর দেখা যাইতেছে যে চন্দ্রশেখর-ভবনে গৌরাঙ্গের 'গোপিকা নৃত্য'কালে তিনি গৌরাঙ্গ কর্তৃক বুদ্ধিমন্ত-খানের সহিত 'কাচ সজ্জ' করিবার আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই ঘটনার পরে 'চৈতন্যচরিতামৃত'-কার তাঁহার সন্ধান দিয়া বলিতেছেন[৩] যে রঘুনাথদাস কর্তৃক দধি-চিড়া-ভোজ-দানের সময় তিনি গঙ্গাতীরে নিত্যানন্দ-সঙ্গী-বৃন্দের সহিত উপস্থিত ছিলেন। এই সমস্ত স্থলেই কিন্তু সদাশিবের কোনও উপাধি উদ্ধৃত হয় নাই। কবিরাজ-উপাধিযুক্ত একজন সদাশিবকে পাওয়া যায় কেবলমাত্র বৃন্দাবনদাস ও কৃষ্ণদাস-কবিরাজ প্রদত্ত দুইটি নিত্যানন্দ-শিষ্য-তালিকার মধ্যে।[৪] আবার পূর্বে যে সদাশিব-পণ্ডিতের কথা বলা হইয়াছে তাঁহার উল্লেখ পাওয়া যায় 'চৈতন্যভাগবতে'র অন্ত্য-খণ্ডের নবম-পরিচ্ছেদে। গ্রন্থকার বলিতেছেন যে চৈতন্য-দর্শন-প্রার্থী নীলাচলগামী ভক্তবৃন্দের মধ্যে

---

(১) ২।১, পৃ. ৯৪-৯৫ (২) ২।৮, পৃ ১৩৯ ; ২।১৩, পৃ. ১৭৪ ; ২।১৮, পৃ. ১৮৮ (৩) ৩।৬, পৃ. ৩১৬
(৪) চৈ. চ.—১।১১, পৃ. ৫৬ ; চৈ. ভা.—৩।৬ পৃ. ৩১৬

সদাশিব পণ্ডিত চলিলা শুদ্ধমতি।
যাঁর ঘরে পূর্বে নিত্যানন্দের বসতি ॥

তাঁহার দ্বিতীয় উল্লেখ দেখা যায় 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র মূলস্কন্ধ-শাখা-বর্ণন পরিচ্ছেদে :

সদাশিব পণ্ডিত যাঁর প্রভুপদে আশ।
প্রথমেই নিত্যানন্দের যাঁর ঘরে বাস ॥

'মুরারি-গুপ্তের কড়চা'-মধ্যেও দেখা যায়[৫] যে গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দের নীলাচল-গমনকালে একজন সদাশিব-পণ্ডিত যাত্রী হইয়াছিলেন। সুতরাং এই সদাশিব-পণ্ডিতই যে গৌরাঙ্গের পূর্ব-পার্ষৎ ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা হইলে নিত্যানন্দ-শিষ্য-বর্ণনাগুলির মধ্যে যে একজন সদাশিব-কবিরাজের নাম পাওয়া যাইতেছে তাঁহার কার্যাদির পরিচয় কি, বা তিনি কোন্ ঘটনার সহিত যুক্ত হইয়াছিলেন? 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'য়[৬] কিন্তু সদাশিব-কবিরাজকেই তাঁহার বিশেষ অবস্থানের জন্য 'চন্দাবলী'-আখ্যা প্রদান করিয়া তাঁহাকে গৌড়দেশবাসী বলা হইয়াছে। ইহা হইতে তাঁহাকেও গৌরাঙ্গের পূর্ব-পার্ষৎ বলিয়া নির্ণয় করা যাইতে পারে। এই সমস্ত হইতে ধারণা জন্মায় যে সদাশিব-পণ্ডিত বা সদাশিব-কবিরাজ নামক একই ব্যক্তি গৌরাঙ্গের নবদ্বীপ-লীলার বিশেষ সঙ্গী থাকিয়াও পরবর্তী-কালে তাঁহার নীলাচল-গমনের পরে নিত্যানন্দেরই একান্ত অনুরাগী হইয়া পড়েন। 'পাটপর্যটন'- ও 'পাটনির্ণয়'-গ্রন্থে[৮] একমাত্র সদাশিব বা সদাশিব-কবিরাজেরই পাট[৯] বোধখানা-গ্রামে নির্ণীত হইয়াছে।

সদাশিব-কবিরাজের একজন পুত্র ছিলেন। তাঁহার অনেকগুলি নাম পাওয়া যায়—পুরুষোত্তম,[১০] পুরুষোত্তম-দাস,[১১] নাগর-পুরুষোত্তম,[১২] নাগর-পুরুষোত্তমদাস,[১৩] পুরুষোত্তম-ঠাকুর।[১৪] 'চৈতন্যসংগীতা' মধ্যে[১৫] পুরুষোত্তম-কবিরাজ দ্বাদশ গোপালের অন্তর্ভুক্ত এবং

(৫) ৪।১৭।৭ (৬) ১৫৬ ; চৈ.চন্দ্র.-গ্রন্থে (পৃ. ১৭৭) ইহার সমর্থন আছে। (৮) পা.প.—পৃ. ১১০ ; পা. নি (পা. বা.)—পৃ. ১ ; পা. নি. (ক. বি.)—পৃ. ২ (৯) বৈ. দ. (পৃ. ৩৪৩)-মতে তাঁহার 'কুমারহট্টে বাস।' চৈ. চন্দ্র-এর ভূমিকাতেও এই একই মত স্বীকৃত হইয়াছে। বৈ.দি. (পৃ. ২৬)-মতে মহাপ্রভুর প্রিয়-পার্ষৎ সদাশিব-কবিরাজের পাট ছিল কাঞ্চনপল্লীতে। তাঁহার পিতার নাম ছিল কংসারি-সেন। হরিদাস দাস মহাশয় তাঁহায় গৌ.জী.-গ্রন্থে (পৃ. ২১০) তাঁহাকে কংসারি-সেনের পুত্র এবং তাঁহার গৌ.তী.-গ্রন্থে (পৃ. ৮৩) তাঁহাকে যদু-কবিরাজের বংশসম্ভূত বলিয়াছেন। এই গ্রন্থকার-মতে সদাশিব-কবিরাজ ও সদাশিব-পণ্ডিত ভিন্ন ব্যক্তি। (১০) পা. নি. (ক. বি.)-পৃ.২ (১১) চৈ. ভা.—৩।৬, পৃ. ৩১৬ ; চৈ. চ.—১।১১, পৃ. ৫৬ (১২) গৌ. দী.—১৩১ ; ভ. মা.—পৃ. ২৯ ; পা. প.—পৃ. ১০৮ (১৩) পা. প.—পৃ.১১০ (১৪) পা. নি. (পা. বা.)—পৃ. ১ (১৫) পৃ. ১২

সুখসাগরে তাঁহার পাট নির্ণীত হইয়াছে। কিন্তু 'পাটনির্ণয়' গ্রন্থের একস্থলে বলা হইয়াছে[১৬] যে নাগর-পুরুষোত্তমদাসের নিলয় ছিল বনকুড়া বা নখছড়া গ্রামে এবং বংশীশিক্ষা-মতে[১৭] স্তোককৃষ্ণাখ্য পুরুষোত্তম বোধখানাবাসী ছিলেন। 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'য়[১৮] পুরুষোত্তম-দাসকে স্তোককৃষ্ণ আখ্যা দেওয়া হইলেও পরবর্তী শ্লোকেই বৈদ্যবংশোদ্ভব সদাশিবের পুত্র নাগর-পুরুষোত্তমকে দাম নামক গোপ-আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে।

যাহা হউক, পুরুষোত্তম সম্বন্ধে 'চৈতন্যভাগবতে' বলা হইয়াছে[১৯] :

সদাশিব কবিরাজ—মহাভাগ্যবান।
যাঁর পুত্র—শ্রীপুরুষোত্তম দাস নাম ॥
বাহ্য নাহি পুরুষোত্তম দাসের শরীরে।
নিত্যানন্দ চন্দ্র যাঁর হৃদয়ে বিহরে ॥

এবং 'চৈতন্যচরিতামৃত'কার বলিতেছেন[২০] :

শ্রীসদাশিব কবিরাজ বড় মহাশয়।
শ্রীপুরুষোত্তম দাস তাঁহার তনয় ॥
আজন্ম নিমগ্ন নিত্যানন্দের চরণে।
নিরন্তর বাল্যলীলা করে কৃষ্ণ সনে ॥
তাঁর পুত্র মহাশয় শ্রীকানু ঠাকুর।
যার দেহে রহে কৃষ্ণ প্রেমামৃতপুর ॥

গ্রন্থের অদ্বৈতশাখা-বর্ণনার মধ্যে একজন কানু-পণ্ডিতকে পাওয়া যায়, তিনি অদ্বৈত-শিষ্যবৃন্দের সহিত গদাধরদাসের তিরোধান তিথি-মহামহোৎসব ও খেতুরির মহামহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।[২১] কিন্তু তিনি পুরুষোত্তম-পুত্র কানু-ঠাকুর নহেন। বৃন্দাবনদাসের নামে প্রচলিত 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নামক গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে[২২] যে স্তোক-কৃষ্ণস্বরূপ পুরুষোত্তম-ঠাকুরের পুত্র শিশু-কৃষ্ণদাস পরে কানু-ঠাকুর আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বিবরণ অসত্য না হইতেও পারে। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে এই কানু-ঠাকুরের পিতা পুরুষোত্তম-ঠাকুরকে 'চৈতন্যচরিতামৃতো'ক্ত কানু-ঠাকুরের জনক সদাশিব-পুত্র পুরুষোত্তম-দাস বলিয়াই ধরিয়া লওয়া চলে। ডা. সুকুমার সেন লিখিয়াছেন,[২৩] "The poet Kanuram Das or Kauu Das was the son of the poet Purusattam Das and the grandson of Sadasiva Kaviraja"

---

(১৬) পা. নি. (ক. বি.)—পৃ. ৩ (৪৬৪১ নং. পুথি); ঐ—পৃ. ২ (৩৬৪৮ নং. পুথি); রামাই-এর চৈতন্যগণোদ্দেশদীপিকায় (পৃ. ২) বোধখানাই স্বীকৃত হইয়াছে। (১৭) পৃ.৮১ (১৮) ১৩০-৩১ (১৯) ৩।৬, পৃ. ৩১৬ (২০) ১।১১, পৃ. ৫৬ (২১) প্রে. বি.—১৯শ. বি., পৃ.,'৩০৯ ; ভ.র.—৯।৪০৪ ; ১০।৪০৩ ; ন. বি.—৬ষ্ঠ. বি., পৃ. ৮৩ ; ৮ম. বি., পৃ. ১০৭ (২২) পৃ. ১৫৭-৬৮ (২৩) H. B. L.—pp. 84,85

পুরুষোত্তম একজন পদকর্তা ছিলেন। তাঁহার অধিকাংশ পদই ব্রজবুলি-ভাষায় রচিত।[২৪] 'অনুরাগবল্লী'-গ্রন্থে[২৫] তাঁহাকে 'বৈষ্ণববন্দনা'-রচয়িতা দেবকীনন্দনের গুরু বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' গ্রন্থেও তাঁহাকে দেবকীনন্দনের গুরু স্বীকার করিয়া বলা হইতেছে[২৬] যে নিত্যানন্দ সমক্ষে পুরুষোত্তমের "অভিষেক হয় এবং তিনি সাত বৎসর বয়সে কৃষ্ণরূপ ধরিয়া সংকীর্তন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার 'স্তোককৃষ্ণ-স্বরূপ তাহা অনুভবে জানি'। স্বয়ং দেবকীনন্দনও বলিতেছেন [২৭]:

ইষ্টদেব বন্দো শ্রীপুরুষোত্তম নাম।······
সাত বৎসরে যার···শ্রীকৃষ্ণ উন্মাদ॥······
গৌরীদাস কীর্তন্তার কেশেতে ধরিআ।
নিত্যানন্দ স্তব যে করাল্য শক্তি দিআ॥

জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' এবং 'গোবিন্দদাসের কড়চা' মধ্যে সম্ভবত এই 'দেবকীনন্দনে'র নাম উল্লেখিত হইয়াছে।[২৮] সপ্তদশ শতকের প্রথম দশকে লিখিত 'কর্ণানন্দে'র লেখকও দেবকীনন্দনের 'বৈষ্ণববন্দনা'র উল্লেখ করায়[২৯] ষোড়শ শতকের কবি দেবকীনন্দন-রচিত এই গ্রন্থটির প্রামাণিকতা সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকে না। কবির যে পদগুলি প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার অন্তত একটি পদ হইতে জানা যায়[৩০] যে কবির পক্ষে গৌরাঙ্গ-লীলা দর্শন করার সৌভাগ্যও ঘটিয়াছিল। তাঁহার যে পাঁচ-ছয়টি পদ পাওয়া যায়, তন্মধ্যে একটি ব্রজবুলি-ভাষায় রচিত।[৩১]

'বৈষ্ণব ইতিহাস'-নামক গ্রন্থে মধুসূদন অধিকারী মহাশয় জানাইয়াছিলেন, "শ্রীদেবকীনন্দন দাস ব্রাহ্মণ কুমার। বাস হালিসহর। ইনি সদাশিব কবিরাজের পুত্র পুরুষোত্তম দাসের মন্ত্রশিষ্য। নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবদ্বেষী চাপাল গোপালই এই দেবকীনন্দন দাস।" এই উক্তির সহিত পরিচিত থাকিয়া ১৩৩৪ সালের 'সোনার গৌরাঙ্গ'-পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যায় কানুপ্রিয় গোস্বামী মহাশয়ও লিখিয়াছিলেন, "বৈষ্ণব বন্দনার রচয়িতা দেবকীনন্দন দাস ও চাপাল গোপাল অভিন্ন ব্যক্তি।" তিনি বলিতে চাহেন যে নাটশালা-প্রত্যাগত মহাপ্রভু শান্তিপুরে পৌঁছাইয়া যে সকল ব্যক্তিকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, 'চৈতন্যভাগবত'-গ্রন্থে তাঁহাদের বর্ণনা দৃষ্ট হয়, এবং তাঁহাদের একজনের বর্ণনার সহিত 'চৈতন্যচরিতামৃতো'ক্ত চাপাল-গোপালের বর্ণনার সম্পূর্ণ মিল দেখিয়া তাঁহাকে চাপাল-গোপাল বলিয়া সহজেই বুঝিতে পারা যায়। আবার 'চৈতন্যভাগবতে'র এই বর্ণনার সহিত নাকি 'বৈষ্ণববন্দনা'র

(২৪) ঐ (২৫) ৬ষ্ঠ. ম., পৃ. ৪৮ (২৬) পৃ. ১৫৯ (২৭) বৈ. ব. (দে.)—পৃ. ৩-৪ (২৮) বি. ধ., পৃ. ১৪৩; গো. ক.—পৃ. ৮৪ (২৯) প্রে. বি., পৃ. ১০৪ (৩০) গৌ. ত.—পৃ. ১১৫; তু.—গো. ক.—পৃ. ৮৪ (৩১) HBL—p. 48

কবি দেবকীনন্দনের আত্মপরিচয়াত্মক বর্ণনাটি একেবারে মিলিয়া যাওয়ায় সহজেই উপরোক্ত সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। পাটবাড়ীতে রামদাস বাবাজী-সম্পাদিত 'সাধক কণ্ঠমালা' (৫ম. সং.) নামক যে মুদ্রিত গ্রন্থটি রহিয়াছে তাহার মধ্যে দেবকীনন্দনের উক্ত আত্ম-পরিচয়াত্মক বর্ণনাটি উদ্ধৃত হইয়াছে এবং পাটবাড়ীর গ্রন্থাগারিক বৈষ্ণব চরণ দাস মহাশয়ও বর্তমান গ্রন্থকারকে জানাইয়াছেন যে বৈষ্ণব-ভক্তবৃন্দ ঐ বর্ণনাকে সত্য বলিয়া পাঠ করিয়া থাকেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ঐ গ্রন্থাগারে রক্ষিত ১০৭১ সালে অনুলিখিত প্রাচীন 'বৈষ্ণব বন্দনা'-পুথি (বিবিধ ৭৭ নং)-মধ্যে ঐ বিবরণ লক্ষিত হয় নাই। কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত উহারও পূর্বে ১০৮৫, ১০৭৫, ও ১০৬৯ সাল প্রভৃতিতে অনুলিখিত আরও কতকগুলি বৈষ্ণববন্দনা-পুথিতে, কিংবা এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত পুথিখানির (Government collection—no. 5369) মধ্যেও উক্ত বিবরণ দৃষ্ট হয় না। বর্তমান গ্রন্থকারের নিকটেও ১১৮৬ সালে অনুলিখিত যে-একখানি পুথি রহিয়াছে, তাহার মধ্যেও ঐ অংশ রক্ষিত হয় নাই। সুতরাং পূর্বোক্ত সুধী-ভক্তবৃন্দ যে-পুথি হইতে উপরোক্ত তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার প্রাচীনত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে সুনিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত দেবকীনন্দন ও চাপাল-গোপালকে অভিন্ন-ব্যক্তি বলিয়া মনে করিতে পারা যায় না।

পুরুষোত্তমের পুত্র সম্বন্ধে পূর্বোক্ত 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়ে'র গ্রন্থকার লিখিতেছেন[৩২] যে কৃষ্ণদাস-গোস্বামী দ্বাদশ দিনের হইলে নিত্যানন্দ তাঁহাকে লইয়া পুত্রবৎ পালন করেন। "কিশোর বয়স যখন তখন বৃন্দাবনে। মহা অনুভব তাঁহার দেখিয়াছি নয়নে॥" আবার তিনি ছিলেন নাকি 'সংকীর্তনে অদ্বিতীয় মদন গোপাল' এবং তাঁহার মুরলীর রবে সকলের চিত্তহরণ হইলে জীব-গোস্বামী ও ব্রজবাসিগণ তাঁহার 'কানাই' নামকরণ করেন, তদনুযায়ী তিনি 'কানুঠাকুর' নামে অভিহিত হন। গ্রন্থকারের উক্তিগুলি প্রণিধানযোগ্য।

'ভক্তিরত্নাকর' হইতে জানা যায়[৩৩] যে জাহ্নবা কর্তৃক বৃন্দাবনে বিগ্রহ-প্রেরণকালে যাঁহারা বিগ্রহসহ যাত্রা করেন, তাঁহাদের মধ্যে ঠাকুর-কানাই বিদ্যমান ছিলেন। 'নরোত্তম বিলাস'-মতে[৩৪] বীরচন্দ্রের খেতুরি হইতে বিদায় গ্রহণকালেও কানাই-ঠাকুর তাঁহার সঙ্গী-হিসাবে বর্তমান ছিলেন। কেহ কেহ এই শিশু-কৃষ্ণদাস বা কানু-ঠাকুরকেও দ্বাদশ-গোপালের অন্তর্ভুক্ত ধরিয়া থাকেন।[৩৫] কানু-ঠাকুরও একজন পদকর্তা ছিলেন।[৩৬]

(৩২) এই প্রসঙ্গে বৈ. দি.-কার (পৃ. ২৭, ৭৩-৭৪) জানান যে পুরুষোত্তমের স্ত্রীর নামও জাহ্নবাদেবী হওয়ায় নিত্যানন্দ-পত্নী জাহ্নবা ও তিনি পরস্পর 'সই' পাতাইয়াছিলেন। দ্বাদশ দিনের শিশুকে রাখিয়া পুরুষোত্তম-ঘরণী দেহত্যাগ করিলে জাহ্নবাদেবী উক্ত শিশুকে পুত্ররূপে পালন করিয়াছিলেন (৩৩) ১৩।৮৪, ১১৪ (৩৪) ১১শ. বি., পৃ. ১৭৭ (৩৫) অ. লী.—পরিশিষ্ট, এই স্থলে তাঁহার পাট নির্দিষ্ট হইয়াছে বর্ধমানের ডাইহাটে। (৩৬) HBL—pp. 84, 85.

'চৈতন্যচরিতামৃতে'র নিত্যানন্দ-শাখা-বর্ণনার মধ্যেই কিন্তু আর এক পুরুষোত্তমকে পাওয়া যায়—

নবদ্বীপে পুরুষোত্তম পণ্ডিত মহাশয়।
নিত্যানন্দ নামে যাঁর মহোন্মাদ হয়॥

পূর্বোক্ত 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়'-মতে[৩৭]—

অর্জুন স্বরূপ হয়েন পুরুষোত্তম নাম।
পণ্ডিতাখ্য নবদ্বীপে দিব্য তেজধাম॥......
আজন্ম বিরাগ তাঁহার রহে প্রভু সঙ্গে।
সদা সখ্যভাবে নাচে অতি বড় রঙ্গে॥

জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল'[৩৮] ও রামাই-এর 'চৈতন্যগণোদ্দেশদীপিকা'তেও দেখা যায় যে পুরুষোত্তম-পণ্ডিতের জন্ম বা বাসস্থান ছিল নবদ্বীপে।[৩৯] এই সমস্ত হইতে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে পুরুষোত্তম-পণ্ডিত নামক ব্যক্তি পুরুষোত্তম-কবিরাজ, -ঠাকুর বা, -নাগর হইতে ভিন্ন ব্যক্তি। কিন্তু পুরুষোত্তম নামধারী ব্যক্তিগুলির মধ্যে বিভ্রাট বাধিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র মূলস্কন্ধ- এবং নিত্যানন্দ- ও অদ্বৈত-শাখার প্রত্যেকটিতেই অন্তত দুইজন করিয়া পুরুষোত্তম আছেন। তাঁহারা প্রত্যেকেই ভিন্ন ব্যক্তি। মূলস্কন্ধ-শাখার দুইজনের মধ্যে একজন[৪০] নবদ্বীপস্থ মুকুন্দ- ও সঞ্জয়-সংশ্লিষ্ট পুরুষোত্তম এবং অন্য-ব্যক্তি[৪১] হইতেছেন কুলীন-গ্রামী। নিত্যানন্দ-শাখার দুইজনের মধ্যে একজন সদাশিব-পুত্র এবং অন্য জন উপরোক্ত আলোচিত পুরুষোত্তম-পণ্ডিত। অদ্বৈত-শাখার দুইজনের[৪২] মধ্যে একজন পুরুষোত্তম-ব্রহ্মচারী ও অন্য ব্যক্তি সম্ভবত অন্য পুরুষোত্তম-পণ্ডিত। কারণ, একই ব্যক্তি অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ উভয়ের শিষ্য হইতে পারেন না। তাছাড়া, দেবকী-নন্দনের 'বৈষ্ণববন্দনা'র মধ্যে নদীয়ার পুরুষোত্তমের উল্লেখের একটু পরেই গ্রন্থকার একজন পুরুষোত্তম-পণ্ডিতের উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন[৪৩] :

শ্রীপুরুষোত্তম পণ্ডিত বন্দো বিলাসি সুজান।
প্রভু জারে দিলা আচার্য গোসাঞির স্থান॥

এই সমস্ত ছাড়াও একজন আছেন, তিনি নরোত্তম-জনক পুরুষোত্তম-দত্ত। একজন পুরু-ষোত্তম-দত্ত সম্বন্ধে জয়ানন্দ বলিতেছেন[৪৪] :

যাহার মন্দিরে নিত্যানন্দের বিলাস।

এই পুরুষোত্তম-দত্ত যে কে, তাহা জোর করিয়া বলা যায় না। 'দত্ত'-উপাধি থাকায়

---

(৩৭) পৃ. ১৬৯ (৩৮) বি. খ., পৃ. ১৪৪ (৩৯) পৃ. ৫ (৪০) দ্র.—মুকুন্দ-দত্ত (৪১) দ্র.—রামানন্দ-বসু (৪২) দ্র.—পুরুষোত্তম-পণ্ডিত (৪৩) পৃ. ৪ (৪৪) বি. খ., পৃ.১৪৫-৪৭

তাঁহাকে মুকুন্দ-সঞ্জয় পরিবারের পুরুষোত্তম বলিয়া ধরিয়া লইতে পারা যায় না।[৪৫] আবার তাঁহার 'পণ্ডিত'-উপাধি না থাকায় তাঁহাকেই 'প্রভু' 'আচার্য গোসাঞির স্থানে' সমর্পণ করিয়াছিলেন, এইরূপ ধারণা করাও সংগত হয় না। সুতরাং অন্তত আট-জন পুরুষোত্তমের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। ইহা ছাড়া উড়িষ্যার রাজা-পুরুষোত্তম এবং আরও কয়েকজন অপ্রসিদ্ধ পুরুষোত্তম ছিলেন।

'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'তে[৪৬] যে অন্য একজন পুরুষোত্তমকে 'অর্জুন'-আখ্যা দান করা হইয়াছে তিনি সম্ভবত নিত্যানন্দ-শাখার পুরুষোত্তম-পণ্ডিত। কারণ, নবদ্বীপ-বাসী সেই পুরুষোত্তম-পণ্ডিতকেই 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়'-গ্রন্থেও 'অর্জুন'-আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। আবার তিনি যে মুকুন্দ-সঞ্জয়-সম্পর্কিত পুরুষোত্তম নহেন, সম্ভবত তাহাও উক্ত-গ্রন্থের উদ্ধৃতি হইতে বুঝা যাইতেছে। কারণ, "আজন্ম বিরাগ তাঁহার রহে প্রভু সঙ্গে। সদা সখ্যভাবে নাচে অতি বড় রঙ্গে॥" 'গৌরপদতরঙ্গিণী'র দুই একটি পদেও পুরুষোত্তম-পণ্ডিতের এই সখ্যভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।[৪৭] মুকুন্দ-সঞ্জয়-পরিবারের পুরুষোত্তম গৌরাঙ্গ অপেক্ষা যথেষ্ট বয়ঃকনিষ্ঠ হওয়ায় তাঁহার পক্ষে সখ্যভাবাক্রান্ত হওয়া সম্ভব ছিল না। তিনি গৌরাঙ্গের পড়ুয়া ও ব্যাকরণের মুখ্য-শিষ্য ছিলেন। তাছাড়া, সেই পুরুষোত্তমের পিতা ছিলেন মুকুন্দ। কিন্তু খুব সম্ভবত এই পুরুষোত্তমের পিতার নাম ছিল রত্নাকর। দেবকীনন্দন জানাইতেছেন[৪৮] :

রত্নাকর সুত বন্দো শ্রীপুরুষোত্তম নাম।
নদীয়া বসতি যার দিব্য তেজধাম॥

'চৈতন্যসংগীতা'তে নবদ্বীপস্থ পুরুষোত্তম-পণ্ডিতকে দ্বাদশ-গোপালের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।[৪৯]

(৪৫) দ্র.—মুকুন্দ-দত্ত (৪৬) ১৩২ (৪৭) পৃ. ১৪৯, ১৫৮ (৪৮) পৃ. ৪ (৪৯) পৃ. ২

সুন্দরানন্দ

নিত্যানন্দের একজন প্রধান সঙ্গী সুন্দরানন্দ দ্বাদশ-গোপালের অন্যতম বলিয়া খ্যাত।[১] তাঁহার পাট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল হালদা-মহেশপুরে।[২] 'পাটপর্যটনে' অভিরাম-ঠাকুরের শিষ্য অন্য একজন সুন্দরানন্দের কথা বলা হইয়াছে। তিনি বিপ্র ও পণ্ডিত; তাঁহার পাট ভঙ্গমোড়ায়।

বাসু-ঘোষ গৌরাঙ্গের বাল্যলীলা-বর্ণনা মধ্যে একস্থানে প্রথমোক্ত সুন্দরানন্দ সম্বন্ধে বলিয়াছেন[৩] যে রামাই, সুন্দরানন্দ গৌরীদাস অভিরাম প্রভৃতিকে লইয়া 'গোষ্ঠলীলা গোরাচান্দ করিলা প্রকাশ।' সম্ভবত বাসু-ঘোষের এই সমস্ত পদই পরে দ্বাদশ-গোপালের পরিকল্পনার সূত্রপাত করিয়া থাকিবে। উল্লেখযোগ্য যে বাসু-ঘোষ নীলাচল হইতে নিত্যানন্দ-সঙ্গী হিসাবেই গৌড়ে আসিয়াছিলেন।[৪] সম্ভবত বাসু-ঘোষের উল্লেখ দৃষ্টে 'ভক্তি-রত্নাকর'-রচয়িতা নরহরি ও অন্যান্য পদকর্তৃগণ গৌরাঙ্গের বাল্যলীলা বা গোষ্ঠলীলাদির সহিত রামাই সুন্দরানন্দ ও গৌরীদাসকে যুক্ত করিয়া থাকিবেন এবং জয়ানন্দও তাঁহার গ্রন্থে নবদ্বীপ-লীলা প্রসঙ্গে বর্ণিত তালিকা-মধ্যে সুন্দরানন্দের নামোল্লেখ করিয়া থাকিবেন।[৫] কিন্তু 'চৈতন্যচরিতামৃত'-মধ্যে গৌরাঙ্গের নবদ্বীপ-লীলায় সুন্দরানন্দের নাম নাই। তবে নবদ্বীপ-লীলাকালেই যে তিনি নিত্যানন্দের সহিত বিশেষভাবে যুক্ত হইয়াছিলেন, জয়ানন্দের গ্রন্থ হইতে তাহা বিশেষভাবেই অনুমিত হইতে পারে।[৬] 'প্রেমবিলাস'-কার জানাইতেছেন[৭] যে মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে নীলাচল হইতে গৌড়ে প্রেরণ করিবার সময় রামদাস (বা ?) রামাই এবং গদাধর ও সুন্দরানন্দ প্রভৃতিকেও নিত্যানন্দের সহিত প্রেরণ করেন। উক্ত সঙ্গী-বৃন্দ নিত্যানন্দেরই পূর্ব-সহচর হওয়ায় নিত্যানন্দের সহিত সুন্দরানন্দের পূর্ব-সম্বন্ধ সূচিত হয়।

চৈতন্য কর্তৃক গৌড়ে প্রেরিত হইবার পর সুন্দরানন্দ নিত্যানন্দের বিশেষ সহচর-হিসাবে খ্যাত হন। তিনি সম্ভবত তাঁহার সহিত নানাস্থান পরিভ্রমণ করেন এবং তাঁহার

---

(১) চৈ.ভা.—৩।৬; পৃ. ৩১৬; চৈ.চ.—১।১১, পৃ. ৫৫ (২) ব. শি.—পৃ. ৮০; চৈ.স.—পৃ. ১২; পা.প.—পৃ. ১০৭; পা. নি. (পা. বা.)—পৃ. ১; পা. নি. (ক. বি.)—পৃ. ২; চৈ. দী. (রামাই)—পৃ. ৫. (৩) বা. প.—পৃ. ১৩ (৪) দ্র.—বাসু-ঘোষ; তু.—অ. লী; গ্রন্থমধ্যে (পৃ. ১৩৯) লিখিত হইয়াছে, "প্রধান গোপাল জানে লীলার সন্ধান।......বাসুদেব ঘোষ দেখে সে সব আচার।" (৫) ভ. র.—১২।৩১১৬, ৩১৫৬, ৩১৬৩; গৌ. ত.—পৃ. ১৬২, ১৬৪; চৈ.ম. (জ.)—বৈ. খ., পৃ. ৭২ (৬) স.খ., পৃ. ৯০ (৭) ১ম. বি, পৃ. ১২; ৪র্থ বি., পৃ. ৪৬

বিবাহানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।[৮] 'চৈতন্যচরিতামৃত' হইতে জানা যায় যে তিনি রঘুনাথদাসের চিড়াদধি-মহোৎসব অনুষ্ঠানকালে নিত্যানন্দের অন্যান্য ভক্তসহ পাণিহাটীর গঙ্গাতীরে উপস্থিত ছিলেন। 'প্রেমবিলাসে'র বর্ণনানুযায়ী[৯] তাঁহাকে একবার খেতুরির মহোৎসবে উপস্থিত থাকিতে দেখা যায়।[১০]

(৮) চৈ. ম. (জ.)—বি. খ., পৃ. ১৪৪ ; উ. খ., পৃ. ১৫১ ; ভ. র.—১২।৩৭৪৮, ৩৮৬৪ ; চৈ. চন্দ্র-মতে (পৃ.১৫২) নিত্যানন্দের এই সকল লীলাকালে তিনি একবার জাম্বীর বৃক্ষ হইতে কদম্ব পুষ্প চয়ন করিয়া দুই কর্ণে পরিধান করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবদিগ্‌দর্শনী (পৃ.১৩)-মতে ইনি 'প্রেমোন্মত্ত অবস্থায় গঙ্গাগর্ভ হইতে কুম্ভীর ধরিয়া আনিতেন। ইঁহার শিষ্যগণ বনের বাঘ ধরিয়া আনিয়া কানে হরিনাম দিয়া ছাড়িয়া দিতেন।······সুন্দরানন্দ চিরকুমার ছিলেন।' গ্রন্থকার আরও বলেন (পৃ.১১৪) যে 'কৃষ্ণবিলাস'-রচয়িতা বড়-কাঁদরাবাসী কায়স্থ-কবি জয়গোপালদাস সুন্দরানন্দ কর্তৃক দীক্ষিত হন। (৯) ১৯শ. বি., পৃ.৩৩৭ (১০) নি. বি. (পৃ. ২৯, ৩২)- ও নি. ব. (পৃ.৯৩)-মতে তিনি একবার জাহ্নবার বৃন্দাবন-গমনকালে তৎসহ একচক্রা পর্যন্ত যান। কিন্তু জাহ্নবা তাঁহাকে গোপীজনবল্লভের সহিত সেই স্থান হইতে ফিরাইয়া দেন। গ্রন্থকার-মতে বৃন্দাবন-গমন.কালে তাঁহাকে পথিমধ্য হইতে ফিরাইয়া দেন।

কমলাকর-পিপিলাই

'চৈতন্যচরিতামৃতে'র নিত্যানন্দ-শাখা-বর্ণনার মধ্যে কমলাকর-পিপিলাইর নাম দৃষ্ট হয়। 'চৈতন্যভাগবত'-গ্রন্থে বলা হইয়াছে[১] :

পণ্ডিত কমলাকান্ত পরম উন্মাদ।
যাঁহারে দিলেন নিত্যানন্দ সপ্তগ্রাম ॥

জয়ানন্দ বলেন[২] যে কমলাকর-পিপিলাইকে নিত্যানন্দ পাণিহাটী গ্রাম দান করিয়াছিলেন ; 'নিত্যানন্দ দিলা যারে পাণিহাটীগ্রাম'। প্রায়-সমোচ্চারিত নাম-বিশিষ্ট দুইজন পৃথক ব্যক্তিকে দুইটি পৃথক গ্রাম-দানের অস্বাভাবিকত্বকে বাদ দিয়া কেবল গ্রাম-সম্বন্ধীয় ভারার্পণের কথাটিকে স্বীকার করিয়া লইলেই বুঝিতে পারা যায় যে 'চৈতন্যভাগবতে'র কমলাকান্ত ও 'চৈতন্যচরিতামৃত' বা 'চৈতন্যমঙ্গলে'র কমলাকর একই ব্যক্তি ছিলেন।

কমলাকর সম্বন্ধে 'চৈতন্যচরিতামৃত'-কার কেবল এইটুকু জানাইতেছেন যে তিনি রঘুনাথদাসের দধিচিড়া-মহোৎসব অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। 'প্রেমবিলাস,' 'ভক্তিরত্নাকর' ও 'নরোত্তমবিলাস' হইতে জানা যায়[৩] যে কমলাকর-পিপিলাই জাহ্নবাদেবীর সহিত খেতুরির মহামহোৎসব-অনুষ্ঠানেও যোগদান করিয়াছিলেন। ইহাছাড়া, কমলাকর সম্বন্ধে আর কিছুই জানিতে পারা যায়না। কিন্তু বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে তিনি দ্বাদশ-গোপালের তালিকাভুক্ত।[৪] আক্না-মাহেশ গ্রামে তাঁহার পাট নির্ণীত হইয়াছে।[৫] 'পাটপর্যটনে' অভিরাম-শিষ্য একজন কমলাকরের কথা বর্ণিত হইয়াছে।[৬] গ্রন্থকার বলেন যে গৌরাঙ্গপুরে কমলাকরদাসের 'স্থিতি' ছিল। কিন্তু আলোচ্য কমলাকর সম্বন্ধে রামাই-এর 'চৈতন্যগণোদ্দেশদীপিকা'য় উপরোক্ত সপ্ত-গ্রামের কথা স্বীকৃত হইয়াছে।[৭] কমলাকর সম্বন্ধে আধুনিক 'বৈষ্ণবদিগ্‌দর্শনী' ও 'বৈষ্ণবাচারদর্পণে' নানাবিধ তথ্য প্রদত্ত হইয়াছে।[৮]

১৩০১ সালে 'গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া'-পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় কাশীনাথ দাস মহাশয় লিখিয়াছেন, "সম্প্রতি একখানি 'শ্রীজগন্নাথেতিবৃত্তং' নামক ক্ষুদ্র সংস্কৃত গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা হইতে কমলাকরের বিষয় যাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারিয়াছি, তাহাই এখানে বিবৃত

---

(১) ৩।৬, পৃ. ৩১৬ (২) বি. খ., পৃ. ১৪৪ (৩) প্রে. বি.—১৯শ. বি., পৃ.৩০৮ ; ভ.র.—১০।৩৭৫ ; ন. বি.—৬ষ্ঠ. বি., পৃ. ৭৯ ; ৮ম. বি., পৃ. ১০৭, ১১২ (৪) চৈ. স.—পৃ. ১২ (৫) চৈ. স.—পৃ.১২ ; পা.প.—পৃ.১০৮ (৬) পৃ. ১১২ (৭) পৃ. ৫ (৮) বৈ. দ.—পৃ. ১৭-১৮, ৩৩৫ ; দ্র.—সীতা-জীবনীর পাদটীকা ও বীরভদ্র-জীবনী

করিব।" এই বলিয়া লেখক কতকগুলি তথ্য পরিবেষণ করিয়াছেন।[৯] তথ্যগুলি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না।

(৯) প্রভুর প্রিয়পাত্র ধ্রুবানন্দ-ব্রহ্মচারী গদাধর-শাখার অন্তর্ভুক্ত। নানা-তীর্থ পরিক্রমার পর শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথের স্তবকালে আকাশ-বাণী হয়, "তুমি মহেশ-নামক গ্রামে গমন কর।......সেই স্থানে আমি রাম ও সুভদ্রার সহিত থাকিব।" ধ্রুবানন্দ মাহেশে আসেন এবং পুনরায় স্বপ্নদর্শন করিয়া গঙ্গাতীরে প্রাপ্ত তিনটি বিগ্রহ আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন। ক্রমে বিগ্রহ-সেবায় ব্রহ্মচারীর দেহ জীর্ণ শীর্ণ হইলে পুনরায় স্বপ্নে বলা হয়, "খালিয়াড়ি নামক বিখ্যাত নগরে কমলাকর নামক এক ধার্মিক ব্রাহ্মণ আছেন। তিনি তোমার সতীর্থ (পিপ্পল্যাঃ কুলসম্ভূতো গৌরভক্তো মমপ্রিয়ঃ) পিপ্পলীকুলজাত, শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্ত এবং আমার প্রিয়, তুমি তাঁহাকে আনয়ন করিয়া আমার সেবায় নিযুক্ত কর।" খালিয়াড়ী হইতে কমলাকর-পিপ্পলাইকে আনিয়া সেবাকার্যে নিযুক্ত করা হইল। কমলাকরের পত্নীও আসিলেন এবং ধ্রুবানন্দ দেহত্যাগ করিলেন। অতঃপর কমলাকরের ভ্রাতা ও শিষ্য নিধিপতিও পত্নীসহ মাহেশে আসিলেন। "কমলাকর চণ্ডীবর নামক এক ব্রাহ্মণকে পৌরোহিত্যে বরণ করিয়া মাহেশ-গ্রামে সংস্থাপন করিলেন।" ক্রমে কমলাকর ও নিধিপতির পুত্র-কন্যা হইল। কমলাকরের পুত্র-কন্যার নাম যথাক্রমে চতুর্ভুজ ও রমা এবং নিধিপতির পুত্র-কন্যার নাম যথাক্রমে বাণেশ্বর ও রাধা। কমলাকর কন্যাদ্বয়ের বিবাহার্থ চিন্তিত হন। "তাঁহারা কষ্টশ্রোত্রিয় পিপ্পলীগাঞি ব্রাহ্মণ ছিলেন।" কিন্তু ভগবান দ্বিজরূপে দেখা দিয়া তাঁহাকে পরামর্শ-দান করিলে কুলীন-বৈষ্ণব যোগেশ্বর-পণ্ডিত ও কামদেব-পণ্ডিতের সহিত কন্যাদ্বয়ের বিবাহ হয় এবং পিপলাই-বংশ জাতিতে উঠিয়া যায়।

পরমানন্দ-গুপ্ত

পরম কৃষ্ণভক্ত পরমানন্দ-গুপ্ত নিত্যানন্দ-শিষ্য ছিলেন এবং নিত্যানন্দ তাঁহার গৃহে কিছুকাল বাসও করিয়াছিলেন।[১] জয়ানন্দ বলেন[২] যে পরমানন্দ-গুপ্ত নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি 'গৌরাঙ্গ বিজয় গীত' রচনা করিয়াছিলেন। তিনি যে কবি ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, কবিকর্ণপূরও জানাইয়াছেন[৩] যে তিনি 'কৃষ্ণস্তবাবলী' রচনা করিয়াছিলেন। 'পরমানন্দদাস'-ভণিতায় কয়েকটি ব্রজবুলি-পদও পাওয়া যায়। পদগুলি কোন্ পরমানন্দের তাহা নিশ্চয় করিয়া না বলা গেলেও আলোচ্য পরমানন্দ-গুপ্ত যে একজন কবি ছিলেন, উপরোক্ত প্রমাণ-বলে তাহা ধরিয়া লইতে পারা যায়। দেবকীনন্দন ও বৃন্দাবনদাসের 'বৈষ্ণববন্দনা'য় একজন 'মহাপ্রভুর সতীর্থ পরমানন্দ-পণ্ডিত'কে পাওয়া যায়। সম্ভবত উভয়েই এক ব্যক্তি। আধুনিক 'বৈষ্ণবাচারদর্পণ'-গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে[৪] যে পরমানন্দ-গুপ্ত 'চৈতন্যের শাখা অম্বিকাতে বিলসয়।'

'চৈতন্যভাগবত'[৫] জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল'[৬] এবং 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র নিত্যানন্দ-শাখা বর্ণনার মধ্যে একজন পরমানন্দকে পাওয়া যায়। তিনি পরমানন্দ-উপাধ্যায়।

---

(১) চৈ. ভা.—৩।৬, পৃ. ৩১৭ ; চৈ. চ.—১।১১, পৃ. ৫৬ (২) বি. খ., পৃ. ১৪৪ ; পৃ. ৩ (৩) গৌ. দী.—১৯৯ (৪) পৃ. ৩৪৭ (৫) ৩।৬, পৃ. ৩১৭ (৬) বি. খ., পৃ. ১৪৫

চতুর্থ পর্যায়

বৃন্দাবন

জীব-গোস্বামী

জীব-গোস্বামী ছিলেন চৈতন্য-পরিকল্পিত নববৃন্দাবন-রচনায় রূপ-গোস্বামীর যোগ্যতম উত্তরাধিকারী। তিনি ছিলেন রূপানুজ অনুপমের পুত্র। 'ভক্তিরত্নাকর' হইতে জানা যায় যে রামকেলিতে যখন মহাপ্রভুর সহিত রূপ, সনাতন ও অনুপমের সাক্ষাৎ ঘটে, তখন 'শ্রীজীবাদি সঙ্গোপনে প্রভুরে দেখিল'।[১] তখন তিনি বালকমাত্র। কিন্তু তখনই তাঁহার উপর পিতা-পিতামহ ও পিতৃব্যদিগের প্রভাব পড়িয়াছিল। তারপর রূপ-অনুপম এবং সনাতন যখন গৌড়-পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে চলিয়া যান, তখন তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি আবাল্য-বৈরাগী ছিলেন।[২] কিন্তু বিশেষ করিয়া পিতার গঙ্গাপ্রাপ্তির পর তিনি উতলা হইয়া পড়িলেন। অবশেষে তিনি একদিন[৩] নবদ্বীপে গিয়া নিত্যানন্দ[৪] ও শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া একাকী সুদূর মথুরার অভিমুখে যাত্রা করিলেন।[৫]

মথুরার পথে বারাণসীতে আসিয়া জীব মধুসূদন-বাচস্পতির গৃহে অবস্থান করেন।[৬] বাচস্পতি সর্বশাস্ত্র-বিশারদ ছিলেন। তিনি জীবকে বেদান্ত-শাস্ত্রাদি শিক্ষা দিয়া অধিকতর শিক্ষিত করিয়া তুলিলে জীব বৃন্দাবনে চলিয়া যান।

বৃন্দাবনে জীব ছিলেন রূপের ছায়া-সদৃশ। তিনি কেবল তাঁহার মন্ত্রশিষ্য[৭] মাত্র ছিলেন না। শিক্ষা, সংস্কৃতি সমস্ত দিক হইতেই তিনি হইয়া উঠিয়াছিলেন রূপের সুযোগ্য

(১) ১।৬৩৮ (২) গৌ. ত.—পৃ. ৩১১ (৩) কোন কোন গ্রন্থ হইতে (প্রে. বি.—২৪ শ. বি., পৃ. ২২৫) জানা যায় যে তিনি মাতার নিকট রূপ-সনাতনের বৃন্দাবন-বাস ও তাঁহাদের বৈরাগী-জীবন-যাপন সম্বন্ধে অবগত হইয়া তাঁহাদের সদৃশ বেশভূষা পরিধান করিয়া তদনুরূপ আচরণ করিবার চেষ্টাও করিতেন। অবশেষে একদিন তিনি 'অধ্যয়নচ্ছলে' নবদ্বীপ যাত্রা করিলেন এবং সঙ্গী-লোকজনদের বিদায় দিয়া তাঁহাদের ফতেয়াবাদ-গৃহ হইতে মাত্র একজন ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া নবদ্বীপে শ্রীবাস-পণ্ডিতের গৃহে হাজির হইলে সেইখানে তাঁহার সহিত নিত্যানন্দ ও শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দের সাক্ষাৎ ঘটে। (৪) জীব মথুরা যাত্রার আজ্ঞা চাহিলে নিত্যানন্দ জানান যে মহাপ্রভু তাঁহার পিতৃব্যগণকে বৃন্দাবনের অধিকার দিয়া সেই ভূমিকে তাঁহাদের বংশগত করিয়াছেন, সুতরাং জীবেরও তথায় গিয়া তদর্থে আত্মনিয়োগ কর্তব্য।—তু.—স. সু, পৃ. ১০ ; চ. সু.—পৃ. ৪ ; বৈ. ব. (দে.)—পৃ. ২-৩ (৫) গৌ. ত.—পৃ. ৩১১ বৈ. দি-মতে' (পৃ. ৬৭, ৮৬) তখন তাঁহার বয়স ২৪ বৎসর (৭) ভ. মা.—পৃ. ১৭

উত্তরাধিকারী। 'প্রেমবিলাস-কার'[৮] তাঁহাকে 'শ্রীরূপের শক্তি' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে, রূপ-গোস্বামীর মৃত্যুর পর তাঁহার সমস্ত কার্যভার তিনি সানন্দে মস্তকে লইয়াছিলেন। কিন্তু তৎপূর্বে রূপের জীবদ্দশায় তিনি কেবল তাঁহার অনুগামী ভৃত্যরূপেই নিজেকে পশ্চাতে রাখিয়াছিলেন। তখনই তিনি প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের অধিকারী হইতে পারিয়াছিলেন। একদিন কোন পণ্ডিত বৃন্দাবনে আসিয়া রূপ-সনাতনের সহিত বিদ্যা-বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাদিগকে পরাজিত করিতে চাহিলে নিরহংকার গোস্বামিভ্রাতৃদ্বয় বিনাযুদ্ধেই তাঁহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। 'প্রেমবিলাসে'র উনবিংশ-বিলাস হইতে জানা যায়[৯] যে এই পণ্ডিতের নাম ছিল রূপচন্দ্র। 'ভক্তমালে'র লেখক কাহারও নামোল্লেখ না করিয়া কেবল বলিয়াছেন ঃ

> দিগ্বিজয়ী এক সর্বত্র জিনিয়া।
> ব্রজে রূপ-সনাতন পণ্ডিত জানিয়া।।
> বিচার করিতে আইল গোসাঞির স্থানে।

ইহার পরবর্তী বর্ণনা 'প্রেমবিলাসে'র বর্ণনাকেই সমর্থন করে।[১০] কিন্তু 'ভক্তিরত্নাকর'[১১]-মতে ইঁহার নাম বল্লভ-ভট্ট। এই পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তিটি রূপ-গোস্বামীর নিকট আসিয়া দেখিলেন যে তিনি তাঁহার 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'-রচনায় ব্যস্ত। বল্লভ-ভট্ট তখন উক্ত গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ পাঠ করিয়া তাহা শোধন করিবার অভিপ্রায় জানাইলে জীব ব্যথিত হইয়া যমুনা-স্নানের পথে তাঁহাকে পরাভূত করেন। সম্ভবত এই বল্লভ-ভট্টই আলোচ্যমান দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হইবেন। কারণ 'প্রেমবিলাসে'র ত্রয়োবিংশ বিলাসে বলা হইতেছে[১২] যে গ্রন্থকার পূর্বে যে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের কথা বলিয়াছেন তাঁহার নাম রূপনারায়ণ; জীবের সহিত কয়েকদিন তর্কযুদ্ধের পর তিনি পরাজিত হইয়া চৈতন্য-মতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন; কিন্তু যাঁহাকে পরাজিত করিয়া স্বয়ং জীব রূপ-কর্তৃক পরিত্যক্ত হন, তিনি 'আর এক প্রবল পণ্ডিত'। ঐ স্থানে তাঁহার নাম করা হয় নাই। কিন্তু উনবিংশ বিলাসের বর্ণনা সম্বন্ধে সচেতন থাকিয়াও যখন লেখক এইরূপ বলিতেছেন, তখন গ্রন্থের রচয়িতা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিলেও তাঁহার মত বিচার্য হইয়া পড়ে। এক্ষেত্রে কাঁহারও দ্বারা প্রকৃত নামের উল্লেখ না পাওয়ায় 'ভক্তিরত্নাকরে'র বল্লভ-ভট্টকেই উক্ত পণ্ডিত বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়। যাহাহউক, উক্ত পণ্ডিত কর্তৃক পরম-আরাধ্য গুরুর

---

(৮) ১২শ বি., পৃ. ১৩৬ (৯) পৃ. ৩২৫-২৬; নরোত্তম-জীবনীতে ইঁহার সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। (১০) দীনেশচন্দ্র সেন প্রে. বি.-এর মতকেই সমর্থন করিয়াছেন—Vaisnava Literature (pp. 44, 46, 47, 48) (১১) ৫।১৬৩০ (১২) পৃ. ২২৬

এই পরাজয় জীবের নিকট অত্যন্ত বেদনাময় হইয়াছিল। যমুনা-স্নানের পথে তিনি পণ্ডিতের সহিত দেখা করিয়া স্বীয় পাণ্ডিত্য ও ধী-শক্তির বলে বুঝাইয়া দিলেন যে অদ্বিতীয় পণ্ডিত সনাতন- ও রূপ-গোস্বামীকে পরাভূত করিবার প্রচেষ্টা নিরর্থক। তিনি নিজেকে রূপের নগণ্য শিষ্যমাত্র বলিয়া জানাইলেন বটে, কিন্তু তাঁহারই বিদ্যাবত্তায় বিদ্যাভিমানী পণ্ডিতকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। কিন্তু জীবের এই অসহিষ্ণু মনোভাব লক্ষ্য করিয়া রূপ তাঁহাকে দূরে চলিয়া যাইতে আদেশ দান করিলে জীব অবনত মস্তকে সেই আদেশ গ্রহণ করিয়া এক রকম অনাহারে বা অর্ধাহারে বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।[১৩] সেই সময় অনাহারে অনিদ্রায় তাঁহার দেহ শীর্ণ হইয়া পড়িল, তিনি মৃতপ্রায় হইলেন। শেষে সনাতনের হস্তক্ষেপের ফলে পুনরায় রূপ ও জীবের মিলন সংঘটিত হয়।

বৃন্দাবনে জীব রাধাদামোদরের নিকট অবস্থান করিতেন। এই বিগ্রহ রূপকর্তৃক প্রকটিত হয় এবং রূপ-গোস্বামী জীবের উপর ইহার সেবার ভারার্পণ করেন। বস্তুত, সনাতন-রূপের তিরোভাবের পর বৃন্দাবনের সমস্ত কার্যভারই জীবের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল। তাহা কেবল উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত নহে। তাঁহার বিপুল পাণ্ডিত্যের অধিকার-বলেই গোস্বামী-রচিত সমস্ত অমূল্য-গ্রন্থের সংরক্ষণ, পরিবর্ধন ও প্রচারের ভারও তাঁহারই উপর ন্যস্ত হইয়াছিল।[১৪] রূপ-গোস্বামীর জীবিতাবস্থা হইতেই জীবের সেই দায়িত্ব স্বীকৃত হইয়াছিল।

শ্রীনিবাস-আচার্য প্রথমবার বৃন্দাবনে পৌঁছাইলে জীব-গোস্বামী তাঁহার তত্ত্বাবধানের সমূহ-ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীনিবাস তাঁহাকে প্রণাম করিলেও তিনি শ্রীনিবাসকে 'বন্ধু'-সম্বোধন করিয়া তাঁহার সহিত বন্ধুবৎ আচরণ করেন। শ্রীনিবাসকে তিনি স্বয়ং বিভিন্ন বিগ্রহাদি পরিদর্শন করাইয়া আনেন এবং লোকনাথ ভূগর্ভাদি গোস্বামী-গণের সহিত তাঁহার মিলন ঘটাইয়া গোপাল-ভট্টের নিকট তাঁহার দীক্ষা-গ্রহণের বন্দোবস্ত করিয়া দেন। গোপাল-ভট্ট শ্রীনিবাসকে দীক্ষাদান করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সমস্ত পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাটিই ছিল জীবের। এবং তিনিই একদিন শ্রীনিবাসের প্রতিভার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া সর্বসম্মতিক্রমে তাঁহাকে 'আচার্য'-উপাধি প্রদান করেন।[১৫] শ্রীনিবাসের বৃন্দাবন-অবস্থানকালে নরোত্তম আসিয়া পৌঁছাইলে তিনি তাঁহাকেও লোকনাথ-গোস্বামীর সহিত সংযুক্ত করেন এবং লোকনাথ ও নরোত্তমের মধ্যে গুরু-শিষ্য সম্বন্ধকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দেন। তাহার পর তিনি নরোত্তমকেও সকলের সহিত পরিচিত করাইয়া, ও স্বয়ং তাঁহাকে

(১৩) প্রে. বি.-মতে (২৩ শ. বি., পৃ. ২২৬) এই সময় তিনি 'সর্বসম্বাদিনী'-গ্রন্থ রচনা করেন।
(১৪) গৌ. প. দী.—পৃ. ৫ ; অ. লী.—পৃ. ১৫৩ (১৫) দ্র.—শ্রীনিবাস

ভক্তি-শাস্ত্র পাঠ করাইয়া সুশিক্ষিত করিয়া তুলেন এবং তাঁহাকে 'ঠাকুর মহাশয়'-উপাধিতে ভূষিত করিয়া যথাযোগ্য ব্যক্তির মর্যাদাদান করেন। এই নরোত্তম এবং শ্রীনিবাসের বৃন্দাবন- ও মথুরা-পরিক্রমার্থ তিনিই রাঘব-গোস্বামীকে নির্দেশ দান করিয়া তাঁহার সহিত তাঁহাদিগকে পরিক্রমায় পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। আবার শ্যামানন্দ বৃন্দাবনে আসিলে তিনি অনুরূপভাবে তাঁহার প্রতিও কৃপা প্রদর্শন করিয়া এবং তাঁহাকে বিশেষভাবে 'ভক্তিরসামৃত', 'উজ্জ্বলনীলমণি' প্রভৃতি ভক্তি-গ্রন্থ শিক্ষা দিয়া রাধাকৃষ্ণানুরাগী করিয়াছিলেন। তারপর নরোত্তম-শ্রীনিবাসের সহিত তাঁহাকে মিলিত করিয়া তিনি এই তিন-জনকে যে এক অচ্ছেদ্য সূত্রে আবদ্ধ করিয়া দিলেন, তাহার ফল সুদূর-প্রসারী হইয়াছিল। এই সংযোগ-স্থাপনের ফলেই মহাপ্রভুর প্রবর্তিত ধর্ম গৌড়-উড়িষ্যাদি দেশে প্রচারিত হইয়া তাঁহার আদর্শকে ফুলে-ফলে সার্থক করিয়া তুলিতে পারিয়াছিল।

শ্যামানন্দের পূর্ব নাম ছিল কৃষ্ণদাস। কিন্তু তাঁহাকেও জীব তাঁহার রাধাকৃষ্ণানুরাগের জন্য 'শ্যামানন্দ'-উপাধিতে ভূষিত করেন। শ্যামানন্দকে তিনি স্বীয় সন্তানের ন্যায়ই দেখিতেন এবং তাঁহার বৃন্দাবন-বাসকালে জীবের স্নেহময় সতর্ক-দৃষ্টি যেন তাঁহাকে সর্বপ্রযত্নে রক্ষা করিয়া চলিত। শেষে তিনি তাঁহাকে শ্রীনিবাসের হস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হন। তারপর অপরিণতবয়স্ক সন্তানকে বিদেশে পাঠাইবার পূর্বে পিতামাতা যেরূপ একান্ত আগ্রহ সহকারে তাহার সমূহ কর্তব্য নির্বাহ করিয়া দেন, শ্রীনিবাস-নরোত্তমের গৌড়-গমনকালে জীব সেইরূপ স্নেহাভিষিক্ত আগ্রহান্বিত চিত্তে তাঁহাদের গমন-ব্যবস্থার যাবতীয় খুঁটিনাটি ব্যাপার নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করিয়া দিলেন। বৃন্দাবনস্থ ভক্তবৃন্দের নিকট তাঁহাদের বিদায়-গ্রহণ, দেবতা-মন্দিরে গিয়া তাঁহাদের প্রণাম-জ্ঞাপন, পথে যাহাতে কোনরূপ অসুবিধা না হয় তজ্জন্য যান-বাহনাদির যাবতীয় ব্যবস্থা, এমন কি মথুরা পর্যন্ত গিয়া 'রাজপত্র' আনাইয়া দেওয়া[১৬] ও অন্যান্য সমস্ত কিছু তাঁহারই অভিভাবকত্বে নির্ভুলভাবে সম্পন্ন হয়। কিন্তু এত-সমস্তের মধ্যেও তিনি তাঁহার আসল কর্তব্যটি ভুলিয়া যান নাই। ভক্তি-ধর্মের বহুল প্রচারের জন্য গোস্বামিকৃত অমূল্য গ্রন্থগুলিকে সেইদিন যোগ্যতম শিষ্য ও অধিকারিত্রয়ের সহিত গৌড়ে প্রেরণ করিয়া তবেই তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর তিরোভাবের পরবর্তী যে অল্প-কয়েকটি বিশেষ দিবসকে বৈষ্ণব-ভক্তবৃন্দের পক্ষে একান্তভাবেই স্মরণীয় দিন বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে, তাহার মধ্যে খেতুরির উৎসব-দিনের মত এই দিনটিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ, এই দিনটিই চৈতন্য পরিবর্তিকালে চৈতন্য-প্রবর্তিত ধর্মপ্রচারের সগৌরব-সূচনা করিয়া দিয়াছে। তাই এই দিনটির কথা বলিতে গিয়া, এবং এই প্রসঙ্গে জীব-গোস্বামীর

(১৬) প্রে. বি.—১৩ শ. বি., পৃ. ১৬৩

সম্যক্ পরিচয় বর্ণনা করিতে গিয়া ‘প্রেমবিলাস’ এবং ‘ভক্তিরত্নাকর’ প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতৃগণ যেন মুখর হইয়া উঠিয়াছেন। পরবর্তী-কালেও জীব-গোস্বামী গৌড়-দেশে ভক্তি-গ্রন্থ প্রেরণ করিয়া তাঁহার মহান কর্তব্যকে সতর্কভাবেই সম্পাদিত করিয়াছিলেন।[১৭]

শ্রীনিবাস-আচার্য দ্বিতীয়বার বৃন্দাবনে আসিলে শ্যামানন্দও ক্ষেত্র হইতে আসিয়া পৌছান। পূর্ববৎ জীব-গোস্বামী তাঁহাদিগকে বাধিত করেন এবং শ্রীনিবাসকে স্বরচিত ‘গোপালচম্পূ’-গ্রন্থখানি শ্রবণ করান। এই সময় রামচন্দ্র-কবিরাজও বৃন্দাবনে আগমন করেন। তখন তাঁহার কবিরাজ-খ্যাতি ছিলনা। জীব-গোস্বামী তৎকৃত-কাব্য-শ্রবণে মুগ্ধ হন এবং তাঁহাকে ‘কবিরাজ’-উপাধি প্রদান করেন। আরও পরে, সম্ভবত জাহ্নবাদেবীর দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন-আগমনকালে তাঁহার সহিত রামচন্দ্রানুজ গোবিন্দ আসিয়া পৌছাইলে তিনি বৃন্দাবন-গোস্বামীদিগের প্রতিভূ-স্বরূপে তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করেন এবং গোবিন্দের গীতামৃতে মুগ্ধ হইয়া রামচন্দ্রেরই মত তাঁহাকেও ‘কবিরাজ’-উপাধি প্রদান করিয়া যথোচিতভাবে পুরস্কৃত ও সম্মানিত করেন। এইবারে তিনি তাঁহার ‘বৃহৎ-ভাগবতামৃতা’দি পাঠ করিয়া জাহ্নবা-ঈশ্বরীকেও যথেষ্টভাবে প্রীত ও সন্তুষ্ট করেন। তারপর তাঁহাদের বিদায়-কালে তিনি শ্রীনিবাসাদির উদ্দেশে আশীর্বাণী-প্রেরণ করিয়া গোবিন্দ-কবিরাজকে তাঁহার স্বরচিত-কবিতাগুলি পাঠাইয়া দিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ জ্ঞাপন করেন এবং তাঁহার হস্তে ‘গোপালবিরুদাবলী’ গ্রন্থখানি অর্পণ করিয়া তাঁহাকে যথেষ্ট উৎসাহিত করেন। বীরচন্দ্রের বৃন্দাবনাগমনকালেও জীব-গোস্বামীর সতর্ক ব্যবস্থার ফলেই তাঁহার যথোচিত সম্মাননার ক্রটি হয় নাই।

রূপ-সনাতনের মৃত্যুর পর যোগ্যতার মর্যাদায় এবং সর্ববিষয়ে জীবই ছিলেন বৃন্দাবনের অধ্যক্ষ। এইদিক দিয়া এবং কর্মতৎপরতার দিক দিয়া তিনি ছিলেন রূপের যোগ্যতম শিষ্য। শ্রীনিবাস-নরোত্তম-রামচন্দ্র-গোবিন্দকে তিনি যশের শিখরে তুলিয়া দিয়াছেন এবং তাঁহার হস্তক্ষেপের ফলেই অন্যান্য কর্মেও অনেকেই কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছেন; কিন্তু এতৎসত্ত্বেও তিনি নামের আকাজ্ক্ষা করেন নাই। আবার অন্যদিকে তিনি ছিলেন যেন বিদ্যার জাহাজ। সনাতন-গোস্বামী ১৪৭৬ শকে (বা ১৫৫৪ খ্রী.-এ) ‘বৈষ্ণবতোষণী’ গ্রন্থ লিখিয়া তাঁহাকেই শোধন করিতে দিয়াছিলেন এবং জীব-গোস্বামী ১৫০০ বা ১৫০৪ শকে (১৫৭৮ বা ১৫৭২ খ্রী.-এ) তাঁহার ‘লঘুতোষণী’ সমাপ্ত করেন। রূপ-গোস্বামীও তাঁহার ‘ভক্তিরসামৃতসিন্ধু’ রচনার শোধনের ভার জীবের উপর অর্পণ করিয়াছিলেন।[১৮] ইহা ছাড়া তিনিও স্বয়ং ভক্তিধর্ম-বিষয়ক বহু গ্রন্থই প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এ বিষয়েও

(১৭) ন. বি.—পৃ. ৭৩-৭৪ (১৮) ভ. র.—৫।১৬৬০

তিনি ছিলেন রূপের যোগ্য-শিষ্য। তাঁহার পঁচিশখানি গ্রন্থ বৈষ্ণবসাহিত্যের এক একটি অমূল্য রত্নবিশেষ। 'হরিনামামৃতব্যাকরণ', 'সূত্রমালিকা', 'ধাতুসংগ্রহ', 'রাধাকৃষ্ণার্চনদীপিকা', 'গোপালবিরুদাবলী', 'রসামৃতশেষ', 'শ্রীমাধবমহোৎসব' (১৫৫৫ খ্রী.-এ রচিত),[১৯] 'সঙ্কল্পকল্পবৃক্ষ', 'ভাবার্থসূচকচম্পূ', 'গোপালতাপনীটীকা', 'ব্রহ্মসংহিতাটীকা', 'রসামৃতটীকা', 'উজ্জ্বলনীলমণিটীকা', 'যোগসারস্তবটীকা', 'অগ্নিপুরাণস্থগায়ত্রীভাষ্যটীকা', 'পদ্মপুরাণস্থশ্রীকৃষ্ণপদচিহ্ন', 'শ্রীরাধিকাকরপদচিহ্ন', 'গোপালচম্পূ' (পূর্ববিভাগ ও উত্তরবিভাগ; ইহার পূর্বভাগ ১৫৮৮ খ্রী.-এ ও উত্তরভাগ ১৫৯২ খ্রী.-এ সমাপ্ত হয়),[২০] 'ষট্‌সন্দর্ভাত্মক-ভাগবতসন্দর্ভ—'তত্ত্বসন্দর্ভ',[২১] 'পরমাত্মসন্দর্ভ', 'কৃষ্ণসন্দর্ভ', 'ভক্তিসন্দর্ভ', 'প্রীতিসন্দর্ভ', 'ক্রমসন্দর্ভ'—শ্রীজীব-রচিত এই পঞ্চবিংশতি গ্রন্থ বৈষ্ণব-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। 'সর্বসংবাদিনী'[২২] এবং সম্ভবত 'দানকেলি কৌমুদী'র টীকাও তাঁহার দ্বারা রচিত হয়।[২৩] এ ছাড়া তিনি তাঁহার গুরু রূপ-গোস্বামীর 'স্তবমালা'ও সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ। তাঁহার সংস্কৃত কবিতাগুলিতেও কবিপ্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। 'পদ্যাবলী'তে তাঁহার যে দুইটি সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার একটিতে তিনি 'শ্রীজীবদাসবাহিনীপতি' এবং অন্যটিতে কেবল 'বাহিনীপতি' বলিয়া উল্লেখিত আছেন।

জীব তাঁহার পিতৃব্যদিগের তুল্য জনপ্রিয়তা অর্জন করিতে পারিয়াছিলেন। বৈষ্ণব-গোস্বামীরা তাঁহাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। তাঁহার প্রতি গোপাল-ভট্টের বাৎসল্য ছিল অগাধ। রঘুনাথদাস তো মৃত্যুর পরেও তাঁহার সহিত একত্রে সমাধিস্থ থাকিবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতেন।[২৪] শ্রীনিবাসাদি তাঁহাকে অসীম শ্রদ্ধা করিতেন। শ্রীনিবাসের জ্যেষ্ঠ-পুত্রের জন্ম-সংবাদ বৃন্দাবনে প্রেরিত হইলে তিনিই শিশুর নাম বৃন্দাবন রাখেন এবং তিনিই তৎশিষ্য ব্যাসাচার্যের পুত্রের নাম গোপালদাস রাখিয়াছিলেন।

বৃন্দাবনে থাকিলেও জীব-গোস্বামী সর্বদা বাংলার সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিতেন। শ্রীনিবাস-আচার্যের সহিত তাঁহার পত্র-বিনিময় হইত।[২৫] গোবিন্দদাসকে তাঁহার 'গীতামৃত' পাঠাইবার জন্য তিনি পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিলে গোবিন্দদাস তাহা

(১৯) চৈ. উ.—পৃ. ১৪৭ (২০) চৈ. উ.—পৃ. ৩২১ (২১) এই পুস্তিকাখানিও রূপ-সনাতনের ইচ্ছায় লিখিত হইয়াছিল। তত্ত্বসন্দর্ভ—।৩। (২২) প্রে. বি.-মতে (২৩শ. বি., পৃ. ২২৬) গ্রন্থখানি লিখা হয় রূপ-পরিত্যক্ত জীবের বনবাসকালে। (২৩) দ্র.—চৈ. উ.—পৃ. ১৫২ (২৪) কর্ণ.—পৃ. ৮৯ (২৫) [শ্রীযুক্ত রাধামাধব তর্কতীর্থ এই পত্রগুলি সম্বন্ধে (Our Hertiage—July-December, 1953), এবং এমন কি জীবের সহিত শ্রীনিবাসের সাক্ষাৎকার সম্বন্ধেও (ঐ—Vol. II, Part I, Jan.-June, 1954—মূল প্রবন্ধগুলি আমি পড়িতে পাই নাই। ডা. বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয় উহা

বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দেন। রাজা বীর-হাম্বীরকেও তিনি পত্র লিখিয়াছিলেন। এই সমস্ত পত্রের মধ্যে বৈষ্ণব-ধর্ম ও ভক্তিতত্ত্বের আলোচনা থাকিত। রামচন্দ্র-কবিরাজ প্রভৃতিও পত্রের মারফতে তাঁহাকে প্রশ্ন করিতেন এবং তিনি তাহার উত্তর পাঠাইয়া দিতেন। এই সমস্ত পত্র হইতে জানা যায় যে তিনি বিভিন্ন সময়ে গৌড়ে প্রচারার্থ 'বৈষ্ণবতোষণী', 'দুর্গমসঙ্গমনী', 'গোপালচম্পূ', এবং 'হরিনামামৃতব্যাকরণ' প্রভৃতি বিভিন্ন গ্রন্থ লোকমারফত পাঠাইয়া দিতেন। বৈষ্ণবধর্ম- ও শাস্ত্র-প্রতিপাদন-বিষয়ে একদিন সনাতন ও রূপ-গোস্বামীর যে স্থান ছিল, তাঁহাদের মৃত্যুর পর ভক্তবৃন্দের মধ্যে জীব-গোস্বামীরও অনুরূপ স্থান হইয়াছিল। ১৫৮২ খ্রী.-এ তিনি তাঁহার 'লঘুতোষণী'-গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। সুতরাং ধরা যাইতে পারে যে ঐ সময়ের পরবর্তী কোনও সময়ে তিনি লোকান্তরিত হন। সম্ভবত নরোত্তমের জীবদ্দশাতেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। নরোত্তম একটি পদে তাঁহার মৃত্যুর উল্লেখ করিয়াছেন।[২৬]

হইতে যে নোট রাখিয়াছেন, তাহাই দয়াপূর্বক আমাকে দেখিতে দেন।) সন্দেহ প্রকাশ করিয়া 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থেরই প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মূল সিদ্ধান্তগুলিই সমর্থনযোগ্য নহে।] (২৬) ন. বি.—১১শ. বি., পৃ. ১৭৯ ; গৌ. ত.—পৃ. ৩২৭ ; প্রে. ব. (পৃ. ১০০-২)- ও নি. বি. (পৃ. ৪৯)-মতে বীরচন্দ্রও বৃন্দাবনে গিয়া তাঁহার সাক্ষাৎ পান ; চৈ. চন্দ্র. (পৃ. ১৬৬)-মতে কানু-ঠাকুরও বৃন্দাবনে গেলে জীবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল।

কৃষ্ণদাস-কবিরাজ

কৃষ্ণদাস[১]-কবিরাজ প্রাচীন ও মধ্য-বাংলা-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি। ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে যে কয়েকজন বৈষ্ণব-গোস্বামী বৃন্দাবনে বসবাস করিতেছিলেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। তিনি তাঁহার বিখ্যাত 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে নিজেকে 'দীন-কৃষ্ণদাস'[২] ও 'দীনহীন-কৃষ্ণদাস'[৩] রূপেও আখ্যাত করিয়াছেন।[৪] ১৩২৪ সালের 'বীরভূমি' (নব পর্যায়)-পত্রিকার ২য়. সংখ্যায় শিবরতন মিত্র মহাশয় কৃষ্ণদাস-কবিরাজ-গোস্বামী সম্বন্ধে বহুবিধ তথ্য প্রদান করিয়াছিলেন এবং কৃষ্ণদাসের পিতৃ-, মাতৃ-, ও ভ্রাতৃ-সম্পর্কিত সেই তথ্যগুলি প্রায় অবিকৃতভাবেই 'বৈষ্ণবদিগ্‌দর্শনী' গ্রন্থমধ্যেও বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু এই সকল বিবরণ কেবল অনুমান-মূলক কিনা জানিবার কোনও উপায় নাই। কবিরাজ-গোস্বামীর জন্মকাল সম্বন্ধে ১৩৪০ সালের 'ভারতবর্ষ'-পত্রিকার চৈত্র-সংখ্যায় অধ্যক্ষ রাধাগোবিন্দ নাথ বিদ্যাবাচস্পতি এম. এ.-মহাশয় লিখিয়াছেন, "১৫২৮ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি কোনও সময়েই তাঁহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা চলে।" ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকার মহাশয় তাঁহার Chaitanya's Life and Teachings-নামক গ্রন্থে (পৃ. ১) কিন্তু বলিয়াছেন যে খুব সম্ভবত তিনি ১৫১৭ খ্রী.-এ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার ধারণা-অনুযায়ী ১৫৩৩ খ্রী.-এ অর্থাৎ ষোল-বৎসর বয়ঃক্রমকালে অকৃতদার কৃষ্ণদাস বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা আরম্ভ করেন।

এই সকল বিবরণের মূলেও কোনও সত্য নিহিত আছে কিনা, জানা যায় না। কিন্তু বৃন্দাবন-গমনের পূর্ব-জীবন সম্বন্ধে স্বয়ং কৃষ্ণদাস-কবিরাজ-গোস্বামী যে সামান্য পরিচয় দিয়াছেন তাহা হইতে শুধু এইটুকু জানা যায় যে তৎকালে তিনি সংকীর্তনানন্দে মত্ত

---

(১) কৃষ্ণদাসের জাতি সম্বন্ধে কাশীনাথ-পণ্ডিতের জীবনীর শেষাংশ দ্রষ্টব্য। (২) চৈ. চ.—২।২৫ (৩) ঐ—৩।১৬ (৪) "বৈদ্যকুলে অনুমান ১৫৩০ খ্রী.-এ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহোদয় জন্মগ্রহণ করেন।" প্রবন্ধকার বলেন যে কৃষ্ণদাসের পিতা, মাতা ও ভ্রাতার নাম ছিল যথাক্রমে ভগীরথ, সুনন্দা ও শ্যামদাস এবং কৃষ্ণদাসের ছয়-বৎসর ও শ্যামদাসের চারি-বৎসর বয়সে তাঁহাদের পিতা পরলোকে গমন করেন। "ভগীরথ কবিরাজী করিয়া অতি কষ্টে পরিবার প্রতিপালন করিতেন।" পিতা ও তাহার পরে মাতার মৃত্যু ঘটিলে অনাথ শিশুদ্বয় 'অপুত্রা পিতৃষসার গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিল।' কৃষ্ণদাসের ২৬ বৎসর বয়সে মাতৃষসার মৃত্যু ঘটিলে কৃষ্ণদাস ভ্রাতার উপর বিষয়াদির ভার দিয়া সাধন-ভজনে মগ্ন হইয়াছিলেন। "তিনি আদৌ দার পরিগ্রহ করিলেন না। এইরূপে তিনি প্রায় বিংশতিবর্ষ ধরিয়া নানাবিধ শাস্ত্রালোচনায় কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।" 'স্বরূপদামোদরের কড়চা' (পৃ.৩৪) -নামক বাংলা ভাষায় লিখিত একটি পুথিতে লিখিত হইয়াছে যে কৃষ্ণদাসের ভগ্নীর নাম ছিল কৌশল্যা।

থাকিতেন। একদিন তাঁহাদের বাড়ীর কীর্তন-আসরে নিমন্ত্রিত নিত্যানন্দ-ভৃত্য মীনকেতন-রামদাসের সম্মুখে কৃষ্ণ-মূর্তির সেবক বিপ্র গুণার্ণব-মিশ্র নিত্যানন্দের সম্ভাষণ না করায় রামদাস তাঁহাকে ভর্ৎসিত করেন। পরে তিনি চলিয়া গেলে চৈতন্য-ভক্ত কৃষ্ণদাস-ভ্রাতাও নিত্যানন্দ সম্বন্ধে অনাস্থা জ্ঞাপন করায় রামদাস অত্যন্ত আহত হন।[৫] কিন্তু কৃষ্ণদাস স্বয়ং জানিতেন যে চৈতন্য ও নিত্যানন্দ 'দুই ভাই এক তনু সমান প্রকাশ।' তিনি তাঁহার ভ্রাতাকে[৬] যথেষ্টরূপে তিরস্কৃত করিতে থাকেন। ফলে তৎক্ষণাৎ অভিশপ্ত ভ্রাতার এক সর্বনাশ আসিয়া উপস্থিত হইল। তারপর সেই রাত্রিতেই নিত্যানন্দপ্রভু কৃষ্ণদাসকে স্বপ্নে দর্শন-দান করিলেন।[৭] "নৈহাটি নিকটে ঝামটপুর গ্রাম। তাঁহা স্বপ্নে দেখা দিলা নিত্যানন্দ রাম॥"[৮] স্বপ্নে তিনি কৃষ্ণদাসকে বৃন্দাবন-গমনের নির্দেশ প্রদান করিলে কৃষ্ণদাস কাল-বিলম্ব না করিয়া বৃন্দাবনে গিয়া রূপ-সনাতন-রঘুনাথের সহিত মিলিত হইলেন।

'প্রেমবিলাস'-কার বলেন[৯] যে কৃষ্ণদাসকে 'দর্শন দিলেন নিত্যানন্দ গুণধাম।' তাহার পরে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে কৃষ্ণদাস 'নিজ গ্রন্থে লিখে প্রভুর শিষ্য আপনাকে' এবং তিনি বৃন্দাবনে গিয়া

আশ্রয় করিল রঘুনাথের চরণ ॥
কেন হেন লিখে কেন করয়ে আশ্রয়।
সেই বুঝে যার মহা-অনুভব হয় ॥

এই বলিয়া তিনি কবিরাজ-গোস্বামী যে রঘুনাথের চরণ-আশ্রয় সম্বন্ধে কেন হেন লিখিয়াছেন তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু 'নিজ গ্রন্থে' রঘুনাথ কি লিখিয়াছেন সে সম্বন্ধে তিনি সচেতন থাকিয়াও কবিরাজ-গোস্বামীর 'স্বপ্নে দেখা দিলা নিত্যানন্দ রাম।'—এই অংশটুকুর কোনও ব্যাখ্যা প্রদান করেন নাই। 'চৈতন্যচরিতামৃতে' অবশ্য 'প্রভু মোরে দিলা দরশন।'—ইহাও লিখিত আছে। কিন্তু ইহার ঠিক পরেই 'স্বপ্নে দেখা দিলা' বলিয়া কবিরাজ-গোস্বামী দর্শন ও স্বপ্ন-দর্শন সম্বন্ধে পাঠককে নিঃসন্দেহ করিয়াছেন। তাহাছাড়া, নিত্যানন্দ যে-বেশে ও যেরূপ সমারোহ সহকারে কৃষ্ণদাসকে দর্শন দিয়াছিলেন, তাহা সম্ভবত স্বপ্নেই সম্ভব। শেষে কবি বলিতেছেন:

অন্তর্ধান কৈল প্রভু নিজগণ লঞা ॥
মূর্ছিত হইয়া মুঞি পড়িনু ভূমিতে।
স্বপ্নভঙ্গ হৈলে দেখি হঞাছে প্রভাতে ॥

---

(৫) এই সম্বন্ধে রামদাস-অভিরামের জীবনী দ্রষ্টব্য। (৬) শ্যামদাস—গৌ.ভ.—উপক্রম., পৃ. ৮০ (৭) প্রে. বি.—১৮শ. বি., পৃ. ২৭১-৭২ (৮) চৈ.চ.—১।৫; বৈ.দ.-মতে (পৃ.৩৩৪) "গঙ্গার পশ্চিমতীরে উদ্ধারণপুর। তার উত্তর পশ্চিমে তিন ক্রোশ দূর॥ নৈহাটি নিকটে ঝামটপুর নামে গ্রাম।" (৯) ১৮শ. বি., পৃ. ২৭১-৭২

সুতরাং দর্শন ও স্বপ্ন-দর্শন সম্বন্ধে নিত্যানন্দদাসের উক্ত প্রকার ভুল, অনবধানতা বশত ঘটিয়া থাকিতেও পারে ; কিন্তু ইহা পরবর্ত্তিযুগের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।[১০]

চৈতন্য-আভাষিত ধর্মের ব্যাখ্যার ভার প্রত্যক্ষভাবে রূপ-সনাতনের উপরেই পড়িয়াছিল। সেজন্য চৈতন্য স্বয়ং তাঁহাদিগকে সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন। কিন্তু 'সনাতন গোস্বামী অপেক্ষা রূপ গোস্বামীই চৈতন্য-প্রবর্তিত ধর্মের তত্ত্ব ও দর্শনের ব্যাখ্যাতা ও শাস্ত্রকৃৎ হিসাবে বেশী কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন'[১১] বলিয়া তাঁহার এই কর্মতৎপরতার জন্য বোধকরি তাঁহার সহিত কৃষ্ণদাসের সাক্ষাৎ যোগাযোগ বিশেষভাবেই ঘটিয়াছিল। তাই কৃষ্ণদাস তাঁহার প্রতি অধিকতর আনুগত্যের কথা স্বীকার করিয়া নিজেকে 'রূপগোসাঁইর ভৃত্য'রূপে আখ্যাত করিয়াছেন।[১২] কিন্তু কৃষ্ণদাস-কবিরাজ-গোস্বামী তাঁহার গ্রন্থের কোনও স্থলে স্বীয় দীক্ষাগুরু হিসাবে কাঁহারও নামোল্লেখ না করায় তাঁহার দীক্ষাগুরুর নাম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা আসিয়া পড়ে। শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয় তাঁহার 'চৈতন্যচরিতামৃতের ভূমিকা'য় কতকগুলি বিশেষ প্রমাণবলে রঘুনাথ-ভট্ট-গোস্বামীকেই কবিরাজ-গোস্বামীর দীক্ষাগুরু বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তৎপ্রদত্ত যুক্তিগুলি প্রণিধান-যোগ্য। কেহ কেহ আবার নিত্যানন্দকেও কৃষ্ণদাসের দীক্ষাগুরু বলিয়া মনে করেন।[১৩] কিন্তু বৃন্দাবনে তিনি (কৃষ্ণদাস) ছিলেন রঘুনাথদাসেরই ঘনিষ্ঠ নিত্য-সঙ্গী। সেইজন্য রঘুনাথের প্রতিই তাঁহার আনুগত্য ছিল সর্বাধিক। কেবল সঙ্গী বলিয়া নহে। এতবড় চিন্তাশীল ও প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে কেবলমাত্র সঙ্গই আকর্ষণের সমূহ-বিষয় হইতে পারেনা। মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ-সেবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সাধক ছিলেন স্বরূপদামোদর। আর সেই স্বরূপের প্রিয়-শিষ্য হিসাবে রঘুনাথও মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ-সেবার অধিকারী হইয়া সাধ্য-সাধন-তত্ত্বের যিনি চরম ও পরম ভাণ্ডারী, তাঁহার ঐকান্তিক কৃপালাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়াই কৃষ্ণদাসের এই আত্যন্তিক আকর্ষণ। তাই তিনি সর্বত্র রূপ-সনাতন-স্বরূপ এবং ভট্ট-গোস্বামীদিগের প্রতি তাঁহার প্রণতি জানাইলেও রূপ-সনাতন এবং রঘুনাথদাসকেই বিশেষভাবে 'গুরু' বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তাহার মধ্যেও আবার 'এই তিন গুরু সার রঘুনাথ দাস।'[১৪] তাই বহির্জীবন ও উচ্চতর মানস-জগতের এই সঙ্গ-শিক্ষা[১৫]-প্রাপ্তি-বিষয়ক গুরুক্রম-বর্ণনায় কবিরাজ-গোস্বামী তাঁহার এই 'সারগুরু'কেই 'শ্রীগুরু'[১৬] আখ্যায় বিভূষিত করিয়াছেন, এবং তাঁহার গ্রন্থের শেষ

(১০) দ্র.—স্ব. ক. সূ., পৃ. ৩ (১১) বা. সা. ই.—১ম. সং., পৃ. ৩২৫ (১২) চৈ. চ.—৩।১৯ (১৩) বাংলা সাহিত্য (ডা. মনোমোহন ঘোষ)—পৃ. ১৩৩ (১৪) চৈ. চ.—৩।৪, পৃ. ৩০৯ (১৫) ঐ—১।১, পৃ. ৪ (১৬) ঐ—৩।২০, পৃ. ৩৭৭-৭৮

পরিচ্ছেদে অন্যান্য গোস্বামী- ও ভক্ত-বৃন্দের সহিত রূপ ও রঘুনাথের নাম কয়েকবার উল্লেখ করিয়াও পুনরায় 'শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ'—বলিয়া তাঁহার 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থের সমাপ্তি-রেখা টানিয়া দিয়াছেন। গ্রন্থের প্রায় সকল পরিচ্ছেদের সমাপ্তি-সূচক শ্লোকে পৃথকভাবে রূপ-রঘুনাথের প্রতি তাঁহার এই বিশেষ শ্রদ্ধা-জ্ঞাপন পাঠক মাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।[১৭]

'প্রেমবিলাসে'র ষোড়শ বিলাসে কিন্তু রঘুনাথদাসকে কৃষ্ণদাস-কবিরাজের গুরু বলা হইয়াছে।[১৮] গ্রন্থকার লিখিয়াছেন :

শ্রীরূপের শিষ্য জীব সেইরূপ রাগী।
যার আজ্ঞাবলে বৃন্দাবনে কর্মত্যাগী ॥
দাস গোসাঞির শিষ্য যেহ কবিরাজ।
যাঁহার বর্ণন কৈল ঘোষে জগমাঝ ॥
দুই গোসাঞির শিষ্য কৈল দুই বিষয়।

জীব ও কবিরাজ সম্বন্ধে এই স্থলে 'শিষ্য' বলিতে যে মন্ত্রশিষ্য বুঝাইতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। আবার গ্রন্থকার যেস্থলে কৃষ্ণদাস-কবিরাজের নিত্যানন্দ-দর্শনের উল্লেখ করিয়াছেন, সেইস্থলেও রঘুনাথদাস সম্বন্ধে বলিতেছেন :

হেন বৈরাগ্য অধিকার প্রিয় কেবা আছে।
কবিরাজ যার শিষ্য রহিলেন কাছে ॥

আবার নরোত্তমদাসের 'গুরুশিষ্য সংবাদে'র মধ্যেও লেখক রঘুনাথদাস-গোস্বামীকেই কবিরাজ-গোস্বামীর গুরু বলিয়া বর্ণিত করিয়াছেন। কিন্তু স্বয়ং কৃষ্ণদাস-কবিরাজের নিজের কথা হইতেই তাঁহার দীক্ষাগুরুর নাম বাহির করা প্রায় অসম্ভব। নিত্যানন্দ সম্বন্ধীয় স্বপ্ন-দর্শনের পর তাঁহার জীবনের মোড় একেবারেই পরিবর্তিত হইয়া যাওয়ায় নিত্যানন্দের প্রতি তাঁহার আনুগত্যের সীমা নাই। আবার রূপ-গোস্বামী ও রঘুনাথদাস-গোস্বামীর প্রতিও তাঁহার কৃতজ্ঞতা অসীম। অন্যদিকে রঘুনাথ-ভট্টের দাবিও আসিয়া পড়িতেছে।

এই সমস্ত ছাড়া আরও কতকগুলি বিষয় লক্ষণীয় হইয়া উঠে। গ্রন্থ-রচনারম্ভের পূর্বে কবিরাজ-গোস্বামী সর্বজন সমক্ষে যে-মদনমোহনের আজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার সম্বন্ধে তিনি লিখিতেছেন[১৯] :

(১৭) সম্ভবত এই কারণের জন্যই স্যার যদুনাথ সরকারও কৃষ্ণদাস সম্পর্কে জানাইয়াছেন (Chaitanya's Life and Teachings—p. 1), "He entered himself as a student of Rup Gaswami, but was later initiated as a Vaishnav monk by Raghunath Das."
(১৮) পৃ. ২১৯ ; ১৮শ. বি., পৃ. ২৭১ (১৯) ১।৮, পৃ. ৪৮

কুলাধিদেবতা মোর মদনমোহন।
যাঁর সেবক রঘুনাথ রূপ সনাতন ॥

"কুলাধিদেবতা' কথাটির মধ্যে বিশেষ কোনও ইঙ্গিত আছে কিনা, বুঝা যাইতেছেনা। এই মদনমোহন সম্বন্ধেই তিনি একটু পূর্বে জানাইয়াছেন :

শ্রীগোবিন্দদেব নাম সাক্ষাৎমদন।

এবং তিনি গ্রন্থের অন্যত্রও জানাইয়ছেন[২০] :

শ্রীমন্মদনগোপাল-গোবিন্দ-দেব-তুষ্টয়ে।
চৈতন্যার্পিতমস্ত্বেতচ্চৈতন্যচরিতামৃতম্ ॥

এইস্থলে মদনমোহন বা মদনগোপাল এবং গোবিন্দ, উভয় দেবতার প্রতিই সমানভাবে শ্রদ্ধা-প্রদর্শন করা হইয়াছে। সুতরাং 'কুলাধিদেবতা' মদনমোহন বলিতে সাধারণভাবে কৃষ্ণকেও বুঝাইতে পারে। তাছাড়া, উক্ত স্থলে মদনমোহনের সেবক-হিসাবে রূপ-সনাতনের সহিত রঘুনাথের নাম উল্লেখিত থাকাতেও এইরূপ ধারণা জন্মে। এইস্থলে রঘুনাথের নামই সর্বাগ্রে উল্লেখিত হইয়াছে এবং মদনমোহনের নিকট আজ্ঞাগ্রহণ প্রসঙ্গে গ্রন্থকার বলিতেছেন :

গোসাঞিদাস পুজারী করেন চরণ সেবন ॥
প্রভুর চরণে যদি আজ্ঞা মাগিল।
প্রভু কণ্ঠ হইতে মালা খসিয়া পড়িল ॥
সর্ব বৈষ্ণবগণ হরিধ্বনি দিল।
গোসাঞিদাস আনি মালা মোর গলে দিল ॥

এই গোসাঞিদাস যে কে, তাহার মীমাংসা সমস্যার বিষয়। মদনমোহনের সেবা-অধিকারী হিসাবে গদাধর-পণ্ডিতের শিষ্য কৃষ্ণদাস-ব্রহ্মচারী নিযুক্ত ছিলেন। 'ভক্তিরত্নাকর' মতে বীরচন্দ্রের-বৃন্দাবন-গমনকালেও তিনি সেই স্থলাভিষিক্ত ছিলেন।[২১] গোবিন্দের প্রথম সেবক ছিলেন কাশীশ্বর-গোসাঁই এবং তাহার পরে শ্রীকৃষ্ণ-পণ্ডিত।[২২] তারপর অনন্ত-আচার্য এবং তাহারও পরে সম্ভবত হরিদাস-পণ্ডিত-গোসাঁই।[২৩] গোপীনাথের সেবক ছিলেন মধু-পণ্ডিত এবং সম্ভবত তৎপূর্বে পরমানন্দ-ভট্টাচার্য। আবার মাধবেন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত গাঠুলীর গোপাল-সেবার জন্য রঘুনাথদাস বিঠ্ঠলনাথকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।[২৪] এই সমস্ত ছাড়াও সেবার অধ্যক্ষ-হিসাবে যে পণ্ডিত-হরিদাসের নাম পাওয়া যায় তিনিও পূর্বোক্ত গোবিন্দাধিকারী এবং এই প্রসঙ্গে গোবিন্দ-সেবক গোবিন্দ-গোসাঁই প্রভৃতি আর কয়েক-জনের নামও দৃষ্ট হয়। কিন্তু তাঁহাদের কাঁহাকেও গোসাঁইদাস বলিয়া নির্দেশ করা হয়

---

(২০) ২।৫ (শেষ পরিচ্ছেদ) পৃ. ২৯৯; গ্রন্থারম্ভেও তিনি রাধা এবং মদনমোহন উভয়েরই জয়ঘোষণা করিয়াছেন (১।১; পৃ. ১) (২১) দ্র.—কৃষ্ণদাস-ব্রহ্মচারী (২২) দ্র.—শ্রীকৃষ্ণ-পণ্ডিত (২৩) দ্র.—হরিদাস-পণ্ডিত গোসাঁই (২৪) দ্র.—রঘুনাথদাস

নাই। 'নিত্যানন্দের বংশবিস্তার' নামক গ্রন্থে 'মুখ্য হরিদাস আর গোসাঞিদাস পূজারি'র উল্লেখ আছে।[২৫] সুতরাং উভয়কে পৃথক ব্যক্তি বলিয়া জানা যায়। তাছাড়া, তাঁহারা যে এক ব্যক্তি, তাহা অনুমান করিয়া লইবার কারণাভাবও রহিয়াছে। আবার অন্যদিকে দাস-গোসাঁই বলিতে গ্রন্থকার-গণ রঘুনাথদাসকেই বুঝাইতেন।[২৬] কিন্তু গোসাঁইদাস সর্বত্রই অলভ্য। অথচ দাস-গোসাঁইর সহিত অদ্ভুত নাম-সামঞ্জস্য থাকিয়া যাওয়ায় গোসাঁইদাসের বিষয়টিও অনুপেক্ষণীয় হইয়া উঠে এবং ইহা দাস-গোসাঁইর ও কৃষ্ণদাসের সম্পর্কটিকে আরও জটিল এবং দুর্বোধ্য করিয়া তুলে। তবে 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র মূল-স্কন্ধ-শাখা-বর্ণনের মধ্যে কবিরাজ-গোস্বামী সনাতন-রূপাদি সকলের কথা উল্লেখ করিলেও তদ্বর্ণিত রঘুনাথ দাস-গোস্বামীর প্রসঙ্গটি সর্বাপেক্ষা অধিক দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আবার বর্ণনার মধ্যেও যথেষ্ট বিশেষত্ব রহিয়াছে। বর্ণনা শেষ করিয়া তিনি বলিতেছেন :

তাঁহার সাধন রীতি কহিতে চমৎকার।
সেই রঘুনাথ দাস প্রভু যে আমার ॥

এই বিশেষ পরিচ্ছেদটির মধ্যে রূপ-সনাতন বা রঘুনাথ-ভট্টাদির বিশেষ উল্লেখ করিলেও আর কাহারও সম্বন্ধে কিন্তু তিনি এইরূপ উক্তি করেন নাই। সুতরাং একমাত্র রঘুনাথদাস সম্পর্কে এই বিশেষ উল্লেখের গুরুত্ব কিছুই অস্বীকৃত হইতে পারে না। আবার বৃন্দাবন হইতে দূরে সরিয়া গিয়া কেনই বা যে তিনি চিরকাল রঘুনাথদাসের সহিত একত্রে থাকিয়া তাঁহারই পরিচর্যা করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার তিরোভাবের পরেও কেনই বা যে চৈতন্য-প্রদত্ত ও রঘুনাথদাস-সেবিত গোবর্ধন-শিলা-পূজার উত্তরাধিকার তাঁহার উপর আসিয়া পড়িয়াছিল, তাহাও এক চিন্তার বিষয় বটে।

যাহা হউক, কৃষ্ণদাস রঘুনাথদাসের ভক্তশিষ্য হিসাবে রাধাকুণ্ডেই স্থায়িভাবে বসবাস করিতেছিলেন। তিনি এইখানে থাকিয়া নানাবিধ শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতেন। একদিকে যেমন তিনি রূপ- ও সনাতন-গোস্বামীর নিকট ভক্তিধর্ম-সম্বন্ধীয় সকল তত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অন্যদিকে তেমন তিনি রঘুনাথের নিকট চৈতন্য-চরিতের সমূহ তথ্য শ্রবণ করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। চৈতন্যের জীবন-সায়াহ্নে স্বরূপের সহিত রঘুনাথও তাঁহার সঙ্গী-হিসাবে বাস করিতেছিলেন এবং 'চৈতন্যলীলা রত্নসার স্বরূপের ভাণ্ডার তিঁহ থুইলা রঘুনাথের কণ্ঠে।'[২৭] সেই রঘুনাথের সান্নিধ্য-লাভ করায় বিশেষ করিয়া মহাপ্রভুর শেষ-জীবন সম্বন্ধে কৃষ্ণদাসের যথেষ্ট পরিচয় ঘটিয়াছিল। অথচ মহাপ্রভুর এই শেষ-জীবন সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য-সংবলিত সর্বজনবোধ্য কোন পুঁথি ছিলনা। 'স্বরূপদামোদরের কড়চা'

---

(২৫) পৃ. ৩৩ (২৬) প্রে. বি.—১৬শ. বি., পৃ. ২১৯ ; অ. র.—৫ম. ম., পৃ. ৩০ ; শু. স.—পৃ. ৪
(২৭) চৈ. চ.—২।২, পৃ. ৯৪

প্রামাণিক গ্রন্থ বটে, কিন্তু তাহা সংক্ষিপ্ত, এবং তাহা সহজগম্য বা সর্বজনবোধ্য ছিলনা। আবার 'মুরারিগুপ্তের কড়চা' বিশেষভাবে চৈতন্যের বাল্যলীলা লইয়া লিখিত। বৃন্দাবন-দাসের 'চৈতন্যমঙ্গল'ও[২৮] প্রায় তাহাই। তাই মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলা সম্বন্ধীয় একটি গ্রন্থের অভাব বিশেষভাবেই অনুভূত হইয়াছিল। এদিকে কৃষ্ণদাসের বিরাট প্রতিভা, পাণ্ডিত্য এবং চৈতন্য-জীবন সম্বন্ধে সবিশেষ পরিচয়ের সংবাদ বৃন্দাবনের সর্বত্রই পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। পণ্ডিত হরিদাস একদিন তাঁহাকে ধরিয়া বসিলেন,—'গৌরাঙ্গের শেষলীলা' লিখিয়া দিতে হইবে।[২৯] গোবিন্দ-গোসাঁই, যাদবাচার্য-গোসাঁই, ভূগর্ভ-গোসাঁই, গোবিন্দ-পূজক চৈতন্যদাস, কুমুদানন্দ-চক্রবর্তী প্রেমী-কৃষ্ণদাস, শিবানন্দ-চক্রবর্তী প্রভৃতি সকলেই একত্রে যোগ দিলেন। তারপর একদিন সকলের অনুরোধে এবং মদনগোপালের প্রসাদীমালা প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণদাস গ্রন্থ আরম্ভ করিলেন। পূর্ব-সূরী 'চৈতন্যমঙ্গল'[৩০]-রচয়িতা বৃন্দাবনদাসের নিকট আজ্ঞা[৩১] লইতেও তিনি ভুলিয়া গেলেন না; এবং কৈফিয়তও থাকিল[৩২]—

দামোদর স্বরূপ আর গুপ্ত মুরারি।
মুখ্য মুখ্য লীলা সূত্রে লিখিয়াছে বিচারি॥
সেই অনুসারে লিখি লীলাসূত্রগণ।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন তাহা দাস বৃন্দাবন॥
চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস।
মধুর করিয়া লীলা করিয়া প্রকাশ
গ্রন্থ বিস্তার ভয়ে তিঁহো ছাড়িল যে যে স্থানে।
সেই সেই স্থানে কিছু করিব ব্যাখ্যানে॥
প্রভুর লীলামৃত তিঁহো কৈল আস্বাদন।
তার ভুক্ত শেষ কিছু করিয়ে চর্বণ॥

"কৃষ্ণদাস কবিরাজ ৬০ খানি বিখ্যাত সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে নানাবিধ অমূল্যরত্ন উদ্ধার করিয়া গ্রন্থের গৌরববৃদ্ধি এবং আপনার পাণ্ডিত্যের প্রমাণ করিয়াছেন।"[৩৩] ইহা ছাড়াও,

সেই লিখি যেই মহান্তের মুখে শুনি।
ইথে অপরাধ মোর না লইহ ভক্তগণ।

সুতরাং সমগ্র গ্রন্থের মাত্র এক-পঞ্চমাংশ সমাপ্তির পর মধ্য-লীলা লিখিতে আরম্ভ করিয়া তিনি

(২৮) ঐ—১।৮, পৃ. ৪৮ ; ২।১, পৃ. ৮১ (২৯) ঐ—১।৮, পৃ. ৪৮ (৩০) ঐ—১।৮, পৃ. ৪৭ (৩১) ঐ—১।৮, পৃ. ৪৮ ; ২।১, পৃ. ৮১ (৩২) ১।১৩, পৃ. ৬০, ৬৯ ; ২।১, পৃ. ৮০ ; ২।২, পৃ. ৯৪ (৩৩) 'বৈষ্ণবমহা অধিবেশন'—ব. সা. প. প. (রংপুরশাখা), vol. i+ii ; গৌ. ভ. (প. প.)—পৃ. ৮১

'বৃদ্ধ জরাতুর'[৩৪]-বিধায় তাঁহার 'আয়ু' সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়াছিলেন। তখন তাঁহার হাত কাঁপিতেছে, চক্ষু কর্ণ শিথিল হইয়াছে, কিছুই স্মরণ থাকিতেছেনা। "তবু লিখি এ বড় বিস্ময়।" ইহা তাঁহার একান্ত বিনয়োক্তি হইলেও তিনি যে গ্রন্থ শেষ করিতে পারিবেন, তাঁহার নিজের এইরূপ বিশ্বাস ছিল না। তাই তিনি মধ্য-লীলার প্রথমেই 'অন্ত্যলীলার সার। সূত্রমধ্যে বিস্তার করি কিছু করিল বর্ণন'; এবং তিনি অন্ত্যলীলা বর্ণনা করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া আরম্ভেই সেই পূর্ব-বিস্তৃতির কৈফিয়ত দিয়াছেন। সম্পূর্ণ গ্রন্থ সমাপ্তির পর তিনি 'বৃদ্ধ জরাতুর' 'অন্ধ বধির' 'নানারোগগ্রস্ত' 'পঞ্চরোগ পীড়ায় ব্যাকুল' হইয়াছেন, এবং "হস্তহালে মনোবুদ্ধি নহে মোর স্থির।" ইহা বিনয়ের আধিক্য হইলেও নিছক বিনয় নাও হইতে পারে। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও এবং সমস্ত সম্ভাব্য-সূত্র হইতে সর্বপ্রকার সাহায্য গ্রহণ করিলেও তিনি যাহা রচনা করিলেন, তাহা কেবল বাংলা বা ভারতীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে নহে, বিশ্বসাহিত্যের ক্ষেত্রেও অক্ষয় সম্পদরূপে গণ্য হইতে পারে। উদ্ধবদাস একটি পদে[৩৫] বলিয়াছেন যে 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র রচয়িতার নিকট 'যুক্তিমার্গে সবে হারি মানে।' বাংলা-সাহিত্য সৃষ্টিতে প্রকৃতপক্ষে তিনিই যে সর্বপ্রথম 'যুক্তিমার্গ' অবলম্বন করিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি ছিলেন তাঁহার যুগ অপেক্ষা অন্তত কয়েক শতাব্দীর অগ্রবর্তী।

'চৈতন্যচরিতামৃতে'র তারিখ সম্বন্ধে ইহার কোন-কোন পুথিতে 'শাকেসিন্ধ্বগ্নি বাণেন্দৌ' প্রভৃতি যে পুষ্পিকা-শ্লোকটি পাওয়া যায়, তদনুযায়ী জানা যায় যে গ্রন্থটি ১৬১৫খ্রী.-এ সমাপ্ত হইয়াছিল। আবার অন্য কতকগুলি পুথিতে এবং 'প্রেমবিলাসের'র চতুর্বিংশ বিলাসের 'শাকেহগ্নি বিন্দুবাণেন্দৌ' প্রভৃতি শ্লোক-অনুযায়ী গ্রন্থটির রচনাকাল ১৫৮১ খ্রী.। ১৯৩৩ খ্রী.-এর **Indian Historical quarterly**-তে ডা. সুশীল কুমার দে 'চৈতন্যচরিতামৃত'-গ্রন্থে 'গোপালচম্পূ'র উল্লেখ দেখাইয়া বলিয়াছেন যে গোপালচম্পূ ১৫৯২ খ্রী.-এ রচিত হইয়া থাকিলে 'চৈতন্যচরিতামৃত'-গ্রন্থের সমাপ্তিকে পরবর্তী তারিখের সহিত সম্পর্কিত ধরিতে হয়। অপরপক্ষে, ১৬০০ খ্রী.-এ রচিত 'প্রেমবিলাসে'র এবং ১৬০৭ খ্রী.-এ রচিত 'কর্ণানন্দে' 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র উল্লেখ দেখিয়া কেহ কেহ এ সম্বন্ধে পূর্ববর্তী তারিখটিকেই অধিকতর সমীচীন বলিয়া মনে করেন। কিন্তু আপাতত এ-সম্বন্ধে কোনও স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার উপায় নাই। দুই, পাঁচ, কি দশ বৎসরের ব্যাপার নহে। দীর্ঘ ৩৪ বৎসরের ব্যবধানে থাকিয়াও সুধীবৃন্দ প্রত্যেকে তাঁহাদের নিজ নিজ আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিতে চাহেন।

বৃন্দাবনে কবিরাজ-গোস্বামীর একটি বিশেষ স্থান ছিল। তিনি রূপ-সনাতনের নিকট

---

৩৪) ২।২ , পৃ. ৯৪ (৩৫) গৌ. ত.—পৃ. ৩১৪

ভক্তি-শাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন, রঘুনাথের নিকট হইতে প্রত্যক্ষ-সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন, কাশীশ্বর- লোকনাথ-গোস্বামীর সহিত ঘনিষ্ঠ-সূত্রে আবদ্ধ হইতে পারিয়াছিলেন। সনাতন-গোস্বামী 'হরিভক্তিবিলাসে'[৩৬], কাশীশ্বর-লোকনাথের সহিত তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা-জ্ঞাপন করিয়াছেন ; জীব-গোস্বামীও 'বৈষ্ণবতোষণী'-গ্রন্থে[৩৭] কাশীশ্বর-লোকনাথের সহিত তাঁহার বন্দনা গাহিয়াছেন। পূর্বে তিনি 'গোবিন্দলীলামৃত' এবং 'কৃষ্ণকর্ণামৃতের টীকা' প্রণয়ন করিয়া প্রসিদ্ধি-লাভ করিয়াছিলেন, এক্ষণে 'চৈতন্যচরিতামৃত'[৩৮] রচনা করিয়া অমরত্ব লাভ করিলেন। ইহাছাড়াও, 'বীরভূমি পত্রিকা'র (নব পর্যায়) তৃতীয়-বর্ষের দ্বিতীয়-সংখ্যায় শিবরতন মিত্র মহাশয় কৃষ্ণদাস-কবিরাজ লিখিত নিম্নোক্ত গ্রন্থরাজির উল্লেখ করিয়াছিলেন—'ভাগবতশাস্ত্রগূঢ়রহস্য', 'অদ্বৈতসূত্রের কড়চা', 'স্বরূপবর্ণনা', 'বৃন্দাবনধ্যান', 'ছয় গোস্বামীর সংস্কৃতসূচক', 'চৌষট্টিদণ্ড নির্ণয়', 'প্রেমরত্নাবলী', 'বৈষ্ণবাষ্টক', 'রাগমালা', 'শ্রীরূপগোস্বামীর গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার', 'রাগময়করণ', 'পাষণ্ডদলন', 'বৃন্দাবনপরিক্রম', 'রাগরত্নাবলী', 'শ্যামানন্দ-প্রকাশ', সারসংগ্রহ' প্রভৃতি। কিন্তু এই সমস্ত নামের বহু পুথি বিভিন্ন পাঠাগারে রক্ষিত হইলেও ইহাদের সকল বা অনেকানেক লেখক যে প্রসিদ্ধ 'কৃষ্ণদাস' নামের অন্তরালে থাকিয়া আত্মগোপন করিয়া আছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে কবিরাজ-গোস্বামী একজন পদকর্তাও ছিলেন।[৩৯] কিন্তু কৃষ্ণদাস-ভণিতাযুক্ত যতগুলি পদ পাওয়া যায় তাহার কতগুলি যে তদ্রচিত, তাহা জানিবার উপায় নাই। স্বতন্ত্র-পদ না হইলেও 'চৈতন্যচরিতামৃত'-গ্রন্থে উদ্ধৃত যে পাঁচটি পদ 'পদকল্পতরু'তেও গৃহীত হইয়াছে, অন্তত সেইগুলি যে কবিরাজ-গোস্বামী-রচিত তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। 'পদ্যাবলী'তে কৃষ্ণদাস-কবিরাজ-কৃত কোনও শ্লোক উদ্ধৃত হয় নাই।

কবিরাজ-গোস্বামী দীর্ঘ-জীবন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীনিবাস-আচার্য, নরোত্তম এবং শ্যামানন্দ বৃন্দাবনে আসিলে তিনি তাঁহাদের অভিনন্দিত করেন।[৪০] শ্রীনিবাসের দ্বিতীয়বার বৃন্দাবনে অবস্থানকালে প্রথমে শ্যামানন্দ এবং তারপর রামচন্দ্র-কবিরাজ, বৃন্দাবনে কৃষ্ণদাসের সহিত মিলিত হন।[৪১] তাহারও পরে জাহ্নবা-ঈশ্বরীর দ্বিতীয়বার বৃন্দাবনাগমন-কালে রঘুনাথদাস-গোস্বামী যখন চলচ্ছক্তি-বিহীন[৪২] ও শিথিলেন্দ্রিয়প্রায় হইয়া পড়িয়াছেন, তখন তিনি স্বয়ং বৃন্দাবন পর্যন্ত আসিয়া জাহ্নবা-ঈশ্বরীকে দাস-গোস্বামীর নিবেদন জানাইয়া রাধাকুণ্ডে লইয়া যান এবং রঘুনাথের নিকট ঈশ্বরীর আগমন সংবাদ জ্ঞাপন করেন।[৪৩]

---

(৩৬) মঙ্গলাচরণ, ৪র্থ শ্লোক (৩৭) মঙ্গলাচরণ (৩৮) বৈ.দি.-মতে (পৃ. ১০৫) শ্রীনিবাস দ্বিতীয়বার বৃন্দাবনে গেলে জীব-গোস্বামী অন্যান্য কতিপয় গ্রন্থের সহিত চৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থখানিও গৌড়ে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। (৩৯) প. ক. (প.) —পৃ. ৩৯ (৪০) ভ. র.—৬।২৯০, ৫৩৬ (৪১) ঐ—৯।২১১ (৪২) ঐ—১১।১৫০ (৪৩) ঐ—১১।১৬৩

ঈশ্বরীর সঙ্গী গোবিন্দ-কবিরাজকেও তিনি সেইবার বিশেষভাবে স্নেহাভিনন্দন জানান। তারপর বীরচন্দ্র বৃন্দাবনে আসিলে গোবর্ধন হইতে ফিরিবার পথে তিনিও কবিরাজ-গোস্বামীর কুটিরে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং কৃষ্ণদাস বীরভদ্রের সহিত বৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন।

তৎকালে গৌড়-বৃন্দাবনের মধ্যে পত্র বিনিময় চলিত। জীব-গোস্বামীর এইরূপ একটি পত্রে কবিরাজ-গোস্বামী গোবিন্দ-কবিরাজকে তাঁহার নমস্কার প্রেরণ করেন।[৪৪] এই সময়ে মুকুন্দদাস নামক পাঞ্চাল-দেশীয় এক বিপ্র কবিরাজ-গোস্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহার নিকট অধ্যয়নকালে[৪৫] তাঁহার সেবায় নিমগ্ন হইয়াছিলেন।[৪৬] দাস-গোস্বামী চৈতন্য-প্রদত্ত যে গোবর্ধন-শিলার সেবা করিয়া আসিতেছিলেন, তাঁহার তিরোধানের পর কবিরাজ-গোস্বামীই তাহার সেবার ভার গ্রহণ করেন। কবিরাজের তিরোধানে সেই ভার মুকুন্দের উপর আসিয়া পড়ে।[৪৭]

'প্রেমবিলাস'-প্রণেতা জানাইয়াছেন[৪৮] যে শ্রীনিবাস-নরোত্তম-শ্যামানন্দের বৃন্দাবন হইতে গৌড়-প্রত্যাবর্তনকালে বৃন্দাবনস্থ গোস্বামী-বৃন্দ গৌড়াদি দেশে প্রচারার্থ যে-সমূহ বৈষ্ণব-গ্রন্থ প্রেরণ কারয়াছিলেন, পথিমধ্যে সেইগুলি বনবিষ্ণুপুরের রাজা বীর-হাম্বীর কর্তৃক অপহৃত হইলে সেই সংবাদ শুনিয়া কৃষ্ণদাস-কবিরাজ-গোস্বামী 'কুণ্ডতীরে বসি সদা করে অনুতাপ। উছলি পড়িল গোসাঞি দিয়া এক ঝাঁপ ॥' গ্রন্থ-মধ্যে তাহার পরে কৃষ্ণদাসের নানাপ্রকার বিলাপোক্তির বর্ণনা আছে। শেষে তিনি রঘুনাথদাসের চরণ বুকে ধরিয়া স্থির হইলেন এবং 'মুদিত নয়নে প্রাণ কৈল নিষ্ক্রমণ।' 'প্রেমবিলাসে'র এইপ্রকার বর্ণনা হইতে কিন্তু পরবর্তিকালে নানাপ্রকার বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইয়াছিল। ১৩০১ সালের 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা'য় (রংপুর শাখা, vol i+ii) কালিকান্ত বিশ্বাস মহাশয় লিখিয়াছিলেন যে বৃন্দাবন হইতে শ্রীনিবাস-নরোত্তম-শ্যামানন্দের গৌড়-প্রত্যাবর্তনকালে "ব্রজের গোস্বামী-গণ তাঁহাদের সঙ্গে 'চৈতন্যচরিতামৃত' প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থরত্ন সাধারণ্যে প্রচারের জন্য প্রদান করিয়াছিলেন।" কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, গ্রন্থরত্নগুলির সহিত 'চৈতন্যচরিতামৃত' প্রেরণের কোনও প্রমাণ কোথাও দৃষ্ট হয় না। অপর পক্ষে, ৪০৪ চৈতন্যাব্দের 'বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা'য় দুর্গাদাস দত্ত মহাশয় জানাইয়াছিলেন যে 'চৈতন্যচরিতামৃত'-গ্রন্থখানি সংস্কৃত-ভাষায় লিখিত নহে বলিয়া জীব-গোস্বামী প্রথমে উহাকে যমুনার জলে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। পর-বৎসরের 'বিষ্ণুপ্রিয়া-পত্রিকা'তে 'ঠাকুর কৃষ্ণদাসকবিরাজের অন্তর্ধান'-শীর্ষক প্রবন্ধে অবশ্য

---

(৪৪) ঐ—১৪।৩৭-৩৮ ; প্রে. বি.—অর্ধবিলাস, পৃ. ৩০৮ (৪৫) ন. বি.—পৃ. ২০০ (৪৬)ঐ—পৃ. ২০৪ (৪৭) ন. বি.—পৃ. ২০৪ ; (৪৮) ১৩শ. বি.

এইরূপ তথ্য প্রচারের প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হইয়াছিল। কিন্তু 'প্রেমবিলাস' রচনার কয়েক বৎসরমাত্র (৭ বৎসর ?) পরে 'কর্ণানন্দ'-কার যদুনন্দনদাস লিখিয়াছেন[৪৯] যে 'প্রেমবিলাসে'র উক্তপ্রকার বর্ণনাকে ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা আছে ; কৃষ্ণদাস মৃত্যুর মুখামুখি হইলেও তাঁহার মৃত্যু ঘটে নাই।—

সিদ্ধ সাধক দেহ দুই এক যোগে।
সাধক দেহে পুনঃ প্রাপ্তি হৈলা মহাভাগে ॥

ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে 'প্রেমবিলাসে'র রচনার অল্প কয়েক বৎসর পরে যদুনন্দন যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাই সমস্যার প্রকৃত সমাধান না হইলে তিনি নিজ হইতে প্রশ্ন উত্থাপন করিতে সাহসী হইতেন না। 'ভক্তিরত্নাকর' হইতে ইহারই সমর্থন পাওয়া যায়। নরহরি-চক্রবর্তীর বর্ণনায় কোথাও কৃষ্ণদাসের এইপ্রকার আকস্মিক-মৃত্যু বা শীঘ্র-মৃত্যুর কথা নাই। 'ভক্তিরত্নাকর'-মতে কৃষ্ণদাস দীর্ঘ-জীবন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বর্ণনা দেখিয়া সহজেই ধরা যায় যে নরহরি-চক্রবর্তী এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ ছিলেন। তাঁহার বর্ণনা-অনুযায়ী রঘুনাথদাস-গোস্বামীর মৃত্যুর পরেও কৃষ্ণদাস বাঁচিয়াছিলেন। 'নরোত্তমবিলাসে' গ্রন্থকর্তা আপনার পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গেও ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

'কবিরাজ-গোস্বামীর শাখানির্ণয়'-পুথিতে কবিরাজ-গোস্বামীর শিষ্যবর্গের তালিকা নিম্নোক্তরূপ[৫০] :—

বিষ্ণুদাস-গোস্বামী (গৌড়ীয়া বিপ্র), গোপালদাস-গোস্বামী (ক্ষেত্রি, মাচগ্রাম) রাধাকৃষ্ণ-চক্রবর্তী-গোস্বামী (গোবিন্দের অধিকারী), মুকুন্দদাস-গোস্বামী (মুলতান)। শেষোক্ত মুকুন্দ-দাসের আবার সাতাইশ শাখার নির্ণয় করা হইয়াছে।

(৪৯) ক্ষ. নি., পৃ. ১২৬ (৫০) পৃ.১

যাদবাচার্য

যাদবাচার্য(-গোসাঁই) সংসার পরিত্যাগ করিয়া কাশীশ্বর-গোসাঁইর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন[১] এবং বৃন্দাবনে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি রূপ-গোস্বামীর বিশেষ সঙ্গী ও ভক্ত ছিলেন। রূপ যখন বৃদ্ধকালে একমাস যাবৎ মথুরায় থাকিয়া গোপাল-দর্শন করেন, তখন অন্যান্য ভক্তবৃন্দের সহিত তিনিও তাঁহার একজন সঙ্গী হিসাবে তাঁহার সহিত অবস্থান করিতেছিলেন। শ্রীনিবাসাদির প্রথমবার বৃন্দাবন-আগমনেরর সময় এবং তাহার অনেক পরে বীরচন্দ্র যখন বৃন্দাবনে পৌঁছান, তখনও তিনি বৃন্দাবনে অবস্থান করিতেছিলেন এবং বীরচন্দ্রের বন-পরিভ্রমণের সময় তিনি তাঁহার সহিত গমন করিয়াছিলেন।

(১) প্রে. বি.—১৮শ. বি., পৃ. ২৭০ ; যাদবাচার্য-কাশীশ্বর সম্পর্ক সম্বন্ধে কাশীনাথ-পণ্ডিতের জীবনী দ্রষ্টব্য।

মুকুন্দদাস

মুকুন্দদাস ছিলেন পাঞ্চাল-দেশীয় বিপ্র। পাটবাড়ীতে সংরক্ষিত 'রূপ-গোস্বামী ও কবিরাজ গোস্বামীর সূচক' নামক একটি প্রাচীন পুথিতে লিপিবদ্ধ আছে যে[১] নাছর নিকটে মুলতান নামক গ্রামে তাঁহার নিবাস ছিল। তিনি ছিলেন ধনবানের সন্তান। মথুরাদাস নামক একব্যক্তি তাঁহার ঘনিষ্ঠ সঙ্গী ছিলেন। একবার মুকুন্দ তরণী সাজাইয়া বাণিজ্যে গিয়াছিলেন। পথে বাত্যা-তাড়িত হইয়া তাঁহার নৌকা ব্রজমণ্ডলে উপনীত হইলে, তিনি নৌকা ভিড়াইয়া মদনমোহন- ও গোপীনাথ-বিগ্রহাদি দর্শন করিতে যান এবং গোবিন্দ-মূর্তি দেখিয়া তাঁহার ভাবোদয় হয়। সেইস্থানে কৃষ্ণদাস-কবিরাজ-গোস্বামী উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার সহিত কথাবার্তায় মুকুন্দের মন ফিরিয়া গেল। তিনি তখন কবিরাজ-গোস্বামীর শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার নিকট দীক্ষা-গ্রহণ করিলেন এবং স্বীয় পোষাক-পরিচ্ছদ ও নৌকার যাবতীয় ধন-সামগ্রী বিতরণ করিয়া সঙ্গীদিগকে বিদায় দিলেন।

তাহারপর হইতে মুকুন্দ কবিরাজ-গোস্বামীর নিকট অবস্থান করিয়া নানাবিধ ভক্তি-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে থাকেন। কবিরাজও তাঁহাকে আপনার প্রিয়-শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সম্ভবত সেইজন্যই গুরু-রঘুনাথের নিকট হইতে মহাপ্রভু-প্রদত্ত গোবর্ধন-শিলা-পূজার যে-ভার কৃষ্ণদাসের হস্তে অর্পিত হইয়াছিল, তাঁহার মৃত্যুর পর তাহা তৎশিষ্য মুকুন্দের উপরেই আসিয়া পড়ে। কবিরাজের মৃত্যুর পর তিনি অনন্যমনা হইয়া গোবর্ধনের সেবাপূজা ও ভক্তিশাস্ত্র আলোচনা করিয়াছিলেন। এই সময়ে রামচরণ-চক্রবর্তীর শিষ্য বিশ্বনাথ-চক্রবর্তী বৃন্দাবনে পৌছাইলে মুকুন্দদাস তাঁহাকে শিক্ষাদান করিতে থাকেন। তারপর তিনি 'বর্ণিলেন লীলাগ্রন্থ কিছু শেষ ছিল। বিশ্বনাথ দ্বারে তাহা পূর্ণ করাইল ॥'[২] বাস্তবিক পক্ষে, বিশ্বনাথকে শিক্ষা-দান করিয়া তিনি এক মহৎকর্মই সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাহারপর নরোত্তম-শিষ্য গঙ্গানারায়ণ-চক্রবর্তীর দৌহিত্রী কৃষ্ণপ্রিয়া-ঠাকুরাণী রাধাকুণ্ডে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। এই সময়ে মুকুন্দ উদরাময়-রোগে ভুগিতেছিলেন। কৃষ্ণপ্রিয়া তাঁহাকে এমন পথ্য দিলেন যে তিনি তাহাতেই আরোগ্য-লাভ করিলেন। তখন তাঁহার বয়সও যথেষ্ট হইয়া গিয়াছে। কৃষ্ণপ্রিয়ার মাতৃসম-সেবায় ও স্নেহে মুগ্ধ

---

(১) পৃ. ৩-৪ (২) ন. বি.—গ্রন্থকর্তার পরিচয় প্রসঙ্গ—পৃ. ২০০, ২০৪ ; বৈ. দি.-মতে (পৃ. ১১৪) মুকুন্দদাস-গোসাঁই বুধাইপাড়া-নিবাসী গোপালদাসকে 'রাধাকৃষ্ণ কল্পলতা'-গ্রন্থ রচনা সম্বন্ধে নির্দেশদান করেন।

হইয়া তিনি তখন তাঁহাকেই যোগ্য-ব্যক্তি মনে করিয়া তাঁহার উপর গোবর্ধন-শিলার ভার অর্পণ করেন এবং অল্পকাল মধ্যেই রাধাকুণ্ডসমীপে দেহরক্ষা করেন।

'কবিরাজ গোস্বামীর শাখা' নামক পুথিতে[৩] মুকুন্দের শিষ্যবর্গের নাম লিখিত হইয়াছে। তাঁহার সর্বশুদ্ধ সাতাইশ জন শিষ্য ছিলেন :—

মথুরাদাস-গোস্বামী, বংশীদাস-গোস্বামী (গোবিন্দের পূজারী), লাল (?) দাস-বৈরাগী (তিরোত), রাধাকৃষ্ণ-পূজারী-ঠাকুর, কাসিরাম-বোড়া (?) (কাশী)

গোপনীয় শাখা :—রামচন্দ্র-ঘোষ-ঠাকুর (গামিলা ?), রামনাথ-রায়-মহাশয় (নেহাল্যা ?), (?)-কবিরাজ-ঠাকুর, কৃষ্ণজীবনদাস-বৈরাগী-ঠাকুর (খেতরির নিকট সাওল্যা), কৃষ্ণচরণ-চক্রবর্তী (সতুদাবাজ), কৃষ্ণপ্রিয়া-ঠাকুরাণী, রামদাস-পূজারী-ঠাকুর (গোবিন্দের পূজারী), গোবিন্দদাস-পূজারী-ঠাকুর, হরিরাম-পূজারী-ঠাকুর, নিমচরণ (?)-রসাইয়া-ঠাকুর, রাধাকিশোরদাস-ঠাকুর, কানিয়া-কৃষ্ণদাস-ঠাকুর, গৌরচরণদাস-ঠাকুর (জামেশ্বরপুর), সুন্দরদাস-ঠাকুর (গোটপাড়া), মোহনদাস-ঠাকুর (বড়সান), প্রকাশরামদাস-ঠাকুর (হোড়াল ?), গোপীরমণ-পূজারী-ঠাকুর (?), নৃসিংহদাস-ঠাকুর, কদম্বমালা-ঠাকুরাণী (খেতোরি), 'হৃদয়রাম-চক্রবর্তী যোতির্বেদ্‌কুলে জন্ম', গৌরাঙ্গপ্রিয়া-ঠাকুরাণী (বোরাকুলি), রামদাস-ব্রজবাসী (বরসনা)

(৩) পৃ. ১

রাঘব-পণ্ডিত (বৃন্দাবনস্থ)

বৃন্দাবনে যে সকল ভক্ত-গোস্বামী বাস করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে রাঘব-পণ্ডিতের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার পূর্ব-নিবাস[১] ছিল দক্ষিণাত্যে এবং তিনি ছিলেন মহাকুলীন বিপ্র-বংশোদ্ভূত। বৃন্দাবনে আসিবার পর তিনি গোবর্ধনে একটি নির্জন-স্থানে গোফা নির্মাণ করিয়া বসতি স্থাপন করেন। সেই গোফায় বসিয়া তিনি গোবর্ধন-সন্দর্শন করিতেন এবং সাধন-ভজন ও শাস্ত্রপাঠের মধ্যদিয়া বৈষ্ণবানুমোদিত বিধানে তাঁহার দিনগুলি কাটাইয়া দিতেন। কিন্তু মহাপ্রভুর আদর্শ ও অভিলাষ সম্বন্ধে তিনি উদাসীন ছিলেন না। চৈতন্যদর্শনপ্রাপ্ত গোপাল-রঘুনাথ প্রভৃতির কর্মপ্রচেষ্টার তুলনায় তাঁহার প্রচেষ্টা ক্ষুদ্রতর হইলেও তাহা নিরর্থক ছিল না। স্বয়ং কবিকর্ণপূর তাঁহার 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'-গ্রন্থে তদ্রচিত ভক্তিরত্ন প্রকাশের উল্লেখ করিয়া তাঁহার প্রশস্তি গাহিয়াছেন।[২]

রাঘব-পণ্ডিত রঘুনাথদাস ও কৃষ্ণদাস-কবিরাজের বিশেষ-সান্নিধ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রায়ই তিনি তাঁহাদের সহিত একত্রে বাস করিতেন। কিন্তু মধ্যে মধ্যে তিনি বৃন্দাবনে গিয়াও গোস্বামীদিগের সাহচর্য লাভ করিয়া আসিতেন। আবার মধ্যে মধ্যে তিনি ব্রজ-পরিক্রমা করিতেন। মথুরা-গোবর্ধন-বৃন্দাবনের মাহাত্ম্য ও ইতিহাস বিষয়ে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। শ্রীনিবাস-নরোত্তম বৃন্দাবনে আসিলে জীব-গোস্বামী বোধকরি সেইজন্যই তাঁহার সহিত তাঁহাদের বৃন্দাবন-পরিভ্রমণের ব্যবস্থা করিয়া দেন। রাঘব তাঁহাদিগকে মথুরাতে কেশবদেবের মন্দির-সন্নিধানে লইয়া যান এবং কৃষ্ণের মথুরা-লীলা ও মথুরা-মাহাত্ম্য ইত্যাদি কাহিনী শুনাইয়া তাঁহাদিগকে পরিতৃপ্ত করেন। এইভাবে রাত্রি-যাপনের পর তিনি তাঁহাদিগকে লইয়া পরিক্রমায় বাহির হন এবং দ্রষ্টব্য সকল স্থানে ঘুরিয়া তাহাদের মাহাত্ম্য ও পূর্ব-ইতিহাস বর্ণনা করিয়া তাঁহাদের মথুরা-পরিক্রমাকে সার্থক করিয়া তুলেন।

জাহ্নবাদেবী যখন দ্বিতীয়বার বৃন্দাবনে আগমন করেন, তখন রাঘব-পণ্ডিত গোবর্ধনে অবস্থান করিতেন। সেই সময়ে তিনি কৃষ্ণদাসাদির সহিত বৃন্দাবনে আসিয়া দেবীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু বীরভদ্রের বৃন্দাবনাগমনকালে তিনি সম্ভবত লোকান্তরিত হইয়াছেন।

---

(১) তু.—বৈ. দ. ; বৈ. দ.-মতে (পৃ. ৩৪৪) রাঘব-গোসাঁই

রামনগরবাসী চৈতন্যের নিজ দাস।

সব ছাড়ি যেঁহ কৈল গোবর্ধনে বাস॥

(২) ১৬২ ; ভ. মা.—৩য় মা., পৃ. ৩০

হরিদাস-পণ্ডিত

বৃন্দাবনে রূপ-গোস্বামীর দ্বারা গোবিন্দ-বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা হইলে মহাপ্রভু-প্রেরিত কাশীশ্বর-গোসাঁইকে বিগ্রহের প্রথম সেবা-অধিকারী নিযুক্ত করা হয়। কাশীশ্বরের পরে সেই কার্যের ভার পড়ে শ্রীকৃষ্ণ-পণ্ডিতের উপর। শ্রীনিবাসের বৃন্দাবনাগমনকালেও ইনি সেই পদে বহাল ছিলেন। কিন্তু 'সাধনদীপিকা' গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে রূপ-গোস্বামী হরিদাস-পণ্ডিতের উপরও গোবিন্দদেবের সেবার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। অন্য একটি পুথিতেও লিপিবদ্ধ হইয়াছে[১] যে কাশীশ্বর বৃন্দাবনে গিয়া সেবা আরম্ভ করিলে রূপ-সনাতন যখন মহাপ্রভুর নিকট সেই সংবাদ প্রেরণ করেন, তখন মহাপ্রভু

হরিদাস গোসাঞিরে শীঘ্র পাঠাইল্যা তারে
করিলেন সেবা সমর্পণ।

অথচ শ্রীনিবাসের বৃন্দাবন-আগমনের পূর্বেই রূপ-গোস্বামী দেহরক্ষা করিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে শ্রীকৃষ্ণ-পণ্ডিত গোবিন্দের সেবা-অধিকারী থাকিলেও পূজাকর্ম ইত্যাদি ছাড়া সেবাবিধির অন্যান্য কর্মের ভার হরিদাসের উপর ন্যস্ত ছিল। কৃষ্ণদাস-কবিরাজও বলিয়াছেন তাঁহার 'চৈতন্যচরিতামৃত' রচনাকালে গোবিন্দদেবের অনেক সেবক ছিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে 'সেবার অধ্যক্ষ শ্রীপণ্ডিত হরিদাস।' তবে শ্রীকৃষ্ণ-পণ্ডিতের পরে অনন্ত-আচার্য, ও তাহার পরে ইনি হয়ত সেই অধিকারী-পদ পাইয়া থাকিতেও পারেন। 'ভক্তিরত্নাকর'-প্রণেতা সম্ভবত সেইজন্যই ইঁহাদিগকে 'গোবিন্দাধিকারী' আখ্যা দিয়া থাকিবেন। নরহরি-চক্রবর্তীও একই সময়ে বর্তমান বহু 'গোবিন্দাধিকারী'র উল্লেখ করিয়াছেন।[২]

হরিদাস-পণ্ডিত-গোসাঁই ছিলেন উপরোক্ত অনন্ত-আচার্যেরই শিষ্য এবং অনন্তের গুরু ছিলেন গদাধর-পণ্ডিত। সমগ্র 'চৈতন্যচরিতামৃত'-গ্রন্থের মধ্যে 'অনন্ত' নামধেয় ব্যক্তির মাত্র চারিবার উল্লেখ আছে। অদ্বৈতপ্রভুর শাখা-বর্ণনা প্রসঙ্গে এক অনন্ত-আচার্য ও এক অনন্তদাসের নাম উল্লেখিত হইয়াছে এবং গদাধর-শিষ্য পূর্বোক্ত অনন্ত-আচার্যের নাম দুইবার উল্লেখিত হইয়াছে। প্রথমোল্লেখিত অনন্ত-আচার্য গদাধর-শিষ্য অনন্ত-আচার্যই[৩] হউন, বা অনন্তদাসই হউন, কিছুই যায় আসে না, বা কোন দ্বিতীয় অনন্ত-আচার্য হইলেও যায় আসে না। কারণ, তাঁহার উল্লেখ এই একবার ছাড়া কোথাও দেখা যায় না। আর উক্ত অনন্তদাস

---

(১) সু. (ব. সা. প.)—পৃ. ৯৬ (২) ভ.র.—১৩।৩২১ (৩) গৌ.ত.-তে (২য়. সং.—উপক্রম.—পৃ. ৭৩) উভয় অনন্ত-আচার্যকে একই ব্যক্তি ধরা হইয়াছে।

যে পরবর্তিকালে খেতুরি-মহোৎসবে[৪] ও গদাধরপ্রভুর তিরোধান-তিথিতে[৫] উপস্থিত অনন্ত-দাস সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ, 'চৈতন্যচরিতামৃত'-কার অদ্বৈতপ্রভুর শাখা-বর্ণনায় এবং 'ভক্তিরত্নাকর'- ও 'নরোত্তমবিলাস'-রচয়িতা খেতুরি-মহোৎসব-বর্ণনায় কানু-পণ্ডিত, হরিদাস-ব্রহ্মচারী[৬], কৃষ্ণদাস এবং জনার্দনের সহিত একত্রে এই অনন্তদাসের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং অনন্ত-নামধারী মাত্র দুইজন ব্যক্তির অস্তিত্বই সম্ভবপর হয়,—অনন্ত-আচার্য এবং পরবর্তিকালের অনন্তদাস। গদাধর-শিষ্য অনন্ত-আচার্য বৃন্দাবনে অবস্থান করিতেন আর অনন্তদাস গৌড়দেশে ছিলেন। তবে অনন্ত-আচার্যের জন্মভূমি ছিল সম্ভবত নবদ্বীপ। কারণ, বৃন্দাবনদাসের 'বৈষ্ণববন্দনা'-পুথিতে নবদ্বীপস্থ অনন্ত-আচার্যের বন্দনা করা হইয়াছে।[৭] ডা. সুকুমার সেন অনন্তদাসের একুশটি ব্রজবুলি পদ রচনার সংবাদ দিয়াছেন।[৮]

'চৈতন্যভাগবত'-কার কিন্তু একজন অনন্ত-পণ্ডিতের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।[৯] সন্ন্যাস-গ্রহণের পর নীলাচল-গমন-পথে ছত্রভোগে পৌছাইবার পূর্বে মহাপ্রভু আটিসারা নগরস্থ এই 'মহাভাগ্যবান' 'পরম সাধু শ্রীঅনন্তে'র গৃহে আসিয়া

সর্বগণ সহ প্রভু করিলেন ভিক্ষা।
সন্ন্যাসীর ভিক্ষা ধর্ম করাইলা শিক্ষা॥
সর্ব রাত্রি কৃষ্ণকথা কীর্তন প্রসঙ্গে।
আছিলেন অনন্ত পণ্ডিত গৃহে রঙ্গে॥
শুভদৃষ্টি অনন্ত পণ্ডিত প্রতি করি।
প্রভাতে চলিলা প্রভু বলি হরি হরি॥

চৈতন্য-পরিমণ্ডল হইতে এ-হেন অনন্তের যে একেবারে অবলুপ্তি ঘটিতে পারে তাহা বাস্তবিকই আশ্চর্যের বিষয়। সুতরাং এই অনন্ত-পণ্ডিত ও পূর্বোল্লেখিত অনন্ত-আচার্য একই ব্যক্তি[১০] বলিয়া ধারণা জন্মায়। জগদ্বন্ধু ভদ্র ইঁহাকে অদ্বৈত-শাখাভুক্ত অনন্তদাসের সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করেন।[১১] কিন্তু উপরোক্ত কারণে সম্ভবত তাহা ঠিক নহে। আরও উল্লেখযোগ্য যে বৃন্দাবনদাসের বর্ণনানুযায়ী আটিসারাতে অনন্তের গৃহে অবস্থানকালে মহাপ্রভুর সহিত গদাধর-পণ্ডিতও উপস্থিত ছিলেন। 'গৌরপদতরঙ্গিণী' ও 'পদকল্পতরু'তে অনন্ত-আচার্য ও অনন্তদাস এই উভয়ের পদই উদ্ধৃত হইয়াছে। অনন্তদাসের ভণিতা-যুক্ত কোন কোন পদ অনন্ত-আচার্যের হওয়াও বিচিত্র নহে।

---

(৪) ন. বি.—৭ম. বি. (৫) ভ.র.—৯।৪০৫ (৬) চৈ. চ.-এ (১।১২) হরিদাস-ব্রহ্মচারীকে অদ্বৈত ও গদাধর উভয়ের শাখাভুক্ত করা হইয়াছে (৭) বৈ. ব. (বৃ.)—পৃ. ৫ ; বৈষ্ণবাচারদর্পণে (পৃ. ৩৪৪) অনন্ত-আচার্য-গোসাঞির 'বাস অনন্ত নগরে' বলা হইয়াছে। (৮) HBL—p. 73 (৯) চৈ. ভা.—৩।২ (১০) গৌরপদতরঙ্গিণীতে (গৌ. ত.—প. প.) অনন্ত-আচার্য ও অনন্ত-পণ্ডিতের পৃথক অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। (১১) প. ক. (প.)—১৯

যাহাহউক, বৃন্দাবনে অনন্ত-আচার্যের শিষ্য পণ্ডিত-হরিদাসের মর্যাদা বড় কম ছিল না। তিনি গোবিন্দ-বিগ্রহের সেবার অধ্যক্ষ ছিলেন এবং 'তাঁর যশগুণ' সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াছিল। সুশীল, সহিষ্ণু, বদান্য, গম্ভীর এবং মধুরভাষী মানুষটি গোবিন্দের সেবা করিয়া এবং চৈতন্যের গুণ-কীর্তন শ্রবণ করিয়া দিনাতিপাত করিতেন। বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল'-শ্রবণে তিনি পরম সন্তোষ-লাভ করিতেন এবং তাঁহার প্রসাদে অন্যান্য বৈষ্ণবও তাহা শুনিতে পাইতেন। কিন্তু উক্ত গ্রন্থে চৈতন্যের শেষ-লীলা বর্ণিত হয় নাই বলিয়া তিনিই সর্বপ্রথম কৃষ্ণদাস-কবিরাজকে তাহা লিখিয়া দিবার অনুরোধ জ্ঞাপন করেন।

বিখ্যাত 'সাধনদীপিকা'-গ্রন্থের রচয়িতা রাধাকৃষ্ণ-গোস্বামী এই পণ্ডিত-হরিদাসেরই একজন যোগ্য-শিষ্য[১২] ছিলেন। 'নিত্যানন্দবংশবিস্তার'-গ্রন্থে[১৩] লিখিত হইয়াছে যে জাহ্নবাদেবী বৃন্দাবনে আসিলে

মুখ্য হরিদাস আর গোসাঁইদাস পূজারী।
আজ্ঞা মালা প্রসাদ আনিল বাটা ভরি॥

সম্ভবত এই 'মুখ্য হরিদাস' এবং আলোচ্যমান হরিদাস এক ব্যক্তি। বীরচন্দ্র যখন বৃন্দাবনে আগমন করেন, তখন জীব-গোস্বামী ও কৃষ্ণদাস-কবিরাজাদির সহিত এই হরিদাসও তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন।

(১২) বৈ. দি.-তে (পৃ. ১৮) তানসেনকে এক হরিদাস-স্বামীর শিষ্য বলা হইয়াছে। (১৩) পৃ. ৬৩

উদ্ধবদাস

'চৈতন্যচরিতামৃতে'র গদাধর-শাখায় একজন উদ্ধবদাসের নাম আছে। তাঁহার সঙ্গী-দিগের নাম দেখিয়া সহজেই অনুমান করা চলে যে তিনি খেতুরির মহামহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।[১] কিন্তু 'চৈতন্যচরিতামৃত' প্রভৃতি গ্রন্থে আর একজন উদ্ধবদাসের নামও পাওয়া যায়[২] ; তিনি রূপ-গোস্বামীর বার্ধক্যে তাঁহার শিষ্য-হিসাবে একবার বিঠ্‌ঠলেশ্বরের গৃহে থাকিয়া গোপাল-দর্শন করিয়াছিলেন। 'ভক্তিরত্নাকর' হইতে জানা যায়[৩] যে রাঘব সহ শ্রীনিবাস-নরোত্তমের বৃন্দাবন-পরিক্রমাকালে তিনি সনাতন-গোস্বামীর পুরোহিত-পুত্র গোপাল-মিশ্রের সহিত নন্দীশ্বরে বাস করিতেছিলেন এবং বৃন্দাবন হইতে শ্রীনিবাস-নরোত্তমের বিদায়-গ্রহণকালেও তিনি অন্যান্য ভক্তের সহিত গোবিন্দ-মন্দিরে আসিয়া সমবেত হইয়াছিলেন। তাহারও অনেক পরে যখন বীরচন্দ্র বৃন্দাবনে গমন করেন, তখনও তিনি বীরচন্দ্রের সহিত ভ্রমণ করিয়াছিলেন। গ্রন্থকার বলেন যে তাঁহার 'মধ্যে মধ্যে গৌড়ে গতি' হইত। মাত্র এই উক্তি হইতে অবশ্য উভয় উদ্ধবকে এক ব্যক্তি মনে করিয়া লইবার কোনও কারণ নাই। বিখ্যাত পদকর্তা উদ্ধবদাস কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তি। ডা. সুকুমার সেন গদাধর-শিষ্য উদ্ধবদাসের একটি বাংলা-পদের নিঃসন্দিগ্ধ পরিচয় দিয়া জানাইতেছেন,[৪] "We are in a position to attribute two Brajabuli songs to him. These songs [P. K. T. (পদকল্পতরু) 1481, 1558] are on the Maste in company with Gadadhara......His treatment of the Master in connection with Gadadhara was a speciality of the disciples of the latter as well as of those belonging to the Srikhanda school." ডা. সেন বলেন যে ইনি 'রসকদম্ব'-রচয়িতা কবি বল্লভের গুরু ছিলেন।

(১) প্রে. বি.—১৯শ. বি., পৃ. ৩০৯ ; ভ. র.—১০।৪১৬ ; ন. বি.—৬ষ্ঠ. বি, পৃ. ৮৪ ; ৮ম, বি., পৃ. ১০৭ (২) চৈ. চ.—২।১৮, পৃ. ২০১ ; মু. বি.—পৃ. ২৯১ ; স. সূ.—পৃ. ১০-১১ (৩) ৫।১৩৩৩ ; ৬।৫১৪ ; ১৩।৩৪২ (৪) HBL—p. 88

গোপালদাস

'চৈতন্যচরিতামৃতে'র মূলস্কন্ধ-শাখাবর্ণনার মধ্যে 'গোপাল আচার্য আর বিপ্র বাণীনাথে'র নাম উল্লেখিত হইয়াছে। তাঁহারা গদাধরদাস ও নরহরি-সরকারের তিরোধান-তিথি মহামহোৎসব এবং খেতুরির মহামহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।[১] 'ভক্তিরত্নাকর' হইতে জানা যায়[২] যে নবদ্বীপের চম্পকহট্ট বা চাঁপাহাটী নামক স্থানে 'বিপ্র বাণীনাথের আলয়' ছিল। মূলস্কন্ধ-শাখার উক্ত বর্ণনায় দুইটি পঙ্‌ক্তির পরেই একজন গোপালদাসের নামও দৃষ্ট হয়। এই গোপালদাস যে কোন্ গোপালদাস, তাহা বুঝিয়া উঠা দুরূহ। তবে 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র মধ্যেই আর এক গোপালদাসকে পাওয়া যায়।[৩] তিনি বৃদ্ধ রূপ-গোস্বামীর সহিত মথুরায় বিঠ্‌ঠলেশ্বর-গৃহে থাকিয়া গোপাল-দর্শন করিয়াছিলেন এবং 'ভক্তিরত্নাকর'-মতেও[৪] বৃন্দাবনের এক গোসাঞি-গোপালদাস মদনগোপালের একজন অধিকারী ছিলেন। খুব সম্ভবত তিনিই নন্দীশ্বরে সনাতনের কুটির সন্নিধানে বাস করিতেন। শ্রীনিবাসাদি বৃন্দাবন পরিভ্রমণকালে নন্দীশ্বরে তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের বৃন্দাবন-ত্যাগকালেও তিনি গোবিন্দ-মন্দিরে অন্যান্যদের সহিত উপস্থিত ছিলেন। সম্ভবত সনাতন-পুরোহিতের পুত্র গোপাল-মিশ্র ও এই গোপালদাস অভিন্ন ব্যক্তি।

কিন্তু 'ভক্তিরত্নাকরে' গদাধরদাসের তিরোধান-তিথি মহামহোৎসবে যোগদানকারী ভক্তবৃন্দের মধ্যে অন্তত চারজন গোপালকে পাওয়া যায়[৫] —গোপাল-আচার্য, গোপালদাস, নর্তক গোপাল ও অন্য এক গোপালদাস। ইঁহাদের মধ্যে গোপাল আচার্যের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। নর্তক-গোপাল খেতুরির মহামহোৎসবেও যোগদান করিয়াছিলেন।[৬] তিনি গদাধর-পণ্ডিতের শিষ্যবৃন্দের দ্বারা পরিবৃত থাকায় তাঁহাকে গদাধর-শিষ্য বলিয়াই ধারণা জন্মায়। কিন্তু অন্য দুইজন গোপালদাসের একজনও সম্ভবত বৃন্দাবনবাসী গোপালদাস নহেন। 'অনুরাগবল্লী'তে বলা হইয়াছে[৭] যে কাঞ্চনগড়িয়া-বাসী গোপালদাস শ্রীনিবাস-আচার্যের শিষ্য ছিলেন। 'ভক্তিরত্নাকর'-মতেও 'কাঞ্চনগড়িয়া-বাসী শ্রীগোপাল

---

(১) ভ. র.—৯।৩৯৫, ৩৯৭, ৫২৭, ৭১৯ ; ১০।৪১৪ ; ন. বি. ৬ষ্ঠ. বি., পৃ. ৮৪, ৮৭ ; ৭ম. বি., পৃ. ৯৭, ১০০ ; ৮ম. বি., পৃ. ১০৭, ১১২ ; প্রে. বি.—১৯. শ. বি. পৃ, ৩০৯ (২) ১২।৪৭৯ (৩) ২।১৮, পৃ. ২০১ (৪) ১৩।৩১৭-১৮ (৫) ৯।৩৯৭ ; ৪০১, ৪০৭ (৬) ভ. র.—১০।৪১৫ ; ন. বি. ৬ষ্ঠ. বি., পৃ. ৪৮ ; নি. বি.-গ্রন্থেও (পৃ. ১৮) একজন নর্তক-গোপালের উল্লেখ আছে। (৭) ৭ম. ম., পৃ. ৪৫

দাস' খেতুরি মহামহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন এবং 'প্রেমবিলাসে'র বর্ণনাতেও[৮] এই উৎসব উপলক্ষে

বুঁধইপাড়া হইতে আইলা শ্রীগোপালদাস।
কাঞ্চনগড়িয়ার শ্রীগোকুল বিত্তাবন্ত।

সম্ভবত এই বুঁধইপাড়া কাঞ্চনগড়িয়ারই পল্লী-বিশেষ। কিন্তু এই গোপালদাস যে উপরোক্ত দুইজনের একজন হইতে পারেন, তাহা ধরিয়া লইলেও অন্য গোপালদাস সম্বন্ধে নির্দিষ্ট করিয়া কিছুই বলিতে পারা যায় না। কিংবা, বুঁধইপাড়া যদি একটি পৃথক গ্রাম হইয়া থাকে তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে বুঁধইপাড়া-বাসী হওয়া আশ্চর্যজনক নহে। আধুনিক বৈ. দি.-মতে[৯] বুঁধইপাড়া-নিবাসী গোপালদাস মুকুন্দদাসের নির্দেশে 'রাধাকৃষ্ণকল্পলতা'-গ্রন্থ রচনা করেন।

(৮) ১০।১৪২ ; প্রে. বি.—১৯শ. বি., পৃ. ৩০৮ (৯) পৃ. ১১৪

৫

সীতাদেবী

অদ্বৈত- ও সীতা-চরিত গ্রন্থগুলির লেখকবৃন্দ সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া যায় নাই। গ্রন্থগুলির মধ্যে প্রক্ষিপ্তাংশ প্রচুর এবং গ্রন্থকর্তৃবৃন্দের অনেকেই হয়ত পরবর্তী-কালের লোক। সুতরাং গ্রন্থোক্ত বহু বিষয়ই যে কাল্পনিক, তাহাতেও সন্দেহ থাকে না কিন্তু এই কারণে গ্রন্থ বর্ণিত সকল বিষয়ই নির্বিচারে বর্জন করিলে সত্যসম্বন্ধযুক্ত ঘটনার কিছু কিছুও পরিত্যক্ত হইতে বাধ্য। অপেক্ষাকৃত পরবর্তী-কালের গ্রন্থকারদিগের হস্তে এমন মাল-মশলা থাকিতে পারে যাহা নিশ্চিতরূপেই প্রাচীন, অথচ যাহা আরও পরবর্তী-কালে লুপ্ত হইয়াছে। সুতরাং দুরূহ হইলেও ঐ বিষয়গুলিকে বিচার্য ধরিয়া অন্যান্য গ্রন্থের সহিত তুলনামূলক বিচারে উহাদের গ্রহণ-বর্জন ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

অদ্বৈত-পত্নী সীতাদেবী সম্বন্ধে 'সীতাগুণকদম্ব'-গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে :

ভাদ্র মাসে সিত পক্ষে জন্মে চতুর্দশীতে
সেই হেতু সীতা নাম হইলা জগতে।

কিন্তু সীতাদেবীর জন্মবৃত্তান্ত ও তাঁহার পিতামাতার পরিচয় সম্বন্ধে গ্রন্থকার নীরব রহিয়াছেন। তিনি জানাইতেছেন[১] যে শান্তিপুরের গোবিন্দ নামক এক ব্রাহ্মণ পুষ্প-চয়ন করিতে গিয়া অসামান্য লাবণ্যবিশিষ্টা সীতাদেবীর সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হন এবং তাঁহাকে গৃহে আনিয়া স্বীয় ব্রাহ্মণীর নিকট অর্পণ করেন। পরে অদ্বৈত-আচার্য একদিন গঙ্গাতীরে আসিলে সীতাদেবীর সহিত তাঁহার প্রণয় জন্মে এবং গ্রন্থকারের দৌত্যে গোবিন্দ সম্মত হইলে অদ্বৈত-সীতার শুভ-পরিণয় ঘটে। কিন্তু 'সীতাগুণকদম্বে'র এই বিবরণ অন্য কোনও গ্রন্থকর্তৃক সমর্থিত হয় না। 'প্রেমবিলাসে'র চতুর্বিংশবিলাস, 'ভক্তিরত্নাকর' 'অদ্বৈতমঙ্গল' ও 'অদ্বৈতপ্রকাশ' অনুযায়ী,[২] অদ্বৈত-পত্নী সীতাদেবী নৃসিংহ-ভাদুড়ীর কন্যা ছিলেন এবং সীতা ও শ্রী নাম্নী নৃসিংহের দুই কন্যার সহিত অদ্বৈতপ্রভুর শুভ-পরিণয় ঘটে। কবিকর্ণপূরও তাঁহার 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'য় এই প্রসঙ্গে উভয়ের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।[৩] আবার 'অদ্বৈতমঙ্গলে' বলা হইয়াছে যে সীতাদেবীর জন্ম হয় ভাদ্র মাসের শুক্লা-চতুর্থী তিথিতে। 'প্রেমবিলাস' ও এই গ্রন্থে আরও বলা হইয়াছে যে নৃসিংহের আবাস-ভূমি নারায়ণপুর সপ্তগ্রামেরই নিকটবর্তী। 'প্রেমবিলাস' মতে :

---

(১) পৃ. ১৩-১৬ (২) অ. প্র.—৮ম. অ., পৃ. ২৯-৩২ ; প্রে. বি.—২৪ শ. বি., পৃ. ২৩৭-৩৮ ; ভ. র.—১২।১৭৮৩-৮৫ ; অ. ম.—পৃ. ৪১-৪৬ (৩) ৮৬

সপ্তগ্রামের নিকট নারায়ণপুর নামে গ্রাম।
বহু ব্রাহ্মণ তথি করে অবস্থান॥
কুলীন শ্রোত্রিয় কাপের তথায় বসতি।
নৃসিংহ ভাদুড়ী কাপের তথি অবস্থিতি॥

এবং তাঁহার দুই কন্যার মধ্যে

জ্যেষ্ঠ সীতা কনিষ্ঠা শ্রীঠাকুরাণী।

নৃসিংহ-গৃহিণীর দেহত্যাগের পর নৃসিংহ স্বপ্নযোগে স্বীয় কন্যাদ্বয়কে অদ্বৈতপ্রভুর পত্নী বলিয়া জানিতে পারেন।

এদিকে 'অদ্বৈতপ্রকাশ'-কার রহস্যজনকভাবে জানাইতেছেন যে নৃসিংহ-ভাদুড়ী যেই দিন পদ্মচয়নকালে পদ্মমধ্যে সীতাদেবীকে প্রাপ্ত হইয়া গৃহে আনিয়াছিলেন, সেইদিনই নৃসিংহ-মহিলা নারসিংহীও

শ্রীরূপা শ্রীনাম্নী এক কন্যা প্রসবিলা॥……
লোক সুবিখ্যাত হইল যমজ দুহিতা।
দেখিতে আইল কত গ্রামের বণিতা॥
সভে কহে দুই কন্যা লক্ষ্মীর সমান।
সীতা বড় শ্রী কনিষ্ঠা কৈলা অনুমান॥

কিন্তু 'সীতাগুণকদম্ব' এবং 'সীতাচরিত্র' নামক গ্রন্থদ্বয়ে শ্রীদেবীর নাম উল্লেখিত হয় নাই। উভয় গ্রন্থের বিষয়-বস্তু এক হইলেও কতকগুলি অলৌকিক ঘটনার বর্ণনায় উভয়ের আশ্চর্যজনক সাদৃশ্য সংশয় জাগাইয়া তুলে। কিন্তু অন্যান্য গ্রন্থের প্রমাণ-বলে নৃসিংহের পালিতা-কন্যা সীতাদেবীর সহিত তাঁহার ঔরস-জাত কন্যা শ্রীদেবীকেও অদ্বৈত-পত্নী বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। 'অদ্বৈতপ্রকাশ' অনুযায়ী বিবাহের পর সীতাদেবী অদ্বৈতকর্তৃক দীক্ষিতা হইয়াছিলেন[৪] এবং 'প্রেমবিলাসা'দি মতে শ্রীদেবীও পতিকর্তৃক দীক্ষিতা হন।[৫]

বিবাহের পর অদ্বৈতপ্রভু মধ্যে মধ্যে তাঁহার পত্নীদিগকে নবদ্বীপে লইয়া যাইতেন। গৌরাঙ্গ-আবির্ভাবকালে সীতাদেবী নবদ্বীপেই অবস্থান করিতেছিলেন। সূতিকা-গৃহে গৌরাঙ্গ-আশীর্বাদ নিমিত্ত তাঁহার আগমন-বৃত্তান্ত সমস্ত গ্রন্থেই বর্ণিত হইয়াছে। ইহার পর তিনি সম্ভবত অধিকাংশ সময় নবদ্বীপেই অতিবাহিত করিতেন। বিশ্বনাথ-চক্রবর্তী লিখিয়াছেন[৬] যে তৎকালে শ্রীবাস-আচার্য ও জগন্নাথ-মিশ্রের পরিবারের সহিত তিনি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে যুক্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং এই সূত্রে তিনি যে বালক-গৌরাঙ্গের

(৪) অ. প্র.—৮ ম. অ., পৃ. ৩৩ (৫) প্রে. বি.—২৪ শ. বি., পৃ. ২৩৮; অ. ম.—পৃ. ৪৫-৬
(৬) গৌ. লী.—পৃ. ১৮, ৩৮

মাতৃস্থানাভিষিক্তা হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই কারণেই 'চৈতন্য-ভাগবত'কারও তাঁহাকে বার বার 'অদ্বৈতগৃহিণী পতিব্রতা জগন্মাতা' বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি আরও লিখিয়াছেন[৭] :

অদ্বৈত-গৃহিণী মহাসতী পতিব্রতা।
বিশ্বম্ভর মহাপ্রভু যারে বোলে মাতা॥

স্নেহময়ী জননীর মত সীতাদেবী নানাভাবে বিশ্বম্ভরের পরিচর্যা করিয়াছিলেন এবং তিনি তাঁহাকে স্বীয় রন্ধন-সামগ্রী প্রভৃতি ভোজন করাইয়া[৮] পরিতৃপ্তি লাভ করিতেন।

কিন্তু নবদ্বীপে বাসকালে তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে শান্তিপুরে যাইতে হইত. 'চৈতন্য-ভাগবত' হইতেই জানা যায় যে নিত্যানন্দের নবদ্বীপ আগমনের পর গৌরাঙ্গ শ্রীরাম-আচার্যকে শান্তিপুরে পাঠাইয়া দিলে সীতাদেবীও অদ্বৈতাচার্যের সহিত শান্তিপুর হইতেই নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন।[৯] আবার গৌরাঙ্গ কর্তৃক দণ্ডপ্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত অদ্বৈতপ্রভু শান্তিপুরে গিয়া জ্ঞানবাদের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলে শ্রীদেবী সহ[১০] সীতাদেবীও তৎকালে সেইস্থানে উপস্থিত ছিলেন। বৃদ্ধ পতির প্রতি সীতাদেবীর দরদের অন্ত ছিল না। গৌরাঙ্গ আসিয়া অদ্বৈতের জ্ঞানবাদ প্রচারের জন্য তাঁহাকে প্রহার করিতে থাকিলে সীতামাতা ব্যগ্র হইয়া বলিলেন[১১] :

বুঢ়া বিপ্র, বুঢ়া বিপ্র রাখ রাখ প্রাণ।
কাহার শিক্ষায় এত কর অভিমান॥
এত বুঢ়া বামনেরে কি আর করিবা।
কোন কিছু হৈলে এড়াইতে না পারিবা॥

বঙ্গনারীর এইরূপ পতিভক্তি অসাধারণ না হইলেও অকৃত্রিম ও সুমধুর। কিন্তু গৌরাঙ্গের প্রতিও তাঁহার স্নেহ সাধারণ ছিল না। শাস্তিদান করিবার পর গৌরাঙ্গ অদ্বৈতপ্রভুকে কোলদান করিলে তিনি আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিয়াছিলেন। অতঃপর 'গৌরগতপ্রাণা-সীতা' স্বহস্তে নানাবিধ অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া সঙ্গীসহ গৌরহরিকে পরিতৃপ্ত করেন।[১২]

এই ঘটনার বহু পূর্বেই বিশ্বম্ভর অদ্বৈতাচার্যের নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন কোন গ্রন্থকার জানাইতেছেন[১৩] যে তজ্জন্য তিনি শান্তিপুরেও গমন করিয়াছিলেন। 'অদ্বৈতপ্রকাশ'- মতে তৎপূর্বে সীতামাতার জ্যেষ্ঠ পুত্র অচ্যুতানন্দ

---

(৭) ২।১৯, পৃ. ২০১ (৮) চৈ. ম. (লো.)—ম. খ., পৃ. ১০৭ (৯) দ্র—অদ্বৈত আচার্য
(১০) ভ. র.—১২।১৯৬১ (১১) চৈ. ভা.—২।১৯, পৃ. ১৯৮ ; তু.—অ.প্র.—১৪শ. অ., পৃ.৫৯
(১২) চৈ. ভা.—২।১৯, পৃ. ২০০ ; অ. প্র.—১৪শ. অ. পৃ. ৬০ (১৩) অ. প্র.—১২শ. অ. ৭৮ ; ১১শ. অ., পৃ. ৪৫-৪৬ ; সী. চ.—পৃ. ৬-৯ ; সী. ক.—পৃ. ৩৩-৪২

জন্মলাভ করিয়াছিলেন। 'প্রেমবিলাসে'র চতুর্বিংশবিলাস মতে[১৪] সম্ভবত সেই সময়ে ছোট-শ্যামদাস নামক এক ব্যক্তিও সীতা কর্তৃক পালিত হইতেছিলেন এবং 'পুত্র-স্নেহে সীতা তাঁরে করাইলা স্তনপান।' বিশ্বম্ভরের শান্তিপুরে আগমনকালে সীতাদেবীর দ্বিতীয়-পুত্র কৃষ্ণদাসও ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন এবং প্রায় একইকালে শ্রীদেবীর গর্ভে একটি পুত্রসন্তান জন্মলাভ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। সীতাদেবীর তৃতীয় পুত্র গোপালদাসও গৌরাঙ্গের শান্তিপুর বাসকালে জন্মলাভ করেন।[১৫] কিন্তু 'অদ্বৈতপ্রকাশ' অনুযায়ী তাঁহার তৃতীয় পুত্র বলরাম ও পরবর্তী যমজ-পুত্রদ্বয় স্বরূপ ও জগদীশের জন্মগ্রহণকালে তিনি শান্তিপুরে অধ্যয়ন শেষ করিয়া নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। 'সীতাগুণকদম্বে'র এক স্থলে[১৬] লিখিত হইয়াছে যে বিশ্বম্ভরের শান্তিপুর-বাসকালেই সীতাদেবীর 'পঞ্চপুত্র' জন্মলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু অন্য-কোথাও ইহার সমর্থন নাই।

'অদ্বৈতমঙ্গলে' উক্ত হইয়াছে[১৭] যে সীতাদেবীর দ্বিতীয় পুত্র বলরাম (? কৃষ্ণমিশ্র) ও তৃতীয়-পুত্র গোপাল মাতাকর্তৃক দীক্ষিত হইয়াছিলেন। শান্তিপুরে অবস্থানকালে সীতাদেবীর প্রথম পুত্র অচ্যুতানন্দের সহিত বিশ্বম্ভরের বিশেষ প্রীতি-সম্বন্ধ গড়িয়া উঠে। কিন্তু সীতাদেবী বোধকরি বিশ্বম্ভরকেই অচ্যুতানন্দ ও কৃষ্ণ-মিশ্র উভয়াপেক্ষা অধিকতর স্নেহ-যত্নের সহিত পালন করিতেছিলেন। একদিন তিনি বিশ্বম্ভরের নিমিত্ত দুগ্ধ 'আবর্তন' করিয়া রাখিলে অচ্যুতানন্দ ক্ষুধাবশত তাহা পান করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তজ্জন্য তিনি অচ্যুতের পৃষ্ঠে সজোরে চাপড় মারিয়া তাঁহাকে শাস্তিদান করিয়াছিলেন। আবার শিশু-কৃষ্ণমিশ্রও একদিন বিশ্বম্ভরের জন্য সঞ্চিত কদলী ভক্ষণ করিয়া মাতা কর্তৃক বিশেষভাবে ভর্ৎসিত হইয়াছিলেন।[১৮]

গৌরাঙ্গের সন্ন্যাসগ্রহণ-কালে সীতাদেবী শান্তিপুরেই বাস করিতেছিলেন। 'চৈতন্য-চন্দ্রোদয়নাটক' লোচনের 'চৈতন্যমঙ্গল' এবং 'চৈতন্যচরিতামৃত' প্রভৃতি প্রাচীন ও প্রামাণিক গ্রন্থেই দেখা যায় যে সন্ন্যাস-গ্রহণের পর চৈতন্য শান্তিপুরে পৌঁছাইলে জননীস্বরূপা সীতাদেবী আকুলিতচিত্তে তাঁহাকে সমাদর জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। সম্ভবত তখন হইতে তিনি শান্তিপুরেই স্থায়িভাবে বাস করিতে থাকেন। কয়েক বৎসর পরে চৈতন্য নীলাচল

---

(১৪) পৃ. ২৩৮-৩৯ (১৫) এই সমস্ত প্রসঙ্গ অচ্যুতানন্দের জীবনীতে প্রদত্ত হইয়াছে। (১৬) পৃ. ৩৮ (১৭) পৃ. ৫৭; সীতাদেবীর পুত্রাদি সম্বন্ধে অচ্যুতানন্দ-জীবনী দ্রষ্টব্য। (১৮) অদ্বৈতপ্রকাশ (১২শ. অ., পৃ. ৪৯), সীতাচরিত্র (পৃ. ৬-৭), সীতাগুণকদম্ব (পৃ. ৩৭-৪১) ও অদ্বৈতমঙ্গলে (পৃ. ৫৬) এই ঘটনা দুইটির কথা বিস্তৃতভাবে বিবৃত হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে অচ্যুতকে চাপড় মারার দাগ গৌরাঙ্গের গায়ে দেখা গিয়াছিল এবং কৃষ্ণ-মিশ্র যে কলা খাইয়াছিলেন, গৌরাঙ্গের উদ্গারে তাহার গন্ধ পাওয়া গিয়াছিল।

হইতে গৌড়ে প্রত্যাবর্তন করিলে সীতাদেবী শান্তিপুরে থাকিয়াই তাঁহার সেবাযত্ন করিয়াছিলেন। গ্রন্থকার-গণের বর্ণনামধ্যে আর তাঁহাকে কখনও অন্যত্র গমন করিতে দেখা যায় না। 'অদ্বৈতপ্রকাশ'-মতে একবার তৎপুত্র কৃষ্ণ-মিশ্র নীলাচলে গমন করিতে চাহিলে তিনি তাঁহাকে গৃহে থাকিয়া কৃষ্ণসেবা করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছিলেন।[১৯] কিন্তু তিনি নিজে অদ্বৈতাচার্যের সহিত নীলাচলে গিয়া চৈতন্যের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।[২০] 'চৈতন্যভাগবত'-কার বলিতেছেন যে নীলাচলে গিয়াও তিনি অপত্য-স্নেহে চৈতন্যকে নিকটে বসাইয়া তাঁহার ভিক্ষা নির্বাহ করাইয়াছিলেন। তৎকালে তিনি

প্রভুর প্রীতের দ্রব্য গৌড়দেশ হৈতে।
যত আনিয়াছিলেন সব লাগিলেন দিতে॥

'অদ্বৈতপ্রকাশ'-কারও এই সম্বন্ধে বিশেষ বর্ণনা দিয়াছেন। চৈতন্য-তিরোভাব-বার্তা শ্রবণ করিয়া সীতামাতা যে কিভাবে মূর্ছিতা হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহাও গ্রন্থকার-গণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

'অদ্বৈতপ্রকাশে'র বর্ণনানুযায়ী, অদ্বৈতপ্রভুর জীবদ্দশাতেই কৃষ্ণ-মিশ্রের উপর মদন-গোপাল-বিগ্রহের ভারার্পণ উপলক্ষে সীতাদেবী কৃষ্ণ-মিশ্রকে আশীর্বাদ করেন; কিন্তু এই বিষয়ে তাঁহাদের কনিষ্ঠ পুত্রদ্বয় যথেষ্ট বাধার সৃষ্টি করিয়াছিলেন।[২১] আরও নানা-কারণে তখন গোষ্ঠীগত বিভেদ ক্রমাগত মাথা তুলিতে থাকে। অদ্বৈত-তিরোধানের পর তাহার সমস্ত ধাক্কাই সীতাদেবীকে সহ্য করিতে হইয়াছিল। 'ভক্তিরত্নাকরা'দি গ্রন্থ হইতে জানা যায়[২২] যে শ্রীনিবাস-আচার্য তাঁহার বৃন্দাবন-গমনের পূর্বে শান্তিপুরে সীতা-দেবীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন এবং 'প্রেমবিলাস'-মতে এই সময়ে সীতাদেবী শ্রীনিবাসের নিকট উপরোক্ত বিভেদের বিষয় কিছু কিছু ব্যক্ত করিয়াছিলেন। আবার 'নরোত্তমবিলাস'-মতে[২৩] খেতুরির মহামহোৎসবে যোগদান করিবার জন্য তিনি অচ্যুতানন্দকেও আজ্ঞাপ্রদান করিয়াছিলেন। সন্দিগ্ধ 'মুরলীবিলাস'-গ্রন্থের লেখক লিখিতেছেন[২৪] যে জাহ্নবার দত্তক-পুত্র রামচন্দ্র প্রথমবার নবদ্বীপ হইতে খড়দহে যাইবার সময় এবং নীলাচল হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া খড়দহে গমনকালে, শান্তিপুরে সীতাদেবীর সাক্ষাৎপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

'সীতাচরিত্র' ও 'সীতাগুণকদম্ব' নামক গ্রন্থদ্বয়ে নন্দিনী ও জঙ্গলী নামক সীতাদেবীর

(১৯) অ. প্র.—১৫শ. অ., পৃ. ৬৫ (২০) চৈ. ভা.—৩।১০, পৃ. ৩৩১-৩২; চৈ. চ.—২।১৬., পৃ. ১৮৬; অ. প্র.—১৮শ. অ., পৃ. ৭৮-৮০ (২১) ২১শ. অ., পৃ. ৯৯ (২২) প্রে. বি.— ৪র্থ. বি.—পৃ. ৪৪-৪৬; ভ. র.—৪।৭০-৮০; ন. বি.—২য়. বি., পৃ. ১৯ (২৩) ৬ষ্ঠ. বি., পৃ. ৮২ (২৪) পৃ. ৮৪, ২২০

একটি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। আবার যেমন তিনি একদিকে পূজার অধিকারী-রূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তেমনি অন্যদিকে তিনি প্রচারকার্যেও নিযুক্ত ছিলেন। গোবিন্দ-গোসাঁই তাঁহার শিষ্য ছিলেন।[১২] ভক্তকাশী নামে এক ব্রাহ্মণ এবং গৌড়দেশীয় অন্য এক ব্রাহ্মণ-কুমারও তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহার সহিত বাস করিয়াছিলেন।[১৩] রূপের সঙ্গী[১৪] সুবিখ্যাত যাদবাচার্যও তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।[১৫] 'বেণুকূপ নিকটে যে সমাজ তাঁহার'—তাহা বহুদিন যাবৎ সংলগ্ন কুঞ্জের মধ্যেই বিরাজ করিতেছিল।[১৬]

শ্রীনিবাস ও নরোত্তম যখন বৃন্দাবনে উপনীত হন, তখন কাশীশ্বর ও লোকনাথ উভয়েই লোকান্তরিত হইয়াছেন।[১৭] বৃন্দাবনের সমাধি-কুঞ্জে উভয়ের সমাধি-স্থান পাশাপাশি নির্দিষ্ট হইয়াছিল। কাশীশ্বরের পর 'চৈতন্য-পরিকর' বা 'চৈতন্যপার্ষদ' শ্রীকৃষ্ণ-পণ্ডিত গোবিন্দের সেবাধিকারী হন। কাশীশ্বরের সহিত তাঁহার সম্প্রীতি ছিল এবং তিনিও বৃন্দাবনে বাস করিতেন। শ্রীনিবাস বৃন্দোবনে আসিলে তাঁহার 'আচার্য'-উপাধি-প্রাপ্তি অনুষ্ঠানে তিনি গোবিন্দের অধিকারী হিসাবে বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। জাহ্নবা-দেবীর দ্বিতীয়বার বৃন্দাবনাগমনকালেও তিনি বৃন্দাবনে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু বীরচন্দ্রের আগমনকালে তাঁহাকে আর দেখা যায় নাই।

সম্ভবত কৃষ্ণদাস নামে শ্রীকৃষ্ণ-পণ্ডিতের একজন শিষ্য ছিলেন।[১৮]

---

(১২) কাশীনাথ-পণ্ডিতের জীবনীর শেষাংশে গোবিন্দ-গোসাঁই সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। (১৩) কাশীশ্বর গোস্বামীর সূচক নামক একখানি পুথি হইতে জানা যায় (পৃ. ৫) যে পলাশি-গ্রামনিবাসী ভগবান-পণ্ডিত নামক এক ব্যক্তি কাশীশ্বরের শিক্ষা-শাখাভুক্ত ছিলেন। (১৪) চৈ. চ.—১।৮, পৃ. ৪৮ (১৫) ভ. র.—১৩।৩২৩; প্রে. বি.—১৮শ. বি., পৃ. ২৭০ (১৬) ভ. মা.—পৃ. ২৩০ (১৭) ভ. র.; অ. ব.—৪র্থ. ম., পৃ. ২৬ (১৮) প্রে. বি.—১৭শ. বি., পৃ. ২৪০

দুইজন অনুরাগী ভক্তের কথা অস্বাভাবিক বিস্তৃতি সহকারে বর্ণিত হইয়াছে[২৫]। অদ্বৈত মঙ্গলে' এবং 'প্রেমবিলাসে'র চতুর্বিংশবিলাসেও তাহার উল্লেখ আছে[২৬]। কিন্তু তৎসম্বন্ধীয় ঘটনাকাল নির্ণয় করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। কেবল এইটুকু জানা যায় যে তখন অদ্বৈত প্রভু জীবিত ছিলেন এবং 'সীতাগুণকদম্বে'র গ্রন্থকার খুব সম্ভবত বলিতে চাহিতেছেন[২৭] যে অদ্বৈতের একজন প্রাচীন-ভক্ত ও উপরোক্ত গ্রন্থের লেখক স্বয়ং বিষ্ণুদাস-আচার্য সীতাদেবী কর্তৃক 'পুনরপি' 'রাধাকৃষ্ণসিদ্ধিমন্ত্রে' দীক্ষিত হইবার পূর্বেই উক্ত ঘটনা ঘটিয়াছিল। কিন্তু এইরূপ বিবরণ সহজভাবে সমর্থিত হইতে পারে না। কারণ গ্রন্থমতে বিষ্ণুদাস সম্ভবত বহুপূর্বেই অদ্বৈতপ্রভুর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিয়াছিলেন।[২৮] যাহাহউক, উপরোক্ত গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণিত কাহিনীগুলির[২৯] অলৌকিক অংশকে বর্জন করিলে কিছু কিছু তথ্য

---

(২৫) সী. চ.—পৃ. ১২-১৫, ১৯-২৩; সী. ক.—পৃ. ৬৬-৮৪, ৯৬-১০৪ (২৬) অ. ম.—পৃ. ৪৬-৪৭; প্রে. বি. (২৪শ. বি.)—পৃ. ২৩৯ (২৭) পৃ. ৮৪-৮৫ (২৮) দ্র.—বিষ্ণুদাস-আচার্য (২৯) ক্ষেত্রিকুলোদ্ভব শূদ্র নন্দরাম এবং ব্রাহ্মণ যজ্ঞেশ্বর একই গ্রামের অধিবাসী। একদিন তাঁহারা যুক্তিপূর্বক সীতাদেবীর নিকট দীক্ষা-গ্রহণেচ্ছু হইয়া শান্তিপুরে গেলেন এবং অদ্বৈতকে জানাইলেন যে তাঁহাদের বংশপ্রথা-অনুযায়ী তাঁহারা পুরুষের নিকট দীক্ষা-গ্রহণ করিতে পারেন না। ফলে সীতার সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল। কিন্তু তিনি জানাইলেন যে তাঁহার নিকট কেবল এক রাধাকৃষ্ণ-মন্ত্র রহিয়াছে, তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে হইলে পুং-ভাব পরিত্যাগ করিয়া ব্রজগোপীর ভাবানুযায়ী সেবাতৎপর হইলে কৃষ্ণপ্রাপ্তি ঘটিবে। তদনুযায়ী নন্দরাম ও যজ্ঞেশ্বর দীক্ষাগ্রহণ করিলেন; কিন্তু তারপর তাঁহারা গৃহ-প্রত্যাবর্তনে রাজি না হইয়া সীতামাতার সেবায় নিযুক্ত হইতে চাহিলে সীতা বলিলেন, "প্রকৃতি না হইলে দাসী কেমনেতে হয়।" তাঁহারা সিন্দূর, শাড়ি, অলংকারাদি পরিধান করিয়াও কবরি বাঁধিয়া হস্তে শঙ্খ লইয়া হাজির হইলেন। তারপর তাঁহারা তাঁহাদের অঙ্গমধ্যে নারী-চিহ্ন প্রদর্শন করিলে সীতাদেবী স্তম্ভিত হইয়া 'তবে নিজ সেবা দিআ দুহারে রাখিলা।' শিষ্যদ্বয় নন্দিনী ও জঙ্গলী নামে অভিহিত হইলেন।

ইহার ঠিক কতদিন পরে, কিংবা তখন অদ্বৈত জীবিত ছিলেন কিনা বলিতে পারা যায় না, একদিন সীতাদেবী নন্দিনী ও জঙ্গলীকে বিদায় দিলেন। তিনি নন্দিনীকে জানাইলেন যে নন্দিনী বন মধ্যে চৈতন্য-ভজন করিতে থাকিলে কুমারী-অবস্থাতেই গর্ভবতী হইবেন এবং তাঁহার গর্ভজাত এক সাধু সীতার শিষ্য-পরিবার হিসাবে গণ্য হইবেন। তিনি জঙ্গলীকেও বলিলেন যে জঙ্গলী অরণ্য মধ্যে চৈতন্য-নাম জপ করিতে থাকিলে হরিদাস নামক যে রাখাল বালকটি তাঁহার নিকট গোধন রক্ষা করিতে গিয়া তাঁহার চরণাশ্রয় করিবেন, তাঁহার দ্বারাই তাঁহার শিষ্য-পরম্পরা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে এবং সেই অরণ্যটিও জঙ্গলী-টোটা নামে খ্যাত হইবে।

নন্দিনী এক শূদ্র গৃহস্থের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তিনি "প্রকৃতির বেশ অঙ্গে বসন পরিআ। তপস্বীর রূপে রহে আনন্দিত হইয়া॥". কিছুকাল পরে সেই গ্রামস্থ এক দুর্জন ব্রাহ্মণ নবাব বা সুবাদারের নিকট জানাইলেন যে নন্দিনী 'প্রকৃতির বেশ ধরে পুরুষ হইয়া।' তখন নবাব আসিয়া তাঁহাকে আসল কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি জানাইলেন যে তিনি নারীই বটেন। নবাব ক্রুদ্ধ হইয়া

সংগৃহীত হইতে পারে বটে ; কিন্তু তাহাতে নন্দিনী বা জঙ্গলীর প্রকৃত পরিচয় লাভ করিতে পারা যায় না। অন্যান্য প্রামাণিক গ্রন্থ হইতেও তাঁহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিতে পারা যায় না। অদ্বৈতশিষ্য-বর্ণনা প্রসঙ্গে 'অদ্বৈতপ্রকাশ'-কার একস্থলে বলিয়াছেন[৩১] :

নন্দনী প্রভৃতি শ্রীমান্ বাসুদেব দত্ত।
প্রভুস্থানে মন্ত্র লঞা হইলা কৃতার্থ॥

গ্রন্থকার-মতে এই নন্দনী অদ্বৈতপ্রভুর নিকট মন্ত্র-গ্রহণ করেন। সুতরাং এই নন্দনী

তাঁহার বসন উন্মোচন করিতে আদেশ দিলে তিনি জানিতে চাহিলেন যে নবাব কি করিয়া রজস্বলা নারীর অঙ্গ-স্পর্শ করিবার আদেশ দান করিলেন। এই বলিতে বলিতে 'আচম্বিতে উরু বাহি নাম্বয়ে রুধির।' অনুতপ্ত নবাব তাঁহাকে তিনখানি গ্রাম দান করিয়া সেইস্থলে গোপীনাথ-মন্দির নির্মাণ করাইয়া দিলেন। তারপর একদিন এক সপ্তবর্ষবয়স্কা ব্রাহ্মণ-কুমারী আচম্বিতে গর্ভবতী হইয়া পুত্র-প্রসবান্তে দেহত্যাগ করিলে 'বালক বলেন আমি নন্দিনীকুমার।' গ্রামবাসিগণ বালককে নন্দিনীর নিকট আনিলেন এবং 'এইরূপে নন্দিনীর হইল প্রকাশ।'

এদিকে জঙ্গলী তপস্বিনী-বেশে এক অরণ্যে বাস করিতে থাকিলে হরিদাস নামক রাখাল-বালক তাঁহাকে দেখিয়া শিষ্য হইবার বাসনা প্রকাশ করেন। কিন্তু "জঙ্গলী কহেন বাছা তবে শিষ্য করি। পুম্ দেহ তেজে যদি হৈতে পার নারী॥ শিশু কহে 'তোমার করুণা যদি হয়।' গুরুজাতি শিষ্য হইলে গুরু মূর্তি পায়।" হরিদাস শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া 'হরিপ্রিয়া' নাম প্রাপ্ত হইলেন এবং পিতৃ-অনুরোধ সত্ত্বেও গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন না, স্ত্রী-বেশ ধারণ করিয়া জঙ্গলীর সেবা করিতে লাগিলেন। গ্রামবাসিগণ নবাব বা কাজীর নিকট গিয়া নানাকথা বলিলে নবাব আসিয়া জঙ্গলীর বস্ত্রমোচনের আজ্ঞা দান করেন। কিন্তু বস্ত্র আকর্ষণকালে ক্রমাগত বস্ত্র বাহির হয় এবং নবাব বা সুবাদারের মুখ হইতেও রক্ত উঠিতে থাকে। শেষে জঙ্গলীর দয়ায় নবাব মুক্তি পাইয়া তাঁহাকে সমস্ত জঙ্গল দান করেন। 'অদ্বৈত মঙ্গল'-মতে এক ব্যাধ জঙ্গলীর দুই প্রকার রূপ দেখিয়া গৌড়-বাদশাহের নিকট সংবাদ দিলে তিনি গ্রাম হইতে অন্য মহিলা আনাইয়া জঙ্গলীর নারীত্বের পরিচয় প্রাপ্ত হন এবং বন পরিষ্কার করিয়া তাঁহার জন্য যে টোটা নির্মাণ করাইয়া দেন, তাহাই জঙ্গলীর-টোটা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। আবার 'সীতাগুণ-কদম্ব'-মতে উপরোক্ত কাজী রক্তবমন করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলে বাদশাহ্ লোকমুখে শুনিতে পাইয়া জঙ্গলীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে জঙ্গল দান করেন। কিন্তু 'প্রেমবিলাসে'র চতুর্বিংশ-বিলাস-মতে (পৃ. ২৩৯) জঙ্গলী তপস্যা করিতে থাকিলে গৌড়েশ্বর শিকারে আসিয়া সেই পরমা-সুন্দরী তপস্বিনীর সতীত্বনাশ করিতে চাহেন ; কিন্তু নারী পুরুষে রূপান্তরিত হন। তখন তিনি সেই নারীর রহস্যময় কথাবার্তা শুনিয়া তাঁহাকে নারী এবং পুরুষদিগের দ্বারা পৃথকভাবে পরীক্ষা করাইয়া তাঁহার দুইটি রূপেরই পরিচয় প্রাপ্ত হন এবং তিনি জঙ্গলীকে মাতৃ-সম্বোধন করিয়া তাঁহার জন্য একটি পুরী নির্মাণ করাইয়া দেন। তদবধি 'সেইস্থানের নাম জঙ্গলীটোটা সভে কন।' ইহার পরেও এক যবন-ফকির সেইস্থানে আসিলে তাঁহার নিকটেও জঙ্গলী এবং হরিপ্রিয়াকে শক্তির পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছিল। (৩১) ১০ম অ., পৃ. ৪০

উপরোক্ত আলোচনার নন্দিনী কিনা ঠিক ঠিক বুঝা যায় না। অথচ 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র অদ্বৈত-শাখায় একজন নন্দিনীকে পাওয়া যাইতেছে।

নন্দিনী আর কামদেব চৈতন্যদাস।
দুর্লভ বিশ্বাস আর বনমালী দাস॥

জঙ্গলীর সম্বন্ধে অন্য কোন উল্লেখ কোথাও না থাকিলেও, এই সমস্ত হইতে অদ্বৈত-শাখার মধ্যে নন্দিনীর একটি বিশেষ স্থান স্বীকার করিতে হয়।

উপরোক্ত উদ্ধৃতি-মধ্যে নন্দিনীর সহিত কামদেবের নাম যুক্ত হইয়াছে। 'সীতাগুণ-কদম্বে'র সন্দেহজনক উল্লেখমাত্র[৩২] ছাড়া দুর্লভ-বিশ্বাসের নাম[৩৩] অন্যত্র না থাকিলেও, কামদেবের একটি অনস্বীকার্য প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি ছিল। 'গৌরগণোদ্দেশ' নামক একটি গ্রন্থে[৩৪] চৈতন্যের দ্বিতীয়-ব্যূহের মধ্যে অদ্বৈত, অচ্যুতানন্দ, কামদেব ও পুরুষোত্তম এই চারি-ব্যক্তির নাম করা হইয়াছে। অদ্বৈতপ্রভুর শিষ্যবর্ণনা প্রসঙ্গে 'অদ্বৈতমঙ্গলে'র লেখকও বলিতেছেন যে পুরুষোত্তম-পণ্ডিত বড় শাখা এবং কামদেব দ্বিতীয়।[৩৫] গ্রন্থকার অন্যত্র জানাইয়াছেন যে কামদেব-পণ্ডিত[৩৬] অদ্বৈতপ্রভুর অষ্টক রচনা করিলে মহাপ্রভু তাঁহাকে 'কৃষ্ণের অংশ' আখ্যা দিয়া অদ্বৈত-চরণ ভজনের উপদেশ দান করেন। তদনুযায়ী কামদেব অদ্বৈত সকাশে আসিলে অদ্বৈতপ্রভু তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া লীলা করিতে থাকেন। 'প্রেমবিলাস' ও তদনুযায়ী 'ভক্তিরত্নাকরে'র উল্লেখ[৩৭] হইতে জানা যাইতেছে যে কামদেব দীর্ঘজীবী হইয়া অচ্যুতানন্দের সহিত খেতুরির মহামহোৎসবে যোগদান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু কামদেব অচ্যুতানন্দের সহিত যুক্ত হইয়া খেতুরিতে গিয়াছিলেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। 'প্রেমবিলাসে'র চতুর্বিংশবিলাস মতে[৩৮] অদ্বৈতপ্রভু শান্তিপুরে জ্ঞানবাদ প্রচারের ছলনা করায় গৌরাঙ্গ কর্তৃক প্রহৃত হইবার পর পুনরায় ভক্তিবাদ প্রচারে উদ্যোগী হইলে

কামদেব নাগর আর আগল পাগল।
না ছাড়িল জ্ঞানবাদ আর সে শঙ্কর॥

---

(৩২) পৃ. ৯১ (৩৩) ইনি সী. ক.(পৃ. ৯১)-মধ্যে বল্লভ-বিশ্বাসে পরিণত হইয়াছেন। (৩৪) গৌ. গ. (কৃষ্ণদাস)—পৃ. ৩ (৩৫) পৃ. ৩৮, ৫৩-৫৪ ; তু.—গৌ. গ. (কৃষ্ণদাস), পৃ. ৩ (৩৬) আধুনিক বৈ. দ.(পৃ. ২৪)-মতে খড়দহ গ্রামনিবাসী কামদেব-পণ্ডিত ও যোগেশ্বর-পণ্ডিত যথাক্রমে মাহেশের কমলাকর-পিপিলাইর কন্যা রাধারাণী ও কমলাকর-ভ্রাতা নিধিপতির কন্যা রমাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন এবং কমলাকরের অনুরোধে নিত্যানন্দকে খড়দহে আনয়ন করেন। এই কামদেবের প্রপৌত্র চাঁদ-শর্মা রাজা-প্রতাপাদিত্যের কর্মচারী ছিলেন। গ্রন্থকার আরও বলেন (পৃ. ১০৮) যে কামদেব-পণ্ডিত-বংশীয় রামেশ্বর-মুখোপাধ্যায়ের সহিত বীরচন্দ্র-পুত্র রামচন্দ্রের কন্যা ত্রিপুরাসুন্দরীর বিবাহ ঘটে। (৩৭) প্রে. বি.—১৯শ. বি., পৃ. ৩০৯ ; ভ. র.—১০।৪০৩ (৩৮) পৃ. ২৪০

তখন

ক্রোধ করি অদ্বৈত তাদের ত্যাগ কৈল।
ত্যাগী হইয়া তারা দেশান্তরে গেল ।।......
যাদেরে ত্যজিল তারা ত্যাগীতে গণন ।।

সুতরাং জানা যাইতেছে যে কামদেব ও নাগর পূর্ব হইতে পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন। 'অদ্বৈতপ্রকাশে'ও বলা হইয়াছে[৩৯] :

তিন শিষ্য বিনা সভে ভক্তিবর্ম্মে গেলা ।।
কামদেব নাগর আর আগল পাগল।
এই তিনে নাহি মানে আচার্যের বোল ।।......
প্রভু কহে যদি তোরা আজ্ঞা না মানিলি।
মুখ না দেখিমু আর মোর ত্যজ্য হৈলি ।।
যে আজ্ঞা বলিয়া তারা পূর্বদেশে গেলা।
আচার্য হইয়া নিজ মত চালাইলা ।।

'অদ্বৈতপ্রকাশ'-মতে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল চৈতন্য-তিরোভাবের পরবর্তিকালে। কিন্তু যাহাই হউক না কেন, কামদের ও নাগরাদি স্বয়ং অদ্বৈতকর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন। 'অদ্বৈতপ্রকাশ'-কার 'আগল পাগল' বলিতে সম্ভবত শংকর নামক অদ্বৈত-শিষ্যের কথাই বলিয়াছেন[৪০]। আর নাগর নামক ব্যক্তিটি সম্ভবত নিজেকে 'অদ্বৈতগোবিন্দ' আখ্যা দিয়া স্বমহিমা ঘোষণা করিয়াছিলেন। 'প্রেমবিলাসে'র চতুর্থবিলাস হইতে জানা যাইতেছে[৪১] যে অদ্বৈত-তিরোধানের পর শ্রীনিবাস-আচার্য প্রথমবারে শান্তিপুরে গিয়া সীতাদেবীকে 'অদ্বৈতগোবিন্দ' সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি জানাইয়াছিলেন যে অদ্বৈত-সাহায্যার্থ মহাপ্রভু-প্রেরিত কামদেব-নাগরাদি ব্যক্তি যখন অদ্বৈতের বিরুদ্ধে স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করিয়া বলিলেন, "গৌড়দেশ আইলা প্রভু (মহাপ্রভু ?) নাগর লৈয়া সঙ্গে," তখন

শুনিতেই মাত্র মোর ক্রোধ উপজিল।
নাগরের মুখ আমি আর না দেখিল ।।
স্বতন্ত্র করিমু আমি সেবক নন্দিনী।
সেই বাক্য আমি আর কর্ণে নাহি শুনি ।।
সব পুত্র লৈল না লৈল অচ্যুতানন্দ।
গৌড়ে আসি প্রেমে ভাসাইল নিত্যানন্দ ।।
নাগরেরে গোসাঞি নিষেধ করিতে নারিল।
তে কারণে এই গণ বিরুদ্ধ হইল ।।

---

(৩৯) ২১ শ. অ., পৃ. ৯৩ (৪০) দ্র.—অদ্বৈতাচার্য (৪১) পৃ. ৪৩-৪৬

শুন শ্রীনিবাস মনে তাপ বড় পাই।
পুত্র সঙ্গে বিরোধ করি ঘরে নিদ্রা যাই ॥
চৈতন্যের দাসী পুত্র অচ্যুত সহিত।
এই বাক্য না কহে যেই সম্বন্ধ রহিত ॥

এই উক্তিতে নন্দিনীর প্রয়োজন স্বীকৃত হইয়াছে। ৪০০ চৈতন্যাব্দের 'বিষ্ণুপ্রিয়া'-পত্রিকার 'অদ্বৈতগোবিন্দ'-শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে, "উপরে যে 'সব পুত্র' লেখা আছে তাহা ঠিক নহে। কামদেব নাগরের মত প্রভু গোপাল-মিশ্র কি প্রভু কৃষ্ণ-মিশ্র লয়েন নাই। কেবল বলরাম ও জগদীশ লইয়াছিলেন।" অদ্বৈত-পুত্রবৃন্দের জীবনী-আলোচনায় আমরা তাহাই দেখিয়াছি। কিন্তু স্বয়ং সীতামাতাকে যে অসহনীয় দুর্দশার মধ্যে থাকিয়া কাল কাটাইতে হইয়াছিল, তাহাও উক্ত পঙ্‌ক্তিগুলির মধ্যে নিশ্চিতভাবে পরিব্যক্ত হইয়াছে। শেষ-বয়সে গৌরাঙ্গ-'মাতা' বা 'জগন্মাতা' সীতাদেবীর জীবন এইভাবেই অতিবাহিত হইয়াছিল।

সীতাদেবীর জীবন সম্বন্ধে অন্য বিশেষ কোনও তথ্য[৪২] পাওয়া যায় না। 'সীতাচরিত্র' ও 'সীতাগুণকদম্ব' মতে[৪৩] শচী-বিষ্ণুপ্রিয়ার তিরোধানের পর তাঁহাদের গৃহভৃত্য-ঈশান শোকাকুল অবস্থায় শান্তিপুরে পৌছাইলে সীতাদেবী তাঁহার আর্তি দেখিয়া তাঁহাকে জল-বহন কার্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ক্রমে ঈশানের মস্তক ক্ষত বিক্ষত হইয়া কীটের আবাস-স্থল হইয়া দাঁড়াইলে অদ্বৈতপ্রভু তাহা দেখিয়া ব্যথিত হন। তখন সীতাদেবী মাতৃস্নেহে ঈশানের পরিচর্যা করিয়া তাঁহাকে যন্ত্রণামুক্ত করিয়াছিলেন। আর একদিন সীতাদেবী দোলায় চড়িয়া নীলাম্বর-গৃহে গমনকালে জানু-রায় নামক এক ভক্তকে পূর্বদেশে গমন করিবার আজ্ঞা দিয়া ঈশানকেও তাঁহার সহিত চলিয়া গিয়া সংসারাদি করিবার নির্দেশ দান করেন। জানু-রায় সীতার আজ্ঞাবিনা দোলা বহনের চেষ্টা করিলে সীতাদেবী তাঁহাকে শান্তিচ্ছলে ঐরূপ নির্দেশ দান করিলেও ঈশানকে তিনি আশীর্বাদ করিয়া তাঁহার বংশসম্বন্ধে নানাবিধ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। গ্রন্থকার-গণের বর্ণনানুযায়ী এই ঘটনাটিও অদ্বৈত-জীবৎকালে সংঘটিত হইয়াছিল। আবার 'অদ্বৈতপ্রকাশ'-মতে অদ্বৈত-তিরোভাবের পরেও সীতাদেবী তাঁহাদের সপ্ততি-বর্ষবয়স্ক গৃহভৃত্য ঈশান-নাগরকেও বিবাহের আজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু ঈশান যখন তাহাতে লজ্জিত হইয়া বলিলেন[৪৪]:

---

(৪২) 'সী. চ.' গ্রন্থের ভূমিকায় সম্পাদক-মহাশয় জানাইয়াছেন যে যশোহরের পদ্মনাভ-চক্রবর্তীর পত্নীর নামও সীতাদেবী হওয়ায় অদ্বৈতপত্নী সাতা তাঁহাকে 'সই' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। সী. ক.-গ্রন্থের লেখক (পৃ. ১-২, ১০৪) সীতাদেবীর প্রতি আনুগত্য স্বীকার করিয়াছেন। গ্রন্থকার বলেন যে তাঁহার জীবন সীতাদেবী কর্তৃক প্রভাবিত হইয়াছিল। (দ্র.—বিষ্ণুদাস-আচার্য বা অদ্বৈতজীবনী)
(৪৩) সী. চ.—পৃ. ১৬-১৯ ; সী. ক.—পৃ. ৮৯-৯৬ (৪৪) ২২ শ. অ., পৃ. ১০৪

সপ্ততি বৎসর প্রায় মোর বয়ঃক্রম।
ইথে কোন দ্বিজ কন্যা করিবে অর্পণ॥

তখন সীতামাতা তাঁহাকে বলিলেন :

পূর্বদেশে যাহ শ্রীজগদানন্দ সনে।
বিয়া করাইবে ইঁহো করিয়া যতনে॥

এই বলিয়া তিনি ঈশান-নাগরকে আশীর্বাদ করিয়া তাঁহার বংশাবলী সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। ইহার পর সীতা সম্বন্ধে আর কিছুই জানা যায় না। একমাত্র 'অভিরাম-লীলামৃত' নামক একটি অতি সন্দেহজনক গ্রন্থের একটি উদ্ভট বর্ণনা মতে অচ্যুতানন্দের মৃত্যুকালেও সীতাদেবী জীবন-ধারণ করিয়াছিলেন। বিবরণের অন্যান্য অংশ অবিশ্বাস্য হইলেও এই অংশটিকে বিশ্বাস অথবা সন্দেহ করা চলে না।

কিন্তু উপরোক্ত ঈশানদ্বয়ের বৃত্তান্ত হইতে উভয়কেই এক ব্যক্তি বলিয়া ধারণা জন্মায়। 'অদ্বৈতমঙ্গলে' বর্ণিত হইয়াছে[৪৫] যে সীতাদেবী জলবাহক যে-ঈশানের পরিচর্যা করিয়া তাঁহার মস্তকের ক্ষত আরোগ্য করিয়াছিলেন সেই ঈশানই তৎকর্তৃক বিবাহাজ্ঞা প্রাপ্ত হইবার পর জানাইয়াছিলেন যে তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, সুতরাং কেই বা তাঁহাকে কন্যাসম্প্রদান করিবেন। ইহা হইতে উভয়ে এক ব্যক্তি কিনা সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করা যায় না। কিন্তু 'অদ্বৈতপ্রকাশে'র মধ্যে গৌরাঙ্গের গৃহ-ভৃত্যের কোনও উল্লেখ না থাকায় সন্দেহ ঘনীভূত হয়। উভয়ে এক ব্যক্তি হইলে 'অদ্বৈতপ্রকাশ'কার ঈশান-নাগর তাঁহার গ্রন্থ-মধ্যে তাঁহার নবদ্বীপ-স্মৃতির বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিতেন। গ্রন্থকর্তা ঈশান-নাগর যে একবার নীলাচলে গিয়া চৈতন্য-সঙ্গ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং চৈতন্য-তিরোধানের পর আর একবার যে নবদ্বীপে গিয়া বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর দুর্দশা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহার কথা উল্লেখ করিয়াছেন।[৪৬] সুতরাং তিনি গৌরাঙ্গের গৃহভৃত্য হইলে তৎসম্পর্কিত সমস্ত বিবরণ বিশদভাবে বর্ণনা করিতেন। তাছাড়া গ্রন্থকার বলিতেছেন যে তিনি অচ্যুতানন্দের সমবয়সী[৪৭] ছিলেন। তদনুযায়ী, তিনি গৌরাঙ্গ অপেক্ষা অন্তত ৬/৭ বৎসরের কনিষ্ঠ হওয়ায় তাঁহার পক্ষে বালক- বা কিশোর-গৌরাঙ্গের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত হওয়া কখনও সম্ভব বিবেচিত হইতে পারে না। সুতরাং ঈশান-নাগরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইলেও ঈশানদ্বয় যে অভিন্ন ব্যক্তি নহেন সে সম্বন্ধে সংশয় থাকিতে পারে না। 'সীতাচরিত্র' ও 'সীতাগুণকদম্বে'র রচয়িতৃগণের বর্ণনায় যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা সম্ভবত ঈশান নামক ব্যক্তিদ্বয়ের ভৃত্যত্ব ও নামসাদৃশ্য-বশত। ইহা হইতে গ্রন্থদ্বয়ের অর্বাচীনত্বই প্রতিপন্ন

---

(৪৫) পৃ. ৫৮ (৪৬) অ. প্র.—১৮ শ. অ., পৃ. ৮১-৮২; ২২ শ. অ., পৃ. ১০২ (৪৭) অ. প্র.—১১ শ. অ., পৃ. ৪৫

হয়। 'অদ্বৈতপ্রকাশে'র 'জগদানন্দ রায়'ও প্রথমোক্ত গ্রন্থ দুইটিতে 'জাহ্নু রায়ে' পরিণত হইয়া থাকিতে পারেন। যাহাহউক, গৌরাঙ্গের গৃহভৃত্য-ঈশান এবং 'অদ্বৈতপ্রকাশে'র বিবরণ অনুযায়ী অদ্বৈতের গৃহভৃত্য-ঈশান-নাগরের জীবনী আলোচনা করিলে উপরোক্ত সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা ধরা পড়িবে। নিম্নে পর পর দুইজনের জীবনী প্রদত্ত হইল।

ঈশান নামে এক ব্যক্তি ছিলেন নবদ্বীপে গৌরাঙ্গের গৃহভৃত্য। ভৃত্য-জীবন ছাড়া তাঁহার জীবনের অন্য কোনও পরিচয় নাই। কিন্তু তিনিই বোধকরি বাংলা সাহিত্যে বর্ণিত প্রথম খাঁটি বাঙ্গালী ভৃত্য—নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততায়, স্নেহ-ভালবাসা ও আত্মবলিদানে আর সকলেরই অনুকরণীয় আদর্শ। 'সীতাচরিত্র' ও 'সীতাগুণকদম্ব' মতে[৪৮] শান্তিপুর-গ্রামবাসী দ্বিজ কুলোদ্ভব ঈশান অদ্বৈতপ্রভুর নিকট আসিলে তিনি পিতৃ-মাতৃ- ও ভ্রাতৃ-বন্ধু-হীন ঈশানকে নবদ্বীপে শচীদেবীর নিকট পাঠাইয়া দেন। এই সংবাদের সমর্থন অন্য কোথাও নাই। তবে ঈশান নামক গৃহ-ভৃত্যটি যে বালক-বিশ্বম্ভরের দেখাশুনার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে প্রাচীন গ্রন্থকার-গণ একমত। কড়চা-লেখক গোবিন্দদাসও পর্যন্ত ঈশানের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।[৪৯] 'চৈতন্যচরিতামৃত' হইতে জানা যায় যে রূপ-গোস্বামীর বার্ধক্যে ঈশান নামক এক ব্যক্তি তাঁহার সহিত বিঠ্ঠলেশ্বর গৃহে গিয়া মাসাবধি গোপাল-দর্শন করিয়াছিলেন।[৫০] সেই ঈশান নিশ্চয়ই ভিন্ন ব্যক্তি। তবে এই গ্রন্থের 'মূলস্কন্ধ-শাখা'-বর্ণনার মধ্যে যে ঈশানের নাম পাওয়া যায় তিনি সম্ভবত শচীভৃত্য-ঈশানই। কিন্তু ঈশানের নবদ্বীপাগমনের কাল সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। 'প্রেমবিলাসে'র চতুর্বিংশবিলাস মতে[৫১] গৌরাঙ্গ-আবির্ভাবের পূর্বেই ঈশান নামক এক অদ্বৈত-শিষ্য অদ্বৈতপ্রভুকে তাঁহার কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করিয়াছিলেন।

ঈশান বোলে বিয়ে করি গৃহস্থ হইলা।
কৈছে জীব উদ্ধার হবে তাহা না করিলা।

এই ঈশান অবশ্য অদ্বৈতের পরবর্তী-ভৃত্য ঈশান-নাগর হইতেই পারেন না। কিন্তু মাত্র এইরূপ একটি অকিঞ্চিৎকর ও অনির্দেশ্য উক্তির উপর নির্ভর করিয়া গৌরাঙ্গ-ভৃত্য ঈশানেরও অতীত জীবনের ঘটনা-সূত্রকে আবিষ্কার করিয়া ফেলা চলে না। 'সীতাচরিত্র' প্রভৃতিতে যে ঈশানের কথা বলা হইয়াছে তাঁহার প্রথম আগমন-কাল সম্ভবত গৌরাঙ্গ-আবির্ভাবের পরেই। সুতরাং তিনিও 'প্রেমবিলাসে'র ঈশান হইতে পারেন না। 'অদ্বৈতমঙ্গল' গ্রন্থে শান্তিপুর প্রসঙ্গে তিনটি ক্ষেত্রে ঈশানের উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে একবার পূর্বোক্ত জলবাহক ঈশানের কথা উল্লেখিত হইয়াছে।[৫২] অন্য দুইটি ক্ষেত্রের

(৪৮) সী. চ.—পৃ. ১৫; সী. ক.—পৃ. ৮৬ (৪৯) পৃ. ১২-১৩ (৫০) ২।১৮, পৃ. ২০১ (৫১) পৃ. ২৩৯ (৫২) পৃ. ৫৭-৫৮; দ্র.—সীতা-জীবনী

উল্লেখ পরবর্তিকালের বর্ণনা প্রসঙ্গে[৫৩] এবং সেইগুলিও যে উক্ত ঈশান সম্বন্ধে নহে তাহা বলা চলে না। কিংবা অন্তত তাহা যে গৌরাঙ্গ-ভৃত্য ঈশান সম্বন্ধীয়, তাহা বলিবার পক্ষে যুক্তি নাই। সুতরাং একমাত্র 'প্রেমবিলাসে'র চতুর্বিংশবিলাসের একটি মাত্র অনির্দেশ্য উল্লেখ হইতে কোনও সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না। অন্তত, সেই উল্লেখের ঈশান যে অদ্বৈত-নির্দেশে শচী বা গৌরাঙ্গের ভৃত্য হইয়াছিলেন, তাহার কোন প্রমাণ 'প্রেমবিলাসে'ও নাই। অপরপক্ষে, প্রামাণিক গ্রন্থগুলিতে গৌরাঙ্গ-ভৃত্য ঈশানের দর্শন মিলিতেছে অনেক পরবর্তিকালে। 'ভক্তিরত্নাকরে'র বর্ণনায়[৫৪] অবশ্য বিশ্বরূপের গৃহত্যাগের পূর্ব হইতেই ঈশানের উপস্থিতির কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু 'ভক্তিরত্নাকর' অনেক পরবর্তিকালের গ্রন্থ। তাহাছাড়া, শ্রীনিবাসাদির নবদ্বীপ-পরিক্রমাকালে পূর্বকথা স্মরণ করিবার ছলে নিছক কাহিনী-বর্ণনা-প্রসঙ্গেই এইরূপ উপস্থিতির কল্পনা করা হইয়াছে। বিশ্বনাথ-চক্রবর্তীর 'গৌরাঙ্গলীলামৃত'-গ্রন্থে যখন ঈশানকে শচী-গৃহে কর্মরত অবস্থায় দেখা যায়[৫৫] তখন গৌরাঙ্গ লীলা আরম্ভ করিয়াছিলেন। 'চৈতন্যভাগবতে'র মধ্যে যখন তাঁহাকে প্রথম গৌরাঙ্গের গৃহাদি 'উপস্কার' করিতে দেখা যায়[৫৬] তখন নিত্যানন্দও নবদ্বীপে আসিয়া গিয়াছেন। আবার 'বাসু-ঘোষের পদাবলী' মধ্যে তাঁহার সাক্ষাৎ মেলে[৫৭] একেবারে গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস-গ্রহণ-কালে। 'চৈতন্যচরিতামৃতে' ঈশানের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় তাহারও পরে।[৫৮] মহাপ্রভু তখন নীলাচলে। এই সমস্ত হইতে ঈশানকে গৌরাঙ্গের একেবারে আশৈশব ভৃত্য বলিয়াও নির্দিষ্ট করা যায় না। কিন্তু যখনই তাঁহার নবদ্বীপাগমন ঘটুক না কেন, তিনি যে শচী-গৌরাঙ্গ-বিষ্ণুপ্রিয়ার একজন অতি অকপট ও বিশ্বস্ত ভৃত্যরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। চৈতন্যের অনুপস্থিতি-কালে তিনি শচী-বিষ্ণুপ্রিয়ার সকল কর্মভার মস্তকে লইয়া তাঁহাদের সেবা করিতেছিলেন। চৈতন্যের তিরোধানের পরেও তিনি সেই কর্তব্যভারকে হাসিমুখে বহন করিয়া গিয়াছেন।

'প্রেমবিলাসে'র চতুর্থ ও পঞ্চম বিলাস হইতে জানা যায় যে শ্রীনিবাস-আচার্য প্রথমবার নবদ্বীপে পৌঁছাইলে ঈশানই তাঁহার দুর্দশা দেখিয়া ব্যথিত হন এবং বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকট বালক-শ্রীনিবাসের কথা বলিয়া তাঁহাকে তৎপ্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন করেন। পরে শ্রীনিবাসের নবদ্বীপ-ত্যাগকালে বিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীনিবাসের সহিত ঈশানকে পাঠাইয়া দিলে ঈশান তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া গিয়া খড়দহে জাহ্নবাদেবী এবং খানাকুলে (?) অভিরামের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটাইয়াছিলেন। তারপর তাঁহারা শ্রীনিবাসকে আশীর্বাদ করিলে ঈশান তাঁহাকে বৃন্দাবন-গমনের আজ্ঞা প্রদান করেন। এই ঘটনার পর কয়েক বৎসর যাবৎ ঈশানের

(৫৩) পৃ. ৩৮, ৬৩ (৫৪) ১২।১১২৪, ১২৩৬, ১৩৫৯, ১৮৩০, ১৮৩৪, ২৪৬৪ (৫৫) পৃ.১৮-২০, ৪৪ (৫৬) ২।৮, পৃ. ১৩৮ (৫৭) পৃ. ১৮ (৫৮) ২।১৫, পৃ. ১৭৯

সম্বন্ধে আর কোনও সংবাদ পাওয়া যায় না। 'ভক্তিরত্নাকরে'র বর্ণনানুযায়ী এই ঘটনার অনেক দিন পরে নরোত্তম তাঁহার নীলাচল-গমনের পূর্বে নবদ্বীপে গিয়া ঈশানের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।[৫৯] তখন বিষ্ণুপ্রিয়ার তিরোধান ঘটিয়াছে। গ্রন্থকার বলেন[৬০] যে তাহারও কয়েক বৎসর পরে খেতুরি-উৎসবান্তে জাহ্নবাদেবী বৃন্দাবনে গিয়া সেইস্থান হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে নবদ্বীপে ঈশানের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটে, নবদ্বীপের বিখ্যাত ভক্তবৃন্দ সকলেই তখন দেহরক্ষা করিয়াছেন। তাহারও পরে শ্রীনিবাস-আচার্য যখন নরোত্তম এবং রামচন্দ্র-কবিরাজকে সঙ্গে লইয়া নবদ্বীপ-পরিক্রমায় পৌছান, তখনও ঈশান নবদ্বীপে অবস্থান করিতেছিলেন।[৬১] তখন তিনি অতিবৃদ্ধ, কোনও রকম বাঁচিয়াছিলেন মাত্র। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি শ্রীনিবাসাদিকে লইয়া নবদ্বীপের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করাইয়া আনিলেন এবং তাঁহাদিগকে সেই সকল স্থানের মাহাত্ম্য ও ইতিবৃত্ত বলিয়া শুনাইলেন। পরিক্রমা-শেষে ঈশানকে প্রণাম জ্ঞাপন করিয়া শ্রীনিবাসাদি চলিয়া গেলে নিঃসঙ্গ ঈশান ব্যথিত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু গৌরাঙ্গের বাল্যলীলার সহিত জড়িত হইয়া যিনি তাঁহার নবদ্বীপ-ত্যাগ ও এমনকি তাঁহার ইহধাম-ত্যাগের পরেও সুখে-দুঃখে সম্পদে-বিপদে তাঁহারই কর্তব্যের দুরূহতম কর্মভারকে অম্লানবদনে মস্তকে বহন করিয়া চলিতেছিলেন, তাঁহার পক্ষে নবদ্বীপ ছাড়া এ বিশ্ব-সংসারে আর কোনও আশ্রয়স্থল বিদ্যমান থাকিতে পারে না। শচী-বিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গের বাস্তু-ভিটার মায়া শ্বাস-প্রশ্বাসের মায়ার মতই তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। গৌরাঙ্গস্মৃতিবাহী কোনও সত্তার প্রজ্বলিত দীপশিখায় স্বীয় অঙ্গনতলকে দীর্ঘদীপ্ত করিয়া রাখিবার জন্য যেন সেই হৃতশ্রী শূন্য গৃহখানিও তাঁহাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিল। 'ভক্তিরত্নাকর'-মতে শ্রীনিবাসাদি চলিয়া যাইবার অত্যল্পকাল মধ্যেই ঈশানকে ধরাধাম পরিত্যাগ করিতে হয়।[৬২]

উপরোক্ত আলোচনা হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে গৌরাঙ্গ-ভৃত্য ঈশানের পক্ষে নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া শান্তিপুরে গমন ও পরে পূর্বদেশে গিয়া দার-পরিগ্রহ করা কোন মতেই সম্ভব ছিল না। সুতরাং পরিবর্তিকালের 'সীতাচরিত্র' বা 'সীতাগুণকদম্বে'র গ্রন্থকার-গণ যে সম্ভবত 'প্রেমবিলাসে'র চতুর্বিংশবিলাস বা 'অদ্বৈতপ্রকাশ' বা ঐরূপ কোনও গ্রন্থের দ্বারা বিভ্রান্ত হইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। শান্তিপুর-সম্পর্কিত উক্ত ঘটনারাজির মধ্যে যদি কিছু সত্য থাকে, তাহা হইলে তাহা যে অদ্বৈত-ভৃত্য তথাকথিত ঈশান-নাগর সম্বন্ধীয়, তাহাই ধরিতে হয়। 'অদ্বৈতপ্রকাশ'-কার গ্রন্থ মধ্যে যে ঈশান-নাগরের পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা নিম্নোক্তরূপ :—

অদ্বৈত-পুত্র অচ্যুতের 'পাঁচ বৎসর' বয়সে যেইদিন তাঁহার 'হাতে খড়ি' ও 'বিদ্যারম্ভ'

(৫৯) ৮।১০৩-৫ (৬০) ১১।৭২১, ৭৫২ (৬১) ঐ—১২।৯০, ১১২, ১৩৪, ৪০৩১ ; ১৩।৮ (৬২) ১৩।২১

হয়, সেই দিন 'পঞ্চ বৎসর'-বয়স্ক ঈশান-নাগর মাতার সহিত শান্তিপুরে পৌছান।[৬৩] গ্রন্থমতে অচ্যুতানন্দ ১৪১৪ শকে জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং উহা ঈশানেরও জন্মশক। যাহাহউক, তাঁহারা শান্তিপুরে পৌছাইলে অদ্বৈতপ্রভু ঈশানের মাতাকে কৃষ্ণ-দীক্ষা দান করিয়া ঈশানকেও হরিনাম প্রদান করেন এবং ঈশানের মাতা 'শ্রীগুরুর আজ্ঞাবহা' হইয়া আচার্য-গৃহে বাস করিতে থাকেন। ঈশানও সীতাকর্তৃক পুত্রস্নেহে প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন।

তখন হইতে ঈশান সম্ভবত অদ্বৈত-আচার্যের গৃহ-ভৃত্যরূপেই বাস করিতে থাকেন। ফলে, চৈতন্য- অদ্বৈত-লীলার বহু-ঘটনা প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ ঘটিয়া গেল। সন্ন্যাস-গ্রহণের পর চৈতন্য শান্তিপুরে পৌছাইলে ঈশান তাঁহার জন্য অন্নব্যঞ্জন-রন্ধনরত ব্যস্ত-সীতামাতার 'জলের টহল'দারী করিতে পারিয়াছিলেন এবং চৈতন্যের প্রসাদ-ভক্ষণের সৌভাগ্যও তাঁহার হইয়াছিল। পরে যখন মহাপ্রভু বৃন্দাবন-গমনোদ্দেশ্যে নীলাচল হইতে আসিয়া শান্তিপুরে উপনীত হন, তখনও

সুদর্শন গঙ্গামৃতে মুক্তি স্নান কৈলোঁ।
কোটি ভাগ্যোদয় সেবা-কার্যে ব্রতী হৈলোঁ।

আর একবার সীতাসহ অদ্বৈতপ্রভু নীলাচলে গমন করিলে চৈতন্য-দর্শন-লাভাকাঙ্ক্ষী ঈশানও 'ভৃত্যকার্যে' রত হইয়া নীলাচলে পৌছান।[৬৪] সেই স্থানে সীতাদ্বৈতের ঐকান্তিক ইচ্ছা পূরণার্থে একদিন চৈতন্য তাঁহাদের বাসাবাড়ীতে পৌছাইলে ঈশান সত্বর তাঁহার পাদ-প্রক্ষালন করিতে ছুটিয়া যান। কিন্তু তিনি ব্রাহ্মণ-তনয় বলিয়া মহাপ্রভু তাঁহাকে তদ্বিষয়ে বিরত করিলে ব্যথায় ও অভিমানে ঈশানের হৃদয় দীর্ণ হয়। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে তৎক্ষণাৎ তাঁহার সেই 'সেবা-বাদী যজ্ঞসূত্র'টিকে ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। অদ্বৈতপ্রভু পুনরায় তাঁহাকে যজ্ঞসূত্র পরিধান করাইলে ঈশান জানাইলেন যে 'গৌরসেবা-বাদী উপবীতে' তাঁহার প্রয়োজন নাই। মহাপ্রভু তখন ঈশানকে অনুমতি প্রদান করিলে ঈশান 'শ্রীপাদ সেবন' করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন। তারপর তিনি মহাপ্রভুর নিকট কিছু উপদেশ শ্রবণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে মহাপ্রভু তাঁহাকে নানাবিধ উপদেশ দিলেন।

নীলাচল হইতে প্রত্যাবর্তনের পরেও ঈশান শান্তিপুরে অদ্বৈত-গৃহে বাস করিতেছিলেন। নীলাচলাগত ভক্তবৃন্দ শান্তিপুরে পৌছাইলে তাঁহাদের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটিল। জগদানন্দ যখন অদ্বৈত-প্রেরিত তর্জা লইয়া নীলাচলাভিমুখে যাত্রা করেন, তখনও তিনি সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন। তারপর শান্তিপুরে বসিয়াই তাঁহাকে মহাপ্রভুর তিরোধান-বার্তা শ্রবণ করিতে হইয়াছিল। পরে নিত্যানন্দ-তিরোধানকালে অদ্বৈতপ্রভু যখন খড়দহে গমন করেন, তখনও ঈশান তাঁহার সহিত খড়দহে গিয়া নিত্যানন্দ-তিরোধান এবং

(৬৩) অ. প্র. —১১ শ. অ., পৃ. ৪৫-৪৬ (৬৪) ঐ—১৮. অ.

তদুপলক্ষে বীরচন্দ্র কর্তৃক অনুষ্ঠিত মহামহোৎসব প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। খড়দহ হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার কিছুকাল পরে একদিন তিনি অদ্বৈতপ্রভুর নিকট আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া[৬৫] নবদ্বীপে গিয়া বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর কঠোর বৈরাগ্য ও কৃচ্ছ্রসাধন প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।[৬৬]

যাঞা দেখি কাণ্ডা-পটে মায়ের অঙ্গ ঢাকা।
কোটিভাগ্যে শ্রীচরণ মাত্র পাইনু দেখা॥

ইহার পরেও বেশ কিছুকাল যাবৎ ঈশান শান্তিপুরে বাস করিয়াছিলেন। 'সীতাচরিত্র' ও 'সীতাগুণকদম্বে'র মধ্যে ঈশানের যে জলবহন-জনিত শিরঃক্ষত ও সীতা কর্তৃক তাঁহার সেবার কথা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা যে এই ঈশান-সম্বন্ধীয় তাহাতে সন্দেহ থাকে না। কারণ 'অদ্বৈতপ্রকাশে' এই জল-বহনের কথা সগর্বে উল্লেখিত হইয়াছে। কিন্তু ঐ ঘটনাটি যে ঠিক কোন্ সময়কার, উপরোক্ত গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে তাহা লিপিবদ্ধ হয় নাই। উল্লেখাদি হইতে মনে হয় তাহা অদ্বৈত-তিরোভাবের পূর্ববর্তী ঘটনা।

তিরোধানের পূর্বে অদ্বৈতপ্রভু আর একদিন ঈশানকে বলিলেন[৬৭], "গৌর নাম প্রচারিহ মোর জন্মস্থানে॥" তাহারপর অদ্বৈতের তিরোভাব ঘটিলে একদিন সীতা-ঠাকুরাণী তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "মোর তুষ্টি হয় তুই করিলে বিবাহ॥" তখন ঈশানের বয়স 'সপ্ততি বৎসর।' বার্ধক্যের জন্য তাঁহাকে কেহই কন্যা-সম্প্রদান করিবেন না জানাইলে সীতাদেবী বলিলেন ঃ

পূর্বদেশে যাহ শ্রীজগদানন্দ সনে।
বিয়া করাইবে ইঁহো করিয়া যতনে॥
তাঁহা গৌর গৌর-ধর্ম করিয়া প্রচার।
তাহে বহু জীবগণ হইবে নিস্তার॥
তোহার সন্ততি হৈব মহাভাগবত।

ঈশান জগদানন্দ-রায়ের সহিত সত্বর পূর্বদেশে[৬৮] গিয়া দারপরিগ্রহ করিলেন এবং তাহারপর লাউড়-গ্রামে গিয়া সেইস্থানে থাকিয়াই 'অদ্বৈতপ্রকাশ'-গ্রন্থ রচনার কার্যে নিযুক্ত হইলেন। গ্রন্থকার বলেন যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিষয় ছাড়াও তিনি নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গের নিকট তাঁহার গ্রন্থের উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন ঃ—

অদ্বৈত[৬৯], সীতা[৭০], গ্রন্থকার-মাতা[৭১], নিত্যানন্দ[৭২], অচ্যুতানন্দ এবং অন্যান্য সাধুবৃন্দ[৭৩]। বিবরণ অনুযায়ী ১৪৯০ শকাব্দায় গ্রন্থ-সমাপ্তি ঘটে।

---

(৬৫) ঐ—২২শ. অ., পৃ. ১০১-২ (৬৬) দ্র.—গৌরাঙ্গ-পরিজন (৬৭) অ. প্র.—২২শ. অ., পৃ. ১০৪

(৬৮) বৈ. দি.(পৃ. ৯২)-মতে পদ্মাতীরস্থ তেওতা-গ্রামে। গ্রন্থকার ঈশানের তিন পুত্রের নামোল্লেখ করিয়াছেন—পুরুষোত্তম-, হরিবল্লভ- ও কৃষ্ণবল্লভ-নাগর। (৬৯) ৫ম.অ., পৃ., ২০ (৭০) ৮ম. অ.,পৃ. ৩৩ (৭১) ১১শ. অ., পৃ. ৪৬ (৭)১৫শ. অ., পৃ. ৬৬ (৭৩) ২০শ. অ., পৃ. ৯১

বিষ্ণুদাস-আচার্য

'চৈতন্যচরিতামৃতে'র অদ্বৈত-শাখা মধ্যে বিষ্ণুদাসাচার্যের নাম দৃষ্ট হয়। 'অদ্বৈতপ্রকাশ'-মতে[১] গৌরাঙ্গ কিংবা তাঁহার জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা বিশ্বরূপের আবির্ভাবের পূর্বে

> শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর দেখি অলৌকিক কার্য।
> তার স্থানে মন্ত্র লৈলা বিষ্ণুদাসাচার্য॥
> শ্রীমদ্ভাগবত তিঁহো পড়ে প্রভুর স্থানে।
> অনেক বৈষ্ণব আইলা সে পাঠ শ্রবণে॥

গ্রন্থকার আরও বলেন[২] যে অদ্বৈত-তিরোভাবকালে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন:

> শ্যামদাস বিষ্ণুদাস শ্রীযদুনন্দন।
> আর যত অদ্বৈতের প্রিয় শিষ্যগণ॥

'ভক্তিরত্নাকরে' লিখিত হইয়াছে[৩] যে খেতুরির মহামহোৎসবে যোগদান করিবার জন্য অচ্যুতানন্দের সহিত যে সমস্ত অদ্বৈত-শিষ্য গমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যেও বিষ্ণুদাসাচার্য উপস্থিত ছিলেন।

উপরোক্ত বিবরণগুলি হইতে বিষ্ণুদাসাচার্য সম্বন্ধে একটি মোটামুটি ধারণা জন্মায়। কিন্তু 'সীতাগুণকদম্ব' নামক গ্রন্থটির লেখক গ্রন্থমধ্যে 'অচ্যুতানন্দের পাদপদ্ম আশা' করিয়া এবং সীতার প্রতি ঐকান্তিক আনুগত্য ও তাঁহার দাসত্ব স্বীকার করিয়া আপনাকেই বিষ্ণুদাস-আচার্য বলিয়া ঘোষণা করায় তিনিই উপরোক্ত বিষ্ণুদাসাচার্য কিনা প্রশ্ন উঠিতে পারে। প্রথমত, এই গ্রন্থ এবং লোকনাথদাস-বিরচিত 'সীতাচরিত্র'-নামক গ্রন্থ দুইটি একই গ্রন্থের দুইটি পৃথক সংস্করণ বলিয়া ধারণা জন্মে। দ্বিতীয়ত, গ্রন্থমধ্যে যে ভাবে এতগুলি অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ করা হইয়াছে, তাহাতে তাহা কোন প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা বলিয়া মনে হয়না।[৪] তৃতীয়ত, গৌরাঙ্গের গৃহ-ভৃত্য ঈশানের জীবনের সহিত অদ্বৈত-ভৃত্য ঈশান-নাগরের জীবনের এমন একটি সংমিশ্রণ ঘটান হইয়াছে, যাহা কেবল জনশ্রুতি বা পরবর্তিকালের বর্ণিত বিবরণকে অবলম্বন করিয়া কল্পনা করা সম্ভব। চতুর্থত, গ্রন্থকার যে অদ্বৈত-শিষ্য মুরারি-পণ্ডিতের সহিত নিত্যানন্দ-শিষ্য মুরারি-চৈতন্যদাসকে এক করিয়া ফেলিয়াছেন, এইরূপ মনে করিবার পক্ষেও যথেষ্ট যুক্তি আছে।[৬] প্রত্যক্ষদর্শী লেখকের পক্ষে এইরূপ ভ্রম সম্ভবপর নহে। পঞ্চমত, গ্রন্থকার জানাইতেছেন[৭] যে নন্দিনী

---

(১) ১০ম. অ., পৃ. ৪০ (২) ২২শ. অ., পৃ. ১০৩. (৩) ১০।৪০৩ (৪) দ্র.—সীতা-জীবনী (৫) দ্র.—ঐ (৬) দ্র.—মুরারি-চৈতন্যদাস (৭) সী. ক.—পৃ. ৭১, ৮৫

ও জনলীকে 'রাধাকৃষ্ণ সিদ্ধিমন্ত্র' দান করিয়া যথাবিধি দীক্ষাদান করিবার পর সীতাদেবী তাঁহাদিগের মধ্যে সেই দীক্ষার প্রভাব প্রত্যক্ষ করিয়া

তবে নিজ সেবা দিআ দুহারে রাখিলা।
পুনরপি মো পাপিরে করুণা করিলা॥
রাধাকৃষ্ণ সিদ্ধিমন্ত্র দিয়া দুহার কাণে।
সিতল করিলা ছাআ দিআ শ্রীচরণে॥
কে কহিতে পারে তার কৃপার মাধুরি।
আমাকে ছঁপিলা কেন কণক অঙ্গুরি॥
এ প্রসঙ্গ জত্তপি কহিতে না জুআঅ।
কি করিব তার কৃপা আনন্দে উঠাএ॥

এই উক্তি হইতে মনে হয় যে সীতাদেবী গ্রন্থ-লেখককেও 'রাধাকৃষ্ণ সিদ্ধিমন্ত্র' প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু 'অদ্বৈতপ্রকাশ' অনুযায়ী স্বয়ং অদ্বৈতই বিষ্ণুদাসাচার্যকে মন্ত্রদীক্ষা দিয়া ভাগবত-শিক্ষা দিয়াছিলেন। সুতরাং অদ্বৈতের নিকট দীক্ষা-গ্রহণের পর তাঁহারই পত্নীকর্তৃক পুনর্দীক্ষিত হইবার সংগত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আরও একটি বিষয় লক্ষণীয় যে গ্রন্থকার আপনাকেই অদ্বৈত-বিবাহের ঘটক বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন।[৮] অথচ 'অদ্বৈতপ্রকাশে' এই প্রসঙ্গে বিষ্ণুদাসাচার্যের কোন উল্লেখ নাই, এই গ্রন্থে[৯] অদ্বৈত-শিষ্য শ্যামদাসাচার্যকেই বিবাহের 'মধ্যস্থ ঘটক' বলা হইয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে 'সীতাগুণকদম্ব'-মধ্যে অদ্বৈত-পত্নী শ্রীদেবীর উল্লেখ পর্যন্ত নাই। আবার গ্রন্থকার সীতাদেবীর পালক-পিতা হিসাবে নৃসিংহ-ভাদুড়ীর পরিবর্তে শান্তিপুর-বাসী গোবিন্দ নামধারী এক দ্বিজকে খাড়া করিয়াছেন। গ্রন্থ-বর্ণিত গোবিন্দ-সীতা কাহিনীটিও পরম আশ্চর্যের বিষয়। এই সমস্ত কারণে এই গ্রন্থের লেখককে অদ্বৈতের পূর্বোল্লেখিত শিষ্য বিষ্ণুদাসাচার্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায় না।

১৩০৪ সালের 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'য় অচ্যুত চরণ চৌধুরী মহাশয় জানাইয়াছেন যে 'সীতাচরিত্র'-গ্রন্থের রচয়িতা লোকনাথদাস অদ্বৈতপ্রভুর 'মন্ত্রশিষ্য' ও পদ্মনাভ-চক্রবর্তীর পুত্র। কিন্তু লোকনাথদাসের নামে আরোপিত এই 'সীতাচরিত্র' সম্বন্ধেও উপরোক্ত কারণগুলির শেষোক্তটি ছাড়া অন্যান্য সকলগুলিই প্রযুক্ত হইতে পারে। অধিকন্তু এ সম্বন্ধে আরও বলা যাইতে পারে যে 'সীতাচরিত্র'-গ্রন্থে[১০] গ্রন্থকার লোকনাথদাস তিনবার 'ব্যাস-অবতার' বৃন্দাবনদাস এবং একবার 'চৈতন্যভাগবত' ও একবার 'কবিরাজঠাকুরে'র 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র (মহাপ্রভুর শেষ-জীবনের লীলা-সম্বলিত) উল্লেখ করায় গ্রন্থখানিকে

(৮) ঐ—পৃ. ১৬ (৯) ৮ম. অ., পৃ. ৩০ (১০) পৃ. ৪, ৮, ১১, ১৬

'চৈতন্যচরিতামৃত'-রচনার পরবর্তী বলিয়া ধরিতে হয়। কিন্তু মহাপ্রভুর প্রায় সমবয়স্ক অদ্বৈত-শিষ্য লোকনাথ-চক্রবর্তীর পক্ষে ততদিন বাঁচিয়া থাকিয়া গ্রন্থরচনা করা সম্ভবপর নহে। এমনকি গ্রন্থকার একস্থলে লিখিয়াছেন[১১] :

কহে লোকনাথ দাস শ্রীচৈতন্য পদে আশ
কৃপা করি দেহ ব্রজে বাস ॥

কিন্তু লোকনাথ-চক্রবর্তী তাঁহার শেষ-জীবন ব্রজেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন।[১২] তাঁহার পক্ষে বৃন্দাবন-ত্যাগ করা সম্ভব ছিল না, তাহার কোন প্রমাণও নাই। আবার 'সীতাচরিত্র'-গ্রন্থের শেষ-পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে, "ত্রয়োদশাধ্যায় গ্রন্থ হৈল সমাধিত।" কিন্তু গ্রন্থটি প্রকৃতপক্ষে অধ্যায় বা পরিচ্ছেদ-বিভাগে বিভক্ত নহে। আশ্চর্যের বিষয়, 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র অদ্বৈত-শাখা মধ্যে লোকনাথ-চক্রবর্তীর নাম পাওয়া যায়না। অপরপক্ষে, তন্মধ্যে একজন 'লোকনাথ-পণ্ডিত'কে পাওয়া যায়। নরহরি-চক্রবর্তী বলেন[১৩] যে তিনি গদাধরদাসপ্রভুর তিরোধান-তিথি-মহামহোৎসবে এবং খেতুরির মহামহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। সম্ভবত 'সীতাচরিত্রে'র লেখক অদ্বৈতশিষ্য-তালিকা হইতে নাম সংগ্রহকালে তাঁহাকেই লোকনাথ-চক্রবর্তী ধরিয়া লইয়াছেন।

কিন্তু যাহাই হউক না কেন, 'সীতাগুণকদম্ব'-গ্রন্থোক্ত বিষ্ণুদাস বলেন[১৪] যে তাঁহার পিতার নাম ছিল মাধবেন্দ্র-আচার্য। তিনি ফুলিয়া সন্নিকটস্থ বিষ্ণুপুর নামক গ্রামে বাস করিতেন। অদ্বৈতপ্রভু প্রথমে নবদ্বীপে আসিয়া মাধবেন্দ্র-গৃহে আতিথ্য-গ্রহণ করার ফলেই সম্ভবত বিষ্ণুদাস তাঁহার সান্নিধ্য প্রাপ্ত হন। পরবর্তিকালে অদ্বৈত-তিরোভাবের পর সীতাদেবীর আজ্ঞায় বিষ্ণুদাস আচার্য কুলিন-গ্রামে বসতি স্থাপন করিয়া রামানন্দ-বসুর সহিত একত্রে বাস করিতে থাকেন। তৎপূর্বে তিনি 'মল্লিক রণছোড়', যদু-চক্রবর্তী, গোকুল ও নন্দ-ঘোষ নামক চারি ব্যক্তিকে দীক্ষাদান করিয়া নীলাচল ও বৃন্দাবন দর্শন করিয়াছিলেন।

---

(১১) পৃ. ১৭ (১২) দ্র.—লোকনাথ-চক্রবর্তী (১৩) ভ. র.—৯।৪০৪ ; ন. বি—৮ম. বি., পৃ. ১০৭
(১৪) পৃ.১০, ১০৪-৫

জাহ্নবাদেবী

জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' এবং ঈশান-নাগরের 'অদ্বৈতপ্রকাশ' ছাড়া 'প্রেমবিলাসে'র পূর্বে রচিত কোন গ্রন্থে বসুধা বা জাহ্নবাদেবীর নাম দৃষ্ট হয় না। সুতরাং সীতা-জীবনী আলোচনার আরম্ভে যাহা উক্ত হইয়াছে, জাহ্নবার জীবনী আলোচনাতেও তাহাই প্রযোজ্য। জয়ানন্দ গ্রন্থারম্ভে জানাইয়াছেন[১] যে সূর্যদাস-নন্দিনী 'বসুজাহ্নবী' নিত্যানন্দ-পত্নী ছিলেন। গ্রন্থের অন্য একস্থলেও তিনি লিখিয়াছেন[২] :

> কথোদিনে নিত্যানন্দের শিখা সূত্র ধরি।......
> সূর্য্যদাস নন্দিনী শ্রীবসু জাহ্নবী।
> পাণিগ্রহণ করিলেন স্বচ্ছন্দ কৌতুকী॥
> বসুগর্ভে প্রকাশ গোসাঞি বীরভদ্র।
> জাহ্নবী নন্দন রামভদ্র মহামদ॥

জাহ্নবা-নন্দন রামভদ্রের কথা অন্য কোনও গ্রন্থকর্তৃক সমর্থিত হয় না। তবে জয়ানন্দ-প্রদত্ত অন্য-বিবরণ অসত্য না হইতে পারে। 'অদ্বৈতপ্রকাশ,' 'প্রেমবিলাসে'র চতুর্বিংশ-বিলাস, 'নিত্যানন্দবংশবিস্তার' এবং 'ভক্তিরত্নাকরে' বসুধা ও জাহ্নবার বিবাহের কথা বিস্তৃতভাবে বিবৃত হইয়াছে। তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে গৌড়ে পাঠাইবার কিছুকাল পরে শালিগ্রাম-নিবাসী সূর্যদাসের জ্যেষ্ঠ কন্যা বসুধার সহিত নিত্যানন্দের শুভ পরিণয় ঘটে এবং বিবাহের পর তিনি সূর্যদাসের কনিষ্ঠা-কন্যা জাহ্নবাদেবীকে যৌতুক হিসাবে গ্রহণ করিতে চাহিলে সূর্যদাস তাঁহাকেও নিত্যানন্দের হস্তে সমর্পণ করেন।[৩]

বিবাহান্তে নিত্যানন্দ পত্নীদ্বয়কে লইয়া বড়গাছিতে উপস্থিত হন।[৪] বসুধা-জাহ্নবা সেইস্থলে শ্রীবাস-পত্নী মালিনী প্রভৃতির নিকট আশীর্বাদ গ্রহণ করেন। ইহার পর নিত্যানন্দ তাঁহাদিগকে নবদ্বীপে আনয়ন করেন এবং সেইস্থানে শচীদেবীর আশীর্বাদ গ্রহণ-পূর্বক খড়দহে আসেন।

ইহার পর দীর্ঘকাল যাবৎ বসুধা-জাহ্নবার আর কোনও সংবাদ পাওয়া যায় না।

(১) পৃ. ৩ (২) উ. খ., পৃ. ১৫১ (৩) এই বিবাহ-প্রসঙ্গ নিত্যানন্দ-জীবনীর মধ্যে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। বসুধা-জাহ্নবার বংশ পরিচয় সম্বন্ধে অন্যান্য তথ্যও সেইস্থলে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।
(৪) ভ. র.—১২।৩৯৮৮

নিত্যানন্দের জীবৎকালে তাঁহাদের সম্বন্ধে কেবলমাত্র এইটুকু জানা যায় যে বসুধা-দেবীর গর্ভে কয়েকটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং শেষে বীরভদ্র ও গঙ্গাদেবী জন্মগ্রহণ করিয়া সুস্থ জীবন প্রাপ্ত হন।[৫] দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে (পৃ. ৩৩৭) লিখিয়াছেন, "জাহ্নবীদেবী দ্বারা নিত্যানন্দের গঙ্গা নামে কন্যা ও বীরভদ্র নামক পুত্র লাভ হয়।" কিন্তু এই তথ্য কোথা হইতে সংগৃহীত হইল জানা যায় না। 'নিত্যানন্দবংশবিস্তার' হইতে আর একটি সংবাদ পাওয়া যায় যে নিত্যানন্দ তাঁহার তিরোধানের অব্যবহিত পূর্বে পত্নীদ্বয়কে লইয়া একচাকায় যান এবং তথায় 'বঙ্কিমদেবেরে গিয়া করেন দরশন'।[৬] সম্ভবত এই ঘটনারও বহুকাল পরে বীরভদ্র অদ্বৈতপ্রভুর নিকট দীক্ষাগ্রহণের নিমিত্ত শান্তিপুর যাত্রা করিলে জাহ্নবার হস্তক্ষেপের ফলে তাঁহাকে কিছুদূর গিয়াও ফিরিয়া আসিতে হয় এবং তিনি শেষে জাহ্নবার নিকটই দীক্ষা গ্রহণ করেন। 'অদ্বৈতপ্রকাশ' 'প্রেমবিলাসে'র চতুর্বিংশবিলাস এবং 'নিত্যানন্দপ্রভুর বংশবিস্তার' বা 'নিত্যানন্দপ্রভুর বংশমালা' হইতে এই সংবাদটি পাওয়া যায়। গ্রন্থকারত্রয়ের বর্ণনা মোটামুটি একই প্রকার[৭]।

কিন্তু পরবর্তিকালের ঘটনা-বর্ণনায়, অন্যান্য গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে বীরভদ্র চিরকালই জাহ্নবার একান্ত অনুগত ছিলেন এবং তাঁহাকেই মাতৃ-মর্যাদা দান করিয়াছেন। এমনকি গ্রন্থগুলি পাঠ করিলে জাহ্নবাদেবীকেই যেন তাঁহার গর্ভধারিণী মাতা বলিয়াই ধারণা জন্মে কিন্তু উপরোক্ত ঘটনা হইতে প্রতীয়মান হয় যে দীক্ষাগ্রহণকালে বীরভদ্র জাহ্নবাদেবীকে যথার্থ মর্যাদা দান করেন নাই এবং 'বংশীশিক্ষা' ও 'মুরলীবিলাস' গ্রন্থ মতে[৮] স্বীয় সন্তান না থাকার জন্য 'জন্মবন্ধ্যা' জাহ্নবা নবদ্বীপস্থ বংশীবদনের জ্যেষ্ঠ-পৌত্র রামচন্দ্রকে দত্তক-পুত্ররূপে গ্রহণ করেন[৯]। রামচন্দ্রকে পুত্ররূপে লাভ করিবার জন্য তাঁহাকে যে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল, কেবল তাহাই নহে, তজ্জন্য তাঁহাকে রামচন্দ্রের পিতামাতার নিকট বার বার যাওয়া আসা করিয়া ঐকান্তিক অনুরোধ জ্ঞাপন ও প্রভাব বিস্তার করিতে হইয়াছিল। পরে তিনি রামচন্দ্র ও তাঁহার ভ্রাতা শচীনন্দনকেও দীক্ষা দান করিয়াছিলেন এবং বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর জীবৎকালেই রামচন্দ্রকে খড়দহে লইয়া যান।

---

(৫) দ্র.-বীরভদ্র ; অ. গো. ব.—পৃ. ৪ ; বৈ. দি.-কার (পৃ. ৮২) সংবাদ দিতেছেন যে 'জাহ্নবা-দেবী বন্ধ্যা ছিলেন' ; তু.—নি. বি.,—পৃ. ১৪ ; বৈ.দ.—পৃ. ১৬ (৬) পৃ. ১৮ (৭) অ. প্র.—২২শ. অ., পৃ. ১০২ ; প্রে. বি.—২৪শ. বি, পৃ. ৩৫২-৫৩ ; নি. বি.—পৃ. ১৯-২০ ; নি. ব.—পৃ. ২৭ (৮) ব. শি.—পৃ. ১৯৭-২১৫ ; মু. বি.—পৃ. ৪৯-৮৪ (৯) বৈ.দি.-কার সংবাদ দিতেছেন যে পুরুষোত্তমদাস-ঠাকুরের স্ত্রীর সহিত নামসাদৃশ্য থাকায় জাহ্নবা তাঁহাকে 'সই' বলিয়া ডাকিতেন। দ্বাদশ-দিবসের এক শিশুপুত্রকে রাখিয়া পুরুষোত্তম-ঘরণী দেহত্যাগ করিলে জাহ্নবা-ঠাকুরাণী ঐ শিশুটিকেও পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। পরে জীব-গোস্বামী ইহার নাম রাখেন কানাই- বা কানু-ঠাকুর।

রামচন্দ্রকে তিনি আমরণ সঙ্গেই রাখিয়াছিলেন এবং শচীনন্দনের প্রতিও তিনি বরাবর যথেষ্ট স্নেহ প্রদর্শন করিতেন। তাঁহার আজ্ঞাক্রমেই শচীনন্দনের বিবাহাদি ঘটে।

বীরভদ্রের দীক্ষাগ্রহণ এবং জাহ্নবার দত্তক-গ্রহণের উপরোক্ত বিবরণ সত্য হইলে উভয়ের মধ্যে মনান্তর বা মতান্তরের আভাসই সূচিত হয়। কিন্তু সে সম্বন্ধে কোনও সুস্পষ্ট বিবরণ কোথাও লিপিবদ্ধ হয় নাই। পরবর্তিকালে জাহ্নবাদেবী স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছিলেন। 'ভক্তিরত্নাকর'-প্রণেতা তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন,[১০] 'প্রেমভক্তি-রত্নপ্রদানে প্রবীণা যেহ।' বাস্তবিকপক্ষে, বৈষ্ণব-সমাজ তাঁহাকে বিপুল সম্মান ও মর্যাদা দান করিয়াছিল।

জাহ্নবাদেবীর প্রথমবার বৃন্দাবন-গমন যে ঠিক কোন্ সময়ে হইয়াছিল তাহা জানা যায় না। সম্ভবত নিত্যানন্দ-তিরোধানের পরবর্তী কোনও এক সময়ে। সনাতন- ও রূপ-গোস্বামী তখনও জীবিত ছিলেন। 'প্রেমবিলাস' হইতে জানা যায়[১১] যে তৎকালে স্বয়ং গ্রন্থকারও জাহ্নবাদেবীর অনুগামী হইয়াছিলেন। জাহ্নবা বৃন্দাবনে পৌঁছাইলে রূপ-গোস্বামী তাঁহাকে গোপাল-ভট্টাদি অন্যান্য গোস্বামী-বৃন্দের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন এবং তাঁহাদের মধ্যে নানাবিধ শাস্ত্রালোচনা চলে। তারপর তিনি গোবিন্দাদি বিগ্রহ দর্শন করেন এবং রাধাকুণ্ডাদি বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করিয়া আসেন। শেষে তাঁহার প্রত্যাবর্তনকালে সনাতন প্রভৃতি সকলেই তাঁহাকে 'পুনর্বার শীঘ্র আসি'য়া তাঁহাদের অভীষ্ট পূরণের জন্য প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন।

এই ঘটনার কিছুকাল পরেই শ্রীনিবাস-আচার্য বৃন্দাবন গমন করিবার পূর্বে খড়দহে গিয়া বসুধা ও জাহ্নবাদেবীর সহিত সাক্ষাৎ করিলে[১২] তাঁহারা তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়া অভিরাম-গোপালের নিকট পাঠাইয়া দেন। পরে শ্রীনিবাসের বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনকালে গোপাল-ভট্ট-গোস্বামী দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়া ছিলেন[১৩] 'ঈশ্বরীর পদযুগ না দেখিল আর।' জাহ্নবা-ঈশ্বরী যে শ্রীনিবাসের প্রথমবার বৃন্দাবন-গমনের পূর্বেই বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, ইহা হইতেই তাহা প্রতিপন্ন হয়। ইতিমধ্যে নরোত্তম-ঠাকুরও নীলাচলে যাত্রা করিবার পূর্বে বসু-জাহ্নবার নিকট আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া যান।[১৪]

ইহার পর খেতুরির মহামহোৎসবকালে জাহ্নবা-ঠাকুরাণীও সেই উৎসবে যোগদান কবিবার জন্য বসুধা-গঙ্গা ও বীরভদ্রের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া[১৫] সদলবলে

---

(১০) ১।৪০১ (১১) ১৬শ. বি, পৃ. ২২৩-৩৩ (১২) ঐ—৪র্থ. বি., পৃ. ৪২ ; ৫ম. বি., পৃ. ৪৭-৪৯ ; ৬ষ্ঠ. বি., পৃ. ৫৯ ; ভ. র.—৪।৮৮, ৯৩ ; ন. বি.—২য়. বি., পৃ. ১৯ ; অ. ব.—৩য়. ম., পৃ ১৪ (১৩) প্রে. বি.—৬ষ্ঠ. বি., পৃ. ৬৪ (১৪) ভ. র.—৮।২১০ ; ন.বি.—২য়. বি., পৃ. ৪৩ (১৫) ভ. র.—১০।৩৭০-৭১ ; ন. বি.—৬ষ্ঠ. বি. পৃ. ৮১

খড়দহ হইতে যাত্রা আরম্ভ করেন। যাত্রাকালে বিভিন্ন স্থানে 'গ্রামে গ্রামে লোকের সংঘট্ট' হইতে থাকে এবং হালিসহর হইতে নয়ন-মিশ্র প্রভৃতি ভক্ত আসিয়া তাঁহার সহিত যুক্ত হন। তারপর পথিমধ্যে নবদ্বীপে শ্রীবাস-গৃহে, আকাইহাটে কৃষ্ণদাস-গৃহে, কণ্টকনগরে গদাধরদাস-প্রতিষ্ঠিত গৌরাঙ্গ-মন্দিরে এবং বুধরিগ্রামে সম্ভবত রামচন্দ্র-কবিরাজের গৃহে বিশ্রামাবস্থানের পর জাহ্নবাদেবী খেতুরিতে গিয়া পৌছান। তাঁহার যাত্রাপথের এই সকল স্থানে গৌড়মণ্ডলের অসংখ্য বৈষ্ণব আসিয়া তাঁহার সহিত যোগদান করেন। তারপর তিনি খেতুরিতে পৌছাইলে তাঁহাকে বিপুলভাবে সংবর্ধনা জানান হয় এবং পূর্ব-নির্ধারিত নির্দিষ্ট বাসায় তিনি স্বীয় ভক্তবৃন্দকে লইয়া অবস্থান করিতে থাকেন।

খেতুরির উৎসবে জাহ্নবাদেবীর স্থান ছিল বোধকরি সর্বোচ্চে। ফাল্গুনী-পূর্ণিমায় ছয়টি বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা হয়। পূর্ব-রাত্রিতে জাহ্নবাদেবীর আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া 'খোল করতাল পূজা' সম্পন্ন করা হয়[১৬] এবং পরদিন প্রভাতেও বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার পূর্বে শ্রীনিবাস-আচার্য তাঁহার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিয়া লন।[১৭] বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার পর চৈতন্য-ভক্তবৃন্দকে মাল্য-চন্দন দান করিবার জন্য জাহ্নবাদেবী শ্রীনিবাসকে নির্দেশ দান করেন[১৮] এবং তাঁহারই আজ্ঞাক্রমে নৃসিংহ-চৈতন্যদাস শ্রীনিবাসাদি কয়েকজনকে মাল্য-চন্দনে বিভূষিত করেন।[১৯] তাহারপর সংকীর্তন-শেষে জাহ্নবাদেবী নরোত্তম প্রভৃতি নর্তক ও গায়কদিগকে অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া ফাগুক্রীড়া আরম্ভ করিবার জন্য আজ্ঞাদান করিলে সকলে প্রস্তুত হইলেন। তখন তিনিই সর্বপ্রথম ফাগু লইয়া মন্দিরে প্রবেশ করেন[২০] এবং 'প্রভু অঙ্গে ফাগু দিয়া দেখে নেত্র ভরি।' তারপর 'শ্রীঈশ্বরীর আজ্ঞায় আচার্য-শ্রীনিবাস' মহাপ্রভুর জন্মাভিষেক সম্পন্ন করেন।[২১]

পরদিন অতি প্রত্যূষে জাহ্নবাদেবী 'প্রাতঃক্রিয়া সারি স্নান কৈল উষ্ণ জলে।'[২২] তারপর তিনি আহ্নিকাদি সম্পন্ন করিয়া যথেষ্ট শ্রম ও পরিপাটি সহকারে বহুবিধ খাদ্য-সামগ্রী প্রস্তুত করিলেন এবং সেই ঐকান্তিক নিষ্ঠা-পূত অন্ন-ব্যঞ্জনাদি লইয়া নিজেই মন্দিরে গিয়া বিগ্রহ সম্মুখে ভোগ অর্পণ করিলেন। ততক্ষণে তিনি পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও শ্রীনিবাসের অনুরোধ এড়াইয়া তিনি স্নেহময়ী জননীর ন্যায় প্রথমে স্বহস্তে পরিবেশন করিয়া ভক্তবৃন্দকে অন্নাদি ভক্ষণ করাইলেন এবং তাহারপর একান্তে গিয়া কিছু ভোজ্য-দ্রব্য গ্রহণ করিলেন।

(১৬) ন. বি.—৬ষ্ঠ. বি., পৃ. ৯০ (১৭) প্রে. বি.—১৯শ. বি., পৃ. ৩১০ ; ন. বি.—৬ষ্ঠ. বি., পৃ. ৯১ (১৮) প্রে. বি.—১৯শ. বি., পৃ. ৩১২ ; ভ. র.—১০।৫১১ (১৯) ভ. র.—১০।৫১৯ (২০) প্রে. বি.—১৯শ. বি., পৃ. ৩১৩ ; ভ. র.—১০।৬৪০ ; ন. বি.—৬ষ্ঠ. বি., পৃ. ৯৭. (২১) প্রে. বি.—১৯ শ. বি. পৃ. ৩১৪ ; তু.—ন. বি. ; ভ. র. (২২) ন. বি.—৬ষ্ঠ. বি., পৃ. ৯৮ ; তু.—ভ. র.—১০।৬৮

সেইদিনই জাহ্নবা-ঠাকুরাণী নরোত্তমের নিকট স্বীয় বৃন্দাবন-গমনের বাসনা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু নরোত্তম সেই প্রস্তাব এড়াইয়া যান[২৩] এবং পরদিন ভক্তবৃন্দের স্ব-স্ব বাসাবাড়ীতেই রন্ধন-ভোজনাদির ব্যবস্থা হইলে জাহ্নবাদেবীর বাসায় বিপুল আনন্দোৎসবের মধ্যে ভক্তগণের ভোজন সম্পন্ন হয়।[২৪] পরদিন ভক্তবৃন্দের বিদায়কালে জাহ্নবা তাঁহার কয়েকজন ভক্তকে খড়দহে ফিরিয়া যাইবার আজ্ঞা দিলে তাঁহারা চলিয়া যান। তারপর তিনি অবশিষ্ট ভক্তবৃন্দকে লইয়া ভোজন করেন এবং সংকীর্তনাদি শ্রবণ করিয়া নিশা-যাপন করেন। পরদিন প্রত্যূষে তিনি পূর্ববৎ স্নানাহ্নিক শেষ করিয়া স্বহস্তের রন্ধন-সামগ্রী দিয়া ভোগ অর্পণ করিলেন এবং ভক্তবৃন্দকে প্রসাদ ভক্ষণ করাইলেন। ইতিমধ্যে রামচন্দ্র, গোবিন্দ প্রভৃতি বুধরি-প্রত্যাগত ভক্তগণের নিকট বিদায়ী ভক্তবৃন্দের শুভ-প্রত্যাগমন বার্তা পাওয়া গেল। তারপর রাত্রিতে সন্ধ্যা-আরাত্রিক দর্শন করিয়া জাহ্নবা দেবতার প্রসাদ-মালা প্রাপ্ত হইলেন এবং পরমানন্দে রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। পরদিন প্রভাতে ভক্তবৃন্দসহ তাঁহার বৃন্দাবন-যাত্রা আরম্ভ হইল।

বৃন্দাবন-পথে জাহ্নবা-ঈশ্বরী নানাস্থানে নানাভাবে জীবকুলের প্রতি করুণা প্রদর্শন করেন। একবার 'কুতবুদ্দিন নামে এক দস্যু দলপতি' অনেক যবন-দস্যু লইয়া ভক্তবৃন্দের অর্থাদি লুণ্ঠন করিতে আসিয়া পথ হারাইয়া ফেলে এবং জাহ্নবাদেবীর মাহাত্ম্য-প্রভাবেই তাহারা এইভাবে ব্যর্থ হইয়াছে মনে করিয়া প্রভাতে গিয়া তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করে।[২৫] জাহ্নবা তাহাদিগকে কৃপা প্রদর্শন করিলে যবনগণ কৃষ্ণনাম গ্রহণ করে। আর একবার পাষণ্ডী-গণ ভক্তবৃন্দের বিরুদ্ধাচরণ করিলে তিনি তাহাদের অন্তরে ভক্তিভাব জাগাইয়া তাহাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া যান।[২৬] এইভাবে তিনি ক্রমে মথুরায় গিয়া পৌঁছাইলেন। মথুরায় বিশ্রাম-ঘটে তাঁহার সহিত তৎস্থানের ব্রাহ্মণবৃন্দের সাক্ষাৎ ঘটিলে তাঁহারা বৃন্দাবনে সেই সংবাদ পাঠাইয়া দেন এবং গোস্বামী-বৃন্দ অগ্রসর হইয়া আসিলে অক্রূরে তাঁহাদের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটে। এইস্থানে সঙ্গী-পরমেশ্বরীদাস জাহ্নবার নিকট গোপাল-ভট্ট, লোকনাথ, ভূগর্ভ, কৃষ্ণদাস-ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণ-পণ্ডিত, মধু-পণ্ডিত, জীব-গোস্বামী প্রভৃতি সকলেরই পরিচয় প্রদান করেন। 'ভক্তিরত্নাকরে'র বর্ণনা[২৭] হইতে বেশ মনে হয় যে জাহ্নবার সহিত গোস্বামী-বৃন্দের কোনও পূর্ব পরিচয় ছিল না। কিন্তু 'প্রেমবিলাস' অনুযায়ী আমরা দেখিয়াছি যে জাহ্নবাদেবী ইতিপূর্বে বৃন্দাবনে আসিলে তাঁহাদের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে। তখন রূপ-সনাতনও জীবিত ছিলেন। 'ভক্তিরত্নাকর' বা 'নরোত্তম-

(২৩) ন. বি.—৬ষ্ঠ. বি., পৃ. ১০২ (২৪) ঐ—৭ম. বি., পৃ. ১০৬ (২৫) প্রে. বি.—১৯ শ. বি., পৃ. ৩১৮-১৯ ; ভ. র.—১১।৮৫ (২৬) প্রে. বি.—১৯ শ. বি., পৃ. ৩১৯ ; ভ. র.—১১।৬৪ (২৭) ১১।১০৩-৫

বিলাস' 'প্রেমবিলাসে'র কোন উল্লেখ না করিলেও তথ্যাদি-সংগ্রহ ব্যাপারে যে এই গ্রন্থের নিকট ঋণী তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও 'প্রেমবিলাস'-বর্ণিত জাহ্নবার প্রথমবার বৃন্দাবন-গমন সম্বন্ধে 'ভক্তিরত্নাকরে' যে কোনও উল্লেখ নাই, কেবল তাহাই নহে, এই গ্রন্থানুযায়ী জাহ্নবার প্রথমবার বৃন্দাবন-গমন ঘটে রূপ-সনাতনের তিরোভাবের, এমন কি, শ্রীনিবাসের দুইবার বৃন্দাবন-গমনেরও পরে। 'প্রেমবিলাস'-কার কিন্তু স্বীয় অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়া বলিতেছেন যে জাহ্নবাদেবীর গৌড়ে প্রত্যাবর্তন করিবার পর শ্রীনিবাস প্রথমবার বৃন্দাবন-গমন করেন। বিশেষ-বিচারে 'প্রেমবিলাস'কে একটি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ বলিতে না পারা গেলেও উপরোক্ত বিষয় সম্বন্ধে 'ভক্তিরত্নাকর' অপেক্ষা যথেষ্ট প্রাচীন এই গ্রন্থের বিবরণকে অসত্য মনে করিবারও কারণ দৃষ্ট হয় না। সুতরাং এ সম্বন্ধে জোর করিয়া কিছু বলিতে পারা যায় না।

যাহাহউক, জীব-গোস্বামী প্রভৃতি জাহ্নবাকে 'মনুষ্যযানে' চড়াইয়া বৃন্দাবনে আনিয়া একটি নিভৃত স্থানে বাসা-ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ক্রমে জাহ্নবাদেবী বিগ্রহ, মন্দির এবং দ্রষ্টব্য স্থানসমূহ পরিদর্শন করেন। গোবর্ধন ও রাধাকুণ্ডে গিয়া তিনি রঘুনাথদাস ও কৃষ্ণদাস-কবিরাজের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তারপর বৃন্দাবনে বসিয়া তিনি গোস্বামিগ্রন্থ পাঠ ও শ্রবণ করেন এবং শেষে বন-পরিক্রমায় বাহির হইয়া যমুনা-তীরস্থ এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রতি যথেষ্ট কৃপা প্রদর্শন করেন।[২৮] এই দুঃখী ব্রাহ্মণ বৃদ্ধ-বয়সে এক পুত্র-সন্তান লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই পুত্রটি পৌগণ্ড বয়সে মরণোন্মুখ হইলে বৃদ্ধের আর বেদনার সীমা থাকে না। এই সময়েই জাহ্নবাদেবীর হস্তক্ষেপের ফলে বৃদ্ধ পুত্রের জীবন ফিরিয়া পান।

বন-পরিক্রমার পর ঈশ্বরী গৌড়-প্রত্যাবর্তনের জন্য উদ্যোগী হইলেন। তৎপূর্বে একদিন রাধা-গোপীনাথ দর্শনকালে তাঁহার মনে হইল যে 'শ্রীরাধিকা কিছু উচ্চ হইলে ভাল হয়।'[২৯] তিনি স্থির করিলেন, গৌড়ে গিয়া আর একটি রাধিকা-বিগ্রহ নির্মাণ করাইবেন। পরদিন প্রভাতে উঠিয়া তিনি গোপনে ভক্ত নয়ন-ভাস্করকে বলিলেন[৩০]:

নিরন্তর গোপীনাথে করিবে ধিয়ান।
করিতে হইবে এক প্রেয়সী নির্মাণ॥

নয়ন ঐ বিগ্রহ দেখিয়া এবং ঈশ্বরীর মনোভিলাষ বুঝিয়া 'যৈছে নির্মাণিব তাহা চিত্তে স্থির কৈলা।' তারপর জাহ্নবা বিভিন্ন স্থানে বিদায় গ্রহণ করিতে গেলে গৌরীদাসের সমাধি-

(২৮) ১১।২২৩ (২৯) তু.—প্রে. বি.—১৯শ. বি., পৃ. ৩৪১; অ. ব.—৪র্থ. ম., পৃ. ২৩ (৩০) ভ. র.—১১।২৪৫

ক্ষেত্রে তাঁহার সহিত তাঁহার মাতৃস্বসার পুত্র বড়ু-গঙ্গাদাসের সাক্ষাৎ ঘটে। গৌরীদাস-শিষ্য গঙ্গাদাসকে গৌড়ে আনিতে চাহিয়া তিনি তাঁহার হস্তে একজন বৃন্দাবনভক্ত-প্রদত্ত 'শ্যামরায়' নামক একটি বিগ্রহ প্রদান করিয়া তাঁহাকে স্বীয় সঙ্গী হইতে আজ্ঞা দান করেন।

বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমন পথে গৌড়মণ্ডলে প্রবেশ করিয়া জাহ্নবাদেবী পূর্ব প্রতিশ্রুতি-মত সর্বপ্রথম খেতুরিতে গমন করেন[৩১] এবং তথায় তাঁহার পূর্ববাসায় বিশ্রামকালে তিনি পূর্ববৎ স্বহস্তে রন্ধন ভোগ-অর্পণ ও প্রসাদ-পরিবেশন করিয়া সকলকে তৃপ্তি দান করেন। কয়েকদিন পরে তিনি বুধরি আসিয়া সেইস্থানে বড়ু-গঙ্গাদাসের সহিত হেমলতার বিবাহানুষ্ঠান সম্পন্ন[৩২] করিয়া এবং গঙ্গাদাসেরই হস্তে পূর্বোক্ত শ্যামরায়-বিগ্রহের সেবার ভার দিয়া ভক্তবৃন্দসহ নিত্যানন্দের জন্মভূমি একচক্রায় হাজির হন। তথায় নিত্যানন্দের বংশ-বিবরণ, তাঁহার বাল্যলীলা, গৃহত্যাগ প্রভৃতি কাহিনী শ্রবণ করিয়া সকলে একচক্রা এবং মৌড়েশ্বর কুণ্ডলীতলা প্রভৃতি স্থানও পরিদর্শন করিলেন।[৩৩] তৎকালে জাহ্নবাদেবী নানাভাবে দুঃখ প্রকাশ করিলেন এবং 'শ্বশুর শাশুড়ীর সন্দর্শন' না হওয়ায় খেদান্বিতা হইলেন।[৩৩] শেষে তিনি প্রত্যাবর্তন পথে যাজিগ্রামে শ্রীনিবাসের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া শ্রীখণ্ডে রঘুনন্দনের গৃহে ও নবদ্বীপে শ্রীবাস-গৃহে কিছুকাল বিশ্রাম গ্রহণ করিবার পর অম্বিকা হইয়া খড়দহে গিয়া বসুধা, গঙ্গা ও বীরচন্দ্রের সহিত মিলিত হন।

অল্পকাল মধ্যেই 'নয়ন ভাস্করে শ্রীজাহ্নবা আজ্ঞা কৈলা। তেঁহ শ্রীরাধিকা মূর্তি নির্মাণ আরম্ভিলা॥'[৩৪] 'প্রেমবিলাসের' শ্যামানন্দ-শাখায় যে নয়ন-ভাস্করের নাম উল্লেখিত হইয়াছে, তিনি কোন্ নয়ন-ভাস্কর বলা যায় না। কিন্তু আলোচ্যমান নয়ন-ভাস্করই সুবিখ্যাত হইয়াছিলেন। এই নয়ন-ভাস্কর কর্তৃক বিগ্রহ নির্মাণ হইয়া গেলে জাহ্নবাদেবী পরমেশ্বরীদাস প্রভৃতি কয়েকজন বিজ্ঞ-ভক্তের সহিত সেই বিগ্রহটিকে বৃন্দাবনে প্রেরণ করিলেন এবং বৃন্দাবনের গোস্বামী-বৃন্দ 'শ্রীগোপীনাথের বামে শ্রীরাধা বসাইল।'[৩৫] পরমেশ্বীদাস ফিরিয়া আসিয়া বসু-জাহ্নবাকে সেই সংবাদ জ্ঞাপন করিলে জাহ্নবা তাঁহাকে

(৩১) তু.—প্রে. বি.—১৫শ. বি., পৃ. ২১৩ (৩২) দ্র.—গৌরীদাস (৩৩) ভ. র.—১১।৬২৬ ; গ্রন্থ-মতে এক অতিবৃদ্ধ বিপ্র ভক্তবৃন্দকে নানাবিধ কাহিনী শ্রবণ করাইয়া নিজেই একচক্রা পরিক্রমা করেন। (৩৪) ঐ—১১।৭৮৮ (৩৫) প্রে. বি.—১৯শ. বি., পৃ. ৩৪১ ; অ. ব.—৪র্থ. ম., পৃ. ২৪ ; ভ. র.—১৩।২২৯, ২৩২ ; ন. বি.—১০ম. বি., পৃ. ১৪৯ ; ভক্তমাল-মতে (পৃ. ২৬-২৭) বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার সময় পূজারী ও ভক্তবৃন্দের মধ্যে মত-বিরোধ ঘটিলে শেষে জয়পুর-রাজের হস্তক্ষেপের ফলে বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু ভক্তমাল-মতে ইহা ছিল স্বয়ং জাহ্নবাদেবীরই বিগ্রহ। তিরোভাবকালে তিনি এই বিগ্রহকে বৃন্দাবনে প্রেরণ করেন।

'অড়া আটপুর গ্রামে' গিয়া 'রাধা গোপীনাথ সেবা প্রকাশ' করিতে আজ্ঞা দান করেন। আজ্ঞা পালিত হইলে ঈশ্বরী তথায় গিয়া উৎসবে যোগদান করেন[৩৬] এবং তাহারপর বীরভদ্রের বিবাহানুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়া খড়দহে ফিরিলে 'পুত্রবধূ দেখি বসু হৈলা মহানন্দ'।[৩৭] এই উপলক্ষে শ্রীমতী ও নারায়ণী নাম্নী বীরভদ্রের দুইজন পত্নীই জাহ্নবাকর্তৃক দীক্ষিতা হন[৩৮]।

ইহার পূর্বেই 'প্রেমবিলাস'-রচয়িতা নিত্যানন্দদাস[৩৯] এবং সুবিখ্যাত পদকর্তা জ্ঞানদাস[৪০] প্রভৃতি অনেক ভক্তই জাহ্নবার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং নিত্যানন্দদাস কোন এক-সময়ে 'প্রেমবিলাস' রচনার জন্যে তৎকর্তৃক আদিষ্ট হন[৪১]। কিন্তু তাঁহার শেষ জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। 'প্রেমবিলাস' মতে উক্ত ঘটনার পর তিনি আরও একবার খেতুরির উৎসবে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেই বৎসর খেতুরিতে এক মহাসভার অধিবেশন হয় এবং তিনি বসুধা, গঙ্গা ও বীরচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া ঐ সভায় যোগদান করেন।[৪২] 'ভক্তিরত্নাকর' মতে তিনি আরও একবার বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন।[৪৩] এইবারে তিনি পূর্বের মত খেতুরি হইতে বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন কিনা, কিংবা এমন কি তিনি বৃন্দাবন হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন কিনা, তাহারও কোন বিবরণ লেখক লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই।

'নিত্যানন্দপ্রভুর-বংশমালা' বা '-বংশবিস্তার'-গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে যে জাহ্নবাদেবী তাঁহার দত্তক-পুত্র রামাই ও বীরভদ্র-পুত্র গোপীজনবল্লভকে লইয়া বৃন্দাবন-যাত্রা আরম্ভ করেন এবং কণ্টকনগর হইয়া মঙ্গলকোট পৌছাইলে, সেইস্থানে তাঁহাদের সহিত চন্দ্র-মণ্ডল নামক এক ধনী বৈষ্ণবের সাক্ষাৎ ঘটে। তাঁহার গৃহে দ্বাদশ-বৎসর অবস্থানের পর বিদায়-গ্রহণ কালে তাঁহার অনুরোধক্রমে জাহ্নবা গোপীজনবল্লভকে একটি রথে চড়াইয়া ভ্রমণ করাইতে অনুমতি দান করেন। তৃতীয় প্রহর বেলায় রথ যেই-স্থানে পৌছাইল, চন্দ্র-মণ্ডলের প্রার্থনাক্রমে জাহ্নবাদেবীকে সেই পর্যন্ত স্থানেব অধিকার গ্রহণ করিতে হইল। লতা-বেষ্টিত থাকায় উহা লতাধাম নামক পাট বলিয়া আখ্যাত হইল। তারপর জাহ্নবা পুনরায় যাত্রা আরম্ভ করিয়া মৌড়েশ্বর ও একচাকায় পৌছান। সেই স্থানে হাড়াই-পণ্ডিতের জ্ঞাতিপুত্র মাধব তাঁহাদিগকে তৎস্থানের মাহাত্ম্য ও নিত্যানন্দলীলার বিষয় অবগত করাইয়া দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখাইয়া আনিলে জাহ্নবা গোপীজনবল্লভকে নানাবিধ

(৩৬) ভ. র.—১৩।২৪৭ (৩৭) ঐ—১৩।২৫৯ (৩৮) ঐ— ১৩।২৫৫ ; তু.—নি. বি.—পৃ. ২৪ (৩৯) ২০শ. বি., পৃ ৩৬১ (৪০) গৌ.ত.—পৃ. ৩১৩ (৪১) প্রে.বি.—৭ম, বি., পৃ. ৮৬ ; ১২শ. বি., পৃ. ১৪৬ ; ১৬শ. বি., পৃ. ২১৮ ; কর্ণ.—৬ষ্ঠ, নি., পৃ. ১১৬ ; ৭ম. নি., ১২৩ (৪২) ১৯শ. বি., পৃ. ৩৩৭ (৪৩) ১৩।২৬৮

উপদেশ ও 'মহামন্ত্র' দান করিয়া সেইস্থান হইতে ফিরাইয়া দেন এবং নিজে ভক্তবৃন্দকে সঙ্গে লইয়া বৃন্দাবনে পৌছান। তখন সনাতন ও রূপ জীবিত ছিলেন। তাঁহারা দুইজনে জাহ্নবার 'স্তুতিপাঠ' করেন। তারপর জাহ্নবা একদিন গোপীনাথের মন্দিরে গিয়া প্রবেশ করিলে দ্বার রুদ্ধ হইয়া যায় এবং

গোপীনাথ জাহ্নবার বস্ত্র আকর্ষিয়া।
বসাইলা আপনার বাম পার্শ্বে লইয়া॥

সেবকবৃন্দ যখন দরজা খুলিলেন, তখন

সবে দেখে কাঞ্চন প্রতিমা মূর্তি হইয়া।
বিরাজয়ে গোপীনাথের দক্ষিণে বসিয়া॥......
বামপার্শ্বে শ্রীরাধিকা দক্ষিণে জাহ্নবা।
মধ্যে গোপীনাথ ইথে উপমা কি দিবা॥

'মুরলীবিলাসে' এই অবিশ্বাস্য বর্ণনার সমর্থন পাওয়া যায়। গ্রন্থকার বলেন বসুধা ও বীরচন্দ্রের মত গ্রহণ করিয়া জাহ্নবাদেবী স্বীয় দত্তক-পুত্র রামচন্দ্র ও অন্যান্য ভক্তসহ বৃন্দাবনে পৌছাইলে তিনি সনাতন, রূপ ও এমনকি রঘুনাথ-ভট্ট-গোস্বামী প্রভৃতি কর্তৃক সংবর্ধিত হন। একদিন তিনি কাম্যবনে গোপীনাথ-মন্দিরে বিগ্রহ-দর্শনান্তে বহির্গত হইবার জন্য উদ্যত হইলে

আকর্ষিলা গোপীনাথ ধরিয়া অঞ্চলে।
বসনে ধরিতে তিনি উলসি চাহিলা,
হাসি গোপীনাথ নিজ নিকটে লইলা।

এবং লেখক অন্যত্র বলিতেছেন যে জাহ্নবাদেবী

নিত্যেগত হইলা এই কহিনু কারণ।

উল্লেখযোগ্য যে গ্রন্থকার স্বয়ং এই বিবরণ সম্বন্ধে নিশ্চিত ছিলেন না। তিনি জানাইয়াছেন,

যাহা শুনি তাহা লিখি নাহি মোর দায়।

জাহ্নবার তিরোভাব সম্বন্ধে 'বংশীশিক্ষা'-গ্রন্থেও একই কথা বলা হইয়াছে। গ্রন্থানুযায়ী জাহ্নবা-ঠাকুরাণী বীরচন্দ্র ও রামচন্দ্র বা রামাইকে লইয়া বোরাকুলি-মহামহোৎসব হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার পর রামচন্দ্র রাঢ়দেশ-, পূর্বদেশ- এবং শ্রীক্ষেত্র-পরিদর্শন করিয়া ফিরিলে জাহ্নবা তাঁহাকে লইয়া বৃন্দাবন গমন করেন। ব্রজমণ্ডলে পৌছাইবার

পাঁচবর্ষ পরে কামপূর্ণ কাম্যবনে।
দেবীর মিলন হৈল গোপীনাথ সনে॥

এই গ্রন্থে রূপ-সনাতনের সহিত জাহ্নবার সাক্ষাৎকারের কথা বলা হয় নাই। পূর্বোক্ত দুইটি গ্রন্থে যে রূপ-সনাতনের কথা বলা হইয়াছে, তাহার কারণ সম্ভবত 'প্রেমবিলাসে'র ঘটনা-সংস্থাপনের ত্রুটি। খুব সম্ভবত, 'প্রেমবিলাসো'ক্ত জাহ্নবার প্রথমবার বৃন্দাবন-গমনের

কাহিনীর দ্বারাই লেখকগণ প্রভাবিত হইয়া থাকিবেন। কিন্তু শেষোক্ত বর্ণিত বিষয় সম্বন্ধে তিনখানি গ্রন্থের বর্ণনা প্রায় একরূপ হওয়ায় জাহ্নবা-তিরোভাব সম্বন্ধীয় বর্ণিত তথ্যটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য হইয়া উঠে। বিশেষ করিয়া অন্য কোনও গ্রন্থে এই সম্বন্ধে কোনও বিরুদ্ধ-বর্ণনা না থাকায় বৃন্দাবনেই জাহ্নবার তিরোভাব সম্বন্ধীয় উপরোক্ত বর্ণনাকে সত্য-সম্বন্ধ-বিহীন বলিয়া একেবারে উড়াইয়া দেওয়া চলে না। সর্বাপেক্ষা উল্লেখ্য বিষয় এই যে 'ভক্তিরত্নাকর'-প্রণেতা আশ্চর্যজনকভাবেই ব্যাপারটিকে এড়াইয়া গিয়াছেন।[৪৪]

শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরীর গমনাগমন।
বিস্তারিয়া এ সব বর্ণিব বিজ্ঞজন॥
ঈশ্বরীর ব্রজে পুনঃ গমন প্রকার।
অনুরাগবল্লী আদি গ্রন্থেতে প্রচার॥

অথচ জাহ্নবার এই শেষবার বৃন্দাবন-গমন সম্বন্ধে 'অনুরাগবল্লী'তে কোনও উল্লেখই নাই। আবার এই বর্ণনার অব্যবহিত পরেই 'ভক্তিরত্নাকরে'র লেখক বলিতেছেন[৪৫] :

কিছুদিনে প্রভু বীরচন্দ্র মাতা স্থানে।
অনুমতি লইল যাইতে বৃন্দাবনে॥

এবং তিনি বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া

খড়দহে জননীরে প্রণমিলা গিয়া॥

লেখক এই দুইটি স্থলেই বসুধা কিংবা জাহ্নবা, কাহারও নাম পর্যন্ত উল্লেখ করেন নাই। 'প্রেমবিলাস'-কার জানাইতেছেন যে বীরচন্দ্র বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া 'বসুধা জাহ্নবা পদে প্রণাম করিলা'।[৪৬] কিন্তু রাধিকা-বিগ্রহ প্রেরণের পরবর্তিকালে জাহ্নবার বৃন্দাবন-গমন সম্বন্ধে কোন উল্লেখই এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয় নাই। আবার 'বংশীশিক্ষা'য় জাহ্নবার এই বৃন্দাবন-গমন বোরাকুলি-মহামহোৎসবের পরবর্তী ঘটনারূপে বর্ণিত হইলেও 'ভক্তিরত্নাকরে' এই উৎসবের কথা জাহ্নবা এবং বীরচন্দ্র উভয়েরই বৃন্দাবন-গমনের পরে উল্লেখিত হইয়াছে। এই সমস্ত কিছু মিলিয়া যে বিষয়টিকে অতি দুর্বোধ্য করিয়া তুলিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। 'বংশীশিক্ষা'য় বোরাকুলি-উৎসব প্রসঙ্গে জাহ্নবার উল্লেখ থাকিলেও 'ভক্তিরত্নাকরে' ঐরূপ কোনও উল্লেখ নাই। খুব সম্ভবত নরহরি-চক্রবর্তী ধারণা করিয়াছিলেন যে জাহ্নবা-ঠাকুরাণী তৎপূর্বেই লোকান্তরিতা হইয়াছিলেনে কিন্তু বৃন্দাবন-পথে বা বৃন্দাবনেই যে তিনি অন্তর্হিতা হন নাই, একথাও নরহরি জোর করিয়া বলিতে পারেন নাই।[৪৭]

---

(৪৪) ১৩।২৮১-৮২ (৪৫) ১৩।৪৩১ (৪৬) ১৯শ. বি., পৃ. ৩৪৪ (৪৭) অ. গো. ব. (পৃ. ১০-১১)-মতে পাড়পুরস্থ গোকুলদাস বা গোপালদাস নামক সূর্যদাস-পণ্ডিতের তন্তুবায় শিষ্যকে জাহ্নবা 'দাদা' বলিতেন। মৃত্যুর পূর্বে জাহ্নবা তাঁহাকে মহোৎসবের আজ্ঞা দিলে জাহ্নবার মৃত্যুর পর গোকুল মহোৎসব করেন।

বীরচন্দ্র (বীরভদ্র)

নিত্যানন্দ-পুত্র বীরচন্দ্র বা বীরভদ্রের জীবনী আলোচনা করিতে গেলে অপেক্ষাকৃত পরবর্তী-কালে লিখিত গ্রন্থগুলি অপরিহার্য হইয়া পড়ে। সুতরাং সীতা-জীবনীর আলোচনারম্ভে যাহা বলা হইয়াছে, এই স্থলেও সেই যুক্তি প্রদর্শিত হইতে পারে। বস্তুত, গ্রন্থগুলির বিবরণ এতই বিভ্রান্তিকর যে অনেক স্থলে কেবল ঘটনাগুলির উল্লেখ করা, বা উদ্ধৃতি তুলিয়া দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। ফলে জীবনীর আলোচনা একটি সংগ্রহ-শালাতেই পরিণত হয়। যাহা হউক, এই সকল গ্রন্থ হইতেও বীরচন্দ্রের জন্মকাল সম্বন্ধে সুনির্দিষ্টভাবে কিছুই জানিতে পারা যায় না। 'অদ্বৈতপ্রকাশ'-গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে[১] যে 'মহাপ্রভুর অপ্রকটে শ্রীবসুধা মাতা'র গর্ভে বীরচন্দ্রের জন্ম হয়। এ-সম্বন্ধে 'নিত্যানন্দপ্রভুর বংশবিস্তার' নামক গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে[২] :

শরৎকৃষ্ণা নবমীতে বোধন দিবসে।
ঈশ্বরাবির্ভাবে সব লোক আনন্দে ভাসে ॥......
পঞ্চদশ মাস[৩] তেজো রূপি যে রহিলা।
মার্গ শীর্ষ শুক্ল চতুর্থিতে প্রসবিলা ॥

গ্রন্থকার বলেন যে বীরচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিলে অদ্বৈতপ্রভু তাঁহাকে দেখিয়া যান। 'নিত্যানন্দ-প্রভুর বংশমালাতে'ও তৎকালে অদ্বৈতপ্রভুর খড়দহ-গমনের কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু মহাপ্রভুর তিরোভাবের পরবর্তিকালে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল কিনা তাহা সঠিক বলা যায় না। 'প্রেমবিলাস'[৪] পাঠে ধারণা জন্মায় যে বীরচন্দ্র শ্রীনিবাস-আচার্য অপেক্ষাও বয়োজ্যেষ্ঠ কিংবা অন্তত তাঁহার সমবয়স্ক ছিলেন। শ্রীনিবাস তাঁহার শৈশবে নরহরি-সরকারের সাক্ষাৎ-প্রাপ্ত হইলে সরকার-ঠাকুর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন :

বীরচন্দ্র ডাকি মোরে জাহ্নবা সাক্ষাতে।
বৃন্দাবনে শ্রীনিবাসে পাঠাহ ত্বরিতে ॥

এবং শ্রীনিবাসের পিতৃবিয়োগের পরে নরহরি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন :

তোমার নিমিত্ত বীরচন্দ্রের লিখন।
শ্রীনিবাসে শীঘ্র করি পাঠাও বৃন্দাবন ॥

(১) ২০ শ. অ., পৃ. ৯১ (২) পৃ. ১৪-১৫ ; নি. ব.—পৃ. ২১, ২৬ (৩) ব. সা. প.-এর ৯৮২ নং. পুথিতে (সূচক) বীরচন্দ্রের 'পঞ্চদশ মাস' গর্ভাবস্থানের কথা বলা হইয়াছে। 'সূচক নামক' পুথিটি বৃন্দাবনদাসের নামে আরোপিত হইয়াছে। (৪) ৪র্থ.-৫ম. বি., পৃ. ২৭-৪৯

পরে বর্ণিত হইয়াছে যে মহাপ্রভুর তিরোভাবের অব্যবহিত পরে শ্রীনিবাস প্রথমবার নীলাচল হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া শ্রীখণ্ডে পৌঁছাইলে তথায় বীরচন্দ্রের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটে এবং শ্রীনিবাস তাঁহাকে প্রণামাদি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। আরও পরে বৃন্দাবন-যাত্রার প্রাক্কালে শ্রীনিবাস খড়দহে পৌঁছাইলে বীরচন্দ্র তাঁহাকে 'বন্ধু'-সম্বোধন করিয়া অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। অথচ মহাপ্রভুর তিরোভাবের বেশ-কয়েক-বৎসর পূর্বেই শ্রীনিবাস জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।[৫] সুতরাং বীরচন্দ্র শ্রীনিবাস অপেক্ষা অন্তত কয়েক বৎসরের কনিষ্ঠ না হইলে বীরচন্দ্রকে মহাপ্রভুর তিরোভাবের পরবর্তিকালে জাত বলিতে পারা যায় না। আবার 'বংশীশিক্ষা'-গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে[৬] যে বংশীবদনের পৌত্র রামচন্দ্র ১৫৩৪ খৃ.-এ জন্মগ্রহণ করেন এবং 'মুরলীবিলাস'-গ্রন্থ মতে[৭] রামচন্দ্রের জন্মকালে

বীরচন্দ্র কোলে লঞা বসুধা আসিলা ধাঞা
বিষ্ণুপ্রিয়া অচ্যুতজননী।

তাহাছাড়া, 'বংশীশিক্ষা' এবং 'মুরলীবিলাসে'র আরও কয়েকটি বিবরণ অনুযায়ী বীরচন্দ্রকে রামচন্দ্র অপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ বলা চলে। অথচ চৈতন্য-তিরোভাব ঘটে ১৪৫৫ শকে বা ১৫৩৩ খৃ.-এ।[৮] সুতরাং 'বংশীশিক্ষা'র বর্ণনা সত্য হইলে, রামচন্দ্র অপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ বীরচন্দ্রের জন্মকালকে চৈতন্য-তিরোভাবের পূর্বেই ধরিতে হয়। কিন্তু 'অদ্বৈতপ্রকাশে'র বর্ণনার সহিত এইরূপ সিদ্ধান্তের সংগতি রক্ষা হয় না। এই সকল কারণে বীরচন্দ্রের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে সঠিকভাবে কিছু বলিতে পারা যায় না। তবে পরবর্তী বৈষ্ণব-সমাজে বীরচন্দ্র প্রাচীনেরই সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জয়ানন্দ জানাইয়াছেন[৯] যে তিনি 'বীরভদ্র গোসাঞির প্রসাদমালা' প্রাপ্ত হইয়া 'চৈতন্যমঙ্গল' রচনা করিয়াছিলেন এবং কৃষ্ণদাস-কবিরাজও 'চৈতন্যচরিতামৃতে' সম্ভবত বীরভদ্র-গোসাঁইর শাখা বা উপশাখার উল্লেখ করিয়াছেন।[১০]

'প্রেমবিলাস'-কার বলেন[১১] যে নিত্যানন্দ-পত্নী বসুধার গর্ভে 'অষ্টপুত্র' জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে

অভিরামের প্রণামে সপ্ত পরাণ ত্যজয় ॥
শেষপুত্র বীরভদ্র বীরচন্দ্র নাম।

'চৈতন্যচন্দ্রোদয়', 'নিত্যানন্দপ্রভুর বংশবিস্তার', ও 'অভিরামলীলামৃত' নামক পরবর্তী-কালের গ্রন্থগুলিতে অভিরামের প্রণামের কথাটি ব্যক্ত হইলেও[১২] নিত্যানন্দের পুত্রবৃন্দ সম্বন্ধে

(৫) প্র.—শ্রীনিবাস (৬) পৃ. ২৩৯ (৭) পৃ. ৫২ (৮) চৈ. উ.—পৃ. ২৫ (৯) পৃ. ৩ (১০) ১।১১, পৃ. ৫৫, ৫৬ (১১) ১৯ শ. বি., পৃ. ৩৪১-৪২ ; ২৪ শ. বি., পৃ. ২৫১ (১২) চৈ. চন্দ্র.—পৃ. ১৪৩ ; নি. বি. —পৃ. ১৪ ; অ. লী.—পৃ. ১২৫-২৭

কোনও সংখ্যা নির্দেশ করা হয় নাই। সুতরাং অষ্টপুত্র সম্বন্ধেও সংশয়-রহিত হওয়া যায় না। আবার 'নরোত্তমবিলাসে' দেখা যায়[১৩]—

প্রভু নিত্যানন্দ বলদেব ভগবান।
রামভদ্র বীরভদ্র দুই পুত্র তান॥
একদিন প্রণমিয়া নিত্যানন্দে রামে।
অল্পকালে রামভদ্র গেলেন স্বধামে॥

নরহরি-চক্রবর্তী এই তথ্য কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন বলা যায় না। কোন গ্রন্থেই নিত্যানন্দ-পুত্র রামভদ্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। খুবসম্ভবত নরহরি জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল দ্বারা প্রভাবিত হইয়া থাকিবেন। কারণ, 'চৈতন্যমঙ্গলে' বলা হইয়াছে :

বসু গর্ভে প্রকাশ গোসাঞি বীরভদ্র।
জাহ্নবী নন্দন রামভদ্র মহামর্দ॥

কিন্তু যতদূর জানা যায় জাহ্নবাদেবী নিঃসন্তান ছিলেন, তাঁহার দত্তক-পুত্র ছিলেন বংশীবদনের পৌত্র রামচন্দ্র। তাঁহার সম্বন্ধে 'বংশীশিক্ষা'য় বলা হইয়াছে[১৫] :

তবে প্রভু রামচন্দ্র প্রভু বীরচন্দ্রে।
বড় ভাই বলি প্রণমিলা বড় ছন্দে॥

এই রামচন্দ্রই হয়ত নিকটবর্তী উল্লেখিত 'বীরভদ্রে'র সাদৃশ্যে রামভদ্রে পরিণত হইয়া থাকিবেন। মনে হয় বীরভদ্রের জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা হিসাবে রামভদ্রের কল্পনা নিরর্থক। তবে গঙ্গা-নাম্নী নিত্যানন্দ-তনয়ার কথা সর্বজনস্বীকৃত। বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যগণোদ্দেশ-দীপিকা' ও 'প্রেমবিলাসে'র চতুর্বিংশবিলাসানুযায়ী[১৬] তিনি সম্ভবত বীরভদ্রের কনিষ্ঠা ছিলেন। 'অভিরাম গোস্বামীর বন্দনা'-নামক গ্রন্থে বীরভদ্রকেই বয়োজ্যেষ্ঠ বলা হইয়াছে।[১৭]

'অদ্বৈতপ্রকাশে' আরও লিখিত হইয়াছে[১৮] যে নিত্যানন্দ-তিরোভাবে বীরভদ্র 'মহামহোৎসবের উদ্যোগ করাইয়া'ছিলেন। বিবরণ সত্য হইলে বলিতে হয় যে নিত্যানন্দ-তিরোভাবের বহুপূর্বেই বীরভদ্র জন্মলাভ করেন। গ্রন্থকার আরও জানাইতেছেন[১৯] যে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে বীরভদ্র অদ্বৈতপ্রভুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিবার জন্য নৌকাযোগে যাত্রা করিয়াছিলেন। কিন্তু একজন বৈষ্ণব আসিয়া অদ্বৈতপ্রভুর নিকট সেই সংবাদ দিলে

প্রভু কহে বীরের এই বুদ্ধি নহে শুদ্ধ।
ইহা তার নিজগণের সম্মতি বিরুদ্ধ॥
মোর কথা বুঝাইয়া কহ যাঞা বীরে।
জাহ্নবা মাতার স্থানে মন্ত্র লইবারে॥

---

(১৩) গ্রন্থকর্তার পরিচয়, পৃ. ২০৮ (১৪) উ. খ.—পৃ. ৫১ (১৫) পৃ. ২১৪ (১৬) চৈ. দী.—পৃ. ৪; প্রে. বি.—পৃ. ২৫১ (১৭) পৃ. ৪-৫ (১৮) ২২ শ. অ., পৃ. ১০০-১০১ (১৯) ২২ শ. অ., পৃ. ১০২-৩

তখন উক্ত বৈষ্ণব জাহ্নবার নিকট গিয়া সেই সংবাদ জ্ঞাপন করিলে জাহ্নবাদেবী একজন সাধুকে[২০] প্রেরণ করিয়া বীরচন্দ্রকে ফিরাইয়া আনেন এবং তাঁহাকে দীক্ষাদান করেন। ইহার কিছুকাল পরে অদ্বৈতপ্রভু যখন দেহরক্ষা করেন তখন বীরভদ্র শান্তিপুরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু বীরভদ্রের দীক্ষাগ্রহণ-ব্যাপারটি হইতে বুঝা যায় যে তৎকালে স্বয়ং জাহ্নবাদেবীর সহিতই তাঁহার কোন না কোন প্রকার মতান্তর বা মনান্তর ঘটিয়াছিল। 'প্রেমবিলাসে'র চতুর্বিংশবিলাস ও 'নিত্যানন্দপ্রভুর বংশবিস্তার' গ্রন্থে উপরোক্ত দীক্ষাগ্রহণের কথা সবিস্তারে উল্লেখিত হইয়াছে।[২১] এই সমস্ত গ্রন্থ হইতে উপরোক্ত বিরোধের কথা স্পষ্টীকৃত হয়। অবশ্য এই সমস্ত বিরোধ ও গোষ্ঠীগত বিভেদের বিষয় কোথাও সবিস্তারে বর্ণিত হয় নাই। কিন্তু অনবহিত বা অসতর্ক গ্রন্থকার-গণের বিক্ষিপ্ত উল্লেখগুলি হইতে ইহাই স্পষ্ট হইয়া উঠে যে নিত্যানন্দ-, অদ্বৈত-[২২] শাখাগুলির কোনটিই অবিকৃতভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে পারে নাই। মূলধারা হইতে উদ্ভূত হইতে না হইতেই যেন তাহারা সহস্রধারে বিভক্ত হইয়া অসংখ্য পঙ্কিলতাময় অবরুদ্ধ জলাভূমির সৃষ্টি করিয়া ফেলিয়াছে।

প্রকৃতপক্ষে, বীরচন্দ্রের জীবন সম্বন্ধে নানাবিধ জটিলতা পরিদৃষ্ট হয়। প্রথমত, তাঁহার জীবনের বিভিন্ন ঘটনবলীর মধ্যে কোন ধারাবাহিকতা খুঁজিয়া পাওয়া যায়না। তাহাছাড়া গ্রন্থকার-গণ তাহার কর্মরাজির মধ্যে বহুস্থলে কোনও কার্যকারণ সম্পর্ক ধরাইয়া দিতে পারেন নাই। ফলে তাঁহারা আপন আপন চিন্তানুযায়ী মধ্যে মধ্যে কতকগুলি অলৌকিক ব্যাখ্যা জুড়িয়া দিয়াছেন। স্বয়ং নিত্যানন্দ এবং তাঁহার শিষ্যবৃন্দ—বিশেষ করিয়া অভিরাম প্রভৃতি সম্বন্ধেও এইরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া তাঁহাদিগের কর্মবিধিকে প্রতিষ্ঠা দান করা হইয়াছে। কিন্তু অভিরাম সম্বন্ধে বর্ণিত ঘটনাগুলি যেখানে অবিশ্বাস্য বলিয়া সহজেই বর্জনীয় হইতে পারে, সেখানে বীরচন্দ্র-সম্বন্ধীয় বর্ণিত-ঘটনাগুলির বহুস্থলেই বাস্তবতার স্পর্শ থাকায় সেইগুলি আরও জটিল হইয়া উঠিয়াছে। এমন কি তাঁহার জন্ম-সংক্রান্ত বিষয়গুলির মত বিবাহাদি ব্যাপারেও একটি সুনির্দিষ্ট ধারণা গড়িয়া তুলা সম্ভবপর হয়না। বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যগণোদ্দেশদীপিকা'-গ্রন্থে[২৩] বীরচন্দ্রের পত্নীর নাম দেওয়া হইয়াছে 'চান্দ ঠাকুরাণী'। কিন্তু 'মুরলিবিলাসে'[২৪] তাঁহাকে সুভদ্রা বলা হইয়াছে। আবার বলরামদাসের 'গৌরগণোদ্দেশ' বা 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'য় এবং রামাই-বিরচিত 'চৈতন্যগণোদ্দেশদীপিকা'-গ্রন্থে বীরচন্দ্র-পত্নীকে নারায়ণী বলা হইয়াছে।[২৫]

---

(২০) ইনি অভিরাম-গোপাল ; দ্র.—রামদাস-অভিরাম (২১) প্রে. বি.—২৪ শ. বি., পৃ. ২৫১-৫২ ; নি. বি.—পৃ. ১৯ ; নি. ব.—পৃ. ২৭ (২২) দ্র.—সীতাদেবী (২৩) পৃ. ৪(২৪) পৃ. ২৪৪, ২৪৮, ৩২৩, (২৫) গৌ. গ.—পৃ, ৪ ; গৌ. গ. দী.—পৃ. ৭ ; চৈ. দী. (রামাই)—পৃ. ৮

'-বংশমালা' বা '-বংশবিস্তার'-গ্রন্থে বলা হইয়াছে[২৬] যে দীক্ষাগ্রহণের কিছুকাল পরে বীরচন্দ্রের বিবাহেচ্ছা জন্মায়। তারপর তিনি অভিরামাদি বৈষ্ণবসহ নীলাচলে গমন করিলে সেইস্থলে

সার্ব্বভৌম আদি ভক্ত প্রভুরে মিলিলা।...

এবং প্রতাপরুদ্রের পুত্র আসিয়া মিলিলা।

তারপর তিনি চিল্কার নিকটবর্তী কোনও গ্রামে গিয়া সুধাময় নামক এক ব্রাহ্মণের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন। মাহেশনিবাসী এই সুধাময়[২৭], পিপিলাই-কন্যা বিদ্যুন্মালার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ-দম্পতীর কোনও সন্তানাদি না হওয়ায় তাঁহারা গৃহত্যাগ করিয়া নীলাচল হইয়া চিল্কা-সন্নিধানে পৌছাইলে স্বয়ং গঙ্গাদেবী তাঁহাদিগকে লক্ষ্মী নাম্নী এক কন্যা দান করেন এবং তদবধি তাঁহারা সেই স্থানে বাস করিতে থাকেন। বীরচন্দ্র আসিলে সেই জলোদ্ভবা লক্ষ্মীদেবী নারায়ণ-সেবাপরায়ণা হইয়া বীরচন্দ্রের গলায় মাল্যদান করিলেন। অতঃপর সুধাময় বীরচন্দ্রের হস্তে কন্যা-সম্প্রদান করিলে স্বয়ং জলধি আসিয়া সেই অনুষ্ঠানে নানাভাবে সাহায্যদান করেন।

ঘটনাগুলির মধ্যে কতটুকু সত্য লুক্কায়িত আছে তাহা বলা সুকঠিন। আবার ইহার পরবর্তী ঘটনাবলী সম্বন্ধেও যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ থাকিয়া যায়। গ্রন্থকার জানাইতেছেন যে বিবাহান্তে বীরচন্দ্র পত্নীসহ নীলাচলে ফিরিয়া গেলে বক্রেশ্বর-পণ্ডিত গজপতির সন্তান চক্রদেবকে দীক্ষিত করিয়া তাঁহার সাহায্যে নব-দম্পতীর গৃহগমন ব্যবস্থা সম্পন্ন করিয়া দেন এবং বধূসহ-বীরচন্দ্র খড়দহে প্রত্যাবর্তন করেন। গ্রন্থ হইতে আরও জানা যায় যে কিছুকাল পরে

তবে প্রভু করিলেন দ্বিতীয় সংসার।
মহাভাগ্যবতী বিষ্ণুপ্রিয়া নাম যার॥

এবং এই বিষ্ণুপ্রিয়া জাহ্নবাকর্তৃক দীক্ষিতা হইয়াছিলেন। 'প্রেমবিলাসে'র চতুর্বিংশ-বিলাসেও বীরচন্দ্রের দুই বিবাহের কথা বলা হইয়াছে।[২৮] কিন্তু সেইস্থলের বর্ণনা সম্পূর্ণতই ভিন্ন।

ঝামটপুরবাসী শ্রীযদুনন্দন।
তার দুই কন্যা অতি রূপবতী হন॥
জ্যেষ্ঠা শ্রীমতী কনিষ্ঠা নারায়ণী।......
পিপ্পলী বংশোদ্ভব সেই বিপ্র ভাগ্যবান।
প্রভু বীরচন্দ্রে কন্যাদ্বয় কৈলা দান ॥

(২৬) নি. ব.—পৃ. ২৮-৩২; নি. বি.—পৃ. ২০-২৪ (২৭) নি. বি.—পৃ. ১৬-১৭; বৈ. দ. (পৃ. ১৭-১৮)-মতে ইনি কমলাকর-পিপিলাই (২৮) পৃ. ২৫৪

এই বর্ণনার সহিত 'ভক্তিরত্নাকরে'র বর্ণনার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।[২৯] তদনুযায়ী জানা যায় যে রাজবলহাটের নিকটবর্তী ঝামটপুর-গ্রামবাসী বিপ্র যদুনন্দন-আচার্যের পত্নীর নাম ছিল লক্ষ্মীদেবী। ব্রাহ্মণ-দম্পতীর দুইজন কন্যা ছিলেন—শ্রীমতী ও নারায়ণী। জাহ্নবার ইচ্ছাক্রমে যদুনন্দন দুই কন্যাকেই বীরচন্দ্রের হস্তে সম্প্রদান করিলে বীরচন্দ্র বিবাহান্তে যদুনন্দনকে দীক্ষাদান করেন এবং বধূদ্বয় জাহ্নবাকর্তৃক দীক্ষিত হইয়া খড়দহে আনীতা হন। 'ভক্তিরত্নাকর'-প্রণেতা 'চৈতন্যভাগবতা'দি-গ্রন্থের মত 'প্রেমবিলাসে'রও বহু ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধানের চেষ্টা করিয়াছেন। সেইদিক হইতে বিচার করিলে বীরচন্দ্র-বিবাহ সম্বন্ধে শেষোক্ত গ্রন্থ দুইটির বর্ণনাই গ্রহণীয় হইয়া উঠে। অন্য গ্রন্থের বর্ণনা স্পষ্টতই উদ্দেশ্যমূলক ও ভ্রমাত্মক। বিংশ শতাব্দীতে লিখিত 'বৈষ্ণবাচারদর্পণ'-গ্রন্থে দুই ভিন্ন বর্ণনার মধ্যে অদ্ভুতভাবে সামঞ্জস্য-বিধানের চেষ্টা করা হইয়াছে।[৩০]

বীরচন্দ্রের সন্তান-সন্ততি সম্বন্ধে কেবল এইটুকু জানিতে পারা যায় যে তাঁহার তিন-পুত্র এবং এক-কন্যা ছিলেন। পুত্রদিগের মধ্যে

> জ্যেষ্ঠ গোপীজনবল্লভ রামকৃষ্ণ মধ্যম।
> কনিষ্ঠ রামচন্দ্র সর্বাংশে উত্তম॥
> দুহিতার নাম হয় ভুবনমোহিনী।
> ফুলিয়ার মুখুটি পার্বতীনাথ যার স্বামী॥

চতুর্বিংশবিলাস[৩১]-প্রদত্ত এই সংবাদ ভক্তিরত্নাকর[৩২] ও -'বংশবিস্তার'[৩৩] কর্তৃক সমর্থিত হইয়াছে। পরবর্তী-গ্রন্থে কন্যাটিকে সর্বকনিষ্ঠা বলা হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার নাম প্রদত্ত হয় নাই। যাহাহউক, পুত্রদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ গোপীজনবল্লভই খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। 'প্রেমবিলাস-' এবং 'কর্ণানন্দ-' গ্রন্থের শ্রীনিবাস-শাখাবর্ণনায় যে-গোপীজনবল্লভের নাম পাওয়া যায়, সম্ভবত: তিনিই বীরচন্দ্র-পুত্র। কারণ 'ভক্তিরত্নাকরে'র[৩৪] গ্রন্থকার জানাইতেছেন যে তিনি তাঁহার 'শ্রীনিবাস-চরিত্র'-গ্রন্থে বীরভদ্র-প্রসঙ্গের বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীনিবাস ও বীরভদ্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধই বিশেষভাবে দ্যোতিত হয়। এই সম্বন্ধ যে অতি নিবিড় ছিল, পরবর্তী আলোচনায়, তাহা প্রতীয়মান হইবে। আবার 'প্রেমবিলাসে' দেখা যায়[৩৫] যে 'বীরচন্দ্র-প্রভুর পুত্র জগদ্দুর্লভ' জাহ্নবার সহিত খেতুরি-উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। এই জগদ্দুর্লভের নাম অন্য কোথাও নাই। অথচ জাহ্নবার সহিত বীরচন্দ্র-পুত্র গোপীজনবল্লভকেই

(২৯) ১৩।২৪৯-৬০ (৩০) পৃ. ১৭-১৮ (৩১) পৃ. ২৫৫ (৩২) ১৪।১৮৮-৮৯ (৩৩) পৃ. ২৩-২৪ (৩৪) ১৪।১৯৩ (৩৫) ১৯শ.বি., পৃ. ৩০৮

অন্যত্র ভ্রমণ-রত দেখা যায়।[৩৬] সুতরাং খুবসম্ভবত গোপীজনবল্লভই কোনও প্রকারে জগদ্দুর্লভে পরিণত হইয়া থাকিবেন। বীরচন্দ্রের অন্য দুই পুত্র সম্বন্ধে চতুর্বিংশবিলাসে কেবল এইটুকু বলা হইয়াছে [৩৭] যে কনিষ্ঠ রামচন্দ্র একবার তৎকালীন ব্রাহ্মণ-সমাজের পুনর্গঠক দেবীবর-ঘটকের সভায় উপস্থিত হইলে দেবীবর

তাহে হেরি বীরভদ্রে বটব্যাল কয়।
তে কারণে রামচন্দ্র বটব্যাল হয়॥
গোপীজনবল্লভ রামকৃষ্ণ প্রভু।
দেবীবরের সভায় তাঁর না আসিল কভু॥
তাঁহারা বংশজ রৈল বন্দ্যঘটী গাঞি।
বটব্যাল বাড়ুরী এই দুই পাই॥

তাহার পর,

নানা বাঁধা মুলুক জুড়ী বীরভদ্রী আদি দোষে।
ফুলিয়া মেলের সৃষ্টি দেবী করিলেন হেসে॥

এই দেবীবরের [৩৮] বিধান গ্রহণ করিয়া বীরভদ্র সম্বন্ধে গ্রন্থকার আরও জানাইতেছেন[৩৯] :

সন্ন্যাসীর সন্তানে বান্তাশী বলি কয়।
নিতাইর সন্তানেও এই দোষ আরোপয়॥
হাড়াই পণ্ডিত বংশজ সর্বলোকে জানে।
বন্দ্যঘটী গাঁই তাঁর জানে সর্বজনে॥
এই দোষদ্বয় 'বীরভদ্রী' নামে খ্যাত।
ঘটকেরা বীরভদ্রী দোষ বোলে অবিরত॥
নিত্যানন্দের কন্যা বিয়ে মাধব চট্ট করে।
বীরভদ্রের কন্যা পার্বতী মুখুটিরে বরে॥
তা সবার কুল রক্ষা করিবার তরে।
বীরভদ্রে বটব্যাল বোলে দেবীবরে॥

শেষোক্ত পঙ্‌ক্তিটি প্রণিধানযোগ্য। বীরভদ্র হইতেই যে একটি নূতন শ্রেণীর উৎপত্তি হইয়াছিল বৃন্দাবনদাসের নামে আরোপিত 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়'-গ্রন্থখানিতেও তাহার উল্লেখ আছে[৪০] :

(৩৬) পরবর্তী আলোচনা দ্রষ্টব্য (৩৭) পৃ. ২৫৬ (৩৮) ডা. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিতেছেন (বিবেকানন্দ —১৯শ. শতাব্দীর সামাজিক উত্তরাধিকার, ১ম. পরিচ্ছেদ—গ্রন্থখানি শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে) যে বিক্রমপুরের দেবীবর ঘটক ব্রাহ্মণ সমাজকে পুনর্গঠিত করেন। তিনি বিধান দেন, "সমদুষ্ট লোকেরা নিজেদের মধ্যে বিবাহাদির ব্যবস্থা করবে। এর নাম দেওয়া হল 'মেলবন্ধন'। এভাবেই রাঢ়ী ব্রাহ্মণদের ৩৬ টি 'মেল' তৈরী হল। বরেন্দ্র ব্রাহ্মণরাও কয়েকটি 'পটী'তে বিভক্ত হলেন। এই জাতিচ্যুতদের মধ্য থেকেই মুসলমান শাসকরা ধর্মান্তরিত করবার লোক পেতেন।" (৩৯) পৃ. ২৫৬ (৪০) পৃ. ১৪২

পাষণ্ড নাশক শ্রীবীরভদ্র ঠাকুর।
যাহা হইতে শ্রেণী হয় আমার প্রভুর ॥

'চতুর্বিংশবিলাস' অনুযায়ী দেবীবর শেষে বীরভদ্র কর্তৃক দীক্ষিত হইয়াছিলেন।[৪১]

বীরভদ্রের বংশবৃত্তান্ত সম্বন্ধে আধুনিক গ্রন্থকার-গণ কেহ কেহ আরও কিছু নূতন তথ্য পরিবেষণ করিয়াছেন[৪২]; কিন্তু তাঁহারা কোনও প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে ঐগুলি আহরণ করিয়াছেন কিনা, তাহা জানিবার উপায় নাই।

'-বংশমালা-' ও -'বংশবিস্তার'-গ্রন্থ মতে[৪৩] শ্রীনিবাস-পুত্র গতিগোবিন্দ বীরচন্দ্রের প্রসাদ-বলে জন্মলাভ করিয়াছিলেন। শ্রীনিবাসের দ্বিতীয়বার বিবাহের পরেই বীরভদ্রের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটিলে তিনি বীরভদ্রকে জানান ঃ

সেবা চালাইবেক সন্তান নাহি হয় ॥
এক খঞ্জ অন্ধ কিবা কুমার দেন মোরে।

'প্রেমবিলাস'-কারও বলেন[৪৪] যে বীরচন্দ্র বিষ্ণুপুরে রাজা-হাম্বীরের গৃহে আতিথ্য-গ্রহণকালে শ্রীনিবাস কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া তাঁহার গৃহে গিয়া পৌছান এবং শ্রীনিবাসের নব-পত্নীর স্বহস্ত-রন্ধনের আস্বাদ পাইতে ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলে শ্রীনিবাসের নবপরিণীতা-পত্নী পদ্মাবতী তাঁহাকে পরিতুষ্ট করেন। তারপর বীরচন্দ্রের প্রশ্নোত্তরে শ্রীনিবাস নিজেকে নিঃসন্তান বলিয়া জানাইয়াছিলেন। কিন্তু এইরূপ বর্ণনা সত্য নহে; শ্রীনিবাস তখন নিঃসন্তান ছিলেন না।[৪৫] যাহাহউক, 'প্রেমবিলাস'-মতে শ্রীনিবাস জানাইয়াছিলেন যে বীরভদ্র 'কৃপা' করিলেই তিনি পুত্রলাভ করিতে পারিবেন।

তোমার সিদ্ধ কলেবর প্রভুর নিজ শক্তি।
পঙ্গু কুব্জা এই গর্ভে জন্ময়ে সন্ততি ॥

(৪১) পৃ. ২৫৭ (৪২) বৈ. দি.-এর লেখক (পৃ. ১০৮) জানাইতেছেন ঃ নারায়ণীর গর্ভে একমাত্র পুত্র রামচন্দ্র গোস্বামী ও তিন কন্যা ভুবনমোহিনী, নবদুর্গা ও নবগৌরী জন্মগ্রহণ করেন। মাহেশের জগদানন্দ পিপিলাই অধিকারীর কন্যা কদম্বমালার সহিত রামচন্দ্রের বিবাহ হয় এবং বামদেব, কৃষ্ণদেব, বিষ্ণুদেব, রাধামাধব নামে চারিপুত্র ও ত্রিপুরাসুন্দরী নাম্নী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। কামদেব পণ্ডিত বংশীয় রামেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের সহিত ত্রিপুরাসুন্দরীর বিবাহ হয়। 'নিত্যানন্দবংশমালা'-গ্রন্থের সম্পাদক জানাইতেছেন (নি. ব.—পৃ. ১১১) :—

গোপীজনবল্লভ প্রভুর প্রথম নন্দন। শ্রীপাট নতাতে তেঁহ হইলেন স্থাপন ॥ মধ্যম নন্দন রামকৃষ্ণ তেজময়। মালদহ গাদিতে তিঁহ হইলেন উদয় ॥ কনিষ্ঠ নন্দন রামচন্দ্র মহাশয়। খড়দহ গাদিতে তাঁহার আশ্রয় ॥ গোপীজনবল্লভ প্রভুর প্রথম নন্দন। যাদবেন্দ্র নাম তাঁর অতি বিচক্ষণ ॥...অদ্যাবধি যাঁর কীর্তি নীলাচলে রয় ॥ (৪৩) নি. ব.—পৃ. ৩৫-৩৬; নি. বি.—পৃ. ৭৭ (৪৪) প্রে. বি.—১৭শ. বি., পৃ. ২৪৯-৫১ (৪৫) দ্র.—শ্রীনিবাস

তখন বীরচন্দ্র পদ্মাবতীর নাম পরিবর্তন করিয়া 'গৌরাঙ্গপ্রিয়া' রাখিলেন এবং তাঁহার হস্তে 'চর্বিত তাম্বূল' দিয়া 'স্বীয় শক্তি সঞ্চার' করিয়া দিলে দশমাস অন্তেই শ্রীনিবাস পুত্রলাভ করিলেন। পূর্বোক্ত গ্রন্থদ্বয়ে আরও লিখিত হইয়াছে যে শ্রীনিবাস-পুত্র-প্রাপ্তি সম্বন্ধে পরবর্তিকালে বীরচন্দ্র বলিয়াছেন :

তোমার পত্নীরে আন বিদ্যমান মোর ॥
তবে তার পত্নী আসি প্রণমিল মোরে।
চর্বিত তাম্বূল ধর বলিনু তাহারে ॥
তবে মহাভক্তি করি হস্ত যে পাতিল।
অধর তাম্বূল আনি তার হস্তে দিল ॥
কৃতার্থ করিয়া সেই খাইল ধরামৃত ॥
আমার প্রসাদে গর্ভ হইলা ত্বরিত ॥
তাহাতে জন্মিলা এই তাহার সন্তান।

কিন্তু এই সন্তানটি বক্রগতি হওয়ায় বীরচন্দ্রই তাঁহার নামকরণ করিলেন 'গোবিন্দ-গতি'।[৪৬] গোবিন্দ-গতির 'ত্রয়োদশ বর্ষে আচার্য (শ্রীনিবাস) গোসাঞি (বীরভদ্রকে) আনাইঞা' পুত্রকে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। কিন্তু এই বিবরণগুলির মধ্যে কতদূর সত্য নিহিত রহিয়াছে তাহা সঠিকভাবে জানিতে না পারা গেলেও একটি বিষয় সম্বন্ধে সন্দেহ থাকেনা যে বীরচন্দ্রের 'কৃপা'তেই গতি-গোবিন্দের জন্মলাভ ঘটিয়াছিল। 'অনুরাগবল্লীতে'ও লিখিত হইয়াছে[৪৭] :

তবে পুত্র শ্রীগোবিন্দগতি ঠাকুর জন্মিলা ॥
শ্রীবীরভদ্র গোসাঁইর বরে জন্ম হৈলা।

'-বংশবিস্তারে' বলা হইয়াছে[৪৮] যে গোবিন্দ-গতি রঘুনন্দন-ঠাকুরের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিতে চাহিলে রঘুনন্দন শূদ্র বলিয়া বীরচন্দ্র গোবিন্দ-গতিকে 'চাবুক মারিয়া' নিবৃত্ত করিয়াছিলেন। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে এই বীরচন্দ্রই একবার খেতুরিতে গিয়া শূদ্র নরোত্তমের 'কৃষ্ণদীক্ষায় দ্বিজত্বলাভে'র অধিকারকে সর্বসমক্ষে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।[৪৯] যাহাহউক, গ্রন্থকার আরও জানাইতেছেন যে গোবিন্দ-গতির পিতা শ্রীনিবাস-আচার্যও রঘুনন্দনের খুল্লতাত নরহরির নিকট একই কারণে দীক্ষাগ্রহণ করেন নাই।

শূদ্র স্থানে শিষ্য হবে ব্রাহ্মণ হইয়া।
শুনিয়া আমার মন গেল বিচলিয়া ॥

এই সমস্ত বিবরণ হইতে তৎকালীন বৈষ্ণব-সমাজের দৈন্যই বিশেষভাবে অনুমিত হয়।

---

(৪৬) দ্র.—শ্রীনিবাস ; এইস্থলে গতিগোবিন্দের বৃত্তান্ত বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। (৪৭) ৬ষ্ঠ. ম., পৃ. ৪৩ (৪৮) নি. বি.—পৃ. ৩৫-৩৬ ; নি. ব.—পৃ. ৭৭ (৪৯) প্রে. বি.—১৯·শ. বি., পৃ. ৩৩৯

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে বীরচন্দ্রের কর্মপদ্ধতি ও গতিবিধি সম্বন্ধে কোনও আনুক্রমিক বিবরণ পাওয়া যায় না। 'প্রেমবিলাসে'র চতুর্বিংশবিলাসে বর্ণিত হইয়াছে[৫০] যে দীক্ষা-গ্রহণের পর এবং পাণিগ্রহণের পূর্বেই বীরভদ্র ধর্মপ্রচারার্থ 'গৌড়ের পাৎসাহের দ্বারে' পৌঁছাইলে বাদশাহ্ তাঁহার ধর্মনাশ করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হন। তখন বীরভদ্রও জানাইলেন যে তিনি যবনগৃহে 'খানা' গ্রহণ করিবেন। তদনুযায়ী বাবুর্চিরা তাঁহার জন্য পর পর তিনবার 'খানা' আনিয়া আবরণ খুলিয়া দেখিলেন যে খাদ্য-সামগ্রী পুষ্পসম্ভারে পরিণত হইয়াছে। শেষে বাদশাহ্ বীরভদ্রের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়া বীরভদ্রেরই আকাঙ্ক্ষানুযায়ী তাঁহাকে স্বীয় 'বহু মূল্যের তেলুয়া পাথর'খানি দান করিলে তিনি তাহা খড়দহে আনিয়া তদ্দ্বারা শ্যামসুন্দর-মূর্তি নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

'-বংশমালা'- অনুযায়ী[৫১] এই ঘটনা কিন্তু আরও পরবর্তিকালের। গ্রন্থ-মতে বীরচন্দ্র গৌড়-গমনের পূর্বে পূর্ববংগে গিয়াছিলেন। যাত্রারম্ভে তিনি নর-যানে আরোহণ করিয়া জ্ঞানদাস কৃষ্ণদাস রামদাস নিত্যানন্দদাস ও রামাই প্রভৃতি বহু ভক্তকে সঙ্গে লইয়া ঢাকা-অভিমুখে রওনা হইলেন। সঙ্গে আরও চলিলেন নৃসিংহদাসের নেতৃত্বে নাড়াবৃন্দ। এই নাড়াবৃন্দ ছিলেন বীরচন্দ্রের বিভিন্ন অভিযানের প্রধান সহায়ক। '-বংশবিস্তারে' ইঁহাদের সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে[৫২]—

> বারশত নাড়া আর তেরশত নেড়ি।
> কেহ বহে গঙ্গাজল কেহ শোধে বাড়ি ॥
> বীর বীর করি নাড়া করে সিংহনাদে।
> কারে নাহি ভয় বীরচন্দ্রের প্রসাদে ॥
> হেন লীলা বীরচন্দ্রের ইচ্ছাতে হইল।
> মহাতেজ দেখি নাড়াগণে দণ্ড কৈল ॥
> নাড়ি সৃষ্টি করি নাড়ার তেজ-ক্ষয় কৈল।
> তথাপি নাড়ার তেজ ব্রহ্মাণ্ডে ভেদয় ॥

-বংশমালা'য় লিখিত হইয়াছে[৫৩] যে একদিন ক্ষুধার্ত নাড়াগণ দাপাদাপি করিয়া সমস্ত গৃহে বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি করিয়া চিৎকার করিতে লাগিলেন :

> ক্ষুধায় পোড়য়ে পেট রহিতে না পারি।
> জ্বলিল জ্বলিল বলি কহয়ে ফুকারি ॥
> এতেক কহিতে অগ্নি ঘরেতে জ্বলিল।

কিন্তু বীরচন্দ্র আসিয়া

> অমৃত নয়নে প্রভু চাহে কুতুহলে।
> তত্তক্ষণে অগ্নি সব নির্বাণ হইল ॥

(৫০) পৃ. ২৫৩ (৫১) পৃ. ৬০-৭২ (৫২) পৃ. ২৩ (৫৩) পৃ. ৩৩-৩৫

তখন বীরচন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া মুহূর্ত-মধ্যে ষোড়শী-যৌবনসম্পন্না 'তেরশত নাঢ়ী সৃষ্টি ইঙ্গিতে করিলা।'

এবং হাসি হাসি প্রভু সব নাড়া বোলাইল।
এক দুই করিয়া নাড়ারে গছাইল॥

কোন কোন 'বিবেকি' নাড়া প্রভুর কৃপায় দুই তিন মাস জলের মধ্যে ডুবিয়া শেষে মুক্তি পাইল।

বীরচন্দ্র এই সমস্ত নাড়াকে সঙ্গে লইয়া ঢাকায় গিয়া সে-দেশের যবন-অধিকারী ও তাঁহার কর্মচারী-বৃন্দ এবং আরও বহু লোকের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। কিন্তু নাড়াগণ মূত্রত্যাগ করিয়া যে ভাবে রাজধানী ও রাজান্তঃপুর পুড়িয়া ছারখার করিয়াছিলেন এবং সকলকে বশীভূত করিয়াছিলেন তাহার বর্ণনা কেবল অবিশ্বাস্য নহে, বীভৎসও। তাহার মধ্যে বিন্দুমাত্র সত্য থাকিলেও তাহা পরবর্তিকালের অভিশপ্ত বৈষ্ণব-সমাজের দৈন্যদশাকেই প্রকাশ করিয়া দেয়। কিন্তু এইভাবে 'বঙ্গদেশ দলনে'র পর বীরচন্দ্র প্রচুর ধনরত্নাদি লইয়া উত্তর-দেশে গৌড়েশ্বর রাজাধিকার মধ্যে গিয়া হাজির হইলেন এবং সেইস্থানে অলৌকিক কাণ্ড-প্রদর্শনে সকলকে মুগ্ধ করিয়া কেশব-ছত্রীর পুত্র দুর্লভ-ছত্রীর সাহায্যে মালদহ বিজয়ান্তে রাঢ়ে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

সম্ভবত উপরোক্ত নেড়া-নেড়ীর ব্যাপার লইয়াই জাহ্নবার দত্তক-পুত্র রামচন্দ্র ও বীরচন্দ্রের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। 'বংশীশিক্ষা'-মতে[৫৪] :

এথা খড়দহে প্রভু বীরচন্দ্র রায়।
নরনারী এক করি শ্রীকৃষ্ণ ভজায়॥
সেইকালে বীরচন্দ্র গোসাঞির সনে।
শ্রীরামের কোন্দল হয় ঐছে কারণে॥
প্রভু রাম কহিলেন শুনহ গোসাঞি।
নারীর স্বাতন্ত্র্য ধর্ম কোন শাস্ত্রে নাই॥

এই নাড়া-নেড়ীর দল বীরচন্দ্রের দেশবিদেশ-গমনের ব্যাপারে বিশেষ সহায়ক ছিলেন। তিনি বিদেশ-ভ্রমণাদির জন্য নানাবিধ সরঞ্জাম নির্মাণ করাইয়াছিলেন। 'শিবিকা' 'শিঙ্গা' 'খুন্তি' 'ঘণ্টা' 'পতাকা' প্রভৃতি সর্বদাই প্রস্তুত থাকিত। 'ফৌজদার', 'ছড়িদার', 'সিঙ্গাদার, কাহারি, বেগারী,' 'পাচক ব্রাহ্মণ' প্রভৃতিও নিযুক্ত থাকিত। তাঁহার পূর্ব- ও উত্তর-বংগ-ভ্রমণের সময় তিনি ঐ সকল দ্রব্য ও লোকজন সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। একবার রামচন্দ্র 'দ্বাদশগোপাল-স্থান মহান্ত নিবাস' দর্শন করিবার জন্য যাত্রা করিলে তিনি বীরচন্দ্রের নিকট

(৫৪) পৃ. ২১৬-১৭

হইতে ঐ সমস্ত সাহায্য লইয়াছিলেন[৫৫] কিন্তু নীলাচল হইতে ফিরিয়া উপরোক্ত দ্রব্যাদি প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত তাঁহার সোয়াস্তি ছিল না। নবদ্বীপে তাঁহার মাতা তাঁহাকে আর কিছুকাল তথায় অবস্থান করিবার জন্য অনুরোধ করিলে তিনি বলিলেন[৫৬] :

যত দেখ সরঞ্জাম সকলি তাঁহার।
তাঁরে সমর্পণ এবে করি পুনর্বার॥

বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকেও তিনি একই কথা বলিলেন[৫৭] :

বহুবিধ দ্রব্য সঙ্গে আছয়ে আমার।
বীরচন্দ্র প্রভু অগ্রে সঁপি পুনর্বার।

আবার তিনি খড়দহে পৌছাইলে[৫৮] :

বনমালী ফৌজদার যতেক সামগ্রী ;
আনিয়া প্রভুর আগে একে একে ধরি।
তালিকা করিয়া সব ভাণ্ডারে যোগায়।

এই সমস্ত হইতে বুঝিতে পারা যায় যে বীরচন্দ্র রীতিমত বিত্তবান ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন। এমনকি জাহ্নবাদেবীকেও পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁহার 'অনুমতি' ও মতাদি গ্রহণ করিতে হইত। একবার জাহ্নবা বীরচন্দ্রের 'অনুমতি' লইয়া স্বীয় দত্তক-পুত্র রামচন্দ্রসহ বৃন্দাবনে গমন করিয়াছিলেন।[৫৯] '-বংশবিস্তার' ও '-বংশমালা'-মতে[৬০] গোপীজনবল্লভও তাঁহাদের সহিত যাত্রা করিয়াছিলেন। পথিমধ্যে মঙ্গলকোটে চন্দ্র-মণ্ডলের গৃহে বেশ কিছুকাল অতিবাহিত হইবার পর বিদায়-গ্রহণকালে জাহ্নবাদেবী চন্দ্র-মণ্ডলের একান্ত অনুরোধে গোপীজনবল্লভকে রথে চড়াইয়া ভ্রমণ করাইবার অনুমতি দান করিলে তৃতীয় প্রহর বেলা পর্যন্ত রথ টানার পর 'রথ হৈতে পৃথিবী পরশ কৈল প্রভু।' তখন

মণ্ডল কহয়ে প্রভু দয়াময় তুমি।
যতেক আইলা চড়ি রথগম্য ভূমি॥
এই ভূমে হৈল তোমার অধিকার।
তীর্থক্ষেত্র হৈল মোর সত্তা নাহি আর॥
লতাতে বেষ্টিত তরু মনোহর স্থান।
শ্রীপাট করিয়া আখ্যা হৈল লতা ধাম॥

গোপীজনবল্লভকে বৃন্দাবন-যাত্রা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে হইল। 'মুরলীবিলাস-' ও 'বংশাশিক্ষা'-মতে জাহ্নবাদেবী সেইবার বৃন্দাবনে গিয়া দেহরক্ষা করেন[৬১] এবং রামচন্দ্র

(৫৫) মু. বি.—পৃ. ১৫৩ ; ব. শি.—পৃ. ২১৭ (৫৬) মু. বি.—পৃ. ২১৬ (৫৭) মু. বি.—পৃ. ২২০ (৫৮) মু. বি.—পৃ. ২৪৫ (৫৯) নি. বি.—পৃ. ২৫ ; মু. বি.—পৃ. ২৫২-৫৩ ; ব. শি.—পৃ. ২১৮ (৬০) পৃ. ২৫-৩২ ; নি. ব.—পৃ. ৪৭ (৬১) দ্র.—জাহ্নবাদেবী

খড়দহে সংবাদ প্রেরণ করিয়া বেশ কিছুকাল তথায় অতিবাহিত করেন। কিন্তু শেষে গৌড়ে ফিরিয়া তিনি কণ্টকনগর অতিক্রম করিয়া 'অম্বিকার পশ্চিমেতে দুই ক্রোশ পরে' 'নদীর দক্ষিণ তীরে' গভীর জঙ্গল কাটাইয়া তথায় বাঘ্নাপাড়া নামক পাটের পত্তন করেন।[৬২] মন্দির বিগ্রহ লোকালয় প্রভৃতির দ্বারা বাঘ্নাপাড়া ক্রমে শ্রী-মণ্ডিত হইয়া উঠিলে তখন রামদাস নামক এক সাধু খড়দহে বীরচন্দ্রকে সেই সংবাদ দান করেন এবং বীরচন্দ্র বাঘ্নাপাড়ার[৬৩] প্রতিষ্ঠাতার নাম না জানিয়াই ক্রোধোন্মত্ত হইয়া নাড়াগণকে তথায় পাঠাইয়া দেন।[৬৪] 'বারশত নাড়া' পৌষ মাসের দ্বিতীয়-প্রহর রাত্রিতে বাঘ্নাপাড়ায় পৌছাইয়া বীরচন্দ্রের আদেশানুযায়ী রামচন্দ্রকে তদ্দণ্ডেই 'ইলসা মৎস্য' ও 'আম্র ব্যঞ্জন' আনিয়া দিতে বলিলেন। কিন্তু রামচন্দ্র বকুল বৃক্ষ হইতে আম্র সংগ্রহ করিয়া রন্ধন করিয়া দিলে নাড়াবৃন্দ রামচন্দ্রের মাহাত্ম্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং খড়দহে গিয়া সকল বার্তা জানাইলে বীরচন্দ্র বাঘ্নাপাড়ায় ছুটিয়া আসিলেন। রামচন্দ্রের সহিত তখন তাঁহার মিলন ঘটিল এবং বীরচন্দ্রের উপদেশ ও সাহচর্যে রামচন্দ্র নানাবিধ উৎসবাদি সম্পন্ন করিলেন। তদবধি বীরচন্দ্র খড়দহ হইতে বাঘ্নাপাড়ায় যাতায়াত করিতে লাগিলেন।

কিন্তু এই সকল ঘটনার কতটুকু অংশ যে সত্যসম্বন্ধযুক্ত, তাহা নির্ণয় করা কঠিন হইলেও এইটুকু বুঝিতে পারা যায় যে বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া রামচন্দ্রের পক্ষে আর খড়দহে যাওয়া সম্ভবপর ছিল না এবং তাঁহার বাঘ্নাপাড়া-প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে বীরচন্দ্র প্রথমে বাধাসৃষ্টি করিলেও শেষে যে-কোন কারণেই হউক না কেন, তাঁহাকে রামচন্দ্রের সহিত পুনর্মিলিত হইতে হইয়াছিল।

'-বংশবিস্তার'-মতে[৬৫] বীরচন্দ্র একবার একচাকাতে মহামহোৎসব করিয়া তথায় বীরচন্দ্র-পুর নামক গ্রামের প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর তিনি অশ্বপৃষ্ঠে ভ্রমণ করিতে করিতে বহুপথ অতিক্রম করিয়া গেলে গোবিন্দ-গতির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটে এবং তিনি তাঁহাকে রঘুনন্দনের নিকট দীক্ষাগ্রহণে নিবৃত্ত করেন। তারপর তিনি পথিমধ্যে পরমেশ্বরদাস-মল্লিকের গৃহে নানাভাবে সেবিত ও ষোড়শোপচারে পূজিত হইয়া গতি-গোবিন্দের অনুরোধ-ক্রমে তাঁহার গৃহে চরণধূলি দান করেন। এই স্থানেও তাঁহার ষোড়শোপচার পূজানুষ্ঠান হইল এবং তাহার পর তিনি দেশাধিপতি বীর-হাম্বীরের গৃহে গিয়া আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। রাজগৃহে মহামহোৎসব স্বনুষ্ঠিত হইল এবং বীরচন্দ্র নানাভাবে লীলা করিতে লাগিলেন।[৬৬]

(৬২) মু. বি.—পৃ. ৩৪৬-৬৬ ; ব. শি.—পৃ. ২২১-২৫ (৬৩) "বনে ব্যাঘ্রের বড় উপদ্রব ছিল বলিয়া গ্রামের নাম হইল ব্যাঘ্রনাদাশ্রম ; তাহার অপভ্রংশ বাঘ্নাপাড়া।"—বাঘনাপাড়ার ইতিকথা, শ্রীবলাই দেবশর্মা (ভারতবর্ষ, ভাদ্র, ১৩২৪) (৬৪) মু. বি.—পৃ. ৩৬৫-৭৪ ; ব. শি.—পৃ. ২২৪-৩৩ (৬৫) পৃ. ৩৪ (৬৬) নি. বি.—পৃ. ৪১-৪৩ ; নি. ব.—পৃ. ৯০-৯১

তদাজ্ঞায় বিষ্ণুপুরে গুপ্ত-বৃন্দাবনও স্থাপিত হইল। গোবিন্দ-গতির নামে প্রচলিত 'বীররত্নাবলী'-গ্রন্থে সেই সমূহ বৃত্তান্ত এবং হাম্বীর ও বীরচন্দ্রের প্রসঙ্গ বিশেষভাবেই বর্ণিত হইয়াছে।[৬৭] গ্রন্থকার বলেন যে 'বীর হাম্বীর' এবং 'বিষ্ণুপুর' এই দুইটি নামই বীরচন্দ্র-কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল এবং বীরচন্দ্র এই সময়ে নাড়াবৃন্দসহ চেকুড়ভা গ্রামে গিয়া হরিদাস নামক এক অন্ধ ব্যক্তিকেও দৃষ্টিদান করিয়াছিলেন। '-বংশবিস্তার'-মতে[৬৮] বীরচন্দ্র বিষ্ণুপুর হইতে ঝাড়িখণ্ড পথে গয়া-কাশীপুর-প্রয়াগ হইয়া বৃন্দাবন গমন করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনে জীব ও মুখ্য-হরিদাসাদির সহিত তাঁহার বিশেষ প্রণয় ঘটিয়াছিল।

কিন্তু বীরচন্দ্রের এই বৃন্দাবন-গমনের কাল নির্ণয় করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। 'প্রেমবিলাসে'ও এই বৃন্দাবন-গমনের বর্ণনা আছে।[৬৯] তদনুযায়ী জানা যায় যে বীরচন্দ্র একবার নীলাচলে জগন্নাথ-দর্শন করিতে গিয়া প্রত্যাবর্তন-পথে গোপীবল্লভপুরে শ্যামানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসেন। ইহার কিছুকাল পরে তিনি খড়দহ হইতে যাত্রা করিয়া অম্বিকা-শান্তিপুর-নবদ্বীপ-যাজিগ্রাম-কাটোয়া-বুধরি ও খেতুরি হইয়া বৃন্দাবনে গমন করিয়াছিলেন। নদীয়া-শ্রীখণ্ড-যাজিগ্রাম-কণ্টকনগর ও বুধরি হইয়া বীরচন্দ্রের খেতুরি-গমনের কথা 'নরোত্তম-বিলাসে'ও বর্ণিত হইয়াছে।[৭০] সেইবার তিনি যাজিগ্রামে পৌছাইলে পত্নীদ্বয়সহ শ্রীনিবাস ও তাঁহাদের পুত্রকন্যা সকলে একত্রিত হইয়া বীরচন্দ্রের সেবা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে গতি-গোবিন্দও বর্তমান ছিলেন। বীরচন্দ্রের সহিত 'প্রভুনিত্যানন্দ দত্ত গোবর্ধন শিলা'ও বিশেষভাবে সেবিত হইয়াছিল। তারপর বীরচন্দ্র শ্রীনিবাসের সহিত কণ্টকনগর ও বুধরি হইয়া খেতুরিতে আসিলে সেইস্থলে তিনি নরোত্তম-সন্তোষ-রামচন্দ্রকবিরাজ-হরিরাম-রামকৃষ্ণ-গঙ্গানারায়ণ-গোবিন্দচক্রবর্তী-গোবিন্দকবিরাজ-গোকুলদাস-দেবীদাস-রূপঘটক ও শ্যামদাস প্রভৃতি ভক্তের দ্বারা বিশেষভাবে সংবর্ধিত হইয়াছিলেন এবং নরোত্তমাদি সকলের সহিত অপূর্ব নৃত্যকীর্তন করিয়াছিলেন। কিন্তু এই ভক্তবৃন্দের সমাবেশ দেখিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে ইহা খেতুরি-উৎসবের পরবর্তী ঘটনা।[৭১] যাজিগ্রামে গতি-গোবিন্দের উপস্থিতি হইতে সেই সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া যায়। কিন্তু ইহা বীরচন্দ্রের প্রথমবার খেতুরি-আগমন কিনা বলা যায় না। অবশ্য নরোত্তমের সহিত ইতিপূর্বে তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল। নরোত্তম খেতুরি-উৎসবের পূর্বেই নীলাচল-গমনের প্রাক্কালে খড়দহে গিয়া বীরচন্দ্রাদির সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।[৭২] কিন্তু তাহার কিছুকাল পরেই খেতুরিতে যে মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল বীরচন্দ্র

(৬৭) পৃ. ১-৫ (৬৮) নি. বি.—পৃ. ৪৪-৫০ ; নি. ব.—পৃ. ৯৯-১০৪ (৬৯) ১৯শ. বি., পৃ. ৩৪২-৪৪ (৭০) ১১শ. বি. পৃ. ১৬৮-৭৮ (৭১) দ্র.—নরোত্তম (৭২) ন. বি.—৩য়. বি., পৃ. ৪৩ ; ভ. র.—৮।২১০

তাহাতে যোগদান করিতে পারেন নাই। 'প্রেমবিলাস'-গ্রন্থে[৭৩] যদিও সেই উৎসবের বর্ণনায় তাঁহার নাম একবার কি দুইবার দৃষ্ট হয়, কিন্তু সেইরূপ বিখ্যাত মহোৎসবে বীরচন্দ্রের মত ব্যক্তির নামমাত্র উল্লেখ হইতে তাঁহায় উপস্থিতির প্রমাণ হয় না। 'ভক্তি-রত্নাকর' ও 'নরোত্তমবিলাসে'র বিবরণ কিন্তু এই বিষয়ে আমাদিগের সংশয় দূরীভূত করিয়া দেয়। যদিও 'ভক্তিরত্নাকর' হইতে জানা যায় যে গদাধরদাসপ্রভু ও নরহরি-সরকার ঠাকুর, এই উভয়ের তিরোধানতিথি-মহামহোৎসবেই বীরচন্দ্র উপস্থিত থাকিয়া বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন[৭৪] এবং 'প্রেমবিলাস'-কারও বলেন[৭৫] যে বীরচন্দ্র 'শ্রীখণ্ডেতে নরহরির অন্ত্যেষ্টি মহোৎসবে' যোগদান করিয়া রামাই নামক এক বেদনার্ত অন্ধ-ব্যক্তিকে স্পর্শ করিয়া তাঁহার চক্ষুদান[৭৬] করিয়াছিলেন তবুও নরহরি-চক্রবর্তী তাঁহার উপরোক্ত গ্রন্থদ্বয়ে স্পষ্টভাবেই জানাইতেছেন[৭৭] যে খেতুরির মহামহোৎসবে যোগদান করিতে যাইবার পূর্বে জাহ্নবাদেবী

গঙ্গা বীরচন্দ্রে স্থির করিলা যতনে ॥

এবং অতি যত্নে গঙ্গা বীরভদ্রে প্রবোধিয়া।

খড়দহ হৈতে চলে প্রভু সোঙরিয়া।

এবং উৎসবান্তে জাহ্নবাদেবী খড়দহে প্রত্যাবর্তন করিলে[৭৮]

গঙ্গা বীরচন্দ্র অতি উল্লসিত মনে।

প্রণামিলা শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী চরণে ॥

'প্রেমবিলাস' -মতে[৭৯] আর একবার খেতুরি-উৎসব উপলক্ষে এক মহাসভার অধিবেশন হইলে বীরচন্দ্র তথায় উপস্থিত হইয়া তীব্র বিতর্কের দ্বারা বৈষ্ণব-ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও শূদ্র-নরোত্তমের 'কৃষ্ণদীক্ষায় দ্বিজত্বলাভে'র অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই সভায় তিনি নরোত্তম-শিষ্য রূপনারায়ণকেও 'গোস্বামী'-আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। বর্ণনা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে বীরচন্দ্রের খেতুরিতে উপস্থিতির এই সংবাদটি মিথ্যা না হওয়াই সম্ভব। ইহার পরেই কিন্তু 'প্রেমবিলাস'-কার বীরচন্দ্রের নীলাচল-গমন ও তাহার পরে খেতুরি হইয়া বৃন্দাবন-গমনের কথা বলিতেছেন। সুতরাং 'প্রেমবিলাস'ানুযায়ী এই বৃন্দাবন-গমনও যে খেতুরির মহামহোৎসবের অনেক পরবর্তী ঘটনা সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। কিন্তু বৃন্দাবন-গমনোদ্দেশ্যে বীরচন্দ্রের এই খেতুরি-আগমন এবং পূর্বোক্ত 'নরোত্তমবিলাসে' বর্ণিত বীরচন্দ্রের খেতুরি-আগমন, একই ঘটনা কিনা তাহা বলা শক্ত

---

(৭৩) ১৯শ. বি., পৃ. ৩১৪, ৩২০ (৭৪) ৯।৩৭৭, ৪৫৩; ৯।৫৩২, ৫৯৬, ৬১৫ (৭৫) ১৯শ. বি., পৃ. ৩৪২ (৭৬) চেকুড়ভার অন্ধ-হরিদাসকে দৃষ্টিদানের কথা পূর্বেই লিখিত হইয়াছে। (৭৭) ন. বি.—৬ষ্ঠ. বি., পৃ. ৮১ (৭৮) ভ. র.—১১।৭৮২ (৭৯) ১৯শ. বি., পৃ. ৩৪০—৪২

হইয়া উঠে। তবে 'ভক্তিরত্নাকর' হইতে জানা যায়[৮০] যে তিনি সম্ভবত এইবারেই খেতুরি হইতেই বৃন্দাবনে গমন করেন। জাহ্নবাদেবীও খেতুরি-মহামহোৎসবে যোগদান করিবার পর এই স্থান হইতেই বৃন্দাবন-যাত্রা করিয়াছিলেন। 'নরোত্তমবিলাস' হইতে জানা যায় যে গোবিন্দাদি ভক্ত বুধরি হইতে পদ্মাপার হইয়া খেতুরিতে পৌঁছাইলে জাহ্নবার যাত্রা আরম্ভ হয়। অথচ নরহরি-চক্রবর্তী 'ভক্তিরত্নাকরে'র বীরচন্দ্রের খেতুরি হইতে বৃন্দাবন-যাত্রার কথা উল্লেখ করিয়াও 'নরোত্তমবিলাসে' জানাইতেছেন যে বীরভদ্র খেতুরি হইতে যাত্রারম্ভ করিয়া পদ্মাপারে বুধরিতে গিয়া পৌঁছান। আবার দুইটি গ্রন্থ হইতেই জানা যায় যে বৃন্দাবন-প্রত্যাগত জাহ্নবা প্রথমে খেতুরি ও তাহার পরে পদ্মাপার হইয়া বুধরিতে গমন করেন। সুতরাং বীরভদ্র খেতুরি হইতে যে কোথায় গিয়াছিলেন তাহা ঠিক ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না। 'নরোত্তমবিলাসে'র উক্তস্থলে লিখিত হইয়াছে[৮১] যে যাত্রার পূর্বে বীরচন্দ্র একচক্রা হইয়া খড়দহে প্রত্যাবর্তন করিবার কথাই শ্রীনিবাসকে জানাইয়াছিলেন। কিন্তু 'প্রেমবিলাস'-কার বলিতেছিলেন[৮২] যে বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার সময়ই বীরচন্দ্র একচক্রা ও তাহারপরে খেতুরি-যাজিগ্রাম-শ্রীখণ্ড হইয়া খড়দহে ফিরিয়া যান। আবার '-বংশবিস্তারে' দেখিয়াছি যে বীরচন্দ্র একচাকায় 'বীরচন্দ্রপুর' প্রতিষ্ঠা করিয়া বিষ্ণুপুর হইয়া বৃন্দাবনে গমন করেন এবং তাঁহার বিষ্ণুপুর-গমনকালে গোবিন্দ-গতি তথায় উপস্থিত ছিলেন। অথচ 'নরোত্তমবিলাসে' দেখা যায় যে বীরচন্দ্রের খেতুরি-গমনকালে গতি-গোবিন্দ যাজিগ্রামেই রহিয়াছেন। সুতরাং এই উভয়-গমনের মধ্যে যে কাল-বিভিন্নতা রহিয়াছে তাহাই ধরিয়া লইতে হয়। এই সকল কারণে বীরচন্দ্রের বৃন্দাবন-গমনকাল সম্বন্ধে সঠিক করিয়া কিছুই বলা যায় না। কেবল এই-টুকুই বলিতে পারা যায় যে খেতুরির মহামহোৎসবের পরেই তিনি একাধিক বার খেতুরিতে এবং অন্তত একবার একচক্রায় ও দুইবার বিষ্ণুপুরে এবং একবার বৃন্দাবনে গমন করিয়াছিলেন।

'ভক্তিরত্নাকর' হইতে জানা যায়[৮৩] যে বীরচন্দ্র বৃন্দাবনে গিয়া শ্রীজীব, ভূগর্ভ, কৃষ্ণদাস-কবিরাজ, 'গোবিন্দের অধিকারী' অনন্ত-আচার্য এবং 'তাঁর শিষ্য পণ্ডিত হরিদাস গোসাঞি', গদাধর-শিষ্য কৃষ্ণদাস-ব্রহ্মচারী, গোপালদাস-গোসাঁই, মধু-পণ্ডিত, ও তাঁহার সতীর্থ ভবানন্দ, হরিদাস, শ্রীকৃষ্ণ-পণ্ডিত, 'কাশীশ্বর-গোসাঞির শিষ্য গোবিন্দ-গোসাঞি আর যাদবাচার্য' এবং বাসুদেব, উদ্ধব প্রভৃতি ভক্তবৃন্দের সাক্ষাৎলাভ করিতে পারিয়াছিলেন। গ্রন্থকার বলেন যে তিনি খড়দহে প্রত্যাবর্তনের পর বোরাকুলি-মহা-

(৮০) ১৩।২৯৮-৩০১ (৮১) ১১শ. বি., পৃ. ১৭৬ (৮২) ১৯শ. বি., পৃ. ৩৪৩-৪৪ (৮৩) ১৩।৩১১-২৯

মহোৎসবে গিয়াও বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।[৮৪] 'বংশীশিক্ষা'-গ্রন্থেও জাহ্নবার এবং রামচন্দ্র সহ বীরচন্দ্রের বোরাকুলি-উৎসবে যোগদানের কথা উল্লেখিত, হইয়াছে।[৮৫] আবার 'রসিকমঙ্গল'-গ্রন্থে বলা হইয়াছে[৮৬] যে উৎকলের ধারেন্দা-বাহাদুরপুরে 'মহারাস-যাত্রা'-কালে শ্যামানন্দ কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া 'নিত্যানন্দ-পুত্র পৌত্র' সকলেই হৃদয়ানন্দের সহিত তথায় গমন করিয়া উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

'কীর্তনগীতরত্নাবলী'তে 'বীরচন্দ্র'-ভণিতার একটি বাংলা পদ পাওয়া যায়।[৮৭] আলোচ্যমান বীরচন্দ্র তাহার রচয়িতা কিনা জানা যায় না।

নিত্যানন্দদাস জানাইতেছেন[৮৮] যে তিনি জাহ্নবা-বীরচন্দ্রের আজ্ঞাতেই তাঁহার 'প্রেম-বিলাস' গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছিলেন।

'নরোত্তমবিলাসে'র 'গ্রন্থকর্তার পরিচয়' নামক পরিচ্ছেদে লিখিত হইয়াছে[৮৯] যে গোপীজনবল্লভের তিন জন পুত্র ছিলেন—জ্যেষ্ঠ রামনারায়ণ, মধ্যম রামলক্ষ্মণ ও কনিষ্ঠ রাম-গোবিন্দ। রামলক্ষ্মণের শিষ্য লক্ষ্মণ দাস।

(৮৪) ১৪।৯৬, ১২৯ (৮৫) পৃ. ২১৭ (৮৬) দ্র.—শ্যামানন্দ (৮৭) HBL—p. 412 (৮৮) প্রে. ৭ম. বি., পৃ. ৮৬-৮৭ ; ৯ম. বি., পৃ. ৯৫ ; ১২শ. বি., পৃ. ১৩৪ (৮৯) পৃ. ২০৮

পরমেশ্বরদাস

পরমেশ্বরদাস ছিলেন নিত্যানন্দ-শিষ্যবৃন্দের অন্যতম।[১] মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে নীলাচল ত্যাগ করিয়া গৌড়ে যাইতে আদেশ দিলে নিত্যানন্দের পূর্ব-সঙ্গী[২] পরমেশ্বরদাসও তৎসহ গৌড়ে আসিয়া[৩] তাঁহার একজন প্রধান সঙ্গী-হিসাবে অবস্থান করিতে থাকেন। প্রথমে তিনি পাণিহাটী-খড়দহ অঞ্চলেই বাস করেন। মহাপ্রভু কানাইর-নাটশালা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া পাণিহাটীর রাঘব-পণ্ডিতের গৃহে পৌঁছাইলে পরমেশ্বরদাস তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।[৪] তাহারও পরে পাণিহাটীতে রঘুনাথদাসের চিড়াদধি-মহোৎসবকালেও তিনি সেই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন।[৫] সম্ভবত তৎকালে তিনি নিত্যানন্দ সহ নীলাচলে যাতায়াত করিতেন।[৬]

নরহরি-চক্রবর্তী কোথাও কোথাও পরমেশ্বরদাসকে পরমেশ্বরীদাস নামে অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থানুযায়ী জানা যায়[৭] যে নিত্যানন্দের তিরোভাবের পর শ্রীনিবাস ও নরোত্তম যথাক্রমে বৃন্দাবন- ও নীলাচল-যাত্রার প্রাক্কালে খড়দহে জাহ্নবাদেবীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে পরমেশ্বরদাস তাঁহাদিগকে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন। তারপর পরমেশ্বরদাস জাহ্নবার সহিত খেতুরি-মহামহোৎসবে যোগদান করিয়া তৎসহ বৃন্দাবনে গমন করেন। এই সকল যাত্রাপথে[৮] তিনি ছিলেন জাহ্নবার প্রধান সঙ্গী ও প্রবীণ তত্ত্বাবধায়ক। যাত্রাকালে তিনি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি গুছাইয়া সাজাইয়া লইতেন। যাহাতে পথিমধ্যে অসুবিধায় পড়িতে না হয়, তজ্জন্য তিনি সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া রাখিতেন এবং জাহ্নবাও তাঁহার মর্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতেন। বৃন্দাবনে পৌঁছাইলে তিনিই বৃন্দাবন-ভক্ত ও গোস্বামীদিগের সহিত জাহ্নবার পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন এবং গোস্বামী-বৃন্দের নিকট গোবিন্দ-কবিরাজের প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন।

(১) চৈ. ভা.—৩।৬, পৃ. ৩১৬ ; চৈ. চ.—১।১১, পৃ. ৫৫ ; চৈ. ম. (জ.)—উ. খ., পৃ. ১৫১ (২) চৈ. ম. (জ.)— স. খ., পৃ. ৯০ (৩) চৈ. ভা.—৩।৫,পৃ. ৩০৩ (৪) ঐ—৩।৫, পৃ. ২৯৯ ; চৈ. ম. (জ)—বি. খ., পৃ. :৪৩-৪৫ (৫) চৈ.চ.—৩।৬ (৬) মু. বি.—পৃ. ১৬৮- ৬৯ (৭) ভ. র.—৪।৮২-৮৬ ; ৮।২১৯ ; ১০।৩৭৬, ৭৪৫ ; ১১।১০১, ১১৪, ১৪৫, ৩৬৭, ৪০২, ৭০৫, ৭৪৭ ; ন. বি.—৬ষ্ঠ. বি., পৃ. ৮০ ; ৮ম. বি. পৃ, ১০৭, ১১৮ ; ৯ম. বি., পৃ. `৩০, ১৩৭ (৮) ব. শি. (পৃ. ২১৮) ও মু. বি. (পৃ. ১৫৮–৭৮,২৩৩, ২৪০–৪১)-মতে জাহ্নবা তাঁহার দত্তকপুত্র রামচন্দ্র সহ বৃন্দাবনে যাত্রাকালেও এই 'সুপ্রবীণ ভক্তকে তত্ত্বাবধায়ক-রূপে লইয়া গেলে তিনি সুপরিচালক হিসাবে যোগ্য নেতৃত্ব প্রদান করেন।

আবার বৃন্দাবন হইতে খেতুরিতে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁহাদের বিদায়কালে রাজাসন্তোষ-দত্ত তাঁহার হস্তেই জাহ্নবাদেবীর জন্য নানাবিধ দ্রব্য অর্পণ করিয়াছিলেন। তারপর জাহ্নবা বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করিয়া খড়দহে পৌছাইলে পরমেশ্বরও তাঁহার সহিত চলিয়া আসেন।

কিছুকাল পরে জাহ্নবাদেবী রাধিকা-বিগ্রহ নির্মাণ করাইয়া বৃন্দাবনে প্রেরণ করেন।[৯] তিনি পরমেশ্বরের উপরই এই বিষয়ে বিশেষ ভার অর্পণ করিলে পরমেশ্বর অন্যান্য ভক্তসহ কণ্টকনগর হইতে নৌকাযোগে যাত্রা আরম্ভ করিয়া বৃন্দাবনে গমন করেন। তারপর সেইস্থানে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করিয়া তিনি খড়দহে প্রত্যাবর্তন করিলে জাহ্নবা তাঁহাকে 'তড়া-আটপুর গ্রামে' গিয়া রাধাগোপীনাথ-বিগ্রহের সেবা-প্রকাশের আজ্ঞা দান করেন। তদনুযায়ী পরমেশ্বর তড়া-আটপুরে বিগ্রহ-প্রকাশ করিলে জাহ্নবাদেবী তথায় উপস্থিত হইয়া সর্বকার্য সমাধান করিয়া আসেন। পরমেশ্বর সম্ভবত তখন হইতেই তড়া-আটপুরে বাস[১০] করিয়া তথায় শেষ-জীবন অতিবাহিত করেন। 'পাটপর্যটন' অনুযায়ী[১১] সাচড়াতেও 'পরমেশ্বরদাসের বসতি' ছিল। আবার ৪০০ চৈতন্যাব্দের 'সজ্জনতোষণী'-পত্রিকার 'শ্রীপরমেশ্বরীদাস' নামক একটি প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে যে বৈদ্য-পরমেশ্বরীদাসের পূর্ব-নিবাস ছিল কেতুগ্রামে (কাউগ্রাম), নিত্যানন্দের শিষ্যত্ব-গ্রহণের পর তিনি খড়দহে বাস করিতে থাকেন এবং জাহ্নবা-আদেশে তড়া-আটপুরে গিয়া বসতি-স্থাপনের পূর্বে তিনি কিছুকাল গরলগাছা গ্রামেও বাস করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সকল বিবরণ কোথা হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে প্রবন্ধকার তাহার উল্লেখ করেন নাই।

'নিত্যানন্দপ্রভুর বংশবিস্তারে' লিখিত হইয়াছে[১২] যে ভ্রমণরত বীরচন্দ্র খঞ্জ-গতি-গোবিন্দের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিবার পূর্বে পরমেশ্বরদাস-মল্লিকের গৃহে গিয়া সবংশে পরমেশ্বরকে অনুগৃহীত করিয়াছিলেন। এই পরমেশ্বরদাস-মল্লিকের উল্লেখ কিন্তু অন্য কোথাও নাই।

বৈষ্ণব-সমাজে পরমেশ্বরদাস দ্বাদশ-গোপালের অন্যতম বলিয়া স্বীকৃত। তিনি একজন যথার্থ ভক্ত ছিলেন। জয়ানন্দ বলেন[১৩] যে তাঁহার গলদেশে গুঞ্জামালা থাকিত। সম্ভবত কোনও মৃতকল্প শৃগালের পরিচর্যা করিয়া তাহাকে জীবন-দান করায় সেই ঘটনাকে তাঁহার ভক্তিভাবের নিদর্শন মনে করিয়া কয়েকজন গ্রন্থকার জানাইতেছেন[১৪] যে তিনি

(৯) ভ. র.—১৩।৭১, ৮৪, ৯৫, ১০০, ১০৫, ১১৩, ২২৫-৪৭ (১০) ব. শি.—পৃ. ৮১ (১১) পৃ. ১০৮ (১২) পৃ. ৩৭ (১৩) চৈ, ম. (জ.)—পৃ. ১৪৩ (১৪) চৈ. চন্দ্র.—পৃ. ১৫৫ ; বৈ.ব. (বৃ.)—পৃ. ৫ ; অ. নী.—পৃ. ৮১ ; ব্র.—প. ক. (প.)—পৃ. ১৪৯

বন্য-শৃগালকেও কৃষ্ণনামের দ্বারা বশীভূত করিয়াছিলেন। পরমেশ্বরদাসের অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে অন্যান্য প্রবাদও প্রচলিত আছে।

পরমেশ্বর-ভণিতার যে ব্রজবুলি পদটি 'পদকল্পতরু'তে উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা এবং 'পরমেশ্বরী'-ভণিতার যে দুইটি পদ 'গৌরপদতরঙ্গিণী'তে উদ্ধৃত হইয়াছে সেইগুলি আলোচ্য পরমেশ্বরদাসেরই রচিত।[১৫]

(১৫) HBL—p.90

নিত্যানন্দদাস

'প্রেমবিলাস'-রচয়িতা, নিত্যানন্দদাসের পূর্ব নাম ছিল বলরামদাস। 'প্রেমবিলাস'-গ্রন্থের বিংশবিলাসের শেষাংশে কবি যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন, তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে নিত্যানন্দ-পত্নী জাহ্নবা-ঈশ্বরী বলরামের দীক্ষাগুরু ও নিত্যানন্দ-পুত্র বীরচন্দ্র তাঁহার শিক্ষাগুরু ছিলেন। কবির বর্ণনা অনুযায়ী বলরামের মাতার নাম সৌদামিনী, পিতার নাম আত্মারামদাস এবং তাঁহার 'অম্বষ্ঠ কুলেতে জন্ম শ্রীখণ্ডেতে বাস।' 'গৌরপদতরঙ্গিণী'তে আত্মারামদাসের দুইটি পদ আছে। জগদ্বন্ধু ভদ্র লিখিয়াছেন[১] যে উহাদের রচয়িতা মহাপ্রভুর সমসাময়িক শ্রীখণ্ডনিবাসী সৌদামিনী-পতি অম্বষ্ঠ-কুলোদ্ভব আত্মারামদাস, সতীশচন্দ্র রায় 'পদকল্পতরু'র পরিশিষ্টে আত্মারামের চারিটি পদের পরিচয় দিয়া শ্রীখণ্ডে আদৌ কোনও আত্মারামদাস ছিলেন কিনা, সে সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু আলোচ্যমান কবি বলরাম- বা নিত্যানন্দ-দাসের পিতার নাম ছাড়া অন্য কোনও আত্মারামের সম্বন্ধে কোনও তথ্য না থাকায় নিত্যানন্দদাসের পিতাকে পদকর্তা বলিয়া ধরিয়া লইতে বাধা থাকেনা। বিশেষ করিয়া এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ প্রমাণ নাই। চৈতন্যোত্তর কালের শ্রীনিবাস-শিষ্য আত্মারামদাস কবি ছিলেন না বলিয়া ডা. সুকুমার সেন অনুমান করেন।[২] তবে 'পদকল্পতরু'র উক্ত চারিটি পদের মধ্যে ২২০৪-সংখ্যক পদটি যে দ্বিজ-গঙ্গারামের ভণিতায় 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি'র মধ্যে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়া এবং আরও অন্য প্রমাণ দেখাইয়া ডা. সেন অনুমান করেন যে তাহা আত্মারামের নহে। যাহাহউক, একমাত্র পুত্র-সন্তানকে পশ্চাতে রাখিয়া যখন বলরামদাসের পিতামাতা উভয়েই স্বর্গারোহণ করেন, তখন অনাথ বালক একদিন স্বপ্নদর্শন করিয়া খড়দহে জাহ্নবাদেবীর নিকট হাজির হন এবং তাঁহার নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিয়া 'নিত্যানন্দ-দাস'-নাম প্রাপ্ত হন।

নিত্যানন্দের প্রাচীন শিষ্যবৃন্দের বর্ণনা প্রসঙ্গে 'চৈতন্যভাগবত'- জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল'- 'চৈতন্যচরিতামৃত'- ও দেবকীনন্দনের 'বৈষ্ণববন্দনা'-গ্রন্থে একবার, করিয়া একজন বলরামদাসের নাম উল্লেখিত হইয়াছে।[৩] জাহ্নবাদেবী যে সেই বলরামদাসের দীক্ষাগুরু এবং বীরচন্দ্র যে তাঁহার শিক্ষাগুরু হইতেই পারেন না, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং সেই বলরাম ভিন্ন ব্যক্তি। তিনি নিত্যানন্দ-শিষ্য ছিলেন। 'চৈতন্যচরিতামৃত'-কার

---

(১) প. ক. (প.)—পৃ. ২২. (২) HBL—p.92 (৩) চৈ. ভা.—৩।৬, পৃ. ৩১৬ ; চৈ. ম. (জ.)—উ. খ., পৃ. ১৫১ ; চৈ. চ.—১।১১, পৃ. ৫৬

তাঁহাকে 'কৃষ্ণপ্রেমরসাস্বাদী' এবং 'নিত্যানন্দনামে অধিক উন্মাদী' বলিয়াছেন এবং দেবকীনন্দন তাঁহাকেই 'সঙ্গীতকারক' ও 'নিত্যানন্দচন্দ্রে যার অধিক বিশ্বাস' বলিয়া বর্ণিত করিয়াছেন।[৪] নরহরি-চক্রবর্তীর গ্রন্থ হইতে জানা যায়[৫] যে একজন বলরামদাস নিত্যানন্দেরই প্রাচীন শিষ্যবৃন্দসহ গদাধরদাসের তিরোধানতিথি-মহামহোৎসব এবং খেতুরির মহামহোৎসবে যোগদান করিবার পর জাহ্নবাদেবীর সহিত বৃন্দাবন-পরিক্রমা শেষ করিয়া গৌড়মণ্ডলে ফিরিয়া একচক্রা পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। এই নিত্যানন্দ-শিষ্য বলরাম যে পূর্বোক্ত নিত্যানন্দ-শিষ্য বলরাম, তাহাতে সন্দেহ থাকে না। দেবকীনন্দনের উল্লেখ হইতে ইহাও বুঝা যাইতেছে যে তিনি সংগীতকারকও ছিলেন। সুতরাং তিনিই যে পদকর্তা বিখ্যাত বলরামদাস হইবেন, তাহাতেও সন্দেহ করিবার কারণ থাকে না। অবশ্য 'প্রেমবিলাস'-রচয়িতার পক্ষে, 'নিত্যানন্দদাস'—এই নাম গ্রহণের পূর্বে বলরামদাস নামে কবিতা রচনা করিবার, কিংবা রামচন্দ্র-কবিরাজের শিষ্য বলরাম-কবিপতির পক্ষেও এই নামে পদরচনা করিবার ক্ষীণ সম্ভাবনা থাকিতে পারে এবং হয়ত বা তাঁহারা কিছু কিছু কবিত্বশক্তির পরিচয়ও প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু বলরামদাসের নামে বাংলা ও ব্রজবুলি পদের যে বৃহৎ পদসংগ্রহ রহিয়াছে, তাহার অধিকাংশ যে উপরোক্ত নিত্যানন্দ-শিষ্যের, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। মৃণালকান্তি ঘোষ 'গৌরপদ-তরঙ্গিণী'র ভূমিকায় বহুবিধ তথ্যসহ এই কথাই বিশেষ যুক্তিসহকারে প্রমাণ করিয়াছেন। 'History of Brajabuli Literature'-গ্রন্থে ডা. সুকুমার সেনও একই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তিনি 'বলরামদাসের পদাবলী' নামক গ্রন্থের ভূমিকায় ('বৈষ্ণব-পদাবলী ও বলরামদাস' নামক প্রবন্ধে) ইহার সম্বন্ধেই জানাইয়াছেন, "কথিত আছে যে ইনি নিত্যানন্দ-প্রভুর অনুমতি নিয়ে নিজের আবাস দোগাছিয়া গ্রামে (কৃষ্ণনগরের কাছে) গোপাল-মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন ইনি ব্রাহ্মণ ছিলেন, কারো কারো মতে ইনি ছিলেন বৈদ্য। শেষের মতই ঠিক বলে মনে হয়।" 'ভাবামৃতমঙ্গল'-গ্রন্থে[৬] এই বলরামকেই 'দ্বিজ-বলরাম দোগাছিয়াবাসী' বলা হইয়াছে। এই বলরামদাস 'প্রেমবিলাস'-রচয়িতা জাহ্নবা-শিষ্য বলরাম হইলে খুব সম্ভবত নিত্যানন্দদাস নামেই বর্ণিত হইতেন। নরহরির 'ভক্তিরত্নাকর' বা 'নরোত্তমবিলাসে'র বিভিন্ন-বর্ণনা, এবং বিশেষ করিয়া বিভিন্ন অনুষ্ঠান-বর্ণনা প্রসঙ্গে ভক্তবৃন্দের তালিকা পাঠ করিয়া এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে না যে গ্রন্থকার 'প্রেমবিলাসে'র সহিত বিশেষভাবেই পরিচিত ছিলেন। অথচ

(৪) বৈ. ব. (দে.)—পৃ. ৫ (৫) ভ. র.—৯।৩৯৮; ১০।৩৭৬, ৭৪৪ ; ১১।৪০০ ; ন. বি.—৬ষ্ঠ. বি., পৃ. ৮০ ; ৮ম. বি., পৃ. ১০৭, ১১৮ (৬) গৌ. ত. (প. প.)—পৃ. ২০৫

অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় এই যে নরহরি 'প্রেমবিলাসে'র নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করেন নাই। বৈষ্ণব-জীবনী গ্রন্থের মধ্যে যদুনন্দনদাসের 'কর্ণানন্দ'ও একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ এবং সেই গ্রন্থেও গ্রন্থকার 'প্রেমবিলাস'-রচয়িতা নিত্যানন্দদাসের নাম কয়েকবারই উল্লেখ করিয়াছেন।[৭] কিন্তু নরহরির উপরোক্ত গ্রন্থদ্বয়ে 'প্রেমবিলাস' বা 'কর্ণানন্দ' কোন গ্রন্থেরই উল্লেখ নাই। অথচ গ্রন্থকার আরও অনেক পরবর্তিকালে লিখিত 'অনুরাগবল্লী'র উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি অবশ্য সেইস্থলে 'অনুরাগবল্লী আদি গ্রন্থে'র কথা বলিয়াছেন[৮] এবং এই 'আদি' কথাটির দ্বারা 'প্রেমবিলাসা'দির ইঙ্গিত থাকিতেও পারে। সুতরাং 'নরোত্তমবিলাসে'র নরোত্তম-শাখা মধ্যে একজন নিত্যানন্দদাসের নাম ছাড়া আর কোথাও কোন নিত্যানন্দদাসের উল্লেখ না থাকায় নরহরি-বর্ণিত বলরামদাসকে নিত্যানন্দ-শিষ্য বলরাম বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু নিত্যানন্দদাস সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য তদ্বর্ণিত 'প্রেমবিলাস' হইতে সংগ্রহ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। একমাত্র 'নিত্যানন্দপ্রভুর বংশমালা'য় বলা হইয়াছে[৯] যে নিত্যানন্দদাস বীরচন্দ্রের সহিত বঙ্গ-গৌড়াদি পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন।

'প্রেমবিলাস' হইতে জানা যায়[১০] যে গ্রন্থকার নিত্যানন্দদাস স্বীয়-ভ্রাতা রামচন্দ্রদাসকে সঙ্গে লইয়া জাহ্নবার সহিত বৃন্দাবন গমন করিয়াছিলেন এবং তথা হইতে প্রত্যাবর্তনের পর শ্রীখণ্ডে পৌঁছাইলে জাহ্নবা তাঁহাকে গৃহ-গমনের আজ্ঞা-দান করেন। তৎপূর্বে

এইদিন আজ্ঞা মোরে করে ঠাকুরাণী।
বিবাহ না কর বাপু মোর আজ্ঞা মানি॥

সম্ভবত নিত্যানন্দদাস সেই আজ্ঞা পালন করিয়াছিলেন। কিন্তু যাহাহউক, জাহ্নবাদেবী খড়দহ চলিয়া যাইবার পরে শ্রীনিবাস-আচার্য শ্রীখণ্ডে পৌঁছাইলে নিত্যানন্দদাস বালক শ্রীনিবাস-আচার্যের সাক্ষাৎলাভ করিয়াছিলেন। পরে শ্রীনিবাস যখন প্রথমবার বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনের পর শ্রীখণ্ডে রঘুনন্দনের সহিত সাক্ষাৎ করেন তখনও লেখক রঘুনন্দনের নিকট উপস্থিত ছিলেন। গ্রন্থকারের বিবরণ হইতে ইহাও মনে হয় যে তিনি খেতুরি-উৎসবের পরেও জাহ্নবার সহিত পুনরায় বৃন্দাবনে গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু গ্রন্থমধ্যে জাহ্নবাদেবী কিংবা শ্রীনিবাস-আচার্যের বৃন্দাবন-গমনাগমন ও সমসাময়িক ঘটনাবলীর অকপট অথচ অসামঞ্জস্যপূর্ণ উল্লেখ গ্রন্থের বক্তব্য-বিষয়কে এতই জটিল ও কণ্টকাকীর্ণ করিয়া তুলিয়াছে[১১] যে একদিকে যেমন তাহা কোনও

(৭) ৬ষ্ঠ. নি., পৃ. ১১৬ ; ৭ম. নি., পৃ. ১২৩, ১২৭ (৮) ভ. র.—১৩।২৮১-৮২ (৯) পৃ. ৬০ (১০) ৭ম. বি., পৃ. ৮৬ ; ১৪শ. বি., পৃ. ১৮৭, ১৯৮ ; ১৬শ. বি., পৃ. ২২৩-৩৫ ; ১৯শ. বি., পৃ. ৩১৭-১৮
(১১) দ্র.—শ্রীনিবাস

প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ বলিয়া গ্রহণ করা শক্ত হইয়া দাঁড়ায়, অন্যদিকে তেমনি তাহাকে নিত্যানন্দদাসের নামে অন্য কোনও কবি বা লেখকের স্বীয় মতবাদ চালাইয়া দেওয়ার চেষ্টা বলিয়া ধরিয়া লওয়া অযৌক্তিক হইয়া উঠে। কেবল ইহাই মনে হয় যে হৃতপত্র পুথিগুলির অসতর্ক ব্যবহার ও পত্রগুলির যথেচ্ছ পুনঃ-সংস্থাপন, এবং বিভিন্ন লিপিকর কর্তৃক তাহাদিগকে পূর্ণত্ব দান করিবার নিরঙ্কুশ প্রচেষ্টাই হয়ত গ্রন্থখানিকে একটি অদ্ভুত বস্তুতে পরিণত করিয়া থাকিবে। তবে একটি বিষয় কিন্তু স্পষ্ট হইয়া উঠে যে গ্রন্থকার তাঁহার দীক্ষাগুরু জাহ্নবার সহিত বৃন্দাবনাদি পরিদর্শন করিয়াছিলেন, এবং তিনি ছিলেন তৎকালীন নানাবিধ উল্লেখযোগ্য ঘটনার প্রত্যক্ষদ্রষ্টা। গ্রন্থকার আরও জানান[১২] যে তিনি গঙ্গা-পতি মাধব-আচার্যের নিকট বাদ্যশিক্ষা করিয়াছিলেন এবং মহাপণ্ডিত রূপনারায়ণের নিকট যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া 'যোগগুরু করি আমি তাহারে মানিল।'

গ্রন্থকার পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করিয়াছেন[১৩] যে তিনি জাহ্নবা-বীরচন্দ্রের আদেশে তাঁহাদিগেরই পদ-শরণ করিয়া গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং স্বীয় অভিজ্ঞতা ছাড়াও জাহ্নবা নরসিংহ প্রভৃতি গুরু ও অন্যান্য বৈষ্ণবভক্তের নিকট তিনি তাঁহার গ্রন্থরচনার মালমশলা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। আর একটি বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে গ্রন্থকার তাঁহার গ্রন্থমধ্যে বাসুদেব-ঘোষ, বৃন্দাবনদাস, লোচনদাস, কবিকর্ণপূর ও কৃষ্ণদাস-কবিরাজ প্রভৃতি পূর্বসূরী-বৃন্দের বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন।[১৪] তিনি আরও জানাইয়াছেন[১৫] যে 'প্রেমবিলাস' রচনা করিবার পূর্বেই তিনি 'বীরচন্দ্রচরিত' রচনা করিয়াছিলেন।

মুর্শিদাবাদ রাধারমণ-যন্ত্র হইতে প্রকাশিত 'প্রেমবিলাস' গ্রন্থখানি বিংশবিলাসে সম্পূর্ণ। কিন্তু 'বাবু যশোদালাল তালুকদার দ্বারা প্রকাশিত' গ্রন্থখানি 'সার্ধ চতুর্বিংশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ।' বাবু-যশোদালালের প্রকাশিত গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিত হইয়াছে যে মূল-পুথিগুলির কোনটি সপ্তদশ-বিলাসের কিয়দংশসহ ও কোনটি বিংশ-বিলাসের অধিকাংশসহ ও কোনটি বিংশ-বিলাস পর্যন্ত অথচ সার্ধচতুর্বিংশ-বিলাসেই পূর্ণত্ব প্রাপ্তির সংবাদ-সংবলিত, কোনটি আবার দ্বাবিংশ-বিলাসে ও কোন কোন পুথি সার্ধচতুর্বিংশ-বিলাসে সম্পূর্ণ ছিল। এমতাবস্থায় রাধারমণ-যন্ত্রে প্রকাশিত গ্রন্থখানি একরকম প্রথমেই ছাপা হইয়াছিল, বা ঐ সময়ে মাত্র বিংশ-বিলাস পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া যে 'প্রেমবিলাস'-গ্রন্থখানি বিংশ-বিলাসেই সম্পূর্ণ এবং সতর-, কুড়ি-, বাইস- অথবা সাড়ে-চব্বিশ-বিলাসে পূর্ণ নহে, একথা

(১২) প্রে. বি.—১৯ শ. বি., পৃ. ৩২০, ৩২৪, ৩৩১ (১৩) ঐ—৩য়. বি., পৃ. ২৩ ; ৮ম. বি., পৃ. ৮৮ ; ৯ম. বি., পৃ. ৯৫ ; ১৩শ বি., পৃ. ১৬১, ১৬৮–৬৯, ১৭২ ; ১৪শ. বি., পৃ. ১৯৯ ; ১৫শ. বি., পৃ. ২১৬–১৭; ১৮শ. বি., পৃ. ২৭১–৭৩, ২৭৫ ; ১৯শ. বি., পৃ. ৩০৯, ৩১৫, ৩১৭, ৩২০, ৩২৪, ৩৪১–৪৫ ; ২৩শ. বি., পৃ. ২২৪ (১৪) ঐ (১৫) ঐ—১৯শ. বি., পৃ. ৩৩৬, ৩৪১–৪৪ ; ২৪শ. বি., পৃ. ২৫৪

জোর করিয়া বলা চলে না। 'প্রেমবিলাসে'র বিংশ-বিলাস পর্যন্ত স্বীকৃতি প্রাপ্ত হইলে পরবর্তী বিলাসগুলির অস্বীকৃতি অসমীচীন ও অযৌক্তিক। শেষোক্ত বিলাসগুলির বহুবিধ তথ্য বিরুদ্ধবাদী কর্তৃকও গৃহীত হইয়া থাকে এবং এই বিলাসগুলি লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়োজন, ও তৎপ্রদত্ত বিবরণ সম্বন্ধে স্বয়ং কবি যে-সমূহ কৈফিয়ত প্রদান করিয়াছেন তাহা, এবং তাহার ঘটনা-বিন্যাস-রীত্যাদি তাঁহার আ-বিংশবিলাস গ্রন্থের রীত্যাদির সহিত সম্পূর্ণভাবে সুসমঞ্জস[১৬]। এ সম্বন্ধে অন্তত এইটুকু বলা চলে যে বিংশ-বিলাস পর্যন্ত বর্ণিত সমস্ত-ঘটনাকেই যেমন যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করা অসমীচীন, তৎপরবর্তী বিলাসগুলির বর্ণিত সমস্ত-ঘটনাকেই তেমনি অযথার্থ বা অসত্য বলিয়া বর্জন করাও অসংগত। এ প্রসঙ্গে দীনেশ চন্দ্র সেন জানাইতেছেন[১৭]: **Whether these supplementary chapters fromed a part of the original work is doubtful. But this does not altogether prove the untrustworthiness of the accounts given in them. Some of those are certainly well established historical facts.** জে. সি. ঘোষ মহাশয় এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন[১৮]: **Inspite of being spurious in parts this book is indispensable for the history of Vaisnavism.**

'প্রেমবিলাসে'র চতুর্বিংশবিলাস-মধ্যে 'চৈতন্যভাগবত' এবং 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র রচনা-সমাপ্তির তারিখ প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থকার সেইসঙ্গে আরও জানাইয়াছেন[১৯]:

পনর শত বাইশ যখন শকাব্দের আসিল।
ফাল্গুন মাস আসিয়া উপস্থিত হৈল॥
কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথি মনের উল্লাস।
পূর্ণ করিল গ্রন্থ শ্রীপ্রেমবিলাস॥

ডা. সুকুমার সেন জানাইয়াছেন,[২০] "এই নিত্যানন্দদাসের রচিত কয়েকটি পদ 'কৃষ্ণপদামৃতসিন্ধু'তে পাওয়া গিয়াছে।" আধুনিক 'বৈষ্ণবদিগ্‌দর্শনী'র গ্রন্থকার বলিতেছেন[২১] যে নিত্যানন্দদাস 'গৌরাঙ্গাষ্টক', 'রসকল্পসার', 'কৃষ্ণলীলামৃত' ও 'হাটবন্দনা' নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

(১৬) ঐ—১৫শ. বি., পৃ. ২১৬-১৭; ২৩শ. বি., পৃ. ২২৪, ২৪শ. বি., পৃ. ২৪২, ২৪৪, ২৫৪; দ্র.—শ্রীনিবাস (১৭) Chaitanya and His Companions—pp. 221, 222 (১৮) Bengali Literature—p. 58 (১৯) প্রে. বি.—২৪শ. বি., পৃ. ৩০১ (২০) বা. সা. ই. (১ম. সং.)—পৃ. ২৫০ (২১) পৃ. ৮৪

জ্ঞানদাস

'চৈতন্যচরিতামৃতে'র নিত্যানন্দ-শাখা বর্ণনায় জ্ঞানদাসের উল্লেখ আছে। 'ভক্তিরত্নাকরে' লিখিত হইয়াছে[১] :

রাঢ়দেশে কাঁদরা নামেতে গ্রাম হয়।
তথা শ্রীমঙ্গল জ্ঞানদাসের আলয়॥

এই গ্রন্থানুযায়ী[২] সম্ভবত নিত্যানন্দের সপ্তগ্রাম-বিহারকালে 'জ্ঞানদাস নিশি দিশি নিতাইর গুণ গায়।' আবার 'ভক্তিরত্নাকর' ও 'নরোত্তমবিলাস' হইতে জানা যায়[৩] যে জ্ঞানদাস গদাধরদাসের তিরোধানতিথি-মহামহোৎসবে এবং খেতুরির মহামহোৎসবে যোগদান করিবার পর জাহ্নবা-ঠাকুরাণীর সহিত বৃন্দাবন-গমন করিয়াছিলেন। '-বংশবিস্তার-' ও '-বংশমালা'-গ্রন্থ মতে[৪] একবার জাহ্নবাদেবীর বৃন্দাবন-যাত্রাকালে তিনি তাঁহার সঙ্গী হইয়াছিলেন। গ্রন্থকার বলেন যে তিনি বীরচন্দ্রের সহিত ঢাকা প্রভৃতি স্থানেও গমন করিয়াছিলেন। 'গৌরপদতরঙ্গিণী'তে উদ্ধৃত নরহরিদাসের একটি পদেই জ্ঞানদাস সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য তথ্য প্রদত্ত হইয়াছে।[৫] পদটি নিম্নে প্রদত্ত হইল :

শ্রীবীরভূমেতে ধাম কাঁদড়া মাঁদড়া গ্রাম
তথায় জন্মিলা জ্ঞানদাস।
আকুমার বৈরাগোতে রত বাল্যকাল হৈতে
দীক্ষা লৈলা জাহ্নবার পাশ॥
অদ্যাপি কাঁদড়া গ্রামে জ্ঞানদাস কবি নামে
পূর্ণিমায় হয় মহা মেলা।
তিনদিন মহোৎসব আসেন মহান্ত সব
হয় তাহাদের লীলাখেলা॥
মদন মঙ্গল নাম রূপে গুণে অনুপাম
আর এক উপাধি মনোহর।
খেতুরির মহোৎসবে জ্ঞানদাস গেলা যবে
বাবা আউল ছিল সহচর॥
কবিকুলে যেন রবি চণ্ডীদাস তুল্য কবি
জ্ঞানদাস বিদিত ভুবনে।
যার পদ সুধারস হেন অমৃতের ধার
নরহরি দাস ইহা ভণে॥

(১) ১৪।১৮০ (২) ১২।৩৭৪৯ (৩) ভ. র.—৯।৪০১ ; ১০।৩৭৪, ৭৪৬ ; ন. বি.—৬ষ্ঠ. বি., পৃ. ৭৯ ; ৮ম. বি., পৃ. ১০৭, ১১৮ (৪) বং. বি.—পৃ. ২৯ ; বং. ম.—পৃ. ৬০ (৫) পৃ. ৩১৩

জ্ঞানদাস ছিলেন বাংলা ও ব্রজবুলি ভাষার একজন শ্রেষ্ঠ কবি। কিন্তু প্রাচীন গ্রন্থগুলি হইতে তাঁহার সম্বন্ধে এতদ্‌তিরিক্ত আর কিছুই জানা যায় নাই। আধুনিক গ্রন্থকার-গণ অবশ্য তাঁহার সম্বন্ধে নানা কথা বলিয়াছেন :—

দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন,[৬] "ব্রাহ্মণ বংশে ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে জ্ঞানদাস জন্মগ্রহণ করেন।" তিনি কোথা হইতে এই তথ্য সংগ্রহ করিলেন বলা যায় না। আবার সুশীল কুমার চক্রবর্তীর 'বৈষ্ণব সাহিত্য'-গ্রন্থে (পৃ. ৩০৪) লিখিত হইয়াছে যে জ্ঞানদাস 'দার পরিগ্রহ করেন নাই।' কিন্তু 'বীরভূম বিবরণে'র মধ্যে (৩য়. খণ্ড) লিখিত হইয়াছে, "কাঁদরায় প্রবাদ আছে তিনি বিবাহিত ছিলেন এবং তাঁহার দুইটি পুত্র হইয়াছিল।" গ্রন্থানুযায়ী জানা যায়[৭] যে কাঁদরা-গ্রামে আগত ইষ্টচিন্তারত বীরভদ্র-প্রভুর ধ্যানের ব্যাঘাত সৃষ্টি করায় ঐ দুই-পুত্রকে অকাল-মৃত্যু বরণ করিতে হয়। 'জ্ঞানদাসের পদাবলীর ভূমিকায় হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয় জানাইতেছেন, "কান্দরায় জ্ঞানদাসের মঠ অন্যতম দ্রষ্টব্য স্থান। এই মঠে (আখড়ায়) জ্ঞানদাসের পূজিত শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ যুগল-বিগ্রহ আজিও পূজাপ্রাপ্ত হইতেছেন।"

'বৈষ্ণবদিগ্দর্শনী'-কার বলেন,[৮] "বর্ধমানে··· মনোহরসাহী পরগণা মধ্যস্থ বড় কাঁদরা বা রামজীবনপুর গ্রামে গৃহী বৈষ্ণব বংশে শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা পদকর্তা জ্ঞানদাস জন্মগ্রহণ করেন।······প্রসিদ্ধ মনোহরসাহী কীর্তনের সৃষ্টি এই গ্রামেই হইয়াছিল।"

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় লিখিয়াছেন,[৯] "কথিত আছে শ্রীনিবাস আচার্য মনোহরসাহী ও রেনেটি সুরের সৃষ্টিকর্তা।" হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও পূর্বোক্ত ভূমিকার মধ্যে এই সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "প্রাচীন কীর্তনীয়াগণের মুখে শুনিয়াছি, জ্ঞানদাস কাঁন্দরার শ্যামকিশোর পুত্র বদন, শ্রীখণ্ডের শ্রীরঘুনন্দন-ঠাকুর এবং ময়নাডালের নৃসিংহ মিত্র ঠাকুরের সহায়তায় রাঢ়ের পুরাতন কীর্তন-ধারাকে খেতরীর গড়েরহাটী ধারা হইতে স্বাতন্ত্র্যদানে মনোহরসাহী নামে প্রচলিত করিয়াছিলেন।"

(৬) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—পৃ. ২৮৯ (৭) পৃ. ১৬১ (৮) পৃ. ৭৩ (৯) কীর্তন—পৃ. ৩২

মাধবাচার্য

নিত্যানন্দ-বসুধার একমাত্র কন্যা ছিলেন গঙ্গাদেবী। সম্ভবত তিনি বীরভদ্রের কনিষ্ঠা ছিলেন।[১] কিন্তু এই বিষয়ে নিঃসংশয় হওয়া যায় না। এই গঙ্গাদেবীর সহিত মাধবাচার্যের শুভপরিণয় ঘটে। 'প্রেমবিলাসে'র শেষ বিলাসগুলি হইতে[২] মাধবাচার্য সম্বন্ধে নিম্নোক্ত তথ্যগুলি সংগৃহীত হইতে পারে :

কাটোয়ার নিকট নন্যাপুর গ্রামে বিশ্বেশ্বর-আচার্য ও ভগীরথ-আচার্য বাস করিতেন। তাঁহারা কাশ্যপ-গোত্রীয় ছিলেন। তাঁহাদের যথাক্রমে 'মৈত্র গাঁই' ও 'চট্ট গাঁই' ছিল। তাঁহাদের মধ্যে যথেষ্ট সখ্য থাকায় বিশ্বেশ্বর-পত্নী মহালক্ষ্মী এবং ভগীরথ-পত্নী জয়দুর্গার মধ্যেও 'গাঢ়তর প্রীতি' বিদ্যমান ছিল। কিন্তু মহালক্ষ্মী একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিবার অল্পকাল পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত্যুকালে তিনি সেই সন্তানটিকে জয়দুর্গার হস্তে সমর্পণ করিয়া গেলে জয়দুর্গা তদবধি তাঁহাকে শ্রীনাথ ও শ্রীপতি নামক স্বীয় পুত্রদ্বয়ের সহিত পালন করিতে থাকেন। পালিত-সন্তানের নাম রাখা হইল মাধব। কিছুকাল পরে বিশ্বেশ্বরও চিরতরে কাশীবাসী হইতে চাহিয়া স্বীয় পুত্রকে ভগীরথের হস্তে সমর্পণ করিয়া গেলেন।

মাধব পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়া 'আচার্য'-উপাধি প্রাপ্ত হন। ভক্তিধর্মের প্রতি বিশেষ অনুরাগ থাকায় তিনি সহজেই নিত্যানন্দের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। নিত্যানন্দও তাহার হস্তেই স্বীয় কন্যা গঙ্গাদেবীকে সমর্পণ করেন। এই বিবাহ লইয়া অবশ্য নানাবিধ অঘটন ঘটিয়াছিল। প্রথমত, সন্ন্যাসীর কন্যার সহিত বিবাহ অবিধেয়। বিশেষ করিয়া গুরুকন্যার সহিত বিবাহ তো একেবারে শাস্ত্রবিরুদ্ধ ব্যাপার। তাছাড়াও মাধব ছিলেন বারেন্দ্র-শ্রেণীর ব্রাহ্মণ এবং নিত্যানন্দ রাঢ়ী-শ্রেণীভুক্ত। কিন্তু নিত্যানন্দের ইচ্ছায় সমস্তই সিদ্ধ হইয়া যায়। তবে ইহা লইয়া দেশময় একটি বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হওয়ায় মাধব প্রথমে একাকী নন্যাপুরে গিয়াই বাস করিতে থাকেন। তারপর তিনি জিরেট-বলাগড় ও কাটোয়া প্রভৃতি স্থানে বাস করিতে আরম্ভ করেন। মধ্যে মধ্যে তিনি খড়দহে গিয়াও পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিতেন। গঙ্গাদেবী কিন্তু বরাবর খড়দহেই অবস্থান করিতেছিলেন।[৩] পরবর্তিকালে সম্ভবত মাধবাচার্য এবং গঙ্গাদেবী জিরাটেই স্থায়ী বাস

---

(১) দ্র.—বীরচন্দ্র (২) ২১শ. বি., পৃ.২১৩-১৪ ; ২৪শ. বি., পৃ. ২৫১-৫২ ; ১৯শ. বি., পৃ. ৩১৯-২০ (৩) ব. শি.- ও মু. বি.-মতে বংশী-পৌত্র রামচন্দ্রের প্রথম খড়দহ আগমন কাল হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার চিরতরে সেই স্থান ত্যাগ করা পর্যন্ত গঙ্গাদেবী খড়দহে বাস করিয়াছিলেন।

স্থাপন করেন। তবে 'পাটপর্যটন' ও 'পাটনির্ণয়' গ্রন্থগুলিতে জিরাটেই মাধবাচার্য এবং গঙ্গাদেবী উভয়ের পাট নির্ণীত হইয়াছে।[৪]

মাধবাচার্য সম্ভবত গদাধরদাসপ্রভুর তিরোধানতিথি-মহামহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।[৫] তাহার পর তিনি জাহ্নবার সহিত যাত্রা করিয়া খেতুরির মহামহোৎসবে একটি বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন।[৬] তৎকালে গঙ্গাদেবী কিন্তু খড়দহতেই অবস্থান করিতেছিলেন। খেতুরি-উৎসবান্তে মাধবাচার্য জাহ্নবার একজন প্রধান সঙ্গী-হিসাবে যাত্রা করিয়া তাঁহার সহিত বৃন্দাবন পরিভ্রমণ করেন[৭] বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনের পথেও তিনি তাঁহার সহিত খেতুরি একচক্রা প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করেন। তাহার পর জাহ্নবা খড়দহে আসিয়া গঙ্গা বীরচন্দ্র প্রভৃতির সহিত মিলিত হন।

'প্রেমবিলাস'-মতে[৮] খেতুরিতে উৎসব-উপলক্ষে একবার এক মহাসভার অধিবেশন বসিলে মাধবাচার্য ও গঙ্গাদেবী প্রভৃতি উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই গ্রন্থ হইতে আরও জানা যায়[৯] যে মাধবাচার্য 'গানবাদ্যে' যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন এবং স্বয়ং গ্রন্থকারও তাঁহার নিকট 'বাদ্যশিক্ষা' করিয়াছিলেন। 'জগদীশচরিত' নামক গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে[১০] যে মাধব ও গঙ্গার পুত্র গোপালবল্লভের সহিত জগদীশ-পণ্ডিতের কন্যার শুভ পরিণয় ঘটে।

'চৈতন্যচরিতামৃতে'র নিত্যানন্দশাখা-বর্ণনার মধ্যে বীরচন্দ্রের নামোল্লেখ থাকিলেও সেইস্থলে জাহ্নবা কিংবা গঙ্গাদেবীর নাম নাই। 'মুরলীবিলাস'-মতে[১১] জাহ্নবাদেবীর তিনটি শ্রেষ্ঠ শাখার মধ্যে একটি হইতেছে গঙ্গাদেবীর শাখা।

(৪) পা. প.—পৃ. ১১১ ; পা. নি. (পা. বা.)—পৃ.১ ; পা. নি. (ক. বি.)—পৃ. ২ (৫) ভ. র.—৯।৩৯৪, ৪০১ (৬) প্রে. বি.—১৯শ. বি., পৃ. ৩০৮ ; ভ. র.—১০।৩৭৩, ৭০১ ; ন. বি.—৬ষ্ঠ.বি., পৃ. ৭৯ ; ৮ম. বি. পৃ. ১০৬, ১১৪ (৭) প্রে. বি.—১৯শ. বি., পৃ. ৩১৯ ; ভ. র.—১০।৭৪৩ ; ১১।১১১, ১৪২, ৪০০ ; ন. বি.—৮ম. বি., পৃ. ১১৮ ; ৯ম. বি., পৃ. ১৩০–৩৬, ১৪৩–১৪৪ (৮) ১৯শ. বি., পৃ. ৩৩৭ (৯) ঐ—পৃ. ৩১৯–২০ (১০) পৃ. ৪৫ (১১) পৃ. ৪২২

মুরারি-চৈতন্যদাস

মুরারি-চৈতন্যদাস সম্বন্ধে 'চৈতন্যভাগবতে' বলা হইয়াছে[১] :

ব্যাঘ্র তাড়াইয়া যায় বনের ভিতরে ॥
কখনে চড়েন সেই ব্যাঘ্রের উপরে।......
মহা অজগর সর্প লই নিজ কোলে।
নির্ভয়ে চৈতন্যদাস থাকে কুতুহলে ॥

নিত্যানন্দশাখা-বর্ণনা-পরিচ্ছেদে 'চৈতন্যচরিতামৃতে'ও বলা হইয়াছে :

মুরারি চৈতন্যদাসের অলৌকিক লীলা।
ব্যাঘ্র গালে চড় মারে সর্প সনে খেলা ॥

বৃন্দাবনদাস নিত্যানন্দশিষ্য-বর্ণনা প্রসঙ্গে অন্যত্র এই কথারই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন[২] জয়ানন্দের গ্রন্থেও[৩] নিত্যানন্দ-শিষ্যবৃন্দের সহিত তাঁহার নাম পাওয়া যায় এবং জানা যায় যে তিনি সম্ভবত নিত্যানন্দের বিবাহানুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। গ্রন্থকার বলেন যে তাঁহার সহিত রাঘবের মতবিরোধ ছিল :

মুরারি চৈতন্যদাসের রাঘব সনে দ্বন্দ্ব ।

'প্রেমবিলাসা'দি-গ্রন্থ হইতে জানা যায়[৪] যে মুরারি-চৈতন্যদাস নিত্যানন্দ-শিষ্যবৃন্দ সহ খেতুরি-মহামহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। নরহরি-চক্রবর্তী বলেন[৫] যে তিনি তৎপূর্বে দাস-গদাধরের তিরোধানতিথি-মহামহোৎসবেও উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং খেতুরি-উৎসবান্তে তিনি জাহ্নবাদেবীর সহিত বৃন্দাবন-গমন ও তথা হইতে খেতুরিতে প্রত্যাবর্তন করিবার পর পুনরায় তাঁহারই সহিত একচক্রা ভ্রমণ করেন।

সীতাচরিত- ও 'সীতাগুণকদম্ব'-গ্রন্থেও একজন মুরারি-চৈতন্যদাসের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।[৬] গৌরাঙ্গ-আবির্ভাব ও চৈতন্য-তিরোভাব, এই উভয় কালেই তাঁহাকে সীতাদেবীর পার্শ্বচর-হিসাবে দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাহার পরেও অদ্বৈত-তিরোভাবের পূর্বে তাঁহাকে সীতাদ্বৈতের সহিত তাঁহাদের একজন বিশেস ভক্তরূপে উপস্থিত দেখা যায়। আবার 'অদ্বৈতমঙ্গলে'র গ্রন্থকারও অদ্বৈতপ্রভুর একজন শ্রেষ্ঠভক্ত হিসাবে 'মুরারি'র নাম উল্লেখ

(১) ৩।৫, পৃ. ৩০৮ (২) ঐ—৩।৬, পৃ. ৩১৬ ; বৈ. ব. (বৃ.)—পৃ. ৫ (৩) বি. খ., পৃ. ১৪৪ ; উ. খ., পৃ ১৪৮, ৫১ ; তু.—ভ. র.—১২।৩৭০৪ (৪) প্রে. বি.—১৯শ. বি., পৃ. ৩০৮ ; ভ. র.—১০।৩৭৪ ; ন. বি., ৬ষ্ঠ. বি.—পৃ. ৭৯ ; ৮ম. বি., পৃ. ১০৭ (৫) ভ. র.—৯।৩৯৭ ; ১০।৭৪৩ ; ১১।৪০১ ; ন. বি.—৮ম. বি., পৃ. ১১৮ (৬) সী. চ.—পৃ. ২, ১১, ১৮ ; সী. ক.—পৃ. ৬৪, ৯২

করিয়াছেন[৭]। উপরোক্ত গ্রন্থদ্বয়ে মুরারি-চৈতন্যদাস ব্যতিরেকে দ্বিতীয় মুরারির অস্তিত্ব না থাকায় সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে তিন-খানি গ্রন্থেরই উদ্দিষ্ট মুরারি একই ব্যক্তি। 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র অদ্বৈতশাখা-বর্ণনায় একজন মুরারি-পণ্ডিতকে পাওয়া যায় এবং গ্রন্থকার বলেন[৮] যে মুরারি-পণ্ডিত চৈতন্য-দর্শনার্থী হইয়া একবার নীলাচলে গিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত মুরারি-গুপ্তও উপস্থিত থাকায় তাঁহাকে বৈদ্য-মুরারি 'বলিয়া ধরিয়া লইবার যুক্তি থাকে না। 'চৈতন্যভাগবতে' দৃষ্ট হয়[৯] যে গৌরাঙ্গের গয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পর মুরারি প্রভৃতি ভক্ত তদাজ্ঞায় শুক্লাম্বর-গৃহে তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। এই মুরারি-পণ্ডিত যে অদ্বৈতশাখা-বর্ণিত মুরারি-পণ্ডিত এবং অদ্বৈতপ্রভুর একজন প্রাচীন-শিষ্য তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। 'ভক্তিরত্নাকরে'র বর্ণনা অনুযায়ী[১০] মুরারি-চৈতন্যদাসের মত ইনিও গদাধরদাসপ্রভুর তিরোধানতিথি-মহামহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

লক্ষ্য করা যাইতে পারে যে কোনও প্রাচীন গ্রন্থেই অদ্বৈতশিষ্য হিসাবে মুরারি-চৈতন্যদাসের নাম দৃষ্ট হয় না। অথচ প্রামাণিক গ্রন্থগুলি হইতে জানা যাইতেছে যে অদ্বৈতশিষ্য মুরারি-পণ্ডিত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ইহা হইতে স্বতই মনে আসে যে পরবর্তিকালে লিখিত 'সীতাচরিত্র' ও 'সীতাগুণকদম্ব' নামক গ্রন্থদ্বয়ের গ্রন্থকারই হয়ত অদ্বৈত-শিষ্য মুরারি-পণ্ডিতকে নিত্যানন্দ-শিষ্য মুরারি-চৈতন্যদাসের সহিত এক করিয়া ফেলিয়া মুরারি-চৈতন্যদাসকেই সীতা ও অদ্বৈতের ভক্ত হিসাবে বর্ণনা করিয়া থাকিবেন। কিংবা, 'চৈতন্যভাগবতে'র নিম্নোদ্ধৃত অংশটুকু হইতেও এই সম্বন্ধে হয়ত কিছু সংকেত খুঁজিয়া পাওয়া যাইতে পারে। গ্রন্থকার নিত্যানন্দ-শিষ্য মুরারি-চৈতন্যদাসের ব্যাঘ্র-সর্প বশীকরণ-শক্তির উল্লেখের পর বলিতেছেন[১১] :

যোগ্য চৈতন্যদাস মুরারি পণ্ডিত।
যার বাতাসেও কৃষ্ণ পাইয়ে নিশ্চিত ॥
এবে কেহো বোলায় 'চৈতন্যদাস' নাম।
স্বপ্নেও না বোলে শ্রীচৈতন্যগুণগ্রাম ॥
অদ্বৈতের প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
যাঁর ভক্তি প্রসাদে অদ্বৈত সত্য ধন্য ॥
জয় খড়্গ অদ্বৈতের যে চৈতন্যভক্তি।
যাহার প্রসাদে অদ্বৈতের সর্বশক্তি ॥
সাধুলোকে অদ্বৈতের এ মহিমা ঘোষে।
কেহো ইহা অদ্বৈতের নিন্দা হেন বাসে ॥

(৭) পৃ. ৯, ৩৮, ৫৭ (৮) ৩।১০, পৃ. ৩৩৪ (৯) ২।১, পৃ. ৯৫ (১০) ৯।৪০৪ (১১) ৩।৫, পৃ. ৩০৮

সেহো ছার বোলায় চৈতন্যদাস নাম।
সে পাপী কেমনে যায় অদ্বৈতের স্থান॥
এ পাপীরে অদ্বৈতের লোক বলে যে।
অদ্বৈতের হৃদয় না জানে কভু সে॥
রাক্ষসের নাম যেন কহে 'পুণ্যজন'।
এই মত এ সব চৈতন্যদাসগণ॥

বর্ণনাটি মুরারি-পণ্ডিতের নামের সহিত আরম্ভ হওয়ায় ইহা প্রণিধানযোগ্য হইয়া উঠে। গৌরাঙ্গের 'চৈতন্য'-নাম গ্রহণের পরেই মুরারি-পণ্ডিতের পক্ষে 'চৈতন্যদাস'-নাম গ্রহণ করা সম্ভব হইতে পারে। 'বংশীশিক্ষা'-গ্রন্থে একজন ঠাকুর-মুরারির নাম উল্লেখিত হইয়াছে[১২] :
শ্রীপাট স্বরের শ্রীঠাকুর মুরারিরে।

'গৌরপদতরঙ্গিণী'তে 'পদকর্তৃগণের পরিচয়'-প্রদান প্রসঙ্গে মৃণালকান্তি ঘোষ লিখিতেছেন, "বর্ধমান জেলার গলশী রেল ষ্টেশন হইতে এক ক্রোশ দূরে সর-বৃন্দাবন-পুর গ্রামে মুরারি-চৈতন্যদাসের জন্ম। নবদ্বীপধামের অন্তর্গত মাউগাছিগ্রামে আসিয়া ইঁহার নাম শার্ঙ্গ (শারঙ্গ) মুরারি-চৈতন্যদাস হইয়াছিল। ইঁহার বংশীয়গণ এখনও সরের পাটে বাস করেন।" আধুনিক 'বৈষ্ণবদিগ্দর্শনী'তে[১৩] সম্ভবত এই মুরারিরই মন্ত্রগ্রহণ সম্বন্ধে একটি মজার গল্প লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

(১২) পৃ. ১৯৫ ; বৈ. দি.-মতে (পৃ. ৮৯) কাশীশ্বর-পণ্ডিত স্বীয় অগ্রজ মহাদেবের পুত্র ও স্বীয় মন্ত্রশিষ্য মুরারি-পণ্ডিতের উপর বিগ্রহ-সেবার ভারার্পণ করিয়া শেষ জীবনে বৃন্দাবনে গমন করেন
(১৩) বৈ. দি.—পৃ. ৪৪ ; গল্পটির জন্য বংশীবদন-জীবনীর পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

শ্রীনিবাস-আচার্য

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে গঙ্গাতীরস্থ চাখন্দি গ্রামে গঙ্গাধর-ভট্টাচার্য নামে রাঢ়ীয় ঘণ্টেশ্বরী কুলজাত[১] এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। গঙ্গাধর যাজিগ্রামস্থ বলরাম-বিপ্রের কন্যা লক্ষ্মীপ্রিয়ার পাণিগ্রহণ করেন।[২] কিন্তু ব্রাহ্মণ-দম্পতী অপুত্রক ছিলেন।

গৌরাঙ্গপ্রভু যখন কণ্টকনগরে কেশব-ভারতীর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন তখন গঙ্গাধর দৈবাৎ সেইস্থানে উপস্থিত ছিলেন।[৩] গৌরাঙ্গের সন্ন্যাসগ্রহণ অনুষ্ঠান দেখিয়া তিনি অত্যন্ত বিচলিত হন এবং তাঁহার 'চৈতন্য' নামও তাঁহাকে বিচলিত করে। তিনি তখন 'চৈতন্য' নাম উচ্চারণ করিতে করিতে ক্ষিপ্তপ্রায় অবস্থায় গৃহে ফিরিলে তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া প্রতিবেশী-বৃন্দের কেহ কেহ তাঁহার নূতন নামকরণ করিলেন 'চৈতন্যদাস'। তদবধি তিনি 'চৈতন্য' নামেই অভিহিত হন।

ক্রমে চৈতন্যদাস প্রকৃতিস্থ হইলেন এবং তাঁহার পুত্র-কামনা জন্মাইল। তখন তিনি পত্নীর সহিত আলোচনা করিয়া দুই চারি দিবস শ্বশুরালয়ে অতিবাহিত করিবার পর নীলাচলের পথে বাহির হইলেন। পথে একদিন তিনি স্বপ্নে চৈতন্যকে জগন্নাথের সহিত অভিন্ন দেখিয়া অস্থির হন। তারপর ক্রমে তাঁহারা নীলাচলে পৌছাইলে বিগ্রহ-দর্শনার্থী মহাপ্রভুর সহিত সিংহদ্বারেই তাঁহাদের দেখা হইয়া যায়। চৈতন্যদাস মহাপ্রভুর চরণে পতিত হইলে তিনি চৈতন্যদাসকে চিনিতে পারিয়া আলিঙ্গন দান করেন এবং যাহাতে তাঁহার নির্বিঘ্নে জগন্নাথ-দর্শন ঘটে তজ্জন্য ভৃত্য-গোবিন্দকে নির্দেশ দান করিলেন। চৈতন্য-দাস তখন স্বপ্নদৃষ্ট মূর্তির ধ্যানে বিভোর ছিলেন। জগন্নাথ দর্শন করিতে গিয়া একই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিলেন। তাঁহার বিগ্রহ-দর্শন হইয়া গেলে মহাপ্রভু তাঁহাকে গৌড়ে চলিয়া যাইবার আজ্ঞা প্রদান করিয়া কাশী-মিশ্রের গৃহে চলিয়া গেলেন। চৈতন্যদাস বিশ্রামার্থ বাসায় গিয়া উঠিলেন; কিন্তু মহাপ্রভুর পার্ষদবৃন্দ মহাপ্রভুর ঐ প্রকার আচরণ ও অতি-সত্বর গৌড়-গমনের আজ্ঞা-প্রদানে একটু সংশয়ান্বিত হইলেন। এই সময় মহাপ্রভু তাঁহার পার্শ্বচর গোবিন্দকে বলিলেন যে উক্ত ভক্তিমান বিপ্র পুত্র-কামনা করিয়া আসিয়াছেন, তিনি একটি গুণসম্পন্ন পুত্রসন্তান লাভ করিলে তাঁহার নাম রাখা হইবে শ্রীনিবাস, গোবিন্দ যেন সেই ব্রাহ্মণের স্বদেশ-প্রত্যাবর্তনের সুব্যবস্থা করিয়া দেন। চৈতন্যদাসের পক্ষে মহাপ্রভুকে ছাড়িয়া যাইতে কষ্ট হওয়ায় একদিন গোবিন্দ

---

(১) কর্ণপুর-কবিরাজকৃত গুণলেশসূচক; ন. বি.—১ম. বি., পৃ. ১৭ (২) ভ.র.—২।৬৮ (৩) ভ. র.—২।৩৭

তাঁহাকে ডাকিয়া আনিলে মহাপ্রভু বুঝাইয়া বলিলেন যে জগন্নাথের কৃপাবলে তিনি একটি সুপুত্র লাভ করিবেন, তিনি যেন গৌড়ে ফিরিয়া নাম-সংকীর্তন করিতে থাকেন। চৈতন্যদাস পত্নীসহ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

গৌড়ে ফিরিয়া তাঁহারা প্রথমেই বলরামের গৃহে এবং তারপর চাখন্দিতে স্বগৃহে পৌছাইলেন। তখন হইতেই কৃষ্ণকথা ও নাম-সংকীর্তনই তাঁহাদের প্রধান কর্তব্য হইয়া দাঁড়াইল। 'ভক্তিরত্নাকর'-প্রণেতা এইরূপ বর্ণনার পর জানাইতেছেন যে 'কতদিনে লক্ষ্মীপ্রিয়া হৈল গর্ভবতী।'[৪] কিন্তু মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণের কতদিন পরে চৈতন্যদাস নীলাচলে গিয়াছিলেন তাহাও যেমন সঠিকভাবে বলা হয় নাই, এইস্থলে তাঁহাদের নীলাচল হইতে প্রত্যাগত হইবার কতদিন পরে যে লক্ষ্মীপ্রিয়া গর্ভবতী হইয়াছিলেন তাহাও তেমন সঠিকভাবে উল্লেখিত হয় নাই। 'প্রেমবিলাস'-গ্রন্থে[৫] কিন্তু শ্রীনিবাসের জন্ম সম্বন্ধে ভিন্ন বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। সেই গল্প অনুযায়ী, একদিন নীলাচলপতি জগন্নাথ মহাপ্রভুকে স্বপ্নে বলিলেন যে চৈতন্যদাস ও তৎপত্নী বলরাম-দুহিতা লক্ষ্মীপ্রিয়া পূর্বে পুত্র-কামনা করিয়া নীলাচলে আসিলে তিনি চৈতন্যদাসকে পুত্র-বর প্রদান করিয়াছেন, এক্ষণে চৈতন্য যেন তাঁহাকে প্রেমদান করেন। মহাপ্রভু যখন কাশী-মিশ্রের নিকট সংবাদ লইয়া জানিলেন যে চৈতন্যদাস বহুপূর্বেই কাঁদিতে কাঁদিতে দেশে ফিরিয়া গিয়াছেন, তখন তিনি তাঁহাকে উক্ত ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে সন্ধান লইতে নির্দেশ দিলেন। এই সময় জগদানন্দের মারফত অদ্বৈত-প্রেরিত তর্জা পাঠ করিয়া মহাপ্রভু ব্যাধিগ্রস্ত হইলে জগন্নাথ তাঁহাকে পুনরায় সেই প্রেমদানের নির্দেশ দেন। কিন্তু মহাপ্রভু এদিকে সমুদ্রকে প্রেমদান করিয়াছিলেন। সমুদ্র ধারণাশক্ত হইয়া পৃথিবীকে তাহা অর্পণ করিলে পৃথিবীও কাঁপিতে থাকেন এবং নীলাচলে প্রবল ভূমিকম্প দেখা দেয়। মহাপ্রভু পৃথিবীকে ডাকিয়া চৈতন্যদাস ও লক্ষ্মীপ্রিয়ার সন্ধান করিতে বলিলেন। তিনদিন পরে পৃথিবী জানাইলেন যে চৈতন্যদাস পুত্রার্থে পুরশ্চরণ আরম্ভ করিয়াছেন। তখন মহাপ্রভুর আজ্ঞায় পৃথিবী সেই প্রেমভার লইয়া লক্ষ্মীপ্রিয়ার মধ্যে রাখিয়া আসিলেন। ইতিপূর্বে মহাপ্রভু নীলাচলে শ্রীনিবাসের আবির্ভাব সম্বন্ধে ঘোষণা করিয়াছিলেন। এখন চৈতন্যদাস সাতবার পুরশ্চরণ শেষ করিলে তিনি লক্ষ্মীপ্রিয়াকে স্বপ্নে স্পর্শ করিয়া তাঁহার পুত্র-সম্ভাবনার কথা জানাইলেন। চেতনা-লাভ করিলে লক্ষ্মীপ্রিয়া স্বামীকে সমস্ত কথা বলিলেন এবং উভয়ে নাম-সংকীর্তনাদির মধ্য দিয়া দিন যাপন করিতে লাগিলেন। কয়েকজন গ্রামবাসীর উপরও তাঁহাদের প্রভাব পড়িয়াছিল। কিন্তু তাহাতে একজন দুরাচার-ব্রাহ্মণ জমিদারের নিকট জানাইলেন যে চৈতন্যদাসের প্রভাবে গ্রাম হইতে শিব-দুর্গার নাম একপ্রকার উঠিয়াই গিয়াছে। জমিদার

(৪) ২।১৫১ (৫) ১ম বি., পৃ. ৬-১৯ ; তু.—শ্রী. জ.—পৃ. ১-৮

দুর্গাদাস-রায় ক্রুদ্ধ হইয়া চৈতন্যদাসের গৃহে আসিলেন। কিন্তু তিনি চৈতন্যদাসের পরম আতিথেয়তায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার গৃহেই নৈশ-ভোজন করিয়া শয়ন করিলে চৈতন্যদাসের গৃহাঙ্গনে হঠাৎ-আবির্ভূত গৌরবর্ণ দুই শিশুর অপরূপ নৃত্য দেখিয়া মূর্ছিত হন। পর পর তিনি সমস্ত বুঝিয়া অনুতপ্ত চিত্তে 'রাধাকৃষ্ণ'-মন্ত্র গ্রহণের জন্য অস্থির হইলে ব্রাহ্মণ-দম্পতী তাঁহাকে সান্ত্বনাদান করেন। ক্রমে দশমাস দশদিন অতিবাহিত হইবার পরে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে শিশু ভূমিষ্ঠ হন।

'প্রেমবিলাসে'র এই বর্ণনার অবিশ্বাস্য অংশগুলি বাদ দিলে, ইহা হইতে জানা যায় যে জগদানন্দ কর্তৃক অদ্বৈত-প্রদত্ত তর্জা লইয়া নীলাচলে যাইবার পরে কোনও সময়ে শ্রীনিবাস জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তী আলোচনায় দেখা যাইবে যে মহাপ্রভুর তিরোভাবকালে শ্রীনিবাস নীলাচলের পথে বাহির হইয়াছিলেন। তাহা হইলে মহাপ্রভুর নীলাচল-বাসের দ্বিতীয়ার্ধের প্রথমদিকে কোনও সময়ে শ্রীনিবাসের জন্মকাল নির্দেশিত করিতে হয়। তাঁহার জন্মকাল সম্বন্ধে এতদতিরিক্ত আর কিছুই বলিতে পারা যায় না। 'ভক্তিরত্নাকরে' কেবল বলা হইয়াছে যে বৈশাখী-পূর্ণিমায় রোহিণী-নক্ষত্রে শ্রীনিবাস জন্মলাভ করেন।

শ্রীনিবাস জন্মগ্রহণ করিলে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী তাঁহাকে চৈতন্যের নামেই উৎসর্গীকৃত করিয়া তদনুযায়ী তাঁহার জীবন-গঠনে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ ও উপনয়ন-সংস্কারাদি সম্পন্ন হয় এবং শ্রীনিবাস তাঁহার গুরু ধনঞ্জয়-বিদ্যানিবাস[৬] বা ধনঞ্জয়-বিদ্যাবাচস্পতির[৭] নিকট

> অল্পদিনে ব্যকরণ কোষ অলংকার।
> তর্কাদি পাড়ল—লোকে হৈল চমৎকার॥

গৃহে কৃষ্ণনাম ও চৈতন্য-গুণগান চলিত এবং মহাপ্রভুর পার্ষদ্ গোবিন্দ-ঘোষাদি ভক্ত আসিয়া শ্রীনিবাসের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। স্বভাবতই শ্রীনিবাস চৈতন্যানুরাগী হইলেন। এই সময় একদিন নরহরি-সরকার-ঠাকুরও যাজিগ্রামের পথে গঙ্গাস্নান করিতে গেলে মাতুলালয়ে আগত শ্রীনিবাসের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ও পরিচয় ঘটে। ফলে শ্রীনিবাসের জীবনে এক বিপুল পরিবর্তন সাধিত হইল। তাঁহার 'চৈতন্যবিরহ-ব্যাধি দ্বিগুণ বাড়িয়া' গেল।[৮]

শ্রীনিবাস চাখন্দিতে ফিরিলে চৈতন্যদাস তাঁহাকে গৌরাঙ্গের বাল্যলীলা সম্বন্ধে নানাকথা শুনাইলেন। মহাপ্রভুর বাল্যলীলাকালে তিনিও অধ্যয়নরত ছিলেন; গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস-গ্রহণের কিছু পূর্বে তাঁহার অধ্যাপক একবার আমন্ত্রিত হইয়া রামকেলিতে গমন করিলে তিনি তৎসহ তথায় গিয়া রূপ-সনাতনের দর্শনলাভ করিয়াছিলেন; রূপ ও সনাতন পরে সর্বত্যাগী

(৬) প্রে. বি.—৩য়. বি., পৃ. ২৫ (৭) ভ. র.—২।১৮৬ (৮) প্রে. বি.—৪র্থ. বি., পৃ. ২৮

হইয়া বৃন্দাবনে গিয়া গোবিন্দ, মদনগোপাল ও বৃন্দাদেবী প্রভৃতির বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং কাশীশ্বর, পরমানন্দ-ভট্টাচার্য ও মধু-পণ্ডিত প্রভৃতি ভক্ত বিভিন্ন বিগ্রহের সেবায় নিযুক্ত হইয়াছেন; চৈতন্যদাস শ্রীনিবাসকে মাতার রক্ষণাবেক্ষণে যোগ্য দেখিয়া তাঁহাকে মাতার সহিত যাজিগ্রামে রাখিয়া বৃন্দাবনে চলিয়া যাইবার বাসনাও প্রকাশ করিয়াছিলেন।[৯] কিন্তু স্বদেশেই জ্বর-রোগে আক্রান্ত হইয়া তিনি পরলোকগত হন।[১০]

পিতার মৃত্যুর অল্পকাল পরে তাঁহার উপাসনা-দিবস আসিবারও পূর্বে শ্রীনিবাস মাতাসহ মাতামহালয়ে উঠিয়া আসিলেন। নরহরির সহিত প্রথম-দর্শনেই তিনি তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। এখন যাজিগ্রামে আসার পর তাঁহার পক্ষে সরকার-ঠাকুরের সহিত সংযোগ স্থাপন করার সুবিধা হইল। একদিন তিনি শ্রীখণ্ডে হাজির হইলেন এবং রঘুনন্দন-ঠাকুর তাঁহাকে নরহরির নিকট লইয়া গেলে নরহরি তাঁহাকে হরিনাম-মহামন্ত্র গ্রহণ করিয়া সেই স্থানেই বাস করিবার জন্য নির্দেশ দান করিলেন।[১১] কিন্তু শ্রীনিবাস স্থির করিতে পারিলেন না, 'কার স্থানে হরিনাম করিব গ্রহণ'। কিছুদিন পরে তিনি নীলাচলস্থ গদাধর-পণ্ডিতের নিকট গিয়া ভাগবতপাঠের জন্য উদ্‌গ্রীব হইলে নরহরি তাঁহাকে পত্র ও লোকসহ নীলাচলে পাঠাইয়া দিলেন।[১২] কিশোর-শ্রীনিবাস মাতৃসমীপে বিদায় গ্রহণ করিয়া যাত্রা আরম্ভ করিলেন।[১৩]

'কর্ণানন্দ'-গ্রন্থে[১৪] লিখিত হইয়াছে যে শ্রীনিবাস পথিমধ্যে মহাপ্রভুর তিরোভাব-বার্তা শুনিয়া মূর্ছিত হইলে মহাপ্রভু তাঁহাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া বৃন্দাবনে যাইবার আজ্ঞা প্রদান করেন এবং শ্রীনিবাস তদনুযায়ী মথুরায় গিয়াই সনাতন ও রূপের সদ্যোমৃত্যুর সংবাদ প্রাপ্ত হন। 'অনুরাগবল্লী'-রচয়িতা মনোহরদাস এবং তৎপরবর্তী লেখক নরহরি-চক্রবর্তী অতিরিক্ত অন্যান্য তথ্য পরিবেশন করিলেও 'কর্ণানন্দে'র বর্ণনাগুলিকে স্বীকৃতি দান করিয়াছেন।[১৫] অথচ 'কর্ণানন্দে'র পূর্বে লিখিত 'প্রেমবিলাসে'র মধ্যে শ্রীনিবাসের নীলাচলপথে মহাপ্রভুর অপ্রকট-বার্তা শ্রবণের কোন উল্লেখ নাই। ইহাতে তথ্যটির সত্যতা সম্বন্ধে হয়ত সন্দেহ আসিতে পারে। তবে মহাপ্রভুর তিরোভাবের পরবর্তী কালেই যে শ্রীনিবাস নীলাচলে যান, গ্রন্থের বর্ণনা হইতে তাহাতে সন্দেহ থাকে না। কিন্তু

---

(৯) ভ. র.—২।৩৫৮-৫৯ (১০) প্রে. বি.—৪র্থ. বি., পৃ. ২৯; ভ. র.—৩।১৮; অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় জানাইতেছেন (শ্রীনিবাস আচার্য চরিত, পৃ. ৩০) যে তখন শ্রীনিবাস ষোড়শ বর্ষবয়স্ক। ইনি বলেন (পৃ. ৩২), "বোধহয় ১৪৫৪ শকাব্দে শ্রীনিবাস মাতৃদেবী সমভিব্যাহারে যাজিগ্রামে মাতামহ-ভবনে বাস করিতে কৃতসংকল্প হইলেন।" (১১) প্রে. বি.—৪র্থ. বি., পৃ. ৩২ (১২) ঐ—পৃ. ৩৪ (১৩) ভ. র.—৩।৪৯-৫১ (১৪) ৬ষ্ঠ. নি., পৃ. ১০৮-৯ (১৫) ২য়. ম., পৃ. ৮, ১৭; ভ. র.—১।৮৬৬; ৩।৬৪; ৪।১৯৭-৯৮; ৮।৩৬২; ন. বি.—১ম. বি., পৃ. ১৭; ২য়. বি., পৃ. ২৪

'ভক্তিরত্নাকর'-প্রণেতা শ্রীনিবাস-শিষ্য নৃসিংহ-কবিরাজের রচিত পদ্য উদ্ধৃত করিয়া উক্ত সংবাদকে দৃঢ়ভিত্তি করিয়াছেন।[১৬]

গন্তং শ্রীপুরুষোত্তমং কৃতমতিঃ শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভো-
শ্চৈতন্যস্য কৃপাম্বুধের্জন মুখাচ্ছ্রুত্বা তিরোধানতাম্।

আবার গ্রন্থকার তাঁহার 'নরোত্তমবিলাস'-গ্রন্থে[১৭] শ্রীনিবাস-শিষ্য কর্ণপূর-কবিরাজ-কৃত 'শ্রীনিবাসের গুণলেশসূচক' হইতেও উদ্ধৃতি আহরণ করিয়া এই তথ্যের সত্যতাকে প্রমাণ করিয়াছেন।

গচ্ছন্ শ্রীপুরুষোত্তমং পথি শ্রুতশ্চৈতন্যসঙ্গোপনং
মূর্চ্ছীভূয় কচান্ লুনন্ স্বশিরসো ঘাতং দধদ্ধিক্‌কৃতং।
তৎপাদং হৃদি সন্নিধায় গতবান্নীলাচলং যঃ স্বয়ং
সোঽয়ং মে করুণানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভু।। ১১।।

শ্রীনিবাস নীলাচলে গিয়া বিগ্রহদর্শনের পর গদাধর, সার্বভৌম, রামানন্দ, বক্রেশ্বর, পরমানন্দ-পুরী, শিখি-মাহিতি ও তাঁহার ভগ্নী মাধবী, কানাই-খুটিয়া, বাণীনাথ-পট্টনায়ক, গোবিন্দ, শংকর, গোপীনাথ-আচার্য প্রভৃতি চৈতন্য-পার্ষদবৃন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তারপর নীলাচল-ভ্রমণান্তে তিনি ভাগবতপাঠের নিমিত্ত গদাধর-পণ্ডিতের নিকট গেলে পণ্ডিত-গোস্বামী খুব যত্নসহকারে তাঁহাকে ভাগবত পড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু পুরাতন পুথিখানি অত্যন্ত জীর্ণ হইয়া গিয়াছিল।[১৮] 'প্রেমবিলাস'-কার বলেন, তখন গদাধর শ্রীনিবাসকে পুনরায় গৌড়ে যাইবার নির্দেশ দিয়া বলিলেন[১৯]:

আমার লিখন দিহ নরহরি হাতে।
নবীন পুস্তক এক দেন তোমার সাথে।।

'ভক্তিরত্নাকরে' এই নবীন পুস্তক আনিবার নির্দেশের কথা লিখিত না হইলেও এই গ্রন্থের বর্ণনায় দেখা যায় যে শ্রীনিবাস গৌড়ে গিয়া শ্রীখণ্ডে নরহরির সহিত সাক্ষাৎ করিয়াই রাত্রি প্রভাত হইলে পুনরায় নীলাচলে ফিরিতেছেন। গদাধরের উক্ত-প্রকার নির্দেশ না থাকিলে শ্রীখণ্ড হইতে পুনরায় এত শীঘ্র নীলাচল-গমনের প্রয়োজন হইত না। কিন্তু শ্রীনিবাসকে আর নীলাচল পর্যন্ত যাইতে হয় নাই। যাজপুরে পৌছাইয়া তিনি পণ্ডিত-গোঁসাইর অপ্রকট-সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। ভগ্নহৃদয় লইয়া তিনি শ্রীখণ্ডে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

গদাধর-পণ্ডিত শ্রীনিবাসকে বৃন্দাবনে গিয়া গোস্বামী-বৃন্দের নিকট ভাগবতপাঠের নির্দেশ দান করিয়াছিলেন।[২০] কিন্তু ইচ্ছা থাকিলেও তখন কিশোর-বালকের পক্ষে

(১৬) ৩।৭৮ (১৭) ১ম. বি., পৃ. ১৭ (১৮) অ. ব.—২য়. ম., পৃ. ৯; ভ. র.—৩।২৭৬ (১৯) প্রে. বি. —৪র্থ. বি., পৃ. ৩৫; তু.—৬ষ্ঠ. বি., পৃ. ৬৪ (২০) অ. ব.—২য়. ম., পৃ' ১০; ভ. র.—৩।২৭৩; প্রে.বি. —৪র্থ. বি., পৃ. ৩৫, ৩৯-৪০

একাকী বিপদসংকুল দূর-পথ অতিক্রম করা একপ্রকার অসম্ভব ছিল। তৎপূর্বে তিনি মহাপ্রভুর জন্মস্থানাদি দর্শন করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। নবদ্বীপে গিয়া[২১] তিনি প্রথমে বংশীবদন[২২] এবং তাহার পর বিষ্ণুপ্রিয়ার সাক্ষাৎপ্রাপ্ত হন। ক্রমে মুরারি শ্রীবাসাদিও তাঁহাকে আশীর্বাদ করেন। 'অনুরাগবল্লী'র গ্রন্থকার সংবাদ দিতেছেন[২৩] যে গদাধর-পণ্ডিত শ্রীনিবাস মারফত বন্ধু-গদাধরদাসের নিকট একটি তর্জা প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু গৌড়-ভ্রমণকালে শ্রীনিবাস সেই কথা বিস্মৃত হইয়াছিলেন। নবদ্বীপে গদাধরদাসকে দেখিয়া যখন তাহা তাঁহার মনে পড়িল, তখন গদাধর-পণ্ডিত পরলোকগত। সুতরাং গদাধরদাস সেই কথা শুনিয়া শ্রীনিবাসের প্রতি অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন। কিন্তু শেষে বিষ্ণুপ্রিয়ার হস্তক্ষেপে তিনি শ্রীনিবাসের অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাঁহাকে আশীর্বাদ করিলেন। 'অনুরাগবল্লী'র এই সংবাদ অন্য কোনও গ্রন্থকার কর্তৃক সমর্থিত হয় না। শ্রীনিবাসের দ্বিতীয়বার নীলাচল-গমনের কোন উল্লেখও এই গ্রন্থে নাই। 'অনুরাগবল্লী'-মতে শ্রীনিবাস নীলাচলে গিয়া তথায় 'কয়েক বৎসর' অতিবাহিত করিয়াছিলেন।[২৪]

'প্রেমবিলাস'-অনুযায়ী শ্রীনিবাস সম্ভবত নবদ্বীপেও কয়েক-বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিলেন।[২৫] কিন্তু নীলাচলবাসের মত তাঁহার নবদ্বীপবাসের কাল সম্বন্ধে কোনও সঠিক সংবাদ সংগ্রহ করা একান্তই দুরূহ। তবে সমস্ত গ্রন্থ হইতেই জানা যায় যে শ্রীনিবাস নবদ্বীপ হইতে শান্তিপুরে গিয়া সীতাদেবীর নিকট এবং তাহার পরে খড়দহে বসু-জাহ্নবার নিকট আশীর্বাদ গ্রহণ করেন। অদ্বৈত-নিত্যানন্দ তখন লোকান্তরিত হইয়াছেন। শ্রীনিবাস খড়দহে গমন করিলে বীরচন্দ্রের সহিত তাঁহার বিশেষ প্রীতি-সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। খড়দহ হইতে গিয়া তিনি খানাকুলে অভিরামের সহিত সাক্ষাৎ করিলে অভিরামও তাঁহাকে নানাভাবে পরীক্ষা করিয়া তাঁহার বিশেষ শক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হন এবং তিনবার বেত্রাঘাত করিয়া তাঁহার মধ্যে শক্তি সঞ্চার করিয়া দেন।[২৬] তারপর তিনি অভিরাম ও তৎপত্নী মালিনীর নিকট আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া পুনরায় শ্রীখণ্ডে আসিয়া তাঁহার অধ্যাত্মসাধনার প্রথম ও প্রধান গুরু নরহরির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। নরহরি এবং রঘুনন্দন তখন তাঁহাকে বৃন্দাবন-গমনের অনুমতি দান করিলে তিনি যাজিগ্রামে

(২১) "প্রেমবিলাসের বর্ণনানুসারে ১৪৬৮ শকে শ্রীনিবাস নবদ্বীপ গমন করেন ; সুতরাং এই সময় তাঁহার বয়ঃক্রম অনধিক ৩০ বৎসর।"—শ্রীনিবাস আচার্যচরিত (পৃ. ৮০) (২২) প্রে.বি.—৪র্থ. বি., পৃ. ৩৭ ; ব. শি.—পৃ.১৮৭ ; ভ. র.—৪।২০ (২৩) ২য়. ম., পৃ. ১০-১৩ (২৪) ২য়. ম., পৃ. ১০ (২৫) ৪র্থ. বি., পৃ. ৪০ (২৬) রামদাস-অভিরামের জীবনীতে এই সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

মাতাকে প্রণতি জানাইয়া বৃন্দাবনাভিমুখে ধাবিত হইলেন। শ্রীনিবাসের জীবনের দ্বিতীয় পর্ব আরম্ভ হইল।

বিভিন্ন দ্রষ্টব্য স্থান পরিদর্শন করিয়া শ্রীনিবাস কাশীতে পৌছাইলেন। চন্দ্রশেখর-বৈদ্যের গৃহে তখন তাঁহার এক শিষ্য বাস করিতেছিলেন। নীলাচল নবদ্বীপ শান্তিপুর খড়দহ প্রভৃতি স্থানে, যখন যেখানে গিয়াছেন, সেখান হইতেই শ্রীনিবাস গৌরাঙ্গ-চৈতন্যলীলার বহু তথ্য অবগত হইয়াছেন। চন্দ্রশেখর-শিষ্যের নিকটও তিনি সেইভাবে নানা পূর্ব-বৃত্তান্ত অবগত হইয়া প্রয়াগ অযোধ্যাদি দর্শন করিবার পর মথুরায় পৌছাইলেন। মথুরায় পৌঁছাইয়া, কিংবা তৎপূর্বেই, তিনি কাশীশ্বর রঘুনাথ-ভট্ট সনাতন ও রূপ-গোস্বামীর মৃত্যু সংবাদ পাইলেন।[২৭] তিনি অধীর হইলেন এবং তাঁহার ভাগবতপাঠাদির সকল অভিলাষই যেন ব্যর্থ মনে হইতে লাগিল। তারপর এক মাথুর ব্রাহ্মণের সাহায্যে প্রকৃতিস্থ হইলে তিনি ধীরে ধীরে বৃন্দাবনে গিয়া হাজির হইলেন।

তখন সন্ধ্যা সমাগত। গোবিন্দ-মন্দিরে আরতি আরম্ভ হইয়াছে। অবসন্নহৃদয় শ্রীনিবাস জনসমাবেশের মধ্যদিয়া কোনওরূপে অগ্রসর হইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। সেদিন ছিল বৈশাখী পূর্ণিমা।[২৮] বিপুল সমারোহে গোবিন্দ-মন্দিরে পূজারতি চলিতেছিল। শ্রীনিবাস ধীরে ধীরে গিয়া ভিড়ের একদিকে দাঁড়াইয়া বিগ্রহ দর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহার জন্ম-জন্মান্তরের বাসনা যেন চরিতার্থ হইয়া গেল। আরতি শেষ হইল। কিন্তু তিনি বিহ্বলভাবে জগমোহনের একান্তে পড়িয়া রহিলেন। কানাকানিতে কথাটা জীব-গোস্বামীর নিকট পৌছাইলে তিনি আসিয়া শ্রীনিবাসকে উঠাইলেন এবং তাঁহার পরিচয় গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে 'বন্ধু'-সম্বোধনে আপ্যায়িত করিলেন। গোবিন্দের অধিকারী শ্রীকৃষ্ণ-পণ্ডিতের সহিতও সেই স্থানেই শ্রীনিবাসের পরিচয় হইয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণ-পণ্ডিত তাঁহাকে মহাপ্রসাদ সেবন করাইয়া তাঁহার ক্লান্তি দূর করিলে জীব তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া গিয়া বাসা-ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

পরদিন প্রভাতে জীব-গোস্বামী শ্রীনিবাসকে লইয়া রাধাদামোদরের চরণে সমর্পণ করিলেন। তারপর তিনি তাঁহাকে রূপ-গোস্বামীর সমাধি দর্শন করাইয়া গোপাল-ভট্ট-গোস্বামীর নিকট লইয়া গেলে গোপাল-ভট্ট শ্রীনিবাসের ইচ্ছায় ও জীবের মধ্যস্থতায় তাঁহাকে দীক্ষাদান করিবার জন্য সম্মত হইলেন। দ্বিতীয়া তিথিতে দীক্ষার দিন স্থির হইলে জীব শ্রীনিবাসকে রাধারমণ দর্শন এবং লোকনাথ ও ভূগর্ভের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া তাঁহাকে. গোপানাথ-মন্দিরে পরমানন্দ ও মধু-পণ্ডিতের সহিত এবং মদনমোহন-মন্দিরে কৃষ্ণদাস-ব্রহ্মচারী

(২৭) প্রে.বি.—৫ম. বি., পৃ. ৫৬-৫৭; কর্ণ.—৬ষ্ঠ. নি., পৃ. ১০৮-৯; অ. ব.—৩য়. ম., পৃ. ১৭; ভ. র.—৪।১৯৫-৯৮; ন. বি.—২য়. বি., পৃ. ২৪ (২৮) ভ. র.—৪।২৭৯; অ. ব.—৩য়. ম., পৃ. ১৯

প্রভৃতির সহিত আলাপ করাইয়া দেন। সেই স্থলে সনাতন-গোস্বামীর সমাধিও দর্শন করা হইল। পরদিন যথাসময়ে রাধারমণ-মন্দিরে শ্রীনিবাসের দীক্ষাগ্রহণ হইয়া গেলে জীব তাঁহাকে রাধাকুণ্ডে পাঠাইয়া দিলেন। তিনি তথায় গিয়া রঘুনাথদাস-গোস্বামী এবং রাঘব-কৃষ্ণদাসাদির সহিতও পরিচিত হইয়া আসিলেন।,

ইহার পর জীবের তত্ত্বাবধানে শ্রীনিবাসের শাস্ত্রসাধনা আরম্ভ হইল। 'অনুরাগবল্লী'-মতে তিনি 'কয়েক বৎসরে গ্রন্থ সমস্ত পড়িল'।[২৯] গোস্বামী-গ্রন্থসমূহ পাঠ করিয়া আয়ত্ত করিতে অবশ্য বৎসরের পর বৎসর লাগিয়া যাইতে পারে। শ্রীনিবাস যে কতদিনে এবং কি পরিমাণে ঐ সমস্ত গ্রন্থ আয়ত্ত করিয়াছিলেন, তাহা সঠিক করিয়া বলিবার উপায় নাই। কিন্তু তিনি বৃন্দাবনেই তাঁহার প্রতিভা ও প্রকৃত জ্ঞানের সুস্পষ্ট ছাপ রাখিতে পারিয়াছিলেন। একদিন জীব-গোস্বামী 'উজ্জ্বলনীলমণি'র একটি 'উদ্দীপন বিভাবের পদ্য বিচার' করিতেছিলেন। শ্লোকটি এইরূপ :

সখি রোপিতো দ্বিপত্রঃ শত পত্রাক্ষেণ যো ব্রজদ্বারি।
সোঽয়ং কদম্বভিস্তঃ ফুল্লো বল্লভবধূস্তুদতি॥

জীব এই 'শ্লোকের ভাবব্যাখ্যা' করিতে অসমর্থ হইলে শ্রীনিবাস যেভাবে তাহার ব্যাখ্যা করিলেন, তাহা শুনিয়া সকলেই চমৎকৃত হইলেন। এইরূপ তীক্ষ্ণ-প্রতিভা প্রত্যক্ষ করিয়া জীব-গোস্বামী তখন সর্বসমক্ষে শ্রীনিবাসকে 'আচার্য'-উপাধিতে ভূষিত করিলেন।[৩০]

এই সময় একদিন শ্রীনিবাস লোকনাথ-গোস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে তথায় লোকনাথ-শিষ্য নরোত্তমের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপিত হয়। নরোত্তম যে শ্রীনিবাসের বৃন্দাবনগমনের পরবর্তী কোনও সময়ে বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।[৩১] 'প্রেমবিলাস' এবং 'অনুরাগবল্লী'র ঘটনাবিন্যাস অনুযায়ী তাহাই প্রতীয়মান হয়। নরহরি-চক্রবর্তীও একই কথা বলিয়াছেন। তবে তাঁহার 'ভক্তিরত্নাকর' ও 'নরোত্তম-বিলাসে' লিখিত হইয়াছে যে নরোত্তমের বৃন্দাবনগমন ঘটে শ্রীনিবাসের 'আচার্য'-উপাধি প্রাপ্তিরও পরে।[৩২] কিন্তু 'প্রেমবিলাস' ও 'অনুরাগবল্লী'র বিবরণ অনুযায়ী এইরূপ সিদ্ধান্ত সংগত মনে হয় না। তাহা হইতে কেবল এইটুকু বলা চলে যে 'আচার্য'-উপাধি প্রাপ্তির নিকটবর্তী কোনও সময়ে উভয়ের সাক্ষাৎ ঘটিলে তাঁহারা এক অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে যুক্ত হইয়া পড়েন।

কিছুদিন পরে জীব-গোস্বামীর নির্দেশে শ্রীনিবাস ও নরোত্তম রাঘব-গোস্বামীর সহিত

(২৯) ৪র্থ. ম., পৃ. ২৪ ; তু.—প্রে. বি.—১২শ. বি., পৃ. ১৩৭ (৩০) প্রে. বি.—১২শ. বি., পৃ. ১৩৮-৪০ ; ভ. র.—৪।৩৯৬-৪০২ ; তু.—অ. ব.—৪র্থ. ম., পৃ. ২৪-২৫ (৩১) সু. (ক. বি.)—পৃ. ৫ ; সু. (ব. সা. প.) পৃ. ১০৪ (৩২) ভ. র.—৪।৪১১ ; ন. বি.—২য়. বি., পৃ. ২৬

মথুরা-বৃন্দাবন পরিক্রমা করিয়া ফিরিলে জীব শ্রীনিবাসকে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের যোগ্য উত্তরাধিকারী বিবেচনা করিয়া তাঁহার ও নরোত্তমের মারফত গোস্বামী-রচিত ভক্তিগ্রন্থাদি গৌড়ে প্রেরণ করিতে মনস্থ করিলেন। 'অনুরাগবল্লী'-মতে[৩৩] জীব শ্রীনিবাসের প্রতিভা দেখিয়া বিস্মিত হইলে তাঁহাকে 'আচার্য' উপাধি প্রদান করিবার সংকল্প করিয়া রাখিয়াছিলেন। এখন গৌড়ে গোস্বামী-গ্রন্থ প্রচারের অধিকার প্রদান সম্পর্কে পূর্ব-সিদ্ধান্ত মত একটি সভার আয়োজন করিয়া বস্ত্র চাদর প্রভৃতি দিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে শ্রীনিবাসকে 'আচার্য' উপাধিতে ভূষিত করা হইল। 'প্রেমবিলাস'-কার বলিতেছেন[৩৪] যে এই সময় জীব-গোস্বামী নরোত্তমকে ডাকিয়া বলিলেন :

শুন নরোত্তম তোমায় কহি এক কথা।
এই শ্যামানন্দ ছিলা মোর স্থানে এথা॥
ইহারেত লৈয়া যাই কৃষ্ণ-কথারঙ্গে।
নিজদেশে পাঠাইবা লোক দিয়া সঙ্গে॥

এই বলিয়া তিনি শ্যামানন্দকে নরোত্তমের হস্তে সমর্পণ করিয়া তাঁহকে নানাবিধ উপদেশ প্রদান করিলেন এবং শ্যামানন্দও শ্রীনিবাস-নরোত্তমের সঙ্গে গৌড়াভিমুখে যাত্রা করিলেন।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে 'অনুরাগবল্লী'তে শ্রীনিবাসাদির এই গৌড়গমন-প্রসঙ্গে শ্যামানন্দের নাম পর্যন্ত উল্লেখিত হয় নাই। এই গ্রন্থানুযায়ী[৩৫] শ্রীনিবাস দ্বিতীয়বার বৃন্দাবনে আসিলে সেই সময়েই জীব শ্যামানন্দকে শ্রীনিবাসের সহিত গৌড়ে পাঠাইয়া দেন। আবার সমগ্র 'কর্ণানন্দ'-গ্রন্থের কোথাও শ্যামানন্দের নাম নাই। অবশ্য 'ভক্তিরত্নাকরে'র লেখক 'প্রেমবিলাস' এবং 'অনুরাগবল্লী' এই উভয়-গ্রন্থের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করিয়া জানাইয়াছেন যে শ্রীনিবাসের দুইবার বৃন্দাবন-গমনকালেই শ্যামানন্দও দুইবার বৃন্দাবনগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু পূর্বে কিছু স্থির না করিরা অল্পদিনের ব্যবধানে একই সঙ্গে দুইজনের দুইবার বৃন্দাবনগমনের মধ্যে যে আকস্মিকতা রহিয়াছে তাহাতে 'ভক্তিরত্নাকরে'র বর্ণনা অবিশ্বাস্য হইয়া উঠে। কারণ অন্য দুইটি গ্রন্থের কোনটিতেই শ্যামানন্দের দুইবার গমনের কথা বলা হয় নাই। সুতরাং শ্রীনিবাসের সহিত শ্যামানন্দ দুইবারই বৃন্দাবন হইতে গৌড়ে আসিয়াছিলেন কিনা, কিংবা, একবার আসিয়া থাকিলে তাহা কোন্‌বার, তাহা বলা কঠিন হইয়া পড়ে। কিন্তু শ্রীনিবাসের বৃন্দাবন-সম্পর্কিত ঘটনাবলীর বর্ণনায় 'প্রেমবিলাসে'র মধ্যে যথেষ্ট অসামঞ্জস্য রহিয়াছে। 'ভক্তিরত্নাকরে'র ঘটনা-বর্ণনার মধ্যে অবশ্য একটি সময়ক্রম লক্ষ্য করা যায়, এবং সেইজন্যই গ্রন্থবর্ণিত

(৩৩) ৪র্থ. ম., পৃ. ২৫ ; ৫ম. ম., পৃ. ৩২-৩৩ (৩৪) ১২শ. বি., পৃ. ১৪৫ (৩৫) ৬ষ্ঠ. ম., পৃ. ৪০

ঘটনাগুলির মধ্যে মোটামুটি একটি সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়াছে। সেই হিসাবে এই স্থলেও 'ভক্তিরত্নাকর'-প্রদত্ত ঘটনাগুলিকে গ্রহণ করিতে হয়।

যাহাহউক, শ্রীনিবাসাদির যাত্রার আয়োজন সম্পন্ন হইলে জীব-গোস্বামী তাঁহাদিগকে লইয়া গোবিন্দ-মন্দিরের দিকে ধাবিত হইলে পথিমধ্যে দ্বিজ-হরিদাসাচার্য তাঁহার দুই পুত্র শ্রীদাস এবং গোকুলানন্দকে গৌড়ে গিয়া দীক্ষাদান করিবার জন্য শ্রীনিবাসের নিকট অনুরোধ জানাইলেন।[৩৬] আবার যমুনাতীরে আসিয়া শ্রীনিবাস ব্রজবাসী ভক্ত-কানায়া এবং তাঁহার মাতার আশীর্বাদ গ্রহণ করিলেন। তারপর তাঁহারা ভূগর্ভ ও ও গোপাল-ভট্টের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং 'কর্ণানন্দ'-কার জানাইতেছেন[৩৭] যে গোপাল-ভট্ট স্ব-রক্ষিত 'গৌরের কৌপীন বহির্বাস' শ্রীনিবাসের মস্তকে বাঁধিয়া দিয়া প্রকারান্তরে তাঁহাকেই তাঁহার যোগ্য উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করেন। ক্রমে তাঁহারা লোকনাথ-গোস্বামীর নিকট পৌছাইলে তিনিও তাঁহার শিষ্য নরোত্তমকে শ্রীনিবাসের হস্তেই সমর্পণ করেন। পরদিন প্রভাতেই গোবিন্দ-মন্দির হইতে যাত্রা আরম্ভ হইল। গ্রন্থপূর্ণ সম্পুট বহন করিবার জন্য দুইটি গাড়ী, চারিটি বলিষ্ঠ বলদ এবং দশজন মানুষকে পূর্ব হইতেই প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছিল।[৩৮] শ্রীনিবাস গ্রন্থরাজিসহ[৩৯] সেই ছোট্ট দলটিকে সঙ্গে লইয়া অগ্রসর হইলেন। জীব-গোস্বামী প্রভৃতি কয়েকজন ভক্ত মথুরা পর্যন্ত আসিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিয়া ফিরিলেন। গ্রন্থ সহিত বৃন্দাবন-গোস্বামীদিগের প্রাণভরা আশীর্বাদ লইয়া শ্রীনিবাস-নরোত্তম গৌড়াভিমুখে যাত্রা সুরু করিলেন।

কিন্তু শ্রীনিবাসাদি পঞ্চকূট পার হইয়া গৌড়-সীমান্তে বনবিষ্ণুপুরের রাজা হাম্বীরের রাজ্যমধ্যে গোপালপুর গ্রামে আসিয়া রাত্রি যাপন করিতে থাকিলে উক্ত গ্রন্থরাজি দস্যু কর্তৃক অপহৃত হয়। এই ঘটনাতে বৈষ্ণব-ভক্তবৃন্দের মাথায় যেন বজ্রাঘাত পড়িল। প্রভাতে উঠিয়া শ্রীনিবাস নরোত্তমাদি ভক্তবৃন্দকে নানাভাবে বুঝাইয়া স্বদেশে প্রেরণ করিলেন।

(৩৬) ভ. র.—৬।৩২৬ (৩৫০) (৩৭) ৬ষ্ঠ. নি., পৃ. ১১৩ (৩৮) প্রে. বি.—১২শ. বি., পৃ. ১৪৫ ; ভ. র.—৬।৩১৭, ৫১৭-২১ (৩৯) শ্রীনিবাস কর্তৃক গৌড়ে প্রচারিত গ্রন্থগুলি সম্বন্ধে একমাত্র কর্ণানন্দ গ্রন্থে (১ম. নি., পৃ. ৩) লিখিত হইয়াছে :

গৌড়দেশে লক্ষ গ্রন্থ কৈলা প্রকটন ॥
শ্রীরূপ গোস্বামিকৃত যত গ্রন্থগণ।
যতগ্রন্থ প্রকাশিলা গোস্বামী সনাতন।
শ্রীভট্ট গোসাঞি যাহা করিলা প্রকাশ।
রঘুনাথ ভট্ট আর রঘুনাথদাস।
শ্রীজীব গোস্বামিকৃত যত গ্রন্থচয়।
কবিরাজ গ্রন্থ যত কৈলা রসময়।

কিন্তু বৃন্দাবনের গোস্বামী-বৃন্দ তাঁহারই তত্ত্বাবধানে যে অমূল্য সম্পদগুলি প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেইগুলিকে ছাড়িয়া যাওয়া তাঁহার দ্বারা সম্ভব হইল না। তিনি ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া এখানে ওখানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে একদিন তিনি এক ব্যক্তির নিকট সন্ধান পাইলেন[৪০] যে বিষ্ণুপুরে 'রাজস্থানে' গেলে গ্রন্থরাজির পুনঃপ্রাপ্তি ঘটিবে। শ্রীনিবাস বিষ্ণুপুর অভিমুখে অগ্রসর হইয়া দেউলি-গ্রামস্থ কৃষ্ণবল্লভ-চক্রবর্তী নামক এক ব্যক্তির আশ্রয়ে আসিয়া তাঁহার নিকটও সন্ধান পাইলেন যে গ্রন্থপূর্ণ সিন্দুকগুলি রাজা-হাম্বীরের নিয়োজিত দস্যুদল কর্তৃক লুণ্ঠিত হইয়া রাজগৃহে রক্ষিত হইয়াছে। তখন তিনি কৃষ্ণবল্লভের সহায়তায় একদিন রাজসভায় ভাগবতপাঠ শুনিতে গিয়া রাজপণ্ডিত ব্যাস-চক্রবর্তীকে শাস্ত্রালোচনায় পরাভূত করিলে রাজা-হাম্বীর ও ব্যাস-চক্রবর্তী উভয়েই তাঁহার অসামান্য প্রতিভার পরিচয় পাইয়া তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন। এইভাবে শ্রীনিবাস গ্রন্থপ্রাপ্তির সহিত একত্রে রাজা-হাম্বীর এবং তাঁহার পরিবারবর্গ ও রাজসভাস্থ সকলের হৃদয় জয় করিয়া বিষ্ণুপুর মধ্যে বিপুল সম্মান লাভ করিলেন।[৪১] সমগ্র বিষ্ণুপুর বৈষ্ণবধর্মের বন্যায় প্লাবিত হইল এবং রাজানুরোধে শ্রীনিবাসকে বেশ কিছুকাল বিষ্ণুপুরে অবস্থান করিতে হইল। কিন্তু শেষে তিনি তাঁহার বিধবা অসহায়া মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইলে রাজা ও রাণী তাঁহাকে বিদায় দান করিলেন। ব্যাস ও কৃষ্ণবল্লভ তাঁহার অনুগামী হইলেন।

শ্রীনিবাস যাজিগ্রামে গিয়া মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কিন্তু যখন তিনি সংবাদ পাইলেন যে বিষ্ণুপ্রিয়ামাতার তিরোভাব ঘটিয়াছে এবং নরহরি-ঠাকুর ও গদাধরদাস কোনওরূপে বাঁচিয়া আছেন মাত্র তখন তিনি শ্রীখণ্ডে গিয়া রঘুনন্দনের সহায়তায় তাঁহার আদি-গুরু নরহরির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। নানাবিধ আলোচনার পর নরহরি শ্রীনিবাসকে তাঁহার পরমা-বৈষ্ণবী মাতার ইচ্ছা পূরণার্থে দারপরিগ্রহ করার অনুমতি প্রদান করিলেন। শ্রীনিবাস প্রথমে আপত্তি জানাইলেও শেষ পর্যন্ত সম্মতি দান করিয়া কণ্টকনগরে চলিয়া গেলেন। সেইস্থানে গদাধরদাসপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তিনি পুনরায় যাজিগ্রামে আসিলে কয়েকদিনের মধ্যেই নীলাচল-প্রত্যাগত নরোত্তম-ঠাকুর আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। নরোত্তম খেতুরিতে চলিয়া গেলে অল্পকাল মধ্যেই যাজিগ্রামবাসী গোপাল-চক্রবর্তীর কন্যা দ্রৌপদীর সহিত শ্রীনিবাসের শুভপরিণয় ঘটে। 'প্রেমবিলাস'-কার বলেন যে এই বিবাহ ঘটে শ্রীনিবাসের মাতৃবিয়োগেরও পরে। মাতৃবিয়োগের পর শ্রীনিবাস মহোৎসবের আয়োজন করিলে তদুপলক্ষে শ্রীখণ্ডাগত রঘুনন্দন

---

(৪০) ভ. র.—৭।১১৬ (৪১) রাজা-হাম্বীরের জীবনীতে গ্রন্থাপহরণ, গ্রন্থপ্রাপ্তি এবং সপরিবারে রাজা ও প্রজাদিগের বৈষ্ণবধর্ম-গ্রহণাদি সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

সুলোচন প্রভৃতি ভক্ত তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিলেন।[৪২] রঘুনন্দন সেই 'গ্রামের ভূমিক' বিপ্র-গোপালদাসকে কন্যা সম্প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন করিলে গোপালদাস স্বীয় ভ্রাতা বৃন্দাবনের স্বীকৃতি গ্রহণ করেন এবং শ্রীনিবাস-আচার্যের সহিত গোপাল-তনয়ার বিবাহ ঘটে। কিন্তু 'প্রেমবিলাসে'র এই সময়কার বিবরণগুলি এতই বিশৃংখলবিন্যস্ত যে অন্য গ্রন্থের সমর্থন ব্যতিরেকে, কিংবা, অন্যগ্রন্থবর্ণিত ঘটনার সহিত ইহার বর্ণনাকে বিশেষভাবে পরীক্ষা না করিয়া ঘটনাগুলির কালানুক্রমকে যথাযথভাবে গ্রহণ করা চলে না। আশ্চর্যের বিষয়, 'প্রেমবিলাস'-কার একস্থানেই শ্রীনিবাসের দুইটি বিবাহের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি শ্রীনিবাস সম্বন্ধে খুঁটিনাটি নানা-বিষয়ের উল্লেখ করিলেও তাঁহার দুইটি বিবাহের মধ্যবর্তিকালের কার্যাবলীর পরিচয় প্রদান করেন নাই; কিংবা অন্যত্র তাহা করিলেও তাহা যে ঐ অন্তর্বর্তিকালেরই কার্যাবলী তাহা বুঝিবার সুযোগ দেন নাই। 'ভক্তিরত্নাকরে'র পূর্ব-বর্ণনা অনুযায়ী জানা যায় যে শ্রীনিবাসের বিবাহকালে তাঁহার পত্নী দ্রৌপদীর নাম পরিবর্তন করিয়া ঈশ্বরী রাখা হইয়াছিল। শ্যামদাস বা শ্যামানন্দ এবং রামচন্দ্র বা রামচরণ নামে দ্রৌপদীর দুই ভ্রাতা ছিলেন।[৪৩] শ্রীনিবাসের বিবাহ হইয়া গেলে তাঁহারাও পিতা এবং ভগ্নীর সহিত শ্রীনিবাসের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন।[৪৪] 'নরোত্তমবিলাস'-গ্রন্থে[৪৫] একজন রামচরণ-চক্রবর্তীর নাম পাওয়া যায়, তিনি নরোত্তমের শিষ্যানুশিষ্য। সুতরাং তিনি শ্রীনিবাসের কনিষ্ঠ-শ্যালক[৪৬] হইতেই পারেন না। কাঞ্চনগড়িয়া হইতে গণসহ শ্রীনিবাস-আচার্যের খেতুরি গমনকাল[৪৭] ছাড়া শ্রীনিবাসের শ্যালকদ্বয়ের সাক্ষাৎ আর পাওয়া যায় না।

গৃহস্থাশ্রম-গ্রহণের পর শ্রীনিবাস গোস্বামী-গ্রন্থাদির অধ্যাপনায় আপনাকে নিয়োজিত করিলেন।[৪৮] এই সময় দ্বিজ-হরিদাসাচার্যের পুত্র গোকুলানন্দ ও শ্রীদাস তাঁহার নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিতে চাহিলে প্রথমে বিদ্যাভ্যাস করিবার উপদেশ দিয়া তিনি তাঁহাদিগকেও শিক্ষা দিতে লাগিলেন। আর একদিন রামচন্দ্র-সেন বিবাহান্তে দোলায় চড়িয়া যাজিগ্রাম-পথে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন। শ্রীনিবাস লোকমুখে তাঁহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তির কথা শুনিয়া তাঁহাকে বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী করিতে ইচ্ছুক হইলেন। পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিলে উভয়ের মধ্যে শাস্ত্র-সম্বন্ধীয় নানাবিধ আলোচনার পর রামচন্দ্র শ্রীনিবাসের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া তাঁহার নিকট মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিলেন। এইভাবে রামচন্দ্রের মত একজন

(৪২) প্রে. বি.—১৭শ. বি., পৃ. ২৪৭-৪৮ (৪৩) প্রে. বি.—১৭শ. বি., পৃ. ২৪৮ ; ২০শ. বি., পৃ. ৩৪৯ ; কর্ণ.—৬ষ্ঠ. নি., পৃ. ১২০ ; ভ. র.—৮।৪৯৯ ; গৌ. ত.—পৃ. ৩২১ (৪৪) ভ. র.—৮।৪৯৭-৫০১ (৪৫) ১২শ. বি., পৃ. ১৯৭ (৪৬) কর্ণ.—৬ষ্ঠ. নি., পৃ. ১২০ (৪৭) ভ. র.—১০।১৪১ (৪৮) ঐ—৮।৫০৬

যথার্থ জ্ঞানী, প্রতিভাবান ও প্রভাবশালী ব্যক্তির সহিত যুক্ত হওয়ায় শ্রীনিবাসের খ্যাতি দৃঢ়ভিত্তির উপর স্থাপিত হইল।[৪৯]

'প্রেমবিলাস'-কার বলেন যে রামচন্দ্রের দীক্ষাগ্রহণের কিছুকাল পরে তাঁহার যাজিগ্রাম-বাসকালেই তাঁহার ভ্রাতা গোবিন্দও শ্রীনিবাসকর্তৃক দীক্ষিত হন। কিন্তু শ্রীনিবাসের দুইবার বৃন্দাবনগমন বর্ণনায় ও তৎসম্পর্কিত কয়েকটি ঘটনাবিন্যাসে 'প্রেম-বিলাসে'র মধ্যে যথেষ্ট ভ্রম-প্রমাদ পরিলক্ষিত হয়। চতুর্দশবিলাসের প্রারম্ভে[৫০] লিখিত হইয়াছে যে শ্রীনিবাস বৃন্দাবন হইতে ফিরিলে শ্রীখণ্ডে রঘুনন্দন-ঠাকুর তাঁহাকে নরহরি-সরকার-ঠাকুরের মৃত্যুবার্তা প্রদান করেন। স্বয়ং লেখক তখন সেইস্থলে উপস্থিত ছিলেন। অথচ এই বর্ণনার বহু পরে ষোড়শবিলাসের শেষভাগে[৫১] আসিয়া লেখক জানাইতেছেন যে জাহ্নবা-ঠাকুরাণী অন্যান্য ভক্তবৃন্দ এবং লেখক সহিত বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া শ্রীখণ্ডে নরহরির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং শ্রীনিবাস নামে কোন বালক থাকিয়া থাকিলে তাঁহাকে বৃন্দাবনে পাঠাইবার জন্য তিনি সরকার-ঠাকুরকে নির্দেশ দান করিলেন। তারপর জাহ্নবা চলিয়া গেলে লেখক সেইস্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং অচিরে চাখন্দি হইতে শ্রীনিবাস আসিলে তিনি সেই সর্বপ্রথম শ্রীনিবাস নামক 'পুরুষ-রতন'কে 'নয়নে দেখিলেন'। আবার গ্রন্থের পঞ্চম ও ষষ্ঠ বিলাসদ্বয়ের একেবারে প্রথমের বর্ণনা হইতেও স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে শ্রীনিবাস তাঁহার প্রথমবার বৃন্দাবনগমনের পূর্বে খড়দহে গিয়াই জাহ্নবার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। সুতরাং ৫ম., ৬ষ্ঠ., ১৪শ. ও ১৬শ. বিলাসে বর্ণিত শ্রীনিবাসের বৃন্দাবনগমন ও প্রত্যাবর্তন ঘটনা যে তাঁহার প্রথমবারেরই বৃন্দাবনগমন ও প্রত্যাবর্তন ঘটনা, তাহাতে সন্দেহ থাকেনা এবং তৎপূর্বেই যে জাহ্নবা-ঠাকুরাণী বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন তাহাও প্রমাণিত হয়। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে লেখক কোথাও ঘটনার পুনরাবৃত্তি করিতেছেন বলিয়া বুঝিবার উপায় নাই। প্রতি-ক্ষেত্রেই অগ্রপশ্চাৎ অন্যান্য ঘটনার মধ্যে এই বর্ণনাগুলির এমনভাবে যোজনা করা হইয়াছে যে বিভিন্নকালে অনুষ্ঠিত ঘটনাগুলির সহিত উক্ত গমন-প্রত্যাবর্তন ঘটনাকে বিভিন্ন সময়ের পৃথকভাবে গমন ও প্রত্যাবর্তন বলিয়া ধারণা জন্মে। চতুর্দশবিলাসের বর্ণনায় স্বয়ং লেখকের উপস্থিতি হইতে সন্নিহিত বর্ণনার ঘটনাগুলিকে শ্রীনিবাসের প্রথমবার বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনের সহিত যুক্ত বলিয়া মনে হয়। অর্থাৎ শ্রীনিবাসের প্রথমবার প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই যে নরহরি-সরকার-ঠাকুর লোকান্তরিত হইয়াছেন এবং রামচন্দ্র-সেন ও তাঁহার ভ্রাতা গোবিন্দ কুমারনগর হইতে তেলিয়াবুধরিতে উঠিয়া গিয়াছেন, তাহাই সম্ভব

(৪৯) শ্রীনিবাস কর্তৃক রামচন্দ্রের দীক্ষা-গ্রহণাদি বিষয় রামচন্দ্র-কবিরাজের জীবনী মধ্যে বিশেষ-ভাবে আলোচিত হইয়াছে। (৫০) পৃ.১৮৭-৮৮ (৫১) পৃ. ২৩৫

মনে হয়। এইবারেই যে গোবিন্দও শ্রীনিবাস কর্তৃক দীক্ষিত হন, তাহাও গ্রন্থের বর্ণনা-নুযায়ী ধরিয়া লইতে হয়। অথচ 'ভক্তিরত্নাকর' ও 'নরোত্তমবিলাসে'র দ্ব্যর্থহীন বর্ণনা হইতে জানা যায় যে উক্ত ঘটনাগুলি শ্রীনিবাসের দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনের সহিত সম্পর্কিত। তাঁহার প্রথমবার প্রত্যাবর্তনের পর যে নরহরি-সরকার তাঁহাকে দারপরিগ্রহ করিবার অনুমতি দান করিয়াছিলেন এবং তাঁহার দ্বিতীয়বার প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই যে সরকার-ঠাকুরের তিরোভাব ঘটিয়াছে, 'ভক্তিরত্নাকরে' তাহার বিশেষ উল্লেখ আছে। আবার প্রথমবার প্রত্যাবর্তনের পরে রামচন্দ্রের সহিত শ্রীনিবাসের প্রথম সাক্ষাৎ-কালে যে গোবিন্দাদি কুমারনগরে বাস করিতেছিলেন, 'ভক্তিরত্নাকর' ও 'নরোত্তম-বিলাসে'র এই বর্ণনা 'কর্ণানন্দ' এবং 'ভক্তমালে'র বর্ণনা হইতেও বিশেষভাবে সমর্থিত হয়।[৫২] এই সময়েই যে নরহরি শ্রীনিবাসের বিবাহের অনুমতি দান করেন তাহাও 'অনুরাগবল্লী' হইতে জানা যায়।[৫৩] 'প্রেমবিলাস'-কার বলেন যে এই সময়েই রামচন্দ্র-কবিরাজ শ্রীখণ্ডে শ্রীনিবাস কর্তৃক দীক্ষিত হন। কিন্তু 'অনুরাগবল্লী'র সহিত 'ভক্তিরত্নাকর' প্রভৃতির উল্লেখ হইতে জানা যায় যে যাজিগ্রামেই উক্ত দীক্ষাগ্রহণ ঘটে।

আবার শ্রীনিবাস-আচার্যের দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনের পরেই যে খেতুরি-মহামহোৎসব সংঘটিত হয়, এ বিষয়ে সকল গ্রন্থকারই একমত। 'প্রেমবিলাসে'র ঊনবিংশ বিলাসের[৫৪] বর্ণনাতেও দেখা যায় যে শ্রীনিবাস দ্বিতীয়বার বৃন্দাবনগমন করিলে, কিছুদিন পরে রামচন্দ্রও বৃন্দাবনে প্রেরিত হন এবং তাঁহারা প্রত্যাবর্তন করিলে খেতুরির মহামহোৎসব সংঘটিত হয়। এই বর্ণনা অন্যান্য গ্রন্থের বর্ণনার সহিত বিশেষভাবেই মিলিয়া যায়। অথচ চতুর্দশবিলাসে বর্ণিত হইয়াছে যে বনবিষ্ণুপুরে গ্রন্থচুরির পর শ্রীনিবাসের শ্রীখণ্ডে প্রত্যাবর্তনকালে লেখক সেই স্থলে উপস্থিত ছিলেন; এবং তাহারপর রামচন্দ্রের, ও তেলিয়াবুধরি হইতে আগত রামচন্দ্র-ভ্রাতা গোবিন্দের দীক্ষা-গ্রহণাদি সম্পন্ন হইলে ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে খেতুরির মহামহোৎসব আরম্ভ হয়। এই সমস্ত স্ববিরোধী বর্ণনা হইতে 'প্রেমবিলাসে'র এতৎসংক্রান্ত ঘটনাবিন্যাসকে যথাযথ বা সময়ানুক্রমিক বলিয়া ধরা চলে না। জাহ্নবা-ঠাকুরাণীর বৃন্দাবনগমন-বর্ণনার মধ্যেও এইরূপ সময়গত ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। পঞ্চদশবিলাসের প্রারম্ভে তাঁহার দ্বিতীয়বার বৃন্দাবনযাত্রার উল্লেখের পর ষোড়শ বিলাসের মধ্যে তাঁহার প্রথমবার বৃন্দাবনগমনের কথা বর্ণিত হইয়াছে।[৫৫] শ্রীনিবাসের দুইবার বৃন্দাবনগমন-সম্পর্কিত ঘটনাবলীর বর্ণনা পাঠে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে

(৫২) কর্ণ.—১ম.নি., পৃ. ৫-৭ ; ভ. মা.—পৃ. ২০৮-৯ (৫৩) ৬ষ্ঠ. ম., পৃ.৩৮ (৫৪) পৃ. ৩০৪-৫ (৫৫) ১৫শ. বি., পৃ. ২১২ ; ১৬শ. বি., পৃ. ২২১

গ্রন্থকার (বা লিপিকার ?) দুইবারের বহু ঘটনাকে একত্রিত করিয়া একবারের মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

যাহাহউক, দীক্ষাগ্রহণের পর রামচন্দ্র শ্রীনিবাসের সহিত অবস্থান করিতে লাগিলেন। শ্রীনিবাসের বিষ্ণুপুর-সঙ্গী ব্যাসাচার্যও তথায় উপস্থিত ছিলেন। যাজিগ্রামে থাকিয়া তিনজনের মধ্যে নানাবিধ শাস্ত্রালোচনা চলিতে লাগিল।[৫৬] এই সময় একদিন হাম্বীরের নিকট হইতে পত্রবাহক আসিয়া[৫৭] জানাইল যে শ্রীনিবাসের বিষ্ণুপুর-অবস্থানকালেই রাজা গ্রন্থপ্রাপ্তির সংবাদদান নিমিত্ত বৃন্দাবনে যে দুইজন লোক পাঠাইয়াছিলেন তাহারা জীব-গোস্বামীর দুইটি পত্রসহ প্রত্যাবর্তন করিয়াছে, শ্রীনিবাসকেও শ্রীজীব পত্র লিখিয়াছেন। হাম্বীরও শ্রীনিবাসকে একটি পৃথক পত্রে বিষ্ণুপুর-গমনের অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। শ্রীনিবাস হাম্বীরকে প্রত্যুত্তর দিয়া পত্রবাহককে বিদায় দিলেন। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই শুক্লাম্বর-ব্রহ্মচারী, গদাধরদাস এবং নরহরি-সরকার-ঠাকুরের তিরোভাবে[৫৮] শোকাভিভূত হইয়া শ্রীনিবাস পুনরায় বৃন্দাবনের অভিমুখে যাত্রা আরম্ভ করিলেন।[৫৯]

'প্রেমবিলাস'-কার বলেন যে ইতিপূর্বে এক গৌড়বাসী বৈষ্ণব বৃন্দাবনে গিয়া শ্রীনিবাস কর্তৃক রামচন্দ্রের ও হাম্বীরের প্রভাবিত হইবার কথা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।[৬০] তাহার পর বৃন্দাবনের 'পূজারীঠাকুর-শিষ্য কৃষ্ণদাস' এবং 'ভূগর্ভঠাকুর-শিষ্য রামদাস' নামক দুইজন বৈষ্ণব গৌড়-নীলাচল ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া জীব, গোপাল-ভট্ট, লোকনাথ প্রভৃতি গোস্বামী-গণের বার্তা বহন করিয়া ক্রমে ক্রমে খেতুরিতে নরোত্তম রামচন্দ্র, যাজিগ্রামে শ্রীনিবাস এবং উৎকলে শ্যামানন্দ ও রসিকানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন[৬১] এবং নরোত্তম শ্রীনিবাসাদি সকলকে গোস্বামী-বৃন্দের আশীর্বাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নিকট হইতে শ্রীনিবাস স্বীয় গুরু গোপাল-ভট্টাদির সংবাদ ও আশীর্বাদ প্রাপ্ত হন। কিন্তু গ্রন্থকার আরও একটি সংবাদ দিয়াছেন[৬২] যে শ্রীনিবাসের বৃন্দাবন-গমনের পূর্বেই জাহ্নবা-শিষ্য বিষ্ণুপুর-সন্নিকটস্থ আউলিয়া-চৈতন্যদাস[৬৩] নামক এক বৈষ্ণবভক্ত বৃন্দাবনে পৌঁছাইলে গোপাল-ভট্ট-গোস্বামী তাঁহাকে শ্রীনিবাসাদির কথা জিজ্ঞাসা করেন। চৈতন্যদাস তখন তাঁহাকে বিষ্ণুপুরে শ্রীনিবাস-প্রভাবের কথা জানাইয়া সংবাদ দেন যে শ্রীনিবাস সম্প্রতি বিবাহ করিয়াছেন। শেষোক্ত সংবাদ শ্রবণ করিয়া ভট্ট-গোস্বামী মুহ্যমান হইয়া পড়েন। পরে চৈতন্যদাস বৃন্দাবন-পরিক্রমার পর বিষ্ণুপুরে প্রত্যাবর্তন

(৫৬) প্রে. বি.—১৪শ. বি., পৃ. ১৮৯-৯২ (৫৭) ভ. র.—৯।২৮ (৫৮) ঐ—৯।৫৩, ৫৪, ৬৩ (৫৯) ঐ—৯।৭১ (৬০) ১৭শ. বি., পৃ. ২৩৮-৩৯ (৬১) ঐ—পৃ. ২৪০-৪৬ (৬২) ১৬শ. বি., পৃ. ২৩৫-৩৭ (৬৩) ইঁহার সম্বন্ধে নারায়ণ-পণ্ডিতের জীবনী দ্রষ্টব্য।

করিয়া রাজা-হাম্বীরের সহিত সাক্ষাৎ করিলে রাজা তাঁহাকে আচার্য-ঠাকুরের নিকট লইয়া যান। সেইস্থানে তিনি বলিলেন যে বিবাহের কথা শুনিয়া ভট্ট-গোস্বামী আসন হইতে উঠিয়া 'দণ্ডবৎ হই'লেন এবং

স্খলৎ স্খলৎ বাক্য লাগিলা কহিতে ॥

তখন শুনিয়া ঠাকুর কহে করি হায় হায়।

আপন অভাগ্য দোষ নিবেদিব কায় ॥
আজ্ঞা নাহি প্রভুর করিল হেন কার্য।
কহিতে প্রভুর আজ্ঞা অভাগ্যেতে ধার্য ॥
ইহা বলি হায় হায় করয়ে রোদন।
আর কি দেখিব সেই যুগল চরণ ॥
শ্রীনিবাস প্রতি প্রভু হৈল নির্দয়।

একমাত্র 'প্রেমবিলাসে' প্রদত্ত এই সংবাদ কতদূর সত্য বলা যায় না। সংবাদ সত্য হইলে বলিতে হয় যে শ্রীনিবাস দ্বিতীয়বার বৃন্দাবনগমনের সময় বিষ্ণুপুরপথে যাত্রা করেন। কিন্তু শ্রীনিবাসের বিবাহ-সম্পর্কিত বিষয়ে যে তাঁহার গুরু গোপাল-ভট্ট-গোস্বামীর নিষেধাজ্ঞা ছিল, 'প্রেমবিলাসে'র বর্ণনায় সম্ভবত তাহাই প্রতিপন্ন হয়। গ্রন্থকার বলিতেছেন[৬৪] যে সুলোচন-রঘুনন্দনাদি শ্রীনিবাসের বিবাহ-প্রস্তাব উত্থাপন করিলে

আচার্য কহেন প্রভুর আজ্ঞা নাহি মোরে।
এই লাগি ভয় মোর হয়ে ত অন্তরে ॥

সম্ভবত এখানে 'প্রভু' বলিতে গোপাল-ভট্টকেই বুঝাইতেছে। কিন্তু তাহা না বুঝাইলেও যাঁহার দ্বারাই হউক না কেন, তাঁহাকে যে পূর্বে বিবাহ সম্বন্ধে নিষেধ করা হইয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এই সম্বন্ধে 'অনুরাগবল্লী'র বর্ণনায়ও[৬৫] স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। তদনুযায়ী জানা যায় যে শ্রীনিবাস বৃন্দাবনে গিয়া গোপাল-ভট্টের সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি তাঁহাকে প্রথমে অভিনন্দন জানান। কিন্তু তাঁহার সহিত কথাবার্তা চলিতে থাকিলে গোপাল-ভট্ট

পুন প্রশ্ন করিলা তুমি বিবাহ করিয়াছ।
ইঁহ কহে নাহি করি, কি কারণে পুছ ॥

'অনুরাগবল্লী'-বর্ণিত এইরূপ প্রশ্ন অনুধাবন করিলে 'প্রেমবিলাসে'র বর্ণনাকে সত্য বলিয়াই ধারণা জন্মে। আউলিয়া-চৈতন্যদাসের কথায় খুব সম্ভবত গোপাল-ভট্টের মন হতাশায়

(৬৪) ১৭শ. বি., পৃ. ২৪৮ (৬৫) ৬ষ্ঠ. ম., পৃ. ৩৮-৪০

ভরিয়া গিয়াছিল। কিন্তু তিনি এখন শ্রীনিবাসের কথায় আশ্বস্ত হইলেন এবং একদিন শ্রীনিবাসকে

কহিলেন রাধারমণের অধিকারী।
করিল তোমারে আমি মনেতে বিচারি ॥
আমার অবিদ্যমানে যত অধিকার।
সেবার যে কিছু ভার সকল তোমার ॥

কিন্তু এদিকে যাজিগ্রামে একদিন শ্রীনিবাস-পত্নী দ্রৌপদী রামচন্দ্র-কবিরাজকে ডাকাইয়া 'সব মনদুঃখ তাঁকে নিভৃতে কহিল', এবং তিনি শ্রীনিবাসের তত্ত্ব লইবার জন্য তাঁহাকে বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দেন।[৬৬] রামচন্দ্র বৃন্দাবনে পৌছাইয়া গোপাল-ভট্টকে জানাইলেন যে শ্রীনিবাস দারপরিগ্রহ করিয়াছেন। তখন ভট্ট-গোস্বামীর সকল আশা সমূলে বিনষ্ট হইয়া গেল। তিনি শ্রীনিবাসকে ডাকাইয়া জানিতে চাহিলেন, তাঁহার এইরূপ মিথ্যা কথা বলিবার কারণ কি। তখন

ঠাকুর কহয়ে তোমার চরণ বন্দন।
গোপাল গোবিন্দ গোপীনাথ দরশন ॥
শ্রীজীব গোসাঞি সঙ্গ বৃন্দাবন বাস।
সভার সহিত কৃষ্ণ-কথায় বিলাস ॥
এত লভ্য হয় এক অসত্য বচনে।
এই লোভে কহিয়াছো সংকোচিত মনে।

উক্তি হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে বিবাহের কুফল সম্বন্ধে শ্রীনিবাস পূর্ব হইতেই অবহিত ছিলেন। তিনি শেষ পর্যন্ত গোপাল-ভট্টের নিকট মার্জনা লাভ করিলেন, কিন্তু দারপরিগ্রহ করায় তাঁহাকে গোপাল-ভট্ট-প্রতিষ্ঠিত (?) রাধারমণের অধিকারী নিযুক্ত করা আর সম্ভব হইল না। কারণ, 'বৈরাগী নহিলে' সেই কার্যের 'অধিকারী' হওয়া বিধি-বহির্ভূত ছিল। তাই

আচার্য ঠাকুরের পরমার্থ শ্রীগোপীনাথ পূজারী।
তাহাকে আচার্য ঠাকুর করাইল অধিকারী ॥

পরে পূজারী-গোসাঁয়ের[৬৭] ভ্রাতা দামোদর-গোসাঁই হরিরাম ও মথুরাদাস নামক তাঁহার দুই পুত্রকে সঙ্গে লইয়া বৃন্দাবনে আসিলে পূজারী-গোসাঁই হরিরামকেই (হরিনাথ?) সেবার অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন এবং এইভাবে ইঁহারাই ক্রমে 'বংশ-অধিকারী' হইয়া যান।[৬৮] 'প্রেমবিলাস' এবং 'নরোত্তমবিলাসে' কিন্তু একজন মথুরাদাসকে নরোত্তম-

(৬৬) দ্র.—রামচন্দ্র-কবিরাজ (৬৭) ইনিই কি ভূগর্ভ-শিষ্য চৈতন্যদাস? দ্র.—চৈতন্যদাসের জীবনী
(৬৮) অ. ব.—৬ষ্ঠ. ম., পৃ. ৪০

শাখাভুক্ত করা হইয়াছে[৬৯] এবং প্রথমোক্ত গ্রন্থে একজন 'হরিরাম'কে শ্রীনিবাসের শাখাভুক্ত করা হইয়াছে।[৭০] এই মথুরাদাস ও হরিরাম উপরোক্ত 'অনুরাগবল্লী'-উল্লেখিত মথুরাদাস এবং হরিরাম কিনা বলা শক্ত। 'অনুরাগবল্লী'র শ্রীনিবাসশাখা-বর্ণনার মধ্যে কিন্তু হরিরামেরও কোন উল্লেখ নাই।

বৃন্দাবনে কিন্তু শ্রীনিবাসের মর্যাদা বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। পরবর্ত্তি-কালে জীব-গোস্বামীর সহিত শ্রীনিবাসের যে পত্র বিনিময় চলিত[৭১] তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে জীব-গোস্বামী চিরকালই তাঁহাকে গৌড়ে ভক্তি-প্রচারের সর্বোত্তম সহায়ক মনে করিয়া বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গ্রন্থাদি প্রেরণ করিয়াছেন এবং নানাবিধ উপদেশ দান করিয়াছেন। অন্য ভক্তবৃন্দের মধ্যেও ধর্মমতাদি বিষয়ে কলহ ঘটিলে তিনি শ্রীনিবাসের নিকটই তাঁহাদের সমস্যা সমাধান করিয়া লইতে নির্দেশ দান করিয়াছেন। সুতরাং বৃন্দাবনে সম্ভবত শ্রীনিবাসের মর্যাদা অক্ষুণ্ণই রহিয়াছিল। এমন কি এইবারে ব্যাসাচার্যও বৃন্দাবনে গিয়া জীবের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিতে চাহিলে জীব শ্রীনিবাসকে আপনার সহিত অভিন্ন বলিয়া মন্তব্য করিলেন এবং তিনি ব্যাসাচার্যকে 'আপনে সাক্ষাৎ থাকি সেবক করাইল'।[৭২] জীব-গোস্বামী সম্ভবত এই সময়ে 'গোপালচম্পূ'-গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন।[৭৩] তিনি তাহা শ্রীনিবাসকে দেখাইয়া তাঁহার সহিত অন্যান্য গ্রন্থ সম্বন্ধেও আলোচনা করিলেন। তারপর বৈশাখী-পূর্ণিমা তিথিতে রাধারমণের সিংহাসন-যাত্রা উপলক্ষে মহামহোৎসব সম্পন্ন হইয়া গেলে জীব-গোস্বামী শ্রীনিবাসকে গৌড়ে চলিয়া যাইবার জন্য নির্দেশ-দান করিলেন। বিদায়কালে তিনি গৌড়ে প্রচারার্থ কিছু গ্রন্থও শ্রীনিবাসের হস্তে অর্পণ করিলেন। 'ভক্তিরত্নাকর' হইতে জানা যায় যে তিনি এইবারেও 'শ্যামানন্দে সমর্পিলা আচার্যের ঠাঁই'।[৭৪]

এইবার তিনি বিষ্ণুপুরে পৌঁছাইয়া রাজা-হাম্বীর, রাণী-সুলক্ষণা এবং রাজপুত্র ধাড়ী-হাম্বীরকে দীক্ষিত করেন এবং হাম্বীর তাঁহার গৃহে 'শ্রীকালাচাঁদের সেবা প্রকাশ' করিলে শ্রীনিবাসই তাহার অভিষেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। তিনি এইবার বিষ্ণুপুরস্থ আরও অনেক ব্যক্তিকে দীক্ষাদান করিয়া 'অনেক জনের পূর্ণ কৈল অভিলাষ'।[৭৫] সম্ভবত এইবারেই ব্যাসাচার্যের পত্নী ইন্দুমুখী ও পুত্র শ্যামাদাসও শ্রীনিবাস কর্তৃক দীক্ষিত

(৬৯) প্রে. বি.—২০শ. বি., পৃ ৩৫৫ ; ন. বি.—১১শ. বি., পৃ. ১৯৩ (৭০) ২০শ. বি., পৃ. ৩৫১ (৭১) প্রে. বি.—অর্থবিলাস পত্র, পৃ. ৩০২-৩০৮ ; কর্ণ.—৫ম. নি., পৃ. ৯২-৯৬ ; ভ. র.—১৪।১৪-৪০ (৭২) অ. বি.—৬ষ্ঠ. ম., পৃ. ৪০ (৭৩) ভ. র.—৯।১০৭ (৭৪) ৯।১২৩ ; পূর্বে এই সম্বন্ধে আলোচিত হইয়াছে। (৭৫) ৯।২৬০, ৩০০

হইলেন।[৭৬] এই সময়ে শিখর-ভূমির রাজা ছিলেন হরিনারায়ণ। 'আচার্যের স্থানে শিষ্য হইতে তাঁর মন'।[৭৭] কিন্তু তিনি রাম-মন্ত্রে দীক্ষিত হইবার বাসনা প্রকাশ করিলে শ্রীনিবাস উদ্যোগী হইয়া রঙ্গক্ষেত্র হইতে ত্রিমল্ল-ভট্টের পুত্রকে আনাইয়া তাঁহারই দ্বারা হরিনারায়ণকে দীক্ষিত করিলেন। ত্রিমল্ল-তনয় পঞ্চকুটে আসিয়া

হরিনারায়ণে অনুগ্রহ প্রকাশিয়া।
শ্রীনিবাস আচার্যে দিলেন সঁপিয়া ॥

এই হরিনারায়ণ সম্বন্ধে 'ভক্তিরত্নাকর'-প্রণেতা জানাইতেছেন[৭৮] :

হরিনারায়ণ রাজা বৈষ্ণব প্রধান।
রামচন্দ্র বিনা তিঁহ না জানয়ে আন ॥......
হরিনারায়ণ কবিরাজে নিবেদিলা।
শ্রীরামচরিত্রগীত তারে বর্ণি দিলা ॥

'ভক্তিরত্নাকরে' গোবিন্দ-কবিরাজকৃত গীতটিও উদ্ধৃত হইয়াছে। ভণিতাংশে গোবিন্দদাস হরিনারায়ণের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন :

গোবিন্দদাস হৃদয়ে অবধারল
হরিনারায়ণ অধিদেবা।

এইবার শ্রীনিবাস বিষ্ণুপুরে থাকিয়া বিষ্ণুপুর-অঞ্চলটিকে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন। হাম্বীর তাঁহাকে 'গ্রাম-ভূমি-সামগ্রী' প্রভৃতি অর্পণ করিয়া তাঁহার জন্য 'বিষ্ণুপুর মধ্যে উপযুক্ত গৃহ নির্মাণ করিয়া দিলে'[৭৯] সেই স্থানে তাহার ইচ্ছানুযায়ী স্থায়িবাসেরও ব্যবস্থা হইয়া গেল।

বিষ্ণুপুর হইতে গৌড়ে ফিরিয়া শ্রীনিবাস প্রথমে যাজিগ্রামে আসিলেন। তারপর তিনি শ্রীখণ্ডে রঘুনন্দনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আবার কণ্টকনগরে গেলেন। তখন সেইস্থানে গদাধরদাসের শিষ্য রঘুনন্দন-চক্রবর্তী গুরুর তিরোভাবতিথি-মহামহোৎসবের আয়োজনে ব্যস্ত ছিলেন। শ্রীনিবাস তাঁহার সহিত সেই বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া যাজিগ্রামে ফিরিলেন এবং বিষ্ণুপুরে 'সমাচারপত্রী' পাঠাইয়া রঘুনন্দনের সহিত উক্ত বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন। তারপর তিনি পুনরায় যথাসময়ে কণ্টকনগরে গিয়া উৎসবে যোগদান করিলেন এবং উৎসবটিকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিলেন। ইহার অল্পকাল পরেই শ্রীখণ্ডে নরহরি-সরকার-ঠাকুরের তিরোভাবতিথি-মহামহোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। সেইস্থলে শ্রীনিবাসের ভাগবতপাঠ ও ব্যাখ্যা শুনিয়া সকলে বিস্মিত হন এবং সমগ্র গৌড়-মণ্ডলের বৈষ্ণবসমাজ উপলব্ধি করিলেন যে তিনিই প্রকৃতপক্ষে চৈতন্যপ্রবর্তিত ধর্মের

(৭৬) দ্র.—বীর-হাম্বীর (৭৭) ভ. র.—৯।৩০৩ (৭৮) ঐ—১।৪৫৪-৬০ (৭৯) দ্র.—বীর-হাম্বীর

যথার্থ উত্তরসাধক এবং উপযুক্ত ধারক ও বাহক। এই উৎসবে স্বয়ং রঘুনন্দন-ঠাকুর তাঁহার গলায় চন্দনচর্চিত মাল্য পরাইয়া দিলে[৮০] তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে কাঁহারও কোন সংশয় থাকিল না। উৎসবান্তে শ্রীনিবাস শ্রীখণ্ড হইয়া যাজিগ্রামে ফিরিলেন। এইবার যাজিগ্রামে বসিয়া তাঁহার অধ্যয়ন-অধ্যাপনা এবং ভক্তিধর্মের প্রচার চলিতে লাগিল।

দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন-গমনকালে শ্রীনিবাস দ্বিজ-হরিদাসাচার্যের তিরোভাব-সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এখন তিনি গোকুলানন্দ ও শ্রীদাসকে ডাকিয়া তাঁহাদের স্বর্গীয় পিতৃদেবের তিরোভাবতিথি-পালনের জন্য নির্দেশ দান করিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে কাঞ্চনগড়িয়া পাঠাইয়া দিলেন এবং নিজেও যথাসময়ে সেইস্থানে উপনীত হইয়া উৎসব সুসম্পন্ন করিলেন। এই উপলক্ষে গোকুলানন্দ ও শ্রীদাস তাঁহার নিকট মন্ত্রদীক্ষা প্রাপ্ত হইলেন।

উৎসবান্তে শ্রীনিবাস খেতুরির পথে যাত্রা করিয়া পথিমধ্যে তেলিয়াবুধরিতে রামচন্দ্র-কবিরাজের গৃহে রামচন্দ্রের প্রতীক্ষারত. ভ্রাতা গোবিন্দকে রাধাকৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন।[৮১] 'প্রেমবিলাস' হইতে জানা যায়[৮২] যে রামচন্দ্রের পত্নী রত্নমালা এবং গোবিন্দের পত্নী মহামায়া ও পুত্র দিব্যসিংহও শ্রীনিবাস কর্তৃক দীক্ষিত হন। কিন্তু তাঁহাদিগের দীক্ষাগ্রহণের কাল সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় নাই। সম্ভবত তাহা এই সময়েই ঘটে। এদিকে নরোত্তম বুধরিতে আসিয়া খেতুরি-উৎসবের আয়োজন সম্পর্কে নানাবিধ আলোচনা করিলেন। তারপর শ্রীনিবাস একদিন কি বুঝিয়া স্বশিষ্য রামচন্দ্রকে নরোত্তমের হস্তে সমর্পণ করিয়া উভয়কেই খেতুরিতে পাঠাইয়া দিলেন। তিনি নিজে আর কিছুদিন বুধরিতে থাকিয়া রামচন্দ্রানুজ গোবিন্দকে কৃষ্ণচৈতন্যলীলা-বর্ণনার আদেশ দান করিলেন এবং এ বিষয়ে গোবিন্দের সাফল্য দর্শন করিয়া তাঁহাকে 'কবিরাজ'-আখ্যা প্রদান করিলেন।[৮৩] ইহার পর নিকটবর্তী বাহাদুরপুর হইতে 'বিপ্রশ্রেষ্ঠ শ্যামাদাস'-ভ্রাতা বংশীদাস-চক্রবর্তী বুধরিতে আসিলে তিনি তাঁহাকেও মন্ত্রদীক্ষা দান করিয়া শিষ্যবৃন্দসহ খেতুরিতে পৌঁছাইলেন।

খেতুরির মহামহোৎসবে শ্রীনিবাস হইলেন প্রধান আচার্য।[৮৪] অভিষেকের পূর্বদিন রাত্রিকালে তিনি খোল-করতাল-পূজা সম্পন্ন করিয়া পরদিন প্রভাতে নরোত্তমের সহিত ভক্তবৃন্দকে বস্ত্র পরিধান করাইলেন। ক্রমে সময় উপস্থিত হইলে তিনি জাহ্নবাদি সকল মহান্তের নিকট অনুমতি গ্রহণ করিয়া 'শ্রীরূপ গোস্বামী-কৃত গ্রন্থাদি বিধানে' ষড়্-বিগ্রহের

(৮০) ভ. র.—৯।৫৯৭ (৮১) দ্র.—রামচন্দ্র-কবিরাজ (৮২) ২০শ. বি., পৃ. ৩৪৭ (৮৩) দ্র.—রামচন্দ্র-ও গোবিন্দ-কবিরাজ (৮৪) প্রে. বি.—১৪শ. বি., পৃ. ২০২ ; ১৯শ. বি., পৃ. ৩১০-১৪ ; ভ. র.—১০।৪৮০, ৬৬৭

অভিষেক ও আরতি সম্পন্ন করিলেন।[৮৫] তাহার পর আচার্য হিসাবে তিনি মাল্যচন্দন আনিয়া খোল স্পর্শ করাইলে নৃত্য আরম্ভ হইল। নৃত্যান্তে কাণ্ডক্রীড়া। তাহার পর শ্রীনিবাস-আচার্য সন্ধ্যারতি ও 'প্রভুজন্মতিথি অভিষেকাদি' সুসম্পন্ন করিলেন।

পরদিন প্রভাতে শ্রীনিবাস জাহ্নবার ইচ্ছানুযায়ী রন্ধন-সামগ্রীর আয়োজন করিয়া দিলে জাহ্নবাদেবী রন্ধন ও ভোগদান করিলেন, এবং শ্রীনিবাসের তত্ত্বাবধানে বৈষ্ণববৃন্দের ভোজন সমাপ্ত হইলে উৎসবও সম্পন্ন হইয়া গেল। তারপর জাহ্নবাদেবী শ্রীনিবাসকে ডাকিয়া পাঠাইলে শ্রীনিবাস নরোত্তম এবং শ্যামানন্দকে লইয়া গিয়া তাঁহার বৃন্দাবন-গমনেচ্ছার কথা অবগত হইলেন। কিন্তু পরদিন ভক্তবৃন্দের পৃথক পৃথক বাসায় ভোজদানের ব্যবস্থা হইলে শ্রীনিবাস তাহার তত্ত্বাবধান করিলেন এবং ভোজনান্তে নরোত্তমকে বলিলেন যে পরদিন প্রভাতে বিদায়ী ভক্তবৃন্দ পদ্মাবতী-তীরে গিয়া স্নানাহার করিবেন, সুতরাং তাঁহাদিগের জন্য পক্কান্ন পাঠাইয়া দিলে ভাল হয়।[৮৬] তদনুযায়ী ব্যবস্থা হইলে পরদিন যথাকালে শ্রীনিবাস, নরোত্তম-শ্যামানন্দ প্রভৃতিকে লইয়া পদ্মাতীরে ভক্তবৃন্দকে স্নানাহার করাইয়া ও বিদায় দিয়া খেতুরিতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। পরবর্তী দিবসে রামচন্দ্র এবং গোবিন্দ বুধরি হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে তাহারও পরের দিন শ্রীনিবাস জাহ্নবাদেবীকে বিদায়-সংবর্ধনা জ্ঞাপন করিলেন। কতিপয় ভক্ত তখনও খেতুরিতে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীনিবাস তাঁহাদিগকে নানাপ্রকার নির্দেশ দান করিয়া পরদিবস প্রাতে তাঁহাদিগকেও বিদায় দিলেন। কিন্তু তিনি স্বয়ং খেতুরিতে থাকিয়া নরোত্তম এবং রামচন্দ্রকে তাঁহাদের ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে সকল প্রকার নির্দেশ দান করিলেন। নিজের ভবিষ্যৎ গতিবিধি সম্বন্ধেও তিনি তাঁহাদিগকে সমস্ত কিছু জানাইয়া বলিলেন যে তিনি শ্যামানন্দ সহ বুধরি হইয়া যাজিগ্রামে যাইবেন এবং তথা হইতে শ্যামানন্দকে নবদ্বীপ-অম্বিকার দিকে প্রেরণ করিয়া তিনি নিজে বিষ্ণুপুরে গমন করিবেন। উৎকলে ভক্তিধর্ম-প্রচার সম্পর্কে তিনি শ্যামানন্দকেও নানাবিধ উপদেশ প্রদান করিলেন এবং পরস্পরের কৃত-কর্মাদি বিষয়ে পরস্পরকে অবহিত করিবার জন্য পত্রপ্রেরণের ব্যবস্থা অব্যাহত রাখিতে বলিলেন। এইভাবে ভক্তিধর্ম প্রচারাদি বিষয়ে সম্ভাব্য সকল প্রকার আলোচনা শেষ করিয়া তিনি শ্যামানন্দকে সঙ্গে লইয়া খেতুরি হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।[৮৭] নরোত্তম তাঁহার বিচ্ছেদ-ভাবনায় কাতর হইলে তিনি তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলেন[৮৮] :

> তিন ঘর হৈল তাহা কহিয়ে বিশেষে।
> খেতরি যাজিগ্রাম বিষ্ণুপুর তিন দেশে ।......

(৮৫) ন. বি.—৬ষ্ঠ. বি., পৃ. ৯০-৯২ (৮৬) ঐ—৮ম. বি., পৃ. ১০৯ (৮৭) ন. বি.—৮ম. বি., পৃ. ১২২-২৩ (৮৮) প্রে. বি.—১৪শ. বি., পৃ. ২০৭

গৌরাঙ্গ আশ্রয় আর মাতার পিরিতি।
বিষ্ণুপুরে রহি রাজার নবীন ভকতি॥
একবার যাই আমি আসিব পুনর্ব্বার।

উক্তি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে তখনও শ্রীনিবাস-জননী জীবিতা ছিলেন।

এই ঘটনার বেশ কিছুকাল পরে বৃন্দাবন-প্রত্যাগত জাহ্নবা-ঠাকুরাণী কণ্টকনগরে পৌঁছাইলে শ্রীনিবাস সেইস্থানে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। সম্ভবত তিনি ইতিমধ্যে বিষ্ণুপুরে গিয়া প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। কণ্টকনগরে তাঁহার সহিত নরোত্তম রামচন্দ্র এবং গোবিন্দের সাক্ষাৎ ঘটে এবং তাঁহারা তাঁহাকে জীব-গোস্বামী-প্রেরিত 'গোপাল বিরুদাবলী' গ্রন্থখানি প্রদান করেন।[৮৯] তারপর শ্রীনিবাস জাহ্নবাকে যাজিগ্রামে আনিয়া পত্নী দ্রৌপদীসহ কিছুদিন যাবৎ তাঁহার সেবা করিলেন এবং কয়েকদিন পরে জাহ্নবার বিদায়কালে তিনি তাঁহাকে জানাইলেন যে তিনি অচিরেই একবার নবদ্বীপে গিয়া গৌরাঙ্গের গৃহভৃত্য ঈশানের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।[৯০]

করিলা ঈশানে আজ্ঞা আমারে যাইতে।
তথা গিয়া আসি যাব খেতরি গ্রামেতে॥
কথো দিন রহি তথা বিষ্ণুপুর গিয়া।
রহিব এথাই তথা হইতে আসিয়া॥

জাহ্নবা চলিয়া গেলে শ্রীনিবাস বিষ্ণুপুরে সংবাদ পাঠাইলেন এবং বিষ্ণুপুর হইতে সংবাদ আসিল যে হাম্বীর কিছুকাল-মধ্যে যাজিগ্রামে আসিবেন। শ্রীনিবাস তাঁহার শিষ্যবৃন্দকে এই সংবাদ জানাইলেন এবং শ্রীদাস গোকুলানন্দ প্রভৃতি শিষ্যকে 'শাস্ত্রানুশীলন হেতু' যাজিগ্রামে রাখিয়া নরোত্তম-রামচন্দ্র সহ শ্রীখণ্ড হইয়া নবদ্বীপে পৌঁছাইলেন।[৯১] সেইস্থানে গৌরাঙ্গ-ভৃত্য ঈশানের সাহায্যে নবদ্বীপ-পরিক্রমা সমাপ্ত করিয়া তাঁহারা পুনরায় শ্রীখণ্ড হইয়া যাজিগ্রামে ফিরিয়া আসেন। এদিকে রাজা-হাম্বীরও শ্রীনিবাসের জন্য নানাবিধ উপঢৌকনাদি লইয়া যাজিগ্রামে পৌঁছাইলেন। কিছুদিন বেশ আনন্দে কাটিল। তারপর একদিন রাধিকামূর্তি সহ জাহ্নবা-প্রেরিত পরমেশ্বরীদাস বৃন্দাবনের পথে কণ্টকনগরে পৌঁছাইলে শ্রীনিবাস, নরোত্তম-রামচন্দ্রসহ তাঁহাদিগকে বিদায় জ্ঞাপন করিয়া আসিলেন।[৯২] তাহার কিছুপরে হাম্বীরের বিদায়গ্রহণকালে রাণী-সুলক্ষণা শ্রীনিবাস-পত্নী ঈশ্বরীকে নানাবিধ অলংকারাদি প্রদান করিয়া গেলেন। পরদিন প্রভাতে শ্রীনিবাস শ্রীখণ্ডে রঘুনন্দন-

(৮৯) ভ. র.—১১।৬৮০ (৯০) ঐ—১১।৭২৩-২৪ (৯১) ঐ—১২।২৬ (৯২) ন. বি.-কার (১০ম. বি., পৃ. ১৪৯) বলেন যে 'আচার্যের শিষ্য রাম-শ্রীরঘুনন্দন'-নামক দুই ব্যক্তি বৃন্দাবন হইতে আসিয়া জাহ্নবা-প্রেষিত বিগ্রহের সংবাদ প্রদান করিয়াছিলেন।

ঠাকুরকে প্রণাম জানাইয়া নরোত্তম-রামচন্দ্রের সহিত খেতুরি-অভিমুখে ধাবিত হইলেন। বুধরি হইয়া খেতুরিতে পৌঁছাইলে পর এক বংগদেশী পাষণ্ড-বিপ্র (কলানিধি-আচার্য[৯৩]) শ্রীনিবাসচরণে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

খেতুরি হইতে প্রত্যাবর্তনপথে শ্রীনিবাস বুধরি ও কাঞ্চনগড়িয়া[৯৪] হইয়া যাজিগ্রামে ফিরিয়াই রঘুনন্দনের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ইহাই রঘুনন্দনের সহিত তাঁহার শেষ সাক্ষাৎকার। কিছুদিন পরে রঘুনন্দনের তিরোভাব ঘটিলে তিনি শ্রীখণ্ডেই থাকিয়া মহামহোৎসব সুসম্পন্ন করেন। উৎসব-শেষে তিনি যাজিগ্রামে ফিরিয়া পুনরায় বিষ্ণুপুরে গমন করেন। এইবার বিষ্ণুপুরে থাকিয়া তিনি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। রাঢ়-দেশের অন্তর্গত গোপালপুর গ্রামনিবাসী রাঘব-চক্রবর্তী বা রঘুনাথ-বিপ্রের কন্যা গৌরাঙ্গপ্রিয়ার সহিত তাঁহার পরিণয় ঘটে। রাঘবের পত্নীর নাম ছিল মাধবী। 'ভক্তিরত্নাকরে' লিখিত হইয়াছে[৯৫] :

একদিন শ্রীআচার্য ঠাকুর স্বপ্নেতে।
করয়ে বিবাহ গৌরচন্দ্রের আজ্ঞাতে॥

তাহার পর রাঘব এবং মাধবীও স্বপ্নদর্শন করিয়া তদনুযায়ী শ্রীনিবাসের নিকট গিয়া কন্যা-সম্প্রদানের প্রস্তাব করিলে

শুনিয়া আচার্য স্তব্ধ হইয়া রহিলা।
সর্ব মনোহিত লাগি বিবাহ করিলা॥

এই স্বপ্নবৃত্তান্তগুলির উপর জোর দেওয়া চলে না। 'প্রেমবিলাসে'র মত 'ভক্তিরত্নাকরে'ও বহু ঘটনাকেই স্বপ্ননির্ভর করা হইয়াছে। বিশেষ করিয়া আবার শ্রীনিবাস-সম্পর্কিত বহু-ঘটনাকে। তজ্জন্য উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে যথেষ্ট বর্ণনা-পার্থক্যও পরিলক্ষিত হয়। 'প্রেম-বিলাস'-কার বলিতেছেন[৯৬] যে 'গোপালপুর-নিবাসী রঘু-চক্রবর্তী'র কন্যা পদ্মাবতী নিজেই শ্রীনিবাসকে পতিরূপে পাইতে চাহিলে রঘু-চক্রবর্তী শ্রীনিবাসের নিকট কন্যাসম্প্রদানের প্রস্তাব করেন এবং শ্রীনিবাস পদ্মাবতীর পাণিগ্রহণ করেন। গ্রন্থমতে[৯৭] পিতা ও পুত্রী শ্রীনিবাসের নিকট দীক্ষাও গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু 'ভক্তিরত্নাকর'-প্রণেতা যেখানে জানাইতেছেন যে বিষ্ণুপুরেই রাজা-হাম্বীরের ব্যবস্থা ও তত্ত্বাবধানে বিবাহানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়, 'প্রেমবিলাস'-কার সেইস্থলে বলিতেছেন যে বিবাহ করিবার পর শ্রীনিবাস পদ্মাবতীকে 'লইয়া গেলা বিষ্ণুপুরের বাড়ী।' গোপালপুর কিংবা যাজিগ্রাম কোন্ স্থান হইতে

(৯৩) শ্রীনিবাসের কন্যাত্রয়ের বিবরণ-সম্পর্কে এবং শ্রীনিবাস-শাখা মধ্যে পরে ইহার কথা উল্লেখিত হইবে। (৯৪) তু.—ন. বি.—৯ম. বি., পৃ. ১৪৫ (৯৫) ১৩।২০২-১৭ (৯৬) ১৭শ. বি., পৃ. ১৪৯-৫১ (৯৭) ২০ শ. বি., পৃ. ৩৪৯

আনিলেন তাহার উল্লেখ নাই। বিবাহের সংবাদ-দানের পরেই 'প্রেমবিলাস'-কার লিখিতেছেন যে একবার বীরচন্দ্র বিষ্ণুপুরে পৌছাইলে তাঁহার অভিপ্রায় অনুযায়ী পদ্মাবতী তাঁহাকে স্বহস্তে রন্ধন করিয়া খাওয়ান এবং বীরচন্দ্র সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীনিবাসকে তাঁহার পুত্রকন্যা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে শ্রীনিবাস জানান যে তিনি নিঃসন্তান, বীরচন্দ্রপ্রভু কৃপা করিলেই তিনি পুত্রলাভ করিতে পারিবেন। বীরচন্দ্র তখন পদ্মাবতীর নাম পরিবর্তন করিয়া 'গৌরাঙ্গপ্রিয়া' রাখেন এবং তিনি তাঁহাকে চর্বিত-তাম্বুল প্রদান করিয়া গর্ভসঞ্চার করিলে দশমাস পরে পদ্মাবতী একটি পুত্রসন্তান লাভ করিলেন। পরে দেখা গেল যে সেই পুত্রের 'চলিবার কালে দক্ষিণ পদ বক্রগতি'। তখন বীরচন্দ্রই তাঁহার নামকরণ করিলেন 'গোবিন্দগতি'। 'নিত্যানন্দপ্রভুর-বংশবিস্তার' বা '-বংশমালা'[৯৮] হইতেও এইরূপ বিবরণের সমর্থন পাওয়া যায় বটে। কিন্তু এই সকল বিবরণের মধ্য হইতে সত্য আবিষ্কার করা কষ্টসাধ্য। অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে এই 'প্রেমবিলাসে'রই শ্রীনিবাসশাখা-বর্ণনার মধ্যে আবার লিখিত হইয়াছে যে শ্রীনিবাসের তিন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন বৃন্দাবন, মধ্যম রাধাকৃষ্ণাচার্য ও কনিষ্ঠই উপরোক্ত গতিগোবিন্দ। সুতরাং বীরচন্দ্র যখন শ্রীনিবাসকে পুত্র-কন্যার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তখন তিনি সম্ভবত পদ্মাবতী বা গৌরাঙ্গপ্রিয়ারই গর্ভজাত সন্তানের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এইরূপ কল্পনা করিয়া লইতে হয়। আর যদি এইরূপ অনুমান সত্য হয়, তাহা হইলে বলিতে পারা যায় যে গতি-গোবিন্দই পদ্মাবতী বা গৌরাঙ্গপ্রিয়ার একমাত্র পুত্র। 'অনুরাগবল্লী'-মতে[৯৯] গতি-গোবিন্দ ছিলেন শ্রীনিবাসের পুত্র-কন্যাদের মধ্যে কনিষ্ঠ।

'অনুরাগবল্লী'র অন্যত্রও বলা হইয়াছে[১০০] যে শ্রীনিবাসের অন্যান্য পুত্র অপ্রকট হইলে বংশরক্ষার্থ তাঁহাকে 'উপরোধ' করিয়া 'সকল মহান্ত মেলি পুন বিবাহ দিলা' এবং 'বীরভদ্র গোসাঞির বরে' গতি-গোবিন্দপ্রভুর জন্ম হয়। ইহা হইতেও উপরোক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থিত হয় বটে। কিন্তু 'অনুরাগবল্লী'র এই বর্ণনা নির্ভরযোগ্য নহে। এই গ্রন্থমতে কবিরাজ-ঠাকুরের অপ্রকটেরও পরে শ্রীনিবাসের দ্বিতীয় বিবাহ ঘটে। অথচ 'প্রেমবিলাস'- এবং 'কর্ণানন্দ'-গ্রন্থ হইতে জানা যায়[১০১] যে শ্রীনিবাস একবার যখন তাঁহার দুই পত্নীকে লইয়াই বিষ্ণুপুরে অবস্থান করিতেছিলেন সেই সময় একদিন তিনি দিবস-রাত্রি ভাবাবেশে সংজ্ঞাহীন রহিলে শ্রীনিবাসপত্নী দ্রৌপদী পঞ্চমুখে রামচন্দ্র-কবিরাজের মাহাত্ম্য ঘোষণা করিয়া তাঁহাকেই আনাইয়া তাঁহার সাহায্যে শ্রীনিবাসের সম্বিৎ ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ হন।

(৯৮) নি. বি.—পৃ. ৩৬ ; নি. ব.—পৃ. ৭৭ (৯৯) ৭ম. ম., পৃ. ৪৪ (১০০) ৬ষ্ঠ. ম., পৃ. ৪২-৪৩
(১০১) প্রে. বি.—১৯শ. বি., পৃ. ২৯৮-৩০১ ; কর্ণ.—৩য়. নি., পৃ. ৩৬-৫৭ তু.—ভ. মা.—পৃ. ২০৮-৯

এই স্থলে দ্রৌপদীর উক্তি হইতে জানা যায় যে তিনি এবং গৌরাঙ্গপ্রিয়া উভয়েই তৎপূর্বে রামচন্দ্র-কবিরাজের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন। এই সময়েও দ্রৌপদী ও গৌরাঙ্গপ্রিয়া উভয়ে প্রচুর খাদ্য-সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া রামচন্দ্রকে আপ্যায়িত করেন এবং দুইজনেই রামচন্দ্রের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। দুইজনেই সন্নিকটে থাকিয়া শ্রীনিবাস-রামচন্দ্রের নিভৃত আলাপ-আলোচনাদিতেও যোগদান করেন। ইহা ছাড়াও 'নরোত্তমবিলাস' হইতে জানা যায়[১০২] যে বীরচন্দ্রপ্রভুর যাজিগ্রাম-আগমনকালে শ্রীনিবাসের দুই পত্নী, জ্যেষ্ঠ পুত্র বৃন্দাবন, অন্য পুত্র রাধাকৃষ্ণ ও কনিষ্ঠ পুত্র গতি-গোবিন্দ, এবং হেমলতাদি তিনজন কন্যাই তথায় উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং এই সকল প্রমাণ বলে বলা চলে যে রামচন্দ্রের জীবদ্দশাতেই শ্রীনিবাস তাঁহার পুত্র-সন্তানাদি পরিবেষ্টিত থাকিয়াই দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। সুতরাং 'অনুরাগবল্লী'র উক্ত বর্ণনা অসত্য বা সংশয়যুক্ত প্রমাণিত হয়। কিন্তু তাহাহইলেও অন্যান্য গ্রন্থ হইতেই জানা যায় যে গৌরাঙ্গপ্রিয়ার গর্ভজাত প্রথম এবং সম্ভবত একমাত্র সন্তান গতি-গোবিন্দই ছিলেন শ্রীনিবাসের কনিষ্ঠ পুত্র।

শ্রীনিবাস বিবাহ করিয়া যাজিগ্রামে প্রত্যাবর্তন করিলে পরমেশ্বরীদাস বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া তাঁহাকে বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার সংবাদ দান করেন[১০৩]। এই সময় তিনি যাজিগ্রামে বসিয়া রীতিমত অধ্যাপনা চালাইতে থাকেন এবং তাঁহার সহিত বৃন্দাবনস্থ জীব-গোস্বামীর কয়েকটি পত্র-বিনিময় ঘটে।[১০৪] সম্ভবত এই সময়েই বীরচন্দ্রও বৃন্দাবন-গমনোদ্দেশ্যে নবদ্বীপ শ্রীখণ্ডাদি হইয়া যাজিগ্রামে আসেন[১০৫]। শ্রীনিবাসের দুই পত্নী, জ্যেষ্ঠ পুত্র বৃন্দাবন, অন্য একজন পুত্র রাধাকৃষ্ণ ও কনিষ্ঠ পুত্র গতি-গোবিন্দ এবং হেমলতা, কৃষ্ণপ্রিয়া ও কাঞ্চনলতিকা নাম্নী তিন কন্যা সকলেই তখন যাজিগ্রামে উপস্থিত ছিলেন[১০৬]। তাঁহারা সকলে মিলিয়া বীরচন্দ্রের সংবর্ধনা করেন। কয়েকদিন পরে বীরচন্দ্র বিদায়-গ্রহণ করিলে শ্রীনিবাসও তাঁহার সহিত কণ্টকনগর ও বুধরি হইয়া খেতুরি পর্যন্ত গমন করেন। খেতুরি হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি কিছুকাল যাজিগ্রামে অতিবাহিত করেন এবং এই সময়ে একদিন পূর্ণিমা রজনীতে রামচন্দ্র-কবিরাজ ভাবাবেশে অস্থির হইলে দ্রৌপদীর প্রশ্নোত্তরে শ্রীনিবাস তাঁহাকে রামচন্দ্রের মর্মকথা বুঝাইয়া দেন[১০৭]। ইহার পর শ্রীনিবাস পুনরায় কাঞ্চনগড়িয়া হইয়া বুধরিতে পৌছাইলে নরোত্তম আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। তারপর তিনি বুধরি হইতে বোরাকুলি গমন করেন।

(১০২) ১১শ. বি., পৃ. ১৬৮, ১৭৫-৭৬ (১০৩) ভ. র.—১৩।২৩০ (১০৪) ন. বি.—১১শ. বি., পৃ. ১৬৭ (১০৫) ভ. র.—১৩।২৮৩-৯৩ (১০৬) ন. বি.—১১ শ. বি., পৃ. ১৬৮ (১০৭) ভ. র.—১৪।৫৮-৬৩

শ্রীনিবাসশাখা-বর্ণনার মধ্যে যে রামশরণের কথা উল্লেখিত হইয়াছে, তিনি যদি রামশরণ-চট্টরাজ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে 'অনুরাগবল্লী'র বর্ণনানুযায়ী বলিতে হয় যে তিনি ছিলেন শ্রীনিবাস-শিষ্য শ্রীকৃষ্ণদাস-চট্টরাজের পুত্র এবং শ্রীনিবাস-শিষ্য রামশরণ-চক্রবর্তীর শিষ্য। এই রামশরণ-চট্টরাজের নিকটেই 'অনুরাগবল্লী'র কবি দীক্ষিত হইয়া 'মনোহরদাস' নাম প্রাপ্ত হন।[১৯৮] কবি তাঁহার গ্রন্থে আত্মপরিচয়-বিবরণী প্রদান করিয়াছেন।[১৯৯] ডা. সুকুমার সেন মনে করেন যে এই মনোহরদাসই 'মনোহরদাস'-ভণিতাবিশিষ্ট বাংলা ও ব্রজবুলি পদগুলির রচয়িতা।[২০০]

'প্রেমবিলাসে'র অষ্টাদশবিলাসে হরবিংশ নামক শ্রীনিবাসের একজন প্রধান-শিষ্যের কথা বলা হইয়াছে।[২০১] তিনি 'ব্রজবাসী' ছিলেন এবং

গুরু আজ্ঞা না মানিয়া গেলা হরিবংশ।
আছিল অনেক গুণ সব হইল ধ্বংস॥

---

(১৯৮) অ. ব.—৬ষ্ঠ. ম., পৃ. ৪৯ (১৯৯) পৃ. ৪৯-৫০ (২০০) HBL—pp. 254, 255 (২০১) পৃ. ২৭৪-৭৫

নরোত্তম-দত্ত

'প্রেমবিলাসে' বর্ণিত হইয়াছে[1] যে মহাপ্রভু বৃন্দাবন-গমনোদ্দেশ্যে কানাইর-নাটকালাতে গিয়া নৃত্যকীর্তনকালে আচম্বিতে 'নরোত্তম' নাম ধরিয়া ডাকিতে থাকেন এবং তাহার পর সেই স্থান হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া গড়েরহাটের অন্তর্গত কুড়োদরপুর-গ্রামে পদ্মাস্নানকালে পদ্মাবতীর হস্তে প্রেমদান করেন।

তিনি পদ্মাবতীকে নির্দেশ দান করেন যে নরোত্তম ভূমিষ্ঠ হইলে যেন তাঁহাকে সেই প্রেম প্রত্যর্পণ করা হয়। পরে নরোত্তম বাল্যকালে একদিন পদ্মাস্নানে গেলে পদ্মাবতী তাঁহাকে সেই প্রেম দান করেন এবং প্রেমপ্রাপ্তিমাত্রেই নরোত্তমের দেহের বর্ণ রূপান্তরিত হইয়া যায়। তখন হইতে নরোত্তম গৌরবর্ণ ধারণ করিয়া এক অননুভূতপূর্ব পুলকে অস্থির হন। তাঁহার মনে হইল এক গৌরবর্ণ শিশু তাঁহার দেহে প্রবিষ্ট হইয়াছে। ক্রমে তাঁহার প্রেমব্যাধি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে এবং তিনি বৃন্দাবন-গমনেচ্ছায় অধীর হইয়া পড়েন।

'প্রেমবিলাসে'র শ্রীনিবাস-আবির্ভাবের কারণ বর্ণনার মত এই বর্ণনাও বাস্তবতা-সম্পর্কচ্যুত। নরহরি-চক্রবর্তীর 'ভক্তিরত্নাকর' ও 'নরোত্তমবিলাসে'র মধ্যে এই সম্বন্ধে যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা অধিকতর বাস্তবানুগ মনে হয়। তবে 'প্রেমবিলাসে'র এতৎ-সম্পর্কিত অন্যান্য বিবরণের মধ্যে কিছু কিছু তথ্য থাকিয়া যাইতেও পারে। বিশেষ করিয়া শতাধিক-বর্ষ পরবর্তিকালের রচিত 'ভক্তিরত্নাকরা'দি অপেক্ষা ইহার বিবরণ অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হইয়া পড়ে। তাছাড়া নরোত্তমের জন্ম ও বাল্যকাল সম্বন্ধে জানিতে হইলে এই উভয় গ্রন্থকারের প্রদত্ত তথ্য ছাড়া আমাদের হাতে আর বিশেষ কোনও মাল-মশলা নাই।

নরোত্তমের পিতারা দুই ভাই ছিলেন। 'নরোত্তমবিলাস'-কার বলেন[2] :

শ্রীপুরুষোত্তমাগ্রজ কৃষ্ণানন্দ দত্ত।
তাঁর পুত্র নরোত্তম বিদিত সর্বত্র ॥

কিন্তু একই গ্রন্থকার 'প্রেমবিলাস'-কারের উক্তির সমর্থন জানাইয়া 'ভক্তিরত্নাকরে' লিখিয়াছেন[3] :

জ্যেষ্ঠ পুরুষোত্তম কনিষ্ঠ কৃষ্ণানন্দ।

আবার 'নরোত্তমবিলাসে' দেখা যায়[4] যে নরোত্তম তাঁহার অন্নপ্রাশনের সময় অন্ন-ভক্ষণে

(১) ৮ম. বি—১০ম. বি., (২) ১ম. বি., পৃ. ৯ (৩) প্রে. বি.—২০শ. বি., পৃ. ৩৫২ ; ভ. র.—১।৪৬৬ (৪) ১ম. বি., পৃ. ১৪

পরাঙ্মুখ হইলে তাঁহাকে বিষ্ণু-নৈবেদ্য দেওয়া হয় এবং তিনি আনন্দে তাহা ভক্ষণ করেন। তখন

সেইদিন হৈতে রাজা কহিল সবারে।
কৃষ্ণের প্রসাদ বিনা না দিহ ইহারে॥
কৃষ্ণানন্দ দত্ত সেই দিবস হইতে।
বিষ্ণু প্রসাদান্ন শ্রেষ্ঠ বিচারিলা চিতে॥

সম্ভবত এই স্থলে রাজা বলিতে পুরুষোত্তমকেই নির্দেশ করা হইয়াছে। অথচ 'ভক্তিরত্নাকর'-প্রণেতা বলেন[৫] :

রাজধানী স্থান পদ্মাবতী তীরবর্তী।
গোপালপুর নগর সুন্দর বসতি॥
তথা বিলসয়ে রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্ত।
শ্রীপুরুষোত্তম দত্ত পরম মহত্ত্ব॥

অন্যত্র[৬] "রাজ্যাধিকারী সে, নাম—কৃষ্ণানন্দ রায়।" 'প্রেমবিলাসে'ও[৭] কৃষ্ণানন্দকে 'রায়' এবং 'মজুমদার' বলা হইয়াছে। কিন্তু নরহরি-চক্রবর্তী তাঁহার দুইটি গ্রন্থেই 'সংগীত-মাধবনাটকে'র যে অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করিয়াছেন,[৮] তাহতে বলা হইয়াছে :

পদ্মাবতীতীরবর্তী গোপালপুরনিবাসি(নগরবাসি)গৌড়াধিরাজমহামাত্য শ্রীপুরুষোত্তম-দত্ত-সত্তম-তনুজঃ শ্রীসন্তোষদত্তঃ স হি শ্রীনরোত্তমদত্ত-সত্তম-মহাশয়ানাং কনীয়ান্ যঃ পিতৃব্যভ্রাতৃশিষ্য : এইস্থলে স্পষ্টত পুরুষোত্তমকেই 'গৌড়াধিরাজমহামাত্য' বলা হইয়াছে। ইহাতে মনে হয় যে পুরুষোত্তম 'মহামাত্য' হইলেও এক পরিবারভুক্ত বলিয়া সাধারণভাবে দুই ভ্রাতাকেই রাজসম্মান দান করা হইয়াছে। কিন্তু পুরুষোত্তম 'মহামাত্য' বলিয়াই যে তিনি জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা ছিলেন, এ বিষয়েও নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না। তবে 'নরোত্তমবিলাসে'র আর একটি উক্তি হইতে সম্ভবত সন্দেহের নিরসন হইতে পারে। নরোত্তমের বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনের ঠিক পরবর্তী ঘটনা প্রসঙ্গে গ্রন্থকার বলিতেছেন[৯] :

মহাহৃষ্ট পুরুষোত্তম দত্তের তনয়।
শ্রীসন্তোষ দত্ত নাম গুণের আলয়॥
শ্রীনরোত্তমের তেঁহ পিতৃব্য কুমার।
কৃষ্ণানন্দ দত্ত যাঁরে দিলা রাজ্যভার॥

(৫) ১।৪৬৪-৬৫ (৬) ৮।৪২৩ (৭) ১ম. বি., পৃ. ১৩ ; ৯ম. বি., পৃ. ৯৬ (৮) ভ. র.—১।৪৭২ ; ন. বি.—১২শ. বি., পৃ. ১৯০ (৯) ন. বি.—৩য়. বি., পৃ. ৩৬

এইরূপ উক্তি হইতে মনে হয় জ্যেষ্ঠ-পুরুষোত্তমের পরলোক-প্রাপ্তি ঘটিলে কনিষ্ঠ-কৃষ্ণানন্দের উপর যে রাজ্যভার আসিয়া পড়ে, তাহাই তিনি পরে পুরুষোত্তম-পুত্র সন্তোষের উপর ন্যস্ত করিয়াছিলেন। কিংবা, পিতার মৃত্যুর পর পুত্রই রাজ্যাধিকারী, এইরূপ মনে করিয়া তিনি সন্তোষকে তৎপদে অভিষিক্ত করেন। ইহা সত্য হইলে বলা চলে যে পুরুষোত্তম ও কৃষ্ণানন্দ এই দুই ভ্রাতার মধ্যে কনিষ্ঠ-কৃষ্ণানন্দই ছিলেন নরোত্তমের পিতা, এবং পুরুষোত্তমের পুত্রের নাম ছিল সন্তোষ।

'প্রেমবিলাসে'র বহু স্থলেই কৃষ্ণানন্দ প্রভৃতিকে গড়েরহাটের অধিবাসী বলা হইয়াছে। গড়েরহাট রাজসাহী জেলার অন্তর্গত একটি পরগণা (গৌড়ীয় বৈষ্ণব তীর্থ)। সুতরাং বুঝিতে পারা যায় যে গড়েরহাটের অন্তর্গত পদ্মাতীরবর্তী গোপালপুরেই পুরুষোত্তমের রাজধানী ছিল। নরহরি-চক্রবর্তীও জানাইয়াছেন[১০] যে এই গোপালপুর বৃহত্তর খেতুরি-গ্রামেরই অংশ-বিশেষ এবং রাজধানী গোপালপুরেই অবস্থিত ছিল। উপরোক্ত গ্রন্থগুলি হইতে আরও জানা যায়[১১] যে কৃষ্ণানন্দ ও পুরুষোত্তম-দত্ত কায়স্থ-কুলোদ্ভব ছিলেন এবং নরোত্তমের মাতার নাম ছিল নারায়ণী। রামকান্ত বা রমাকান্ত নামে নরোত্তমের একজন জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতাও ছিলেন, তাঁহার পুত্রের নাম রাধাবল্লভ-দত্ত। সন্তোষ এবং রাধাবল্লভ উভয়েই নরোত্তমের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন। লক্ষণীয় যে, জ্যেষ্ঠ-রমাকান্ত বা তৎপুত্র রাধাবল্লভের রাজ্য-প্রাপ্তি ঘটে নাই, পুরুষোত্তম-সুত সন্তোষই রাজত্বের অধিকারী হইয়াছিলেন।

নরোত্তমবিলাসে বলা হইয়াছে[১২] যে মহাপ্রভু রামকেলিতে আসিয়া নৃত্য-সংকীর্তনকালে 'শ্রীখেতুরি গ্রাম দিশাপানে' দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া 'নরোত্তম বলিয়া বারে বারে' ডাকিয়াছিলেন এবং

নীলাচলে প্রভু শ্রীনিবাসে জানাইলা।
রামকেলি আসি নরোত্তম আকর্ষিলা।।

সম্ভবত শ্রীনিবাস-আচার্যের জন্ম-বৃত্তান্তের মত নরোত্তমের আবির্ভাব-ব্যাপারটির সহিতও মহাপ্রভু-চৈতন্য কোন না কোনভাবে যুক্ত ছিলেন। তাই নরোত্তমের আবির্ভাব সম্বন্ধে তাঁহার এই ঘোষণার বাস্তব-ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়াই 'প্রেমবিলাস'-কার এমনভাবে কল্পনার জাল বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং সেই কল্পনাকে তিনি নরোত্তমের বাল্যকাল পর্যন্ত প্রসারিত করিয়াছেন। সুতরাং পরবর্তী বিষয় সম্বন্ধে নরহরি-চক্রবর্তীর

(১০) ভ. র.—৮।৪৮২-৮৩ (১১) প্রে. বি.—২০শ. বি., পৃ. ৩৫২ ; ১৯শ. বি., পৃ. ৩৩৯ ; ভ. র.—১।৪৬৭-৭১ ; ন. বি.—১২শ. বি., পৃ. ১৮৯ ; ২য়. বি., পৃ. ১৪-১৫ ; বৈ. দি-মতে (পৃ. ৭৪), "গড়েরহাট পরগণায় খেতুরিগ্রামে উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ বংশে নরোত্তম ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন।"
(১২) ১ম. বি., পৃ. ১০-১১

বর্ণনা ছাড়া আমাদের আর গত্যন্তর থাকে না। কিন্তু গ্রন্থকার তাঁহার 'নরোত্তমবিলাসে' লিখিয়াছেন[১৩] :

গৌর নিত্যানন্দাদ্বৈত গণের সহিতে।
নৃত্য কৈলা নারায়ণী দেখিলা সাক্ষাতে ।।
ঐছে ভাগ্যবতী নাহি নারায়ণী সম।
যাঁর গর্ভে জন্মিলা ঠাকুর নরোত্তম ।।

নরোত্তম-জননী নারায়ণী-দত্ত যে কোনও দিন গৌরাঙ্গলীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, এই সংবাদ কোথাও দৃষ্ট হয় না। অথচ গ্রন্থকার 'শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা' নারায়ণীকেও জানিতেন।[১৪] সুতরাং নরোত্তমের জন্মের সহিত চৈতন্যের সম্পর্ক, এবং নরোত্তম-জননী নারায়ণীর গৌরাঙ্গলীলা-দর্শন, এই উভয় ঘটনার একটি হইতে অন্যটির উদ্ভব হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু নরোত্তমের বাল্যকাল সম্বন্ধে কোন গ্রন্থকারই বিশেষ কিছু তথ্য পরিবেশন করিতে পারেন নাই। তাঁহার আবির্ভাবকাল সম্বন্ধেও বিশেষ কিছু জানা যায় নাই। কেবল স্বয়ং নরোত্তমই তাঁহার একটি পদে জানাইতেছেন[১৫] :

গৌরাঙ্গের সহচর শ্রীবাসাদি গদাধর
নরহরি মুকুন্দ মুর
সঙ্গে স্বরূপ রামানন্দ হরিদাস প্রেমকন্দ
দামোদর পরমানন্দ পুরী ।।
যে সব করিল লীলা শুনিতে গলয়ে শিলা
তাহা মুঞি না পাইনু দেখিতে
তখন নহিল জন্ম এবে ভেল
সে না শেল রহি গে

'নরোত্তমবিলাসে'ও লিখিত হইয়াছে[১৬] :

এ হেন সময়ে জন্মাইলে পৃথিবীতে ।।
দেখিতে না পাইলুঁ এই নদীয়া বিহার।

এই সকল উদ্ধৃতি হইতে কেবল এইটুকুই বুঝিতে পারা যায় যে খুব সম্ভবত মহাপ্রভুর অন্তলীলার শেষদিকে কিংবা তাঁহার অপ্রকটের পরবর্তী-কালে কোনও সময়ে নরোত্তম জন্মলাভ করেন। মহাপ্রভুর রামকেলি-গমনের বহু পরেই[১৭] যে তিনি ভূমিষ্ঠ হন তাহা অবশ্য পরবর্তী আলোচনায় স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইবে। 'নরোত্তমবিলাস'-কার

(১৩) ২য় বি., পৃ. ১৪ (১৪) ভ. র.—১২।২৪০১ (১৫) গৌ. ত.—পৃ. ৩২৭ (১৬) ৩য়. বি., পৃ. ৩৯
(১৭) শিশির কুমার ঘোষ বলেন (শ্রীনরোত্তম চরিত, পৃ. ১৭) "কোন্ শকে এই পুত্র (নরোত্তম) হইল তাহা ঠিক করা যায় না। তবে তখন গৌরাঙ্গ প্রকট আছেন।"

জানাইয়াছেন[১৮] যে তাঁহার জন্মকালে তাঁহার পিতামহ জীবিত ছিলেন এবং তিনি 'পৌত্রের কল্যাণে কৈলা বহু অর্থ দান।' তাহার পর যথাকালে নরোত্তমের অন্নপ্রাশন, কর্ণবেধ ইত্যাদি সমাপ্ত হইলে তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা চলিতে থাকে এবং তাঁহার বিবাহকাল উপস্থিত হয়। 'প্রেমবিলাস'-কার বলেন যে তখন তাঁহার বয়স 'দ্বাদশ বৎসর' এবং সেই সময়ে তিনি একদিন পদ্মাস্নানে গমন করিয়া প্রেম আনয়ন করেন। যাহাহউক, তাঁহার পিতা মাতা তাঁহার বিবাহের জন্য 'বিজ্ঞ কায়স্থবর্গের' কন্যা অনুসন্ধান করিতে থাকেন। সম্ভবত কিছুকাল পূর্ব হইতেই তাঁহার মনে বৈরাগ্যভাব উদিত হওয়ায় পিতামাতা তাঁহার অল্প-বয়সেই বিবাহের জন্য উদ্যোগী হইতে থাকেন। কিন্তু তাঁহার এইরূপ বাল্য-বৈরাগ্যের বিশেষ কোনও কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। নারায়ণীর গৌরলীলা-দর্শনের কথা ছাড়াও 'নরোত্তমবিলাস' হইতে জানা যায়[১৯] যে সেই সময়ে কৃষ্ণদাস নামে একজন খেতুরিবাসী প্রাচীন ব্রাহ্মণ চৈতন্যলীলা সম্বন্ধে বিশেষভাবে অবগত ছিলেন। প্রত্যহ কৃষ্ণসেবা (নরোত্তমের গৃহে ?) শেষ করিয়া ফিরিবার সময় তিনিই নরোত্তমের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে সবিস্তারে চৈতন্যলীলা-বৃত্তান্ত শ্রবণ করাইতেন। কিন্তু ইহাই নরোত্তমের উপর প্রভাব-বিস্তারের মূল কারণ বলিয়া মনে হয় না। খুব সম্ভবত, কোন না কোনভাবে দত্ত-পরিবারারের উপরও চৈতন্য-প্রভাব পড়িয়াছিল। 'ভক্তিরত্নাকরে'র এক স্থলে উল্লেখিত হইয়াছে[২০] যে নরহরি-সরকার-ঠাকুরের সহিত নরোত্তমের পিতার পরিচয় ঘটিয়াছিল। নরহরি-সরকার নরোত্তমের সম্বন্ধে

> নিজগণ প্রতি কহে—গৌড় যাতায়াতে।
> ইঁহার পিতার সহ সাক্ষাৎ তথাতে ॥
> রাজ্য অধিকারী সে নাম কৃষ্ণানন্দ রায়।
> তাঁর ঘরে জন্মে ইঁহো প্রভুর ইচ্ছায় ॥

নরহরির সহিত সাক্ষাৎ ঘটিয়া থাকিলে কৃষ্ণানন্দের পক্ষে তৎকর্তৃক প্রভাবিত হওয়া বিচিত্র নহে। এদিকে কৃষ্ণানন্দও নানাকথা বলিয়া নরোত্তমকে বৈষ্ণব-ধর্মের প্রতি অনুযায়ী করিয়া তুলেন। তিনি শ্রীনিবাস-আচার্যের কথাও জানিতেন এবং আবাল্য চৈতন্যানুরাগী শ্রীনিবাস যে বহুবিধ দুঃখ-যাতনা সহ্য করিয়া তখন বৃন্দাবনে গমন করিয়াছেন, তাহাও তিনি নরোত্তমকে জানাইলেন। তাহাতে নরোত্তম বৃন্দাবনে যাইবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তাঁহার ঔদাসীন্য লক্ষ্য করিয়া পিতামাতা তাঁহার উপর সর্বদাই সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া চলিলেন; তজ্জন্য প্রহরীও নিযুক্ত করা হইল। কিন্তু নরোত্তমও নানা কৌশলে সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন।

(১৮) ২য় বি., পৃ. ১৩ (১৯) ২য়. বি., পৃ. ১৬ (২০) ৮।৪২২-২৩

'প্রেমবিলাস'-কার বলেন[২১] যে 'এইকালে জাগিরদারের এক আশোয়ার নরোত্তমকে লইবার' জন্য একটি পত্র আনয়ন করিল।

পত্রপাঠ আসিবে তোমার পুত্রকে দেখিব।
শিরোপার ঘোড়া আমি তাহারে করিব॥

পিতামাতার অনিচ্ছা এবং আপত্তি সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত নরোত্তমকে পাঠাইতে হইল এবং পথিমধ্যে একদিন পরিশ্রান্ত সঙ্গী-বৃন্দ নিদ্রাচ্ছন্ন হইলে নরোত্তম বৃন্দাবনের পথে ধাবিত হইলেন। কিন্তু এই বিবরণ অপেক্ষা নরহরি-চক্রবর্তী-প্রদত্ত বিবরণ অধিকতর নির্ভরযোগ্য। নরহরি জানাইতেছেন :

অকস্মাৎ গৌড়রাজ-মনুষ্য আইল।
গৌড়ে রাজস্থানে পিতা পিতৃব্য চলিল ॥
এই অবসরে রক্ষকেরে প্রতারিলা।
প্রকারে মায়ের স্থানে বিদায় হৈলা ॥

'প্রেমবিলাস'-কার জানাইতেছেন যে নরোত্তম কাশীতে পৌছাইয়া চন্দ্রশেখর-শিষ্যের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বৃন্দাবনগামী ভক্তমাত্রকেই যে চন্দ্রশেখর-গৃহে তাঁহার শিষ্যের নিকট আতিথ্য গ্রহণ করিতে হইবে এইরূপ বর্ণনা যেন একটি রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। 'নরোত্তমবিলাসে' অবশ্য এইস্থলে এই প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় নাই। কিন্তু যাত্রার প্রারম্ভে কিংবা গমনকালে পথিমধ্যে স্বপ্নদর্শন ও মথুরার বিশ্রামঘাটে পৌছাইয়া ভাবাবিষ্ট হইলে মাথুর-ব্রাহ্মণের সাহায্যে চেতনা-প্রাপ্তি ও বৃন্দাবন-গমনের জন্য সাহায্য-প্রাপ্তি এবং প্রয়োজন হইলে আরও একবার স্বপ্নদর্শন—এ সমস্তই এই গ্রন্থে যথারীতি বর্ণিত হইয়াছে।

নরোত্তম বৃন্দাবনে পৌছাইলেন। শ্রীনিবাসের বৃন্দাবন-গমনের কতদিন পরে যে তিনি বৃন্দাবনে যান, এবং যাওয়া মাত্রেই তাঁহার সহিত শ্রীনিবাসের সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল কিনা, কিংবা কতদিন পরে উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা জন্মাইয়াছিল, এ সমস্ত বিষয় সঠিকভাবে জানিবার উপায় নাই। বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে কেবল এইটুকুই বুঝিতে পারা যায় যে বৃন্দাবনে গিয়া তিনি প্রথমে জীব-গোস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিলে জীব তাঁহাকে গোবিন্দাধিকারী শ্রীকৃষ্ণ-পণ্ডিতের নিকট প্রসাদমালা চাহিয়া দেন এবং প্রসাদ-ভক্ষণ করান, তারপর তিনি তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া লোকনাথ, গোপাল, ভূগর্ভ প্রভৃতি বৃন্দাবন-গোস্বামীদিগের সহিত সাক্ষাৎ করান এবং সমস্ত মন্দির ও সমাধি স্থানগুলি পরিদর্শন করাইয়া আনেন। ক্রমে নরোত্তম রাধাকুণ্ডে গিয়া রঘুনাথ রাঘব ও কৃষ্ণদাসাদির সহিতও সাক্ষাৎ করিয়া আসেন।

(২১) ১১শ. বি., পৃ. ১০৬-১০

জীব নরোত্তমকে লোকনাথ-গোস্বামীর নিকট লইয়া গিয়া তাঁহার দীক্ষাগ্রহণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু নরোত্তমের বৃন্দাবন-আগমনের কতদিন পরে তাঁহার দীক্ষাগ্রহণ ঘটে, সে সম্বন্ধে নরহরি-চক্রবর্তী স্পষ্ট করিয়া[২২] কিছু বলেন নাই। 'প্রেমবিলাস' ও 'অনুরাবগল্লী' হইতে জানা যায় যে বৃন্দাবনে পৌছাইবার অন্তত বৎসরাধিক-কাল পরে নরোত্তম দীক্ষাগ্রহণ করেন।[২৩] প্রথমে লোকনাথ দীক্ষা দিতে কোনও প্রকারে রাজী না হইলেও তিনি কিন্তু লোকনাথের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। জীব-গোস্বামী তাঁহাকে গোস্বামী-গ্রন্থাদি পাঠ করাইয়া সুশিক্ষিত করিয়া তুলিতেছিলেন এবং সেই সঙ্গে তাঁহার হরিনাম ও লোকনাথ-সেবা নিয়মিতভাবে চলিতেছিল। এই সেবাভক্তির মধ্যদিয়াই তাঁহার সাধনা সার্থক হইয়া উঠিতে থাকে। এতৎসম্পর্কে তাঁহার নিষ্ঠা তৎকালীন কাঁহারও অপেক্ষা ন্যূন ছিল না রঘুনাথদাসের মত তিনিও ছিলেন ধনীর দুলাল। কিন্তু চৈতন্যের মত কোনও প্রাণমন-ভোলান আদর্শ মহাপুরুষ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত ছিলেন না। কিংবা, রাজপুত্র হিসাবে তাঁহার সুখৈশ্বর্যের কোন অভাবও ছিল না। ইচ্ছা করিলেই তিনি পরিপূর্ণ ভোগবিলাসের মধ্যে নিজেকে আপাদমস্তক নিমজ্জিত করিয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু সে-সমস্তই তিনি লোষ্ট্রবৎ দূরে নিক্ষেপ করিয়া এক দুর্বার গতিতে দূর-বৃন্দাবনের দুর্গম-পথে নামিয়া পড়িয়াছিলেন এবং স্বীয় অন্তরের মধ্যে যে দীপখানি প্রজ্বলিত হইয়াছিল, তাহারই আলোকে তিনি যেন পথের বনান্ধকার দূরীভূত করিয়া বৃন্দাবনে গিয়া তাঁহার গুরুটিকেও চিনিয়া লইলেন।

লোকনাথ যে প্রথমে তাঁহাকে মন্ত্রদীক্ষা দান করেন নাই, তাহাতেই বোধকরি নরোত্তম-হৃদয়ের ভক্তি-তরঙ্গ শতধারে উচ্ছলিত হইয়াছিল। ফলে লোকচক্ষুর অন্তরালেই তাঁহার গুরুসেবা আরম্ভ হয়। স্বয়ং লোকনাথও প্রথমে সেই সেবাবিধির প্রকৃত স্বরূপটি চিনিয়া উঠিতে পারেন নাই। কিন্তু বৎসরাধিককাল অতিবাহিত হইলে একদিন তাঁহার হঠাৎ মনে হইল[২৪] কে যেন তাঁহার জন্য

মৃত্তিকা শৌচের লাগি মাটি ছানি আনে।
নিত্য নিত্য এই মত করেন সেবনে ॥

গোস্বামী তাঁহার সাধন-ভজনে মগ্ন থাকেন, তাই তিনি এতদিন বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। নরোত্তমও প্রত্যহ যথাকালে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার সেবাদি করিয়া যান, কখনও বা তাঁহার নিকটে বসিয়া শিক্ষাগ্রহণ করেন এবং প্রসাদপ্রাপ্ত হন। সুতরাং তাঁহাকে সন্দেহ করিবার কোন কারণই থাকে না। কিন্তু একদিন লোকনাথ অতি

---

(২২) ন. বি.—২য়. বি., পৃ. ২৭ (২৩) প্রে. বি.—১১শ. বি., পৃ. ১১৬ (২৪) ঐ—১১শ. বি., পৃ. ১১৮

প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়া দেখিলেন যে নরোত্তম তাঁহারও পূর্ব হইতে উঠিয়া তাঁহার জন্য শৌচ-মৃত্তিকা প্রস্তুত করিতেছেন। লোকনাথ তাঁহাকে কাছে ডাকিয়া তাঁহার এইরূপ কর্মবিধির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে নরোত্তম সলজ্জভাবে বলিলেন[২৫] :

তোমার সেবনে আমার দ্রবীভূত মন।
আর না করিহ মোরে ছাড় বিড়ম্বন ॥······
যখন দেখিলুঁ কৈলুঁ আত্মসমর্পণ ॥
যে তোমার মনে আইসে তাহা তুমি কর।
মোর প্রভু তুমি মুঞি তোমার কিংকর ॥

আরও একদিন লোকনাথ অতি-প্রত্যূষে উঠিয়া দেখিলেন[২৬] যে এক ব্যক্তি অঙ্গনে ঝাঁট দিতেছেন। তখনও অন্ধকার রহিয়াছে, ভাল চেনা যাইতেছে না। লোকনাথ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে তিনি নরোত্তম। নরোত্তমের এইরূপ কার্য দেখিয়া লোকনাথের হৃদয় গলিয়া গেল। রাজার স্নেহের দুলাল রাজধানী হইতে শত শত ক্রোশ দূরে আসিয়া আধ-অন্ধকারে উঠিয়া তাঁহার পেলব হস্ত দুইটি দিয়া ঝাড়ুদারের কার্য করিতেছেন, এ দৃশ্য বোধকরি পাষাণকেও বিচলিত করে। তিনি সেইদিনই নরোত্তমকে মন্ত্রদীক্ষা দিয়া তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করিলেন।[২৭]

দীক্ষাগ্রহণের পর কিন্তু নরোত্তমের সেবাবিধির বিন্দুমাত্র পরিবর্তন ঘটে নাই। এমনিভাবে তাঁহার মানস সেবা চলিত যে মধ্যে মধ্যে তিনি যেন কাণ্ডজ্ঞান পর্যন্ত হারাইয়া ফেলিতেন। 'প্রেমবিলাসে' ও 'ভক্তিরত্নাকরে' এই সম্বন্ধে একটি গল্প বলা হইয়াছে[২৮] — একদিন নরোত্তম তন্ময়চিত্তে কল্পিত রাধিকার ইচ্ছানুযায়ী সখীর ইঙ্গিতে দুগ্ধ আবর্তন করিবার কালে

শুষ্ক কাষ্ঠ আঁচ দেন উথলে বারেবার।
মনে বিচার করেন কিবা করি প্রতিকার ॥
পুনর্বার উথলিত হইল যখন।
হস্ত দিয়া সেই দুগ্ধ করিল রক্ষণ ॥
হস্ত পুড়ি গেল বাহ্যে তাহা নাহি জানে।
উতারিয়া সেই দুগ্ধ রাখে সেই খানে ॥

এইরূপ সেবার জন্য অবশ্য জীব বা লোকনাথের নিকট তাঁহার নিয়মিত শিক্ষাগ্রহণ বন্ধ হইয়া যায় নাই।

(২৫) অ. ব.—৫ম. ম., পৃ. ২৮ (২৬) প্রে. বি.—১১শ. বি., পৃ. ১১৯-২২ (২৭) তু.—ভ. র.—১।৩৪৬ ; ৪।৪২০ ; অ. ব.—৫ম. ম., পৃ. ২৯ (২৮) ১১শ. বি., পৃ. ১৩১-৩২ ; ভ. র.—৬।১৬৭-৭৭

ইতিপূর্বে শ্রীনিবাসের সহিত নরোত্তমের ঘনিষ্ঠতা জন্মাইয়াছিল এবং জীব তাঁহার 'প্রিয় শ্রীনিবাসে নরোত্তমে সমর্পণ' করিয়াছিলেন।[২৯] তিনি নরোত্তমকে 'মহাশয়' বা 'শ্রীমহাশয়' বা 'শ্রীঠাকুর মহাশয়' উপাধিতেও ভূষিত করিয়া[৩০] তাঁহার যোগ্যতার মর্যাদা দান করিয়াছিলেন। ক্রমে জীবের নির্দেশে রাঘব-গোস্বামীর সহিত তাঁহাদের বৃন্দাবন ও মথুরা পরিক্রমা সমাপ্ত হইলে[৩১] তাঁহাদিগকে গৌড়-প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দান করা হইল।

শ্রীনিবাস ও নরোত্তম হইয়াছিলেন 'শ্রীজীবের যেন দুই বাহু দুইজন।[৩২] তিনি স্থির করিলেন যে গৌড়ে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের যোগ্য অধিকারী ছিলেন তাঁহারা দুইজন। সেই সময় শ্যামানন্দও বৃন্দাবনে ছিলেন।[৩৩] জীব শ্রীনিবাসের উপর নরোত্তম ও শ্যামানন্দের, এবং নরোত্তমের উপর শ্যামানন্দের ভার অর্পণ করেন। তারপর তিনি তিনজনকেই গোস্বামিগ্রন্থ প্রচারের নির্দেশ দান করিয়া ও উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া গো-শকট বাহিত গ্রন্থ-সম্পূট সহিত সশস্ত্র লোকজনসহ গৌড়াভিমুখে পাঠাইয়া দিলেন।[৩৪] যাত্রাকালে লোকনাথ-গোস্বামীও শ্রীনিবাসের উপর নরোত্তমের ভার অর্পণ করিলেন।[৩৫]

'নরোত্তমবিলাসে' বলা হইয়াছে[৩৬] যে সেইসময় লোকনাথ নরোত্তমকে 'শ্রীবিগ্রহসেবা সংকীর্তন সদাচার' কবিবার জন্যও বিশেষভাবেই জানাইয়া দেন এবং 'প্রেমবিলাস-'কার বলেন[৩৭] যে লোকনাথ তাঁহাকে বলিয়াই দিয়াছিলেন :

......সংশয় করি মনে এই ভয়।
বিবাহের কাল অতি মনে জানি লয়॥
ব্যবহারে রহি সব বৈরাগ্য সাধিবে।
তৈল ত্যাগ হবিষ্যান্ন সদা আচরিবে॥......

আবার 'অনুরাগবল্লী'-মতে[৩৮] বিদায়কালে লোকনাথ নরোত্তমকে যে কেবল 'সংকীর্তন প্রচার', 'রাধাকৃষ্ণ সেবা' ও 'বৈষ্ণব সেবনে'র কথাই বলিয়া দিয়াছিলেন তাহা নহে, তাঁহাকে দীক্ষাদানের সময়ে শর্ত হিসাবে বলিয়া রাখিয়াছিলেন :

......বিষয়েতে বৈরাগী হইবা।
অমুষ্মাহ উক্তাল্ল মৎস্য না খাইবা॥

---

(২৯) ন. বি.—২য়. বি., পৃ. ৩০ (৩০) প্রে. বি.—১২ শ. বি., পৃ. ১৩৫ ; ১৩শ. বি., পৃ. ১৮২ ; ন. বি.—২য়. বি., পৃ. ৩১ ; ভ.র.—৪।৪২৪, ১।৩৪৮ ; 'পদকল্পতরু'র একটি পদে (২৩৮৪ কিন্তু বলা হইয়াছে যে সংকীর্তন-রত নরোত্তমের 'ভাব দেখি আপনি জাহ্নবা-ঠাকুরাণী নাম থুইলা ঠাকুর মহাশয়।' (৩১) এতৎ সম্বন্ধীয় অন্যান্য ঘটনাবলীর জন্য দ্র.—শ্রীনিবাস। (৩২) ভ. র.—৪।৪২৬ (৩৩) দ্র.—শ্রীনিবাস (৩৪) ঐ (৩৫) প্রে. বি.—১২শ. বি., পৃ. ১৪৫, ১৫৭, ন. বি.—৩য়. বি. পৃ. ৩৪ ; অ. ব.— ৬ষ্ঠ. ম., পৃ. ৩৪ (৩৬) ৩য়. বি., পৃ. ৩৪ (৩৭) ১২ শ. বি., পৃ. ১০৮ (৩৮) ৫ম. ম., পৃ. ২৮

বৃন্দাবন-ত্যাগের সময় আজন্ম ব্রহ্মচারী নরোত্তমকে এই সমস্ত কথা স্মরণ করিতে হইয়াছিল। শ্রীনিবাস এবং নরোত্তম উভয়েরই বৃন্দাবন-যাত্রা ও বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনের পথ যে 'দুর্গম' ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু সর্বচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া যিনি যশোলাভাকাঙ্ক্ষাহীন সেবা ও ভক্তির সাধনাকে জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেদিন তাঁহার মানস-বৃন্দাবনের গমনাগমন পথ যে 'ক্ষুরধারে'র মতই 'নিশিত' এবং 'দুরত্যয়' হইয়া উঠিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

বিষ্ণুপুর-অঞ্চলে পৌঁছাইলে জীবাদি-প্রেরিত গ্রন্থসম্পুট অপহৃত হয়।[৩৯] কিন্তু শ্রীনিবাসের আজ্ঞায় নরোত্তম শ্যামানন্দকে লইয়া খেতুরি চলিয়া আসেন। ইতিপূর্বে নরোত্তমের পিতা কৃষ্ণানন্দ তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র সন্তোষের উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়াছিলেন এবং সন্তোষও যোগ্যতার সহিত রাজ্যপালন করিতেছিলেন। নরোত্তম গৃহে ফিরিয়া সর্বপ্রথম তাঁহাকেই দীক্ষিত করিয়া[৪০] স্বীয় কর্তব্য পালনে অগ্রসর হইলেন। কিছুদিন পরে বিষ্ণুপুর হইতে গ্রন্থপ্রাপ্তির সংবাদ পৌঁছাইলে রাজা-সন্তোষ আনন্দে ও উৎসাহে 'করিল মঙ্গলক্রিয়া বিবিধ বিধানে'।[৪১] নরোত্তম শ্রীনিবাসকে শ্যামানন্দের পরবর্তী কার্যসূচী প্রেরণ করিয়া শ্যামানন্দকে প্রয়োজনীয় নির্দেশাদি দান করিলেন এবং তাঁহার যাত্রার ব্যবস্থা করিয়া দিলে রাজা-সন্তোষ পদ্মাবতী পর্যন্ত গিয়া তাঁহাকে বিদায় দিয়া আসিলেন।

শ্রীনিবাসের যাজিগ্রামে প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই নরোত্তম নীলাচল-দর্শনে বাহির হইয়া যান। তৎপূর্বে তিনি গৌড়মণ্ডলের বিশিষ্ট স্থানগুলি পর্যটন করেন। একমাত্র নরহরি-চক্রবর্তীই তাঁহার দুইটি গ্রন্থে[৪২] সেই গৌড়-নীলাচল পর্যটনের বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। তদনুযায়ী জানা যায় যে নরোত্তম সর্বপ্রথম নবদ্বীপে গমন করেন। তাঁহার পথঘাট জানা ছিল না। নবদ্বীপের প্রবেশপথে তাঁহার সহিত এক প্রাচীন বিপ্রের সাক্ষাৎ ঘটিলে তিনি তাঁহার নিকট নবদ্বীপলীলার বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন এবং আরও জানিতে পারিলেন যে কিছুকাল পূর্বে শ্রীবাস-পণ্ডিত এবং তাহার পরে বিষ্ণুপ্রিয়া-ঠাকুরাণী দেহরক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু কোনও প্রাচীন বিপ্রের দ্বারা নবাগত ভক্তকে তৎস্থান সম্বন্ধে নানাবিধ বৃত্তান্ত শ্রবণ করাইবার বর্ণনাও যেন গ্রন্থকার-গণের একটি রচনা-রীতি হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং বৃত্তান্তগুলির ঐতিহাসিকত্ব বিচার্য হইলেও উক্ত ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সর্বদাই বিশ্বাস স্থাপন করিবার কারণ দৃষ্ট হয় না। গ্রন্থানুযায়ী জানা যায় যে নরোত্তম প্রথমে শুক্লাম্বর-ব্রহ্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তারপর ক্রমে শচী-ভৃত্য ঈশান, দামোদর-ব্রহ্মচারী ও

(৩৯) দ্র.—শ্রীনিবাস (৪০) ভ. র.—৭।১২৪ (৪১) ঐ—৭।২৬৭ (৪২) ভ. র. —৮ম. তরঙ্গ; ন. বি —৩য়.-৪র্থ বি.

শ্রীবাস-ভ্রাতা শ্রীপতি শ্রীনিধি প্রভৃতির আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া তিনি শান্তিপুরে অচ্যুতানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং সেখান হইতে হরিনদীতে গঙ্গাপার হইয়া অম্বিকায় গিয়া হৃদয়-চৈতন্যের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হন। অম্বিকা হইতে তিনি সপ্তগ্রামে পৌছান। কিন্তু সপ্তগ্রামের উদ্ধারণ-দত্ত তখন পরলোকগত। নরোত্তম গঙ্গাতীর-পথ ধরিয়া খড়দহে পৌছাইলে বসু-জাহ্নবা এবং বীরচন্দ্র তাঁহাকে পাইয়া আনন্দিত হইলেন। কয়েকদিন খড়দহে থাকার পর তিনি জাহ্নবা-নির্দেশে খানাকুল-অভিমুখে যাত্রা করিলে পরমেশ্বরীদাস পথ দেখাইয়া দিলেন এবং মহেশ-পণ্ডিত প্রভৃতি তাঁহাকে আশীর্বাদ করিলেন। খানাকুলে অভিরাম এবং মালিনীও তাঁহাকে আশীর্বাদ জানাইলে তিনি নীলাচল-অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

বর্ণনা আছে যে নীলাচল প্রবেশের পূর্বেও নরোত্তমের সহিত পূর্ববৎ এক প্রাচীন বিপ্রের সাক্ষাৎ ঘটে। কিন্তু যাহাহউক, তিনি শ্রীক্ষেত্রে পৌছাইয়া গোপীনাথ-আচার্য, শিখি-মাহিতী, বাণীনাথ, কানাই-খুটিয়া, মঙ্গরাজ, মামু-গোসাঁই ও গোপাল-গুরু প্রভৃতি ভক্তের দর্শন লাভ করিলেন। তিনি টোটা-গোপীনাথে গিয়া গদাধরের অবস্থান-ক্ষেত্র, এবং সমুদ্রতীরে হরিদাস-ঠাকুরের সমাধি-ক্ষেত্র প্রভৃতি দর্শন করিলেন। তারপর গোপীনাথ-আচার্য জগন্নাথ নামক এক বিপ্রকে দিয়া তাঁহার পরিক্রমা সুসম্পন্ন করিয়া দিলে কয়েকদিন পরে নরোত্তম যাজপুর হইয়া নৃসিংহপুরে শ্যামানন্দের নিকট পৌছাইলেন। তিনি সেইস্থানেও কয়েক-দিবস অবস্থান করিয়া শ্যামানন্দকে নীলাচল-গমনের পরামর্শ দান করিলেন এবং তথা হইতে শ্রীখণ্ডে আসিয়া মরণোন্মুখ নরহরি-সরকার-ঠাকুরের দর্শন লাভ করিলেন। রঘুনন্দন তাঁহাকে লইয়া গৌরাঙ্গ-বিগ্রহ দর্শন করাইলে নরোত্তম সেইদিন তথায় অতিবাহিত করিয়া পরদিন যাজিগ্রামে গিয়া শ্রীনিবাসের সহিত মিলিত হইলেন। সেখান হইতে তিনি কাটোয়ায় গিয়া গদাধরদাসপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করেন। তখন গদাধরও মৃত্যুর দুয়ারে উপস্থিত। নরহরির মত তিনিও নরোত্তমকে বাৎসল্য প্রদর্শন করিলে নরোত্তম একচক্রায় নিত্যানন্দের লীলাক্ষেত্র দর্শন করিয়া খেতুরিতে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

এইবার নরোত্তম তাঁহার কর্তব্যপালনে অগ্রসর হইলেন। বৃন্দাবন-নীলাচল গমনাগমনের মধ্যদিয়া প্রচুর অভিজ্ঞতা লাভ, বৃন্দাবনে শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া বিপুল-পাণ্ডিত্য অর্জন, নীরব ও নিঃস্বার্থ সেবাব্রতের মধ্যদিয়া ভক্তিবাদের প্রাথমিক সোপানগুলি অতিক্রম এবং প্রাচীন বৈষ্ণবদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতেও চৈতন্যলীলা সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ—এই সমস্ত দিক হইতেই বিপুল মানসিক সম্পদের অধিকারী হইয়া তিনি ভক্তিধর্ম-প্রচার ও বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠাদি বিষয়ে সচেষ্ট হইলেন। এইজন্য তাঁহাকে বহুবিধ

বাধারও সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। কিন্তু নীলাচল হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি তাঁহার পাণ্ডিত্যের দ্বারা 'খণ্ডিলা পাষণ্ডমত ভক্তি প্রকাশিয়া।'[৪৩]

সেই সময়ে গোপালপুর-সন্নিকটস্থ এক গ্রামে বিপ্রদাস নামে এক 'অর্থবান' ব্যক্তি বাস করিতেন।[৪৪] তাঁহার গৃহে একটি অযত্নরক্ষিত 'ধান্য-সর্ষপাদি গোলা' ছিল। সর্প-মূষিকাদি-সংকুল সেই ভয়াবহ গোলাটির নিকট কেহই যাইতে সাহসী হইতেন না। তাহার মধ্যে 'প্রিয়াসহ শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর'-বিগ্রহ লুক্কায়িত আছে জানিয়া নরোত্তম একদিন নির্ভয়ে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই বিগ্রহ উদ্ধার করিলেন এবং তাহার জন্য মন্দির সিংহাসনাদি-নির্মাণে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার পিতৃব্যপুত্র রাজা-সন্তোষ-রায় এ বিষয়ে তাঁহাকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করিয়াছিলেন। এইভাবে নরোত্তম এবং সন্তোষের চেষ্টায় বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা সম্পন্ন হইলে তাঁহারা খেতুরিতে এক মহামহোৎসবের আয়োজনে উদ্যোগী হইলেন। ইতিমধ্যে বিগ্রহপ্রাপ্তি-দিবসে 'বলরাম আদি কতজন, ঠাকুরের স্থানে কৈলা শ্রীমন্ত্রগ্রহণ।' খুব সম্ভবত এইদিনেই উক্ত বিপ্রদাস, তৎপত্নী ভগবতী, এবং যদুনাথ ও রমানাথ নামক[৪৫] তাঁহাদের দুইটি পুত্র নরোত্তমপ্রভুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। এইদিন হইতেই খেতুরিতে 'কীর্তনের শুভারম্ভ' হইয়া গেল।[৪৬]

শ্রীনিবাস-আচার্য সেই সময়ে তেলিয়াবুধরি-গ্রামে হাজির হইলে খেতুরিবাসী দুর্গাদাস নামে নরোত্তমের এক ব্রাহ্মণ-শিষ্য আসিয়া তাঁহাকে নরোত্তমের পূর্বকৃত-কার্যাবলীর পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে জানাইলেন যে পরদিনই নরোত্তম শ্রীনিবাসের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বুধরিতে পৌঁছাইবেন। এদিকে পরদিন প্রত্যূষে খেতুরিতে বলরাম-পূজারী কর্তৃক বিগ্রহ-সেবা হইয়া গেলে নরোত্তম তাঁহার কয়েকজন শিষ্যকে প্রয়োজনীয় উপদেশাদি দান করিয়া দেবীদাস, গোকুলদাস ও গৌরাঙ্গদাস প্রভৃতি শিষ্যকে সঙ্গে লইয়া বুধরিতে পৌঁছাইলেন। 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র[৪৭] নিত্যানন্দ-শাখার মধ্যে যে গোকুলদাস এবং গৌরাঙ্গদাসের নাম পাওয়া যায় তাঁহারা কিন্তু আলোচ্য গোকুল-গৌরাঙ্গ হইতে ভিন্ন ব্যক্তি। কারণ, 'নরোত্তমবিলাসে'র খেতুরি-উৎসব বর্ণনার মধ্যে নরোত্তম-শিষ্য গৌরাঙ্গদাসের খেতুরিতে অবস্থান-কালেই আর একজন গৌরাঙ্গদাসকে খড়দহ হইতে জাহ্নবা-ঠাকুরাণীর সহিত আসিয়া উৎসবে যোগদান করিতে দেখা যায়।[৪৮] কিন্তু নরোত্তম-শিষ্য উপরোক্ত গৌরাঙ্গদাসাদি ছিলেন সুবাদক ও উত্তম কীর্তনীয়া। তাঁহাদিগকে লইয়া নরোত্তম বুধরিতে পৌঁছাইলে তাঁহার সহিত রামচন্দ্র-কবিরাজ এবং তদ্ভ্রাতা গোবিন্দেরও বিশেষ

(৪৩) ভ. র.—১০।১৮৯ ; ন. বি.—৬ষ্ঠ. বি., পৃ. ৭২ (৪৪) প্রে. বি.—১৯শ. বি., পৃ. ৩০৫-৬ ; ৩১০-১১ ; ভ. র.—১০।১৯৩ ; ন. বি.—৬ষ্ঠ. বি., পৃ. ৬৯ (৪৫) প্রে. বি.—২০শ. বি., পৃ. ৩৫৬ (৪৬) ন. বি.—৬ষ্ঠ. বি., পৃ. ৭২ (৪৭) ১।১১, পৃ. ৫৬ (৪৮) ন. বি.—৬ষ্ঠ. বি., পৃ. ৭৫, ৮০

প্রণয় ঘটে। তারপর একদিন শ্রীনিবাস স্বীয় শিষ্য রামচন্দ্রকে নরোত্তমের হস্তে অর্পণ করিলে উভয়ে তখন এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে বদ্ধ হইয়া একই পথের পথিক হইয়া পড়িলেন। নরোত্তম বুধরিতে থাকিয়াই চতুর্দিকে উৎসবের বার্তা পাঠাইয়া দিলেন এবং কয়েকদিন পরে রামচন্দ্রাদি সহ খেতুরিতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। কয়েকদিনের মধ্যে শ্রীনিবাসও শিষ্যসহ আসিয়া পৌছাইলেন। ক্রমে সারা বাংলার বৈষ্ণববৃন্দ খেতুরিতে সমবেত হইলে খেতুরির আকাশে বাতাসে উৎসবের ঘটা লাগিয়া গেল।

খেতুরি-উৎসবে নরোত্তমের দক্ষিণ-হস্ত ছিলেন তাঁহার পিতৃব্য-পুত্র সন্তোষ-দত্ত। তিনি ভক্তদিগের জন্য অসংখ্য বাসা নির্মাণ করাইয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের জন্য তিনি পদ্মায় নৌকারও ব্যবস্থা রাখিয়াছিলেন। তাঁহারা স্বচ্ছন্দে নদী পার হইয়া খেতুরি পৌছাইলে তিনি গোপীরমণ-চক্রবর্তী[৪৯] প্রভৃতি নরোত্তম-শিষ্যবৃন্দের সাহায্যে বিভিন্ন স্থানাগত বৈষ্ণব দলগুলির জন্য পৃথক পৃথক বাসার ব্যবস্থা করিয়া রাজ-ভাণ্ডার হইতে প্রচুর অর্থ ও খাদ্য-দ্রব্যাদির বরাদ্দ করিয়া দিলেন। তাঁহার তত্ত্বাবধানে মন্দির ও বেদী-সজ্জাঃএবং 'সংকীর্তনস্থলী' নির্মাণাদি বিষয়ে কোথাও ত্রুটি থাকিল না। উৎসবের আয়োজন ছিল বিরাট, এবং সমারোহ হইয়াছিল বিপুল। ইতিপূর্বে বাংলা দেশে বোধকরি এত বড় উৎসব এবং তদুপলক্ষে এত বড় বৃহৎ জন-সমাবেশ আর কখনও ঘটিয়া উঠে নাই। জাহ্নবাদেবী শ্রীনিবাস ও রঘুনন্দনাদি বৈষ্ণব-মহান্তবৃন্দের নির্দেশে ইহার প্রধান প্রধান অনুষ্ঠানগুলি নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। কিন্তু এত বড় একটি বিরাট ব্যাপারের পশ্চাতে যে কর্মক্ষমতা, ধৈর্য ও বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন হইয়া থাকে, রাজা-সন্তোষ তাহারই অধিকারিরূপে তাঁহার অতন্দ্র দৃষ্টি ও নিরলস প্রচেষ্টার দ্বারা তুচ্ছ বৃহৎ সমস্ত ঘটনাকেই সুষ্ঠুভাবে সুশৃঙ্খলার সহিত সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছিলেন। আর নরোত্তম ছিলেন সমগ্র উৎসবটিরই আঙ্গিক ও আধ্যাত্মিক তাৎপর্যের সমন্বয়কারী নিয়ামক। তাঁহার একদিকে ছিলেন সন্তোষ, অন্যদিকে ছিলেন জাহ্নবা-শ্রীনিবাসাদি উদ্গাতৃবৃন্দ।

সন্তোষ বহুবিধ খোল-করতালাদি নির্মাণ করাইয়া রাখিয়াছিলেন। উৎসবের পূর্ব-দিন নরোত্তম শ্রীনিবাসাচার্যকে তথায় লইয়া গেলে শ্রীনিবাস গৌরাঙ্গ-গোকুল-দেবীদাস-গোবিন্দদাসাদিকে[৫০] সঙ্গে লইয়া খোল-করতাল-পূজা সম্পন্ন করিলেন। বৈষ্ণব-মহান্তদিগের জন্য সন্তোষ বস্ত্রাদিও সংগ্রহ করিয়াছিলেন। পরদিন নরোত্তম শ্রীনিবাসকে লইয়া তাঁহাদের বাসাতে গিয়া 'সবে বস্ত্র পরান আগ্রহ করি কত।' তারপর তিনি জাহ্নবা ও অন্যান্য বৈষ্ণবের অনুমতি গ্রহণ করিলে শ্রীনিবাস অভিষেকের কার্যে অগ্রসর হইলেন।

(৪৯) ঐ—৬ষ্ঠ. বি., পৃ. ৮৭ (৫০) প্রে. বি.—১৯শ. বি., পৃ. ৩১২, ৩২০

সেদিন ছিল ফাল্গুনী পূর্ণিমা। গৌরাঙ্গপ্রভুর আবির্ভাব-তিথি। প্রাপ্ত গৌরাঙ্গ-বিগ্রহ সহ শিলা-নির্মিত অন্য পাঁচটি অপূর্ব বিগ্রহ ছয়টি সিংহাসনে সুসজ্জিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল[৫১]—

গৌরাঙ্গ বল্লভীকান্ত শ্রীব্রজমোহন।
শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকান্ত শ্রীরাধারমণ ॥

বিপুল শঙ্খ- ও বাদ্য-ধ্বনি এবং বেদোচ্চারণাদির মধ্য দিয়া শ্রীনিবাস যথাবিহিতভাবে 'রাধাকৃষ্ণ যুগলমন্ত্রে' ও 'দশাক্ষর গোপালমন্ত্রে'[৫২] বিগ্রহের অভিষেক সম্পন্ন করিলে নরোত্তম সর্বানুমতিক্রমে গোকুল, গৌরাঙ্গ, দেবীদাসকে লইয়া গীতবাদ্য আরম্ভ করিলেন। দেবীদাসাদি 'খোল' বা 'মর্দল' বাদ্য, গৌরাঙ্গদাস 'কাংস্য' বা 'তালে করতাল বাদ্য' এবং বল্লভ-গোকুলাদি ভক্ত 'অনিবদ্ধ গীত' আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন। এই বল্লভই সম্ভবত বিখ্যাত পদকর্তা বল্লভদাস। 'গৌরপদতরঙ্গিণী'তে উদ্ধৃত 'বল্লভ'- বা 'বল্লভদাস'-ভণিতার পদগুলির মধ্যে অন্তত শেষোক্ত তিনটি যে ইঁহার রচিত তাহাতে সন্দেহ থাকে না। আর সম্ভবত এই গোকুলদাসও পদকর্তা ছিলেন। 'পদকল্পতরু'তে গোকুলদাস-ভণিতার যে ব্রজবুলি পদটি (২৯৭৫) পাওয়া যায়, তাহা এই গোকুলদাসের হওয়া বিচিত্র নহে। যাহা হউক, বল্লভ গোকুলাদি ভক্ত গীতালাপে প্রবৃত্ত হইলে নরোত্তম 'দীন প্রায় দাঁড়াইয়া প্রভুর প্রাঙ্গণে' নৃত্য-সংগীত আরম্ভ করিলেন এবং ক্রমে ক্রমে শ্রোতৃবৃন্দ সেই সংকীর্তন-মাধুরীতে বিমোহিত হইলেন। স্বয়ং গৌরাঙ্গপ্রভুর সংকীর্তন-আসরে যে পুলকাবেগ অনুভূত হইত, এতকাল পরে যেন তাহারই পুনরাবৃত্তি ঘটিয়া সমগ্র সভাস্থলকে ভাববন্যায় প্লাবিত করিয়া দিল, এবং সকলেই যেন নরোত্তম ও তাঁহার সঙ্গী-বৃন্দের দেহমনের উপর সপার্ষদ্ গৌরাঙ্গের আবেশ অনুভব করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়া গেলেন।[৫৩] 'প্রেম বরিষণে' 'আচণ্ডাল' সকলেরই হৃদয়ের 'তাপ' দূরীভূত হইল।[৫৪]

'প্রেমবিলাস-'কার বলিতেছেন[৫৫] যে নরোত্তমের ভাবাবেশ দেখিয়া তাঁহার পিতা

---

(৫১) প্রে. বি.—১৯শ. বি., পৃ. ৩০৫-৬, ৩১০-১১ ; ন. বি.—৬ষ্ঠ. বি., পৃ. ৯১ ; ভ. র.—১০।৪৮৩ (৫২) প্রে. বি.—১৯শ. বি., পৃ. ৩১২ (৫৩) প্রে. বি.—১৯শ. বি., পৃ. ৩১১-১২ ; ভ. র.—১০।৫৭১-৬২২ (৫৪) প্রকৃতপক্ষে খেতুরির উৎসবের এই কীর্তন যে এক সময় সমগ্র বাংলাদেশকেই ভাববন্যায় প্লাবিত করিয়া ভবিষ্যৎকালের উপরেও নানাভাবে বিপুল প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে ঐতিহাসিক, সংগীতজ্ঞ এবং গবেষক প্রভৃতি সুধীসমাজ সকলেই নিঃসন্দেহ।—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (প্রাচীন বাংলার গৌরব) ; খগেন্দ্রনাথ মিত্র (কীর্তন) ; অপর্ণাদেবী (শারদীয়া আনন্দবাজার, ১৩৫৯); স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ (পদাবলী কীর্তনের পরিচয়—বলরামদাসের পদাবলী) ; সুরেন্দ্রনাথ দাস (বংগশ্রী—ভাদ্র, ১৩৪৭) (৫৫) ১৪ শ. বি., পৃ. ২০৪-৬

'কৃষ্ণানন্দ মজুমদার' এবং মাতা নারায়ণী অস্থির হইয়াছিলেন। গোকুলদাস মৃদঙ্গ-ধ্বনি করিতেছিলেন। কিন্তু তিনি হঠাৎ আলাপ ছাড়িয়া গৌরাঙ্গগুণ-মাধুরীযুক্ত গান আরম্ভ করিলে নরোত্তম ভাবাবেশে ভূপতিত হন এবং তাঁহার 'মাতা পিতা বন্ধুজন' নানা চেষ্টা করিয়া তাঁহার সম্বিৎ ফিরাইয়া আনেন। এইভাবে সংকীর্তন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইলে সন্তোষ-দত্ত ফাগু লইয়া আসিলেন এবং মহাসমারোহে ফাগুক্রীড়া অনুষ্ঠান শেষ হইল। তাহার পর রাত্রিতে শ্রীনিবাস কর্তৃক 'প্রভু জন্মতিথি অভিষেকাদি'ও স্বনুষ্ঠিত হইল।

পরদিন প্রভাতে জাহ্নবাদেবী স্বহস্তে রন্ধন করিয়া বিগ্রহসেবা করিলে শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও সন্তোষ মহানন্দে বৈষ্ণব-ভোজন করাইলেন। তাহার পরের দিন বৈষ্ণবদিগের বিদায় গ্রহণের কথা। কিন্তু রাজা-সন্তোষের অভিলাষানুযায়ী তাঁহাদিগকে সেইদিনও থাকিয়া যাইতে হইল। সেইদিন সন্তোষ বৈষ্ণবদিগের বাসায় পৃথক পৃথক ভাবে ভোজদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রত্যেকটি বাসায় তিনি পৃথকভাবে প্রচুর খাদ্য-সামগ্রী তণ্ডুল-তরকারী এবং একজন করিয়া পাককর্তাও পাঠাইয়া দিলেন। কেবল তাহাই নহে, ভক্তবৃন্দের জন্য 'তাম্বূলাদি সহ বাটা,' 'থাল, বাটী' ও 'অপূর্বগঠন ঝারি' এবং 'স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রা পট্টবস্ত্রাদি, আসন' প্রভৃতি বহুবিধ উপঢৌকনও প্রেরিত হইল[৫৬] এবং স্বয়ং রাজা-সন্তোষ-দত্তও তৎসহ বাসাগুলিতে উপস্থিত হইয়া সকল কিছু সুনির্বাহ করিলেন। এমন কি সেই মহামিলন-ক্ষেত্রে 'চণ্ডালাদি পাইলেন পরম সম্মান।' পরদিন ভক্তবৃন্দ যাহাতে পদ্মা-স্নানান্তে আহারাদি করিয়া যাইতে পারেন, তজ্জন্য শ্রীনিবাস ও নরোত্তম একত্রে যুক্তি করিয়া প্রচুর পরিমাণে 'প্রসাদ পক্বান্ন' পাঠাইয়া দিলেন এবং শ্যামানন্দ সহ তাঁহারাও পদ্মাবতী পর্যন্ত আসিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিয়া গেলেন। সন্তোষ পূর্ব হইতেই নৌকার ব্যবস্থা রাখিয়াছিলেন। ভক্তবৃন্দ নির্বিঘ্নে পদ্মা অতিক্রম করিলেন।

জাহ্নবা-ঈশ্বরী আরও দুই দিন খেতুরিতে থাকিয়া গোকুল-নৃসিংহ-বাসুদেবাদি ভক্ত সহ বৃন্দাবন-গমন করিলেন।[৫৭] প্রত্যাবর্তন-পথে তিনি যাহাতে পুনরায় খেতুরিতে আসিয়া স্বীয় পাদপদ্ম দর্শন করাইয়া যান, তজ্জন্য সন্তোষ বিচলিতভাবে তাঁহাকে অনুরোধ জানাইলেন। যাত্রাকালে সন্তোষ বৃন্দাবনের গোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন, রাধাবিনোদ, রাধারমণ ও রাধাদামোদরের জন্য 'অতি সূক্ষ্ম পট্ট আদি বিচিত্র বসন' ও 'নানা রত্ন জড়িত স্বর্ণাদি বিভূষণ' এবং 'স্বর্ণ রোপ্য মুদ্রাদি বহু বস্তু' ভক্তবৃন্দের সহিত প্রেরণের

(৫৬) ন. বি.—৭ম. বি., পৃ. ১০৫-৮; ভ. র.—১০।৭১৪-৪০ (৫৭) জাহ্নবা-বিদায় ও খেতুরি-উৎসব সম্বন্ধে দ্র. শ্রীনিবাস

ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।[৫৮] গমনাগমনের জন্য যাহাতে কোনও অসুবিধা না হয় তজ্জন্য তিনি সকল প্রকার আয়োজন করিয়া দিলে জাহ্নবা যাত্রা আরম্ভ করিলেন। যে সমস্ত ভক্ত তখনও খেতুরিতে উপস্থিত ছিলেন সন্তোষ তাঁহাদিগকেও ক্রমে ক্রমে এইভাবে যথাযোগ্য সংবর্ধনা জানাইয়া বিদায় দিলেন। শ্যামানন্দ সহ শ্রীনিবাস আরও কয়েক-দিবস খেতুরিতে থাকিয়া গেলেন। তাঁহাদের অবস্থানকালে সন্তোষ তাঁহাদিগকে লইয়া রাজবাটী ও বিভিন্ন দ্রষ্টব্য স্থান পরিদর্শন করাইয়া আনিলেন এবং নরোত্তম-ঠাকুর প্রত্যহ দেবীদাস, গোকুল ও গৌরাঙ্গদাসাদিকে লইয়া খোল-করতালাদি-যোগে নৃত্য-কীর্তন করিয়া মহামান্য অতিথিবৃন্দকে আপ্যায়িত করিলেন। তারপর তাঁহাদের খেতুরি পরিত্যাগ করিবার দিন নরোত্তম পদ্মাবতী পর্যন্ত গিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিয়া আসিলেন। গৃহে ফিরিয়া নরোত্তম উৎসবের কর্মী-বৃন্দ এবং 'গ্রামীয় লোক'দিগকে নিমন্ত্রণ জানাইয়া প্রসাদ ভোজন করাইলেন। বহু বহু পাষণ্ডী-বৃন্দও সেই ভোজসভায় যোগদান করিয়াছিলেন। এইভাবে নরোত্তম-ঠাকুর খেতুরিতে যে মহামিলনোৎসব সম্পন্ন করিলেন, তাহার মধ্য দিয়া চৈতন্য-প্রবর্তিত ভক্তিধর্মের মন্দীভূত স্রোত-প্রবাহ যেন পুনরায় তাহার প্রকৃত স্বরূপেই সগৌরবে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। নরোত্তমের ব্যবস্থানুসারে তদবধি খেতুরিতে যথারীতি নিত্যসেবা ও সংকীর্তনের প্রবর্তন হইল।[৫৯] 'প্রেমবিলাস'-কার বলেন যে 'বৎসর ভরি সংকীর্তন' ও ভাগবত-ব্যাখ্যা এবং 'চৈতন্যভাগবত' ও 'চৈতন্যচরিতামৃতা'দির পাঠও চলিয়াছিল। গ্রন্থকার আরও বলেন,[৬০] এইভাবে যে মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া গেল, তাহারপর হইতে প্রতি বৎসরই খেতুরিতে তাহার পুনরাবৃত্তি চলিত। পরবর্তিকালে আরও একবার ফাল্গুনী 'পূর্ণিমার তৃতীয় দিবসে' খেতুরিতে আর একটি মহাসভার অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।[৬১]

জাহ্নবাদেবী বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া খেতুরিতে আসিলে সন্তোষ তাঁহাকে পূর্ববৎ বিপুলভাবে সংবর্ধিত করিলেন। তিনি ভক্তবৃন্দের জন্য পৃথক পৃথক বাসার ব্যবস্থা করিলেন এবং ভক্তবৃন্দ ও জাহ্নবার জন্য যে নব্য-বস্ত্রাদি সংগ্রহ করা হইয়াছিল, এখন তিনি তাহা তাঁহাদিগকে অর্পণ করিলেন। জাহ্নবার একচক্রা যাইবার বাসনা ছিল। তাই সন্তোষ তাঁহার দ্বারা দুইটি পত্র লিখাইয়া একটি খড়দহে এবং অন্যটি শ্রীনিবাসের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। নরোত্তমও নানাভাবে জাহ্নবার সেবা করিলেন। গোবিন্দ-কবিরাজ বৃন্দাবন হইতে শ্রীজীব-প্রেরিত 'গোপালবিরুদাবলী' গ্রন্থখানি নরোত্তমকে প্রদান করিলে তিনি তাহা রামচন্দ্রের নিকট গচ্ছিত রাখিলেন। কয়েকদিন পরেই

(৫৮) ন. বি.—৮ম. বি., পৃ. ১১৭-২০ (৫৯) প্রে. বি.—১৯শ. বি., পৃ. ৩১৭ (৬০) ১৯শ. বি., পৃ. ৩১৮ (৬১) ঐ—পৃ. ৩৩৭-৪০

জাহ্নবার বিদায়কালে সন্তোষ তাঁহার উদ্দেশ্যে তাঁহার প্রধান সঙ্গী পরমেশ্বরীদাসের হস্তে বহুবিধ দ্রব্যসামগ্রী অর্পণ করিলেন। তারপর নরোত্তম এবং রামচন্দ্র জাহ্নবার সহিত বুধরি হইয়া একচক্রা গমন করেন এবং একচক্রা-পরিক্রমার পর নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া কণ্টকনগরে ও শেষে যাজিগ্রামে আসিয়া উপস্থিত হন। যাজিগ্রামে রামচন্দ্র পূর্বোক্ত 'গোপালবিরুদাবলী'-গ্রন্থখানি শ্রীনিবাসের হস্তে সমর্পণ করেন। তাহার পর জাহ্নবাদেবী শ্রীখণ্ড হইয়া খড়দহে চলিয়া গেলে শ্রীনিবাস নরোত্তম এবং রামচন্দ্র সহ নবদ্বীপ-পরিক্রমা করিয়া পুনরায় যাজিগ্রামে আসিলেন। এই স্থানে নরোত্তমের সহিত রাজা-হাম্বীরের সাক্ষাৎ হইল ও ঘনিষ্ঠতা জন্মাইল। এই সময় জাহ্নবা-প্রেরিত রাধিকা-বিগ্রহ লইয়া পরমেশ্বরীদাস বৃন্দাবনের পথে যাত্রা করিলে শ্রীনিবাস-নরোত্তমাদি কণ্টকনগরে গিয়া তাঁহাকে বিদায় দিয়া পুনরায় যাজিগ্রামে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং কিছুদিন পরে রাজা-হাম্বীরকে বিদায় জ্ঞাপন করিয়া সকলেই একত্রে বুধরি হইয়া খেতুরিতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। শ্রীনিবাস-আচার্য কিছুদিন পরে খেতুরি ত্যাগ করিয়া গেলে নরোত্তম এবং রামচন্দ্র একনিবিষ্ট চিত্তে শাস্ত্রালোচনা, নাম-সংকীর্তন এবং অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় রত হইলেন।[৬২] 'বিপ্র বৈষ্ণব একত্রে' বসিয়া উদার-চিত্তে নরোত্তমের নিকট পাঠ গ্রহণ করিয়া ধন্য হইলেন।[৬৩]

নরোত্তম এবং রামচন্দ্র ছিলেন যেন 'সমপ্রাণ-সখা'। তাঁহারা একত্রে থাকিয়া ধর্ম-প্রচারে যত্নবান হইলেন। 'নরোত্তমবিলাসে' নরোত্তমের মাহাত্ম্য-বিষয়ক একটি কাহিনী প্রদত্ত হইয়াছে। বস্তুত, এইরূপ কাহিনীগুলি প্রধানতই মাহাত্ম্যপ্রচারমূলক। সুতরাং ইহাদের বক্তব্য বিষয়ে সত্যের বিশেষ সংস্পর্শ নাও থাকিতে পারে। তবে অন্য কোন না কোন দিক হইতে ইহারা সার্থক হইয়া উঠে। নরোত্তমের অধ্যাপনাকালে একদিন গুরুদাস-ভট্টাচার্য নামক পাছ্‌পাড়া গ্রামনিবাসী এক বিশিষ্ট বৈদিক ব্রাহ্মণ আসিয়া জানাইলেন[৬৪] যে তিনি স্বীয় শিষ্যবৃন্দের নিকট নরোত্তমকে শূদ্রত্বের জন্য নিন্দিত করায় কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছেন, এখন তিনি অনুতপ্ত চিত্তে নরোত্তমের কৃপাপ্রার্থী। নরোত্তম প্রেমাবিষ্ট হইয়া সেই বিপ্রকে আলিঙ্গন দান করিলে তিনি রোগমুক্ত হন। শূদ্র বলিয়া নরোত্তমকে নানাভাবে লোকনিন্দার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল।

আর একদিন নরোত্তম রামচন্দ্রকে লইয়া পদ্মা-স্নানে গেলে 'গঙ্গা-পদ্মা সঙ্গমস্থলে'র গোয়াস গ্রামনিবাসী 'রাঢ়ীশ্রেণী বিপ্র' শিবাই-আচার্যের পুত্র হরিরাম ও রামকৃষ্ণের সহিত

---

(৬২) উপরোক্ত অনুচ্ছেদের ঘটনাবলীর বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্র. শ্রীনিবাস। (৬৩) ন. বি.—৯ম. বি., পৃ. ১৪৬; প্রে. বি.—১৯শ. বি., পৃ. ৩২১-২২; ২০শ. বি., পৃ. ৩৫৬ (৬৪) ন. বি.—৯ম. বি.—পৃ. ১৪৬

তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটে।[৬৫] হরিরাম ও রামকৃষ্ণ পিতৃ আজ্ঞায় ভবানীপূজার নিমিত্ত পদ্মাপারে ছাগ মেষ মহিষাদি ক্রয় করিতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু নরোত্তম ও রামচন্দ্রের প্রভাবে তাঁহারা জীবহিংসার অসমীচীনতার কথা বুঝিতে পারিয়া সমস্ত পশু ছাড়িয়া দেন এবং সঙ্গী লোকজনকে বিদায় দিয়া খেতুরিতে চলিয়া আসেন। খেতুরিতে নরোত্তমাদির প্রভাবে তাঁহাদের মনের আমূল পরিবর্তন ঘটে এবং জ্যেষ্ঠ হরিরাম ও কনিষ্ঠ রামকৃষ্ণ যথাক্রমে রামচন্দ্র ও নরোত্তমের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়া গোয়াসে প্রত্যাবর্তন করেন। গোয়াসে গিয়া তাঁহারা বৈদ্য বলরাম-কবিরাজের গৃহে রাত্রিযাপন করিলেন। পরদিন প্রভাতে তাঁহাদের পিতার সহিত সাক্ষাৎ ঘটিলে তিনি তাঁহাদিগকে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করিতে থাকেন। শূদ্র নরোত্তমের ব্রাহ্মণ-শিষ্যকরণের জন্য শিবাই-আচার্য ক্রোধান্ধ হইয়া পণ্ডিত-সমাজে নরোত্তমকে পরাভূত করিতে চাহিলেন। কিন্তু হরিরামই পণ্ডিতদিগকে পরাস্ত করিলে তিনি মিথিলা হইতে মুরারি নামক দিগ্বিজয়ী-পণ্ডিতকে লইয়া আসিলেন। মুরারিকেও বলরামাদির নিকট পরাভব স্বীকার করিতে হইল এবং তিনি লজ্জায় 'ভিক্ষু-ধর্ম আশ্রয় করিয়া' পলায়ন করিলে সকলেই বৈষ্ণবধর্মের মাহাত্ম্য স্বীকার করিয়া লইলেন। অতঃপর হরিরাম রামকৃষ্ণ ও বলরাম-কবিরাজ প্রভৃতি নাম-সংকীর্তন ও চৈতন্য-গুণগান করিয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন। হরিরাম-আচার্য বা হরিরামদাস একজন পদকর্তাও হইয়াছিলেন।[৬৬]

কিছুদিন পরে আচার্য-ভ্রাতৃদ্বয় সুরধুনী-তীরস্থ গাম্ভীলায় আসিলে গাম্ভীলানিবাসী বারেন্দ্র শ্রেণীর সুবিখ্যাত কুলীন ব্রাহ্মণ 'মহাতুষ্টমতি' গঙ্গানারায়ণ-চক্রবর্তীর সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ ঘটে।[৬৭] গঙ্গানারায়ণ ইতিপূর্বে তাঁহাদের বৈষ্ণবত্ব-গ্রহণ ও ভক্তিধর্মের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে অবগত হইয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি তাঁহাদের ব্রাহ্মণ হওয়া সত্ত্বেও তুচ্ছ বৈষ্ণবধর্ম-গ্রহণের জন্য তাঁহাদের সহিত বিতর্ক করেন। কিন্তু তিনি তাঁহাদিগের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়া[৬৮] তাঁহাদের সহিত বুধরিতে এবং তাহারপর খেতুরিতে আসিলে নরোত্তম তাঁহাকে দীক্ষিত করিয়া রামচন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করিলেন। 'সর্ববিদ্যাবিশারদ' গঙ্গা-

(৬৫) তু.—প্রে. বি.—১৪শ. বি., পৃ. ২০৮-১১ ; ১৭শ. বি., পৃ. ২৫৭-৬১ ; ২০শ. বি., পৃ. ৩৫২ ; ন. বি.—৯ম. বি., পৃ. ১৪৯-৫২ (৬৬) প. ক. (প.)—পৃ. ২৩২ (৬৭) ন. বি.—১০ম. বি.; পৃ. ১৫৩-৫৭ ; তু.—প্রে. বি.—১৭শ. বি., পৃ. ২৫৭-৬০ ; ২০শ. বি., পৃ. ৩৫২ ; উদ্ধবদাসের একটি পদে (গৌ. ত.—পৃ. ৩২৮) ইঁহাকে 'গামিলা-নিবাসী' বলা হইয়াছে। (৬৮) ন. বি.-মতে (পৃ. ১৫৪) তাঁহাদের তিনজনের কথাবার্তাকালে নরোত্তমও গঙ্গাস্নানে আসেন এবং গঙ্গানারায়ণ তাঁহার চরণে পতিত হইয়া কিছু বলিতে চাহিলে নরোত্তম তাঁহাকে সাবধান করেন যে উহাতে নিকটবর্তী ব্রাহ্মণেরা কিছু মনে করিতে পারেন, সুতরাং গঙ্গানারায়ণ যেন খেতুরিতেই যান।

নারায়ণও ক্রমে গোস্বামী-গণের গ্রন্থ অধ্যয়ন ও 'নিরবধি সংকীর্তনে' রত হইয়া 'প্রেমভক্তি ধনে ধনী' হইয়া উঠিলেন। পরবর্তিকালে গঙ্গানারায়ণ শত-শত শিষ্যের নিত্য অন্ন-সংস্থান করিয়া তাঁহাদিগকে শিক্ষা দান করিতেন।[৬৯]

ইহার পর তেলিয়াবুধরি গ্রামস্থ জগন্নাথ-আচার্য[৭০] নামে এক ভগবতী-পূজক বৈদিক-বিপ্র নরোত্তমের চরণাশ্রয় প্রার্থনা করিলে নরোত্তম তাঁহাকেও দীক্ষা দিয়া ভক্তিবলে বলীয়ান করিলেন। কিন্তু এই সময়ে রাজা নরসিংহ ও তাঁহার সভাপণ্ডিত নরনারায়ণকে দীক্ষাদান[৭১] করিতে সমর্থ হইলে ধর্মপ্রচারের ক্ষেত্রে নরোত্তমের শ্রেষ্ঠ সাফল্য অর্জিত হয়। 'প্রেমবিলাসে' বর্ণিত হইয়াছে যে নরসিংহ ছিলেন 'অতিদূরদেশে' 'গঙ্গাতীর নগরী' 'পক্কপল্লী'র প্রজারঞ্জক নৃপতি। গ্রন্থের নরোত্তমশাখা-বর্ণনায় ইঁহাকেই আবার রাঢ়দেশস্থ গোপালপুরনিবাসী বলা হইয়াছে।[৭২] 'নরোত্তমবিলাস'-মতে 'নরসিংহ নামে রাজা রহে দূর দেশে।' নরসিংহের সভায় অনেক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত থাকিতেন। অব্রাহ্মণ-নরোত্তমের খ্যাতিতে ক্রুদ্ধ হইয়া এক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত রাজসমক্ষে তাঁহার অনাচার সম্বন্ধে অভিযোগ করিয়া জানাইলেন যে তিনি কুহক বলেই ক্রমাগত বিপ্রদিগকে বৈষ্ণব করিয়া ফেলিতেছেন। নরসিংহ সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন এবং ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের প্রার্থনা পূরাণার্থ রাজপণ্ডিত-রূপনারায়ণকে লইয়া নরোত্তমকে পরাভূত করিতে যাইবার জন্য সিদ্ধান্ত করিলেন। এই রূপনারায়ণের পূর্ব-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে 'নরোত্তমবিলাসে' কিছুই বলা হয় নাই, কিন্তু 'প্রেমবিলাসে' সেই সম্বন্ধে নিম্নোক্তরূপ বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।[৭৩] গ্রন্থকার বলেন যে তিনি স্বয়ং নরসিংহ-রায়ের নিকটই রূপচন্দ্রের পূর্ব-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন।

বংগদেশে কামরূপ নামক রাজ্যের রাজধানী ছিল এগারসিন্দুর।

> এগার সিন্দূর আর মিরজাফরপুর।
> দগ্‌দা কুটীশ্বর আর হোসেনপুর॥
> ব্রহ্মপুত্রতীরেতে এ সব স্থান হয়।
> নানাদেশী লোক তথা বাণিজ্য করয়॥

এই স্থানগুলি বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে এগার সিন্দুরের

(৬৯) প্রে. বি.—২০শ. বি., পৃ. ৩৫২ (৭০) ন. বি.—১০ম. বি., পৃ. ১৫৭ ; প্রে. বি.—১৯শ বি., পৃ. ৩২৩ ; ২০শ. বি., পৃ. ৩৫৪ (৭১) প্রে. বি.—১৯শ. বি., পৃ. ৩২৪-৩৬ ; ন. বি.—১০ম. বি., পৃ. ১৫৭-৬৩ ; ১২শ. বি. (৭২) লক্ষণীয় যে এই স্থলে ইঁহার ঠিক পূর্ববর্তী বর্ণিত ব্যক্তি গুরুদাস-ভট্টাচার্যকে 'পাহ্‌পাড়া'বাসী বলা হইয়াছে। (৭৩) ১৯ শ. বি., পৃ. ৩২৪-৩১ ; ২০ শ. বি., পৃ ৩৫৩

নিকটবর্তী ভিটাদিয়া গ্রামে লক্ষ্মীনাথ-লাহিড়ী[৭৪] নামক এক বারেন্দ্র শ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার পত্নীর নাম ছিল কমলাদেবী ও পুত্রের নাম রূপচন্দ্র। 'বাল্যকালে রূপচন্দ্র মহাতুষ্ট ছিলা।' তিনি কোনমতে লেখাপড়া না করায় 'একদিন পিতা ক্রোধে অন্নে দিল ছাই।' রূপচন্দ্র তখন মাতাকে প্রণাম জানাইয়া 'গ্রাম্যপণ্ডিতে'র বাড়ীতে গিয়া ব্যাকরণ শিক্ষা করিলেন এবং 'চক্রবর্তী'-উপাধি গ্রহণ করিয়া নবদ্বীপে চলিয়া গেলেন। নবদ্বীপেও তিনি যথেষ্ট বিদ্যাশিক্ষা করিয়া 'আচার্য খেয়াতি' লাভ করিলেন এবং নীলাচলে গিয়া দূর হইতে সংকীর্তনরত মহাপ্রভুর দর্শনলাভ করিলেন। তারপর নীলাচল হইতে পুণা-নগরে গিয়া তিনি 'বেদ বেদাঙ্গ বেদান্তাদি' গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলেন এবং 'অধ্যাপক'-উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। 'মহাশ্রুতিধর' বলিয়া তাঁহার যশ চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। তখন তিনি নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া বৃন্দাবনে রূপ-সনাতনের নিকট আসিয়া তর্কযুদ্ধ করিতে চাহিলে তাঁহারা বিনাযুদ্ধে তাঁহাকে জয়পত্র লিখিয়া দেন।[৭৫] কিন্তু যমুনাতীরে আসিলে তাঁহার সহিত শ্রীজীবের সাক্ষাৎ ঘটে এবং জীবের সহিত তর্কযুদ্ধ করিয়া তিনি সপ্তম দিবসে পরাভূত হন। তখন তিনি অনুতপ্তচিত্তে জীব এবং সনাতন ও রূপের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া মন্ত্রদীক্ষা প্রার্থনা করেন। কিন্তু গোস্বামিদ্বয় তাঁহাকে 'হরিনাম মহামন্ত্র' প্রদান করিলেও মন্ত্রদীক্ষা দান করেন নাই। তখন তিনি এইস্থানে থাকিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিতে থাকিলে একদিন তাঁহার নারায়ণ-আবেশ হয়। তাহা দেখিয়া গোস্বামী-গণ তাঁহাকে 'রূপনারায়ণ' নামে অভিহিত করেন। ক্রমে তিনি 'লঘু, বৃহদ্ভাগবতামৃত' 'রসামৃত' 'উজ্জ্বলা'দি ভক্তিশাস্ত্র পাঠ করিয়া বৃন্দাবন-মথুরা পরিক্রমা করিলেন এবং রঘুনাথ-ভট্ট, গোপাল-ভট্ট, রঘুনাথদাস, কৃষ্ণদাস-ব্রহ্মচারী ও কাশীশ্বরাদি বৈষ্ণববৃন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পুনরায় নীলাচলে চলিয়া গেলেন। কিন্তু তখন মহাপ্রভুর তিরোভাব ঘটায় তিনি গদাধর-পণ্ডিত, স্বরূপদামোদর এবং রামানন্দ-রায় প্রভৃতির নিকট অনুগ্রহ লাভ করিয়া গৌড়মণ্ডলে ফিরিয়া আসিলেন। গৌড়ে আসিয়াও তিনি প্রথমে অদ্বৈতের এবং তাহার পর নিত্যানন্দের অন্তর্ধান সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। ইহার পর একদিন গঙ্গাস্নানার্থ আগত রাজা-নরসিংহের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটিলে নরসিংহ তাঁহার পাণ্ডিত্য-দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে স্বীয় রাজসভায় মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। 'প্রেমবিলাস'-কার বলেন যে রূপনারায়ণ যোগশাস্ত্রেও পারদর্শী ছিলেন এবং গ্রন্থকার তাঁহাকে যোগগুরু করিয়াছিলেন। গ্রন্থকার আরও বলেন :

(৭৪) ইনি স্বরূপদামোদরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। ইঁহার পিতা পদ্মগর্ভাচার্যের বিবরণ সম্বন্ধে দ্র.—স্বরূপদামোদর (৭৫) দ্র.—জীব-গোস্বামী।

তার চরিত্র লিখিতে আছে ঈশ্বরী আদেশ।
সংক্ষেপে লিখিল নাহি লিখিল বিশেষ ॥

যাহা হউক, রাজা নরসিংহ যখন শুনিলেন যে নরোত্তম শূদ্র হইয়া ব্রাহ্মণকে মন্ত্রদান করিতেছেন এবং 'বলিবিধান পশ্বালম্ভ' ও 'বৈদিক তান্ত্রিক ক্রিয়া'দি সমস্তই দেশ হইতে লোপ পাইতে বসিয়াছে, তখন তিনি রূপনারায়ণ ও অন্যান্য পণ্ডিতদিগকে লইয়া খেতুরি গমন করিলেন। খেতুরির নিকটবর্তী আসিয়া তাঁহারা কুমারপুর গ্রামে বিশ্রাম করিতে থাকিলে খেতুরিতে তাঁহাদের আগমন সংবাদ পৌঁছায়। সেই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া রামচন্দ্র গঙ্গানারায়ণ হরিহর (হরিরাম?) রামকৃষ্ণ জগন্নাথ প্রভৃতি ভক্ত বারুই এবং কুমার প্রভৃতির বেশ ধারণ করিয়া কুমারপুরে গিয়া তাঁহাদের দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে আরম্ভ করেন।[৭৫] কিন্তু বিক্রয়কালে তাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় কথাবার্তা চালাইতে থাকিলে ক্রেতাগণ তাঁহাদের পাণ্ডিত্য দেখিয়া মুগ্ধ হন। তাঁহারা নরসিংহ এবং তাঁহার সঙ্গী পণ্ডিতদিগের নিকট গিয়া জানাইলেন যে খেতুরি হইতে আগত বারুই-কুমারাদির সহিত শাস্ত্রচর্চা করিয়া তবে যেন রাজা ও অধ্যাপকগণ নরোত্তমের নিকট তর্কার্থে গমন করিতে সাহসী হন। এই কথা শুনিয়া রাজা ও রাজপণ্ডিত কৌতূহলী হইয়া সেই স্থানে গমন করিলেন এবং জানিতে পারিলেন যে তাঁহারা খেতুরির মন্দিরের নিকট দ্রব্যাদি বিক্রয় করেন এবং সেই স্থানের বৈষ্ণব-পণ্ডিতদিগের সংস্পর্শে আসিয়াই তাঁহারা ঐরূপ বিদ্যালাভ করিয়াছেন। তখন রূপনারায়ণ ও অন্যান্য পণ্ডিতদিগের সহিত রামচন্দ্রাদির তর্ক চলিতে লাগিল; কিন্তু শেষে রূপনারায়ণাদি পরাভব স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। পরদিন রাজা-নরসিংহ সঙ্গী-গণসহ খেতুরিতে গিয়া নরোত্তমের চরণ শরণ করিলে নরোত্তম তাঁহাদিগকে সাদর সংবর্ধনা জানাইলেন। তারপর রাজার একান্ত ইচ্ছায় তিনি তাঁহাকে দীক্ষাদান করিলেন। তিনি রূপনারায়ণকেও 'দশাক্ষর গোপালমন্ত্র' 'কাম গায়ত্রী কামবীজ' প্রদান করিলেন। 'প্রেমবিলাস'-কার বলেন যে রাজার সহিত অন্য যে সমস্ত পণ্ডিত দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের নাম[৭৬] যদুনাথ-বিদ্যাভূষণ, কালীনাথ (বা কাশীনাথ)-তর্কভূষণ, হরিদাস-শিরোমণি, চন্দ্রকান্ত-ন্যায়পঞ্চানন, শিবচরণ-বিদ্যাবাগীশ ও দুর্গাদাস-বিদ্যারত্ন। দীক্ষাগ্রহণের পর রাজা-সন্তোষের ব্যবস্থায় তাহারা সকলেই বিশেষভাবে আপ্যায়িত হইলেন। কয়েকদিন যাবৎ গোস্বামিগ্রন্থ-অধ্যয়ন ও সংকীর্তন চলিল। গোবিন্দ-কবিরাজ তাঁহার স্বরচিত গীত এবং গঙ্গানারায়ণ-চক্রবর্তী ভাগবতপাঠ করিয়া সকলকেই প্রচুর আনন্দ দান করিলেন। এইভাবে কিছুদিন কাটাইয়া রাজা-নরসিংহ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন। কিন্তু তিনি পুনরায় তাঁহার রাণী রূপমালাকেও খেতুরিতে আনিয়া তাঁহাকে নরোত্তমের নিকট দীক্ষিত করিয়া লইলেন।

(৭৫) তু.—প্রে. বি.—১৯ শ. বি., পৃ.৩৩২ (৭৬)—১৯শ. বি., পৃ. ৩৩৫; ২০শ. বি., পৃ. ৩৫৬

ডা. সুকুমার সেনের অনুমান[৭৭] অনুযায়ী চম্পতি (=রায় চম্পতি, চম্পতি পতি), ভূপতি- ও নৃসিংহভূপতি-ভণিতাযুক্ত প্রাপ্ত পদগুলি যদি একই কবির রচনা বলিয়া গণ্য হয়, তাহা হইলে বলিতেই হয় যে পক্কপলীর রাজা এই নৃসিংহ বা নরসিংহদেব একজন পদকর্তাও ছিলেন এবং তাঁহার অধিকাংশ পদই ব্রজবুলি ভাষায় রচিত হইয়াছিল। গোবিন্দদাস তাঁহার চারিটি পদে নরসিংহ, রূপনারায়ণ, ভূপতি- রূপনারায়ণ এবং রায়-চম্পতির নাম-যুক্ত-ভণিতার মধ্যে উল্লেখ করায় গোবিন্দদাসের সহিত উক্ত ব্যক্তির ঘনিষ্ঠতা-সূত্রেও ডা. সেনের অনুমানকে সুসিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। বিশেষ লক্ষণীয় যে 'পদকল্পতরু'র একটি পদে (১৯৪৪) নরনারায়ণ-ভূপতি এবং বিজয়নারায়ণের, এবং অন্য একটি পদে (২৩৮৮) বিজয়নারায়ণের ও রূপনারায়ণের যুক্ত-ভনিতা দৃষ্ট হয়। বিজয়নারায়ণের কথা বলিতে পারা যায় না। হয়ত রূপনারায়ণের মত তিনিও রাজা-নরসিংহের একজন সভাপণ্ডিত হইয়া থাকিবেন। কিন্তু নরসিংহ ও নরনারায়ণের পক্ষে এক ব্যক্তি হওয়া বিচিত্র নহে।

যাহা হউক, উপরোক্ত প্রকারে নরোত্তমের ধর্মপ্রচার চলিতে লাগিল। ক্রমে 'রাঢ়ীশ্রেণী সাবর্ণ গোত্রী'য় ব্রাহ্মণ বলরাম-চক্রবর্তী ও একই শ্রেণী গোত্রীয় রূপনারায়ণ-পূজারী নামক খেতুরি-গ্রামস্থ আর এক দুষ্ট ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিলে তিনি তাঁহাদিগকে বিগ্রহ সেবায় নিযুক্ত করিলেন।[৭৮] হরিচন্দ্র-রায় নামক বংগদেশের অন্তর্গত জলাপন্থের এক জমিদার-দস্যুও তাঁহার নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়া হরিদাস নাম প্রাপ্ত হন।[৭৯] কিন্তু ইঁহারই আত্মীয় আর একজন বিখ্যাত জমিদার-দস্যুকে দীক্ষাদান করায় নরোত্তমের খ্যাতি বিশেষভাবে ছড়াইয়া পড়ে। তাঁহার নাম চাঁদ-রায়।[৮০] তাঁহার পিতার নাম ছিল রাঘবেন্দ্র-রায়, মাতার নাম বিষ্ণুপ্রিয়া ও জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতার নাম সন্তোষ-রায়।[৮১] ডা. সুকুমার সেন রাঘবেন্দ্র-রায় রচিত একটি পদের সন্ধান দিয়াছেন।[৮২] দুই ভ্রাতার সম্বন্ধেই 'প্রেমবিলাস'-কার জানাইতেছেন :

> শুনিয়া তাঁহার নাম কাঁপয়ে জীবন।
> চৌরাশি হাজার মুদ্রার ছিল জমিদার।
> তার কথোদিনে হৈল এমন প্রকার।
> গড়িদ্বারে গেল তাহা ফৌজদার হয়।
> রাজমহল থানা করি আমল করয়।......

---

(৭৭) H B L.—pp. 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158 (৭৮) প্রে. বি.—১৯শ. বি., পৃ. ৩৩৬ ; ২০শ. বি., পৃ. ৩৫১ (৭৯) ন. বি.—১০ম. বি., পৃ. ১৬৩ ; প্রে. বি.—১৯শ. বি., পৃ. ৩২৩ ; ১৭শ. বি., পৃ. ২৬০-৬১ (৮০) প্রে. বি.—১৮শ. বি., পৃ. ২৭৬-৯৭, ১৯শ. বি., পৃ. ৩২৩ ; ন. বি.—১০ম. বি., পৃ. ১৬৪-৬৬ (৮১) প্রে. বি —২০শ. বি., পৃ. ৩৫৪ (৮২) HBL—p. 408

না দেয় পাতসার কর থানা দেয় গ্রামে ॥
পাঁচ সহস্র অশ্ব রাখে কতক পয়দল।
কত দেশ মারি নিল করি অস্ত্রবল ॥······
লুটিয়া লইল আইল যত ধন কড়ি ॥······
ডাকা চুরি মনুষ্য মারে না মারে কাহাকে ॥······
শক্তি উপাসনা সদা মৎস্য মাংস খায়।
পরস্ত্রী ঘরদ্বার লুটি লঞা যায় ॥

এহেন চাঁদ-রায় একবার পীড়িত হইয়া নরোত্তমের নিকট প্রার্থনা জানাইয়া পত্র লিখিলে নরোত্তম আসিয়া তাঁহাকে সুস্থ করিয়া তুলেন এবং চাঁদ-রায় তাঁহার নিকট মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিতে চাহেন। ইহা দেখিয়া সন্তোষ-রায় এবং বিষ্ণুপ্রিয়া[৮৩] সহ রাঘবেন্দ্র-রায়ও সবংশে তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইতে চাহিলে তিনি তাঁহাদিগকে দীক্ষাদান করেন। তারপর নরোত্তমের খেতুরি-প্রত্যাবর্তনকালে চাঁদ-রায় সন্তোষ-রায় এবং রাঘব-রায় বহুবিধ মূল্যবান উপঢৌকন ও খাদ্য-সামগ্রীতে পরিপূর্ণ দুইখানি নৌকা লইয়া তাঁহার সহিত চলিলেন। খেতুরিতে গিয়া তাঁহারা কৃষ্ণানন্দ-রায় সহ সমস্ত দত্ত-পরিবারকে যথেষ্ট আনন্দ দান করিলেন এবং দেবীদাস-প্রভৃতি কীর্তনাদির দ্বারা তাঁহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিলে তাঁহারা প্রত্যাবর্তন করিলেন। 'প্রেম-বিলাস'কার বলেন[৮৪] যে হরিশ্চন্দ্র-রায়, গোবিন্দ-ভাদুড়ি[৮৫], ললিত-ঘোষাল, কালিদাস-চট্ট, নীলমণি-মুখুটি, রামজয়-চক্রবর্তী, হরিনাথ গাঙ্গুলি, শিব-চক্রবর্তী প্রভৃতি চাঁদ-রায়ের বান্ধব, আত্মীয় এবং সঙ্গী-গণও নরোত্তমের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে চাঁদ-রায় লোকজনসহ নৌকাযোগে গঙ্গাস্নানে চলিলে 'পাঠানের পিয়াদা' আসিয়া তাঁহার চরিত্রের পরিবর্তনের কথা না জানিয়াই তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গেল। চাঁদ-রায়ও বিনা আপত্তিতে নবাবের সম্মুখে আসিলেন এবং শাস্তি গ্রহণ করিয়া জরিমানা দিতে চাহিলেও ক্রুদ্ধ নবাব তাঁহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিয়া তাঁহাকে 'তলঘরে' নজর বন্দী রাখিলেন। এদিকে রাঘবেন্দ্র-রায় পুত্রের উদ্ধারার্থ পুরস্কার ঘোষণা করিলে এক ব্যক্তি তাঁহাকে উদ্ধার করিতে কৃতসংকল্প হন। তিনি কৌশলে চাঁদ-রায়ের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে 'মা কালীর মন্ত্র' গ্রহণ করিতে বলিলে চাঁদ-রায় কিন্তু 'রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র' ছাড়া আর কোন নামই উচ্চারণ করিতে চাহিলেন না। কয়েকদিন পরে ক্রোধাবিষ্ট নবাব তাঁহাকে 'মাতোয়াল' হস্তীর পাদদেশে ফেলিয়া দিলে চাঁদ-রায় সজোরে হস্তী-শুণ্ড

---

(৮৩) প্রে. বি.—১৮শ. বি., পৃ. ২৮৩ ; ২০শ. বি., পৃ. ৩৫৪ (৮৪) ১৯ শ. বি., পৃ. ৩২৩ ; ২০ শ.বি., পৃ. ৩৫৬-৫৭ (৮৫) ৩২৩ পৃষ্ঠায় 'ভাদুড়ি'র স্থলে ভুলবশত 'বাঁড়ুয্যা' লিখিত হইয়াছে।

ধরিয়া টান দেন এবং নিজেকে বিপন্মুক্ত করেন। নবাব তখন তাঁহাকে সেই বিপুল শক্তির সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নরোত্তমের কৃপার কথা বলিলেন। তাহার পর তিনি পিতৃপ্রেরিত লোকটির বিষয়ও নবাবকে জানাইলে নবাব সমস্ত শুনিয়া তাঁহাকে পুরস্কৃত করিলেন :

নিজরাজ্য ভোগ কর সব ছাড়িলাম।
ইলাকা নাহিক কিছু তোমারে কহিলাম॥

তিনি তাঁহাকে

পঞ্জা করি দিল নিজ পরোয়ানা সহিতে।
মুচ্ছুদ্দি আইল সব আমল করিতে॥

এইভাবে মুক্তিপ্রাপ্ত হইয়া চাঁদ-রায় পুনরায় গৃহে পত্র পাঠাইয়া খেতুরিতে গিয়া নরোত্তমের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এদিকে প্রচুর খাদ্য-সামগ্রী লইয়া রাঘবেন্দ্রাদি আসিয়া পৌঁছাইলে খেতুরিতে পিতা-পুত্রের মিলন ঘটিল। চাঁদ-রায় তাহারপর গৃহে ফিরিয়া নরোত্তমের আজ্ঞামত কালযাপন করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে তিনি পুনরায় নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিলে নবাব তাঁহাকে আহির-পরগণা দান করিলেন।

চাঁদ-রায় 'সংখ্যা করি হরিনাম' লইত বলিয়া তাঁহার নাম হরিদাস হইয়াছিল। তাঁহার পত্নী কনকপ্রিয়া এবং তাঁহার ভ্রাতা সন্তোষ-রায়ের পত্নী নলিনী উভয়েই নরোত্তমের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন।[৮৬]

নরোত্তমের যশোগাথা চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু কোনওকালে কোথাও কোন ধর্মপ্রচারকের মাহাত্ম্য সর্বজনস্বীকৃত হয় নাই। পাষণ্ডী-বৃন্দ মধ্যে মধ্যে নরোত্তমের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতে লাগিল। বিশেষ করিয়া কিছু সংখ্যক দেশবাসীর যুগ-যুগ সঞ্চিত ব্রাহ্মণ্য-সংস্কার শূদ্র-নরোত্তমের ব্রাহ্মণ-দীক্ষাদান ব্যাপারটিকে কিছুতেই অনুমোদন করিতে পারে নাই। সম্ভবত এই কারণে আর একবার 'ফাল্গুনী পূর্ণিমার তৃতীয় দিবসে' খেতুরিতে আর একটি মহাসভার অধিবেশন আহ্বান করিতে হইয়াছিল।[৮৭] সারা বাংলার শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতবৃন্দ সভায় যোগদান করিয়াছিলেন এবং সেই সভায় শ্রীনিবাস ও বীরভদ্র সর্বসমক্ষে পাষণ্ডী-বৃন্দের মত খণ্ডন করিয়া নরোত্তমের 'দ্বিজত্ব'-প্রাপ্তিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন :

ব্রাহ্মণের গলে পৈতা সর্বলোকে দেখে।
সাধকের হৃদে পৈতা সদা থাকে গোপে॥······

(৮৬) প্রে. বি.—২০শ. বি., পৃ. ৩৫৪-৫৫ (৮৭) ঐ—১৯শ. বি., পৃ. ৩৩৭-৪০

নরোত্তম মহাপ্রভুর প্রেম-অবতার।
নিত্যানন্দ প্রভুর হয় আবেশাবতার ॥······
তৈছে নরোত্তম গোসাঞি সবার আজ্ঞামতে।
হৃদয় চিরি দেখাইল শ্রীযজ্ঞোপবীতে ॥······

নরহরি-চক্রবর্তী বলেন[৮৮] যে বীরচন্দ্র একবার খেতুরিতে আসিয়াছিলেন। তিনি যে কখন কি নিমিত্ত আসিয়াছিলেন তাহা বুঝিতে পারা যায় না। তাঁহার খেতুরি-আগমনকালে হরিরাম, রামকৃষ্ণ,[৮৯] গোকুল, দেবীদাস, রূপ-ঘটক, গঙ্গানারায়ণ ও শ্যামদাসাদি ভক্ত তাঁহাকে নানাভাবে আপ্যায়িত করেন।

সন্তোষ-রায় তাঁহাকে সূক্ষ্মবস্ত্র পরিধান করাইলেন এবং নরোত্তম নৃত্য-সংকীর্তন করিয়া তাঁহার হৃদয় জয় করিলেন। বীরচন্দ্রের বিদায়কালে অনেকানেক ভক্ত তাঁহার সহিত পদ্মা পার হইয়া যান। কিন্তু হরিরাম, রামকৃষ্ণ, গঙ্গানারায়ণ, গোবিন্দ-চক্রবর্তী, গোপীরমণ, বলরাম-কবিরাজ প্রভৃতি ভক্ত খেতুরিতে থাকিয়া গেলেন। কিছুকাল পরেই বোরাকুলিতে গোবিন্দ-চক্রবর্তীর গৃহে মহামহোৎসব হইলে গোপীরমণ-চক্রবর্তী, শ্যামদাস, দেবীদাস ও গোকুলাদি ভক্ত তথায় গিয়া সংকীর্তন করিয়াছিলেন এবং মৃদঙ্গাদি বাদ্য বাজাইয়াছিলেন।[৯০] সম্ভবত উৎসব-শেষে উক্ত ভক্তবৃন্দ সকলে খেতুরিতে ফিরিয়া গেলে নরোত্তম তাঁহাদিগকে লইয়া শাস্ত্র-সংকীর্তনের মধ্যে নিজেকে ডুবাইয়া দিলেন। নরসিংহ, চাঁদ-রায়, গোবিন্দ-চক্রবর্তী, গঙ্গানারায়ণ, হরিরাম, রামকৃষ্ণ, গোপীরমণ, বলরাম-কবিরাজ, রামচন্দ্র ও গোবিন্দ-কবিরাজ প্রভৃতি সকলেই উপস্থিত থাকিতেন।[৯১] কিন্তু এইভাবে কিছুকাল অতিবাহিত করিবার পর নরোত্তম একদিন সকলকেই স্ব-স্ব গৃহ হইতে ফিরিয়া আসিবার অনুমতি দান করিয়া কেবল রামচন্দ্র-কবিরাজকে লইয়াই খেতুরিতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্রই ছিলেন তাঁহার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু। সম্ভবত সেই জন্যই তিনি তাঁহাকে সাধনসঙ্গী-হিসাবে নিকটে রাখিয়া সাধন-ভজনে মত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে রামচন্দ্র যাজিগ্রামে শ্রীনিবাসের নিকট গিয়া তাঁহার সহিত বৃন্দাবনযাত্রা করেন এবং ক্রমে নরোত্তমের নিকট শ্রীনিবাস ও রামচন্দ্র উভয়েরই তিরোধান-বার্তা পৌছাইলে তিনি একেবারেই বিগতস্পৃহ হইয়া পড়িলেন।

নরোত্তম গ্রন্থকার ছিলেন। তাঁহার পঞ্চচন্দ্রিকা (প্রেমভক্তি-, সিদ্ধপ্রেমভক্তি-, সাধ্য-প্রেম-, সাধনভক্তি-, চমৎকার-চন্দ্রিকা), তিনি মণি (সূর্য-, চন্দ্র-, প্রেমভক্তিচিন্তা-মণি)

(৮৮) ভ. র.—১৩।২৯৮ ; ন. বি.—১১শ. বি., পৃ. ১৭০ ; দ্র.—বীরচন্দ্র (৮৯) ন. বি.—১১শ. বি., পৃ. ১৭২-৭৮ (৯০) ভ. র.—১৪।১২১-২৪, ১৩৫ (৯১) ন. বি.—১১শ. বি., পৃ. ১৭৯-৮০

গুরুশিষ্যসংবাদপটল বা উপাসনাপটল, প্রার্থনা ও রাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীয় স্মরণমঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থ[৯২] প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে আবার 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা' গ্রন্থখানি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও বিখ্যাত। 'বংগশ্রী'-পত্রিকার ১৩৪৮ সালের কার্তিক-সংখ্যায় নৃপেন্দ্রমোহন সাহা নরোত্তমের নামে প্রচলিত 'হাটপত্তনা'দির উল্লেখ করিয়া 'প্রেমভাবচন্দ্রিকা' নামে তাঁহার আর একখানি 'নূতন পুথি'রও সংবাদ দিয়াছেন। ১৩২১ সালের 'বীরভূমি পত্রিকা'র বৈশাখ-সংখ্যায় শিবরতন মিত্র মহাশয়ও নরোত্তম-রচিত 'কুঞ্জবর্ণন', 'রাগমালা' 'রসসার' প্রভৃতি আরও কতকগুলি গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থের প্রামাণিকতা কতদূর বলিতে পারা যায় না। কিন্তু এ সকল ছাড়াও নরোত্তম একজন বিখ্যাত পদকর্তা ছিলেন। বাংলা ও ব্রজবুলি উভয় ভাষাতেই তিনি পদ রচনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার প্রার্থনা-বিষয়ক পদগুলির অধিকাংশই বাংলাভাষায় লিখিত এবং এইগুলিই তাঁহার কবিত্বশক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করে।[৯৩] আবার তাঁহার শেষ-বয়সে রচিত কয়েকটি স্মৃতি-জাগানিয়া পদ বড়ই করুণ ও মর্মস্পর্শী। এইগুলিতে[৯৪] শ্রীনিবাস ও রামচন্দ্রের বিচ্ছেদবেদনা এবং স্বীয় মৃত্যুকামনাও বিশেষভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। তৎকালে নরসিংহ রূপনারায়ণ গোবিন্দ ও সন্তোষাদি তাঁহার নিকটে থাকিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দান করিবার চেষ্টা করিতেন; কিন্তু তিনি যেন আর শান্তি খুঁজিয়া পান নাই। সেই সময়ে তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে বুধরি গাম্ভীলা প্রভৃতি স্থানে যাতায়াত করিতে দেখা যায়। রামচন্দ্র-কবিরাজের জীবৎকালে তিনি প্রায় প্রতি বৎসর তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যাজিগ্রামে গমন করিতেন এবং তাঁহাদের অনুরোধে শ্রীনিবাসকেও খেতুরিতে আসিতে হইত।[৯৫] তাঁহারা খেতুরিতে শ্রীনিবাসের জন্য একটি গৃহও নির্মাণ করাইয়াছিলেন এবং শ্রীনিবাস ব্যতিরেকে আর কেহই সেইস্থানে উঠিতেন না। কিন্তু শ্রীনিবাস-রামচন্দ্রের তিরোভাবের পর নরোত্তম সম্ভবত আর যাজিগ্রামে যান নাই। তবে তিনি বুধরিতে গিয়া গোবিন্দ-কবিরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন এবং বুধরি হইতে গাম্ভীলায় যাইতেন। একবার গাম্ভীলায় অনুরক্ত-শিষ্য গঙ্গানারায়ণের গৃহে তিনি রোগাক্রান্ত হইয়া মরণাপন্ন হন এবং একবার তিনি সেই সময়ে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়েন।[৯৬] কিন্তু ক্রমে তিনি সুস্থ হইয়া উঠেন। সম্ভবত সেই সময়ে বিরুদ্ধবাদীরা পুনরায় মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছিল। নরোত্তম গাম্ভীলায় থাকিয়া তাহাদের কয়েকজনকে নিরস্ত করিলেন এবং তাহাদিগকে বৈষ্ণব-মতবাদ

(৯২) গৌ. ত.—পৃ. ৩২০; গৌ. জী.— পৃ. ১০১ (৯৩) HBL—P. 97 (৯৪) ন. বি.—১১শ. বি., পৃ. ১৭৯, ১৮৬ (৯৫) অ. র.—৬ষ্ঠ. ম., পৃ. ৪২; আধুনিক বৈ. দি.-মতে (পৃ. ১১০) একবার নরোত্তম-রামচন্দ্র বিষ্ণুপুরে গিয়া হাম্বীরের অনুষ্ঠিত মহোৎসবেও যোগদান করেন। (৯৬) ন. বি.—১১শ. বি., পৃ. ১৮১

গ্রহণ করাইয়া পরম বিজ্ঞ গঙ্গানারায়ণের উপর ভক্তিপ্রচার ও দীক্ষাদানের ভার অর্পণ করিলেন। তাহার পর তিনি প্রত্যাবর্তন-পথে পুনরায় বুধরিতে আসিয়া গোবিন্দ-কবিরাজ, কর্ণপূর-কবিরাজ, গোকুল, বল্লভী-মজুমদার প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া খেতুরিতে ফিরিয়া আসেন। খেতুরিতে তিনি সর্বদা গৌরাঙ্গ-মন্দিরেই কালযাপন করিতেন এবং 'সংসার-যাতনা' হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য নিয়ত প্রার্থনা জানাইতেন। কিন্তু তখনও পর্যন্ত তাঁহার ধর্মপ্রচার ও দীক্ষাদানাদি কার্য চলিতেছিল। প্রসিদ্ধ ও প্রাচীন বৈষ্ণব মহান্ত এবং গোস্বামী-বৃন্দের প্রায় সকলেই তখন ইহজগৎ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাই চৈতন্য-মহাপ্রভুর যোগ্য উত্তরাধিকারী হিসাবে ঠাকুর-নরোত্তমকেই যেন তাঁহার সকল কার্যকে সার্থক করিয়া তুলিতে হইয়াছিল। একদিন তিনি দূর-বৃন্দাবনে বসিয়া গোস্বামী-বৃন্দের আশীর্বাদ সহ যে কঠোর দায়িত্বভার মস্তকে তুলিয়া লইয়াছিলেন, জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত তিনি তাহা অতন্দ্র-নয়নে বহন করিয়াছিলেন। শ্রীজীবাদি গোস্বামী-বৃন্দ যখন জীবিত ছিলেন তখন তিনি তাঁহাদের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়াও চলিতেন এবং শ্রীনিবাস-নরোত্তমাদির সহিত তাঁহাদের রীতিমত পত্র বিনিময় চলিত।[৯৭]

নরোত্তমের তিরোভাব সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানিতে পারা যায় না। তবে গঙ্গাতীরবর্তী গাম্ভীলাতে গিয়াই তিনি দেহরক্ষা করেন।[৯৮] তাঁহার তিরোধানকালে হরিরাম, রামকৃষ্ণ, গঙ্গানারায়ণ প্রভৃতি কয়েকজন ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা বুধরিতে ফিরিয়া আসিলে গোবিন্দ-কবিরাজ এক মহোৎসবের অনুষ্ঠান করেন। তারপর খেতুরিতেও মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সন্তোষ, গোবিন্দ, নরসিংহ, রূপনারায়ণ, কৃষ্ণসিংহ, চাঁদ-রায়, গোপীরমণ প্রভৃতি ভক্ত সকলেই উপস্থিত ছিলেন। দেবীদাস, গৌরাঙ্গদাস গোকুলদাসাদি ভক্তও সংকীর্তন করিয়াছিলেন।

নরোত্তমের পিতৃব্য-পুত্র সন্তোষের পরবর্তী জীবন সম্বন্ধে আর কিছুই জানা যায় না। নরোত্তম এবং রামচন্দ্র-কবিরাজ যেমন একপ্রাণ ছিলেন সন্তোষ এবং গোবিন্দ-কবিরাজও তদ্রূপ অভিন্নহৃদয় ছিলেন। সন্তোষের অনুমতিক্রমেই গোবিন্দ তাঁহার 'সংগীতমাধবনাটক'-খানি রচনা করিয়াছিলেন।[৯৯]

'প্রেমবিলাসে' নরোত্তমের একশত চব্বিশ জন শিষ্যের নাম বর্ণিত হইয়াছে। পূর্বোল্লেখিত শিষ্যদিগকে বাদ দিয়া অবশিষ্ট শিষ্যবৃন্দের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

রবি-রায়-পুজারী (বুধরিবাসী বৈদিক ব্রাহ্মণ), রাধাবল্লভ-চৌধুরী, (নরোত্তম সম্বন্ধে

(৯৭) দ্র.—শ্রীনিবাস ও রামচন্দ্র (৯৮) ন. বি.—১১শ. বি., পৃ. ১৮৭ ; স্বরূপদামোদরের কড়চা নামক পরবর্তী-কালের একটি বাংলা পুঁথিতে নরোত্তমকে নবরসিকের অন্তর্ভুক্ত ধরা হইয়াছে—লীলা-সঙ্গিনী কৌশল্যা (কৃষ্ণদাস কবিরাজের ভগিনী) (৯৯) ভ. র.—১।৪৬১ ; ন. বি.—১২শ. বি., পৃ. ১৯০

তিনি যে চারিটি পদ রচনা করিয়াছিলেন, তাহার একটি হইতে জানা যায় যে শ্রীনিবাস-নরোত্তম-রামচন্দ্র ও গোবিন্দের মৃত্যুর পরেও তিনি বাঁচিয়াছিলেন।[১০০]), নব-গৌরাঙ্গদাস, নারায়ণ-ঘোষ, গৌরাঙ্গদাস, বিনোদ-রায়, কাণ্ড চৌধুরী, রাজা-গোবিন্দরাম, বসন্ত-রায়,[১০১] প্রভুরামদত্ত, শীতল-রায়, ধর্মদাস-চৌধুরী, নিত্যানন্দদাস, ধরু(বা ধিরু)-চৌধুরী, চণ্ডীদাস, ভক্তদাস, বোঁচারাম-ভদ্র, রামভদ্র-রায়, জানকীবল্লভ-চৌধুরী, ('জানকীবল্লভ'-ভণিতায় একটি ব্রজবুলি পদ পাওয়া যায়।[১০২]), শ্রীমন্ত-দত্ত, পুরুষোত্তম, গোকুলদাস, হরিদাস (নবদ্বীপ-বাসাভিলাষী[১০৩]), গঙ্গাহরিদাস(গঙ্গাতীরে স্থিতি[১০৪]),কৃষ্ণ-আচার্য (গোপালপুরবাসী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ),রাধাকৃষ্ণ-ভট্টচার্য (নবদ্বীপবাসী রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ), বৈষ্ণবচরণ, শিবরামদাস (ইনি একজন পদকর্তা ছিলেন এবং ব্রজবুলি ভাষাতেও পদ রচনা করিয়াছিলেন।[১০৫]), কৃষ্ণদাস-বৈরাগী, বাটুয়া (নরোত্তমবিলাসে 'চাটুয়া)-রামদাস, নারায়ণ-রায়, রামচন্দ্র-রায়, কৃষ্ণদাস-ঠাকুর, শংকর-বিশ্বাস (ইনি পদকর্তা ছিলেন[১০৬]), মদন-রায়, বড়ু-চৈতন্যদাস, গন্ধর্ব-রায়, ব্রজরায়, রাধাকৃষ্ণ-রায়, কৃষ্ণ-রায়, দয়ারামদাস, জগৎ-রায়, হরিদাস-ঠাকুর, শ্রীকান্ত, ক্ষীরু-চৌধুরী, রূপ-রায় (ইনি অনেক যবনকেও 'তারণ' করেন), চন্দ্রশেখর (সম্ভবত ইনিই গদাধরদাসের তিরোভাব-তিথি-মহামহোৎসবে উপস্থিত হইয়াছিলেন।[১০৭]), গণেশ-চৌধুরী, গোবিন্দ-রায়, মথুরাদাস, ভাগবতদাস, জগদীশ-রায়, নরোত্তম-মজুমদার, মহেশ-চৌধুরী, শংকর-ভট্টচার্য (নৈহাটী নিবাসী বৈদিক ব্রাহ্মণ), গোসাঞি-দাস, মুরারি-দাস, বসন্ত-দত্ত, শ্যামদাস-ঠাকুর, গোপাল-দত্ত (বা জয়গোপাল-দত্ত[১০৮]), রামদেব-দত্ত, গঙ্গাদাস-দত্ত, মনোহর-ঘোষ, অর্জুন-বিশ্বাস, কমল-সেন, যাদব-কবিরাজ, মনোহর-বিশ্বাস, কৃষ্ণ-কবিরাজ, বিষ্ণুদাস-কবিরাজ (বৈদ্যবংশতিলক, বাস কুমারনগর), মুকুট-মৈত্র (ফরিদপুরবাসী), গোবর্ধন-ভাণ্ডারী, বালকদাস-বৈরাগী, বৈরাগী-গৌরাঙ্গদাস, বিহারীদাস-বৈরাগী (বিহারীদাস-ভণিতায় যে পদটি পাওয়া যায়, তাহা ইঁহার কিনা বলা শক্ত[১০৯]), বৈরাগী-গোকুলদাস, প্রসাদদাস-বৈরাগী[১১০] (খেতুরিবাসী,[১১১] 'ভক্তিরত্নাকরে'[১১২] পরসাদ-দাসের পদ উদ্ধৃত হইয়াছে), কাশীনাথ-ভাদুড়ী, রামজয়-মৈত্র, নারায়ণ-সান্যাল, পুরন্দর-মিশ্র, বিধু-চক্রবর্তী, কমলাকান্ত-কর, রঘুনাথ-বৈদ্য ও হলধর-মিশ্র।

(১০০) HBL—p. 1'9 (১০১) রামচন্দ্র-কবিরাজের জীবনীতে ইঁহার সম্বন্ধে সমস্ত সংগৃ তথ্য প্রদত্ত হইয়াছে। (১০২) HBL—pp. 197, 198 (১০৩) ন. বি.—১১শ. বি., পৃ. ১৯৩ (১০৪) ঐ (১০৫) প. ক. (প.)—পৃ. ২১২-১৩ ; HBL.—p 177 (১০৬) প. ক. (প.)—পৃ. ২১০-১১ ; গৌ. ত. (প. প.)—পৃ. ২৪৮ (১০৭) দ্র.—চন্দ্রশেখর-আচার্য (১০৮) ন. বি.—১২শ. বি., পৃ. ১৯৪ (১০৯) HBL—p. 410 (১১০) প্রসাদদাস সম্বন্ধে শ্রীনিবাস-আচার্যের জীবনীর শেষাংশে শ্রীনিবাস-শিষ্য প্রকাশদাস-বিবরণ দ্রষ্টব্য (১১১) ন. বি.—১২শ. বি., পৃ. ১৯৪ (১১২) ১২।৩৭৩০

রামচন্দ্র-কবিরাজ

'চৈতন্যচরিতামৃতে'র নিত্যানন্দশাখা-বর্ণনায় খণ্ডবাসী ভক্তবৃন্দের মধ্যে রাম-সেন, কংসারি-সেন, সুলোচনাদির নাম উল্লেখিত হইয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে বিশেষ করিয়া আবার সুলোচনের নাম চিরঞ্জীব-সেন ও নরহরি-রঘুনন্দনাদির সহিত মূলস্কন্ধ-শাখার মধ্যেও দুইবার উল্লেখ করা হইয়াছে। 'ভক্তিরত্নাকর'-মতে চিরঞ্জীব ছিলেন 'চৈতন্যচন্দ্রের ভক্ত'[১]। 'পাটনির্ণয়' এবং 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'র মধ্যেও চিরঞ্জীব ও সুলোচন, এই দুইজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখিত আছে। 'নরোত্তমবিলাসে'[২] কংসারির নাম একবার উল্লেখিত হইলেও, সে উল্লেখ অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'য়[৩] কবিকর্ণপুর স্পষ্টই বলিয়াছেন যে চিরঞ্জীব এবং সুলোচন উভয়েই নরহরির 'সাহাচর্যান্ম-হত্তরৌ' এবং 'গৌরাঙ্গৈকান্তশরণৌ' হইয়াছিলেন। 'পদ্যাবলী'তে যে-চিরঞ্জীবের[৪] একটি শ্লোক গৃহীত হইয়াছে তিনি এই চিরঞ্জীব-সেন কিনা জানা যায় না।

'ভক্তিরত্নাকর' হইতে জানা যায় যে চিরঞ্জীব-সেন তাহার কনিষ্ঠ-পুত্র গোবিন্দের জন্ম-গ্রহণের অল্পকাল পরেই পরলোকগত হইয়াছিলেন।[৫] তবে চিরঞ্জীব-সেন যে সুলোচন প্রভৃতি ভক্তের সহিত মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের পরেই চৈতন্য-দর্শনার্থ নীলাচলে গিয়াছিলেন, 'চৈতন্যচরিতামৃত' ও 'মুরারিগুপ্তের কড়চা' হইতে তাহা জানিতে পারা যায়। ইহারপর চিরঞ্জীবের আর কোনও সংবাদ পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু 'প্রেমবিলাস' হইতে জানা যায় যে শ্রীনিবাস-আচার্যের বিবাহ ব্যাপারে সুলোচনের সম্মতি ছিল।[৬] খুবসম্ভবত চিরঞ্জীব তখন পরলোকগত। নচেৎ সুলোচনের সহিত তাঁহার নামোল্লেখ থাকিত। 'নরোত্তমবিলাস'-মতে[৭] সুলোচন খেতুরি-মহামহোৎসবেও যোগদান করিয়াছিলেন। 'প্রেমবিলাসে'ও বলা হইয়াছে যে ইহারপরেও যেইবার খেতুরি-উৎসব উপলক্ষে মহাসভার আয়োজন হয় সেইবার সুলোচন তথায় উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু সুলোচনের পক্ষে এতকাল বাঁচিয়া থাকা সম্ভব বিবেচিত হয় না।

কিন্তু সুলোচন অপেক্ষা চিরঞ্জীবই বিশেষভাবে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তৎকালে শ্রীখণ্ডে দামোদর-সেন নামে এক বিখ্যাত কবি[৮] বাস করিতেন। 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র

---

(১) ৯।১৬৫ (২) ৪র্থ. বি., পৃ. ৫২ (৩). ২০৯ (৪) মু. বি.-মতে জাহ্নবা সহ রামচন্দ্রের বৃন্দাবন-গমনকালে বৃন্দাবনে একজন চিরঞ্জীব-গোসাঁই উপস্থিত ছিলেন।—তিনি নিশ্চয় শ্রীখণ্ডের চিরঞ্জীব-সেন হইতে পারেন না। পরবর্তী অনুচ্ছেদে কারণ দ্রষ্টব্য। (৫) ৯।১৫২ (৬) ১৭শ. বি., পৃ. ২৪৮ (৭) ৮ম. বি., পৃ. ১০৮ (৮) গৌ. ত.—পৃ. ৩২০ ; ভ. র.—২।২৩৯-৪১

নিত্যানন্দ-শাখায় খণ্ডবাসীদিগের সন্নিকটে এক দামোদর-দাসের নাম উল্লেখিত হইয়াছে। পরবর্তিকালে তিনি খেতুরি মহামহোৎসবে উপস্থিত হইয়াছিলেন[৯] এবং উৎসবান্তে জাহ্নবাদেবীর সহিত গিয়া বৃন্দাবন-দর্শন করিয়াছিলেন ও তাঁহার সহিত প্রত্যাবর্তন করিয়া একচক্রা-পরিক্রমা করিয়াছিলেন[১০]। কিন্তু এই দামোদর-দাস খণ্ডবাসী দামোদর নহেন। দামোদর-সেনের পক্ষে ততদিন বাঁচিয়া থাকিয়া বৃন্দাবন দর্শন করিতে যাওয়া অসম্ভব ছিল। তাছাড়া, তিনি ছিলেন শক্তির উপাসক, 'ভগবতী যাঁর বশীভূত নিরন্তর!' তিনি দামোদর-কবিরাজ নামেই বিখ্যাত ছিলেন।[১১]

শ্রীখণ্ডের দামোদর-সেনের নিকট একবার এক দিগ্বিজয়ী-পণ্ডিত পরাভূত হইলে তিনি দামোদরকে 'অপুত্রক হও' বলিয়া অভিসম্পাত করিয়াছিলেন,[১২] কিন্তু দামোদর তাঁহাকে প্রসন্ন করিলে তিনি শেষে দামোদরকে আশীর্বাদ করিয়া যান। পরে দামোদর এক কন্যারত্ন লাভ করেন। কবিবর তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন সুনন্দা।[১৩] কালক্রমে সুনন্দা বিবাহযোগ্যা হইলে দামোদর-কবিরাজ সৎপাত্র সন্ধান করিতে থাকেন। পূর্বোক্ত চিরঞ্জীব-সেন তখন শ্রীখণ্ডে বাস করিতেছিলেন। গৌরাঙ্গলীলা প্রত্যক্ষ করিবার সৌভাগ্য তাঁহার হইয়াছিল। তাহাছাড়া 'সংগীতমাধবনাটক' হইতে জানা যায় যে তৎপূর্বে গঙ্গাতীরস্থ সরজনি-নগরে 'গৌড়-ভূপাধিপাত্র' বা গৌড়রাজের শ্রেষ্ঠ অমাত্য হিসাবেও দ্বিজভক্ত ও বিষ্ণুভক্ত চিরঞ্জীবের নাম প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।[১৪] সম্ভবত এই সকল কারণে দামোদর-কবিরাজ সেই চিরঞ্জীব-সেনের হস্তেই কন্যা সম্প্রদান করিলেন। চিরঞ্জীবের পূর্বনিবাস ছিল ভাগীরথী-তীরবর্তী কুমারনগর-গ্রামে[১৫]। কিন্তু তৎকালে তিনি শ্রীখণ্ডেই থাকিতেন। তাহার পরেও তিনি 'বিবাহ করিয়া খণ্ডে করিলেন স্থিতি'।

সম্ভবত শ্রীখণ্ডেই চিরঞ্জীবের দুই পুত্রের জন্ম হয়। পুত্রদ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র এবং কনিষ্ঠ গোবিন্দ উভয়েই স্বনামখ্যাত হইয়াছিলেন। 'প্রেমবিলাস'-কার বলিয়াছেন[১৬] যে রামচন্দ্রের 'তেলিয়া বুধরি গ্রামে জন্ম স্থান হয়।' কিন্তু সম্ভবত এই বর্ণনা ভ্রমাত্মক। যতদূর মনে হয় তেলিয়াবুধরিতে রামচন্দ্র বাসস্থান স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া লেখক এইরূপ উক্তি করিয়া থাকিবেন। চিরঞ্জীবের কনিষ্ঠপুত্র গোবিন্দ কিন্তু শ্রীখণ্ডেই ভূমিষ্ঠ হন।[১৭] গোবিন্দ তাঁহার বিভিন্ন গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদে গৌরাঙ্গ ভজনা না করিবার জন্য আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন। গৌরহরিকে পাইয়াও হারাইয়াছেন বলিয়া তাঁহার

(৯) ন. বি.—৮ম. বি., পৃ. ১০৭, ১১৮; ভ. র.—১০।৩৭৬ (১০) ভ. র.—১০।৭৪৫; ১১।৪০১ (১১) ঐ—৯।১৪৩; গৌ. ত.—পৃ. ৩২০ (১২) ভ. র.—১।২৪২ (১৩) প্রে. বি.—২০শ. বি., পৃ. ৩৬০ (১৪) ভ. র.—১।২৭০ (১৫) ভ. র.—১।২৪৯; তু.—প্রে. বি—২০শ. বি., পৃ. ৩৬০ (১৬) ১৪শ. বি., পৃ. ১৮৯ (১৭) ভ. র.—৯।১৫৩

যেন আর পরিতাপের অন্ত ছিল না। তদ্রচিত অনেকগুলি পদ হইতেই[১৮] বেশ বুঝিতে পারা যায় যে গৌরাঙ্গের নবদ্বীপলীলা সাঙ্গ হইবার পূর্বেই তিনি জন্মলাভ করিয়াছিলেন। 'চৈতন্যচরিতামৃত'-কারও নিত্যানন্দশাখা-বর্ণনার মধ্যে কংসারি-সেন রাম-সেনের সহিত রামচন্দ্র-কবিরাজ এবং 'গোবিন্দ শ্রীরঙ্গ মুকুন্দ তিন কবিরাজে'র নামোল্লেখ করিয়াছেন।

'ভক্তিরত্নাকরে' গোবিন্দের জন্মবৃত্তান্ত বিশেষভাবে লিখিত হইয়াছে। তদনুযায়ী, তাঁহার জন্মকালে মাতা সুনন্দা নিদারুণ প্রসব-যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন।[১৯] একজন দাসী কর্তৃক সেই সংবাদ আনীত হইলে ভগবতীপূজারত 'শক্তি উপাসক' দামোদর-কবিরাজ কথা বলিতে না পারিয়া দাসীকে 'শ্রীদুর্গাদেবীর যন্ত্র' দেখাইয়া দেন এবং তাহা লইয়া গিয়া দর্শন করাইবার জন্য নির্দেশ দান করেন। কিন্তু দাসী সেই নির্দেশ বুঝিতে না পারিয়া "শীঘ্র যন্ত্র ধৌত করি জল পিয়াইল" এবং যথাকালে প্রসূতি একটি পুত্রসন্তান লাভ করিলেন। এইভাবে জন্মাবধি গোবিন্দদাসের জীবন ভগবতী-প্রসাদের সহিত যুক্ত হইয়া রহিল। তাঁহার জন্মের অল্পকাল পরেই পিতার পরলোক-প্রাপ্তি ঘটে। তখন তিনি মাতামহালয়ে পালিত হইতেছিলেন। ফলে তাঁহার উপরে শাক্ত-প্রভাব আরও দৃঢ় হইয়া উঠে।

পিতার মৃত্যুতে রামচন্দ্র ও গোবিন্দ মাতামহালয়ে বাস করিতেছিলেন।[২০] তারপর তাঁহারা তাঁহাদের পিতার পূর্বনিবাস কুমারনগরে গিয়া কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন এবং শেষে সেখান হইতেও তেলিয়াবুধরি গ্রামে উঠিয়া আসেন। কিন্তু এই বুধরিগ্রামে তাঁহাদের আগমন হয় অনেক পরে। তৎপূর্বে কুমারনগরে অবস্থানকালেই তাঁহারা যশস্বী হইয়া উঠেন। উভয় ভ্রাতাই বিপুল পাণ্ডিত্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। রামচন্দ্র হইয়াছিলেন 'দিগ্বিজয়ী চিকিৎসক যশস্বিপ্রবর'[২১] এবং মাতামহের যোগ্য উত্তরাধিকারী হিসাবে গোবিন্দ হইয়াছিলেন সার্থক কবি। মাতামহের মত তিনিও শক্তির উপাসক হইয়া উঠেন এবং 'গীতপদ্যে করে ভগবতীর বর্ণন'।[২২] 'প্রেমবিলাস'-মতে[২৩] রামচন্দ্র এবং গোবিন্দ উভয় ভ্রাতাই বিবাহ করিয়াছিলেন। রামচন্দ্রের পত্নীর নাম ছিল রত্নমালা[২৪] এবং গোবিন্দের পত্নী মহামায়া। দিব্যসিংহ নামে গোবিন্দের একজন পুত্রও ছিলেন এবং তিনি খেতুরি-উৎসবেও যোগদান করিয়াছিলেন।[২৫] রামচন্দ্রের পরিবারস্থ সকলেই শ্রীনিবাস-আচার্যের নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন।[২৬]

(১৮) গৌ. ত.—৮৮-৯০ (১৯) ৯।১৪৫ (২০) প্রে. বি.—২০শ. বি., পৃ. ৩৬০ (২১) ভ. র.—৮।৫৩২ ; তু.—কর্ণ.—১ম. নি., পৃ. ৬ (২২) ভ. র.—৯।১৪১ (২৩) ২০শ. বি., পৃ. ৩৪৭ (২৪) জয়ানন্দের গ্রন্থে (ন. খ.—পৃ. ২৪) একজন রত্নমালা আছেন। তাঁহার পক্ষে রামচন্দ্রের পত্নী হওয়া অসম্ভব। (২৫) প্রে. বি.—১৯শ. বি., পৃ. ৩০৮ (২৬) ঐ—২০শ. বি., পৃ. ৩৪৭ ; কর্ণ.—১ম. নি., পৃ. ৭

'ভক্তমাল' ও 'ভক্তিরত্নাকর' হইতে জানা যায়[২৭] যে রামচন্দ্র বিবাহান্তে প্রত্যাবর্তন করিবার কালেই শ্রীনিবাসের সাক্ষাৎপ্রাপ্ত হইয়া তৎকর্তৃক দীক্ষিত হন। 'ভক্তিরত্নাকর' হইতে আরও জানা যায় যে ইহার কিছুকাল পরেই গোবিন্দ প্রভৃতি তেলিয়াবুধরিতে চলিয়া আসেন। অথচ 'প্রেমবিলাসে'র[২৮] বর্ণনায় বুধরি-আগমনের পূর্বে কুমারনগরেই দিব্যসিংহের প্রসঙ্গ উল্লেখিত দেখা যায়। তখন তিনি প্রাপ্তবয়স্ক, এবং খেতুরির মহোৎসবও তাহার নিকটবর্তী ঘটনা। এইসমস্ত কারণে ধরিয়া লইতে হয় যে রামচন্দ্রের পূর্বেই তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোবিন্দ বিবাহিত হইয়া পুত্রসন্তান লাভ করিয়াছিলেন; অথবা দিব্যসিংহের জন্মেরও বহুকাল পরে রামচন্দ্র দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন এবং তাহার অব্যবহিত পরেই শ্রীনিবাসের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটে। 'প্রেমবিলাস'-মতে রামচন্দ্র নিঃসন্তান ছিলেন।[২৯] অন্য কোন গ্রন্থেও তাঁহার সন্তানাদির কোন উল্লেখ নাই। শ্রীনিবাসের সহিত রামচন্দ্রের উক্ত প্রথম সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে 'প্রেমবিলাস'-কার বলেন[৩০] যে শ্রীনিবাস প্রথমবারে বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া শ্রীখণ্ডে উপস্থিত হইলে রামচন্দ্র শ্রীনিবাসের খ্যাতির কথা শুনিয়া অনুসন্ধানপূর্বক আসিয়া তাঁহার সহিত তথায় সাক্ষাৎ করেন। তৎকালে বিষ্ণুপুর হইতে আগত শ্রীনিবাস-শিষ্য ব্যাসাচার্য সেইস্থানে উপস্থিত ছিলেন। প্রথমে ব্যাসাচার্যের সহিত ও পরে আপনার সহিত শাস্ত্রালোচনায় রামচন্দ্রের পাণ্ডিত্য দেখিয়া শ্রীনিবাস তৎপ্রতি আকৃষ্ট হন এবং তাঁহাকে রাধাকৃষ্ণ-মন্ত্র দান করিয়া দীক্ষিত করেন। তারপর উভয়ে কৃষ্ণকথা ও শাস্ত্রালোচনা প্রভৃতির দ্বারা একত্রে কাল কাটাইতে থাকিলে একদিন রামচন্দ্রের ভ্রাতা গোবিন্দ রামচন্দ্রকে পত্র মারফত জানাইলেন যে তিনি অসুস্থ, রামচন্দ্র যেন গৃহে ফিরিয়া যান। কিন্তু রামচন্দ্র সাধন-ভজনে দিন কাটাইতে থাকেন এবং গোবিন্দের ব্যাধিও ক্রমাগত বাড়িয়া যায়। এ পর্যন্ত গোবিন্দ 'শক্তি মহামায়া'র পূজা করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু খুব সম্ভবত রোগযন্ত্রণা অসহ্য হওয়ায় জ্যেষ্ঠের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তিনি বৈষ্ণব-ধর্মের আশ্রয়ে শান্তি খুঁজিয়া পাইতে চাহিলেন এবং পুত্র দিব্যসিংহের সাহায্যে রামচন্দ্রের নিকট পত্র পাঠাইয়া পুনরায় তাঁহাকে জানাইলেন যে তিনি গ্রহণী-রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইয়াছেন, রামচন্দ্র যেন শ্রীনিবাস-আচার্যপ্রভুকে সঙ্গে লইয়া তাঁহাকে শেষ-দর্শন দিয়া যান। রামচন্দ্র পত্রপ্রাপ্তিমাত্র শ্রীনিবাসকে সঙ্গে লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলে শ্রীনিবাসের হস্তক্ষেপে গোবিন্দ আরোগ্যলাভ করেন এবং শ্রীনিবাসের নিকট মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণবধর্মের ছায়ায় আসিয়া আশ্রয়লাভ করেন। এই দীক্ষাগ্রহণ

---

(২৭) ভ. মা.—পৃ. ২০৮; ভ. র.—৮।৫২১ (২৮) ১৪শ. বি., ১৯৫-৯৬ (২৯) ১৭শ. বি., পৃ. ২৫৬
(৩০) ১৩শ.-১৪শ. বি., পৃ. ১৮৪-৯৯

ব্যাপারে রামচন্দ্র ও গোবিন্দ বহু অর্থ ব্যয় করিয়া শ্রীনিবাসকে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। গোবিন্দ তৎপূর্বে শক্তি-উপাসক হিসাবে তদ্বিষয়ক পদ লিখিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। এখন হইতে তিনি 'রসামৃতসিন্ধু' ও 'উজ্জ্বলনীলমণি' প্রভৃতি বৈষ্ণবগ্রন্থ সাদরে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন এবং কৃষ্ণ- ও গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদরচনা করিয়া একজন শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব-পদকর্তা হিসাবে অমর প্রতিষ্ঠা অর্জন করিলেন।

রামচন্দ্রের সহিত শ্রীনিবাসের সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে কিন্তু 'কর্ণানন্দ-,' 'ভক্তমাল'- ও 'ভক্তিরত্নাকর-'গ্রন্থে ভিন্ন বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে[৩১]। গ্রন্থকারদিগের বর্ণনা মোটামুটি একপ্রকার। তদনুযায়ী জানা যায় যে বিবাহান্তে একটি দিব্য-দোলায় চড়িয়া রামচন্দ্রের যাজিগ্রাম-পথে প্রত্যাবর্তনকালে বৃন্দাবন-প্রত্যাগত শ্রীনিবাস লোকমুখে তাঁহার পরিচয় প্রাপ্ত হন এবং তাঁহার মত একজন গুণী ও বিদ্বান ব্যক্তিকে স্ব-ধর্মে প্রবর্তনা-দানের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে থাকেন। এইকথা রামচন্দ্রের কর্ণগোচর হইল এবং উভয়ের সাক্ষাৎ ঘটিল। তারপর উভয়ের মধ্যে নানাবিধ শাস্ত্রালোচনার পর রামচন্দ্র শ্রীনিবাসকর্তৃক দীক্ষিত হন। 'অনুরাগবল্লী'র লেখকও বলেন যে রামচন্দ্র যাজিগ্রামেই শ্রীনিবাস কর্তৃক দীক্ষিত হন।[৩২] 'কর্ণানন্দ'-মতে এই ঘটনার পরেই রামচন্দ্রের ভ্রাতা গোবিন্দ এবং ভ্রাতৃদ্বয়ের দুইজন পত্নী ও গোবিন্দের পুত্র দিব্যসিংহ—ইঁহারা সকলেই শ্রীনিবাসের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন। গোবিন্দের দীক্ষাগ্রহণ সম্বন্ধে কিন্তু এই গ্রন্থে কোনও বিবরণ নাই। 'ভক্তমালে'[৩৩] অবশ্য বিস্তৃত বিবরণ আছে এবং তাহা মোটামুটি 'প্রেমবিলাসে'র বর্ণনাকেই সমর্থন করে। কিন্তু 'ভক্তমালে' এ সম্বন্ধে কোনও সময় নির্দেশ করা হয় নাই। লক্ষণীয় যে 'প্রেমবিলাস' ছাড়া অন্য তিনখানি গ্রন্থ কিন্তু একটি বিষয়ে একমত যে শ্রীনিবাসের সহিত প্রথম-সাক্ষাৎকালে রামচন্দ্র কুমারনগরে বাস করিতেছিলেন। 'প্রেম-বিলাসে' বলা হইয়াছে তেলিয়াবুধরিতে। গ্রন্থকার বলিতেছেন যে শ্রীনিবাসের প্রশ্নোত্তর-দানকালে রামচন্দ্র আত্মবিবরণ প্রদান প্রসঙ্গে বলিতেছেন :

রামচন্দ্র নাম মোর অম্বষ্ঠকুলে জন্ম।......
তেলিয়া বুধরিগ্রামে জন্মস্থান হয়॥

কিন্তু দীন-নরহরির একটি কবিতা[৩৪] ছাড়া অন্য কোথাও এইরূপ বর্ণনার সমর্থন নাই। 'ভক্তিরত্নাকর'-মতে অবশ্য তেলিয়াতে দামোদর-সেনের যাতায়াত ছিল ; কিন্তু তাহা যে তৎসুতা সুনন্দার বিবাহ-পরবর্তী ঘটনা তাহার কোনও প্রমাণ নাই। বরঞ্চ গ্রন্থমতে[৩৫] তাহা বহু পূর্ববর্তী ঘটনা। প্রকৃতপক্ষে, কুমারনগর পরিত্যাগ পূর্বক রামচন্দ্র ও গোবিন্দ যে

(৩১) কর্ণ.—১ম. নি., পৃ, ৫-৭ ; ভ. মা.—পৃ. ২০৮-৯ ; ভ.র.—৮।৫১৯-৫৫২ (৩২) ৬ষ্ঠ. ম., পৃ. (৩৩) পৃ. ১৮৩-৮৬ (৩৪) গৌ. ত.—পৃ. ৩২০ (৩৫) দ্র.—পরবর্তী আলোচনা

কেন তেলিয়াবুধরিতে চলিয়া যান, 'ভক্তিরত্নাকর'-প্রণেতা তাহার বিশদ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। তাহা হইতে ধারণা জন্মে যে তেলিয়া-গমন আরও পরবর্তিকালের ঘটনা। তাছাড়া, শ্রীনিবাস-রামচন্দ্রের সাক্ষাৎ-বিষয়ে 'ভক্তমাল' 'কর্ণানন্দ' প্রভৃতি সকল গ্রন্থই একমত হওয়ায় এইসম্বন্ধে একমাত্র 'প্রেমবিলাসে'র বিরুদ্ধ বর্ণনাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা চলে না। 'প্রেমবিলাসে'র ঘটনাবিন্যাসের মধ্যে নানাবিধ ভুলত্রুটি থাকিয়া গিয়াছে।[৩৫]

নরহরির তিরোভাবের পর শ্রীনিবাস-আচার্য দ্বিতীয়বার বৃন্দাবনে গেলে কিছুকাল পরে শ্রীনিবাসের প্রথমা-পত্নী দ্রৌপদী বড়-কবিরাজঠাকুরকে অর্থাৎ রামচন্দ্রকে ডাকাইয়া 'সব মনদুঃখ তাঁরে নিভৃতে কহিল' এবং শ্রীনিবাসের 'তত্ত্ব' লইবার জন্য তিনি রামচন্দ্রকে বৃন্দাবনে পাঠাইতে চাহিলে রামচন্দ্রও বৃন্দাবনে গমন করেন।[৩৬] 'ভক্তিরত্নাকর'-মতে[৩৭] শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দন-ঠাকুর, এবং 'প্রেমবিলাস'-মতে[৩৮] নরোত্তম-ঠাকুর রামচন্দ্রকে এই আদেশ প্রদান করেন। কিন্তু তখনও পর্যন্ত নরোত্তমের সহিত রামচন্দ্রের পরিচয় ঘটিয়া উঠে নাই এবং শ্রীনিবাসের বৃন্দাবন-গমনের অত্যল্পকাল পরে রঘুনন্দন-ঠাকুরেরও এইরূপ আদেশ-দানের কোনও প্রয়োজন থাকে না। সেইরূপ প্রয়োজন থাকিলে তিনি নিশ্চয়ই রামচন্দ্রকে শ্রীনিবাসের সহিত পাঠাইয়া দিতে পারিতেন। তবে শ্রীনিবাস-পত্নী রামচন্দ্রকে বৃন্দাবনে পাঠাইবার জন্য ইচ্ছুক হইলে তিনি অবশ্য রামচন্দ্রকে আজ্ঞাদান করিতে পারেন।

ইতিপূর্বে রামচন্দ্র শ্রীনিবাসের নিকট নরোত্তমের সবিশেষ পরিচয় পাইয়াছিলেন এবং তাঁহার দর্শনলাভের জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন। তিনি আরও বুঝিয়াছিলেন[৩৯] যে শ্রীনিবাসের পক্ষে গৃহে থাকা সম্ভব হইবে না, তাঁহাকে বারবার নরোত্তমের নিকট যাইতে হইবে।

প্রভু গৃহে রহিতে নারিব তাঁহা বিনে।
তথা গতায়াত করিবেন গণ সনে ॥

সুতরাং সেই যাতায়াত-পথে তাহার এমন একটি নির্বাচিত স্থানে বাস করা উচিত, যেই স্থানে থাকিলে মধ্যে মধ্যে শ্রীনিবাসাদির সাক্ষাৎ মিলিতে পারিবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি স্ব-গৃহে গিয়া অনুজ গোবিন্দকে বলিলেন যে তিনি বৃন্দাবনে যাইতেছেন এবং আর তাঁহাদের কুমারনগরে বাস করা ঠিক হইবে না।

এবে এথা বাসের সঙ্গতি ভাল নয়।
সদা মনে আশঙ্কা উপজে অতিশয় ॥
আছয়ে কিঞ্চিৎ ভৌম বহুদিন হৈতে।
তাহে যে উৎপাত এবে দেখহ সাক্ষাতে ॥

(৩৫) দ্র.—শ্রীনিবাস (৩৬) অ. ব.—৬ষ্ঠ. ম., পৃ. ৩৯ (৩৭) ৯।১১০ (৩৮) ১৯শ. বি., পৃ. ৩০৫
(৩৯) ভ. র.—৯।১১৮

সুতরাং নির্বিঘ্ন বাসের জন্য গঙ্গা-পদ্মা মধ্যবর্তী 'পুণ্যক্ষেত্র তেলিয়া বুধরি'তে চলিয়া যাওয়া উচিত। উহা একটি 'গণ্ডাগ্রাম', এবং বহু 'শিষ্টলোক' ঐস্থানে বসবাস করেন; পূর্বে মাতামহ দামোদর-সেনেরও ঐ স্থানে যাতায়াত ছিল। রামচন্দ্রের প্রস্তাবে গোবিন্দ সানন্দে সম্মতি প্রদান করিলে রামচন্দ্র বৃন্দাবনে চলিয়া গেলেন। গোবিন্দও কয়েকদিন পরে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি সম্পন্ন করিয়া 'কুমারনগর হৈতে গেলেন তেলিয়া'। বুধরিবাসী জনগণ গোবিন্দকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। বুধরিগ্রামের পশ্চিম পাড়াতে[৪০] গোবিন্দ বাস স্থাপন করিলেন।

'ভক্তিরত্নাক'র-প্রণেতা বলেন যে এই তেলিয়াবুধরিতে আসিয়াই নিশ্চিতভাবে গোবিন্দের ধর্মমতের পরিবর্তন ঘটে। তৎপূর্বে জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্রের বৈষ্ণবধর্ম-গ্রহণ তাঁহার মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছিল। খুবসম্ভবত সেই সময়ে তাঁহার অস্বাস্থ্য জনিত[৪১] মানসিক দ্বন্দ্বও তাঁহাকে ক্রমাগত জ্যেষ্ঠভ্রাতার পথানুগামী করিয়া তুলিতেছিল। কিছুদিন পূর্বে তিনি শ্রীনিবাসের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য একবার যাজিগ্রামেও গিয়াছিলেন।[৪২] কিন্তু শ্রীনিবাস তখন বৃন্দাবনে চলিয়া গিয়াছেন। যাজিগ্রামের অধিবাসী-বৃন্দ তখন সম্ভবত শ্রীনিবাসের প্রভাবেই বৈষ্ণবমত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিয়া গোবিন্দ তাঁহাদের উদার ও সহানুভূতিসূচক মনোভাবের পারচয় পাইয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। পিতা চিরঞ্জীব-সেন যে চৈতন্যের পরমভক্ত ছিলেন, সেকথাও তাঁহাকে ভাবান্বিত করিয়া তুলিতেছিল। এখন রামচন্দ্র বৃন্দাবনে চলিয়া গেলে তিনি জ্যেষ্ঠভ্রাতার দর্শন-লাভেচ্ছায় উদ্‌গ্রীব হইয়া বুধরিতে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

এদিকে রামচন্দ্র বৃন্দাবনে গেলে গোপাল-ভট্ট, রঘুনাথদাস, জীব, লোকনাথ, ভূগর্ভ, কৃষ্ণদাস-কবিরাজ প্রভৃতির সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটিল: সম্ভবত এই সময়েই তাঁহার কবিত্ব[৪৩] প্রতিভা দেখিয়া বৃন্দাবনের ভক্তবৃন্দ চমৎকৃত হন এবং তাঁহাকে 'কবিরাজ'-আখ্যা প্রদান করেন। তারপর তিনি বৃন্দাবন পরিভ্রমণ করেন এবং সম্ভবত এই সময়ে শ্যামানন্দের সহিতও তাঁহার পরিচয় ঘটে। এইভাবে কয়েক মাস বৃন্দাবনে অতিবাহিত করিবার পর শ্রীনিবাস গৌড়াভিমুখে ধাবিত হইলে শ্যামানন্দ ও রামচন্দ্র উভয়েই তাঁহার সহিত প্রত্যাবর্তন করিলেন। পথে শ্রীনিবাস বিষ্ণুপুরে আসিয়া বীর-হাম্বীরের সহিত উভয়ের পরিচয় ঘটাইয়া দিলেন। 'অনুরাগবল্লী'-মতে[৪৪] এই সূত্রে বীর-হাম্বীরের পুত্র ধৃন্দাবন এবং রামচন্দ্র-কবিরাজের মধ্যে বিশেষ সান্নিধ্য ঘটিয়াছিল। ইহার কিছুকাল পরেই

---

(৪০) ভ. র.—৯।১৭৬ (৪১) তু.—গৌ. ভ.—পৃ. ৩২০ (৪২) ভ. র.—৯।১৬২ (৪৩) চৈ. দী.—পৃ. ১২; গৌ. গ. দী.—পৃ.১৮ (গ্রন্থগুলি-মতে রামচন্দ্র গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।) (৪৪) ৬ষ্ঠ. ম., পৃ. ৪১

কাটোয়ায় গদাধরদাসের তিরোধানতিথি-মহামহোৎসব আরম্ভ হইলে রামচন্দ্রও সেই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।[৪৫] তারপর হরিদাসাচার্যের অপ্রকটতিথি-মহামহোৎসব কালেও তিনি কাঞ্চনগড়িয়াতে গিয়া উৎসবে যোগদান করেন।[৪৬] উৎসব-শেষে শ্রীনিবাস কাঞ্চন গড়িয়া হইতে খেতুরি-যাত্রার পথে রামচন্দ্রাদি ভক্তসহ বুধরিতে উপস্থিত হন। 'ভক্তি-রত্নাকর-'মতে এতদিন পরে শ্রীনিবাসের সহিত অপেক্ষমাণ-গোবিন্দের সাক্ষাৎ ঘটিল। তিনি তখন জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতার নিকট শ্রীনিবাস-শরণাকাঙ্ক্ষা জানাইলে তাঁহার সহায়তায় শ্রীনিবাসের নিকট গোবিন্দের রাধাকৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ সম্পন্ন হইল। এদিকে নরোত্তমও বুধরিতে পৌঁছাইলেন। রামচন্দ্র এবং নরোত্তম পরস্পরকে দেখিয়া গভীরভাবে আকৃষ্ট হইলেন।[৪৭]

রামচন্দ্রের গৃহে বসিয়াই খেতুরি মহামহোৎসবের পরিকল্পনা প্রস্তুত হয় এবং শ্রীনিবাস রামচন্দ্রকে নরোত্তমের হস্তে সমর্পণ করেন। তারপর শ্রীনিবাস উভয়কেই খেতুরি পাঠাইয়া দিলে[৪৮] রামচন্দ্রের অনুপস্থিতিতে গোবিন্দই 'আচার্যের সেবারসে মগ্ন হইলেন।' শ্রীনিবাস তখন তাঁহার কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে কৃষ্ণচৈতন্যলীলা বর্ণনা করিবার আজ্ঞাদান করিলে গোবিন্দও

প্রভুর আজ্ঞায় বর্ণে গদ্য পদ্য গীত।
সে সব শুনিতে কা'র না দ্রবয়ে চিত।।

এবং

গোবিন্দের কাব্যে শ্রীআচার্য হর্ষ হৈলা।
গোবিন্দে প্রশংসি 'কবিরাজ' খ্যাতি দিলা।।[৪৯]

ইহার পরেই গোবিন্দ শ্রীনিবাসের সহিত খেতুরি পৌঁছাইলেন এবং রামচন্দ্র ও গোবিন্দ উভয় ভ্রাতাই উৎসবে বিশেষ অংশগ্রহণ করিলেন। সমবেত অসংখ্য ভক্তের বাসা-সংস্থান এক সমস্যার ব্যাপার হইল। জাহ্নবা ও তাঁহার ভক্তবৃন্দের বাসা-ব্যবস্থার ভার পড়িল রামচন্দ্রের উপর। আর রঘুনন্দনাদি শ্রীখণ্ড-সম্প্রদায়ের তত্ত্বাবধানের ভার লইলেন গোবিন্দ।[৫০] ইহা ছাড়াও কবিরাজভ্রাতৃদ্বয় নানা গুরুত্বপূর্ণ কার্যে যুক্ত হইয়া উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করিলেন।[৫১] তারপর উৎসবশেষে বুধরি চলিয়া যাইবার সময় গোবিন্দ কয়েকজন পাককর্তাকে সঙ্গে লইয়া গেলেন। তাঁহারা গিয়া পর দিবস গোবিন্দের

(৪৫) ভ. র.—৯।৪০০ (৪৬) ঐ—১০।২২, ৬০ (৪৭) তু.—প্রে. বি.—১৯শ. বি., পৃ. ৩০৭ (৪৮) প্রে. বি.-কার (১৪ শ. বি., পৃ. ২০১-২) বলেন যে উৎসবের আয়োজনাদির জন্য নরোত্তম ব্যাসাচার্যকে লইয়া যান এবং পরে রামচন্দ্রসহ শ্রীনিবাস খেতুরিতে গিয়া পৌঁছান। (৪৯) ভ. র.—১০।২৯৫-৯৬ ; তু.—গৌ. ভ.—পৃ. ৩২১ (৫০) ন. বি.—৬ষ্ঠ. বি., পৃ. ৮৬-৮৭ (৫১) পৃ. ৯৭ ; ৭ম. বি., পৃ. ১০৫, ১০৮ ; প্রে. বি.—১৪শ. বি., পৃ. ২০৩, ২০৬-৭ ; ১৯শ. বি., পৃ. ৩২০

ব্যবস্থানুসারে রন্ধনাদি সম্পন্ন করিয়া এক বিরাট ভোজের ব্যবস্থা করিয়া রাখিলেন। পরদিন রামচন্দ্র বিদায়ী ভক্তবৃন্দকে বুধরিতে লইয়া গেলে দুই ভ্রাতা মিলিয়া তাঁহাদিগকে আপ্যায়িত করিলেন। তারপর তাঁহারা ভক্তবৃন্দকে বিদায় দিয়া পুনরায় খেতুরিতে প্রত্যাবর্তন করিলে জাহ্নবাদেবী স্বীয় অনুগামী ভক্তবৃন্দসহ বৃন্দাবনাভিমুখে গমন করিলেন। শ্রীনিবাসের আজ্ঞায় গোবিন্দ-কবিরাজও তাঁহার সঙ্গী হইলেন।[৫২] রামচন্দ্র নরোত্তমের নিকট রহিয়া গেলেন।[৫৩]

গোবিন্দের কবিত্ব-শক্তির কথা শুনিয়া বৃন্দাবনস্থ সকলেই তাঁহার কাব্যামৃত শুনিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। শেষে তাঁহার মনোমুগ্ধকর পদাবলী শ্রবণ করিয়া

সবে কহে 'কবিরাজ'-খ্যাতি যুক্ত হয়।
'শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ' বলি প্রশংসয় ॥[৫৪]

তারপর প্রত্যাবর্তনকাল সমাগত হইলে জীব-গোস্বামী সস্নেহে গোবিন্দকে নানাকথা বলিয়া দিলেন এবং গোবিন্দের 'নিজকৃত গীতামৃত পাঠাইয়া দিবা'র জন্য অনুরোধ জানাইলেন। তিনি গোবিন্দের হস্তে 'গোপালবিরুদাবলী'-গ্রন্থখানি দিয়া মধ্যে মধ্যে পত্রাদি প্রেরণ করিবার জন্যও তাঁহাকে নির্দেশ দান করিলেন।[৫৫] কৃষ্ণদাস-কবিরাজ প্রভৃতিও নানাভাবে গোবিন্দের নানা প্রশংসা করিলেন।

জাহ্নবা সহ গোবিন্দ সর্বপ্রথম খেতুরিতে পৌঁছাইলে সেইস্থলেই রামচন্দ্র-কবিরাজের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল। তিনি নরোত্তমের অভিন্নহৃদয় বন্ধুরূপে[৫৬] তাঁহার সহিত খেতুরিতেই থাকিয়া সর্বদা কৃষ্ণকথা ও নামগানে মত্ত থাকিতেন। 'গৃহে মাত্র কবিরাজের ঘরণী আছয়' এবং নরোত্তম তাঁহার অন্ন বস্ত্রাদির ব্যয় পাঠাইয়া দিতেন। ভৃত্যসহ দুইজন দাসী সেইস্থানে থাকিত। 'পুত্র কন্যা আর কেহ নাহিক সংসারে।'[৫৭] একবার কবিরাজ-পত্নী রামচন্দ্রকে একটিবারের জন্য গৃহে পাঠাইয়া দিবার প্রার্থনা জানাইলে নরোত্তম অনেক বুঝাইয়া রামচন্দ্রকে বুধরিতে পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু রামচন্দ্র একটি রাত্রিও গৃহে অবস্থান না করিয়া দ্বিতীয় প্রহর রাত্রিতে গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া আসেন। নরোত্তমকে ছাড়িয়া রামচন্দ্রের অন্য কোথাও বাস করা অসম্ভব ছিল।

যাহাহউক, খেতুরিতে পৌঁছাইয়া গোবিন্দ নরোত্তমকে শ্রীজীব-প্রেরিত 'গোপাল-

(৫২) ভ. র.—১০।২৯৩ ; ন. বি.—৮ম. বি., পৃ. ১১১, ১১৮ (৫৩) ভ. র.—১০।৭৬৯ ; ১১।২৫ ; ন. বি.—৮ম. বি., পৃ. ১২২, ১২৮ ; প্রে. বি.—১৪শ. বি., পৃ. ২০৭ ; অ. ব.—৬ষ্ঠ. ম., পৃ. ৪২ (৫৪) ভ. র.—১১।১৪৭ ; তু.—ন. বি.—৯ম. বি., পৃ. ১৩১ (৫৫) ন. বি.—৯ম. বি., পৃ. ১৩২-৩৩ (৫৬) তু.—ভ. র.—১।৪৩৯ (৫৭) প্রে. বি.—১৭শ. বি., পৃ. ২৫৬

বিরুদাবলী' গ্রন্থখানি প্রদান করিলে নরোত্তম তাহা রামচন্দ্রের হস্তে অর্পণ করিলেন।[৫৮] তারপর কয়েক দিবস অতিবাহিত হইলে জাহ্নবা বুধরি হইয়া একচক্রায় গমন করেন এবং গোবিন্দও পূর্বাহ্ণে বুধরিতে আসিয়া জাহ্নবার অভ্যর্থনার আয়োজন করিয়া তাঁহাকে বিশেষভাবে সংবর্ধিত করেন। তারপর নরোত্তম-রামচন্দ্রের সহিত তিনিও একচক্রায় গিয়া পৌছান।[৫৯] একচক্রা হইতে তাঁহারা কণ্টকনগরে আসিলে সেইস্থানেই শ্রীনিবাসের সহিত গোবিন্দের সাক্ষাৎ ঘটে এবং রামচন্দ্রও সেইস্থলে 'গোপালবিরুদাবলী'-গ্রন্থটি শ্রীনিবাসের হস্তে অর্পণ করেন।[৬০] তাহার পর জাহ্নবা যাজিগ্রাম হইয়া খড়দহে প্রত্যাবর্তন করিলে শ্রীনিবাস রামচন্দ্র প্রভৃতি শ্রীখণ্ড হইয়া নবদ্বীপে গমন করেন এবং নবদ্বীপ-পরিক্রমা শেষ করিয়া[৬১] পুনরায় শ্রীখণ্ড হইয়া যাজিগ্রামে প্রত্যাবর্তন করেন।

এই সময় বীর-হাম্বীর যাজিগ্রামে পৌছাইলে রামচন্দ্র ও নরোত্তমের সহিত তাঁহার শ্রদ্ধা-বিনিময় ঘটে[৬২] এবং রামচন্দ্রাদি, এবং সম্ভবত গোবিন্দও[৬৩] কণ্টকনগরে গিয়া রাধিকাবিগ্রহবাহী পরমেশ্বরীদাসকে বৃন্দাবনের পথে বিদায় দিয়া আসেন। ইহার পর হাম্বীর বিষ্ণুপুরে চলিয়া গেলে রামচন্দ্র নরোত্তম ও শ্রীনিবাসকে সঙ্গে লইয়া শেষবারের জন্য শ্রীখণ্ডে রঘুনন্দনের দর্শনলাভ করিয়া যাজিগ্রাম-কাঞ্চনগড়িয়া-বুধরি হইয়া খেতুরিতে উপস্থিত হন। গোবিন্দ সম্ভবত বুধরিতেই থাকিয়া যান।[৬৪]

ইহার পর হইতে রামচন্দ্র সম্ভবত তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময়ই নরোত্তমের সহিত খেতুরিতে অবস্থান করিয়া বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে যত্নবান হন। এই সময় একদিন দুই-বন্ধুতে 'পদ্মাবতী স্নানে' গেলে হরিরাম- ও রামকৃষ্ণ-আচার্য নামক দুই-ভ্রাতার সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ ঘটে এবং আচার্য-ভ্রাতৃদ্বয় যথাক্রমে রামচন্দ্র ও নরোত্তমের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন।[৬৫] পরে ইঁহাদের দৃষ্টান্তে ও সহায়তায় বুধরিনিবাসী বৈদ্য বলরাম-কবিরাজ এবং গাম্ভীলা-নিবাসী গঙ্গানারায়ণ-চক্রবর্তীও রামচন্দ্র ও নরোত্তমের অনুগামী হন। হরিরাম ও রামচন্দ্রের সহিত গঙ্গানারায়ণ গাম্ভীলা হইতে বুধরিতে আসিয়া কর্ণপুর-কবিরাজ এবং গোবিন্দ-তনয় দিব্যসিংহ-কবিরাজ প্রভৃতির সহিত মিলিত হন। তারপর সকলে মিলিয়া খেতুরিতে আসিলে গঙ্গানারায়ণের একান্ত ইচ্ছায় গোবিন্দাদি সকলের সম্মুখে নরোত্তম তাঁহাকে দীক্ষিত করিয়া রামচন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করেন।[৬৬] কিছুদিন পরে রাজা-নরসিংহ নরোত্তমকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য রূপনারায়ণ এবং অধ্যাপকগণসহ সদর্পে খেতুরি

(৫৮) ভ. র.—১১।৩৫৫ ; ন. বি.—৯ম. বি., পৃ. ১৩৬ (৫৯) ভ. র.—১১।৪০৪ (৬০) ঐ—১১।৬৮০ ; ন. বি.—৯ম. বি., পৃ. ১৪০ (৬১) ভ. র.—১২।২৬, ৮৭, ১৩৫, ৪০৩২ ; ১৩।৭ (৬২)।ঐ—১৩।৪৫ (৬৩) ঐ—১৩।১০৬ (৬৪) ন. বি.—৯ম. বি., পৃ. ১৪৫ (৬৫) দ্র.—নরোত্তম; বলরাম-কবিরাজ সম্বন্ধেও (৬৬) ন. বি.—১০ম. বি., পৃ. ১৫৬

সন্নিকটস্থ কুমরপুরে পৌঁছাইলে রামচন্দ্র এবং গঙ্গানারায়ণ বারুই- ও কুমার-বেশে কুমরপুরে আসিয়া তাঁহাদিগকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করেন।[৬৭]

এইভাবে রামচন্দ্র নরোত্তমের প্রধান সহায় হইয়া পরবর্তিকালে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের একটি শ্রেষ্ঠ স্তম্ভরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। নরোত্তম কর্তৃক মহাপরাক্রান্ত জমিদার চাঁদ-রায়কে দীক্ষাদান ব্যাপারেও রামচন্দ্র বিশেষভাবে যুক্ত হইয়াছিলেন।[৬৮] 'প্রেমবিলাস' ও 'কর্ণানন্দে'র বর্ণনা হইতে জানা যায়[৬৯] যে একবার বনবিষ্ণুপুরে শ্রীনিবাস-আচার্য ভাবাবেশে সম্বিৎ হারাইয়া ফেলিলে তাঁহার প্রথমা-পত্নী দ্রৌপদী রামচন্দ্র-কবিরাজকে আনাইবার নির্দেশ দিয়া সমবেত শিষ্যবৃন্দকে জানান যে রামচন্দ্রই শ্রীনিবাসের প্রকৃত মর্মবেত্তা, এবং সেইজন্যই শ্রীনিবাস ব্রাহ্মণ হওয়া সত্ত্বেও রামচন্দ্রের নিকট জাতিকুলের সকল ব্যবধান ঘুচাইয়া দিয়াছিলেন। এইভাবে দ্রৌপদী-ঈশ্বরী কর্তৃক রামচন্দ্রের বহুবিধ গুণবর্ণনার[৭০] পর রামচন্দ্রকে আনা হইলে তিনি শ্রীনিবাসকে প্রকৃতিস্থ করিতে সক্ষম হন। 'কর্ণানন্দ'-কার বলেন যে এই ব্যাপারের পর স্বয়ং রাজা-হাম্বীর রামচন্দ্রের অলৌকিক শক্তির প্রত্যক্ষ-পরিচয় লাভ করিয়া অনুগত শিষ্যের ন্যায় তাঁহার নিকট তত্ত্বশিক্ষা লাভ করেন[৭১] এবং তাঁহাকে গুরুমান্য হিসাবে একটি গ্রামও দান করেন।[৭২]

নরোত্তমের সহিত রামচন্দ্রের যেইরূপ অন্তরঙ্গ ভাব ছিল, নরোত্তমের পিতৃব্য-পুত্র সন্তোষের সহিতও গোবিন্দের অনেকটা সেইরূপ ঘনিষ্ঠতা ছিল।[৭৩] গোবিন্দ তাঁহার কাব্য-মধ্যে রাজপুত্র সন্তোষের প্রতি সেই আনুগত্যকে অমর করিয়া রাখিয়াছেন। সংস্কৃতভাষায় লিখিত তাঁহার বিখ্যাত 'সঙ্গীতমাধবনাটক'টিও সন্তোষ-দত্তেরই অনুমতি-ক্রমে লিখিত হয়। গোবিন্দের প্রতিষ্ঠা ছিল এই কবিত্বের দিক হইতেই। এবং সেইজন্যই তাঁহার কবিতার প্রতিও সকলেরই আকর্ষণ ও লোভ ছিল। তিনিও যথাসাধ্য সকলের আশা পূর্ণ করিতে সচেষ্ট হইতেন। 'ভক্তিরত্নাকর'-কার লিখিতেছেন[৭৪] :

শ্রীজীব গোস্বামী পত্রীদ্বারে ব্রজ হৈতে।
পুনঃ পুনঃ লেখে গীতামৃত পাঠাইতে॥
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ গীতামৃতগণে।
গোস্বামীর আদেশে পাঠান বৃন্দাবনে॥......
যবে যে বর্ণয়ে তাহা পরামৃত হয়।
নরোত্তম কবিরাজ আদি আস্বাদয়॥

---

(৬৭) দ্র.—নরোত্তম ; ন. বি.—১০ ম. বি., পৃ. ১৬৩ ; প্রে. বি.—১৯শ. বি., পৃ. ৩৩৫ (৬৮) প্রে. বি.—১৮শ. বি., পৃ. ২৭৯-৮০, ২৮৬ (৬৯) ঐ—১৯শ. বি., পৃ. ৩০০-৩০১ ; কর্ণ.—৩য়. নি., পৃ. ৩৭-৫৭ (৭০) কর্ণ.—ঐ ; তু.—ভ. মা.—পৃ. ২০৯ (৭১) কর্ণ.—৪র্থ. নি., পৃ. ৬০-৯১ (৭২) ঐ—৬ষ্ঠ. নি., পৃ. ১১৭ (৭৩) ভ. র.—১।৪৮০ ; প্রে. বি —২০শ. বি., পৃ. ৩৫২ (৭৪) ১।৪৬১ ; ন. বি.—১২শ. বি., পৃ. ১৯০

যখন যা বর্ণিতে কহয়ে বিজ্ঞগণে।
তখন তা বর্ণয়ে পরানন্দ মনে ॥……
হরিনারায়ণ কবিরাজে নিবেদিলা।
শ্রীরামচরিত্র গীত তারে বর্ণি দিলা ॥……
ঐছে সন্তোষদত্ত অনুমতি দিল।
সঙ্গীত মাধব নাম নাটক বর্ণিল ॥……

গোবিন্দের মত রামচন্দ্র-কবিরাজও সংস্কৃত ভাষায় মহাপণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি বাংলা ভাষায় পদরচনা করিয়াছিলেন।[৭৫] অবশ্য গোবিন্দ ছিলেন এই বিষয়ে জ্যেষ্ঠভ্রাতা অপেক্ষা বহুগুণে প্রতিভাবান। কাব্যরচনা বিষয়ে তিনি যেন ছিলেন মহাকবি বিদ্যাপতিরই সার্থক উত্তরাধিকারী। এইজন্য বল্লভ তাঁহার এইটি পদে[৭৬] তাঁহাকে 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি'-আখ্যাদান করিয়া জানাইতেছেন :

অসম্পূর্ণ পদ বহু রাখি বিদ্যাপতি পহুঁ
পরলোকে করিলা গমন।
গুরুর আদেশক্রমে শ্রীগোবিন্দ ক্রমে ক্রমে
সে সকল করিল পূরণ ॥

প্রকৃতপক্ষে, গোবিন্দদাস ছিলেন ব্রজবুলি ভাষার শ্রেষ্ঠ বাঙালী কবি। 'পদকল্পতরু'তে তাঁহার চারি-শতাধিক ব্রজবুলি কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহাছাড়া তাঁহার আরও ব্রজবুলি পদ রহিয়াছে। ডা সুকুমার সেন ১৩৩৬ সালের বংগীয় 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'য় 'গোবিন্দদাস কবিরাজ'-নামক প্রবন্ধ মধ্যে প্রমাণ করিয়াছেন যে 'বঙ্গদেশে প্রচলিত বিদ্যাপতির কতকগুলি অসম্পূর্ণ পদকে গোবিন্দদাস সম্পূর্ণ বা সংস্কৃত করিয়া গিয়াছেন এবং কতকগুলির রচনার কৃতিত্ব সম্পূর্ণরূপে আত্মসাৎ না করিয়া যুক্ত-ভণিতা দিয়া গিয়াছেন।' বর্তমান গ্রন্থকারের অনুসন্ধানের ফলে গোবিন্দদাসের উৎকৃষ্টপদসংগ্রহ পুথি একখানি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। অর্বাচীন ও খণ্ডিত হইলেও পুথিখানি বিশেষত্বপূর্ণ। গোবিন্দদাসের যুক্ত-ভণিতায় অনেকগুলি পদ আছে। ভণিতাগুলিতে নিম্নোক্ত নামগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে—'রায় সন্তোষ,' 'রায় দিব্যসিংহ রূপনারায়ণ,' 'ভূপতি রূপনারায়ণ' ও 'দ্বিজরায়বসন্ত'। এই প্রসিদ্ধ ভণিতাগুলি ছাড়াও গোবিন্দদাস তাঁহার পদে 'হরিনারায়ণ,' 'নরসিংহ রূপনারায়ণ,' 'রায়চম্পতি'[৭৭] নামও ব্যবহার করিয়া এই সকল ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং ইঁহাদের সহিত স্বীয় ঘনিষ্ঠতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। এই সমস্ত ব্যক্তির মধ্যে রায়-সন্তোষ যে নরোত্তমের ভ্রাতুষ্পুত্র, এবং পূর্বোক্ত চাঁদ-রায়ের ভ্রাতা সন্তোষ-রায় নহেন, তাহা সহজেই ধরিয়া লইতে পারা যায়। দ্বিজ-রায়-

(৭৫) HBL.—pp, 204, 2 5 (৭৬) গৌ. ত.—পৃ ৩২১ (৭৭+৭৮) দ্র —নরোত্তম

বসন্ত সম্বন্ধে একটুকু জানা যায় যে একবার খেতুরিতে ব্যাসাচার্যের সহিত নরোত্তম, রামচন্দ্র এবং গোবিন্দের এক বিতর্ককালে গোবিন্দদাস তাঁহার পদমধ্যে পরকীয়া-লীলাবাদ সমর্থন করিলে সেই বিতর্ক বহুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়। সেই সময় নরোত্তম-শিষ্য[৭৮] রায়-বসন্ত বৃন্দাবন-গমনেচ্ছু হইলে তাঁহার মারফত[৭৯] একটি পত্র প্রেরণ করিয়া জীব-গোস্বামীর অভিমত চাহিয়া পাঠান হইয়াছিল। জীব যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহাও বসন্ত-রায়ই বহন করিয়া আনিয়াছিলেন এবং জীবের নিকট হইতে সেই পত্রপ্রাপ্তির পর গোবিন্দ-কবিরাজও খেতুরি হইতে বুধরিতে আসিয়া সানন্দে স্বীয় 'গীতাবলী'কে একত্রিত করিলেন। যাহাহউক, দাস-গদাধরের তিরোধানতিথি-মহামহোৎসবে যোগদানকারী লবনি সহ একজন বসন্তকে দেখা যায়।[৮০] সম্ভবত ইনি ভিন্ন ব্যক্তি। কিন্তু বসন্ত-রায়কে 'নরোত্তমবিলাসে'র মধ্যে 'মহাকবি' আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে[৮১] এবং 'পদকল্পতরু'তে তাঁহার একটি ব্রজবুলি পদ ও 'ভক্তিরত্নাকরে' তাঁহার একটি বাংলাপদ গৃহীত হইয়াছে।[৮২]

ডা. সুকুমার সেন বলেন,"গোবিন্দদাস কবিরাজ বাঙ্গালায় কোন পদরচনা করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। পদামৃতসমুদ্রে উদ্ধৃত গোবিন্দদাস ভণিতাযুক্ত পদগুলির মধ্যে যে পদগুলিকে রাধামোহন ঠাকুর গোবিন্দদাস-কবিরাজ মহাশয়ের রচনা বলিয়া নির্দেশ করিয়া-ছেন, সেগুলির কোনটিই বাঙ্গালা পদ নহে।" ১৩৪৯ সালের 'বংগশ্রী' পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যায় কবিশেখর কালিদাস রায় কিন্তু গোবিন্দদাসের ২।৪টি বাংলা কবিতা রচনার সম্ভাব-নার কথা উল্লেখ করিয়া জানাইতেছেন, "প্রতাপাদিত্যের মত পাষাণও যে এই (গোবিন্দ-দাসের) গানে গলিয়া যাইত তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। 'প্রতাপ আদিত এ-রসে ভাসত দাস গোবিন্দ ভনে'।" ডা. মনোমোহন ঘোষ তাঁহার বাংলা সাহিত্য গ্রন্থের অষ্টাদশ অধ্যায়ে জানাইতেছেন, "প্রতাপাদিত্য ও উদয়াদিত্য নামক দুইজন পদকর্তার নিশ্চিত পদ পাওয়া যায় নাই। তবে নাম দেখিয়া মনে হয় ইঁহারা যশোহরের ইতিহাস প্রসিদ্ধ রাজা প্রতাপা-দিত্য ও তাঁহার পুত্র। এরূপ অনুমান অমূলক না হইতে পারে। কারণ, রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রে' আছে যে, প্রতাপাদিত্য দিল্লীতে আকবরের সভায় একটি দুর্বোধ্য ব্রজবুলি পদের ব্যাখ্যা করিয়া বাদশাহের দ্বারা পুরস্কৃত হইয়াছিলেন। উদয়াদিত্যের একটি পদ 'পদকল্পলতিকা'য় উদ্ধৃত আছে। আর রামগোপাল দাস তাঁহার 'রসকল্পবল্লী'তে একটি ভণিতাহীন পদ উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন যে, তাহা নৃপ উদয়াদিত্য বিরচিত। ইহা হইতে মনে হয়, ইনি হয়ত রাজা প্রতাপাদিত্যের পুত্রও হইতে পারেন।"

গোবিন্দদাস সম্বন্ধে কিন্তু আর একটু তথ্য আছে। শ্রীযুক্ত তপন মোহন চট্টোপাধ্যায়

---

(৭৯) কর্ণ.—৫ম. নি., পৃ. ৯৪-৯৫ (৮০) ভ. র.—৯।৪০০ (৮১) ন. বি.—১২শ. বি., পৃ. ১৯০-৯১
(৮২) HBL.—p. 140

তাঁহার 'বাংলা লিরিকের গোড়ার কথা'য় লিখিয়াছেন, "গোবিন্দদাস বাঙালী হয়েও ব্রজবুলির বিষম পক্ষপাতী। তাইতো বিহারীরা এঁকে মৈথিল বলে সন্দেহ করেন।" কথাটি সত্য। কিন্তু কেবল বিহারীরা নহেন, বাঙালীরাও ইঁহাকে বিহারী প্রমাণ করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। দ্বারভাঙা রাজ-গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ মথুরাপ্রসাদ দীক্ষিত মহাশয় লহেরিয়াসরায় বিদ্যাপতি মুদ্রাযন্ত্র হইতে 'গোবিন্দ গীতাবলী' প্রকাশ করিবার পর ১৩৪২ সালের 'ভারতবর্ষ'-পত্রিকার বৈশাখ-সংখ্যায় নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় 'কবি গোবিন্দদাস ঝা-'নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন, "গোবিন্দ গীতাবলী গোবিন্দদাস ঝার রচনা। এই সকল কবিতা বঙ্গদেশেও প্রচলিত আছে। এই কবিই কবিরাজ গোবিন্দদাস নামে প্রসিদ্ধ। মিথিলা হইতে যে বাঙ্গালী কবির রচনা প্রকাশিত হয় নাই, ইহা বিশ্বাস করিতে কাহারও দ্বিধা হইবে না।......আমিই প্রথমে ত্রিশ বৎসর পূর্বে প্রমাণ করিয়াছিলাম যে প্রধান বৈষ্ণব কবি গোবিন্দদাস মিথিলাবাসী......আমার সিদ্ধান্ত যে ভ্রান্ত নহে তাহা প্রমাণিত হইল।......গোবিন্দদাস ঝারও সম্পূর্ণ পদাবলী প্রকাশিত করিব।" ঐ বৎসরের 'ভারতবর্ষে'র আষাঢ়-সংখ্যায় হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয় 'পদকর্তা দাসরঘুনাথ ও নৃপ রঘুনাথ-'নামক প্রবন্ধের শেষভাগে একরকম যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও নগেন্দ্রবাবুর প্রবন্ধের যে জবাব দিয়াছিলেন তাহা সংক্ষিপ্ত হইলেও তীব্রতম। বৈষ্ণবসাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ পদকর্তা গোবিন্দদাস-কবিরাজের স্থলে গোবিন্দদাস-ঝার নাম এখন আর শুনিতে পাওয়া যায় না।

গোবিন্দ বারবার বৃন্দাবনে তাঁহার পদাবলী পাঠাইয়া দেওয়া সত্ত্বেও জীব-গোস্বামী, কবিরাজ-গোস্বামী প্রভৃতি সেই সমস্ত পদপাঠে পরিতৃপ্ত হইয়া নব-রচিত পদাবলীর জন্য তাঁহার নিকট পুনরায় পত্র প্রেরণ করিতেন।[৮৩] আবার 'ভক্তিরত্নাকর' হইতে জানা যায় যে রামচন্দ্র, গোবিন্দ ও নরোত্তম প্রভৃতির মধ্যে রীতিমত তত্ত্বালোচনা চলিত এবং এতৎসংক্রান্ত বিষয় তাঁহাদের নিকট এতই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইলে তাঁহারা বৃন্দাবনে 'পত্রী'-প্রেরণ করিয়া তাহার সমাধান চাহিয়া পাঠাইতেন।[৮৪] একবার বৃন্দাবন হইতে পত্র আসিয়া পৌঁছাইলে রামচন্দ্র তাহা যাজিগ্রামে শ্রীনিবাসের নিকট পাঠাইয়া দেন। পত্র পাঠ করিয়া এবং নরোত্তম-রামচন্দ্রের মাহাত্ম্য স্মরণ করিয়া তিনি উৎফুল্ল হইয়াছেন, এমন সময় বীরচন্দ্র হাজির হইলেন। কয়েকদিন যাজিগ্রামে রাখিয়া শ্রীনিবাস তাঁহাকে কণ্টকনগর ও বুধরির পথে খেতুরিতে আনিলে বীরচন্দ্রের ইচ্ছানুযায়ী গোবিন্দ-কবিরাজ তাঁহার গীতামৃত পান করাইয়া এবং রামচন্দ্র-কবিরাজ

(৮৩) প্রে. বি.—অর্থ.বি., পৃ. ৩০৮ ; ভ. র.—১৪।৩৬-৩৭ ; ১।৪৫৫ ; ন. বি.—১১শ. বি., পৃ. ১৬৭ (৮৪) প্রে. বি.—অর্থ. বি., পৃ. ৩০৬ ; ভ. র.—১৪।৩২-৩৩ ; কর্ণ.—৫ম.নি., পৃ. ৯৬

ভাগবতের 'রাসবিলাস' ব্যাখ্যা করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিলেন।[৮৫] কয়েকদিন পরে বীরচন্দ্র বিদায় গ্রহণ করিলে রামচন্দ্র বুধরি হইয়া যাজিগ্রামে আসিলেন।[৮৬] বলরাম-কবিরাজাদি তাঁহার কয়েকজন শিষ্য খেতুরিতেই থাকিয়া গেলেন। কিন্তু রামচন্দ্র সম্ভবত এইবারেই যাজিগ্রামে আসিয়া শ্রীনিবাসের নিকট কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন।[৮৭] এই সময়েই একদিন পূর্ণিমা রাত্রিতে রামচন্দ্রের ভাবাকুল অবস্থা দেখিয়া শ্রীনিবাস-পত্নী দ্রৌপদী শ্রীনিবাসের নিকট তাঁহার সেইরূপ আবেশের তত্ত্ব বুঝিয়া লন।[৮৮] কিছুদিন পরে 'প্রিয়গণ'সহ শ্রীনিবাস কাঞ্চনগড়িয়া হইয়া বুধরি এবং তথা হইতে বোরাকুলিতে গমন করিলে রামচন্দ্রও তাঁহার সহিত বোরাকুলি-মহামহোৎসবে যোগদান করিলেন।[৮৯] বলরাম প্রভৃতিকেও উৎসবে যোগদান করিতে দেখা যায়।[৯০]

এদিকে নরোত্তম

গোবিন্দাদি লৈয়া গৌরচন্দ্রের প্রাঙ্গণে।
দিবানিশি মত্ত মহাশয় সংকীর্তনে॥ ৯১

এই সময় রামচন্দ্র বোরাকুলি হইতে খেতুরিতে প্রত্যাবর্তন করিলে কিছুকাল পরে নরোত্তম-প্রভু একবার বলরাম-কবিরাজ প্রভৃতি সকল ভক্তকেই গৃহগমনের আজ্ঞা দিয়া একাকী রামচন্দ্র সঙ্গ কিছুকাল অতিবাহিত করেন। তারপর রামচন্দ্র একদিন নরোত্তমের নিকট বিদায় লইয়া যাজিগ্রামে শ্রীনিবাসের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কিছুদিন পরে নরোত্তম সংবাদ পাইলেন যে রামচন্দ্র শ্রীনিবাসের সহিত বৃন্দাবনের পথে বাহির হইয়া গিয়াছেন।[৯২] আরও কিছুকাল পরে পুনরায় সংবাদ আসিল, রামচন্দ্র ইহজীবন ত্যাগ করিয়াছেন।[৯৩]

ভ্রাতার মৃত্যুতে গোবিন্দ-কবিরাজ নিদারুণ আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। বুধরিতেই তাঁহার শেষ জীবন অতিবাহিত হয়। তবে প্রায়ই খেতুরিতে আসিয়া তিনি সন্তোষ এবং নরোত্তমের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইতেন। নরোত্তমের তিরোভাবকালেও তিনি জীবিত ছিলেন।[৯৪] তাহার পর আর তাঁহার কোনও সংবাদ পাওয়া যায় না। বল্লভদাসের একটি

(৮৫) ন. বি.—১১শ. বি., পৃ. ১৭৫-৭৬ (৮৬+৮৭) ভ. র.—১৪।৪৬ (৮৮) ঐ—১৪।৫৮-৬৩ (৮৯) ঐ—১৪।১৩৬ (৯০) ঐ—১৪।৯৮ (৯১) ন. বি.—১১শ. বি., পৃ. ১৭৮ (৯২) ঐ—১১শ. বি., পৃ. ১৭৯ (৯৩) ঐ—পৃ. ১৮ ; বৈ. দি. (পৃ. ১১৬)-মতে বৃন্দাবনেই রামচন্দ্র দেহত্যাগ করেন এবং ধীর সমীর কুঞ্জে তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হয়।—রামচন্দ্র সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য যে স্বরূপদামোদরের কড়চা নামক পরবর্তী কালের বাংলা পুথিটিতে (পৃ. ৩৪) রামচন্দ্রকে নবরসিকের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে ; লীলীসঙ্গিনী বলা হইয়াছে 'আচার্য ভগিনী' দেবকীকে। কিন্তু শ্রীনিবাস-আচার্যের কোনও ভগিনী (বা ভ্রাতা) ছিলেন না। মনে হয় আচার্য-ভর্ত্রী দ্রৌপদী আচার্য-ভগ্নী দৈবকীতে পরিণত হইয়াছেন। (৯৪) ন. বি.—১১শ. বি., পৃ. ১৮৭ ৮৮

পদ হইতে জানা যে সম্ভবত নরোত্তমের অন্তর্ধানের অল্পকাল মধ্যেই গোবিন্দও লোকান্তরিত হন।[৯৫]

গোবিন্দের পুত্র দিব্যসিংহ সম্বন্ধেও[৯৬] আর বিশেষ কিছু জানিতে পারা যায় না। ডা. সুকুমার সেন 'সংকীর্তনামৃত' হইতে দিব্যসিংহের একমাত্র ব্রজবুলি-পদের উল্লেখ করিয়াছেন।[৯৭]

'প্রেমবিলাস'-কার নিম্নোক্ত ব্যক্তিবৃন্দকে রামচন্দ্রশাখাভুক্ত করিয়াছেন[৯৮] :—

গোয়াসনিবাসী হরিরাম-আচার্য, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ বল্লভ-মজুমদার এবং বুধরিনিবাসী বলরাম-কবিপতি। 'কর্ণানন্দে'ও বলরাম-কবিপতির নাম আছে।[৯৯] 'কর্ণানন্দে' হরিরাম-আচার্যের পুত্র গোপীকান্ত-চক্রবর্তীকে রামচন্দ্র-শাখান্তর্গত বলা হইয়াছে। 'পদকল্পতরু'তে গোপীকান্তের একটি পদ দৃষ্ট হয়।[১০০] 'গৌরপদতরঙ্গিণী'তেও এই পদটি ছাড়া 'গোপীকান্ত'-ভণিতার অন্য একটি পদ গৃহীত হইয়াছে।[১০১] 'নরোত্তমবিলাস'-কার যে উপরোক্ত বলরাম-কবিপতিকেই বলরাম-কবিরাজ আখ্যা দিয়াছেন[১০২] সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ এই বলরাম-কবিরাজের নাম অন্য কোথাও নাই। তাছাড়া 'কর্ণানন্দে'র মত 'নরোত্তমবিলাসে'ও রামচন্দ্র-শিষ্য হরিরাম-আচার্য ও গোপীরমণের সহিত একত্রে এই বলরাম-কবিরাজের নামোল্লেখ করা হইয়াছে। এই বলরাম-কবিরাজ বা বলরাম-কবিপতির পক্ষে পদকর্তা হওয়াও বিচিত্র নহে।[১০৩] তবে বলরাম- বা বলরামদাস-ভণিতার কোনও পদ ইঁহারই রচিত কিনা সে বিষয়ে জোর করিয়া বলিবার মত প্রমাণ নাই। সম্ভবত সমার্থবোধকতা-হেতু কবিরাজকে 'কবিপতি' বলা হইয়া থাকিবে।

---

(৯৫) গৌ. ত. (৯৬) দিব্যসিংহ-কবিরাজের কোন পুত্র ছিলেন কিনা, কিংবা থাকিলে তাঁহার নাম কি, সে সম্বন্ধে প্রাচীন বাংলা চরিত-গ্রন্থগুলিতে কোন উল্লেখ নাই। অনেকে গতিগোবিন্দের শিষ্য দিব্যসিংহ-কবিরাজকে গোবিন্দ-কবিরাজের পুত্র দিব্যসিংহ-কবিরাজ ধরিয়া আলোচনা করিয়াছেন এবং তাঁহার তনয় সম্বন্ধে তথ্য প্রদান করিয়াছেন :—বৃহৎ শ্রীবৈষ্ণব চরিত অভিধান, অমূল্যধন রায়ভট্ট ; বৈ. দি. (পৃ. ৯৪) ; গৌ. জী ; বা. সা. ই. (পৃ. ৫৪৫) ; HBL—pp. 215, 216, 217, 218 : প. ক. (প.)—পৃ. ৮৬-৮৮ (৯৭) HBL—p 184 (৯৮) ২০ শ. বি., পৃ. ৩৬০ (৯৯) ২য়. নি., পৃ. ২৬ (১০০) ২৩৮২ (১০১) গৌ. ত.—পৃ. ৩৪৩ (১০২) ন. বি.—১১শ. বি., পৃ. ১৭৭-৭৮ (১০৩) HBL—pp. 75, 405

বীর-হাম্বীর

বীর-হাম্বীরের রাজত্বকাল লইয়া মতভেদ দৃষ্ট হয়। L. S. S. O. Malley-কৃত 'Bengal District Gazetteers, Bankura' হইতে জানা যায়, "The reign of Bir Hambir fell between 1591 and 1616." 'The Annals of Rural Bengal'-গ্রন্থে W. W. Hunter লিখিয়াছেন, "He was born in 868 and succeeded in 881 Bishenpore era (A.D. 1596). He reigned 26 years." এই স্থলে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। ১৯০৩-৪ খ্রী.-এর Archaeological Survey of India-এর Annual Report-এ ব্লক সাহেব লিখিয়াছেন, "From the fact that in one of the temple inscriptions the Malla year 1064 corresponds to the Saka year 1680." ইহা সত্য হইলে [১৬৮০-১০৬৪ =] ৬১৬ শক বা ৬৯৪ খ্রী. হইতেই মল্লাব্দের আরম্ভ বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়। কিন্তু এই সম্বন্ধে অন্য কোনও প্রমাণ না থাকায় এইরূপ অব্দ-নির্ণয় সঠিক কিনা জানা সম্ভব ছিল না। সেইজন্য ১৯২১খ্রী.-এ অভয়পদ মল্লিক মহাশয় তাঁহার 'History of the Bishnupur Raj'-নামক গ্রন্থ-প্রণয়নের সময় ব্লক-সাহেব-উল্লেখিত তারিখটির উপর পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ১৯২৭ খ্রী-এর 'Indian Historical Quarterly'-র তৃতীয় খণ্ডে মহা-মহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এশিয়াটিক সোসাইটির ১০,৮১৬ নং পুথির প্রমাণবলে স্থির করেন যে ৬১৬ শক বা ৬৯৪ খ্রী. হইতেই মল্লাব্দ আরম্ভ হয়। অব্যবহিত পরেই ডা. সুশীল কুমার দে মহাশয়ও শাস্ত্রীমহাশয়-প্রদত্ত সম্পূর্ণ পৃথক একখানি পুথির প্রমাণ বলে ঐ পত্রিকা মারফত একই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত ৪৪১৮ নং পুথিখানির সমাপ্তি তারিখও 'শকাব্দা ১৬৮৮॥ মল্লাব্দে সন ১০৭২ সাল তারিখ॥ ৮ ফাল্গুন মঙ্গলবার॥' ইহা হইতেও নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হইতেছে যে [১৬৮৮-১০৭২ =] ৬১৬ শক বা ৬৯৪ খ্রী. হইতেই মল্লাব্দের গণনা আরম্ভ হয়। এই হিসাব অনুযায়ী, উপরোক্ত হান্টার-সাহেবের বিষ্ণুপুর সন যদি মল্লাব্দকে বুঝাইয়া থাকে, তাহাহইলে তদ্বর্ণিত ৮৮১ অব্দ সমান ১৫৭৫ খ্রী. হয় এবং বীর-হাম্বীরের রাজত্বকালকে ১৫৭৫ খ্রী. হইতে ১৬০১ খ্রী. পর্যন্ত ধরিতে হয়। আবার ১৩২৯ সালের 'বংগবাণী পত্রিকা'র অগ্রহায়ণ-সংখ্যায় সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায় মহাশয় লিখিয়াছিলেন, "বিষ্ণুপুর রাজ-পরিবারে রক্ষিত মল্লরাজগণের বংশপত্র হইতে জানা যায় যে, বীর-হাম্বীর ৮৯৩ মল্লাব্দ বা ১৫৮৭ খ্রী. অব্দ হইতে ৯২৫ মল্লাব্দ বা ১৬১৯ খ্রী. অব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।" এদিকে আবুল ফজলের 'আকবরনামা' হইতে জানা যাইতেছে যে

১৫৯০ খ্রী.-এর শেষভাগে বিহারে শান্তিস্থাপন করিবার পর রাজা মানসিংহ ঝাড়খণ্ড-পথে উড়িষ্যা-বিজয়ে বাহির হইয়া ১৫৯১ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে বর্ধমানের অন্তর্গত জাহানাবাদে শিবির-স্থাপন করেন এবং স্বীয় পুত্র জগৎসিংহকে কতলুখাঁর বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলে জগৎসিংহ যুদ্ধক্ষেত্রে বাহাদুর কুরুর সম্মুখীন হন। কিন্তু এই সময়ে 'Though the landholder Hamir warned Jagat of Bahadur's craft and of the dispatch of an army to his assistance, he did not accept the news.' ফলে জগৎসিংহের পরাজয় ঘটে। কিন্তু "Hamir brought away the infatuated young man and took him to his quarters at Bishnupur. A report arose that he was killed." উল্লেখযোগ্য যে 'আকবরনামা'-প্রদত্ত বিখ্যাত ঐতিহাসিক ঘটনাটির সহিত বীর-হাম্বীরের রাজত্বকাল সম্বন্ধে পূর্বোক্ত বিবরণগুলির কাহারও বিরোধ ঘটিতেছে না। আবার আমরা শ্রীনিবাস-আচার্যের জীবনী মধ্যে দেখিয়াছি যে যেইবার শ্রীনিবাস বিষ্ণুপুরে গিয়া বীর-হাম্বীর ও তাঁহার পরিবারবর্গকে দীক্ষাদান করিয়াছিলেন, সেইবারই তাঁহার ব্যবস্থায় পঞ্চকুটের রাজা হরিনারায়ণও ত্রিমল্ল-তনয় কর্তৃক দীক্ষিত হন। নিখিলনাথ রায় মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধ মধ্যে জানাইয়াছেন, "পঞ্চকুট রাজগণের বংশপত্রে তিনি ১৫১১ শক বা ১৫৮৯ খৃ. অব্দ হইতে ১৫৪৭ শক বা ১৬২৫ খৃ. অব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া লিখিত আছে।" এই স্থলেও আমরা পূর্ব-প্রদত্ত রাজত্ব-কালগুলির মধ্যে কোনও বিরোধ দেখিতে পাই না। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও আমরা বীর-হাম্বীরের সিংহাসনারোহণের যথার্থ অব্দটি সম্বন্ধে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছাইতে পারি না। কিন্তু তাহাতে বর্তমান ক্ষেত্রে বড় বেশি যায় আসে না। ১৫৮৯ খ্রী. (হরিনারায়ণের রাজ্য প্রাপ্তিকাল) হইতে ১৬০১ খ্রী. (হাম্বীরের রাজত্ব-সমাপ্তির প্রথম সীমা) পর্যন্ত তিনি যে সিংহাসনারূঢ় ছিলেন, তাহা বোধহয় নিশ্চয় করিয়া বলা চলে। তবে নিখিলনাথ রায় মহাশয় দেখাইয়াছেন যে এ বিষয়ে মল্লরাজগণের বংশপত্রধৃত তারিখগুলিই গ্রহণযোগ্য। কিন্তু পূর্বোক্ত Archaeological Survey of India হইতে জানা যাইতেছে যে বিষ্ণুপুরের 'মল্লেশ্বর'-নামক প্রাচীন মন্দিরটি স্বয়ং বীরসিংহ (=বীর-হাম্বীর) কর্তৃক ৯২৮ মল্লাব্দে (=১৬২২ খ্রীষ্টাব্দে) নির্মাপিত হইয়াছিল। ইহা সত্য হইলে আমরা বীর-হাম্বীরের রাজত্বকালকে ১৬২২ খ্রী. পর্যন্ত দীর্ঘায়িত বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি! কিন্তু বীর-হাম্বীরের রাজত্বকাল মধ্যেই মন্দিরটির নির্মাণ-কার্য শেষ হইয়াছিল কিনা জানা যায় না। সুতরাং মল্লরাজগণের বংশপত্রধৃত যে তারিখটি সম্বন্ধে নিখিলনাথ রায় মহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার উপর নির্ভর করিয়া ১৭১৯ খ্রীষ্টাব্দকে বীর-হাম্বীরের রাজ্যকালের শেষ সীমা বলিয়া ধরিয়া লওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

বীর-হাম্বীরের পিতৃনাম সম্বন্ধে রায় মহাশয় আরও একটি বিষয় উল্লেখ করিয়াছিলেন—

"Bengal District Gazetteers, Bankura-য় ধাড়িমল্লের স্থলে ধাড়ি-হাম্বীর লিখিত আছে। ধাড়ি-হাম্বীর বীর-হাম্বীরের পিতা নহেন, পুত্র,—ধাড়িমল্লই তাঁহার পিতা।" পরবর্ত্তী আলোচনাতেও আমরা ধাড়ি-হাম্বীরকে বীর-হাম্বীরের পুত্ররূপে দেখিতে পাইব। Gazetteers হইতে জানা যায়, "Bir Hambir is said to have been succeeded by Raghunath Singh, the first of the line to assume the Khattriya title of Singh...The next prince was Bir Singh, who is said to have built the present fort."

বৈষ্ণবগ্রন্থগুলি হইতে কিন্তু বীর-হাম্বীরের রাজত্বকাল সম্বন্ধে কোনও সঠিক সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় না। ঐ সকল গ্রন্থ হইতে বীর-হাম্বীর সম্বন্ধে নিম্নোক্ত বিবরণগুলি পাওয়া যায়।

বনবিষ্ণুপুরের রাজা-হাম্বীর বীর-হাম্বীর নামে বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার মহিষীর নাম ছিল সুলক্ষণা।[১] রাজা-হাম্বীরের পুত্রের নাম ছিল ধাড়ি-হাম্বীর। ইঁহারা সকলেই শ্রীনিবাস-আচার্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন।[২] হাম্বীর-রচিত কয়েকটি পদের সন্ধান পাওয়া যায় বটে ;[৩] কিন্তু তাই বলিয়া তিনি যে একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি ছিলেন, তাহা মনে হয় না। শ্রীনিবাসের নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তিনি যে ভক্তিমান বৈষ্ণব হইতে পারিয়াছিলেন, তাহার জন্যই তিনি বৈষ্ণব গ্রন্থ মধ্যে স্মরণীয় হইয়া আছেন।

প্রকৃতপক্ষে, হাম্বীর প্রথমে ধর্মনিষ্ঠ নৃপতি ছিলেন না। বৈষ্ণব গ্রন্থগুলিতে আমরা প্রথম তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করি শ্রীনিবাস-আচার্যের প্রথমবার বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমন কালে সেই সময় শ্রীনিবাসাদি গোস্বামিগ্রন্থাদি লইয়া বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে হাম্বীরের রাজধানী বনবিষ্ণুপুরের নিকট পৌঁছাইলে রাজার গুপ্তচর-বৃন্দ তাঁহাদের শকট-বাহিত গ্রন্থপূর্ণ-সম্পুটকে অর্থরত্নাদিপূর্ণ সম্পুট সিদ্ধান্ত করিয়া রাজার নিকট সেই সুসংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। রাজাও প্রলুব্ধ হইয়া দস্যুগণকে উহা অপহরণ করিয়া আনিবার আজ্ঞাদান করেন। ইতিমধ্যে শ্রীনিবাসাদি তামড়গ্রাম, মালিয়াড়া ও রঘুনাথপুর[৪] অতিক্রম করিয়া গোপালপুরে[৫] গিয়া রাত্রিযাপন করিতেছিলেন। গভীর রাত্রিতে দস্যুবৃন্দ গোপালপুরে হাজির হইল। রাজার পূর্বাদেশ-অনুযায়ী তাহারা কাহারও গায়ে হস্তক্ষেপ করে নাই বটে, কিন্তু একবারে গাড়ী সমেত সমস্ত কিছু লইয়া তাহারা বনে প্রবেশ করিল এবং যথাকালে রাজসমীপে গিয়া অপহৃত বস্তু অর্পণ করিল। কিন্তু গ্রন্থ-সম্পুট খুলিয়া রাজা আশ্চর্যান্বিত হইয়া গেলেন। পবিত্র গ্রন্থগুলিকে অর্থাদি

(১) প্রে. বি.—২০শ. বি., পৃ. ৩৪৯ ; ভ. র.—৯।২৭০ (২) প্রে. বি.—২০শ. বি., পৃ. ৩৪৯ (৩) প. ক.—২৩৭৮ ; কর্ণ.—১ম. নি.—পৃ. ১৮ ; ভ. র.—৯।২৮৯, ২৯৩ (৪) ভ. র.—৭।৪৬-৪৭ (৫) প্রে. বি.—১৩শ. বি., পৃ. ১৬৫-৬৬

ভ্রমে চুরি করিয়া আনায় তাঁহার নিজেকে অপরাধী মনে হইতে লাগিল।[৬] রাজমহিষী[৭] প্রভৃতিও সেই অমূল্য গ্রন্থরাজি দেখিয়া বিচলিত হইলেন। কিন্তু ঘটনা তখন বহুদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। রাজার দস্যুবৃত্তির শুভাশুভ-নির্ণয়কারী সুযোগ্য গণক ইতিপূর্বে ঘোষণা করিয়াছিল যে যাত্রীদিগের শকট-বাহিত সিন্দুকে 'অমূল্য রতন'[৮] রক্ষিত ছিল। রাজাও গ্রন্থগুলিকে অমূল্য-সম্পদ মনে করিয়া সেইগুলিকে সযত্নে গৃহাভ্যন্তরে সুরক্ষিত করিলেন।

এদিকে নরোত্তম ও শ্যামানন্দকে দেশে পাঠাইয়া দিয়া শ্রীনিবাস গ্রন্থ-সন্ধানে ভ্রমণ করিতে করিতে দেউলি গ্রামস্থ শ্রীকৃষ্ণবল্লভ-চক্রবর্তী নামক এক বিপ্রের আলয়ে[৯] আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণবল্লভ শ্রীনিবাসের সহিত কথাবার্তায় এবং তাঁহার পাণ্ডিত্য দেখিয়া আকৃষ্ট হইলেন। একদিন রাজার সম্বন্ধে কথা উঠিলে তিনি শ্রীনিবাসকে জানাইলেন যে মল্লপাটের রাজা[১০] বীর-হাম্বীর কিছুদিন পূর্বে 'দুই গাড়ী মারি ধন লুটিয়া আনিল।' তিনি আরও জানাইলেন যে রাজসভায় ভাগবতপাঠ হয় এবং তিনি নিজেও মধ্যে মধ্যে পাঠ শুনিয়া আসেন; শ্রীনিবাসও একদিন কৃষ্ণবল্লভের সহিত ভাগবতপাঠ শুনিতে গেলেন। কিন্তু রাজপণ্ডিতের ভ্রান্ত-ব্যাখ্যা শুনিয়া তিনি অনুযোগ উত্থাপন করিলে পণ্ডিত রুষ্ট হইয়া উঠেন। শ্রীনিবাসের আকৃতি ও কথাবার্তা রাজার উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছিল। তিনি শ্রীনিবাসকে 'ভ্রমরগীতা'[১১] পাঠ করিয়া শুনাইতে বলিলেন। শ্রীনিবাসের পাঠ শুনিয়া 'রাজার পাঠক ব্যাস-চক্রবর্তী' সহ সভাস্থ সকলে চমৎকৃত হইলেন।

রাজা-হাম্বীর অবিলম্বে শ্রীনিবাসের জন্য বাসার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন এবং স্বয়ং তাঁহার নিকট গিয়া তাঁহার পরিচয়াদি প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার চরণে প্রণত হইলেন। স্বীয় অপরাধের জন্য তাঁহার হৃদয় অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। তিনি শ্রীনিবাসের জন্য সুরম্য স্থানে একটি পৃথক বাসার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন এবং তাঁহাকে গ্রন্থ-সম্পুটের নিকট লইয়া গেলেন। তিনি গৃহাভ্যন্তরে গেলে রাজমহিষী তাঁহার দর্শনলাভ করিয়া কৃতার্থ বোধ করিলেন এবং শ্রীনিবাস তাঁহাকেও কৃপা করিলেন।

'প্রেমবিলাস'-কার বলেন[১২] যে এই ঘটনার পরেই শ্রীনিবাস রাজাকে 'মহামন্ত্র হরিনাম করিল প্রদান' এবং দিন স্থির করিয়া 'আষাঢ়ের কৃষ্ণপক্ষ তৃতীয়া দিবসে' তাঁহাকে 'রাধাকৃষ্ণ-মন্ত্র দিল ধ্যানাদিক যত।' গ্রন্থকার আরও বলেন যে শ্রীনিবাস

---

(৬) তু.—ন. বি—২য়. বি., পৃ. ৩৫ (৭) ভ. র.—৭।৯৮ (৮) ঐ—৭।৮৬ (৯) প্রে. বি.—১৩শ. বি., পৃ. ১৭৩-৭৪ ; ২০শ. বি., পৃ.৩৫০ ; কর্ণ.—১ম. নি., পৃ. ১৭-১৮ ; ভ. র.—৭।১৩৩-৩৪ (১০) প্রে. বি.—১৩শ. বি., পৃ. ১৭৩ ; কর্ণ.—১ম. নি., পৃ. ১৬ (১১) ভ. র.—৭।১৪৬ ; তু—কর্ণ.—১ম. নি., পৃ. ১৫ (১২) ১৩শ. বি., পৃ.১৮০-৮১ ; ২০শ. বি., পৃ.৩৪৯

'রাজারে দিলেন নাম হরিচরণ দাস' এবং তিনি রাজার সভাপণ্ডিত ব্যাস-চক্রবর্তীকেও দীক্ষাদান করিয়া 'ব্যাস আচার্য' নাম প্রদান করেন। কিন্তু 'অনুরাগবল্লী'[১৩] ও 'ভক্তি-রত্নাকর' হইতে জানা যায় যে শ্রীনিবাস রাজরাণী প্রভৃতিকে দীক্ষাদান করেন তাঁহার দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে। শ্রীনিবাসের প্রথম ও দ্বিতীয় বারের বৃন্দাবন-গমন এবং তৎসংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী সম্বন্ধে 'প্রেমবিলাসে'র বর্ণনাগুলিতে ঠিক সময়-ক্রম রক্ষিত হয় নাই।[১৪] 'কর্ণানন্দে'র বর্ণনাও[১৫] অস্পষ্টতা-দোষদুষ্ট। এ বিষয়ে 'ভক্তি-রত্নাকরে'র বর্ণনা অধিকতর নির্ভরযোগ্য বলিয়া অনুমতি হয়। তদনুযায়ী জানা যায়[১৬] যে প্রথমবারে শ্রীনিবাস রাজাকে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পদে' সমর্পণ করেন এবং নাম-সংকীর্তনের উপদেশ দিয়া 'হরিনাম মহামন্ত্র কৈল উপদেশ'। তিনি তাঁহাকে আরও জানাইলেন যে হাম্বীর 'গোসাঞির গ্রন্থাস্বাদ' করিলে তিনি তারপর তাঁহাকে 'রাধকৃষ্ণ-মন্ত্রে দীক্ষা' দান করিবেন। কিন্তু এইবারে দীক্ষাগ্রহণ না করিলেও 'গোষ্ঠীর সহিত রাজা' শ্রীনিবাস-চরণে বিক্রীত হইয়া রহিলেন। 'শ্রীকৃষ্ণবল্লভ ব্যাস আদি সর্বজন'ও 'আচার্যের পাদপদ্মে লইলা শরণ।'

বীর-হাম্বীর বহুবিধ দ্রব্যে গ্রন্থ[১৭]-শকটগুলি পূর্ণ করিয়া বৃন্দাবনে প্রেরণ করিলেন এবং নরোত্তমকে সংবাদ দেওয়ার জন্যও খেতুরিতে লোক পাঠাইয়া দিলেন। তারপর কিছু কাল পরে শ্রীনিবাস-আচার্য স্বীয় জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্তন করিতে চাহিলে তিনি তাঁহার গমনের সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ব্যাসাচার্য এবং কৃষ্ণবল্লভও শ্রীনিবাসের সহিত যাত্রা করিয়া[১৮] শ্রীখণ্ড হইয়া যাজিগ্রামে পৌছাইলেন। অল্পকালের মধ্যে নীলাচল হইতে প্রত্যাগত নরোত্তম যাজিগ্রামে আসিলে তাঁহার সহিত ব্যাসাচার্য ও কৃষ্ণবল্লভের পরিচয় ঘটিল।[১৯] ব্যাসাচার্যের সহিত রামচন্দ্র-কবিরাজেরও পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠতা হইয়া গেল।[২০] শ্রীনিবাসের সম্মুখে উভয়ের মধ্যে নানাবিধ শাস্ত্রালোচনা হইল। এদিকে রাজ-প্রেরিত লোক মারফত জীব-গোস্বামী হাম্বীরের নিকট পত্র[২১] পাঠাইলে তাহাতে তাঁহার অপার করুণার পরিচয় পাইয়া রাজা চৈতন্যভক্তের প্রতি অধিকতর অনুরাগী হইলেন। জীব প্রেরিত শ্রীনিবাসের পত্রটি তিনি অবিলম্বে যাজিগ্রামে পাঠাইয়া দিলেন।

কিছুকাল পরে শ্রীনিবাস পুনরায় বৃন্দাবনে গেলে 'ব্যাস আচার্য ঠাকুর'ও বৃন্দাবনে গিয়া জীবের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু জীব-গোস্বামী তাঁহাকে

---

(১৩) ৬ষ্ঠ. ম., পৃ. ৪১ (১৪) দ্র.—শ্রীনিবাস (১৫) কর্ণ.—১ম. নি., পৃ.১৮-১৯ (১৬) ৭।২০৫-১৪ (১৭) গ্রন্থগুলি তারপর কোথায় গেল, সে-সম্বন্ধে কিন্তু আর কেহ কোন কথা বলেন নাই। (১৮) প্রে. বি.—১৩শ. বি., পৃ. ১৮৪ (১৯) ন. বি.—৪র্থ. বি., পৃ. ৬৩ (২০) প্রে. বি.—১৪শ. বি., পৃ. ১৮৯-৯০ (২১) ভ. র.—৯।২০

শ্রীনিবাসের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবার জন্যই নির্দেশ দান করিয়া[২২] 'আপনে সাক্ষাৎ থাকি সেবক করাইল'। তারপর শ্রীনিবাসের বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনের সময় ব্যাসাচার্য রামচন্দ্র-কবিরাজ এবং শ্যামানন্দ একত্রে প্রত্যাবর্তন করিয়া বিষ্ণুপুরে হাম্বীরের সহিত সাক্ষাৎ করেন।[২৩] রাজা এইবার রামচন্দ্র এবং শ্যামানন্দের সহিতও পরিচিত হওয়ায় নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করিলেন। কয়েকদিন পরে শ্যামানন্দের উৎকল-গমনকালে নানাবিধ দ্রব্য-সামগ্রী উপহার দিয়া তিনি তাঁহাকে বিদায় দিলেন। কিন্তু শ্রীনিবাস-আচার্য এইবারে রাজার ভক্তিভাবের যথেষ্ট পরিচয় পাইয়া এবং তাঁহার 'ভক্তিগ্রন্থে অধিকার' দেখিয়া তাঁহাকে 'রাধাকৃষ্ণ মন্ত্রে' দীক্ষিত করিলেন এবং জানাইলেন যে স্বয়ং জীব-গোস্বামী রাজার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহার নাম রাখিয়াছেন চৈতন্যদাস।[২৪] ক্রমে শ্রীনিবাস রাণী-সুলক্ষণাকে দীক্ষাদান করিলেন।

১৩৪২ সালের 'ভারতবর্ষ'-পত্রিকার আষাঢ় সংখ্যায় হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয় জানাইয়াছিলেন, "শ্রীনিবাস-শিষ্য সুপ্রসিদ্ধ মল্লরাজ বীর-হাম্বীরের ছয় রাণী ছিলেন।" কিন্তু হান্টার সাহেবের **The Annals of Rural Bengal (p. 445)** হইতে জানা যাইতেছে যে **'This king had four wives and twenty two sons.** রাণী-সুলক্ষণা সম্ভবত বীর-হাম্বীরের প্রধানা মহিষী ছিলেন। কারণ তাঁহাকে কোথাও কোথাও পট্টদেবীও (পাটরাণী) বলা হইয়াছে।[২৫] 'মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী'-গ্রন্থ হইতেও জানা যায় (পৃ. ৩২) যে 'বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাদের প্রধান মহিষীর উপাধি ছিল শ্রীশ্রী চূড়ামণি পট্টমহাদেবা।' যাহাহউক, রাণী সুলক্ষণার দীক্ষাগ্রহণের পর রাজপুত্র ধাড়ি-হাম্বীরও[২৬] শ্রীনিবাস কর্তৃক দীক্ষিত হইয়া

শ্রীকালাচাঁদের সেবা করিলা প্রকাশ ॥
শ্রীআচার্য প্রভু তাঁর করে অভিষেক।

পরে অবশ্য স্বয়ং জীব-গোস্বামী ধাড়ি-হাম্বীরের নাম পরিবর্তন করিয়া গোপালদাস রাখিয়াছিলেন।[২৭] ইনি সম্ভবত একজন পদকর্তা ছিলেন। ধাড়ি-হাম্বীর-ভণিতায় শ্রীনিবাস-প্রশস্তিমূলক একটি মিশ্র সংস্কৃত ভাষার পদ পাওয়া যায়।[২৮]

(২২) অ. ব.—৬ষ্ঠ. ম., পৃ. ৪০ (২৩) ঐ—পৃ. ৪১ ; ভ. র.—৯।৩০ (২৪) প্রে. বি.—২০শ. বি., পৃ. ৩৪৯ ; ভ. র.—৯।২৬৬ ; কর্ণামৃত-কার (১ম. নি., পৃ. ২১) বলেন :

রাজার পরমার্থ শুনি শ্রীজীব গোসাঞি।
নাম শ্রীগোপাল দাস থুইলা তথাই ॥

(২৫) কর্ণ.—১ম. নি., পৃ. ১৮-১৯ (২৬) অ. লী.-গ্রন্থে (পৃ. ১৪৯) লিখিত হইয়াছে যে শ্রীনিবাসের সহিত পরিচয়কালে রাজা (বীর-হাম্বীর) নিঃসন্তান ছিলেন। কিন্তু অন্য কোথাও ইহার সমর্থন নাই। (২৭) ভ. র.—১৪।১৫ (২৮) HBL— p. 407

মল্লরাজবংশ এইভাবে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হয়। অভয়পদ মল্লিক মহাশয় লিখিতেছেন (History of the Vishnupur Raj—p 40), "Tradition tells us that the Malla Kings were such extreme Shaktas that they were in the habit of offering human sacrifices before Mrinmoyee. But the introduction, or rather, the revival of Vaishnavism by Shrinibas turned the tide for ever in favour of civilisation and humanity." এইভাবে সবংশে দীক্ষিত হইয়া রাজা-হাম্বীর শ্রীনিবাসের জন্য 'বিষ্ণুপুর মধ্যে এক বাড়ী করি দিলা'[২৯] এবং তাঁহাকে 'গ্রামভূমি সামগ্রী' প্রভৃতি দিয়া[৩০] তাঁহার বিষ্ণুপুর-বাসের সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। এই সময় রাজা-হাম্বীর সবদাই শ্রীনিবাসের ধ্যান করিতে থাকিতেন এবং 'কর্ণানন্দ' ও 'ভক্তিরত্নাকর' হইতে জানা যায় যে এই সময়ে রাণী-সুলক্ষণা একদিন তাঁহাকে স্বপ্নাবিষ্টভাবে শ্রীনিবাস-প্রশস্তিমূলক পদ পাঠ করিতেও শুনিয়াছিলেন।[৩১] পূর্বেই বলা হইয়াছে যে বীর-হাম্বীর একজন পদকর্তাও ছিলেন কিন্তু 'বীর-হাম্বীর' এবং 'চৈতন্যদাস' এই উভয় ভণিতাতেই তিনি পদরচনা করিয়াছেন।[৩২]

রাজার দৃষ্টান্তেই এই সময় বিষ্ণুপুরের আরও অনেক ব্যক্তি শ্রীনিবাসের নিকট দীক্ষা-গ্রহণ করেন।[৩৩] বনবিষ্ণুপুরবাসী[৩৪] ব্যাসাচার্যও রাজার মত সবংশে দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নীর নাম ছিল ইন্দুমুখী ও পুত্রের নাম শ্যামদাস-চক্রবর্তী[৩৫] বা শ্যামদাস-আচার্য[৩৬] এবং সম্ভবত তাঁহার কন্যার নাম ছিল কনকপ্রিয়া। তাঁহাদের কেহ কেহ খুব সম্ভবত এই সময়েই শ্রীনিবাসের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন। 'কর্ণানন্দে' কনকপ্রিয়াকে সম্ভবত গতি-গোবিন্দের শিষ্যভুক্ত করা হইয়াছে।[৩৭] ব্যাসাচার্য ও তাঁহার পুত্র শ্যামদাস উভয়েই বৈষ্ণব হিসাবে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন। এমন কি বৃন্দাবন হইতে জীব-গোস্বামীও পত্র মারফত রাজা-হাম্বীর, ধাড়ি-হাম্বীর এবং তাঁহাদের সংবাদ জানিতে চাহিয়া পত্র পাঠাইতেন।[৩৮] পরবর্তিকালে শ্রীনিবাসের নিকট জীবের লিখিত একটি পত্র হইতে জানা যায়[৩৯] যে শ্যামদাস-আচার্য বৃন্দাবন হইতে শোধিত 'বৈষ্ণবতোষণী' 'দুর্গমসঙ্গমনী' ও 'গোপালচম্পূ' গ্রন্থ লইয়া আসিয়াছিলেন। পত্রমধ্যে

(২৯) তু.—অ. ব.—৬ষ্ঠ. ম., পৃ. ৪১ (৩০) প্রে. বি.—১৬শ. বি., পৃ. ২৩৬ (৩১) ভ. র.—৯।২৮৩ ; কর্ণ.—১ম. নি., পৃ. ১৯ (৩২) ভ. র.—৯।২৯৩, ২৯৮ (৩৩) অ. ব.—৬ষ্ঠ. ম., পৃ. ৪১ ; ভ. র.—৯।৩০০ ; তু.—কর্ণ.—১ম. নি., পৃ. ২২ (৩৪) প্রে. বি.—২০শ. বি., পৃ. ৩৪৯ (৩৫) ঐ ; কর্ণ.—১ম. নি., পৃ. ২২ (৩৬) প্রে. বি.—অর্ধ. বি., পৃ. ৩০৫, ৩০৮ ; অ. ব.—৭ম. ম., পৃ. ৪৪ ; ভ. র.—১৪।২৩ (৩৭) ২য়. নি., পৃ. ২৮ (৩৮) প্রে. বি.—অর্ধ. বি., পৃ. ৩০৪ ; ভ. র.—১৪।২১, ২৩, ২৫ (৩৯) প্রে. বি.—অর্ধ. বি., পৃ. ৩০৫

জীব জানাইতেছেন যে শ্রীনিবাস যেন তাঁহার 'পরমার্থ সহৃদয় পণ্ডিত বর্য' শ্যামদাসের সহিত স্নেহসহকারে 'ভগবদ্ভক্তি বিচার' করেন। আর একটি পত্রে তিনি গোবিন্দ-কবিরাজকে জানাইতেছেন যে শ্যামদাস মৃদঙ্গিয়ার দ্বারা 'বৃহদ্ভাগবতামৃত' গ্রন্থখানি প্রেরিত হইয়াছে।[৪০] এই শ্যামদাস ব্যাস-নন্দন শ্যামদাস-আচার্য কিনা জানা যায় না। শ্যামদাস-ভণিতার ব্রজবুলি পদগুলিতে 'ব্রজভাখা'র প্রভাব থাকায় ডা. সুকুমার সেন অনুমান করেন যে ঐ পদগুলি ব্যাস-পুত্র শ্যামদাসের রচিত, কারণ এই শ্যামদাসের পক্ষেই বৃন্দাবনে গিয়া শিক্ষাগ্রহণ করার সম্ভাবনা অধিক ছিল। আমরাও পূর্বেই এই শ্যামদাস 'সহৃদয় পণ্ডিত বর্যে'র সহিত বৃন্দাবন-গোস্বামীদিগের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের পরিচয় পাইয়াছি।

শ্রীনিবাসের বিদায়কালে হাম্বীর তাঁহার সহিত যাত্রা করিতে চাহিলেন। কিন্তু গুরু-নিদেশে তাঁহার যাওয়া হয় নাই। তিনি শ্রীনিবাসের সহিত বহুবিধ দ্রব্য সামগ্রী পাঠাইয়া দিলেন। ব্যাসাচার্য কিন্তু শ্রীনিবাসের সঙ্গী-রূপে তাঁহার সহিত বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করিবার পর খেতুরি-উৎসবে আসিয়া বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন।[৪১] শ্রীনিবাসের প্রথম আশ্রয়দাতা কৃষ্ণবল্লভও সম্ভবত খেতুরি-উৎসবে উপস্থিত হইয়াছিলেন।[৪২]

খেতুরি-উৎসবান্তে জাহ্নবাদেবীর বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমনের পরে শ্রীনিবাস নরোত্তম এবং রামচন্দ্র-কবিরাজ নবদ্বীপ-পরিক্রমা শেষ করিয়া যাজিগ্রামে ফিরিয়া আসিলে হাম্বীরও যাজিগ্রামে পৌছান।[৪৩] গ্রামের বাহিরে 'অশ্ব-গজ-পদাতিক-আদি' রাখিয়া তিনি কয়েকজন সঙ্গী-সহ শ্রীনিবাসের গৃহে আসিয়া[৪৪] তাঁহার চরণে বহুবিধ দ্রব্যসামগ্রী নিবেদন করিলেন এবং নরোত্তম রামচন্দ্রকেও প্রণতি জানাইলেন। নরোত্তমের সহিত এই

(৪০) প্রে. বি.—অর্ধ. বি., পৃ. ৩০৮ (৪১) প্রে. বি.,—১৪ শ. বি., পৃ. ২০০-২০৮; ১৯ শ. বি., পৃ. ৩০৮; ন.বি.—৬ষ্ঠ. বি.,পৃ. ৭৬-৭৭, ৮৭; ৮ম. বি., পৃ. ১২০; ভ. র.—১০।১৩৪ (৪২) প্রে. বি.—১৯ শ. বি., পৃ. ৩০৮; এই গ্রন্থের বর্ণনায় (পৃ. ৩১২) খেতুরি-উৎসবে একজন বল্লভকে দেখা যায়। ইনি কৃষ্ণবল্লভ কিনা জানা যায় না। (৪৩) ভ. র.—১২।২১; আধুনিক বৈ. দি.(পৃ. ১০২)-মতে রাজা-হাম্বীর আরও একবার যাজিগ্রামে আসেন। শ্রীনিবাসের মাতৃশ্রাদ্ধে যাইবার কালে তখন বীর-হাম্বীর বীরভুম পরগণার বৃষভানুপুরে এক ব্রাহ্মণ-গৃহে রাত্রিযাপনকালে ব্রাহ্মণ-সেবিত মদনমোহন-বিগ্রহ দেখিয়া আকৃষ্ট হন। যাজিগ্রাম হইতে ফিরিবার পর তিনি স্বপ্নাদেশে শ্রীবিগ্রহ লইয়া বিষ্ণুপুরে আসিলে ব্রাহ্মণ শোকাভিভূত হইয়া বিষ্ণুপুরে আসেন। ঠাকুর তাঁহাকে স্বপ্নে বলেন যে তিনি দিবাভাগে বিষ্ণুপুরে এবং নিশাকালে বৃষভানুপুরে থাকিবেন। কয়েক বৎসর পরে হাম্বীরের ইচ্ছায় বিষ্ণুপুরে খেতুরির ন্যায় একটি মহোৎসব সংঘটিত হয়। তদুপলক্ষে মদনমোহন ও তিনশত আশী বিগ্রহ লইয়া রাসমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। "মল্লবংশের শেষ রাজা চৈতন্যসিংহ নানাকারণে ঋণগ্রস্ত হইয়া স্বপ্নাদেশে ১৭৯৫ খ্রীঃ-এ কলিকাতা বাগবাজারের গোকুল মিত্রের নিকট লক্ষাধিক টাকায় এই বিগ্রহ আবদ্ধ রাখেন। তদবধি মদনমোহন বাগবাজারে অধিষ্ঠিত আছেন।" (৪৪) ভ. র.—১৩।৩৮

তাঁহার প্রথম মিলন ঘটিল, তারপর 'রাজা অতি দীনপ্রায় সর্বত্র ভ্রমণ' করিয়া বৈষ্ণব মহান্তবৃন্দের আশীর্বাদ লাভ করিলেন। এইসময় বৃন্দাবনের উদ্দশ্যে জাহ্নবা-প্রেরিত রাধিকা-বিগ্রহ লইয়া ভক্তবৃন্দ কণ্টকনগরে পৌঁছাইলে তিনি তাঁহাদের জন্য গোপনে রামচন্দ্র-কবিরাজের মারফত সহস্র মুদ্রা পাঠাইয়া দিলেন। এইভাবে বেশ কিছুকাল যাজিগ্রামে কাটাইয়া রাজা হাম্বীর বিদায় গ্রহণ করিলেন। রাজমহিষীও রাজার সহিত যাজিগ্রামে আসিয়াছিলেন। তিনি শ্রীনিবাস-পত্নীকে বহুবিধ বস্ত্র-অলংকারাদি প্রদান করিয়া এবং তাঁহার চরণসেবা করিয়া চতুর্দোলায় আরোহণ করিলেন। রাজা কিন্তু বহুদূর পর্যন্ত পদব্রজে গিয়া তারপর যথাযোগ্যে যানে আরোহণ করিলেন। তাঁহার বিষ্ণুপুরে পৌঁছাইবার কিছুকাল পরেই শ্রীনিবাসও সেইস্থানে পৌছান। এইবারে শ্রীনিবাস বিষ্ণুপুরে থাকিয়া দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিলে রাজা-হাম্বীর সেই বিবাহে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন।

ইহার পরে হাম্বীর সম্বন্ধে আর বিশেষ কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। 'প্রেমবিলাস'-মতে[৪৫] খেতুরিতে একবার এক মহাসভার অধিবেশন হইলে 'রাজা বীর-হাম্বীর কৃষ্ণবল্লভ ব্যাস' তাহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। এই সংবাদ সত্য কিনা বলিতে পারা যায় না। আবার বৃন্দাবনদাসের নামে প্রচলিত 'নিত্যানন্দপ্রভুর-বংশবিস্তার' বা '-বংশমালা' এবং শ্রীনিবাস-পুত্র গতি-গোবিন্দের নামে প্রচলিত 'বীররত্নাবলী' নামক গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে[৪৬] যে নিত্যানন্দ-পুত্র বীরচন্দ্র একবার বিষ্ণুপুরে গিয়া বীর-হাম্বীরের নিকট নানাবিধ অলৌকিক শক্তি প্রকাশ করেন এবং বিষ্ণুপুরের নাম পরিবর্তন করিয়া 'গুপ্ত বৃন্দাবন' রাখেন। বীরচন্দ্র কোনও সময়ে—সম্ভবত তাঁহার বৃন্দাবনগমনপথে—বিষ্ণুপুর পৌছাইলে রাজা-হাম্বীর তাঁহাকে সংবর্ধিত করেন,—এই তথ্য ছাড়া উক্ত গ্রন্থগুলিতে অন্যান্য বিষয়গুলির বর্ণনা যেমনি কৌতুকপ্রদ, তেমনি অদ্ভুত। তবে 'প্রেমবিলাস' এবং 'কর্ণানন্দ' এই উভয় গ্রন্থ হইতেই জানা যায়[৪৭] যে শ্রীনিবাসের দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহের পর একবার রাজা-হাম্বীর বিষ্ণুপুরে আগত রামচন্দ্র-কবিরাজের আধ্যাত্মিক শক্তির পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হন।[৪৮] 'কর্ণানন্দ'-কার বলেন যে রাজা তখন রামচন্দ্রের নিকট বহুবিধ শাস্ত্র ও সাধ্যসাধনতত্ত্ব শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। তৎকালে শ্রীনিবাসের সহিত ব্যাসাচার্য এবং কৃষ্ণবল্লভও বিষ্ণুপুরে উপস্থিত ছিলেন। খুব সম্ভবত যাজিগ্রাম হইতে রাজা-হাম্বীরের বিষ্ণুপুরে প্রত্যাবর্তন করিবার পরেই তাঁহারাও শ্রীনিবাসের সহিত বিষ্ণুপুরে আসিয়াছিলেন।

(৪৫) ১৯শ. বি., পৃ. ৩৩৭ (৪৬) নি. বি.—পৃ. ৪১-৪৪ ; নি. ব.—পৃ. ৮৭, ৯০, ৯১ ; বী. র.—পৃ. ৩-৭ (৪৭) প্রে. বি.—১৯শ. বি., পৃ. ২৯৮-৩০৮ ; কর্ণ.—অ.-৪র্থ. নি. ; ৬ষ্ঠ নি., পৃ. ১১৬-১৭ (৪৮) দ্র.—রামচন্দ্র-কবিরাজ

'কর্ণানন্দ'-কার ব্যাসাচার্য সম্বন্ধে জানাইতেছেন[৪৯] যে শ্রীনিবাস-আচার্য তাঁহাকে কৃপা করিয়া 'নিজ পুরোহিত প্রভু তাহারে করিল।' এই গ্রন্থ হইতে আরও জানা যায়[৫০] যে একবার গোবিন্দদাস তাঁহার পদমধ্যে পরকীয়া-লীলাবাদ সমর্থন করায় ব্যাসাচার্যের সহিত নরোত্তম, রামচন্দ্র ও গোবিন্দের বিতর্ক উপস্থিত হয়। সেই সময় ব্যাসাচার্য খুব সম্ভবত বৃন্দাবন হইতে জীব-গোস্বামী-প্রেরিত 'গোপালচম্পূ'-গ্রন্থখানির প্রমাণ-বলে খেতুরিতে বসিয়াই রামচন্দ্রাদিকে নিরস্ত করিতে প্রয়াসী হন এবং ব্যাস-চক্রবর্তী 'স্বকীয়া'-মতানুযায়ী ব্যাখ্যা করিতে থাকেন। কিন্তু বাদানুবাদের মীমাংসা না হওয়ায় বৃন্দাবন-গমনেচ্ছু বসন্ত-রায় মারফত[৫১] জীবের নিকট পত্র প্রেরণ করা হইলে জীব-গোস্বামী ব্যাস-শর্মার উক্ত-প্রকার ব্যাখ্যায় ব্যথিত হইয়া প্রত্যুত্তর পাঠাইয়াছিলেন। এই পত্রটি রামচন্দ্র-নরোত্তম-গোবিন্দের নিকটই লিখিত হইয়াছিল। ইহার পর ব্যাসাচার্য যাজিগ্রাম খেতুরি প্রভৃতি স্থানেই অবস্থান করিতেছিলেন। 'নরোত্তমবিলাস' হইতে জানা যায়[৫২] যে বীরচন্দ্রের যাজিগ্রাম-আগমনকালেও ব্যাসাচার্য তথায় উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু শ্রীনিবাসের সঙ্গত্যাগপূর্বক তিনি যে আর কখনও বিষ্ণুপুরে বাস করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে কোন উল্লেখই আর কোথাও নাই।

১৩২৬ সালের 'গৌরাঙ্গসেবক'-পত্রিকার পৌষ-সংখ্যায় 'শ্রীনিবাসচরিত' নামক প্রবন্ধে ব্রজমোহন দাস মহাশয় জানাইয়াছিলেন, "রাজা বীর-হাম্বীরের রাজপণ্ডিত ব্যাসাচার্য ১৫০৫ শকাব্দায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের এক প্রস্থ নকল উঠাইয়া রাখেন।" প্রবন্ধকার এইরূপ তথ্য কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন তাহা জানা যায় না। আধুনিক 'বৈষ্ণবদিগ্দর্শনী' গ্রন্থেও[৫৩] ঠিক একই কথা বলা হইয়াছে।

(৪৯) ১ম. নি., পৃ. ২১ (৫০) ৫ম. নি., পৃ.৯৩-৯৬ ; ভ. র.—১৪।১৬-৩৬ (৫১) বসন্ত-রায় সম্বন্ধে দ্র.—রামচন্দ্র-কবিরাজ (৫২) ১১শ. বি., পৃ. ১৬৯ (৫৩) বৈ. দি.—পৃ. ১১০ ; এই গ্রন্থে (পৃ. ৮৩) বীর-হাম্বীর সম্বন্ধে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি লিপিত হইয়াছে :

"বিষ্ণুপুরের ৪৮ সংখ্যক রাজা হাম্বীরমল্ল, পিতা দমনমল্লের মৃত্যুর পর রাজ্যলাভ করেন।......ইঁহার পিতামহ চন্দ্রমল্লের সময় (খ্রী. ১৪৬১-১৫০১) গোকুলনগরে 'গোবিন্দচন্দ্র জীউ' ও চন্দ্রপুরে 'বৃন্দাবনচন্দ্র-জীউ' প্রতিষ্ঠিত হয়েন। গৌড়াধিপতি সোলেমানের পুত্র দায়ুদখাঁকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া হাম্বীরমল্ল 'বীরহাম্বীর' নামে প্রসিদ্ধ হয়েন। প্রথম বয়সে বীর-হাম্বীর অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ ছিলেন, পরে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণান্তর পরমভক্তে পরিণত হইয়াছিলেন।......'দিনমণিচন্দ্রোদয়'-প্রণেতা কবি মনোহর দাস রাজা বীর-হাম্বীরের সভাসদ ছিলেন। সোনামুখিতে ইঁহার শ্রীপাঠ ও বদনগঞ্জে সমাধি আছে।"

শ্যামানন্দ

শ্যামানন্দের জন্মকাল সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানিতে পারা যায় না। 'প্রেমবিলাস' এবং 'ভক্তিরত্নাকর' বা 'নরোত্তমবিলাস' হইতে তাঁহার সম্বন্ধে যাহা জানা যায় তাহাতে কেবল এইটুকু বলা চলে যে তিনি সম্ভবত শ্রীনিবাস ও নরোত্তম অপেক্ষাও বয়সে কনিষ্ঠ ছিলেন।[১] 'রসিকমঙ্গল' নামক গ্রন্থে কিন্তু শ্রীনিবাস বা নরোত্তম প্রভৃতির কোন উল্লেখই দৃষ্ট হয় না। এই গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে শ্যামানন্দের পিতা শ্রীকৃষ্ণ-মণ্ডল জাতিতে গোপ বা সদ্‌গোপ ছিলেন। তিনি তাঁহার পত্নী দুরিকাদেবী সহ গৌড় পরিত্যাগ করিয়া উড়িষ্যার দণ্ডেশ্বর নামক গ্রামে গিয়া বসবাস করিতে থাকেন। কিন্তু শ্যামানন্দের জন্ম বা বাল্যকাল সম্বন্ধে এই গ্রন্থে কিছুই লিখিত হয় নাই। ইহাতে কেবল এইটুকুই বলা হইয়াছে যে শ্যামানন্দ বিবাহ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি বিষয়-বিরাগী ছিলেন এবং একদিন তিনি বৃন্দাবন-গমনাভিপ্রায়বশত অনুজ-বলরামের উপর গৃহ ব্যবস্থার সকল-ভার অর্পণ করিয়া আম্বুয়াতে চলিয়া যান।[২] 'ভক্তিরত্নাকরে'ও শ্যামানন্দের পিতামাতা জাতি ও বাসস্থান সম্বন্ধে একই বিবরণ দানের পর বলা হইয়াছে[৩] :

ধারেন্দা বাহাদুরপুরেতে পূর্বস্থিতি।
শিষ্ট লোক কহে শ্যামানন্দ জন্ম তথি ॥

এই গ্রন্থে আরও সংবাদ দেওয়া হইয়াছে যে শ্রীকৃষ্ণ-মণ্ডলের 'পুত্র-কন্যা গত' হইবার পর শ্যামানন্দ জন্মগ্রহণ করায় গ্রামবাসী স্ত্রীলোকেরা তাঁহাকে যথেষ্ট 'দুঃখসহ' পালিত হইতে দেখিয়া তাঁহাকে 'দুঃখী' বা 'দুঃখিয়া' নামে অভিহিত করেন। 'প্রেমবিলাসে'ও শ্যামানন্দকে বাল্যাবস্থায় 'দুঃখী কৃষ্ণদাস' বলা হইয়াছে এবং জানান হইয়াছে যে তাঁহার জন্মভূমি ছিল উৎকলের ধারেন্দা গ্রামে। সুতরাং ইহা হইতে মনে হয় যে শ্যামানন্দের পিতা শ্যামানন্দের জন্মের পর সম্ভবত ধারেন্দা হইতে দণ্ডেশ্বরে উঠিয়া যান। কিন্তু 'ভক্তিরত্নাকরে'[৪] অন্যত্র বলা হইয়াছে[৫] :

গৌড়দেশ মধ্যে দণ্ডেশ্বর নামে গ্রাম।
যথাপূর্বে কৃষ্ণমণ্ডলের বাসস্থান।
তারপর উৎকলেতে করিলেন বাস।

এই উক্তি হইতে বুঝা যাইতেছে যে শ্রীকৃষ্ণ-মণ্ডল গৌড়দেশ-মধ্যস্থ দণ্ডেশ্বর হইতেই উৎকলে

---

(১) ভ. র.—৬।৪৩-৪৪, ৪৮ ; ৭। ৩০৪-৫ (২) র. ম.—পূ (২), পৃ: ৯-১৪ (৩) ১।৩৫১-৫৯
(৪) ২০শ. বি., পৃ. ৩৫৭ ; ১৯শ. বি, পৃ. ৩০১ (৫) ৭।৪৫৯-৬০

গিয়া বসবাস করেন। 'ভক্তিরত্নাকরে'র এইরূপ পরস্পরবিরোধী বর্ণনার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আবার 'রসিকমঙ্গলে' এই দণ্ডেশ্বরকেই উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত ধরিয়া বলা হইতেছে যে শ্রীকৃষ্ণ-মণ্ডল গৌড় হইতে এইস্থানে উঠিয়া আসেন। অথচ গৌড়দেশের সীমারেখা বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তিত হইলেও একসময়ে তাহা উড়িষ্যার যাজপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ডা. বিনয়চন্দ্র সেনের **Some Historical Aspects of the Inscriptions of Bengal**-নামক গ্রন্থে (p. 126) লিখিত হইয়াছে : **That Gouḍa in the early Muhammadan period denoted the more or less homogeneous area is apparent from the statement in which Minhāj-ud-Din seems to define it in the Ṭabaqāt-i-Nāṣirī. "The parts round about the State of Lakaṇawatī," according to Chronicle, were "Jāj-nagar, the countries of Bang, Kāmrūd, and Tirhut," and "the whole of that territory," seems to have been named Gaur. It appears therefore that Gouḍa in his time included Tirhut, Bengal, Assam and Utkala or Orissa. Jāj-nagar is identified by Blochmann with Jujpur, near Cuttack.** মৌলানা মিন্‌হাজুদ্দীন ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক হইলে ঐ সময়ের যাজপুরকেও গৌড়ান্তর্গত ধরিতে হয়। কিন্তু পঞ্চশত বর্ষ পরে অষ্টাদশ শতকে নরহরি-চক্রবর্তীর সময়েও 'গৌড়' নামটি উক্তরূপ ব্যাপকার্থে প্রযুক্ত হইত বলিয়া মনে হয় না। 'ভক্তিরত্নাকরে'র উল্লেখে গৌড় এবং উৎকলের পৃথক অবস্থিতি স্বীকৃত হওয়ায় বুঝা যাইতেছে যে গ্রন্থকার উৎকলকে গৌড়ান্তর্গত বলিয়া মনে করেন নাই। 'গোড়ীয় বৈষ্ণব জীবন'-গ্রন্থের লেখক জানাইতেছেন, 'দণ্ডেশ্বর গ্রাম—মেদিনীপুরে, সুবর্ণরেখা নদীর তীরে' অবস্থিত ছিল। 'চৈতন্যচরিতামৃতা'দি পাঠে সমগ্র বাংলা দেশকেই গৌড়ান্তর্গত বলিয়া ধারণা জন্মে। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে দণ্ডেশ্বর সহ মেদিনীপুরকেও (অন্তত প্রতাপরুদ্রের রাজত্বকালের পরে) গৌড়ান্তর্গত ধরা হইত। ইহাতে 'ভক্তিরত্নাকরে'র 'গৌড়দেশ মধ্যে দণ্ডেশ্বর নামে গ্রাম' সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। তাহা হইলে 'রসিকমঙ্গলে' দণ্ডেশ্বরকে উড়িষ্যার অন্তর্গত বলা হইয়াছে কেন, তাহা বুঝিতে পারা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে উড়িষ্যারাজের আধিপত্য বাংলাদেশের ত্রিবেণী পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।[৬] কিন্তু এই আধিপত্য ছিল সাময়িক। 'রসিকমঙ্গল'-মতে শ্রীকৃষ্ণ-মণ্ডল গৌড়দেশ হইতেই উড়িষ্যার দণ্ডেশ্বরে উঠিয়া যান। সম্ভবত সপ্তদশ শতকে এই গ্রন্থরচনার নিকটবর্তী কোনও সময়ে উড়িষ্যা-রাজ্য ক্রমাগত সংকুচিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-মণ্ডলের

(৬) ত্রিবেণী—গৌ. জী., পৃ. ৪৬-৪৭

পূর্ব-বাসভূমি (ধারেন্দা ?) অতিক্রম করিয়া দণ্ডেশ্বরের কাছাকাছি গিয়া পৌছায় এবং অষ্টাদশ শতকে 'ভক্তিরত্নাকর'-রচনাকালে দণ্ডেশ্বরও গৌড়-মধ্যবর্তী বলিয়া পরিগণিত হয়। উল্লেখ করা যাইতে পারে যে 'রসিকমঙ্গলে'রও পূর্বে লিখিত 'প্রেমবিলাসে'[৭] ধারেন্দা গ্রামকে 'দক্ষিণদেশ' বা 'উৎকলে'র অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। অবশ্য 'প্রেমবিলাসে'র এই বর্ণনা যে খুব নির্ভরযোগ্য তাহা না ধরিয়া লইলেও যায় আসে না। যাহাহউক, 'রসিক-মঙ্গলে' যে বলা হইয়াছে শ্রীকৃষ্ণ-মণ্ডল দণ্ডেশ্বরেই উঠিয়া যান, 'ভক্তিরত্নাকরে'র পূর্বোদ্ধৃত বিবরণ হইতেই তাহা সমর্থিত হইতেছে। সুতরাং দণ্ডেশ্বরে যে তাঁহার পূর্ববাস ছিল তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করা চলে না। নরহরি-চক্রবর্তী 'শিষ্ট লোকে'র নিকট শ্রবণ করিয়া এই সম্পর্কিত কিছু কিছু সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন।[৮] হয়ত এই কারণেই তাঁহার এই উক্তিগুলির মধ্যে স্ববিরোধ থাকিয়া যাইতে পারে। তবে শ্যামানন্দ যে তাঁহার পিতার পূর্ব-বাসস্থান ধারেন্দা-বাহাদুরপুরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, 'ভক্তিরত্নাকরে'র এই বিবরণকে অবশ্য অসত্য বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই।

'ভক্তিরত্নাকর'-মতে শ্যামানন্দ বা 'দুঃখিয়া' বাল্যকালে ব্যাকরণাদি পাঠ শেষ করিয়া হৃদয়-চৈতন্যের নিকট কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইবার নিমিত্ত পিতামাতার অনুমতি গ্রহণ করিয়া গঙ্গাস্নানার্থী যাত্রী-বৃন্দের সহিত অম্বিকায় গমন করেন। কিন্তু তিনি হৃদয়-চৈতন্যের কথা কিরূপে অবগত হইয়াছিলেন গ্রন্থমধ্যে তাহার কোন উল্লেখ নাই। এইস্থলেও 'রসিকমঙ্গলে'র বিবরণই সত্যের অধিকতর নিকটবর্তী বলিয়া মনে হইতে পারে। খুব সম্ভবত শ্যামানন্দ বৃন্দাবন গমনোদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়া অম্বিকায় পৌছাইলে হৃদয়-চৈতন্যের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটে। যাত্রাকালে তিনি যে অনুজ-বলরামের নিকট গৃহ-সংসারের ভার অর্পণ করিয়া যান, তাহাতে মনে হয় যে তখন তাঁহার পিতামাতা পরলোকগত হইয়াছেন। 'প্রেমবিলাসে' যদিও বলা হইয়াছে[৯] যে শ্যামানন্দ গৃহত্যাগ করিলে তাঁহার 'পিতামাতা দুঃখ পাই বহু অন্বেষিল,' তবুও তাহার পরক্ষণেই দেখা যায়, শ্যামানন্দ বলিতেছেন :

> পৃথিবীতে কেহ নাহি হই জন্ম দুঃখী।......
> কেহ নাহি সংসারে মোর মুঞি অতি দীন।

এবং হৃদয়ানন্দও শ্যামানন্দকে বলিতেছেন :

> শুন বাছা একা তুমি কেহ নাহি আর।
> প্রভু আছেন সংসারে সত্যাচরণ তোমার॥

সুতরাং 'প্রেমবিলাসে'র বর্ণনা পরস্পরবিরোধী হওয়ায় তাহার উপর জোর দেওয়া যায় না।

(৭) ১২শ. বি., পৃ. ১৪৬-৪৭ ; ১৯শ. বি., পৃ.৩০১ (৮) ভ. র.—১।৩৫৪ (৯) ১২শ. বি., পৃ. ১৪৭-৪৮

যাহাহউক, অম্বিকাতে আসিবার পর হৃদয়-চৈতন্য-ঠাকুরের সহিত পরিচয় ঘটিলে হৃদয়-চৈতন্য তাঁহার ভক্তিভাব-দর্শনে প্রীত হইয়া তাঁহাকে দীক্ষাদান করিলেন এবং তাঁহার নূতন করিয়া নামকরণ হইল 'কৃষ্ণদাস' বা 'দুঃখীকৃষ্ণদাস',[১০] 'প্রেমবিলাস'-মতে 'দুঃখিনী কৃষ্ণদাস'। ইহার পর এই কৃষ্ণদাস আপনাকে গুরুসেবায় নিযুক্ত করিয়া অম্বিকাতে বাস করিতে লাগিলেন। কিছুকাল অতিবাহিত হইবার পর হৃদয়-চৈতন্য তাঁহাকে বৃন্দাবন-গমনের জন্য আজ্ঞা প্রদান করিলে তিনি নবদ্বীপাদি পরিভ্রমণান্তে বৃন্দাবনে চলিয়া গেলেন।

ব্রজমণ্ডলে পৌঁছাইয়া দুঃখী-কৃষ্ণদাস বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করেন। রঘুনাথদাস ও কৃষ্ণদাস-কবিরাজের দর্শন লাভ করিয়া তিনি বৃন্দাবনে জীব-গোস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিলে[১১] জীব তাঁহাকে বাৎসল্যসহকারে আপনার নিকট রাখিয়া শাস্ত্রাধ্যয়ন করান এবং পূর্বাগত[১২] শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের সহিত পরিচিত করাইয়া তাঁহাকে তাঁহাদের হস্তেই সমর্পণ করেন। ইতিপূর্বে হৃদয়ানন্দ তাঁহাকে মন্ত্রদান করিয়াছিলেন মাত্র। কিন্তু তদপেক্ষা বহুগুণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ও যোগ্যতর বৈষ্ণব-ভক্ত জীবের মধ্যেই যেন তিনি তাঁহার প্রকৃত গুরুর সাক্ষাৎলাভ করিলেন। 'প্রেমবিলাসা'দি-গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে জীবই তাঁহার 'কৃষ্ণদাস'-নাম পরিবর্তিত করিয়া তাঁহাকে 'শ্যামানন্দ'-নামে আখ্যাত করিয়াছিলেন।

বৃন্দাবন-বাসকালে দুঃখী-কৃষ্ণদাস আপনাকে 'রাধিকার দাসীভাবে' ভাবিত করিয়া ভক্তি ও সেবার পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং 'ভক্তিরত্নাকর'-প্রণেতা বলেন[১৩] যে সেইজন্য জীব-গোস্বামীও তাঁহাকে শ্যামানন্দ নামে অভিহিত করেন। 'প্রেমবিলাস'-কারও বলেন[১৪] যে জীব-গোস্বামী তাঁহার একান্ত অভিলাষ ও প্রার্থনা অনুযায়ী তাঁহাকে 'রাধিকাজিউর মন্ত্র ষড়ক্ষর দিল' এবং ইহার পর কৃষ্ণদাস কুঞ্জে বসিয়া গোসাঁইর নিকট পাঠ-গ্রহণ করিতে থাকিলে তাঁহার মনে 'কত ভাব উঠে তাহা ভাবিতে ভাবিতে।' একদিন তিনি মানসে দর্শন করিলেন যে নৃত্যকালে রাধিকার বামপদের নূপুর খসিয়া পড়িয়া গেল। সখীগণসহ রাধিকা চলিয়া গেলে কৃষ্ণদাস রাসস্থলী দর্শন করিতে গিয়া পত্র-ঢাকা নূপুরটি মাথায় তুলিয়া লইয়া ভাবাবেশে জীবের নিকট উপস্থিত হইলে জীবও ভাবাকুল হইয়া দেখিলেন যে নূপুরের স্পর্শে কৃষ্ণদাসের মস্তকে 'কৃষ্ণপদাকৃতি তিলকবিন্দু' শোভিত হইয়াছে। তখনই তিনি 'হরিপদাকৃতি তিলকের' প্রমাণে তাঁহার নাম পরিবর্তিত করিয়া রাখিলেন 'শ্যামানন্দ'। 'রসিকমঙ্গলে'র লেখক বলেন[১৫] যে 'শ্যামানন্দ'-নাম অম্বিকাতে হৃদয়-চৈতন্য কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল। কিন্তু গৌড়-বৃন্দাবনে সংঘটিত ঘটনা সম্বন্ধে

(১০) ভ. র.—১।৩৭৬-৭৮ ; র. ম.—পূ. (২), পৃ. ১০ (১১) প্রে. বি.—১২শ. বি., পৃ. ১৫১-৫৩ ; ভ. র.—৬।২০-৩০ (১২) দ্র.—শ্রীনিবাস ও নরোত্তম (১৩) ৬।৫১-৫২ (১৪) ১২শ. বি., পৃ. ১৫৪-৫৭ (১৫) পূ. (২), পৃ. ১০

গ্রন্থকার-গোপীজনবল্লভ অপেক্ষা নরহরি-চক্রবর্তী (কিংবা 'প্রেমবিলাসে'র লেখকও) যে অধিকতর বাস্তবজ্ঞানের পরিচয় দিয়া থাকিবেন, তাহাই সম্ভব মনে হয়। উৎকল সম্পর্কিত ঘটনার বর্ণনায় অবশ্য 'রসিকমঙ্গলের' উক্তি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

'শ্যামানন্দপ্রকাশ' বা 'শ্যামানন্দবিলাস' এবং 'অভিরামলীলামৃত' নামক গ্রন্থে উপরোক্ত ঘটনাটি বহু-পল্লবিত হইয়াছে। তদনুযায়ী[১৬] দুঃখিনী-কৃষ্ণদাস প্রাত্যহিক নিকুঞ্জ সেবাকালে একদিন রাধিকার নূপুর প্রাপ্ত হন। রাধিকা-প্রেরিত ললিতা কিংবা বৃন্দা ছদ্মবেশে নূপুরের সন্ধানে আসিলে উভয়ের মধ্যে নানা বাক্‌চাতুরির পর ললিতা কৃষ্ণদাসকে স্বীয় স্বরূপ দর্শন করান। কৃষ্ণদাস রাধাকৃষ্ণ সেবার বর চাহিলে তিনি বলিলেন :

মানসিক সখী-দেহে করিবে দর্শন।

এবং দেহ অন্তে পাইবে রাধা-কৃষ্ণের চরণ ॥

তারপর তিনি একটি মন্ত্র দান করিলেন :

এই নিত্য মন্ত্র তুমি করহ গ্রহণ।
স্মরণ করিলে হবে রাধিকা দর্শন ॥

তখন কৃষ্ণদাস নূপুর আনিতে গিয়া দেখিলেন যে নূপুরের স্পর্শে তাঁহার লৌহময় খুরপাটিও স্বর্ণময় হইয়াছে। তিনি নূপুর মস্তকে তুলিয়া আনিলে মস্তকেও নূপুর-চূড়ার তিলক অঙ্কিত হয় এবং ললিতাই তাঁহাকে 'শ্যামানন্দ'-আখ্যা দিয়া যান। কিন্তু শ্যামানন্দ খুরপা লুকাইতে না পারায় জীব সমস্ত অবগত হইয়া ললিতার আজ্ঞানুযায়ী তাঁহাকে প্রকৃত বিষয় গোপন করিতে বলিলেন :

গুরু কৃপা হৈল বলি লোকেরে কহিবে ॥……
গুরুকৃপা—'শ্যামানন্দ' নাম প্রকাশিল ॥
তিলকের নাম রাখিলেন শ্যামানন্দী।

সকলেই বুঝিলেন, জীব কর্তৃক পুনর্দীক্ষিত কৃষ্ণদাস নব-তিলক ধারণ ও নব-নাম গ্রহণ করিয়াছেন। হৃদয়ানন্দের নিকট সংবাদ পৌঁছাইলে নানাবিধ কার্য-কলাপের পর তিনি ক্রুদ্ধচিত্তে দ্বাদশ-গোপাল ও চৌষট্টি-মহান্তকে বৃন্দাবনে আনিয়া জীব-শ্যামানন্দের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড অভিযোগ উত্থাপন করিলেন এবং জীবাদিকে প্রথমে মিথ্যার আশ্রয় লইতে হইলেও শেষে ললিতার মধ্যস্থতায় রাধিকা গৌরীদাসকে (পরলোকগত) পাঠাইলে তাঁহাদেরই জয় হইল। সমবেত বৈষ্ণববৃন্দ কর্তৃক শ্যামানন্দের তিলক-চিহ্ন ধুইয়া মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা ব্যর্থ হইল এবং শ্যামানন্দ একমাত্র হৃদয়ানন্দেরই শিষ্যরূপে পরিগণিত থাকিলেন। শ্যামানন্দকে আরও কিছু দুর্ভোগ ভুগিতে হইয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হৃদয়ানন্দ তাঁহাকে কোলে তুলিয়া লইতে বাধ্য হন।

(১৬) শ্যা. প্র. ; শ্যা. বি. ; অ. লী.—২৫শ. প., পৃ. ১২০ ২৩

উক্ত তিনখানি গ্রন্থ ছাড়া অন্যত্র ইহার বিশেষ সমর্থন নাই। নরহরির একটি পদে কেবল লিখিত হইয়াছে[১৭] যে শ্যামানন্দ 'বৃন্দাবনে নব নিকুঞ্জে রাইর নূপুর' প্রাপ্ত হন। 'প্রেমবিলাসে'র বর্ণনার সহিত ইহা সংগতিসম্পন্ন। কিন্তু 'অভিরামলীলামৃত'-গ্রন্থখানি একটি আজগুবি ঘটনার সংগ্রহশালা। আবার কৃষ্ণচরণদাস-বিরচিত 'শ্যামানন্দবিলাস' গ্রন্থখানিকেও তৎপ্রণীত 'শ্যামানন্দপ্রকাশ' গ্রন্থের অন্যএকটি সংস্করণ বলা চলে, এবং 'শ্যামানন্দপ্রকাশ' অনেক পরবর্তিকালে লিখিত। এই সমস্ত গ্রন্থের বর্ণনা যে 'প্রেম-বিলাসে'র বর্ণনার কল্পনারঞ্জিত পরিবর্ধনমাত্র তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যে-'প্রেম-বিলাসে'র বর্ণনা অবলম্বনে উক্ত গ্রন্থের লেখকগণ এইভাবে শ্যামানন্দের গুরুদ্রোহ এবং হৃদয়ানন্দের প্রচণ্ড বিক্ষোভকে পল্লবিত করিতে চাহিয়াছেন, সেই 'প্রেমবিলাসে'র লেখকই লিখিতেছেন[১৮] যে নূপুর-প্রাপ্তির পূর্বে জীব দুঃখী-কৃষ্ণদাসকে বলিলেন :

> শুন ওহে কৃষ্ণদাস কর্তব্যাকর্তব্য।
> হৃদয়চৈতন্যদাস গুরু সে অবশ্য ॥
> কৃষ্ণমন্ত্রদাতা তিঁহ তাঁর কৃপা হৈতে।
> এই সব প্রাপ্তি তাঁর কৃপার সহিতে ॥
> তাতে অপরাধ হৈলে সব যায় ক্ষয়।
> এই মোর বাক্য তুমি রাখিবে হৃদয় ॥

'ভক্তিরত্নাকর' হইতেও জানা যায়[১৯] যে শ্যামানন্দ

> 'শ্রীগুরু শ্রীহৃদয়চৈতন্যপ্রভু—বলি'
> যমুনার তীরে সদা নাচে বাহু তুলি ॥

এবং

> শ্রীশ্যামানন্দের ভক্তিরীত চমৎকার।
> মধ্যে মধ্যে পত্রিকা পাঠান সমাচার ॥

স্বয়ং হৃদয়-চৈতন্যও

> শ্রীজীব গোস্বামীরে লিখয়ে পত্রীদ্বারে।
> দুঃখী কৃষ্ণদাস শিষ্যে সঁপিল তোমারে ॥

এবং

> শ্যামানন্দে কহিয়া পাঠান নিরন্তর।
> শ্রীজীবে জানিবে তুমি আমার সোঁসর ॥

'নরোত্তমবিলাসে'ও লেখক জানাইতেছেন[২০] যে শ্যামানন্দ বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসিলে হৃদয়ানন্দই শ্যামানন্দ সম্বন্ধে এক ব্যক্তিকে বলিয়াছিলেন :

> নিজ মনোবৃত্তি মোরে লিখি পাঠাইল।
> তার আর্তি দেখি তারে তৈছে আজ্ঞা দিল ॥

(১৭) ভ. র.—১৫।১০৬ (১৮) ১২শ. বি., পৃ. ১৫৫ (১৯) ৬।৫৬ ; ৬।৪৯ (২০) ৩য়. বি., পৃ. ৩৭

নিকুঞ্জ সেবায় রত হৈল অনিবার।
পাইল সুখ 'শ্যামানন্দ' নাম হৈল তার ॥
বৃন্দাবনে সকলেই অতি কৃপা কৈলা।
এথাতে আসিব পূর্বে পত্রী পাঠাইলা ॥
নিতাই চৈতন্য কৃপা করি তার দ্বারে।
যে কার্য সাধিবে তাহা ব্যাপিবে সংসারে ॥
মোর প্রিয় শিষ্য সেই কহিলুঁ তোমায়।

এইস্থলে শ্যামানন্দের কোন এক বিশেষ অভিলাষের কথা দ্যোতিত হইলেও গুরু-শিষ্যের মধ্যে কোন বিবাদ, দ্বন্দ্ব বা মনোমালিন্যের কথা নাই। অন্য কোন গ্রন্থের দ্বারাও বিবাদের কথা স্বীকৃত হয় নাই। 'রসিকমঙ্গলে'ও উহার সমর্থন পাওয়া যায় না। তবে বৃন্দাবনে আসিবার পর শ্যামানন্দের জীবনে যে এক আমূল পরিবর্তন ঘটিয়া যায় এবং শ্রীজীবের বৃহত্তর প্রতিভায় উদ্দীপ্ত হইয়া তিনি যে এক নবজীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্যানানন্দ জীবকর্তৃক সুশিক্ষিত হন এবং বৃন্দাবন-মথুরার মন্দির বিগ্রহ ও সমাধিক্ষেত্র প্রভৃতি পরিদর্শন করেন। লোকনাথ, ভূগর্ভ, গোপাল-ভট্ট, রঘুনাথদাস প্রভৃতি সকলের সহিতও তাঁহার ঘনিষ্ঠতা জন্মায়। 'ভক্তিরত্নাকরে' দেখা যায় যে শ্রীনিবাসাদির গৌড়-গমনের পূর্বেই জীব-গোস্বামী শ্রীনিবাস ও নরোত্তমকে রাঘব-গোস্বামীর সহিত বৃন্দাবন-পরিক্রমায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। পরিক্রমাকালে শ্যামানন্দকে তাঁহাদের সহিত দেখা যায় না। তাহাতে মনে হয় যে শ্যামানন্দ হয়ত তখনও পর্যন্ত বৃন্দাবনে পৌছান নাই। কিংবা পৌছাইলেও তিনি ছিলেন নবাগত। কিন্তু শ্রীনিবাস ও নরোত্তমকে গোস্বামিগ্রন্থ সহ গৌড়ে প্রেরণকালে জীব-গোস্বামী তাঁহাদের হস্তেই শ্যামানন্দের ভারার্পণ করিয়া তাঁহাকেও গৌড়াভিমুখে প্রেরণ করেন।[২১]

বিষ্ণুপুর-অঞ্চলে গ্রন্থসমূহ অপহৃত হইলে শ্রীনিবাসের আদেশক্রমে নরোত্তম এবং শ্যামানন্দ খেতুরিতে চলিয়া যান। তারপর খেতুরিতে গ্রন্থ-প্রাপ্তির শুভ সংবাদ পৌছাইবার কিছুকাল পরে শ্যামানন্দ খেতুরি ত্যাগ করিয়া যান। রাজা-সন্তোষ-দত্ত পদ্মাবতী পর্যন্ত গিয়া তাঁহার প্রত্যুদগমন করিলেন। শ্যামানন্দ তখন নবদ্বীপ হইয়া অম্বিকায় পৌছাইলে[২২] হৃদয়-চৈতন্য তাঁহাকে সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করিলেন। কিছুদিন পরে শ্যামানন্দ উৎকলে চলিয়া গেলেন। 'ভক্তিরত্নাকর'-প্রণেতা বলেন যে তিনি সর্বপ্রথম দণ্ডেশ্বর এবং তাহার পরেই ধারেন্দায় গমন করেন এবং 'নরোত্তমবিলাস'-গ্রন্থে তিনি জানাইতেছেন যে তিনি এইবার উৎকলে গিয়াই রসিকানন্দ প্রভৃতি বহু শিষ্যকে মন্ত্রদীক্ষা দান করেন।

(২১) দ্র.—শ্রীনিবাস (২২) ন. বি.—৩য়. বি., পৃ. ৩৭; ভ. র.—৭।৪৬৮

আবার 'ভক্তিরত্নাকর'-গ্রন্থের একেবারে শেষ-তরঙ্গে গিয়া গ্রন্থকার বিচ্ছিন্নভাবে শ্যামানন্দ সম্বন্ধে বহুপূর্বঘটিত বিষয়ের বিবরণ প্রদান-প্রসঙ্গে বলিতেছেন যে শ্যামানন্দ পূর্বে ব্রজ হইতে গৌড়মণ্ডলে আসিবার পর পুনরায় অম্বিকা হইতে উৎকলের দণ্ডেশ্বর-ধারেন্দা হইয়া রসিক-মুরারির আবাস-স্থল রয়নী-গ্রামে গিয়া পৌছান। তথা হইতে তিনি ঘণ্টশিলায় গিয়া রসিক-মুরারিকে দীক্ষাদান করেন এবং পুনরায় মুরারি সহ রয়নীতে আসিয়া দামোদর[২৩] প্রভৃতি বহু ব্যক্তিকে দীক্ষিত করেন। তারপর তিনি বলরামপুর হইয়া ধারেন্দায় গেলে রাধানন্দ, পুরুষোত্তম, মনোহর, চিন্তামণি, বলভদ্র,[২৪] জগদীশ্বর, উদ্ধব, অক্রূর, মধুসূদন[২৫], গোবিন্দ, জগন্নাথ, গদাধর, সুন্দরানন্দ,[২৬] ও রাধামোহন প্রভৃতি ভক্ত তাঁহার নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিলেন। ক্রমে তিনি নৃসিংহপুর ও গোপীবল্লভপুর গ্রামকেও প্রেম-বন্যায় নিমজ্জিত করেন এবং গোপীবল্লভপুরে রসিকানন্দের উপর গোবিন্দ-সেবার ভার অর্পণ করিয়া তাঁহাকে পাষণ্ডী-উদ্ধারের আজ্ঞা-প্রদান করেন। এইভাবে তিনি ভক্তবৃন্দ সহ বহু স্থান পরিভ্রমণ করিলেন। একবার তিনি এক দুষ্টব্যক্তি প্রেরিত হস্তীকেও বশীভূত করিয়া দুষ্ট-যবনকে পর্যন্ত প্রভাবিত করিয়াছিলেন।

কিন্তু 'ভক্তিরত্নাকরে' বর্ণিত উপরোক্ত ঘটনাগুলির মধ্যে কোনও পারম্পর্য রক্ষিত হয় নাই। উৎকলে শ্যামানন্দের শিষ্য-করণ প্রভৃতি বৃত্তান্ত সম্বন্ধে 'প্রেমবিলাসে'র মধ্যেও কোন ধারাবাহিকতা দৃষ্ট হয় না। 'ভক্তিরত্নাকর' ও 'নরোত্তমবিলাস' হইতে জানা যায় যে শ্যামানন্দের খেতুরি-ত্যাগের কিছুকাল পরেই নরোত্তম নীলাচলে গিয়া সেইস্থান হইতে প্রত্যাবর্তনকালে নৃসিংহপুরে আসিয়া শ্যামানন্দকে নীলাচলে যাইবার জন্য নির্দেশ দান করিয়াছিলেন এবং নরোত্তম চলিয়া আসিলেই শ্যামানন্দও নীলাচলে গমন করেন। এদিকে শ্রীনিবাস-আচার্য বিষ্ণুপুর হইতে যাজিগ্রামে আসিয়া অল্পকাল মধ্যে বৃন্দাবনে গমন করিলে সেইস্থানেই কিছুদিন পরে তাঁহার সহিত শ্যামানন্দের সাক্ষাৎ ঘটে এবং রামচন্দ্র-কবিরাজ সহ শ্রীনিবাসের বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনের সময় শ্যামানন্দ তাঁহার সহিত বিষ্ণুপুরে আসিয়া রাজা-হাম্বীর কর্তৃক বিশেষভাবে আপ্যায়িত হইবার পর উৎকলে চলিয়া যান। ইহার কিছুকাল পরে খেতুরিতে মহামহোৎসবকালে তিনি পুনরায় সেইস্থানে আসিয়া উৎসবানুষ্ঠানে বিশেষ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। তারপর তিনি উৎসবান্তে শ্রীনিবাসের সহিত যাজিগ্রামে পৌছান এবং এবং সেখান হইতে গৌড়ের বিভিন্নস্থান পরিদর্শন করিয়া উৎকলে যান।

(২৩) ইঁহার প্রসঙ্গ পরেও উত্থাপিত হইবে। (২৪) প্রে. বি.-এ (২০শ. বি., পৃ. ৩৫৮-৫৯) সম্ভবত ইনিই রামভদ্র বা বীরভদ্র। (২৫) ভ. র-এ মধুবন থাকিলেও প্রে. বি.-এ (২০শ. বি., পৃ. ৩৫৮) ইঁহাকে মধুসূদন বলা হইয়াছে। (২৬) ভ. র-এ ইনি আনন্দানন্দ, কিন্তু প্রে. বি.-এ (২০শ. বি., পৃ. ৩৫৮) সুন্দরানন্দ।

'নরোত্তমবিলাস'-কার বলেন খেতুরিতে শ্যামানন্দের সহিত হৃদয়ানন্দের সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল এবং তিনি বিদায়কালে তাঁহাকে শ্রীনিবাসের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। 'প্রেমবিলাসে'ও শ্যামানন্দের খেতুরি-মহামহোৎসবে যোগদানের কথা বর্ণিত হইয়াছে এবং গ্রন্থকার-মতে[২৭] তিনি আরও দুই একবার খেতুরিতে গিয়া উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন, এমনকি খেতুরিতে যেইবার মহাসভার অধিবেশন ঘটে সেইবারও তিনি তাঁহার শিষ্য রসিকাদি সহ সেই মহাসভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

কিন্তু শ্যামানন্দের এই গৌড়, নীলাচল ও বৃন্দাবন সম্পর্কিত ঘটনাবলীর সহিত তাঁহার পূর্বোল্লেখিত উৎকল সম্বন্ধীয় ঘটনাবলীর কোনও কালসামঞ্জস্য নাই। প্রথমবারে বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়াই তিনি বংগোৎকল-সীমান্তে ভক্তিধর্ম-প্রচারার্থ বিশেষভাবে তৎপর হইয়াছিলেন। কিন্তু সেই কর্মসাধনার কোন্ পর্যায়ে যে তাঁহার সহিত নৃসিংহপুরে নরোত্তমের সাক্ষাৎ ঘটে এবং তিনি নীলাচল, বৃন্দাবন, খেতুরি প্রভৃতি স্থানে গমন করেন তাহার বিষয় কিছুই জানা যায় না। তবে তিনি যে প্রথমবার বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনের পরেই রসিকানন্দকে দীক্ষাদান করেন, নরহরি-প্রদত্ত এই বিবরণ অসত্য নহে। 'প্রেমবিলাসে'র বিভিন্ন বর্ণনা[২৮] হইতে এই সম্বন্ধে সন্দেহ দূরীভূত হইতে পারে। গ্রন্থকার একস্থলে জানাইতেছেন যে বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া শ্যামানন্দ গড়েরহাট (খেতুরি) হইয়া অম্বিকায় আসিয়া হৃদয়-চৈতন্যের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাহার পর স্বীয় জন্মস্থান ধারেন্দা-গ্রামে গিয়া অন্যান্য পাষণ্ডী-বৃন্দসহ সেরখাঁ নামক এক দুরন্ত পাঠানকে উদ্ধার করেন। ধারেন্দা হইতে তিনি রয়নীগ্রামে গিয়া অচ্যুতানন্দ-পুত্র রসিক ও মুরারিকে কৃপাদান করেন এবং তাহারপর তিনি বলরামপুর নৃসিংহপুর ও গোপীবল্লভপুর প্রভৃতি স্থানে ধর্মপ্রচার করিতে থাকেন। দামোদর নামক এক বৈদান্তিক মহাযোগী এই গোপীবল্লভপুরেই শ্যামানন্দ কর্তৃক পরাস্ত হইয়া তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন। ইনিই 'ভক্তিরত্নাকরে' বর্ণিত পূর্বোক্ত দামোদর।

এইস্থলে শ্যামানন্দের দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন-গমনের কাল সম্বন্ধে কোন কথাই উল্লেখিত হয় নাই। সুতরাং এই সম্বন্ধীয় ঘটনার ক্রমানুধাবন প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠে। আবার 'রসিকমঙ্গলে'র বর্ণনায়[২৯] দৃষ্ট হয় যে শ্যামানন্দ প্রথমবার বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনের পর নীলাচল গমন করেন ; তাহার পরেই তিনি বৃন্দাবনে যান, এবং দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া দীক্ষাদান বা ধর্মপ্রচার আরম্ভ করেন। পরে তিনি আরও একবার নীলাচল এবং তাহার পরে তৃতীয়বারের জন্য বৃন্দাবন গমন করেন। কিন্তু খুব সম্ভবত ইহাই তাঁহার

(২৭) ১৯শ. বি., পৃ. ৩২০, ৩৩৭ (২৮) ১৭শ. বি., পৃ. ২৪৬-৪৭ ; ১৯শ. বি., পৃ. ৩০১-৪ (২৯) পূ. (২), পৃ. ১২ ; পূ. (১৪-১৫), পৃ.৫৩-৫৭ ; দ. (১), পৃ. ৬৩

দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন-গমন। কারণ গ্রন্থ-বর্ণিত প্রথম দুইবার গমনের মধ্যে কোনও কাল-ব্যবধান দৃষ্ট হয় না এবং তাহা অন্যান্য গ্রন্থেরও বর্ণনা-বিরুদ্ধ। 'রসিকমঙ্গল' হইতে অবশ্য শ্যামানন্দের উৎকল-সম্পর্কিত অন্যান্য কর্মবিধি ও ধর্মপ্রচার সম্বন্ধে বিশেষভাবে জানিতে পারা যায়। 'ভক্তিরত্নাকরে'র পূর্বোদ্ধৃত বিবরণ ছাড়া 'প্রেমবিলাসে'ও এই সম্বন্ধে কিছু কিছু বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে 'রসিকমঙ্গলে'র বিবরণই বিস্তৃততর। গুরু-রসিকান্দের জীবনবৃত্তান্ত-বর্ণনা গ্রন্থকারের মূল উদ্দেশ্য হইলেও ইহা হইতে শ্যামানন্দ ও তৎশিষ্য রসিকানন্দ প্রভৃতি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত অতিরিক্ত বিবরণগুলিও পাওয়া যায়।—

উড়িষ্যার অন্তর্গত মল্লভূমিতে সুবর্ণরেখা নদীর তীরে এবং ডোলঙ্গ নদীর নিকটবর্তী রউনি বা রয়নী গ্রামে রসিকানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মের কিছুকাল পূর্বে হলধর নামক এক ব্যক্তি যবন-পীড়নে উত্ত্যক্ত হইয়া কটক হইতে আসিয়া এই স্থানে গোপী-মণ্ডলের গৃহে বাস করিতে থাকেন। সেই সময় এইস্থানের 'অধিপতি অচ্যুত মহাশয়' একদিন গোপী-মণ্ডলের গৃহে হাজির হন। অচ্যুত ইতিপূর্বে কয়েকটি ('দুই চারি') বিবাহ করিলেও হলধরের সুরূপা কন্যা ভবানীর পাণিপ্রার্থী হন এবং উভয়ের শুভ-পরিণয় ঘটিলে ১৫১২ শকের কার্তিক মাসে ভবানীর গর্ভে রসিকানন্দ জন্মলাভ করেন। বাল্যকালে হরি-দুবের নিকট ভাগবত ও রূপ-গোস্বামীর গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া রসিকানন্দের হৃদয়ে ভক্তিভাব অঙ্কুরিত হয়। মুরারির যৌবনারম্ভে হিজলী-মণ্ডলের অধিকারী বিভীষণ-মহাপাত্রের ভ্রাতুষ্পুত্র ও সদাশিব-ভ্রাতা বলভদ্রদাস সে দেশের রাজ-আজ্ঞায় 'কড়কড়ি' লইয়া 'মেদিনীপুরেতে পাতসাহ সুবা স্থানে' গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু বাকী লক্ষ টাকা হিজলী-মণ্ডলে রাখিয়া যাওয়ায় সুবা তাঁহাকে বন্দী করেন। সুবার নিকট অচ্যুতের যথেষ্ট খাতির ছিল। এই সংবাদে অচ্যুত গিয়া তাঁহাকে নিজের দায়িত্বে ছাড়াইয়া আনিলে বলভদ্র অচ্যুতের গৃহে আসিয়া রসিককে দেখিয়া আকৃষ্ট হন। তাঁহার প্রস্তাবে বলভদ্র-কন্যা ইচ্ছাদেইর সহিত রসিক-মুরারির শুভ পরিণয় ঘটে।

এই স্থলে লক্ষণীয় যে রসিক এবং মুরারি একই ব্যক্তি হিসাবে বর্ণিত হইয়াছেন। শ্যামানন্দের শিষ্য-বর্ণনা প্রসঙ্গে 'প্রেমবিলাসে' লিখিত হইয়াছে[৩০] :

শ্রেষ্ঠ শাখা রসিকানন্দ আর শ্রীমুরারি।
যার যশোগুণাসার উৎকল দেশ ভরি ॥
এই দুই বিপ্রের বনিতা দুইজনে।
শ্যামানন্দ শিষ্য কৈলা আনন্দিত মনে ॥

(৩০) ২০শ. বি., পৃ ৬৫৮

রসিকানন্দের পত্নী মালতী তার নাম।
মুরারির পত্নী শচীরাণী অভিধান ॥

অন্যত্র[৩১] রসিক মুরারি নামে তার পুত্রদ্বয়।
শ্যামানন্দ তাহে কৃপা কৈলা অতিশয় ॥

নরহরি-চক্রবর্তীও লিখিতেছেন :

শ্রীরসিকানন্দ শ্রীমুরারি নামদ্বয় ॥
'রসিক-মুরারি' নাম প্রসিদ্ধ লোকেতে।

নরহরি সম্ভবত 'প্রেমবিলাসে'র দ্বারা প্রভাবিত হইয়া থাকিবেন।[৩২] কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তৎপ্রদত্ত বিবরণ হইতে উভয়কে পৃথক ব্যক্তি বলিয়া বুঝিতে পারা যায় না। মুরারির পত্নী শচীরাণীর নাম তাঁহার গ্রন্থে নাই। তিনি বলিতেছেন 'মুরারির ভাযা ইচ্ছাদেই গুণবতী।' 'রসিকমঙ্গলে' কিন্তু রসিক ও মুরারিকে কোথাও পৃথক ব্যক্তি বলা হয় নাই। এই গ্রন্থ-মতেও রসিক-মুরারি বলভদ্রের কন্যা ইচ্ছাদেইর পাণিগ্রহণ করেন। গ্রন্থকার এক ব্যক্তিকেই কোথাও 'রসিক' এবং কোথাও বা 'মুরারি' বলিয়াছেন।

এই গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে রসিকানন্দের সহিত শ্যামানন্দের প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে ঘণ্টশিলায়। শ্যামানন্দ বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনের পর ঘণ্টশিলায় গেলে রসিকানন্দ তাঁহার দ্বারা দীক্ষিত হন এবং ঘণ্টশিলা শ্যামানন্দের একটি ভক্তিপ্রচার-কেন্দ্রে পরিণত হয়। কিছুদিন পরে রসিকানন্দের কন্যা দৈবকী এবং পত্নী ইচ্ছাদেইও শ্যামানন্দের নিকট মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করেন এবং তদবধি ইচ্ছাদেইর নূতন নামকরণ হয়—শ্যামদাসী। গ্রন্থকার-মতে এই সময় শ্যামানন্দ নীলাচল হইয়া ব্রজধামে গমন করেন। খুব সম্ভবত ইহাই 'ভক্তিরত্নাকর'-কথিত শ্যামানন্দের দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন-গমন। যাহাহউক, যাত্রাকালে রসিক শ্যামানন্দের সহিত চাকলিয়া পর্যন্ত গিয়া দামোদরদাস-গোসাঁইর গৃহে উঠিলে দামোদরও তাঁহার দুই পত্নী এবং মাতাসহ শ্যামানন্দের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন। এইরূপে শ্যামানন্দ তাঁহার দুইজন প্রধান শিষ্যকে দীক্ষিত করিলেন।

পূর্বে নেত্রানন্দ কিশোর হরিদাস খ্যাতা।
তবে রসিক দামোদর জগতে বিখ্যাতা ॥

'প্রেমবিলাস'- ও 'ভক্তিরত্নাকর'-মতে দামোদর পূর্বে 'যোগাভ্যাসী' ছিলেন[৩৩] এবং

কিশোর মুরারি দামোদরাদি সহিতে।
মহামহোৎসব কৈল ধারেন্দা গ্রামেতে।

'রসিকমঙ্গলে'র বর্ণনা-অনুযায়ী, শ্যামানন্দ বৃন্দাবনে চলিয়া গেলে রসিকানন্দ শ্যামদাসীকে লইয়া বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণান্তে একদিন শ্যামদাসীকে তনিয়া-গ্রামস্থ অনন্তের গৃহে রাখিয়া

---

(৩১) ১৯শ. বি., পৃ. ৩০৩ (৩২) ভ. র.—১৫।২৭ (৩৩) ২০শ. বি., পৃ. ৩৫৮; ভ. র.—১৫।৫৫

পূর্ব-কথামত একাকী মথুরায় গিয়া শ্যামানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করিবার পর তিনি তাঁহার সহিত বন-পথে উৎকলে প্রত্যাবর্তন করেন।

এইবার রসিকানন্দ শ্যামদাসী সহ বৈষ্ণবসেবা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন এবং বিভিন্ন ব্যক্তির ভোজনাবশেষ গ্রহণ করায় তাঁহাদের জাতিকুলমান বিনষ্ট হইল। এই-ভাবে তাহারা কাশীপুরে পৌছাইলেন। রসিকের জ্যেষ্ঠভ্রাতা কাশীনাথদাস পূর্বে সেই গ্রামে গিয়া নিজ নামানুযায়ী গ্রামের নামকরণ করিয়াছিলেন। 'দৈবে রাজ্য অধিপতিও আপন ইচ্ছায়' কাশীপুরে আসিয়া গৃহনির্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার হস্তক্ষেপে গ্রামটি ক্রমে শোভাময় হইয়া উঠিল এবং রসিকানন্দ তাঁহার বন্ধুবান্ধবকে লইয়া সেই গ্রামে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ভঞ্জ-রাজা তাঁহার বহুকালের দেবতাকে লইয়া চলিয়া গেলে রসিক স্বয়ং রাজসমীপে গিয়া বিগ্রহ ফিরাইয়া আনিলেন। পরে শ্যামানন্দ সেইগ্রামে আসিলে তিনি বিগ্রহের নামকরণ করেন 'গোপীবল্লভ রায়' এবং তদনুযায়ী গ্রামটিও গোপীবল্লভপুর নামে খ্যাত হয়। ইহার পর রসিকানন্দ শ্যামদাসীর উপর বিগ্রহ-সেবার ভারার্পণ করিয়া গুরুর আদেশে ধর্মপ্রচারার্থ বিভিন্নস্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ধারেন্দা গ্রামের দুর্জন ও মহাপাষণ্ড ভীম-শ্রীরিকরও তাঁহার দ্বারা দীক্ষিত হইলেন।

এদিকে শ্যামানন্দ বড়-বলরামপুরে আসিয়া রসিককে ডাকাইয়া পাঠাইলেন এবং বড়কোলা গ্রামে পঞ্চমদোলের আয়োজন করিলেন। খুব ঘটা করিয়া উৎসব অনুষ্ঠিত হইল এবং মেদিনীপুরের সুবাও উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। দেশের যবন-রাজা উৎসব দেখিয়া শ্যামানন্দকে মেদিনীপুরের আলমগঞ্জে লইয়া গিয়া মহোৎসব করিলেন। এই দুইটি উৎসব উপলক্ষে বহু ব্যক্তি শ্যামানন্দের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন। ইহার পর ভীম-শ্রীরিকর প্রভৃতি ভক্তের দ্বারা বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হইয়া শ্যামানন্দ বড়বলরামপুর-গ্রামবাসী জগন্নাথের কন্যা শ্যামপ্রিয়ার পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহাকে ধারেন্দায় পাঠাইয়া দিলেন এবং নিজে কিছুদিন চিন্তামণি নামক এক ব্যক্তির গৃহে অতিবাহিত করিবার পর রাধানগরে গিয়া একটি গৃহনির্মাণ করাইলেন। ইতিমধ্যে রসিকানন্দেরও কয়েকটি পুত্র সন্তান জন্মে। ছয় বৎসরে ছয়টি পুত্র জন্মায়। কিন্তু প্রথম তিনটি মৃত্যুমুখে পতিত হয়। শেষ তিনজনের নামকরণ হয়—'রাধানন্দ, কৃষ্ণগতি ও রাধকৃষ্ণদাস'। সম্ভবত এই রাধানন্দ পদকর্তা ছিলেন। রাধানন্দ-ভণিতায় একটি ব্রজবুলি পদও পাওয়া যায়।[৩৪]

শ্যামানন্দ এবং রসিকাদি ক্রমে সমগ্র অঞ্চল মাতাইয়া তুলিলেন। একবার তাঁহারা

(৩৪) HBL—p. 346

হৃদয়ানন্দকেও ধারেন্দায় আনাইয়াছিলেন। তাঁহার বিদায়কালে শ্যামানন্দ প্রত্যুদ্গমন করিতে গিয়া রসময় নামক এক ব্যক্তির গৃহে কিছুকাল থাকিয়া যান। তারপর তিনি রসিকানন্দ সহ নৈহাটীর অর্জুনী নামক ভক্তের গৃহে গিয়া মহোৎসব উপলক্ষে বহু ব্যক্তিকে দীক্ষিত করেন এবং উৎসবান্তে অর্জুনীর পুত্র শ্যামদাস প্রভৃতিকে লইয়া কাশীয়াড়ী ও ঝাটিয়াড়া হইয়া মথুরায় চলিয়া যান। ইহার পর ভীমধন নামক এক ভুঞা তাঁহার দ্বারা অনুগৃহীত হন এবং ভীমধন তাঁহাকে গোবিন্দপুর নামক একটি গ্রাম দান করেন। সেই গ্রামে শ্যামানন্দের জন্য একটি গৃহ নির্মিত হইলে তিনি সেই স্থানে বাস করিতে থাকেন এবং

শ্যামপ্রিয়া ঠাকুরাণী আসিল তথায়।
গৌরাঙ্গদাসী ঠাকুরাণী যমুনা সবায়॥

কিন্তু শ্যামানন্দ গোবিন্দপুরে বাস করিতে থাকিলেও তিনি রসিকানন্দের উপর উৎকলের রাজাপ্রজা-নির্বিশেষে সকলেরই দীক্ষার ভার প্রদান করিয়াছিলেন। তদনুযায়ী রসিকানন্দ উৎকলের রাজগড়ে গিয়া রাজা-বৈদ্যনাথ-ভঞ্জ, তাঁহার দুই ভ্রাতা এবং অন্যান্য বহু ব্যক্তিকে দীক্ষিত করিলেন। রাজভ্রাতৃত্রয় গুরু কর্তৃক প্রভাবিত হইয়া তদাজ্ঞায় রাজ্য হইতে জীবহত্যা নিষিদ্ধ করিয়া দিলেন। ইহার পর শ্যামানন্দ রসিককে লইয়া নৃসিংহ বা নরসিংহ-পুরের মহাপাষণ্ড ভুঞা উদ্দণ্ড-রায়কে দীক্ষিত করিয়া সেই স্থানে মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান করিলেন এবং তথা হইতে কাশীয়াড়িতে গিয়া শ্যামরায়-বিগ্রহ প্রকাশ করিলেন। এই বিগ্রহ-প্রকাশ উপলক্ষে পুরুষোত্তম, দামোদর, মথুরাদাস, হাড়-ঘোষ-মহাপাত্র দ্বিজ-হরিদাস প্রভৃতি ভক্ত দীক্ষিত হইয়াছিলেন। কাশীয়াড়ি হইতে শ্যামানন্দ ধারেন্দায় আসিয়া 'নেত্রানন্দ কিশোর ঠাকুর হরিদাস ভীম শ্রীরিকর রসময় বংশীদাস' ও চিন্তামণি প্রভৃতির সহিত পরামর্শ করিয়া সুবর্ণরেখা তীরবর্তী গোপীবল্লভপুরে 'মহারাস যাত্রা' আরম্ভ করিলেন। উৎসব উপলক্ষে তিনি

শ্রীহৃদয়ানন্দেরে আনাইলা যতনে॥
আউলিয়া ঠাকুর সে আইল কৌতুকে।
বিদ্যুৎমালা ঠাকুরাণী লক্ষ্মীর স্বরূপে॥
ঠাকুর সুবলদাস বড় মহাজন।
জগৎবল্লভ সঙ্গে করেন নর্তন॥
শ্যাম মথুরাদাস বায়েন বল্লভ।
হৃদয়ানন্দের সঙ্গে নিজ ভৃত্য সব॥
বড় বলরাম দাস ঠাকুর আইলা।
নিত্যানন্দ পুত্র পৌত্র আসি প্রকাশিলা॥
অদ্বৈতের পুত্র পৌত্র সব আগমন।
দ্বাদশ গোপালের শিষ্য প্রশিষ্যগণ॥......

রামদাস ঠাকুর বৈরাগী কৃষ্ণদাস।
শ্রীপ্রসাদ দাস ঠাকুর শ্রীজগন্নাথ দাস ।।

উৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

কিছুকাল পরে বাণপুরের আহম্মদবেগ সুবা অত্যন্ত দুর্দান্ত হইয়া উঠিলে রসিকানন্দ তাঁহার সম্মুখে একটি মত্ত-হস্তীকে বশীভূত করিয়া সুবাকে দীক্ষাদান করিলেন। সেই দৃষ্টান্তে আরও অনেকানেক ব্যক্তি রসিকানন্দের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিলেন। তারপর তিনি গোপীবল্লভপুরে গোবিন্দ-বিগ্রহ স্থাপন করিলে শ্যামানন্দ তাঁহাকে লইয়া ঘণ্টশিলায় যান। সেইস্থানের রাজা শ্যামানন্দকে একটি গ্রাম দান করিলে গ্রামের নাম রাখা হয় শ্যামসুন্দরপুর এবং শ্যামানন্দ শ্যামসুন্দরপুরেও গৃহ-নির্মাণ করাইলেন। পরে তিনি অযোধ্যা ও গোবিন্দপুর নামক স্থানেও গৃহ নির্মাণ করাইয়াছিলেন এবং সেই সমস্ত স্থানে তাঁহার তিনজন পত্নীকে লইয়া কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। অবশ্য তৎকালে থুরিয়া কাশীয়াড়ি নৃসিংহপুর নারায়ণগড় প্রভৃতি স্থানেও তাঁহার প্রায়শই যাতায়াত চলিত এবং তিনি চিরকালই এইসমস্ত স্থানে ধর্মপ্রচারের জন্য বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন।

হৃদয়ানন্দের তিরোভাব সংবাদ আসিলে শ্যামানন্দ রসিকাদি ভক্তকে লইয়া শ্যামসুন্দরপুরে মহোৎসব করিয়াছিলেন। তারপর তিনি গোবিন্দপুরে যান। কিন্তু তখন দামোদর অন্তর্হিত হইয়াছেন। শ্যামানন্দ গোবিন্দপুরে অধিকারী-গোসাঁইর মহোৎসব শেষ করিয়া রসিকানন্দ সহ নৃসিংহপুরে উদ্দণ্ড-রায়ের গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার শরীর ও মন দুর্বল। তিনি উক্তস্থানে চার-মাস অতিবাহিত করিয়া একদিন তাঁহার প্রধান শিষ্য রসিকানন্দের উপর উৎকলের ভার অর্পণ করিলেন। তখন তাঁহার অসুস্থাবস্থা। সেই অবস্থাতেই তিনি ১৫৫২ শকের আষাঢ়ী কৃষ্ণা প্রতিপদ তিথিতে দেহত্যাগ করেন।[৩৫]

'পদকল্পতরু'তে শ্যামানন্দ-ভণিতার কয়েকটি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। গ্রন্থ-সম্পাদকের মতে সেইগুলি আলোচ্য শ্যামানন্দের হওয়াও বিচিত্র নহে। কিন্তু 'দুঃখী-কৃষ্ণদাস'-ভণিতায় যে পদগুলি গ্রন্থমধ্যে উদ্ধৃত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে তিনি বলেন[৩৬] যে সেইগুলি শ্যামানন্দের বলিয়া 'আমাদিগের বিবেচনায় তাহা সঙ্গত বোধ হয় না'। ডা. সুকুমার সেন অনুমান করেন[৩৭] যে 'দুঃখিনী'-, 'দুখী-কৃষ্ণদাস'-, 'দীন-কৃষ্ণদাস'- ও 'দীন-দুখী-কৃষ্ণদাস'-ভণিতার সমস্ত পদই শ্যামানন্দ-রচিত। তিনি বলেন যে 'পদকল্পতরু'ধৃত 'দীন-কৃষ্ণদাস'-ভণিতায় ব্রজভাখা মিশ্রিত ব্রজবুলি পদটিও শ্যামানন্দের রচিত।

---

(৩৫) বৈ. দি. (পৃ. ১১৯)-মতে, "ময়ূরভঞ্জ রাজ্যে সমাদ্দার পরগণার অন্তর্গত কানপুর গ্রামে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর সমাধি বিরাজিত আছেন।" (৩৬) পৃ. ৪২ (৩৭) HBL—p 101

শ্যামানন্দের তিরোভাবের পর রসিকানন্দ গোবিন্দপুরে দ্বাদশ-মহোৎসব সম্পন্ন করিয়াছিলেন এবং 'সেই হইতে দুয়াদশ কৈল পরচারে।' ইহার পর রসিক কিশোর, চিন্তামণি প্রভৃতি ভক্তের তিরোভাবতিথি সম্পন্ন করিয়া ধারেন্দাতে মহামহোৎসবের প্রবর্তন করিলেন এবং শ্যামানন্দের নির্দেশানুযায়ী কর্ম-নির্বাহ করিতে লাগিলেন। শ্যামানন্দের আজ্ঞা ছিল :

তিন মাতা তোমার রাখিবে একঘরে।

এবং বৃন্দাবনচন্দ্র ব্রজমোহন ঠাকুর।

বিজয় করাবে শ্রীশ্যামসুন্দরপুর ॥

কিন্তু রসিকানন্দের সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। ভূঞ্যা-উদ্দণ্ড-রায় সগর্বে জানাইলেন :

হেন কেহ যোগ্য হয়, বৃন্দাবন চন্দ্র লয় ;

পৃথিবীতে মুই সে থাকিতে।

তখন রসিকানন্দ নানা চেষ্টার পর বিরক্ত হইয়া ব্রজবাসিবেশে ময়নায় গিয়া চন্দ্রভানু ও মুরারি নামক ভ্রাতৃদ্বয়কে দীক্ষাদান করিলেন। কিন্তু একদিন বংশীদাস আসিয়া পৌছাইলে তাঁহার প্রকৃত পরিচয় প্রকাশিত হইয়া পড়ে এবং তিনি হিজলীতে গিয়া বহু ব্যক্তিকে দীক্ষিত করিয়া গোপীবল্লভপুরে ফিরিয়া আসেন। তখন উদ্দণ্ড-ভূঁঞ্যা পরলোকগত। রসিকানন্দ পূর্বোক্ত তিন ঠাকুরাণীকে শ্যামসুন্দরপুরে আনয়ন করিলেন। কিন্তু তখন ঠাকুরানীদিগের মধ্যে কলহ চলিতেছিল। গ্রন্থকার-মতে জ্যেষ্ঠ শ্যামপ্রিয়া অন্যের প্ররোচনায় রসিকের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিলেন, যাহাতে রসিকানন্দ সেইস্থানে না আসিতে পারেন। তিনি গণ্যমান্য ব্যক্তিদিগের সভায় একটি পত্র প্রকাশ করিতে চাহিলেন, তাহাতে তিনি যেন গৌরাঙ্গদাসীকে বিষপান করাইবার জন্য রসিকানন্দ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইতেছেন। কিন্তু পত্রের বিষয় বস্তু শেষপর্যন্ত রসিকানন্দের মহত্ত্বকেই প্রকাশ করিয়া দেয়। রসিক সমস্ত বুঝিয়া গোপীবল্লভপুরে মহোৎসবের ব্যবস্থা করিলেন এবং শ্যামানন্দী-গণকে শ্যামসুন্দরপুরে আসিতে নিষেধ করিয়া দিলেন।

শ্যামপ্রিয়া সম্বন্ধে আর কিছুই জানিতে পারা যায় না। ডা. সুকুমার সেন শ্যামপ্রিয়া নাম্নী একজন পদকর্ত্রীর একটি পদের উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে কবি তাঁহার কবিতাতে মুরারি এবং রসিকের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিতেছেন। এই কবি যে শ্যামানন্দ-পত্নী শ্যামপ্রিয়া, তাহা সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে।

উপরোক্ত ঘটনার পর রসিক ধর্মপ্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। রাজা রামচন্দ্র-ধলের পুত্র তাঁহার দ্বারা দীক্ষিত হন। পাটনার রাজ্যেও অনেকে তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং তিনি কিছুকাল সেই স্থানে অতিবাহিত করেন। বাদশাহ্ শাহ্সুজা তাঁহার শক্তির কথা শুনিয়া তাঁহার নিকট লোক পাঠাইলে তিনি পূর্বোল্লেখিত গোপালদাস

নামক হস্তীর সাহায্যে তাঁহার জন্য চৌদ্দটি হস্তী ধরিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তাহার পর তিনি নাগপুরে 'শেখরভূমি' কেন্দুবিল্ব, বিষ্ণুপুর, আম্বুয়া প্রভৃতি স্থানেও পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রতি বৎসর নীলাচলে গিয়াও মহোৎসব করিতেন। তাছাড়া, তিনি বিভিন্নস্থানে বিভিন্ন প্রকারের উৎসবাদিরও প্রবর্তন করেন। একবার তিনি বাঁশদাতে পৌছাইলে তাঁহার পায়ে একটি কাঁটা ফুটিয়া যাওয়ায় তিনি প্রচণ্ড জ্বরে আক্রান্ত হন। ভক্তগণ তাঁহাকে গোপীবল্লভপুরে লইয়া যাইতেছিলেন। কিন্তু 'সুকপালে' পৌছাইলে তাঁহার অবস্থা শোচনীয় হয় এবং শিষ্যবৃন্দ তাঁহার আদেশ-মতে তাঁহাকে রেমুণায় লইয়া যান। সেইস্থানে পৌছাইলে ফাল্গুনের শিবচতুর্দশীর পর প্রতিপদ তিথিতে 'বাষট্টি বৎসর' বয়সে রসিকানন্দপ্রভুর তিরোভাব ঘটে।

'রসিকমঙ্গল'-গ্রন্থে উপরোক্ত ঘটনাবলী বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু অন্য-কোনও গ্রন্থে তাহাদের সমর্থন না থাকায় সমস্ত ঘটনাগুলিই যথাযথ কিনা বুঝিবার উপায় নাই। 'রসিকের খুল্লতাত তুলসী ঠাকুরে'র আজ্ঞায় এবং শেষপর্যন্ত রসিকের সম্মতিক্রমে তৎশিষ্য গোপীজনবল্লভদাস প্রধানত রসিকানন্দের প্রশস্তিমূলক এই গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং প্রশস্তিগুলির মধ্যে যে ভাবাতিরেক থাকিতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়।

মৃণালকান্তি ঘোষ জানাইতেছেন, "ইঁহার (রসিকানন্দের) রচিত গ্রন্থগুলির নাম 'অদ্বৈততত্ত্ব,' 'উপাসনা সার সংগ্রহ' ও 'বৃন্দাবন-পরিক্রম'।" রসিকানন্দও একজন পদকর্তা ছিলেন এবং তিনি ব্রজবুলি পদও রচনা করিয়াছিলেন।[৩৮]

'প্রেমবিলাসে' রসিকানন্দ সহ শ্যামানন্দের শিষ্যবর্গের একটি তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। তাঁহাদের অধিকাংশের প্রসঙ্গ পূর্বেই উত্থাপিত হইয়াছে। অবশিষ্ট শিষ্যবৃন্দের তালিকা নিম্নোক্ত রূপ :—

কিশোরীদাস, দীনবন্ধু, নিমু-গোপ, কানাই-গোপ, হরি-গোপ, যদুনাথ, ধ্রুবানন্দ, কৃষ্ণ-হরিদাস, হরি-রায়, কালীনাথ, কৃষ্ণকিশোর, রামভদ্র, বীরভদ্র, হলধর, রাধানন্দ, নয়ন-ভাস্কর, গৌরীদাস, শিখিধ্বজ, গোপাল।

(৩৮) HBL.—pp, 190, 191

বোরাকুলিতে তাঁহার একজন শ্রেষ্ঠ শিষ্য ও প্রকৃত মর্মবেত্তা[১০৮] গোবিন্দ-চক্রবর্তীর বাস। তিনি বাল্যকাল হইতে 'প্রেমমূর্তিকলেবর' ও ভজনানন্দ-মত্ত থাকিতেন বলিয়া তিনি 'ভাবক' বা 'ভাবুক চক্রবর্তী' নামেও বিখ্যাত ছিলেন। 'তাঁহার ঘরণী সুচরিতা বুদ্ধিমন্তা শ্রীঈশ্বরীর কৃপাপ্রাপ্ত্রী' হইয়াছিলেন। তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজবল্লভ-চক্রবর্তীও শ্রীনিবাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন[১০৯] এবং রাধাবিনোদ ও কিশোরীদাস নামক 'আর দুই পুত্র মাতার সেবক হইলা'।[১১০] অর্থাৎ তাঁহারা হইয়াছিলেন 'দুঁহে ঈশ্বরীর অনুসেবক।'[১১১] ডা. সুকুমার সেন মনে করেন যে এই কিশোর-চক্রবর্তীই 'কিশোরদাস'- বা 'কিশোরী-দাস'-ভণিতায় যে অল্প-সংখ্যক বাংলা ও ব্রজবুলি পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাদের রচয়িতা।[১১২]

যাহা হউক, গোবিন্দ পূর্বে মহুলায় বাস করিতেন। শ্রীনিবাস-আচার্যের শিষ্যত্ব-গ্রহণের পর তিনি বোরাকুলিতে আসেন।[১১৩] বীরচন্দ্রের খেতুরি-গমনকালেও গোবিন্দ-চক্রবর্তী তথায় উপস্থিত ছিলেন শ্রীনিবাস খেতুরি হইতে চলিয়া আসিবার সময় তাঁহাকে তথায় রাখিয়া আসেন।[১১৪] কিন্তু ইতিমধ্যে তিনি সম্ভবত বোরাকুলিতে ফিরিয়া মহামহোৎসবের আয়োজন করিতে থাকেন। তারপর শ্রীনিবাস বোরাকুলিতে গোবিন্দ-ভবনে পৌছাইলেন এবং গৌড়মণ্ডলের বিভিন্ন স্থান হইতেও ভক্তবৃন্দ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উৎসব আরম্ভ হইলে শ্রীনিবাস-আচার্য সকলের অনুমতি লইয়া বিগ্রহের অভিষেক করিলেন। বিগ্রহের নামকরণ হইল 'রাধাবিনোদ'। উৎসব-উপলক্ষে রাধিকা ও রাধাবিনোদ বিগ্রহ-দ্বয়ের সম্মুখে নরোত্তম-রামচন্দ্র-বীরচন্দ্র ও কৃষ্ণ-মিশ্রাদির অপূর্ব নৃত্যকীর্তন দেখিয়া গোবিন্দ-চক্রবর্তী ভাবাবিষ্ট হইলে সমবেত ভক্তবৃন্দ তাঁহাকে 'ভাবুক চক্রবর্তী' আখ্যা প্রদান করিলেন।[১১৫] ডা. সুকুমার সেন জানাইতেছেন[১১৬] যে রাধামোহন-ঠাকুরের 'পদামৃত-সমুদ্র' মধ্যে গোবিন্দ-ভণিতায় যে বাংলা পদগুলি রহিয়াছে সেই 'বাঙ্গালা পদগুলি প্রায়ই গোবিন্দ-চক্রবর্তীর রচনা বলিয়া রাধামোহন উল্লেখ করিয়াছেন।' তাহাছাড়া গোবিন্দ-চক্রবর্তী রচিত ব্রজবুলি পদের দৃষ্টান্তও রহিয়াছে।[১১৭]

কিছুদিন পরে শ্রীনিবাস বোরাকুলি হইতে নরোত্তমের সহিত খেতুরিতে গিয়া পৌছান। তখন শ্রীনিবাসের যশোগাথা চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। লোকে তাঁহাকে 'গৌর প্রেমস্বরূপ' মনে করিয়া[১১৮] বহির্মুখদিগের গর্ব-খর্বকারী বিবেচনা করিলেন। বহির্মুখরা তখন নানাভাবে অত্যাচার আরম্ভ করে। তাহারা 'উদর ভরণের' জন্য একজন দলপতিকে

(১০৮) কর্ণ.—৩য়. নি., পৃ. ৪৩ (১০৯) প্রে. বি.—২০শ. বি., পৃ. ৩৪৮; কর্ণ.—১ম. নি., পৃ. ১১ (১১০) কর্ণ.—১ম. নি., পৃ. ১১ (১১১) ঐ—২য়. নি., পৃ. ২৭ (১১২) HBL—pp. 199, 200, 201 (১১৩) ভ. র.—১৪।৯২-৯৩ (১১৪) ন. বি.—১১শ. বি., পৃ. ১৭২, ১৭৮ (১১৫) ভ. র.—১৪।১৪৫ (১১৬) ব. সা. প. প.—১৩৪০ (১১৭) HBL.—pp. 135, 136, 137, 138 (১১৮) ভ. র.—১৪।১৬১-৭৬

রঘুনাথ সাজাইয়া লোককে ভাঁড়াইতে থাকিলে সে 'স্বমত রচিয়া' বঙ্গদেশে আপনাকে 'কবীন্দ্র' বলিয়া প্রচার করিতে থাকে। 'মল্লিক'-খ্যাতিবিশিষ্ট কোনও 'মহাব্রহ্মদৈত্য' 'বিপ্রাধম' আবার নিজেকে গোপাল বলিয়া ভাঁড়াইতে থাকিলে লোকে তাঁহাকে 'শিয়াল'-আখ্যা প্রদান করে। শ্রীনিবাস যে 'কল্কি অবতার'-রূপে সেই সমস্ত দুর্বৃত্তকে শায়েস্তা করিয়াছেন, তজ্জন্য সকলেই তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। 'প্রেমবিলাস'-কার বলিতেছেন[১১৯] যে খেতুরিতে একবার এক বৈষ্ণব-মহাসভার বিশেষ অধিবেশন আরম্ভ হইলে 'বহুল পাষণ্ডী সভামধ্যে প্রবেশ' করিয়াছিল। কিন্তু সেই সভায় শ্রীনিবাসের 'শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা' এবং বীরভদ্রের 'বক্তৃতা' বৈষ্ণবধর্মেরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়া পাষণ্ডীদিগকে মত-পরিবর্তনে বাধ্য করিয়াছিল।

খেতুরি হইতে শ্রীনিবাস যাজিগ্রামে চলিয়া আসেন। কিন্তু গোবিন্দ-চক্রবর্তী সম্ভবত খেতুরিতে থাকিয়া যান। পরে তিনি নরোত্তমের নির্দেশে গৃহে ফিরিয়া আসেন।[১২০] 'নরোত্তমবিলাসে'র লেখক জানাইতেছেন[১২১] যে নরোত্তম যখন বুধরি হইতে গাম্ভীলায় গিয়া দেহরক্ষা করেন তখন গোবিন্দও তথায় তাঁহার সঙ্গী-হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। একই গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে ইহার পূর্বেই শ্রীনিবাস-আচার্য ও রামচন্দ্র-কবিরাজ উভয়েই বৃন্দাবনে যাত্রা করিয়া আর ফিরিয়া আসেন নাই, ইহজগৎ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।[১২২] কিন্তু 'অনুরাগবল্লী'র লেখক শ্রীনিবাসের তিনবার বৃন্দাবন-গমন এবং শেষবারে তাঁহার সহিত শিষ্য রামচন্দ্র-কবিরাজ ও পুত্র বৃন্দাবনেরও বৃন্দাবন-গমনের কথা স্বীকার করিয়াই বলিতেছেন যে রামচন্দ্রের তিরোভাবের পরেও নরোত্তম মধ্যে মধ্যে যাজিগ্রামে 'আচার্য ঠাকুর নিলয়ে' আসিতেন এবং 'ঠাকুর-পুত্র' (আচার্য ঠাকুর পুত্র) অর্থাৎ শ্রীনিবাসের পুত্রবৃন্দ অপ্রকট হইলে তিনি সকলের অনুরোধে বংশরক্ষার্থ পুনরায় বিবাহ করিয়া বীরভদ্র-বরে পুত্র-প্রাপ্ত হন ; সেই পুত্রই গতি-গোবিন্দ নামে আখ্যাত হইয়াছিলেন। কিন্তু এই বর্ণনার একাংশের ভ্রান্তির কথা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। অন্যাংশের বিবরণ যে সত্য, তাহাও বলা চলে না। 'গৌরপদতরঙ্গিণী'র একটি পদ হইতেও জানা যায় যে শ্রীনিবাস রামচন্দ্র ও নরোত্তম প্রায় 'এককালে' অন্তর্হিত হন[১২৩] এবং নরোত্তমের তিরোভাবের পূর্বে শ্রীনিবাস ও রামচন্দ্র উভয়েরই তিরোভাব ঘটে।[১২৪]

---

(১১৯) ১৯শ. বি., পৃ.৩৩৭ (১২০) ন. বি.—১১শ. বি., পৃ. ১৭৮ (১২১) ১১শ. বি., পৃ. ১৮৭-৮৮ (১২২) ন. বি.—১১শ. বি., পৃ. ১৭৯ (১২৩) গৌ. ত.—পৃ. ৩২৩ (১২৪) গৌ. ত.—পৃ. ৩২৭ ; 'স্বরূপ দামোদরের কড়চা'-নামক পরবর্তী-কালের একটি বাংলা পুঁথিতে (পৃ. ৩৪) শ্রীনিবাসকে নবরসিকের অন্তর্গত ধরিয়া তাঁহাকে বিদ্যাপতি ও হেমলতাকে লছিমা কল্পনা করা হইয়াছে।

শ্রীনিবাস-আচার্য অত্যল্প কয়েকটি পদও রচনা করিয়াছিলেন।[১২৬] তন্মধ্যে দুইটি পদ ব্রজবুলি ভাষায় লিখিত।[১২৭] শ্রীনিবাসের দুইজন পত্নীর সম্বন্ধেই 'কর্ণানন্দ'-কার বলিতেছেন[১২৮] :

শুদ্ধ রাগানুগা দোঁহার ভজন একান্ত।
পরকীয়া ভাব দোঁহার ভজন নিতান্ত॥

এইরূপ উক্তির তাৎপর্য বুঝিতে পারা যায় না। যাহা হউক, উভয়ের মধ্যে 'বড়ঠাকুরাণী'ই অধিকতর খ্যাতিসম্পন্না ছিলেন। তাঁহাকেই গৃহদেবতা বংশীবদনের শালগ্রাম-সেবা করিতে হইত।[১২৯] 'কর্ণানন্দ'-মধ্যে[১৩০] তাঁহার কয়েকজন শিষ্যোপশিষ্যের নাম বিবৃত হইয়াছে :—

গোবিন্দ-চক্রবর্তীর পত্নী (সুচরিতা ?) ও তৎপুত্র রাধাবিনোদ এবং কিশোরীদাস, কাঞ্চনগড়িয়ার হরিদাসাচার্যের কনিষ্ঠ তনয় শ্রীদাসের তিনপুত্র—জয়কৃষ্ণ, জগদীশ, শ্যামবল্লভ; জয়কৃষ্ণ-পত্নী সত্যভামা এবং জগদীশ(বা শ্যামবল্লভ ?)-ভার্যা চন্দ্রমুখী, রাধাবল্লভ-চক্রবর্তী, বৃন্দাবন-চক্রবর্তী, বৃন্দাবনী-ঠাকুরাণী। ইঁহাদের মধ্যে সত্যভামা ও চন্দ্রমুখীর অনেক শিষ্যোপশিষ্য ছিলেন। 'ভক্তমালে'র অনুবাদক লালদাস রচিত 'উপাসনাচন্দ্রামৃত' হইতে জানা যায়[১৩১] যে গোবিন্দ-চক্রবর্তীর পত্নীর নাম ছিল গৌরাঙ্গবল্লভা এবং কিশোরী-ঠাকুরের পত্নীর নাম শ্রীমতী-মঞ্জরী। লালদাস জানাইতেছেন যে এই মঞ্জরী-শিষ্য নয়নানন্দ-চক্রবর্তীই তাঁহার গুরু।

দ্রৌপদী-ঈশ্বরী দুই-পুত্র ও তিন-কন্যার জননী ছিলেন। পুত্রদিগের মধ্যে দ্বিতীয়-পুত্র রাধাকৃষ্ণের কথা বড় একটা শুনা যায় না। জ্যেষ্ঠ-পুত্র বৃন্দাবনই সমধিক খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন। 'ভক্তিরত্নাকর'-প্রণেতা জানাইতেছেন[১৩২] যে তাঁহার জন্মগ্রহণের পরেই বৃন্দাবনে সেই সংবাদ প্রেরিত হইলে জীবগোস্বামীই তাঁহার ঐরূপ নামকরণ করেন। পরবর্তিকালেও জীব পত্র-মারফত বৃন্দাবন[১৩৩] প্রভৃতির[১৩৪] খোঁজ খবর লইতেন। বৃন্দাবন বড় হইয়া সম্ভবত গৃহ-বিগ্রহ শালগ্রাম-সেবায়ও নিযুক্ত হইয়াছিলেন।[১৩৫] 'অনুরাগবল্লী'তে লিখিত হইয়াছে[১৩৬] যে শ্রীনিবাস তৃতীয়বার বৃন্দাবনে গমন করিলে তিনিও পিতার সঙ্গী হইয়াছিলেন। দ্রৌপদীর তিন কন্যার মধ্যে[১৩৭] কনিষ্ঠার নাম কাঞ্চনলতিকা। তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। মধ্যমার নাম কৃষ্ণপ্রিয়া। শ্রীনিবাস-শিষ্য কুমুদ-

---

(১২৬) ভ. র.—৬।৪৬৮; কর্ণ.—৬ষ্ঠ. নি., পৃ. ১১৩-১৪; গৌ. ত.—পৃ. ৩৬০ (১২৭) HBL.—p. 94 (১২৮) ১ম. নি., পৃ. ৮ (১২৯) অ. ব.—৬ষ্ঠ. ম., পৃ. ৪২ (১৩০) ২য়. নি., পৃ. ২৭, ২৬; ১ম. নি., পৃ. ৯; অ. ব.—৭ম. ম., পৃ. ৪৪, ৪৫ (১৩১) চৈ. উ.—পৃ. ৫৬৮ (১৩২) ১৪।১৯-২০ (১৩৩) ভ. র.—১৪শ. ত., পৃ ৬৩২; কর্ণ.—৫ম. নি., পৃ. ৯৬; প্রে. বি.—অর্ধবিলাস পত্র, পৃ. ৩০৩ (১৩৪) ভ. র.—১৪শ. ত., পৃ. ৬৩২; প্রে. বি.—অর্ধ-বি., পৃ. ৩০২, ৩০৫ (১৩৫) অ. ব.—৬ষ্ঠ. ম., পৃ. ৪২

চট্টরাজের পুত্র চৈতন্য-চট্টরাজের সহিত তাঁহার পরিণয় ঘটে। চট্টরাজের জামাতা রাজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দুই কন্যা মালতী- ও ফুলঝি-ঠাকুরাণী—ইঁহারা সকলেই শ্রীনিবাসের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন। 'কর্ণানন্দো'ক্ত 'চট্টরাজ' কাঁহার নাম বুঝা যাইতেছে না। 'প্রেমবিলাস'-কার বলেন যে রাজেন্দ্র-বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন কলানিধি-চট্টরাজের জামাতা এবং মালতী-ফুলঝির স্বামী। অথচ 'কর্ণানন্দে' কলানিধির নামও উপরোক্ত উল্লেখের পরেই পৃথকভাবে উক্ত হইয়াছে। সম্ভবত, কলানিধি কুমুদেরই ভ্রাতা ছিলেন বলিয়া রাজেন্দ্রকে চট্টরাজ অর্থাৎ কুমুদ-চট্টরাজের জামাতা বলা হইয়া থাকিবে। 'ভক্তিরত্নাকর' ও 'নরোত্তমবিলাসে'র বর্ণনায় দেখা যায় যে রামকৃষ্ণ-চট্টরাজের সহিত কুমুদও গদাধরদাসের তিরোভাবতিথি-মহামহোৎসব এবং খেতুরি-উৎসবে যোগদান করেন।[১৩৮] 'অনুরাগবল্লী'[১৩৯] হইতে জানা যায় যে রামকৃষ্ণ ও কুমুদ দুই ভ্রাতা ছিলেন। এবং চট্টরাজ-গোষ্ঠী[১৪০] শ্রীনিবাস কর্তৃক দীক্ষিত হন। এই গ্রন্থে কলানিধির নাম নাই, অথচ রাজেন্দ্রকে চট্টরাজ-জামাতা বলা হইয়াছে। ইহাতে মনে হয় কলানিধি ও রামকৃষ্ণ কুমুদেরই ভ্রাতা ছিলেন। 'প্রেমবিলাস' ও 'কর্ণানন্দে' এতৎসহ একজন বৃন্দাবন-চট্টরাজকেও শ্রীনিবাস-শিষ্য বলা হইয়াছে এবং উভয় গ্রন্থেই আর একজন কলানিধি-আচার্যকে পাওয়া যায়, তিনি শ্রীনিবাসের বংগদেশী শিষ্য।[১৪১] কিন্তু 'প্রেমবিলাসে'র মধ্যে চট্টরাজ-বংশায় রামকৃষ্ণ, কুমুদ ও কলানিধির নাম এরূপভাবে উল্লেখিত হইয়াছে যে তাঁহাদিগকে তিন ভ্রাতা বলিয়া নিঃসন্দেহ হওয়া যায় এবং উভয় গ্রন্থেই দ্রৌপদীর জ্যেষ্ঠ কন্যা হেমলতাকে রামকৃষ্ণ-চট্টরাজের পুত্র গোপীজনবল্লভ-চট্টরাজের পত্নী বলা হইয়াছে। এই সকল হইতে আরও একটি বিষয় মনে আসে যে চট্টরাজ-পরিবারের অন্য কেহ হয়ত দ্রৌপদী-ঈশ্বরীর কনিষ্ঠা কন্যা কাঞ্চনলতিকার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। বৃন্দাবন-চট্টরাজ যদি কলানিধির পুত্র হইয়া থাকেন তাহা হইলে তিনিই শ্রীনিবাসের একজন জামাতা হইতে পারেন।

ঈশ্বরীর তিন কন্যার মধ্যে হেমলতাই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি একটি বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পিতৃগুরু গোপাল-ভট্টের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের নামানুসারে সেই বিগ্রহের নামকরণ করা হইয়াছিল 'রাধারমণ'। এতদুপলক্ষে তিনি মহামহোৎসবেরও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।[১৪২] হেমলতাও বহু শিষ্যকে দীক্ষা দান করিয়াছিলেন। 'কর্ণানন্দে' তাঁহাদের কয়েকজনের নাম লিপিবদ্ধ আছে[১৪৩]:

(১৩৬) ৬ষ্ঠ. ম., পৃ. ৪১ (১৩৭) কর্ণ.—১ম. নি., পৃ. ৯-১০ ; প্রে. বি.—২০শ. বি., পৃ. ৩৪৮ (১৩৮) ভ. র.—৯।৪০২ ; ১০।১৪০ ; ন. বি.—৬ষ্ঠ. বি., পৃ. ৭৮, ৮৭ (১৩৯) ৭ম. ম., পৃ. ৪৪ (১৪০) বৈ. দি.-মতে (পৃ. ১১৪) ইঁহাদের বাসস্থান ছিল মণিপুরে। (১৪১) প্রে. বি.—২০শ. বি., পৃ. ৩৫১ ; কর্ণ.—১ম. নি., পৃ. ২৪ (১৪২) অ. ব.—৬ষ্ঠ. ম., পৃ. ৪২ (১৪৩) ২য়. নি., পৃ. ২৭–২৮

সুবলচন্দ্র-ঠাকুর, গোকুল-চক্রবর্তী, রাধাবল্লভ-ঠাকুর, বল্লভদাস, যদুনন্দন-বৈদ্যদাস, কানুরাম-চক্রবর্তী, দর্পনারায়ণ, চণ্ডী-সিংহ, রামচরণ, মধু-বিশ্বাস, রাধাকান্ত-বৈদ্য, জগদীশ-কবিরাজ (রাধাবল্লভ-কবিরাজের ভ্রাতা)। এই শিষ্যবৃন্দের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, মালিহাটি গ্রামনিবাসী সপ্তদশ শতাব্দীর কবি যদুনন্দনদাস-বৈদ্য। তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তদ্রচিত 'কর্ণানন্দ'-গ্রন্থে কবি আপনার সম্বন্ধে এবং হেমলতার সহিত তাঁহার নানাবিধ আলাপ-আলোচনা ও কথাবার্তা সম্বন্ধে কতকগুলি তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন। গ্রন্থটিতে 'প্রেমবিলাসে'রও উল্লেখ আছে। গ্রন্থকার একজন বিখ্যাত পদকর্তা ছিলেন। ব্রজবুলি পদ রচনাতেও তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন।

শ্রীনিবাস-পত্নী গৌরাঙ্গপ্রিয়ার গর্ভজাত-পুত্র গতি-গোবিন্দও খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। 'নিত্যানন্দবংশবিস্তার' গ্রন্থে বলা হইয়াছে[১৪৪] যে তিনি রঘুনন্দন-ঠাকুরের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিতে চাহিলে রঘুনন্দন শূদ্র বলিয়া বীরচন্দ্র তাঁহাকে এই বিষয়ে নিবৃত্ত করিয়া নিজেই তাঁহাকে 'মন্ত্র দিয়া কৈল আত্মসাৎ'। কিন্তু এই বিবরণ কতদূর সত্য তাহা বলা যায় না। কারণ, কিছু পরেই দেখা যায় যে বীরচন্দ্র স্বয়ং শ্রীনিবাসকেই গতি-গোবিন্দের জন্মরহস্য সম্বন্ধে জানাইতেছেন।[১৪৫] 'আচার্যে কহিল প্রভু গতির বৃত্তান্ত'। তাছাড়া, 'প্রেমবিলাস' হইতে জানা যায়[১৪৬] যে গতি-গোবিন্দ ত্রয়োদশবর্ষ বয়স্ক হইলে শ্রীনিবাস বীরচন্দ্রকে আনাইয়া তাঁহাকেই দীক্ষাদানের অনুরোধ জ্ঞাপন করেন; কিন্তু বীরচন্দ্রের নির্দেশে শ্রীনিবাসই গতি-গোবিন্দকে মন্ত্রদীক্ষা দান করেন। তবে বীরচন্দ্রের সহিত যে গতি-গোবিন্দের একটি বিশেষ সম্বন্ধ ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। বীরচন্দ্র সম্বন্ধে গতি-গোবিন্দের নামে একটি গ্রন্থ প্রচলিত আছে। কিন্তু প্রাপ্ত গ্রন্থটির প্রামাণিকতা সম্বন্ধেও সন্দেহ আছে। 'বীররত্নাবলী' নামক সেই গ্রন্থটির দ্বিতীয় অধ্যায়-শেষে লিখিত হইয়াছে[১৪৭]:

মহাপ্রভু বীরচন্দ্র অমূল্য পদদ্বন্দ্বে।
বাসুদেব সুত কহে এ গতি-গোবিন্দে ॥

প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে এইরূপ বীরচন্দ্র-সম্বন্ধীয় প্রশস্তি আছে। কিন্তু সেইগুলিতে 'বাসুদেব সুত' স্থলে 'শ্রীনিবাসসুত'ই লিখিত হইয়াছে। গতি-গোবিন্দ একজন পদকর্তাও ছিলেন।[১৪৮] 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি'তে উদ্ধৃত তাঁহার দুইটি পদের মধ্যে

(১৪৪) পৃ. ৩৫–৩৬ (১৪৫) পৃ. ৩৯ (১৪৬) ১৭শ. বি., পৃ. ২৫২ (১৪৭) বী. র.—পৃ. ২ (১৪৮) পে. ত.—পৃ. ২৭৮

একটি ব্রজবুলি ভাষায় লিখিত।[১৪৯] 'কর্ণানন্দে' গতি-গোবিন্দের পুত্রাদির সম্বন্ধে বলা হইয়াছে[১৫০] :

শ্রীগতি প্রভুর শিষ্য প্রধান তনয়।
শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদ ঠাকুর গম্ভীর হৃদয় ॥
শ্রীসুন্দরানন্দ আর শ্রীহরি ঠাকুর।
তিন পুত্র শিষ্য তার তিন ভক্তশূর ॥
তিনপত্নী মধ্যেতে কনিষ্ঠা যেই জন।
তিঁহো ত হইলা প্রভুর কৃপার ভাজন ॥
সর্ব জ্যেষ্ঠার নাম শ্রীসত্যভামা যিঁহো।
শ্রীরাধামাধবকে কৃপা করিয়াছেন তিঁহো ॥

'পদামৃতসমুদ্রে' গতি-গোবিন্দ-পুত্র উক্ত কৃষ্ণপ্রসাদের একটি পদ এবং 'পদকল্পতরু'তে তাঁহার অন্য-পুত্র সুন্দরদাস বা সুন্দরানন্দ-ঠাকুরের একটি বাংলা (১৩২৮) ও একটি ব্রজবুলি (১৩২৭) পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। 'কর্ণানন্দ'-গ্রন্থে গতি-গোবিন্দের অন্যান্য শিষ্যের তালিকা নিম্নোক্তরূপ[১৫১] : তুলসীরামদাসের পুত্র ঘনশ্যাম, কন্দর্পরায়-চট্ট, ব্যাস-কন্যা কনকপ্রিয়া, জানকী-বিশ্বাসের পুত্র হাড়গোবিন্দ, প্রসাদ-বিশ্বাসের পুত্র বৃন্দাবনদাস, ব্রজমোহন-চট্টরাজ, পুরুষোত্তম-চক্রবর্তী, সোণারুদ্ধি গ্রামস্থ জয়রামদাস ('অনুরাগবল্লী'[১৫২]-মতে গ্রামের নাম কাণসোণা), রাধাকৃষ্ণ-আচার্যঠাকুর, কৃষ্ণপ্রদাস-চক্রবর্তী ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র মদন-চক্রবর্তী, বল্লভীকান্ত-চক্রবর্তী ('পদকল্পতরু'তে সম্ভবত ইঁহারই রচিত একটি বাংলা ও একটি ব্রজবুলি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে—৫৫৩, ৫৫৪), ঘনশ্যাম-কবিরাজ।

'প্রেমবিলাসে'র শ্রীনিবাস-শাখায় ১১৫ জন শিষ্যের নাম লিখিত হইয়াছে।[১৫৩] পূর্বোল্লেখিত শিষ্যদিগকে বাদ দিয়া অবশিষ্ট শিষ্যবৃন্দের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

নরসিংহ-কবিরাজ, রঘুনাথ-কর, গোপালদাস, জগৎ-দুর্লভ, কর্ণপুর-কবিরাজ, বুঁধইপাড়াবাসী গোপালদাস-ঠাকুর, রূপনারায়ণ-ঘটক, রঘুনন্দনদাস (ঘটক),[১৫৪] সুধাকর-মণ্ডল ও তৎপত্নী শ্যামপ্রিয়া, এবং তাঁহাদিগের তিন পুত্র রাধাবল্লভ-, কামদেব-[১৫৫] ও গোপাল-মণ্ডল,[১৫৬] ফরিদপুর-নিবাসী কৃষ্ণদাস-চট্ট, মোহনদাস (বৈদ্য, পদকর্তা, অনেকগুলি ব্রজবুলি পদ রচনা করেন[১৫৭]) ও বনমালীদাস (ইঁহারা দুইজনেই বৈদ্য[১৫৮]), রাধাবল্লভদাস

---

(১৪৯) HBL—p.213, (১৫০) ২য়. নি.,পৃ. ২৮ (১৫১) ২য়. নি., পৃ. ২৮ (১৫২) ৭ম. ম., পৃ. ৪৫

(১৫৩) ২০শ. বি., পৃ. ৩৪৬–৫১ (১৫৪) কর্ণ.—১ম. নি., পৃ. ১২ (১৫৫) খেতুরি-উৎস'বে যোগদানের জন্য গমন-পথে জাহ্নবার সহিত একজন কামদেবকে দেখা যায় (ভ. র.—১০।৪০৩)। উভয়ে এক ব্যক্তি হইতে পারেন। (১৫৬) ইনি নারায়ণ-মণ্ডলের ভ্রাতা—অ. ব.—৭ম. ম., পৃ. ৪৫ (১৫৭) HBL—p. 156 (১৫৮) কর্ণ.—১ম. নি., পৃ. ১৩

ও রমনদাস (ইঁহারা দুইজনেই কামদেব-মণ্ডলের পুত্র[১৫৯]), মথুরাদাস, রাধাকৃষ্ণদাস, 'মহা-আঁখরিয়া' রামদাস-কবিবল্লভ (আচার্যকে বহু পুঁথি দিয়াছে লিখিয়া), বনমালীদাসের পিতা (পুত্র[১৬০]) গোপালদাস, আত্মারাম, নকড়ি (ইনি খেতুরি-উৎসবে যোগদান করেন ;[১৬১] কিন্তু ইনি জাহ্নবার সহিত আগত খেতুরি-উৎসবে যোগদানকারী নকড়িদাস হইতে ভিন্ন ব্যক্তি), চট্ট-শ্যামদাস, দুর্গাদাস, গোপীরমণদাস বৈদ্য (কর্ণানন্দে ইঁহার গোপীরমণ-কবিরাজ নামও দৃষ্ট হয়।[১৬২] 'পদকল্পতরু'র ১৬০৮-সংখ্যক পদটি ইঁহার হওয়া বিচিত্র নহে.[১৬৩]), রঘুনাথদাস (পদকল্পতরুর একটি ব্রজবুলিপদ—২৩৮৭—সম্ভবত ইঁহারই রচিত[১৬৪]), শ্রীদাস-কবিরাজ, গোকুলানন্দ-চক্রবর্তী, গোকুলানন্দদাস [ইনিই কি কর্ণানন্দোক্ত গোকুলানন্দ (কবিরাজ ?) এবং পদকর্তা-উদ্ধবদাসোক্ত 'ভক্তিগ্রন্থ' রচয়িতা গোকুল ?[১৬৫]] গোপালদাস-ঠাকুর, রাধাকৃষ্ণদাস, রামদাস-ঠাকুর, মুকুন্দ-ঠাকুর, করণ-কুলোদ্ভব করুণাদাস-মজুমদার ও তৎপুত্রদ্বয় জানকীরামদাস ('দাস জানকী'-ভণিতার একটি বাংলাপদ পাওয়া যায়।[১৬৬]) ও প্রকাশদাস (ইঁহারা দুইজনে 'আচার্য পত্রলেখক বলি বিশ্বাস খ্যাতি পান'। প্রসাদদাস নামক কবির দুইটি বাংলা কবিতা ও একটি ব্রজবুলি কবিতা পাওয়া গিয়াছে।[১৬৭] কিন্তু তিনি এই প্রকাশদাস কিনা, কিংবা "পদকর্তা প্রসাদদাস যে কে, তাহা স্থিরীকৃত হইল না।"[১৬৮]) রামদাস, গোপালদাস, বল্লভী-কবিপতি (ইঁহারা তিন সহোদর—উপাধি 'কবিরাজ'[১৬৯], বল্লভীকান্ত-কবিরাজ কাঞ্চনগড়িয়া হইতে শ্রীনিবাসের সহিত গিয়া খেতুরি-মহোৎসবে যোগদান করেন[১৭০]), দেউলি-গ্রামস্থ কৃষ্ণবল্লভ-চক্রবর্তী (ইঁহার কথা পূর্বেই বিবৃত হইয়াছে), নারায়ণ-কবিরাজ, নৃসিংহ-কবিরাজ (নৃসিংহের সহোদরই নারায়ণ[১৭১]), বাসুদেব-কবিরাজ, বৃন্দাবনদাস-কবিরাজ (ইঁহার আসল নাম বৃন্দাবনদাস[১৭২]), ভগবান-কবিরাজ, শ্রীমন্ত-চক্রবর্তী, রঘুনন্দন, গৌরাঙ্গদাস, গোপীজনবল্লভ-ঠাকুর, ঠাকুর-শ্রীমন্ত, চৈতন্যদাস, গোবিন্দদাস, তুলসীরামদাস (তন্তুবায়[১৭৩]; 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি'তে তুলসীদাসের একটি ব্রজবুলি পদ পাওয়া যায়[১৭৪]), বিপ্র-বলরামদাস, উৎকল-বাসী

---

(১৫৯) অ. ব.—৭ম. ম., পৃ.৪৫ (১৬০) কর্ণ.—১ম. নি., পৃ. ১৪ (১৬১) ভ. র.—৯।৩৯৯ (১৬২) ১ম, নি., পৃ. ১৪ ; ৬ষ্ঠ. নি., পৃ. ১১৯ ; অ. ব.—৭ম. ম., পৃ. ৪৫ (১৬৩) HBL—p. 407 (১৬৪) HBL—p. 194 (১৬৫) কর্ণ.—৬ষ্ঠ. নি., পৃ. ১১৯ ; গৌ. ত.—পৃ. ৩২৮ (১৬৬) HBL—p. 198 (১৬৭) HBL—p. 174 (১৬৮) গৌ. ত. (প. প.)—পৃ. ২০১ (১৬৯) কর্ণ.—১ম. নি., পৃ. ১৭ ; ৩য়. নি., পৃ. ৩৫ ; ৬ষ্ঠ. নি., পৃ. ১২০ (১৭০) ভ. র.—১০।১৩৫ (১৭১) কর্ণ.—৬ষ্ঠ. নি., পৃ. ১২০ ; অ. ব.—৭ম. ম., পৃ. ৪৫ (৬৫২) কর্ণ.—১ম. নি., পৃ. ২২ (১৭৩) ঐ—১ম. নি., পৃ. ২৩ (১৭৪) HBL—p. 192

জয়রাম-চৌধুরী (দয়ারাম-চৌধুরী—বলরাম ও দয়ারাম একই গ্রামবাসী[১৭৫]), হরিবল্লভ-সরকার-ঠাকুর, কৃষ্ণবল্লভ-চক্রবর্তী, গৌড়দেশ-বাসী কৃষ্ণ-পুরোহিত-ঠাকুর, শ্যাম-চট্ট, গৌড়দেশবাসী জয়রাম-চক্রবর্তী, ঠাকুরদাস-ঠাকুর, শ্যামসুন্দরদাস, মথুরাদাস, আত্মারাম (ইহারা তিনজন মথুরাবাসী ব্রাহ্মণ), গোবিন্দরাম ও গোপালদাস (শ্রীকুণ্ডেতে বাস), মোহনদাস, ব্রজানন্দদাস (ইনি একটি ব্রজবুলি পদ রচনা করিয়াছিলেন[১৭৬]), হরিরাম, হরিপ্রসাদ, সুখানন্দ, মুক্তারাম, বংগদেশী কলানিধি, রামশরণ, রসিকদাস ও প্রেমদাস (ইহারা দুই ভাই[১৭৭])। 'প্রেমবিলাস'-কার বলেন[১৭৮] যে সম্ভবত প্রেমানন্দ নামক এক ব্যক্তি শ্রীনিবাসের শিষ্য হিসাবে খেতুরি-মহামহোৎসবে যোগদান করেন। কিন্তু অন্য কোথাও তাঁহার উল্লেখ নাই।

উপরোক্ত শিষ্যবৃন্দের মধ্যে নৃসিংহ-কবিরাজ ও ভগবান-কবিরাজ কাঞ্চনগড়িয়ায় হরিদাসাচার্যের তিরোধান-তিথি মহামহোৎসব-শেষে শ্রীনিবাস-আচার্যপ্রভুর সহিত খেতুরি-অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন।[১৭৯] ইঁহাদের সহিত 'পঞ্চকূটে সেরগড়-বাসী শ্রীগোকুল'কেও দেখা যায়। ডা. সুকুমার সেন মনে করেন যে 'পদকল্পতরু'তে উদ্ধৃত গোকুলদাস-ভণিতার একটি ব্রজবুলিপদ (২৭১৫) এই গোকুলের রচিত[১৮০] হইতেও পারে। কারণ, 'ভক্তিরত্নাকরে'ও ইঁহাকে গোকুলদাস বলা হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, 'ভক্তিরত্নাকরে' ইনি 'শ্রীগোকুল' এবং 'অনুরাগবল্লী'তে ইনি 'গোকুল কবিরাজ' নামে বর্ণিত। ডা. সেন বলেন যে উক্ত পদকর্তার পক্ষে অন্যকোনও গোকুল বা গোকুলানন্দ হওয়াও বিচিত্র নহে। সম্ভবত তাহা হইতেও পারে। কারণ, আলোচ্য গোকুলকে যদিও 'কবীন্দ্র'-আখ্যা দান করা হইয়াছে তাহা হইলেও 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র নিত্যানন্দ-শাখায় একজন গোকুলদাস ও 'প্রেমবিলাসে'র নরোত্তম-শাখায় একজন গোকুলদাসকে পাওয়া যায়। শেষোক্ত গোকুলদাসও একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ও সুগায়ক ছিলেন।[১৮১] আলোচ্যমান গোকুল-কবিরাজের পূর্ববাস ছিল কড়ই এবং ইঁহাকে 'কবীন্দ্র'-আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।[১৮২] ইনিও শ্রীনিবাস-শিষ্য ছিলেন এবং ইঁহাকেই কর্ণপুরাদির (কবিরাজ) সহিত মধ্যে মধ্যে খেতুরিতে দেখা যায়।[১৮৩]

'ভক্তিরত্নাকর'-প্রণেতা বলেন যে খেতুরি-গমন সময়ে 'মহাকবি' নৃসিংহ-কবিরাজের সহিত তাঁহার ভ্রাতা 'কবিশ্রেষ্ঠ' নারায়ণও গমন করিয়াছিলেন। খেতুরি-মহামহোৎসব উপলক্ষে নৃসিংহ ও ভগবান বিভিন্ন বাসাতে ভক্তদিগের দেখাশুনার কাজে নিযুক্ত হইয়া-

---

(১৭৫) কর্ণ.—১ম. নি., পৃ. ২৩ (১৭৬) HBL—p. 176 (১৭৭) কর্ণ.—১ম. নি., পৃ. ২৪ (১৭৮) ১৯শ. বি., পৃ. ৩০৮ (১৭৯) ভ. র.—১০।১৩৬ (১৮০) HBL—p. 187 (১৮১) ত্র.—নরোত্তম (১৮২) ভ. র.—১০।১৩৯ ; অ. বু.—৭ম. ম., পৃ. ৪৫ (১৮৩) ত্র.—নরোত্তম

ছিলেন এবং উৎসবান্তে তাঁহারা জাহ্নবাদেবীর সহিত বৃন্দাবন-যাত্রা করিয়াছিলেন।[১৮৪] জাহ্নবাদেবীর গৌড়-প্রত্যাবর্তন-পথেও ভগবানের নামোল্লেখ করা হইয়াছে। 'ভক্তি-রত্নাকরে' শ্রীনৃসিংহ-কবিরাজ-কৃত 'নবপদ্য' হইতে শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।[১৮৫] সম্ভবত এই ভগবান-কবিরাজ সম্বন্ধেই 'অনুরাগবল্লী'র লেখক জানাইতেছেন[১৮৬] যে ইনি ছিলেন বীরভূমবাসী এবং বৈদ্যবংশীয়, ইঁহার ভ্রাতার নাম রূপ-কবিরাজ ও পুত্রের নাম ছিল নিমু-কবিরাজ। কিন্তু 'কর্ণামৃত'- ও 'ভক্তিরত্নাকর'-মতে রূপ এবং নিমাই দুইভ্রাতা ছিলেন।[১৮৭] ভগবান সম্বন্ধে 'ভক্তিরত্নাকর'-প্রণেতা বলেন, 'যাঁর ভ্রাতা রূপ নিমুবীর ভৌমালয়।' ভগবানাদির সহিত বাসুদেব-কবিরাজও একই কালে বৃন্দাবন-গমন করেন।[১৮৮] তাহাতে মনে হয় ইনিও খেতুরি-উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। ইনি একজন বিশেষ গণনীয় ব্যক্তি ছিলেন। পরবর্তিকালে স্বয়ং জীব-গোস্বামীও শ্রীনিবাসের নিকট পত্র-মারফত ব্যাসাচার্যের সহিত ইঁহার খোঁজ লইতেন।[১৮৯]

আর একজন বিশেষ বিখ্যাত ভক্ত ছিলেন কর্ণপূর-কবিরাজ; খেতুরি-উৎসবে তিনিও একটি-বাসার ব্যবস্থাকর্তা নিযুক্ত ছিলেন।[১৯০] কিন্তু উৎসব-শেষে তিনি জাহ্নবার সহিত বৃন্দাবনে না গিয়া স্বীয়-গুরু শ্রীনিবাসের সহিত খেতুরি হইতে বিদায় গ্রহণ করেন।[১৯১] সম্ভবত তিনি বুধরি বা তৎসন্নিকটস্থ বাহাদুরপুর ইত্যাদির কোনও একটি গ্রামে বাস করিতেন।[১৯২] শ্রীনিবাস ও রামচন্দ্র-কবিরাজের তিরোভাবের পরে নরোত্তম মধ্যে মধ্যে বুধরিতে আসিলে উভয়ের সাক্ষাৎ ঘটিত।[১৯৩] তিনি শ্রীনিবাস-আচার্যের 'গুণলেশসূচক' বা 'শ্রীনিবাসের শাখা'-গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ বা গ্রন্থগুলি 'কর্ণানন্দ'-, 'ভক্তিরত্নাকর-' ও 'নরোত্তমবিলাস'-রচনায় শ্রীনিবাস সম্বন্ধে নানাবিধ তথ্য যোগাইয়াছে।[১৯৪] কোনও কোনও গ্রন্থে সম্ভবত তাঁহাকে ভুলবশত কবিকর্ণপুর বলা হইয়াছে এবং তৎসহ বৃন্দাবনস্থ কৃষ্ণদাস-কবিরাজাদির সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতার কথাও বলা হইয়াছে।[১৯৫] কিন্তু তিনি বৃন্দাবন গিয়াছিলেন কিনা তাহার কোনও প্রমাণ নাই।

যাজিগ্রামস্থ রূপনারায়ণ-ঘটকও হরিদাসাচার্যের তিরোধানতিথি-মহোৎসবের পর শ্রীনিবাসের সহিত খেতুরিতে গিয়াছিলেন।[১৯৬] আবার বীরচন্দ্রপ্রভুর খেতুরি আগমন-কালেও তিনি খেতুরিতে গিয়া শ্রীনিবাসের সহিত বুধরিতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন।[১৯৭]

---

(১৮৪) ন. বি.—৬ষ্ঠ. বি., পৃ.৮৬-৮৭ ; ৮ম. বি., পৃ.১১৮ (১৮৫) ৩।৭৮ (১৮৬) ৭ম.ম., পৃ. ৪৫(১৮৭) কর্ণ.—১ম. নি., পৃ. ২২ ; ভ. র.—১০।১৩৮ (১৮৮) ন. বি.—৮ম.বি., পৃ. ১১৮ (১৮৯) ভ. র.—১৪।২১ (১৯০) ন.বি.—৬ষ্ঠ. বি., পৃ. ৮৬ (১৯১) ঐ.—৮ম. বি., পৃ. ১২৩ (১৯২) ঐ—১০ম. বি., পৃ. ১৫৫ (১৯৩) ঐ—১১শ. বি., পৃ. ১৮২ (১৯৪) কর্ণ.—১ম. নি., পৃ, ৫, ১১-১২ ; ৬ষ্ঠ. নি., পৃ. ১১৯ ; ন. বি.—১ম. বি., পৃ. ১৭-১৮ ; ভ. র.—৮।৫৫৪ (১৯৫) স. সূ.—পৃ. ৮, ১০ ; চৈ. দী.,—পৃ. ১২ (১৯৬) ভ. র.—১০।১৪২ (১৯৭) ন. বি.,—১১ শ. বি., পৃ. ১৭৬-৭৭

পরিশিষ্ট
প্রথম পর্যায়
বংশীবদন

একমাত্র 'বংশীশিক্ষা'-গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে[১] :

চৌদ্দ শত ষোল শকে মধু পূর্ণিমায়।
বংশীর প্রকটোৎসব হয়ত সন্ধ্যায় ॥
নদীয়ার মাঝখানে সকল লোকেতে জানে,
কুলীয়া পাহাড় নামে স্থান।
তথায় আনন্দ ধাম শ্রীছকড়ি চট্ট নাম
মহাতেজা কুলীন সন্তান ॥

গ্রন্থকার বলেন যে এই ছকড়ি-চট্ট 'পাটুলীর বাস ছাড়িয়া কুলীয়ায়' আসিয়া বাস করিতে থাকিলে তাঁহার পত্নীর গর্ভে বংশীবদন জন্মলাভ করেন। 'মুরলীবিলাস'-মতে[২] সেই পত্নীর নাম ছিল সুনীলা। এই গ্রন্থে ছকড়িকে নবদ্বীপবাসিরূপে বর্ণিত করিয়া বলা হইয়াছে যে 'বসন্তকালের ক্ষপা পূর্ণ চন্দ্রোদয়ে' বংশীবদন ভূমিষ্ঠ হন। কিন্তু বংশীবদনের জন্ম তারিখ সম্বন্ধে কোনও প্রামাণিক গ্রন্থে কোনও উল্লেখ নাই।

বংশীদাস সম্ভবত গৌরাঙ্গের বিশেষ স্নেহভাজন হইয়া নবদ্বীপলীলায় যুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে'র একটি তালিকার একটিমাত্র অকিঞ্চিৎকর উল্লেখ[৩] ছাড়া প্রাচীন জীবনীকারদিগের কোন গ্রন্থ হইতেই বংশীবদন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু তথ্য সংগৃহীত হয় না। বহু পরবর্তিকালে লিখিত বংশীর জীবনচরিতগুলিতে লিখিত হইয়াছে যে বংশীবদন বিবাহ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পত্নীর গর্ভে দুইটি পুত্রসন্তান জন্মলাভ করেন; তাঁহাদের নাম রাখা হয় চৈতন্য ও নিতাই। আরও বলা হইয়াছে যে গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস-গ্রহণের পর বংশীবদন শচী-বিষ্ণুপ্রিয়ার সাহায্যার্থে নিজেকে নানাভাবে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। কিন্তু জীবনচরিতগুলির মধ্যে এতই বর্ণনা-বিভিন্নতা দৃষ্ট হয় যে বংশীর জীবন-সম্বন্ধীয় বর্ণিত ঘটনাগুলির মধ্যে অত্যল্প কয়েকটিকেই নির্ভরযোগ্য বলিয়া গ্রহণ করা চলে। 'মুরলীবিলাস'-মতে[৪] মহাপ্রভুর অপ্রকট-বার্তা শুনিয়া বংশীবদন লীলাসংবরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু 'মুরলীবিলাসে'র অন্যান্য বহু ঘটনার মত এই তথ্যটিকেও প্রামাণিক বলা যায় না। কারণ, 'বংশীশিক্ষা' হইতে জানা যায়[৫] যে মহাপ্রভুর তিরোধানের পর

(১) পৃ. ৬-৭ (২) পৃ. ৩৭, ৩৯ (৩) বি. খ., পৃ. ১৪৫ (৪) পৃ. ৪৭, ১৪৫ (৫) পৃ. ১৮৭-৮৯

বংশীবদন গৌরাঙ্গ জন্ম-সম্পর্কিত নিম্ব-বৃক্ষটির কাষ্ঠ হইতে গৌরাঙ্গ-মূর্তি নির্মাণ করাইয়া মহাসমারোহে সেই মূর্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন। তাহাছাড়া, গ্রন্থকার বলেন যে শ্রীনিবাস-আচার্য যখন প্রথমবার নবদ্বীপে পৌছান, তখন বংশীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটে এবং বংশীবদন তাঁহাকে 'মিশ্রের আলয়ে' লইয়া যান। 'প্রেমবিলাস'-গ্রন্থেও[৬] এই ঘটনাটি বর্ণিত হইয়াছে এবং 'ভক্তিরত্নাকরে'ও ইহার বিশেষ সমর্থন আছে। সুতরাং এই বংশী-শ্রীনিবাস ঘটনাটি সত্য হইলেও বুঝিতে পারা যায় যে মহাপ্রভুর তিরোভাব-বার্তা শ্রবণের পরক্ষণেই বংশীবদন দেহরক্ষা করেন নাই।

'বংশীশিক্ষা'-মতে[৭] গৌরাঙ্গমূর্তি প্রকাশের পর বংশীবদন যাদব-মিশ্রের পুত্রের উপর সেই বিগ্রহ-সেবার ভারার্পণ করিয়া দক্ষিণ-দেশে গমন করেন এবং তথায় জগদানন্দ, গোকুল, মোহন, মনোহর, শ্যামদাস প্রভৃতি কয়েকজন ভক্তকে দীক্ষিত করিয়া প্রত্যাবর্তন করেন। তারপর

গৌরলীলা কৃষ্ণলীলা গ্রন্থপদাবলী।
তবে রচিলেন বংশী হইয়া ব্যাকুলী॥

রামাই-এর 'চৈতন্যগণোদ্দেশদীপিকা'তেও বংশীবদন সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে[৮] 'রাধাকৃষ্ণ-ধামালীর যে বহু পদ কৈল।' বাস্তবিক পক্ষে, বংশীবদন একজন পদকর্তা ছিলেন এবং তিনি বাংলা ও ব্রজবুলি উভয় ভাষাতেই পদ রচনা করিয়াছিলেন।[৯] 'বংশীশিক্ষা'-মতে বংশীবদনের তিরোভাবের পূর্বে তাঁহার দুইজন পুত্রই বিবাহ করিয়াছিলেন। 'মুরলীবিলাসে'ও বলা হইয়াছে[১০] যে বংশীর পুত্র চৈতন্য বা চৈতন্যদাস তৎপূর্বে অন্তত দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন।

'পাটপর্যটনা'দি[১১]-গ্রন্থে বংশীবদনের পাট কুলিয়া-পাহাড়পুরেই নির্ণীত হইয়াছে। কুলিয়া এবং পাহাড়পুর নামক সংলগ্ন-গ্রাম দুইটিতে বংশীবদন, কবিদত্ত ও সারঙ্গ-ঠাকুর বাস ও যাতায়াত করিতেন। এই দুইটি গ্রামই কালে কুলিয়া-পাহড়পুর নামে খ্যাতিলাভ করে। 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র গদাধর-শাখা মধ্যে কবিদত্তের নাম, এবং মূলস্কন্ধ-শাখা মধ্যে সারঙ্গদাসের নাম পাওয়া যায়। সারঙ্গদাস সম্ভবত গৌরাঙ্গের নবদ্বীপ-লীলার একজন প্রাচীন সঙ্গী ছিলেন।[১২] বৃন্দাবনদাসের 'বৈষ্ণববন্দনা'য় লিখিত হইয়াছে[১৩]:

সারঙ্গ ঠাকুর বন্দিব করজুড়ি।
গুথড়িতে ছিল যার সর্প ছয় কুড়ি॥

(৬) প্রে. বি., পৃ. ৩৭ ; ভ. র.—৪।২০-২৪, ৩৯ (৭) পৃ.১৯১-৯৫ (৮) পৃ. ৯ (৯) HBL—p. 42 (১০) পৃ. ৪৭ (১১) পা. প.—পৃ. ১১০ ; পা. নি. (পা. বা.)—পৃ. ১ ; পা. নি. (ক. বি.)—পৃ. ১ ; এই গ্রন্থগুলিতে সারঙ্গ-ঠাকুরের পাট কুলিয়া-পাহাড়পুরে বলা হইয়াছে। আধুনিক বৈ. দ-মতে (পৃ.৩৪৫) ইঁহার পাট ছিল মাউগাছিপুর। (১২) গৌ. ত.—পৃ. ২৮ ; ভ. র.—২।১৫ ; ১২।৩৮৬৪ (১৩) পৃ. ৫

এইরূপ উক্তির তাৎপর্য দুর্বোধ্য। আধুনিক 'বৈষ্ণবদিগ্‌দর্শনী'-গ্রন্থেও সারঙ্গ-ঠাকুর সম্বন্ধে একটি মজার গল্প লিখিত হইয়াছে।[১৪] এই সমস্ত হইতে মনে হয় সারঙ্গ সম্ভবত সাপুড়ে বা ওঝা ছিলেন।

যাহাহউক, বংশীবদনানন্দ বা ঠাকুর-বংশীর পুত্রাদি সম্বন্ধেও বিশেষ কিছুই জানা যায়না। নরহরি-চক্রবর্তী জানাইতেছেন[১৫] যে জাহ্নবা খেতুরি-মহামহোৎসবে যোগদানার্থ যাত্রা আরম্ভ কারলে বংশীবদনের পুত্র চৈতন্যদাস পথিমধ্যে তাঁহার সহিত মিলিত হন এবং খেতুরির মহামহোৎসবে অংশগ্রহণ করেন 'পদকল্পতরু'তে চৈতন্যদাস-ভণিতায় ষোলটি পদ সংগৃহীত হইয়াছে। ডা. সুকুমার সেনের মতে সকলগুলির রচয়িতাই বংশীবদন-পুত্র চৈতন্যদাস।[১৬] কিন্তু তাহাদের কোনটি কোন্ চৈতন্যদাসের রচনা, কিংবা সমস্তগুলিই একজনের কিনা, বলা প্রায় অসম্ভব। 'মুরলীবিলাস' ও 'বংশীশিক্ষা'-গ্রন্থ মতে জাহ্নবাদেবী চৈতন্যদাসের পুত্র রামচন্দ্র বা রামাইকে দত্তক-হিসাবে গ্রহণ করেন। রামচন্দ্রের কৈশোরে চৈতন্যদাস শচীনন্দন নামক আর একটি পুত্র লাভ করিবার পর জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্রকে জাহ্নবার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। গ্রন্থগুলিতে রামচন্দ্রের জীবন সম্বন্ধে বহুবিধ তথ্য প্রদত্ত হইয়াছে। তাহাদের অধিকাংশগুলিকেই নির্বিচারে গ্রহণ করা চলেনা। কিন্তু ষোড়শ-শতকে রচিত কোনও প্রামাণিক বাংলাগ্রন্থে রামচন্দ্র বা শচীনন্দনের উল্লেখমাত্র নাই।

---

(১৪) পৃ. ৪৪; গ্রন্থবর্ণনানুযায়ী নবদ্বীপ সন্নিকটস্থ জান্নগড়-গ্রামবাসী গৌরাঙ্গ-পার্ষদ্ অতিবৃদ্ধ সারঙ্গ-ঠাকুরকে একদিন গৌরাঙ্গপ্রভু শিষ্যগ্রহণ পূর্বক গোপীনাথ-সেবাব্যবস্থার নির্দেশ দেন। স্থির হয় যে পরদিন সারঙ্গ-ঠাকুর সর্বপ্রথম যাঁহাকেই দেখিবেন, তাঁহাকেই মন্ত্র দিবেন। পরদিন অতি প্রত্যূষে গঙ্গাস্নানকালে এক দ্বাদশবর্ষীয় ব্রাহ্মণ কুমারের মৃতদেহ সারঙ্গ-ঠাকুরের অঙ্গস্পর্শ করিলে তিনি তাঁহাকেই মন্ত্রদান করেন এবং বালক প্রাণ প্রাপ্ত হন। তখন সপার্ষদ্ গৌরাঙ্গ আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে তিনি বর্ধমান জেলার গুস্করার (স্টেশান) নিকটবর্তী সরডাঙা গ্রামের গোস্বামী বংশজাত, নাম মুরারি; উপনয়নের পরেই সর্পাঘাত ঘটিলে তাঁহাকে মৃতজ্ঞানে নদীতে ভাসাইয়া দেওয়া হয়। মুরারি জান্নগড়ের পাটেই রহিয়া গেলেন। (১৫) ভ. র.—১০।৩৮৫-৮৬ ; ন. বি.—৬ষ্ঠ. বি., পৃ. ৮১, ৮৬ ; ৮ম. বি., পৃ. ১১৭ (১৬) HBL—pp. 89, 90

নারায়ণ-পণ্ডিত

কবিকর্ণপূরের 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'তে নারায়ণ-বাচস্পতি[১] ছাড়া আর কোনও নারায়ণের নাম উল্লেখিত হয় নাই।

'চৈতন্যচরিতামৃতে'র মূলস্কন্ধ-শাখায় নারায়ণ-পণ্ডিত, নিত্যানন্দ-শাখায় নারায়ণ এবং অদ্বৈত-শাখায় নারায়ণদাসের নাম উল্লেখিত হইয়াছে।[২] 'চৈতন্যচরিতামৃতে' আর একজন নারায়ণদাসকে পাওয়া যায়। তিনি বৃদ্ধ রূপ-গোস্বামীর সহিত বিঠ্ঠলেশ্বর-গৃহে গোপাল-দর্শনে গিয়াছিলেন। একই গ্রন্থে এই দুইবার নারায়ণদাসের নামোল্লেখ দেখিয়া বৃন্দাবনস্থ নারায়ণদাসকে অদ্বৈত-শিষ্য নারায়ণদাস বলিয়াই মনে হইতে পারে। কিন্তু এ সম্বন্ধে জোর করিয়া কিছু বলা চলেনা। 'চৈতন্যচরিতামৃত'-কার খুব সম্ভবত বৃন্দাবনে আর একজন নারায়ণদাসের কথাই বলিয়াছেন। 'ভক্তিরত্নাকরে'র বর্ণনায় বৃন্দাবন হইতে শ্রীনিবাস-আচার্যাদির বিদায়কালে যে-নারায়ণকে দেখা যায় সম্ভবত তিনি এই নারায়ণই। 'মুরলীবিলাসে'র বর্ণনা অনুযায়ী বৃন্দাবনে একজন নারায়ণ ছিলেন[৩]; জাহ্নবা ও রামাই বৃন্দাবনে গেলে তাঁহাদের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটে। রসময়দাসের 'সনাতন গোসাঁইর সূচকে' বৃন্দাবনস্থ ভক্তবৃন্দের মধ্যে সম্ভবত এই নারায়ণদাসকেই দেখিতে পাওয়া যায়। খুব সম্ভবত বৃন্দাবনে উপরোক্ত একজন নারায়ণই ছিলেন এবং তিনিই নারায়ণদাস। পরবর্তিকালে গদাধরদাসপ্রভুর তিরোধান-উৎসবে ও খেতুরি-উৎসবে নিত্যানন্দ-শিষ্য নারায়ণ ছাড়াও আর একজন নারায়ণদাসকে পাওয়া যায়।[৪] জনার্দনদাস প্রভৃতি অদ্বৈত-ভক্তবৃন্দের সহিত উল্লেখিত হওয়ায় ইঁহাকেই অদ্বৈত-শাখাভুক্ত দাসাখ্য নারায়ণ বলিয়া বুঝিয়া লওয়া যায়।

নিত্যানন্দ-শাখার নারায়ণ সম্বন্ধে 'চৈতন্যচরিতামৃত' ও 'চৈতন্যভাগবত', উভয় গ্রন্থেই বলা হইয়াছে[৫] যে তাঁহারা চারিভাই ছিলেন। মনোহর, নারায়ণ, কৃষ্ণদাস এবং দেবানন্দ। জয়ানন্দ-প্রদত্ত একটি তালিকার মধ্যেও কৃষ্ণদাস দেবানন্দ এবং নারায়ণের নাম একত্রে উল্লেখিত হইয়াছে। তবে সেইস্থলে মনোহরের পরিবর্তে মহানন্দকে দেখা যায়। সম্ভবত কোনও কারণে মনোহরই মহানন্দে পরিণত হইয়া থাকিবেন।

কৃষ্ণদাস-দেবানন্দ সম্বন্ধে কিন্তু বিশেষ কিছু জানা যায়না। কিন্তু পরবর্তিকালে

---

(১) ১৬৮ (২) ১।১০, পৃ. ৫১ ; ১।১১, পৃ. ৫৬ ; ১।১২, পৃ. ৫৮ (৩) পৃ. ২৯১ (৪) ভ. র.—৯।৪০৫, ৪০৩ ; প্রে. বি.—১৯ শ. বি., পৃ. ৩০৯ ; ন. বি.—৮ম. বি., পৃ. ১০৭ (৫) চৈ.চ.—১।১১, পৃ. ৫৬ ; চৈ. ভা.—৩।৬, পৃ. ৩১৭

মনোহর এবং নারায়ণ বৈষ্ণবসমাজে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর আজ্ঞাক্রমে নিত্যানন্দ যখন প্রথমবার নীলাচল হইতে গৌড়ে চলিয়া আসেন, তখন হইতেই মনোহরকে তাঁহার সঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায়।[৬] আবার পরবর্তিকালে গদাধরদাসপ্রভুর তিরোধান-তিথি-উৎসব[৭] এবং খেতুরি-উৎসব,[৮] ও তাহার পরে জাহ্নবাদেবীর বৃন্দাবন-গমন[৯] ও প্রত্যাবর্তন-কালে[১০] তাঁহার সহিত তাঁহাদিগের প্রায় উভয়কেই উপস্থিত দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত ক্ষেত্রে বিশেষ করিয়া রঘুনাথ-বৈদ্য-উপাধ্যায়াদি[১১] নিত্যানন্দ-শিষ্যবৃন্দের সহিত বিদ্যমান থাকায় তাঁহাদিগকে সহজেই চিনিয়া লইতে পারা যায়। সম্ভবত তাঁহাদের ভ্রাতা কৃষ্ণদাসও এই সমস্ত ঘটনাতে উপস্থিত ছিলেন। 'বংশীশিক্ষা'-গ্রন্থে বংশী-শিষ্য একজন মনোহরের উল্লেখ আছে।[১২] তাঁহার সম্বন্ধে আর কোনও তথ্য কোথাও পাওয়া যায়না।

তবে আলোচ্যমান মনোহর সম্বন্ধে 'বীরভূম-বিবরণে' লিখিত হইয়াছে[১৩] যে তিনি কাঁদরা-নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ আউলিয়া-মনোহরদাস, কবি জ্ঞানদাসের 'বিশেষ বন্ধু'। প্রকৃতপক্ষে 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র নিত্যানন্দশাখা-বর্ণনা প্রসঙ্গেও এই মনোহরদাস জ্ঞানদাসের সহিত যুক্ত হইয়াছেন। আবাব 'নরোত্তমবিলাসে'র সর্বত্র এবং 'ভক্তিরত্নাকরে'র চারিটি উল্লেখের দুইটি স্থলেই মনোহরের নাম জ্ঞানদাসের সহিত একত্রে উল্লেখিত হইয়াছে। ইহাতে জ্ঞানদাস ও মনোহরের বন্ধুত্বের সম্ভাবনাই সূচিত হয়।[১৪] 'বীরভূমবিবরণে' আরও লিখিত হইয়াছে, "জ্ঞানদাসের জীবিতকাল পর্যন্ত মনোহর কাঁদরাতেই অবস্থিতি করিতেন, পরে আউলিয়া চৈতন্যদাস নাম গ্রহণ পূর্বক দেশে দেশে পর্যটন করেন। এদেশে বৈরাগীর আখড়া বাঁধিয়া বাসের প্রথা তিনিই প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন।......অনেক আখড়ায় যে কোন উৎসবে পর্বাহে দেববিগ্রহের পরই মনোহরদাসের ভোগ দেওয়ার রীতি এখনও প্রচলিত আছে।.....ইনিও জাহ্নবাদেবীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন......
'সারাবলী'তে আছে

আদি নাম মনোহর চৈতন্যনাম শেষে।
আউলিয়া হইয়া বুলে স্বদেশ বিদেশে॥

---

(৬) ভ. র.—১২।৩৮৬৩ (৭) ঐ—৯।৩৯৮-৯৯ (৮) ঐ—৯।৩৭৪ ; ন. বি.—৬ষ্ঠ.বি., পৃ. ৭৯ ; ৮ম. বি., পৃ. ১০৭ (৯) ভ. র.—৯।৭৪৫ ; ন. বি.—৮ম. বি., পৃ. ১১৮ (১০) ভ. র.—৯।৪০২ (১১) দ্র.—রঘুপতি-বৈদ্য-উপাধ্যায়। (১২) পৃ. ৮১, ২৯১ (১৩) ৩য়. খণ্ড, পৃ. ১৬১-৬২ (১৪) বীরভূমবিবরণ-অনুযায়ী, মনোহরদাসের পুত্র কিশোরদাস জ্ঞানদাস-প্রতিষ্ঠিত রাধাগোবিন্দ যুগল-বিগ্রহের সেবাইত হিসাবে মঠের মহান্ত-পদ গ্রহণ করেন। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় 'জ্ঞানদাসের পদাবলী'র ভূমিকায় কিন্তু কিশোরদাসকে মনোহরের ভ্রাতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

......পদসঙ্কলয়িতা ছিলেন কিনা বিতর্কের বিষয় হইলেও ইনি একজন প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা ছিলেন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।"

কিন্তু এই মনোহরদাসই যে পদকর্তা ছিলেন, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। 'গৌরপদ-তরঙ্গিণী'-ধৃত নরহরিদাসের একটি পদে লিখিত হইয়াছে[১৫] :

মদন মঙ্গল নাম রূপে গুণে অনুপাম
আর এক উপাধি মনোহর।
খেতুরির মহোৎসবে জ্ঞানদাস গেলা যবে
বাবা আউল ছিল সহচর।

ইহা হইতে আলোচ্যমান মনোহরদাসকে আউলিয়া-মনোহরদাস বলিয়াই ধরিতে হয়। কিন্তু তিনি যে জাহ্নবার মন্ত্রশিষ্য ছিলেন, কোথাও তাহার উল্লেখ নাই। জ্ঞানদাসের মত এই মনোহরও 'চৈতন্যচরিতামৃত' মধ্যে কেবল নিত্যানন্দ-শাখাভুক্ত হইয়াছেন মাত্র। তবে জাহ্নবাদেবীর সহিত উভয়ের নিবিড় সম্পর্ক দেখিয়া মনে করা যাইতে পারে যে হয়ত উভয়েই তাঁহার নিকট মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। আবার সারাবলীর প্রমাণ সত্য হইলে ইহাও ধরিয়া লইতে হয় যে এই আউলিয়া-মনোহরদাসই শেষে আউলিয়া-চৈতন্যদাস নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। শ্রীনিবাস-আচার্যের জীবনী হইতে জানা যায় যে একজন আউলিয়া-চৈতন্যদাস বৃন্দাবনে গিয়া গোপাল-ভট্ট-গোস্বামীর নিকট শ্রীনিবাস-আচার্যের প্রথম বিবাহ ও বিষ্ণুপুরে তাঁহার প্রভাব-স্থাপনের সংবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন এবং তিনি বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া বিষ্ণুপুরের রাজসমীপেও গোপাল-ভট্ট-গোস্বামীর অন্তরের প্রতিক্রিয়ার কথা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। এই চৈতন্যদাসের নিবাস সম্বন্ধে 'প্রেববিলাস'-কার কেবল এইটুকু বলিতেছেন যে

বিষ্ণুপুরে মোর ঘর হয় বার ক্রোশ।
রাজার দেশে বাস করি হইয়া সন্তোষ ॥

ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে এই আউলিয়া-চৈতন্যদাসই সম্ভবত উপরোক্ত আউলিয়া-মনোহরদাস বা আউলিয়া-চৈতন্যদাস হইতে পারেন।

'চৈতন্যচরিতামৃতে'র মূলস্কন্ধ-শাখায় যে নারায়ণ-পণ্ডিতকে পাওয়া যায় তিনি কিন্তু মহাপ্রভুর পরম-ভক্ত প্রসিদ্ধ দামোদর-পণ্ডিতেরই ভ্রাতা। পঞ্চম-ভ্রাতার মধ্যে দামোদর এবং শংকরই সমধিক খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন। দেবকীনন্দন তাঁহার 'বৈষ্ণববন্দনা'র মধ্যে দামোদর-পণ্ডিতের অন্য চারি ভ্রাতার নামোল্লেখ করিয়াছেন—পীতাম্বর, জগন্নাথ, শংকর ও

(১৫) পৃ. ৩১৩

নারায়ণ। গ্রন্থকার পীতাম্বরকেই দামোদরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া সংবাদ দিয়াছেন। কিন্তু পীতাম্বর ও জগন্নাথের (জগদানন্দের) কথা বিশেষ কিছুই জানা যায়না। গদাধরদাস-প্রভুর তিরোধানতিথি-মহামহোৎসবে যোগদান করিবার জন্য যাত্রী হিসাবে একজন পীতাম্বরকে দেখা যায়।[১৬] একই শ্লোকের মধ্যে একজন দামোদরের নামোল্লেখ থাকায় তাঁহাকে দামোদর-পণ্ডিতের ভ্রাতা বলিয়া ধারণা জন্মাইতে পারে। আবার 'গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা'তে নারায়ণ-বাচস্পতির সহিত একজন পীতাম্বরের নাম উল্লেখিত হইয়াছে। তাহাতে নারায়ণ-বাচস্পতি যে পীতাম্বর-ভ্রাতা নারায়ণ-পণ্ডিতের সহিত অভিন্ন, তাহাই সম্ভব হইয়া পড়ে। কিন্তু এ সম্বন্ধে অন্য কোনও প্রমাণ নাই। প্রকৃত-পক্ষে, নারায়ণ-পণ্ডিত সম্বন্ধে যাহা জানা যায়, তাহা অল্পই। কবিকর্ণপুরের 'চৈতন্য-চরিতামৃতমহাকাব্যে' ও লোচনের 'চৈতন্যমঙ্গলে' গৌরাঙ্গের গয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে তাঁহার নবদ্বীপলীলার মধ্যে একজন নারায়ণের দুই একবার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।[১৭] কিন্তু কোনস্থলেই তাঁহাকে সক্রিয় দেখা যায় না। তবে প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি শ্রীবাস- ও শ্রীরাম-পণ্ডিতের সহিত যুক্ত হইয়াছেন। 'চৈতন্যভাগবতে'ও[১৮] তাঁহাকে শ্রীরাম-পণ্ডিতের সহিত বিশেষভাবে যুক্ত দেখিয়া কর্ণপূর বা লোচন কর্তৃক উক্ত নারায়ণকে নারায়ণ-পণ্ডিত বলিয়াই সন্দেহ উপস্থিত হয়। কিন্তু 'চৈতন্যভাগবতে' নবদ্বীপলীলা-বর্ণনায় নারায়ণ-পণ্ডিতের কোনও উল্লেখ নাই। কেবল নারায়ণ নামক এক ব্যক্তিকে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় দুইটিবার মাত্র দেখা যায়।[১৯] মুরারি-গুপ্তের গ্রন্থে[২০] এবং 'গৌরপদতরঙ্গিণী'র একটি পদেও[২১] কেবল নারায়ণকে একবার করিয়া দেখা যায়। এই সমস্ত উল্লেখ হইতে ধরিয়া লইতে হয় যে গৌরাঙ্গের গয়া-প্রত্যাবর্তনের পর হইতে সম্ভবত একজন নারায়ণ তাঁহার নবদ্বীপলীলার সহিত কোনও না কোনও ভাবে কখনও কখনও যুক্ত হইতেন। কিন্তু তিনি নারায়ণ-পণ্ডিত কিনা বলা চলে না। দামোদর-পণ্ডিতের জীবনী আলোচনায় জানা যায় যে দামোদর সম্ভবত গৌরাঙ্গপ্রভুর নবদ্বীপলীলার শেষদিকে তাঁহার সহিত যুক্ত হন। কিন্তু তিনি কোথা হইতে কিভাবে আসিয়া যুক্ত হইয়াছিলেন তাহার কিছুই জানা যায় না। নারায়ণ-পণ্ডিত যদি পূর্ব হইতে নবদ্বীপলীলায় যুক্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে সেই-সূত্রে দামোদরের পক্ষে প্রথম আসামাত্রেই গৌরাঙ্গপ্রভুর বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করা সম্ভব হয় বটে। কিন্তু বৃন্দাবনাদির গ্রন্থের উপরোক্ত মাত্র একটি দুইটি উল্লেখ হইতেই এ সম্বন্ধে সঠিকভাবে কিছু বলা চলে না। তবে মহাপ্রভুর দর্শন

(১৬) ভ. র—৯।৪০১ (১৭) চৈ. চ. ম.—৬।৪২-৪৫, ১০৮; চৈ. ম.—ম. খ., পৃ. ৯৭, ১১১, ১১৫ (১৮) ৩।৯, পৃ. ৩২৭ (১৯) ২।৮, পৃ. ১৩৯; ৩।৪, পৃ. ২৯০ (২০) ২।৭।৪ (২১) পৃ. ১৫১

লাভার্থে প্রথম বৎসরেই নারায়ণ-পণ্ডিত যে নীলাচলে গমন করিয়াছিলেন, 'চৈতন্য-চরিতামৃতা'দি-গ্রন্থে[২২] তাহার বিশেষ উল্লেখ আছে। সুতরাং নারায়ণ-পণ্ডিত যে নবদ্বীপলীলায় যুক্ত ছিলেন, তাহা ধরিয়া লইতে হয়। প্রথমবার নীলাচলে গিয়া তিনি মহাপ্রভু-প্রবর্তিত সম্প্রদায়-কীর্তনে যোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু তারপর আর তাঁহাকে কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না।

(২২) দ্র.—চৈ. চ. ম.—১৫।১০৫-৬ ; চৈ. চ.—২।১১, পৃ. ১৫৩ ; ২।১৩, পৃ. ১৬৪ ; চৈ. না.—৮।৪৪ অ.—চৈ.ভা.—৩।৯, পৃ. ৩২৭

হিরণ্য-দাস

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে সপ্তগ্রাম অঞ্চলের বিখ্যাত জমিদার ছিলেন হিরণ্য- ও গোবর্ধন-দাস, তৎকালে তাঁহারাই সেই 'মুলুকের মজুমদার'-নামে অভিহিত হইতেন[১] এবং তাঁহারা 'সপ্তগ্রাম বারলক্ষ মুদ্রার ঈশ্বর' ছিলেন।[২] তাঁহাদের নিবাস ছিল হুগলীর নিকটবর্তী চাঁদপুর- বা চন্দনপুর-গ্রামে।[৩] তাঁহারা সহোদর-ভ্রাতা ছিলেন ; জ্যেষ্ঠ হিরণ্য-দাস। কনিষ্ঠ গোবর্ধনের পুত্র ছিলেন রঘুনাথ-দাস গোস্বামী। ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে যথেষ্ট সদ্ভাব ছিল এবং জমিদার হিসাবেও তাঁহারা সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন। জাতিতে কায়স্থ[৪] হইলেও ধর্মপ্রাণ-ভ্রাতৃদ্বয় ব্রাহ্মণদিগের প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন। নদীয়া তখন বাংলাদেশের ব্রাহ্মণ-সংস্কৃতির বিখ্যাত কেন্দ্র। হিরণ্য ও গোবর্ধন সেই নদীয়ার অধিবাসী-ব্রাহ্মণদিগকে প্রভূত পরিমাণে ভূমি ও অর্থাদি দান করিয়া সাহায্য করিতেন।[৫] গৌরাঙ্গের মাতামহ নীলাম্বর-চক্রবর্তী দুইজনেরই মান্য ও বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। নীলাম্বরও দুইজনকে ভ্রাতৃসম জ্ঞান করিতেন। এই সূত্রে গৌরাঙ্গের পিতৃদেব পুরন্দর-মিশ্রের সহিতও তাঁহাদের বিশেষ সদ্ভাব ঘটে। গৌরাঙ্গপ্রভুকেও তাঁহারা ভালভাবেই চিনিতেন।

কিন্তু তাহারও বহুপূর্বে অদ্বৈতপ্রভুর সহিত তাঁহাদের সংযোগ স্থাপিত হয়। অদ্বৈত-শিষ্য যদুনন্দন-আচার্যের নিকট তাঁহারা শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। সম্ভবত সেই সূত্রেই তাঁহারা অদ্বৈত-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে অবহিত হন। অদ্বৈতপ্রভুর দারপরিগ্রহকালে তাহার সমুহ ব্যয়ভারই বহন করিয়াছিলেন এই ধনী-ভ্রাতৃদ্বয়।[৬] সেই সময় অদ্বৈত-শিষ্য হরিদাস একবার নামপ্রচার করিতে করিতে তাঁহাদের পুরোহিত বলরাম-আচার্যের গৃহে আসিয়া উঠিলে বলরাম একদিন তাঁহাকে মজুমদার-সভায় লইয়া যান।[৭] হিরণ্য ও গোবর্ধন হরিদাসকে দেখিয়াই সসম্ভ্রমে উঠিয়া নমস্কার জানাইলেন এবং যথাযোগ্য আদর আপ্যায়ন করিয়া তাঁহাকে উপযুক্ত স্থানে বসাইলেন। তারপর তাঁহাদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা চলিতে থাকিলে গোপাল-চক্রবর্তী নামক মজুমদার গৃহের একজন অতিমূঢ়

(১) চৈ. চ.—৩।৩, পৃ. ৩০০ (২) ঐ—২।১৬, পৃ. ১৯১ ; ভক্তমাল (পৃ.১০)-মতে 'নব লক্ষ' (৩) চৈ.চ.—৩।৩, পৃ. ৩০০ ; গৌ. ত.—পৃ. ৩১১ ; পা. নি. ; অমিয়নিমাইচরিতের প্রথম খণ্ডের উপক্রমণিকায় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে 'হরিপুরগ্রামে গোবর্ধনদাসে'র নিবাস ছিল। কিন্তু এই নাম কোথা হইতে সংগৃহীত হইল জানা যায় নাই। (৪) চৈ. চ.—৩।৬, পৃ. ৩১৫ (৫) ঐ—২।১৬, পৃ.১৯১ (৬) দ্র.—যদুনন্দন-আচার্য (৭) চৈ. চ.—৩।৩, পৃ. ৩০০-৩০১ ; গৌ. ত.—পৃ. ৩১১

আরিন্দা-ব্রাহ্মণ বৃথা তর্ক করিয়া সন্ন্যাসী-হরিদাসকে অপমানসূচক কথা বলিলে মজুমদার তন্মুহূর্তে তাঁহাকে ধিক্কৃত করিয়া পরিত্যাগ করিলেন। গোপাল তখন সংকুচিতভাবে আসিয়া হরিদাসের পদতলে পতিত হইলে হরিদাস তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন। কিন্তু সন্ন্যাসীর অসম্মান হিরণ্যদাসকে যথেষ্ট আহত করিয়াছিল। তিনি সেই ব্রাহ্মণকে 'নিজদ্বার মানা' করিয়া দিলেন। অবশ্য হিরণ্য-গোবর্ধন বিষয়বিরাগী ছিলেন না। একবার সপ্তগ্রাম মুলুকের ম্লেচ্ছ অধিকারীর সহিত তাঁহাদের সংঘর্ষ ঘটে। হিরণ্যদাস বারলক্ষ টাকার শর্তে রাজার নিকট হইতে সপ্তগ্রাম মুলুকটি 'মোকতা' করিয়া লইয়াছিলেন।[৮] কিন্তু রাজদরবারে বারলক্ষ টাকা দেওয়ার শর্ত থাকিলেও তিনি ঐ মুলুক হইতে বিশ লক্ষ টাকা আদায় করিয়া লইতেন। তাঁহার এইরূপ লভ্যাংশ দেখিয়া মুলুকের পূর্বাধিকারী রাজদরবারে নালিশ করিয়া এক উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে সপ্তগ্রামে আনয়ন করেন। ফলে হিরণ্যদাসকে কোনও গোপন স্থানে গিয়া লুকাইয়া থাকিতে হয়। কিন্তু শেষে ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুনাথের দ্বারা তাঁহার বিপন্মুক্তি ঘটে। সেই সময় রঘুনাথ গৃহত্যাগের চেষ্টা করিলে গোবর্ধন নানাভাবে তাঁহাকে বিষয়- ও সংসার-বন্ধনে বাঁধিবার চেষ্টা করিলেন। শেষপর্যন্ত আদরের দুলালকে ধরিয়া রাখার জন্য তাঁহার উপর সতর্কদৃষ্টি রাখিবারও প্রয়োজন হইয়াছিল। কিন্তু সকল সর্তকতাকে ব্যর্থ করিয়া একদিন রঘুনাথ নীলাচলে গিয়া চৈতন্য-প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন। গোবর্ধনের লোকজন নীলাচলপথে ঝাকরা পর্যন্ত গিয়া গৌড়ভক্তসহ নীলাচলগামী শিবানন্দ-সেনের সহিত দেখা করিয়াও তাঁহার সন্ধান পাইলেন না।[৯] তাঁহারা ফিরিয়া সংবাদ দিলে রঘুনাথের পিতামাতার মাথায় যেন বজ্রাঘাত পড়িল।

এদিকে নীলাচলে রঘুনাথের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিলে মহাপ্রভু তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া জানাইলেন যে পিতামহ নীলাম্বরের সম্বন্ধে হিরণ্য-গোবর্ধনও তাঁহার পিতামহ-স্থানীয়। এই বলিয়া তাঁহাদের বিষয়-বাসনা লইয়া তিনি কৌতুক পরিহাস করিলেন। কিন্তু যথাকালে গোবর্ধনের নিকট সংবাদ গিয়া পৌছাইলে গোবর্ধন ও তাঁহার পত্নী তৎক্ষণাৎ পুত্রের জন্য চারিশত মুদ্রা সহ দুইজন ভৃত্য এবং একজন পাচক ব্রাহ্মণকে শিবানন্দের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। অসময় দেখিয়া সেইবারও শিবানন্দ তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে পরবৎসর নীলাচল-গমনের সময় তিনি নিশ্চয় তাঁহাদিগকে লইয়া যাইবেন। শিবানন্দ তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু গোবর্ধন ও তাঁহার পত্নীকে চিরকালের জন্যই পুত্র-সম্বন্ধীয় বেদনা বহন করিয়া চলিতে হইয়াছিল।

(৮) চৈ. চ.—৩।৬, পৃ. ৩১৫ (৯) চৈ. চ.—৩।৬, পৃ. ৩১৮; চৈ. না.—১০।৮

যদুনন্দন-আচার্য

গৌরাঙ্গ-অবির্ভাবের পূর্বে যে সমস্ত ভক্ত অদ্বৈত-সাধনাকে সফল করিয়া তুলিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন, যদুনন্দন-আচার্য-তর্কচূড়ামণি ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। সেইজন্য 'চৈতন্যচরিতামৃত'-কার তাঁহাকে অদ্বৈতাচার্যের একটি প্রধান শাখারূপে বর্ণিত করিয়াছেন। গ্রন্থবর্ণিত মূলস্কন্ধশাখায় যে-যদুনন্দনকে দেখা যায়, তিনি ইনিই। কারণ, এই গ্রন্থে অন্য কোনও যদুনন্দনের উল্লেখ নাই। 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকা'দি[1] গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে যদুনন্দন বাসুদেব-দত্তেরও পরমানুগৃহীত ছিলেন এবং হরিচরণদাসও তাঁহার 'অদ্বৈতমঙ্গল'-গ্রন্থে[2] 'বাসুদেবদত্ত আর শ্রীযদুনন্দন'কে মহাপ্রভুর দুই সেনাপতিরূপে বর্ণিত করিয়াছেন। অন্যান্য গ্রন্থে যে সকল যদুনন্দনের নাম পাওয়া যায়, তাঁহারা পরবর্তিকালের।

যদুনন্দন-আচার্যের বাসস্থান[3] ইত্যাদি সম্বন্ধেও কিছুই জানা যায়না। 'অদ্বৈতপ্রকাশ'-গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে[4] যে অদ্বৈতপ্রভু যখন সর্বপ্রথম অল্পকয়েকটিমাত্র ভক্ত লইয়া ভক্তিধর্ম- ও নাম-প্রচারের কার্যে অগ্রসর হইতেছিলেন সেইসময়ে একদিন তর্কচূড়ামণি-যদুনন্দন আসিয়া সগর্বে ব্রহ্ম-হরিদাসকে ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধীয় তর্কযুদ্ধে আহ্বান করিলেন। ব্যাপারটিকে এড়াইতে না পারিয়া ধীর-প্রকৃতির হরিদাস 'ভূস্বুর চক্রবর্তী' কৃষ্ণদাসকে মধ্যস্থ রাখিয়া যখন অব্যর্থ যুক্তি কৌশল প্রয়োগ করিতেছিলেন তখন হঠাৎ অদ্বৈতপ্রভু সেইস্থলে উপস্থিত হন। ইতিমধ্যে হরিদাসের তর্কসিদ্ধান্ত যদুনন্দনের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করিতেছিল। এখন অদ্বৈতপ্রভুর কৃপাকৃষ্ট হইয়া তিনি তাঁহার চরণে পড়িলেন। যদুনন্দনের একান্ত অনুরোধে অদ্বৈত তাঁহাকে যথাকালে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত করিলে তিনি চিরতরে জ্ঞানবাদ পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিবাদ গ্রহণ করিলেন।[5] তখন হইতেই তাঁহার ভাগবত-অধ্যাপনা সুরু হয়।

তৎকালে সমৃদ্ধ সপ্তগ্রাম-অঞ্চলের বিখ্যাত জমিদার ছিলেন হিরণ্য-দাস ও গোবর্ধন-দাস। এই ভ্রাতৃদ্বয়কে সম্ভবত স্বীয়-শিষ্যে পরিণত করিয়া যদুনন্দন গৌড়বাংলায় ভক্তিধর্ম প্রচারের একটি অতি প্রশস্ত পথ মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। এই শিষ্যবৃন্দের উপর তাঁহার প্রভাবও ছিল যথেষ্ট। অদ্বৈতপ্রভুর দারপরিগ্রহকালে যখন যদুনন্দন মুৎসুদ্দির ভার গ্রহণ করিয়া কার্য-সমাধা করিয়াছিলেন[6] তখন সেই বিবাহের ব্যয়ের নিমিত্ত সমস্ত

(১) ১০।১০ ; চৈ. চ.—১।১২, পৃ. ৫৮ (২) পৃ. ৩৮ (৩) আধুনিক বৈ. দ.-মতে (পৃ. ৩৪৮) তাঁহার নিবাস ছিল ঘাঁটাল। (৪) ৭ম. অ., পৃ. ২৭ (৫) প্রে. বি.—২৪শ. বি., পৃ. ২৩৩-৩৪ (৬) অ. প্র.—৮ম. অ., পৃ. ৩০ ; প্রে. বি.—২৪ শ. বি., পৃ. ২৩৮ ; অ. ম.—পৃ. ৪৪

অর্থই তিনি তাঁহার এই ধনী-শিষ্যদ্বয়ের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, পরে গোবর্ধনের পুত্র রঘুনাথ-দাসও যদুনন্দনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।[৭] রঘুনাথ গৃহত্যাগে সমর্থ হইয়া যে নীলাচলে মহাপ্রভুর সান্নিধ্য ও কৃপালাভ করিতে পারিয়াছিলেন,[৮] তাহারও পরোক্ষ কারণ হিসাবে যদুনন্দনের নাম স্মরণীয় হইয়া আছে। এইঘটনার পর আর যদুনন্দনের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। একমাত্র 'অদ্বৈতপ্রকাশ'-মতে[৯] অদ্বৈত-তিরোধান-কালেও যদুনন্দন শান্তিপুরে আসিয়াছিলেন।

---

(৭) চৈ. না.—১০।১০ ; চৈ. চ.—৩।৬, পৃ. ৩১৮ ; প্রে. বি.—১৮ শ. বি., পৃ. ২৭১ ; প্রে. বি.—২৪ শ. বি., পৃ.২৩৪ (৮) চৈ. চ.—৩।১৬, পৃ.৩১৮ ; দ্র.—রঘুনাথদাসের জীবনী (৯) ২২ শ. অধ্যায়, পৃ. ১১৩

রঘু-মিশ্র

'চৈতন্যচরিতামৃতে'র মূলস্কন্ধ-শাখা, নিত্যানন্দ-, অদ্বৈত- ও গদাধর-শাখা মধ্যে কয়েকজন অখ্যাতনামা রঘুনাথকে পাওয়া যায়। গদাধর-শাখা মধ্যে যে রঘু-মিশ্রের নাম আছে তাঁহার পার্শ্ব-লিখিত সঙ্গী-বৃন্দের নামোল্লেখ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে তিনি খেতুরির মহোৎসবেও যোগদান করিয়াছিলেন।[১] নিত্যানন্দ-শাখায় যে রঘুনাথকে পাওয়া যায় তাঁহার সম্বন্ধে লেখক বলিতেছেন :

আচার্য বৈষ্ণবানন্দ ভক্তি অধিকারী।
পূর্বে নাম ছিল যাঁর রঘুনাথপুরী॥

বৃন্দাবনদাস এবং জয়ানন্দও তাঁহার সম্বন্ধে একই সংবাদ দিয়াছেন।[২] অবশ্য 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'য় ও বৃন্দাবনের 'বৈষ্ণববন্দনা'য়[৩] অনন্ত-পুরী, সুখানন্দ-পুরী প্রভৃতি আটজন পুরীর মধ্যে যে রঘুনাথের নাম উল্লেখিত হইয়াছে তিনি সম্ভবত নিত্যানন্দ-শিষ্য হইতে পারেন না। আবার মূলস্কন্ধ-শাখায় যে রঘুর সাক্ষাৎ মেলে তিনি উড়িষ্যাবাসী। কিন্তু অদ্বৈত-শাখান্তর্গত রঘুনাথের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানিতে পারা যায় না। তবে তিনি যে গৌড়ীয়, তাহা তাঁহার পার্শ্ববর্তী অন্যান্য ভক্তের পরিচয় হইতে সহজেই জানা যায়। যে-সমস্ত গৌড়ীয় ভক্তকে লইয়া মহাপ্রভু সর্বপ্রথম নীলাচলে সাত-সম্প্রদায়ের কীর্তন-রীতির প্রবর্তন করেন, তৎসহ বর্ণিত যে-রঘু নীলাচলে রামাই-নন্দাই-গোবিন্দাদির সহিত থাকিয়া মহাপ্রভুর সেবা করিতেন,[৪] তিনি যে মূলস্কন্ধ-শাখার রঘু এবং অদ্বৈত-শাখার রঘুনাথ, ইঁহাদের একজন হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। খুব সম্ভবত তিনি মূলস্কন্ধ-শাখার উড়িষ্যাবাসী রঘু এবং বৃন্দাবনদাস তাঁহার 'বৈষ্ণববন্দনা'তে উৎকলিয়া বিপ্রদাসাদির সহিত সেই বিপ্র-রঘুনাথদাসের চরণবন্দনা করিয়াছেন।[৫]

---

(১) প্রে. বি.—১৯শ. বি., পৃ. ৩০৯ ; ভ. র.—১০।৪১৫ ; ন. বি.—৬ষ্ঠ. বি., পৃ. ৮৪ (২) চৈ. ভা.—৩।৬, পৃ. ৩১৭ ; চৈ. ম. (জ.)—বি. খ., পৃ. ১৪৫ (৩) গৌ. দী.—৯৭ ; বৈ. বং (বৃ.)—পৃ. ৭-৮ (৪) চৈ. চ.—২।১৩, পৃ. ১৬৫ ; ৩।৬, পৃ. ৩১৯ ; ৩।১২, পৃ. ৩৪৪ (৫) পৃ. ৫

দিগ্বিজয়ী

'চৈতন্যভাগবতে' দিগ্বিজয়ী সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণটি লিপিবদ্ধ হইয়াছে।[১]

নিমাই-পণ্ডিত যখন তাঁহার প্রিয়-পড়ুয়াবৃন্দকে লইয়া অধ্যাপনা আরম্ভ করিয়াছেন, তখন একদিন এক দিগ্বিজয়ী মহাপণ্ডিত মহাদম্ভ সহকারে শিষ্যবৃন্দ-পরিবেষ্টিত হইয়া 'হস্তী, ঘোড়া, দোলা, ধন যতেক সম্ভার'-সহ নবদ্বীপে পৌঁছাইলেন। নিমাই-পণ্ডিতের সঙ্গী-বৃন্দ ভীত হইয়া নিমাইকে সংবাদ দিলে নিমাই চিন্তা করিলেন যে প্রকৃত জ্ঞানীর এইরূপ দম্ভ অসমীচীন। অথচ দিগ্বিজয়ী বিজিত হইলে বেদনা-ক্লিষ্ট হইবেন কল্পনা করিয়া তিনি সর্বজন-সমক্ষে তাঁহার সহিত তর্কযুদ্ধে অবতরণ করিতে ইতস্তত করিলেন। তদনুযায়ী তিনি রাত্রিতে একাকী নিঃশব্দে তাঁহার নিকট পৌঁছাইয়া তাঁহার গঙ্গাস্তব শ্রবণ করিতে চাহিলেন। দিগ্বিজয়ী শিষ্যবৃন্দের নিকট নিমাই-পণ্ডিতের পরিচয় পাইয়াছিলেন। এক্ষণে সেই নিমাই তাঁহার কবিত্বের মর্ম উপলব্ধি করিতে চাহিয়া 'পাপবিমোচনার্থ' পুণ্যসলিলা গঙ্গার মাহাত্ম্য শ্রবণে উৎসুক হইয়াছেন দেখিয়া তিনি আনন্দে গঙ্গা-মহিমা স্তব করিতে লাগিলেন। কিন্তু শেষে নিমাই তৎকৃত শ্লোকের মধ্য হইতে বহুবিধ দোষ প্রতিপন্ন করিয়া দিলে দিগ্বিজয়ীর গর্ব খর্ব হইয়া গেল। নিমাই বাড়িতে ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু সেই দিগ্বিজয়ী-পণ্ডিত অতি প্রত্যুষে উঠিয়া নিমাইর শরণাপন্ন হইলে নিমাই জানাইলেন :

> শুন বিপ্রবর তুমি মহাভাগ্যবান।
> সরস্বতী যাঁহার জিহ্বায় অধিষ্ঠান।
> দিগ্‌বিজয় করিব বিদ্যার কার্য নহে।
> ঈশ্বরে ভজিলে, সে বিদ্যার সত্ত্যে কহে।

চূর্ণিতদম্ভ দিগ্‌বিজয়ী ঐশ্বর্য-সম্পদ পরিত্যাগ করিয়া গৌরাঙ্গ-প্রদর্শিত পথে অবতরণ করিলেন।

'চৈতন্যচরিতামৃতে'র বর্ণনা[২] একটু ভিন্ন ধরণের। গ্রন্থকর্তা লিখিয়াছেন যে দিগ্বিজয়ী-পণ্ডিতই প্রথমে সদর্পে নিমাই-পণ্ডিতের নিকট গিয়া গঙ্গার স্তব করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। নিমাই তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইলেও তিনি তাঁহাকে সামান্য ব্যাকরণের পণ্ডিত ও 'কলাপ'-পারদর্শী বলিয়া অবজ্ঞা করিয়াছিলেন। কিন্তু নিমাই তদ্বর্ণিত শত

(১) ১।৯, পৃ. ৬৩-৬৭ (২) ১।১৬, পৃ. ৬৮-৭০

শ্লোকের মধ্য হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার ভ্রম-প্রমাদ প্রদর্শন করিলে তিনি তাঁহার স্মৃতি- ও মেধা-দর্শনে স্তম্ভিত হন।

'ভক্তিরত্নাকরে'র লেখক উক্ত দিগ্বিজয়ী-পণ্ডিত সম্বন্ধে জানাইতেছেন[৩] যে তিনি ছিলেন কাশ্মীরবাসী, নাম কেশব-কাশ্মীর। তিনি 'লঘুকেশব'-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। 'গৌরাঙ্গবিজয়'-মতে[৪] দিগ্বিজয়ী-পণ্ডিত দ্রাবিড়বাসী, নাম 'সর্বজিতভট্ট'।

(৩) ১২।২২৭৩-৭৫ (৪) পৃ. ১৪২-৪৩

কাজী

কাজীদলন গৌরাঙ্গপ্রভুর নবদ্বীপলীলার একটি প্রধান ঘটনা। 'চৈতন্যভাগবত' ও 'চৈতন্যচরিতামৃত' মধ্যে[১] এই সম্বন্ধে যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে কিছু বিভিন্নতা দৃষ্ট হইলেও, মূলত তাহাদের বিষয়বস্তু প্রায় একই। জয়ানন্দের গ্রন্থে কেবল ইহার উল্লেখ-মাত্র দৃষ্ট হয়। 'চৈতন্যভাগবত'-মতে গৌরাঙ্গ যখন গয়া হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া নদীয়াবাসী-গণকে কৃষ্ণ-সংকীর্তনে মাতাইয়া তুলিতেছিলেন এবং তাঁহার নির্দেশানুসারে যখন নবদ্বীপের গৃহে গৃহে এবং পথে ঘাটে সংকীর্তনের সাড়া পড়িয়া যায়, তখন কাজী তাহা শুনিতে পাইয়া নবদ্বীপ-নগরে সংকীর্তনের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রদান করেন। এইস্থলে 'চৈতন্যভাগবত'-কার বলেন যে কাজী স্বয়ং নগর-পথে সেই কীর্তন শুনিয়া রুষ্ট হইয়াছিলেন এবং 'চৈতন্য-চরিতামৃত'-কার বলেন যে প্রথমে যবনগণ এবং তাহার পরে হিন্দু পাষণ্ডী-বৃন্দ কাজীর নিকট গিয়া অভিযোগ উত্থাপন করিলে কাজী ঐরূপ নিষেধাজ্ঞা দান করেন। যাহাহউক, কাজীর এই নিষেধাজ্ঞা ছিল কঠোর। নগরবাসী-গণ সকলেই কাজী কর্তৃক নির্যাতিত হইবার আশঙ্কায় হরি-সংকীর্তন বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা তাহাতে বিক্ষুব্ধ হইয়া গৌরাঙ্গের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে তিনি কাজীর নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া প্রকাশ্য পথে একটি বিরাট শোভাযাত্রা পরিচালনার জন্য তাঁহার প্রধান ভক্তবৃন্দকে নির্দেশ দান করিলেন। এই ব্যাপারে নগরময় সাড়া পড়িয়া গেল এবং সমস্ত নগরবাসী মিলিয়া এক বিরাট বিপ্লবাত্মক শোভাযাত্রার প্রস্তুতি সম্পন্ন করিলে গৌরাঙ্গপ্রভু স্বয়ং নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। শোভাযাত্রা নগরীর বিখ্যাত পথগুলি ঘুরিয়া বারকোণা-ঘাট প্রভৃতি হইয়া সিমুলিয়ায় (জয়ানন্দের গ্রন্থানুযায়ী 'সিম্বলিয়া') কাজীর গৃহ সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। বৃন্দাবনদাস বলেন যে শোভাযাত্রাকালে গৌরাঙ্গ-ভক্তবৃন্দের হস্তে পড়িয়া পাষণ্ডীবৃন্দকে চরম নিগ্রহ ভোগ করিতে হইয়াছিল এবং গৌরাঙ্গ কাজীর গৃহের নিকট আসিয়া তাঁহার ঘরবাড়ী ভাঙিয়া আগুন লাগাইয়া দিতে আদেশ দিলে শোভাযাত্রী-বৃন্দ কাজীর গৃহ ও তাঁহার উদ্যানাদির অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিয়া দেয়। কাজী পলাইয়া যান এবং গৌরাঙ্গ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলে সঙ্গী-বৃন্দ তাঁহাকে অনেক অনুনয় করিয়া কাজীকে প্রাণে বাঁচিয়া থাকিতে দিবার জন্য প্রার্থনা জানান এবং তখন তিনি নিবৃত্ত হন। 'চৈতন্যচরিতামৃত' হইতে কিন্তু জানা যায় যে 'প্রশ্রয় পাগল' 'উদ্ধত' জনতা 'তর্জগর্জন' করিয়া কাজীর গৃহদ্বার ভাঙিতে গেলে তাঁহাদের নেতা গৌরাঙ্গ 'ভব্যলোক' প্রেরণ করিয়া কাজীকে ডাকাইয়া

(১) চৈ. ভা.—২।২৩ ; চৈ. চ.—১।১৭ ; পৃ. ৭৪-৭৬

আনেন এবং ভয়েভীত কাজী গৌরাঙ্গের নিকট আসিলে তিনি কাজীকে আশ্বস্ত করেন। তারপর কাজী যখন জানাইলেন যে নীলাম্বর-চক্রবর্তীর সম্পর্কে তিনি গৌরাঙ্গের মাতুলস্থানীয় এবং তজ্জন্য মাতুলাপরাধ অবশ্যই ক্ষমনীয়, তখন উভয়ের মধ্যে মিলন সংঘটিত হয়। গৌরাঙ্গপ্রভু কাজীকে নানভাবে জ্ঞানদান করিলে কাজী তাঁহার কৃতকর্মের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন এবং অনুতপ্ত হন। তিনি স্বয়ং কৃষ্ণনাম গ্রহণ করায় গৌরাঙ্গ প্রভু চমৎকৃত হইলেন এবং শেষে

কাজী কহে "মোর বংশে যত উপজিবে।
তাহাকে তালাক দিব কীর্ত্তন না বাধিবে॥"

নদীয়ায় সংকীর্তনের ক্ষেত্র পুনর্মুক্ত হইয়া গেলে গৌরাঙ্গপ্রভু জনতাকে সঙ্গে লইয়া প্রত্যাবর্তন করেন।

এই কাজী সম্বন্ধে আধুনিক 'বৈষ্ণবদিগ্‌দর্শনী'-গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে[২], "গৌড়ের বাদশাহার দৌহিত্র চাঁদ কাজি নবদ্বীপের শাসনকর্তা......তাঁহার বংশে শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবার সৃষ্টি হইল। চাঁদ কাজির সমাধি নবদ্বীপে 'বল্লালটিলা'র নিকট।"

(২) পৃ. ৪৬

চৈতন্যচরিতামৃতোক্ত বিভিন্ন শাখার অনাধিক খ্যাতিসম্পন্ন ভক্তবৃন্দ

'চৈতন্যচরিতামৃতে'র মূলস্কন্ধ-শাখা মধ্যে শ্রীনিধি-মিশ্র গোপীকান্ত-মিশ্র ভগবান, শ্রীকর, শ্রীমধুসূদন, পুরুষোত্তম-পালিত, জগন্নাথদাস, জগন্নাথ-তীর্থ, ওড্র-কৃষ্ণানন্দ, তপন-আচার্য, নীলাম্বর (নীলাই ?), সিঙ্গাভট্ট, কামাভট্ট ও দন্তুর নামক বৈষ্ণববৃন্দের নাম এবং গ্রন্থের নিত্যানন্দ-শাখা মধ্যে বিহারী, কৃষ্ণদাস, সূর্য, জগন্নাথ, শ্রীমন্ত, অবধূত পরমানন্দ গোপাল, বিষ্ণাই হাজরা ও শ্রীরঙ্গ নামক শিষ্যবৃন্দের নাম এবং তাহার অদ্বৈত-শাখা মধ্যে জগন্নাথ-কর, ভগবান-কর, যাদবদাস, শ্রীবৎস-পণ্ডিত, কৃষ্ণদাস, বৈদ্যনাথ, বিজয়-পণ্ডিতের নাম ও গদাধর-শাখা-বর্ণনার মধ্যে শ্রীধর-ব্রহ্মচারী, গঙ্গামন্ত্রী, কণ্ঠাভরণ (ইনি চট্টবংশজাত শ্রীকণ্ঠা-ভরণোপাধিক অনন্ত),[১] ভাগবতদাস, সাদিপুরিয়া-গোপাল, বঙ্গবাটী (নামামৃত সমুদ্রে[২] রঙ্গবাটী)-চৈতন্যদাস, শ্রীরঘুনাথ-হস্তীগোপাল (ইনি 'হস্তিগোপাল নামা চ রঙ্গবাসী চ বল্লভঃ'[৩]), চৈতন্য-বল্লভ ও যদু-গাঙ্গুলির নাম লিখিত হইয়াছে। কিন্তু ইঁহাদের সম্বন্ধে সম্ভবত অন্য কোথাও বিশেষ কোনও তথ্য প্রদত্ত হয় নাই। হয়ত কোথাও কাহারও নামমাত্র উল্লেখ থাকিতে পারে। মূলস্কন্ধ-শাখার তপন-আচার্য, নীলাম্বর, সিঙ্গাভট্ট, কামা-ভট্ট ও দন্তুর উড়িষ্যাবাসী ছিলেন।

(১) গৌ. দী.—২০৬ (২) না. স.—১৫০ (৩) গৌ. দী.—২০৬

দ্বিতীয় পর্যায়

ত্রিমল্ল-ভট্ট

মহাপ্রভু দক্ষিণ-ভ্রমণকালে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে ত্রিমল্ল-ভট্টের গৃহে বর্ষার চারিমাস অতিবাহিত করেন।[১] গোপাল-ভট্ট-গোস্বামী ছিলেন এই ত্রিমল্ল- বা তদ্ভ্রাতা বেঙ্কট-ভট্টের পুত্র। চৈতন্য-জীবনীকারদিগের মধ্যে সর্বপ্রাচীন মুরারি-গুপ্ত গোপাল-ভট্টকে ত্রিমল্ল-ভট্টের পুত্র বলিয়া জানাইয়াছেন।[২] তাঁহার পরবর্তী লেখক কবিকর্ণপুর, বৃন্দাবনদাস, লোচনদাস, ও কৃষ্ণদাস-কবিরাজ এ সম্বন্ধে কিছুই লিখিয়া যান নাই। পরবর্তী-কালে লিখিত 'কর্ণানন্দ', 'ভক্তমাল' ও 'ভক্তিরত্নাকরে' কিন্তু গোপালকে বেঙ্কটেরই পুত্র বলা হইয়াছে। এ বিষয়ে এই সকল গ্রন্থের আদর্শ ছিল সম্ভবত 'প্রেমবিলাস'। 'কর্ণানন্দ'-রচয়িতা যদুনন্দন বিশেষভাবেই 'প্রেম-বিলাস'-রচয়িতা নিত্যানন্দদাসের উল্লেখ করিয়াছেন। নরহরি-চক্রবর্তী যে 'প্রেমবিলাস' পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাও প্রায় সুনিশ্চিত। এই সমস্ত গ্রন্থকার এতদ্বিষয়ে নিত্যানন্দ-দাসকেই যে আদর্শ করিয়া থাকিবেন তাহাই সম্ভব বলিয়া মনে হয়। কারণ, মুরারি-গুপ্তের গ্রন্থখানি ছিল অতীব সংক্ষিপ্ত এবং সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। তজ্জন্য ইহার খুব বেশী প্রচলন থাকার কথা নহে। এক্ষেত্রে গোপাল-ভট্টের পিতা কে ছিলেন, তাহা জানিতে গেলে মুরারি ও নিত্যানন্দদাস, এই দুইজনের যে কোনও একজনের উক্তিকে সত্য বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়। চৈতন্যের জীবদ্দশাতেই তাঁহার বাল্যসঙ্গী মুরারি-গুপ্ত তাঁহার জীবনী-গ্রন্থটি রচনা করেন। আর নিত্যানন্দদাস উক্ত ঘটনার বেশ কিছুকাল পরে সম্ভবত ষোড়শ শতকের একেবারে শেষভাগে স্বীয় গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। সুতরাং এ বিষয়ে নিত্যানন্দের ভুল হওয়াই স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। 'প্রেমবিলাস'-গ্রন্থের বিংশবিলাসে উপরোক্ত তথ্যটি পরিবেষণ করা হইয়াছে। অংশটি প্রক্ষিপ্ত না হইলে মনে হয় লেখক সেইস্থলে ভুল বশত গোপালের পিতৃব্যের নাম প্রবোধানন্দ-সরস্বতী বলিয়া লিখিয়াছেন, প্রবোধানন্দ-সরস্বতীর জীবনী আলোচনা করিলে তাহা বুঝিতে পারা যায়। তাহাছাড়া, ঘটনা বা ইতিহাসের যাথার্থ্য সম্বন্ধে নিত্যানন্দদাসের উপর যে বহু-ক্ষেত্রেই নির্ভর করা চলে না, তাঁহার গ্রন্থপাঠে তাহা সম্যক্ উপলব্ধ হয়। এক্ষেত্রে ত্রিমল্ল-ভট্টকেই গোপালের পিতা বলিয়া স্বীকার করা সমীচীন মনে হয়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত একটি পুথিতে[৩] গোপালকে বেঙ্কট-তনয় বলা হইয়াছে। কিন্তু

---

(১) চৈ. চ.—২।১, পৃ. ৮৪ ; চৈ. চ. ম.—১৩।৪-৫ (২) শ্রীচৈ. চ.—৩।১৫।১৫ (৩) সু. (ব. সা. প.)—পৃ. ১০৪

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐ জাতীয় আর একটি পুথিতে[৪] তিনি সম্ভবত ত্রিমল্ল-ভট্টের পুত্ররূপেই বর্ণিত হইয়াছেন। লেখক ত্রিমল্লের পুত্র ও পৌত্রের উল্লেখও করিয়াছেন, কিন্তু বেঙ্কট-ভট্টের কোনও পুত্র ছিলেন কিনা, গ্রন্থমধ্যে তাহার প্রমাণ নাই।

পরবর্তী গ্রন্থকারদিগের মধ্যে 'অনুরাগবল্লী'-রচয়িতা মনোহরদাসের নাম বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। তিনিও যদুনন্দনদাসের মত গোপাল-শিষ্য শ্রীনিবাসের শাখান্তর্গত ছিলেন। ভট্ট-পরিবার সম্বন্ধে তিনি যেরূপ বিস্তৃত বর্ণনা দিয়াছেন এবং যেভাবে আলোচনা করিয়াছেন, সেইরূপ আর কেহই করেন নাই। তিনিও বলিতেছেন যে গোপাল-ভট্ট ত্রিমল্ল-ভট্টেরই পুত্র ছিলেন। শুধু তাহাই নহে; তিনি আলোচনা পূর্বক জানাইতেছেন যে কৃষ্ণদাস-কবিরাজ 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র মধ্য খণ্ডের প্রথম-পরিচ্ছেদে ত্রিমল্ল-ভট্টের গৃহে মহাপ্রভুর ভিক্ষাগ্রহণ ও বর্ষার চারিমাস অবস্থানের কথা লিখিয়া পরে

> নবম পরিচ্ছেদে সেই সূত্র বিস্তারিল
> তাহে তার ছোট ভাই বেঙ্কট লিখিল।
> ত্রিমল্লভট্টের পুত্রাদি আত্মসাৎ পরিপাটি।
> রহি গেল তে কারণে লিখনের ত্রুটি।

মনোহরদাসের এই প্রকার উক্তি দেখিয়া 'প্রেমবিলাসে'র উক্তি সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য এই যে 'প্রেমবিলাসে'র অষ্টাদশবিলাসের মধ্যে লেখক যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়াও ত্রিমল্লকেই গোপাল-ভট্টের পিতা বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়। আবার নরহরির বর্ণনা দেখিয়া মনে হয়, গোপাল-ভট্ট যে বেঙ্কট-ভট্টেরই পুত্র ছিলেন, এ বিষয়ে তিনি নিঃসংশয়।[৫] কিন্তু নরহরি ছিলেন প্রায় দুইশত বৎসর পরবর্তিকালের লোক। লোকমুখে তিনি প্রবোধানন্দের 'সরস্বতী'-খ্যাতির কথা শুনিয়াছিলেন। আলোচ্যমান বিষয়টির কথাও যদি কেবল লোকমুখে শুনা হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার উপর নির্ভর করা চলে না। এখানে 'প্রেমবিলাসে'র প্রভাব থাকিলে তাহাও সম্পূর্ণরূপে নির্ভরযোগ্য নহে। বল্লভদাস যে একটি পদে গোপালকে 'বেঙ্কটের পুত্র' বলিয়াছেন, তাহাও উক্তপ্রকার কারণে গ্রহীতব্য হইতে পারে না। তাছাড়া, বল্লভের বর্ণনা ত্রুটিবহুল। তিনি গোপালকে ভট্টমারি-গ্রামনিবাসী বলিয়াছেন।[৬]

যাহাহউক, এই ত্রিমল্ল-ভট্টেরা তিনভাই ছিলেন। ত্রিমল্ল, বেঙ্কট আর প্রবোধানন্দ।[৭] তিনি জনেই সম্ভবত পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। মহাপ্রভু তাঁহাদের গৃহে উঠিবার পূর্বে তাঁহারা

(৪) স. সূ.—পৃ. ৫ (৫) ভ. র.—১।১৫৭-৬১ (৬) গৌ. ভ.—পৃ. ৩১১ ; (৭) প্রে. বি—২০শ. বি., পৃ. ৩৪৬ ; ভ. র.—১।১২৮ (৮) ভ. র.—১।৮২-৮৪ ; আধুনিক বৈ. দি.-তে (পৃ. ৫২) বেঙ্কটকে শ্রী-সম্প্রদায়ী বলা হইয়াছে।

লক্ষ্মীনারায়ণের সেবা করিতেন[৮] এবং নারায়ণকেই স্বয়ং-ভগবান বলিয়া মনে করিতেন। মহাপ্রভু আসিয়া পৌঁছাইলে তাঁহারা তাঁহার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন এবং সবংশে তাঁহার পরিচর্যায় রত হন। তাঁহাদের সনির্বন্ধ অনুরোধে মহাপ্রভু বর্ষার চতুর্মাস ভট্টগৃহে কাটাইয়া যান। ঐ সময় তিনি প্রত্যহ ত্রিমল্ল, বেঙ্কট প্রভৃতি শ্রীরঙ্গক্ষেত্রের সমস্ত ব্রাহ্মণের সহিত কৃষ্ণকথায় অতিবাহিত করিতেন। তৎকালে সেইস্থানে এক বিপ্র গীতাপাঠ করিতে করিতে ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িতেন।[৯] কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া যখন মহাপ্রভু জানিলেন যে তিনি মূর্খ হইলেও অর্জুনের পার্শ্বস্থ রথ-'রজ্জুধর' শ্যামলসুন্দর কৃষ্ণকে প্রত্যক্ষভাবেই দেখিতে পান, তখন তিনি বিপ্রকে জানাইলেন যে তিনিই প্রকৃত গীতা-পাঠের অধিকারী। এইভাবে তিনি তাঁহাকে উৎসাহিত করিয়া তাঁহার নিকট স্বীয় শক্তি বা প্রতিভার পরিচয় প্রদান করত তাঁহাকে একজন মহাভক্তে পরিণত করিলেন। ভট্ট-পরিবারকেও তিনি স্বীয় প্রতিভার আলোকে আলোকিত করিয়া তুলিলে তাঁহারাও কৃষ্ণস্বরূপ সম্বন্ধে অবহিত হইয়া নারায়ণের ভগবত্তা সম্বন্ধে সকল অভিমান পরিত্যাগ পূর্বক প্রেমভক্তির পথ অবলম্বন করিলেন এবং চৈতন্যের মধ্যেই সেই স্বরূপকে প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন।

সেই সময়ে গোপাল-ভট্ট ছিলেন বালক মাত্র; কিন্তু পিতৃব্য প্রবোধানন্দ বিদ্যাশিক্ষা দিয়াছিলেন।[১০] মহাপ্রভু তাঁহার মধ্যে ভক্তিভাব প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার গুরু প্রবোধানন্দকে সেই কথা জানাইলেন এবং পিতামাতার মৃত্যুর পর যাহাতে তিনি গোপালকে বৃন্দাবনে প্রেরণ করেন, সেজন্যও উপদেশ দিয়া গেলেন। শুধু গোপাল নহে, প্রবোধানন্দও মহাপ্রভুর কৃপায় পরম ভাগবত হইয়াছিলেন। তিনি চৈতন্যাদেশ বিস্মৃত হন নাই। মহাপ্রভুর জীবদ্দশাতেই গোপালের পিতৃ-মাতৃ-বিয়োগ ঘটিলে তিনিই গোপালকে যথা সময়ে বৃন্দাবনে প্রেরণ করিয়াছিলেন।[১১] গোপালও তাঁহার পিতৃব্য প্রবোধানন্দের কথা কখনও ভুলিয়া যান নাই। 'হরিভক্তিবিলাসে'র মঙ্গলাচরণে[১২] তিনি স্বীয় গুরু চৈতন্যপ্রিয়-প্রবোধানন্দের কথা সগৌরবে স্মরণ করিয়াছেন।

'ভক্তিরত্নাকর'-প্রণেতা বলেন যে শ্রীনিবাস-আচার্য দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে শিখর-ভূমির রাজা হরিনারায়ণ শ্রীরাম-মন্ত্র গ্রহণ করিয়া শ্রীনিবাস-আচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে চাহিলে তিনি 'পত্রীদ্বারে' রঙ্গক্ষেত্র হইতে ত্রিমল্ল-ভট্টের পুত্রকে ডাকিয়া পাঠান। তদনুসারে ত্রিমল্ল-পুত্র পঞ্চকূটে গিয়া 'রামমন্ত্রে শিষ্য কৈল হরিনারায়ণে।'[১৩]

---

(৯) মুরারি-গুপ্তও এই গীতাপাঠক-বিপ্রের উল্লেখ করিয়াছেন,—শ্রীচৈ. চ.—৩।১৫।৮ (১০) তু.—স. সু., পৃ. ৬ (১১) প্রে. বি.—১৮শ. বি., পৃ. ২৭৪ ; অ. র.-মতে ত্রিমল্ল, বেঙ্কট: প্রবোধানন্দ তিনজনেরই মৃত্যুর পর গোপাল বৃন্দাবনে যান—১ম. ম., পৃ. ৭ (১২) হ. বি.—১।১।২ (১৩) ৯।৩০৮ ; দ্র.—শ্রীনিবাস

রামজপী-বিপ্র

দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণকালে মহাপ্রভু সিদ্ধবটে গিয়া রঘুনাথ-প্রণামের পর একজন বিপ্রের দ্বারা তাঁহার গৃহে নিমন্ত্রিত হন।[১] সেই বিপ্র নিরন্তর রাম নাম গ্রহণ করিতেন। কিন্তু মহাপ্রভুর দর্শনলাভের পর হইতেই, সম্ভবত তাঁহার মুখে কৃষ্ণনাম শুনিয়া, তিনিও কৃষ্ণনাম লইতে আরম্ভ করেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাঁহাকেই কৃষ্ণ সাব্যস্ত করিয়া বসেন। মহাপ্রভু সেই রামজপী-বিপ্রকে নানাভাবে কৃপা করিয়া বৃদ্ধকাশী চলিয়া যান।

(১) চৈ. চ.—২।৯, পৃ. ১৩৫-৩৬ ;চৈ. কৌ.—পৃ. ২১৯ ; দ্র.—চৈ. ম।.—৭।২৬

রামদাস-বিপ্র

দাক্ষিণাত্য-পরিভ্রমণকালে মহাপ্রভু দক্ষিণ-মথুরাতে কৃতমালায় স্নান সম্পন্ন করিয়া এক রামভক্ত বিপ্রের অনুরোধে তাঁহার গৃহে ভিক্ষানির্বাহার্থ হাজির হন।[১] কিন্তু সেই মধ্যাহ্নকালেও তাঁহার গৃহে পাকের কোন ব্যবস্থা না দেখিয়া তিনি বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। বিপ্র জানাইলেন যে সেই অরণ্যে খাদ্যসামগ্রীর বড়ই অভাব, লক্ষ্মণ ফলমূল সংগ্রহ করিয়া আনিলে তবে সীতাদেবী পাক চড়াইবেন। মহাপ্রভু তাঁহার একনিষ্ঠ উপাসনা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। তাহার পর রামদাস রন্ধন সম্পন্ন করিলে মহাপ্রভু তৃতীয় প্রহরে ভিক্ষানির্বাহ করিলেন। কিন্তু স্বয়ং সেই বিপ্র উপবাসে কাটাইতে থাকিলে জিজ্ঞাসাবাদের দ্বারা মহাপ্রভু জানিলেন যে জগন্মাতা মহালক্ষ্মী সীতাঠাকুরাণী রাক্ষসস্পৃষ্টা হইয়াছেন শুনিয়াই তাঁহার এত ব্যথা, এবং সেইজন্য তিনি 'অগ্নিজলে' প্রবেশ করিয়া জীবন পরিত্যাগ করিতে সংকল্প করিয়াছেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে অনেক বুঝাইলেন, বলিলেন যে চিদানন্দমূর্তি সীতাদেবীকে প্রাকৃত ইন্দ্রিয় কখনও দেখিতে বা স্পর্শ করিতে পারে না। রাবণের আগমনে সীতাদেবীর অন্তর্ধান ঘটিয়াছিল এবং রাবণ মায়া-সীতাকেই প্রকৃত সীতা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু তাঁহার কথাকে যথার্থ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে অনুরোধ করায় রামদাস-বিপ্র আশ্বস্ত হইয়া ভোজনে বসিলেন।

এই ঘটনার পর মহাপ্রভু বহুস্থান পরিভ্রমণ করিয়া শেষে রামেশ্বরে উপস্থিত হইলেন। বিশ্রামান্তে তিনি বিপ্র-সভায় কূর্মপুরাণ-পাঠ শ্রবণ করিয়া জানিলেন যে রাবণ জগন্মাতা সীতাকে হরণ করিতে আসিলে রাম-গেহিণী অগ্নির শরণ গ্রহণ করেন এবং অগ্নিদেবীও তাঁহাকে পার্বতীর নিকট রাখিয়া মায়া-সীতার দ্বারা রাবণকে বঞ্চনা করেন। রাবণবধের পর রামচন্দ্র সীতাকে অগ্নি-পরীক্ষার্থ আনয়ন করিলে অগ্নি সেই মায়া-সীতাকে গ্রহণ করিয়া সত্য-সীতাকে আনিয়া দেন। এই উপাখ্যান শুনিয়া মহাপ্রভু পরম আনন্দ লাভ করিলেন। তিনি বিপ্রদিগের নিকট সেই গ্রন্থখানি চাহিয়া লইয়া মায়া-সীতার উপাখ্যানটি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলেন এবং সেইস্থান হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া পুনরায় দক্ষিণ-মথুরাতে আসিয়া হাজির হইলেন। কাহিনী পাঠ করিয়া বিপ্র-রামদাস পুলকাশ্রু-বিগলিত নেত্রে মহাপ্রভুর চরণে অসংখ্য নমস্কার জানাইয়া তাঁহাকেই সাক্ষাৎ রঘুনন্দন জ্ঞানে তাঁহার সেবা করিলেন। পূর্বে স্বীয় মনোবেদনার জন্য যে তিনি মহাপ্রভুকে কষ্ট দিয়াছিলেন, সেইজন্য তিনি অত্যন্ত কুণ্ঠাবোধ করিয়া পুনরায় সাদরে তাঁহার ভিক্ষানির্বাহের সাড়ম্বর আয়োজন করিলেন। তাঁহার আন্তরিক নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া মহাপ্রভু পাণ্ড্যদেশস্থ তাম্রপর্ণী-অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

---

(১) চৈ. চ.—২।৯, পৃ. ১৪০-৪১ ; চৈ. চ. ম.—১৩।৯

কূর্ম

মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণকালে কূর্মক্ষেত্রে বা কূর্মস্থানে গিয়া কূর্ম নামক এক বৈদিক ব্রাহ্মণের গৃহে রাত্রিযাপন করেন[১]। শ্রদ্ধাবান ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুর অপূর্ব মূর্তি দর্শন করিয়া বিমোহিত হন এবং বিষয়বাসনা পরিত্যাগ পূর্বক তাঁহার সহিত চলিয়া যাইতে চাহিলে মহাপ্রভু তাঁহাকে নানাভাবে বুঝাইয়া নিবৃত্ত করেন ও সেইস্থানে রহিয়াই কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিবার জন্য আজ্ঞাদান করেন। কিন্তু কূর্ম তাহাতে অত্যন্ত ব্যথিত হইলে মহাপ্রভু তাঁহাকে জানান যে আবার তিনি তাঁহার নিকট নিশ্চয়ই ফিরিয়া আসিবেন।

প্রভাতে উঠিয়া মহাপ্রভু চলিয়া গেলে তৎস্থানবাসী বাসুদেব[২] নামক এক গলিত-কুষ্ঠরোগী কূর্মের নিকট আসিয়া দেখিলেন যে সন্ন্যাসী চলিয়া গিয়াছেন। লোকমুখে সেই সন্ন্যাসীর মাহাত্ম্যকথা শুনিয়া তিনি অনেক আশা লইয়াই আসিয়াছিলেন। কিন্তু সমস্ত শুনিয়া তাঁহার আর পরিতাপের সীমা রহিল না। তিনি কাঁদিয়া মূর্ছিত হইলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় মহাপ্রভু সেইদিন আর অগ্রসর না হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। কূর্মের গৃহে বাসুদেবের এই অবস্থা দেখিয়া তিনি তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গন দান করিলেন।

সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে বাঞ্ছিতের বাহুবন্ধনে ধরা পড়ায় বাসুদেবের সমগ্র দেহমনে যেন এক বিপুল শান্তি ও পুলকের বন্যা প্রবাহিত হইয়া গেল। বাসুদেব সুস্থ হইলেন।

---

(১) চৈ. না.—৭।৭-৮ ; চৈ. চ.—২।৭, পৃ. ১২১-২২ ; চৈ. চ. ম.—১২।১০১-১৬ ; দ্র.—চৈ. চ.—৩।৪, পৃ. ৩০৮ ; চৈ. ম. (লো.)—শে. খ., পৃ. ১৮১ (২) বাসুদেব-বিপ্র—না. স., ২২৮

তপন-মিশ্র

পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে পূর্ববংগে পদ্মা পারে তপন-মিশ্র নামে এক নিষ্ঠাবান বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ বাস করিতেন।[১] সাধ্যসাধনতত্ত্ব নির্ণয় করিতে না পারায় তিনি অন্তরে এক প্রকার অশ্বস্তি লইয়া কালযাপন করিতেছিলেন। এই সময়ে ১৫০০ খ্রী.-এর কাছাকাছি কোন সময়ে গৌরাঙ্গপ্রভু পদ্মাপারে গিয়া তৎস্থানের অধিবাসী-বৃন্দকে বিদ্যাদান করিতে থাকিলে একদিন তপন-মিশ্র তাঁহার নিকট আসিয়া মনের কথা ব্যক্ত করিলেন। গৌরাঙ্গ তখন তাহাকে কৃষ্ণ-ভজনার উপদেশ দিয়া জানাইলেন যে 'হরিনাম সংকীর্তনে মিলিবে সকল'।[২] এইভাবে সম্ভবত এই তপন-মিশ্রই হইলেন গৌরাঙ্গের প্রথম শিক্ষাশিষ্য।

বিপ্রবর কিন্তু প্রথমে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। তিনি গৌরাঙ্গের সহিত নবদ্বীপে আসিবার জন্য বার বার অনুরোধ করিতে থাকেন। তখন গৌরাঙ্গ তাঁহাকে কাশীধামে গমনের উপদেশ প্রদান করেন এবং আশ্বাস দিয়া যান যে কাশীতে তিনি তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে 'সাধ্যসাধন' শিক্ষা দান করিবেন। আজ্ঞা পাইয়া বিপ্রবর কাশী চলিয়া যান।[৩] সেইস্থানে ভক্ত চন্দ্রশেখরের-বৈদ্যের সহিত তিনি কৃষ্ণ-কথায় দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

এই ঘটনার বহুকাল পরে ১৫১৫ খ্রী.-এর দিকে মহাপ্রভু বৃন্দাবনগমন-পথে কাশীতে উপনীত হন। মধ্যাহ্নকালে তিনি মণিকর্ণিকার ঘাটে গঙ্গাস্নান করিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ তপন-মিশ্রের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটিল। পূর্বেই তিনি মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের কথা শুনিয়াছিলেন; এক্ষণে সাক্ষাৎ ঘটায় তিনি তাঁহাকে বিশ্বেশ্বর-বিন্দুমাধব দর্শন করাইয়া স্বগৃহে আনিলেন এবং 'সবংশে' তাঁহার পাদোদক পান করিয়া ধন্য হইলেন। মিশ্রের পুত্র রঘুনাথ-ভট্টাচার্য মহাপ্রভুর সেবা- ও পাদ-সংবাহনে নিযুক্ত হইলেন। যে কয়েকদিন[৪] মহাপ্রভু কাশীতে অবস্থান করিয়াছিলেন, সেই কয়েকদিনই মিশ্রের একান্ত অনুরোধে তাঁহাকে তাঁহার গৃহেই ভিক্ষানির্বাহ করিতে হইয়াছিল। মথুরা-বৃন্দাবন পরিদর্শন করিয়া আবার যখন তিনি কাশীতে প্রত্যাবর্তন করেন তখনও মিশ্র তাঁহাকে আপন গৃহে ভিক্ষানির্বাহ করিবার জন্য অনুরোধ জানাইলে মহাপ্রভু তাঁহার দুইমাস কাশীবাসকালে তপনের গৃহেই ভিক্ষানির্বাহ করিয়াছিলেন।[৫]

(১) বৈ. দি.-তে (পৃ.৩৫) ইঁহাকে লাউড়ের নবগ্রামবাসী বলা হইয়াছে। (২) চৈ. ভা.—১।১০ (৩) চৈ. চ.—১।১৬ (৪) 'দিন চারি'—চৈ. চ., ২।১; 'দিন দশ'—চৈ. চ., ২।১৭ (৫) বৃন্দাবনদাস (চৈ.

এই সময়ে সনাতন-গোস্বামী কাশীতে আসিয়া মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইলে তাঁহার সহিত তপনের পরিচয় ঘটে। ভক্ত তপন-মিশ্র সনাতনকেও আপনার গৃহে সাদর নিমন্ত্রণ জানাইলেন এবং তাঁহাকে মহাপ্রভুর প্রসাদান্ন ভক্ষণ করাইয়া তৃপ্ত করিলেন। তাহার পর তিনি সনাতনকে একখানি নূতন বস্ত্র দান করিয়া সম্মানিত করিতে চাহিলে সনাতন তাহা না গ্রহণ করায় একখানি পুরাতন বস্ত্র দান করিয়াই তিনি স্বীয় বাসনা পূর্ণ করেন।

এই সময়ে কাশীর বৈদান্তিক-সন্ন্যাসীদিগের চৈতন্য-নিন্দা সহ্য করিতে না পারিয়া তপন-মিশ্র ও চন্দ্রশেখর-বৈদ্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ সহকারে চৈতন্যকে সন্ন্যাসী-বৃন্দের সম্মুখে আনয়ন করিয়া তাঁহাদের গর্ব খর্ব করেন। তারপর মহাপ্রভু বিদায় লইয়া চলিয়া যাইবার বহুকাল পরে জগদানন্দ-পণ্ডিত বৃন্দাবনগমন-পথে কাশীতে তপন-মিশ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তাহারও কিছুকাল পরে তপনের পুত্র রঘুনাথ নীলাচলে গিয়া আট মাস পরে কাশীতে প্রত্যাবর্তন করেন। তাহার পর তপন-মিশ্র আর মাত্র চারি বৎসর বাঁচিয়াছিলেন।

ভা.—২।১৯, পৃ. ১৯৭) বলেন যে এই দুইমাস তিনি রামচন্দ্র পুরীর মঠে লুকাইয়া রহিয়াছিলেন। কিন্তু চৈতন্যচরিতামৃতাদি অন্যান্য গ্রন্থে ইহার সমর্থন পাওয়া যায় না।

চন্দ্রশেখর-বৈদ্য

বারাণসীতে চৈতন্যমহাপ্রভুর যে দুইজন একনিষ্ঠ ভক্ত স্থায়িভাবে বসবাস করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে চন্দ্রশেখর-বৈদ্য[১] একজন ছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পাদে যখন বৈদান্তিক সন্ন্যাসী-বৃন্দ ষড়্‌দর্শন-ব্যাখ্যা ও মায়াবাদ-প্রচারের আন্দোলন সৃষ্টি করিয়া সমগ্র কাশীধামকে তোলপাড় করিয়া তুলিয়াছিলেন, তখন এই চন্দ্রশেখর তাঁহার বৈষ্ণব-ধর্ম্ম লইয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন এবং বন্ধু তপন-মিশ্রের নিকট কৃষ্ণকথা শুনিয়া কালাতিপাত করিতেছিলেন। তিনি জাতিতে বৈদ্য ছিলেন এবং সম্ভবত 'লিখন-বৃত্তি'র উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার দিন চলিত। মহাপ্রভু বৃন্দাবনগমন-পথে কাশীতে তাঁহার এই 'পূর্বদাস' চন্দ্রশেখরের গৃহেই[২] প্রায় দশদিন অতিবাহিত করিয়া বৃন্দাবনে চলিয়া যান।

মহাপ্রভুর বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনকালে উদ্বিগ্ন চন্দ্রশেখর গ্রামের বাহিরেই তাঁহাকে ধরিলেন এবং স্ব-গৃহে আনয়ন করিলেন। এবারেও মহাপ্রভু পূর্ব্ববৎ তাঁহার গৃহে বাস করিয়া তপন-মিশ্রের গৃহে ভিক্ষানির্বাহ করিতে থাকেন।[৩] এই সময়ে চন্দ্রশেখরের নিকটে তাঁহার এক সঙ্গী বাস করিতেছিলেন, তাঁহার নাম পরমানন্দ। তিনি একজন ভাল কীর্তনীয়া ছিলেন। চন্দ্রশেখরের গৃহে মহাপ্রভু ভক্তিতত্ত্ব আলোচনা করিতেন; আর প্রতিদিন কীর্তনগান চলিত। কয়েকজনকে লইয়া বেশ একটি ছোট্ট দল গড়িয়া উঠিয়াছিল। মহাপ্রভু, চন্দ্রশেখর, তপন-মিশ্র, রঘুনাথ-ভট্ট, পরমানন্দ-কীর্তনীয়া, একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ আর বলভদ্র-ভট্টাচার্য। তারপর একদিন সর্বপ্রকার বন্ধন ছিন্ন করিয়া এই চন্দ্রশেখর-গৃহে আসিয়া দেখা দিলেন ভক্তশ্রেষ্ঠ সনাতন-গোস্বামী। সাধ্যসাধন-তত্ত্বালোচনা একটি উচ্চতর মার্গ অবলম্বন করিল।

মহাপ্রভুর ইচ্ছানুযায়ী চন্দ্রশেখর ও তপনের দ্বারা নবাগত-অতিথির সেবা-সৎকারাদি সুসম্পন্ন হইয়াছিল। তাহার পর কাশীর এই ভক্তদ্বয়ের ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার জন্যই মহাপ্রভু যেদিন কাশীর বিখ্যাত বৈদান্তিক সন্ন্যাসী-বৃন্দের গর্ব চূর্ণ করেন, সেইদিন এই ছোট্ট বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীর দল শেখর-ভবনে নাম-সংকীর্তনানন্দে মত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু দেখিতে দেখিতে দুইমাস কাটিয়া গেল। মহাপ্রভু একদিন রাত্রিশেষে নীলাচলের পথে যাত্রা করিলেন। সেইদিন—

(১) আধুনিক বৈ. দি.-মতে (পৃ. ৬৩) তাঁহার নাম 'চন্দ্রশেখর সেন' এবং তিনি মহাপ্রভুর 'দেশভক্ত'। (২) শ্রীচৈ. চ.—৪।১।১৮ (৩) বৃন্দাবনদাস ভিন্ন বর্ণনা দিয়াছেন; দ্র.—তপন-মিশ্র, পাদটীকা।

তপন মিশ্র রঘুনাথ মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ।
চন্দ্রশেখর কীর্তনীয়া পরমানন্দ জন॥
সবে চাহে প্রভু সঙ্গে নীলাচল যাইতে।
সবারে বিদায় দিল প্রভু যত্নের সহিতে॥

ইহার পর ভক্ত-চন্দ্রশেখরের আর বড় একটা খবর আমরা পাইনা। শুধু এইটুকু জানি যে বৃন্দাবনাভিমুখী জগদানন্দের নিকট তিনি মহাপ্রভুর সংবাদ শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং রঘুনাথ-ভট্টের নীলাচল-যাত্রাকালে তিনি মহাপ্রভুর নিকট তাঁহার 'দণ্ডবৎ' প্রেরণ করিতে পারিয়াছিলেন। 'ভক্তিরত্নাকর' হইতে জানা যায় যে শ্রীনিবাস-আচার্য প্রথমবার বৃন্দাবন-গমনপথে কাশীতে গিয়া চন্দ্রশেখরকে দেখিতে পান নাই। চন্দ্রশেখরের গৃহে তখন তাঁহার এক শিষ্য বাস করিতেছিলেন।[৪]

'চৈতন্যচরিতামৃতে'র মূলস্কন্ধ-শাখায় কৃষ্ণদাস-বৈদ্যের সহিত অন্য একজন শেখর-পণ্ডিতের উল্লেখ আছে। তিনি খেতুরির মহামহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।[৫]

(৪) ৪।১৮৩; রাজবল্লভ-গোস্বামী তাঁহার মু. বি.-গ্রন্থে জানাইতেছেন যে জাহ্নবা যখন স্বীয় দত্তক রামাই সহ বৃন্দাবনগমনকালে কাশীতে চন্দ্রশেখরের গৃহে উঠেন, তখন চন্দ্রশেখর জীবিত ছিলেন এবং তিনি পুত্র পরিবার সহ জাহ্নবার প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু এই বর্ণনা নির্ভরযোগ্য নহে। কোথাও ইহার সমর্থন নাই। (৫) ন. বি.—৮ম. বি., পৃ. ১০৭; রামাই-এর চৈ. দী.-তেও (পৃ.১৭) ইঁহার নাম আছে।

প্রবোধানন্দ-সরস্বতী

১২৮০ সালের 'বংগদর্শন'-পত্রিকার পৌষ-সংখ্যায় 'শ্রীরা'-লিখিত 'গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য-বৃন্দের গ্রন্থাবলীর বিবরণ' নামক প্রবন্ধে প্রবন্ধকার জানাইয়াছিলেন যে গোপাল-ভট্ট 'অচীরকাল মধ্যে সংসারের মায়া পরিত্যাগ করতঃ শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন, পথিমধ্যে কাশীনিবাসী প্রবোধানন্দ সরস্বতী দণ্ডীর আবাসে কিছুকাল থাকিয়া তাঁহার নিকট শিষ্য হইয়া যতিবেশ পরিগ্রহ করতঃ বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন।' আবার ৪১০-গৌরাব্দের 'বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা'র মাঘ-সংখ্যায় রাজীবলোচন দাস মহাশয় লিখিয়াছিলেন, "শ্রীল প্রবোধানন্দ স্বরস্বতী—যাঁহার পূর্বনাম প্রকাশানন্দ সরস্বতী—যিনি কাশীর দণ্ডীদের গুরু ও মহাদার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত তাঁহারই প্রণীত॥" সম্ভবত এই সমস্ত কারণেই শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ও তাঁহার 'শ্রীপ্রবোধানন্দ ও শ্রীগোপালভট্ট' নামক গ্রন্থে জানাইয়াছেন যে মহাপ্রভু কাশীতে প্রকাশানন্দকে আত্মসাৎ করিয়া তাঁহাকে 'প্রবোধানন্দ'-আখ্যায় ভূষিত করিবার পর প্রবোধানন্দ তদাজ্ঞায় বৃন্দাবনে গমন করেন ও গোপাল-ভট্ট একেবারে বৃন্দাবনে গমন করিয়াই তাঁহার খুল্লতাত এই প্রবোধানন্দের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। কিন্তু এই সমস্ত সিদ্ধান্ত যে ভ্রান্তিমূলক, পরবর্তী আলোচনায় তাহা স্পষ্ট হইতে পারে। তৎপূর্বে এই সমস্ত সিদ্ধান্তের কারণ সম্বন্ধে অবগত হওয়ার প্রয়োজন।

'ভক্তমাল'-গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে যে মহাপ্রভু কাশীতে প্রকাশানন্দ-সরস্বতীকে পরাভূত করিবার পর তাঁহার নাম প্রবোধানন্দ রাখিয়াছিলেন।[১] আবার 'প্রেমবিলাস'-গ্রন্থের বিংশবিলাসে উল্লেখিত হইয়াছে যে বেঙ্কট-নন্দন গোপাল-ভট্ট প্রবোধানন্দ-সরস্বতীর শিষ্য ছিলেন[২] এবং গোপাল-ভট্ট নিজেও 'হরিভক্তিবিলাসে' জানাইয়াছেন যে তিনি প্রবোধানন্দের শিষ্য ছিলেন।[৩] 'প্রেমবিলাসে'র অষ্টাদশবিলাস হইতে ইহাও জানা যায় যে গোপাল তাঁহার পিতৃব্য প্রবোধানন্দের শিষ্য ছিলেন।[৪] এই কয়েকটি বর্ণনা হইতে স্বভাবতই মনে হয় যে গোপালভট্টের পিতৃব্য এবং গুরু প্রবোধানন্দই মহাপ্রভু কর্তৃক পরাভূত প্রকাশানন্দ বা প্রবোধানন্দ-সরস্বতী। 'ভক্তিরত্নাকর'-প্রণেতা নরহরি-চক্রবর্তীও এই মতের সমর্থন করিয়া গোপালের পিতৃব্য এবং গুরু প্রবোধানন্দের সম্পর্কে বলিয়াছেন, "সর্বত্র হইল যার খ্যাতি সরস্বতী।"

'ভক্তমালে'র বিবরণ, 'প্রেমবিলাস'-গ্রন্থের বিংশবিলাসের একটিবারমাত্র উল্লেখ এবং প্রবোধানন্দের জীবৎকালের প্রায় দ্বিশতবর্ষ পরবর্তিকালে লিখিত 'ভক্তিরত্নাকরে'র সমর্থন

(১) ২২শ. মা., পৃ. ২৫৩ (২) পৃ. ৩৪৬ (৩) ১।১।২ (৪) পৃ. ২৭৩

ছাড়া আর কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ হইতে উভয়ের একত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়না। অথচ বহুবিধ ভ্রম ত্রুটি সত্ত্বেও 'ভক্তমাল,' 'প্রেমবিলাস' ও 'ভক্তিরত্নাকর' এই তিনখানিই প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। 'ভক্তিরত্নাকর' পরবর্তিকালে লিখিত হইলেও প্রাচীন গ্রন্থকর্তৃগণ-প্রদত্ত বিবরণ সংগ্রহ-ব্যাপারে ইহার গুরুত্ব সর্বাধিক। আবার চৈতন্য-পরবর্তিকালের বৈষ্ণবধর্ম পুনরভ্যুত্থানের ইতিহাস-সংগ্রহ বিষয়ে 'প্রেমবিলাস' একটি অপরিহার্য গ্রন্থ; এবং 'ভক্তমাল' সম্বন্ধে ১৯০৯ খ্রী.-এর রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি জার্ন্যালের 'Gleanings from the Bhakta Mala'-নামক প্রবন্ধে পণ্ডিতপ্রবর গ্রিয়ার্সন সাহেব জানাইয়াছেন যে সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধে নাভাজী কর্তৃক গ্রন্থখানির মূলবিষয় সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ হইলেও ঐ শতাব্দীর দ্বিতীয়ভাগে তাঁহারই তত্ত্বাবধানে প্রিয়াদাস যে বর্ধিত-ভক্তমাল গ্রন্থটি রচনা করিয়াছিলেন, তাহাও মূল গ্রন্থটির মত ছিল সমানভাবেই প্রামাণিক (of equal authority)। সুতরাং এই তিনখানি গ্রন্থের বর্ণনাই বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য হইয়া উঠে। গোপাল-ভট্ট নিজেকে প্রবোধানন্দ-শিষ্য বলিয়াছেন সত্য, কিন্তু তিনি যে প্রবোধানন্দ-সরস্বতীর শিষ্য ছিলেন, ইহা একমাত্র 'প্রেমবিলাসে'র একটিমাত্র উল্লেখ ছাড়া আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। আবার গোপালের পিতৃব্য প্রবোধানন্দ যে 'সরস্বতী'-আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহাও একমাত্র 'ভক্তিরত্নাকরে'র একটিমাত্র উল্লেখ ছাড়া আর কোথাও নাই। অথচ যে 'ভক্তমালে'র মধ্যে আমরা প্রকাশানন্দ-সরস্বতীর নাম-পরিবর্তনের ইতিহাস পাইতেছি, তাহাতে কিন্তু প্রবোধানন্দ-সরস্বতীকে কোথাও গোপালের পিতৃব্য বা গুরু বলিয়া উল্লেখ করা হয় নাই।

'চৈতন্যভাগবতে' দেখা যায় যে মহাপ্রভু তাঁহার নবদ্বীপলীলাকালে একবার মুরারি-গুপ্তকে বলিতেছেন যে কাশীতে প্রকাশানন্দ-নামক এক বৈদান্তিক-সন্ন্যাসী সেইকালে তাঁহার ঈপ্সিত ধর্মমতের ঘোর বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন।[৫] নরহরি-চক্রবর্তীও বৃন্দাবনের এই উক্তিকে সমর্থন করিয়াছেন।[৬] মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণকালে যে তাঁহার সহিত প্রবোধানন্দের সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল, ইহা পরবর্তিকালের ঘটনা। এই সাক্ষাৎকালে মহাপ্রভুর সংস্পর্শে আসা সত্ত্বেও যে বৈদান্তিক-পণ্ডিতের রূপান্তর ঘটে নাই এবং সেই রূপান্তর-ঘটনের জন্য আরও কয়েকবৎসর পরে মহাপ্রভুর কাশীগমনকালে পুনরায় তাঁহার সহিত সাক্ষাতের প্রয়োজন হইয়াছিল, ইহা বিশ্বাসযোগ্য হইতেই পারে না। তাহাছাড়া, 'প্রেম-বিলাসে'ই স্বীকৃত হইয়াছে যে ভট্ট-গৃহে বাসকালে মহাপ্রভু প্রবোধানন্দকে গোপাল-ভট্টের গুরু বলিয়া জানিয়াছেন এবং তাঁহাদের মধ্যে প্রীতি-সম্বন্ধও ঘটিয়াছিল।[৭] বৈদান্তিক-পণ্ডিতের শিষ্য গোপাল-ভট্ট স্বীয় গুরুর নিকট অবস্থান করিয়াও একদিনে তাঁহার পূর্বার্জিত

(৫) ২।৩, পৃ. ১১৫ ; ২।২০, পৃ. ২০৩ (৬) ভ. র.—১২।২৯৫২ (৭) ১৮শ. বি., পৃ. ২৭৩

বিদ্যাকে গোপন করিয়া একেবারে বৈষ্ণব হইয়া পড়িলেন এবং মহাপ্রভুর সেবায় নিয়োজিত হইয়া প্রবোধানন্দের সম্মুখেই ভাগবত-পাঠে অভিনিবিষ্ট-চিত্ত হইলেন, ইহা সম্ভব নহে। মায়াবাদী প্রবোধানন্দ অন্তত অত সহজে ছাড়িতেন না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, মহাপ্রভু সমস্ত ভট্ট-পরিবারকেই কৃষ্ণানুরাগী করিয়া তুলিয়াছিলেন। প্রবোধানন্দের জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা ত্রিমল্ল-ভট্ট ও বেঙ্কট-ভট্ট এবং ভ্রাতুষ্পুত্র ও প্রিয় শিষ্য গোপাল যেখানে একান্তভাবেই চৈতন্যের অনুরক্ত হইলেন, সেখানে প্রবোধানন্দও যে ঐরূপ হইয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারেনা। তাহা না হইলে, গ্রন্থকার-গণ সেই উল্লেখযোগ্য সংবাদটি পরিবেষণ করিতে কিছুতেই ভুলিতেন না এবং মহাপ্রভু নবদ্বীপলীলাকালেই যদি বৈদান্তিক-পণ্ডিতের কঠোর বিরুদ্ধাচরণ সম্পর্কে সচেতন থাকিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি যে এতটা সন্নিকটে আসিয়া সেই মায়াবাদীর সহিত প্রীতি-সম্পর্ক সৃষ্টি করিয়া যাইবেন, বা তাঁহাকে শোধন না করিয়া তাঁহার পরিবারের সহিত ভাব জমাইয়া যাইবেন, ইহা সম্ভব হইতেই পারে না। আর 'চৈতন্য-ভাগবতে'র উল্লেখ যদি সত্য নাও হইয়া থাকে, তাহা হইলে মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাতের পরে চার-পাঁচ বৎসরের মধ্যেই যে প্রবোধানন্দ একেবারে ঘোর বৈদান্তিক হইয়া মহাপ্রভুর বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন, তাহাও সম্ভব বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না।

'প্রেমবিলাস' হইতে জানা যায় যে মহাপ্রভু গোপালকে তাঁহার কোন কর্ম সম্পাদনার্থ বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিবার জন্য 'প্রাণসম' প্রিয় প্রবোধানন্দকেই নির্দেশ দিয়া আসিয়াছিলেন এবং তদনুযায়ী প্রবোধানন্দই গোপালকে বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। গোপালকে বৃন্দাবনে পাঠাইবার নির্দেশ-গ্রহণ এবং তাঁহাকে বৃন্দাবনে প্রেরণ, এই দুই ঘটনার মধ্যবর্তী প্রবোধানন্দের কাশীর জীবন একেবারে খাপছাড়া ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ হইয়া পড়ে। গোপাল-ভট্ট প্রবোধানন্দের নির্দেশমত বৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রা করিয়া 'ঝারিখণ্ড-পথে' গমন করিয়াছিলেন।[৮] সুতরাং বুঝিতে পারা যায় যে প্রবোধানন্দ ও গোপাল-ভট্ট তৎকালে তৈলঙ্গ-দেশেই বাস করিতেছিলেন। প্রবোধানন্দ-সরস্বতীর কাশী পরিত্যাগ পূর্বক শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে গমনের উল্লেখও কোথাও দেখা যায়না।

কাশীতে যে মায়াবাদী প্রকাশানন্দের সহিত মহাপ্রভুর বিতর্ক ঘটিয়াছিল, ইহা একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা এবং 'চৈতন্যচরিতামৃতে' ইহার বিশেষ বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে। নাভাজী স্বীকার করিতেছেন যে তিনি সেই কাহিনীকেই সংক্ষিপ্ত করিতেছেন মাত্র। অথচ 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র প্রাসঙ্গিক অংশে প্রবোধানন্দের নামোল্লেখ পর্যন্ত নাই। আবার 'অদ্বৈতপ্রকাশে' প্রবোধানন্দ-সরস্বতীর সহিত মহাপ্রভুর বিরোধ ও বিতর্কের কথা উল্লেখিত

(৮) প্রে. বি.—১৮শ. বি., পৃ. ২৭৩-৭৪

হইয়াছে। ইহাতে সহজেই অনুমেয় হয় যে প্রকাশানন্দ ও প্রবোধানন্দ-সরস্বতী এক ব্যক্তিই ছিলেন। 'অদ্বৈতপ্রকাশে' কিন্তু এই প্রবোধানন্দ-সরস্বতীর সহিত গোপাল-ভট্ট-গোস্বামীর কোন সম্বন্ধ স্বীকৃত হয় নাই। উক্ত উল্লেখের কিছু পরেই রূপ-সনাতনাদির সহিত গোপাল-ভট্টের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে। প্রকৃতই উভয়ের মধ্যে কোন সম্পর্ক থাকিলে গ্রন্থকর্তা এই দুইটি নিকটবর্তী উল্লেখের অন্তত একটির সঙ্গেও দুইজনকে একত্র যুক্ত করিতেন। সমগ্র 'চৈতন্যচরিতামৃত'-গ্রন্থে প্রবোধানন্দের নাম পর্যন্ত নাই। নরহরি-চক্রবর্তীর কথা সত্য হইলে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে গোপাল-ভট্টের নির্দেশানুযায়ী কৃষ্ণদাস-কবিরাজ তাঁহার গ্রন্থে গোপাল-ভট্ট-প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন নাই। কিন্তু ঐ গ্রন্থে স্বয়ং, গোপাল-ভট্ট, বেঙ্কট-ভট্ট ও ত্রিমল্ল-ভট্টের নাম উল্লেখিত হইয়াছে, আবার প্রকাশানন্দের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখিত আছে। গোপালের সঙ্গে প্রকাশানন্দের নিকট সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও যে কৃষ্ণদাস এইরূপ একটি সংবাদের উল্লেখও করিবেন না, তাহা হইতেই পারেনা। বিশেষ করিয়া মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্যভ্রমণ-বর্ণনার মধ্যেও কৃষ্ণদাস-কবিরাজ কর্তৃক প্রবোধানন্দের কোনও উল্লেখ না থাকায় তাঁহার বিপুল-খ্যাতি বা গুরুত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়। অথচ প্রবোধানন্দ-সরস্বতী অশেষ খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। এক্ষেত্রে গোপাল-ভট্টের খুল্লতাত প্রবোধানন্দ যে বৈদান্তিক-পণ্ডিত প্রকাশানন্দ বা প্রবোধানন্দ-সরস্বতী নহেন, তাহাই স্বীকার্য হইয়া উঠে।

মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণকালে যে কাবেরী-তীরে গিয়া ভট্ট-পরিবারের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, এই সংবাদ লোচনের 'চৈতন্যমঙ্গল', 'চৈতন্যচরিতামৃত', 'প্রেমবিলাস', 'কর্ণানন্দ', 'ভক্তমাল' এবং 'অনুরাগবল্লী' প্রভৃতি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে এই সকল গ্রন্থের প্রথমোক্ত প্রাচীন গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে প্রবোধানন্দের নাম নাই, 'কর্ণানন্দে'র মধ্যেও নাই। অন্য তিনখানি গ্রন্থে তাঁহার পরিচয় 'প্রবোধানন্দ'-নামে। কোথাও 'প্রকাশানন্দ'-নাম নাই। 'ভক্তমালে' বলা হইয়াছে যে প্রবোধানন্দ-স্বরস্বতীর পূর্বনাম ছিল প্রকাশানন্দ-সরস্বতী, কাশীতে মহাপ্রভুর সহিত বিতর্কের পর তিনি তাঁহার প্রতি অনুগত হইয়া পড়িলে মহাপ্রভু তাঁহার নাম পরিবর্তিত করিয়া প্রবোধানন্দ রাখেন। গোপাল-ভট্টের গুরু এবং 'সরস্বতী' যদি একব্যক্তি হইয়া থাকিতেন, তাহা হইলে উক্ত তিনখানি গ্রন্থে ভট্ট-পরিবারের বর্ণনাস্থলে তাঁহার পূর্বনাম প্রকাশানন্দের কথাই উল্লেখিত হইত। হইতে পারে যে তিনি প্রবোধানন্দ-সরস্বতী নামে বিখ্যাত হওয়ায় পরবর্তী গ্রন্থকার-গণ তাঁহাকে সেই নামেই অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহার 'সরস্বতী'-উপাধিটি নামপরিবর্তনের পরেও থাকিয়া গিয়াছিল। সুতরাং এই সমস্ত লেখক গোপাল-ভট্টের পিতৃব্যকে

কেবলমাত্র প্রবোধানন্দ না বলিয়া প্রবোধানন্দ-সরস্বতী নামেই উল্লেখ করিতে পারিতেন। এমনকি, যে-'ভক্তিরত্নাকর-'গ্রন্থ জনশ্রুতি অনুযায়ী তাঁহার 'সরস্বতী'-খ্যাতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতেও তাঁহাকে প্রবোধানন্দ-সরস্বতী বলিয়া নির্ভয়ে উল্লেখ করা হয় নাই। 'ভক্তিরত্নাকর' অনেক পরিবর্তিকালের গ্রন্থ। প্রবোধানন্দের নাম সর্বপ্রথম 'প্রেমবিলাসে'ই দৃষ্ট হয়। প্রবোধানন্দ-উপাখ্যানের ঘটনাকালের অন্তত আশী বৎসর পরে লিখিত 'প্রেমবিলাসে'র মধ্যে গোপাল-ভট্ট-গোস্বামীর পিতৃব্যের নামোল্লেখ ব্যাপারে ভুল না থাকিলেও উক্ত গ্রন্থের শেষাংশে যে তাঁহার নামের সহিত স্বনামধেয় বিখ্যাত প্রবোধানন্দ-সরস্বতীর উপাধিটি যুক্ত হইয়া যাইতে পারে তাহা আশ্চর্যজনক নহে। কৃষ্ণদাস-কবিরাজের মত নিত্যানন্দদাসের ঐতিহাসিক বা বাস্তবানুগ দৃষ্টিভঙ্গী সজাগ ছিলনা। সম্ভবত, তাঁহার এই ত্রুটির মধ্যেই নরহরির ত্রুটির মূল নিহিত থাকিবে। কিন্তু অন্যান্য গ্রন্থের উল্লেখ হইতে উক্ত দুই ব্যক্তিকে একজন বলিয়া ধরিয়া লওয়া চলেনা। এই বিষয়ে 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র ঋণ প্রায় সকল গ্রন্থকারই স্বীকার করিয়াছেন। কবিরাজ-গোস্বামী অপ্রয়োজনীয়তা বিধায় গোপাল-ভট্টের পিতৃব্যের নাম না উল্লেখ করিতে পারেন, কিন্তু প্রকাশানন্দ-সরস্বতী বা প্রবোধানন্দ-সরস্বতীর সহিত সেই নামের সংযোগ থাকিলে তিনি নিশ্চয়ই তাহার উল্লেখ করিতেন। 'ভজননির্ণয়' নামক একটি যথেষ্ট সন্দেহজনক গ্রন্থে দেখা যায় যে মহাপ্রভু কাশীর এই পণ্ডিতকে 'প্রবোধানন্দ' বলিয়াছেন।[১] কিন্তু যে সময় মহাপ্রভু এইপ্রকার উক্তি করিতেছেন, তাহার পূর্বেই উভয়ের মধ্যে তর্কযুদ্ধ ও তাহার ফলে প্রকাশানন্দের নাম-পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য এই যে যে-'ভক্তমাল'-গ্রন্থে প্রকাশানন্দের নাম-পরিবর্তনের ইতিহাস লিখিত হওয়ায় বিষয়টি আপাতজটিল হইয়া উঠিয়াছে, তাহার কোন স্থলেই কিন্তু তাঁহাকে গোপালের পিতৃব্য বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই। মহাপ্রভুর শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে বাস, বা ভট্ট-পরিবারের সহিত সান্নিধ্যের কথা গ্রন্থকার বিশেষভাবেই উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় এই যে সেইস্থলে প্রবোধানন্দের চিহ্নমাত্রও খুঁজিয়া পাওয়া যায়না। সুতরাং গোপাল-ভট্টের পিতৃব্যের নাম প্রবোধানন্দ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও তিনি যে প্রকাশানন্দ বা প্রবোধানন্দ-সরস্বতী হইতে ভিন্ন ব্যক্তি তাহা নিঃসন্দেহ।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে যে-সকল বৈদান্তিক ও মায়াবাদী-পণ্ডিত বারাণসীতে থাকিয়া বেদান্তচর্চা বা বেদান্তাধ্যয়ন করিতেছিলেন, তাঁহাদের গুরু-স্থানীয় ছিলেন সুবিখ্যাত পণ্ডিত প্রকাশানন্দ-সরস্বতী। গৌরাঙ্গের নবদ্বীপলীলাকালেই প্রকাশানন্দ বেশ যশস্বী

(১) পৃ. ১২০

হইয়াছিলেন। তাঁহার মায়াবাদ প্রচারের কথা সুদূর নবদ্বীপেও পৌঁছাইয়াছিল, এবং ভক্তিধর্ম-প্রবর্তক গৌরাঙ্গপ্রভু তাঁহার মত পণ্ডিতের সেই ভক্তিপ্রেমশূন্য ধর্মবাদ প্রচারের কথা শুনিয়া বিচলিত হইয়াছিলেন।[১০] তাহার পর তিনি যখন নীলাচলে গিয়া বিখ্যাত বৈদান্তিক-পণ্ডিত সার্বভৌম-ভট্টাচার্যকেও ভক্তিবাদী করিয়া তুলিলেন, তখন প্রকাশানন্দ স্থির থাকিতে পারিলেন না। বেদান্তবাদী-সার্বভৌমের পরাজয় ও পরিবর্তন তাঁহাকে পীড়া দিতে লাগিল। চৈতন্যমহাপ্রভু যে কাশীবাস না করিয়া নীলাচলে বাস করিতেছিলেন তজ্জন্য তিনি একটি ব্যঙ্গপূর্ণ শ্লোক লিখিয়া তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলে মহাপ্রভুও তাহার উত্তর প্রেরণ করেন। মহাপ্রভুর নিকট আর একটি ব্যঙ্গাত্মক শ্লোক প্রেরিত হইলে চৈতন্যের অগোচরেই তাঁহার ভক্তবৃন্দ তাঁহার একটি যথাযথ উত্তর পাঠাইয়া দেন। এইখানেই আপাতত পত্রালাপের পরিসমাপ্তি ঘটে। কিন্তু প্রকাশানন্দের এইরূপ রূঢ় আচরণের প্রত্যুত্তর দেওয়ার জন্যই বোধকরি একবার সার্বভৌম-ভট্টাচার্যও স্বয়ং কাশীতে গিয়াছিলেন। সম্ভবত উক্ত ব্যাপারের পরিসমাপ্তির ইহাও একটি কারণ হইতে পারে। প্রকাশানন্দ কিন্তু স্থির করিয়া রাখিলেন যে তথাকথিত চৈতন্য একজন 'লোকপ্রতারক' 'ইন্দ্রজালী'। সার্বভৌম প্রভৃতি পণ্ডিত এবং অন্যান্য ভাবুকগণ যে তাঁহাকে কৃষ্ণ-সিদ্ধান্ত করিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছেন, ইহা কেবল চৈতন্যের যাদুবিদ্যার ফলেই।[১১]

কিছুকাল পরে মহাপ্রভু বৃন্দাবনের পথে কাশী আসিয়া পৌঁছাইলে একদিন কাশীবাসী এক মহারাষ্ট্রীয় বিপ্র মহাপ্রভুকে দেখিতে আসিয়া তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়েন। তিনি প্রকাশানন্দের সভায় গিয়া মহাপ্রভুর গুণকীর্তন করিলে প্রকাশানন্দ তাঁহাকে উপহাস করিয়া জানাইলেন যে নীলাচলে তিনি যাহাই করুন না কেন, 'কাশীপুরে না বিকাবে তার ভাবকালী।' এই বলিয়া তিনি সেই বিপ্রকে বেদান্ত শ্রবণ করিতে উপদেশ দিলেন। কিন্তু মহাপ্রভুর প্রভাবে তাঁহার মন শুদ্ধ হইয়াছে এবং তিনি প্রেমপথের সন্ধান পাইয়াছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিয়া সেইস্থান পরিত্যাগ করিলেন এবং মহাপ্রভুর নিকট আসিয়া সমস্তই ব্যক্ত করিলেন। মহাপ্রভু এসম্বন্ধে কিছুই না বলিয়া সাদরে কৃষ্ণস্বরূপ সম্বন্ধে নানাবিধ উক্তির দ্বারা তাঁহাকে আত্মসাৎ করিয়া লইলেন। প্রকাশানন্দের সহিত তাঁহার আর সাক্ষাৎ হইল না। পরদিনই তিনি প্রয়াগের পথে যাত্রা করিলেন।

বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া মহাপ্রভু চন্দ্রশেখরের গৃহে উঠিলে মহারাষ্ট্রী-বিপ্র তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই সনাতন আসিয়া পৌঁছাইলে মহাপ্রভু

(১০) চৈ. ভা.—২।৩, পৃ. ১১৫ ; ২।২০, পৃ. ২০৩ ; ভ. র.—১২।২৯৫২ (১১) চৈ. চ.—২।১৭, পৃ.১৯৭

সনাতনের সহিত মহারাষ্ট্রী-বিপ্রের পরিচয় করাইয়া দিলেন। ইতিমধ্যে চৈতন্যকে লইয়া কাশীর পণ্ডিত-সমাজে নানাবিধ ঠাট্টা-বিদ্রূপ হইয়া গিয়াছে। মায়াবাদী সন্ন্যাসীদিগের নিকট তিনি কেবল উপহাসেরই পাত্র হইয়া আছেন। তপন, চন্দ্রশেখর, মহারাষ্ট্রী-বিপ্র সেইকথা শুনিয়া অশেষ যাতনা ভোগ করিতেছেন। মহাপ্রভুর বৃন্দাবনযাত্রাকালে তাঁহারা পুনঃ পুনঃ তাঁহার দৃষ্টি এইদিকে আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিলেও কিছুই হয় নাই। বিপ্রেরা তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিতেন। কিন্তু পাছে কোথাও কোন সন্ন্যাসীর সংস্পর্শে আসিতে হয়, সেইজন্য তিনি কাঁহারও নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন নাই। এবার কিন্তু মহারাষ্ট্রী-বিপ্র কিছুতেই ছাড়িলেন না। মায়াবাদী সন্ন্যাসীদিগের প্রতাপ ও পীড়ন অসহনীয় হইয়াছিল। কোনপ্রকারে একটিবারের জন্যও মহাপ্রভুর সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ ঘটাইয়া তাঁহাদের মুখ বন্ধ করিয়া দিতে না পারিলে, চিরকালই তাঁহাকে সেজন্য অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে হইবে। তিনি সন্ন্যাসী-বৃন্দকে স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া মহাপ্রভুকে সেই সংবাদ জানাইলেন এবং একান্তভাবে ধরিলেন, একটিবারের মত তাঁহাকে সেখানে যাইতেই হইবে। চন্দ্রশেখর ও তপন আসিয়া তাঁহার সহিত যোগদান করায় মহাপ্রভু তাঁহাদের মিলিত অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না।

বিপ্র-গৃহে আসিয়া মহাপ্রভু দেখিলেন যে প্রকাশানন্দ তাঁহার দলবল লইয়া বসিয়া আছেন। তিনি যাওয়ামাত্র তাঁহারা তাঁহাকে সম্মানিত করিলেন এবং তিনি একান্তে গিয়া আসন গ্রহণ করিতে চাহিলে স্বয়ং প্রকাশানন্দ তাঁহাকে অপবিত্র স্থানে বসিতে না দিয়। বিশিষ্ট স্থানে আনিয়া বসাইলেন। মহাপ্রভু জানাইলেন যে তিনি হীন-সম্প্রদায়ভুক্ত, সুতরাং বিখ্যাত পণ্ডিতদিগের মধ্যে তাঁহার স্থান হওয়া উচিত নহে। প্রকাশানন্দ পূর্ব হইতে সংবাদ লইয়া জানিয়াছিলেন যে চৈতন্য কেশব-ভারতীর শিষ্য। তিনি তজ্জন্য তাঁহাকে সম্মানিত করিয়াই বলিলেন যে তাহা হইলে তিনিতো সম্প্রদায়ী-সন্ন্যাসী, সুতরাং তাঁহার পক্ষে সন্ন্যাসীদিগের সঙ্গত্যাগ করিয়া গ্রামের একপ্রান্তে নির্জনে গিয়া থাকা উচিত নহে, আর সন্ন্যাসীর প্রকৃত ধর্ম যে বেদান্ত-পঠন-পাঠন, তাহা পরিত্যাগপূর্বক কয়েকজন ভাবুকের সহিত নাচ-গান করিয়া বেড়ানও সংগত নহে; তাঁহার মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য দেখিলেই আকৃষ্ট হইতে হয়, অথচ তিনি কেন এইভাবে হীনাচার করিয়া বেড়াইবেন! মহাপ্রভু উত্তর দিলেন যে তাঁহাকে অতিশয় মূর্খ ও বেদান্তাধ্যয়নে অনুপযুক্ত দেখিয়া তাঁহার গুরু কেবল কৃষ্ণমন্ত্র জপ করিবার উপদেশ দিয়াছিলেন। সেই নাম জপ করিতে করিতে তিনি ক্রমে ঐরূপ হাস্য, ক্রন্দন ও নৃত্য-সংকীর্তন করিতে থাকেন এবং ক্রমে উন্মত্ত হইয়া পড়েন। তারপর একদিন তিনি গুরুর নিকট গিয়া সমস্ত কথা নিবেদন করিলে তিনি জানাইয়াছিলেন যে উহাই কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের স্বভাব;

তাঁহার পরম পুরুষার্থপ্রাপ্তিতে গুরু স্বীয়-দীক্ষাদানকে সার্থক মনে করিয়া তাঁহাকে ঐভাবে ভক্তবৃন্দসহ নাচ-গান করিয়া বেড়াইতে উপদেশ দিয়াছেন এবং তদবধি চৈতন্যও নামপ্রেমে অধিকতর মত্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। সন্ন্যাসী-বৃন্দ মহাপ্রভুর কথায় করুণার্দ্র হইয়া জানাইলেন যে তিনি উপযুক্ত কর্মই করিয়াছেন, কিন্তু নাম-সংকীর্তন করিয়াও বেদান্তাধ্যয়ন করিতে দোষ কোথায়? মহাপ্রভু প্রত্যুত্তরের আজ্ঞা প্রার্থনা করিয়া বিনীতভাবে জানাইলেন যে স্বয়ং ব্যাসদেব ঈশ্বরবচনরূপ যে বেদান্তসূত্র লিখিয়াছেন তাহার সহজ ও মুখ্যার্থকে আচ্ছন্ন করিয়া শংকরাচার্য গৌণার্থ অবলম্বনে যে ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহা লইয়া অতটা মাতামাতি করা জ্ঞানযোগী পণ্ডিতদিগের পক্ষে কদাচ উচিত হইতে পারেনা। এই বলিয়া তিনি ক্রমাগত যুক্তিতর্কের সাহায্যে বিবর্তবাদকে খণ্ডন করিতে লাগিলেন। যুক্তিবাদী-প্রকাশানন্দ তাঁহার স্মৃতি, ধী ও বিদ্যাবত্তায় মুগ্ধ হইলে। শেষে মহাপ্রভু যখন মায়াবাদ খণ্ডন করিয়া ভক্তিবাদ স্থাপন করিলেন, তখন সমগ্র বৈদান্তিক সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় তাঁহার ব্যাখ্যা ও মতকে স্বীকার করিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং সশিষ্য প্রকাশানন্দ কৃষ্ণনামগানে প্রমত্ত হইলেন।

ক্রমে সেই সংবাদ চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। চতুর্দিক হইতে কৃষ্ণনাম ও কীর্তনধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল। একদিন মহারাষ্ট্রী-বিপ্র আসিয়া সংবাদ দিলেন যে প্রকাশানন্দ-সদৃশ এক মহাপণ্ডিত-শিষ্যের সহিত বিতর্ককালে প্রকাশানন্দ স্বয়ং শংকর-ভাষ্যের দুর্বলতা এবং কেবলমাত্র অদ্বৈতবাদ-স্থাপনের জন্যই অন্য দর্শনশাস্ত্রগুলির প্রতি আচার্যের বৃথা আক্রমণ সম্বন্ধে নানা কথা বলিয়া মহাপ্রভুর মতকেই একমাত্র গ্রহীতব্য মত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন; শুষ্ক মায়াবাদ যে কেবলমাত্র জোর করিয়াই মত গ্রহণ করাইতে চাহে, হৃদয়ের সহিত যে তাহার কোন যোগাযোগ নাই, তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। মহারাষ্ট্রী-বিপ্রের নিকট এই সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া চৈতন্যমহাপ্রভু নিশ্চিন্ত হইলেন। পরে তিনি বাসায় ফিরিয়া তাঁহার ভক্তবৃন্দকে লইয়া সংকীর্তন আরম্ভ করিলে প্রকাশানন্দও শিষ্যবৃন্দকে লইয়া আসিয়া তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন এবং চৈতন্যকেই স্বয়ং-ভগবান বলিয়া সাব্যস্ত করিলেন। প্রকাশানন্দ-সরস্বতীর প্রকৃত জ্ঞানের উদ্বোধন হওয়ায় তদবধি তিনি প্রবোধানন্দ-সরস্বতী নামে বিখ্যাত হইলেন।[১২] মহাপ্রভু প্রকাশানন্দের প্রার্থনা অনুযায়ী পুনর্বার তাঁহাকে ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে শিক্ষাপ্রদান করিয়া তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ

(১২) ভ. মা.—পৃ. ২৫৩; অ. প্র.—১৭শ. অ., পৃ. [illegible]

করিলেন। মহারাষ্ট্রী-বিপ্রের ইচ্ছানুযায়ী তিনি একটি শ্লোকের একষট্টি প্রকার অর্থ নিরূপণ করায় সকলেই চমৎকৃত হইলেন। বারাণসী যেন দ্বিতীয়-নদীয়ায় পরিণত হইল।

চৈতন্যের জীবদ্দশাতেই[১৩] প্রবোধানন্দ-সরস্বতী 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত'-গ্রন্থখানি রচনা করেন। সেই গ্রন্থের মধ্যে তিনি নিজ দৈন্যের কথা বারবার স্বীকার করিয়া[১৪] স্বীয় আশ্রম ও দুর্ভাগ্য সম্বন্ধে যে আক্ষেপ করিয়াছেন তাহা অতিশয় মর্মস্পর্শী। তাহাতে তিনি চৈতন্যকেই ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার এবং বৈষ্ণববৃন্দকে সর্বসম্প্রদায়ের উর্ধ্বে স্থান দান করিয়া স্বীয় পূর্বাপরাধের ক্ষালন করিয়াছেন এবং তাঁহার মত-পরিবর্তনের কথা বিশেষভাবেই ঘোষণা করিয়াছেন। গ্রন্থখানির মধ্য দিয়া প্রবোধানন্দ-সরস্বতীর প্রাণ-মন নিঙ্ড়ান ভক্তি-প্রেমার্ঘ্যই নিবেদিত হইয়াছে। এই গ্রন্থটি ছাড়াও 'শ্রীবৃন্দাবনমহিমামৃত' (বৃন্দাবন শতক ?), 'সঙ্গীতমাধব,' 'আশ্চর্যরাস প্রবন্ধ' প্রভৃতি গ্রন্থও তাঁহার নামে প্রচলিত আছে।

---

(১৩) ভ. মা.—পৃ. ৩২৪ ; শ্রী.চ.—৭০, ১২৭, ১২৯, ১৩১ ; তু.—বৈ. ব. (বৃ.), পৃ. ৩ (১৪) শ্রী. চ.—৪৩, ৪৭, ৫৭, ৬, ৫০, ৮৫, ১০৩-৪

কৃষ্ণদাস (প্রেমী)

ষোড়শ শতব্দীর প্রথমভাগে বৃন্দাবনে যমুনার পরপারে কৃষ্ণদাস নামে এক রাজপুত ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি ছিলেন পরম বৈষ্ণব। স্ত্রী-পুত্রাদি পরিজনবর্গ সহ গৃহস্থ ব্রাহ্মণ দিন যাপন করিতেছিলেন। এমন সময় ১৫১৫ খ্রী.-এর শেষদিকে চৈতন্যমহাপ্রভু মথুরায় আসিয়া উপস্থিত হন। কৃষ্ণদাস এই মহাপুরুষের কথা কিছুই জানিতেন না। একদিন কেশি-স্নান সারিয়া কালিদহপথে গমনকালে আমলীতলাতে হঠাৎ তাঁহার চৈতন্যদর্শন-প্রাপ্তি ঘটিল। মহাপ্রভু এই সময় মথুরা হইতে আসিয়া অক্রূরে অবস্থান করিতেছিলেন এবং অক্রূর হইতেই বৃন্দাবনের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রণ করিতেছিলেন। আমলীতলাতে কৃষ্ণদাস তাঁহাকে দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন। তারপর তিনি তাঁহার সহিত অক্রূরে আসিয়া তাঁহার অবশিষ্ট-পাত্র ভোজন করিলেন এবং রাত্রিকালে তিনি চৈতন্যের অভিপ্রায় অনুযায়ী তাঁহাকে মথুরা-মাহাত্ম্য শুনাইয়া পরিতৃপ্ত করিলেন। পরদিন হইতেই মহাপ্রভুর জল-পাত্রাদি লইয়া তাঁহারও পরিভ্রমণ আরম্ভ হইয়া গেল। গৃহ, স্ত্রী, পুত্র সকলই বিস্মৃত হইয়া তিনি মহাপ্রভুকে সঙ্গে লইয়া তাঁহাকে ব্রজমণ্ডল পরিদর্শন করাইতে চলিলেন।[১]

মহাপ্রভুর বৃন্দাবন-অবস্থানকালে কৃষ্ণদাস কখনও তাঁহার সঙ্গ ছাড়া হন নাই। মহাপ্রভু একদিন ভাবাবেশে জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলে এই বলিষ্ঠদেহ রাজপুতটি বালকের মত কাঁদিয়া আকুল হইলেন। সেই দিনই স্থির হইল লোক-সংঘট্ট এড়াইবার জন্য মহাপ্রভুকে বৃন্দাবন হইতে অন্যত্র লইয়া যাইতে হইবে। তদনুযায়ী তাঁহার আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে গঙ্গাপথে মহাবনের অভিমুখে লইয়া যাইবার কালে তিনি পুনরায় ভাবাবিষ্ট হইয়া পথিমধ্যে মূর্ছিত হইয়া পড়েন। সেই সময় কয়েকজন ম্লেচ্ছ পাঠান-ঘোড়শোয়ার আসিয়া বৈষ্ণববৃন্দের উপর চড়াও হইলে সকলেই ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। তখন এই নির্ভীক রাজপুত ব্রাহ্মণ কৃষ্ণদাস নিজেকে 'মাথুর ব্রাহ্মণ' বলিয়া পরিচিত করেন এবং জানাইয়া দেন যে পার্শ্ববর্তী গ্রামেই তাঁহার আবাস, তিনি চীৎকার করিলেই 'শতেক তুরকী' এবং 'দুইশত কামান' অসিয়া পৌছাইবে। তাঁহার তেজস্বিতা দেখিয়া পাঠানগণ আর জুলুম করিতে সাহস করিল না। সংজ্ঞা ফিরিয়া পাইলে মহাপ্রভু সেই পাঠানদিগের মধ্যস্থ একজন অদ্বয়-ব্রহ্মবাদীর মত খণ্ডন করিয়া তাঁহার কৃষ্ণভক্তি জাগ্রত করিলেন এবং নূতন নামকরণ করিয়া তাঁহাকে রামদাস নামে অভিহিত করিলেন। পাঠানদের দলপতি

(১) শ্রীচৈ. চ.—৪।১৩।১

রাজকুমার-বিজুলিখানও মহাপ্রভুর কৃপায় পরম কৃষ্ণভক্ত হইলেন। এইরূপে কৃষ্ণদাসের চাতুর্য ও নির্ভীক আচরণের ফলে সেদিন তাঁহার সঙ্গী-বৃন্দ সকলেই প্রাণ ফিরিয়া পাইলেন। বিজুলী খাঁ সম্বন্ধে প্রথম চৌধুরী মহাশয় Elliot's History of India-র প্রমাণ-বলে জানাইয়াছেন (প্রবন্ধ সংগ্রহ—পৃ. ২৯৩-৯৫) যে 'রাজকুমার বিজুলী খাঁ কালীঞ্জরের নবাবের পোষ্যপুত্র' ছিলেন 'এবং তিনিই এ রাজ্য রাজা রামচন্দ্রকে বিক্রি করে চলে গিয়েছিলেন।'

সোরোক্ষেত্রে আসিয়া মহাপ্রভু গঙ্গা-স্নানান্তে কৃষ্ণদাসাদিকে প্রত্যাবর্তন করিবার আদেশ দান করিলেন। কিন্তু তাঁহারা সানুনয় অনুরোধে তাঁহার সম্মতি গ্রহণ করিয়া তৎসহ প্রয়াগ পর্যন্ত আসিলেন এবং রূপ-গোস্বামীর সাক্ষাৎলাভ করিয়া ধন্য হইলেন। তাহার পর মহাপ্রভু প্রয়াগ হইতে কাশী চলিয়া আসেন; কিন্তু কৃষ্ণদাস আর মহাপ্রভুর স্মৃতি ভুলিতে পারেন নাই। বৃন্দাবনে অবস্থানকালে তিনি গদাধর-শিষ্য ভূগর্ভ-গোস্বামীর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়া মহাপ্রভুর কার্যেই আত্মনিয়োগ করেন। শ্রীনিবাস নরোত্তম শ্যামানন্দ যখন বৃন্দাবনে আগমন করেন তখন তিনি বৃন্দাবনেই অবস্থান করিতেছিলেন। বৃন্দাবনের যে সমস্ত গোস্বামী ও ভক্ত-বৈষ্ণব কৃষ্ণদাস-কবিরাজকে চৈতন্য-চরিত রচনা করিবার জন্য আজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন।

বল্লভ-ভট্ট

১৭৯১ শকাব্দার 'তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা'র বৈশাখ-সংখ্যায় 'বৈষ্ণব সম্প্রদায়' নামক প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে, "ত্রৈলঙ্গ দেশীয় লক্ষ্মণ-ভট্টের পুত্র বল্লভাচার্য......পঞ্চদশ শত শকের মধ্যভাগে বিশিষ্ট প্রকারে স্বমত প্রকাশ করেন।" তিনি দাক্ষিণাত্যের বিজয়নগরাধিপ কৃষ্ণদেবের সভাসদ্ স্মার্ত-ব্রাহ্মণদিগকে বিচারে পরাস্ত করিয়াছিলেন। গোকুল, উজ্জয়িনী প্রভৃতি ভারতের বিশিষ্ট স্থানগুলিতে তিনি মধ্যে মধ্যে বাস করিতেন। অঘোর নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার 'শ্রীহরিদাস ঠাকুর' নামক গ্রন্থে 'ভক্তদিগ্‌দর্শনী'র উল্লেখ অনুযায়ী চৈতন্য-সাক্ষাৎপ্রাপ্ত বল্লভ-ভট্টকেই বল্লভাচারী সম্প্রদায়ের প্রবর্তক বলিয়া স্বীকার করেন। দীনেশ চন্দ্র সেনও তাঁহার Chaitanya and His Companions-নামক গ্রন্থে একই মতের সমর্থন করিয়াছেন। তবে এইরূপ সমর্থনের কারণ সম্বন্ধে কিন্তু সকলেই নীরব রহিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে, এই সিদ্ধান্ত যে নির্ভুল তাহা 'তত্ত্ববোধিনী'র উক্ত প্রবন্ধ হইতেই প্রমাণিত হয়। কারণ ঐস্থলে লিখিত হইয়াছে, "বল্লভাচার্যের পুত্র বিত্তলনাথ পিতৃপদে অভিষিক্ত হন।" 'বিত্তলনাথ'ই যে চৈতন্য-প্রসাদপ্রাপ্ত বল্লভ-ভট্টের পুত্র, তাহা পরবর্তী আলোচনা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে।

মহাপ্রভুর বৃন্দাবন-গমনকালে বল্লভ-ভট্ট প্রয়াগের নিকটস্থ আউলি-গ্রামে বাস করিতেছিলেন। মহাপ্রভু বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া প্রয়াগে আসিলে একদিন বল্লভ-ভট্ট তাঁহার নাম শুনিয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। তিনি ছিলেন বাল-গোপালের পরম ভক্ত। মহাপ্রভু ছিলেন কিশোর-কৃষ্ণভক্ত। মহাপ্রভুর কৃষ্ণভক্তি দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন এবং মহাপ্রভুও বল্লভের সংকোচ দেখিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। রূপ এবং অনুপম আসিয়া ইতিপূর্বে মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদের সহিত ভট্টের পরিচয় করাইয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ-ভ্রাতৃদ্বয়ের বিনয়ভাব দেখিয়া বল্লভ-ভট্ট অবাক হইয়া গেলেন। মর্যাদা-রক্ষার্থ তাঁহারা এই বিনয় প্রদর্শন করিলেও বল্লভ-ভট্ট তাঁহাদের কৃষ্ণভক্তির জন্য তাঁহাদিগকে সর্বোত্তম ভাগবত বলিয়া চিনিয়া লইলেন। তিনি স্বগণ সহিত মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া নৌকাযোগে স্বীয় গৃহে আনয়ন করিলেন।

বল্লভ-ভট্ট চৈতন্যপ্রভুকে গৃহে আনিয়া 'সবংশে' তাঁহার পাদোদক গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাকে নূতন কৌপীন-বহির্বাস পরাইয়া যথেষ্ট মান্য প্রদর্শন করিলেন। মহাপ্রভুর ভিক্ষা নির্বাহ হইয়া গেলে পরম-বৈষ্ণব রঘুপতি-উপাধ্যায় আসিয়া তাঁহার দর্শনলাভ করিলেন।

তিনি ছিলেন 'তিরোহিতা'-ব্রাহ্মণ ও মহাপণ্ডিত। তাঁহার পাণ্ডিত্য কেবল শুষ্ক তত্ত্বজ্ঞানের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল না। রামানন্দ-রায়ের মত তিনি ছিলেন ভক্ত-পণ্ডিত। 'পদ্যাবলী'তে তাঁহার কয়েকটি শ্লোকও সংগৃহীত হইয়াছে। মহাপ্রভুর ইচ্ছানুযায়ী তিনি 'নিজকৃত কৃষ্ণলীলা শ্লোক পড়ি'য়া শুনাইলে চৈতন্য ভাবাবিষ্ট হইলেন। তখন গ্রামস্থ ব্রাহ্মণগণ আসিয়া মহাপ্রভুর চরণ-বন্দনা করিতে লাগিলেন এবং প্রত্যেকেই তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বগৃহে লইয়া যাইতে চাহিলেন। শেষে অত্যন্ত জনসমাগম দেখিয়া বল্লভ-ভট্ট তাঁহাকে পুনরায় নৌকাযোগে আনিয়া প্রয়াগে পৌছাইয়া দিয়া গেলেন।

কিন্তু বল্লভ-ভট্ট মহাপ্রভুকে বিস্মৃত হন নাই। তাঁহার নীলাচল-প্রত্যাবর্তনের কয়েক বৎসর পরে তিনি নীলাচলে গিয়া পুনরায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে মহাপ্রভু তাঁহাকে যথোপযুক্ত মান্য ও সমাদর করিলেন। বল্লভও পঞ্চমুখে তাঁহার প্রশংসা করিলেন কিন্তু বল্লভের মধ্যে কৃষ্ণভক্তির অভিমান থাকায় মহাপ্রভু তাঁহার সম্ভ্রম-রক্ষা করিয়াও জানাইলেন যে তিনি নিজে অদ্বৈত সার্বভৌম রামানন্দ স্বরূপদামোদর হরিদাস প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ভাগবতদিগের নিকট কৃষ্ণভক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন মাত্র, নচেৎ তাঁহার নিজস্ব বলিয়া কিছুই নাই। সুতরাং যাহা কিছু প্রশংসা, তাহা তাঁহাদিগেরই প্রাপ্য। বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত সমূহ সম্বন্ধে বল্লভ নিজেকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী বলিয়া মনে করিতেন। স্বয়ং চৈতন্যের নিকট ভক্তবৃন্দের সম্বন্ধে শুনিয়া তিনি অত্যন্ত সংকুচিত হইলেন। এবং তাঁহাদিগের সহিত পরিচিত হইবার জন্য উৎসুক হইলেন। সেই সময় রথযাত্রা উপলক্ষে বিভিন্ন স্থান হইতে ভক্তবৃন্দ আসিয়া মিলিত হইয়াছিলেন। তাঁহার আগ্রহ লক্ষ্য করিয়া মহাপ্রভু সকলের সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দিলে তাঁহাদিগের জ্ঞান ও ভক্তি দেখিয়া তিনি চমৎকৃত হইলেন। তখন তিনি প্রচুর পরিমাণে প্রসাদ আনাইয়া গণসহ মহাপ্রভুকে ভোজন করাইয়া পরিতৃপ্ত হইলেন। কিন্তু তিনি ইতিপূর্বে কিছু ভাগবতের টীকা লিখিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার প্রতিভার যে ছাপ রহিয়াছে তাহা একবার মহাপ্রভুকে না জানাইয়া তিনি সোয়াস্তি পাইলেন না। মহাপ্রভু কিন্তু তাঁহাকে জানাইলেন যে কেবল কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিতে করিতেই তাঁহার দিন চলিয়া যায়, তথাপি তাঁহার সংখ্যা নাম পূর্ণ হয় না, ভাগবতের অর্থ শুনিবার বা বুঝিবার অধিকার তাঁহার কোথায়।

মহাপ্রভুর এইরূপ আচরণে বল্লভ বিমনা হইয়া অন্যান্য ভক্তের নিকট গেলেন। কিন্তু চৈতন্য-প্রত্যাখ্যাত বল্লভের ভাগবত-ব্যাখ্যা শুনিতে কেহই রাজি হইলেন না। শেষে তিনি গদাধর-পণ্ডিতের নিকট গিয়া কাকুতি-মিনতি করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার বিনয় ও সম্ভ্রমবোধের সুযোগ লইয়া একরকম জোর করিয়াই স্ব-কৃত টীকা পাঠ করিয়া তাঁহাকে শুনাইলেন। কিন্তু পণ্ডিত-গোসাঁইর মৃদু-ব্যবহারে তাঁহার মন ফিরিয়া গেল। তিনি বাল-গোপালের উপাসনা ত্যাগ করিয়া কিশোর-গোপালের উপাসনায় মন দিলেন এবং

পণ্ডিতের নিকট মন্ত্রাদি শিক্ষার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু গদাধরের পক্ষে এতদূর অগ্রসর হওয়া অসম্ভব ছিল। শেষপর্যন্ত তিনিও জানাইয়া দিলেন যে মহাপ্রভুর আজ্ঞা ব্যতিরেকে তাঁহার পক্ষে স্বতন্ত্র হওয়া সম্ভব নহে। বল্লভ অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন।

বল্লভ-ভট্ট কিন্তু প্রত্যহ মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান এবং সেইস্থলে নানাবিধ প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। একদিন তিনি অদ্বৈতাচার্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন তাঁহারা যে জীব-প্রকৃতিরূপে কৃষ্ণকে পতি বলিয়া স্বীকার করিয়াও সেই পতির নাম গ্রহণ করেন তাহা কি ধর্মোচিত। আচার্য মহাপ্রভুকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে বলিলে চৈতন্য জানাইলেন যে স্বামীর আজ্ঞাপালনই পতিব্রতার ধর্ম ; এবং

পতি আজ্ঞা নিরন্তর তাঁর নাম লৈতে।

সুতরাং পতি আজ্ঞা পতিব্রতা না পারে লঙ্ঘিতে।

আর একদিন বল্লভ-ভট্ট বলিয়া বসিলেন যে তিনি শ্রীধর-স্বামীর ভাগবত-ব্যাখ্যাকে খণ্ডন করিয়াছেন, স্বামীর ব্যাখ্যার মধ্যে 'একবাক্যতা' নাই বলিয়া তিনি তাহা মানিয়া লইতে পারেন না। মহাপ্রভু তৎক্ষণাৎ সহাস্যে উত্তর দিলেন, স্বামীকে যে মানে না সে ত বেশ্যার মধ্যে গণ্য। মহাপ্রভুর কথা শুনিয়া ভট্টের গর্ব চূর্ণ হইয়া গেল। তিনি গৃহে গিয়া স্থির করিলেন যে মহাপ্রভু যখন প্রয়াগে স্ব-গণ সহিত তাঁহার গৃহে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া তাঁহার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার বর্তমানের এইপ্রকার ভিন্ন-আচরণের নিশ্চয় কিছু গূঢ়ার্থ আছে, চিত্তকে গর্বশূন্য করিবার শিক্ষাদান নিমিত্তই তিনি এইরূপ করিয়া থাকিবেন। এইকথা ভাবিয়া তিনি পরদিন প্রভাতে আসিয়া দৈন্য প্রকাশ করিয়া কহিলেন যে তিনি অজ্ঞ বলিয়াই 'মূর্খ পাণ্ডিত্য' প্রকাশ করিয়া অপরাধ করিয়াছেন। মহাপ্রভু সন্তুষ্ট চিত্তে শ্রীধর-স্বামীর ব্যাখ্যার প্রশংসা করিয়া বুঝাইয়া দিলে বল্লভ মহাপ্রভুকে আর একবার তাঁহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করিবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইলেন। মহাপ্রভু স্ব-গণ সহ তাঁহার গৃহে ভিক্ষানির্বাহ করিয়া তাঁহাকে অনুগৃহীত করিলেন। বল্লভ-ভট্টের ব্যাপার লইয়া গদাধর-পণ্ডিতের সহিত মহাপ্রভুর যে অভিমানের পালা চলিতেছিল তাহাও এইসূত্রে সমাপ্ত হইয়া গেল।

'ভক্তিরত্নাকরে'র বর্ণনা সত্য হইলে জানিতে পারা যায় যে মহাপ্রভুর তিরোভাবের পরবর্তিকালে বল্লভ-ভট্ট একবার বৃন্দাবনে রূপ-গোস্বামীর 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'র মঙ্গলাচরণের ভুল সংশোধন করিয়া দিতে চাহিলে শ্রীজীবকর্তৃক পরাভূত হইয়া তাঁহার নিজের ভুলই নিজেকে সংশোধন করিয়া লইতে হইয়াছিল।[১] এই ঘটনার পরে আর তাঁহার কোনও সংবাদ পাওয়া যায়না। তবে খুব সম্ভবত, তিনি বৃন্দাবন-মথুরাতেই বাস করিতেছিলেন।

(১) ভ. র.—৫।১৬৩০ ; দ্র.—জীব-গোস্বামী

'তত্ত্ববোধিনী'-মতে "বল্লভাচার্য 'সুবোধিনী' নামে ভাগবতের যে টীকা করেন, তাহা ইঁহারদিগের (বল্লভাচারীদিগের) প্রধান প্রামাণিক গ্রন্থ।"

'ভক্তিরত্নাকর' হইতে জানা যায়[২] যে বল্লভ-ভট্টের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বিট্‌ঠলনাথ-ভট্ট মথুরাতে নির্জনে বাস করিতেছিলেন। তিনিও একজন বৈষ্ণবভক্ত ছিলেন এবং তিনি মহাপ্রভুর লীলা স্মরণ ও আলোচনা করিয়া দিনাতিপাত করিতেছিলেন।[৩] তিনি রঘুনাথদাস-গোস্বামীর নিকট বাস করিতে থাকেন। রঘুনাথের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। একবার রঘুনাথ অজীর্ণরোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িলে বিট্‌ঠলনাথ তাহা শুনিয়াই তৎক্ষণাৎ তাঁহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।[৪] রঘুনাথও বিট্‌ঠলকে বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। মহাপ্রভুর বৃন্দাবনাগমনকালে গাঠুলিতে গোপাল-সেবায় নিযুক্ত ছিলেন মাধবেন্দ্র-পুরীর নির্ধারিত দুইজন গৌড়ীয় বিপ্র।[৫] তাঁহাদের মৃত্যুর পর অন্য ব্যক্তি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু সম্ভবত যথাবিধি সেবাপূজা চলিতেছিল না। তজ্জন্য রঘুনাথদাস-গোস্বামী সকলের সহিত যুক্তি করিয়া বিট্‌ঠলেশ্বরকে গোপালের সেবা-অধিকারী হিসাবে নিযুক্ত করিলে তখন হইতে তিনি পরম-নিষ্ঠার সহিত গোপালের সেবা-পূজায় আত্মনিয়োগ করেন। বৃদ্ধকালে যখন রূপ-গোস্বামী দূরে যাইতে পারিতেন না তখন তিনি গোপাল-দর্শনার্থী হইয়া ভক্তবৃন্দের সহিত এই বিট্‌ঠলেশ্বরের গৃহে আসিয়া একমাস কাল অতিবাহিত করিয়া যান।[৬] ম্লেচ্ছ-ভয়ে তখন গোপালকে আনিয়া বিট্‌ঠলের গৃহে রাখা হইয়াছিল। শ্রীনিবাস-আচার্য প্রথমবার বৃন্দাবনে আসিয়া বিট্‌ঠল-গোসাঁইর গোপালসেবা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং তাঁহার সহিত 'ইষ্টগোষ্ঠী' করিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন।[৭]

ডা. সুশীল কুমার দে তাঁহার History of Sanskrit Literature-গ্রন্থে জানাইয়াছেন,[৮] "The Vallabhācārī sect also appears to have recognised the Gīta-govinda, in imitation of which Vallabhācārya's son Viṭṭhaleśvara, introduced rhymed Padāvalīs into his Śṛṅgāra-rasa-maṇḍana.

বল্লভাচার্য সম্বন্ধে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র লেখক আরও বলিতেছেন, "তৎসাম্প্রদায়িক লোকেরা তাঁহাকে শ্রীগোসাঁইজী বলিয়া জানে। বিত্তলনাথের সাত পুত্রের নাম গিধরি রায়, গোবিন্দ রায়, বালকৃষ্ণ, গোকুলনাথ, রঘুনাথ, যদুনাথ ও ঘনশ্যাম।"

(২) ৫।৮০৫ (৩) ঐ—৫।৮১৬-১৭ (৪) ঐ—৫।৫৭৭ (৫) ঐ—৫।৮১২ ; বৈ. দি.-মতে (পৃ.৬৯) "মাধবেন্দ্র পুরীর প্রতিষ্ঠিত গোবর্ধন-নাথজীর সেবাধিকার তদীয় শিষ্য শ্রীবল্লভাচার্যের উপর ন্যস্ত হয়। বল্লভাচার্য এই শ্রীবিগ্রহের গোবর্ধনোপরি এক মন্দির নির্মাণ করেন।" (৬) চৈ. চ.—২।১৮, পৃ. ২০১ (৭) অ. র.—৫ম. র., পৃ. ৩০ ; ভ. র.—৫।৮০৪ (৮) p. 392, fn..

কমলাকান্ত-বিশ্বাস

কমলাকান্ত-বিশ্বাস অদ্বৈত-শিষ্য ছিলেন এবং সম্ভবত শান্তিপুরেই অবস্থান করিতেন।[১] একমাত্র 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র অদ্বৈতশাখা-বর্ণনার মধ্যেই তাঁহার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণটি পাওয়া যায় :—

একবার কমলাকান্ত নীলাচলে অবস্থানকালে অদ্বৈতপ্রভুর অজ্ঞাতসারেই প্রতাপ-রুদ্রকে পত্র লিখিয়া জানাইয়াছিলেন :

ঈশ্বরত্বে আচার্যের করেছ স্থাপন ॥
কিন্তু তাঁর দৈবে কিছু হইয়াছে ঋণ।
ঋণ শোধিবারে চাহি টাকা শত তিন ॥

দৈবাৎ পত্রটি মহাপ্রভুর হস্তগত হইলে মহাপ্রভু ক্ষুব্ধ হইয়া

গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিলা ইঁহা আজি হৈতে।
বাউলিয়া বিশ্বাসে এথা না দিবে আসিতে ॥

আচার্যপ্রভু সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া কমলাকান্তকে বলিলেন যে মহাপ্রভুর দণ্ড লাভ করিয়া কমলাকান্ত ধন্য হইলেন, পূর্বে অদ্বৈত, শচীদেবী এবং মুকুন্দও সেই দণ্ডলাভের সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছিলেন। এই বলিয়া তিনি মহাপ্রভুর নিকট আসিলেন এবং

প্রভুরে কহেন তোমার না বুঝি এ লীলা।
আমা হইতে প্রসাদ-পাত্র করিলা কমলা ॥
আমারেহ কভু যেই না হয় সে প্রসাদ।
তোমার চরণে আমি কি কৈনু অপরাধ ॥

মহাপ্রভু তখন প্রসন্ন হইয়া কমলাকান্তকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং

প্রভু কহে বাউলিয়া ঐছে কাহে কর।
আচার্যের লজ্জা ধর্ম নাহি সে আচর ॥
প্রতিগ্রহ কভু না করিয়ে রাজধন।
বিষয়ীর অন্ন খাইলে দুষ্ট হয় মন ॥
মন দুষ্ট হইলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ।......
এই কর্ম না করিহ কভু ইহা জানি ॥

(১) চৈ. চ.—১।১২, পৃ. ৫৭ ; অ. প্র.—পৃ. ৩৮, ৫৭, ৬৪ ; গৌ. চ.—পৃ. ১৮

কালিদাস

'চৈতন্যচরিতামৃত' হইতে জানা যায়[১] যে রঘুনাথদাসের একজন জ্ঞাতি-খুড়া ছিলেন, তাঁহার নাম কালিদাস। তিনি ছিলেন 'মহাভাগবত সরল উদার' এবং তিনি সর্বদাই কৃষ্ণ-নামে তন্ময় থাকিতেন। এমনকি, অক্ষক্রীড়ার সময়েও তিনি 'হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ করি পাশক চালায়।' তাঁহার একটি বিশেষ সাধ ছিল। তদনুযায়ী তিনি সমস্ত বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া বেড়াইতেন। ছোট বড় সকল ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের নিকটই তিনি নানাবিধ উত্তম দ্রব্যের ভেট লইয়া যাইতেন এবং তাঁহাদের ভুক্তাবশেষ চাহিয়া ভোজন করিতেন। কোনমতে তাহা সংগৃহীত না হইলে তিনি কোথাও লুকাইয়া থাকিতেন এবং ভুক্তাবশেষ নিক্ষিপ্ত হইলে তিনি তাহা কুড়াইয়া ভক্ষণ করিতেন। একবার তিনি ঝড়ু নামক এক 'ভূমিমালি জাতি'র বৈষ্ণবের নিকট আম্র-ভেট লইয়া গিয়া বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীর চরণ-বন্দনা করিলে ঝড়ু-ঠাকুরও তাঁহার সেবার নিমিত্ত কোনও ব্রাহ্মণের নিকট অন্ন পাঠাইয়া দিতে চাহিলেন, যাহাতে কালিদাস ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত হইতে পারেন। কিন্তু কালিদাস তাহাতে রাজি না হইয়া ঝড়ু-ঠাকুরের পদরজ মস্তকে লইয়া পরিতৃপ্ত হইতে চাহিলেন। অথচ নীচজাতি বলিয়া ঝড়ুর পক্ষেও তাহাতে সম্মত হওয়া সম্ভব ছিল না। নানাবিধ কথাবার্তা ও ইষ্ট-গোষ্ঠীর পর ঝড়ু তাঁহাকে প্রত্যুদ্গমন করিয়া বিদায় দিয়া ফিরিলে কালিদাসও প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং ঝড়ু-ঠাকুরের পদচিহ্ন সন্ধান করিয়া সেই স্থানের ধূলি সংগ্রহ করিয়া সর্বাঙ্গে লেপন করিলেন। তারপর তিনি নিকটে লুকাইয়া থাকিলেন এবং ঝড়ু-ঠাকুরের আম্র-ভক্ষণের পর তাঁহার পত্নী পুনরায় তাহা চুষিয়া উচ্ছিষ্ট-গর্তে নিক্ষেপ করিলে তিনি তাহা লইয়া আনন্দে চুষিতে লাগিলেন।

একবার কালিদাস চৈতন্য-দর্শন করিবার জন্য নীলাচলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। মহাপ্রভুর একটি নিয়ম ছিল যে ঈশ্বর-দর্শনের পূর্বে তিনি 'সিংহদ্বারের উত্তরদিকে কপাটের আড়ে বাইশ পশার তলে' যে একটি গর্ত ছিল সেইস্থানে পাদ-প্রক্ষালন করিয়া তারপর 'ঈশ্বর দর্শন' করিতেন। গোবিন্দের প্রতি মহাপ্রভুর কঠোর নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও কখনও হয়ত কোন অন্তরঙ্গ ভক্ত কোন ছলে সেই পাদোদক গ্রহণ করিতে সমর্থ

(১) ৩।১৬, পৃ. ৩৫৬-৫৮

হইতেন। একদিন মহাপ্রভুর পাদ-প্রক্ষালনকালে কালিদাস আসিয়া এক দুই করিয়া তিন অঞ্জলি জল পান করিলে মহাপ্রভু তাঁহাকে নিষেধ করিয়া দিলেন :

অতঃপর আর না করিহ পুনর্বার।
এতাবৎ বাঞ্ছাপূর্ণ করিল তোমার॥

সেই দিন মহাপ্রভু তাঁহার প্রথা মত নৃসিংহমূর্তি- ও তাহার পরে জগন্নাথ-দর্শনান্তে গৃহে ফিরিয়া মধ্যাহ্ন-ভোজন শেষ করিতেই দেখিলেন যে কালিদাস উপস্থিত। কালিদাসের ঐকান্তিকতা দেখিয়া তিনি তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। তাঁহার ইঙ্গিতক্রমে গোবিন্দ তৎক্ষণাৎ কালিদাসকে মহাপ্রভুর ভোজনশেষ দান করিলে তিনি তাহা ভক্ষণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

'প্রেমবিলাসে'ও[১] এই ঘটনাটি সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। কালিদাস সম্বন্ধে 'পাটনির্ণয়ে' বলা হইয়াছে[২] :

কালিদাস ঠাকুরের বসতি সপ্তগ্রামে।

(১) ১৬শ. বি., পৃ. ২৩৩-৩৪ (২) পা. নি. (ক. বি.)—পৃ. ৩; পা. নি. (পা. বা.)—পৃ. ২

কাশীনাথ-পণ্ডিত

'চৈতন্যচরিতামৃতে'র 'মূলস্কন্ধশাখা-বর্ণন' পরিচ্ছেদে লিখিত হইয়াছে

> শঙ্করারণ্য আচার্য বৃক্ষের এক শাখা।
> মুকুন্দ কাশীনাথ রুদ্র উপশাখা লেখা॥
> শ্রীনাথ পণ্ডিত প্রভুর কৃপার ভাজন।
> যার কৃষ্ণসেবা দেখি বশ ত্রিভুবন॥

ইঁহাদের মধ্যে শ্রীনাথ-পণ্ডিত ও মুকুন্দের নাম অন্য কোথাও দৃষ্ট হয়না। আবার উক্ত গ্রন্থের 'গুণ্ডিচা মন্দির মার্জন'-অধ্যায়ের ভোজন-ব্যাপার বর্ণনার মধ্যে একটিবার মাত্র শংকরারণ্যের নামোল্লেখ ছাড়া আর কোথাও তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। রুদ্রের নামও বড় বেশি একটা কোথাও নাই। কেবল গৌরাঙ্গের নবদ্বীপলীলা-সহচরদিগের বর্ণনায় লোচনদাস একবার একজন রুদ্র-পণ্ডিতের নামোল্লেখ করিয়াছেন[১] এবং ভক্তমাল[২], ও 'গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা'র[৩] গৌরগণ-তালিকায় একবার করিয়া তাঁহার নাম করা হইয়াছে মাত্র। আর কাশীনাথ সম্বন্ধেও বিশেষ কিছুই জানা যায় না। 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে' নীলাচলগামী ভক্তবৃন্দের সহিত একজন কাশীনাথের নাম উল্লেখিত হইলেও[৪] তিনি কোন কাশীনাথ তাহা সঠিক বলা যায় না। 'প্রেমবিলাস' ও নরহরি-চক্রবর্তীর দুইটি গ্রন্থ হইতে জানা যায়[৫] যে কাশীনাথ বা কাশীনাথ-পণ্ডিত নামক এক ব্যক্তি পরবর্তিকালের খেতুরি-উৎসবেও যোগদান করিতে পারিয়াছিলেন।

'চৈতন্যচরিতামৃত'-গ্রন্থে উপরোক্ত শংকরারণ্যকে একটি শাখা ধরিয়া অন্যান্য ব্যক্তিকে একত্রে উপশাখার মধ্যে গণনা করায় তাঁহাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধই সূচিত হইয়াছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে অন্যান্য মুদ্রিত প্রাচীন গ্রন্থ হইতে কিছুই জানা যায়না। তবে রামগোপাল-দাসের 'পাটনির্ণয়ে' লিখিত হইয়াছে[৬] :

> চাতরা বল্লভপুর খড়দহের পার।
> কাশীশ্বর শঙ্করারণ্য শ্রীনাথ পণ্ডিত আর॥

এবং

> রুদ্র পণ্ডিতের সেবা রাধাবল্লভ নাম।

---

(১) চৈ. ম.—ম. খ., পৃ. ৯৭ (২) পৃ. ২৯ (৩) ১৩৫ ; এই গ্রন্থের ১০৭ নং. শ্লোকে কাশীনাথ, লোকনাথ, শ্রীনাথ এবং রামনাথ নামক চারি ব্যক্তির একত্র উল্লেখ আছে। (৪) ১০।১৩ (৫) প্রে. বি.—১৯শ. বি., পৃ. ৩০৯ ; ভ. র.—১০।৪১৬ ; ন. বি.—৬ষ্ঠ. বি., পৃ. ৮৪ ; ৮ম. বি., পৃ. ১০৭ (৬) পা. নি.—(ক. বি., ব. সা. প., পা. বা.)

১৩১৮ সালের 'বংগীয় সাহিত্য পরিষৎ'-পত্রিকায় অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী মহাশয়-প্রকাশিত 'পাট পর্যটনে'ও কাশীশ্বর শঙ্করারণ্য শ্রীনাথ ও রুদ্র-পণ্ডিতের পাট চারটা (=চাতরা)-বল্লভপুরে বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহাদের সম্বন্ধে এতদতিরিক্ত আর কিছুই জানিতে পারা যায় না। তবে উপরোক্ত প্রমাণগুলির বলে ইহা বলা চলে যে তাহারা সম্ভবত একই বংশীয় ছিলেন এবং তাঁহাদের নিবাস ছিল খড়দহপারে চাতরা-বল্লভপুর গ্রামে, গৃহে রাধাবল্লভ-বিগ্রহ সেবিত হইতে, এবং খুব সম্ভবত 'কাশাশ্বর' কাশীনাথেরই নামান্তর।

কিন্তু কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় কৃষ্ণদাস-রচিত 'সূচক' বা 'কাশীশ্বর গোস্বামীর সূচক' নামক যে একখানি পুথি সংরক্ষিত আছে, তাহার বর্ণনা উপরোক্ত বিষয়কে আরও জটিল করিয়া তুলে। তৎপূর্বে আধুনিক 'বৈষ্ণবদিগ্‌দর্শনী'-গ্রন্থে কাশীশ্বরের সম্বন্ধে যে তথ্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে[৭] তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইল :

যশোহরের ব্রাহ্মণডাঙা-গ্রামে বাসুদেব-ভট্টাচার্য নামে এক ধনী বৈষ্ণব ছিলেন। পত্নী জাহ্নবার গর্ভে ১৪৯৮ খ্রী.-এ তিনি যে-পুত্রসন্তান লাভ করেন তিনিই কাশীশ্বর- বা কাশীনাথ-পণ্ডিত নামে পরিচিত হন। বাল্যে কাশীশ্বরের বৈরাগ্যোদয় হয় এবং তিনি সপ্তদশবর্ষ বয়সে গোপনে নীলাচলে গিয়া মহাপ্রভুর চরণাশ্রয় করেন। ষোল-বৎসর মহাপ্রভুর নিকট থাকিবার পর ১৫৩১ খ্রী.-এ তিনি স্বীয় জননীর চেষ্টায় এবং মহাপ্রভুর আদেশে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং বিবাহাদি না করিয়া শ্রীরামপুর স্টেশনের নিকট চাতরা-গ্রামে নিতাই-গৌর-বিগ্রহ প্রকাশ করিয়া পাট স্থাপন করেন। এইস্থানে ১৫৩৮ খ্রী.-এ তাঁহার ভাগিনেয় রুদ্র-পণ্ডিতের আবির্ভাব ঘটে। এই রুদ্র-পণ্ডিতই একজন উপগোপাল হিসাবে পরে খ্যাতি লাভ করেন। ১৫৪৪ খ্রী.-এ জননীর মৃত্যুতে কাশীশ্বর-পণ্ডিত গয়া হইয়া বৃন্দাবনে গমন করেন এবং তথায় একটি বিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া তাহার সেবা-ব্যবস্থা করিয়া চাতরায় ফিরিয়া আসেন। ১৫৪৬ খ্রী.-এ তাঁহার অগ্রজ মহাদেব একটি পুত্রসন্তান লাভ করেন। তাঁহার নাম রাখা হয় মুরারি। কাশীশ্বর এই মুরারিকেই মন্ত্রশিষ্য করিয়া তাঁহার উপর বিগ্রহ-সেবার ভারার্পণ করিয়া শেষজীবনে বৃন্দাবনে চলিয়া যান এবং ১৫৬৩ খ্রী.-এ তথায় তাঁহার তিরোভাব ঘটে। তিরোধানের চারিমাস পরে শ্রীনিবাস-আচার্য বৃন্দাবনে গিয়া কাশীশ্বর-পণ্ডিত রঘুনাথ-ভট্ট ও সনাতন-রূপের মৃত্যু-সংবাদ প্রাপ্ত হন।

গ্রন্থকার এইরূপ সনতারিখযুক্ত বিবরণ কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন বলিতে পারা যায় না। হরিদাস দাস মহাশয়ও চাতরাবল্লভপুরের গ্রামবাসীদিগের নিকট সমস্ত শুনিয়া

(৭) পৃ. ৩৩, ৭৩, ৮৫, ৮৯, ৯৫

ঠিক একই বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু পূর্বোক্ত 'সূচক'-নামাঙ্কিত পুথিখানিতে[৮] যে বিবরণ আছে তাহা সম্পূর্ণতই ভিন্ন। তাহা নিম্নোক্তরূপ :

রুদ্র-পণ্ডিতের পুত্র কাশীশ্বর-গোস্বামী স্বীয় ভ্রাতা শংকর[৯]-বল্লভের সহিত চাতরা-বল্লভপুরে বাস করিতেন। শ্রীনাথ-আচার্য, লক্ষণ এবং রূপের বৃন্দাবন-সঙ্গী যাদবাচার্য-গোসাঁই, এই তিনজন কাশীশ্বরের ভাগিনেয় ছিলেন। আর গোবিন্দ-গোসাঁই ছিলেন কাশীশ্বরের কনিষ্ঠ-ভ্রাতা শংকর-বল্লভের পুত্র।

মথুরায় ঈশ্বর-পুরীর দেহত্যাগকালে কাশীশ্বর তৎকর্তৃক নীলাচলে চৈতন্য সমীপে গমন করিবার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে গোবিন্দ আসিয়া মহাপ্রভুর নিকট সেই কথা জ্ঞাপন করেন। পরে কাশীশ্বর আসিয়া সংকোচ সত্ত্বেও পুরীর নির্দেশানুযায়ী মহাপ্রভুর সেবা করিতে চাহিলে মহাপ্রভু বিশেষ আপত্তি সত্ত্বেও শেষে সার্বভৌম-ভট্টাচার্যের মধ্যস্থতায় পুরীর আদেশ মান্য করিয়া তাঁহাকে স্বীয় সন্নিকটে থাকিবার নির্দেশ দেন। তাঁহার কাজ হইল জগন্নাথ-দর্শনার্থ যাত্রাকালে ভিড় ঠেলিয়া মহাপ্রভুকে সঙ্গে লইয়া যাওয়া এবং তাঁহাকে প্রসাদ-মাল্য আনিয়া দেওয়া। কাশীশ্বরের নিকট মহাপ্রভুকে ভিক্ষানির্বাহ করিতেও হইত।

কিছুকাল পরে মহাপ্রভু তাঁহাকে গোপাল-সেবার জন্য মথুরায় যাইতে আজ্ঞা দেন :

গোবর্ধনে গোপাল সেবা করিবে সকালে।
মথুরায় সংকীর্তন করিবে সন্ধ্যাকালে ॥

কাশীশ্বর বলিলেন যে ঈশ্বর-পুরী তাঁহাকে চৈতন্য-সেবার নির্দেশ দিয়া বলিয়াছিলেন :

গোবিন্দেরে লয়্যা যাও পুরুষোত্তমে।
দুইজনে যাহ সেব চৈতন্যচরণে ॥

সুতরাং কশীশ্বর বলিলেন :

যেখানে রাখহ প্রভু চরণ দিবা মোরে ॥

মহাপ্রভু কাশীশ্বরকে মথুরায় গিয়া অম্বুজকুঞ্জে নিত্যসেবার নির্দেশ দিলে তিনি 'ঝারিখণ্ড পথে' মথুরা চলিয়া গেলেন।......মথুরায় গিয়া কাশীশ্বর যমুনা-তীরে 'মাধব ঈশ্বরপুরীর সমাজ' সন্নিকটে টোটা নির্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন এবং গোবর্ধনে গোপাল-সেবায় নিযুক্ত হইলেন। গ্রন্থকার আরও বলিতেছেন যে গোবিন্দই কাশীশ্বরের মুখ্য-শাখা বলিয়া "'রসামৃত নাটকে' রূপ লিখিয়াছেন আপনে" এবং মহাপ্রভুর প্রিয় পলাশী-নিবাসী ভগবান-পণ্ডিতও কাশীশ্বরের শিক্ষা-শাখা ছিলেন।

এই সমস্ত বিরোধী বর্ণনার মধ্যে দুইটি জিনিস বিশেষভাবেই প্রনিধানযোগ্য হইয়া উঠে। কাশীনাথ-পণ্ডিত, কাশীশ্বর-পণ্ডিত এবং কাশীশ্বর-গোসাঁই এক ব্যক্তি কিনা,

(৮) কা. সূ. (৯) শংকর সম্বন্ধে শংকর-ঘোষের জীবনী দ্রষ্টব্য।

এবং কাশীশ্বর-গোসাঁইর ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দ, মহাপ্রভুর নীলাচল-ভৃত্য গোবিন্দ ও বৃন্দাবনের গোবিন্দ-গোসাঁইও অভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন কিনা।

বৃন্দাবনের কাশীশ্বর-গোসাঁই যে মহাপ্রভুর নবদ্বীপ- বা নীলাচল-লীলার কাশীশ্বর বা কাশীশ্বর-ব্রহ্মচারী, তাহা কাশীশ্বর-গোসাঁইর জীবনীতে আলোচিত হইয়াছে। 'ভক্তিরত্নাকরে' এবং সম্ভবত 'চৈতন্যভাগবতে' ইঁহাকেই কাশীশ্বর-পণ্ডিতও বলা হইয়াছে।[১০] কিন্তু একটি জিনিস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থেই কাশীনাথ এবং কাশীশ্বর এই উভয়ের নাম উল্লেখিত হইলেও পৃথকভাবে সেই সমস্ত উল্লেখ করা হইয়াছে এবং কাশীশ্বর বা কাশীশ্বর-পণ্ডিত প্রসঙ্গে কোথাও কাশীনাথ বা কাশীনাথ-পণ্ডিতের নামোল্লেখ নাই। সুতরাং ইঁহারা যে পৃথক ব্যক্তি সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। তবে 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র কাশীনাথ যে 'পাটনির্ণয়ে'র মধ্যে কাশীশ্বররূপে দেখা দিয়াছেন, তাহা লিপিকর-প্রমাদ বশত হইতে পারে, কিংবা প্রকৃতই কাশীনাথও কাশীশ্বর নামে অভিহিত হইতেন বলিয়াও হইতে পারে। সুতরাং আলোচ্যমান চাতরাবাসী-কাশীশ্বর এবং কাশীশ্বর-গোসাঁই যে এক ব্যক্তি তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না। সম্ভবত তাঁহাদের নাম-সাদৃশ্য বশতই তাঁহারা পূর্বোক্ত বিশ্ববিদ্যালয়-পুথিতে এক হইয়া গিয়াছেন। একই কারণ বশত কাশীশ্বরের ভ্রাতুষ্পুত্ররূপে একজন গোবিন্দের উদ্ভব হওয়াও বিচিত্র নহে।

পুথির মধ্যে কাশীশ্বরের ভ্রাতুষ্পুত্রকে যে গোবিন্দ-গোসাঁই বলা হইয়াছে তাহার কারণ বৃন্দাবনে কাশীশ্বর-শিষ্য একজন গোবিন্দ-গোসাঁই ছিলেন। কিন্তু কাশীশ্বরের ভ্রাতুষ্পুত্রই যে নীলাচলে গিয়া মহাপ্রভুর ভৃত্য হইয়াছিলেন লেখক সেই কথাটি বিশেষভাবে দ্যোতিত করিলেও কোথাও তাহা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। তাহার কারণ এই হইতে পারে যে 'চৈতন্যচরিতামৃতে' নীলাচল-ভৃত্য গোবিন্দকে শূদ্র বলা হইয়াছে। কাশীশ্বর-ব্রহ্মচারীর জাতিকুল সম্বন্ধে কোথাও স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও তাঁহার কর্মপদ্ধতি হইতে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া ধরিতে হয়। সুতরাং বৃন্দাবনে কাশীশ্বরের পূর্ব-শিষ্যরূপে যে গোবিন্দ-গোসাঁইর কথা 'প্রেমবিলাস'-গ্রন্থে উল্লেখিত হইয়াছে তাহার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য তাঁহাকে কাশীশ্বরের ভ্রাতুষ্পুত্র হইতে হইয়াছে। কাশীশ্বরের পূর্ব-শিষ্য যাদবাচার্য-গোসাঁইকেও লেখক একই কারণে কাশীশ্বরের সহিত আত্মীয়তার সম্বন্ধে বাঁধিয়াছেন। অথচ অন্য কোনও গ্রন্থে এই সম্বন্ধের কথা বলা হয় নাই। পুথিখানি পাঠ করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে উভয় গোবিন্দই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি এবং নীলাচল-ভৃত্য শূদ্র-গোবিন্দ এবং বৃন্দাবনের গোবিন্দ-গোসাঁইকে এক ব্যক্তি বলিয়া প্রকাশ করিবার বাধা আছে বলিয়াই যেন কাশীশ্বর ও গোবিন্দ-গোসাঁইর মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক সৃষ্টি করিতে হইয়াছে।

(১০) ভ. র.—৯।২০৪ ; ১১।২৫৭ ; চৈ. ভা.—৩।৯, পৃ. ৩২৭

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, নীলাচল-ভৃত্য গোবিন্দের পক্ষে বৃন্দাবনের গোবিন্দ-গোসাঁই হওয়ার ব্যাপারে অনতিক্রমণীয় বাধা থাকিতে পারেনা। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন মহাপ্রভুর তিরোভাবের পর গোবিন্দের পক্ষে আর জীবনধারণ করা সম্ভব ছিলনা। এইরূপ সিদ্ধান্ত কেবল কল্পনা-প্রসূত। তাছাড়া, 'ভক্তিরত্নাকর'-প্রণেতা বলিয়াছেন[১১] যে মহাপ্রভুর তিরোভাবের পরে শ্রীনিবাস-আচার্য নীলাচলে গিয়া গোবিন্দের সাক্ষাৎলাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং প্রকৃত বাধা হইতেছে অব্রাহ্মণের পক্ষে গোসাঁই হওয়াতে। এই বিষয় আলোচনার পূর্বে বৃন্দাবনের গোবিন্দ-সম্পর্কিত বর্ণনাগুলির উল্লেখ প্রয়োজন। 'চৈতন্যচরিতামৃত'-কার বলেন[১২] যে তাঁহাকে যাঁহারা গ্রন্থ-রচনার আদেশ দান করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন—

কাশীশ্বর গোসাঞির শিষ্য গোবিন্দ গোসাঞি।
গোবিন্দের প্রিয় সেবক তাঁর সম নাই।
শ্রীযাদবাচার্য গোসাঞি শ্রীরূপের সঙ্গী।

বৃদ্ধ রূপ-গোস্বামীর গোপাল-দর্শনকালে রঘুনাথ-ভট্ট লোকনাথ ভূগর্ভ ও জীবাদির সহিত গোবিন্দভকত (ভট্ট ?), গোবিন্দ-গোসাঁই এবং যাদবাচার্যের নামও লেখক অন্যত্র উল্লেখ করিয়াছেন।[১৩] অথচ উপরোক্ত দুইটি স্থলের কোথাও কিন্তু স্বয়ং কাশীশ্বরের নাম নাই। একই গ্রন্থকার নীলাচল-ভৃত্য গোবিন্দের পরিচয় দিতে গিয়া বলিয়াছেন[১৪] :

ঈশ্বর পুরীর শিষ্য ব্রহ্মচারী কাশীশ্বর।
শ্রীগোবিন্দ নাম তাঁর প্রিয় অনুচর॥
তাঁর সিদ্ধিকালে দোঁহে তাঁর আজ্ঞা পাঞা।
নীলাচলে প্রভু স্থানে মিলিলা আসিয়া।......
অঙ্গ সেবা গোবিন্দেরে দিলেন ঈশ্বর।
জগন্নাথ দেখিতে আগে চলে কাশীশ্বর।

'ভক্তিরত্নাকর'-প্রণেতা বলিতেছেন[১৫] যে শ্রীনিবাস-আচার্যের প্রথমবার বৃন্দাবন-ত্যাগকালে যাদবাচার্য, শ্রীগোবিন্দ ও গোবিন্দাদি উপস্থিত ছিলেন এবং বীরচন্দ্রপ্রভুর বৃন্দাবন-গমনকালেও উপস্থিত ভক্তবৃন্দের মধ্যে ছিলেন :

কাশীশ্বর গোসাঞির শিষ্য মহা আর্য।
গোবিন্দ গোসাঞি আর শ্রীযাদবাচার্য।

বৃন্দাবনবাসীদিগের সম্পর্কে 'প্রেমবিলাসে'ও লিখিত হইয়াছে :

কাশীশ্বরের এক শিষ্য হন ব্রজবাসী।
ব্রাহ্মণকুলেতে জন্ম নাম ভক্তকাশী।

---

(১১) ৩।১৮৮ (১২) ১।৮, পৃ. ৪৮ ; দ্র.—মু. বি.—পৃ. ২৯১ (১৩) ২।১৮, পৃ. ২০১ (১৪) ১।১০, পৃ. ৫৪
(১৫) ৬।৫১৩-১৪ ; ১৩।৩২৩

গোবিন্দ গোসাঞি আর যাদব আচার্য।
চরণ আশ্রয় কৈল ছাড়ি গৃহকার্য ॥

এই সকল[১৬] হইতে বুঝিতে পারা যায় যে কাশীশ্বরের সহিত গোবিন্দের পূর্ব-সম্বন্ধ অনস্বীকার্য বলিয়াই অন্য কোন সমর্থন না থাকা সত্ত্বেও উভয়কে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ করিতে হইয়াছে এবং তৎসঙ্গে যাদবাচার্যকেও একই সূত্রে বাঁধিতে হইয়াছে। অথচ আমরা দেখিয়াছি যে ঈশ্বর-পুরীর সূত্রেই ভৃত্য-গোবিন্দ এবং কাশীশ্বরের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগসম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। বৃন্দাবন-আগমনের পূর্বে কাশীশ্বর যে অন্য কোনও গোবিন্দের সহিত যুক্ত ছিলেন তাহার যেমন কোনও প্রমাণ নাই, কাশীশ্বরের পূর্বসঙ্গী ভৃত্য-গোবিন্দও যে পরে তাঁহার বৃন্দাবন-সঙ্গী হন নাই, তাহারও তেমন কোনও প্রমাণ নাই। যে-গোবিন্দ-গোসাঁই বৃন্দাবনে এইরূপ সম্মান প্রাপ্ত হইতেন, কাশীশ্বরের সহিত তাঁহার পূর্ব-সম্বন্ধ থাকা সত্ত্বেও তাঁহার পূর্ব-পরিচয় কোথাও থাকিবেনা, তাহাও এক প্রকার অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়।

চৈতন্যমহাপ্রভুকে ভগবান্ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে তিনি মানুষরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি মোহমুক্ত ছিলেন সত্য, এবং তাঁহার সাধন-সঙ্গী বা তত্ত্ব-বিষয়ক সঙ্গী হিসাবে অনেকানেক ভক্তই তাঁহার হৃদয়ের অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু মানুষ-হিসাবে তাঁহার যে মমতাবোধের পরিচয় পরিদৃষ্ট হয়, তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ আলম্বন ছিলেন তাঁহার নীলাচল-ভৃত্য 'শ্রীগোবিন্দ'ই। তাঁহার জীবনের বাহ্য প্রয়োজন হইতে আর সকলকে বাদ দেওয়ার কথা যদিও বা সম্ভব হয়, স্বরূপ-দামোদর এবং বিশেষ করিয়া গোবিন্দকে পরিত্যাগ করিবার কথা প্রায় অসম্ভবই। মহাপ্রভু নিয়মিতভাবে ভক্তবৃন্দের গৃহে ভিক্ষানির্বাহ করিতেন, এবং মহা-প্রসাদ ভক্ষণ করিতেন। তজ্জন্য স্বীয় অবস্থান-ক্ষেত্রে রন্ধনের প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু ইহা ছাড়া ব্রহ্মাণাদির জন্য প্রসাদান্ন লইয়া যাওয়া প্রভৃতি এমন কোনও কার্য ছিল না যাহাতে গোবিন্দের অধিকার ছিল না। সুতরাং কর্ম-মর্যাদার কথা বিচার করিলে একথা বলা চলে যে কাশীশ্বর অপেক্ষাও 'শ্রীগোবিন্দ' অধিকতর সম্মান বা সৌভাগ্যের অধিকারী হইতে পারিতেন। 'মর্যাদা'-রক্ষার্থ যে-সনাতন জগন্নাথ-মন্দিরে প্রবেশ করা তো দূরের কথা, জগন্নাথের পড়িছাবৃন্দের ছায়া মাড়াইয়া ফেলিবার ভয়ে সর্বদাই মন্দির হইতে দূর-পথে গমন করিতেন, যবন-হরিদাসের সহিত একত্রে বাস করিতেন[১৭] এবং ব্রাহ্মণত্বের

---

(১৬) মু. বি. (পৃ. ২৯১) এবং স. সূ.-তেও (পৃ. ১১) বৃন্দাবনবাসী যাদবচার্য-গোসাঁই ও গোবিন্দ-গোসাঁইর নাম একত্রে উল্লেখিত হইয়াছে। পরবর্তী পুথির অন্যত্র (পৃ. ১০) বলা হইয়াছে : জয়দেব (=যাদব ?)-আচার্য কৈলা বৃন্দাবনে স্থিতি। কাশীশ্বর শ্রীগোবিন্দ গোসাঁঞি সঙ্গতি ॥ (১৭) দ্র.—সনাতন

সামান্য অধিকারও ভোগ করিতেন না তিনিও যে বৃন্দাবনে গোস্বামী-পদবাচ্য হইয়াছিলেন, তাহা সম্ভবত কেবল তাঁহার জাতিত্বের জোরে নহে, প্রভাব- বা কর্ম-মাহাত্ম্যের গুণেই। রঘুনাথদাসের গোস্বামী-আখ্যা সম্বন্ধে ১২৮০ সালের 'বংগদর্শন পত্রিকা'র পৌষ-সংখ্যায় 'গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যবৃন্দের গ্রন্থাবলীর বিবরণ' নামক একটি প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে, "চৈতন্য জাতিভেদ মানিতেন না। তাঁহার অন্যান্য ব্রাহ্মণ আচার্যগণের ন্যায় ইঁহার (রঘুনাথ দাসের) প্রতিও স্নেহের কিছুমাত্র ক্রটি হইত না। এজন্য দাস-গোস্বামীকে পঞ্চ ব্রাহ্মণ-আচার্যগণের ন্যায় পদ প্রদান করিয়াছিলেন। বিদ্যা ও ভক্তির জন্য ইনি আচার্যপদবাচ্য হইয়াছিলেন।" আবার ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ নির্বিশেষে 'দাস', 'পণ্ডিত' ও 'ঠাকুর' উপাধির ব্যবহার বৈষ্ণবগ্রন্থগুলির মধ্যে সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। 'আচার্য'-উপাধির সম্বন্ধেও এই কথা অনেকাংশে প্রযোজ্য। 'চৈতন্যভাগবতে'র বনমালী-পণ্ডিত ও 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র বনমালী-আচার্য একই ব্যক্তি। তেমনি পুরন্দর-পণ্ডিত ও পুরন্দর-আচার্যও এক ব্যক্তি। 'পাটনির্ণয়-গ্রন্থে রাঘব-পণ্ডিতকেও রাঘবদাস-ঠাকুর বলা হইয়াছে। আবার অন্যান্য গ্রন্থেও বাসুদেব-দত্ত, নরহরি-সরকার, শিবানন্দ-সেন এবং চন্দ্রশেখর-বৈদ্য প্রভৃতিকে যথাক্রমে বাসুদেবাচার্য[১৮] নরহরি-আচার্য-ঠাকুর[১৯], শিবানন্দ-আচার্য[২০] এবং চন্দ্রশেখর-আচার্য[২১] প্রভৃতি বলা হইয়াছে। একসময় হরিদাস দাস বাবাজী বর্তমান গ্রন্থকারকে বলিয়াছিলেন যে 'গোসাঁই'-উপাধি ব্যবহারের ক্ষেত্রেও বাঁধাধরা নিয়ম ছিল না। ডা. বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয়ের গ্রন্থ[২২] হইতেও এই মতই সমর্থিত হয়। বৈষ্ণব-গ্রন্থে একই ব্যক্তিকে ঠাকুর এবং গোস্বামী, বা, আচার্য এবং ঠাকুর উভয়-উপাধিবিশিষ্ট দেখা যায়। শিশু-কৃষ্ণদাস-গোস্বামীর নামই ছিল কানু-ঠাকুর[২৩] এবং শ্রীনিবাস-আচার্যকেও আচার্য-ঠাকুর[২৪] বলা হইয়াছে। আবার একই বংশীয় দুইজনের একজনকে ঠাকুর এবং অন্যজনকে গোসাঁইরূপেও বর্ণিত দেখা যায়। বংশীবদন-ঠাকুরের পৌত্র ছিলেন রামাই-গোঁসাই। সুতরাং শূদ্র হইয়াও গোবিন্দের পক্ষে যে গোসাঁই হওয়া অসম্ভব ছিল তাহা মনে করা চলে না। ডা. সুকুমার সেন কিন্তু বর্তমান গ্রন্থকারের নিকট অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন

(১৮) দ্র.—বাসুদেব-দত্ত (১৯) গৌ. ত.—পৃ. ২২৮; গৌ. গ.—পৃ. ৪; এই পুথির ৮ম. পৃষ্ঠায় একজন নরহরি- আচার্য-সেনের নামও উল্লেখিত হইয়াছে। বলরামদাসের গৌরগণোদ্দেশদীপিকাতেও (পৃ. ১৫) 'নরহরি আচার্য সেন' নাম দৃষ্ট হয়; চৈ. দী. (রামাই)—পৃ. ৫, ১৪ (২০) চৈ. চ—৩।১, পৃ.২৮০:

কুলীনগ্রামী ভক্ত আর যত খণ্ডবাসী।
আচার্য শিবানন্দ সনে মিলিলা সবে আসি॥

এই স্থলে অদ্বৈত-আচার্যের কল্পনা কষ্টকল্পনামাত্র; দ্র.—বাসুদেব-দত্ত (২১) প্রে. বি.—৫ম. বি., পৃ. ৫৫ (২২) চৈ. উ.—পৃ. ১০২-৪ (২৩) চৈ. চন্দ্র.—পৃ. ১৬৫-৬৬ (২৪) ব. শি.—পৃ. ১৮৭

যে প্রাচীন বৈষ্ণব-শাস্ত্রে অব্রাহ্মণকে কোথাও 'গোস্বামী'-আখ্যা প্রদান করা হয় নাই। অনুসন্ধানের ফলে যতদূর জানিতে পারিয়াছি তাঁহার অভিমতই যথার্থ। তবে বৃন্দাবন-গোস্বামীদিগের সম্বন্ধে অবশ্য তিনি একথা জোর করিয়া বলেন নাই। প্রকৃত-পক্ষে, বৃন্দাবনের গোসাঁইদিগের সম্বন্ধে যে এরূপ নিয়ম প্রযুক্ত ছিলনা, তাহার প্রমাণ স্বয়ং রঘুনাথদাস এবং কৃষ্ণদাস-কবিরাজ। সম্ভবত কবিরাজ-গোস্বামীর শিষ্য গোপালদাস-গোস্বামীও ক্ষেত্রি-কুলোদ্ভব ছিলেন।[২৫] অবশ্য উল্লেখযোগ্য যে রঘুনাথ-কৃষ্ণদাসাদির নামের সহিত গোস্বামী-পদের ব্যবহার পরবর্তিকালের হইতেও পারে। কিন্তু খুব পরবর্তিকালের বলিয়াও ধরা যাইতে পারেনা। ষোড়শ শতকে রচিত দেবকীনন্দনের 'বৈষ্ণববন্দনা'তেও রঘুনাথদাসকে 'গোস্বামী'-আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে।[২৬] তবে কৃষ্ণদাস-কবিরাজের জাতি সম্বন্ধে হয়ত জোর করিয়া কিছু বলা চলে না। হরিদাস দাস মহাশয়ও বর্তমান গ্রন্থকারকে জানাইয়াছিলেন যে তিনি কৃষ্ণদাসকে 'বৈদ্য' বলিয়া মনে করেন। ডা. বিমানবিহারী মজুমদার লিখিয়াছেন[২৭] যে 'কৃষ্ণদাস খুব সম্ভবত জাতিতে বৈদ্য ছিলেন।' ইঁহারা কেহই এ সম্বন্ধে কিছু প্রমাণ প্রয়োগ করেন নাই। অধিকন্তু ডা. মজুমদার রঘুনাথদাসের 'মুক্তাচরিত্রে'র শেষ-শ্লোকের উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে সেই স্থলে রঘুনাথ যে 'কৃষ্ণকবিভূপতি'র সঙ্গলাভ করিতে চাহিয়াছেন সেই "'কবিভূপতিকৃষ্ণে'র অর্থ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ।" কিন্তু এই স্থলে সমার্থবোধকতা হেতু কবিরাজকে 'কবিপতি' বা 'কবিভূপতি' বলা হইতে পারে। রামচন্দ্র-কবিরাজের শিষ্য বলরাম-কবিরাজকেও এই কারণেই বলরাম-কবিপতি বলা হইয়াছে।[২৮] কিন্তু যাহাহউক, 'কবিরাজ'কে কৃষ্ণদাসের পূর্ব উপাধি বা পদবি ধরিয়া লইলেও তিনি যে বৈদ্য ছিলেন, তাহা জোর করিয়া বলা যায় না। আবার 'কবিরাজ' যে একটি বৈদ্য-পদবী ছিল তাহাও বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। সদাশিব-কবিরাজ বৈদ্যবংশোদ্ভব ছিলেন। শ্রীনিবাস-আচার্যের শিষ্য গোপীরমরণ-কবিরাজকে স্পষ্টই গোপীরমণদাস-বৈদ্য বলা হইয়াছে।[২৯] তৎসত্ত্বেও কৃষ্ণদাস-কবিরাজের বৈদ্যত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত প্রমাণের অভাব থাকিয়া যায়। অপরপক্ষে, ইহাও দৃঢ়তার সহিত বলা যাইতে পারে যে কৃষ্ণদাস-কবিরাজ যে ব্রাহ্মণ ছিলেন, এইরূপ কোন বিবরণ এযাবৎ পাওয়া যায় নাই এবং রঘুনাথদাস যে অব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহারও প্রমাণাভাব নাই। তাছাড়া, যতদূর মনে হয় 'গোসাঞি'-উপাধিটি প্রধানত প্রভাব- বা মাহাত্ম্য-প্রকাশক। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' অন্তত ৬।৭ বার 'গোসাঞি'-কথার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই উহা 'প্রভু'- বা 'ভগবান'-অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে

(২৫) ক. সা.—পৃ. ১ (২৬) পৃ. ৩ (২৭) চৈ. উ.—পৃ. ৩০২-৫ (২৮) দ্র.—রামচন্দ্র-কবিরাজ (২৯) দ্র. —শ্রীনিবাস

এবং গোপ-বংশীয় কানাইর সম্বন্ধে উহা প্রযুক্ত হইয়াছে। বাংলা বৈষ্ণব-গ্রন্থগুলিতে অবশ্য 'গোসাঞি'-কথাটির সুস্পষ্ট অর্থ বা প্রয়োগ-বিধি সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে 'অদ্বৈতমঙ্গলে'র একটি বর্ণনা এ বিষয়টির উপর সম্ভবত কিছু পরিমাণে আলোকপাত করিতে পারে। গ্রন্থকর্তা অদ্বৈত-শিষ্য কমলাকান্তের 'গোসাঞি'-উপাধি সম্বন্ধে বলিতেছেন[৩০] (অষ্টাদশ শতকের মধ্যবর্তী কালের পুথি অনুযায়ী) :

কমলাকান্তের প্রভাব বড় যে দেখিয়া।
কমলাকান্ত গোসাঞি কহে প্রভু যে ডাকিয়া॥

এই সকল কারণে গোবিন্দের পক্ষে গোসাঁই হওয়ার বাধা যে অনতিক্রমণীয়, তাহা মনে হয় না। বিশেষ করিয়া তিনি বৃন্দাবনবাসী হওয়ায় এ এম্বন্ধে অনেকাংশেই সন্দেহ দূরীভূত হইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, গোবিন্দের শূদ্রত্ব একটি কথার কথামাত্র। গোবিন্দ যখন সর্বপ্রথম নীলাচলে গিয়া পৌছান, তখন সার্বভৌম তাঁহার শূদ্রত্বের প্রশ্ন তুলিয়া মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে ঈশ্বর-পুরীর মত লোক শূদ্র-'পরিচারক' রাখিলেন কিরূপে। কেবলমাত্র অঙ্গ-সেবার ব্যাপার হইলে এরূপ প্রশ্ন উঠিতই না। সার্বভৌম নিশ্চয়ই এমন বিষয়ের ইঙ্গিত করিতেছেন, যে-বিষয়ে শূদ্রের প্রবেশাধিকার ছিল নিয়ম- ও আচার-বহির্ভূত। মহাপ্রভুও তাই উত্তর দিয়াছিলেন[৩১] :

হরেঃ স্বতন্ত্রস্য কৃপাপি তদ্ব
দ্ভবেত্ ন সা জাতি কুলাদ্যপেক্ষাং।
ঈশ্বরের কৃপা জাতি কুলাদি না মানে।......

এবং মর্যাদা হইতে কোটি সুখ স্নেহ আচরণে॥

---

(৩০) অ. ম. (ব. সা. প.)—পৃ. ৮৭।২ (৩১) চৈ. না.—৮।১৮; চৈ. চ.—২।১০, পৃ. ১৪৯

রঘুনাথ-বৈদ্য-উপাধ্যায়

বৃন্দাবনদাস এবং জয়ানন্দ নিত্যানন্দ-শিষ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে 'মহামতি রঘুনাথ বৈদ্য উপাধ্যায়ে'র উল্লেখ করিয়াছেন।[১] ইঁহার নিবাস ছিল পানিহাটী কিংবা তন্নিকটস্থ কোনও গ্রামে। ইনি প্রায়ই নিত্যানন্দ-সমীপে থাকিতেন। নিত্যানন্দের নীলাচল-বাসকালে 'রঘুনাথ বৈদ্য' সেইস্থানে অবস্থান করিতেছিলেন।[২] মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে ভক্তি-প্রচারার্থ গৌড়ে প্রেরণ করিলে 'রঘুনাথ বেজ ওঝা' বা 'রঘুনাথ বৈদ্য উপাধ্যায়' তাঁহার সহিত পানিহাটীতে চলিয়া আসেন।[৩] তাহার পর মহাপ্রভু যখন রামকেলি হইতে ফিরিয়া পানিহাটীতে পৌছান, তখন পরম বৈষ্ণব 'রঘুনাথ বৈদ্য' আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন।[৪] মহাপ্রভুর যে সমস্ত পূর্ব-পরিচিত ব্যক্তি তাঁহার সহিত নীলাচলে বাস করিতেছিলেন, কৃষ্ণদাস-কবিরাজ তাঁহাদের মধ্যে একজন 'রঘুনাথ বৈদ্যে'র নাম উল্লেখ করিয়াছেন।[৫] শ্রীক্ষেত্রে মহাপ্রভুর নিকট তিনজন রঘুনাথ অবস্থান করিতেছিলেন।[৬] রঘুনাথদাস, উড়িষ্যাবাসী-রঘু এবং এই রঘুনাথ-বৈদ্য।[৭] খুব সম্ভবত, মহাপ্রভুর গৌড় হইতে নীলাচলে ফিরিয়া আসিবার সময় কিংবা তৎপরবর্তী কোনও সময়ে উক্ত রঘুনাথ-উপাধ্যায় শ্রীক্ষেত্রে গিয়া তথায় কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। পানিহাটীর রঘুনাথ-উপাধ্যায় ও মহাপ্রভুর নীলাচল-সঙ্গী রঘুনাথ-বৈদ্য যে অভিন্ন-ব্যক্তি তাহা বৃন্দাবনদাসোক্ত 'রঘুনাথ বৈদ্য উপাধ্যায়' নাম হইতে ধারণা করা যাইতে পারে।

'ভক্তিরত্নাকর' ও 'নরোত্তমবিলাস' হইতে জানা যায় যে নরোত্তমের বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠাকালে নিত্যানন্দ-পত্নী জাহ্নবাদেবীর সহিত 'রঘুপতি বৈদ্য উপাধ্যায়' নামে এক ব্যক্তি আসিয়া খেতুরি-উৎসবে যোগদান করেন।[৮] উৎসবান্তে জাহ্নবা যখন বৃন্দাবন গমন করেন, তখনও 'রঘুপতি বৈদ্য উপাধ্যায় মনোহর' তাঁহার সঙ্গী হইয়াছিলেন।[৯] জাহ্নবাদেবীর সহিত রঘুপতির এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখিয়া মনে হয় যে এই রঘুপতি-বৈদ্য-উপাধ্যায় এবং পূর্বোক্ত রঘুনাথ-বৈদ্য-উপাধ্যায় এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হইতেও পারেন।

'ভক্তিরত্নাকরে' আর একজন রঘুনাথ-বৈদ্যের নাম আছে। শ্রীনিবাস-আচার্যপ্রভু

---

(১) চৈ. ভা.—৩।৬, পৃ. ৩১৬ (২) ঐ—৩।৯, পৃ. ৩২৭-২৮; বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যগণোদ্দেশেও (পৃ. ১২) রঘুনাথ-বৈদ্যের নাম আছে। (৩) চৈ. ভা.—৩।৫, পৃ. ৩০৩; চৈ. ম. (জ.)—পৃ. ৩২,৩৪ (৪) চৈ. ভা.—৩।৫, পৃ. ২৯৯ (৫) চৈ. চ.—১।১০, পৃ. ৫৪ (৬) ঐ—৩।৬, পৃ. ৩১৯ (৭) শ্রীচৈ.চ.—৪।১৭।২২ (৮) ভ. র—১০।৩৭৩, ৭৪৩; ন. বি.—৬ষ্ঠ. বি., পৃ. ৭৯; প্রে. বি.—১৯শ. বি., পৃ. ৩০৮ (৯) ভ. র. —১০।৭৪৫; ১১।৪০২

বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া কাটোয়ায় পৌঁছাইলে তখন যেসব মহান্তের আগমন হইয়াছিল তাঁহাদের মধ্যে 'রঘুনাথ-বৈদ্য-উপাধ্যায় নারায়ণ'[১০] ছিলেন। পূর্বোক্ত 'রঘুনাথ-বৈদ্য-উপাধ্যায় মনোহরে'র মত এই স্থলেও উপাধ্যায়াখ্য ব্যক্তিটি রঘুনাথ-বৈদ্য (উপাধ্যায়), কিংবা নারায়ণ (উপাধ্যায়) তাহা সঠিকভাবে বুঝা যায়না। তবে উপাধ্যায়াখ্য-নারায়ণ বা -মনোহর নাম অন্য কোথাও পাওয়া যায়না এবং নিত্যানন্দ-শিষ্য নারায়ণের চারি ভ্রাতার মধ্যে একজন মনোহরও থাকায় নিশ্চয়ভাবে ধরিয়া লওয়া যায় যে উপরোক্ত উপাধ্যায়-পদবীটি রঘুপতি বা রঘুনাথেরই। সম্ভবত তিনি নারায়ণ-মনোহরদের সহিত কোন বিশেষ সম্বন্ধে যুক্ত ছিলেন বলিয়াই তাঁহাদের নাম একত্রে ব্যবহৃত হইয়াছে। উল্লেখযোগ্য যে তাঁহারা সকলেই নিত্যানন্দের বিশেষ ভক্ত ও শিষ্য ছিলেন।

'চৈতন্যচরিতামৃতে' কিন্তু একজন 'রঘুপতি উপাধ্যায়ে'র নাম আছে। মহাপ্রভু বৃন্দাবন হইতে প্রয়াগে ফিরিয়া একদিন আউলি-গ্রামে বল্লভ-ভট্টের গৃহে ভিক্ষা-নির্বাহার্থ গমন করিলে এই পরম বৈষ্ণব 'তিরোহিতা পণ্ডিত' কৃষ্ণতত্ত্বকথা কহিয়া মহাপ্রভুকে যথেষ্ট আনন্দ দান করিয়াছিলেন।[১১] এই রঘুপতি-উপাধ্যায় সম্বন্ধে কোনও সংশয় নাই।

'প্রেমবিলাসে' নরোত্তম-শিষ্য অন্য একজন রঘুনাথ-বৈদ্যের নাম পাওয়া যায়।[১২]

(১০) ভ. র.—৯।৩৯৮ (১১) চৈ. চ.—২।১৯, পৃ. ২০৯ (১২) প্রে. বি.—২০শ. বি., পৃ. ৩৫৬

কৃষ্ণদাস (রাঢ়দেশী)

নিত্যানন্দ-শাখার কৃষ্ণদাস সম্বন্ধে 'চৈতন্যভাগবত'-কার বলিতেছেন[১] :

রাঢ়ে জন্ম মহাশয় বিপ্র কৃষ্ণদাস।

এবং 'চৈতন্যচরিতামৃত'-কার বলিয়াছেন :

রাঢ়দেশে জন্ম কৃষ্ণদাস দ্বিজবর।

শেষোক্ত গ্রন্থ হইতে ইঁহার সম্বন্ধে আরও জানা যায়[২] যে 'তৃতীয় বৎসর সব গৌড়ের ভক্তগণ নীলাচলে' গিয়া যখন রথযাত্রা উপলক্ষে নৃত্য-কীর্তনাদির পর 'বাপীতীরে' বিশ্রাম করিতেছিলেন তখন :

রাঢ়ী এক বিপ্র তিঁহো নিত্যানন্দ দাস।
মহাভাগ্যবান তিঁহো নাম কৃষ্ণদাস ॥
ঘট ভরি প্রভুর তিঁহো অভিষেক কৈল।
তাঁর অভিষেকে প্রভু মহাতৃপ্তি হইল ॥

নরহরি-চক্রবর্তী জানাইতেছেন[৩] যে এক বিপ্র- বা দ্বিজবর-কৃষ্ণদাস গদাধরদাসপ্রভুর তিরোধানতিথি-মহামহোৎসব এবং খেতুরির মহামহোৎসবে যোগদান করিবার পর জাহ্নবা-দেবীর সহিত বৃন্দাবন-পরিক্রমা শেষ করিয়া গৌড়ে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন এবং একচক্রা পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। খুব সম্ভবত, এই উভয় কৃষ্ণদাস একই ব্যক্তি ছিলেন।

নিত্যানন্দ-শাখায় উল্লেখিত নকড়িদাস এবং মহীধর-নামক দুই ব্যক্তিকে নরহরি-বর্ণিত ঘটনাবলীর সহিত যুক্ত দেখা যায়।

---

(১) ৩।৬, পৃ. ৩১৬ (২) ২।১, পৃ. ৮৫ ; ২।১৬, পৃ. ১৮৬ (৩) ভ. র.—৯।৩৯৯ ; ১০।৩৭৬, ৭৪৩-৪৪ ; ১১।৪০০-৪০১, ৪০৩ ; ন. বি.—৮ম. বি., পৃ. ১০৭, ১১৮ ; ৬ষ্ঠ. বি., পৃ. ৭৯-৮০

পুরুষোত্তম (-বড়জানা)

পুরুষোত্তম-জানা ছিলেন রাজা প্রতাপরুদ্রের পুত্র। A History of Orissa নামক গ্রন্থ (p. 149) হইতে জানা যায় যে প্রতাপরুদ্রের বত্রিশ জন পুত্র ছিলেন। কিন্তু পুরুষোত্তম-বড়জানা তাঁহার কোন্ পুত্র তাহা জানা যায় না। 'চৈতন্যচরিতামৃতে' পুরুষোত্তমের জীবনের একটি ঘটনার স্পষ্ট উল্লেখ দৃষ্ট হয়। আর একটি ঘটনাতেও প্রতাপরুদ্রের পুত্রকে সম্পর্কিত দেখা যায় ; কিন্তু তিনি যে কোন্ পুত্র, তাহার স্পষ্ট উল্লেখ নাই। ঘটনাটি নিম্নোক্তরূপ :

রামানন্দ-রায় যখন প্রতাপরুদ্রকে দর্শন দান করিবার জন্য মহাপ্রভুকে একান্তভাবে অনুরোধ জানাইলেন, তখন মহাপ্রভু রামানন্দের অনুরোধে রাজা-প্রতাপরুদ্রের পুত্রের সহিত মিলিত হইবার প্রস্তাব করিলেন। তাঁহার যুক্তি ছিল,—'আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ।' সুতরাং পুত্রের সহিত মিলিত হইলেই রাজা উহাকে আপনার সহিত মিলন বলিয়া মনে করিতে পারিবেন। তদনুযায়ী রাজপুত্রকে আনা হইল। তখন রাজপুত্র কিশোরবয়স্ক ও রূপবান হইয়াছেন। পীতাম্বর-পরিহিত রত্নাভরণ-ভূষিত রাজপুত্র সম্মুখে আনীত হইলে মহাপ্রভুর কৃষ্ণ-স্মৃতি জাগিল। তিনি কিশোরকে বাহুবদ্ধ করিয়া আলিঙ্গন দান করিলেন। তারপর রাজপুত্রকে বক্ষে ধারণ করিয়া প্রতাপরুদ্র জীবন সার্থক মনে করিলেন।

'চৈতন্যচরিতামৃতে' পুরুষোত্তম-বড়জানার নামোল্লেখ করিয়া যে ঘটনাটি বিবৃত হইয়াছে, তাহা কিন্তু আরও অনেক পরের ঘটনা। সেই ঘটনা রামানন্দ-রায়ের পঞ্চমভ্রাতা[১] গোপীনাথ-পট্টনায়ক সম্পর্কিত। দক্ষিণ হইতে মহাপ্রভুর নীলাচল-প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পরে পিতা ও ভ্রাতা-গণের সহিত গোপীনাথ মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। এই গোপীনাথ 'রাজবিষয়ী' ছিলেন। সেইজন্য 'মালজাঠা দণ্ডপাটে তার অধিকার। সাধি পাড়ি আনি দ্রব্য দিল রাজদ্বার॥' শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মহাতাব বলেন তিনিও 'বড়জানা'-উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।[২] যাহাহউক, রাজার নিকট তাঁহার দুই লক্ষ কাহন কৌড়ি বাকি পড়িয়াছিল। ক্রমে ক্রমে বেচাকেনা করিয়া তিনি তাহা শোধ করিতে চাহিলেন, নচেৎ প্রয়োজন হইলে রাজদ্বারে অশ্ব বেচিয়াও তিনি অর্থ পরিশোধ করিবেন। তাহাই স্থির হইল। 'এক রাজপুত্র ঘোড়ার মূল্য ভাল জানে।' কিন্তু রাজা-কর্তৃক প্রেরিত হইয়া তিনি অশ্বের যে মূল্য স্থির করিয়া দিলেন, তাহাতে গোপীনাথ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। রাজপুত্রের একটি স্বভাব ছিল, তিনি মধ্যে মধ্যে গ্রীবা ফিরাইয়া উর্ধ্বমুখে এদিক

(১) দ্র.—ভবানন্দ-রায় (২) The History of Orissa—Harekrishna Mahtab—pp. 91,92

ওদিক চাহিতেন। গোপীনাথ তাঁহার নিন্দা করিয়া সগর্বে জানাইলেন যে তাঁহার অশ্ব তো আর গ্রীবা ফিরাইয়া ঊর্দ্ধমুখে এদিক ওদিক চাহিতেছে না যে তাহার মূল্য এত কম হইবে। রাজপুত্র অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া নানাভাবে রাজার নিকট 'লাগানি করিল' এবং গোপীনাথকে চাঙ্গে চড়াইয়া তাঁহার প্রাণদণ্ডাদেশ ভিক্ষা করিয়া লইলেন। সমস্ত ব্যাপারটির গুরুত্ব ঠিকঠিক না বুঝিয়া

রাজা বলে "যেই ভাল কর সেই যায়।
যে উপায়ে কৌড়ি পায় কর সেই উপায়॥"

পুরুষোত্তম আসিয়া গোপীনাথকে চাঙ্গে চড়াইয়া তাঁহার প্রাণ হরণ করিতে উদ্যত হইলেন এবং বাণীনাথ প্রভৃতিকে 'সবংশে' বাঁধিয়া লইয়া গেলেন।

মহাপ্রভুর নিকট এই সংবাদ পৌছাইলে তিনি উভয়ের প্রতি ক্ষুণ্ণ হইলেন। শেষে হরিচন্দন-পাত্র রাজার নিকট সকল কথা জ্ঞাপন করিলে রাজ-আজ্ঞায় গোপীনাথের প্রাণদণ্ডাদেশ রহিত হইল। পরে কাশী-মিশ্রের হস্তক্ষেপের ফলে প্রতাপরুদ্র গোপীনাথকে সমস্ত দায় হইতে মুক্তি দিয়া বলিলেন :

সে মাল ছাঠ্যা পাঠ পুনঃ তোমায় বিষয় দিল॥
আবার ঐছে না খাইহ রাজধন।
আজি হৈতে দিল তোমার দ্বিগুণ বর্ত্তন॥

এই বলিয়া তিনি তাঁহাকে 'নেতধটী' পরাইয়া দিলেন। 'নেতধটি' মাথায় লইয়া গোপীনাথ মহাপ্রভুর চরণ-বন্দনা করিলেন এবং ভ্রাতা-রামানন্দ ও -বাণীনাথের মত তাঁহাকেও নির্বিঘ্ন করিবার জন্য কাতর প্রার্থনা জানাইলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলেন।

এই ঘটনার পর গোপীনাথ সম্বন্ধে আর কিছুই জানিতে পারা যায় না। 'ভক্তিরত্নাকর'-প্রণেতা জানাইতেছেন যে মহাপ্রভুর জীবিতাবস্থাতেই প্রতাপরুদ্রের পুত্র পিতার সিংহাসনে আরূঢ় হইয়াছিলেন।[৩] প্রতাপরুদ্র স্বয়ং তাঁহাকে রাজ্যভার অর্পণ করিয়াছিলেন এবং তদুপলক্ষে তিনি যথাবিধি মঙ্গলানুষ্ঠানের মধ্য দিয়া তাঁহাকে সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। সিংহাসনে আরোহণের পর তিনি সম্ভবত পিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া রাজকার্য পরিচালনা করিতে থাকেন। কিন্তু সেই রাজপুত্রের নাম সম্বন্ধে গ্রন্থমধ্যে কোনও উল্লেখ নাই। সুতরাং তিনি পুরুষোত্তম কিনা তাহা জানিবার কোনও উপায় নাই। প্রকৃতপক্ষে পুরুষোত্তমের রাজ্যপ্রাপ্তি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা কিনা তাহাও জানা যায়

(৩) ৩।২১৪

নাই। 'নিত্যানন্দবংশবিস্তার' নামক একটি গ্রন্থে বলা হইয়াছে[8] যে বীরচন্দ্র নীলাচলে আসিয়া যখন সুধাময়ের জলোদ্ভবা কন্যার পাণিগ্রহণ করেন তখন

গজপতির সন্তান সে দেশের অধিকারী।
জোরদণ্ড প্রতাপ চক্রদেব নামধারী॥

বীরচন্দ্র তাঁহাকে 'রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র দিয়া আত্মসাৎ' করেন এবং উক্ত রাজানুগত্যে নব-দম্পতীর স্বদেশ-গমনের সুবন্দোবস্ত হয়। এইস্থলে বর্ণনার অস্পষ্টতাহেতু চক্রদেব সম্বন্ধেও কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না। History of Orissa-গ্রন্থে হাণ্টার-সাহেব প্রতাপরুদ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার মাত্র যে-দুইজন পুত্রকে উত্তরাধিকারী রাজা-হিসাবে বর্ণিত করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কিন্তু পুরুষোত্তম-জানা বা চক্রদেব-নামক কাহাকেও দেখা যায় না। অথচ এই গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে প্রতাপরুদ্রের মৃত্যুর পর সিংহাসনের প্রকৃত-উত্তরাধিকারী প্রতাপরুদ্রের উক্ত দুইজন পুত্রকেই পর পর হত্যা করিয়া রাজমন্ত্রী বিদ্যাধর স্বল্পকাল-স্থায়ী নূতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও তাঁহার History of Orissa (p. 237)-গ্রন্থে জানাইতেছেন, "Two sons of Prataprudra are known to us from the local chronicle Madla Panji. Even their proper names have not been recorded and they are mentioned only by nicknames." কালুয়াদেব এবং কখাড়ুয়াদেব নামক সেই পুত্রদ্বয়ের কথা উল্লেখ করিয়া গ্রন্থকার জানাইতেছেন যে তাঁহাদের হত্যার পর গোবিন্দ-বিদ্যাধর ১৫৪১-৪২ খ্রী.-এ রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। সুতরাং অন্য বিশেষ প্রমাণাবলীর অভাবে পুরুষোত্তম-জানাকে ঐতিহাসিক মর্যাদাসম্পন্ন কোনও বিশেষ রাজা বলিয়া ধরিয়া লইবার সংগত কারণ দেখা যায় না। তবে হয়ত এমন হইতে পারে যে প্রতাপরুদ্রের জীবদ্দশাতেই তিনি সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া রাজকার্য পরিচালনা করিতেছিলেন; কিন্তু ঘটনাচক্রে হয়ত তাঁহার সে সৌভাগ্য স্থায়িত্বলাভ করে নাই।

'অনুরাগবল্লী'- ও 'ভক্তিরত্নাকর'-গ্রন্থে কিন্তু পুরুষোত্তম-বড়জানার ভক্তজীবনের পরিচয় বর্ণিত হইয়াছে[৫]। গ্রন্থ দুইখানি বহু পরবর্তিকালে লিখিত। সুতরাং গ্রন্থকর্তৃবৃন্দ প্রতাপ-রুদ্রের অন্য কোন পুত্রকে উক্তভাবে নামাঙ্কিত করিয়াছেন কিনা জানিবার উপায় নাই। তবে ঐ প্রকার ভুল না হওয়াই সম্ভব। যাহাহউক, গ্রন্থানুযায়ী জানা যায় যে বৃন্দাবনে যখন গোবিন্দ- ও মদনমোহন-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয় তখন সেখানে তাঁহাদের সহিত কোন স্ত্রী-দেবতার বিগ্রহ ছিল না। পুরুষোত্তম-জানা সেই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া 'রাধিকার ভানে' দুইটি স্ত্রী-বিগ্রহ নির্মাণ করাইয়া বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দেন। কিন্তু মদনমোহনের সেবা-

(৪) পৃ. ২২, ২৪ (৫) অ. ব.—৪র্থ. ম., পৃ. ২৩; ভ.র.—৬।৬৫-১০৬

অধিকারীর নির্দেশে বৃহত্তর মূর্তিটিকে ললিতা-রূপে এবং ক্ষুদ্রটিকে রাধিকা-রূপে যথাক্রমে একই মদনমোহন-বিগ্রহের দক্ষিণে এবং বামপার্শ্বে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এই সংবাদ শুনিয়া পুরুষোত্তম-বড়জানা অতিশয় আনন্দিত হইলেন। কিন্তু গোবিন্দ-বিগ্রহের কথা স্মরণ করিয়াও তিনি চিন্তিত হইলেন। শেষে তিনি জানিতে পারিলেন যে উৎকল-দেশের রাধানগর-গ্রামবাসী পরম-বৈষ্ণব বৃহদ্ভানু নামক এক বিপ্র বৃন্দাবন হইতে যে রাধিকা-বিগ্রহ আনয়ন করিয়া কন্যারূপে তাহার পূজা-অর্চনা করিতেছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর ক্ষেত্রস্থ রাজা সেই সংবাদ শ্রবণ করিয়া রাধানগর হইতে সেই বিগ্রহ আনিয়া জগন্নাথের চক্রবেড়ের মধ্যে তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, এবং তাহাই পরে লক্ষ্মীরূপে পূজিতা হইতেছিলেন। পুরুষোত্তম তখন সযতনে সেই বিগ্রহ আনিয়া মহাসমারোহে বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিলেন এবং তদবধি তাহা গোবিন্দ-বিগ্রহের বামপার্শ্বে রাধারূপে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল। পুরুষোত্তমের জীবন সম্বন্ধে এতদতিরিক্ত আর কিছুই জানিতে পারা যায় না বটে, কিন্তু বৃন্দাবনের বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠায় ভক্ত-পুরুষোত্তমের এই দান স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

রামচন্দ্র-খান

'চৈতন্যভাগবত' হইতে জানা যায় যে মহাপ্রভু প্রথমবার নীলাচল-অভিমুখে যাত্রা আরম্ভ করিয়া ছত্রভোগে পৌঁছাইলে 'সেই গ্রামে অধিকারী রামচন্দ্র খান'[১] দোলা হইতে নামিয়া তাঁহাকে বন্দনা করিয়াছিলেন। তখন রাজ্য-সীমানা লইয়া রাজা বা রাজাধিকারী-দিগের মধ্যে যথেষ্ট কলহ চলিতেছিল। 'রাজারা ত্রিশূল পুতিয়াছে স্থানে স্থানে।' তাই মহাপ্রভু রামচন্দ্রকে তাঁহার দ্রুত নীলাচল-যাত্রার ব্যবস্থা করিয়া দিতে বলিলে বিপদের সম্ভাবনা সত্ত্বেও রামচন্দ্র নিজের দায়িত্বে নিরাপদ-যাত্রার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন এবং একরাত্রি তাঁহাকে সেইস্থানে রাখিয়া পরদিন প্রত্যুষে নৌকা ও লোকজনসহ তাঁহাকে অগ্রসর করিয়া দিয়াছিলেন।

আবার 'চৈতন্যচরিতামৃত' হইতেও জানা যায়[২] যে বেনাপোল অঞ্চলের দেশাধ্যক্ষ বৈষ্ণবদ্বেষী পাষণ্ড রামচন্দ্র-খান হরিদাসের নিকট একজন সুন্দরী বারাঙ্গনাকে পুনঃ পুনঃ প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে বিপথে পরিচালিত করিবার জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছিলেন। গ্রন্থকার আরও বলেন[৩] যে নিত্যানন্দ নীলাচল হইতে গৌড়ে প্রত্যাবর্তন করিয়া একবার শিষ্যবৃন্দসহ রামচন্দ্র-খানের গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলে রামচন্দ্র অভ্যন্তরে থাকিয়াই সেবক মারফত নিত্যানন্দকে জানাইলেন যে গোয়ালার গো-শালাই সাঙ্গোপাঙ্গ-নিত্যানন্দের উপযুক্ত স্থান। তখন ক্রুদ্ধ নিত্যানন্দ সেইস্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে রামচন্দ্র গোময় জলে সমস্ত প্রাঙ্গণ পরিষ্কার করিলেন। কিন্তু 'দস্যুবৃত্তি' রামচন্দ্র কর প্রদান না করায় অত্যল্পকাল মধ্যেই যবন-উর্জীর আসিয়া নানাভাবেই 'জাতিধন জন খানের সকল লইল' এবং তাঁহার দুর্গামণ্ডপে অবধ্য-বধ করিয়া ও মাংস রন্ধনাদি করিয়া স্ত্রী-পুত্র সহিতে রামচন্দ্র-খানকে বাঁধিয়া লইয়া গেল।

'চৈতন্যভাগবত' ও 'চৈতন্যচরিতামৃতো'ক্ত দুই জন রামচন্দ্র-খান দুই পৃথক ব্যক্তি। হরিদাস দাস তাঁহার 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবন'-গ্রন্থে দুইজন রামচন্দ্র সম্বন্ধেই নানাবিধ তথ্য প্রদান করিয়াছেন। পাষণ্ড রামচন্দ্র-খান সম্বন্ধে ১৩০৮ সালের 'গৌরাঙ্গ-পত্রিকা'র আশ্বিন-কার্তিক- সংখ্যায় মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন, "রাজা রামচন্দ্র খান ভূম্যধিকারীর আসনে বসিয়া দোর্দণ্ডপ্রতাপে বনগ্রাম শাসন করিতেছিল।"

---

(১) সম্ভবত ইঁহার সম্বন্ধেই ডা. সুকুমার সেন লিখিয়াছেন (মধ্য যুগের বাংলা ও বাঙালী—পৃ. ১৪), "হোসেন সাহের এক সেনাপতি (লস্কর) রামচন্দ্র-খান ছিলেন কায়স্থ। ইনি রাজ্যের দক্ষিণ অংশের অধিকারী ছিলেন।" (২) দ্র.—হরিদাস (৩) দ্র.—নিত্যানন্দ

রাজ-অধিকারী

মহাপ্রভু নীলাচল হইতে গৌড়ে প্রত্যাবর্তনকালে যখন উড়িষ্যা-রাজ্যের প্রান্তদেশে আসিয়া উপস্থিত হন, তখন সেইস্থানের রাজ-অধিকারী আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হন। তিনি মহাপ্রভুর সহিত কিছুকাল অবস্থানের পর তাঁহাকে জানান[১] যে অদূরেই

মন্তপ যবন রাজের আগে অধিকার।
তার ভয়ে কেহো পথে নারে চলিবার॥
পিচ্ছলদা পর্যন্ত তার সব অধিকার।
তার ভয়ে নদী কেহ হৈতে নারে পার॥
দিন কত রহ সন্ধি করি তার সনে।
সুখেতে নৌকায় তোমা করাব গমনে॥

তারপর সেইস্থলে যবনরাজের একজন উড়িষ্যাগত চর মহাপ্রভুর 'অদ্ভুত চরিত্র' প্রত্যক্ষ করেন। তিনি ফিরিয়া গিয়া যবনের নিকট 'সিদ্ধপুরুষ' চৈতন্যের কৃষ্ণ-কীর্তন ও তাঁহার জনপ্রিয়তাদির সম্বন্ধে বলিলে যবনরাজ তাঁহার বিশ্বাসকে পাঠাইয়া দেন। বিশ্বাস আসিয়া মহাপ্রভুর আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইলে ম্লেচ্ছ 'যবনাধিকারী' প্রভু-সন্দর্শনে গমন করেন এবং মহাপ্রভুর দ্বারা প্রভাবিত হওয়ায় তাঁহার জীবনের পরিবর্তন ঘটে। সেইস্থলে মহাপ্রভুর সঙ্গী মুকুন্দ-দত্ত উপস্থিত ছিলেন। তিনি জানাইলেন যে মহাপ্রভু গঙ্গাতীরে গমন করিবেন, সুতরাং যবনরাজ যদি দয়া করিয়া সুব্যবস্থা করিয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহারা যথেষ্ট উপকৃত হইবেন। রাজা নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করিয়া মহাপাত্রকে নির্দেশ দিলে মহাপাত্র বহু দ্রব্য-সমগ্রী উপহার প্রদান করিলেন এবং মুকুন্দাদির সহিত তাঁহাদের মধুর-মিলন সংঘটিত হইল। পরদিন রাজা বিশ্বাসকে পাঠাইয়া সকল বন্দোবস্ত করিয়া দিলে মহাপ্রভু এক 'নবীন নৌকার মধ্যে' সগণে চড়িয়া যাত্রা আরম্ভ করিলেন। যবন আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম জানাইয়া গেলে তিনি মহাপাত্রকেও বিদায় দিয়া অগ্রসর হইলেন। জলদস্যুর ভয় নিবারণার্থ একজন যবন 'দশ নৌকা ভরি বহু সৈন্য সঙ্গে লৈয়া' পিচ্ছলদা পর্যন্ত মহাপ্রভুকে অগ্রসর করিয়া দিলেন।

(১) চৈ.চ.—২।১৬, পৃ. ১৮৯-৯০

হোসেন-শাহ্

১৯৪৮ খ্রী.-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত The History of Bengal নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে স্যার যদুনাথ সরকার মহাশয় অন্য প্রমাণের সহিত ১৪৯৩ খ্রী.-এর একটি স্বর্ণমুদ্রার ও ১৪৯৪খ্রী.-এর মান্দারণ-অনুশাসনের প্রমাণবলে লিখিয়াছেন যে যতদূর মনে হয়, হোসেন-শাহ্ ১৪৯৩ খ্রী.-এ সিংহাসনে আরোহণ করেন। আবার ১৮৭২ খ্রী.-এর Journal of the Asiatic Society of Bengal-এর 'On a New King of Bengal' ইত্যাদি প্রবন্ধে ব্লকম্যান সাহেব ফিরিস্তার প্রমাণ বলে জানাইয়াছিলেন যে হোসেন-শাহ্ ২৭ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। Riyazu-s-Salatin- মতে (pp, 133, 134), "Sultan Husain Shah, in the year 927 A.H. (=1520 A. D.), died a natural death. His reign lasted for 27 years, and according to some, 24 years,······and according to others 29 years and 5 months." কিন্তু রাখালদাস-বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার 'বাংলার ইতিহাস'-গ্রন্থে (২য়. ভাগ, পৃ. ২৬৪-৬৫) লিখিয়াছেন, "৯২৫ হিজরায় মুদ্রিত হোসেন-শাহের পুত্র নাসিরউদ্দীন-নস্‌রৎ নামাঙ্কিত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, সুতরাং উক্ত বর্ষেই (১৫১৯ খৃষ্টাব্দে) হোসেন শাহের মৃত্যু হইয়াছিল।" স্যার যদুনাথও ১৪৯৩ খ্রী. হইতে ১৫১৯ খ্রী. পর্যন্ত কালকে হোসেন-শাহের রাজত্বকাল বলিয়া নির্দেশিত করিয়াছেন। মজুমদার-রায়চৌধুরী-দত্ত প্রণীত An Advanced History of India-তে হোসেন-শাহের রাজ্যপ্রাপ্তি ও মৃত্যুকাল যথাক্রমে ১৫৯৩ খ্রী. ও ১৫১৮ খ্রী. বলিয়া লিখিত হইয়াছে। বৈষ্ণবগ্রন্থগুলিতেও হোসেন-শাহ্ সম্বন্ধে যাহা জানা যাইতেছে তাহাও উপরোক্ত রাজ্যকালের সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। অবশ্য সেই সকল গ্রন্থে বৈষ্ণবভক্তবৃন্দের জীবনী পর্যালোচনা-প্রসঙ্গে হোসেন-শাহের বিবরণ লিপিবদ্ধ হওয়ায় তাঁহার সম্বন্ধে বিবৃত প্রতিটি ঘটনাই যে ঐতিহাসিক তাৎপর্যে মণ্ডিত, তাহা জোর করিয়া বলা চলে না। তৎসত্ত্বেও প্রাচীন বৈষ্ণবগ্রন্থগুলি হইতে বঙ্গের সুলতান হোসেন-শাহ্ সম্বন্ধে যাহা জানিতে পারা যায় তাহা সামান্য হইলেও অকিঞ্চিৎকর নহে।

'সৈয়দ হুঁসেন খাঁ' গৌড়ের সুলতান হইবার পূর্বে সুবুদ্ধি-রায়[১] গৌড়াধিকারী ছিলেন। হুঁসেন-খাঁ তাঁহার অধীনেই চাকরী করিতেন। একদিন

দীঘি দেখাইতে তার মনসীব কৈল।
ছিদ্র পাঞা রায় তারে চাবুক মারিল।

---

(১) চৈ. চ.—২।২৫, পৃ. ২৭৬ ; সুবুদ্ধি-রায়ের জীবনীতে এই সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা দ্রষ্টব্য।

কিন্তু হোসেন-শাহ্ সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। পরে রাজা হইয়াও তিনি সুবুদ্ধি-রায়ের মান রক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রী পতির পৃষ্ঠদেশে চাবুকের দাগ দেখিয়া সকল বিষয় অবগত হইয়া সুবুদ্ধিকেও প্রহার করিতে অনুরোধ করিলে

রাজা কহে আমার পোষ্টা রায় হয় পিতা।
তাহাকে মারিব আমি ভাল নহে কথা॥

কিন্তু সুবুদ্ধির জাতি নষ্ট করিয়া দিবার জন্য স্ত্রীর দ্বারা সবিশেষ অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি শেষ পর্যন্ত সুবুদ্ধির মুখে 'করোয়ার পানি' দেওয়াইলে সুবুদ্ধি-রায় দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করেন।

রাজা হওয়ার পর হোসেন-শাহের প্রভাব বাড়িতে থাকে। ক্রমে তিনি উড়িষ্যারাজের সহিত বিবাদলিপ্ত হন। ১৫১০ খ্রী.-এর প্রথমদিকে চৈতন্য যখন নীলাচলের পথে যাত্রা করেন, তখন উড়িষ্যাধিপতির সহিত গৌড়েশ্বরের যথেষ্ট বিবাদ চলিতে থাকায় উভয় দেশের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহাদি চলিতেছিল।[২] যবন-রাজা হোসেন-শাহের তখন বিপুল প্রতিপত্তি। তাঁহার সৈন্যেরা উড়িষ্যা বা ওড্রদেশের শত শত দেউল ও দেবালয় ভাঙিয়া তাহাদের প্রতিমাগুলিও বিনষ্ট করিয়া ফেলেন।[৩] কিন্তু রাজ্যগত বিবাদ-বিসংবাদ যাহাই চলুক না কেন, রাজা ছিলেন সজ্জন ব্যক্তি। মুসলমান রাজা হইয়াও হিন্দু প্রজাদিগের সহিত তাঁহার ব্যবহার কটু ছিল না। রাজধানী ছিল গৌড়ে, সুতরাং হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে গৌড়বাসিমাত্রই যে তাঁহার প্রজা, এবং তাঁহাদের প্রতি ব্যবহারও যে সমদৃষ্টিসম্পন্ন হওয়া উচিত, এ বোধ তাঁহার ছিল। তাই দেখা যায় প্রকৃত যোগ্যব্যক্তি তাঁহার সভায় সমাদৃত হইতেন।

গৌড়-সন্নিকটস্থ রামকেলি তখন একটি অতি সমৃদ্ধ ও বর্ধিষ্ণু গ্রাম। রাজা শুনিলেন যে সেই গ্রামের রত্ন-স্বরূপ সনাতন এবং রূপ নামে[৪] দুই ভ্রাতা বিদ্যাশিক্ষা করিয়া প্রচুর পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছেন। তাঁহারা যে সকল দিক দিয়াই রাজপণ্ডিত হইবার যোগ্যব্যক্তি তাহা বুঝিয়া হোসেন-শাহ্ তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়া মন্ত্রিত্বের পদ দান করিয়াছিলেন। সনাতন হইলেন 'সাকর মল্লিক' এবং রূপ হইলেন 'দবিরখাস'। সম্ভবত ইহারও পূর্বে ১৪৯৩ খ্রী.-এ যখন হোসেন-শাহ্ রাজপদ প্রাপ্ত হন, তৎকালীন কোনও সময় হইতেই শ্রীখণ্ডস্থ মুকুন্দ-সরকারও তাঁহার দরবারে রাজবৈদ্য-হিসাবে নিযুক্ত হন। মুকুন্দ রাজকার্য ছাড়িয়া দিলে তৎস্থলে অন্যান্য বৈদ্যও নিযুক্ত হইয়াছিলেন।[৫] আবার 'সঙ্গীতমাধবনাটকে' লিখিত হইয়াছে[৬] যে চিরঞ্জীব-সেনও গৌড়রাজের শ্রেষ্ঠ অমাত্য ছিলেন। ইহাছাড়াও

(২) চৈ. ভা.—৩।২, পৃ. ২৫৪ ; চৈ. না.—৬।১৪ (৩) চৈ. ভা.—৩।৪, পৃ.২৮৪ (৪) তখন ইঁহাদের অন্য নাম ছিল। *এই নাম দুইটি পরবর্তিকালে মহাপ্রভু-প্রদত্ত। (৫) চৈ. চ.—২।১৮, পৃ. ২০৭ (৬) ভ. র.—১।২৭০

কেশব-বসু (-খাঁ,-ছত্রী), সূর্যদাস-সরখেল প্রভৃতির মত হিন্দু গুণী ব্যক্তিরাও রাজদরবারে নিযুক্ত হইয়া রাজসভা অলংকৃত করিয়াছিলেন।[৭] 'চৈতন্যচরিতামৃত' হইতে জানা যায় যে আরও অনেক কায়স্থ কর্মচারী রাকজার্যে নিযুক্ত ছিলেন[৮] এবং রূপ-সনাতন ছাড়া অন্যান্য ব্রাহ্মণও রাজবাটিতে কাজ পাইয়াছিলেন। গোপাল-চক্রবর্তী নামক এক ব্যক্তি 'গৌড়ে রহে পাদ্‌শাহা আগে আরিন্দাগিরী করে।'[৯] গ্রন্থকার-গণ রাজাকে 'মহাবিদগ্ধ' বলিয়াছেন। ইতিহাসও তাহার সমর্থন করে। কিন্তু সমদর্শী ও বিচক্ষণ রাজা হোসেন-শাহ্ যে তাঁহার যোগ্য সভাসদ্‌দিগকে প্রভূত সম্মান দান করিয়া যথেষ্ট দূরদর্শিতার প্রমাণ দিয়াছিলেন, বৈষ্ণবগ্রন্থগুলি হইতে তাহা বিশেষভাবেই উপলব্ধ হইয়া থাকে।

মহাপ্রভু যখন দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ শেষ করিয়া নীলাচলে ফিরিয়া আসেন, তখন গৌড় ও উড়িষ্যার মধ্যে রাজ্য লইয়া আর বিবাদ নাই।[১০] তাহারও দুই বৎসর পরে মহাপ্রভু গৌড় সন্নিকটে পৌঁছাইলে রাজ-কতোয়াল রাজাকে জানাইলেন যে অসংখ্য ভক্তসমভি-ব্যহারে এক সন্ন্যাসী রামকেলি-গ্রামে আসিয়া হরি-সংকীর্তন ধ্বনিতে সমস্ত গ্রামকেই মাতাইয়া তুলিয়াছেন।[১১] রাজা তখন কেশব-বসু[১২] নামক সভাসদের নিকট প্রকৃত সংবাদ জানিতে চাহিলে কেশব যবন-রাজাকে ঠিক বিশ্বাস করিতে না পারিয়া চৈতন্যকে এক তীর্থযাত্রী বৃক্ষতলবাসী সন্ন্যাসী-মাত্র বলিয়া বিষয়টিকে লঘু করিয়া দিলেন।[১৩] কিন্তু চৈতন্য-মহিমার কথা তখন পরিব্যাপ্ত হওয়ায় রাজার মনে সন্দেহ জন্মাইয়াছিল। তিনি স্বীয় 'দবীরখাস'কে, ডাকিয়া বিশেষভাবে জিজ্ঞাসা করিলে সনাতন-ভ্রাতা রূপ সেই সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিয়া রাজাকেই আপনার মনের নিকট সন্ধান করিতে বলিলেন। বিদগ্ধ-রাজা হিন্দু-সন্ন্যাসীর মাহাত্ম্য স্বীকার করিয়া চৈতন্য-মহিমার কথা ঘোষণা করিলেন।

কিন্তু এতৎসত্ত্বেও দেখিতে পাওয়া যায় যে হিন্দু দেশবাসী- বা কর্মচারী-বৃন্দ যেন যবন-রাজার উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই। দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার Chaitanya and His Age নামক গ্রন্থে (p. 55) লিখিয়াছেন, "It seems that after having committed all kinds of atrocities upon his peaceful Hindu subjects at Nadia, a spirit of commiseration and repentance came upon Hussain Shah." সম্ভবত হোসেন-শাহের পূর্বকৃত কার্যাদির জন্যই প্রথমে তিনি হিন্দু দেশবাসীর অনাস্থার কারণ হইয়াছিলেন। শ্রীবাস-পণ্ডিতকে পাষণ্ডী-বৃন্দ যবন-রাজের ভয় দেখাইলে তিনি বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে যবন-রাজা তাঁহাদিগকে ধরিয়া

(৭) সনাতন, রূপ, সূর্যদাস সরখেল, মুকুন্দ-সরকার ও কেশব-বসুর জীবনী দ্রষ্টব্য (৮) চৈ.চ.—২।১৯, পৃ. ২০৬(৯) চৈ.চ.—৩।৩, পৃ. ৩০১ (১০) চৈ. না.—৮।২৯ (১১) চৈ. ভা.—৩।৪, পৃ. ২৮৩ ; চৈ. ম. (জ.) —বি. খ., পৃ. ১৪১ (১২) চৈ. না.—৯।৩৪ (১৩) চৈ.চ.—২।১, পৃ. ৮৬ ; চৈ. ভা.—৩।৪, পৃ. ২৮৩-৮৪

লইয়া যাইবেন।[১৪] আবার পূর্বেই দেখিয়াছি যে কেশব-ছত্রী হোসেন-শাহ্‌কে ঠিক বিশ্বাস করিতে পারেন নাই এবং রূপও যেন একটু সংকোচের সহিত রাজার সম্মুখে চৈতন্য-মহিমার কথা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। স্বয়ং সনাতনও মহাপ্রভুকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন[১৫] :

যদ্যপি তোমারে ভক্তি করে গৌড়রাজ।
তথাপি যবন জাতি না করি প্রতীতি।

পিরল্যাবাসী-গণের উস্কানীর ফলে হোসেন-শাহের নদীয়া উচ্ছন্ন করিবার অভিপ্রায় সম্বন্ধে জয়ানন্দের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃতি দিয়া প্রমথ চৌধুরী মহাশয় তাঁহার 'প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান' নামক গ্রন্থে (পৃ. ৮) লিখিয়াছিলেন, "সুতরাং হুসেনশা কর্তৃক নবদ্বীপে ব্রাহ্মণদের উপর অত্যাচারের কারণ political, religious নয়।" কিন্তু চৌধুরী মহাশয়ের এই উক্তি পূর্ণ সত্য কিনা জোর করিয়া বলা চলে না। হোসেন-শাহে্‌র পূর্ববর্তী সুলতানবৃন্দের আচরণ, হোসেন-শাহের অধীনস্থ অন্যান্য আঞ্চলিক মুসলমান-শাসকদিগের অত্যাচার, নবদ্বীপবাসীদিগের প্রতি হোসেন-শাহেরই অত্যাচার, এবং সুবুদ্ধি-রায়ের প্রতি হোসেন-শাহের ব্যবহার ও তাঁহার উড়িষ্যা-আক্রমণকালে হিন্দু-মন্দির ও দেবদেবীর প্রতিমা ধ্বংস-সাধন,—এই সমস্তই যে ধর্মভীরু হিন্দুদিগের মনে কিছুটা অবিশ্বাস সৃষ্টি করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ থাকে না।

যাহাহউক, মহাপ্রভু নীলাচলে চলিয়া গেলে রূপ যখন রাজকার্য ছাড়িয়া পথে নামিয়া পড়েন তখন রাজা-হোসেন-শাহের দক্ষিণ হস্তখানি যেন ভাঙিয়া যায়। তাহার উপর সনাতনও উদাসীন হইয়া পড়িলেন। রাজার পক্ষে রাজকার্য পরিচালনা করা একপ্রকার অসম্ভব হইল। তিনি সনাতনের অব্যবস্থিত চিত্তের কথা শুনিয়া বৈদ্যের ব্যবস্থা করিলেন।[১৬] কিন্তু কিছুই হইল না। রাজা একদিন জিজ্ঞাসা করিলে সনাতন স্পষ্টই জানাইয়া দিলেন যে আর তাঁহার পক্ষে রাজকার্য করা সম্ভবপর নহে। তিনিও চৈতন্য-চরণ দর্শনে যাইবেন। রাজা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া মারিতে গেলে সনাতন রাজাকেও তাঁহার সঙ্গে যাইতে অনুরোধ জানাইলেন। রাজা তখন বুঝিলেন যে যে-শক্তি সনাতনকে এমন অকুতোভয় করিয়াছে, তাঁহার সে শক্তি নাই। তিনি অত্যন্ত বিচলিত হইলেন এবং সনাতনকে বন্দী-শালায় এক কর্মচারীর অধীনে নজর-বন্দী রাখিয়া সম্ভবত যুদ্ধার্থই দক্ষিণাভিমুখে[১৭] রওনা হইয়া গেলেন।

এই ঘটনার পর কোনও বৈষ্ণবগ্রন্থে হোসেন-শাহ্ সম্বন্ধে আর কোনও বিবরণ রক্ষিত হয় নাই।

---

(১৪) চৈ. ভা.—২।২, পৃ. ১১ (১৫) চৈ. চ.—২।১, পৃ. ৮৭ (১৬) চৈ. চ.—২।১৯, পৃ. ২০৭ (১৭) চৈ.চ.—২।২০, পৃ. ২১৬ ; ভ. মা.—পৃ. ১১ ; কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়-রক্ষিত 'সূচক' নামক একটি পুথি হইতে জানা যায় যে হোসেন শাহ্ 'উড়িষ্যায় করিল গমন'।

তৃতীয় পর্যায়

বৃন্দাবনদাস

কবি বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের জন্মবৃত্তান্ত রহস্যাবৃত। 'প্রেমবিলাসের' সন্দিগ্ধ ত্রয়োবিংশ-বিলাসে[১] তাঁহার সম্বন্ধে নিম্নোক্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে :—

বৃন্দাবনের মাতা নারায়ণী শ্রীবাসাগ্রজ নলিন-পণ্ডিতের কন্যা। 'মাতাপিতা তার পরলোকে চলি গেলে' এক বৎসরের শিশুকন্যা নারায়ণী শ্রীবাসপত্নীকর্তৃক লালিত পালিত হইতে থাকেন। চতুর্বর্ষ বয়ঃক্রমকালে এই বালিকা গৌরাঙ্গ-আজ্ঞায় কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিয়া তাঁহার পরম স্নেহপাত্রী হইয়া তাঁহার ভুক্তাবশেষ প্রাপ্ত হন। পরে মহাপ্রভু নীলাচলে চলিয়া গেলে শ্রীবাস ও শ্রীরাম কুমারহট্টবাসী হইয়া বিপ্র-বৈকুণ্ঠদাসের হস্তে উক্ত নারায়ণীকে সম্প্রদান করেন। কিন্তু নারায়ণী গর্ভবতী হইলে বৈকুণ্ঠের বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি ঘটে। তখন 'ভ্রাতৃকন্যা গর্ভবতী পতিহীনা দেখি' শ্রীবাস-পণ্ডিত তাঁহাকে স্বীয় গৃহে আনিয়া রাখিলেন এবং যথাকালে নারায়ণীও পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। এই পুত্রই পরে বৃন্দাবনদাস নামে খ্যাত হন।

'পঞ্চ বৎসরের শিশু বৃন্দাবনদাস' মাতামহ-নিবাস মামগাছিতে চলিয়া আসেন। সেইস্থানে

> বাসুদেব দত্ত প্রভুর কৃপার ভাজন।
> মাতামহ বৃন্দাবনের করে ভরণ পোষণ॥
> বাসুদেব দত্তের ঠাকুর বাড়ীতে বাস কৈল।
> নানা শাস্ত্র বৃন্দাবন পড়িতে লাগিল॥

পরবর্তিকালে বৃন্দাবন 'চৈতন্যমঙ্গল' রচনা করেন। এই গ্রন্থটিকে 'ভাগবতের অনুরূপ' দেখিয়া বৃন্দাবনবাসী ভক্তবৃন্দ ইহার নাম 'চৈতন্যভাগবত' রাখেন। চৈতন্য, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতপ্রভুর অন্তর্ধানের পর বৃন্দাবন দেন্দুড়-গ্রামে গিয়া বাস করিতে থাকেন। 'প্রেম-বিলাসের' চতুর্বিংশ বিলাসে বলা হইয়াছে[২] :

> চৌদ্দশত পাঁচানব্বই শকাব্দের যখন।
> শ্রীচৈতন্যভাগবত রচে দাস বৃন্দাবন॥

বৃন্দাবনদাসের জীবন সম্বন্ধে এতদতিরিক্ত বর্ণনা অন্যত্র বড় একটা দেখা যায় না। কিন্তু 'প্রেমবিলাসে'র উক্ত সন্দিগ্ধ বিলাসগুলির সমস্ত তথ্যকেও নির্বিচারে গ্রহণ করিতে পারা

(১) পৃ. ২২২ ; তু.—ঐ.,—পৃ. ২২০ (২) পৃ. ৩০১

যায় না। সকল প্রাচীন গ্রন্থে নারায়ণীকে শ্রীবাসের ভ্রাতুস্পুত্রী বলা হইয়াছে। অথচ, কোথাও শ্রীবাসাগ্রজ নলিন-পণ্ডিতের বা নারায়ণীর পিতৃনামের উল্লেখ নাই। বরং সর্বত্রই শ্রীবাস-পণ্ডিতের চারি-ভ্রাতার উল্লেখ করা হইয়াছে। উক্ত 'প্রেমবিলাসা'নুযায়ী যখন নলিন-পণ্ডিতের বাঁচিয়া থাকার কথা, তখনও চারি-ভ্রাতার কথাই বলা হইয়াছে; পঞ্চভ্রাতার উল্লেখ কোথাও নাই। আশ্চর্যের বিষয়, বৃন্দাবন তাঁহার গ্রন্থে স্বীয় মাতাকে শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা বলিয়া উল্লেখ করিলেও কোথাও সেই শ্রীবাস-ভ্রাতার নামোল্লেখ পর্যন্ত করেন নাই। ডা. বিমানবিহারী মজুমদার বলেন,[৩] "ইহার কারণ এই হইতে পারে যে বিধবার গর্ভে জন্মগ্রহণ করার জন্য বৃন্দাবনদাস ও তাঁহার মাতার সহিত শ্রীবাসের পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ কোন সম্পর্ক স্বীকার করিতেন না।" ডা. মজুমদার অন্যত্র বলিতেছেন, "বৃন্দাবনদাস শ্রীবাসের ভ্রাতুস্পুত্রীর পুত্র। সন্ন্যাস-গ্রহণের এক বৎসর পুর্বে প্রভু যে অপূর্ব প্রেমভক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহার কেন্দ্র ছিল শ্রীবাসের বাড়ী। কিন্তু কবি কোথাও এরূপ ইঙ্গিত করেন নাই যে তিনি শ্রীবাস শ্রীরাম বা নিজের জননী নারায়ণীর নিকট লীলা-কাহিনী শুনিয়াছেন। যদি শ্রীবাসের বাড়ীর লোকে তাঁহাকে দৌহিত্র বলিয়া স্বীকার না করিয়া থাকেন ও কবির বাল্যাবস্থায় নারায়ণীর পরলোকগমন ঘটিয়া থাকে তাহা হইলে এরূপ নীরবতার অর্থ বুঝা যায়।"

বৃন্দাবনের মাতা নারায়ণী যখন চারি বৎসরের শিশুমাত্র ছিলেন, তখন যে তিনি কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিয়া গৌরাঙ্গের কৃপাভাজন হইয়াছিলেন, স্বয়ং বৃন্দাবনদাস তাঁহার 'চৈতন্যভাগবতে' তাহার উল্লেখ করিয়াছেন।[৪] কিন্তু জয়ানন্দ বলিয়াছেন যে শচীদেবীর

> প্রসব সময় জানি আইলা নারায়ণী।......
> নাড়ীচ্ছেদ করি ধাত্রী মাতা কৈল কোলে।
> নারায়ণী ধাত্রীমাতা বৈষ্ণবী সর্বাণী।......ইত্যাদি।

জয়ানন্দ তাঁহার গ্রন্থে যতবার নারায়ণীর উল্লেখ করিয়াছেন প্রায় ততবারই তাঁহাকে গৌরাঙ্গের ধাত্রী-মাতারূপে আখ্যাত করিয়াছেন।[৫] বৃন্দাবনের মাতা নারায়ণী সম্বন্ধে জয়ানন্দের এইসমস্ত উক্তি সত্য হইলে 'চৈতন্যভাগবত' ও 'প্রেমবিলাসো'ক্ত চতুর্ব্বর্ষবয়স্ক নারায়ণীর পক্ষে গৌরাঙ্গের কীর্তনাসরে উপস্থিতিকে অলীক-কল্পনা বলিয়াই ধরিয়া লইতে হয়। এক্ষেত্রে প্রকৃত-সত্য উদ্‌ঘাটন করা একপ্রকার অসম্ভব হইয়া উঠে।

আবার বিপ্র-বৈকুণ্ঠদাসের উল্লেখও 'প্রেমবিলাস' ছাড়া অন্য কোথাও নাই। বৃন্দাবন

---

(৩) চৈ. উ.—পৃ. ১৭৭, ১৯২ (৪) ২।১০, পৃ. ১৬০; একমাত্র ভক্তিরত্নাকরে (১২।২৪০০-১) ইহার সমর্থন আছে। (৫) ন. খ., পৃ. ১৪,২৩; স. খ., পৃ. ৮৮; তু.—ন. খ. পৃ. ২০

বহুস্থলে তাঁহার মাতার নাম উল্লেখ করিলেও একবারও পিতৃনাম উচ্চারণ করেন নাই। তিনি স্বীয় মাতার সম্বন্ধে বলিয়াছেন,[৬] গৌরাঙ্গ

আপন গলার মালা দিলা সভাকারে।
চর্বিত তাম্বূল আজ্ঞা হইল সভারে ॥......
ভোজনের অবশেষ যতেক আছিল।
নারায়ণী পুণ্যবতী তাহা সে পাইল ॥
শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা বালিকা অজ্ঞান।
তাহারে ভোজন শেষ প্রভু করে দান ॥......
অদ্যাপিহ বৈষ্ণব মণ্ডলে যার ধ্বনি।
গৌরাঙ্গের অবশেষ পাত্র নারায়ণী ॥

নারায়ণী যে গৌরাঙ্গের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়াছিলেন বৃন্দাবন অন্যত্রও তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। 'চৈতন্যচরিতামৃত'-কারও বলিয়াছেন[৭] যে গৌরাঙ্গপ্রভু 'উচ্ছিষ্ট দিয়া নারায়ণীর করিল সম্মান।' 'গৌরগণোদ্দেশ' নামক একটি পুথিতে বলা হইয়াছে[৮] :

শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা নাম নারায়ণী ॥
চৈতন্যের তাম্বূল চিবা করিতেন ভক্ষণে।

মুরারি-গুপ্ত প্রভৃতি অন্যান্য গ্রন্থকারও নারায়ণীর এই গৌরাঙ্গপ্রসাদ-প্রাপ্তির উল্লেখ করিয়াছেন।[৯] বহুস্থলেই বহুভক্ত গৌরাঙ্গের প্রসাদ-শেষ ভক্ষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু গ্রন্থকার-গণ এতৎসম্পর্কে নারায়ণীর নামই বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে নারায়ণীর এই প্রসাদগ্রহণ-ব্যাপারটি তাৎপর্যবোধক হইয়া উঠে। উদ্ধবদাস বলিতেছেন[১০] :

প্রভুর চর্বিত পান স্নেহবেশে কৈলা দান
নারায়ণী ঠাকুরাণী হাতে।
শৈশব-বিধবা ধনী সাধ্বী সতী-শিরোমণি,
সেবন করিল সে চর্বিতে ॥
প্রভু শক্তি সঞ্চারিলা বালিকা গর্ভিণা হৈলা
লোক মাঝে কলঙ্ক নহিল।
দশমাস পূর্ণ যবে মাতৃ গর্ভ হৈতে তবে
সুন্দর তনয় এক হৈল ॥

কবি বলিতেছেন যে সেই তনয়ই বৃন্দাবনদাস। শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় লিখিয়াছেন,[১১] "নিত্যানন্দের আশীর্বাদ ও মহাপ্রভুর শক্তিসঞ্চারকে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য, বৃন্দাবনদাসকে

(৬) চৈ. ভা.—২।১০, পৃ. ১৬০ (৭) ১।১৭, পৃ. ৭৬ (৮) গৌ. গ. (কৃষ্ণদাস)—পৃ. ২ (৯) শ্রীচৈ.চ. —২।৭।২৬ ; বৈ. ব. (বৃ.)—পৃ. ১ ; গৌ. দী.—পৃ. ৪৩ (১০) গৌ. ত.—পৃ. ৩০৪-৫ (১১) প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য—৫ম. ও ৬ষ্ঠ. খণ্ড, পৃ. ৮৮

প্রভুর মানস পুত্র বানাইবার জন্য বৈষ্ণবভক্তেরা প্রেমবিলাসের কথা উড়াইয়া দিয়া উদ্ধবদাসের পদসাক্ষ্যকেই প্রাধান্য দিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।"

উদ্ধবদাসের উপরোক্ত উল্লেখ হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে বৃন্দাবনের জন্ম-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে তৎকালে উপরোক্ত কিংবদন্তি সুপ্রসিদ্ধ হইয়াছিল। অপর পক্ষে, বৃন্দাবনের জন্ম-বৃত্তান্ত এবং তাঁহার 'চৈতন্যমঙ্গল'-গ্রন্থের নাম পরিবর্তনের ইতিহাস-সম্পর্কে লোচনের সহিত তাঁহার সংযোগ-স্থাপন সম্বন্ধে আরও নানাবিধ কিংবদন্তি প্রচলিত হইয়াছিল। ৪০০ চৈতন্যাব্দের 'সজ্জনতোষণী'-পত্রিকার দ্বিতীয় খণ্ডে অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী ভট্টাচার্য মহাশয় সেই সমস্ত কিংবদন্তির বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু সে-সকল প্রবাদমাত্র। যাহাহউক, স্বয়ং বৃন্দাবন তাঁহার 'চৈতন্যভাগবতে'র সর্বত্রই স্বীয় মাতৃপরিচয় দিতে গিয়া বলিয়াছেন যে 'গৌরাঙ্গের অবশেষ পাত্র নারায়ণী'[১২] এবং কৃষ্ণদাস-কবিরাজও বলিয়াছেন :[১৩]

নারায়ণী চৈতন্যের উচ্ছিষ্টভাজন।
তাঁর গর্ভে জন্মিলা শ্রীদাস বৃন্দাবন ॥

এই সমস্ত হইতে প্রমাণিত হয় যে গৌরাঙ্গোচ্ছিষ্ট প্রসাদই যে নারায়ণীর পুত্রবতী হওয়ার কারণ, তাহাই পরবর্তিকালের বৈষ্ণব-সমাজ অবধারিত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং তথাকথিত 'প্রেমবিলাসো'ক্ত বৈকুণ্ঠদাসকে স্বীকার করা যাউক বা না যাউক, তাঁহাকে বৃন্দাবনের পিতৃগৌরব দেওয়া চলে না। আধুনিককালে, 'বৈষ্ণবদিগ্‌দর্শনী'র লেখক বৈকুণ্ঠদাসকে বাদ দিয়াই সকল দিকের সামঞ্জস্য কল্পনা করিয়াছেন। তিনি জানাইতেছেন,[১৪] "শ্রীবাস অতি অল্প বয়সেই নারায়ণীর বিবাহ দেন এবং বিবাহের অল্প পরেই তিনি বিধবা হন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীবাসালয়ে অবস্থিতিকালে নারায়ণীকে বিধবা না জানিয়া 'পুত্রবতী হও' বলিয়া আশীর্বাদ করেন। নিত্যানন্দের ব্যাসপূজার নৈবেদ্যের মহাপ্রভুর ভুক্তাবশেষ ভোজনে নারায়ণীর গর্ভসঞ্চার হয়। শ্রীবাসের কুমারহট্টালয়ে বৃন্দাবনঠাকুরের জন্ম হইলে, লোকনিন্দায় উৎপীড়িত হইয়া, নারায়ণী এক বৎসরের শিশু লইয়া, নবদ্বীপ-সন্নিকটে মামগাছিগ্রামে শ্রীবাসুদেবদত্ত ঠাকুরের বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই ঠাকুরবাটী পরে নারায়ণীর পাট বলিয়া বিখ্যাত হয়।"

শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় বলেন,[১৫] "কথিত আছে—৯।১০ বৎসর বয়সের সময়ই বৃন্দাবনের মাতা বিধবা।......নিত্যানন্দ ৯।১০ বছরের কন্যাকে পুত্রবতী হও বলিয়া কেন আশীর্বাদ করিবেন ? যুবতী কন্যাকেই এই আশীর্বাদ করা চলে।" কিন্তু এই প্রশ্ন সম্ভবত

(১২) ১।১, পৃ. ৭ ; ২।২, পৃ. ১১৩ ; ২।১০, পৃ. ১৬০, ৩।৬, পৃ. ৩১৭ (১৩) চৈ.চ.—১।৮, পৃ.৪৭ (১৪) পৃ. ৪৩ (১৫) প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য—৫ম. ও ৬ষ্ঠ. খণ্ড., পৃ. ৮৬

বহুস্থলে তাঁহার মাতার নাম উল্লেখ করিলেও একবারও পিতৃনাম উচ্চারণ করেন নাই। তিনি স্বীয় মাতার সম্বন্ধে বলিয়াছেন,[৬] গৌরাঙ্গ

আপন গলার মালা দিলা সভাকারে।
চর্বিত তাম্বূল আজ্ঞা হইল সভারে ॥……
ভোজনের অবশেষ যতেক আছিল।
নারায়ণী পুণ্যবতী তাহা সে পাইল ॥
শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা বালিকা অজ্ঞান।
তাহারে ভোজন শেষ প্রভু করে দান ॥……
অদ্যাপিহ বৈষ্ণব মণ্ডলে যার ধ্বনি।
গৌরাঙ্গের অবশেষ পাত্র নারায়ণী ॥

নারায়ণী যে গৌরাঙ্গের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়াছিলেন বৃন্দাবন অন্যত্রও তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। 'চৈতন্যচরিতামৃত'-কারও বলিয়াছেন[৭] যে গৌরাঙ্গপ্রভু 'উচ্ছিষ্ট দিয়া নারায়ণীর করিল সম্মান।' 'গৌরগণোদ্দেশ' নামক একটি পুথিতে বলা হইয়াছে[৮] :

শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা নাম নারায়ণী ॥
চৈতন্যের তাম্বূল চিবা করিতেন ভক্ষণে।

মুরারি-গুপ্ত প্রভৃতি অন্যান্য গ্রন্থকারও নারায়ণীর এই গৌরাঙ্গপ্রসাদ-প্রাপ্তির উল্লেখ করিয়াছেন।[৯] বহুস্থলেই বহুভক্ত গৌরাঙ্গের প্রসাদ-শেষ ভক্ষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু গ্রন্থকার-গণ এতৎসম্পর্কে নারায়ণীর নামই বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে নারায়ণীর এই প্রসাদগ্রহণ-ব্যাপারটি তাৎপর্যবোধক হইয়া উঠে। উদ্ধবদাস বলিতেছেন[১০] :

প্রভুর চর্বিত পান স্নেহবেশে কৈলা দান
নারায়ণী ঠাকুরাণী হাতে।
শৈশব-বিধবা ধনী সাধ্বী সতী-শিরোমণি,
সেবন করিল সে চর্বিতে ॥
প্রভু শক্তি সঞ্চারিলা বালিকা গর্ভিণা হৈলা
লোক মাঝে কলঙ্ক নহিল।
দশমাস পূর্ণ যবে মাতৃ গর্ভ হৈতে তবে
সুন্দর তনয় এক হৈল ॥

কবি বলিতেছেন যে সেই তনয়ই বৃন্দাবনদাস। শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় লিখিয়াছেন,[১১] "নিত্যানন্দের আশীর্বাদ ও মহাপ্রভুর শক্তিসঞ্চারকে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য, বৃন্দাবনদাসকে

(৬) চৈ. ভা.—২।১০, পৃ. ১৬০ (৭) ১।১৭, পৃ. ৭৬ (৮) গৌ. গ. (কৃষ্ণদাস)—পৃ. ২ (৯) শ্রীচৈ.চ. —২।৭।২৬; বৈ. ব. (বৃ.)—পৃ. ১; গৌ. দী.—পৃ. ৪৩ (১০) গৌ. ত.—পৃ. ৩০৪-৫ (১১) প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য—৫ম. ও ৬ষ্ঠ. খণ্ড, পৃ. ৮৮

প্রভুর মানস পুত্র বানাইবার জন্য বৈষ্ণবভক্তেরা প্রেমবিলাসের কথা উড়াইয়া দিয়া উদ্ধবদাসের পদসাক্ষ্যকেই প্রাধান্য দিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।"

উদ্ধবদাসের উপরোক্ত উল্লেখ হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে বৃন্দাবনের জন্ম-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে তৎকালে উপরোক্ত কিংবদন্তি সুপ্রসিদ্ধ হইয়াছিল। অপর পক্ষে, বৃন্দাবনের জন্ম-বৃত্তান্ত এবং তাঁহার 'চৈতন্যমঙ্গল'-গ্রন্থের নাম পরিবর্তনের ইতিহাস-সম্পর্কে লোচনের সহিত তাঁহার সংযোগ-স্থাপন সম্বন্ধে আরও নানাবিধ কিংবদন্তি প্রচলিত হইয়াছিল। ৪০০ চৈতন্যাব্দের 'সজ্জনতোষণী'-পত্রিকার দ্বিতীয় খণ্ডে অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী ভট্টাচার্য মহাশয় সেই সমস্ত কিংবদন্তির বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু সে-সকল প্রবাদমাত্র। যাহাহউক, স্বয়ং বৃন্দাবন তাঁহার 'চৈতন্যভাগবতে'র সর্বত্রই স্বীয় মাতৃপরিচয় দিতে গিয়া বলিয়াছেন যে 'গৌরাঙ্গের অবশেষ পাত্র নারায়ণী'[১২] এবং কৃষ্ণদাস-কবিরাজও বলিয়াছেন :[১৩]

নারায়ণী চৈতন্যের উচ্ছিষ্টভাজন।
তাঁর গর্ভে জন্মিলা শ্রীদাস বৃন্দাবন ॥

এই সমস্ত হইতে প্রমাণিত হয় যে গৌরাঙ্গোচ্ছিষ্ট প্রসাদই যে নারায়ণীর পুত্রবতী হওয়ার কারণ, তাহাই পরবর্তিকালের বৈষ্ণব-সমাজ অবধারিত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং তথাকথিত 'প্রেমবিলাসো'ক্ত বৈকুণ্ঠদাসকে স্বীকার করা যাউক বা না যাউক, তাঁহাকে বৃন্দাবনের পিতৃগৌরব দেওয়া চলে না। আধুনিককালে, 'বৈষ্ণবদিগ্‌দর্শনী'র লেখক বৈকুণ্ঠদাসকে বাদ দিয়াই সকল দিকের সামঞ্জস্য কল্পনা করিয়াছেন। তিনি জানাইতেছেন,[১৪] "শ্রীবাস অতি অল্প বয়সেই নারায়ণীর বিবাহ দেন এবং বিবাহের অল্প পরেই তিনি বিধবা হন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীবাসালয়ে অবস্থিতিকালে নারায়ণীকে বিধবা না জানিয়া 'পুত্রবতী হও' বলিয়া আশীর্বাদ করেন। নিত্যানন্দের ব্যাসপূজার নৈবেদ্যের মহাপ্রভুর ভুক্তাবশেষ ভোজনে নারায়ণীর গর্ভসঞ্চার হয়। শ্রীবাসের কুমারহট্টালয়ে বৃন্দাবনঠাকুরের জন্ম হইলে, লোকনিন্দায় উৎপীড়িত হইয়া, নারায়ণী এক বৎসরের শিশু লইয়া, নবদ্বীপ-সন্নিকটে মামগাছিগ্রামে শ্রীবাসুদেবদত্ত ঠাকুরের বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই ঠাকুরবাটী পরে নারায়ণীর পাট বলিয়া বিখ্যাত হয়।"

শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় বলেন,[১৫] "কথিত আছে—৯।১০ বৎসর বয়সের সময়ই বৃন্দাবনের মাতা বিধবা।......নিত্যানন্দ ৯।১০ বছরের কন্যাকে পুত্রবতী হও বলিয়া কেন আশীর্বাদ করিবেন? যুবতী কন্যাকেই এই আশীর্বাদ করা চলে।" কিন্তু এই প্রশ্ন সম্ভবত

(১২) ১।১, পৃ. ৭ ; ২।২, পৃ. ১১৩ ; ২।১০, পৃ. ১৬০, ৩।৬, পৃ. ৩১৭ (১৩) চৈ.চ.—১।৮, পৃ.৪৭ (১৪) পৃ. ৪৩ (১৫) প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য—৫ম. ও ৬ষ্ঠ. খণ্ড., পৃ. ৮৬

পরবর্তিকালের এবং এই সমস্তাও অসমাধেয়। 'প্রেমবিলাসে'র একটি বিবরণ অবশ্য গ্রহীতব্য হইতে পারে। লেখক বলিতেছেন যে বৃন্দাবনের 'চৈতন্যমঙ্গল'-গ্রন্থটিকে 'ভাগবতে'র অনুরূপ দেখিয়া বৃন্দাবনবাসী ভক্তবৃন্দ তাহার নাম পরিবর্তিত করিয়া 'চৈতন্য-ভাগবত' রাখেন। প্রকৃতপক্ষে কবিকর্ণপূর এবং কৃষ্ণদাস-কবিরাজ উভয়েই 'চৈতন্যমঙ্গল' রচনার জন্য বৃন্দাবনকে ব্যাসদেব বলিয়াছেন[১৬] এবং 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র লেখক তাঁহার-গ্রন্থে শেষ পর্যন্তই বৃন্দাবনের 'চৈতন্যমঙ্গলের' নামোল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে কবিরাজ-গোস্বামীর গ্রন্থরচনা-সমাপ্তিকালেও বৃন্দাবনের গ্রন্থের নাম পরিবর্তিত হয় নাই। স্বীয় গ্রন্থ রচনার এতকাল পরে যে স্বয়ং বৃন্দাবনই তাঁহার গ্রন্থের নাম পরিবর্তন করিবেন বা করিতে পারেন, তাহা বিশ্বাস্য নহে।

'চৈতন্যভাগবত' রচনার কাল সম্বন্ধে কোনও সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার 'বাংলা ভাষা ও বাংলাসাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব'-গ্রন্থে অনুমান সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, "১৪৭০শকে (খ্রী. ১৫৪৮ অব্দে) বৃন্দাবনের গ্রন্থ চৈতন্যমঙ্গল রচিত হইয়া থাকিবে।" অবশ্য তাঁহার যুক্তি অনুযায়ী গ্রন্থ-রচনাকাল ১৫৪৮ খ্রী.-এর পূর্বে হইতে পারে না। ডা. সুশীলকুমার দে ও ডা. বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয়দ্বয় মোটামুটি এই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু পূর্ববর্তী আলোচনা প্রভৃতি হইতে এ সম্বন্ধে সঠিক ভাবে কেবল এইটুকু বলা চলে যে কবিকর্ণপূরের 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা' ও কৃষ্ণদাস-কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' (ও লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল'[১৭]) রচনার পূর্ববর্তী কোনও সময়ে বৃন্দাবনের 'চৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থ রচিত হইবার পর উক্ত গ্রন্থদ্বয় (এবং 'চৈতন্যমঙ্গল[১৮]'ও) রচনার পরবর্তী কোনও সময়ে কৃষ্ণদাসের সঙ্গী বৃন্দাবন ভক্তবৃন্দই উক্ত গ্রন্থের নাম পরিবর্তন করিয়া থাকিবেন। 'প্রেমবিলাস' হইতেও এই সিদ্ধান্তেরই যথার্থ ব্যাখ্যা মিলিয়া থাকে। 'প্রেমবিলাসে'র উনবিংশ বিলাসেও ঠিক একই কথা বলা হইয়াছে :

> চৈতন্যভাগবতের নাম চৈতন্যমঙ্গল ছিল।
> বৃন্দাবনের মহান্তেরা ভাগবত আখ্যা দিল ॥

'চৈতন্যভাগবত' হইতে জানা যায় যে শ্রীবাস-গৃহে গৌরাঙ্গের কীর্তনারম্ভকালে বৃন্দাবন-দাস জন্মগ্রহণ করেন নাই।[১৯] তাঁহার জন্মকাল সম্বন্ধেও এতদতিরিক্ত আর কিছুই জানা যায় নাই। তবে 'প্রেমবিলাসে'র চতুর্বিংশবিলাসে 'চৈতন্যমঙ্গলে'র যে রচনাকাল নির্দিষ্ট হইয়াছে, আপাতত তাহা সত্য বলিয়া ধরিয়া লইবার কোন বাধা নাই। 'পাটনির্ণয়' এবং 'পাটপর্যটন' গ্রন্থে হালিশহর-নতিগ্রামে বৃন্দাবনের জন্মস্থান এবং দেন্নুড়ে তাঁহার অবস্থিতির কথা বলা হইয়াছে। ইহাও 'প্রেমবিলাসে'র বর্ণনাকে সমর্থন করে।[২০]

(১৬) চৈ. চ.—১।৮, পৃ. ৪৭ (১৭) চৈ. ম. (লো.)—সূ. খ., পৃ. ৩ (১৮) দ্র.—নরহরি-সরকার (১৯) চৈ. ভা.—১।৮, পৃ. ৬২ ; ২।১, পৃ. ১০৪ ; ২।৮, পৃ. ১৪২ (২০) হালিশহর—কুমারহট্ট

'চৈতন্যভাগবত' ও 'চৈতন্যচরিতামৃত' প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে বৃন্দাবন সম্বন্ধে এইটুকু জানা যায় যে তিনি ছিলেন নিত্যানন্দের একান্ত স্নেহভাজন শিষ্য[২১] এবং নিত্যানন্দের আজ্ঞা-পালনক্রমেই তিনি 'চৈতন্যমঙ্গল' রচনায় ব্রতী হইয়াছিলেন। 'ভক্তিরত্নাকর' মতে[২২] গদাধর-দাসের তিরোধানতিথি-মহামহোৎসবে বৃন্দাবনদাস উপস্থিত ছিলেন। শ্রীনিবাস-আচার্য এই ঘটনার অল্পকাল পূর্বে পাণিগ্রহণ করায় তাঁহার পুত্র বৃন্দাবনের পক্ষে এই উৎসবে যোগদান করা সম্ভব ছিল না। আর অন্য কোনও বৃন্দাবনকে এইসময়ে দেখা যায় না। সুতরাং উপরোক্ত বৃন্দাবনদাস যে বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর তাহাই সম্ভব বলিয়া মনে হয়। তাহা হইলে 'নরোত্তমবিলাস' ও 'ভক্তিরত্নাকরে'র বর্ণনানুযায়ী[২৩] বলিতে হয় যে ইনি জাহ্নবাদেবীর সহিত খেতুরি উৎসবেও যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীনিবাস-কন্যা হেমলতার একজন শিষ্যের নাম অবশ্য বৃন্দাবন-চক্রবর্তী এবং শ্রীনিবাসের কনিষ্ঠ পুত্র গতি-গোবিন্দের একজন শিষ্যের নামও বৃন্দাবনদাস।[২৪] কিন্তু তাঁহারা আরও অনেকে পরবর্তিকালের লোক। তবে শ্রীনিবাস-শাখায় একজন বৃন্দাবনদাস-কবিরাজের[২৫] উল্লেখ থাকিলেও তিনি খ্যাতি-সম্পন্ন ছিলেন কিনা, কিংবা তাঁহার সহিত জাহ্নবাদেবীর কোনও সম্বন্ধ ছিল কিনা জানা যায় না। পক্ষান্তরে খেতুরি-উৎসবে যে-বৃন্দাবন যোগদান করিয়াছিলেন তাঁহার সহিত জাহ্নবাদেবীর নাম যুক্ত হইয়াছে।

'ভজননির্ণয়'-নামক একটি গ্রন্থ বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের নামে প্রচলিত আছে। এই গ্রন্থে মহাপ্রভুর দক্ষিণ হইতে আগমন ও কৃষ্ণদাসকে গৌড়ে প্রেরণের যে বৃত্তান্ত দেখা যায়, তাহা 'চৈতন্যভাগবতে' সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত। মহাপ্রভুর সহিত প্রতাপরুদ্রের মিলন-বর্ণনাতেও উভয় গ্রন্থের মধ্যে বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। আবার গ্রন্থকার জানাইতেছেন যে তিনি স্বরূপ-গোসাঁইর নিকট 'ভক্তিতত্ত্ব গৌরলীলা' সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। এই সকল এবং অন্যান্য কারণে মনে হয় যে এই গ্রন্থটির রচয়িতা 'চৈতন্যভাগবত'-রচয়িতা বৃন্দাবন নহেন।

'চৈতন্যচন্দ্রোদয়'-রচয়িতা একজন বৃন্দাবনদাস বলিতেছেন যে তিনি বৃন্দাবনে গিয়া শিশু-কৃষ্ণদাসের 'মহা অনুভব' প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং জীব-গোস্বামী তাঁহাকে সংস্কৃত ভাষায় 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়' লিখিতে আজ্ঞা প্রদান করিলে তিনি মুরারি-গুপ্তের কবিত্ব দেখিয়া সংকুচিত হন এবং বাংলাভাষায় উক্ত গ্রন্থ রচনা করেন।[২৬] কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, কবি

(২১) চৈ. ভা.—৩।৬, পৃ. ৩১৭; চৈ. চ.—৩।২০, পৃ. ৩৭৬; দ্র.—নিত্যানন্দ (২২) ৯।৪০২ (২৩) ১০।৩৭৭; ন. বি.—৬ষ্ঠ. বি., পৃ. ৮০; ৮ম. বি., পৃ. ১০৭ (২৪) কর্ণ.—২য়. নি., পৃ. ২৭-২৮ (২৫) প্রে. বি.—২০শ. বি., পৃ. ৩৫০; কর্ণ.—১ম. নি., পৃ. ২২, ২৪; অ. র.—৭ম. ম., পৃ. ৪৪ (২৬) চৈ. চন্দ্র.—পৃ. ১৬৫, ১৯৪-২০০

তাঁহার গ্রন্থের প্রথমদিকে বলিতেছেন যে তিনি নিত্যানন্দ-সিদ্ধভক্তবৃন্দের সম্বন্ধে সংক্ষেপে বর্ণনা করিবেন। কারণ ভবিষ্যতে 'শ্রীচৈতন্যভাগবতে' তাঁহাদের সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া লিখিত হইবে।[২৭] পূর্বেই দেখিয়াছি যে গ্রন্থ রচিত হইবার বহুকাল পরেই 'চৈতন্যভাগবত' এই নামটি প্রদত্ত হইয়াছিল। কিন্তু আলোচ্য 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়ে'র লেখক যে গ্রন্থ-রচনার বহুপূর্বেই কিভাবে এই নাম প্রাপ্ত হইলেন তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না। সুতরাং এই গ্রন্থ-রচয়িতাকেও বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর বলিয়া সিদ্ধান্ত করা চলেনা।

'শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বংশবিস্তার' বা 'শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর বংশমালা' নামক গ্রন্থও বৃন্দাবনদাসের নামে প্রচলিত। আলোচ্যমান বৃন্দাবনদাস এই গ্রন্থের রচয়িতা কিনা বলা যায় না। যদি হইয়া থাকেন, তাহা হইলে বলিতে হয় যে গ্রন্থমধ্যে বহু প্রক্ষিপ্তাংশ ঢুকিয়াছে।

একটি 'বৈষ্ণববন্দনা'-গ্রন্থও বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের নামে প্রচলিত আছে। তাহাছাড়া, 'চৈতন্যগণোদ্দেশ', 'চৈতন্যগণোদ্দেশদীপিকা' প্রভৃতি গ্রন্থও তাঁহার নামে প্রচলিত হইয়াছে। পরবর্তিকালে বহু লেখকই 'বৃন্দাবনদাস' ও কৃষ্ণদাস এই দুই সুপ্রসিদ্ধ কবির নামে আপনাদের রচনারাজীকে চালাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাহারই ফলে হয়ত ইঁহাদের নামে প্রচলিত এত অধিক গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়। 'বৈষ্ণবচারদর্পণে'র লেখকও 'শ্রীবৃন্দাবনদাস-ঠাকুর বিরচিতং শ্রীনিত্যানন্দাষ্টকং সম্পূর্ণম্' উদ্ধৃত করিয়াছেন।[২৮]

কবি বৃন্দাবনদাস বাংলা ও ব্রজবুলি উভয় ভাষাতেই পদ রচনা করিয়াছিলেন।[২৯]

(২৭) পৃ. ১০৪ (২৮) পৃ. ২২৭-২৮ (২৯) HBL—p.48

জয়ানন্দ

১৩০৪-৫ সালের 'বংগীয় সাহিত্য পরিষৎ'-পত্রিকায় প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহোদয় কর্তৃক জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইবার পর ৪১২ গৌরাব্দের 'বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা'র আশ্বিন-সংখ্যায় হারাধন দত্ত ভক্তনিধি মহাশয় লিখিয়াছিলেন, "পাঠক দুঃখিত হইবেন না, শুনিয়াছি গ্রন্থখানির সমস্ত কথা নোট করিয়া শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ সভায় উপস্থিত করিয়াছেন। তাহার উপর কোন কথা উচিত নহে।

অনেক বৈষ্ণব হবে অনেক বৈষ্ণবী।
সেবকানুসেবকে ব্যাপিবে পৃথিবী ॥

উক্ত গ্রন্থের এই প্রমাণানুসারেই বলিতেছি মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের পরেই বারশ নেড়ার ও তেরশ নেড়ীর ও তাহার সঙ্গে সঙ্গেই সাহজিক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। তাঁহারা কল্পনা করিয়া পূর্ব পূর্ব গ্রন্থকারগণের অনেক মত উল্টাইয়া আপনাদের মতে গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সাধু সাবধান!! তৃষ্ণাতুর মৃগীর ন্যায় মরীচিকাভ্রমে খানায় পতিত হইবেন না।"

'প্রেমবিলাসা'দি বহু বৈষ্ণবচরিতগ্রন্থগুলির মত জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল'-গ্রন্থখানিও যে ঘটনাগত বহুবিধ ভ্রম-প্রমাদে কণ্টকিত তাহাতে সন্দেহ নাই। তৎসত্ত্বেও 'প্রেমবিলাস' কিংবা তাহার অংশ-বিশেষের মেকি-ত্ব প্রমাণ করিবার জন্য যেরূপ বিতর্কজালের সৃষ্টি হইয়াছিল, ভক্তনিধি-মহাশয়ের সন্দেহ সত্ত্বেও যে ঐ গ্রন্থ সম্বন্ধে সেইরূপ মতবিরোধ দেখা দেয় নাই কেন, তাহা আশ্চর্যের বিষয়। অথচ একমাত্র 'চৈতন্যমঙ্গলে'র বিবরণ ছাড়া সুধী সমাজে স্বীকৃত জয়ানন্দের সম্বন্ধে অন্য কোথাও বিন্দুমাত্র উপাদান সংরক্ষিত হয় নাই।

জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে' কবির যে আত্মবিবরণী লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায়[১] যে বর্ধমানের নিকটবর্তী আমাইপুরা নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রামে সুবুদ্ধি-মিশ্র নামে এক ভক্ত বাস করিতেন। তিনি 'পূর্বে গোসাঞির শিষ্য' ছিলেন। তাঁহার পত্নীর নাম ছিল রোদনী। রোদনী ঋষি নিত্যানন্দের অনুগতা ছিলেন। কবি জয়ানন্দ এই দম্পতীরই সন্তান। কোন এক বৈশাখী শুক্লা-দ্বাদশীতে মাতামহালয়ে ভূমিষ্ঠ হইলে প্রথমে ইঁহার নাম রাখা হয় 'গুহিয়া'। এইরূপ নামকরণের কারণ সম্বন্ধে কবি বলিতেছেন: 'গুহিয়া নাম ছিল মাএর মড়াছিআ বাদে'। সম্ভবত কয়েকটি সন্তান ইতিপূর্বে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় পুত্রের এই নামকরণ হয়। কিন্তু মহাপ্রভু নীলাচল হইতে গৌড়ে

---

(১) পৃ. ৩; বৈ. ধ.—পৃ. ৮৪; বি. ধ.—পৃ. ১৪০

প্রত্যাগমনের পথে পূর্বশিষ্য সুবুদ্ধি-মিশ্রের গৃহে আসিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিবার কালে সুবুদ্ধি-পুত্রের এই 'গুহিয়া'-নাম ঘুচাইয়া 'জয়ানন্দ'-নাম রাখিয়া যান। তখন জ্যৈষ্ঠ মাস।

জয়ানন্দ 'চৈতন্যপদারবিন্দে' মন নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পরবর্তিকালে তিনি 'বীরভদ্র গোসাঞিের প্রসাদমালা পাঞা' 'অভিরাম-স্বামীর পাদোদক প্রসাদে' এবং 'পণ্ডিত গোসাঞিের আজ্ঞা শিরে ধরি'য়া 'চৈতন্য আশীর্বাদে' 'চৈতন্যমঙ্গল'-গ্রন্থ রচনা করেন। তৎপূর্বে সার্বভৌম-ভট্টাচার্যের 'চৈতন্যসহস্রনাম শ্লোক প্রবন্ধে,' পরমানন্দ-পুরীর 'গোবিন্দ বিজয়,' পরমানন্দ-গুপ্তের ''গৌরাঙ্গবিজয়' ও আদি মধ্য শেষ খণ্ড যুক্ত বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থ রচিত হইয়াছে এবং গৌরীদাস-পণ্ডিতের 'কবিত্ব সুশ্রেণী' এবং গোপাল-বসুর রচিত 'সঙ্গীত প্রবন্ধ' খ্যাতিলাভ করিয়াছে। গ্রন্থমধ্যে লেখক পুনঃ পুনঃ গদাধর-পাদপদ্ম স্মরণ করিয়াছেন।

অন্যান্য বৈষ্ণব-গ্রন্থ হইতে জয়ানন্দ সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। কবিকর্ণপূরের 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'তে ও 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র মূলস্কন্ধশাখা বর্ণনায় একজন সুবুদ্ধি-মিশ্রের নাম পাওয়া যায়। এই সমস্ত উল্লেখের সুবুদ্ধি-মিশ্র যে জয়ানন্দ-পিতা সুবুদ্ধি হইবেন, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। জয়ানন্দ তাঁহার পিতাকে 'পূর্বে গোসঞিের শিষ্য' এবং 'গোসাঞিের পূর্বশিষ্য' বলিয়াছেন। শেষোক্ত উল্লেখ চৈতন্যের সুবুদ্ধি-গৃহে আগমন-সম্পর্কিত। সুতরাং 'গোসাঞি' বলিতে তিনি চৈতন্যকেই বুঝাইতেছেন। অন্যত্রও তিনি চৈতন্যকে 'গোসাঞি' বলিয়াছেন। গ্রন্থের দ্বিতীয় পৃষ্ঠাতেই তিনি বলিতেছেন, "চৈতন্য গোসাঞিের ধাত্রীমাতা নারায়ণী।" গদাধর, অভিরাম, বীরভদ্র, সুবুদ্ধি-মিশ্র সকলেই তাঁহার নিকট 'গোসাঁই'। সুতরাং জয়ানন্দ উপরোক্ত স্থলে নামবিহীন 'গোসাঞি' বলিতে সম্ভবত চৈতন্যকেই বুঝাইতেছেন। কিন্তু তাঁহার উদ্ধৃত 'শিষ্য' কথাটি 'মন্ত্রশিষ্য' বলিয়া মনে হয় না। কবি বলিতেছেন :

> পূর্বে গোসাঞির শিষ্য পুস্তক লিখনে।
> আপনে চিন্তয়ে পাঠ যত শিষ্যগণে ।।

চৈতন্য যে বহু ভক্তকে মন্ত্রদান করিয়াছিলেন, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। সুতরাং এইস্থলে বুঝিতে পারা যায় যে সম্ভবত পুস্তক-লিখন, কিংবা শিক্ষা-গ্রহণাদি সম্বন্ধেই 'শিষ্য' বা 'শিষ্যগণ' শব্দগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে, সুবুদ্ধি-মিশ্র কাঁহার মন্ত্রশিষ্য ছিলেন তাহা জানিবার উপায় না থাকিলেও 'চৈতন্যচরিতামৃত' হইতে বুঝিতে পারা যায় যে তিনি চৈতন্য শাখাভুক্তই ছিলেন। তিনি গদাধর-পণ্ডিতের মন্ত্রশিষ্য হইলে গ্রন্থকার নিশ্চয় তাঁহাকে গদাধর-শাখা-বর্ণনার অন্তর্ভুক্ত করিতেন। তবে তিনি যে গদাধর-পণ্ডিতের সহিত অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ-সম্বন্ধযুক্ত ছিলেন এবং এমনকি উভয়ে যে এক পরিবারভুক্ত ছিলেন, তাহাও ধরিয়া লইবার কারণ রহিয়াছে। গৌরীদাস-পণ্ডিতের জীবনী মধ্যে সেই সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

মহাপ্রভু যে নীলাচল হইতে আসিয়া সুবুদ্ধি-মিশ্রের গৃহে বিশ্রাম লাভ করিয়াছিলেন, তাহা যথার্থ মনে করিবার কোন কারণ নাই। রেমুণা-বাঁশদা-দাঁতন-জলেশ্বর-দেবশরণ মান্দারণ-বর্ধমান-বায়ড়া-কুলিয়া—মহাপ্রভুর আগমন-পথের এইরূপ বর্ণনা কোনও প্রামাণিক গ্রন্থের দ্বারা সমর্থিত হয় না। তাছাড়া, 'চৈতন্যচরিতামৃত' হইতে জানা যায় যে মহাপ্রভু বিজয়াদশমী-তিথিতে নীলাচল হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার জ্যৈষ্ঠমাসে বর্ধমানে পৌছাইবার কথা উঠিতেই পারে না। উল্লেখযোগ্য যে মহাপ্রভু অভিরামের গৃহে গিয়া ছয় মাস অতিবাহিত করিয়াছিলেন বলিয়া কবি যে সংবাদটি দিয়াছেন,[২] তাহাও অন্য কোনও গ্রন্থের দ্বারা সমর্থিত হয় না। তবে কবির স্ব-গৃহে 'চৈতন্যের আগমন' বৃত্তান্তটির বর্ণনায় তাঁহার ভুল না ঘটিবার কথাকেই যদি স্বাভাবিক বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে বলিতে হয় যে চৈতন্যের সেই আগমন ঘটিয়াছিল তাঁহার ১৫১০ খ্রী.-এ সন্ন্যাস-গ্রহণের পূর্বে। সেক্ষেত্রে কবির জন্মকালকে উক্ত তারিখের পূর্ববর্তী বলিয়াই ধরিয়া লইতে হয়।

জয়ানন্দ জানাইতেছেন যে তিনি 'পণ্ডিত গোসাঞির আজ্ঞা শিরে ধরি'য়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। কিন্তু গদাধর-পণ্ডিত-গোসাঁই ১৫১২ খ্রী.-এ বাংলাদেশ পরিত্যাগ করিয়া নীলাচলে চলিয়া যান এবং আমৃত্যু তাঁহাকে নালাচলেই অবস্থান করিতে হয়[৩]। চৈতন্য-তিরোভাবের অল্পকাল পরেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। সুতরাং গদাধরের আজ্ঞাপ্রাপ্তির জন্য জয়ানন্দকে তৎপূর্বে নীলাচলে যাইতে হয়। কিন্তু তিনি নীলাচলে গিয়াছিলেন কিনা, তাহার উল্লেখ নাই। নীলাচলে গিয়া মহাপ্রভু ও গদাধর-পণ্ডিতের সহিত সাক্ষাৎ করিলে গ্রন্থমধ্যে নিশ্চয় তাহার উল্লেখ থাকিত বলিয়া মনে হয়। এই সমস্ত কারণে উপরোক্ত জয়ানন্দ-গদাধর প্রসঙ্গটি বিশেষভাবেই প্রণিধানযোগ্য হইয়া উঠে। বীরচন্দ্র-অভিরামের সহিত জয়ানন্দের সংযোগের উল্লেখ ভিত্তিহীন না হইতেও পারে।

জয়ানন্দের গ্রন্থবর্ণিত বহুবিধ ভ্রম-প্রমাদের মত তাঁহার আত্মপরিচয়-সংবলিত বর্ণনাগুলির মধ্যেও কিছু কিছু ভ্রম-প্রমাদ রহিয়াছে কিনা তাহা চিন্তা না করিয়াও বলা চলে যে সেই বর্ণনার মধ্যে যথেষ্ট অস্পষ্টতা থাকিয়া গিয়াছে। একস্থলে সেই বর্ণনা নিম্নোক্তরূপ :

গুহিয়া নাম ছিল মায়ের মড়ছিআ বাদে।
জয়ানন্দ নাম হৈল চৈতন্য প্রসাদে ॥
মা রোদনী ঋষি নিত্যানন্দের দাসী।
জার গর্ভে জন্মিয়া চৈতন্যানন্দে ভাসি ॥
খুড়া জেঠা পাষণ্ড চৈতন্যে অল্পভক্তি।
মহাপাষণ্ড তবো ধরে মহাশক্তি ॥

(২) বি. খ., পৃ. ১৪৪ (৩) দ্র.—গদাধর-পণ্ডিত

বাণীনাথ মিশ্র ষট্‌রাত্রি উপবাসে।
দুর্বাসা ভারতী ব্যাস জগৎ প্রকাশে ॥
জার পুত্র মহানন্দ বিদ্যাভূষণ।
সর্বশাস্ত্রে বিশারদ সর্বসুলক্ষণ ॥
তার ভাই ইন্দ্রিয়ানন্দ কবীন্দ্র ভারতী।
অল্পকালে শরীর ছাড়িল পৃথিবীতে ॥
জেঠা বৈষ্ণবমিশ্র সর্বতীর্থ পূত।
ছোট খুড়া রামানন্দ মিশ্র ভাগবত ॥
বন্দিঘাটী বংশে রঘুনাথ উপাসক।
তার মধ্যে জয়ানন্দ চৈতন্যভাবক ॥

চতুর্থ পর্যায়

অনধিক খ্যাতিসম্পন্ন বৃন্দাবনের ভক্তবৃন্দ

কুমুদানন্দ-চক্রবর্তী ঃ—যে-সমূহ বৃন্দাবন-গোস্বামী কৃষ্ণদাস-কবিরাজকে 'চৈতন্যচরিতামৃত' লিখিতে আজ্ঞাদান করেন, ইনি তাঁহাদের অন্যতম। সম্ভবত ইনি সুকণ্ঠ ছিলেন।

শিবানন্দ-চক্রবর্তী [শিবানন্দ] ঃ—'চৈতন্যচরিতামৃত'-মতে[১] ইনি 'আচার্য গোসাঞির শিষ্য' এবং 'চৈতন্যচরিতামৃত'-রচনার আজ্ঞাকারীদিগের মধ্যেও একজন। ইনি মদনগোপালের পরম ভক্ত ছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য এই যে উক্ত গ্রন্থের অদ্বৈতশাখায় কোনও শিবানন্দের নাম নাই। তবে উক্ত পরিচ্ছেদের মধ্যেই শিবানন্দ-চক্রবর্তীকে গদাধর-শাখাভুক্ত করা হইয়াছে এবং 'প্রেমবিলাস' ও 'ভক্তিরত্নাকর'-গ্রন্থে দেখা যায় যে একজন শিবানন্দ গদাধর-শিষ্যবৃন্দের সহিত খেতুরি-উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।[২] ডা. সুকুমার সেন মনে করেন[৩] যে 'পদকল্পতরু', 'ভক্তিরত্নাকর' ও 'রসকল্পবল্লী'তে 'শিবানন্দ'-, 'শিবাই'- ও 'শিবানন্দ-আচার্য ঠাকুর'-ভণিতায় যে বাংলা ও ব্রজবুলি পদগুলি পাওয়া যায়, সেগুলি গদাধর-শিষ্য শিবানন্দেরই। চৈতন্যপার্ষদ্ শিবানন্দ-সেনও আত্মজীবনী-বর্ণনামূলক পদ রচনা করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণদাস-ব্রহ্মচারী ঃ—শ্রীনিবাস নরোত্তমাদির বৃন্দাবনাগমনকালে ইনি মদনমোহনের সেবা-অধিকারী ছিলেন।[৪] ইনিও গদাধর-পণ্ডিতের শিষ্য। জাহ্নবাদেবীর দ্বিতীয়বার বৃন্দাবনাগমনকালে এবং তাহারও পরে বীরভদ্র যখন বৃন্দাবনে উপস্থিত হন তখনও ইনি মদনমোহনের সেবাধিকারী-রূপে বিদ্যমান ছিলেন।

চৈতন্যদাস ঃ—ইনি ভূগর্ভ-শিষ্য, গোবিন্দপূজক এবং 'চৈতন্যচরিতামৃত'-রচনার আজ্ঞাকারীদিগেরও একজন ছিলেন! 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবন'-গ্রন্থ মতে ইঁহার নামান্তর পূজারী-গোসাঁই এবং ইনি গীতগোবিন্দের 'বালবোধিনী টীকা' ও সম্ভবত 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে'র 'সুবোধনী' টীকা-প্রণেতা। চৈতন্যদাস ও পূজারী-গোসাঁই এক ব্যক্তি হইলে বলিতে হয় যে চৈতন্যদাসের ভ্রাতাই দামোদর-গোসাঁই।[৫]

ভবানন্দ ঃ—ইনি বৃন্দাবনে গোবিন্দাধিকারীদিগের মধ্যে একজন ছিলেন; বীরভদ্র প্রভুর বৃন্দাবনাগমনকালেও ইনি তাঁহার সংবর্ধনাকারীদিগের মধ্যে একজন ছিলেন।

---

(১) ১।৮, পৃ. ৪৮ (২) প্রে. বি.—১৯শ. বি., পৃ.৩০৯ ; ভ.র.—১০।৪১৪ ; ন. বি.—৬ষ্ঠ. বি., পৃ. ৮৪, ৮ম. বি., পৃ.১০৭ (৩) HBL.—pp. 49, 50, 51 (৪) 'প্রেমবিলাসে'র ১৩শ. বিলাসে লিখিত হইয়াছে যে মহাজনের নৌকা চড়ায় ঠেকিয়া গেলে তিনি সনাতনের নিকট প্রার্থনা জানান এবং নৌকা চলিয়া যায়। মহাজন পূর্ব-প্রতিশ্রুতি অনুসারী সেবায়কার বাণিজ্যের সমস্ত অর্থ দান করেন ; গোবিন্দ, গোপীনাথ, রাধাদামোদর, রাধাবিনোদ, রাধারমণ ও শ্যামসুন্দরের মন্দির নির্মাণ ও সেবার ব্যবস্থা হয়। (৫) ইঁহার সম্বন্ধে শ্রীনিবাস-আচার্যের জীবনী দ্রষ্টব্য।

কবিচন্দ্র

'প্রেমবিলাসে' দেখা যায়[১] যে শ্রীজীব-পণ্ডিত, নৃসিংহ-গৌরাঙ্গদাস, কমলাকর-পিপিলাই ও শংকর প্রভৃতি নিত্যানন্দ-ভক্তের সহিত কানাই নামক একজন ভক্ত খেতুরির মহামহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। 'ভক্তিরত্নাকর' এবং 'নরোত্তমবিলাসে'ও উক্ত উৎসব উপলক্ষে এই সমস্ত ভক্তের নাম একত্রে উল্লেখিত হইয়াছে।[২] কিন্তু সেই সমস্ত স্থলে নৃসিংহ-গৌরাঙ্গদাসের পরিবর্তে নৃসিংহ-চৈতন্যদাস দৃষ্ট হয়। 'ভক্তিরত্নাকর'-মতে[৩] জাহ্নবাকর্তৃক বৃন্দাবনে বিগ্রহ-প্রেরণকালে যাঁহারা যাত্রা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে নৃসিংহ-চৈতন্য বিদ্যমান ছিলেন। জীব-পণ্ডিত ও নৃসিংহ-চৈতন্যদাসের নাম 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র নিত্যানন্দ-শাখায় বর্ণিত হইয়াছে। 'ভক্তিরত্নাকর-'প্রণেতা বলেন[৪] যে নৃসিংহ গদাধরদাসের তিরোধানতিথি-মহামহোৎসবেও যোগদান করেন এবং তিনি খেতুরি উৎসবান্তে জাহ্নবার সহিত বৃন্দাবন গমন করেন। গৌড়মধ্যস্থ পোখরিয়া নামক স্থানে নৃসিংহ-চৈতন্যদাসের পাট নির্ণীত হইয়াছে।[৫] 'চৈতন্যভাগবত' এবং জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে'র নিত্যানন্দ-শিষ্যতালিকা মধ্যেও জীব-পণ্ডিতের নাম উল্লেখিত হইয়াছে।[৬] প্রথমোক্ত গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে শ্রীজীব-পণ্ডিতের 'ঘরে নিত্যানন্দচন্দ্রের বিহার' হইয়াছিল। গ্রন্থকার বলেন যে শ্রীজীবের পিতা বিপ্র রত্নগর্ভ-আচার্য গৌরাঙ্গ-'প্রভুর বাপের সঙ্গী জন্ম এক গ্রামে।' উল্লেখযোগ্য যে গৌরাঙ্গের মাতুল রত্নগর্ভ-পণ্ডিতও বেলপুকুরিয়াতে বাস করিতেন।[৭] সুতরাং রত্নগর্ভ-পণ্ডিত ও রত্নগর্ভ-আচার্য যে এক ব্যক্তি হইতে পারেন তাহার সম্ভাবনাও থাকিয়া যায়।

কৃষ্ণানন্দ, জীব ও যদুনাথ-কবিচন্দ্র নামক স্বীয় পুত্রত্রয়কে পরম আদরে ভাগবত ও ভক্তিযোগ-শিক্ষা দান[৮] করিয়া পরম ভাগবত রত্নগর্ভ-আচার্য গৌরাঙ্গের সাদর অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন। পুত্র-ত্রয়ের মধ্যে সম্ভবত কৃষ্ণানন্দের নাম 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র নিত্যানন্দ-শাখায় বর্ণিত হইয়াছে। 'চৈতন্যভাগবত'-মতে[৯] কৃষ্ণানন্দ মুরারি-গুপ্ত ও

(১) ১৯শ. বি., পৃ. ৩০৮ (২) ভ. র.—১০।৩৭৫, ৫১৯ ; ১১।৪০১ ; ন. বি.—৬ষ্ঠ. বি., পৃ. ৭৯-৮০ ; ৮ম. বি., পৃ. ১০৭, ১১৪, ১১৮ (৩) ১৩।৮৪, ১১২ (৪) ৯।৪০২ ; ১০।৭৪৪ (৫) পা. নি (পা. বা.)—পৃ. ২ ; পা. নি. (ক. বি.)—পৃ. ৩ (৬) চৈ. ভা.—৩।৬, পৃ. ৩১৭ ; ২।১, পৃ. ১০১-২ ; চৈ. ম. (জ.)—বি. খ., পৃ. ১৪৭ (৭) প্রে. বি.—৭ম. বি., পৃ. ৬৯ (৮) তু.—ভ. র.—১২।২৩২১ (৯) ১।৬, পৃ. ৩৬ ; ২।১৩, পৃ. ১৭৪

কমলাকান্ত প্রভৃতির সহিত গঙ্গাদাস-পণ্ডিতের নিকট বিদ্যাভ্যাস করিতেন এবং গৌরাঙ্গ তাঁহাদের সকলকে ফাঁকি জিজ্ঞাসা করিয়া জব্দ করিতেন। তারপর কৃষ্ণানন্দ সম্ভবত ক্রমেই গৌরাঙ্গের পার্ষদ্ হইয়া উঠেন। জগাই-মাধাই উদ্ধার ঘটনায় তাঁহাকে উপস্থিত থাকিতে দেখা যায়।

'চৈতন্যচরিতামৃতে'র মূলস্কন্ধশাখা বর্ণনায় 'কবিচন্দ্র আর কীর্তনীয়া ষষ্ঠীবর' নামক দুই ব্যক্তির উল্লেখ আছে। 'গৌরচরিতচিন্তামণি'-এবং 'নামামৃতসমুদ্র'-গ্রন্থে ষষ্ঠীবরকে ষষ্ঠীধর নামে অভিহিত করা হইয়াছে।[১০] আশ্চর্যের বিষয়, রূপ-গোস্বামী-সংকলিত 'পদ্যাবলী'-গ্রন্থে একজন কবিচন্দ্রের রচিত কয়েকটি শ্লোক ও ষষ্ঠীদাস-রচিত একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু এই কবিচন্দ্র ও ষষ্ঠীদাস যথাক্রমে 'চৈতন্যচরিতামৃতো'ক্ত কবিচন্দ্র ও ষষ্ঠীবর কিনা, জানিবার কোনও উপায় নাই। 'আবার চৈতন্যচরিতামৃতে'র নিত্যানন্দ-শাখা-বর্ণনায় 'মহাভাগবত যদুনাথ কবিচন্দ্র' এবং অদ্বৈতশাখাবর্ণনায় 'বনমালী কবিচন্দ্র আর বৈদ্যনাথে'র উল্লেখ করা হইয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে যদুনাথ-কবিচন্দ্রের নাম 'চৈতন্যভাগবতে'র নিত্যানন্দ-শিষ্যবৃন্দের মধ্যেও বর্ণিত হইয়াছে।[১১] দেবকীনন্দনের 'বৈষ্ণববন্দনা'য়[১২] একজন যদু-কবিচন্দ্রের উল্লেখ ব্যতিরেকে নিত্যানন্দ-শিষ্য উপরোক্ত যদুনাথ-কবিচন্দ্রকে আর কোথাও দেখা যায় না। 'প্রেমবিলাসে' দেখা যায়[১৩] যে খেতুরিতে যেইবার মহা-অধিবেশন হইয়াছিল, সেইবার যদুনাথ নামক এক ব্যক্তি তথায় উপস্থিত ছিলেন। পরবর্তিকালের সন্দিগ্ধ 'সীতাচরিত'-গ্রন্থে[১৪] অদ্বৈত-শিষ্য একজন যদুনাথকেও পাওয়া যায় এবং কমলাকান্তের অব্যবহিত পরেই তাঁহার নাম উল্লেখিত হওয়ায় তাঁহাকে কমলাকান্তের বাল্যসঙ্গী কৃষ্ণানন্দের ভ্রাতা যদুনাথ-কবিচন্দ্র বলিয়াও মনে হইতে পারে। কিন্তু তাহা হইলে একই যদুনাথ-কবিচন্দ্রকে অদ্বৈত এবং নিত্যানন্দ উভয়ের শিষ্য বলিয়া ধরিয়া লইবার অযৌক্তিকতার সম্মুখীন হইতে হয়। এদিকে ষষ্ঠীবরের সহিত একজন কবিচন্দ্রকে গদাধরদাসপ্রভুর তিরোধান-তিথিমহামহোৎসব এবং খেতুরির মহামহোৎসবে যোগদান করিতে দেখা যায়।[১৫] ষষ্ঠীবরের নিকটে উল্লেখিত থাকায় তাঁহাকে মূলস্কন্ধশাখার কবিচন্দ্র বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু গদাধরদাসের তিরোধান-তিথিতে যিনি গিয়াছিলেন, তিনি কবিচন্দ্র, কিংবা রামদাস-কবিচন্দ্র নামক আর এক ব্যক্তি, তাহাও তর্কের বিষয় হইয়া উঠিতে পারে। কারণ, বৃন্দাবনদাসের 'বৈষ্ণব-বন্দনা'য়[১৬] একস্থলে গ্রন্থকার রামদাস-কবিচন্দ্রের বর্ণনা করিয়াও অন্যত্র বলিতেছেন, "বন্দিব বালক রামদাস কবিচন্দ্র।" ইহা হইতে রামদাস-কবিচন্দ্র নামক এক পৃথক ব্যক্তির

(১০) গৌ. চি.—পৃ. ৪৭ ; না.স.—৪১ (১১) ৩।৬, পৃ. ৩১৬ (১২) বৈ. ব. (দে.)—পাঁ. বা. (১৩) ১৯শ. বি., পৃ. ৩৩৭ (১৪) পৃ. ১৮ (১৫) ভ. র.—৯।৩৯৩-৯৫ ; ন. বি.—৮ম. বি., পৃ. ১০৭ (১৬) পৃ. ২, ৬

কল্পনা করিয়া লইতে হয়। দেবকীনন্দনের 'বৈষ্ণববন্দনাতে'ও একজন রামদাস-কবিচন্দ্রের উল্লেখ আছে।[১৭] কিন্তু বৃন্দাবনদাসের নামে প্রচলিত 'চৈতন্যগণোদ্দেশদীপিকা' নামক আর একটি গ্রন্থে[১৮] যে চারজন ব্যক্তিকে ব্রহ্মার চারিপুত্র বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে, তাঁহাদের নাম—লোকনাথ, কবিচন্দ্র, রামদাস ও শ্রীনাথ। এইস্থলে কবিচন্দ্র ও রামদাসকে স্পষ্টতই পৃথক ব্যক্তি বলা হইয়াছে। এই সমস্ত হইতে কবিচন্দ্রের বিষয়টি সমস্যাবহুল হইয়া উঠে। এই সম্বন্ধে কেবল এইটুকু বলা যায় যে রামচন্দ্র-যদুনাথ কিংবা অদ্বৈতশাখার বনমালী, ইঁহাদের কেহ কেহ, বা সকলেই হয়ত 'কবিচন্দ্র'-উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং ইঁহাদের মধ্যে কেহ, বা হয়ত অন্য কোনও ব্যক্তি, কেবল 'কবিচন্দ্র' নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। পরবর্তিকালে সম্ভবত ইঁহারা জীবনীকার ও কবিদিগের অনবধানতা বশত তাঁহাদের গ্রন্থমধ্যে প্রবেশলাভ করিয়া হট্টগোল সৃষ্টি করিয়াছেন। কেহ কেহ যদুনাথ-ভণিতার কোনও কোনও কবিতাকে এই যদুনাথ-কবিচন্দ্রের বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহা অমূলক।[১৯] 'শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান'-গ্রন্থে[২০] কবিচন্দ্র-লিখিত একটি 'ভাগবতামৃতে'র কথা উল্লেখিত হইয়াছে।

আবার বৃন্দাবনদাসের নামে প্রচলিত 'চৈতন্যগণোদ্দেশে'ও[২১] একজনকে কবিচন্দ্র-ঠাকুর বলা হইয়াছে এবং দীন-নরহরির একটি পদেও[২২] একজন 'শ্রীনিবাস-শিষ্য কবিচন্দ্র'কে পাওয়া যায়। বর্তমান গ্রন্থকারের নিকট 'লক্ষ্মীর বনবাস' নামক একটি পুথি সংগৃহীত রহিয়াছে। তাহার লেখকও একজন কবিচন্দ্র।

(১৭) পৃ. ২ (১৮) পৃ. ৫ (১৯) প. ক. (প.)—পৃ. ১৯৫ ; গৌ. ত. (প. প.)—পৃ. ২৩৩ ; HBL—pp. 53, 54 (২০) পৃ. ৬১১ (২১) পৃ. ৯ (২২) গৌ. ত.—পৃ. ৩২০

শংকর-ঘোষ

'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'য়[১] একজন 'ডম্ফবাদ্যবিশারদ' শংকর-ঘোষের নাম পাওয়া যায়। 'বৈষ্ণববন্দনা', 'চৈতন্যগণোদ্দেশ' এবং রামাই-এর 'চৈতন্যগণোদ্দেশদীপিকা'তেও ডম্ফবাদক এই শংকর-ঘোষকে পাওয়া যায়।[২] ইনি একজন পদকর্তা ছিলেন।[৩]

'চৈতন্যচরিতামৃতে'র নিত্যানন্দ-শাখার মধ্যেও একজন শংকরকে পাওয়া যায়। 'প্রেমবিলাসা'দি[৪]-গ্রন্থে সম্ভবত ইঁহাকেই কমলাকর-পিপিলাই প্রভৃতি নিত্যানন্দ-শিষ্যবৃন্দ সহ খেতুরি-উৎসবে যোগদান করিতে দেখা যায় এবং 'নরোত্তমবিলাস' হইতে জানা যায় যে ইনি উৎসবান্তে জাহ্নবাদেবীর সহিত বৃন্দাবনে গমন করেন। এই শংকর সম্ভবত পূর্ববর্তী শংকর-ঘোষ হইতে ভিন্ন ব্যক্তি। কারণ এই শংকর কমলাকর-পিপিলাইর সহিত যুক্ত থাকায় ইঁহাকে 'কাশীশ্বর গোস্বামীর স্থচক'-বর্ণিত রুদ্র-পণ্ডিতের সহিত সম্বন্ধযুক্ত শংকর বা শংকর-পণ্ডিত বলিয়া মনে হয়।[৫]

---

(১) ১৪২ ; বৈ. ব. (দে.)—পৃ. ৫ (২) বৈ. ব. (বৃ.)—পৃ. ৬ ; চৈ.গ.—পৃ. ১০ ; চৈ. দী. (রামাই)—পৃ. ১০ (৩) গৌ. ত. (প. প.)—পৃ. ২৪৮ ; প. ক. (প.)—পৃ. ২১০ ; HBL.—p.251 (৪) প্রে. বি.—১৯শ. বি., পৃ. ৩০৮ ; ভ. র.—১০।৩৭৫ ; ন. বি. ;—৬ষ্ঠ. বি., পৃ. ৮০ ; ৮ম. বি., পৃ. ১০৭, ১১৮ (৫) দ্র.—কমলাকর-পিপিলাই ও কাশীনাথ-পণ্ডিত।

প্রমাণ-পঞ্জী

মুদ্রিত প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থ

অদ্বৈতপ্রকাশ (অ. প্র.)—ঈশান-নাগর—মৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ-সম্পাদিত (৩য়. স.)

অনুরাগবল্লী (অ. ব.)—মনোহরদাস—ঐ-সম্পাদিত (৩য়. সং.)

অভিরামলীলামৃত (অ. লী.)—তিলকরামদাস—প্রসন্নকুমার গোস্বামী-সম্পাদিত (১৩০১)

কর্ণামৃত (কর্ণ.)—যদুনন্দনদাস—রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন-সম্পাদিত (৩য়. সং.)

গোবিন্দদাসের-কড়চা (গো. ক.)—দীনেশচন্দ্র সেন-সম্পাদিত (নব. সং.)

গৌরগণোদ্দেশদীপিকা (গৌ. দী.)—কবিকর্ণপূর রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন-সম্পাদিত (৫ম. সং.)

গৌরচরিতচিন্তামণি (গৌ. চি.)—নরহরি-চক্রবর্তী—হরিদাসদাস-প্রকাশিত (গৌরাব্দ ৪৬১)

গৌরপদতরঙ্গিণী (গৌ. ত.)—জগদ্বন্ধু-ভদ্র-সংকলিত—মৃণালকান্তি ঘোষ-সম্পাদিত (২য়. সং.)

গৌরাঙ্গলীলামৃত (গৌ. লী.)—বিশ্বনাথ-চক্রবর্তী (কৃষ্ণদাস অনূদিত)—রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন-প্রকাশিত (চৈতন্যাব্দ ৪০২)

গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস (গৌ. স.)—বাসুদেব-ঘোষ—আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ-সম্পাদিত (ব. সা. প. —১৩২৪)

চৈতন্যচন্দ্রোদয় (চৈ. চন্দ্র.)—বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর—কবিরাজ সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী (চৈতন্যাব্দ ৪৫৫)

চৈতন্যচন্দ্রোদয়কৌমুদী (চৈ. কৌ.)—প্রেমদাস-মিশ্র—মহেন্দ্রচন্দ্র শীল-প্রকাশিত (?) (১২৯২)

চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক (চৈ. না.)—কবিকর্ণপূর—রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন-অনূদিত (১৩৩০)

চৈতন্যচরিতামৃত (চৈ. চ.)—কৃষ্ণদাস-কবিরাজ—(বসুমতী সাহিত্য মন্দির—৮ম. সং.)

চৈতন্যচরিতামৃতমহাকাব্য (চৈ. চ. ম.)—কবিকর্ণপূর—রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন-অনূদিত (১৩৩২)

চৈতন্যমঙ্গল (চৈ. ম.—জ.)—জয়ানন্দ—নগেন্দ্রনাথ বসু ও কালিদাস নাথ (ব. সা. প. ১৩১২)

চৈতন্যমঙ্গল (চৈ. ম.—লো.)—লোচনদাস—মৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ-সম্পাদিত (৩য়. সং.)

চৈতন্যভাগবত (চৈ. ভা.)—বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর—(বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ৫ম. সং.)

চৈতন্যসংগীতা (চৈ. স.)—ভগীরথ-বন্ধু (বেণীমাধব দে'র যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত—১২৫৯)

জগদীশচরিত (জ. চ.)—আনন্দচন্দ্রদাস (১৭৩৭ শক) (কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় পুথিশালা, নং ২৪০১)

নরহরি-সরকার-ঠাকুরের শাখা-নির্ণয় (ন. শা. নি.)—রামগোপালদাস (শ্রীগৌরাঙ্গমাধুরী-পত্রিকা—মাঘ, ১৩৩৭)

নরোত্তমবিলাস (ন. বি.)—নরহরি-চক্রবর্তী—রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন-সংশোধিত (২য়. সং.—১৩২৮)

নামামৃতসমুদ্র (না. স.)—নরহরি-চক্রবর্তী—হরিদাস দাস-প্রকাশিত

নিত্যানন্দপ্রভুর-বংশবিস্তার, বা বংশবিস্তার (নি. বি.)—বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর—নবদ্বীপ-চন্দ্রবিদ্যারত্ন (শক.—১৭৯৬)

নিত্যানন্দপ্রভুর-বংশমালা, বা বংশমালা (নি. ব.)—বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর – বিপিনবিহারী গোস্বামী (শক.— ১৮০৭)

পদকল্পতরু (প. ক.)—সতীশচন্দ্র রায়-সম্পাদিত (ব. সা. প.)

পদ্যাবলী—রূপ-গোস্বামী—রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন-অনূদিত (২য়. সং.—১৩১৮)

পাটপর্যটন এবং অভিরাম-ঠাকুরের শাখা-নির্ণয় (পা. প.)—অভিরামদাস—অম্বিকা ব্রহ্মচারী-প্রকাশিত (ব. সা. প. প.—১৯১৮)

প্রেমবিলাস [১ম.-২০শ. বিলাস] (প্রে. বি.)—নিত্যানন্দদাস—রাসবিহারী সাংখ্যতীর্থ (২য়. সং.—চৈতন্যাব্দ, ৪২৫)

প্রেমবিলাস [২১শ.-২৪½শ. বিলাস] (প্রে. বি)—নিত্যানন্দদাস—যশোদানন্দন তালুকদার

বাসুদেব-ঘোষের-পদাবলী (বা. প.)—মৃণালকান্তি ঘোষ (১৩১২)

বৈষ্ণববন্দনা (বৈ. ব.—য.)—যদুনন্দন [অসম্পূর্ণ]—পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ (ব. সা. প. প.—রংপুর শাখা, ১ম. ও ২য়., ১৩১৩-১৪)

বংশীশিক্ষা (ব. শি.)—প্রেমদাস-মিশ্র—ভাগবত কুমার দেব গোস্বামী

ভক্তমাল (ভ. মা.)—নাভাজীউ (কৃষ্ণদাস বাবাজী)—বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ৫ম. সং. (চৈতন্যাব্দ ৪৬৪)

ভক্তিরত্নাকর (ভ. র.)—নরহরি-চক্রবর্তী—নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালংকার (গৌড়ীয় মিশন—১৯৪০)

ভজননির্ণয় (ভ. নি.)—বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর—বলহরি দাস (১৩০৮)

মুরলীবিলাস (মু. বি.)—রাজবল্লভ-গোস্বামী—নীলকান্ত ও বিনোদবিহারী গোস্বামী (চৈতন্যাব্দ—৪০৭)

রঘুনন্দন-ঠাকুরের শাখানির্ণয় (র. শা. নি.)—রামগোপালদাস—শ্রীগৌরাঙ্গমাধুরী পত্রিকা—মাঘ, ১৩৩৭

রসিকমঙ্গল (র. ম.)—গোপীজনবল্লভ দাস

শ্যামানন্দপ্রকাশ (শ্যা. প্র.)—কৃষ্ণচরণদাস—অমূল্যধন রায়ভট্ট (১৩৩৫)

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতং (শ্রী. চ.)—প্রবোধানন্দ-সরস্বতী (৪র্থ. সং.—১৩৩৪ ?)

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং (শ্রীচৈ. চ.)—মুরারি-গুপ্ত (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুথিশালা)

শ্রীশ্রীসংক্ষেপবৈষ্ণবতোষণী (সং. বৈ. তো.)—জীব-গোস্বামী—অকিঞ্চন শ্রীমৎপুরীদাসেন সম্পাদিতা [ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশিত (২)]

ষট্‌সন্দর্ভ, তত্ত্বসন্দর্ভ (ষ. স. ত.)—জীব-গোস্বামী—নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী ও কৃষ্ণচন্দ্র-গোস্বামী

সীতাগুণকদম্ব (সী. ক.)—বিষ্ণুদাস-আচার্য—হৃষীকেশ বেদান্তশাস্ত্রী এম. এ.-সম্পাদিত

সীতাচরিত্র (সী. চ.)—লোকনাথদাস—অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি (১৩৩৩)

হরিভক্তিবিলাস (হ. বি.)—সনাতন-গোস্বামী—অকিঞ্চন শ্রীমৎ পুরীদাস মহাশয়েন সম্পাদিতঃ (ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশিত)

প্রাচীন পুথি ***

পাটবাড়ীতে সংরক্ষিত—পানিহাটী শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থমন্দির হইতে সংগৃহীত

	লিপিকাল		পুথিসংখ্যা
কবিরাজ-গোস্বামীর-শাখা (ক. শা.)		বিবিধ,	১৬৬
চৈতন্যগণোদ্দেশ (চৈ. গ.) বৃন্দাবনদাস		ঐ,	৫৮
বৈষ্ণববন্দনা (বৈ. ব—বৃ .)—বৃন্দাবনদাস	১০৭৫ সন, ৩রা ভাদ্র	ঐ,	১০১
মহাপ্রভুর-গণের-আবির্ভাবতিথি (ম. আ. তি.)		ঐ,	১২৫
মহাপ্রভুর-গণের-শ্রীপাট-নির্ণয় (পা. নি.—পা. বা.)	১২৫৩, ২৮শা আশ্বিন	ঐ,	১২৯
রঘুনাথদাস-গোস্বামীর গুণলেশ-সূচক (র. সূ.)—শ্রীকৃষ্ণদাস-কবিরাজ		অনুবাদ,	২৯
রূপ-গোস্বামী ও কবিরাজ-গোস্বামীর সূচক (রূ. ক. সূ)	প্রায় ২০০ বৎসরের প্রাচীন	বিবিধ,	১৯৫
রূপ-সনাতন-সংবাদে উপাসনা-কাণ্ড (রূ. স. উ.)	ঐ	ঐ,	১৬৪
স্বরূপদামোদরের-কড়চা (স্ব. ক.)	১২৬৩, ১১ই কার্তিক	ঐ,	১৯৩
** বৈষ্ণববন্দনা (বৈ. ব.—পা. বা.) দেবকীনন্দন	১০৯১	ঐ,	৯৯

এশিয়াটিক সোসাইটিতে সংরক্ষিত

অদ্বৈতকড়চাসূত্র (অ. ক. সূ.)—কৃষ্ণদাস		৫৪১৩
গৌরলীলাবর্ণনা (গৌ. ব.)—বাসুদেব-ঘোষ		বাং. ৪
গৌরাঙ্গবিজয় (গৌ. বি.)—চূড়ামণি দাস		৩৭৩৬
নিত্যানন্দকড়চা (নি. ক.)—		৪৯৬৮
** বৈষ্ণববন্দনা (বৈ. ব.—এ. সো.)—দেবকীনন্দন	১ ০৫	৫৩৬৯
সূচকস্তব [ক. বি., ১৯৮০ অনুযায়ী] (সূ. স্ত.)—রাধাবল্লভ দাস	১০৯৪, ৩রা-শ্রাবণ, মঙ্গলবার	৪৯৩৫
স্বরূপদামোদরের কড়চা (স্ব. ক.—এ. সো.)	প্রায় ২০০ বৎসরের প্রাচীন	৫৩৫৩

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালা বিভাগ-সংরক্ষিত

অভিরাম-গোস্বামীর বন্দনা (অ. গো. ব.)	১২৫৮ সাল	১৫০৩
কাশীশ্বর-গোস্বামীর সূচক (কা. সূ.)—কৃষ্ণদাস		১৮৮৭
গুরুশিষ্য-সংবাদ (গু. স.)—নরোত্তম দাস	১০৬৯ সাল	৫৫৮

*** পুথিগুলির পাঠ সম্বন্ধে একটি ত্রুটি থাকিয়া গিয়াছে। একটি পুথি খুলিয়া ধরিলে উপরে ও নীচে যতটুকু অংশ একসঙ্গে দেখা যায়, তাহার সমস্তটি একই পৃষ্ঠার অন্তর্গত বলিয়া ধরিলে বিভ্রাট বাধিবে না।

গৌরগণদীপিকা (গৌ. গ. দী.)—কৃষ্ণদাস-কবিরাজ	১২৫৩ সাল	৩২১৭
গৌরগণোদ্দেশ (গৌ. গ.)—[অসম্পূর্ণ]	প্রায় ২০০ বৎসরের প্রাচীন	১১৮৮
চৈতন্যকারিকাগ্রন্থ (চৈ. কা.)—যুগলকিশোরদাস	ঐ	৫৮০
চৈতন্যগণোদ্দেশদীপিকা (চৈ. দী.)—বৃন্দাবন দাস	১১০৭ সাল	৩৫৫৬
চৈতন্য-জাহ্নবা-তত্ত্ব (চৈ. জা. ত.)—গোপাল-ভট্ট	শক ১৬৮৮	৪৪৫৮
জগদীশ-পণ্ডিতের শাখা-বর্ণন (জ. শা.) [অসম্পূর্ণ]		১৬৬৭
পাট নির্ণয় (পা. নি.—ক. বি.)—রামগোপাল দাস		৪৬৪১, ৩৬৪৮
** বৈষ্ণববন্দনা (বৈ. ব.—দে.)—দেবকীনন্দন	১০৭৫	১৪৩৩
	১০৮৫	১৫৫৫
	১০৬৯	১৫৫১
রঘুনাথদাসের সূচক (র. দা. সূ.)—প্রেমদাস	প্রায় ১৫০ বৎসরের প্রাচীন	১৬৮৩
শ্যামানন্দবিলাস (শ্যা. বি.)—কৃষ্ণচরণ দাস		৩৫৭৭
শ্রীনিবাসের জন্মকথা (শ্রী. জ.)		৩১৮২
সনাতন গোসাঞির সূচক (স. সূ.)—রসময়দাস	প্রায় ২০০ বৎসরের প্রাচীন	১১৫৯
সূচক (সূ.)		৩২৯৭

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-সংরক্ষিত

অদ্বৈতবিলাস (অ. বি.)—নরহরিদাস	২৬৫
গৌরগণোদ্দেশ (গৌ. গ.)—কৃষ্ণদাস	১৬৫৫
গৌরগণোদ্দেশদীপিকা (গৌ. গ. দী.—বলরাম—বলরামদাস)	১৬৫৬
চৈতন্যগণোদ্দেশ (চৈ. গ.—বলরাম)—বলরামদাস	চি. ৩৫১
চৈতন্যগণোদ্দেশদীপিকা (চৈ. দী.—রামাই)—রামাই	১৪২৩
বীররত্নাবলী (বী. র.)—গতি-গোবিন্দ	২৩৭৯
সূচক (সূ.—ব. সা. প.)	৯৮২

বর্তমান গ্রন্থকারের সংগৃহীত

গোবিন্দদাসের উৎকৃষ্ট পদসংগ্রহ পুথি [খণ্ডিত]

** বৈষ্ণববন্দনা (বৈ. ব.—দে.)—দেবকীনন্দন ১১৮৬

** দেবকীনন্দনের অন্যান্য বৈষ্ণববন্দনাগুলির সহিত মিলাইয়া এই (বর্তমান-গ্রন্থকার-সংরক্ষিত) গ্রন্থখানিকেই আদর্শ-রূপে গ্রহণ করা হইয়াছে।

মুদ্রিত আধুনিক বৈষ্ণব-গ্রন্থ

[যে সমস্ত গ্রন্থের অভিমত গৃহীত বা আলোচিত হইয়াছে]

অমিয় নিমাই চরিত (১ম-৫ম. খণ্ড)—শিশির কুমার ঘোষ
উৎকলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—সারদাচরণ মিত্র (১৯০৯)
গোবিন্দদাসের কড়চা রহস্য—মৃণালকান্তি ঘোষ, ভক্তিভূষণ (১৩৪৩)
গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবন (গৌ. জী.)—হরিদাস দাস (গৌরাব্দ—৪৬৫)
গৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ (গৌ. তী.)— ঐ
গৌরপদতরঙ্গিণী—পরিকর ভক্ত ও পদকর্তৃগণের পরিচয় (গৌ. ত.—প. প.)
—মৃণালকান্তি ঘোষ, ভক্তিভূষণ (২য়. সং.)
চৈতন্যচরিতামৃতের ভূমিকা—শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ (৩য়. সং.—বঙ্গাব্দ, ১৩৫৫)
জ্ঞানদাসের পদাবলী (ভূমিকা)—হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন (ক. বি.—১৩৬৩)
দাক্ষিণাত্যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—রেবতীমোহন সেন (জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪)
নিত্যানন্দচরিত (১ম.-৩য়. খণ্ড)—জানকীনাথ পাল
নিত্যানন্দচরিত—যজ্ঞেশ্বর চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ (১৩১৫)
নীলাচলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—প্রমথনাথ মজুমদার, বি. এল. (১৩৩৪)
পদকল্পতরু—পরিশিষ্ট (প. ক.—প.)—সতীশচন্দ্র রায়, এম. এ. (ব. সা. প.—১৩৩৮)
পদাবলী পরিচয়—হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (আশ্বিন, ১৩৫৯)
পদামৃতমাধুরী (৪র্থ খণ্ড)—শ্রীনবদ্বীপ ব্রজবাসী ও শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম. এ.-সম্পাদিত
বক্রেশ্বর চরিত—অমৃতলাল পাল দাস (১৩০৭ সাল)
বলরামদাসের পদাবলী—ব্রহ্মচারী অমরচৈতন্য-সম্পাদিত (ফাল্গুন, ১৩৬২)
বাংলা চরিত গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য—গিরিজাশংকর রায়চৌধুরী (ক. বি.—১৯৪৯)
বাংলার বৈষ্ণব ধর্ম—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ (ক. বি. ১৯৩৯)
বৈরাগী রঘুনাথ দাস—প্রাণকৃষ্ণ দত্ত (১৯০৩)
বৈষ্ণবদিগ্‌দর্শনী—(বৈ. দি.)—মুরারিলাল অধিকারী (বঙ্গাব্দ—১৩২২)
বৈষ্ণব-রসসাহিত্য—খগেন্দ্রনাথ মিত্র (১৩৫৩)
বৈষ্ণব সাহিত্য—সুশীলকুমার চক্রবর্তী (১৩৩২)
বৈষ্ণবাচারদর্পণ (বৈ. দ.)—নবদ্বীপচন্দ্র গোস্বামী (৪র্থ. সং., ১৩৩৬)
ভক্তচরিতামৃত—অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় (১৩০০)
ভক্তপ্রসঙ্গ (২য়. খণ্ড)—সতীশচন্দ্র মিত্র-সংকলিত (১ম. সং. ১৯২১)
রঘুনাথদাস গোস্বামীর জীবনচরিত—অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় (১৩০০ সাল)
রায় রামানন্দ—রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ (১৩১৭ সাল)
লীলাসঙ্গী—বিষ্ণু সরস্বতী—মৃণালকান্তি ঘোষ-প্রকাশিত
শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব—গৌরগুণানন্দ ঠাকুর
শ্রীগৌরাঙ্গের পূর্বাঞ্চল পরিভ্রমণ—অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি (বঙ্গাব্দ ১৩২৮)
শ্রীনরোত্তমচরিত—শিশির কুমার ঘোষ
শ্রীনিবাস আচার্য চরিত—অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় (১৩০৭)

শ্রীপ্রবোধানন্দ ও শ্রীগোপাল ভট্ট—মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ (১৩৩৫ সন)
শ্রীবাসচরিত—বৈষ্ণবচরণ দাস (বহরমপুর, ১৩১৬)
শ্রীভাগবত আচার্যের লীলা প্রসঙ্গ—হরিদাস ঘোষাল (পা. বা., ১৩৪৪)
শ্রীমৎ রঘুনাথদাস গোস্বামীর জীবনচরিত (১ম. সং.)—অচ্যুতচরণ চৌধুরী (১৩০০ সাল)
শ্রীমৎ হরিদাস ঠাকুরের জীবন চরিত—অচ্যুতচরণ চৌধুরী (বৈশাখ, ১৩০৩ বঙ্গাব্দ)
শ্রীমদ্গোপাল ভট্ট গোস্বামীর জীবনচরিত—অচ্যুতচরণ চৌধুরী (বঙ্গাব্দ ১৩০২)
শ্রীরূপ সনাতন—অচ্যুতচরণ চৌধুরী
শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ চরিত—রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ (আষাঢ়, ১৩৪২ সাল)
শ্রীহরিদাস ঠাকুর—অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় (১৩০২)
সদ্‌গুরুলীলা—হরিদাস বসু (১৩৩৩)
সাধককণ্ঠমালা—রামদাস বাবাজী-সম্পাদিত (৫ম. সং.—১৩৫৮)
Chaitanya and His Age—Rai Bahadur Dinesh Ch. Sen, B. A., D. Litt. (C. U.—1922)
Chaitanya and His Companions—Rai Sahib Dinesh Ch. Sen, B.A (C.U— 1917)
Chaitanya's Life and Teachings—Sir Jadunath Sarkar (3rd. Ed., 1232)
Early History of the Vaisnava Faith and Movement in Bengal (VFM.) Dr. S. K. De, M. A., D. Litt. (1942)
History of Brajabuli Literature (HBL.)—Sukumar Sen, M. A. (C. U.—1935)
The Vaisnava Literature of Mediæval Bengal— Rai Sahib Dinesh Ch. Sen, B. A. (C. U.—1917)

সাময়িক পত্রিকা ইত্যাদি

আনন্দবাজার পত্রিকা—১৩৫৯ (শারদীয়া)
গৌড়ভূমি—১৩০৮ (আষাঢ়-শ্রাবণ, অগ্রহায়ণ-পৌষ)
গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা—১৩০১ (আশ্বিন), ১৩০১ (২য়.সংখ্যা)
গৌরাঙ্গ মাধুরী—১৩৩৪ (ফাল্গুন), ১৩৩৫ (শ্রাবণ)
গৌরাঙ্গসেবক—১৩২৬ (পৌষ), ১৩২৭ (বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ), ১৩৩৪ (শ্রাবণ, ফাল্‌গুন)
জন্মভূমি—১২৯৮ (জ্যৈষ্ঠ)
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—১৭৭১ শকাব্দ (বৈশাখ)
নারায়ণ—১৩২১ (চৈত্র)
প্রবাসী—১৩৩২ (শ্রাবণ)
বসুমতী—(মাসিক)—১৩৪২ (পৌষ)
বঙ্গদর্শন—১২৮০ (পৌষ) ; ১২৮২ (পৌষ, মাঘ)
বঙ্গবাণী—১৩২৮ (চৈত্র), ১৩২৯ (অগ্রহায়ণ)
বঙ্গশ্রী—১৩৪০ (?) (জ্যৈষ্ঠ), ১৩৪৭ (ভাদ্র), ১৩৪৮ (কার্তিক), ১৩৪৯ (জ্যৈষ্ঠ), ১৩৫৬ (বৈশাখ)
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা—১৩০৩, ১৩০৮, ১৩০৬, ১৩১৬, ১৩১৮, ১৩১২, ১৩৪২

বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা—চৈতন্যাব্দ ৪০৪, ৪০৫ (চৈত্র), গৌরাব্দ ৪১০ (মাঘ), ৪১১ (আষাঢ়, আশ্বিন, কার্তিক), ৪১৩
বিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ পত্রিকা—৪৪৬ গৌরাব্দ (ফাল্‌গুন-বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়)
বীরভূমি—১৩১১ (পৌষ), ১৩২১ (বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ), ১৩৩৫ (?)
বীরভূমি (নবপর্যায়)—১৩২৪
ভারতবর্ষ—১৩২৪ (ভাদ্র), ১৩৩০ (কার্তিক), ১৩৪০ (চৈত্র), ১৩৪১ (শ্রাবণ), ১৩৪২ (বৈশাখ, আষাঢ়)
যুগান্তর—১৩৬৪ (শারদীয়া)
শ্রীগৌরাঙ্গ পত্রিকা—১৩০৮ (আশ্বিন-কার্তিক)
শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গপ্রিয়া পত্রিকা—১৩৩০ (পৌষ)
সজ্জনতোষণী—চৈতন্যাব্দ ৪০০ (২য়. খণ্ড)
সাহিত্য—১২৯৯ (আশ্বিন), ১৩০২ (অগ্রহায়ণ), ১৩০৩ (অগ্রহায়ণ), ১৩০৬ (আষাঢ়, ফাল্‌গুন)
সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা—(রংপুর শাখা)—১ম. ও ২য়. খণ্ড
সোনার গৌরাঙ্গ—১৩৩২ (?), ১৩৩৪ (জ্যৈষ্ঠ)
Archæological Survey of India—Annual Report (Rep. Arch. Surv. Ind.)—1903-4
Bengal District Gazetteers, Bankura—L.S.S.O.' Malley, I.C.S. (Cal.—1908)
Calcutta Review—1898 (January)
Indian Antiquary (Ind. Ant.)—Vol. XX (1891)
Indian Historical Quarterly (Ind. Hist. Quart.)—1927 (Vol. 3.), 1933 (March), 1946
Journal of the Asiatic Society of Bengal (J. A. S. B.)—1872
Journal of the Bihar and Orissa Research Society (J. B. O. R. S.)—Vol. 5, 1909
Journal of the Royal Asiatic Society (J.R.A.S.)—1909
Nadia District Gazetteer (Hand Book)—1953
Proceedings of the India History Congress (Proc. Ind. Hist. Cong.)—Annamalai University, 9th Session, 1945

অন্যান্য গ্রন্থ

অন্নদামঙ্গল—ভারতচন্দ্র রায়, কবিগুণাকর—সন্তোষকুমার চৌধুরী-সম্পাদিত
কীর্তন—খগেন্দ্রনাথ মিত্র (১৩৫২—আষাঢ়)
প্রবন্ধসংগ্রহ—প্রমথ চৌধুরী (পুনর্মুদ্রণ—১৯৫৭)
প্রাচীন বাংলার গৌরব—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৩৫৩—আশ্বিন)
প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য (৫ম.-৬ষ্ঠ. খণ্ড)—কালিদাস রায় (ফাল্‌গুন, ১৩৫৮)
প্রাচীন বংগসাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান—প্রমথচৌধুরী (১৩৬০)
বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব—রামগতি ন্যায়রত্ন (৪র্থ. সং.) —গিরীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত (চুঁচুঁড়া, ১৩৪২)
বাংলার ইতিহাস (২য়. ভাগ)—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা—১৩২৪)

বাংলার সাধনা—ক্ষিতিমোহন সেন (১৩৫২)
বাংলা সাহিত্য—ডা. মনোমোহন ঘোষ (১৩৬১)
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (বা. সা. ই.)—১ম. খণ্ড—ডা. সুকুমার সেন, এম. এ., পি. এইচ. ডি. (১ম. ও ২য়. সং.)
বাংলা লিরিকের গোড়ার কথা—তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় (১৩৬১)
বাঙালীর সারস্বত অবদান (১ম. ভাগ)—দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য
বিচিত্র সাহিত্য—ডা. সুকুমার সেন (১৯৫৬)
বীরভূম বিবরণ (৩য়. খণ্ড)—মহিমা নিরঞ্জন চক্রবর্তী-সম্পাদিত, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়-সংকলিত ও প্রকাশিত
ভক্তিযোগ—স্বামী বিবেকানন্দ
মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী—সুকুমার সেন (১৩৫২)
রাজযোগ—স্বামী বিবেকানন্দ
শব্দকল্পদ্রুম
শ্রীকৃষ্ণবিজয় (ভূমিকা) .. খগেন্দ্রনাথ মিত্র-সম্পাদিত
শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান (চৈ. উ.)—ডা. বিমানবিহারী মজুমদার, এম. এ., পি. এইচ. ডি. (ক. বি.—১৯৩৯)
স্বামী বিবেকানন্দ—ডা. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (প্রকাশিতব্য)
An Advanced History of India—R. C. Majumdar, H. C. Roy-Chowdhury, Kalikinkar Dutta (1953)
A History of Orissa (Vol. 1)—W. W. Hunter B. A., etc. (1956)
Bengali Literature—J. C. Ghosh (Oxford University Press—London, 1948)
History of Bengal (Vol. II)—Sir Jadunath Sarkar (Dacca University Publication, 1948)
History of Orissa (Vol. I)—R. D. Banerji (Calcutta –1930)
History of Sanskrit Literature (Vol. I)—S. N. Das Gupta and S. K. De (1947)
History of the Vishnupur Raj—Abhay Pada Mallik (1921)
Markandeya Purana—Pargiter
Political History of Ancient India—H. C. Roy Chowdhury (C. U., 1950)
Riyazu-s-Salatin—Ghulam Husain Salim—Translated by Moulavi Abdus Salim, M A. (Calcutta—1902)
Some Historical Aspects of the Inscriptions of Bengal—Dr. Benoy Chandra Sen, M. A., B. L., Ph.D. (London)
Studies in Indian Antiquities—H. C. Roy Chowdhury
The Akbarnama—Abu-l-Fazl (Vol.III)—Translated by H. Beveridge, I. C. S., F. A. S. B.
The Annals of Rural Bengal—W.W. Hunter, B. A., M. R. A. S. of B.C.S. (London, 1868)
The History of Orissa—Harekrishna Mahatab—(Radhakumud Mukhreji Endowment Lectures, 1947—Lucknow University

নির্ঘণ্ট

ব্যক্তি

স্থান

গ্রন্থ, পত্রিকা, প্রবন্ধ, অনুশাসনাদি

[প্রমাণ-পঞ্জীর অন্তর্গত প্রাচীন বৈষ্ণবগ্রন্থগুলির (বিশেষ আলোচনা বা বিশেষ উল্লেখের ক্ষেত্র ছাড়া) এবং আধুনিক বৈষ্ণবদিগ্দর্শনী, বৈষ্ণবাচারদর্পণ, গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জীবন, গৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ প্রভৃতি গ্রন্থ ও পদকল্পতরু বা গৌরপদতরঙ্গিণী প্রভৃতির পদ-অংশগুলি নির্ঘণ্টধৃত হয় নাই। —বহুস্থলেই গ্রন্থনামের পূর্বস্থিত 'শ্রী-' এবং 'শ্রীমৎ-'গুলিকে বাদ দেওয়া হইয়াছে।]

STATE CENTRAL LIBRARY
WEST BENGAL

বিবিধ